গল্পমালা

গল্পমালা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

সূচী

নিবেদন

নরেন্দ্রনাথ মিত্রর ছোট বড় মাঝারি গল্পের সংখ্যা শচারেক। তার বেশির ভাগই এখন আর সংকলিত অবস্থায় নেই। অথচ সেগুলির পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন যে আছে তা বলাই বাহুল্য। তাই তাঁর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা গল্পভাণ্ডার থেকে পঞ্চাশটি গল্প নিয়ে এই 'গল্পমালা' প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত। গল্পগুলি সাজানো হয়েছে রচনাকাল অনুসারে। প্রতিটি গল্পের শেষে রচনাকালের উল্লেখ আছে। কোন্ গল্পের প্রথম প্রকাশ কোন্ পত্রিকায়, গ্রন্থশেষে তারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভূমিকা হিসাবে রইল লেখকেরই স্বরচিত 'গল্প লেখার গল্প'—তাঁর শেষ বেতার-কথিকা।

প্রকাশক

গল্প লেখার গল্প

ছোট বড মাঝাবি ভালো মন্দ মাঝাবি জীবনে কত গল্পই না লিখলাম। তবু অলিখিত গল্পেব সংখ্যা যেন আবো বেশি। যে সব গল্প লিখব বলে ভেবে বেখেছি অথচ শেষ পর্যন্ত লেখা আব হযে ওঠেনি, যে সব গল্পেব ইসাবা সামান্য একটু সাডা দিযেই চঞ্চল পাযে অদৃশ্য হযে উঠেছে, যাবা কেবল চকিতেব জন্যে দেখা দিযেছে অথচ ধবা-ছোঁওযা দেযনি, তাদেব সংখ্যা কম নয।

না-লেখা গল্পগুলিব কথা থাক। লেখা গল্পগুলিব কথাই বলি।

পিছনে ফেলে আসা দিনগুলিব আব দিন ভবে বাত ভবে লেখা গল্পগুলিব দিকে তাকিযে কেমন যেন একটা দীর্ঘশ্বাস পডে। বাস্তব আব কল্পিত, অবচিত আব স্ববচিত সব মিলিযে এই গল্পগুলি যেন আমাবই জীবনবৃত্ত

অনেকদিন আগে নাবকেলডাঙ্গায একটি ভাডাটে বাডিতে আমি সপবিবাবে বাস কবতাম। দোতলায বাডিওযালা থাকতেন আব একতলায থাকতাম আমবা তিন ঘব ভাডাটে।

সেই বাসা ছেডে দেবাব প্রায বিশ বছব বাদে কোন একটা উপলক্ষে আবাব আমাকে ওই অঞ্চলে একদিন যেতে হযেছিল। কি কৌতূহল হল, ঘুবতে ঘুবতে গিযে দাঁডালাম সেই বাসাবাডিটাব সামনে। দেখি আমাদেব সেই ঘব দুখানি জুডে আব একটি নবীন দম্পতি বসবাস কবছে।

আমাব সেই পুবনো ঘবেব নতুন বাসিন্দাবা আমাকে খুবই আপ্যাযন কবল। চা এল, মিষ্টি এল। এল সানুবাগ অনুবোধ, 'আবাব আসবেন কবে আসবেন বলুন।'

বিদায নেওযাব সময আব একবাব আমি সেই ঘব দু'খানিব দিকে তাকালাম। কেমন যেন একটা উদাস বৈবাগ্যে মন ভবে উঠল। এই ঘব একদিন আমাব ছিল,আজ আব আমাব নয। পুবো তিন বছব আমি এই ঘবে কাটিযে গেছি। তিনশ পঁযষট্টিকে তিনগুণ কবলে কত হয? বৃহৎ পাবিবাবিক বন্ধনেব মধ্যে ছোট ছোট সুখ দুঃখে আন্দোলিত হতে হতে এখানে সহস্র দিন-বজনী আমি বাস কবেছি। এই বাসা যেমন এখন আব আমাব নয, সেই দিনবাত্রিগুলিও তেমনি আব পুবোপুবি আমাব নয। প্রত্যক্ষতা হাবিযে তাবা অতীতেব ছাযাব মধ্যে মুখ লুকিযেছে। আপনাবা বিশ্বাস কববেন কিনা জানিনে, নিজেব পুবনো গল্পগুলিব দিকে তাকালেও আমাব প্রায ওই ধবনেব একটা অনুভূতি হয। এগুলি যেন আমাব অতীতেব লীলাক্ষেত্র। বহু গল্পেব কথাই আমাব আব মনে নেই। পাত্রপাত্রীব নাম মনে বাখা সম্ভব নয কিন্তু বহু গল্পেব ঘটনাসংস্থানেব কথা, তাদেব শুরু আব শেষেব কথাও আমি বিস্মৃত হযেছি।

একবাব এক কাণ্ড ঘটেছিল। এক ভদ্রলোক আমাব একটি গল্প পডে আমাব সঙ্গে দেখা কবতে এলেন। গল্পটি আমাব আগেব লেখা কিন্তু তিনি পডেছেন সদ্য সদ্য। তিনি পাত্রপাত্রীব নাম উল্লেখ ক'বে ঘটনাবিন্যাসেব কথা বলে, জাযগায জাযগায লাইন পর্যন্ত মুখস্থ বলে পবম উল্লাসে উৎসাহে আমাব সঙ্গে আলোচনা শুরু কবলেন। একজন লেখকেব কাছে এসেছেন একজন সাহিত্যবসিক পাঠক। আমি মস্ত বড় অবসিক বনে গেলাম গল্পটিব কথা আমি একেবাবেই ভুলে গেছি। আমি তাঁব সঙ্গে তাল বেখে একবাব বলি, হুঁ, আব একবাব বলি, হাঁ। আব একবাব বলি, না। তা কি হয।

গোঁজামিলটা তাঁব চোখে ধবা পডে গেল। তিনি হেসে জিজ্ঞাসা কবলেন, 'কিছু মনে কববেন না। গল্পটা কি সত্যি আপনিই লিখেছিলেন?'

বললাম, 'একদা লিখেছিলাম। কিন্তু আজ যে আমি অন্য গল্প লিখছি। লিখতে লিখতে উঠে এসেছি আপনাব কাছে।'

লেখকেব গল্পগুলিব উৎস নিযে হযতো আপনাদেব কাবো কাবো মনে কৌতূহল আছে। আমাব

নিজের তেমন খুব একটা কৌতূহল নেই। গল্পের নেপথ্যে যে গল্প থাকে তা না শোনাই ভালো, না শোনানই ভাল। আমার মনে হয় তাতে আসল গল্পের রসহানি ঘটে। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকেই লিখি। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতাব আনাগোনা কখনো রাজপথে কখনো সুড়ঙ্গপথে। কখনো সেই পথবেখা চোখে দেখা যায়, কখনো বা তা দৃষ্টিগোচর হয় না। এই অগোচরতাই লেখকের নিজেব পক্ষে বিস্ময়কর! এতেই তার সৃষ্টিব আনন্দ।

দুটি একটি গল্পেব কথা বলি। ধরা যাক 'রস' গল্প।

এ গল্পের যে পটভূমি তা আমার খুবই পরিচিত। পূর্ববঙ্গে আমাদের গ্রামের বাড়িতে পূব দিকে ছিল একটি পুকুর। সেই পুকুরের চারধারে ছিল অজস্র খেজুর গাছ। ছেলেবেলা থেকে দেখতাম আমাদের প্রতিবেশী কিষাণকে সেই সব খেজুর গাছের মাথা চেঁছে মাটির হাঁড়ি বেঁধে রাখতে। বাঁশের নল বেয়ে সেই হাঁড়িতে সারারাত ধরে ঝিব ঝির করে রস পড়ত। সেই রস কড়াইতে কবে, বড় বড় মাটির হাঁড়িতে কবে জ্বালিয়ে গুড় তৈরি কবতেন আমাদের মা-জ্যেঠীমারা। শীতেব দিনে রস থেকে গুড় তৈরিব এই প্রক্রিয়া মায়ের পিঠেব কাছে দাঁড়িয়ে থেকে রোজ দেখতাম। আমাব চিরচেনা এই পরিবেশ থেকে রস গল্পটি বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু বসের যে কাহিনী অংশ, মোতালেফ মাজুখাতুন আর ফুলবানুকে নিয়ে যে হৃদয় দ্বন্দ্ব, খেজুর রসকে ঘিরে রূপাসক্তিব সঙ্গে যে জীবিকার সংঘাত তা কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আসে নি। সেই কাহিনী আমি দেখিওনি, শুনিওনি। তা মনেব মধ্যে যেন আপনা থেকেই বানিয়ে বানিয়ে উঠেছে।

আর একটি গল্পেব কথা মনে পড়ে, 'সেতার'। এই গল্পে যক্ষ্মা বোগগ্রস্ত স্বামীকে সুস্থ কববার জন্যে স্ত্রী সেতারের টিউশনি করত। সামান্য যা কিছু আয় হত তা যেত স্বামীব সেবায়। প্রয়োজনের জন্যে যে সঙ্গীত চর্চা বউটি শুরু কবেছিল ধীবে ধীবে সেই চর্চায় সে আনন্দ পেতে লাগল। ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে তার পরিচিতি বাড়ল, খ্যাতিও হল। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে স্বামী যেদিন বাড়িতে এল স্ত্রীর সেইদিনই ডাক পডল একটি বড় অনুষ্ঠানে বাজাবাব জন্যে। এমন সম্মান সে এর আগে কোনদিন আব পায়নি। কিন্তু স্বামী তাকে ছেড়ে দিতে চায না। এতদিন পরে স্ত্রীকে সে কাছে পেয়েছে। কত বোগ যন্ত্রণা মৃত্যুভয় পার হয়ে সে এসে পৌঁছেছে তার স্ত্রীর কাছে। এত দীর্ঘদিনেব বিরহের পর স্ত্রীব সঙ্গে তিলমাত্র বিচ্ছেদ যেন তার সহনাতীত। সঙ্গীতেব আসরে স্ত্রীব আব যাওয়া হল না। কিন্তু তার এই থাকাটাই কি পুরোপুরি থাকা?

এই গল্প এল কোত্থেকে? হাসপাতালে কি হাসপাতালের বাইরে আত্মীয় অনাত্মীয় বহু যক্ষ্মা রোগীকেই তো দেখেছি। গীতানুবাগিণী একটি গৃহবধূব সঙ্গেও আমাব পরিচয় ঘনিষ্ঠ। কিন্তু এই আখ্যানটিব দুটি প্রধান চবিত্র, তাব কাহিনী অংশ, আর কাহিনীসঞ্জাত যে হৃদয়বেদনা, তা আগে আমি দেখিওনি শুনিওনি। মনেব কোন আক্ষেপ কোন ভাবাবেগ থেকে এই গল্পেব সৃষ্টি হয়েছিল আজ আমাব পক্ষে তা বলা কঠিন। এই অক্ষমতাটুকু শিল্পীর অগৌববের নয়। ববং এই অনির্বচনীয়তায় তার আনন্দ। লেখার মধ্যে সে সবই ব্যক্ত করতে চায় না, বোধ হয় পারেও না। সবই যদি ভাষায় বলে দেব তবে আভাস আব ইসারা আছে কিসের জন্যে?

সব লেখকই নিজেব চেনাজানা গণ্ডিব ভিতর থেকে গল্পেব উপাদান পেয়ে যান। আমিও তাঁদের ব্যতিক্রম নই। তবে কেউ কেউ বলেন আমাব লেখায সামান্য ছদ্মনামেব আড়াল যদি বা থাকে, ছদ্মবেশের আড়ালটুকু থাকে না। যাদেব নিয়ে লেখা তারা নিজেদেব চিনে ফেলে। পাঠকদের মধ্যে যদি তাদের আত্মীয় কেউ থাকে তারাওজেনে যায়। এই দুর্বুদ্ধিব জন্যে শাস্তি পেতে হয়েছে। আইন আদালতের শাস্তি নয়, সামাজিক শাস্তি। এই নিয়ে একজন বান্ধবীর সঙ্গে চিরবিচ্ছেদ হয়ে গেছে। সেই দুঃখের কথা আজ মনে পড়ে। অথচ আমি আমার সেই গল্পটির মধ্যে তাঁকে ছোট করিনি, অপমানও করিনি। হৃদয়েব পরিপূর্ণ সমবেদনা আর সহানুভূতি দিয়েই আমি সেই প্রেমের গল্পটি লিখেছিলাম। পরিণাম হল অপ্রেম।

কেউ কেউ আবার অন্যরকম অনুরোধও করেছে, 'লিখুন আমাকে নিয়ে। আমি যেন আপনার লেখার মধ্যে থাকি।'

লিখতে বসেছি সেই অনুরোধকারিনীকে নিয়ে। কিন্তু লিখতে লিখতে সেই একজনের সঙ্গে

আরো কতজন যে মিশে গেছে , সেই বাস্তবিকার সঙ্গে লেখকের একটি মানসবাসিনী কেমন করে যে অঙ্গাঙ্গী হয়ে রয়েছে তার রাসায়নিক বিশ্লেষণ কে করবে ?

মেয়েটি আমার সেই গল্প পড়ে মুখ ভার করে বলেছিল এ কার মূর্তি এঁকেছেন ? এ তো আমি নই ।'

আমি তার মুখের সঙ্গে আমার নায়িকার মুখ মেলাতে মেলাতে জবাব দিয়েছি, 'এও তুমি ।'

আর একটি মেয়ের কথা বলি । সে আমাকে একেবারে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছিল । অপূর্ব ভ্রূভঙ্গি করে বলেছিল, 'আপনার সঙ্গে বেশি মিশব না । আপনি যে এত মেলামেশা করেন তার বিশেষ একটা উদ্দেশ্য আছে ।'

মেয়েটির জীবনে কিছু প্রণয়ঘটিত জটিলতা ছিল । আমি তা জানতাম ।

তার কথার জবাবে আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'উদ্দেশ্য ? আমার তো ধারণা আমি একেবারে নিষ্কাম ।'

সে বলেছিল, 'নিষ্কাম না হাতি । আপনি আসেন গল্প লেখার তাগিদে ।'

আমি তাকে বলেছিলাম, 'অমন কথা বোলো না । আমি আসার তাগিদেই আসি । তুমি তো জানো না, লেখকরা যাদের ভালোবাসে তাদের নিয়ে লিখতেও ভালোবাসে । লেখাটা তাদের ভালোবাসারই অঙ্গ ।' মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে আমার কথা মেনে নেয়নি । তর্ক জুড়ে দিয়েছিল, 'অমন বড়াই করবেন না । আপনার বেশির ভাগ গল্পই প্রেমের গল্প তা জানি । তবু গল্পে উপন্যাসে আপনি যত মেয়েপুরুষকে এনেছেন যত চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন তারা সবাই কি আপনার ভালোবাসার জন ?'

চটকরে জবাব দিতে পারিনি । কিছুক্ষণ আমাকে নির্বাক থাকতে হয়েছিল । ভেবেছিলাম কথাটা হয়তো অসত্য নয় । সবাইকে সমান ভালোবাসতে পারিনি । আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলির সকলের প্রতি সমান মনোযোগ দেওয়া হয়ে ওঠেনি । হয়তো ইচ্ছা ছিল না, হয়তো সে সাধ্যও ছিল না ।

কিন্তু পিছন ফিরে তাকিয়ে বই না পড়ে নিজের গল্পগুলির কথা যতদূর মনে পড়ে আমি দেখতে পাই ঘৃণা বিদ্বেষ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বৈরিতা আমাকে লেখায় প্রবৃত্ত করেনি । বরং বিপরীত দিকের প্রীতি প্রেম সৌহৃদ্য, স্নেহ শ্রদ্ধা ভালোবাসা পারিবারিক গণ্ডির ভিতরে ও বাইরে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, একের সঙ্গে অন্যের মিলিত হবার দুর্বার আকাঙক্ষা বার বার আমার গল্পের বিষয় হয়ে উঠেছে । তাতে পুনরাবৃত্তি ঘটেছে । তা জেনেও আমি আমার সীমার বাইরে যেতে পারিনি ।

অথচ জানি সংসারে অনাচার অবিচার আর অত্যাচারের অভাব নেই । প্রেমের শক্তি যেমন শক্তি, প্রয়োজনবোধে ঘৃণা বিদ্বেষের শক্তিও তেমনি । বৃহত্তর প্রেম গভীরতর কল্যাণকে অবারিত করবার জন্যে সেই শক্তিরও প্রয়োজন আছে । শুধু আলিঙ্গন নয়, দরকার হলে আঘাত করতেও জানা চাই, আঘাত করতেও পারা চাই । সেই পৌরুষ সেই বীর্যবত্তা মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধ করে, লেখকের রচনার মধ্যে দীপ্তি এনে দেয় ।

কিন্তু এই তত্ত্ব আমি জ্ঞান দিয়ে জানি, বুদ্ধি দিয়ে জানি । একে হৃদয়রসে জারিত করে রসরূপ দিতে জানিনে ।

নিজের স্বভাবকে দেখে নিয়ে, নিজের প্রবৃত্তি আর প্রবণতাকে স্বীকার করে আমি সারা জীবন শুধু ভালোবাসার গল্পই লিখেছি । সে ভালোবাসা হয়তো সঙ্কীর্ণ অর্থে ভালোবাসা, সীমিত অর্থে ভালোবাসা । তবু তা ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নয় ।

বৈশাখ ১৩৮২

যৌথ

বাড়ি থেকে বের হবার আগে অনুরূপ সদ্য-নির্মিত জলচৌকিখানা একাই দু'হাতে উঁচু ক'রে নিয়ে এসে ছোট ভাই স্বরূপের সামনে ফেলে দিয়ে বলল, নে বাতার চার পাশ ঘুবিয়ে লতাপাতা ফুলটুল যা পারিস ক'রে দিস। আমি যাচ্ছি হাটখোলা, আবো কিছু কাঠ নিয়ে আসতে হবে সরকারদের আড়ৎ থেকে। ওসব কুঁড়ে কাজ কববাব সময় নেই আমার। শালার সাউর শখ দেখ, কালী প্রতিমাব চৌকি হবে তা আবাব ফ্রেমেব ওপর কল্কা না হ'লে চলবে না। বেশি খাটিসনে, পয়সা কিন্তু বেশি দেবে ন।

স্বরূপ হেসে বলল, আচ্ছা সেজন্য ভেবো না দাদা।

বাড়ি থেকে নেমে অনুরূপ হালোটেব পথ ধরে। যতটা দেখা যায় অনুরূপের দ্রুত গমনভঙ্গির দিকে স্বরূপ অপলকে চেয়ে থাকে—চলমান মানুষকে কী সুন্দব দেখায়।

ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেবিয়ে আসে স্বরূপেব। জীবনে আব কোনোদিন সে চলতে পারবে না। বহুকাল পবে আজ ক'দিন যাবৎ ক্ষোভটা আবার নতুন ক'বে জাগছে স্বরূপের। এতদিন সে যেন একথা ভুলেই ছিল। নিজেব পায়ের অভাব বহুকাল তাব মনে ছিল না। দাদা বউদিব অনুতপ্ত লজ্জা স্নেহ কৃতজ্ঞতা তার সমস্ত ক্ষোভকে ভুলিয়ে রেখেছিল। দাদার ব্যবহাবে নিজের দুঃখের কথা মনে কবতেও লজ্জা হত স্বরূপের। তাব শোক আব অনুশোচনাব সান্ত্বনা স্বরূপকেই দিতে হত। এত ভেঙে পড়েছিল অনুরূপ!

কিন্তু দিনেব পব দিন সময় বদলায়, আর বদলায় মানুষেব মন। সময় কি সত্যিই বদলায—না মানুষের পরিবর্তনে সময় বদলানো মনে হয়? কিন্তু আগের মত তেমনই তো দিনেব পব বাত, রাতের পর দিন আসছে; ঋতুব আবর্তন ঘটছে ঠিক একই নিয়মে। সামনের কৃষ্ণকলির গাছটা তেমনি বছরে একবার ফুলে ভেঙে পড়ছে, ঝ'রে ঝ'রে শূন্য হয়ে যাচ্ছে গাছ। কিন্তু আবার বছর ঘুরে আসছে সেই ফুল ফোটার পালা। না, সময় ঠিক এক রকমই থাকে বোধ হয। বদলায় কেবল মানুষ—মনে আর ব্যবহারে।

কম দিন কি হল? সাত সাতটা বছর ঠিক একই ছোট কামবায় বন্দীভাবে কেটে গেল স্বরূপের। আরো কত সাত বছর জীবনের বাকি কে জানে।

সেই দুর্ভাগ্যের দিনটা স্বরূপের স্পষ্ট মনে পড়ে। এতদিনে একটা কথাও সে বিস্মৃত হয়নি। অনুরূপেব বড় ছেলে ধলুব অত্যন্ত জ্বর। তিন বছবের শিশু দুঃসহ উত্তাপে ছটফট করছে। আর পিপাসা। পৃথিবীর সমস্ত জল শুষে না নিলে তাব তৃষ্ণাব যেন আব নিবৃত্তি হবে না। কিন্তু ডাক্তার ব'লে গেছেন, জল নয়, যদি দিতেই হয়, কচি ডাবের জল ফোঁটা ফোঁটা ক'বে দেওয়া যেতে পারে। গাছ তো আছে একটা নিজেদেরই, বেশ বড় গাছ, নারকেলও অনেক। কিন্তু নাবকেল গাছে ওঠবার তেমন অভ্যাস নেই। স্বরূপ ইতস্তত করছে দেখে অনুরূপ ধমক দিয়ে বলল, ছেলে যায় তৃষ্ণায় ম'রে আর তুই গড়িমসি কবছিস! নিয়ে আয় না ডাবটা পেড়ে। ধমক খেয়ে লজ্জিতভাবে স্বরূপ গিয়ে গাছে উঠেছিল। ওঠার সময় কোনো অসুবিধাই তো হয়নি, নামার সময়ই যত বিপত্তি। তাও অনেকটাই তো নেমে এসেছিল। ওখান থেকে প'ড়ে গেলে হয় তো তেমন কিছু হত না যদি ভাঙা শিশি বোতলেব বাক্সটা ওখানে না থাকত। বাক্সটা ঘর পরিষ্কাব করার সময় অনুরূপ ওখানটায় ঠেলে রেখেছিল। আর সরিয়ে নেওয়া হয়নি।

তারপর একটু একটু ক'রে কাট্‌তে কাট্‌তে জেলা শহরের সিভিল সার্জন তার দুটো পায়েরই হাঁটু পর্যন্ত বাদ দিয়ে দিলেন। মাঝখানে একবার কলকাতায় অনুরূপ তাকে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন আর সময় নেই। সেখানকার ডাক্তাররা বলেছিলেন, প্রথমেই নিয়ে এলে অন্যরকম হোতো।

ধলু বেঁচে উঠেছে। আশ্চর্য, তাবপব থেকে তাব আব কোনো কঠিন অসুখ হয়নি। আব স্বৰূপও তো প্রাণে মবেনি। নিচেব দিকটা না থাকলেও শবীবেব বাকি যেটুকু আছে সেটুকু তো সুন্দব স্বাস্থ্যবান। ফাঁড়াটা কাবো জীবনেব ওপব দিয়ে যায়নি। কেবল পা দুটোব ওপব দিয়ে গেছে। এব চেয়ে বড় দুর্ঘটনাও তো ঘটতে পাবত। একথা অনুৰূপাকে একদিন বলতে শুনেছে স্বৰূপ। এমন কথা আগেকাব দিনে অবশ্য অনুৰূপ বলত না। কিন্তু মানুষ যে একই কথা চিবদিন বলবে তাব কি মানে আছে। একেক সময় যদি তাব একেক কথা মনে আসে তা সে বলবে বই কি।

জলচৌকিটা টেনে নিয়ে উডপেনসিল দিয়ে তাব পায়া আব বাতাব ওপব লতাপাতাব নক্সা আঁকতে লাগল স্বৰূপ। পবে এগুলিকে বাটালি দিয়ে কেটে কেটে তুলতে হবে।

ভাঁড়াব থেকে কিছু ডাল নিতে এসে বাবান্দা দিয়ে ঘবে ঢোকবাব সময় মল্লিকা একটু থেমে দাঁড়াল। স্বৰূপেব কাঁধেব ওপব দিয়ে মুখ বাড়িয়ে হেসে বলল, ও, লতাপাতাব ছবি। আমি ভাবলুম বুঝি ব'সে ব'সে কাবো মুখ আঁকছ। কী মনোযোগ বাপবে বাপ। একজন মানুষ এসে গায়েব ওপব পড়লেও হুঁশ হয় না।

স্বৰূপ বলল, হুঁশ হলেই যে গায়েব ওপব থেকে মানুষটি আবাব সবে যাবে। তাব চেয়ে বেহুঁশ থাকাই ভালো। যেয়ো না। কেবল লতাপাতাই নয় মুখও একখানা আঁকছি।

মল্লিকা বলল, কাব মুখ?

সে কথা মুখে বলা যায় না।

আহা হা, এই ভাঙাচোবা হতকুৎসিত মুখ আঁকতে মানুষেব বয়ে গেছে। মল্লিকা হাসল।

হাসলে এখনও ভাবি সুন্দব দেখায় মল্লিকাকে। অবশ্য সেই প্রথম যৌবনেব ৰূপ আব নেই। দু'তিনেব ছেলেমেয়ে হওয়াব পব মল্লিকাব শবীব অনেক ভেঙে গেছে। মেজাজও হয়েছে খিটখিটে। তবু তাব সামান্য একটু আধটু হাসি টাট্টাব সূত্র ধ'বে স্বৰূপেব মন সেই উজ্জ্বল অতীতেব দিনগুলিতে ফিবে যেতে চায়। কাল যেন বদলায়নি। যেন ঠিক তেমনি আগেব মতই আছে মল্লিকা। স্বৰূপ যেন জোব ক'বে পবিবর্তনকে ঠেকিয়ে বাখবে। মাঝে মাঝে বিবক্ত হয় মল্লিকা, কিন্তু মাঝে মাঝে আবাব ভালোও লাগে। স্বৰূপেব ব্যবহাবে কোথাও যেন একটু মোহ আছে।

একটু পবে মল্লিকা বলে, যাই, বান্না চড়িয়ে দিয়ে এসেছি, ছোট্ট ছেলেটা কি বকম চেঁচাচ্ছে শোন, এমন অশান্তই হয়েছে ছেলেটা। তুমি কিন্তু বেশ আছ ঠাকুবপো, এসব কোনো ঝামেলা নেই।

তা ঠিক। নিচু হয়ে স্বৰূপ আবাব নক্সাব কাজে মন দিল।

কিন্তু ছেলেটা সত্যিই ভাবি চেঁচাচ্ছে, বছব খানেক মাত্র বয়স, কিন্তু সমস্ত বাড়িটা যেন ছিন্নভিন্ন ক'বে ফেলবে এমনি আক্রোশ ওব, গলায় এত তীক্ষ্ণতা।

স্বৰূপ একটু বিবক্তিব সুবে চেঁচিয়ে বলে, এই মিনি, টেনু কাঁদছে কেন বে এত? শান্ত কবতে পাবিস না? নিয়ে যা ওখান থেকে কোলে ক'বে।

মিনি অনুৰূপেব বড়-মেয়ে, বছব পাঁচেক বয়স। সে কোথায় খেলতে বেবিয়েছে। সে এল না, তাব বদলে ছেলেকে স্তন দিতে দিতে মল্লিকা নিজেই এল, বলল, ভাবি যে চ'টে গেছ ঠাকুবপো।

স্বৰূপ বলল, তোমাব ছেলেব জ্বালায় কি স্থিব থাকবাব জো আছে। ক্রমেই এক এক ডিগ্রী ওপবে উঠছে এক একজন। এটি হবে সব চেয়ে সেবা দেখে নিয়ো।

বেশ অপ্রসন্ন হল মল্লিকা, জোব ক'বে একটু হেসে বলল, কি কবব ভাই, মেবে তো আব ফেলতে পাবি না।

মনে মনে হাসল স্বৰূপ। ছেলেমেয়েব বিৰুদ্ধে সামান্য কিছু বললেই মল্লিকা চ'টে যায়। ওদেব কিছু বলা মানে মল্লিকাকেই আঘাত কবা, অপমান কবা। ছেলেমেয়েব সঙ্গে এত একাত্ম হয়ে গেছে মল্লিকা। তাকে যদি ভালোবাসতে হয়, শুধু তাব নিজেব দোষত্রুটিগুলিকেই নয়, তাব সন্তানদেব দোষ ত্রুটি সুদ্ধ ভালোবাসতে হবে।

স্বৰূপ জবাব দিল, না, মেবে ফেলাব দবকাব হয় না, শান্ত কবতে পাবলেই হয়।

মল্লিকাব মুখ কঠিন হয়ে গেছে, বলল, শান্ত না হ'লে শান্ত কবে কি ক'বে? বেশ, দিয়ে যাচ্ছি

তোমার কাছে, শান্ত কর দেখি তুমি।

স্বরূপ সত্রাসে বলল, না বউদি, মাপ কর, আমার এখানে দিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। কাজ আছে আমার।

মল্লিকা আরো ক্ষুব্ধ হল, বলল, কাজ আমাদেরও আছে। ভয় নেই ঠাকুরপো, তোমার এখানে সত্যিই দিয়ে যাবো না। আমার ছেলেমেয়েদের যে তুমি দেখতে পার না তা অত স্পষ্ট ক'রে না বললেও লোকে বুঝতে পারে। কি করব ভাই, তোমাকে সংসারী করবার চেষ্টা কি আমরা কম করেছি। কিন্তু মেয়ে দিতে কেউ রাজি হল না, তাছাড়া তুমি নিজেও তো একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ ক'রে বসলে বিয়ে করবে না।

স্বরূপ বলল, পণ না করলেই বুঝি দু'পা-কাটা ছেলের কাছে কেউ মেয়ে দিত? তাছাড়া তখন ভেবেছিলাম বিয়ে করলেই তোমার সঙ্গে ঝগড়া শুরু হবে। কিন্তু বিয়ে না করলেও যে ঝগড়া বাধতে পারে তা তো ভাবিনি।

মল্লিকা মুখ বাঁকিয়ে বলল, নাও তুমি তো আছ কেবল তোমার রসের কথা নিয়ে। খেয়ে না খেয়ে আর তো কোনো কাজ নেই দিনরাত। ব'লে মুখ ঘুরিয়ে মল্লিকা চ'লে গেল।

বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অনুরূপ করেছিল একথা ঠিক। কিন্তু কিছুতেই হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া স্বরূপের নিজেরও অমত ছিল। নিজেই চলতে পারে না, তার ওপর আবার একটা বোঝা। ব্যর্থ হয়ে অনুরূপ হতাশ ম্লান মুখে বলেছিল, আমার জন্যেই তোর যত দুর্দশা। কিন্তু বিয়ে আমি দেবই তোর। মেয়ে কি আর ভূভারতে মিলবে না? টাকা থাকলে বাঘের দুধ মেলে, আর এ তো মেয়ে। পদ্মার পারটা দেখা হয়নি। ওদিকে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে। কিন্তু আমার সংসারও তো আমার একার নয়, তোরও। সব ভার—আমার স্ত্রী-পুত্র সব তোকে আমি সঁপে দিলুম। সব তোর। সংসারের কর্তাও তুই।

একথা শুধু মুখেই নয়, কাজেও দেখাতে অনুরূপ প্রাণপণ চেষ্টা করত। সংসারের সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে সে স্বরূপের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করত। তার পরামর্শ গ্রহণও করত। হিসাবপত্র জমাখরচের খাতা তার কাছে এনে ফেলে রাখত। স্বরূপ যদি বলত, অত আমাকে দেখাচ্ছ কেন দাদা, আমি তো আর তেমন রোজগার করিনে? অনুরূপ বিস্মিত হয়ে বলত, রোজগার করিসনে মানে? আমার চেয়ে ঢের বেশি রোজগার করিস। শুধু ছুটোছুটি করি ব'লেই কি আমি বেশি রোজগার করি ভাবিস? আমার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা তোর, অনেক বেশি বুদ্ধি। তাছাড়া সূক্ষ্ম হাতের কাজে কেউ তোর জোড়া নেই।

কারুকার্য সত্যিই বেশ ভালো করে স্বরূপ, খাট আলমারিগুলির অলংকরণ ছাড়াও মাঝে মাঝে কাঠের উপর নানা রকম মূর্তি স্বরূপ বাটালি দিয়ে কুঁদে কুঁদে তুলেছে। নিজের চলবার শক্তি নেই ব'লে যেন বিশ্বের গতিশীলতাকে সে কাঠের ওপর রূপায়িত ক'রে তুলতে চায়। এ অঞ্চলে এমন কারিগর সত্যিই আর নেই।

শুধু সাংসারিক বিষয়েই নয়, অনুরূপ নিজের স্ত্রীকেও বেশির ভাগ সময় স্বরূপের পরিচর্যায় নিযুক্ত করেছে। বলেছে, আহা, আমাকে তোমার দেখতে হবে না। আমার হাত পা আছে; নিজেরটা আমি নিজেই ক'রে নিতে পারি। ওকে তুমি একটু দেখ। ওকে একটু ফুর্তিতেই রাখতে চেষ্টা কর। আমোদপ্রমোদের আমার অভাব কি, কত খেলাধুলো বন্ধুবান্ধব আমার, কিন্তু ওর তো এখন আর সেসব কিছুই নেই। ওকে যাতে তুমি খুশিতে রাখতে পার, আনন্দে রাখতে পার, তাই কর। বড় আদরের ভাই আমার। এমন ভাই আর কারো হয় না। আত্মোৎসর্গের প্রেরণায় মনে হয়েছে স্বরূপকে এর চেয়ে বেশি কিছু দিতে পারলে যেন অনুরূপ খুশি হত।

কিন্তু অনুরূপের এই দান গ্রহণ ক'রে স্বরূপের তেমন তৃপ্তি ছিল না। সে আবার মল্লিকাকে তার দাদার কাছে পাঠিয়ে দিত। বলত, যাও, আর বেশি ভদ্রতা করতে হবে না। মন যে কোথায় প'ড়ে আছে তা তো জানি।

মল্লিকা হেসে বলত, মন কি একটা আলগা ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটলি যে, কোথাও ফেলে রেখে আসব। মন আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। গল্প করতে তোমারই বোধ হয় মন যাচ্ছে না। স্বরূপ গম্ভীর

মুখে জবাব দিয়েছে, ঠিক বলেছ, আমি একটু অন্যমনস্কই আছি। একটা মূর্তির কথা ভাবছি। আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পার।

মল্লিকা ক্ষুণ্ণ হয়ে যেতে যেতে বলেছে, সারাদিন তো তোমার ঐ এক ভাবনা, কি যে তোমার ভাব কিছু বুঝতে পারিনে।

তারপর মল্লিকা যখন স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করেছে তখন হঠাৎ স্বরূপ ডেকে বলেছে, বউদি, শুনে যাও তো, জল নিয়ে এস আসবার সময় এক গ্লাস।

শুনে অনুরূপ হেসে চুপি চুপি বলেছে, জলটা তো ছল, শুনে আসাটাই বড কথা। এবার বুঝি মানভঞ্জনের পালা। দেখে-শুনে বরের চেয়ে দেবর হ'তেই লোভ যাচ্ছে কিন্তু।

মল্লিকা বলেছে, বেশ, আমার কি, যাব না আমি।

না না, ছি, বললাম ব'লেই নাকি?

মল্লিকা অবশ্য কৌতুক ক'রে জল না নিয়েই উপস্থিত হয়েছে, কি, আবার ডাকছ কেন?

জলের জন্যে বললাম যে? জল আনলে না কেন?

সত্যিই খুব তৃষ্ণা পেয়েছে?

হ্যাঁ, কিন্তু জলেই এ যাত্রা মেটাতে হবে।

তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ গল্প ক'রে গেছে মল্লিকা।

কিন্তু সে সব দিন আর নেই। মল্লিকার অনেক কর্তব্য বেড়েছে। অনেক দায়িত্ব। অলক্ষ্যে—জীবনের, সংসারের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে। কেবল স্বরূপ রয়ে গেছে একই জায়গায়। সে পঙ্গু, সে নড়তে পারেনি। কেবল তার জীবনেই কোনো অভিজ্ঞতার ছাপ পড়ল না। এখন তার মাঝে মাঝে মনে হয়, স্বভাবত খুঁজে অন্ধ, খঞ্জ, বোবা, বধির যেমনই হোক একটি মেয়েও কি পাওয়া গেল না স্বরূপের জন্যে? আর কিছু সে না হোক, শুধু একটি মেয়ে? মনে হয় অনুরূপ আর মল্লিকা ইচ্ছা ক'রে তাকে ঠকিয়েছে। কেবল সোহাগ আদর ক'রে ভুলিয়ে রেখেছে, পাছে স্বরূপের নিজের সন্তান এসে সম্পত্তির অংশীদার হয়। স্ত্রীপুত্র নিয়ে সম্পূর্ণ আপন একটি সংসারের জন্যে স্বরূপের মন হাহাকার ক'রে ওঠে।

বেলা দুপুরের সময় হাটখোলা থেকে নৌকাভরা কাঠ নিয়ে অনুরূপ ফিরে এল। কী কাঠফাটা রোদ। অনুরূপ এসেই জিজ্ঞাসা করল, হয়ে গেছে কাজটা?

স্বরূপ বলল, না, খানিকটা বাকি আছে, হয়ে যাবে'খন।

অনুরূপ রেগে গিয়ে বলল, হয়ে যাবে'খন? এতক্ষণ কি করছিস ব'সে ব'সে? কাজ নেই কর্ম নেই, কেবল গল্প আর গল্প।

স্বরূপও চ'টে গেল, কাজ না ক'রে কি মাগনা খাই তোমার সংসারে? নিজের কাছেই নিজেকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ দেখি। কাজ আমি করি, না, করি না? খুব খাটিয়ে নিয়েছ, আর কেন? এত আমি করব কার জন্যে? কে আছে আমার সংসারে?

অনুরূপ কি বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ চুপ ক'রে গেল।

মল্লিকা এদিকে এসেছিল, অনুরূপ বাধা দিয়ে বলল, না, দরকার নেই তোমার ওদিকে যাওয়ার, সংসারে নাকি ওর কেউ নেই, এত ক'রেও যখন ওর মন পাওয়া গেল না, তখন তোমাকে আর যেতে দেব না আমি।

মল্লিকা হেসে বলল, এতকাল যেতে দিয়ে এখন তোমার আপত্তি হল এই বুড়ো বয়সে?

স্বরূপের কাছে গিয়ে মল্লিকা বলল, কি ভাই ঠাকুরপো, খুব যে ঝগড়া করা হচ্ছে। ঝগড়া করার পালা আমার সঙ্গে, তোমার দাদার সঙ্গে তো নয়।

স্বরূপ একবার মুহূর্তের জন্য মল্লিকার দিকে তাকাল, তার চোখে আর ঠোঁটের কোণে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ যেন ঝলসে উঠল। মল্লিকা কি ভেবেছে এমনি ছদ্ম সোহাগে আজীবন তাকে ভুলিয়ে রাখবে? নিজেদের গোপন উদ্দেশ্য চিরকাল তার কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে? মল্লিকা কি ভুলে গেছে সে চার সন্তানের মা?

কোনো কথা না ব'লে স্বরূপ আবার তার কাজে মন দিল।

স্বরূপের চোখে কী ছিল কি জানি, মল্লিকার বুকে গিয়ে তা যেন তীরের মত বিঁধল। আরো কত দিনই তো স্বরূপ এমন রাগ ক'রে তার সঙ্গে কথা বলেনি, কিন্তু এমন ব্যথা তো কোনোদিন পায়নি মল্লিকা। অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে মল্লিকা ফিরে গেল।

খাওয়া-দাওয়ার পর মনটা একটু শান্ত হ'লে অনুরূপের মনে হল সত্যিই বড় স্বার্থপরের মত কাজ হয়েছে। সংসার নিয়ে, নানা বিষয়-আশয় নিয়ে এতদিন সে এমন মত্ত হয়ে ছিল যে, স্বরূপের দিকে তেমন ক'রে তাকাবার কথা ইদানীং তার মনেই হয়নি। মল্লিকার ওপর তার সমস্ত পরিচর্যার ভার দিয়ে স্বরূপের বিয়ের কথা প্রায় ভুলেই বসেছিল অনুরূপ। অবশ্য চেষ্টা সে কম করেনি আগে, কিন্তু আরো চেষ্টা দরকার। টাকার দিকে অনুরূপ তাকাবে না, যেমন ক'রেই হোক বিয়ে সে দেবেই স্বরূপের। তাছাড়া, স্বরূপ ইচ্ছা ক'রে না করলে তো কোনো কাজ তাকে আর করতে বলবে না অনুরূপ।

বিকালে সে নিজেই কাঠের ওপর সূক্ষ্ম কারুকার্য করতে বসল। কিন্তু মনে যত অটুট সংকল্পই থাক, হাত আর চলে না। এসব কাজ করতে ধৈর্য থাকে না অনুরূপের। এত দিনের অনভ্যস্ততায় সমস্ত চারুশিল্প যেন ভুলতে বসেছে অনুরূপ। কাজ কিছুতেই এগুলো না। বিরক্তি আর হতাশায় বারবার তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে লাগল। ইদানীং এসব কাজে বড় একটা হাতই দেয়নি অনুরূপ। বড় বড় শাল গাছের গুঁড়ি এসেছে বন্দর থেকে। কাঠের কারবার ক'রে পয়সা করবার দিকেই তার ঝোঁক ছিল। বিষয়আশয়, ক্ষমতা প্রতিপত্তি, এই ছিল তার লক্ষ্য। কখন অলক্ষ্যে শিল্পীর দক্ষতা তার হাতে থেকে খ'সে প'ড়ে গেছে সে টেরও পায়নি।

মনের মধ্যে হঠাৎ যেন কেমন ক'রে উঠল অনুরূপের। শুধু স্বরূপই যে পঙ্গু তা নয়, শিল্পের দিকে নিজেকেও সে পঙ্গু ক'রে তুলেছে। এতদিন স্বরূপকে সে নিজেরই এক অংশ ব'লে মনে করত। তার গৌরব, তার খ্যাতিতে নিজেকে গর্বিত বোধ করত। আজ স্বরূপ যখন দূরে স'রে যাচ্ছে, তখন অনুরূপের মনে হল তার খ্যাতি আর গৌরব নিয়েই সে যাচ্ছে—অনুরূপের জন্য তার কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট রেখে যাবে না। অথচ সৌন্দর্যসৃষ্টির সম্পূর্ণ সুযোগ অনুরূপই তাকে দিয়েছে। সংসারের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা সমস্ত কাঠিন্য থেকে তাকে সে সন্তর্পণে দূরে সরিয়ে রেখেছে, না হ'লে এত কি বড় হ'তে পারত স্বরূপ। কিন্তু নেপথ্যে এই আত্মোৎসর্গের জন্য কোনো দামই থাকবে না অনুরূপের। সমস্ত কীর্তি, সমস্ত গৌরব কেবল স্বরূপেরই রয়ে যাবে।

স্নানের পর মাথা আঁচড়াবার সময় হঠাৎ বহুদিন পরে নিজের চেহারার দিকে চোখ পড়তে মল্লিকা চমকে উঠল। এত খারাপ হয়ে গেছে তার চেহারা, ভেঙেচুরে এই ক'বছরে সে এমন জীর্ণ হয়ে গেছে, তা তো সে ধারণাও করতে পারেনি। ক্ষোভে আর লজ্জায় নিজের দিকে সে যেন নিজেই চাইতে পারল না। বহু সংকোচে সে স্বরূপকে খাবার পরিবেশন ক'রে এল। গোপনে একবার তাকিয়ে দেখল স্বরূপ ঠিক সেইভাবে আর তার দিকে চেয়ে নেই, অন্যমনে কি ভাবছে। মোহ তার চোখ থেকে খ'সে পড়ে গেছে আর মল্লিকার দেহ থেকে সৌন্দর্য আর যৌবন। মল্লিকার মনে হল স্বরূপের মোহই যেন এতদিন সেই সৌন্দর্যকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। নীরবে পরিবেশন ক'রে মল্লিকা চ'লে এল, কোনো কথা বলতে চেষ্টা করল না, স্বরূপও কোনো কথা বলল না।

কোলের ছেলেটা কাঁদতে লাগল; কিন্তু মল্লিকার আজ আর তাকে ধরতে ইচ্ছা করল না, কেমন যেন উদাস হয়ে গেছে মন।

রাত্রে গুহদের বাড়িতে ছেলেরা শখের থিয়েটার করবে। মেয়েদের বসবার জন্য আলাদা বন্দোবস্ত হয়েছে। পাড়ার মেয়েদের বিশেষ ক'রে নিমন্ত্রণ করেছে তারা, তাছাড়া অনুরূপের অবস্থা একটু ভালো হওয়ার পর ইদানীং খুব খাতির আর সম্মান করছে গুহরা।

মল্লিকা বলল, ছেলেপুলেরাই যাক, আমি আবার কি দেখব ওর।

অনুরূপ জবাব দিল, সে ভালো দেখায় না, যখন ব'লে গেছে এত ক'রে। খোকার অন্নপ্রাশনে ও-বাড়ির মেয়েছেলেরাও এসেছিল, মনে নেই তোমার?

মল্লিকা সাধারণ একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শাড়ি পরল। অনুরূপ দেখে বলল, ও কি, না না, ভালো একটা দামী শাড়ি প'রে যাও।

মনে মনে স্বামীর এই ব্যাপারে, এই মনোযোগে মল্লিকা খুশিই হল, মুখ বলল, কিন্তু এদিকে যে বুড়ো হয়ে গেলাম, বয়স তো হয়েছে, এখন কি আর ও সব ফ্যাশান মানায়?

অনুরূপ বলল, ফ্যাশান অবশ্য আমিও পছন্দ করি না তবু ভালো একটা দামী শাড়ি প'রেই যাও। না হ'লে লোকে ভাববে - বাড়িতে দালান দিলে হবে কি, অনুরূপ তেমনই কৃপণ আর ছোটলোকই রয়ে গেছে।

মাত্র এই? মল্লিকার আর একদিনের কথা মনে পড়ল। কি কথায় কথায় মল্লিকা ব'লে ফেলেছিল, আর এখন তো বুড়ো হয়েই গেলাম, বয়স কম হল নাকি?

শুনে স্বরূপের কী রাগ, আমার সামনে মুখেও এনো না ও সব কথা। মল্লিকা হেসে বলেছিল, মুখে না আনলেই কি কথাটা মিথ্যে হয়ে যাবে? আমার বয়স তুমি জোর ক'রেই কমিয়ে রাখবে নাকি ভেবেছ?

স্বরূপ জবাব দিয়েছিল হাঁ, জোর ক'রেই তো রাখব

শাড়টা অবশ্য কি ভেবে মল্লিকা বদলিয়েই পরল তারপর বলল আর দেরি ক'র না, ঠাকুরপোর একটা বিয়ে দাও- খুব সুন্দরী মেয়ে যেন হয়। টাকার জন্যে ভেবো না এতদিন দেরি করাই ভারি অন্যায় হয়ে গেছে

অনুরূপ ভেবে অবাক হল হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে এ কথা বলল কেন মল্লিকা।

স্বরূপ দিনরাত কাজ নিয়ে ব্যস্ত কি একটা নতুন মূর্তি খোদাই করছে যেন। আজকাল অনেক কম কথা বলে স্বরূপ, মল্লিকাকে ডাকাডাকিও তেমন করে না নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া আর বিশেষ কোনো কথাবার্তাও হয় না। মল্লিকার মাঝে মাঝে আসতে ভারি ইচ্ছা হয়, কিন্তু কোথায় যেন বাধে কোথায় যেন একটু অভিমান আর সংকোচ লেগে থাকে। স্বরূপের মনের ভাব অবশ্য বদলায়নি। সে যেন এদের চাতুরী সব ধ'রে ফেলেছে, কেমন একটা ঘৃণাই তার মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকে। গভীর মনোযোগে মূর্তি খোদাইয়ের কাজ করতে থাকে স্বরূপ। ভিন্ন জেলার এক জমিদারবাড়ি থেকে বায়না দিয়ে পাঠিয়েছে। কাজ সুন্দর হ'লে টাকাও যেমন পাওয়া যাবে, যশও তেমন দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়বে। নিপুণ অভ্যস্ত হাত স্বরূপের তেমনই চলতে থাকে। কিন্তু মূর্তির মধ্যে তেমন লালিত্য আর সৌন্দর্য যেন আসতে চায় না। বিরক্ত হয়ে বার বার নতুন ক'রে স্বরূপ কাজ আরম্ভ করে

অনুরূপ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, এই দু তিনটে মাস গেলে বিয়ে সে যেমন ক'রেই হ'ক অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে দিয়ে দেবে স্বরূপের একটা সম্বন্ধ প্রায় ঠিক হয়েই আছে, কিন্তু সমস্ত সংসারের যেন আর রস নেই। জায়গায় ব'সে ব'সে স্বরূপ যেমন হাঁক ছাড়ত, তেমন আর করে না। তার হাসিতে উল্লাসে সমস্ত বাড়ি যেমন চঞ্চল হয়ে উঠত তেমন আর হয় না। কিন্তু মল্লিকা যেমন গৃহকর্ম করত, সন্তানপালন করত, তেমনি ক'রে যায় কাঠের কারবার অনুরূপের তেমনি চলতে থাকে। কিন্তু সংসারটাও যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে একেক সময় এই বিষয়-আশয়, কারবারপত্র ভারি দুর্বহ মনে হয় অনুরূপের বেশ আছে স্বরূপ, নিজের ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে বেশ আছে সে। আর এদিকে ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি ক'রে অনর্থক নিজেকে ক্ষয় ক'রে ফেলছে অনুরূপ। বিয়ে ক'রে ছেলেপুলে নিয়ে অকালে বুড়ো হ'তে চলেছে মল্লিকা। কিন্তু স্বরূপ নিজেকে ধ'রে রেখেছে, একটুও অপচয় হ'তে দেয়নি। যৌবনকে সে বেঁধে রেখেছে। সমস্ত ভবিষ্যৎ তার সামনে। আর অনুরূপ কেবল অতীতের বস্তু। এতকাল যে যৌবনের সৌন্দর্যকে সে আকণ্ঠ পান করেছে তা অনুরূপের মনে পড়ল না, ভবিষ্যৎকে সে যে আর স্বরূপের মত উপভোগ করতে পারবে না এই ক্ষোভই তার মনকে বার বার আচ্ছন্ন ক'রে রাখতে লাগল।

কিন্তু হঠাৎ সেদিন স্বরূপের মুখের দিকে তাকিয়ে অনুরূপ চমকে উঠল, চুলগুলো উস্কোখুস্কো,

চোখ দুটো লালচে। অনুরূপ ধমক দিয়ে বলল, খুব রাত জাগছিস বুঝি ?

স্বরূপ বলল, না।

না তো শবীব দিনেব পব দিন অমন খাবাপ হচ্ছে কেন ? কী এত কাজ। কী এমন তোব দুর্গোৎসব পড়েছে শুনি।

স্বরূপ অল্প একটু হাসল, ও কিছু না, তুমি ভেবো না দাদা।

স্বরূপ তো বলল ভেবোনা, কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই পড়ল জ্বরে। অনুরূপ বলল, কিরণ ডাক্তাবকে কল দিই, কেমন ?

স্বরূপ বলল, এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?

কিন্তু ব্যস্ত শেষ পর্যন্ত হ'তেই হল। কিবণ ডাক্তাব ব'লে গেল, জ্বরটা ভালো নয। কয়েকদিন বাদে বলল ডবল নিউমোনিয়া। শহব থেকে পব পব দুজন ডাক্তাবকে এনে দেখাল অনুরূপ, কিন্তু কাবো ভাবভঙ্গিতেই ভবসা পেল না। সদব থেকে আবো বড ডাক্তাব আনতে যাবে, স্বরূপ তাকে ইসাবায থামিয়ে ফিস ফিস ক'বে বলল, যাবে যাও, বাবণ তো তুমি শুনবে না। কিন্তু আমাব বড ইচ্ছা তুমি এ সময আমাব কাছে থাক।

অনুরূপ ফেব ধমক দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু উপস্থিত সবাই সেই পবামর্শই দিল। মববাব আগে স্বরূপ বড়ভাইকে তাব একটা ইচ্ছা জানিয়ে গেল। তাব শেষ অসম্পূর্ণ মূর্তিটা যেন সম্পূর্ণ কবে অনুরূপ। অনুরূপ চোখেব জলেব ভিতব দিয়ে বলল, আচ্ছা, কিন্তু তোব হাতেব কাজে বাটালি ধবতে কি আমি পাবব।

স্বরূপ বলল, তুমি আমার চেয়ে অনেক ভালো পাববে।

শোকাচ্ছন্ন কয়েকটি দিন কাটল। অনুরূপেব কোনো কাজে মন নেই খেযাল নেই কোনো দিকে। একদিন মল্লিকাই মনে কবিয়ে দিল, ঠাকুবপো কি একটা মূর্তিব কথা না বলেছিল শেষ সময ?

অনুরূপ বলল, ঠিক ঠিক, তাব শেষ ইচ্ছা তো বাখতে হবে। কোথায সেই মূর্তি ? যদি তাই নিয়ে একটু অন্যমনস্ক থাকা যায, স্বরূপেব কাজ নিয়ে ভুলে থাকতে হবে স্বরূপকে।

পাটেব মোটা মোটা চট দিয়ে ঢাকা মূর্তিটা স্বরূপেব ঘবেবই এক কোণে প'ডে ছিল। বড ছেলেব সাহায্যে ধবাধবি ক'বে মূর্তিটাকে আবো একটু সামনেব দিকে এগিয়ে আনল অনুরূপ। চটটা সবিয়ে ফেলল। তবু এ'কযদিনেই বেশ ধুলো জমেছে। মাকড়সা মাথাব ওপব দিয়ে বুনে গেছে জাল।

অনুরূপ মল্লিকাকে ডেকে বলল, পবিষ্কাব শুকনো একখানা ন্যাকড়া নিয়ে এসো তো।

আলমাবিব মাথাব ওপব থেকে ছেঁড়া কাপড়েব পুঁটুলিটা পেড়ে ন্যাকড়া বেব কবতে একটু দেবি হল মল্লিকাব। তাবপব সেখানা হাতে ক'বে এসে বলল, এই নাও। দেখি দেখি কী মূর্তি কেটেছে ঠাকুবপো।

অনুরূপ রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, দেখ চিনতে পাব কিনা।

চেনা কঠিন নয। মল্লিকাবই আবক্ষ প্রতিকৃতি। এখনকাব ভাঙাচোবা ক্ষ'য়ে-যাওয়া মল্লিকাব নয, দশ বৎসব আগেব সেই যৌবনোচ্ছলা সপ্তদশী মল্লিকা আবাব এসে সামনে দাঁড়িয়েছে যেন।

মূর্তিটাকে একবাব দেখেই মল্লিকা সলজ্জে তাড়াতাড়ি স'বে যাচ্ছিল, অনুরূপ হাত বাড়িয়ে তাব শীর্ণ হাতখানা চেপে ধবল, বলল, যেয়ো না, দাঁড়াও।

মল্লিকা সভয়ে বলল, কি বলছ ?

অনুরূপ অদ্ভুত একটু হাসল, দাঁড়াও এইখানে—বাকিটা তো আমাকেই শেষ কবতে হবে।

ভাদ্র ১৩৪৯

মহাশ্বেতা

সদ্য-চুনকাম-করা দেয়ালগুলি শুধু শুভ্রই নয়, শূন্যও। একখানা ফটোগ্রাফ কিংবা ক্যালেণ্ডাব পর্যন্ত নেই! একপাশে একখানি তক্তপোশে বিছানা পাতা। সাদা চাদরটা মেঝে পর্যন্ত ঝুলে পড়েছে। পাশেই ছোট একটি টেবিলে দু'একখানা বইপত্র আর একটি ফুলদানিতে কয়েকটি চন্দ্রমল্লিকা। তক্তপোশের উপর পা-ঝুলিয়ে-বসা অমিতাব দিকে আব একবাব তাকাল চিন্মোহন। ঘরের মতই নিবাভরণ শুভ্র ওর সজ্জা। ভিজে এলোচুল সমস্ত পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে, ও যেন কালো শ্লেটের ওপর খড়ি দিয়ে লেখা একটি শ্লোকের স্তবক।

ইচ্ছা কবলে এখান থেকেই হাত বাড়িয়ে ওব একখানা হাত চিন্মোহন নিজের হাতে তুলে নিতে পারে। অমিতা একটুও বাধা দেবে না একটুও বিস্মিত হবে না। তবু—থাক। এই স্তব্ধ গম্ভীর মর্মরমূর্তির সামনে ব'সে প্রশান্ত মাধুর্যে মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, কোনো ক্ষোভ থাকে না, কোনো চাঞ্চল্য জাগে না। রূপের এই অনুভূতি চিন্মোহনেব জীবনে নতুন। এতকাল উজ্জ্বল শিখায় নিজেকে আহুতি দিয়ে ছিল আনন্দ। দহনজ্বালায় নিজের অস্তিত্বকে তীব্রভাবে অনুভব করা যেত। কিন্তু অমিতার সঙ্গে পবিচয় না হ'লে জীবনে মধুর প্রশান্তিব এই আস্বাদন আর হয়তো ঘটে উঠত না।

কোনো কোনো দিন চুলের মত সূক্ষ্ম একটু কালো বেখা থাকে, আজ একেবারে সাদা থান পরেছে অমিতা। তাতে গাম্ভীর্য যেন আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে। রিক্ততার মধ্যেই যেন ওর ঐশ্বর্যের পূর্ণ প্রকাশ।

একটু চুপ ক'রে থেকে চিন্মোহন ডাকল, শ্বেতা!

বেশ আর পরিবেশেব সঙ্গে মিলিয়ে ওর নাম দিয়েছে চিন্মোহন, মহাশ্বেতা। স্নিগ্ধ হাসল অমিতা। চিন্মোহনের মনে হল ওব হাসির রঙও যেন সাদা একগুচ্ছ জুঁই ফুলের মত। যেমন স্বল্প, তেমনি সুন্দর।

তবু ভালো, আজ আর মহাশ্বেতা নই।

চিন্মোহন বলল, মহাশ্বেতাই তো। আমাব দেওয়া নাম যাতে সম্পূর্ণ সার্থক হয় তার জন্যে শাড়ির প্রান্ত থেকে কালো রেখাটুকু পর্যন্ত তুলে দিয়েছ।

অমিতা কোনো কথা বলল না।

চিন্মোহন বলল, বেশ, আমার কোনো আপত্তি নেই, এ বেশ যেদিন নিজে থেকে বদলাবে আমি সে দিনের প্রতীক্ষা ক'রে থাকব। কিন্তু বদলাতে একদিন হবেই।

চিন্মোহন তার চোখের দিকে তাকাতে অমিতা চোখ নামিয়ে নিল। কি যেন আছে চিন্মোহনের দৃষ্টিতে যাতে সমস্ত অন্তর থর থর ক'রে কেঁপে ওঠে।

বেশ বদলানো আর রোধ করা যাবে না একথা অমিতাও জেনেছে। সে সম্ভাবনা দিনের পর দিন মুহূর্তের পর মুহূর্তে, ক্রমেই নিকটতর হয়ে আসছে। বদলাতে হবে। শুধু কি বেশ? জীবনের মূল ধারাই ছুটবে নতুন গতিতে। কিন্তু কেমন হবে সে পথ? কেমন হবে পরিবর্তন? এখনো শঙ্কায় মন দুলতে থাকে, সংশয় সম্পূর্ণ ঘুচতে চায় না। এই পাঁচ বছরের বৈধব্য জীবনের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে লেগে গেছে। এ ছাড়া অন্য জীবনের কথা কল্পনাও যেন করা যায় না। কিন্তু যার স্মৃতির জন্যে এই কৃতজ্ঞতা, সেই মৃত অমূল্যর ওপর মন কি অমিতার আজো তেমনি একনিষ্ঠ আছে? দৈনন্দিন জীবনে বিধবার আচারনিষ্ঠা সে তেমনি মেনে চলেছে, কিন্তু নিজের মনের খবর তো অমিতা জানে। এই শুভ্র বেশবাসের সঙ্গে মনের মিল কই? কত রাত্রে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলেছে অমিতা, তবু অমূল্যর মুখ স্পষ্ট ক'রে মনে পড়েনি; সেখানে ভেসে উঠেছে চিন্মোহনের প্রতিমূর্তি। অমিতা আর

পারে না, এই অন্তর্দ্বন্দ্ব আর আত্মনিরোধের অন্ত কবে হবে ? গোপন কাঁটায় মুহুর্মুহু ক্ষতবিক্ষত হওয়ার শক্তি আর অমিতার নেই। এবার সে শিথিল দেহে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেবে। দুর্বার স্রোত যেখানে খুশি তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাক্।

তবু ওর চোখের সামনে নিজের মনকে এমন ক'রে উন্মুক্ত ক'রে মেলে ধরবার কি প্রয়োজন ছিল ? এর চেয়ে আজীবন প্রচ্ছন্ন থাকতে পারলে, নিজেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে পারলে যেন কৃতিত্ব ছিল, আনন্দ ছিল বেশি। দিনের পর দিন পাপড়ির পর পাপড়ি খুলতে থাকবে, তবু তার মনের কিছুতে নাগাল পাবে না চিন্মোহন ; অমিতা তেমনি ভেবে রেখেছিল। কিন্তু তা হল কই। কখন্ কোন্ অজ্ঞাত মুহূর্তে একসঙ্গে সমস্ত দলগুলি খুলে গেল, অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ওর চোখের আলোয় কিছুই আর গোপন রইল না।

পর্দার বাইরে থেকে ভুবনবাবু ডাকলেন, অমি মা।

অমিতা হঠাৎ কোনো কথা বলতে পারল না।

চিন্মোহন বলল, আসুন।

ভুবনবাবু ঘরে ঢুকতেই চিন্মোহন চেয়ার ছেড়ে দিয়ে তক্তপোশের এক পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। আর সেই মুহূর্তে সংকোচের সঙ্গে অমিতা আরো খানিকটা স'রে বসল।

মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভুবনবাবু মনে মনে হাসলেন। ওর বৈধব্যক্লিষ্ট শীর্ণ চেহারায় যেন এক নতুন রঙের ছোপ লেগেছে। বয়স ওর পঁচিশ হ'তে চলল, গত বছর বি টি পাশ ক'রে গুরুগম্ভীর হেডমিস্ট্রেস হয়েছে। বাড়িতেও খাওয়া-শোওয়া নিয়ে ওর কড়া শাসনে ভুবনবাবুকে সর্বদা তটস্থ থাকতে হয়। সেই মেয়ের এই বালিকাসুলভ লজ্জা তাঁর চোখে ভারি অপরূপ লাগল। ভুবনবাবু মুহূর্তের জন্যে যেন পলক ফেলতে ভুলে গেলেন। ওর দেহে মনে যেন লাবণ্যের নতুন জোয়ার এসেছে, বাঁচবার নতুন সার্থকতা। দীর্ঘদিনের সংস্কারাবদ্ধ মনকে ধিক্কার দিলেন ভুবনবাবু। এ সম্ভাবনার কথা যদি তাঁর আরো চারবছর আগে মনে পড়ত তাহ'লে এই ব্যর্থ কৃচ্ছ্রসাধনে ওর জীবনের এতগুলি দিন এমন ক'রে নষ্ট হয়ে যেত না।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে চিন্মোহনের দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা কথা নিশ্চিত ক'রে জেনে নেওয়া দরকার চিন্মোহন। তোমরা দুজনেই বয়ঃপ্রাপ্ত, সে হিসেবে ভালোমন্দ সমস্ত বোঝাপড়া নিজেরাই ক'রে নিতে পার, মাঝখান থেকে আমার হস্তক্ষেপের অবশ্য কোনো প্রয়োজন নেই—

চিন্মোহন বাধা দিয়ে বলল, না না, তা কেন, অভিভাবক হিসেবে নিশ্চয়ই আপনার অনেক কিছু জানবার থাকতে পারে।

ভুবনবাবু হাসলেন, সে কথা থাক্। নিতান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবেই কয়েকটা কথা স্পষ্ট বুঝতে চাচ্ছি। নতুন কিছু নয়। সেদিন তুমি যখন আমার কাছে কথাটা প্রস্তাব করেছিলে তখন আমি যা জিজ্ঞাসা করেছিলাম তার জবাব তো এখনো পাইনি চিন্মোহন ?

চিন্মোহন বলল, হ্যাঁ, খোলাখুলিভাবেই আমি সকলের সঙ্গে আলোচনা করেছি। দাদা তো সম্পূর্ণ সমর্থনই করেন। অনেক ক'রে বুঝিয়ে বলবার পর মায়ের সম্মতিও শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। হয়তো সেটা তাঁর সানন্দ সম্মতি নয়, কিন্তু এ ধরনের কিছু কিছু প্রতিকূলতার মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি অমিতার আছে ব'লেই আমি জানি। যদি নাই পারেন, তাতেই বা ক্ষতি কি। বর্তমান যুগের বিবাহটা ব্যক্তিগত, পরিবারগত নয়।

ভুবনবাবু এবারো একটু মৃদু হাসলেন, সে কথা সত্য। কিন্তু পরিবার আর সমাজ, কয়েকজন জ্ঞাতি বন্ধু নিয়ে সে সমাজের গণ্ডী যত ছোটই হোক, তাকে অস্বীকার করা অত সহজ নয়। জীবনে কিসের যে কতটুকু প্রভাব তার হিসেব কি খুব সহজ চিন্মোহন ?

ভুবনবাবুর কথার শেষের দিকটায় [illegible] ক্লান্ত করুণ সুর বেজে উঠল। ইতিহাসটা চিন্মোহনের কিছু কিছু জানা। [illegible] বোনকে বিয়ে করেছিলেন ভুবনবাবু। মাত্র এইটুকু অবৈধতায় প[illegible] সঙ্গে আজীবন তাঁদের [illegible]চ্ছিন্ন থাকতে হয়েছে। সেই নিঃসঙ্গ রুক্ষতা তাঁদের দাম্পত্য[illegible]কেও স্পর্শ করতে ছাড়ে[illegible]
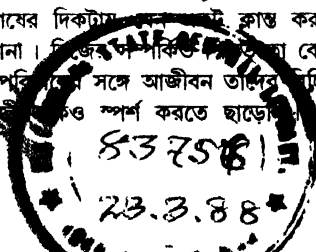
চিন্ময়োহন চুপ ক'রে রইল। কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে অমিতা বলল, যাই বাবা, চা ক'রে আনি।

ভুবনবাবু সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লেন।

সপ্তাহখানেক সময় নিয়েছিল অমিতা। সপ্তাহের শেষে আরো এক সপ্তাহ সময় চাইল। কিন্তু অসহিষ্ণু চিন্ময়োহন মাথা নাড়ল, না, আর সময় তুমি পাবে না। আয়ুর সমস্ত সপ্তাহই তাহ'লে এমনি একটি একটি ক'রে কাটবে। আর বিলম্ব নয়। যা হয় কালই।

ওর এই অসহিষ্ণুতা মাঝে মাঝে বেশ লাগে অমিতার। আরো বেশি অসহিষ্ণু, বেশি রূঢ় যদি হয়ে উঠত চিন্ময়োহন, তাহ'লে অমিতার দায়িত্ব যেন আরো অনেক কমত। তার সমস্ত দ্বিধাসংশয়ের তন্তু নির্দয় হাতে উন্মোচিত ক'রে ফেলুক চিন্ময়োহন। অমিতা বাধা দেবে না।

স্থির হল বিয়ে হবে রেজেস্ট্রি ক'রেই তবু চিন্ময়োহনের পারিবারিক সন্তুষ্টির জন্যে হিন্দু অনুষ্ঠানগুলিও সংক্ষেপে পালন করা হবে।

লজ্জায় কণ্টকিত হয়ে ওঠে অমিতার মন। আবার সেই অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি। কিছুতেই মন সাড়া দেয় না।

একটু চুপ ক'রে অমিতা বলে ওগুলি কি না করলেই নয়?

চিন্ময়োহন বলে, আমার জন্য ওগুলি নিতান্তই অনাবশ্যক কিন্তু আত্মীয়স্বজনের জন্যে কিছুটা প্রয়োজন আছে বইকি। তবু জিনিসগুলি যে বিরক্তিকর সন্দেহ নেই। কত যে অসংখ্য মেয়েলি আচারের মধ্য দিয়ে পার হ'তে হয় তার ঠিক নেই। তবু—চিন্ময়োহন মিষ্টি একটু হাসল—তবু একবারের অভিজ্ঞতা তোমার যখন হয়েছে তত অসুবিধা হবে না বোধ হয়। কিন্তু ওদের পাল্লায় প'ড়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ আমার দশাটা কি হবে ভেবে দেখ তো।

হঠাৎ ভারি বিবর্ণ দেখালো অমিতার মুখ। চিন্ময়োহন বিস্মিত হয়ে বলল, কি হল?

ম্লান হাসল অমিতা, কি আবার হবে।

কিন্তু কী যে হয়েছে তা বুঝতে বাকি নেই চিন্ময়োহনের। অমিতার পূর্বজীবন সম্বন্ধে পারতপক্ষে কোনোদিন কোনো কৌতূহল চিন্ময়োহন প্রকাশ করেনি, এ প্রসঙ্গ সতর্কভাবে সে বরং এড়িয়েই যায়। তবু কোনো মুহূর্তে তার উল্লেখ মাত্রেই অমিতা যদি এমন আঘাত পায়, এ'তটা অসহায় বোধ করে, তাই বা কি ক'রে চিন্ময়োহন সহ্য করবে? বয়স এবং অভিজ্ঞতা কি কম হয়েছে অমিতার যে, তার মন আজো এতখানি স্পর্শকাতর থাকবে?

একটা কথা আজ একটু খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে চাই অমিতা। চিন্ময়োহনের কণ্ঠ একটু রূঢ় এবং গম্ভীর শোনালো।

বল।

তোমার পূর্বজীবনের প্রসঙ্গ এতকাল সযত্নে দুজনে আমরা এড়িয়েই গেছি। কিন্তু ফল তাতে ভালো হয়নি দেখা যাচ্ছে। এর চেয়ে খোলাখুলিভাবে আলোচনাই বরং ভালো। বেদনা এবং দুর্বলতার স্থানকে লুকিয়ে রেখে কাজ নেই। অমূল্যবাবুকে তুমি আজো ভুলতে পারনি, এই তো স্বাভাবিক। এজন্যে আমার কোনো ঈর্ষাও নেই ক্ষোভও নেই। আমার শুধু দুঃখ এই, তাঁর কথা আমার কাছ থেকে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখতে চাও। অন্যান্য প্রসঙ্গের মত তাঁর কথাও তো—এমন কি তোমাদের সেই দাম্পত্যজীবনের খুঁটিনাটি কাহিনী পর্যন্তও—দুজনে আমরা আলোচনা করতে পারি।

অমিতা অদ্ভুত একটু হাসল, বলল প্ল্যানটা যেমন ভালো তেমনি কৃত্রিম। জীবনকে সবসময় অমন ফরমূলায় বাঁধা যায় ব'লে কি মনে হয় তোমার?

চিন্ময়োহন বলল, বেঁধে নিতে পারলে অনেক সময় কিন্তু ভালোই হয়। নিজেদের গড়া যে বাঁধন তাকে ভয় কিসের, সে তো ছন্দের বাঁধনের মত। বিয়েকেও তো লোকে বন্ধন বলে।

মনে মনে যত বিরূপতাই থাক, মুহূর্তের জন্যে সকলে মুগ্ধই হ'লেন। রূপ যেমন আছে, সংযত

রুচিও তেমনি। বয়স যতটা বেশি ব'লে শোনা গিয়েছিল, মুখে ততখানি ছাপ পড়েনি। বিদ্যার সঙ্গে—বন্দুকের সঙ্গীনের মত— তীক্ষ্ণাগ্র অহংকার উঁচু হয়ে নেই। শুধু চিন্মোহনের সঙ্গেই তার সম্পর্ক নয়, পরিবারের সকলের সঙ্গেই অন্তরঙ্গ হ'তে অমিতা উৎসুক।

তবু কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই অমিতার মনে অস্বস্তির গোপন কাঁটা কোত্থেকে এসে বিঁধতে লাগল। মন্দাকিনীকে প্রণাম করতে গেলে তিনি হঠাৎ পা সরিয়ে নিলেন, থাক থাক।

অপ্রতিভভাবে অমিতাকে স'রে দাঁড়াতে হল।

বাইরের ঘরে শোনা গেল চিন্মোহনের বড় ভাই মনোমোহন বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বন্ধুদেব কাছে বক্তৃতা করছেন, আমি বেশ ভেবেচিন্তে ইচ্ছা ক'রেই মত দিয়েছি, বুঝলে বন্ধু। এমন সচেতন চেষ্টা ছাড়া বিধবাবিবাহ আমাদের সমাজে প্রচলিতই হবে না। লজ্জা আর সংস্কারের জড়তা এমনি জোর ক'রেই ঘুচানো প্রয়োজন।

অমিতা সেখান থেকে তাড়াতাড়ি স'রে যায়।

খেতে ব'সেও অসুবিধার অন্ত নেই। পুরুষদের খাওয়া হয়ে গেলে চিন্মোহনের বোন সুনন্দা আর তার বউদি সরমার সঙ্গে অমিতাকে খেতে দেওয়া হল। পরিবেশনের ভাব নিয়েছেন সম্পর্কিত এক ঠানদি। বিবাহাদি ব্যাপারে খাটতে যেমন তিনি পারেন তেমনি পারেন কথা বলতে। তাঁব বসনাব সরসতার খ্যাতি আছে পাড়ায়।

নিরামিষ আমিষ নানারকমের তরকারি। কিন্তু অমিতা শুধু নিরামিষ তরকারি দিয়েই খেয়ে চলেছে। আমিষ একটাও সে স্পর্শ পর্যন্ত করছে না। ঠানদি তা লক্ষ্য ক'বে বললেন, ওমা, নতুন বউ যে মাছের তারকারি একটাও ছুঁয়ে দেখলে না। এত কষ্ট ক'রে রাঁধলুম তো ভাই তোমার জন্যেই।

সলজ্জভাবে অমিতা বলল, আজ থাক্।

ওমা থাকবে কেন, সধবাকে যে রোজ মাছ খেতে হয়।

সুনন্দা বলল, খান বউদি, চমৎকার হয়েছে।

সরমাও বলল, একটা তরকারি অন্তত খাও।

নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটুকরো মাছ মুখে দিল অমিতা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দুঃসহ বিবমিষায় সমস্ত গ্রাসটা সে ঢেলে ফেলল মেঝের ওপর। সবাই অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। লজ্জায় আর অস্বস্তিতে প্রত্যেকটি মুহূর্ত অসহনীয় লাগতে লাগল অমিতার।

ঠানদি কিছুক্ষণ নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিলেন। তারপর হঠাৎ কি মনে প'ড়ে যাওয়ায় তিনি মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন। ও, তাই বল! তা চিনুর সঙ্গে ভাব তো নাতবউয়ের শুনেছি অনেকদিন থেকেই। বিয়ে যে হবে এ তো প্রথম থেকেই জানত। মাছকোচ খাওয়ার অভ্যাসটা তখন থেকে আরম্ভ করলেই তো হত। তাহ'লে আর এমন অসুবিধেয় পড়তে হত না। সে সব বিধিনিষেধ তো আর সকলের জন্যে নয়।

অমিতা চেয়ে দেখল সকলের মুখে কৌতূহলেব হাসি ফুটে-উঠেছে।

খেয়ে-দেয়ে উঠে সুনন্দা বলল, ঠানদি চিরকালই ঠোঁটকাটা মানুষ। তাঁর রসজ্ঞানের তুলনা হয় না। কিন্তু তাঁর রসিকতায় আমার পায়ের তলা পর্যন্ত জ্ব'লে যায়, এই যা যন্ত্রণা।

অমিতা নীববে ম্লান একটু হাসল। বাইরের আচার-আচরণ নিয়ে এমন আকস্মিক অসুবিধায় পড়তে হবে, নানা অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে এ ধারণা তার কিছুতেই মাথায় আসেনি।

সুনন্দা সহানুভূতির কণ্ঠে বলল, গা বমি বমি লাগছে নাকি এখনো? একটা পান খেয়ে দেখুন না বউদি, সেরে যাবে।

অমিতা বলল, পান তো আমি খাইনে।

সুনন্দা হাসল, খান না ব'লে কি এখনো খেতে হবে না নাকি? আমিই কি সবদিন খাই? কিন্তু নিমন্ত্রণ-টিমন্ত্রণের পর পান খেয়ে ভারি চমৎকার লাগে। দাঁড়ান আমি সেজে আনছি, ভালো যদি না লাগে কি বলেছি। চৌদ্দপনের বছরের কিশোরী মেয়ে। ওর নিজের ভালো-লাগার স্রোতে অন্যের অসুবিধাটা ও ভাসিয়ে নিয়ে যায়। স্কুলে এমন অনেক ছাত্রীর সঙ্গে নিত্য পরিচয় হয়েছে অমিতার,

কিন্তু নিজের গাম্ভীর্যে সে অটল রয়েছে।

সারাদিনের মধ্যে চিন্ময়োহনের আর সাক্ষাৎ নেই। ভিড়ের মধ্যে বাইরে বাইরে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে ; তাকে দেখাই যায় না আর। মনে মনে অমিতা হাসে। এতদিনের সেই সপ্রতিভ চিন্ময়োহন বিয়ের পর হঠাৎ এমন লাজুক হয়ে উঠলো কি ক'রে।

সন্ধ্যায় সরমা আর সুনন্দা প্রসাধনের নানা উপকরণ নিয়ে বসল, অমিতাকে নিজেদের পছন্দ মত সাজাবে।

বিব্রত হয়ে অমিতা বলল, এসব কেন এত ?

সুনন্দা বলল, কেন নয় ? আগের মত আজো কি সেই সাদা—

চোখের ইসারায় সরমা তাকে নিষেধ ক'রে বলল, ছি।

অমিতা ছেড়ে দিয়েছে নিজেকে। তাকে নিয়ে যা খুশি করুক ওরা। অস্বস্তি প্রথমটায় লাগলেও এ ধরনের আত্মসমর্পণে অদ্ভুত তৃপ্তিও যে একরকম পাওয়া যায় তা যেন বহুকাল পরে আবার নতুন ক'রে অনুভব করল অমিতা। এ যেন আর কেউ, আর কারো শরীর। সুনন্দাদের একজন হয়ে সেও যেন কৌতুক বোধ করছে।

আলতায় দুটো পা একেবারে লেপে দিয়েছে সুনন্দা। কপাল আর সিঁথি নিয়ে পড়েছে সরমা। সিঁদুরের সূক্ষ্ম রেখায় তার তৃপ্তি নেই। নিজের মত ক'রে অমিতার সিঁথিও সে আয়তির চিহ্নে উজ্জ্বল ক'রে তুলল। কপালে বড় ক'রে এঁকে দিল সিঁদুরের ফোঁটা। কে বলবে বিধবার বেশে পাঁচপাঁচটি বছর কাটিয়ে এসেছে অমিতা। খাওয়া দাওয়ার পর সুনন্দার পাল্লায় প'ড়ে এ বেলাও পান খেতে হল। তাছাড়া দীর্ঘদিন পরে হ'লেও পানের স্বাদটা অমিতার ভালোই লেগেছে।

সাজিয়ে-গুজিয়ে সুনন্দা তাকে ঠেলে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল নিজের বড় দেওয়াল-আয়নাটার সামনে, দেখুন কি চমৎকার মানিয়েছে, আমূল বদলে' গেছেন একেবারে। নিজেকে নিজে চিনতে পারছেন তো ?

মৃদু হাসল অমিতা, না পারাই তো ভালো।

আধো-শোয়া ভাবে কি-একটা বই পড়ছিল চিন্ময়োহন। অমিতাকে দেখে হঠাৎ যেন চমকে উঠল।

এ কি হয়েছে !

অমিতাও একটু বিস্মিত হল, কেন, কি আবার হবে।

চিন্ময়োহন যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, তোমাকে এমন বিশ্রী সঙ সাজালো কে ?

কথার ভঙ্গিটা কেমন যেন দুঃসহ লাগল অমিতার, বলল, কে আবার সাজাবে ? আমি নিজেই সেজেছি। কেন, খুব খারাপ লাগছে নাকি ?

সবাঙ্গে হেসে উঠল চিন্ময়োহন, না না না, অতি চমৎকার, অতি চমৎকার ! দশ বছর বয়স ক'মে গেছে তোমার। একেবারে চতুর্দশী বালিকা-বধূ।

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে চমকে উঠে চোখ তুলতেই অমিতা দেখতে পেল চিন্ময়োহনের শিয়রের খানিকটা ওপরে, দেয়ালে টাঙানো দিন কয়েক আগেকার অমিতারই একখানা ফটো। নিচে সযত্ন হস্তে লেখা, মহাশ্বেতা !

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অমিতা। এই বিচিত্র বর্ণবাসের অন্তরালে তার মন মরুভূমির রিক্ততায় ধূ ধূ করছে।

মাঘ ১৩৫০

নেতা

একটা ক'রে বালতি প্রত্যেকের হাতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সকলের' কাছ থেকে আবদার-মিশ্রিত ফরমায়েস এল, 'আর দেরি কেন চন্দরদা, আরম্ভ হক।'

মানে গল্প আবম্ভ হক। চন্দ্র চাটুয্যের মুখ না চললে কারো হাত চলে না। এ-কথা সকলেই জানে।

মোমে আর ক্যানভাসে তৈরি নীলরঙের ছোট ছোট বালতি। সৈনিকদের ব্যবহার্য। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে আঙ্গিক গড়নটা ঠিক নক্সা মাফিক হয়েছে কিনা মিলিয়ে দেখতে হয় ; তলার চার দিকটা টিপে টিপে পরীক্ষা করতে হয় কোথাও ছেঁড়া ফুটো আছে নাকি, সব জায়গায় সেলাই পড়েছে কিনা যথাযথ। কনট্রাক্টররা যাতে বাজে মাল না চালিয়ে যায়—তাই সরকারী তরফ থেকে আমরা পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছি।

যুদ্ধের কাজে না লাগে এমন জিনিস নেই। সৈনিকদের পায়ের জুতো গায়ের গেঞ্জি, মাথার বালিশ্ শোয়ার বিছানা থেকে আরম্ভ ক'রে কত বকম আবরণ-আভরণেরই যে যাচাই-বাছাই হয় এই ডিপোতে তার সব নামও জানি নে, জানবার কথাও নয়। একেক রকম জিনিসের জন্য একেক দল পরীক্ষক, একেক দল শ্রমিক আর পরিচালক হিসাবে বিভিন্ন পদের সামরিক উপাধিধারী একেক জন শ্বেতাঙ্গ।

চন্দ্র চাটুয্যেব কাছে গল্প মানেই অবশ্য আদিবসের গল্প। চাটুয্যে বলেন, 'আরে রস মানেই আদিরস। ও শুধু আদি নয়, অন্তও।'

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'মানেটা কি হলো চন্দরদা।'

'কেন লজ্জা দিচ্ছ ভায়া। মানেটা তো আমার চেহাবাতেই আছে।'

তাঁর স্বীকারোক্তিতে আমরাই লজ্জিত হলাম। আদিরসের কিছু কিছু অন্তিম আভাস চাটুয্যের চেহারায় অনুমান ক'রে আমবা নিজেবাই একদা কানাকানি করেছিলাম—লোঁকটি ডাক্তাবী পরীক্ষায় পার হলো কি করে ? আলোচনার কিছু কিছু চাটুয্যের কানে গিয়ে থাকবে।

কিন্তু সন্দেহজনক চেহারা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে চাটুয্যের প্রতিপত্তি নিঃসন্দেহেই বেড়ে যেতে লাগল। দিনে একেক জনের হাজার ক'রে বালতি পাশ কবার হুকুম। কিন্তু চাটুয্যে বাকেট প্রায় ছুঁয়েও দেখেন না। কেবল যখন সাহেবদের আসতে দেখেন, তখন একেকটা বালতি হাতে তুলে নেন। চাটুয্যের ভাগের কাজ ভাগাভাগি ক'রে বিনা আপত্তিতে আর সবাই ক'রে দেয়। চাটুয্যের কেবল রস যোগাবার ভার। গাঁজা, গুলি, চরস, ফুটুস্ কত রকমের নেশা আছে সংসারে। দেশভেদে তার নানা রকম নাম, উপভোগের নানা রকম প্রকরণ। বর্মী নেশা, ফ্রবাসী নেশা, চীনে নেশা, যা চাটুয্যে সব চেখে দেখেছেন। সেই সব নেশার গল্প আমাদের প্রমত্ত ক'রে তোলে। আমাদের অতুলের স্বভাবটা কিছু নাস্তিক গোছের। সে একদিন শ্লেষ ক'রে বলেছিল, 'ওসব দেশেও কি পদধূলি দিয়ে এসেছেন না কি চাটুয্যেদা ?'

চাটুয্যে ভয়ানক চটে গিয়েছিলেন, 'দরকার কি বাবা, কলির গুপ্তবৃন্দাবন এই কলকাতাই যথেষ্ট। চাই কেবল ট্যাঁকের নীচে পয়সা আর কপালের নীচে একজোড়া চোখ। এখানেই সব পাবে।'

আলোচনাটা একটু রুচি-সম্মত করবার জন্য আমি প্রথম প্রথম চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হয় নি। চাটুয্যের রসস্রোতে সব কিছু ভেসে গিয়েছিল।

সুরুচি প্রসঙ্গে চাটুয্যে আমাকে একদিন আপোষে বলেছিলেন, 'প্রভুপাদ, তোমার তিলক চন্দন আর জপের মালা এখানে বার ক'রে কাজ নেই, তাহলে কোম্পানীর কাজ পড়ে থাকবে, সৈন্যরা বালতি পাবে না। আর দু'দিন যেতে না যেতে আমরা দলকে দল অকেজো ব'লে বাতিল হয়ে

যাব। এই কড়া রোদে আট দশ ঘণ্টা বসে বসে যারা বালতি টিপবে তাদের মনটা যদি একটু রসস্থ করতে চাও ত হাঁড়ি হাঁড়ি তাড়ি আমদানী কর, তুলসীপাতায় ক'রে গঙ্গাজলের ছিটা দিতে যেয়ো না। কই এত তো সর্দারি করো—আমাদেব মাথাব ওপব দিয়ে একটা সামিয়ানা টাঙিয়ে দাও দেখি সাহেবকে বলে।'

প্রথমটা আমাদের পরীক্ষাব কাজ ঘবেব ভেতরেই চলত। আমরা পরীক্ষকেরা বসবার জন্য পেয়েছিলাম সরু বেঞ্চ আর বালতি রাখবার জন্য লম্বা টেবিল। কিন্তু লরীব পর লরী বালতিতে সমস্ত ডিপো যখন ভরে উঠবাব জো হলো, অর্ডার এলো একেকজনকে হাজার ক'বে বালতি পাশ করতে হবে, তখন একদিন খোদ বড সাহেব এসে আমাদের সেই সব সাহেবী আসবাব বাতিল ক'রে দিলেন। না হ'লে আশানুরূপ কাজ এগুবে না।

ঘর থেকে আমরা প্রাঙ্গণে নেমে এলাম,বসবার কোন নির্দিষ্ট আসন রইল না। কেউবা একটু খবরের কাগজ, কেউ বা সাহেবকে লুকিয়ে বাতিল-করা পাঁচ সাতটা বালতিই ঢেকে ঢুকে চেপে বসে। মাথার ওপরে রৌদ্রোদ্ভাসিত নীলাকাশ আর সামনে নীলাভ বালতি-সমুদ্র। চাটুয্যের খোঁচা খেয়ে সেক্‌সন-ইনচার্জ ডসনের কাছে সেদিন দরবাব কবতে গিয়েছিলাম। তিনি তখন এক কন্‌ট্রাক্টরের সঙ্গে গোপন পরামর্শে ব্যস্ত, বাধা পেয়ে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হয়েছে কি?'

সবিনয়ে বললাম, 'হতচ্ছাড়া রোদ বড় বেশি জোবে উঠেছে, চামড়ায় আর সহ্য হচ্ছে না।'

ডসন একটু হেসে বললেন, 'সত্যি নাকি? নিজেদের দেশেব রোদ নিজেরা সহ্য করতে পার না আব সাত সমুদ্দুর তের নদী ডিঙিয়ে আমরা বিদেশীরা কি ক'রে পাবছি? আসলে তোমাদের মত আবামপ্রিয জাত আব দুটি নেই।' আমাব গা'টা একটু টিপে দেখে বললেন, 'ইস্‌, ঠিক একেবারে মেয়েমানুষের মত নবম। এর চেয়ে তোমাদের গোটা জাতটা যদি পুরোপুরি মেয়ে মানুষ হয়ে জন্মাত, যুদ্ধে অনেক বেশি কাজে আসত!' সাহেব হেসে উঠলেন। তারপর সস্নেহে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'যাও যাও—কাজ কবো গিয়ে। রোদ আড়াল করবার ব্যবস্থা শিগ্‌গিরই হচ্ছে।'

সে ব্যবস্থা অবশ্য এখনও হযনি।

গল্পেব ফবমায়েস পেয়ে চাটুয্যে জিজ্ঞাসা কবলেন, 'কিসেব গল্প শুনবে?'

শিবু দলেব মধ্যে সব চেয়ে বযসে ছোট। বছব পনের ষোলর বেশি বয়স হবে না। কিন্তু চাটুয্যেব সাহচর্যে ইতিমধ্যেই বেশ পেকে উঠেছে। সে ব'লে উঠল, 'আজ আর কোন নেশার গল্প নয়। রোজ বোজ গুলি আর চরস ভালো লাগে না। আজ প্রেমের গল্প বলুন।'

চাটুয্যে তাব দিকে এক চোখ বুজে মুচকি হেসে বললেন, 'মাইরি! প্রেমের গল্প মানে তো সেই মেয়ে মানুষেব গল্প? সেও তো এক নেশারে দাদা, গুলি-চবসের চেয়েও পাক্কী নেশা। ও নেশার সব চেযে বড় অসুবিধা, ওতে আনুষঙ্গিক লাগে। সাদা চোখে আব সাদা মুখে ও নেশায় আমেজ লাগে না।' ব'লে চাটুয্যে সকলেব আগে শিবুর কাছেই আজ প্রথমে হাত পাতলেন, 'কই দে দেখি।'

শিবু লজ্জায লাল হয়ে উঠল, 'কি দোব।'

চাটুয্যে তাব দিকে তাকিযে অসংকোচে বললেন, 'দেখ, অমন সুন্দরীপনা কবিস নে। কি করতে কি ক'রে বসি ঠিক কি। কি আবার দিবি, বিড়ি।'

ঠিক এই সময়ে বড় সাহেব ক্যাপ্টেন উইলসন্‌ এসে উপস্থিত হলেন, আর সঙ্গে ডসন। অনেকক্ষণ আগে থাকতেই অলক্ষ্যে তাঁরা যে চাটুয্যেকে লক্ষ্য করছিলেন তা কেউ দেখিনি। সামনে এসে ক্যাপ্টেন গর্জে উঠলেন, 'ইউ ব্লাডি ওল্ড চ্যাপ্‌, সকাল থেকে কেবল গল্পই করছে, গল্পই করছে। সেক্‌সনের কাজ এগুবে কি ক'রে? ডসনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কি প'ড়ে প'ড়ে ঘুমোও, এ সব দিকে লক্ষ্য করো না? উচিত শিক্ষা দিতে পার না এই বুড়ো বাঁদরটাকে?'

সাহেব চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে উচিত শিক্ষার ব্যবস্থা তিনি নিজেই ক'রে গেলেন। চাটুয্যের একদিনের রোজ ফাইন হয়ে গেল। চাটুয্যে কাঁদো কাঁদো ভাবে ক্যাপ্টেনের পা জড়িয়ে ধরতে চাইলেন, 'একেবারে ম'রে যাব—একেবারে ম'বে যাব স্যার।'

সাহেব ততক্ষণে অনেক দূরে চলে গেছেন।

আমরা সবাই বললুম, 'আপনার কোন চিন্তা নেই চাটুয্যেদা, এ ফাইন আমরা সবাই চাঁদা ক'রে দেব।'

চাটুয্যে বললেন, 'ও সব ছেঁদো কথায় আমি ভুলিনে। এই ফাইন রদ কর। আর বুড়ো ব্রাহ্মণকে ম্লেচ্ছের বাচ্চা সকাল বেলায় যে অপমানটা ক'রে গেল তার শোধ তোল। তবেই বুঝব তোমরা আমাকে ভালোবাস। মান অপমান ব'লে সত্যিই কোন জ্ঞান আছে তোমাদের।'

বললুম, 'সাহেবের বাক্য যে বেদ বাক্য—ওর কি আর নড়চড় হবার জো আছে।'

চাটুয্যে সকলেব দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শোন, শোন, আমাদের বিদ্যার জাহাজ, বুদ্ধির সাগর, নেতাজীর কথা শোন একবার! ইনি কেবল চরিত্তির বাঁচাতেই জানেন, মান প্রাণ বাঁচাবার ধার ধারেন না।'

সবাই আমাকে গোল হয়ে ঘিরে ধরল। এর বিহিত করবার জন্য আমি ছাড়া আর লোক নেই। মনে মনে একটু গর্ববোধ না করে পাবলুম না। দলের মধ্যে চাটুয্যের আসন এতদিনে টলেছে।

বললুম, 'বিহিত করবার চেষ্টা আমি করতে পারি—সবাই যদি শক্ত হয়ে আমাব পাশে দাঁড়াও।'

সকলে সমস্বরে বলল, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

চাটুয্যে অতিশয়োক্তিতে ওস্তাদ। আমার হাত জড়িয়ে ধ'রে বললেন, 'পাশে নয়. পাশে নয়—আমরা তোমার পায়ের নীচে পড়ে থাকব, যদি এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে পার। নিতে পার কি, নিতেই হবে তোমাকে।'

রমেশ বলল, 'অন্যায়ের প্রতিকার এই সব ছোট খাটো ব্যাপার নিযেই শুরু হয়।'

বিপিন সায় দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই। কচু গাছ কাটতে কাটতেই লোকে ডাকাত হয়ে ওঠে।'

বললুম, 'খুব কিন্তু শক্ত হ'তে হবে প্রত্যেককে। দরকার হলে চাকরির মায়া পর্যন্ত ছাড়তে হবে।'

চাটুয্যে বললেন, 'থুঃ থুঃ, এ চাকরির মুখে আমি পেচ্ছাপ কবি।'

সবাই বলল যে, এই অতি ক্ষণস্থায়ী চাকরি প্রত্যেকেব কাছেই অত্যন্ত তুচ্ছ বস্তু।

ডসনকে গিয়ে ধরলাম, 'চাটুয্যের ফাইন মাপ করতে হবে।'

ক্যাপ্টেনের ধমক খেয়ে ডসনের মেজাজ আবও চ'ড়ে গেছে। ডসন মুখ খিচিয়ে উত্তব দিলেন, 'গোলমাল ক'র না। কাজ কর গিয়ে। আর ফের যদি বিরক্ত করতে আস্সো তোমাকে সুদ্ধ ফাইন করবো। তলে তলে তুমিও শয়তান কম নও।'

বললাম, 'সে তো বটেই। কিন্তু ফাইন তুলে না দিলে সেক্‌সনের কাজ আজ বন্ধ থাকবে।'

ডসন দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'বটে!'

আমি দৃঢ় কণ্ঠে বললুম, 'হ্যাঁ।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে ডসন এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন, 'আচ্ছা ভট্টাচারিয়া, ব্লাডি বুড়োটা তোমাকে কিসের লোভ দেখিয়েছে বলো দেখি? ঘরে ওর বুড়ী স্ত্রী ছাড়া আর কে আছে?'

বললুম, 'সতের বছরের অপূর্ব সুন্দরী একটা মেয়েও আছে. জানো না বুঝি?'

তারপর সেক্‌সনে ফিরে গেলুম।

কাজ চলছে না শুনে ক্যাপ্টেন সাহেব স্বয়ং আবার দেখা দিলেন। বললেন, 'সার বন্দী হয়ে দাঁড়াও। ব্যাপারটা আমি সব শুনতে চাই।'

যখন চরমতম অবজ্ঞাই আমরা করতে প্রস্তুত হয়েছি, তখন কৌতুকচ্ছলেও এ সব ছোটখাটো আদেশ মানবার অভিনয় করা যায়। এতক্ষণ গোল হয়ে যারা জোট পাকাচ্ছিল, সবাই আমার ইঙ্গিতে একই সরলরেখায় সমান্তরালভাবে স্থির হয়ে দাঁড়াল। প্রথমে আমি, তারপর চাটুয্যে এবং পাশাপাশি আমাদের সেক্‌সন্বের আরও জন পঁচিশেক এগজামিনার।

সাহেব প্রথমে আমার সম্মুখেই এসে দাঁড়ালেন। পাইপটা ঠোঁটের এককোণে সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'কি চাও তুমি?'

আমি বললুম, 'আমি নয়—আমরা।'
'বাজে কথায় সময় নষ্ট করবার মত সময় আমার নেই। তুমি কি চাও তাই বল। কাজ করছ না কেন? এর ক্ষতিপূরণ কে দেবে?'
বললুম, 'আমাদের সম্মানিত চাটুয্যে মশাইকে অন্যায়ভাবে গালাগালি এবং ফাইন করা হয়েছে। আর তার প্রতিবাদেই কাজ বন্ধ আছে।'
সাহেব বললেন, 'কিছুই অন্যায় হয় নি। তুমি কাজ করবে কি না তাই বল?'
'ফাইন এবং গালাগাল প্রত্যাহার না করলে কাজ করা অসম্ভব।'
সাহেব বললেন, 'বেশ। তোমাকে ডিসচার্জ করলুম। ডসন, একে একটা গেট-পাশ লিখে এখনি ডিপোর বার ক'রে দাও।'
তারপর চাটুয্যের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বুড়ো বদমাস, এ সম্বন্ধে তোমার কি বলবার আছে?'
চাটুয্যে বললেন, 'আজ্ঞে আজ্ঞে—'
'আজ্ঞে আজ্ঞে নয়, কাজ করবে কি করবে না?'
চাটুয্যে বললেন, 'আজ্ঞে করব।'
'তা হ'লে বাকেট তুলে নাও হাতে।'
চাটুয্যে বাকেট তুলে টিপতে আরম্ভ করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাকি সবাই তাঁর অনুসরণ করল।
ক্যাপ্টেন প্রসন্ন হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ—এইতো গুড বয়ের কাজ। কিন্তু যতক্ষণ সময় নষ্ট ক'রেছ ছুটির পর ততক্ষণ থেকে এই কাজ সেরে দিয়ে যেতে হবে। সে জন্য কোন ওভার-টাইমের ব্যবস্থা হবে না—আগেই বলে রাখছি।'
ডসন তাড়া দিয়ে বললেন, 'এসো ভট্টাচারিয়া, ওদের কাজ করতে দাও।'
ডসনের পিছনে আসতে আসতে চাটুয্যের গলা শুনতে পেলাম, 'আরে বাবা, ওটা স্থানমাহাত্ম্য। প্রথমে দাঁড়ালে ভটচায্ যা বলেছে—আমিও ঠিক তাই বলতুম, আর ভটচায যদি আমার জায়গায় দাঁড়াত তা'হলে তার ফলাফল দেখে ভটচায্ও ঠিক তোমাদের মতই একটা ক'রে বাকেট হাতে তুলে নিত। নেতাগিরি জিনিসটাই আসলে এই। নেতা কেউ নিজের ক্ষমতায় হয় না, অবস্থা গতিকে ধ'রে বেঁধে একেকজনকে নেতা আমরা বানিয়ে বসি। সেটা তার কপাল জোরও বটে, গ্রহবৈগুণ্যও বটে।'
ভক্তদের মধ্যে দু'একজন বলল, 'ঠিক বলেছেন, চাটুয্যেদা! অবিকল তাই।'
আর সকলে চুপ ক'রে রইল।
আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ডসনের বুঝি অনুকম্পা হলো। বললেন, 'ঘাবড়িয়োনা ভট্টাচারিয়া—আমি সব ঠিক ক'রে নিচ্ছি। তোমাকে আমি সত্যি ভালোবেসে ফেলেছি। তুমি ভারী ভালো মানুষ!'
আমি শক্ত হয়ে বললুম, 'ওসব বাজে কথা রাখো। গেট-পাশটা আমাকে দিয়ে দাও, আমি যাই।'
ডসন বললেন, 'অত নিষ্ঠুর হচ্ছ কেন ডার্লিং? একটু দাঁড়াও—আমি এক্ষুণি সব ঠিক ক'রে দেব।'
ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, 'পাগলামি ক'র না ডসন।' ডসন যেতে যেতে বললেন, 'পাগলামি তুমি নিজে করছ ভট্টাচারিয়া। বাড়িতে তোমার অনেক ডিপেনডেন্ট আছে, তুমি নিজেই তো সেদিন বলছিলে।'
তা আছে। আগের দিন লেট হয়েছিলাম ব'লে আজ রাত সাড়ে তিনটায় চুপিচুপি উঠে জ্বর গায়ে উনুনে আঁচ দিতে বসেছিল সুমিতা। আমার নিষেধ শোনেনি। খোকাটার এমন স্বভাব হয়েছে—এক মুহূর্তও মার কোল ছাড়া থাকবে না। সঙ্গে সঙ্গে কাঁদতে কাঁদতে উঠে গিয়েছিল সুমিতার পিছনে পিছনে। রোজ ওর কান্নায় আমার ঘুম ভাঙে। মন্দ হয়নি, বেশ একটা এ্যালার্মওয়ালা ঘড়ির কাজ চলে। উঠে বাইরে যাওয়ার সময় একবার সুমিতার মুখের দিকে চোখ পড়েছিল। জ্বরে আর আগুনের আঁচে মুখখানা আরক্ত।
'দেখছ কি', সুমিতা জিজ্ঞাসা ক'রেছিল।

'কিছু না। আজও আবার জ্বর এলো নাকি ?' সুমিতা অদ্ভুত একটু হেসেছিল, 'আসুক না! জ্বর এলে আমাকে নাকি আরো সুন্দর দেখায় ?'

বেরুবার মুখে একবার একটু ইতস্তত ক'রে বলেছিল, 'পয়সায় যদি কুলোয় একটা বেদানা আনবে।' তারপর একটু হেসে বলেছিল, 'সুন্দরের দর্শনী লাগে।'

ডসন ফিরে এসে বল'লেন, 'ঠিক ক'রে এসেছি। আজ কয়েক ঘণ্টার জন্য সস্‌পেণ্ড। ওটুকু কেবল ক্যাপ্টেনের সম্মান রক্ষার জন্য। শত হ'লেও ক্যাপ্টেন তো ? কাল সকাল থেকে আবার কাজে লেগে যেও।'

একটু ইতস্তত করলাম। চাটুয্যের কথাকেই সত্য হ'তে দিলাম তাহ'লে ? পরের মুহূর্তে ভাবলাম, ক্ষতি কি ? ওদের মত লোকের কাছে আবার চক্ষুলজ্জা ? বরং ওদের ব্যবহারের জবাব চাকরি নিয়ে ওদের ওপর সর্দারি ক'রেই দিতে হবে। সুমিতার জন্য একটা বেদানা, আর খোকনের জন্য লজেন্স নিয়ে ঘরে ফিরলাম।

সন্ধ্যার পর কড়া নাড়ার শব্দে দোর খুলে এসে দাঁড়ালাম। চাটুয্যে, রমেশ, অতুল এবং আরও জন বারো। বললাম, 'কি ব্যাপার ?'

চাটুয্যে এগিয়ে এসে বললেন, 'তোমার স্ত্রী কেমন আছেন ভটচায, তাঁর অসুখের কথা শুনেছিলাম।'

বললাম, 'ভালোই আছেন।'

রমেশ পকেট থেকে একটা বেদানা বার করল। প্রসঙ্গক্রমে বেদানার কথাটা তাকে বলেছিলাম এবং জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কোথায় সস্তায় পাওয়া যায়।

চাটুয্যে বললেন, 'তুমি আমাদের মুখ রেখেছ ভটচায। সবারই প্রাণের কথা বলেছ, উপযুক্ত কাজ করেছ তুমি। চাকরি! থুঃ থুঃ, ও আবার একটা চাকরি! তোমার মত বিদ্বান সচ্চরিত্র ছেলের আবার চাকরির ভাবনা ? সার্টিফিকেটখানা একবার মেলে ধরলে অমন হাজারটা আপিস এসে তোমাকে লুফে নেবে না ?'

একটু শুষ্ক হেসে বললাম, 'তার দরকার হবে না। সাহেবকে অনুরোধ ক'রে ঐ আপিসেই আবার কাজ পেয়েছি চাটুয্যে মশাই। ভাবনা নেই, কালই গিয়ে আবার আপনার গল্প শুনতে পাবব।'

চাটুয্যে বললেন, 'যাঃ, ঠাট্টা করছ! তুমি আবার তাই পার নাকি ?'

বললাম, 'ঠাট্টা নয় সত্যি, আপনারা পারলেন—আমি কেন পারব না ?'

চাটুয্যে সে কথার কোন জবাব না দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'সত্যি ? আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না।'

নীরস এবং নির্মম কণ্ঠে বললাম, 'না হ'লে আর উপায় কি।'

চাটুয্যে এক মুহূর্ত চুপ ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'না, উপায় আর কি। চল হে রমেশ চল, রাত হলো।'

চাটুয্যের পিছনে সদলবলে সবাই আবার হাঁটা শুরু করল।

ওরা কি সত্যিই আমার কাছে অন্য কিছু আশা করেছিল ? সত্যিই দেখতে এসেছিল, ওরা যা পারেনি আমি তাই পেরেছি ? উইলসন আর ডসনের চেয়েও কি আমি ওদের বেশি নিরাশ আর বেশি অপমান করলুম ?

ভাদ্র ১৩৫১

চোর

ঘরে ঢুকে গা থেকে চাদরটা খুলে অমূল্য বিছানার ওপর রাখল, তারপর পকেট থেকে সরু লম্বা সাইজের একটা সাবানের বাক্স আর এক কৌটো স্নো বার ক'রে স্ত্রীর সামনে ধ'রে বলল, 'নাও, তুলে রাখো।'

বেণু হাতখানা বাড়িয়েই তাড়াতাড়ি আবার সরিয়ে নিল, যেন সাপের গায়ে হাত দিতে যাচ্ছিল সে তারপর সরাসরি স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আজ আবার এ-সব এনেছ যে ?'

অমূল্য একবার যেন চোখ ফিরিয়ে নিল, কিন্তু পর মুহূর্তেই তীব্র দৃষ্টিতে বেণুর দিকে চেয়ে ক্রোধ এবং ব্যঙ্গ মিশ্রিত অদ্ভুত হাস্যে বলল, 'এনেছি বাজারে বিক্রি করবার জন্যে।'

সঙ্গে সঙ্গেই সুর বদলে হঠাৎ যেন ধমকে উঠল অমূল্য 'বলি, জিনিসগুলো হাত থেকে নিতে পারবে কি না ?'

বেণু আস্তে আস্তে বলল 'হাতে ক'রে তুমি যদি আনতে পেরে থাক, আমি নিতে পারব না কেন ?'

এরপর জিনিসগুলো তুলে নিয়ে বেণু জলচৌকিটার ওপর রেখে দিল।

অমূল্য বলল, 'শেষ পর্যন্ত না নিয়ে যখন পারবেই না জানো তখন আগে থাকতে ভদ্রভাবে নিলেই হয়। অত চেঁচামেচি, অত সতীপনা কিসের জন্যে ? আর একদিন ঠাট্টা ক'রে বলেছিলাম ব'লে কি রোজই তাই করব নাকি। এগুলি আমার নিজের পয়সায় কেনা।'

বেণু স্বামীর দিকে তাকিয়ে একটু ম্লান হাসল, 'দেখ, আর যাই কর, আমার কাছে মিথ্যা কথা ব'ল না।'

অমূল্য আবার জ্বলে উঠল 'না, খড়দ'র মা-গোঁসাই এসেছ কিনা তুমি, তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলব না।'

এবার সত্যি সত্যিই হাসি পেল বেণুর 'খড়দ'র মা-গোঁসাই ছাড়া আর কারো কাছে বুঝি সত্যি কথা বলা যায় না ?'

অমূল্য একমুহূর্ত মুগ্ধ দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে চেয়ে রইল হাসলে ভারি সুন্দর দেখায় ওকে, কেবল এই গোঁড়ামিটুকু যদি না থাকত, এই অতিরিক্ত শুচিবায়ু।

বেণু একবার চোখ নামিয়ে নিল, তারপর আবার অমূল্যর দিকে চেয়ে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'দেখ, তোমার ভালোর জন্যেই বলি, না হ'লে আমার আর কি, একদিন যদি হাতে-নাতে ধরা প'ড়ে যাও তখন দশা হবে কি তখন মান থাকবে কোথায় ?'

অমূল্য অটুট আত্মপ্রত্যয়ে বলল, 'ক্ষেপেছ! তেমন কাঁচা হাত আমার নয়।'

হাত কাঁচা নয়, এই নিয়ে বড়াই করতে লজ্জাও হয় না অমূল্যর, সেই লজ্জায় বেণুর নিজের ম'রে যেতে ইচ্ছা করে। হাত কাঁচা নয় তা ঠিক। কোনো দ্বিধাই যেন নেই অমূল্যর! বিয়ের ক'দিন পরে তারা ট্রামে ক'রে যাচ্ছিল ইডেন গার্ডেন দেখতে। একই বেঞ্চে পাশাপাশি ব'সে বেণুর সঙ্গে গল্প করছিল অমূল্য। কনডাকটর এলো টিকিট চাইতে। সঙ্গে সঙ্গে গল্পে অমূল্যর মনোযোগ আরো বেড়ে গেল।

কনডাক্টর তবু জিজ্ঞেস করল, 'বাবু, টিকিট ?'

অমূল্য একবার মাথা নেড়ে বেণুর সঙ্গে গল্পই করতে লাগল। বেণু স্পষ্ট দেখল, কন্‌ডাক্টরটা একটু মুচকি হেসে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। অমূল্য অনর্গল কথা বলতে লাগল, কিন্তু লজ্জায়

রেণুর সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। ছি ছি, কী মনে করল কন্‌ডাক্‌টরটা ! মাত্র দু'আনার তো ব্যাপার।

কন্‌ডাক্‌টর একটু দূরে স'রে গেলে রেণু চুপি চুপি স্বামীকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'টিকিট করলে না যে ?'

অমূল্য হেসে বলেছিল, 'ওঃ, তুমি বুঝি আবার তা লক্ষ্য করেছ ! টিকিটই যদি করব তো ফার্স্ট ক্লাসে উঠেছি কেন !'

রেণু অবাক্ হয়ে বলেছিল, 'ওমা, ফার্স্ট ক্লাসে ছাড়া আবার ভদ্রলোকে মেয়েছেলে নিয়ে ওঠে নাকি ! তাই ব'লে টিকিট করবে না ?'

অমূল্য সগর্বে বলেছিল, 'একা যখন উঠি তখনই ডব্‌লু টি-তে চলি, আর আজ তো তুমি সঙ্গে আছ। বিয়ে করায় বড্ড খরচ। দু'-চার পয়সাও যদি এভাবে পুষিয়ে না নেওয়া যায় তা'হলে কি ক'রে চলে বল।'

রেণু ভেবেছিল, অমূল্য বুঝি পরিহাস করছে। কিন্তু ফেরবার পথেও অমূল্য যখন কনডাক্‌টরকে দেখে গম্ভীর মুখে একবার মাথা কাত ক'রে রেণুর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করল, তখন রেণুর বুকের ভিতর ঢিপ-ঢিপ করছে। রক্ষা যে, সেই আগের কন্‌ডাক্‌টরটা নয়। এবার সে তাহ'লে অমূল্যর কাছ থেকে টিকিটের পয়সা আদায় ক'রে তবে ছাড়ত। ছি ছি ছি! এক গাড়ি লোকের সামনে কি ক'রে তাদের মান থাকত, কি ক'রে মুখ দেখাত তারা !

গাড়ি থেকে নেমে রেণু বলেছিল,' ছি, এ-সব আমি মোটেই পছন্দ করিনে।'

অমূল্য বলেছিল, 'কি সব ?'

'এই টিকিট না কেটে ট্রামে-বাসে চলা, ছি !'

অমূল্য হেসেছিল, 'ও, গম্ভীর ভাবে তুমি বুঝি সেই কথাই ভাবছ ? আচ্ছা শুচিবায়ুগ্রস্ত মেয়ে তো তুমি ! বুঝতে পারছি, তুমি আমাকে ভোগাবে। হিস্টিরিয়া-টিস্টিরিয়া নেই তো আবার।'

'তার মানে ?'

'তার মানে, এ-সব মেয়েদের তাও থাকে।'

রেণু বলেছিল, 'ছি, সামান্য দু' আনা পয়সার জন্যে—'

অমূল্য বাধা দিয়ে জবাব দিয়েছিল, 'দু' আনা নয়, দু' আনা চার আনা, দিব্যি এক প্যাকেট সিগারেট হবে।'

'চাইলে না কেন, সিগারেটের পয়সা আমি তোমাকে দিতুম।'

এর ক'দিন পরে অমূল্য দামী একখানা চিরুনি নিয়ে এসে উপস্থিত।

'দেখ তো, কেমন চিরুনিখানা !'

রেণু সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে চিরুনিখানা নিয়ে বলল, 'বাঃ, চমৎকার তো ! কত দাম ?'

অমূল্য বলল, 'আড়াই টাকা।'

রেণুর মুখ ম্লান হয়ে গেল, 'ছি, এত দাম দিয়ে কেন আনতে গেলে বলো দেখি, চিরুনির তো আমার অভাব নেই, এই সেদিন বৌভাতেই তো তিনখানা চিরুনি পেয়েছি। যা-ই বলো, এ সব বাজে বাবুগিরি আমার মোটেই পছন্দ হয় না, যা দিন-কাল, তাতে এভাবে পয়সা নষ্ট করবার মানে হয় ?'

অমূল্য আত্মপ্রসাদে হেসে বলল, 'পাগল হয়েছ ! গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে বাবুগিরি করতে যাব, অত পয়সা পাল ব্রাদার্স দেয় না।'

রেণু বলল, 'ও, কোম্পানি বুঝি নিজেদের লোক ব'লে খুব সস্তায় দিয়েছে ?'

অমূল্য হেসে বলল, 'কেবল সস্তায় নয় গো, একেবারে বিনামূল্যে। জানো কিনা, আনকোরা নতুন বৌ এসেছে ঘরে।'

রেণু সলজ্জে বলল, 'যাও, কি যে বল ! মুখের তোমার কোনো আগল নেই। সত্যি, আড়াই টাকার জিনিস কত দামে পেলে বল না, আমার বৌদির জন্যে একখানা আনাব।'

অমূল্য অকস্মাৎ চ'টে উঠল, 'হয়েছে। আর ন্যাকামি কর না, মেয়েদের ন্যাকামি কখনো ভালো

লাগে, তাই ব'লে কি সব সময়েই সহ্য হয়?'

'তার মানে?'

'তার মানে, পয়সা লাগেনি, হাত সাফাইতে এসেছে। তা তোমার জন্যে পারি ব'লে তোমার বৌদির জন্যেও পারতে হবে এমন কী কথা আছে।'

কিছুক্ষণ গুম্ হয়ে থেকে রেণু বলেছিল, 'ও চিরুনিতে আমার কাজ নেই। ওটা তুমি কালই ফেরৎ দিয়ে এসো, ছি!'

'অমনি রাগ হয়ে গেল বুঝি! আচ্ছা, আচ্ছা, তোমার বৌদির জন্যেও একখানা হবে। হাজার হ'লেও, শালাজ তো!'

কিন্তু বহুক্ষণের মধ্যে রেণু আর কথা বলেনি।

আজও রেণু চুপ ক'রে রইল। কোনো ভদ্রলোকের ছেলে যে এ-সব করতে পারে, তা যেন ধারণায় আনা যায় না। গরিব তো তার বাপ-ভাইও। কিন্তু পরম শত্রুও কি কোনদিন বলতে পারবে যে, পরের কোনো জিনিস লুকিয়ে আনা তো দূরের কথা, হাত দিয়ে ছুঁয়ে পর্যন্ত তারা দেখেছে?

নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে কান্না পায় রেণুর। শেষ পর্যন্ত এমন লোকের হাতেই পড়তে হ'লো তাকে! আর শুধু হাতে পড়া নয়, আজীবন এই লোকটির সঙ্গেই তাকে বাস করতে হবে,—হাসতে হবে, আদর-সোহাগ করতে হবে। তারপর ছেলে হবে, মেয়ে হবে, কিন্তু কিছুতেই অমূল্যব প্রবৃত্তি আর বদলাবে না। কেন না, এ সব অভ্যাস মানুষেব যায় না, বয়স হ'লেও না, পয়সা হ'লেও না,—রেণু অনেক শুনেছে, অনেক দেখেছে। তারপর সব একাকার হয়ে যাবে; কেউ জানবে না রেণু অন্য প্রকৃতির মেয়ে, এ-সব সে সহ্য করতেই পারে না। কেউ কি এ কথা বিশ্বাস করবে? সবাই জানবে অমূল্য যেমন ছিঁচকে চোর, রেণু তেমনি চোরের বৌ।

অন্ধকারে স্বামীর ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনেব মধ্যে ঘৃণায় রেণুর যেন সর্বাঙ্গ কুঞ্চিত হয়ে এলো। এমন একটি লোক তাকে জড়িয়ে ধরেছে যার মন ছোট, প্রবৃত্তি ছোট, পরের দোকান থেকে জিনিস চুরি ক'রে আনতে যাব কোনো লজ্জা-ঘৃণার বালাই নেই।

অমূল্যর চুম্বনের প্রত্যুত্তরে রেণু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'আমার একটা কথা শুনবে?'

'কি?'

রেণু বলল, 'ও-ভাবে জিনিসপত্র আর এনো না। সত্যি বলছি, ও-সব আমার কিচ্ছু দরকার নেই, আমি আর কিচ্ছু চাইনে; কেবল তুমি ভালো হও, ভদ্র হও। দশ জনে যদি তোমাকে ভদ্রলোক ব'লে জানে, তাহ'লেই আমার তৃপ্তি।'

এবার স্তব্ধ হবাব পালা অমূল্যার। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ধীরে ধীরে সে পাশ ফিরলো। এই নীতি-শিক্ষাব দক্ষিণা রেণুকে পুরোপুরি ভাবে না দিয়ে তাব শান্তি নেই।

রেণু বলল, 'ও কি, রাগ করলে না কি? তোমার ভালোর জন্যেই বলছি।'

অমূল্য জবাব দিল, 'আমিও ভালোর জন্যেই বলছি। চুপ ক'রে ঘুমোও।'

পরদিন ভোরে উঠে অমূল্য স্ত্রীকে কাছে ডাকল, 'এই, শোন।'

রেণু কাছে এসে বলল, 'কি?'

অমূল্য ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, 'ওপবের বিনোদবাবুদের ঘরে কাল নতুন কতকগুলি কাঁসার বাটি এসেছে, না?'

রেণু অবাক্ হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাতে তোমার কি?'

'বিনোদবাবুর বৌয়ের সঙ্গে তো তোমার খুব ভাব। ও-ঘরে তো তোমার অবাধ গতিবিধি।'

'হ্যাঁ, মাসীমা ভারি ভালোবাসেন আমাকে। আর তাঁব ছোট ছেলে তো আমার হাতে ছাড়া খেতেই চায় না।'

অমূল্য তেমনি ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, 'তবে তো আরো সুবিধে। দুধ খাওয়ানো হয়ে গেলে কাপড়ের তলায় ক'রে বাটিটা অনায়াসে তুলে আনতে পারবে।'

রাগে ও দুঃখে মুখ দিয়ে রেণুর কিছুক্ষণ কথা সরলো না। একটু পরে সে বলল, 'কী যা তা বলছ, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার ?'

অমূল্য অম্লান মুখে বলল, 'মোটেই না, কাঁসার আজকাল সের কত ক'রে জানো ? দু'-তিনটে বাটি যদি সরাতে পারো তাহ'লে দু'দিন বক্‌সে ব'সে দু'জনে বেশ থিয়েটার দেখে আসতে পারব।' অমূল্য হাসল।

রেণু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'যেমন মানুষ, তেমনি তার ঠাট্টা। ও-সব ঠাট্টা আমি মোটেই সহ্য করতে পারি না।'

অমূল্য বলল, 'ঠাট্টা নয়, সত্যিই বলছিলাম।'

দুপুরবেলায় মাসীমার কোলের ছেলেকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে অকারণে রেণুর হাত কাঁপতে লাগল। কি সাংঘাতিক মানুষ অমূল্য, কি বিশ্রী ঠাট্টাই সে করতে পারে।

কয়েক দিন পরে। বেলা সাড়ে সাতটা বাজে, তবু অমূল্যর বিছানা থেকে ওঠবার নাম নেই। অন্য দিন চা-টা খেয়ে এর মধ্যে অমূল্য বেরিয়ে পড়ে। দোকানে আটটা থেকে তার ডিউটি।

রেণু কাছে এসে অমূল্যর মুখের ওপর থেকে লেপটা সরিয়ে নিয়ে বলল, 'কি মশাই, খুব যে ঘুমোন হচ্ছে ? বেলা হয় না আজ ?'

অমূল্য অদ্ভুত একটু হাসল, 'আজ আর বেলা হবে না।'

স্বামীর হাসি আর কথার ভঙ্গিতে কেমন যেন বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল রেণুর, বলল, 'কেন, দোকান আজ বন্ধ না কি ? কি উপলক্ষে বল দেখি ?'

অমূল্য চ'টে উঠে বলল, 'ন্যাকা ! কি উপলক্ষে ! উপলক্ষ আবার কি, উপলক্ষ আমার শ্রাদ্ধ।'

বলতে বলতে অমূল্য আবার পাশ ফিরতে চেষ্টা করল।

রেণু একমুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এমন যে হবে আমি আগেই জানতুম।'

অমূল্যর আর পাশ ফেরা হল না, 'কি, কি বললে ?'

রেণু বলল, 'বলবার আর আছে কি, তবু ভাগ্যি যে, পুলিসে দেয়নি, অমনিই ছেড়ে দিয়েছে।'

অমূল্য বলল, 'উঃ, কি আপসোসের কথা ! কিন্তু এর চেয়ে বোধ হয় পুলিসের হাতে যাওয়াই ভালো ছিল। আমি জেল খাটতুম আর তুমি ততদিন সাধুসঙ্গ ক'রে একটু মুখ বদ্‌লে নিতে পারতে !'

কিছুক্ষণ বাদে মনে মনে কি মতলব ঠিক ক'রে অমূল্য উঠে পড়ল। হাতমুখ ধুয়ে ফিরে এসে দেখে রেণু দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ব'সে আছে।

অমূল্য কাছে এসে বলল, 'একি, এমন ক'রে ব'সে রয়েছ যে। হল কি তোমার ?'

কিন্তু রেণুর কাছ থেকে কোনো সাড়া এল না।

অমূল্য বলল, 'বা, মুখই তুলবে না ব'লে ঠিক করেছ নাকি ? কিন্তু মুখ দেখাতে লজ্জা তো আমার হবার কথা, তোমার কি ?'

রেণু হঠাৎ মাথা তুলে বলল, 'তোমার প্রাণে কি মায়া-মমতা বলতে কিছু নেই একেবারে ? তুমি কি পাষাণ ?'

অমূল্য পাষাণ নয়। নীরবে আস্তে আস্তে রেণুর চুলের ওপর হাত বুলোতে লাগল।

মিনিট খানেক পরে রেণু মুখ তুলে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কি এমন অপরাধ করেছিলে যে ওরা তোমাকে ছাড়িয়ে দিল ?'

কৈফিয়ৎটা অমূল্যর কাছে নয়, অমূল্যর মনিবদের কাছেই যেন দাবী করছে রেণু। অমূল্য একটু অবাক্ হয়ে গেল। বলল, 'অপরাধ আবার কি। বুড়ো ক্যাশিয়ার বেটা পেছনে লেগেছিল। অপরাধ, তার স্ত্রীর জন্যে কেন এক কৌটো পাউডার হাত-সাফাই ক'রে নিয়ে দিতে পারিনি। ম্যানেজারকে গিয়ে লাগিয়েছে আমার বিরুদ্ধে।'

রেণু আজ স্বামীর কথার প্রতি বর্ণ বিশ্বাস ক'রে বলল, 'হুঁ, সাধু যে পৃথিবীতে সকলেই তা জানা আছে।'

দিন কয়েক খুব চাকরি খুঁজল অমূল্য । কিন্তু হয় হয় ক'রে কোনোটাই ঠিক হয়ে উঠল না । বেণু ভরসা দিয়ে বলে, 'অত ভাবো কেন, চাকরির কি অভাব আছে আজকালকার দিনে ? হবেই একদিন ।'

কিন্তু দিন কয়েকের মধ্যেই চাল বাড়ন্ত হয়ে পড়ল । শুধু চাল নয়, তেল নুন ডাল বলতে কিছুই নেই ।

অমূল্য মাথায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ ভাবল, তারপর বলল, 'এক কাজ করা যায়, কিন্তু তুমি কিছু মনে করবে না তো ?'

'না, মনে আবার কি করব ?'

'স্নো আর সাবানের বাক্সগুলো দাও । জানা লোক আছে, উচিত দামেই দিয়ে দিতে পারব ।'

বেণুর মুখখানা হঠাৎ যেন কালো হয়ে উঠল । তারপর বলল 'আচ্ছা নাও । কিন্তু এভাবেই তো আর দিন চলবে না ।'

অমূল্য বলল 'সে তো নিশ্চয়ই । অন্য ব্যবস্থাও করতে হবে ।

দু' তিন দিন পরে দেখা গেল, অমূল্য কোত্থেকে একটা দামী ফাউন্টেন পেন নিয়ে এসেছে ।

বেণু একবার পেনটার দিকে তাকাল, আর একবার স্বামীর দিকে তাকাল । অমূল্য প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা করতে লাগল এই বুঝি বেণু তীব্র কণ্ঠে তিরস্কার ক'রে উঠবে । কিন্তু আশ্চর্য, বেণু ও সম্বন্ধে কোনো কথাই বলল না । যেন কোনো নতুন কিছু ঘটেনি, তেমনি সহজ নিশ্চিন্তভাবে ঘর ঝাঁট দিতে লাগল ।

মাঝখানে [illegible] স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'নারকেল তেল কিন্তু একেবারে নেই ।'

অমূল্য বলল 'আচ্ছা ।

সন্ধ্যার দিকে পেনটা আর দেখা গেল না । তার বদলে চাল ডাল তেল কয়লায় ঘর ভ'রে গেল । সুগন্ধ নারকেল তেল এল এক শিশি ।

বেণু এবারও কোনো কথা না ব'লে জিনিসগুলো গুছিয়ে তুলছে, অমূল্য বলল, 'দাঁড়াও, আর একটা জিনিস আছে তোমার জন্যে ।'

বেণু বলল, 'কি ?'

অমূল্য পকেট থেকে একটা ওটিন স্নো বের ক'রে বেণুর হাতে দিয়ে বলল, 'পাল ব্রাদার্স থেকে একেবারে নগদ পয়সা দিয়ে কেনা । বুড়ো বিষ্টুবাবুর নাকের সামনে পাঁচ টাকার নোটখানা বাড়িয়ে দিয়ে বললুম, চেঞ্জ প্লিজ । একটু তাড়া আছে বাইরে ।'

বেণু হেসে বলল, 'এতও জানো তুমি আর এতও তোমার মনে থাকে ।'

রাত্রির অন্ধকারে স্বামীর রোমশ বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে বেণু আস্তে আস্তে বলল, 'যাই বলো, আমার কিন্তু গা কাঁপছে এখনো । এত সাহস কি ভালো ?'

বেণুর খোঁপার ওপর সাদরে আস্তে একটু চাপ দিয়ে অমূল্য বলল, 'সাহস ভালো নয় ? সাহস না থাকলে এতদিন উপোস ক'রে মরতে হ'ত । তোমার মত ভীরু হ'লেই হয়েছিল আর কি । আস্ত একটি অকর্মার ধাড়ী । তোমার মত অমন সুবিধা-সুযোগ যদি আমার থাকত ।'

অভিমানে কথা ফুটল না বেণুর, ঠোঁট ফুলে উঠতে লাগল বার বার । এর জবাব বেণু স্বামীকে একদিন না একদিন না দিয়ে ছাড়বে না ।

দু'-তিন দিন বাদে । সুযোগ তো এসেছে, কিন্তু বেণুর হাত কাঁপে আর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে থাকে । দেয়ালের এক কোণে পেরেকে বিনোদবাবুর হাত-ঘড়িটা ঝুলানো রয়েছে । এমন প্রায়ই থাকে । ভারি ভুলো মন বিনোদবাবুর । যেদিন আপিসের বেলা বেশি হয়ে যায়, সেদিন আর কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না । কোনদিন বা ঘড়ি ফেলে যান, কোনদিন মনিব্যাগ ।

খাটের ওপর লেপ মুড়ি দিয়ে মাসীমা অচেতন ভাবে ঘুমোচ্ছেন । তাঁর কোলের ছেলেকে দুধ খাইয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল বেণু । নিস্তব্ধ ঘর, ঘড়ির শব্দ এখান থেকেই

যেন শোনা যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, অতটুকু হাতঘড়িতে কি এত শব্দ হয় ? না, এ তার নিজেরই হৃৎপিণ্ডের শব্দ। একবার বেণু চেষ্টা করল ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে। কিন্তু অসম্ভব। এখান থেকে তার নড়বার সাধ্য নেই, পা আটকে গেছে মাটিতে। আর ওই হাতঘড়িটার ছোট ছোট কাঁটা দুটো তার দু'চোখের তারাকে বিদ্ধ ক'রে রেখেছে।

কিন্তু যদি ধরা পড়ে, যদি খোঁজ পড়ে ঘড়ির ? তার বেণু কী জানে! এই ছ'মাস ধ'রে বিনোদবাবুদের ঘরে সে আসে যায়, গল্প করে, একগাছা কুটো পর্যন্ত নড়চড় হয়েছে কেউ বলতে পারবে ?

বেণু যখন কোনো রকমে নিজের ঘরে এসে পৌঁছল, তখন অদ্ভুত উত্তেজনায় তার মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বুক কাঁপছে, নিশ্বাস পড়ছে ঘন ঘন। এমন আনন্দের স্বাদ অভূতপূর্ব। আর একবার ছোট্ট ঘড়িটা আঙুল দিয়ে স্পর্শ ক'রে দেখল বেণু। পুরুষের প্রথম স্পর্শও কি এত তীব্র, এমন রোমাঞ্চকর ?

সন্ধ্যার পর অমূল্য ম্লান মুখে ঘরে ফিরে এলো। আজ আর কোনো সুবিধা হয়নি। হঠাৎ বেণুর দিকে চেয়ে অমূল্য অবাক হয়ে গেল।

কি ব্যাপার, আজ যে একটু বিশেষ সাজের ঘটা দেখছি ?'

দরজায় খিল দিয়ে এসে বেণু স্বামীর সঙ্গে প্রায় মিশে গিয়ে স্নিগ্ধ-মধুর কণ্ঠে বলল, 'অত হিংসা কেন, সাজ তোমারো আজ মন্দ হবে না। যদিও কেবল এই রাত্রিটুকুর জন্যে। কিন্তু একটা রাত্রিই কি কম ?

অমূল্য ঈষৎ বিরক্ত কণ্ঠে বলল, 'কি বলছ, একটু পরিষ্কার ক'রে বল, হেঁয়ালি ভালো লাগে না সব সময়।

বেণু বলল, 'সবুর, সবুর, অত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন। তোমাদের সব-কিছুতেই তাড়াহুড়ো, একটুও ধৈর্য সয় না প্রাণে না ?'

খাওয়া দাওয়ার পরে আলো না নিবিয়েই স্বামীর পাশে এসে শুয়ে পড়ল বেণু।

অমূল্য অবাক হয়ে বলল, আলোটা কি সারা রাত জ্বালাই থাকবে আজ ?'

বেণু মুচকি হেসে বলল, 'থাকলেই বা, ক্ষতি কি তাতে ? না গো না, সারা রাত জ্বালা থাকবে না, একটু পরেই নিববে। দেখি, দেখি, বাঁ হাতখানা বার কর দেখি।'

'বাঁ হাত দিয়ে আবার কি করবে ?

'একটু দরকার আছে।

ব্লাউজের ভিতর থেকে আস্তে আস্তে ব্যাণ্ডসুদ্ধ ছোট্ট ঘড়িটুকু বের ক'রে বেণু স্বামীর মণিবন্ধে বেঁধে দিয়ে বলল, 'দেখি তো, কেমন মানাচ্ছে ?'

অমূল্য মুহূর্তকাল অবাক হয়ে থেকে শুষ্ক কণ্ঠে বলল, 'কি সর্বনাশ! এ তুমি কোথায় পেলে ?'

বেণু গভীর রহস্যলোক থেকে যেন মৃদু একটু হাসল, বলল, 'তা দিয়ে তোমার দরকার কি, মানাচ্ছে কি না তাই বলো।'

তারপর হঠাৎ উঠে গিয়ে লাইটটা অফ ক'রে এসে বেণু স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরল। আজ তার কোনো কুণ্ঠা নেই, লজ্জা নেই, দীনতা নেই। আজ সে পৃথিবী জয় ক'রে ফিরেছে।

'কি গো, কথা বলছ না যে! বলো না, ঠিক মানিয়েছে কি না ?'

মানাবারই তো কথা। আজ বেণু তার যথার্থ সহধর্মিণী। এতদিন ধ'রে এই তো অমূল্য প্রত্যাশা ক'রে এসেছে। আজ তার উল্লসিত হয়ে ওঠবার দিন। কিন্তু স্ত্রীর কোমল বাহুবেষ্টনের মধ্যে অমূল্য যেন কাঠ হয়ে রইল। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য, সমস্ত মাধুর্য যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর যে চির-পরিচিত দু'খানি হাত তার কণ্ঠ জড়িয়ে রয়েছে তা কোনো সুন্দরী তরুণীর কঙ্কণ-ক্বণিত মৃণালভুজ নয়—তাও আজ শ্রীহীন, কলঙ্কিত।

মাঘ ১৩৫১

চাঁদ মিঞা

ট্রামের মধ্যে দাঁড়াবার জাযগা ছিল না। নানা কসবতের পব দুই বন্ধুতে কোন রকমে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছিলাম। আব আমাদের খুব কাছেই আব একজন তরুণ ভদ্রলোক তাঁর সহযাত্রিণীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প কবছিলেন এবং সিগারেট টানছিলেন। সমস্ত লেডিজ সীটগুলি ভরতি। অন্যান্য যাত্রীরা মেয়েটিকে আসন ছেড়ে দিয়ে বার কয়েক শিষ্টাচার দেখিয়েছেন কিন্তু তরুণীটি সহাস্যে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কিছুতেই বসতে রাজী হন নি। ঠিক তেমনি তাঁর সহযাত্রীটির ধূমপানে ও আকারে ইঙ্গিতে অনেকেই আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু ভদ্রলোককে কিছুতেই নিবৃত্ত করা যায় নি। তিনি বেশ সতর্কতাব সঙ্গেই কখনো বা গাড়িব মধ্যে কখনো বা বাইরে সিগারেটের ছাই ফেলছিলেন। হঠাৎ মেয়েটির কি একটা কথায় তিনি স্থানকাল ভুলে হো হো ক'রে হেসে উঠলেন আর সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা সিগারেটেব ছাই আমাব ব্যাপারের ওপর দিলেন ছিটিয়ে।

রুক্ষ কণ্ঠে প্রায় চেঁচাবার মত ক'বে বললুম 'এটা কি হল?'

দুজনেই চমকে উঠে আমাব দিকে তাকালেন। যুবকটি অপ্রতিভ কণ্ঠে বললেন, 'সরি।'

বন্ধু মসিয়ব রুখে উঠে কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু মেয়েটি তাকে কিছু বলবারই সুযোগ দিলেন না, তাড়াতাড়ি রুমাল বের ক'রে সিগারেটের ছাইগুলি আমার ব্যাপার থেকে ঝেড়ে দিতে দিতে অত্যন্ত লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, 'কিছু মনে ক'রবেন না।'

এরপর কিছু আর মনে ক'রবার জো ছিল না। কিন্তু যুবকটি দেখলাম ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন। বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে আমার দিকে একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'কিছু মনে ক'রবেন না, আপনি বরং তার চেয়ে প্রতিশোধ নিন।'

মেয়েটিব মৃদু কণ্ঠ শোনা গেল, 'আঃ থাম, কি হ'চ্ছে।'

ট্রাম থেকে নেমে মসিয়র বলল, 'তুমি একেবারেই ভ্যাবা গঙ্গারাম। লোকটিকে আচ্ছা ক'রে শুনিয়ে দিতে পাবলে না যে মশাই আমার সিগারেটেব ছাই গায়ে মেখে আপনাব কি কিছু লাভ হবে? আমার কিছু লাভ হবে? আমার সঙ্গে কাঠখোট্টা এক বন্ধুই রয়েছে অমন কোমল হৃদয় সুন্দরী কোনো বান্ধবী তো নেই?'

হেসে বললুম, 'তা নাই বা থাকল। তাঁর সঙ্গে যিনি ছিলেন ছাই ঝাড়বার পক্ষে তিনি একাই কি যথেষ্ট ছিলেন না?'

মসিয়র গম্ভীর হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'সে কথা ঠিক। পুরুষের ঈর্ষা বহু বিচিত্র।' তারপব একটু হেসে বলল, 'তুমি আজ বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছ। মেয়েদের সহানুভূতিও কম সাংঘাতিক নয়।'

খানিকটা হাঁটতেই একটা চায়ের দোকান পাওয়া গেল। সেখানেও ভিড়। তবু তারই মধ্যে অপেক্ষাকৃত একটু নিরিবিলি কোণ বেছে নিয়ে দুজনে বসলুম। একটা কাটলেটের খণ্ড কাঁটায় ফুঁড়ে মুখে তুলতে তুলতে মসিয়র বলল, 'আজকের এই ছোট ঘটনায় আমার অনেককাল আগের একটি কাহিনীর কথা মনে পড়ছে।'

বললুম, 'ব্যক্তিগত নাকি?'

মসিয়র বলল, 'না, ঠিক ব্যক্তিগত নয়, তবে প্রায় পরিবারগত বলতে পার। কাহিনীর নায়ক নশরৎ আলী ছিলেন আমার বাবারই আপন চাচা। সেই হিসাবে তাঁর ঘরের গুপ্ত কথা প্রকাশ করা আমার পক্ষে সমীচীন নয়। কিন্তু কথাটা কিছুতেই গোপন ছিল না। স্বয়ং নশরৎ আলী আর তাঁর উত্তরপুরুষদেব চেষ্টাতেও নয়। বেশ মনে আছে, আমাদের অঞ্চলে ছেলেবেলায় এ নিয়ে ছড়া গান পর্যন্ত লোককে বাঁধতে শুনেছি।'

মীবপুব এবং আশেপাশেব পাঁচ-সাতখানা গাঁযেব জমিদাব ছিলেন নশবৎ আলী মৃধা। লোক লস্কব, পাইক পেযাদা কিছুবই অভাব ছিল না। অভাব ছিল কেবল সন্তানেব। পীবেব দবগায সিন্নি দিযে, ফকিব দববেশেব কাছ থেকে নানা বকম গাছ গাছডা তাবিজ কবচ জডো কবেও ছেলে তো ভালো, একটি কানা মেযেব মুখ পযন্ত মৃধা সাহেব দেখতে পাবেন নি। কিন্তু অদ্ভুত তাঁব জেদ। বলতেন খোদাব সঙ্গে আমাব জেহাদ। ছেলে যতদিন না হবে ততদিন কেবল বিবিব পব বিবি এনে ঘব ভ'বে ফেলব দেখি ছেলে না হযে যায কোথায। আমি জানি, আমাব নিজেব কোন দোষ নেই, ছেলে যে হয না তা কেবল এই বিবিদেব দোষ।

প্রায ষাটেব কাছাকাছি যখন তাঁব বযস তখন কেবল গুটিচাবেক বিবি তাঁব ঘবে ছিলেন এবং আব গুটি চাব পাঁচ ম'বে নিষ্কৃতি পেযেছিলেন।

তাব কিছুকাল আগে থেকেই শুধু ফকিব দববেশেব কেবামতিতেই নয, খোদাব অস্তিত্বেব ওপবও মৃধা সাহেব আস্থা হাবিযে ফেলেছিলেন। মোল্লা মুনসীদেব দেখতে পাবতেন না, বাডি থেকে কোবাণ সবিফ দ ক'বে ফেলেছিলেন বোজা নামাজ পযন্ত পালন কবতেন না।

মানুষজনেব চেযে পশু পক্ষীব ওপবই প্রীতি যেন তাঁব কিছু বেশি পবিমাণে ছিল। বিচিত্র বকমেব বিচিত্র বঙেব পাখী পুষতেন আব ছিল ঘোডা। হবিহবছত্রেব মেলায নিজে যেতেন ঘোডা কিনতে। বেছে বেছে নানা আকাবেব নানা বঙেব ঘোডা আনতেন। ঘোডাব বঙেব সঙ্গে বঙ মিলিযে বাখতেন সহিসদেব, ঘোডাব নামেব সঙ্গে নাম মিলিযে বাখতেন তাদেব নাম।

নশবৎ আলীব মস্ত বড বাডিব পাশেই ছিল মস্ত বড মাঠ। তাব অর্ধেকটা জুডে পৌষ মাস থেকে ঘোডদৌড সুরু হত শযে শ'যে ঘোডা আসত। আব হাজাবে হাজাবে লোক। প্রত্যেক ঘোডাওযালাকে নশবৎ আলী কলস দিযে সম্মান দেখাতেন আব তাব সওযাবদেব দিতেন দামী শাল।

একদিন নশবৎ আলীব কানে গেল তিন চাবখানা গাঁ পশ্চিমে নূবগঞ্জে আতাজদ্দি মিঞাব নাকি এক চমৎকাব ঘোডা আছে। তেমন ঘোডা ধাবেকাছে আব কাবো নেই। সে ঘোডা সে ঘোডদৌডেব মেলায আনে না পাছে নশবৎ আলী তা কেডে নেন। শুনে নশবৎ আলী হাসলেন, তাবপব ভাবলেন তিনি নিজেই যাবেন সেই ঘোডা দেখতে আব ঘোডাওযালাকে আশ্বাস আব অভয দিযে আসতে। নিজেব অদ্ভুত সব খেযালেব কাছে মান সম্ভ্রম পযন্ত তাঁব তুচ্ছ হযে গিযেছিল। আত্মীয পবিজন কাবো নিষেধ না শুনে তিনি নিজেই চললেন একদিন সেই ঘোডাব সন্ধানে। আস্তাবল থেকে সব চেযে ভালো ঘোডাটা বেছে নিযে চ'ডে বসলেন তাব পিঠে। বাবণ সত্ত্বেও কেউ কেউ দূবে দূবে থেকে তাঁব অনুসবণ কবতে লাগল। পীবকান্দায এসে একটা পানাভবা পুকুব দেখে তাঁব ঘোডা ছুটে গেল মবিযা হযে। মৃদু হেসে নশবৎ আলী বাশ ছেডে দিলেন।

ঘোডাব জল খাওযা দেখতে দেখতে হঠাৎ তাঁব চোখ পডল পুকুবেব ওপাবে একটা কুঁডেব দিকে। বাডিব বাইবেব দিকে দোচালা একটা শনেব ঘব, কোন দিকে কোন বেডাব বালাই নেই। তাব মধ্যে একটি মেযে হাঁটু গেডে নামাজ পডছিল। গাছেব গোডায ঘোডা বেঁধে বেখে মৃধা সাহেব নিঃশব্দে সেই ভাঙা দোচালাব দিকে এগিযে গেলেন। তাবপব অপলক দৃষ্টিতে চেযে চেযে দেখতে লাগলেন সেই নামাজ—আঠেব উনিশ বছবেব একটি তন্বী মেযেব অপরূপ আত্মনিবেদন।

নামাজ পডা শেষ হ'লে পিছন ফিবে মেযেটি তাঁকে দেখতে পেযে যেন চমকে উঠল, তাবপব একটা অস্ফুট আর্তনাদেব সঙ্গে মেযেটি একেবাবে বাডিব মধ্যে গিযে পালাল।

তাব ভয দেখে মৃধা সাহেব হাসলেন, তাবপব আস্তে আস্তে তিনিও এগুলেন বাডিব ভিতবে। এ বাডি তাব অপবিচিত নয। আইনুদ্দিন ফকিবেব বাডি। তাঁব মনে পডল অনেককাল আগে গাছগাছডাব খোঁজে আইনুদ্দিনেব কাছে তিনি গোপনে নিজে এসেছিলেন। গাছডা নশবৎ আলী পেযেছিলেন কিন্তু ফল কিছু পাননি।

এতকাল বাদে নশবৎ আলীকে নিজেব বাডিব দোবে দেখতে পেযে আইনুদ্দিন বিস্মিতও হ'ল, ভীতও হ'ল, বলল, 'আজ্ঞে হুজুব, আপনি নিজে কেন এত কষ্ট কবলেন, দববাব থাকলে লোক লস্কব পাঠিযে আমাকে তলব ক'বলেই তো হ'ত।'

নশরবৎ আলী মাথা নাড়লেন, 'না লোক লস্করে তা হ'ত না। এই মাত্র যে মেয়েটি গিয়ে ঘরে ঢুকল সে কি তোমার?'

ফকির সন্ত্রস্ত হ'য়ে বলল, 'আজ্ঞে হাঁ হুজুর।'

নশরবৎ আলী বললেন, 'দেখ, বহুকাল আমার খোদার ওপর কোন আস্থা ছিল না, আজ তোমার মেয়েকে দেখে ফের আবার সেই আস্থা ফিরে এসেছে। ওর নামাজপড়া দেখে আমার ভারি সাধ হচ্ছে ওর পাশে দাঁড়িয়ে আমিও খোদার নাম ক'রে নামাজ পড়ি।'

আইনুদ্দিন ফকির বিব্রত ভীত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু হুজুর, আমার মেয়ে রাবেয়া যে বড় দুর্ভাগিনী। এক সপ্তাহও হয়নি অমন জোয়ান স্বামীকে সে হারিয়েছে। দিনরাত অভাগীর চোখের জলে কাটছে।'

নশরবৎ আলী বললেন, 'ভয় কি, তার চোখের জল মোছাবার ভার আমি নিলুম।'

কিন্তু তবু আইনুদ্দিনের ভয় ভাঙল না। দিনে অসংখ্যবার নশরবৎ আলীর লোক লস্কর এসে হানা দিতে লাগল।

রাবেয়া বলল, 'বা-জান, আমি মন ঠিক ক'রে ফেলেছি। তুমি মৃধা সাহেবকে বল যে আমি রাজী আছি।'

আইনুদ্দিন আর তার স্ত্রী চোখের জল ফেলে বলল, পাগলী, আমাদের বাঁচার জন্য তুই এমন ক'রে মরণ ডেকে আনতে চাস। তার চেয়ে চল রাতারাতি এমুলুক ছেড়ে আমরা কোথাও চ'লে যাই।

রাবেয়া তার সুন্দর ছোট কপালটুকু দেখিয়ে বলল 'কিন্তু এ তো আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাবে।'

নশরবৎ আলী মিথ্যা কথা বলেন না। চোখের জল মুছবার জন্য সত্যিই তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। সোনাদানায় রাবেয়ার গা ভরে দিলেন, দাসী বাঁদীতে ভরলেন ঘর, কিন্তু তবু রাবেয়ার মন যেমন শূন্য ছিল তেমন শূন্যই রইল, আড়ালে চোখের জলেরও বিরাম রইল না।

অন্যান্য বিবির বেলায় এ সব রোগে নশরবৎ আলী শারীরিক শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু রাবেয়াকে দেখার পর আল্লার দুনিয়াকে তিনি যেন নতুন চোখে দেখতে সুরু করলেন।

একদিন বললেন, 'রাবেয়া, এতকাল ছেলে ছেলে ক'রে পাগল হয়ে বেড়িয়েছি। ভেবেছি স্বামীর কোলে ছেলে ধ'রে দিতে না পারলে স্ত্রীর রূপ বৃথা, তার যৌবন বৃথা, তার মেয়ে জন্মটাই অর্থহীন। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার সে ভুল এতদিনে ভেঙেছে। শুধু তুমিই যথেষ্ট। তুমি যে আছ এই সব চেয়ে বড় লাভ, পুত্রলাভ এর কাছে তুচ্ছাতিতুচ্ছ। তোমার কাছে আলাদা ক'রে আমি কিছু চাই না, ছেলে নয়, মেয়ে নয়, আমি কেবল তোমাকেই চাই।'

রাবেয়াকে নীরব দেখে বললেন, জানি চাইলেই পাওয়া যায় না, এ জিনিস জোর জবরদস্তিতে হওয়ার নয়, এর জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়। কিন্তু অপেক্ষা করবার মত সময় আমার হাতে যে খুব বেশী নেই।'

নশরবৎ আলীর কথা শুনে রাবেয়ার চোখে আবার জলের ধারা নামত। নশরবৎ আলী ক্ষুণ্ণ মনে ভাবতেন দেহে এমন রূপ, কণ্ঠে এমন মাধুর্য, স্পর্শে এমন আবিষ্টতা কিন্তু চোখের জল ছাড়া কি আর কোন ভাষা রাবেয়ার জানা নেই? অমন কাজলকালো দুই চোখ কি চিরকাল কেবল জলে ভ'রে থাকবে?

হাইকোর্টে কি একটা বাটোয়ারার মামলায় হেরে নশরবৎ আলী সেদিন কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ব'সেছিলেন। সেজো বিবি মেহেরজান এসে চটুল ভঙ্গিতে বলল, 'সুখবর এনেছি, কি পুরস্কার দেবে বল।'

নশরবৎ আলী ভ্রূ কুঁচকে তার দিকে তাকালেন। মেহেরজান একটুও ভয় পেল না, তেমনি সহাস্যে বলল, 'তোমার ছোট বিবির মন বেহেস্ত থেকে একেবারে ধূলামাটির দুনিয়ায় নেমে এসেছে। দরিয়ার সওয়ার চাঁদ মিঞাকে দরিয়া একটা ছাঁট দিয়ে ফেলে দিয়েছিল--ছোট বিবি জানালা দিয়ে দেখতে পেয়ে আহা হা ক'রে উঠেছেন। তারপর চাঁদ মিঞার হাঁটু ছ'ড়ে আর মচকে গেছে শুনে ছোট

বিবি নিজ হাতে তার জন্য চুন-হলুদ গরম ক'রে পাঠিয়েছেন।'
নশরৎ আলী বললেন, 'কেবল এই ? এও তো সেই দয়ার কথা, সেই পুরনো চোখের জলের কথা। বলি রাবেয়াকে কেউ হাসাতে পেরেছে ?'
মেহেরজান বলল, 'কেন পারবে না ? চাঁদ মিঞা তোমার রাবেয়াকে হাসিয়েছেও। দানাপানি নিয়ে ঘোড়াকে যখন চাঁদ মিঞা কেবল সাধাসাধি করছিল আর তোমার সাধের দরিয়া বার বার মান ক'রে মুখ সরিয়ে নিচ্ছিল আমি স্পষ্ট দেখেছি ছোট বিবিও মুখ মুচকে মুচকে হাসছে।'
নশরৎ আলী বললেন, 'হ্যাঁ এ খবরের পর পুরস্কার তুমি পেতে পার।' বলে হাতের সব চেয়ে দামী আংটি খুলে তিনি মেহেরজানকে দিতে গেলেন।
মেহেরজান পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'বাঁদীর কসুর মাপ করবেন হুজুর। ও আংটি পরবার যোগ্য আঙুল আমার হাতে নেই। তা কেবল ছোট বিবির হাতে আছে আর আছে চাঁদ মিঞার হাতে।'
কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। চাঁদ মিঞার মত সুপুরুষ সহিস সওয়ারদের মধ্যে তো দূরের কথা, বড় বংশেও খুব কম মেলে, অনেক চেষ্টায় অনেক খুঁজে পেতে নশরৎ আলী তাঁর সবচেয়ে পেয়ারের দুধবরণ ঘোড়ার জন্য অমন সোনারবরণ সওয়ার সংগ্রহ করেছেন। অমন সুন্দর ঘোড়ার উপর যদি কালো কুশ্রী যেমন তেমন একটা সওয়ার উঠে বসত তা হ'লে কি মান থাকত নশরৎ আলীর, না তার রুচিরই প্রশংসা করত ? দৌড়ের সময় মাঠের হাজার হাজার লোক যে দিশেহারা হয়ে ভাবে, ঘোড়া দেখবে, না তার ওপরের সওয়ার দেখবে এ তো নশরৎ আলীরই কৃতিত্ব, তাঁরই গর্বের বস্তু।
তবু ভালো যে তাঁর বাড়ির একটা জিনিস অন্তত রাবেয়ার চোখে ভালো লেগেছে। হীরা নয়, জহরৎ নয়, হরিণ নয়, ময়ূর নয়, রাবেয়ার ভালো লেগেছে নশরৎ আলীর সবচেয়ে পেয়ারের আর সবচেয়ে খুবসুরৎ সওয়ার চাঁদ মিঞাকে। এতো সুখবরই। তবু মেহেরজানের কথার ধাঁচে কোথায় যেন নশরৎ আলীর একটু বিঁধল। সেটা মেহেরজানের জিভেরই দোষ। এতকাল তো তাকে তিনি দেখে এসেছেন। মেহেরজানের জিভ যেমন বাঁকা, তেমনি ছুঁচালো।
এক সময় চাঁদ মিঞাকে তিনি নিজের কামরায় ডাকিয়ে আনলেন, 'তুমি নাকি ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিলে ?'
চাঁদ মিঞা লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু ক'রে রইল।
নশরৎ আলী সহাস্যে সস্নেহে বললেন, 'ব্যাপার কি মিঞা, তোমার এত পেয়ারের দরিয়া, সে-ই তোমাকে পিঠ থেকে পায়ের নিচে ফেলে দিল ?'
চাঁদ মিঞা অপ্রতিভভাবে একটু হাসল, 'আজ্ঞে হুজুর, ওরা রঙ্গ দেখবার জন্য অমন মাঝে মাঝে করে।'
'রঙ্গ দেখবার জন্য ?'
'আজ্ঞে হাঁ। ফেলে দিয়ে আমার দিকে এমন ক'রে তাকাচ্ছিল যে মনে হ'ল ওর চোখ ফেটে জল আসছে।'
নশরৎ আলী চমকে উঠে বললেন, 'কার, কার চোখ ফেটে জল আসছিল ?'
চাঁদ মিঞা তেমনি বিনীত কণ্ঠে বলল, 'আজ্ঞে হুজুর, দরিয়ার।'
'ও দরিয়ার। যাক গে, তিন দিন বাদে আবার ঘোড়দৌড়ের বন্দোবস্ত করছি। তুমি কি পারবে, না দরিয়ার রঙ্গ আর চোখের জলের লোভে পিঠ থেকে আবারও আছড়ে পড়বে ?'
'আজ্ঞে না হুজুর, তাহ'লে কি আর মান থাকে ?'
'হ্যাঁ, মানের কথা মনে থাকে যেন।'
তা মনে থাকবে চাঁদ মিঞার। রাবেয়ার দিকে তাকাতে গিয়ে ঘোড়া থেকে প'ড়ে তার লজ্জার সীমা ছিল না, রাবেয়া অবশ্য করুণ-ছলছল চোখে অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়েছিল, নিজ হাতে দাওয়াই তৈরি ক'রে পাঠিয়েছিল, কিন্তু অমন হাত থেকে কি কেবল দাওয়াই নিতে ইচ্ছা হয়, অমন চোখে কি কেবল দয়া দেখতে ভাল লাগে ?

নির্দিষ্ট দিনে ঘোড়দৌড়ের আয়োজন পূর্ণ হ'ল। ঘোড়া আর মানুষে পূর্ণ হয়ে গেল মাঠ। নশরৎ

আলীর প্রাসাদের জানালায় বিবিরা এসে দাঁড়ালেন। কুটুম্ব স্বজনরা উঠল ছাদে। সমস্ত মাঠ কল্লোলে কোলাহলে ভ'রে গেল। উৎসুখ দর্শকদের ভারে আশেপাশের গাছগুলি কেবলি দোল খেতে লাগল।

পাল্লার প্রান্ত থেকে কাতারে কাতারে ঘোড়া ছুটল। নশরৎ আলী এক সময় এসে রাবেয়ার পাশে দাঁড়ালেন। আস্তে আস্তে বললেন, 'ঘোড়দৌড় তোমার ভালো লাগছে?'

রাবেয়া মাথা নাড়ল।

নশরৎ আলী বললেন, 'সাদা ঘোড়ার পিঠে চাঁদ মিঞাকে বেশ মানিয়েছে, না?'

রাবেয়া স্বামীর মুখের দিকে তাকাল, তারপর মৃদু একটু হেসে বলল 'মানাবে না? মানাবার জন্যই তুমি তো এমন করেছ। অমন খুবসুরৎ সওয়ারকে তুলে দিয়েছ অমন চমৎকার খুবসুরৎ ঘোড়ায়।'

এক সঙ্গে রাবেয়ার এত কথা, এত মিষ্টি কথা যেন কোন দিন নশরৎ আলী শোনেন নি। প্রসন্ন হাস্যে বললেন, 'জুড়ি মিলাবার আমার হাত আছে বল?

রাবেয়া আবার তার বড় বড় স্নিগ্ধ প্রশান্ত চোখ দুটি তুলে স্বামীর দিকে তাকাল, বলল, 'তা তো আছেই।'

জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ পাশের দেওয়াল আয়নার দিকে চোখ পড়ল নশরৎ আলীর। দেখলেন, দুটি বিস্মিত বিষণ্ণ চোখ মেলে রাবেয়াও সেই আয়নার দিকেই তাকিয়েছে। স্বামীর সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই রাবেয়া তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে মাঠের দিকে তাকাল

আড়চোখে নশরৎ আলী দেখলেন ঠিক সেই মুহূর্তে সমস্ত ঘোড়াগুলিকে পিছনে ফেলে চাঁদ মিঞার ঘোড়া বিদ্যুতের মত পাল্লার আর এক প্রান্তে মিলিয়ে গেল।

সেদিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে নশরৎ আলী আবার নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকালেন, তাকালেন অন্যদিকে মুখ ফেরানো রাবেয়ার দিকে। মনে হল জোড় ঠিক মেলেনি। কিন্তু যদি না মিলে থাকে তাতেই বা কি আসে যায়? আর কেনই বা মেলেনি? মেয়েদের মত পুরুষের রূপ আর যৌবন তো কেবল তার দেহেই নয়, তার সামর্থ্যে তার খ্যাতিতে তার ঐশ্বর্যে,—তা তো নশরৎ আলীর এখনও আছে। কিন্তু আশ্চর্য, তাঁর সম্পদ রাবেয়ার চোখ ঝলসে দেয়নি, রাবেয়ার চোখকে মুগ্ধ করেছে তাঁরই একজন দীনাতিদীন অনুচরের দেহসৌষ্ঠব। এর চেয়ে লজ্জার, এর চেয়ে বিস্ময়ের আর কি হ'তে পারে। নশরৎ আলীর মনে পড়ল তিনিও রাবেয়ার দেহলাবণ্য দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। গুণ নয়, বংশ নয় শুধু রূপ। কিন্তু নশরৎ আলী মুগ্ধ হয়েছিলেন ব'লে কি রাবেয়াও তাই হবে? অমন সুন্দর বিস্ময়কর দুটি চোখ কি কেবল পুরুষের স্থূল দেহসৌষ্ঠবেই আটক থাকবে? আরও গূঢ়, আরও বিস্ময়কর কিছু আবিষ্কার করতে পারবে না?

হঠাৎ তুমুল কলধ্বনিতে নশরৎ আলীর চমক ভাঙল। 'চাঁদ মিঞা জিতেছে, চাঁদ মিঞা জিতেছে।'

নশরৎ আলী অদ্ভুত একটু হাসলেন। তাঁরই ঘোড়া, তাঁরই সওয়ার, তবু জিত চাঁদ মিঞারই। নশরৎ আলীর নামগন্ধ কোথাও নেই।

নশরৎ আলী বললেন, 'শুনেছ, চাঁদ মিঞা জিতেছে। খুশি হয়েছ তো?

রাবেয়া বলল, 'কেন হব না, তুমি হওনি?'

'নিশ্চয়ই।' নশরৎ আলী রাবেয়ার প্রসন্ন মুখের দিকে তাকালেন, তারপর হাতের সেই দামী আংটিটি খুলে বললেন, 'এই নাও।'

রাবেয়া বিস্মিত হয়ে বলল, 'ও কি, আবার আংটি কেন।'

নশরৎ আলী বললেন, 'ভারী খুশি হয়েছি। কেন না তোমাকে এতখানি খুশি হতে আর দেখিনি।'

রাবেয়া মৃদু হেসে বলল, 'তাই নাকি। কিন্তু বকশিশটা আমাকে কেন?'

নশরৎ আলী বললেন, 'তবে কাকে? চাঁদ মিঞাকে? তার জন্য ভেবনা। তাকে অন্য জিনিস দেব। আংটিটা তুমিই পর।'

পরদিন থেকে চাঁদ মিঞাকে কোথাও দেখা গেল না। দরিয়ার জন্য অন্য সহিস নিযুক্ত হ'ল। সমস্ত বাড়িটা নিঃশব্দ ইঙ্গিতে আর আশঙ্কায় থম থম করতে লাগল।

একটু ইতস্তত ক'রে রাবেয়া বলল, 'কেউ কেউ বলছে চাঁদ মিঞা আর পৃথিবীতে নেই—'

নশরৎ আলী নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে হাসলেন, 'কিন্তু তোমার হৃদয় কি বলছে, আর তোমার খোদা।'

রাবেয়ার ঠোঁট দুটি একটু কেঁপে উঠল, কিন্তু কোন কথা বেরোল না।

এক ঘুমের পর জেগে উঠে নশরৎ আলী দেখলেন রাবেয়া তখনো শোয়নি। পশ্চিম দিকে মুখ ক'রে নিশ্চলভাবে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। যেন শ্বেত পাথরে খোদা এক মূর্তি। রাবেয়ার এই মূর্তি, এই ভঙ্গি দেখেই নশরৎ আলী একদিন মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু আজ তাঁর চোখ তৃপ্ত হ'ল না, জ্বলতে লাগল। জ্বলতে লাগল বুক, মনে হ'ল ও মূর্তি একান্ত পাথরেরই, ওর মধ্যে প্রাণ নেই।

তিনি ডাকলেন, 'রাবেয়া।'

দু' তিন ডাকের পর রাবেয়ার চমক ভাঙল, ফিরে তাকাল স্বামীর দিকে।

নশরৎ আলী বললেন, 'খোদাকে যতক্ষণ ধ'রে ডাকছ তার চার আনি সময়ও যদি আমাকে ডাকতে আমি তোমার মনের আশা মিটাতে পারতুম। চাঁদ মিঞা পৃথিবীতেই আছে। দেখবে তাকে ?'

রাবেয়া মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে বলল, 'না, আমি তাকে দেখতে চাইনে।'

নশরৎ আলী বললেন, 'না চল, তোমার একবার দেখে আসা ভালো।'

হাত ধ'রে নশরৎ আলী তাকে টেনে তুললেন।

সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। খোপে খোপে মানুষ ঘুমচ্ছে, খাঁচায় খাঁচায় পাখি। নশরৎ আলী রাবেয়াকে নিয়ে একটা অন্ধকার সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে এসে থামলেন। ঘুরে ঘুরে একটা সরু সিঁড়ি মাটির নিচে গিয়ে নেমেছে। সিঁড়ির শেষে আরও ছোট, আরও সংকীর্ণ একটি ঘর। নশরৎ আলী একটা মোম জ্বেলে রাবেয়ার হাতে দিয়ে বললেন, 'ধর', তারপর চাবি বার ক'রে বন্ধ তালা খুলে দরজার পাল্লা ঠেলে দিয়ে বললেন, 'দেখ।'

মোমের ম্লান মৃদু আলো ঘরের ভিতর গিয়ে পড়ল। রাবেয়া একবার সেদিকে তাকিয়ে আঁৎকে উঠে স্বামীকে জড়িয়ে ধরল, 'না, না, আমি দেখতে চাইনে।'

চাঁদ মিঞার সর্বাঙ্গ, বিশেষ ক'রে সমস্ত মুখ নির্মম চাবুকের দাগে ছিঁড়ে ফেটে গিয়েছে। ক্ষতের মুখে রক্ত কালো হয়ে জমে রয়েছে। স্ফীত মুখখানা এমন বিকৃত আর কুশ্রী দেখাচ্ছে যে মানুষের মুখ ব'লে চিনবার জো নেই। চোখের ভ্রূ এবং পাতার ওপরেও চাবুকের ঘা পড়েছিল। রাবেয়ার ক্ষীণ আর্তনাদে প্রাণপণ শক্তিতে চোখের পাতা চাঁদ মিঞা টেনে তুলতে চেষ্টা করল। তারপর স্বামীর সঙ্গে আশ্লিষ্ট ভীত শঙ্কিত রাবেয়ার দিকে তাকিয়ে মনে হল চাঁদ মিঞা যেন হাসল। রাবেয়া তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল ; তারপর কাতর মিনতিতে ব'লল, 'আমাকে নিয়ে চল!'

সঙ্গে সঙ্গে নশরৎ আলী তার ক্ষীণ কম্পিত দেহ দুহাতে তুলে নিলেন। মুখে তাঁর অদ্ভুত আত্মপ্রসাদের হাসি। শুধু চাঁদ মিঞা নয়, খোদার সমস্ত দুনিয়াটাকে যদি তিনি এমনি চাবুকের ঘায়ে বিকৃত ক'রে দিতে পারতেন।

ঘরে এসে সযত্নে রাবেয়াকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। রাবেয়া আস্তে আস্তে বলল, 'কেন এমন করলে, কি ক'রেছিল ও।'

নশরৎ আলী বললেন, 'বিশেষ কিছু করেনি। ঘোড়দৌড়ের মাঠ থেকে জিতে এসে গভীর রাত্রে ঘুমন্ত ঘোড়াকে আস্তে আস্তে রাবেয়া রাবেয়া বলে ডাকছিল।'

রাবেয়া আর কোন কথা না বলে পাশ ফিরল। সঙ্গে সঙ্গে নশরৎ আলী তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। কথাটা শুনে রাবেয়ার মুখের রঙ কি রকম বদলায় হয়তো নশরৎ আলীর দেখবার লোভ হয়েছিল। কিন্তু তীক্ষ্ণ কুটিল দৃষ্টির সামনে অত্যন্ত বিবর্ণ নিষ্প্রভ রক্তহীন একখানি মুখাবয়ব মৃতবৎ স্থির হয়ে রইল।

নশরৎ আলী যেন খানিকটা তৃপ্তি পেলেন। তারপর হঠাৎ পরম ঔদার্যের সুরে বললেন, 'এই

বইল সেই ঘবেব চাবি। এবপব এখন তাকে তুমি যা খুশি তাই ক'বতে পাব।'

দুঃসহ আতঙ্কে বাবেযা আব একবাব শিউবে উঠল, 'না না না

তাব সেই শিহবিত কোমল বাহুখানিব ওপব আস্তে নিজেব দীর্ঘ প্রশস্ত হাতখানি বাখলেন নশবৎ আলী। সমস্ত সত্তা দিযে বাবেযাব সেই শিহবণ তিনি যেন অনুভব কব'বেন, সমস্ত অনুভূতিব মধ্যে সেই শিহবণটুকুকে তিনি যেন চিবকালেব জন্য সঞ্চয ক'বে বাখবেন।

খানিকক্ষণেব মধ্যে গভীব ক্লান্তিতে নশবৎ আলী ঘুমিযে পড়লেন।

কিন্তু বাবেযাব চোখে ঘুম নেই তাব চোখেব সামনে সেই বিকৃত ক্ষতলাঞ্ছিত মুখ অনুক্ষণ ভেসে বযেছে। দেখে দেখে বাবেযাব মনে হ'ল সে মুখ বীভৎস নয, অত্যন্ত করুণ, অত্যন্ত অসহায। এক অস্ফুট চাপা আর্তনাদ সেই মাটিব নিচেব গহ্বব থেকে বাবেযাব কানে যেন বাববাব ভেসে আসতে লাগল

বাবেযা আস্তে আস্তে বিছানাব ওপব উঠে বসল ঘবেব এক কোনে মোমদানিতে একটা মোম জ্বলে জ্বলে প্রায শেষ হযে এসেছিল বাবেযা আব একটা নতুন মোম জ্বালাল। তক্তপোশেব নিচে তাব বাবাব দেওযা বড একটা ঝাঁপিতে অনেক গাছড়া আব নানা বকমেব ওষুধেব তেল কবা বযেছে। ফকিব ব'লে দিযেছে এগুলি তাকে সব বকম বিপদ আপদ অসুখ বিসুখ থেকে বক্ষা কবাবে

ঝাঁপিটা বাব ক'বে কি একটু চিন্তা কবল বাবেযা। তাবপব কযেকখানা গাছড়া আব একটা তেলেব শিশি তুলে নিল চাবিটা তাব বিছানাব পাশেই পড়ে বযেছে। তুলতে গিযে হাতটা যেন একটু কেঁপে উঠল। তাবপব ঘুমন্ত স্বামীব মুখেব দিকে একবাব তাকাল বাবেযা। একটু কি ইতস্তত কবল স্বা. ত্বেল তাঁকে ডেকে তাঁব অনুমতি নিযেই যাবে আবাব কি ভেবে নিবস্ত হ'ল। তাবপব চাবিটা তুলে নিযে নিঃশব্দ পাযে ঘব থেকে বেবিযে গেল।

আব কোন ভয নেই কোন শঙ্কা নেই অদ্ভুত সাহস এসেছে বাবেযাব মনে। গাছড়াব ঝাঁপিতে হাত দেওযাব সঙ্গে সঙ্গে যেন অলৌকিক দৈবশক্তি সে হাতে পেযেছে। খোদাব নির্দেশ শুনতে পেযেছে হৃদযেব মধ্যে সাবাবাত

সাবাবাত দুঃসহ যন্ত্রণায আর্তনাদ ক'বে ভোবেব দিকে চাঁদ মিঞাব বোধ হয একটু তন্দ্রাব মত এসেছিল ঘবেব মধ্যে আলো আব পাযেব সাড়ায সে চমকে জেগে উঠল চোখ মেলতেই দেখল বাবেযা তাব দিকে ছোট একটা শিশি হাতে এগিযে আসছে। হঠাৎ যেন ব্যাপাবটা তাব বিশ্বাস কবতে ইচ্ছা হ'ল না কিন্তু পবক্ষণেই খানিকক্ষণ আগেব ঘটনাকে সব মনে পড়ে যাওযায সর্বাঙ্গেব দুঃসহ যন্ত্রণা যেন দ্বিগুণ হযে ফিবে এল। গূঢ় অভিমানে বাবেযা হাতখানা ঠেলে দিযে বলল না।'

ধাক্কা লেগে বাবেযাব হাতেব শিশিটা দূবে ছিটকে পড়ল। নিজেব হাতেব দিকে তাকিযে একমুহূর্তে যেন বিমূঢ় হযে বইল বাবেযা তাবপব হঠাৎ আঙুলেব জ্বলন্ত অঙ্গুবীব দিকে তাব চোখ পড়ল দুই ঠোঁটে অদ্ভুত এক ঝিলিক হাসি ফুটে উঠল। আস্তে আস্তে হাতেব আংটিটা খুলে চাঁদ মিঞাব একটা আঙুলে পবিযে বাবেযা তেমনি দুর্বোধ বহস্যময মৃদু হাস্যে বলল, 'এবাব তো আব ওষুধে তোমাব কোন আপত্তি নেই?'

বিস্মযে আনন্দে চাঁদ মিঞা নির্বাক হযে বইল। দেহ মনেব কোন জ্বালাব কথাই তাব আব মনে পড়ছে না।

বাবেযা উঠে গিযে সেই শিশিটা তুলে নিযে এল। তাবপব হাতেব তালুতে ঘন খানিকটা তেল ঢেলে ডান হাতেব আঙুল ভিজিযে চাঁদ মিঞাব মুখে ক্ষতস্থানে বুলিযে দিতে লাগল। চাঁদ মিঞা গভীব শান্তিতে চোখ বুজল।

হঠাৎ পিছন থেকে একখানা বজ্রকঠিন হাত এসে বাবেযাব কণ্ঠ চেপে ধবল। বাবেযা মুখ ফিবিযে দেখতে পাবল না, কিন্তু হাতেব স্পর্শ সে চিনতে পাবল।

চাঁদ মিঞা চীৎকাব ক'বে এগিযে আসতেই পাযেব ঠোকবে নশবৎ আলী তাকে ঘবেব আব এক

কোণে ঠেলে ফেলে দিলেন। তারপর সেই বিবশ মূর্চ্ছিত অপরূপ দেহাধারটিকে অনায়াসে দুহাতে তুলে নিয়ে তিনি আর একবার সেই ঘোরান সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন।

পরের দিন শোনা গেল অকস্মাৎ হার্টফেল ক'রে রাবেয়া মারা গেছে। শহরের ডাক্তারও সেই রিপোর্ট দিল। বাড়ির আত্মীয়স্বজন অনুচরেরা আর একবার নীরবে পরস্পরেব মুখের দিকে তাকাল। খবর পেয়ে থানার ইন্সপেক্টর চৌধুরী সাহেব বন্ধুবৎ সমবেদনা জানাতে এলেন এবং খানিকক্ষণ নিভৃতে নশরৎ আলীব সঙ্গে কি দু-একটি কথাবার্তা ব'লে বিদায়ও নিলেন। রাবেয়াকে কবর দেওয়ার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা ক'রতে নশরৎ আলীর ঘন্টাখানেকের বেশি লাগল না। অনুচরেরা রাবেয়াকে তুলে নিয়ে গেল। নশরৎ আলী তাদের খানিকটা এগিয়ে দিয়ে ফিরে এলেন ঘরে। চার বিবির কেউ তাঁর কাছে আসতে সাহস পেল না।

শূন্য ঘবের মধ্যে হঠাৎ এক দুঃসহ বেদনায় নশরৎ আলীর বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। চোখ ফেটে আসতে চাইল কান্না। কিন্তু নিজেকে নশবৎ আলী অনেক কষ্টে সংববণ ক'রলেন। কান্না ছাড়া তার আরও এক কাজ এখনো বাকী আছে। যে কুকুর তাঁর রাবেয়াকে অশুচিস্পর্শে কলঙ্কিত ক'রেছে, তার চরম শাস্তি বাকি আছে এখনো। সে শাস্তি নিজেব হাতে না দিলে নশরৎ আলীর অন্তব শান্ত হবে না।

পরিজনেরা এখানে ওখানে জটলা পাকাচ্ছে। নশরৎ আলী অলক্ষ্যে এক সময সিঁড়ি বেয়ে সেই গুপ্ত গহ্বরের উদ্দেশে নেমে চললেন।

হঠাৎ মসিয়র উঠে দাঁড়াল, বলল, 'ওঠ, এবার আমরাও চলি, অনেক কাজ আছে।'

আমি তার হাত ধ'রে টেনে বসালাম। 'উঠব মানে? আগে চাঁদ মিঞার কি পরিণতি হ'ল তাই ব'ল।

মসিয়র বহমান সিগারেটেব ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বহস্যাত্মক ভঙ্গিতে হাসল, 'পবিণতিটা তেমন সুবোধ্য নয়, এখানে এসে গল্পটা কিছু অলৌকিক আকাব নিয়েছে, মাঝখানেব খানিকটা অংশ অত্যন্ত অস্পষ্টও হযে গেছে।'

অসহিষ্ণু হযে বললাম, 'ভণিতা না ক'রে সংক্ষেপে বল চাঁদ মিঞার শেষ দশাটা কি হ'ল।'

মসিয়র বলল,'শুনেছি অত্যন্ত বৃদ্ধ বযসে নশবৎ আলীব চাঁদ মিঞাই সবচেয়ে প্রিয়পাত্র ছিলেন। চাঁদ মিঞা হাত ধ'রে তাঁকে রাবেয়ার কবরভূমিতে নিয়ে যেত, তাব সঙ্গে সঙ্গে থাকত, আবার রোজ সন্ধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে আসত বাড়িতে।' শেষের দিকে দুজনের মধে প্রভু ভৃত্যের সম্পর্ক উঠে গিয়ে গভীর সৌহার্দেব সৃষ্টি হয়েছিল।'

বললুম, 'হঠাৎ এরকম অভিনব কুটুম্বিতার কারণ?'

মসিয়র হেসে বলল, 'যারা আইনুদ্দিন ফকিরের কেরামতিতে বিশ্বাস ক'রত তারা বলত ফকিরের গাছড়ার গুণ। যে সব গাছড়া রাবেয়া চাঁদ মিঞার ঘরে ফেলে এসেছিল তা হাতে পেয়ে চাঁদ মিঞা অসীম দৈববলে বলীয়ান হয়েছিল, নশবৎ আলীর জিঘাংসা তাকে স্পর্শ ক'রতে পারেনি।'

বললুম, 'আর যাবা ফকিরের কেরামতিতে বিশ্বাস করে না?'

মসিয়র বলল, 'তারা আমার টীকায় বিশ্বাস ক'রবে?'

'তোমার টীকাই শুনতে চাচ্ছি।'

মসিয়র বলল, 'নশরৎ আলী চাঁদ মিঞাকে যে হত্যা করতে গিয়েও ক'রতে পারেননি, তা কোন গাছগাছড়ার জন্য নয়, চাঁদ মিঞার আঙ্গুলে পরিয়ে দেওয়া রাবেয়ার সেই আংটিটির জন্য। তার হাতে আংটিটি দেখে নশরৎ আলী প্রথমে জ্বলে উঠেছিলেন। বজ্রমুষ্টিতে সেই আংটি সুদ্ধ হাত তার চেপে ধ'রেছিলেন। এটা তাকে উদ্ধার ক'রতেই হবে। এটা রাবেয়ার স্মৃতিচিহ্ন। কিন্তু ছিনিয়ে নিতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছিল, শেষ চিহ্ন হ'লেও রাবেয়া তো তার হাতে সেটা দিয়ে যায়নি। দিয়ে গেছে তারই এই বীভৎস, শ্রীহীন অনুচরটির হাতে। কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঁদ মিঞার মুখের দিকে নশরৎ আলী তাকিয়েছিলেন। ক্ষতস্থানের মুখে মুখে রাবেয়ার দেওয়া সেই মলম শুকিয়ে লেগে রয়েছে। রাবেয়ার আঙুলের শেষ স্পর্শ। সেই দিকে চেয়ে চেয়ে নশরৎ আলীর বোধ

হয মনে হযেছিল বাবেযাব অঙ্গুবীটিব মত তাব আঙুলেব স্পর্শগুলি স্মৃতি হিসাবে আবও মূল্যবান। সেগুলি রাখতে হয, কেন না এক হিসাবে সে-ই বাবেযাব জীবন্ত স্মৃতিচিহ্ন।'

হেসে বললাম, 'ফকিবের চেযে তোমাব কেবামতি কম কঠিন নয মসিযব। কিন্তু নশবৎ আলীকে চাঁদ মিঞা ক্ষমা কবল কি ক'বে?'

মসিযব কোন জবাব না দিযে একমুখ ধোঁযা ছাড়ল।

ফাল্গুন ১৩৫২

সেতার

শ্বশুব-শাশুড়ী উঠে যাওযাব সঙ্গে সঙ্গে নীলিমা বসবাব টুলটাকে স্বামীব বিছানাব আবো কাছে এগিযে নিযে এলো। তাবপব তাব শীর্ণ হাতখানা নিজেব হাতেব মধ্যে টেনে নিযে বলল, 'একটা কথা বলব, শুনবে?'

সুবিমল ম্লান একটু হাসল, 'কেন শুনব না বলো।'

নীলিমা বলল, 'আগে কথা দাও আপত্তি কববে না, বাগ কববে না।'

সুবিমলেব দু'পাশে সাবে সাবে আবো চোদ্দ পনেবটি বেড। বোগী আব তাদেব দর্শনার্থী আত্মীয-স্বজনেব ভিড়ে হাসপাতালেব এই ঘবটি ভ'বে উঠেছে।

নীলিমাব গলাব স্ববে কেউ কেউ কৌতূহলী হযে তাব দিকে তাকাল। কিন্তু নীলিমাব কোনো খেযাল নেই, ভ্রূক্ষেপ নেই কাবো দিকে। স্বামী সম্ভাষণেব এমন উপযুক্ত ক্ষেত্র এমন নিবিড় অবকাশ যেন আব কোনো দিন সে পাযনি।

সুবিমলেব হাতে আব একটু চাপ দিল নীলিমা, বলল 'বেখা বউদিব কথা মনে আছে তোমাব? আমাব মামাতো ভাই নীবদদা'ব বউ। তিনি কাল এসেছিলেন আমাদেব বাড়ি। বললেন, একদিন হাসপাতালেও আসবেন তোমাকে দেখতে। বেখা বউদিবই পিসেমশাই হন সম্পর্কে, বায সাহেব পি এন বিশ্বাস। তাঁবই ছোট ছোট দুটি নাতনীকে বিকেলে গিযে গান শেখাতে হবে। বেখা-বউদি বলছিলেন আমি যা জানি তাতেই চলবে। টাকা পঁচিশেক তো ওঁবা দেবেনই, বেশিও দিতে পাবেন।'

সুবিমল আস্তে আস্তে বলল, 'কুটুম্ব-স্বজনেব বাড়িতে শেষ পর্যন্ত গানেব মাস্টাবীও গিযে ক'বতে হবে তোমাকে?'

নীলিমা বলল, 'আহা-হা ভাবি তো মাস্টাবী, মাস্টাবী কববাব মত গান যেন আমি জানি। আব কুটুম্বও তো খুব। মামাতো ভাইযেব পিসেশ্বশুব। তাঁব কাছ থেকে টাকা নিলে মহাভাবত অশুদ্ধ হবে না, ববং এক হিসেবে লাভ আছে। প্রথমেই একেবাবে অজানা অচেনাব মধ্যে গিযে পড়বাব ভয নেই।'

সুবিমল বলল, 'কিন্তু বাবা-মা বাজী কি হবেন

নীলিমা জবাব দিল, 'সে জন্য ভেব না। সে ভাব আমাব ওপব, এক বকম নিমবাজী তাঁবা হযেছেন।'

সুবিমল বিস্মিত হল না। যে শ্বশুব-শাশুড়ী বিযেব পব মাত্র কযেকটি মাসেব জন্য পুত্রবধূকে ম্যাট্রিকুলেশন পবীক্ষাটা দিতে দেননি, ছেলেব বন্ধুবান্ধবদেব সঙ্গে মেলা-মেশায আপত্তি কবেছেন

তাঁরাও যে আজ নীলিমাকে অর্থ উপার্জনের অনুমতি দিতে পারেন, একথা সুবিমলের কাছে আজ অবিশ্বাস্য মনে হল না। এই বছর দু'য়েকের মধ্যে তাদের সংসারে অনেক পবিবর্তন হয়েছে। থাইসিসে আক্রান্ত হয়ে সে এসেছে যাদবপুবের এই হাসপাতালে। প্রথম বছর ফ্রী-বেড মেলেনি। চিকিৎসার খরচ বাবদ মোটা টাকা লেগেছে মাসে মাসে। বুড়ো বাপ দেশী একটা মার্চেন্ট অফিসে হিসেব লেখেন। অসুখ-বিসুখ দূরের কথা, সংসারের দৈনন্দিন অনেক খরচই তাঁর হিসাবের বাইরে গিয়ে পড়ে। ইদানীং সুবিমলের চাকরিই ছিল ভরসা। তাই অসুখের প্রথম ধাক্কাতেই তাঁকে হাত দিতে হয়েছে স্ত্রী আব পুত্রবধূর গয়নায়, হাত পাততে হয়েছে স্বজন-বন্ধুদের কাছে। কিন্তু তাঁদের সংখ্যা অগণ্য নয়, ধার দেওয়ার ক্ষমতারও সীমা আছে। বাসন-কোসন গেছে, সামান্য আসবাবপত্র অদৃশ্য হয়েছে, তবু রোগ রেহাই দেয়নি।

সংসারের খরচ কম নয়, ভাই-বোনই সুবিমলের ছ'টি। ভাগ্যের ফেরে সুবিমলের ঠিক পরেই দুটি অনূঢ়া বয়স্থা মেয়ে। কন্যাদায়ের চিন্তা ছাড়া বাপ-মায়ের আর কিছু তারা বাড়াতে পারেনি। ছেলেরা এখনো স্কুলে নীচের ক্লাসে পড়ে।

তবু অনেক চেষ্টা-চরিত্র ধরাধরির ফলে মাস কয়েক হল হাসপাতালে সুবিমলেব জন্য ফ্রী-বেডেব ব্যবস্থা হয়েছে, বড় রকমের খরচ কিছু লাগে না। কিন্তু দু' একটা ওষুধের দাম আর টুকটাক হাতখরচ বাবাদ ফী মাসেই পঁচিশ-ত্রিশ টাকা দরকাব। সুবিমল জানে, এই ক'টি টাকা পাঠাতেও বাপের সাধ্য আর এখন নেই। কিছু কাল ধরে নিজের ব্যবস্থা নিজেই তাই তাকে করতে হচ্ছে। কলকাতার বন্ধুদের কারো কাছে হাত পাততে আর বাকি নেই। ইদানীং তাদের কাছ থেকে টাকা আর সে চায় না, চায় ঠিকানা। বন্ধুর বন্ধু, তস্য বন্ধুরা সারা ভারতবর্ষ ভ'রে কে কোথায় আছে, কে কোথায় ভালো চাকরি করছে জানতে চায় সুবিমল।

অনেকেই চিনতে পারে না, অনেকের কাছ থেকেই জবাব পাওয়া যায় না। সকলে সমান নয়, কেউ কেউ আবার দেয়ও। ভরসা দেয় থাইসিস রোগটা আজকাল আর এমন কিছু মারাত্মক নয়, বিশেষত গোড়াতেই যখন ধরা পড়েছে। কেউ কেউ দু'-এক মাস পাঁচ-দশ টাকা পাঠায়, কিন্তু তাব পর হয় আর তাদেব সাড়া মেলে না, না হয় অত্যন্ত হাত-টানাটানিব খবর আসে।

এমনি দু'তিনখানা চিঠি স্বামীকে দেখতে এসে গতবার নীলিমার হাতে পড়েছিল।

সুবিমল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'তাঁরা যদি রাজী থাকেন তবে আর কি। অন্যেব কাছ থেকে ভিক্ষে নেওয়াব চেয়ে তোমার রোজগাব আমি সহজভাবেই নিতে পাবব।'

নীলিমার চোখ ছলছল ক'রে উঠল, 'অমন ক'রে ব'লো না।'

স্ত্রীর সেই জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে সুবিমল কি যেন দেখল, তার পর কোমল কণ্ঠে বলল, 'মান-অপমানেব কথা নয়, আমি ভাবছি তোমার শবীরের কথা, সংসারের অত খাটুনির পরে আবার কি গান শেখানোর পবিশ্রম দেহে সইবে? দু'দিনও তো শরীব টিকবে না তোমার।'

নীলিমার মনে পড়ল অফিসের কাজের পবে সুবিমল যখন টিউশনিতে বেরুত নীলিমা ঠিক এই ধরনেব কথাই বলত। স্বামীর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ কবৃত নীলিমা। সেই আশঙ্কাই আজ নিষ্ঠুর সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এখন সুবিমলের মুখে সেই কথা। নীলিমার স্বাস্থ্যেব জন্য ঠিক তেমনি ধরনের উদ্বেগ দেখা দিয়েছে স্বামীর মনে। এমন কি হয় না, নীলিমার মত সুবিমলের এই উদ্বেগ আর আশঙ্কাও এমনি সত্যি সত্যি ফলে যায়। আর সুবিমল সঙ্গে সঙ্গে ভালো হয়ে ওঠে। তাহলে বেশ মজা হয়, তাহলে নীলিমা উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে পারে স্বামীর ওপর।

সুবিমল বলল, 'হাসছ যে।'

নীলিমা বলল, 'হাসছি তোমার কথা শুনে, আমার আবার শরীর! তার জন্য তোমার এত ভাবনা!'

সুবিমল বলল, 'অত বিনয় ভালো নয়। তোমার শরীরের জন্য ভাবব না, তোমার মনের জন্য ভাবব না, তবে ভাবব আর পৃথিবীতে কিসেব জন্য?'

স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে সুবিমল একটু হাসল।

নীলিমার মুখে কেমন যেন একটু ছায়া পড়ল। কিন্তু পরমুহূর্তে সে-ও হাসিমুখে জবাব দিল, 'কিছু

ভেব না, তোমাব কথা আমাব মনে থাকবে।'

কালীমোহন তবু আমতা আমতা কবলেন বললেন, 'লোকে কি বলবে।'

মনোবমা বললেন, 'আব সেসব যদি আমাব সুবুব কানে যায় তাহলে তাবই বা কেমন লাগবে।'

অতি দুঃখে নীলিমাব হাসি পেল। স্বামী, শ্বশুব শাশুডী সকলেব মনে সেই একই প্রশ্ন, সেই একই বিপদেব আশংকা। অভাব অনটন সমস্ত সংসাবকে গিলে ধ'বেছে কিন্তু স্থিব আছে সেই অবিশ্বাস, সেই কুটিল সংশয-প্রবণতা।

নীলিমা জবাব দিল, 'অত ভাবছেন কেন মা, আজকাল কত মেয়েই এমন তো কবছে। এতে নিন্দাব কিছু নেই। আব নিন্দা-বন্দনাব দিকে কান দেওযাব এই কি আমাদেব সময?'

অন্য কোন সময হ'লে পুত্রবধূব মুখে এই সব ছাপাব অক্ষবেব বড বড কথা মনোবমা সহ্য কবতেন না, কিন্তু এখন চুপ ক'বে বইলেন।

বেখাই প্রথম পবিচয কবিযে দেওযাব ভাব নিল নির্দিষ্ট দিনে এসে বলল, 'চল ঠাকুবঝি।'

পাযে পুবনো একজোডা স্যাণ্ডাল, পবনে অনেক কাল আগেব বঙ ফিকে হয়ে যাওযা একখানা শাডি। বেখা তাব দিকে তাকিযে কি যেন ব'লি বলি ক'বে চুপ ক'বে গেল।

নীলিমা শ্বশুবের সামনে গিযে বলল 'তাহলে আসি বাবা।'

কালীমোহনেব কণ্ঠ আদ্র হযে এল, বললেন এসো মা। নিতান্ত দুবদৃষ্ট নাহ'লে কুললক্ষ্মী তুমি, তোমাকে আজ বেবোতে হয টাকাব চেষ্টায।

নীলিমা বলল, 'কিন্তু এ সময ঝি গিবিতেও যে আমাব অপমান নেই বাবা।'

কালীমোহন বললেন, 'তবু আমি বেঁচে থাকতে—'

নীলিমা মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আপনি বিচলিত হবেন না বাবা।'

কালীমোহন বললেন, 'না আব বিচলিত হব কেন। আশীর্বাদ কবি তোমাব কষ্ট যেন সার্থক হয।' একটু চুপ করে থেকে বললেন খুব দেখে শুনে সাবধান মত চ'ল মা।'

বেখা হেসে বলল, 'বউকে বুঝি খুব দূব দেশে পাঠাচ্ছেন তাযেমশাই। ভবানীপুব থেকে কালীঘাট, ট্রামেব মাত্র গোটাকযেক স্টপেজ, তাতেই ভেবে এত সাবা হচ্ছেন। ভয নেই, ঘণ্টাখানেক বাদেই আপনাদেব বউকে ফিবিযে দিযে যাব।'

বায সাহেবেব এ-বাডিতে কি একটা বিযেব নিমন্ত্রণে নীলিমা এব আগে আবো একবাব এসেছিল। কিন্তু সে আসায আব এ আসায পার্থক্য অনেক বাডিব ভিতবে ঢুকতে গিযে নীলিমাব পা যেন হঠাৎ আব এগুতে চাইল না, মন দ্বিধাগ্রস্থ হযে উঠল।

বেখা বলল, 'কি ব্যাপাব, এত ভাবছ কেন? দিন বাত অমন ভাবনা কিন্তু ভালো নয।'

সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালেব কথা মনে পডল নীলিমাব, মনে পডল স্বামীব রুগ্ন শীর্ণ মুখ, নিজেদেব নিঃসম্বল দীনতাব কথা

নীলিমা একটু হাসতে চেষ্টা কবল, বলল, সে কথা ঠিক। চল।'

বেখাব পিসীমা পিসেমশাই নীলিমাদেব সাদবে বাডিব ভিতবে ডেকে নিযে গেলেন।

বায সাহেব বললেন, 'কোন সংকোচ কবো না মা।'

কাত্যাযনী বললেন, 'বাঃ, সংকোচ আবাব কিসেব এ কি পবেব বাডিতে এসেছে না কি।'

পবিবাবেব অন্য সকলেব সঙ্গে আলাপ কবিযে দিলেন কাত্যাযনী সুদর্শন স্বাস্থ্যবান পুত্র, সুন্দবী পুত্রবধূ, সাত-আট বছবেব চঞ্চল সপ্রতিভ দুটি মেযে, চমৎকাব দেখতে।

কাত্যাযনী বললেন, 'এবাই তোমাব ছাত্রী নীলিমা অঞ্জু আব মঞ্জু, ভালো নাম কৃষ্ণা আব কাবেবী। পবিচযেব সময সঙ্গে সঙ্গে ভালো নাম দু'টিও আমাকে ব'লে দিতে হয, না হ'লে ফল ভালো হয না।' কাত্যাযনী হাসলেন।

দোতলাব দক্ষিণ দিকেব একটি ঘবে নীলিমাকে নিযে এলেন কাত্যাযনী। মেঝেব ওপব দামী গালিচা পাতা। এক দিকে বাজনাব সবঞ্জাম। বাঁযা তবলা ছোট-বড গুটি তিনেক সেতাব নীলবঙেব

ঢাকনিতে ঢাকা।

কাত্যায়নী বললেন, 'সপ্তাহে দু'দিন ওস্তাদ আসেন অঞ্জু মঞ্জুকে সেতার শেখাবার জন্য। সেই সঙ্গে সঙ্গে ওদের বাবাও শেখে। খুব ভালো সেতার বাজায় আমাদের খোকা, এক দিন শুনো।'

নীলিমা বলল, 'গান-বাজনার দিকে সকলেরই বেশ ঝোঁক আছে বুঝি এ-বাড়িতে।'

রায় সাহেব পিছনে পিছনে এসেছিলেন। হেসে বললেন, 'তা একটু আছে। পেশায় আমরা চামার হ'লে হবে কি মা, নেশাটা সকলেরই একটু মোলায়েম।'

সহরতলীতে রায় সাহেবের ট্যানারী খ্যাতিলাভ করেছে।

সুমিতা বলল, 'বাবাও বেশ চমৎকার তবলা বাজাতে পারেন।'

ভূমিকা হিসাবে হারমনিয়ম বাজিয়ে খানদুই গান গাইল নীলিমা। খুব ভালো জমল না। দু'-এক জায়গায় তালও কাটল। রায় সাহেব ভ্রূ কুঁচকালেন।

রেখা ননদের দোষ ক্ষালনের চেষ্টা করে বলল, 'অনেক দিন ধরে চর্চা নেই কি না।'

কাত্যায়নী বললেন, 'থাকবার কথাও তো নয়। মনের যে শান্তিতে এখন রয়েছে।' নীলিমার দিকে চেয়ে বললেন, 'সব আমরা শুনেছি মা, রেখার কাছে। কেমন আছে আজকাল সুবিমল। সত্যিই ভারি কষ্ট হয় তোমার শ্বশুরের কথা ভেবে। এ বাজারে সংসারের খরচ চালিয়ে আবার হাসপাতালের খরচ জোগানো কি সহজ কথা! আর এ হ'ল একেবারে রাজা-রাজড়াদের ব্যাধি। রীতিমত রাজসূয় যজ্ঞ।'

নীলিমার গুণের চেয়ে, তার প্রয়োজন, স্বামীর অসুস্থতায় অর্থ সাহায্যের কথাই যে ওঁরা বেশি বিবেচনা ক'রেছেন একথা নীলিমাও বুঝল, ওঁরাও বুঝিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লেও মনের মধ্যে কোথায় যেন একটু বিঁধতে লাগল নীলিমার।

ফেরার পথে রেখা বলল, 'গান-বাজনাটা তোমাকে আরও একটু ভালো করে চর্চা করতে হবে ভাই।'

নীলিমা গম্ভীর ভাবে বলল, 'তা তো হবেই।'

ওস্তাদ রেখে গান-বাজনা শেখার সুযোগ নীলিমা কোনদিন পায়নি। গরীব বাপের পক্ষে সে ব্যবস্থা করা সম্ভবও ছিল না। রেকর্ড রেডিয়ো শোনা বিদ্যা। স্কুলে গানের ক্লাসও মাঝে মাঝে দু'এক বছর হ'ত, মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যেত। মাইনে উঠত কম। স্কুলের তহবিলে কুলোত না। নিজের উদ্যম উৎসাহেই যা কিছু শিখেছিল নীলিমা। শ্বশুরবাড়িতে এসে সব আবার চাপা পড়ে গিয়েছিল। শ্বশুর-শাশুড়ী জিনিসটা বিশেষ পছন্দ করতেন না, সুবিমলেরও যে এদিকে খুব সখ-আগ্রহ ছিল তা নয়। তার পর এই দু'বছর ধরে গানের কথা ভাববার নীলিমার ইচ্ছাও হয়নি, সময়ও হয়নি। আজ হল। সখ নয়, আনন্দ নয়, প্রয়োজন আর পেশা। একটু অভ্যাস করে না গেলে ছাত্রীদের কাছে মান থাকবে না, এমন কি চাকরি যেতেই বা কতক্ষণ। কিন্তু চাকরি গেলে চলবে না নীলিমার। যেমন ক'রেই হোক স্বামীর হাসপাতালের খরচ তাকে সংগ্রহ করতেই হবে। পরিচিত অর্ধ-পরিচিতদের কাছে আর তাঁকে সে ভিক্ষা ক'রতে দেবে না। তার চেয়ে নিজে ভিক্ষা করবে সেও ভালো।

বাড়ির অন্য কেউ উঠবার আগে খুব ভোরে উঠে গলা সাধতে বসে নীলিমা। দিন ভ'রে চলে সংসারের কাজ। দুপুরে কোন কোন দিন অবসর পেলে গানের সঙ্গে হারমনিয়ম বাজিয়ে হাত আর গলাটাকে চোস্ত রাখে, বিদ্যাটাকে একটু ঝালিয়ে নিতে চেষ্টা করে নীলিমা। যেদিন সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া শেষ হয়ে যায় সেদিন রাত্রেও আসর বসে নীলিমার ঘরে। দুই ননদ শান্তি আর সুধা এসে জোটে, বলে, 'বউদি আমরাও শিখব, আমাদেরও শিখিয়ে দাও ভালো ক'রে। তার পর তোমার মত বেরোব টিউশনিতে। তিন গুণ টাকা আসবে ঘরে।'

মনোরমা মাঝে মাঝে ধমক দেন, 'কি যে তোরা আমোদ-আহ্লাদ গান-বাজনা করিস, তোরাই জানিস। এত স্ফূর্তি যে তোদের কি দেখে আসে তাই ভাবি। বাছা আমার হাসপাতালে ভুগছে আর বাড়িতে তোরা দিব্যি গান-বাজনায় আনন্দ-সোহাগে দিন কাটাচ্ছিস্। যে শোনে সেইতো অবাক্ হয়ে যায়।'

বেদনায় নীলিমাও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকে। তারপর ঘরে এসে তাকায় দেয়ালে টাঙানো স্বামীর ফটোখানার দিকে। মনে অদ্ভুত বল পায় নীলিমা, মুখে হাসির আভাস দেখা দেয়। যে যাই বলুক কিছুতেই কিছু এসে যাবে না তার। সে তো জানে এই অমোদ-আহ্লাদ কিসের জন্য। তার বিদ্যা আজ কোন কাজে লাগছে, কিভাবে সার্থক হ'তে চলেছে সে তো জানে, সুবিমল তো জানে।

'জানো তো? না তুমিও জানো না?'

ফটোখানাকে জিজ্ঞাসা করে নীলিমা। জবাব শোনবার জন্য দেয়াল থেকে সেখানা পেড়ে নিয়ে এসে অধীর আবেগে নিজের ঠোঁটের ওপর চেপে ধরে।

রায় সাহেবের ছেলে পুরন্দর একদিন সেতার বাজিয়ে শোনাল সবাইকে।

অঞ্জু বলল, 'আমাদের নীল মাসীও বাজাতে জানেন বাবা। সেদিন তোমার সেতার নিয়ে—'

পুরন্দর বলল, 'তাই না কি। আপনার যে এমন চুরি করার অভ্যাস আছে তা তো আগে বলেননি।'

নীলিমা লজ্জিত হয়ে বলল, 'বলবার মত কিছু নয়।'

পুরন্দর বলল, 'সে কথা ঠিক। চুরি কেউ বলে-কয়ে করে না। কিন্তু ধরাই যখন প'ড়ে গেছেন তখন তো একটু না শুনিয়ে পারবেন না।'

নীলিমা ভারি বিব্রত হয়ে পড়ল, 'বিশ্বাস করুন, সত্যি কিছু জানিনে আমি।'

পুরন্দর নীলিমার চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল, বলল, 'আপনার অতখানি অনভিজ্ঞতা বিশ্বাস করা সত্যি শক্ত।'

নীলিমা বলল, 'সেটা আপনার বিশ্বাস করার শক্তির ওপর নির্ভর করে। ছেলেবেলায় একবার সুরু করেছিলাম, তারপর আর হয়ে উঠল না।'

পুরন্দর বলল, 'বেশ তো এবার হবে। তখন সুরু করেছিলেন, এখন শেষ করবেন। আমাদের ওস্তাদজী নারায়ণ ত্রিবেদীর সঙ্গে তো আপনারও পরিচয় হয়েছে, তাঁর কাছেই তো শেখার ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারেন।'

নীলিমা বলল, 'এক একবার অবশ্য এ কথা আমিও ভেবেছি। সেতারের টিউশনিতে শুনেছি টাকাও বেশি পাওয়া যায়।'

পুরন্দর আহত হয়ে বলল, 'টাকা! ও ভাবি দুঃখিত। ওকথা আমার মনে ছিল না।'

জবাবে নীলিমা মৃদু একটু হাসল। তার মনে না থাকলে চলবে কি ক'রে।

বহু অনুরোধ উপরোধেও নীলিমা সেদিন সেতারে হাত দিল না। কিন্তু বাড়ি ফেরার পথে ট্রামে পুরন্দরের পরামর্শটা তার কেবলি মনে পড়তে লাগল। সেতার শিখবার সখ্যই ভারি সাধ ছিল তখন। কিছুদিনের জন্য একজন সৌখীন অল্পবয়সী স্বামী-স্ত্রী নীলিমাদের বাড়ির একতলায় দুখানা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন। তাঁদের ছিল একটি সেতার। নীলিমা সেই বউটির কাছে সবে শিখতে সুরু ক'রেছিল। হঠাৎ একদিন ওদের সঙ্গে কলের জল নিয়ে দারুণ ঝগড়া হয়ে গেল নীলিমাদের। তাঁরাও রাগ ক'রে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে কোথায় যেন চ'লে গেলেন। তারপর নীলিমা অনেক চেষ্টা ক'রেছে সেতার শেখার জন্য, কিন্তু কিছুতেই সুযোগ হয়ে ওঠেনি। মা অসুখে পড়লেন, বাবার পুরনো ভালো চাকরিটা গেল, কম মাইনের নতুন এক অফিসে ঢুকতে হল তাঁকে। সেতারের কথা কি ক'রে আর মনে রাখে নীলিমা?

ছাত্রীদের গান শেখাতে এসে আবার চোখে পড়ল সেই সেতার। বাজাতে দেখল অঞ্জু-মঞ্জুকে। কয়েক দিন রইল লোভ সম্বরণ ক'রে, শেষে একদিন হাত দিয়ে বসল যন্ত্রে। আঙুলের ছোঁয়ায় ঝঙ্কার দিয়ে উঠল তার, তার চেয়েও বেশি ঝঙ্কার লাগল নীলিমার হৃদয়ে।

কৃষ্ণা আর কাবেরী উদ্বেলিত হয়ে উঠল, 'ও মা, দেখ এসে। নীল মাসী—'

সেতার রেখে নীলিমা তাড়াতাড়ি ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়াল, 'চুপ-চুপ।'

মাঝখানে দু'তিন দিন গিয়ে স্বামীর সঙ্গে দেখা ক'রে এল নীলিমা। তারপর নতুন ইংরেজী মাসের

পয়লা তারিখে গিয়ে বলল, হাত পাতো।'

সুবিমল অনুমান করল জিনিসটা, তবু বলল, 'হাত কি আজ এই প্রথম পাতব ?'

নীলিমা বলল, 'প্রথম ছাড়া কি। তোমরা কি কিছু পাততে জানো ? হৃদয়ও আমরা পাতি, হাতও আমরা পাতি।'

তিনখানা নতুন দশ টাকার নোট ব্লাউজের ভিতর থেকে বের ক'রে স্বামীর হাতে নীলিমা গুঁজে দিল। আঙুলে আঙুলে মেশামেশি ক'রে রইল খানিক্ষণ। ঝঙ্কারটা সেতারের চেয়ে কম হল না।

নীলিমা বলল, 'পুরস্কার দেবে না ?'

সুবিমল বলল, 'দেব। ডক্টর কর বললেন, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি। মাস তিনেকের মধ্যেই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাব।' একটু থেমে সুবিমল স্ত্রীর আনন্দ-উচ্ছল দুটি চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অন্য কোন পুরস্কার তো এখন আর হাতে নেই।'

নীলিমা বলল, 'মনে থাকলেই হবে।'

প্রথম প্রথম কিছু দিন বার-তের বছরের দেবর সুকোমল আসত নীলিমার সঙ্গে। রায় সাহেবের বাড়ির কাছাকাছি এসে ফিরে যেত। ফেরার পথে আবার এসে দাঁড়াত ট্রাম-স্টপেজটার কাছে দিন কয়েক পরে নীলিমা তাকে রেহাই দিল। বলল, 'থাক, আর তোমাকে পথ দেখাতে হবে না সুকু। তুমি তোমার পড়া করো গিয়ে।'

সুকু বলল, 'ভয় ক'রবে না তো বউদি ? হারিয়ে যাবে না তো ?'

নীলিমা সস্নেহে দেবরের গাল দুটি টিপে জবাব দিয়েছিল, না গো না, হারাই ই যদি, খুঁজবার লোক তো আমার রইল।'

গান শিখিয়ে ফেরবার সময় নীলিমাকে পুরন্দর আজ বড় রাস্তার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিল, বলল, 'ত্রিবেদীজীকে আমি বলেছিলাম। তিনি রাজী হয়েছেন।

নীলিমা একটু হাসল, 'কিন্তু আমি যে রাজী হব একথা আপনি কি ক'রে জানলেন ?'

পুরন্দর বলল, 'রাজী হ'লেই তো লাভ। না হয়ে লাভ কি।'

নীলিমা বলল 'আপাতত দেখছি তো লোকসান। অত গুরুদক্ষিণা কোথায় পাব।'

পুরন্দর বলতে যাচ্ছিল, 'সে জন্য ভাববেন না।' কথাটা তাড়াতাড়ি বদলে নিয়ে বলল, 'সকলের কাছ থেকে দক্ষিণা তিনি নেন না। তা ছাড়া আপনার কথা আমি তাঁকে সব বলেওছি।

নীলিমা বলল, কিন্তু যেখানে গুরু হয়ে যাচ্ছি, সেখানে শিষ্য হয়ে গেলে ছাত্রীদের কাছে মান যাবে যে।'

পুরন্দর বলল, 'ছাত্রীদের বাড়িতে কেন। আপনাকে একেবারে খোদ গুরুপাটে নিয়ে উপস্থিত ক'রব। তা'হলে তো আর কোন আপত্তি থাকবে না।'

নীলিমা ট্রামে উঠতে উঠতে বলল, 'আচ্ছা, ভেবে দেখব আপনার কথা।'

পুরন্দর বলল, 'আমার পক্ষে এইটুকু আশ্বাসই যথেষ্ট।'

নীলিমা ভালো ক'রে ভেবে দেখল। এই সুযোগে সেতারটা শিখে নিতে পারলে সত্যিই মন্দ হয় না। বাজনা জানা থাকলে টিউশনিতে আরো বেশি টাকা পাওয়া যায়। আর টাকার তো এখনো কত দরকার। সংসারে কিছু দিতে হবে। না হলে শ্বশুর মনে ক'রবেন কি ? স্বামী যদি উপার্জনের সমস্ত টাকা তার জন্য ব্যয় ক'রতেন তখন শ্বশুর-শাশুড়ী যা ভাবতেন এখনো প্রায় তাই-ই ভাববেন। তাছাড়া তিন মাস পরে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে সুবিমলকে কি কলকাতার এই বদ্ধ গলির মধ্যে ভ'রে রাখবে না কি নীলিমা। অন্তত দু'-এক মাসের জন্যও ভালো কোন স্বাস্থ্যকর জায়গায় পাঠিয়ে দেবে। আর সেই চেঞ্জের টাকা এইভাবেই সংগ্রহ ক'রতে হবে নীলিমাকে। কেবল গলায় আর হারমনিয়মে সে টাকা উঠবে না, তার জন্য সেতারও দরকার।

নারায়ণ ত্রিবেদীর বয়স ষাটের কাছাকাছি, বয়সের অনুপাতে শরীর বেশ শক্তই আছে। হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ, ঋজু উন্নত চেহারা। মুখে শান্ত প্রসন্নতা। শোনা যায় অনেক শোক-তাপ পেয়েছেন জীবনে। পুত্র-কন্যার অকালমৃত্যু হয়েছে, নিরুদ্দিষ্টা স্ত্রী সম্বন্ধেও নানা রকম কিংবদন্তী আছে। কিন্তু সে ইতিহাস লোকেব চোখের সামনে তিনি ধরে রাখেননি। নিজেব অন্তরের মধ্যেই তা তিনি প্রচ্ছন্ন বেখেছেন। মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে সেতারের আলাপে কেবল তার আভাস পাওয়া যায়। অন্য কোন আলাপ-আলোচনায় তা ধরা যায় না।

প্রৌঢ়া একটি বালবিধবা বোনকে নিয়ে তিনি থাকেন হরীশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটের পুরনো একতলা একখানা বাড়িতে। পুরন্দর নীলিমাকে একদিন বিকালে নিয়ে এল সেখানে।

নীলিমা পা ছুঁয়ে প্রণাম ক'রলে ত্রিবেদী স্মিত মুখে আশীর্বাদ জানালেন, বললেন, কোন ভাবনা নেই। সব তিনি শুনেছেন।

নীলিমা বিদ্যাভাস আরম্ভ করল। টিউশনিতে আসবার আগে আসে এখানে। কিছুক্ষণ বসে বসে বাজায়; ত্রিবেদী চেয়ে চেয়ে দেখেন। মাঝে মাঝে কেবল হেসে মাথা নাড়েন, হল না।

অদ্ভুত ধৈর্য। কোন বিরক্তি নেই, তিরস্কাব র্ভৎসনার আভাস নেই। এমন সহিষ্ণুতা সাধারণত দেখা যায় না।

কিন্তু ধৈর্য নেই নীলিমার নিজের। প্রায়ই প্রশ্ন করে আব কত দিন বাকি। কত দিনে অন্তত কাজ চালাবাব মত বিদ্যাটা আয়ত্তে আসবে। টাকা রোজগাব করতে পারবে ছাত্র-ছাত্রীকে শিখিযে।

ত্রিবেদী হাসেন, বলেন, 'যা আনন্দেব জিনিস তাকে তুমি এত তাড়াতাড়ি প্রয়োজনে লাগাতে চাচ্ছ। আনন্দকে ছাপিয়ে প্রয়োজন তো এক দিন বড় হযে উঠবেই, কিন্তু তা আজই কেন?'

নীলিমা চুপ ক'রে থাকে। তিবস্কাবের জন্য দুঃখ করে না। ত্রিবেদী কি করে বুঝবেন তাব প্রয়োজনের কথা, যার সঙ্গে আনন্দের কোন ভেদ নেই কিংবা যা আনন্দের চেয়েও অনেক বড়।

অনেক ইতস্তত ক'রে নীলিমা কিছু টাকা ধাব চাইল পুরন্দরেব কাছে। একটা সেতার কিনবে বলে। পরে শোধ করবে।

পুরন্দর জবাব দিল, 'ভুল করেছেন, আমি মহাজন নই। নিতান্তই অভাজন মাত্র। টাকা নেই। তবে একটা জিনিস আছে সেটা ধাব দিলেও দিতে পাবি।' বলে পুবন্দর একটু হাসল।

নীলিমা শঙ্কিত হয়ে উঠল, পাছে পুরন্দব বেফাঁস কিছু বলে ফেলে।

পুরন্দর তাব বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'ভয় কববেন না, হৃদয় নয়। তেমন বাজে অকেজো জিনিস বাখবার মত বাড়তি জায়গা আপনার নেই তা জানি। সে সব কিছু নয়। আমার সেতারটাই নিন, আপনার কাজে লাগবে।'

নীলিমা কিছুক্ষণ মুখ নীচু ক'বে বইল, তাবপর বলল, 'আচ্ছা।'

কিন্তু এর পর এ টিউশনি রাখতে আর সাহস ক'রল না নীলিমা। ইতিমধ্যে আরো দুটি টিউশনির খোঁজ এসেছিল। নিজেই একটু অগ্রসর হয়ে সে দুটিকে নিযে নিল। কিন্তু সেতারটা পুরন্দরকে ফিরিয়ে দিতে চক্ষুলজ্জায় বাধল। সেটা রয়ে গেল নিজের কাছেই।

নীলিমা সুবিমলকে গিয়ে একদিন বলে এল তার চেঞ্জের পরিকল্পনার কথা।

সুবিমল হেসে বলল, 'বেশ তো।'

না, বেশ তো নয়। সুবিমলকে সত্যি সত্যি নীলিমা দেখিয়ে দেবে তার সাধ্যের সীমা কতখানি। খুঁজে খুঁজে নীলিমা সেতারের টিউশনি নিল। চেষ্টা ক'রল রেডিয়োতে। প্রোগ্রাম-ডিরেক্টর বললেন, 'কিন্তু আমরা তো নতুন শিক্ষার্থীদের তেমন সুযোগ দিতে পারিনে, টাকা দেওয়াও সম্ভব হয়ে ওঠে না।'

নীলিমা অম্লান মুখে বলল, 'কিন্তু আমার কথা শুনলে আপনি 'না' করতে পারবেন না।'

প্রোগ্রাম-ডিরেক্টর শুনলেন এবং সত্যিই আর 'না' করলেন না।

অদ্ভুত উত্তেজনায় পেয়ে বসল নীলিমাকে। স্বামীর জন্য শুধু হাসপাতালের খরচই নয় তার চেঞ্জের টাকাও সংগ্রহ করতে হবে। যত্র তত্র সে গান শেখাতে লাগল। সেতার শেখাতে গিয়ে

কোন কোন জায়গায় অপদস্থও হল, তবু হটল না।

নারায়ণ ত্রিবেদী বললেন, 'অত অধীর হয়ো না মা। অকালে শক্তির অমন অপচয় কোরো না। তাকে সঞ্চয় কোরো নিজের মধ্যে। ভবিষ্যতেও তার প্রয়োজন হবে।'

তিন মাসের পর আরো মাস দুই গেল। তারপর সুবিমলের সত্যিই ছাড়া পাবার দিন এল। দু'টি দিন মাত্র মধ্যে। এদিকে শ'-তিনেক টাকার মত প্রায় জমিয়ে তুলেছে নীলিমা। আর পঁচিশটা টাকা হ'লে সংখ্যা পূর্ণ হয়। আপাতত এতেই হবে। সুবিমল বাড়ি এলে টাকার তোড়াটা তাকে উপহার দেবে নীলিমা, বলবে, 'দেখ পেরেছি কি না।'

পঁচিশটি টাকার কথা ভাবছে নীলিমা এই সময় আমন্ত্রণের চিঠি নিয়ে এল উত্তর কলকাতার একদল ছেলে। রঙমহল থিয়েটাব হল ভাড়া নিয়ে তাবা এক জলসার আয়োজন ক'রেছে। টাকাটা যাবে বন্যাপীড়িত দুর্গত-সেবার তহবিলে। শহরের বড় বড সব শিল্পীরা আসবেন। তাঁদের সঙ্গে নীলিমাবও ডাক পড়েছে।

নীলিমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'এঁদের মধ্যে আমাকে কেন। আমার কোন্ যোগ্যতা আছে।'

দলপতি গোছের কয়েকজন এগিয়ে এল, মধুর হেসে বলল, আছে বই কি। সেবার অধিকার তো সকলেরই। তাছাড়া এ ক্ষেত্রে বিশেষ দাবীও আছে নীলিমার। সে নিজেকে যতখানি ছোট বলে মনে করে তা সে নয়।

এদের মধ্যে দু'-একজন রেডিয়োতে দেওয়া নীলিমার দু'-একটা গানের কথা উল্লেখ কবল। কেউ কেউ বলল কোন কোন জলসায় তার সেতার না কি অদ্ভুত হয়েছিল শুনতে।

অদ্ভুত, হ্যাঁ অদ্ভুতই লাগল নীলিমার। প্রথম প্রথম স্বামীর রোগের কথা শুনে লোকে তাকে অনুকম্পা ক'রে টাকা দিয়েছে। মাঝে মাঝে একটু খোঁচা লাগত মনে, ক্রমে সেইটাই তাব অভ্যাস হয়ে এসেছিল। যেখানে এ রকম বিশেষ পক্ষপাতিত্ব তার জুটত না, নৈপুণ্যের অভাব দেখে লোকে তাকে তুচ্ছ করত, অনাদব করত, সে সব জায়গায় নীলিমাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এসে তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিত, বিদ্যায় তার দীনতা থাকলে কি হবে অন্তরে সে সমৃদ্ধ। সে টাকা তুলছে দুঃস্থ যক্ষ্মা-রোগগ্রস্থ স্বামীর জন্য, নিঃস্ব অর্ধভুক্ত পরিবারের জন্য। তাতেও টাকাও আসত, নিজের শিল্পকুশলতার অভাবের জন্য ক্ষোভ এবং গ্লানিও কম হত। মাঝে মাঝে উপরি পাওয়া হিসাবে কোন কোন জায়গা থেকে প্রশংসা অবশ্য এসেছে, কোন কোন মুহূর্তে গুন্‌গুন্ ক'রে গাওয়া পরিচিত গানের একটি কলি মনকে আচমকা দোলা দিয়ে গেছে ; মনে হয়েছে এর সঙ্গে আর কিছুর তুলনা হয় না, সমস্ত কর্তব্য এর কাছে মিথ্যা, সকল উদ্দেশ্য এর কাছে অর্থহীন। কিন্তু মনেব এই মোহকে নীলিমা বেশিক্ষণ প্রশ্রয় দেয়নি। আদর্শেব পথে, কর্তব্যের পথে বাধা বলে বর্জন করেছে। তাছাড়া শুধু আদর্শ আর কর্তব্যই তো নয় হৃদয়ের দাবী, প্রেমেব দাবী তার মনকে সব সময় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কিছুতেই অন্যমনস্ক হ'তে দেয়নি।

কিন্তু আজ যখন ছোট হৃদয়ের আর ক্ষমতার মাপে মাপা ক্ষুদ্র সিদ্ধি তার করায়ত্তপ্রায় তখন আহ্বান এল বৃহত্তর জগতের। এল সার্থকতার নতুন অর্থ, মহত্তর সম্ভাবনা। নীলিমা শুনল, তার কৃতিত্ব আছে, নৈপুণ্য আছে, তার গান অনেকের সত্যি সত্যিই ভাল লেগেছে, তার সেতার অনুরণন জাগিয়েছে অনেকের মনেই। আর শুধু তাই নয় তার এই দক্ষতা আরও বড় কাজে লাগছে, ব্যাপকতর সেবায় ব্যয়িত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। সেখানে আসবেন দেশের বড় বড় শিল্পী, যাঁদের অনেকের সে কেবল নামমাত্র শুনেছে। তাঁদের সে আজ স্বচক্ষে দেখবে, গান শুনবে, গান শোনাবে।

উদ্যোক্তাদের কাছে সবিনয়ে সম্মতি জানাল নীলিমা। বলল, তার যোগ্যতা যদি সত্যিই কিছু থাকে তবে তা দেশের কাজে লেগে ধন্য হোক।

সুবিমল আসবে কাল বাড়ি। এক হাতে নীলিমা ঘর গুছাল, ঘর সাজালো, কিন্তু আর এক হাত রইল তার সেতারের তারে। ঘর-কন্নার ফাঁকে ফাঁকে সেতারে তুলতে লাগল তার সর্বশ্রেষ্ঠ সংগীত,

তার শিল্পকুশলতার চরম নৈপুণ্য। কাল জগৎ তার যথার্থ পরিচয় পাবে। সে ছোট নয়, দীন নয়, অকৃতার্থ নয়।

পরদিন খানিকটা বেলা হ'তে না হতেই সুবিমল এসে পৌঁছল। বাড়িতে তার আগে থেকেই উৎসব সুরু হয়েছে। ভাইবোনদের ছুটোছুটির অন্ত নেই। বাপ এলেন, রুক্ষ কঠিন তার মুখ, কিন্তু ভিতরের আনন্দ তবু যেন চাপা থাকছে না। মা এলেন গৃহদেবতা নারায়ণের আশীর্বাদ নিয়ে, মনের আনন্দ চোখের জলে টলটল করছে। প্রতিবেশীরা এসে খোঁজ নিয়ে গেলেন। কাছের বন্ধুরা খবর পেয়ে এল দেখা করতে।

এক ফাঁকে নীলিমাকে নির্জনে পেল সুবিমল, বলল, 'সবচেয়ে তোমার কৃতিত্ব বেশি।'

নীলিমা বলল, 'আস্তে, কেউ শুনে ফেলবে।'

সুবিমল হাসল, 'কারো যেন শোনার বাকি আছে। তার পর তোমার সেই টাকার তোড়া কই। সেই চেঞ্জে পাঠাবার তোড়া।'

মন্ত্রগুপ্তি ঠিকমত রাখতে পারেনি নীলিমা। হাসপাতালে একদিন কথায় কথায় খুসির ঢেউয়ে গোপন কথা ভেসে এসেছে।

নীলিমা মুখ ম্লান ক'রে বলল, 'তোড়া পূর্ণ হয়নি। গোটা পঁচিশেক টাকা কম আছে।'

সুবিমল হাসল, 'মাত্র! কিন্তু তোড়া পূরাবার জন্য পঁচিশ টাকার চেয়েও বেশি দামী জিনিস এখানে আছে বলে আমার বিশ্বাস।'

কিন্তু দুপুরের পর বিকাল, বিকালের পর সন্ধ্যা যত এগিয়ে আসতে লাগল নীলিমার মন ততই চঞ্চল হয়ে উঠল। মাঝে মাঝে এক একবার সেতারের কাছে গেল, আবার ফিরে এল।

সুবিমল লক্ষ্য করে বলল, 'ব্যাপার কি।'

নীলিমা কুণ্ঠায় সংকোচে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'একটু বাইরে যেতে হবে।'

সুবিমলের মুখখানা যেন কেমন হয়ে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই কি মনে পড়ে যাওয়ায় হাসিমুখে বলল, 'ক্ষেপেছ! এতকাল বাদে আমি এলাম ঘরে আর তুমি যাবে বাইরে? টিউশনিতে আর কাজ নেই। তিনশো টাকায় ঘরে বসে দিব্যি তিন মাস খাব আর ঘুমোব।'

নীলিমা বলল, 'টিউশনি নয়।'

সুবিমল বলল, 'তবে কি জলসা-টলসা গোছের কিছু না কি? তারও আর দরকার নেই। তারা এতক্ষণে নিশ্চয়ই জেনেছে নীলিমা বাঈজীর ভূতপূর্ব স্বামী ফিরে এসেছে যমের দুয়ার থেকে, যমের হাত থেকে যমদণ্ড কেড়ে নিয়ে আজ কেবল একটিমাত্র জলসা হবে, কেবল তোমাতে-আমাতে। তুমি গীত-সরস্বতী আর আমি গুণমুগ্ধ নারায়ণ। ধরো এই নাও।' ব'লে নিজেই সুবিমল সেতারটা স্ত্রীর হাতে তুলে দিল। তারপর মৃদু হেসে দোর দিল ভেজিয়ে।

নীলিমা কাতর স্বরে বলল, 'আজ থাক্।'

সুবিমল বলল, 'না নীলিমা, আজই। রোগের বীজ আজ হয়তো চাপা আছে, কালই যে আবার ভেসে উঠবে না তার ঠিক কি? ডাক্তারের কথায় অত সহজে ভুলো না; তুমি বাজাও নীলিমা, আমি আজই একটু শুনব। তোমার সুর বেচে কেবল তুচ্ছ টাকাই এতদিন দিয়েছ, আজ এত অল্পতে ভোলাতে পারবে না। আজ তোমার সেই আসল সুর আমাকে শোনাতেই হবে।'

কিন্তু সুবিমলের কথার মাঝখানে হঠাৎ এক সময় চমকে উঠল নীলিমা। কানে গেল, সদর দরজার কড়া নড়ছে।

সেইদিকে কিছুক্ষণ কান পেতে রইল নীলিমা। নিজের সেতারের বাজনার চেয়েও যেন মধুর আর অপূর্ব ঐ কড়ানাড়ার নিক্কণ।

সুবিমল বলল, 'কি হ'ল, নাওনা সেতারটা।'

নীলিমা নিষ্প্রভ শূন্য দৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে তাকাল, তারপর সেতারখানা টেনে নিল হাত বাড়িয়ে। তাকে আজ বাজাতেই হবে।

চৈত্র ১৩৫২

নাম

স্ত্রী আর দুই বোনের জ্বালায় শেষ পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠলাম। উঠতে বসতে তাগিদ, 'কই, ঝির কি করলে? ব'লে ব'লে যে আমবা হযরান হয়ে গেলাম—'

খুঁজে খুঁজে আমিও কি কম হয়রান হয়েছি। কিন্তু কলকাতায় চার টাকার জায়গায় আট দশ টাকা মাসিক মাইনেব যদি বা ঠিকে ঝি বার কয়েক ঠিক করা গেছে, গাঁয়ে এসে দেখতে পেলাম টাকা বিলিয়ে আর যাই মিলুক না কেন ঝি মিলবে না।

আশোপাশে যে কয়েক ঘর কামাব নমঃশূদ্র প্রতিবেশী আছে আগে তাদের বিধবা বোন আব মেয়েদের ভিতর থেকেই এ সব প্রয়োজন মিটত। কিন্তু এখন দিনকাল বদলেছে। পুরুষদের মজুরিব রেট হযেছে এখন দু'তিন টাকা। ফলে মেয়েদের মান-সম্মানের দিকে চোখ পড়েছে। কি মেয়ে কি পুরুষ, ঝি চাকর খাটতে আর কেউ রাজী নয়।

ঘুবে ঘুবে দু'তিন বাড়িতে গিয়ে ইসারা ইঙ্গিতে কথাটা পেড়েও দেখলাম। কিন্তু কেউ বলল, 'দেহ ভালো নয়. নিজেব সংসাবেই নানান ঝামেলা', আবার কেউ বা পরিষ্কাব মাথা নেড়ে জানাল, 'না কর্তা, সমাজে তা'লে কথা উঠবে।'

তা তো উঠবে, কিন্তু এদিকে বাইরের কাজকর্ম করাব জন্যে একজন মেয়েছেলে আমাদের যে না হ'লেই নয।

সবচেয়ে অসুবিধা জলের। আধ-মাইলটাক দূরে নদী। ফাল্গুনেই জল হাঁটুব নীচে নামতে চায়। তাও বাত থাকতে থাকতে, খুব ভোব-ভোব সময়ে গিয়ে পৌঁছলে সেটুকু দেখা যায়। একটু বেলা হয়ে গেলেই ঘোলা হ'তে হ'তে সেই জল তরল কাদায় রূপান্তবিত হয়। তিন ননদে-বৌদিতে প্রথম দিন দুযেক কলসী কাঁখে বেশ সোৎসাহে স্নান-যাত্রা শুরু কবেছিল, কিন্তু তৃতীয় দিনে দেখা গেল তাদের মধ্যে দুজনের উৎসাহে ভাঁটা পডেছে; বলবার কিছু নেই। দীর্ঘকালেব নাগবিক অভ্যাস বদলানো শক্ত। মনের জোব জিহ্বায় যত সহজে সঞ্চারিত হয় অন্য সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তত সহজে হয়ে ওঠে না।

জলেব পর আগুন। বান্না কবতে গিয়ে সুলতাব প্রায চোখ ছল ছল ক'রে ওঠে আর কি! শহবেব মত কয়লা এখানে মেলে না। শক্ত কোনো রকম জ্বালানি কাঠেরও ব্যবস্থা কবা যায়নি। উমা আর রমা দু'জনে মিলে বাগান থেকে কিছু শুকনো পাতা আব ছিটকে ডাল সংগ্রহ ক'বে এনেছে। আহার্য তৈবিব তাই একমাত্র ভবসা। আমি অবশ্য আশ্বাস পেয়েছি ও আশ্বাস দিয়েছি যে শীগগিরই এর একটা সুব্যবস্থা হবে। নিষ্পত্র শুকনো শুকনো ডাল নিয়ে যে সব গাছ এখনো সোজা হয়ে দাঁড়িযে আছে তাবাই জ্বালানিরূপে সুলতাব উনানের পাশে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকবে। কেবল জন দুয়েক কামলা মিললেই হয়।

পৈতৃক বাড়িতে মাসখানেকের জন্যে সপরিবারে বিশ্রাম এবং চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে এসেছি। কিন্তু ঝি-চাকরেব আর কামলা-কৃষাণের অভাব প্রতি মুহূর্তে অস্তিত্বকে দুঃসহ ক'রে তুলল।

পাশেব গাঁ থেকে পিসেমশাই অবশেষে এনে হাজির করলেন ঝি। তাঁর প্রজা বুড়ো ভুবন মণ্ডলের বিধবা মেয়ে। আকালের বার ভুবন মারা যাওয়ায় তাঁর বাড়িতেই এতদিন ছিল। এবার তিনি তাকে নতুন চাকরিতে ভরতি ক'রে দিতে চান।

বললুম, 'আপনার চলবে কি ক'রে?'

পিসেমশাই বললেন, 'সেজন্যে ভেবো না। তোমার পিসীমা একাই একশ'। কাজকর্ম দেখে যদি পছন্দ হয় তুমি ওকে কলকাতায়ও নিয়ে যেতে পারো। শুনেছি সেখানেও ঝিরা নাকি সব-রাজার ঝি হয়েছে।'

তামাক খেয়ে পিসেমশাই বিদায় নিলেন। আমি অন্দরে গেলাম ঝি সম্বন্ধে ওদের মতামত শুনতে। কিন্তু চাঁদ হাতে পাওয়ার মত সুখের ভাব কারোরই দেখলাম না। সুলতা আর উমা দু'জনে গম্ভীর হয়ে ব'সে রয়েছে। রমা হাসছে মুচকে মুচকে।

তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ব্যাপাব কি, ঝি পছন্দ হয়েছে তো?'

সুলতা বলল, 'আচ্ছা, পিসেমশাই না হয় বুড়োমানুষ, তাঁর রুচির কথা ছেড়েই দিলাম। কিন্তু তোমার কি সঙ্গে চোখ ছিল না?'

উমা বলল, 'রাগ কোরো না দাদা, চোখ মানে এখানে চশমা।'

বললুম, 'দুই-ই ছিল ব'লেই তো মনে হচ্ছে। কিন্তু তোমাদের এ ধবনের সন্দেহেব কারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

উমা বলল, 'দেখা যাক, আর একবার দেখে যদি পারো।' ব'লে উমা একটু উচ্চকণ্ঠে ডাকল, 'ওগো, একবার এদিকে এসো তো, বাড়ির কর্তা তোমাব সঙ্গে আলাপ করবেন।'

ঘরের পিছনে ব'সে জ্বালানির জন্যে দা' দিয়ে শুকনো কঞ্চিগুলিকে ঝি ছোট ছোট ক'বে কেটে রাখছিল। উমার ডাক শুনে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। আটহাতি ধুতির আঁচলটুকু মাথায় টেনে দিতে বার দুয়েক চেষ্টা করল কিন্তু কোনোবারই মাথায় আব তা বইল না।

সুলতা ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, 'চেহারাখানা দেখ একবার।'

এতক্ষণ চেহারার কথা আমার মনেই হয় নি। ঝির আবার কেউ চেহারা দেখে নাকি। বিশেষত সারা গ্রাম খুঁজলে যা একটি মেলে না, তার চেহারা কি রকম কে দেখতে যায়।

সুলতার অনুবোধে ওর দিকে এবার তাকিয়ে দেখলাম। বোঝা গেল এতক্ষণ কেন সুলতা আর উমার মুখ গম্ভীর দেখাচ্ছিল, কেনই বা রমা হাসি চাপতে পারছিল না।

বছব তিরিশেক হবে বয়স। লম্বা ছিপছিপে একটি গাবের চারার মত চেহারা, কোনো অঙ্গে যে বিশেষ রকমেব খুঁৎ কিছু আছে তা নয় কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কোনো রকম সামঞ্জস্যই যেন নেই। অত বড মুখে নাক এবং চোখ দুটিকে ভারি ছোট মনে হয়। দেহের তুলনায় হাত দুখানিও খুব খাটো এবং নিচের অংশ কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত রকমের লম্বা। চেহাবায় পুরুষালি ধরনটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। আসলে ও যেন মেয়ে নয়, মেয়ে সেজে এসেছে এবং সাজটা সম্পূর্ণ করার দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য নেই। ঝির আঙ্গিক গঠনের এই বৈসাদৃশ্যই রমাকে হাসিয়েছে এবং সুলতাকে বিরক্ত ও গম্ভীর ক'রে তুলেছে বুঝতে পারলাম। সুলতার ইচ্ছা বাড়ির প্রত্যেকটি আসবাব যেন সুন্দব হয় এবং গৃহকর্ত্রীর সুরুচি এবং সৌন্দর্য-নিষ্ঠার সাক্ষ্য দেয়।

একটু চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার নাম কি?'

কর্কশ পুরুষের কণ্ঠে জবাব এল, 'রসো।'

ওর পৌরুষের আধিক্য স্ত্রীসুলভ লজ্জা অনুভব ক'রে একটু কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বললাম, 'কাজকর্ম সব দেখে নিয়েছে? সব পারবে তো করতে?'

রসো বলল, 'কেন পারব না? এদেশের মানুষ না আমি, না বিলেত থেকে এসেছি?'

সুলতা বলল, 'তা তো আসোনি। কিন্তু মাথাটাকে অমন ন্যাড়া কদমছাঁটা করেছ কেন? চুলগুলি কি দোষ করল?'

রসো এবার লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসল। বলল, 'আর বলবেন না বউঠাকরুণ। দিনরাত উকুনের জ্বালায় অস্থির হয়ে বেড়াতাম। মাথা ভ'বে কেবল চুলবুল চুলবুল করত। যত সব অশান্তির বাসা। শেষে রাগ ক'রে দিলাম একদিন ছেঁটে।'

সুলতা রুক্ষ কণ্ঠে বলল, 'বেশ করেছ।'

ব্যক্তিগতভাবে চুলের ভারি যত্ন করে সুলতা। তেল মাখিয়ে শুকানোয়, বেণী কি কবরী রচনায় অনেকটা সময় তার ব্যয় হয়। কিন্তু তার প্রতিটি মুহূর্ত সে যেন আলাদা আলাদা ক'রে উপভোগ করে। সুলতার জন্যে সত্যিই কষ্ট বোধ করলাম।

সুলতা পিছিয়ে এল তো উমা গেল এগিয়ে। দ্বিতীয় দিনে আমার বিনা অনুমতিতেই সুটকেস থেকে পুরনো সরু নকসী-পেড়ে ধুতিখানা বের ক'রে আনল। আলনা থেকে নামিয়ে নিল নিজের

আধ-পুরনো সাদা সেমিজটা। তারপর রসোর কাছে গিয়ে বলল, 'ওখানা ছেড়ে এগুলি পরো দেখি, ওভাবে তুমি ত দিব্যি স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করো, এদিকে আমরা যে চোখ তুলে তাকাতে পারি না। ছি ছি!'

রসো অত্যন্ত বিব্রত বোধ করল। তারপর উমার দেওয়া সেই ধুতি আর সেমিজটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে আড়ালে চ'লে গেল।

কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই দেখি সেই আটহাতি জীর্ণ ময়লা চীর প'রে সে বেশ আরামে স্বচ্ছন্দে কাজ-কর্ম করছে।

উমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'ওমা, সেই ধুতি আর সেমিজ কি করলি?'

রসো অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, 'ছেড়ে রেখেছি। ভারি বাধো-বাধো ঠেকে। আর পরতে না পরতেই যা ঘামাচি উঠেছে, দেখবেন?'

উমা বিকৃত মুখে বলল, 'থাক্, তোমার ঘামাচি দেখে আমাব আর দরকার নেই।'

আরো দিন কয়েক কাটল। দেখা গেল অবস্থার মোটামুটি উন্নতি হয়েছে। রসোর কদমছাঁটা মাথা, আঙ্গিক শ্রীহীন বৈসাদৃশ্য এবং পরিধেয়ের হ্রস্বতা নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না। কাজকর্মে সবাইকেই সে তুষ্ট করেছে। রান্না এবং খাওয়া ছাড়া প্রায় কোনো কাজেই সুলতাদের হাত দিতে হয় না। কলসীতে কলসীতে নদী থেকে জল নিয়ে আসে রসো। এত জল যে, তাতে সুলতাদের স্নান পর্যন্ত শেষ হয়ে যায়।

জ্বালানি কাঠের কোনো অভাব নেই আজকাল। শুকনো পাতা আর কঞ্চিব খণ্ড নয়, অবসব মত বিকেলে বিকেলে ছোট কুড়ুলখানা নিয়ে আম আর গাবগাছের শুকনো গুঁড়িগুলি বসো চেলা ক'বে দেয়। তার সে রূপ নাকি চোখ পেতে দেখা যায় না। মাথায় কোনো কালেই রসোব কাপড় থাকে না। বুকের আঁচল কোমবে জড়িয়ে নেয়। তাবপর লোহার মত শক্ত আমেব গুঁড়ির ওপর মুহুর্মুহু তার কুড়ুল পডতে থাকে; দর দর ক'রে ঘাম ঝ'রে পড়ে পিঠ বেয়ে।

সুলতা মাঝে মাঝে মিনতি ক'রে বলে, 'থাক্ না রসো, এসব পুরুষেব কাজ তোমাকে করতে হবে না।'

কুড়ুল থামিয়ে রসো তার বিপুল মুখখানাকে বিকৃত ক'রে জবাব দেয, 'আহাহা, কি সোহাগের কথাখানা গো! আমাকে করতে হবে না তো করবে কে শুনি? চাকর-বাকর, কামলা-কৃষাণ আছে দু'চার গণ্ডা, না দাদাবাবু নিজে এসে করতে পারবে? কোপ দেওয়া দূরে থাক্ কুড়ুলখানা যদি ভালো ক'রে ধরতে জানতো তবু না হয বুঝতাম। গুণের ওই তো একখানা সোয়ামী। এবপর আবাব পুরুষেব কাজ আর মেয়েমানুষেব কাজ ব'লে বকাবকি করছ বউঠাককণ?'

নায়ক নায়িকার সংলাপ রচনা করতে করতে হঠাৎ কথাগুলি আমাব কানে যায়। কিছুক্ষণের জন্য কলমটি স্তব্ধ হয়ে থাকে কিন্তু রসোর কুড়ুলের খট্ খট শব্দ চলতে থাকে অবিরাম।

খানিক বাদে রসো আবার এসে আপোষ করে সুলতার সঙ্গে।

'সোয়ামীর নিন্দা করলাম ব'লে রাগ করেছ নাকি বউঠাকরুণ?'

সুলতা হাসি গোপন ক'রে বলে, 'করেছিই তো। নিন্দা শুনলে বাগ হয় না? তোর হ'ত না?'

জানলা দিয়ে চোখে পড়ল রসো তার বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে ধরেছে, 'হুঁ, এইটে হ'ত!'

উমা হঠাৎ ধমকের সুরে বলে, 'ছিঃ, ওসব কি!'

রসো পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যায়, 'কাজের কথা বলছিলে বউঠাকরুণ। কাজের কি আবার মেয়ে পুরুষ আছে। যে যা জানে তার সেই কাজ। তাই তাকে মানায়।'

রমা হেসে ওঠে, 'বাব্বাঃ, আমাদের রসরাজ যে আবার বক্তৃতা দিতেও জানে দেখছি বউদি!'

রসোর পৌরুষকে স্বীকার ক'বে নিয়ে ওরা তার নাম রেখেছে রসরাজ। চালচলনে রুচিতে প্রসাধনে নিজেদের সঙ্গে রসোর মিল নেই। এ নিয়ে মনে আর কোনো ক্ষোভ নেই সুলতার, চোখ আর পীড়িত হয়ে ওঠে না। ওর বেশে-বাসে, আচারে-ব্যবহারে লজ্জা পাওয়ার কি আছে। ও যে কেবল আমাদের নিজেদের শ্রেণীর মেয়ে নয় তাই নয়, ওর মধ্যে কোনো শ্রেণীর কোনো নারীত্বই নেই।

আরো একটি ঘটনায় এ কথার ভালো রকম প্রমাণ হয়ে গেল। আমাদের বাড়ির পাশের বাড়িতেই থাকেন কুঞ্জ কবিরাজ। ছেলেপুলে নেই, বছর কয়েক আগে স্ত্রী মারা গেছে। আর একবার বিয়ের চেষ্টা করছিলেন কিন্তু মাথার চুল সব পেকে যাওয়ায় কোনো মেয়ের বাপ রাজী হয়নি, পাড়ার ছেলেরাও শাসিয়েছে। অগত্যা বড়ি আর দাবার ব'ড়ে নিয়েই কবিরাজের দিন কাটে।

আমি বাড়ি এসেছি শুনে দাবার পুঁটলি হাতে রোজ আমাদের বাড়িতে তিনি আসা শুরু করলেন। বললাম, 'কিন্তু দাবাখেলা তো আমি জানিনে কবিরাজ মশাই।'

কবিরাজ মশাই নাছোড়বান্দা। বললেন, 'জানো না, জানতে কতক্ষণ?'

প্রথম দিন-কয়েক খুব বিরক্ত বোধ করতাম। কিন্তু ক্রমশ একটু একটু ক'রে রস পেতে লাগলাম। নেশা জ'মে উঠল।

তবু কবিরাজের মত জিততে পারি না, চালও দিতে পারি না তাড়াতাড়ি। ভাবতে হয়। অনেক সময় লাগে।

কবিরাজ কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থাকেন তারপর অধীরভাবে বলেন, 'না হে, তুমি যে রাত ভোর ক'রে দিতে চললে দেখছি। ব'সে ব'সে আমি কি করি বলো তো। অন্তত একটু ধোঁয়া-টোয়ার ব্যবস্থা করলেও না হয় বুঝতুম।'

লজ্জিত হয়ে পরদিন থেকে কবিরাজ মশায়ের জন্য তামাকের ব্যবস্থা ক'রে দিলাম। হুঁকো কলকে এলো, মাটির ভাঁড়ে রইল মাখা তামাকের গুলি, আগুন-মালসায় দগদগ করতে লাগল চেলা কাঠের আগুন। নবাবী শিষ্টাচারে আরো এক ধাপ অগ্রসর হ'লাম। রসোকে ডেকে বললাম, 'রাত্রে তো কোনো কাজ নেই। এখানে কাছাকাছি থাকবি, কবিরাজ মশাই যখন তামাক চাইবেন, সেজে দিবি তামাক '

রসো হাত মুখ নেড়ে বলল, 'আহাহা, কি সোহাগের কথা গো, ওঁরা রাত ভ'রে দাবা খেলবেন আর আমি ব'সে ব'সে কেবল তামাক ভ'রে দেব! আমার বুঝি আর মানুষেব গতর নয়।'

ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতেই রসো অত্যন্ত অপ্রতিভ এবং সংকুচিত হয়ে বলল, 'ব'কো না দাদাবাবু, মুখে বললুম ব'লে, তোমার কথা কি সত্যিই অমান্য করতে পারি। তুমি হচ্ছ মনিব।'

সুবন্দোবস্তের ফলে কবিরাজ মশায়ের তামাকের তৃষ্ণা ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল। এক ছিলিম শেষ হ'তে না হ'তে আর এক ছিলিম রসোকে সাজতে বলেন। দুটো দিন যেতে না যেতে বড় বড় এক-একটা গুলি কাবার হয়ে যায়। কিন্তু এ নিয়ে বলি-বলি ক'রেও কবিরাজ মশাইকে কিছু বলতে ভারি সংকোচ হয়। ভাবি, আর ক'টা দিনই বা।

কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এবং আকস্মিকভাবে যে দাবা আব তামাকের ওপর যবনিকা পড়বে ভাবতেই পারিনি। সুলতারা এ নিয়ে অনেকবার অনেক রকম মন্তব্য করেছে, কানে তুলিনি। কিন্তু সে রাত্রে ব্যাপার ঘটল একেবারে ভিন্ন রকম।

একটু বেশি রাত হয়ে যাওয়ায় এবং ওরা বারবার আপত্তি করতে থাকায় খেলা অসমাপ্ত রেখেই কবিরাজ মশাইকে বিদায় দিলাম। কবিরাজ মশাই নিতান্ত অনিচ্ছায় পুঁটুলি বেঁধে উঠে পড়লেন। বললেন, 'বড় বেরসিক লোক হে, একেবারে স্ত্রীব আঁচলধরা হয়ে পড়েছ।'

হেসে বললাম, 'সেটা তো রসিকেরই লক্ষণ। সে আঁচল যে বসে একেবারে ভিজে জবজবে হয়ে থাকে, তা কি এর মধ্যেই ভুলে গেলেন?'

রসো যে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল লক্ষ্য করিনি। তার হাসির শব্দে চমকে উঠলাম। চমকালেন কবিরাজও। এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'রসো, আলোটা একটু ধরো তো, ভারি অন্ধকার রাস্তা।'

বললাম, 'আমি দিচ্ছি এগিয়ে।'

রসো তাড়াতাড়ি হ্যারিকেনটা তুলে নিয়ে বলল, 'না দাদাবাবু, আপনি থাকুন। পথঘাট ভালো নয়, আমিই যাচ্ছি।'

ঘরে গিয়ে সুলতার অভিযোগের জবাব দিতে চেষ্টা করছি হঠাৎ বাগানের ভিতর থেকে কবিরাজ মশায়ের তীব্র আর্তনাদ শুনে চমকে উঠলাম। ব্যাপার কি! সাপটাপ পড়ল নাকি রাস্তায়!

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। পিছন থেকে রমা আর উমা ভীত কণ্ঠে বলল, 'একটা আলো নিয়ে যাও দাদা। অমন অন্ধকারে যেয়ো না।'

খানিকটা যেতে না যেতেই বিস্মিত হয়ে দেখলাম, কবিরাজ মশায়ের একখানা হাতের কবজি শক্ত ক'রে ধ'রে রসো তাকে হিড়হিড় ক'রে আমাদের বাড়ির দিকে টেনে আনছে।

বললাম, 'ব্যাপার কি রসো ?

রসো একটা অশ্রাব্য গালি দিয়ে উঠল : 'হতচ্ছাড়া মুখপোড়া বুড়ো আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল বাগানের মধ্যে '

কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। তারপর বললাম, 'ছেড়ে দাও ওঁকে। এসব কি কাণ্ড কবিরাজ মশাই ?

কবিরাজ মশায়ের চেহারাটা অত্যন্ত করুণ দেখাল। গরম চিমনির ছাপ লেগে গালের খানিকটা পুড়ে গেছে ' হাত ছেড়ে দিতে মনে হ'ল কব্জিটা তাঁর মচকে গেছে। বিস্মিত হয়ে ভাবলাম রসো সম্বন্ধে এমন ভুল এমন মোহ, তাঁর হ'ল কি ক'রে ? রসোর অন্তরে বাহিরে সত্যিই কি নারীত্ব ব'লে কিছু আছে ?

মহকুমা শহর থেকে টীকাদার এসেছে বসন্তের টীকা দেওয়ার জন্যে। রোগটা প্রত্যেকবারই এই সময়টায় এ অঞ্চলে বেশ একটু ছড়িয়ে পড়ে। আগে থেকেই সাবধান হওয়া ভালো।

অন্য সব বাড়ি সেরে প্রায় দুপুরের সময় টীকাদার আমাদের বাড়িতে এল। মেয়েরা প্রথমটায় কিছুতেই টীকা নেবে না। টীকাদার বার বার অনুরোধ ক'রে বলতে লাগল সব তো আমার মা লক্ষ্মী। আমার কাছে আবার লজ্জা কি আপনাদের ?

সুলতাদের বললাম, দোষ কি। নাওনা টীকা।

বারান্দায় চেয়ার পেতে টীকাদারকে বসতে দেওয়া হ'ল। পাড়ার কৌতূহলী ছেলেমেয়েরা টীকাদারের পিছনে পিছনে এসেছিল। ধমক খেয়ে আর তারা এগুলো না।

শত হলেও বাইরের একজন লোকের সামনে বেরুতে হবে। আবাল্যের অভ্যাস মত তিনজনই শাড়িটা বদলে নিল, আয়নার সামনে গিয়ে দেখে নিল মুখখানা। তারপর টীকা নেওয়ার জন্য বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

রসোও এসেছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী চোখে দেখছে সব চেয়ে চেয়ে।

টীকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টীকাদারের সঙ্গের লোকটি একটি খাতায় নাম লিখে নিচ্ছে।

রমার টীকা দেওয়া হয়ে গেলে লোকটি বলল, 'ওঁর নামটা ?'

বললাম, 'ডাকি তো রমা রমা ক'রে। ভালো নামটাই লিখুন, কাবেরী রায়।'

উমার পোশাকী নাম উজ্জয়িনী। সুলতার শুচিস্মিতা।

এবার রসোর পালা। টীকাদারের কাছে ঠিক মধুরেণ সমাপয়েৎ হ'ল না। রসোর শক্ত শাবলের মত হাতখানায় নিতান্ত নিস্পৃহভাবে সরু ছুরি দিয়ে গোটা তিনেক আঁচড় কেটে টীকাদার পরম অবহেলায় জিজ্ঞাসা করল, 'নাম ?'

বললাম, 'রসো। রসো একবার আমার দিকে তাকাল, চোখ বুলিয়ে নিল সুলতাদের দিকে, তারপর টীকাদারের দিকে চেয়ে মোলায়েম গলায় বলল, 'না টীকাদার মশাই, আমার নাম রসমঞ্জরী।'

অবাক হয়ে রসোর দিকে তাকালাম। তার বেশবাসের সংস্কারের দিকে আজ আর কেউ লক্ষ্য করেনি। এতদিনে লক্ষ্য না করাটাই সকলের অভ্যাস হয়ে গেছে। রসোর পরনে সেই আটহাতি ময়লা ধুতি। কয়েক জায়গায় ছেঁড়া।

টীকাদাররা চ'লে গেলে বললাম, 'আমরা তো জানতাম না। এ নাম তুই কোথায় পেলি রে ?'

রসো ভারি লজ্জা পেয়ে মুখ নিচু করল। তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'পাবো আবার কোথায় ? পোড়ারমুখো কবরেজ সেদিন ওই নামেই ডেকেছিল।'

শ্রাবণ ১৩৫৩

রত্নাবাঈ

কাহিনীটি আবীবচাদ রূপচাঁদেব আত্মজীবনাত্মক। বিভিন্ন সন্ধ্যায় বিভিন্ন প্রসঙ্গে এ কাহিনীব তিনি আভাস দিলেও প্রধানত একটি বিশেষ দিনেব বৈঠকেই আমূল আখ্যানটি তাঁব কাছ থেকে জানতে পেবেছিলাম। অবশ্য স্মৃতিব পুনরুদ্ধাব কবতে গিয়ে অন্যান্য দিনেব আলাপ-আলোচনাব কিছু কিছু অংশ যে এ কাহিনীব মধ্যে মিলে যায়নি এ কথা জোব ক'বে বলতে পাবব না। এটুকু রূপান্তব ছাড়া আব যা অদল-বদল হয়েছে তা নিতান্তই ভাষান্তবেব। তাঁব প্রাদেশিক মাবাঠি মিশ্রিত হিন্দীকে স্বকীয় ভাষায় অনুবাদ ক'বে নিয়েছি। তাতে ভঙ্গিটা একটু এদিক ওদিক হ'লেও ভাবেব বিশুদ্ধতা একটুও ক্ষুণ্ণ হয়নি, এ কথা নিঃসংশয়ে বলব।

মধ্য প্রদেশেব একটি নাতিখ্যাত শহবে আবীবচাঁদ রূপচাঁদেব সঙ্গে আমাব পবিচয় হয়েছিল। চাকবিতে ঢুকতে না ঢুকতেই সেই শহবেব শাখা-অফিসে আমাব বদলিব হুকুম এল। শুনে প্রথমটা উল্লসিতই হয়েছিলাম। এ উপলক্ষে নতুন একটা জায়গা অন্তত দেখে আসা যাবে। দেখলামও। গিয়েই সপ্তাহ দুয়েকেব মধ্যে অঞ্চলটিব ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আব নৈসর্গিক চমৎকাবিত্বেব নিদর্শনগুলি ঘুবে ঘুবে সব নিঃশেষ কবে ফেললাম। ভাঙাচোবা যত দুর্গ আব মন্দিব, হ্রদ আব জলপ্রপাত, চাবদিকেব ছোট বড নানা আকাবেব পাহাড়েব বেষ্টনী একাধিকবাব প্রত্যক্ষ কবলাম। তাব পব এল ক্লান্তি। মাঠঘাটেব সমতলে ছাড়া পাওযাব জন্য চোখ তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠল, মন ছটফট কবতে লাগল কলকাতাব স্বজন-বন্ধুদেব জন্য। কিন্তু ছটফট কবলে তো উপায় নেই। এ তো আব হাওযা বদল নয় যে মনেব মধ্যে উল্টো হাওযা বইতে সুরু কবলেই গাড়িতে উঠে বসব। এমনি যখন মনেব অবস্থা, আবীবচাঁদ রূপচাঁদেব সঙ্গে হঠাৎ একদিন আলাপ হয়ে গেল। আলাপ এব আগেও যে কোন একদিন হ'তে পাবত। আমাদেব অফিসেব পাশেই তাঁব বাড়ি। শুনেছিলাম, শহবেব অন্য দিকে তাঁব মাববেল পাথবেব ব্যবসা আছে। এই ষাট বছবেব সাধাবণ-দর্শন পাথবেব ব্যবসাযীটি সম্বন্ধে আমাব তেমন কোন ঔৎসুক্য ছিল না। আমাব সম্বন্ধে ওঁবও যে বিশেষ কোন কৌতূহল ছিল এমন আমাব মনে হয়নি। ঢুকতে বেরুতে প্রায়ই চোখে পড়ত বাবান্দায় ইজিচেযাবে হেলান দিয়ে তিনি সামনেব পাহাড়টিব দিকে চেয়ে আছেন। ভ্রমণে ক্লান্তি আসাব পব অফিস অন্তে আমিও বই নিয়ে চেযাব পেতে তেতলাব বাবান্দায় বসতে শুরু কবলাম। অফিসেব ওপবতলায় আমাদেব বাস ও আহাবেব ব্যবস্থা ছিল। পব পব তিন-চাব দিন বোধ হয় তিনি আমাকে অসময়ে চুপচাপ বসে থাকতে লক্ষ্য কবেছিলেন। তাব পব হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাব সময় তিনি আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবুজী আজকাল যে বেড়াতে বেরুচ্ছেন না? বেড়াবাব এই তো সময়।'

বললাম, 'আব কোথায় বেড়াব। বেড়াবাব মত নতুন জায়গা আব নেই, সব প্রায় দেখা-শোনা হয়ে গেছে।'

তিনি একটু হাসলেন, 'জায়গাব আব দোষ কি। যে বেগে ছুটছিলেন তাতে দু' সপ্তাহে গোটা পৃথিবীও বোধ হয় দেখা হয়ে যায়, আব এ তো সামান্য একটা পাহাড়ে শহব। কিন্তু ও-ভাবে নয়, আবো ভালো ক'বে দেখুন বাবুজী। কেবল দেশ নয়, দেশেব লোকজনও দেখুন, তবে তো পুবোপুবি দেখা হবে।'

উপদেশটি মামুলী বৃদ্ধজনোচিত, কিন্তু বলবাব ভঙ্গিটা ভালো লাগল। হেসে বললাম, 'আপনার কথা মনে বাখব। আব দ্বিতীয় পর্যাযেব দেখাটা আমাব বর্তমান প্রতিবেশীকে দিয়েই শুরু কববাব ইচ্ছা বইল।'

তিনি হেসে উঠলেন, 'বহুৎ আচ্ছা, আজই আসুন না আপনি। তবে বুড়ো মানুষকে দেখতে আসা মানেই কিন্তু তাব কথা শুনতে আসা বাবুজী, তা মনে বাখবেন।'

ক্রমে আলাপ জমে উঠল। দেখলাম তিনি মিথ্যা বলেননি, কথা তিনি একটু বেশিই বলেন। তবে তাব সবই রূপকথা, উপদেশ নির্দেশ নয। ফলে ভযেব বদলে ভক্তি এল, বীতিমত অনুবক্ত হযে উঠলাম তাঁব। সময চমৎকাব কাটতে লাগল।

তিনি চা খান না। আমিও চা ছেড়ে ভাঙেব সববৎ ধবলাম। তাবপব এ অঞ্চলেব পুবনো মন্দিবগুলিব নামেব কিংবদন্তী প্রসঙ্গে সেদিন তাঁকে কথায কথায জিজ্ঞাসা ক'বে বললাম, 'আচ্ছা, এত কথা তো বললেন, শেঠজী, কিন্তু আপনাব নামেব ইতিহাসটুকু তো কিছুই বললেন না।'

আবীবচাঁদ রূপচাঁদ একটু যেন বিস্মিত ভঙ্গিতে আমাব মুখেব দিকে তাকালেন, 'নামেব আবাব একটা ইতিহাস কি বাবুজী! এ কি কোন দুর্গেব না মন্দিবেব নাম, যে কিছু একটা কিংবদন্তী থাকবে?'

বললাম, 'নেই বুঝি? নামটি কিন্তু আপনাব সত্যিই চমৎকাব। যৌবনে বোধ হয আপনি সুপুরুষ ছিলেন।'

পলকেব জন্য আবীবচাঁদ রূপচাঁদেব দাড়ি-গোঁফ-চাঁছা কুঞ্চিত বেখাসঙ্কুল মুখে কেমন একটা ছাযা পড়ল। কিন্তু তাব পবেই তিনি সহাস্যে বললেন, 'উহুঁ, তোমাব অনুমান সত্য নয বাবুজী, এই একষট্টি বছব বযসে রূপ আমাব সবে খুলতে সুরু কবেছে। এ ধবনেব প্রশ্ন কিন্তু তাই বলে আজ শুরু হযনি। সাঁইত্রিশ বছব আগে আবো একজনেব মুখে শুনেছিলাম। আমাব নাম আর নামেব অর্থ নিযে সে-ও উপহাস কবেছিল।'

একটু ব্যথিত হযে বললাম, 'আমি কিন্তু আপনাকে ঠিক উপহাস কবিনি শেঠজী।'

আবীবচাঁদ রূপচাঁদ অন্যমনস্কেব মত বললেন, 'তা জানি।'

বললাম, 'কিন্তু আমাব মনে হচ্ছে, সাঁইত্রিশ বছব আগেব সেই মুখ নিশ্চযই খুব সুন্দব ছিল। না হলে সে মুখেব কথা এতদিন ধ'বে আপনি মনে কবে বাখতেন না।'

আবীবচাঁদ মৃদু হাসলেন 'এবাবকাব অনুমান তোমাব মিথ্যা হযনি বাবুজী। তুমি ঠিকই বলেছ। সে মুখেব মত মুখ আমি জীবনে আব দেখিনি।'

বললাম, 'আপনাব ভাগ্য ভালো, আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন। আমি তো আব তেমন ভাগ্য নিযে আসিনি। আমাকে এ যাত্রা শুধু শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। দোহাই আপনাব, এই শোনাব আনন্দটুকু থেকে আমাকে বঞ্চিত কববেন না।'

আবীবচাঁদ তেমনি স্মিত হাস্যে আমাব দিকে তাকালেন 'ভাবি জববদস্ত লোক তুমি বাবুজী! খুঁচে খুঁচে মানুষেব গোপন কথা টেনে বাব কবতে তোমাব জুড়ি নেই। আচ্ছা, শোন তা'হলে। গোড়া থেকেই বলি।'

বযস তখন আমাব কম হযনি। চব্বিশ পেবিযে গেছে। সে বযসে আমাদেব সমাজে তখনকাব আমলে লোকে একেবারে পাকা-পোক্ত সংসাবী হযে বসত। ছেলে হত, মেযে হত, মান-সম্মান ধন-দৌলত তখন থেকেই দানা বাঁধতে শুরু কবত। কিন্তু গোড়াতেই আমি বড় বেদাবায চলে গিযেছিলাম বাবুজী! শুকনো কেতাবেব পাতায আমাব মন বসল না, বাঁধা পড়ল না বাবাব কাববাবেব খেবো বাঁধা খাতায, সে মন কেবলই উড়ু উড়ু কবতে লাগল, কেবলই চাইল ভেসে-ভেসে বেড়াতে।

বাব' বাগ কবে বললেন, 'এমন অপদার্থ আমাদেব বংশে আব জন্মাযনি। ও আমাব বিষয আশয সব ছাবখাবে দেবে তবে ছাড়বে।'

মা বললেন, 'তা নয়, যেমন ভাবভঙ্গি দেখছি, এ ছেলে নিশ্চযই একদিন সন্ন্যাস নেবে। ভালো চাও তো বিযে দিযে এখনো আটকাও।'

বাবা শুনে শ্লেষের হাসিতে ঠোঁট বাঁকালেন। আমাব তখনকাব চাল-চলন স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে বাবা যতখানি জানতেন, মা ততখানি বিশ্বাস কবতেন না।

মা'র কোন দোষ ছিল না। ছেলে যতদিন কোলের মধ্যে আঁচলেব তলায় থাকে ততদিনই মা'ব তার ওপব পুরোপুরি অধিকার। তাবপব আঁচলের গিঁট যেদিন খোলে, হাতের মুঠিতে ছেলেকে

সেদিন আর ধরা যায় না, বুদ্ধি দিয়ে ছোঁয়া যায় না তার মন, অন্ধ-বিশ্বাস ছাড়া তাঁর আর কি সম্বল থাকে বলো ?

কিন্তু বাবার শাসন, তিরস্কার আর অবিচার-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সন্ন্যাসী হওয়ার দিকে ঝোঁক যে এক সময় আমার না গিয়েছিল তা নয়। ঈশ্বরের কাছে নালিশ জানাবার জন্য জলভরা চোখে আকাশের দিকে তাকিয়েও ছিলাম, কিন্তু চোখ আমার আকাশ পর্যন্ত গিয়েও পৌঁছল না, প্রতিবেশীর বাড়ির ছাদ পর্যন্ত গিয়েই আটকে রইল। বিকালের আলোয় দেখলাম একখানি অপূর্বসুন্দর মুখ। চোখ জুড়িয়ে গেল। অবিচারের কথা আর মনে রইল না, অভিযোগের কথা ভুলে গেলাম।

তারপর থেকে বহু কাল পর্যন্ত কেবল মুখ দেখে-দেখে ফিরেছি। গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্দরে। যত দেখেছি, তত দেখবার তৃষ্ণা বেড়েছে। দেশে দেশে সে মুখের আদল বদলে গেছে, বদলেছে মুখের ভাষা। কিন্তু পৃথিবীর সব দেশের ভাষাই যে সমান মধুর তা প্রত্যেক অঞ্চলের সুন্দরী তরুণীদের মুখে না শুনলে তোমার বিশ্বাস হবে না। বিদেশিনীর সঙ্গে তার নিজের ভাষায় প্রণয়ালাপের লোভে আমি বহু দুরূহ ভাষা আয়ত্ব করবার চেষ্টা করেছি। এক-আধটু ঢুঁ মেরেছিলাম তোমাদের বাংলা ভাষাতেও।

কিন্তু অনেক মুখ আর অনেক ভাষার কথা এখন থাক। একখানা মুখের কথাই আজ শোন।

রত্নাবাঈর নাম তখন উত্তর-ভারতে খুব ছড়িয়ে পড়েছে। রাজ-রাজড়া, নবাব-বাদশার বড় বড় ঘরে তার যাতায়াত, আনাগোনা। শুনলাম, তার রূপের দ্যুতিতে চোখ ঝলসে যায়, কণ্ঠের সুর আর নূপুরের নিক্কণ একবার শুনলে কান থেকে মিলাতে চায় না। লুব্ধ ভ্রমরের মতন মন উঠল চঞ্চল হয়ে। তাকে না দেখা পর্যন্ত চিত্তে শান্তি নেই।

যোগাযোগ আর হয় না। খবর পেয়ে আগ্রায় যাই, শুনি, দল বল নিয়ে রত্নাবাঈ গেছে এলাহাবাদে। সেখানে গিয়ে শুনি গেছে কলকাতায়। কলকাতা পর্যন্ত ধাওয়া ক'রে শুনতে পাই, পূর্ববঙ্গের কোন্ এক জমিদারের বজরায় নদীতে সে ভেসে বেড়াচ্ছে।

অবশ্য জলে সে বেশি দিন রইল না। ফের উঠল ডাঙায়। লক্ষ্ণৌ শহরে এক রাও সাহেবের নাচের মজলিসে অবশেষে একদিন তাকে দেখলাম।

তুমি হয়তো রূপের বর্ণনা শুনবার জন্য উন্মুখ হয়ে আছ বাবুজী! কিন্তু রূপ তো মুখে বর্ণনা করবার জন্য নয়, চোখে দেখবার জন্য। সেই চোখে দেখার রূপকে কতগুলি বাঁধা-ধরা শব্দে রূপান্তরিত ক'রে কতটুকু আর তোমাকে দেখাতে পারব ? তার দরকারও নেই। তাকে দেখবার লোভ ক'র না, তবু তার কথা শুনে যাও। কানের ওপর তুমি অনেকখানি নির্ভর করতে পার, সে তোমাকে সহসা পাগল করবে না, মাতাল করে তুলবে না। কিন্তু চোখ ? তাকে যদি তুমি একবার আস্কারা দাও বাবুজী, তোমার সমস্ত ইন্দ্রিয় অস্থির আর অশান্ত হয়ে উঠবে।

রত্নাবাঈকে দেখে আমারও তাই হল। আসব ভাঙল অনেক রাত্রে। রাও বাহাদুরকে ঘুম পাড়াতে রত্নাবাঈ'র আরও কিছুটা সময় লাগল। নতুন ক'রে কানে সুর ঢালল, গলায় সুরা ঢালল, অবশেষে ছুটি মিলল। আমি পিছনে পিছনে ছুটলাম গোলাপী রঙের নতুন একতলা কুঠিটায়, যেখানে তার বাসা ঠিক হয়েছে সেইখানে।

দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম, রত্নাবাঈ তার ভারহীন লঘু দেহাধার পালঙ্কে এলিয়ে দিয়েছে। পরিচারিকা পা থেকে ঘুঙুর খুলে দিচ্ছে, গা থেকে বেশবাসের বাঁধন শিথিল ক'রে দিচ্ছে। খানিক আগে যা ছিল সজ্জা, যা ছিল অলঙ্কার, এই মুহূর্তে নিতান্ত বাহুল্যের মত তা পরম অবহেলায় খসে পড়ছে।

ক্লান্তির এই অদ্ভুত রূপ আমাকে উন্মত্ত ক'রে তুলল। যে শব্দ রক্তের ঢেউয়ে আমার বুকের মধ্যে উত্তাল হয়ে উঠেছিল, দোরের করাঘাতে রত্নাবাঈ তারই প্রতিধ্বনি শুনল। পরিচারিকা অস্ফুট চীৎকার করে উঠল কিন্তু রত্নাবাঈ জ্বলন্ত মোমদানিটা তুলে নিয়ে সেই অর্ধনগ্ন বেশে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। জ্বলন্ত মোম ফোঁটায় ফোঁটায় গলে গলে পড়তে লাগল। মনে মনে ভাবলাম, আলাদা একটা মোমবাতির দরকার ছিল কি, রত্নাবাঈ নিজেই যখন এমন করে জ্বলতে জানে।

এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থেকে রত্নাবাঈ বলল, 'কে তুমি ?'

বললাম, 'এই অধম রূপভিক্ষুর নাম আবীবচাঁদ রূপচাঁদ।'

'আবীবচাঁদ রূপচাঁদ!'

এক ঝলক হাসি যেন উছলে পড়ল রত্নাবাঈ'র পাতলা, পদ্মেব পাপড়ির মত দুটি ঠোঁটের ফাঁকে। সেই হাসির ঝলকে সুধা ছিল না। কিন্তু অঞ্জলি পেতে যদি তা ধরা যেত তাহলে দু'হাতে আমি সেই হলাহল আকণ্ঠ পান করতাম।

তাবপব আমাব দিকে তাকিয়ে রত্নাবাঈ জিজ্ঞাসা কবল, 'এ নাম তোমার কে বেখেছে?'

দেখলাম মুখেব হাসি চাপা পড়লেও কৌতুকে ব্যঙ্গে বত্নাবাঈ'ব দু'টি চোখের হাসি তখনো উছলে পড়ছে। নিজেব রূপহীন প্রতিবিম্ব বত্নাবাঈর সেই ঝকঝকে দু'চোখেব আয়নায যেন নতুন কবে প্রত্যক্ষ করলাম।

বললাম, 'নাম রেখেছেন মা, মানাবে কিনা তা ভেবে দেখেননি, সে দায তো তাঁর নয়।'

রত্নাবাঈ বলল, 'তবে কাব?'

বললাম, 'প্রিয়াব। মা শুধু নাম বাখেন, ভঙ্গি দিয়ে সুব দিযে সে নামের মান রাখেন প্রিয়া। নিত্য নতুন মানে জোগান।'

পরম কৌতুকে ভ্রূ দু'টি নেচে উঠল বত্নাবাঈব, 'তাই নাকি? কিন্তু এখানে তোমাব নামের সেই মানে জোগাবে কে?'

বললাম, 'তুমি।'

হাসির ঢেউযে রত্নবাঈ যেন টুকরো টুকবো হয়ে ছড়িযে পড়ল, 'ওলো হীরাবাঈ, দেখ এসে আমার শেষ বাতেব প্রেমিক এসেছে। বেশ বেশ! এবার, দর্শনী বাবদ পঞ্চাশ গিনি গুণে দাও বন্ধু! তার পর ঘবে এস।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'পঞ্চাশ'।

বত্নাবাঈ বলল, 'হ্যাঁ, বন্ধু, পঞ্চাশ। তোমাব ভাব দেখে মনে হচ্ছে গিনিগুলি তোমাব সঙ্গে নেই। যাও নিযে এসো ঘর থেকে। আমি তোমার পথ চেয়ে বসে থাকব। এক বাত যদি ভোব হয ভেবনা আবও হাজাব বাত আছে। হাজাব বাত যদি ভোর হয, আছে লক্ষ বাত—'

খিল খিল কবে ফেব হেসে উঠে রত্নাবাঈ দোর বন্ধ কবে দিল।

অত টাকা সত্যিই সঙ্গে ছিল না, কিন্তু মনে মনে সংকল্প করলাম, যেমন কবেই হোক এই পঞ্চাশ গিনি জুটিয়ে আনব। তার পর সেই গিনিব মালা বত্নাবাঈয়ের চোখেব সামনে তুলে ধবব, সেদিন কৌতুকের বদলে লোভে তার চোখ চক্‌চক্ করবে। রুদ্ধ দ্বার খুলে যাবে। তার পব পলকেব জন্য হলেও সেই সুঠাম তনু-দেহ সম্পূর্ণ আমার আয়ত্তে আসবে। তাকে নিয়ে যা খুশি কবব।

ফিবে এলাম দেশে। উপার্জনের কোন বিদ্যা তখনো জানা ছিল না। বার কয়েক ক্যাস-বাক্স ভাঙবার পব বাবার দোকানে কি শোবার ঘরে ঢোকবাব হুকুম ছিল না, তাই নিতান্ত নিরুপায় হয়েই মায়ের গয়নার বাক্স ভাঙলাম। মা জেগে উঠে আমার হাত চেপে ধবলেন। আমার হাত তাঁর চোখের জলে ভিজে গেল, বললেন, 'এ গযনা যে তোর বউয়ের জন্য রেখেছি, আবীর!'

একবাব যেন মুখে কথাটা আটকে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সমস্ত সংকোচ ত্যাগ কবে বললাম, 'তার জন্য নিচ্ছি।'

কিন্তু ফের লক্ষ্ণৌয়ে রত্নাবাঈ'র আব দেখা পেলাম না। শুনলাম আবার সে কোথায় গাওনায় বেবিয়েছে। খুঁজতে বেরুলাম নতুন অধ্যবসায়ে কিন্তু কিছুতেই আর দেখা মিলল না, মাসের পর মাস কাটল, ঘুরে এল বছর। তারপর একদিন শোনা গেল, রত্নাবাঈ'র আব কোন উদ্দেশই পাওযা যাচ্ছে না। কেউ বলল সন্ন্যাসিনী হয়ে সে গেছে হিমালয়ের দিকে; কেউ বলল, বাঈজী-জীবনে বিতৃষ্ণা আসায় কুলবধূ সেজে ফের অজানা গাঁয়ের পাতার ঘরে ঢুকেছে, আত্মগোপন করেছে ওড়নার আড়ালে। সর্বশেষ জনশ্রুতি, তাব বুকে ব্যর্থপ্রণয়ীর ছুরি বিঁধেছে তাকে আর ইহলোকে পাওয়া যাবে না।

শূন্য হাতে ফের ঘরে ফিরলাম। রত্নাবাঈ'র দেখা না মিললেও পথে-ঘাটে ছোট-খাট মণি-মুক্তার

অভাব হয়নি। মায়ের গয়না তাদের বিলিয়ে দিয়ে এলাম। ভাগ্য ভালো, ঘরে কারো কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হোল না। ঘরে মা-কেও দেখলাম না, বাবাকেও না। শুনলাম দিন কয়েক আগে প্লেগে তাঁরা পঞ্চত্ব পেয়েছেন।

আবীরচাঁদ আমার দিকে তাকিয়ে এর পর মূহূর্ত কাল চুপ করে রইলেন। আমিও কোন কথা বললাম না।

কিন্তু পরমুহূর্তেই প্রসন্ন মৃদু হাসিটি তাঁর মুখে ফিরে আসতে দেখে আমি স্বস্তি বোধ করলাম। তিনি আবার শুরু করলেন—

অবশ্য মা-বাবার মৃত্যুকে অবিশ্বাস করবার জো ছিল না। প্লেগে সে-বার শহরের বহু লোক মারা গিয়েছিল, আত্মীয়-স্বজনদের কেউ কেউ তাঁদের মৃত্যুশয্যায় উপস্থিতও ছিলেন আর আমাকে এসে সান্ত্বনাও দিয়েছিলেন যে সাধ্যমত চিকিৎসার তাঁরা ত্রুটি করেননি। সুতরাং তাঁদের মৃত্যুশোককে বেশ স্বাভাবিক ভাবেই নিতে পেরেছিলাম। কিন্তু রত্নাবাঈ'র মৃত্যু বিশ্বাস করিনি। বিশ্বাস করবার আমার সাধ্য ছিল না। আমার ছুরি ছাড়া আর কারো ছুরি তার বুকে বিঁধতে পারে, এ কথা কিছুতেই আমার মনঃপূত হয়নি। আমার চেয়েও বেশি ব্যর্থ-প্রণয়ী তার আর কে আছে, বেশি ধার আছে কার ছুরিতে! তাই তার অনুসন্ধানে কোন দিন আমি নিরস্ত হতে পারিনি। অবশ্য অন্য কারো মুখ দেখে তার মুখ বলে মাঝে মাঝে যে ভুল না হয়েছে তা নয়; তার মুখ বলে ভুল হয় না এমন মুখ দেখেও মাঝে মাঝে ভুলেছি, কিন্তু রত্নাবাঈকে কোন দিনই সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'তে পারিনি। তার সেই আয়নার মত ঝকঝকে চোখ আমার সমস্ত পৃথিবীকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। তার ঠোঁটের সেই বিদ্রূপ-বাঁকা রূপ তীরের ফলার মত আমার সমস্ত জীবনকে এ-পিঠ ও-পিঠ বিদ্ধ করে রেখেছে। আমি কি করে তাকে ভুলব... শুধু খুঁজে খুঁজে কিছুতেই তাকে পাওয়া গেল না। মনের মধ্যে কাঁটার মত দিনের পর দিন সে বিদ্ধ হয়ে রইল চোখের সামনে, ফুলের মত কোন দিন ফুটে উঠল না।

বছর পনের বাদে সন্ধ্যার পরে এই ঘরেই বেশ জাঁক-জমকের সঙ্গে সেদিন গানের আর পানের অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। বয়সের দিক থেকে নিজে যৌবনের শেষ প্রান্ত ছুঁই-ছুঁই করলেও মনে-প্রাণে চাল-চলনে আমি অন্য প্রান্তেই ছিলাম। সহচরদের মধ্যে সকলেই ছিল শহরের যুবা-বয়সী ধনী-সন্তান, সহচারিণীরা সবাই ছিল চারু-দর্শনা তরুণী, কেবল যে অর্থের আতিশয্যেই তারা আকৃষ্ট হত তাই নয়, ব্যর্থতার রহস্যও আমার মধ্যে ছিল। আমার কথার চাটনি ছাড়া মদের আসর পুরোপুরি জমে উঠত না, বাঁয়া-তবলায় আমার নিজের হাতের সঙ্গত না থাকলে প্রমোদের আসরে অসঙ্গতি ধরা পড়ত।

সেদিনকার আড়ম্বরের কারণ ছিল। নাগপুর থেকে যে নতুন তরুণী নর্তকীটিকে আনিয়েছিলাম তার নাম ছিল মণিবাঈ। তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি এ অঞ্চলে এত প্রসিদ্ধি পেয়েছিল যে তাকে মাথার মণি করে রাখবার মত লোকের অভাব ছিল না, তবু যে সে এই ছোট্ট শহরে কিছু দিনের জন্য বাসা বাঁধতে রাজী হয়েছিল তা কেবল আমারই অলৌকিক কৃতিত্বে, এ কথা আমার সহচরেরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছিল।

আকস্মিক পুচ্ছাহত নাগ-কন্যার অপরূপ একটি নৃত্যভঙ্গি শেষ ক'রে মণিবাঈ ক্লান্ত দেহে বিশ্রাম করতে বসল। সর্পপুচ্ছের মত তার সুদীর্ঘ বেণীটি গভীর শ্রান্তিতে পিঠের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। গৌরবর্ণ মুখে মুক্তার মত দেখা যাচ্ছে বিন্দু বিন্দু স্বেদ। আসরের সবগুলি চোখ একজোড়া মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে। মণিবাঈ মৃদু হেসে পানীয়ের জন্য ইঙ্গিত করল। সহাস্যে তার কাচের পাত্রটি রঙীন সুরায় পূর্ণ করে দিলাম। তরুণ দর্শকদের পাত্রগুলিও মদে ভরে উঠল। তারা মুহূর্তের জন্য চোখ ফিরিয়ে গ্লাসে চুমুক দিল। কেবল একজোড়া মুগ্ধ চোখ কিছুতেই মণিবাঈয়ের মুখ থেকে সরে এল না। গ্লাস-ভরা রঙীন পানীয় বৃথাই তার সামনে টল-টল করতে লাগল।

আমি একটু হেসে আস্তে আস্তে হাত রাখলাম তার কাঁধে, বললাম, 'খেয়ে নাও বন্ধু! অমন ক'রে এক-দৃষ্টে তাকিয়ো না, চোখ ঝলসে যাবে, হৃদয় ঝলসে যাবে। সে জ্বালা নিবৃত্তির একমাত্র মধু আছে

এই গ্লাসের মধ্যে।'

সবাই হেসে উঠল, হাসতে লাগল মণিবাঈ। কিন্তু ততক্ষণে চমকে উঠে ছেলেটি আমার মুখের দিকে তাকিয়েছে। আর তার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছি আমি। এ মুখ এ আসরে নতুন! কিন্তু এ মুখের সঙ্গে রত্নাবাঈ'র মুখের অবিকল মিল আছে। আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে সে বলল, 'মাফ করবেন, মদ আমি খাই নে।'

বললাম, 'বটে! এখানে কার সঙ্গে এসেছ তুমি? নাম কি তোমার?'

বেণীপ্রসাদ এগিয়ে এল, 'অন্যায় হয়ে গেছে ওস্তাদজী। ওর সঙ্গে আগে আপনার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সুযোগ পাইনি। একেবারে নাচের মাঝখানে এসে পড়েছিলাম। আমি ওকে সঙ্গে করে এনেছি। ওর নাম চন্দনলাল।'

আমি বললাম, 'বেশ বেশ, দল যত ভারি হয় ততই ভালো। তা চন্দনলাল, এখানে কোথায় থাক?'

তার হয়ে বেণীপ্রসাদই জবাব দিল, 'বেশি দূরে নয়, নর্মদার তীরে ভেরিঘাট গাঁয়ের কাছাকাছি। এখানে পাঠশালায় রোজ পণ্ডিতি করতে আসে।'

বললাম, 'কিন্তু এখানে কেন, এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা ওঁর কাছে কি পাঠ নেবে?'

বেণীপ্রসাদ বলল, 'পণ্ডিতকে আপনার কাছেই পাঠ নেওয়ার জন্য ধরে এনেছি ওস্তাদজী। ও ভারী বোকা। কোন কোন শাস্ত্রে ওর একবারেই বর্ণ-পরিচয় নেই।'

বললাম, 'ভেব না, বর্ণজ্ঞান ইতিমধ্যেই ওর শুরু হয়েছে দেখছি।'

কথার গূঢ় ইঙ্গিতে চন্দনলালের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল; মণিবাঈ তেমনি হাসতে লাগল মুখ টিপে টিপে।

এক ফাঁকে একান্তে ডেকে আরও একটু পরিচয় নিলাম চন্দনলালের। ওর বাবা দীর্ঘকাল সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন। মা আছেন ঘরে। পুণ্য-স্নান আর পূজা-অর্চনা নিয়েই থাকেন। মাতুল-সম্পত্তি পেয়ে সম্প্রতি ওরা এ অঞ্চলে এসেছে।

কিন্তু আশ্চর্য, রত্নাবাঈয়ের সঙ্গে এমন মুখের মিল ওর কি ক'রে এল? বছর কুড়ি-একুশ হবে চন্দনলালের বয়স। পনের বছর আগে রত্নাবাঈ'র বয়সও ঠিক এমনিই ছিল।

চন্দনকে বিদায় দেওয়াব সময় বললাম, 'এসো মাঝে মাঝে।'

চন্দনলাল বলল, 'দয়া করে অমন অনুরোধ আমাকে করবেন না। মা যদি একবার জানতে পারেন, তিনি—' চন্দনলাল যেন শিউরে উঠল, তার মা জানতে পারলে যে অনর্থ ঘটবে তা যেন কল্পনাতেও আনা যায় না।

চন্দনলাল বলল, 'তা ছাড়া—'

বললাম, 'তা ছাড়া কি?'

চন্দনলাল একটু ইতস্তত করে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'আমার স্ত্রী আছে ঘরে।'

হেসে উঠলাম, 'ও, তাই বলো, তাহলে তো তুমি ভাগ্যবান পুরুষ। এই বয়সেই স্ত্রীরত্ন লাভ করে বসেছ, চল্লিশ বছরেরও যা আমি পেরে উঠিনি।'

কিন্তু ঘরে নিষ্ঠাবতী মা আর সাধ্বী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও মণিবাঈ'র নাচের আসরে চন্দনলালকে তার পর দিনও দেখা গেল। মনে মনে হাসলাম। মণিবাঈ'র কিঙ্কিণীর ধ্বনিতে তাহলে এর মধ্যেই চন্দনলালের দুই কান ভরে উঠেছে। মায়ের উপদেশ আর স্ত্রীর অনুরোধ শুনতে হলে এখন তার তৃতীয় কর্ণের দরকার। মদের পেয়ালা চন্দনলাল আজও স্পর্শ করল না। কিন্তু মণিবাঈ'র দিকে তেমনই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। নাচের ফাঁকে ফাঁকে মণিবাঈও তার দিকে তাকাতে ভুলল না। বুঝতে পারলাম, তার সুদীর্ঘ সর্পিল বেণী চন্দনলালকে পাকে পাকে জড়িয়েছে। পরিত্রাণের আর তার পথ নেই।

আসর ভাঙলে চন্দনলালকে বললাম, 'চল তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

চন্দনলাল বলল, 'দরকার নেই, আমি একাই যেতে পারব।'

হেসে উঠলাম, 'অত আত্ম-প্রত্যয় ভালো নয়। চেনা পথ একবার ভুললে ফের তা চিনে পাওয়া

শক্ত।'

চন্দনলাল হঠাৎ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে কঠিন সুরে জবাব দিল, 'কিন্তু পথ ভোলাবার বিদ্যাই আপনি জানেন। পথ চেনাবার সাধ্য আপনার নেই।'

পথভ্রষ্ট তরুণ-তরুণীদের এ ধরনের গালাগাল প্রায়ই আমাকে সহ্য করতে হয়। কিন্তু আমার তা গায়ে লাগে না। জানি, মনে মনে এ পথের আকর্ষণ দুর্নিবার বলে যারা টের পায় তাদেরই মুখে কটূক্তি বর্ষণের শেষ থাকে না। হেসে বললাম, 'তা হবে। তা'হলে তুমিই চিনিয়ে নিয়ে চল। তোমাদের বাড়িটাই না হয় একবার দেখে আসি।'

চন্দনলাল রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'আমি কি এতই নির্লজ্জ যে আপনার মত সঙ্গীকে মা'র সামনে নিয়ে উপস্থিত করব?'

বললাম, 'আচ্ছা, তাহলে থাক্। তুমিই এস মাঝে-মাঝে। তাতে বোধহয় লজ্জায় অতখানি বাধবে না।'

চন্দনলাল নরম হয়ে বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। অত্যন্ত অভদ্রতা করছি। কিন্তু আমার মা—'

বললাম, 'সে জন্য অত না ভাবলেও পারতে। গায়ে এমন ক'রে নামাবলী জড়িয়ে যেতাম যে তোমার মা কিছুতেই চিনতে পারতেন না।'

পরদিন চন্দনের বাড়ির খোঁজে বেরুলাম। বাড়ি চিনতে কষ্ট হল না। কিন্তু শুনলাম, বাড়িতে কেউ নেই। চন্দন শহরে গেছে, স্ত্রী গেছে বাপের বাড়ি, মা নর্মদায় স্নান সেরে শিবমন্দিরে পূজা দিয়ে ফিরবে। পাহাড়ের উপর জঙ্গলের মধ্যে পোড়ো শিবমন্দির। গিয়ে দেখলাম গলায় আঁচল দিয়ে সাষ্টাঙ্গে এক একটি নারী সিঁদুর-মাখা বিগ্রহকে প্রণাম করছে। ভিজে চুলের রাশে তার দেহের সামান্যই দেখা যায়। তবু আমার মনে হল, আমি ঠিক চিনেছি, ভুল করিনি। প্রণাম সেরে একটু পরেই সে উঠে দাঁড়াল, শ্বেত পাথরের রেকাবি তুলে নিল হাতে। ফুল-বেলপাতা সবই দেবতাকে নিবেদন করা হয়েছে। খানিকটা রক্ত-চন্দন কেবল লেগে রয়েছে রেকাবিতে।

মন্দির থেকে বেরিয়ে পাথরের সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা দিতেই সে আমাকে সামনে দেখতে পেল; 'কে আপনি, এখানে কি চান?'

এ সেই রত্নাবাঈ। কোন সংশয় নেই তাতে। চোখের সেই মদির উচ্ছলতা আর নেই, ঠোঁটের কোণে বাঁকা বিদ্রূপ তার অন্তর্হিত হয়েছে, কিন্তু তার সেই পদ্মের পাপড়ির মত রঙ আজো ম্লান হয়নি, তবু দেহের কোথাও এতটুকু মাত্র বিকৃত হয়নি, কঠিন তপশ্চর্যায় জরাকে সে বহু দূরে ঠেকিয়ে রেখেছে, যৌবনকে বেঁধে রেখেছে সংযমের বাঁধনে।

আজো সেদিনের মতই আত্ম-পরিচয় দিলাম, 'আমার নাম আবীরচাঁদ রূপচাঁদ।'

নাম শুনে সেদিনের মত রত্নাবাঈ আজ আর হাসির টুকরোয় ছড়িয়ে পড়ল না। উপহাসে তার চোখ উচ্ছল হল না। কিন্তু সেই শান্ত বিষণ্ণ সুন্দর দু'টি চোখ হঠাৎ এক বিজাতীয় ঘৃণায় যেন আবিল হয়ে উঠল।

কণ্ঠের মৃদুতায় কঠিন তিরস্কার ঢাকা পড়ল না।

বললাম, 'কিন্তু এ ছাড়াও আমার আর একটু পূর্বপরিচয় আছে।'

রত্নাবাঈ বলল, 'পূর্ব-পরিচয়! সে আবার কি?'

বললাম, 'পঞ্চাশ' গিনির অভাবে তোমার দোর একদিন আমার মুখের সামনে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রত্নাবাঈ। তবে ভরসা দিয়েছিলে, যদি দর্শনী সংগ্রহ করতে পারি, হাজার রাত—লক্ষ রাত ধরে তুমি আমার জন্য নাকি প্রতীক্ষা করবে। সেই পঞ্চাশ গিনির দর্শনী আজ আমি নিয়ে এসেছি রত্নাবাঈ, তোমার দোর এবার খোল, প্রতিজ্ঞা রাখো।'

এক অনৈসর্গিক ভয়ে রত্নাবাঈ'র সর্বাঙ্গ যেন থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। 'আপনি ভুল করছেন, আমার নাম রমাবতী। আমি চন্দনের মা। আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি।'

রত্নাবাঈ'র গলা কাঁপতে লাগল।

হেসে বললাম, 'বরং তুমিই আমাকে চিনতে পারোনি রত্নাবাঈ। আমি তোমাকে কেবল নিজেই

চিনেছি তা নয়, আবও অনেককে চিনিয়ে দেওয়াব ভাব নিয়েছি। সেই অনেকেব মধ্যে চন্দনও থাকবে। তবে তোমাব সম্মতি না পেলে হঠাৎ আমি কাজে নামব না। তুমি যদি প্রতিজ্ঞা বাখ, আমিও বাখব।'

বত্নাবাঈ বলল, 'এত হীন তুমি, এত জঘন্য! তুমি কি চাও?'

বললাম, 'সেদিনও যা চেয়েছিলাম আমি, আজও তাই চাই। আমি ভিক্ষু বত্নাবাঈ।'

বত্নাবাঈ কাঁপতে কাঁপতে ফেব মন্দিবে ঢুকল, 'দূব হও—দূব হও এখান থেকে!'

তাবপব সেদিনেব মতই আঁব একবাব সশব্দে দোব বন্ধ কবে দিল বত্নাবাঈ।

বললাম, 'ভুল কবলে বত্না, দোব তোমাকে খুলতেই হবে। কাবণ পঞ্চাশ গিনিব চেয়ে এবাব কিছু বেশি দর্শনীই আমাব হাতে এসেছে।'

বাড়ি গিয়ে মণিবাঈকে আবও মাস কয়েকেব টাকা আগাম দিলাম আব বেণীপ্রসাদকে বলে দিলাম চন্দনকে খবব দিতে। শুনলাম বত্নাবাঈও তোড-জোড কম কর্বেনি। পুত্রবধূ তাবাবতীকে পবদিনই বাপেব বাড়ি থেকে আনিয়েছে। কড়া পাহাড়া বসিয়েছে ছেলেব চাব দিকে। শিবমন্দিবে পূজা-অর্চনাব পবিমাণ বেড়ে গেছে। বেডেছে বত্নাবাঈ'ব উপবাস আব মন্ত্রজপেব সংখ্যা।

কিন্তু বত্নাবাঈ'ব সমস্ত আধ্যাত্মিক সাধনা আমাব কাছে হাব মানল। দিন কয়েক বাদে বেণীপ্রসাদেব সঙ্গে ফেব এল চন্দনলাল। মণিবাঈ তাকে নির্জন কক্ষে অভ্যর্থনা কবল। খবব পেলাম, মদ সেদিনও চন্দন ছোঁয়নি—তবে মণিবাঈ'ব অধব-মদিবা না কি অবশ্যই পান কবছে।

খবব দেওয়াব জন্য নিজেই গেলাম বত্নাবাঈ'ব খোঁজে। কিন্তু ঘবেব কাছে যেতে না যেতেই নূপুবেব ধ্বনি কানে এল। অবাকই হলাম। এ তো আমাব বাড়ি নয়, তপস্বিনী বমাবতীব গৃহাঙ্গন। এখানে নূপুব বাজে কাব? পা টিপে টিপে বেড়াব পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। এমন দৃশ্য আমিও কল্পনা কবিনি। ফেব নাচেব আসব বসেছে বত্নাবাঈ'ব ঘবে। কিন্তু আজ সে নিজে নাচছে না, নাচ শিখাচ্ছে পুত্রবধূকে। তাবাবতী বিস্মিত চোখে এক-এক বাব শাশুড়ীব দিকে তাকাচ্ছে, তাব পব ধমক খেয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ফেব নূপুব বাঁধা পা ফেলছে মাটিতে।

বত্নাবাঈ অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে, 'হতভাগী, আবো মন দিয়ে শেখো—আবো যত্ন নাও। স্ত্রীব সেবা যে মূর্খ চাইল না, নূপুব পবা পা তুলে দাও তাব কোলে। দেখ, তাতে সে ভোলে কি না।'

আশ্বস্ত হয়ে ফিবে এলাম ঘবে। শিব ফেলে বত্নাবাঈ তাহলে এবাব অশিবেব শবণ নিয়েছে আমাব পালা তাহলে এসেছে! এখন যে কোন একদিন বত্নাবাঈ এসে ঘরে ঢুকলেই হয়। মণিবাঈকে বকশিস দিয়ে বললাম, 'তোমাব কাজ শেষ। আব তোমাকে বেঁধে বাখতে চাই না।'

মণিবাঈ অপূর্ব ভ্রূভঙ্গি ক'বে বলল, 'কিন্তু আমি যে বাঁধা পড়েছি।'

হেসে বললাম, 'সে তো আমাব টাকায় আব চন্দনেব রূপে।'

কিন্তু নেওয়াব সময় কেবল টাকাই মণিবাঈ দু'হাতে কুড়িয়ে নিল, চন্দনকে সঙ্গে নিল না। এত দিনে আমাব উপদেশ চন্দনেব মনে পড়ল। সুবাব পাত্রে অধবেব স্বাদ খুঁজতে লাগল।

তাবপব একদিন সত্যিই ডাক এল বত্নাবাঈ'ব কাছ থেকে। শিবমন্দিবে নয়, তাব নির্জন শয়ন-ঘবেই। চন্দনলাল বাড়িতে ঢোকে না, অকেজো তাবাবতীকে ফেব বাপেব বাড়ি পাঠানো হয়েছে। ঘবে শুধু আমি আব বত্নাবাঈ। অঙ্গে সামান্য আভবণ, পবনে লালপেড়ে তসবেব শাড়ি। তবু যেন রূপেব অন্ত নেই। মনে হল যেন পাথবে গড়া একখানা দেবীমূর্তি। কিন্তু আমি তো দেবতা নই। আমাব বক্তে রূপেব ক্ষুধা। সে রূপ পাথবেব মধ্যে আমি দেখতে শিখিনি, আমাব চোখে রূপময়ী শুধু বক্তমাংসেব নারী। তবে তাব হৃদয় বোধ হয় পাথবেরই।

তাব সেই পাথবেব প্রতিমা হঠাৎ আমাব পায়েব ওপব ভেঙে পড়ল। ঝবনাব ধাবা ছুটল পাথব ভেঙে। মিনিট কয়েক নিঃশব্দে কাটল। শেষে রুদ্ধকণ্ঠে বত্নাবাঈ বলল, 'রক্ষা কবো চন্দনকে, ওকে বাঁচাও। তুমি যা চেয়েছ তাই দেব।'

আমি মুহূর্তকাল চুপ কবে থেকে হঠাৎ বললাম, 'আচ্ছা, সত্যিই কি পনেব বছর আগে কেউ তোমাব বুকে ছুবি বিঁধিয়েছিল?'

রত্নাবাঈ প্রথমে বিস্মিত হয়ে আমাব দিকে তাকাল, তাবপব ম্লান এক টুকরো হাসি তাব সুন্দর

দু'টি ঠোঁটে আভাস ফেলতে না ফেলতেই মিলিয়ে গেল।

রত্নাবাঈ বলল, 'পনের নয় এই একুশ বছর। আজ মনে হচ্ছে বিষাক্ত ছুরিই বটে, কিন্তু সেদিন তা মনে হয়নি। সেদিন চন্দনকে পেয়ে হৃদয় আমার জুড়িয়ে গিয়েছিল, মনে হয়েছিল অমৃত-ভরা চাঁদ ধরেছি বুকে।'

কিন্তু চাঁদকে রত্নাবাঈ বেশি দিন বুকের মধ্যে রাখতে পারেনি। অনেক কষ্টে রাহুর গ্রাস থেকে রক্ষা করে তাকে দূর-সম্পর্কীয় এক বোনের হাতে পৌঁছে দিয়েছিল। চন্দনের বয়স যখন বছর পাঁচেক, হঠাৎ একদিন সেই বোনের কাছ থেকে খবর এল কঠিন রোগে চন্দনের বাঁচবার আর আশা নেই। রত্না যেন তাকে শেষ দেখা দেখে আসে। ছেলের চিকিৎসায় প্রায় সমস্ত সঞ্চয় ব্যয় করল রত্নাবাঈ। তবু তার প্রাণের আশা দেখা দিল না। দিনের পর দিন অনাহারে মাথা কুটল রত্নাবাঈ শিবমন্দিরে। প্রতিজ্ঞা করল, ছেলে যদি বাঁচে আর সে ব্যবসায়ে নামবে না। সত্যের পথে—ধর্মের পথে ছেলেকে সে মানুষ ক'রে তুলবে। পরদিন শহর থেকে সব চেয়ে বড় ডাক্তার এসে বললেন, 'ভয় নেই, এত দিন ভুল চিকিৎসা হয়েছিল।' চন্দন বেঁচে উঠল কিন্তু রত্নাবাঈ আর ভুল করল না। দেব মন্দিরের সেই প্রতিশ্রুতি রত্না ভাঙল না ছেলের কল্যাণের জন্য। শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে এত দিনের খ্যাতি আর ঐশ্বর্যের পথ ছাড়ল। ছেলেকে নিয়ে অখ্যাত এক পাহাড়ী গাঁয়ে ঘর বাঁধল। তবু একদিন কপাল ভাঙল, চন্দনের উচ্ছৃঙ্খল রক্তের মধ্যে প্রমত্তা রত্নাবাঈ'র যৌবনের সেই চঞ্চল নূপুরের ধ্বনি শোনা গেল।

উপকথার মত রত্নাবাঈ'র বিগত পনের ষোল বছরের ইতিবৃত্ত শুনে গেলাম। তারপর রত্নাবাঈ আবার আমার মুখের দিকে তাকাল, 'তোমার যা দাবী আছে নাও, কিন্তু চন্দনকে ফিরিয়ে দাও, ওকে রক্ষা করো।'

রত্নাবাঈ'র চোখের কোলে মুক্তার মত ফের দুই বিন্দু অশ্রু টল-টল করে উঠল ইচ্ছা হল চুম্বনে চুম্বনে সেই অশ্রুর বিন্দু দুটি মুছে দিই, কিন্তু পরক্ষণেই সংযত করলাম নিজেকে। শুধু চুম্বনে কি এই অতল অশ্রুর সিন্ধু শুকাবে?

বললাম, 'আচ্ছা, আজ যাই রত্নাবাঈ। তোমার উপযুক্ত দর্শনী নিয়ে আর একদিন আসব।'

আবীরচাঁদ রূপচাঁদ থামলেন, তারপর চোখ ফিরিয়ে সেই ধূসর পাহাড়টির দিকে তাকিয়ে রইলেন চুপ করে। আমার অস্তিত্বের কথা যেন তিনি সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন।

কিছুক্ষণ আমি চুপ করে রইলাম। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, 'শেষে কি হল? দর্শনী কি শেঠজী শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ করেছিলেন?'

আবীরচাঁদ রূপচাঁদ আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, 'অত কি সহজ বাবুজী? এ তো কেবল একটি বাঈজীর পঞ্চাশ গিনির দর্শনী নয়, এ দু দুজন পুরুষের বাঁকা-চোরা বিশৃঙ্খল জীবন। নারীর দু বিন্দু অশ্রুতে তার কতটুকু প্রতিবিম্বই বা পড়ে। তবু চেষ্টা করছি। শেষ? না বাবুজী এ গল্পের আজও শেষ হয়নি।'

চৈত্র ১৩৫৩

রস

কার্তিকেব মাঝামাঝি চৌধুবীদেব খেজুব বাগান ঝুবতে শুরু কবল মোতালেফ। তাবপর দিন পনেব যেতে না যেতেই নিকা কবে নিয়ে এল পাশেব বাডিব বাজেক মৃধাব বিধবা স্ত্রী মাজুখাতুনকে। পাড়াপড়শী সবাই তো অবাক। এই অবশ্য প্রথম সংসাব নয় মোতালেফেব। এব আগেব বউ বছব খানেক আগে মাবা গেছে। তবু পঁচিশ ছাব্বিশ বছবেব জোয়ান পুরুষ মোতালেফ। আব মাজুখাতুন ত্রিশে না পৌঁছলেও তার কাছাকাছি গেছে। ছেলেপুলেব ঝামেলা অবশ্য মাজুখাতুনেব নেই। মেয়ে ছিল একটি, কাঠিখালিব শেখদেব ঘবে বিয়ে দিযেছে। কিন্তু ঝামেলা যেমন নেই, তেমনি মাজুখাতুনেব আছেই বা কি। বাক্স সিন্দুক ভবে যেন কত সোনাদানা বেখে গেছে বাজেক মৃধা, মাঠ ভবে যেন কত ক্ষেত খামাব বখে গেছে যে তাব ওযাবিশি পাবে মাজুখাতুন। ভাগেব ভাগ ভিটাব পেয়েছে কাঠা খানেক, আব আছে একখানি পড়ো পড়ো শণেব কুঁড়ে। এই তো বিষয-সম্পত্তি, তাবপব দেখতেই বা এমন কি একখানা ডানাকাটা হুবীব মত চেহাবা। দজ্জাল মেয়েমানুষেব আঁটি-সাঁটি শক্ত গড়নটুকু ছাড়া কি আছে মাজুখাতুনেব যা দেখে ভোলে পুরুষেবা, মন তাদেব মুগ্ধ হয।

সিকদাব-বাড়িব, কাজী-বাড়িব বউঝিবা হাসাহাসি কবল, তুক কবছে মাগী ধূলা পড়া দিছে চৌখে।'

মুন্সীদেব ছোটবউ সাকিনা বলল, 'দিছে ভালো কবছে। দেবে না? অমন মানুষেব চৌখে ধূলাপড়া দেওযনেবই কাম। খোদা তো পাতা দেয নাই চৌখে। দেখছো তো কেমন ট্যাবাইযা ট্যাবাইযা চায। ধূলা ছিটাইযা থাকে তো বেশ কবছে।'

কথাটা মিথ্যা নয, চাউনিটা একটু তেবছা তেবছা মোতালেফেব। বেছে বেছে সুন্দব মুখেব দিকে তাকায। সুন্দব মুখেব খোঁজ ক'বে ঘোবে তার চোখ। অল্পবযসী খুবসুবৎ চেহাবাব একটি বউ আনবে ঘবে, এতদিন ধরে সেই চেষ্টাই সে কবে এসেছে। কিন্তু দবে পটেনি কাবো সঙ্গে। যাবই ঘবে একটু ডাগব গোছেব সুন্দব মেয়ে আছে সে-ই হেঁকে বসেছে পাঁচকুড়ি সাতকুড়ি। সবচেযে পছন্দ হযেছিল মোতালেফেব ফুলবানুকে। চবকান্দাব এলেম সেখেব মেয়ে ফুলবানু। আঠাব উনিশ বছব হবে বযস। বসে টলটল কবছে সর্বাঙ্গ, টগবগ কবছে মন। ইতিমধ্যে অবশ্য একহাত ঘুবে এসেছে ফুলবানু। খেতে পবতে কষ্ট দেয, মাব ধোব কবে এই সব অজুহাতে তালাক নিয়ে এসেছে কইডুবিব গফুব সিকদাবেব কাছ থেকে। আসলে বযস বেশি আব চেহাবা সুন্দব নয বলে গফুবকে পছন্দ হযনি ফুলবানুব। সেই জন্যই ইচ্ছা ক'রে নিজে ঝগড়া কোন্দল বাঁধিয়েছে তাব সঙ্গে। কিন্তু একহাত ঘুবে এসেছে বলে কিছু ক্ষযে যাযনি ফুলবানুব, ববং চেকনাই আব জেল্লা খুলেছে দেহেব, বসেব ঢেউ খেলে যাচ্ছে মনেব মধ্যে। চবকান্দায় নদীব ঘাটে ফুলবানুকে একদিন দেখেছিল মেতালেফ। এক নজবেই বুঝেছিল যে, সেও নজবে পড়েছে। চেহাবাখানা তো বেমানান নয মোতালেফেব। নীল লুঙ্গী পরলে ফর্সা ছিপছিপে চেহারায চমৎকাব খোলতাই হয তাব, তাছাড়া এমন ঢেউ-খেলানো টেবিকাটা বাববিই বা এ তল্লাটে ক'জনেব মাথায আছে। ফুলবানুব সুনজবেব কথা বুঝতে বাকি ছিল না মোতালেফেব। খুঁজে খুঁজে গিয়েছিল সে এলেম সেখেব বাড়িতে। কিন্তু এলেম তাকে আমল দেয়নি। বলেছে গত বাব যথেষ্ট শিক্ষা হযে গেছে তাব। এবাব আব না দেখে শুনে যাব তাব হাতে মেয়ে দেবে না। আসলে টাকা চায় এলেম। গাঁটের কড়ি যা খবচ কবতে হযেছে মেয়েকে তালাক নেওযাতে গিযে, সুদে আসলে তা পুবিয়ে নিতে চায। গুনাগাব চায সেই লোকসানেব। আঁচ নিয়ে দেখেছে মোতালেফ সে গুণাগার দু'এক কুড়ি নয, পাঁচকুড়ি একেবাবে। তার কমে কিছুতেই বাজী হবে না এলেম। কিন্তু অত টাকা সে দেবে কোথেকে।

মুখ ভার ক'রে চলে আসছিল মোতালেফ। আশ্শেওড়া আর চোখ-উদানের আগাছার জঙ্গলা ভিটার মধ্যে ফের দেখা হল ফুলবানুর সঙ্গে। কলসী কাঁখে জল নিতে চলেছে ঘাটে। মোতালেফ বুঝল সময় বুঝেই দরকার পড়েছে তার জলের।

এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিক ক'রে একটু হাসল ফুলবানু, 'কি মেঞা, গোসা কইরা ফিরা চললা নাকি ?'

'চলব না ? শোনলা নি টাকার খাককাই তোমার বা-জানের !'

ফুলবানু বলল, 'হ, হ, শুনছি। চাইছে তো দোষ হইছে কি ? পছন্দসই জিনিস নেবা বা-জানের গুনা, তার দাম দেবা না ?'

মোতালেফ বলল, 'ও খাককাইটা আসলে বা-জানের নয়, বা-জানের মাইয়ার। হাটে বাজরে গেলেই পারো ধামায় উইঠা।'

মোতালেফের রাগ দেখে হাসল ফুলবানু, 'কেবল ধামায় ক্যান, পালায় উইঠা বসব। মুঠ ভইবা ভইরা সোনা জহরৎ ওজন কইরা দেবা পালায়। বোঝব ক্ষেমতা, বোঝব কেমন পুরুষ মাইনষের মুঠ।' মোতালেফ হন হন ক'রে চলে যাচ্ছিল। ফুলবানু ফের ডাকল পিছন থেকে, 'ও সোন্দর মিঞা, বাগ করলানি ? শোন শোন।'

মোতালেফ ফিরে তাকিয়ে বলল, 'কি শোনব ?'

এদিকে ওদিকে তাকিয়ে আরো একটু এগিয়ে এল ফুলবানু, 'শোনবা আবার কি, শোনবা মনের কথা। শোন, বা-জানেব মাইয়া টাকা চায় না, সোনা দানাও চায় না, কেবল মান রাখতে চায় মনের মাইনষের। মাইনষের ত্যাজ দেখতে চায়, বুঝছ ?'

মোতালেফ মাথা নেড়ে জানালে, বুঝেছে।

ফুলবানু বলল, 'তাই বইলা আকাম কুকাম কইরো না মেঞা, জমি ক্ষেত বেচতে যাইও না।'

বেচবাব মত জমি ক্ষেত অবশ্য মোতালেফের নেই, কিন্তু সে গুমর ফুলবানুর কাছে ভাঙল না মোতালেফ, বলল, 'আইচ্ছা, শীতের কয়ডা মাস যাউক, ত্যাজও দেখাব, মানও দেখাব। কিন্তু বিবিজানেব সবুর থাকবেনি দেখবার ?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'খুব থাকব। তেমন বেসবুর বিবি ভাইবো না আমারে।'

গাঁয়ে এসে আর একবার ধারেব চেষ্টা করে দেখল মোতালেফ। গেল মল্লিকবাড়ি, মুখুজ্যেবাড়ি, সিকদারবাড়ি, মুন্সীবাড়ি—কিন্তু কোথাও সুবাহা হয়ে উঠল না টাকার। নিলে তো আর সহজে হাত উপুড় করবাব অভ্যেস নেই মোতালেফের। ধাবের টাকা তার কাছ থেকে আদায় ক'রে নিতে বেজায় ঝামেলা। সাধ ক'রে কে পোয়াতে যাবে সেই ঝক্কি।

কিন্তু নগদ টাকা ধার না পেলেও শীতের সূচনাতেই পাড়ার চার পাঁচ কুড়ি খেজুর গাছের বন্দোবস্ত পেল মোতালেফ। গত বছর থেকেই গাছেব সংখ্যা বাড়ছিল, এবার চৌধুরীদের বাগানের দেড়কুড়ি গাছ বেশি হল। গাছ কেটে হাঁড়ি পেতে রস নামিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক রস মালিকের, অর্ধেক তাব। মেহনৎ কম নয়, এক একটি ক'রে এতগুলি গাছের শুকনো মরা ডালগুলি বেছে বেছে আগে কেটে ফেলতে হবে। বালিকাচায় ধার তুলে তুলে জুৎসই ক'রে নিতে হবে ছ্যান। তারপব সেই ধারালো ছ্যানে গাছের আগা চেঁছে চেঁছে তার মধ্যে নল পুততে হবে সরু কঞ্চি ফেড়ে। সেই নলের মুখে লাগসই ক'রে বাঁধতে হবে মেটে হাঁড়ি। তবে তো রাতভরে টুপ টুপ ক'রে রস পড়বে সেই হাঁড়িতে। অনেক খাটুনি, অনেক খেজমৎ। শুকনো শক্ত খেজুর গাছ থেকে রস বের করতে হলে আগে ঘাম বের করতে হয় গায়ের। এতো আর মার দুধ নয়, গাইয়েব দুধ নয় যে বোঁটায় বানে মুখ দিলেই হল।

অবশ্য কেবল খাটতে জানলেই হয় না, গাছে উঠতে নামতে জানলেই হয় না, গুণ থাকা চাই হাতের। যে ধারালো ছ্যান একটু চামড়ায় লাগলেই ফিনাক দিয়ে রক্ত ছোটে মানুষের গা থেকে, হাতের গুণে সেই ছ্যানের ছোঁয়ায় খেজুর গাছের ভিতর থেকে মিষ্টি রস চুঁইয়ে পড়ে। এ তো আর ধান কাটা নয়, পাট কাটা নয় যে, কাচির পোঁচে গাছের গোড়াসুদ্ধ কেটে নিলেই হল। এর নাম খেজুরগাছ কাটা। কাটতেও হবে, আবার হাত বুলোতেও হবে। খেয়াল রাখতে হবে গাছ যেন ব্যথা

না পায, যেন কোন ক্ষতি না হয গাছের। একটু এদিক ওদিক হলে বছব ঘুবতে না ঘুরতে গাছের দফা বফা হয়ে যাবে, মবা মুখ দেখতে হবে গাছেব। সে গাছেব গুডিতে ঘাটেব পৈঠা হবে ঘরের পৈঠা হবে, কিন্তু ফোঁটায ফোঁটায সে গাছ থেকে হাঁডিব মধ্যে বস ঝববে না বাত ভবে।

খেজুব গাছ থেকে বস নামাবাব বিদ্যা মোতালেফকে নিজে হাতে শিখিয়েছিল বাজেক মৃধা। বস সম্বন্ধে এ সব তত্ত্বকথা আব বিধি নিষেধও তাব মুখেব। বাজেকেব মত অমন নামডাকওয়ালা 'গাছি' ধাবে-কাছে ছিল না। যে গাছেব প্রায বাবো আনা ডালই শুকিয়ে এসেছে সে গাছ থেকেও বস বেকত বাজেকেব হাতেব ছোঁওযায। অন্য কেউ গাছ কাটলে যে গাছ থেকে বস পডতো আধ-হাঁড়ি, বাজেকেব হাতে পডলে সে বস গলা-হাঁডিতে উঠতো। তাব হাতে খেজুব গাছ ছেড়ে দিযে নিশ্চিন্ত থাকত গৃহস্থবা। গাছেব কোন ক্ষতি হত না, বসও পডত হাঁড়ি ভবে। বছব কযেক ধবে বাজেকেব সাকবেদ হয়েছিল মোতালেফ, পিছনে পিছনে ঘুবত, কাজ কবত সঙ্গে সঙ্গে। সাকবেদ দু'চাবজন আবো ছিল বাজেকেব —সিকদাবদেব মকবুল, কাজীদেব ইসমাইল। কিন্তু মোতালেফেব মত হাত পারেনি কেউ। বাজেকেব স্থান আব কেউ নিতে পাবেনি তাব মত।

কিন্তু কেবল গাছ কাটলেই তো হবে না কুডিতে কুডিতে, বসেব হাঁডি বয়ে আনলেই তো হবে না বাঁশেব বাখাবিব ভাবায ঝুলিযে, বস জ্বাল দিয়ে গুড কববাব মত মানুষ চাই। পুরুষ মানুষ গাছ থেকে কেবল বসই পেড়ে আনতে পাবে,—কিন্তু উনান কেটে, জ্বালানি জোগাড ক'বে, সকাল থেকে দুপুব পর্যন্ত বসে বসে সেই তবল বস জ্বাল দিয়ে তাকে ঘন পাটালিগুডে পবিণত কববাব ভাব মেয়েমানুষেব ওপব। শুধু কাঁচা বস দিয়ে তো লাভ নেই, বস থেকে গুড় আব গুড থেকে পযসায কাঁচা বস যখন পাকা রূপ নেবে তখন সিদ্ধি, কেবল তখনই সার্থক হবে সবল খেজমৎ মেহনৎ। কিন্তু বছব দুই ধবে বাড়িতে সেই মানুষ নেই মোতালেফেব। ছেলেবেলায মা মবেছিল। দু'বছব আগে বউ মবে ঘব একেবাবে খালি করে দিয়ে গেছে।

সন্ধ্যাব পব মোতালেফ এসে দাঁডাল মাজুখাতুনেব ঝাঁপ আঁটা ঘবেব সামনে, 'জাগনো আছো নাকি মাজুবিবি ?'

ঘবের ভিতব থেকে মাজুখাতুন সাড়া দিয়ে বলল, কেডা ?

আমি মোতালেফ। শুইয়া পড়ছ বুঝি ? কষ্ট কইবা উইঠ্যা যদি ঝাপটা একবাব খুইলা দিতা, কযডা কথা কইতাম তোমাব সাথে।

মাজুখাতুন উঠে ঝাপ খুলে দিয়ে বলল, কথা যে কি কবা তা তো জানি। বসেব কাল আইছে আব মনে পইড়া গেছে মাজুখাতুনবে। বস জ্বাল দিয়া দিতে হবে। কিন্তু সেবে চাইব আনা কইবা পযসা দেবা মেঞা। তাব কমে পাবব না। গতবে সুখ নাই এ বছব '

মোতালেফ মিষ্টি ক'বে বলল, গতবেব আব দোষ কি বিবি। গতব তো মনেব হাত ধইবা ধইবা চলে। মনেব সুখই গতবেব সুখ।'

মাজুখাতুন বলল, তা যাই কও তাই কও মেঞা, চাইব আনাব কমে পাবব না এবাব।'

মোতালেফ এবাব মধুব ভঙ্গিতে হাসল 'চাইব আনা ক্যান বিবি, যদি ষোল আনা দিতে চাই, বাজী হবা তো নিতে ?

মোতালেফেব হাসিব ভঙ্গিতে মাজুখাতুনেব বুকেব মধ্যে একটু যেন কেমন ক'বে উঠল, কিন্তু মুখে বলল তোমাব বঙ্গ তামাসা থুইয়া দাও মেঞা। কাজেব কথা কবা তো কও, নইলে যাই, শুই গিযা।

মোতালেফ বলল, শোবাই তো। বাইত তো শুইযা ঘুমাবাব জন্যেই। কিন্তু শুইলেই কি আব চোখে ঘুম আসে মাজুবিবি, না চাইযা চাইযা এই শীতেব লম্বা বাইত কাটান যায ?'

ইসাবা ইঙ্গিত বেখে এবপব মোতালেফ আবো স্পষ্ট ক'বে খুলে বলল মনেব কথা। কোনবকম অন্যায সুবিধা সুযোগ নিতে চায না সে। মোল্লা ডেকে কলমা পড়ে সে নিকা ক'রে নিয়ে যেতে চায় মাজুখাতুনকে। ঘব গেবস্থালিব ষোল আনা ভাব তুলে দিতে চায তাব হাতে।

প্রস্তাব শুনে মাজুখাতুন প্রথমে অবাক হয়ে গেল, তাবপব একটু ধমকের সুবে বলল, 'বঙ্গ তামাসাব আব মানুষ পাইলা না তুমি ! ক্যান, কাঁচা বযসের মাইযা পোলাব কি অভাব হইছে নাকি

দেশে যে তাগো থুইয়া তুমি আসবা আমাব দুয়ারে।'

মোতালেফ বলল, 'অভাব হবে ক্যান মাজুবিবি। কম বয়সী মাইয়া পোলা অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু শত হইলেও, তাবা কাঁচা বসেব হাঁড়ি।'

কথাব ভঙ্গিতে একটু কৌতুক বোধ কবল মাজুখাতুন, বলল, 'সাঁচাই নাকি? আব আমি?'

'তোমাব কথা আলাদা। তুমি হইলা নেশাব কালে তাড়ি আব নাস্তাব কালে গুড, তোমাব সাথে তাগো তুলনা?'

তখনকাব মত মোতালেফকে বিদায় দিলেও তাব কথাগুলি মাজুখাতুনেব মন থেকে সহজে বিদায় নিতে চাইল না। অন্ধকাব নিঃসঙ্গ শয্যায় মোতালেফেব কথাগুলি মনেব ভিতবটায় কেবলই তোলপাড় কবতে লাগল। মোতালেফেব সঙ্গে পবিচয় অল্পদিনেব নয়। বাজেক যখন বেঁচে ছিল, তাব সঙ্গে সঙ্গে থেকে যখন কাজকম কবত মোতালেফ তখন থেকেই এ বাড়িতে তাব আনাগোনা, তখন থেকেই জানাশোনা দুজনেব। কিন্তু সেই জানাশোনাব মধ্যে কোন গভীবতা ছিল না। মাঝে মাঝে একটু হাল্কা ঠাট্টা তামাসা চলত, কিন্তু তাব বেশি এগুবাব কথা মনেই পড়েনি কাবো। মোতালেফেব ঘবে ছিল বউ, মাজুখাতুনেব ঘবে ছিল স্বামী। স্বভাবটা একটু কঠিন আব কাটখোট্টা ধবনেবই ছিল বাজেকেব। ভাবি কড়া-কড়া চাঁছা ছোলা ছিল তাব কথাবার্তা। শীতেব সময় কুড়িতে কুড়িতে বসেব হাঁড়ি আনত মাজুখাতুনেব উঠানে আব মাজুখাতুন সেই বস জ্বাল দিয়ে কবত পাটালিগুড। হাতেব গুণ ছিল মাজুখাতুনেব। তাব তৈবি গুড়েব সেব দু পয়সা বেশি দবে বিক্রী হতো বাজাবে। বাজেক মবে যাওযাব পব পাড়াব বেশিব ভাগ খেজুব গাছই গেছে মোতালেফের হাতে। দু'এক হাঁড়ি বস কোনবাব ভদ্রতা ক'বে তাকে খেতে দেয় মোতালেফ কিন্তু আগেকাব মত হাঁড়িতে আব বস যায় না তাব উঠান। গতবাব মাসখানেক তাকে বস জ্বাল দিতে দিয়েছিল মোতালেফ। চুক্তি ছিল দু আনা ক'বে পয়সা দেবে প্রতি সেবে কিন্তু মাসখানেক পবেই সন্দেহ হয়েছিল মোতালেফেব মাজুখাতুন গুড চুবি ক'বে বাখছে অন্য কাউকে দিয়ে গোপনে গোপনে বিক্রী কবাচ্ছে সেই গুড, ষোল আনা জিনিস পাচ্ছে না মোতালেফ। ফলে কথান্তব মনান্তব হয়ে সে বন্দোবস্ত ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু এবাব তাব ঘবে বসেব হাঁড়ি পাঠাবাব প্রস্তাব নিয়ে আসেনি মোতালেফ মাজুখাতুনকেই নিজেব ঘবে নিয়ে যেতে চেয়েছে। এমন প্রস্তাব পাড়াব আধ বুড়োদেব দলেব আবো কবেছে দু'একজন কিন্তু মাজুখাতুন কান দেয়নি তাদেব কথায়। ছেলে ছোকবাদেব মধ্যে যাবা একটু বেশি বাড়াবাড়ি বকমেব ইয়ার্কি দিতে এসেছে তাদেব কান কেটে নেওযাব ভয় দেখিয়েছে মাজুখাতুন। কিন্তু মোতালেফেব প্রস্তাব সম্পূর্ণ ভিন্ন ধবনেব তাকে যেন তেমনভাবে তাড়ান যায় না। তাকে তাড়ালেও তাব কথাগুলি ফিবে ফিবে আসতে থাকে মনেব মধ্যে। পাড়ায় এমন চমৎকাব কথা বলতে পাবে না আব কেউ অমন খুবসুবৎ মুখও কাবোও নেই, অমন মানানসই কথাও নেই কাবো মুখে।

মোতালেফকে আবো আসতে হল দু এক সন্ধ্যা তাবপব নীল বঙেব জোলাকী শাড়ি পবে, বঙ-বেবঙেব কাঁচেব চুড়ি হাতে দিয়ে মোতালেফেব পিছনে পিছনে তাব ঘবেব মধ্যে এসে ঢুকলো মাজুখাতুন।

ঘবদোবেব কোন শ্রী ছাঁদ নেই, ভাবি অপবিষ্কাব আব অগোছাল হয়ে বয়েছে সব। কোমবে আঁচল জড়িয়ে মাজুখাতুন লেগে গেল ঘবকন্নাব কাজে। ঝাঁট দিয়ে দিয়ে জঞ্জাল দূব কবল উঠানেব, লেপেপুঁছে ঝক্‌ঝকে তকতকে ক'বে তুলল ঘবেব মেঝে।

কিন্তু ঘব আব ঘবণীব দিকে তাকাবাব সময় নেই মোতালেফেব, সে আছে গাছেগাছে। পাড়ায় আবো অনেকেব—বোসেদেব, বাঁড়ুয্যেদেব গাছেব বন্দোবস্ত নিয়েছে মোতালেফ। গাছ কাটছে, হাঁড়ি পাতছে, হাঁড়ি নামাচ্ছে, ভাগ ক'বে দিচ্ছে বস। পাঁকাটিব একখানা চালা তুলে দিয়েছে মাজুখাতুনকে মোতালেফ উঠানেব পশ্চিমদিকে। সাবে সাবে উনান কেটে তাব ওপব বড় বড় মাটিব জালা বসিয়ে সেই চালাঘবেব মধ্যে বসে সকাল থেকে দুপুব পর্যন্ত বস জ্বাল দেয় মাজুখাতুন। জ্বালানিব জন্যে মাঠ থেকে খড়েব নাড়া নিয়ে আসে মোতালেফ, জোগাড় কবে আনে খেজুবেব শুকনো ডাল। কিন্তু

তাতে কি কুলোয়। মাজুখাতুন এর ওর বাগান থেকে জঙ্গল থেকে শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে আনে ঝাঁকা ভরে ভরে, পলো ভরে ভরে, বিকেলে বসে বসে দা দিয়ে টুকরো টুকরো ক'রে শুকনো ডাল কাটে জ্বালানির জন্যে। বিরাম নেই বিশ্রাম নেই, খাটুনি গায়ে লাগে না, অনেকদিন পরে মনের মত কাজ পেয়েছে মাজুখাতুন, মনের মত মানুষ পেয়েছে ঘরে।

ধামা ভরে ভরে হাটে-বাজারে গুড় নিয়ে যায় মোতালেফ, বিক্রি ক'রে আসে চড়া দামে! বাজারের মধ্যে সেরা গুড় তার। পড়ন্ত বেলায় ফের যায় গাছে গাছে হাঁড়ি পাততে। তল্লা বাঁশের একেকটি ক'রে চোঙা ঝুলতে থাকে গাছে। সকালে রসের হাঁড়ি নামিয়ে ঝরার চোঙা বেঁধে দিয়ে যায় মোতালেফ। সারাদিনের ময়লা রস চোঙাগুলির মধ্যে জমা থাকে। চোঙা বদলে গাছ চেঁছে হাঁড়ি পাতে বিকেলে এসে। চোঙার ময়লা রস ফেলা যায় না। জ্বাল দিয়ে চিটে গুড় হয় তাতে তামাক মাখবার। বাজারে তাও বিক্রি হয় পাঁচ আনা ছ' আনা সের। দু'বেলা দু'বার ক'রে এতগুলি গাছে উঠতে নামতে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ে মোতালেফের, পৌষের শীতেও সর্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম ঝড়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। সকালবেলায় রোমশ বুকের মধ্যে ঘামের ফোঁটা চিক চিক করে। পায়ের নিচে দুর্বার মধ্যে চিক চিক করে রাত্রির জমা শিশির। মোতালেফের দিকে তাকিয়ে পাড়াপড়শীরা অবাক হয়ে যায়। চিরকালই অবশ্য খাটিয়ে মানুষ মোতালেফ কিন্তু বেশি উৎসাহ নিয়ে কাজ করতে, দিনরাত এমন কলের মত পরিশ্রম করতে এর আগে তাকে দেখা যায় নি কোনদিন। ব্যাপারটা কি? গাছ কাটা অবশ্য মনের মত কাজই মোতালেফের, কিন্তু পছন্দসই মনের মানুষ কি সত্যিই এল ঘরে?

সেরা গাছের সবচেয়ে মিষ্টি দু' হাঁড়ি রস আর সের তিনেক পাটালি গুড় নিয়ে মোতালেফ গিয়ে একদিন উপস্থিত হল চরকান্দায় এলেম শেখের বাড়িতে। সেলাম জানিয়ে এলেমের পায়ের সামনে নামিয়ে রাখলে রসের হাঁড়ি, গুড়ের সাজি, তারপর কোঁচার খুঁটের বাঁধন খুলে বের করল পাঁচখানা দশ টাকার নোট, বলল, 'অর্ধেক আগাম দিলাম মেঞাসাব।'

এলেম বলল, 'আগাম কিসের?'

মোতালেফ বলল, 'আপনার মাইয়ার—'

তাজা কবকরে নোট বেছে নিয়ে এসেছে মোতালেফ। কোণায়, কিনারে চুল পরিমাণ ছিঁড়ে যায় নি কোথাও, কোন জায়গায় ছাপ লাগে নি ময়লা হাতের। নগদ পঞ্চাশ টাকা। নোটগুলির ওপর হাত বুলোতে বুলোতে এলেম বলল, 'কিন্তু এখন আর টাকা আগাম নিয়া আমি কি করব মেঞা? তুমি তো শোনলাম নেকা কইরা নিছ রাজেক মেরধার কবিলারে। সতীনের ঘরে যাবে ক্যান্ আমার মাইয়া। যাইয়া কি ঝগড়া আর চিল্লাচিল্লি করবে, মারামারি কাটাকাটি কইরা মরবে দিন রাইত।'

মোতালেফ মুচকে হাসল। বলল, 'তার জৈন্যে ভাবেন ক্যান্ মেঞাসাব। গাছে রস যদ্দিন আছে, গায়ে শীত যদ্দিন আছে, মাজুখাতুনও তদ্দিন আছে আমার ঘরে। দক্ষিণা বাতাস খেললেই সব সাফ হইয়া যাবে উইড়া।'

এলেম শেখ জলচৌকি এগিয়ে দিল মোতালেফকে বসতে, হাতের হুঁকোটা এগিয়ে ধরল মোতালেফের দিকে, তারিফ ক'রে বলল, 'মগজের মধ্যে তোমার সাঁচাই জিনিস আছে মিঞা, সুখ আছে তোমার সাথে কথা কইয়া, কাম কইরা।'

ফুলবানুকেও একবার চোখের দেখা দেখে যেতে অনুমতি পেল মোতালেফ। আড়াল থেকে দেখতে শুনতে ফুলবানুর কিছু বাকী ছিল না। তবু মোতালেফকে দেখে ঠোঁট ফুলালো ফুলবানু, 'বেসবুর কেডা হইল মেঞা? এদিকে আমি রইলাম পথ চাইয়া আর তুমি ঘরে নিয়া ঢুকাইলা আর একজনারে।'

মোতালেফ জবাব দিল, 'না ঢুকায়ে করি কি!'

মানের দায়ে জানের দায়ে বাধ্য হয়ে তাকে এই ফন্দি খুঁজতে হয়েছে। ঘরে কেউ না থাকলে পানি-চুনি দেয় কে, প্রাণ বাঁচে কি ক'রে। ঘরে কেউ না থাকলে রস জ্বাল দিয়ে গুড় তৈরি করে কে। আর সেই গুড় বিক্রি ক'রে টাকা না আনলেই বা মান বাঁচে কি ক'রে।

ফুলবানু বলল, 'বোঝলাম, মানও বাঁচাইলা, জানও বাঁচাইলা, কিন্তু গায়ে যে আর একজনের গন্ধ

জড়াইয়া রইল তা ছাড়াবা কেমনে।'

মনে এলেও মুখফুটে এ কথাটা বলল না মোতালেফ যে, মানুষ চ'লে গেলে তার গন্ধ সত্যিই আর একজনের গায়ে জড়িয়ে থাকে না, তা যদি থাকত তা'হলে সে গন্ধ তো ফুলবানুর গা থেকেও বেরুতে পারত। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে মোতালেফ ঘুরিয়ে জবাব দিল, বলল, 'গন্ধের জন্য ভাবনা কি ফুলবিবি। সোডা সাবান কিনা দেব বাজার গুনা। ঘাটের পৈঠায় পা ঝুলাইয়া বসব তোমারে লইয়া। গতর গুনা ঘইসা ঘইসা বদ্ গন্ধ উঠাইয়া ফেইলো।'

মুখে আঁচল চাপতে চাপতে ফুলবানু বলল, 'সাঁচাই নাকি ?'

মোতালেফ বলল, 'সাঁচা না ত কি মিছা ? শুইঙ্গা দেইখো তখন নতুন মাইনষের নতুন গন্ধে ভুর ভুর করবে গতর। দক্ষিণা বাতাসে চুলেব গন্ধে ফুলের গন্ধে ভুর ভুর করবে, কেবল সবুর কইরা থাক আর দুইখান মাস।'

ফুলবানু আর একবার ভরসা দিয়ে বলল, 'বেসবুব মানুষ ভাইবো না আমারে।'

যে কথা সেই কাজ মোতালেফের, দু'মাসের বেশি সবুব করতে হল না ফুলবানুকে। গুড় বেচে আরও পঞ্চাশ টাকার জোগাড় হতেই মোতালেফ মাজুখাতুনকে তালাক দিল। কারণটাও সঙ্গে সঙ্গে পাড়াপড়শীকে সাড়ম্বরে জানিয়ে দিল। মাজুবিবির স্বভাব চরিত্র খারাপ। রাজেকের দাদা ওয়াহেদ মৃধার সঙ্গে তার আচার-ব্যবহার ভাবি আপত্তিকর।

মাজুখাতুন জিভ কেটে বলল, 'আউ আউ, ছি ছি ! তোমার গতরই কেবল সোন্দর মোতিমেঞা, ভিতর সোন্দর না। এত শয়তানি, এত ছলচাতুরী তোমাব মনে ? গুড়ের সময় পিপড়াব মত লাইগা ছিলা, আব গুড় যাই ফুরাইল অমনি দুব দূর।'

কিন্তু অত কথা শোনবার সময় নেই মোতালেফের ; ধৈর্যও নেই।

আমেব গাছ বোলে ভবে উঠল, গাব গাছের ডালে ডালে গজাল তামাটে রঙের কচি কচি নতুন পাতা। শীতেব পরে এল বসন্ত, মাজুখাতুনেব পরে এল ফুলবানু। ফুলের মতই মুখ। ফুলের গন্ধ তার নিঃশ্বাসে। পাড়াপড়শী বলল, 'এবাব মানাইছে, এবার সাঁচাই বাহাব খোলছে ঘরের।'

ফুর্তিব অন্ত নেই মোতালেফেব মনে। দিনভর কিষাণ কামলা খাটে। তারপব সন্ধ্যা হতে না হতেই এসে আঁচল ধবে ফুলবানুব, 'থুইয়া দাও তোমাব রান্ধন-বাড়ন ঘরগেরস্থালি। কাছে বস আইসা।'

ফুলবানু হাসে, 'সবুব সবুব ! এ কয়মাস কাটাইলা কি কইরা মেঞা ?'

মোতালেফ জবাব দেয়, 'খেজুর গাছ লইয়া।'

নিবিড় বাহুবেষ্টনের মধ্যে দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসে ফুলবানুর, একটু নিঃশ্বাস নিয়ে হেসে বলে, 'তুমি আবার সেই গাছের কাছেই ফিরা যাও। 'গাছি'ব আদর গাছেই সইতে পারে।'

মোতালেফ বলে, 'কিন্তু গাছির কাছেও যে গাছেব রস দুই-চাইর মাসেই ফুরায় ফুলজান, কেবল তোমাব রসই বছবে বাব মাস চোঁযাইয়া চোঁয়াইয়া পড়ে।'

মাজুখাতুন ফের গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল রাজেকের পড়ো-পড়ো শণের কুঁড়েয়। ভেবেছিল আগের মতই দিন কাটবে। কিন্তু দিন যদিবা কাটে, রাত কাটে না। মোতালেফ তার সর্বনাশ ক'রে ছেড়েছে। পাড়াপড়শীরা এসে সাড়ম্বরে সালঙ্কারে মোতালেফ আব ফুলবানুর ঘবকন্নার বর্ণনা করে, একটু বা সকৌতুক তিবস্কাবের সুরে বলে, 'নাঃ, বউ বউ কইবা পাগল হইয়াই গেল মানুষটা। যেখানেই যায় বউ ছাড়া আব কথা নাই মুখে।'

বুকের ভিতরটা জ্বলে ওঠে মাজুখাতুনের। মনে হয় সেও বুঝি হিংসায় পাগল হয়ে যাবে। বুক ফেটে মরে যাবে সে।

দিন কয়েক পরে রাজেকের বড় ভাই ওয়াহেদই নিয়ে এল সম্বন্ধ। বউটার দশা দেখে ভারি মায়া হয়েছে তার। নদীর ওপারে তালকান্দায় নাদির শেখের সঙ্গে দোস্তি আছে ওয়াহেদের। এক মাল্লাই নৌকা বায় নাদির। মাসখানেক আগে কলেরায় তার বউ মারা গেছে। অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে রেখে

গেছে অনেকগুলি। তাদের নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছে বেচারা। কমবয়সী ছুঁড়ী-টুড়িতে দরকার নেই তার। সে হয়তো পটের বিবি সেজে থাকবে, ছেলেমেয়ের যত্ন-আত্তি করবে না। তাই মাজুখাতুনের মত একটু ভারিক্কি ধীরবুদ্ধি গৃহস্থঘরের বউই তার পছন্দ। তার ওপর নির্ভর করতে পারবে সে।

মাজুখাতুন জিজ্ঞেস করল, 'বয়স কত হবে তার?'

ওয়াহেদ জবাব দিল, 'তা আমাগো বয়সীই হবে। পঞ্চাশ, এক-পঞ্চাশ।'

মাজুখাতুন খুশী হয়ে ঘাড় নেড়ে জানাল—হ্যাঁ ওই রকমই তার চাই। কম বয়সে তার আস্থা নেই। বিশ্বাস নেই যৌবনকে।

তারপর মাজুখাতুন জিজ্ঞেস করল, 'গাছি না তো সে? খাজুর গাছ কাটতে যায় না তো শীতকালে?'

ওয়াহেদ বিস্মিত হয়ে বলল, 'গাছ কাটতে যাবে ক্যান্! ওসব কাম কোন কালে জানে না সে। বর্ষাকালে নৌকা বায়, শীতকালে কিষাণ কামলা খাটে, ঘরামির কাজ করে। ক্যান্ বউ, 'গাছি' ছাড়া, রসের ব্যাপারী ছাড়া কি তুমি নিকা বসবা না কারো সাথে?'

মাজুখাতুন ঠিক উল্টো জবাব দিল। রসের সঙ্গে কিছুমাত্র যার সম্পর্ক নেই, শীতকালের খেজুর গাছের ধারে কাছেও যে যায় না, নিকা যদি বসে মাজুখাতুন তার সঙ্গেই বসবে। রসের ব্যাপারে মাজুখাতুনের ঘেন্না ধরে গেছে।

ওয়াহেদ বলল, 'তাহ'লে কথাবার্তা কই নাদিরের সাথে? সে বেশি দেবি করতে চায় না।'

মাজুখাতুন বলল, 'দেরি কইরা কাম কি।'

দেরি বেশি হলও না, সপ্তাহখানেকের মধ্যে কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল। নাদিরের সঙ্গে এক মাল্লাই নৌকায় গিয়ে উঠল মাজুখাতুন। পার হয়ে গেল নদী।

মোতালেফ স্ত্রীকে বলল, 'আপদ গেল। পেত্নীর মত ফাঁৎ ফাঁৎ নিশ্বাস ফেলত, চোখের উপর শাপমন্যি করত দিন রাইত, তার হাতগুনা তো বাঁচলাম, কি কও ফুলজান?'

ফুলবানু হেসে বলল, 'পেত্নীরে খুব ডরাও বুঝি মেঞা?'

মোতালেফ বলল, 'না, এখন আর ডরাই না। পেত্নী তো ছুইটাই গেল। এখন চোখ মেললেই তো পরী। এখন ডরাই পরীবে।'

'ক্যান্, পরীরে আবার ডর কিসের তোমার?'

'ডর নাই? পাখা মেইলা কখন্ উরাল দেয় তার ঠিক কি!'

ফুলবানু বলল, 'না মেঞা, পরীর আর উরাল দেওয়ার সাধ নাই। সে তার পছন্দসই সব পাইয়া গেছে। এখন ঘরের মাইন্ষের পছন্দ আর নজরডা বরাবর এই রকম থাকলে হয়।'

মোতালেফ বলল, 'চৌখ যদ্দিন আছে, নজরও তদ্দিন থাকবে।'

দিনরাত ভারি আদরে তোয়াজে রাখল মোতালেফ বউকে। কোন্ মাছ খেতে ভালোবাসে ফুলবানু হাটে যাওয়ার আগে শুনে যায়, ট্যাঁকে পয়সা না থাকলে কারো কাছ থেকে পয়সা ধার ক'রে কেনে সেই মাছ। ডিমটা, আনাজটা, তরকারিটা যখন যা পারে হাট-বাজার থেকে নিয়ে আসে মোতালেফ। ফি হাটে আনে পান সুপারি খয়ের মসলা।

ফুলবানু বলে, 'অত পান আন ক্যান্, তুমিতো বেশি ভক্ত না পানের। দিন রাইত খালি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ তামাক টানো।'

মোতালেফ বলল, 'পান আনি তোমার জৈন্যে। দিন ভইরা পান খাবা, খাইয়া খাইয়া ঠোঁট রাঙ্গাবা।'

ফুলবানু ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'ক্যান্, আমার ঠোঁট এমনে বুঝি রাঙ্গা না যে, পান খাইয়া রাঙ্গাইতে হবে? আমি পান সাইজা দেই, তুমিই বরং দিন রাইত খাওয়া ধর। তামাক খাইয়া খাইয়া কালা হইয়া গেছে ঠোঁট, পানের রসে রাঙ্গাইয়া নেও।'

মোতালেফ হেসে বলল, 'পুরুষ মাইনষের ঠোঁট তো ফুলজান কেবল পানের রসে রাঙ্গা হয় না,

আর-একজনের পানখাওয়া-ঠোঁটের রস লাগে।

নিজের ভুঁই ক্ষেত নেই মোতালেফের। মল্লিকদের, মুখুজ্যেদের কিছু কিছু জমি বর্গা চষে। কিন্তু ভালো কৃষাণ বলে তেমন খ্যাতি নেই, জমির পরিমাণ, ফসলের পরিমাণ অন্য সকলের মত নয়। সিকদারদের, মুন্সীদের জমিতে কিষাণ খাটে। পাট নিড়ায়, পাট কাটে, পাট জাগ দেয়, ধোয়, মেলে। ভারি খেজমৎ খাটুনি খাটে। ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে কালো হয়ে যায় মোতালেফের। বর্গা জমির পাট খুব বেশি ওঠে না উঠানে। সিকদাররা, মুন্সীরা নগদ টাকা দেয়। কেবল মল্লিক আর মুখুজ্যেদের বিঘেচারেক ভুঁইয়েব ভাগের ভাগ অর্ধেক জাগ-দেওয়া পাট নৌকা ভরে খালের ঘাটে এনে নামায় ·মোতালেফ। পাট ছাড়াতে ভারি উৎসাহ ফুলবানুর। কিন্তু মোতালেফ সহজে তাকে পাটে হাত দিতে দেয় না, বলে, 'কষ্ট হবে, পচা গন্ধ হবে গায়।'

ফুলবানু বলে, 'হইল তো বইয়া গেল, রউদে পুইড়া তুমি কালা কালা হইয়া গেলা, আর আমি পাট নিতে পারব না. কষ্ট হবে! কেমনতরো কথাই যে কও তুমি মেঞা।'

নিজেদের পাট তো বেশি নয়, পাঁকাটি পাওয়া যায় না। ফুলবানুর ইচ্ছা, অন্য বাড়ির জাগ-দেওয়া পাটও সে ছাড়িয়ে দেয়। সেই ছাড়ানো পাটেব পাটখড়িগুলি পাওযা যাবে তাহ'লে। কিন্তু মোতালেফ রাজী নয় তাতে, অত কষ্ট বউকে সে করতে দেবে না।

আশ্বিনের শেষেব দিকে আউস ধান পাকে। অন্যেব নৌকায় পরের জমিতে কিষাণ খাটতে যায় মোতালেফ। কোমর পর্যন্ত জলে নেমে ধান কাটে। আঁটিতে আঁটিতে ধান তুলতে থাকে নৌকায়। কিন্তু মোমিন, করিম, হামিদ, আজিজ—এদের সঙ্গে সমানে সমানে কাচি চলে না তার। হাত বড় 'ধীরচ' মোতালেফের, জলে ভাবি কাতর মোতালেফ। একেক দিন পিঠে বগলে জোঁক লেগে থাকে। ফুলবানু তুলে ফেলতে ফেলতে বলে, 'জোঁকটাও ছাড়াইতে পার না মেঞা, হাত তো ছিল সঙ্গে?'

মোতালেফ বলে, 'ধান কাটাব হাত দুইখান সাথেই ছিল. জোঁক ফেলাবাব হাত থুইয়া গেছিলাম বাড়িতে।'

যেখানে যেখানে জোঁকে মুখ দিয়েছিল সে সব জাযগায় সযত্নে চুন লাগিয়ে দেয় ফুলবানু, আরো পাঁচজন কৃষাণেব সঙ্গে ধান মলন দেয় মোতালেফ, দেউনি পায় পাঁচভাগের একভাগ। ধামায় ক'রে পৈকায় ক'রে ধান নিয়ে আসে। ফুলবানু ধান রোদে দেয়, কুলোয় ক'রে চিটা ঝেড়ে ফেলে ধান থেকে। মোতালেফ একেকবার বলে, 'ভারি কষ্ট হয় বউ, না?'

ফুলবানু বলে, 'হ, কষ্টে একেবারে মইরা গেলাম না! কার নাগাল কথা কও তুমি মেঞা। গেরস্থ ঘরের মাইয়া না আমি, না সাঁচাই আশমান গুনা নাইমা আইছি?'

বসন্ত যায়, বর্ষা যায়, কাটে আশ্বিন কার্তিক, ঘুরে ঘুরে ফের আসে শীত। রসেব দিন মোতালেফের বতরের দিন।.কিন্তু শীতটা এবার যেন একটু বেশি দেরিতে এসেছে। তা হোক, আবো বেশি গাছের বন্দোবস্ত নিয়ে পুষিয়ে ফেলবে মোতালেফ। খেজুর গাছের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ে। এ কাজে নাম ডাক আছে মোতালেফের, এ কাজে গাঁয়ের মধ্যে সে-ই সেরা। এবারেও বাঁডুজ্যেদের কুড়িদেড়েক গাছ বেড়ে গেল।

গাছ কাটাবার ধুম লেগে গেছে। একটুও বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই মোতালেফের, সময় নেই তেমন ফুলবানুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি রঙ্গরসিকতার। ধাব দেনা শোধ দিতে হবে, সারা বছরের রসদ জোগাড় করতে হবে রস বেচে, গুড় বেচে। দৈত্যের মত দিনভর খাটে মোতালেফ, আর বিছানায় গা দিতে না দিতেই ঘুমে ভেঙে আসে চোখ। দু'হাতে ঠেলে, দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ফুলবানু, কিন্তু মানুষকে নয়, যেন আস্ত একটা গাছকে জড়িয়ে ধরেছে। অসাড়ে ঘুমোয় মোতালেফ। শব্দ বেরোয় নাক থেকে, আর কোন অঙ্গ সাড়া দেয় না। মোটা কাঁথার মধ্যেও শীতে কাঁপে ফুলবানু। মানুষের গায়ের গরম না পেলে, এত শীত কি কাঁথায় মানে?

কেবল রস আনলেই হয় না, রস জ্বাল দেওয়ার জ্বালানি চাই। এখান থেকে ওখান থেকে

শুকনো ডালপাতা আব খড় বযে আনে মোতালেফ। ফুলবানুকে বলে, 'বস জ্বাল দেও,—যেমন মিঠা হাত, তেমন মিঠা গুড বানান চাই, সেবা আব সবেস জিনিস হওযা চাই বাজাবেব।'

কিন্তু হাঁড়িতে হাঁড়িতে বসের পবিমাণ দেখে মুখ শুকিযে যায ফুলবানুব, বুক কাঁপে। দু'এক হাঁড়ি বস জ্বাল দিযেছে সে বাপেব বাড়িতে, কিন্তু এত বস এক সঙ্গে সে কোনদিন দেখেনি, কোনকালে জ্বাল দেযনি।

মোতালেফ তাব ভঙ্গি দেখে হেসে বলে, 'ভয় কি, আমি তো আছিই কাছে কাছে—আমাবে পুছ কইবো, আমি কইযা কইযা দেব। মনেব মইধ্যে যেমন টগবগ কবে বস, জালাব মধ্যেও তেমন কবা চাই।'

কিন্তু উনানেব কাছে সকাল থেকে দুপুব পর্যন্ত বসে বসে মনেব বস্ শুকিয়ে আসে ফুলবানুব, নিবু নিবু কবে উনানেব আগুন, তেমন ক'বে টগবগ কবে না জালাব বস।সাবা দুপুব উনানেব ধাবে বসে বসে চোখ-মুখ শুকিযে আসে ফুলবানুব, রূপ ঝলসে যায, তবু গুড হয না পছন্দমত। কেমন যেন নবম নবম থাকে পাটালি, কোনদিন বা পুড়ে তেতো হযে যায।

মোতালেফ রুক্ষস্ববে বলে, 'কেমনতবো মাইযামানুষ তুমি, এত কইবা কইযা দেই, বুঝাইলে বোঝ না। এই গুড হইছে, এই নি খইদ্দাবে কেনবে পযসা দিযা ?'

ফুলবানু একটু হাসতে চেষ্টা কবে বলে, 'কেনবে না ক্যান। বেচাতে জানলেই কেনবে।'

মোতালেফ খুশি হয না হাসিতে, বলে, 'তাইলে তুমি যাইযা ধামা লইযা বইস বাজাবে। তুমি আইস বেইচা। খুবসুবৎ মুখেব দিকে চাইযা যদি কেনে, গুড়েব দিকে চাইযা কেনবে না।'

বোকা তো নয ফুলবানু, অকেজো তো নয একেবাবে। বলতে বলতে শেখাতে শেখাতে দু'চারদিনেব মধ্যেই কোনবকমে চলনসই গুড তৈবি কবতে শিখল ফুলবানু, বাজাবে গুড একেবাবে অচল বইল না। কিন্তু দব ওঠে না গতবাবেব মত, খদ্দেববা তেমন খুশি হয না দেখে।

পুবনো খদ্দেববা একবাব গুড়েব দিকে চায আব একবাব মুখেব দিকে চায মোতালেফেব, 'এ তোমাব কেমনতবো গুড হইল মিঞা ? গত হাটে নিযা দেখলাম গেল বছবেব মত সোযাদ পাইলাম না। গেলবাবও তো গুড খাইছি তোমাব, জিহ্বায যেন জড়াইযা বইছে, আস্বাদ ঠোঁটে লাইগা বইছে। এবাব তো তেমন হইল না। তোমাব গুড়েব থিকা এবাব ছদন শেখ, মদন সিকদাবেব গুড়েব সোযাদ বেশি।'

বুকেব ভিতব পুড়ে যায মোতালেফেব, বাগে সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে। গতবাবেব মত এবাব স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফেব গুড়ে। কেন, সে তো কম খাটছে না, কম পবিশ্রম কবছে না গতবাবেব চেযে। তবু কেন স্বাদ হচ্ছে না মোতালেফেব গুড়ে, তবু কেন দব উঠছে না লোকে দেখে খুশি হচ্ছে না, খেযে খুশি হচ্ছে না, গুড়েব সুখ্যাতি কবছে না তাব। অত নিন্দামন্দ শুনতে হচ্ছে কেন, কিসেব জন্যে ?

বাত্রে বিছানায শুযে শুযে বস জ্বাল দেওযাব কৌশলটা আবো বাব কযেক মোতালেফ বলল ফুলবানুকে 'হাতায কইরা কইবা ফোঁটা দেইখো নামাবাব সময হইল কিনা, ঢালবাব সময হইল কিনা বস।'

ফুলবানু বিরক্ত বিবস মুখে বলে, 'হ হ, চিনছি। আব বক বক কইবো না, ঘুমাইতে দেও মাইনষেবে।

হঠাৎ মোতালেফেব মনে পড়ে গেল মাজুখাতুনেব কথা। বাত্রে শুযে শুযে বস আব গুড়েব কত আলোচনা কবেছে তার সঙ্গে মোতালেফ। মাজুখাতুন এমন ক'বে মুখ ঝামটা দেযনি, অস্বস্তি জানাযনি ঘুমেব ব্যাঘাতের জন্যে, সাগ্রহে শুনেছে, সানন্দে কথা বলেছে।

পবদিন বেলা প্রায দুপুব নাগাদ কোত্থেকে একবোঝা জ্বালানি মাথায ক'বে নিযে এল মোতালেফ, এনে বাখল সেই পাঁকাটিব চালাব দোরেব কাছে, 'কি বকম গুড় হইতেছে আইজ ফুলজান ?'

কিন্তু চালাব ভিতব থেকে কোন জবাব এল না ফুলবানুব। আবো একবাব ডেকে সাড়া না পেয়ে বিস্মিত হয়ে চালার ভিতব মুখ বাড়াল মোতালেফ, কিন্তু ফুলবানুকে সেখানে দেখা গেল না। কি

রকম গন্ধ আসছে যেন ভিতর থেকে, জালার মধ্যে ধরে গেল নাকি গুড় ? সারে সারে গোটা পাঁচেক জালায় রস জ্বাল হচ্ছে, টগবগ করছে রস জালার মধ্যে। মুখ বাড়িয়ে দেখতে এগিয়ে গেল মোতালেফ। যা ভেবেছে ঠিক তাই। সবচেয়ে দক্ষিণকোণের জালাটার রস বেশি জ্বাল পেয়ে কি ক'রে যেন ধরে গেছে একটু। পোড়া পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে ভিতব থেকে। বুকের মধ্যে জ্বালাপোড়া ক'রে উঠল মোতালেফের, গলা চিরে চীৎকার বেরুল,—'কই, কোথায় গেলি হারামজাদী ?'

ব্যস্ত হয়ে ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ফুলবানু। বেলা বেশি হয়ে যাওয়ায় দু'দিন ধ'রে স্নান করতে পারেনি। শীতের দিন না নাইলে গা কেমন চড় চড় করে, ভালো লাগে না। তাই আজ একটু সোডা সাবান মেখে ঘাট থেকে সকাল সকাল স্নান ক'রে এসেছে। নেয়ে এসে পরেছে নীল রঙের শাড়ি। গামছায় চুল নিংড়ে তাতে তাড়াতাড়ি একটু চিরুনি বুলিয়ে নিচ্ছিল ফুলবানু, মোতালেফের চিৎকার শুনে ত্রস্তে চিরুনি হাতেই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ভিজে চুল লুটিয়ে রইল পিঠের ওপর। এক মুহূর্ত জ্বলন্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইল মোতালেফ, তারপর ছুটে গিয়ে মুটি ক'রে ধরল সেই ভিজে চুলের রাশ, 'হারামজাদী, গুড় পুইড়া গেল সেদিকে খেয়াল নাই তোমার, তুমি আছ সাজগোজ লইয়া, পটের ভিতর গুনা বাইরাইয়া আইলা তুমি বিদ্যাধরী, এই জৈন্যাই গুড় খারাপ হয় আমার, অপমান হয়, বদনামে দেশ ছাইয়া গেল তোমার জৈন্যে।'

ফুলবানু বলতে লাগল, 'খববদার, চুল ধইরো না তাই বইলা, গায়ে হাত দিও না।'

'ও, হাতে মারলে মান যায় বুঝি তোমাব ?' পায়ের কাছ থেকে একটা ছিটা কঞ্চি তুলে নিয়ে তাই দিয়ে হাতে বুকে পিঠে মোতালেফ সপাসপ চালাতে লাগল ফুলবানুর সর্বাঙ্গে, বলল, 'কঞ্চিতে মাবলে তো আব মান যাবে না শেখেব ঝির। হাতেই দোষ, কঞ্চিতে তো আর দোষ নাই।'

ভাবি বদরাগী মানুস মোতালেফ। যেমন বেসবুর বেবুঝ তার অনুরাগ, রাগও তেমনি প্রচণ্ড।

খবর পেয়ে এলেম শেখ এল চরকান্দা থেকে। জামাইকে শাসালো, বকলো, ধমকালো, মেয়েকেও নিন্দামন্দ কম কবল না।

ফুলবানু বলল, 'আমারে লইয়া যাও বা'জান তোমার সাথে—এমন গোঁয়ার মাইনষের ঘর করব না আমি।'

কিন্তু বুঝিয়ে শুঝিয়ে এলেম রেখে গেল মেয়েকে। একটু আস্কারা দিলেই ফুলবানু পেয়ে বসবে, আবার তালাক নিতে চাইবে। কিন্তু গৃহস্থঘরে অমন বারবার অদল-বদল আর ঘর-বদলানো কি চলে। তাতে কি মান-সম্মান থাকে সমাজেব কাছে। একটু সবুর করলেই আবার মন নবম হয়ে আসবে মোতালেফের। দু'দণ্ড পরেই আবাব মিলমিশ হয়ে যাবে। স্বামীস্ত্রীর ঝগড়াঝাঁটি। দিনে হয়, রাত্রে মেটে। তা নিয়ে আবার একটা ভাবনা।

মিটে গেলও। খানিক বাদেই আবার যেচে আপোষ কবল মোতালেফ। সেধেভেজে মান ভাঙাল ফুলবানুর। পরদিন ফের আবাব উনানের পিঠে রস জ্বাল দিতে গিয়ে বসল ফুলবানু। দুপুরের পর ধামায় বয়ে গুড় নিয়ে চলল মোতালেফ হাটে। যাবার সময় বলল, 'এই দুইটা মাস কাইটা গেলে কোন রকমে তোমার কষ্ট ঘারে ফুলজান।'

ফুলবানু বলল, 'কষ্ট আবার কি।'

কিন্তু কেবল মুখের কথা, কেবল যেন ভদ্রতার কথা। মনের কথা যেন ফুটে বেরোয় না দুজনের কারোরই মুখ দিয়ে। সে কথার ধরন আলাদা, ধ্বনি আলাদা ; তা তো আর চিনতে বাকি নেই কারো। বলেও জানে, শোনেও জানে।

হাটের পর হাট যায়, রসের বতর প্রায় শেষ হয়ে আসে ; গুড়ের খ্যাতি বাড়ে না মোতালেফের, দর চড়ে না ; কিন্তু তা নিয়ে ফুলবানুর সঙ্গে বাড়ি এসে আর তর্কবিতর্ক করে না মোতালেফ, চুপ ক'রে ব'সে হুঁকোয় তামাক টানে। খেজুর গাছ থেকে নল বেয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রস পড়ে হাঁড়ির মধ্যে। ভোরে গাছে উঠে রসভরা বড় বড় হাঁড়ি নামিয়ে আনে মোতালেফ, কিন্তু গত বছরের মত যেন সুখ নেই মনে, স্ফূর্তি নেই। ঘামে এবারও সর্বাঙ্গ ভিজে যায়, কিন্তু শুকনো পাঁকাটির মত খট খট করে মন, দুপুরের রোদ্রের মত খাঁ খাঁ করে। কোথাও ছিটা ফোঁটা নেই রসের। রসের হাঁড়িতে

ভবে যায উঠান. বসবতী নাবী ঘবেব মধ্যে ঘোবা ফেবা কবে, তবু যেন মন ভরে না, কেমন যেন খালি-খালি মনে হয দুনিযা।

একদিন হাটেব মধ্যে দেখা হযে গেল নদীব পাবের নাদিব শেখেব সঙ্গে।

'সেলাম মেঞাসাব।'

'আলেকম আসলাম।'

মোতালেফ বলল, 'ভালো তো সব, ছাওযালপান ভালো তো—?'

মাজুখাতুনেব কথাটা মুখে এনেও আনতে পাবল না মোতালেফ। নাদির একটু হেসে বলল, 'হ মেঞা, ভালোই আছে সব। খোদাব দযায চইলা যাইতেছে কোন বকম সকমে।'

মোতালেফ একটু ইতস্তত ক'বে বলল, 'ছাওযালপানেব জৈন্যে সেব দুই তিন গুড লইযা যান না মেঞা। ভালো গুড।'

নাদিব হেসে বলল, 'ভালোই তো। আপনাব গুড তো কোনকালে খাবাপ হয না।'

হঠাৎ ফস ক'বে কথাটা মুখ থেকে বেবিযে যায মোতালেফেব, 'না মেঞা, সে দিনকাল আব নাই।'

অবাক হযে নাদিব এক মুহূত তাকিযে থাকে মোতালেফেব দিকে। এ কেমনতবো ব্যাপাবী ' গুড বেচতে এসে নিজেব গুডেব নিন্দা কি কেউ নিজে কবে ?'

নাদিব জিজ্ঞাসা কবে, 'কত কইবা দিতেছেন ?'

'দামেব জৈন্যে কি ? দুই সেব গুড দিলাম আপনাব পোলাপানবে খাইতে। কযন জানি, চাচায দিছে।'

নাদিব ব্যস্ত হযে বলে 'না না না, সে কি মেঞা, আপনাব বেচবাব জিনিস, দাম না দিযা নেব ক্যান আমি।'

মোতালেফ বলে, 'আইচ্ছা, নিযা তো যাযন আইজ, খাইযা দ্যাখেন, দাম না হয সামনেব হাটে দিবেন।'

বলতে বলতে কথাগুলো যেন মুখে আটকে যায মোতালেফেব। এবাবেও জিনিস কাটাবাব জন্যে বলতে হয এসব কথা, গুডেব গুণপনাব কথা ঘোষণা কবতে হয খদ্দেবেব কাছে, কিন্তু মনে মনে জানে কথাগুলি কত মিথ্যা, পবেব হাটে এসব খদ্দেব আব পাবতপক্ষে গুড কিনবে না তাব কাছ থেকে ভিড কববে না তাব গুডেব ধামাব সামনে।

অনেক বলা-কওযায একসেব গুড কেবল বিনা দামে নিতে বাজী হয নাদিব আব বাকি দ' সেবেব পযসা গুনে দেয জোব ক'বে মোতালেফেব হাতেব মধ্যে।

মাজুখাতুন সব শুনে আগুন হযে ওঠে বেগে 'ও গুড ছাওযালপানবে খাওযাইতে চাও খাওযাও, কিন্তু আমি ও গুড ছোব না হাত দিযা, তেমন বাপেব বিটি না আমি।

এক হাট যায, নাদিব আব ঘেঁষে না মোতালেফেব গুডেব কাছে। মাজুখাতুন নিষেধ ক'রে দিযেছে নাদিবকে, খববদাব, ওই মাইনষেব সাথে যদি ফেব খাতিব নাতিব কব, আমি চইলা যাব ঘবগুনা। বাইত পোহাইলে আমাবে আব দেখতে পাবা না।'

মনে মনে মাজুখাতুনকে ভাবি ভয কবে নাদিব। কাজে-কর্মে সবেস, কথায-বার্তায বেশ, কিন্তু রাগলে আব কাণ্ডজ্ঞান থাকে না বিবিব।

দিন কযেক পবে একদিন ভোববেলায দু'টি সেবা গাছেব সবচেযে ভালো দু' হাঁডি বস নিয়ে নদীব ঘাটে গিযে খেযা নৌকায উঠে বসল মোতালেফ। ঝাপ্টানো কুলগাছটাব পাশ দিযে ঢুকল গিযে নাদিবের উঠানে, 'বাডি আছেন নাকি মেঞা ?'

হুঁকো হাতে নাদিব বেবিয়ে এল ঘব থেকে, 'কেডা ? ও, আপনে ? আসেন, আসেন। আবাব বস নিযা আইছেন ক্যান মেঞাসাব ?'

মোতালেফকে আমন্ত্রণ জানাল বটে নাদিব কিন্তু মনে মনে ভাবি শঙ্কিত হয়ে উঠল মাজুখাতুনের জন্য। যে মানুষেব নাম গন্ধ শুনতে পারে না বিবি, সেই মানুষ নিজে এসে সশবীবে হাজিব হযেছে।

না জানি, কি কেলেঙ্কারিটাই ঘটায়।

যা ভেবেছে নাদির, তাই। বাঁখারির বেড়ার ফাঁক দিয়ে মোতালেফকে দেখতে পেয়েই স্বামীকে ঘরের ভিতর ডেকে নিল মাজুখাতুন, তারপর মোতালেফকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'যাইতে কও এ বাড়িগুনা, এখনই নাইমা যাইতে কও। একটুও কি সরম ভরম নাই মনের মইধ্যে ? কোন মুখে উঠল আইসা এখানে ?'

নাদির ফিস ফিস ক'রে বলে, 'আস্তে, আস্তে,—একটু গলা নামাইয়া কথা কও বিবি। শোনতে পাবে। মাইন্‌ষের বাড়ি মানুষ আইছে, অমন কইরা কথা কয় নাকি। কুকুব বিডালডাবেও তো অমন কইবা খেদায না মাইন্‌যে।'

মাজুখাতুন বলল, 'তুমি বোঝবা না মিঞা, কুকুর বিডাল থিকাও অধম থাকে মানুষ, শয়তান থিকাও সাংঘাতিক হয়। পুছ কব, বস খাওয়াইতে যে আইল আমাবে, একটুও ভয়ডব নাই মনে, একটুও কি নাজসবম নাই ?'

একটা কথাও মৃদুস্ববে বলছিল না মাজুখাতুন, তাব সব কথাই কানে যাচ্ছিল মোতালেফের। কিন্তু আশ্চর্য, এত কঠিন, এত রূঢ় ভাষাও যেন তাকে ঠিক আঘাত কবছিল না, ববং মনে হচ্ছিল এত নিন্দা-মন্দ, এত গালাগাল তিরস্কারেব মধ্যেও কোথায় যেন একটু মাধুর্য মিশে আছে ; মাজুখাতুনের তীব্র কর্কশ গলার ভিতর থেকে আহত বঞ্চিতা নাবীব অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠেব আমেজ আসছে যেন একটু একটু। ছ্যানের খোঁচায় নলেব ভিতব দিযে ফোঁটায় ফোঁটায় চুঁইযে চুঁইযে পডছে রস।

দাওযায় উঠে রসের হাঁড়ি দু'টি হাত থেকে মাটিতে নামিয়ে বেখে মোতালেফ নাদিবকে ডেকে বলল, 'মেঞাসাব, শোনবেন নি একটু ?'

নাদিব লজ্জিত মুখে ঘর থেকে বেবিযে এসে বলল, 'বসেন মেঞা, বসেন। ধবেন, তামাক খান।'

নাদিবেব হাত থেকে হুঁকোটা হাত বাডিযে নিল মোতালেফ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মুখ লাগিয়ে টানতে শুরু করল না, হুঁকোটা হাতেই ধবে বেখে নাদিরেব দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাব হইযা একটা কথা কন বিবিরে।'

নাদিব বলল, 'আপনেই ক'ন না, দোষ কি তাতে।

মোতালেফ বলল, 'না, আপনেই কন, কথা কবাব মুখ আমাব নাই। ক'ন যে মোতালেফ মেঞা খাওয়াবাব জৈন্যে আনে নাই বস, সেইটুকু বুদ্ধি তার আছে।'

নাদির কিছু বলবার আগেই মাজুখাতুন ঘরের ভিতর থেকে বলে উঠল, 'তয কিসেব জৈন্যে আনছে ?'

নাদিরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই জবাব দিল মোতালেফ, বলল, 'কযন এ আনছে জ্বাল দিয়া দুই সের গুড় বানাইয়া দেওয়ার জৈন্যে। সেই গুড ধামায় কইরা হাটে নিয়া যাবে মোতালেফ মিঞা। নিয়া বেচবে অচেনা খইদ্দারের কাছে। এ বছর একছটাক পছন্দসই গুডও তো সে হাটে বাজারে বেচতে পারে নাই। কেবল গাছ বাওয়াই সাব হইছে তাব।' গলাটা যেন ধবে এল মোতালেফের। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, বাঁখারির বেড়ার ফাঁকে চোখে পড়ল কালো বড় বড় আর-দুটি চোখ ছল্ ছল্ করে উঠেছে। চুপ ক'বে তাকিয়ে রইল মোতালেফ। আর কিছু বলা হল না।

হঠাৎ যেন হুঁস হল নাদির শেখের, বলল, 'ও কি মেঞা, হুঁকাই যে কেবল ধইরা বইলেন হাতে, তামাক খাইলেন না ? আগুর্নান নিবা গেল কইলকার ?'

হুঁকোতে মুখ দিতে দিতে মোতালেফ বলল, 'না মেঞাভাই, নেবে নাই।'

পৌষ ১৩৫৪

কাঠগোলাপ

সাদা কাপড়ের চার ধারে সরু পেনসিলে নক্সা কেটে সেই পেনসিলের দাগ সবুজ সুতোয় ঢেকে দিচ্ছিল অণিমা।

ছেলে-মেয়ে দু'টি পাশেব ভাড়াটের ছেলেপুলের সঙ্গে খেলতে বেরিয়েছে গলিতে। নির্জন ঘর। ঠিক নির্জন নয়। আরো একজন আছে, কিন্তু সে না থাকার-মতই। জানলার ধারে তক্তপোশ পেতে শিযবের বালিসে কনুই ডুবিয়ে, হাতের তেলোয় মাথা রেখে, খবরের কাগজে সারাটা মুখ ঢেকে রেখেছে সে ব্যক্তি। দাঁতেব আগায় সুতো কেটে অপাঙ্গে সেদিকে একবার তাকিয়ে দেখল অণিমা। আজ দিন ভ'বেই কি কাগজ পড়বে নীবদ! হকার ভোরে দিয়ে গেছে কাগজ। নীরদ সকালে পড়েছে, ঘুমেব আগে দুপুবে দেখেছে, বিকেলেও কি পোড়া ছাইর কাগজ শেষে হল না?

এমব্রয়ডাবীটি হাতে ক'রেই অণিমা উঠে এল স্বামীব কাছে। একবার ভাবল কাগজটা হাত থেকে ছিনিযে নেবে, কিন্তু সাহস পেল না, মেজাজটা কেমন আছে কে জানে। অণিমা একটু কাল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে কি দেখল, তারপব কৃত্রিম শাসনের ভঙ্গিতে বলল, 'কাগজ এখনো ফেল বলছি। না হ'লে হাতেব সূচ বিঁধিয়ে দেব আঙুলে।'

কাগজ এবার সরিয়ে রাখল নীবদ, তাবপর স্ত্রীব মুখেব দিকে চেয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাই এখন বাকি। তারপব হচ্ছে কি ওটা?'

'কোনটা?' হাসিতে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল অণিমার, 'এই এমব্রয়ডারীব কথা বলছ? বল দেখি কি তুলেছি?' লতা-পাতা-ফুলেব নক্সাওযালা কাপডটা স্বামীব মুখের কাছে আবো একটু এগিয়ে দিল অণিমা, 'দেখ দেখি চিনতে পার নাকি, বলতে পাব নাকি ফুলের নাম?'

'না'।

অণিমা বলল, 'পারবে না, আমি আগেই জানতাম। একে বলে কাঠগোলাপ, দেখেছ কোন দিন?'

'না'।

অণিমা একটু হাসল, 'আমিও দেখিনি। শুনে শুনে আন্দাজে আন্দাজে তুলছি, বেশ মানাবে টেবিলক্লথেব বর্ডারে, তাই না?'

নীরদ বলল, 'হু। নতুন ক'রে আবার এমব্রয়ডাবীর সখ শুরু হল বুঝি?'

অণিমা বলল, 'হবে না? ও বাসার মায়ার ধারণা কি জান? গেঁয়ো মেয়ে ব'লে আমরা যেন আর কিছু জানি না। গান নয়, বাজনা নয়, কোন রকম হাতের কাজ নয়। কেবল জানি রাঁধতে আর খেতে। সেলাইর কাজেব দেখলুম তো নমুনা। এখনো দু'বছর আমাব কাছে ব'সে ব'সে ওরা কাজ শিখতে পারে।'

নীরদ একটু হাসল, 'তাতো পারেই।'

'তাতো পারেই মানে? ওরা ভাবে আমি এই নতুন এসেছি কলকাতায়। ওদের চেয়ে ঢের বেশি এসেছি, তা ওরা জানে না। ক'বছর আগেও তো শ্যামবাজারে মামা-বাড়িতে বছর বছর আসতুম। কলকাতার দেখিনি এমন কিছু নেই, যাইনি এমন জায়গা নেই। তা'ছাড়া গাঁয়ে থাকলেই বা। এদের এই নদীয়া-চব্বিশ পরগনারও গ্রাম, আর আমাদের ফরিদপুর-বরিশালেরও গ্রাম।'

'তাই নাকি?'

'তা'ছাড়া কি? স্কুলে, পোস্ট-অফিসে, হাটে-বাজারে ওদিককার গ্রাম এদিককার শহরের সমান। জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে এদিকের হাঁড়ির খবর বের ক'রে নিয়েছি তো সব, আজই না হয় পাকিস্তান, আজই না-হয় কপাল পুড়েছে পোড়া দেশের।' হঠাৎ কান খাড়া ক'রে কি যেন শুনল অণিমা,

'ওমা, জল এসেছে তো কলে! যাই, পেতে দিয়ে আসি বালতি। এখুনি তো আবার কাড়াকাড়ি-মারামারি শুরু হয়ে যাবে।'

এমব্রয়ডারীর কাজ ফেলে অণিমা তাড়াতাড়ি বালতি নিয়ে ছুটল। মাথার আঁচল খসে পড়ল, দুলে উঠল কানের ঝুমকো দুটো।

নীরদ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল স্ত্রীর ব্যস্ততা। যেন নতুন জোয়ার এসেছে অণিমার সর্বাঙ্গে। যেন তার সাত-আট বছর বয়স কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ষোল সতেরয়। পাড়ার অনেক ষোড়শী সপ্তদশী স্কুল-কলেজের ছাত্রীর সঙ্গে ইতিমধ্যেই অণিমার ভাব হয়েছে। চালচলনে, আচারে আচরণে, বেশে, ভূষায় অণিমাও যেন তাদেরই একজন। তার ভাব-ভঙ্গি রকম-সকম দেখে মনে হয়, যেন কেরাণীর ঘরের ঘরণী নয় সে, রাজধানীর রাণী—সম্রাজ্ঞী।

রাজধানীই বটে, অনেক খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত এই শহরতলীতে এসে ঘর মিলেছে একখানা, একতলার স্যাৎসেঁতে ঘর, চুন-বালি-ঝরা কত কালের পুরনো দেয়াল। জোরে বৃষ্টি নামলে ছাদ চুঁয়ে জল পড়ে জায়গায় জায়গায়। ঘটি বাটি পেতে রাখতে হয় ধরবার জন্য। জানলা দু'টি আছে বটে, কিন্তু খুলবার সঙ্গে সঙ্গে কাঁচা নর্দমার গন্ধও আছে। বাথরুমটা প্রায় ব্যবহারের অযোগ্য। কল-চৌবাচ্চা নিয়ে তিন ঘর ভাড়াটে, আর উপরের বাড়িওয়ালার সঙ্গে মারামারি কাড়াকাড়ি। নোংরা-ভরা উঠান। মশা আর দুর্গন্ধভরা ঘর। গন্ধে, গানে এই তো কলকাতা।

তবু তো রাজধানী। তবু তো শহরে এসেছে অণিমা। তার মুখে শহর ছাড়া কথা নেই, তার চোখে শহর ছাড়া বস্তু নেই দেখবার। অণিমা প্রায়ই বলে, 'শাপে বর হ'ল। ভাগ্যে পাকিস্তানের হাঙ্গামা হ'ল দেশে, হিড়িক লাগিল গ্রাম ছাড়বার। নইলে কি আনতে, নইলে কি আসতে পারতুম কলকাতায়? এমন স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধে বাস করতে পারতুম? সারাটা জীবন গাঁয়েই ফেলে রাখতে। আট বছর ধ'রেই তো দেখছি, ক'দিন এনে রেখেছ কলকাতায়?'

সে কথা ঠিক, স্থায়ীভাবে এর আগে এখানে বাসা বাঁধতে পারেনি নীরদ। কেবল আয়ে কুলোয়নি ব'লে নয়, মনও স্থির হয়নি ব'লে। মন কেবল শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহরে ঘুরে বেড়িয়েছে। কোথায় যে ডেরা বাঁধবে ঠিক করতে পারেনি। ফলে আধা-আধি শহরে রয়েছে, আধা-আধি গ্রামে। বছর দশেক ধ'রে শহরেই আছে নীরদ, পড়াশুনো করেছে, চাকরি-বাকরি করেছে, তবু সে নাগরিক নয, মনে মনে গ্রামিক। এখনো সেই নদী-নালা, খাল-বিল, মাঠ-জঙ্গল, বেতের ঝোপ, বাঁশের ঝাড় তার নাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে, রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে, মিলেছে স্মৃতিতে আর স্বপ্নে। কিন্তু বাস্তবে মেলেনি। ছুটিছাটায় দু-এক সপ্তাহ, দু-এক মাস গ্রামে থেকেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে নীরদ, পালাই পালাই করেছে তার মন, পালিয়ে এসেছেও। কিন্তু শহরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই বাঁশের ঝাড়, গাছের ছায়া মনকে ঢেকে ফেলেছে, ছেয়ে ফেলেছে। শহরে যে সে কিছু ক'রে উঠতে পারল না, বোধ হয় এই জন্যই। এত বড় রাজধানী সারা দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্র, তার কাছে গাঁয়ের বাজার ছাড়া বেশি কিছু নয়। এখানে লোকে আসে, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য করে তারপর খেয়া পার হয়ে ফের যায় গ্রামে। থাকবার ঘুমাবার ঘর-গৃহস্থালী, চাষবাসের জায়গা সেখানে। এত বড় কলকাতা নীরদের মনে সেই হাটুরে গঞ্জের চেয়ে বেশি জায়গা জুড়তে পারেনি।

তবু শেষ পর্যন্ত আসতে হয়েছে। বাসা বাঁধতে হয়েছে শহরে, কেবল পাকিস্তানের গোলমাল ব'লে নয়, মেস-হোটেলে খেয়ে খেয়ে কতদিন আর চলে? আপোস করতেই হয় বস্তুজগতের সঙ্গে। কেবল নিজেকে নিয়ে থাকলে চলে না, কেবল নিজের খেয়ালখুশি দেখলে চলে না। সমাজে সংসারে আর কাউকে না দেখলেও দেখতে হয় নিজের স্ত্রী-পুত্রকে, তাদের ভবিষ্যৎ—দেশের, সমাজের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি।

বাড়ি-ঘরের অবস্থা দেখে অণিমা প্রথম ভ্রূ কুঁচকোচ্ছিল।

'এ কোথায় এনে তুললে? এই নাকি কলকাতা?'

নীরদ জবাব দিয়েছিল, 'হুজুগে, হিড়িকে যারা দেশ ঘর ছেড়ে এসেছে, তাদের কলকাতা এইখানেই, এইরকম।'

'হুঁ, এই রকম না ছাই। আসলে মোটেই জোগাড়ে লোক নও তুমি, না কি ইচ্ছে ক'রে এখানে এনে তুলেছ? কলকাতায় আসতে চেয়েছি ব'লে শোধ তুলছ?'

কিন্তু দু'দিনেই ভুল ভেঙেছে অনিমার। চোখ-কান তার খোলা। দেশের অবস্থা দু-এক দিনেই বুঝে ফেলেছে। বাড়ি পাওয়া যায় না কলকাতায়, নিজেদের আব আশে পাশের চারিদিকের গ্রাম থেকে যারা উঠে এসেছে, তাদের অনেকেই কাছাকাছি আছে, ছড়িযে বয়েছে এইসব বেলেঘাটা, নাবকেলডাঙা, চড়কডাঙা অঞ্চল নিয়ে। বাসে যেতে যেতে আলাপ হযেছে অনিমাব তাদের গাঁয়ের ঘোষেদের বড বউ মল্লিকার সঙ্গে।

মল্লিকা বলেছিল, 'তুমি তো অনেক ভালো আছ। আমরা কোথায় আছি জান? মিঞাবাগানের এক বস্তীর মধ্যে, আলো নেই, জল নেই বাড়িতে। রাস্তার টিউবওয়েল থেকে জল আনিয়ে নিতে হয়।'

বাঁড়য্যেদেব ছোট মেযে তিলোত্তমাব সঙ্গে খুব ভাব অনিমার। এখন সে বাসুখালিব মুখুয্যে বাড়ির বউ, দেশে জমি-জায়গা বিষয়-আশয়, ভালো অবস্থা মুখুয্যেদের। কলকাতায় তিলোত্তমার ববও ভালো চাকরি করে ব্যাঙ্কে। ঠিকানা পেযে বরের সঙ্গে একদিন বেড়াতে এসেছিল তিলোত্তমা। ঘুরে ঘুরে দেখল সব ঘরদোর, তাবপব বলল, 'যাই বলিস, তবু তোকে দেখে হিংসা হয় অণু। আমরা যেখানে আছি, তাব তুলনায় এতো স্বর্গ। কোঠাবাড়ি নয়, আপাততঃ টিনের ঘবেই এসে উঠতে হয়েছে। ভিতটা কেবল বাঁধানো, আলো নেই, বাতাস নেই, গলি ঘিঞ্জির মধ্যে অন্ধকূপ। তুই তো স্বর্গে আছিস ভাই।'

স্বর্গে না থাকলেও ঝেড়ে-পুছে সাজিযে গুছিয়ে ঘরদোরকে স্বর্গ প্রায বানিয়ে ফেলল অনিমা। কিন্তু ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখল না। ঘুরে ঘুবে দিন কয়েকেব মধ্যেই পাড়া-পড়শীদেব সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে ফেলল, কয়েকজনের সঙ্গে রীতিমত বন্ধুত্ব। তিন ঘব ভাড়াটেব সঙ্গেই শুধু নয়, এপাশে ওপাশে আরো দুইটি সরু গলিব খান কযেক বাড়িব মেয়েদেব সঙ্গেও আলাপ পবিচয় হ'ল অনিমার। গাঁয়ের মেয়ে হলেও লজ্জা-সঙ্কোচের আধিক্যে আড়ষ্ট ভাব তার ছিল না। তা'ছাড়া পাছে গাঁয়ের কুনো মেয়ে ব'লে অপবাদ রটে, সেই আশঙ্কায় অনিমা কেবল ঘরেব কোণেই আবদ্ধ হয়ে রইল না, বাইরেও বেরুতে লাগল। কখনো বা নিজেব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে, কখনো বা অল্পবয়সী সখীসঙ্গিনীদের হাত ধরে। তারপব ক্রমে ক্রমে অনিমাদেব ঘর আব দাওয়ায়ও লোকজন আসতে লাগল। এ বাড়ির বউ, ও বাড়ির মেয়ে, সে বাড়ির মাসীমা। অনিমা আসন পেতে দেয, পিঁড়ি পেতে দেয়, দু'একজনের বেশি হ'লে দেয় মাদুব বিছিয়ে, এগিয়ে দেয় পান-সুপুবি, খয়েব-জর্দা ভবা পিতলের বাটি।

শুধু মেয়েবাই যে আসে তাই নয়, পাড়ার দু'একজন কলেজে-পড়া যুবকদেবও আসতে দেখা যায়। তিন ঘর ভাড়াটের মধ্যে গুটিচাবেক দেবর জুটেছে অনিমার, তারা জুটিয়েছে আবার আবো দু'তিনজনকে। অবসব মত তারা দু'একজন প্রায়ই জল-চৌকি অথবা মাদুর পেতে এসে বসে অনিমার ঘবে। গল্প চলে, আলাপ চলে, চলে পাকিস্তান আর ভাবতের তুলনামূলক আলোচনা। মাস কয়েকের মধ্যেই অসাধারণ খ্যাতির অধিকারিণী হয়েছে অনিমা। এমন আলাপী বউ পাড়ায় আর নেই। অনিমার গানের গলা বেশ মিষ্টি, অনিমার চায়ের হাত মধুরতব। সাজসজ্জার সখটাও বেশ একটু বেড়ে গেছে অনিমার। কখন কোন বাড়ির কোন ঠাকুরপো এসে পড়ে, কখন কোন ঠাকুরঝি ডাকতে আসে তার আনারসী নক্সাব সোয়েটারের ঘরগুলি দেখিয়ে নিতে, সেই জন্য বিকাল হ'লেই বেশ একটু সেজে-গুজে, ছিমছাম, ফিটফাট হয়ে থাকতে চেষ্টা করে অনিমা। দেয়ালে টাঙানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কোন দিন খোপা বাঁধে, কোন দিন বিনুনি করে, পাউডারের পাফ্ বুলোয় মুখে।

একদিন এমনি প্রসাধন করছে অনিমা, হঠাৎ পাশের বাড়ির একুশ-বাইশ বছরের একটি ছেলে 'বউদি' ব'লে এসে হুড়মুড় ক'রে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল বাইরে। কেবল অনিমাই যে একটু অগোছালভাবে আছে তাই নয়, ঘরের মধ্যে নীরদও রয়েছে জানলার পাশে বই হাতে। কিন্তু এই আকস্মিক আবির্ভাব-তিরোভাবের পর হাতের বই বন্ধ হ'ল নীরদের, অনিমার

পাউডারের ছোপ-লাগা মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ছেলেটি কে ?'

অণিমা অবাক হয়ে বলল, 'ওমা, ওকে চেন না ? আমাদের বাড়িওয়ালার ছোট ছেলে। এতদিন ধ'রে আছ বাড়িতে আর বাড়িওয়ালার ছেলেকেই চেন না ? কি ক'রে চিনবে ? মানুষ তো আর দেখ না, মানুষের মুখের দিকে তো আর তাকাও না ভালো ক'রে। নিজের ভাবের রাজ্যেই আছ। নভেল-নাটকের মানুষগুলিই চোখের সুমুখ দিয়ে নড়াচড়া করে, আসল মানুষের দিকে চোখ মেলে তাকাবার ফুরসুৎ কই ?'

নীরদ বলল, 'হুঁ। চোখ মেলে আসল মানুষ দেখবার জন্যে তোমাকে রেখেছি। ছেলেটি এসেছিল কেন, আর এসেছিল তো ওভাবে পালিয়েই বা গেল কেন ?'

'পালিয়ে গেল ?' এবার যেন একটু আরক্ত হয়ে উঠল অণিমার মুখ। বলল, 'পালিয়ে গেল তোমার ভয়ে। তুমি তো আর মানুষ-জন দু'চোখ পেতে দেখতে পার না। তাছাড়া মানস ঠাকুরপোই সবচেয়ে বেশি ভয় করে তোমাকে '

'কেন ?'

অণিমা বলল, 'কেন বলব ? ভয়ে বলব, কি নির্ভয়ে বলব ?

নীরদ বিরসমুখে বলল, 'বল তোমার যেভাবে খুশি।

অণিমা বলল, 'তা'হলে কথা দিচ্ছ ? রাগ করবে না ? আমার কাছে একখানা শাড়ির দাম পাবে মানস ঠাকুরপো।'

'শাড়ি ?'

'হ্যাঁগো, গয়নাগাটি কিছু নয়, সামান্য একখানা শাড়ি। কোন একটা জিনিসের নাম শুনলে তুমি এমন আকাশ থেকে পড় যে, কিছু তোমার কাছে বলতে ইচ্ছা করে না। ওই ভয়েই বলি না কোন কথা। শাড়িখানা কিন্তু খুব ভালো। যেমন পাড়, তেমনি কাচ কলাপাতার রঙ। মাত্র একুশ টাকায় পেয়েছি। বাইরে থেকে কিনতে হ'লে পঁচিশ টাকার একটি পয়সাও কমে পেতে না কেবল আমিই নয়, ও ঘরের ললিতাও কিনেছে। সবাই বলে দুজনের মধ্যে রঙের সঙ্গে আমাকেই বেশি ম্যাচ করেছে দেখবে ?

বাক্স খুলে শাড়িখানা বের করল অণিমা তুলে ধরল নীরদের মুখের সামনে, 'রঙটা খুব চমৎকার, না ?'

অণিমার চোখ মুখ উৎসাহে এত উজ্জ্বল দেখাল যে, নীরদকে ঘাড় নেড়ে স্বীকার করতেই হ'ল রঙের মনোহারিত্ব।

অণিমা বলল, 'টাকাটা কিন্তু ওকে কালকের মধ্যেই দিয়ে দিতে হবে। ভারি তাগিদ দিচ্ছে' আসলে মানস ঠাকুরপো যে তাগিদ দিচ্ছে তা নয়, যে লোকটির কাছ থেকে ও এনেছে, সে-ই তাগিদে তাগিদে ওকে অস্থির করে তুলেছে।

এবার চটে উঠল নীরদ, 'মাসের শেষে অত দামি শাড়ি তুমি কিনলে কেন ? কালকের মধ্যে কোথায় পাব একুশ টাকা ? দরকার নেই শাড়িতে, ওটা তুমি ফিরিয়ে দিয়ে এস ওকে।'

অণিমা নীচু গলায় বলল 'ছি-ছি আস্তে আস্তে। ও হয়তো কাছাকাছিই কোথাও আছে। ফিরিয়ে দিলে মান থাকে নাকি ? তা'ছাড়া ফিরিয়ে দিলে পরব কি ? গণ্ডায় গণ্ডায় শাড়ি আমার বাক্সে আছে, না ?'

নীরদ বলল 'বেশ তো, কিনবার ইচ্ছা হয়েছিল, আমাকে বললেই তো পারতে। সুযোগ-সুবিধামত আমিই দেখে শুনে কিনে দিতাম শাড়ি। গরজ দেখে নিশ্চয়ই তোমাকে ও ঠকিয়ে গেছে।'

অণিমা বলল, 'ঠকিয়েছে না আরো কিছু। তোমার কে' কেবল সন্দেহ—এই বুঝি ঠকলুম, এই বুঝি কেউ ঠকিয়ে গেল। ঠকিয়ে থাকে তো বেশ করেছে। বাড়ি বয়ে হাতের কাছে এনে দিয়েছে জিনিস। নিজে দেখে-শুনে হাতে ক'রে কিনতে পেরেছি। দু-এক টাকা যদি ঠকেও থাকি, আমার দুঃখ নেই। নিজের হাতে জিনিসপত্র কিনতে যে কি আনন্দ, তা তো তুমি আর জানো না।'

এতক্ষণ রাগ রাগ ভাব ছিল অণিমার। এবার হাসি ফুটল ঠোঁটে। নিজের হাতে জিনিস কেনার

আনন্দ। কিন্তু নীরদের মুখে যা ফুটল, তা ঠিক আনন্দ নয়। কারণ মাসের শেষে মাথা কুটলেও একুশ টাকা মিলবে না কোথাও। বিপদ-আপদ বলতে যে শ'খানেক টাকা আছে ব্যাঙ্কের সেভিংস এ্যাকাউণ্টে, তার থেকেই তুলে দিতে হবে অনিমার শাড়ির দাম। তাই তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে একটু তাকিয়ে নীরদ জবাব দিল, 'তাতো ঠিকই। নিজের হাতে খরচ করবার আনন্দই কেবল বুঝে গেলে, নিজের হাতে রোজগার করবার কষ্ট তো আব পেতে হ'ল না।'

অনিমা মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'কোন একটা জিনিসপত্র কিনতে গেলেই তোমার ওই কথা। কেবল কষ্ট আর কষ্ট। কিসের কষ্ট শুনি? অফিসে পাখার নীচে বসে কাজ কর, আর সপ্তাহে একবার ক'রে রেশন নিয়ে আস ঘরে, তাও তো একে-ওকে দিয়ে প্রায়ই মাঝে মাঝে আনাই। আর, আমার বুঝি কোন কষ্ট নেই? ঝিকে ঝি, ঠাকুরকে ঠাকুর। ছেলেমেয়েদের পড়াটা পর্যন্ত আমাকে ব'লে দিতে হয়। রাঁধাবাড়া, ঝাড়াপোঁছা, সংসাবের কোন কাজটায় আমার না থাকলে চলে শুনি? ফিরিস্তি নিয়ে দেখ, তোমার কাজেব চেয়ে দ্বিগুণ, চতুর্গুণ আমার কাজ। তোমার মাইনে সোয়াশ' হ'লে আমার মাইনে কম ক'বে ধবলেও হওয়া উচিত আড়াইশ'—তা জান?'

'তাই নাকি?' নীরদ এবার না হেসে পারল না। এই মাসকয়েক শহরবাসেব ফলেই অনেক বড় বড় কথা শিখে ফেলেছে অনিমা। মেয়েদের দাবী, মেয়েদের অধিকার, মেয়েদের মর্যাদা। কিন্তু যে আড়াইশ' টাকার উপযুক্ত কাজ অনিমা করে, সে টাকা তো সরকাবী মুদ্রায় চোখে দেখবার নয়। নীরদেব সোয়াশ'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে সে টাকা তো আব সংসারের আয় বাড়ায় না, স্বাচ্ছন্দ্য বাড়ায় না। নিজেব হাতে জিনিস কিনবার আনন্দ নীবদের সোয়াশ'র মধ্যেই মিটাতে হয় অনিমাকে। বাজার, রেশন, ঘরভাড়া, ছেলেমেয়ের স্কুলেব মাইনে মিটাতে হয় ওই টাকা থেকেই। তারপব ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কোন মাসে বা এক গজ ব্লাউজের কাপড়, কোন মাসে এনামেলেব ছোট ডেকচি, ফলওয়ালার কাছ থেকে আতাটা, কলাটা, খাবারওয়ালাব কাছ থেকে চানাচুব, চিনেবাদাম কিনে যে ক্রয়-সুখ উপভোগ করে অনিমা তা নীবদ বাসা করবার সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য কবেছে। তেমন কোন আপত্তি করেনি। কিন্তু তাকে না জানিয়ে দামি শাড়ি কিনে ফেলাটি স্ত্রীর ভাবি দুঃসাহস আর অনধিকারচর্চা ব'লে মনে হ'ল নীরদের কাছে। এই নিয়ে চলল কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক, এই নিয়ে উঠল অনিমাব আরো অনেক বে-হিসাবী খবচ, আরো নানাবকম অবুঝ অপরিণামদর্শিতাব কথা।

নীবদ বলল, 'তাছাড়া বাইরের লোক ডেকে ডেকে অত চা-পান দিলোবাবই বা কি দবকার?'

অনিমা বিজ্ঞের মত হাসল, 'কি দবকার, তা তুমি বুঝবে না। শহবে এলে এসব কবতেই হয়, না কবলে লোকে নিন্দা কবে। শত হলেও এটুকু লোক-লৌকিকতা, সমাজ-সামাজিকতা না কবলে কি ভদ্রতা থাকে নাকি? শহরে এলে এসব দরকাব হয়।'

শহরে আসবার ফলে আরো অনেক কিছু দরকার হয়েছে অণিমাব। পাড়াব কোন-না-কোন মেয়েকে নিয়ে বিনা প্রয়োজনে শ্যামবাজার-বাগবাজারে ট্রামে-বাসে ক'রে আত্মীয়-বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে খোঁজ-খবর নিয়ে এসেছে। ন্যায়বত্ন লেনে থাকে তার পিসতুতো বোন চারু, দেখা করা চাই তাব সঙ্গে। কাঁটাপুকুর লেনে থাকে ছেলেবেলাব সাথী মল্লিকা, তাকে একবাব না দেখে এলে মনটা কেমন কেমন করে। দুপুরে কোন কোন দিন না ঘুমিয়ে ঘবে তালাচাবি দিয়ে শহরে সফব কবতে বেরোয় অণিমা। ছেলেমেয়ে দুটিকে কোনদিন সঙ্গে নেয়, কোনদিন বা বাড়িওয়ালাব স্ত্রী সুবাসিনী মাসীমার জিম্মায় রেখে যায়। ফেবাব পথে দু-চার আনার সওদা ক'রে ফেরে।

টের পেয়ে নীরদ এক-একদিন ধমক দেয়, 'দুহাতে এত বাজে খরচ কবছ, আর কিন্তু আমি চালাতে পারব না।'

'বাজে খরচ কোথায় দেখলে?'

'বাজে খরচ ছাড়া কি, ট্রামে-বাসে মিছামিছি কেন অতগুলি ক'রে পয়সা—'

অণিমা জবাব দেয়, 'ও, ট্রাম-বাসের কথা বলছ! মাঝে মাঝে ট্রাম-বাসে না উঠলে শহরে আছি ব'লে মনেই হয় না। আর কি চমৎকারই যে লাগে দোতলা বাসের সামনের সীটগুলিতে গিয়ে বসলে! আমি আর কুন্তলা তো দোতলা বাস পেলে একতলা বাসে উঠিই না। বেশ লাগে চলন্ত

বাসের চূড়ায় ব'সে দুদিকের দোকান-পাট, মানুষ-জন দেখতে।'

নীরদ বলে, 'ও! তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, ফুটপাথ দিয়ে তখন যারা হাঁটে, ভারি অসহায় দেখায় তাদের, তাই না? যা-ই বল, নিজেরা যে গরীব, তা আর মনে থাকে না, যখন দোতলা বাসে উঠি। অবশ্য ট্রামের ফার্স্ট-ক্লাসগুলিও ভালো। ফ্যানের নীচে বসে যেতে-যেতে বেশ লাগে। সবচেয়ে মজা লাগে যখন লেডীজ সীটগুলি ছেড়ে ভারিক্কী ভারিক্কী সব পুরুষেরা উঠে দাঁড়ায়। তখন দয়া হয় তাদের জন্য। বুড়ো বুড়ো লোক দেখলে পাশে বসতেও দিই। তাই দেখে অল্পবয়সী ছেলে ছোকরারা কি রকম কাতর মুখে দাঁড়িয়ে থাকে! মায়াও হয়, মজাও লাগে। আমি তার জন্যও যাই মাঝে মাঝে।'

শহরের এই ছোটখাট সুখ-সুবিধার জন্য স্ত্রীর এই কাঙালপনা, হ্যাংলাপনা দেখে কেমন যেন লজ্জা হয় নীরদের। কিন্তু কিছু বলতেও বাধে। বড় বড় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের হদিস তো নীরদ ওকে দিতে পারেনি। স্ত্রীকে ছোট বলবার অধিকার কই তার? নীরদ মনে মনে প্রবোধ দেয় নিজেকে, বছরের পর বছর গ্রামে কাটিয়ে হঠাৎ শহরে এলে এইরকমই বোধ হয় মানুষের—বিশেষ ক'রে মেয়ে মানুষের। বয়স যতই হোক, ভিতরে ভিতরে ওদের একটা দিক বড় অপরিণত, বড় ছেলেমানুষের মত থেকে যায়। নারী-প্রকৃতির সঙ্গে প্রাকৃত জনের রুচি-বুদ্ধির যেমন মিল, তেমন মিল যেন আর কারো সঙ্গে নেই। শহরে এসেছে, একথাটি কোনও মুহূর্তেই যেন অণিমা ভুলতে পারে না, ভুলতে চায় না।

বাস-ট্রামের পর সিনেমা, মাসে গোটা তিনেক সিনেমা না দেখলে যেন পেটের ভাত হজম হয় না অণিমার। একটি নীরদকে ব'লে কয়ে, তার সঙ্গে গিয়েই দেখে। আর দুটো দেখে লুকিয়ে, ম্যাটিনি শো'তে পাড়ার অন্য দু'একটি মেয়ের সঙ্গে দল বেঁধে। তবু টের পায় নীরদ। অণিমার মুখ দেখলেই বোঝা যায়, চোখ দেখলেই বোঝা যায়, সে সিনেমা দেখে এসেছে। দিন কয়েক ধ'রে নতুন গানের গুন্‌গুনানি শোনা যায় ঘরের মধ্যে, বাথ্‌-রুমে, প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে আলোচনা সমালোচনা চলে গল্পের, অভিনয়ের। নীরদ কিছু বলবার আগে সাদর অনুরোধ জানায়, 'সত্যি, ভারি চমৎকার হয়েছে বইটা। যাও, দেখে এসো, অবশ্য দেখো কিন্তু।'

সিনেমার সব ছবিই চমৎকার। আর শহরের সব কিছুই ছবির মত সুন্দর।

নীরদ আর একবার ওয়ার্নিং দেয়, 'এমন করলে কিন্তু সত্যিই চালান শক্ত হবে। কিছুতেই থাকা যাবে না এখানে। সিনেমার টিকেট যদি অত ঘন ঘন কেনো, আমি বাধ্য হব, শিয়ালদায় গিয়ে ট্রেনের টিকেট কিনতে।'

অণিমা বলে, 'ঈস্! টিকেট কিনলেই গাড়িতে উঠে বসেছি আর কি! দরকার থাকে, তুমি যাও—আমি আর যাচ্ছি না।'

নীরদ বলে, 'কেন, যেতে ক্ষতি কি? জেঠীমা জ্যেঠামশাই তো আছেন বাড়িতে।'

অণিমা জবাব দেয়, 'তাঁরা থাকুন। কিন্তু আমি আর যাচ্ছি না। ভেবেছ, ফের আমাদের ওই বাঁশবনে ঠেলে পাঠাতে পারবে? আর আমরা যাচ্ছি না সেখানে, কিছুতেই না।'

টেবিল-ঢাকনির চারদিকে লতাপাতা আর কাঠগোলাপের নক্সা নিয়ে ফের এসে বসল অণিমা, একটা দিক কেবল হয়েছে, আর তিন দিক বাকি।

নীরদ বলল, 'টেবিল তো নেই ঘরে। টেবিল-ঢাকনি দিয়ে করবে কি?'

অণিমা হাসল, 'ঘর ছাড়া আর বুঝি কোথাও টেবিল নেই শহরে? বল তো এ ঢাকনি দিয়ে কি হবে?'

'কি হবে?'

অণিমা বলল, 'ভয়ে বলব, কি নির্ভয়ে বলব, মহারাজ?'

নীরদ বিরক্ত হয়ে বলল, 'আঃ! সব সময় ঠাট্টা ইয়ার্কি ভালো লাগে না, কি বলবে ব'লে ফেল।'

অণিমা বলল, 'এ টেবিল-ঢাকনি কিন্তু মশাইর ঘরের জন্য নয়, বাইরের। পাড়ার ছেলেদের সঞ্জীবনী-সঙ্ঘের। মানস ঠাকুরপোরা আছে ওই ক্লাবে। তাদের বার্ষিক উৎসব হবে শিগ্‌গিরই।

সেই সময এটা প্রেজেন্ট কবব।'

নীবদ নিস্পৃহ সুবে বলল, 'বেশ তো।'

অণিমা বলল, 'বেশ তো! এদিকে হিংসেয বুক ফেটে যাচ্ছে। ভয নেই গো, তোমাকেও আর একখানা দেব তৈবি ক'বে। ওতদিনে টেবিলও একখানা ঘবে আসবে, আমাদেব। টেবিল পাতার মত ঘবও হবে।'

'থাক, থাক, আমাকে দিযে দবকাব নেই। তুমি ওইখানাই আগে শেষ কব।'

অণিমা বলল, 'পুরুষ মানুষ তো! হিংসুকেব সেবা। বউযেব হাতেব জিনিস বাইবেব লোকে ব্যবহাব করুক, তা তোমবা আসলে সহ্য কবতে পাব না। তাই না?'

নীবদ বলল, 'আঃ, থাম। কি যা-তা বলছ!'

অণিমা হাসল, 'যা তা নয গো, যা-তা নয। আমবা ঠিক বুঝতে পাবি। কিন্তু বউযেব হাতেব জিনিস ঘবে থাকলেও তোমাদেব লাভ, বাইবে গেলেও তোমাদেবই লাভ। এটি বোঝ না কেন? জিনিস ভালো হ'লে বাইবেব পাঁচজন যখন প্রশংসা কববে, তখন কি আব আমাব প্রশংসা কববে? না, বলবে অমুকেব বউ, অমুক বাবুব বউ। কি বল, তাই না?'

কিন্তু টেবিল ঢাকনি শেষ কবতে গিযে দেবি হযে গেল অণিমাব। ছোট মেযে পডল অসুখে। এক মুহূর্ত মাব কাছ ছাডা থাকতে চায না মঞ্জু। আব কেবল কাছে থাকলেই হবে না, তাকে বুকে জডিযে ধ'বে শুযে থাক। কিন্তু জডিযে ধবা কি যায? মেযেব গা যাচ্ছে আগুনে পুডে।

পাশেই এক উকিল ভদ্রলোকেব বাডিতে ফোন আছে। ফোনটা ভিতবেব ঘবে। দবকাব হ'লে মেযেবাও ব্যবহাব কবতে পাবে। নীবদ সেখান থেকে এক ডাক্তাব বন্ধুকে ফোন ক'বে দিল। অনেক দিনেব পবিচিত বন্ধু। বিনা ভিজিটেই দেখতে চাইবে। হাফ-ফীটা জোব কবে দিতে হবে গছিযে। কিন্তু উকিল তো আব বন্ধু নন। নব-পবিচিত প্রতিবেশী। তিনি ফোনেব চার্জ নিলেন ছ' আনা। অপ্রসন্নমুখে নীবদ ফিবে এল ঘবে। ভাবল, ফোনটা অফিস থেকে বিনা পযসায কবলেই হ'ত।

দুপুব বেলায ডাক্তাব এসে দেখে গেছল কিনা জানবাব জন্যে অফিস থেকে নীবদ আব একবাব ফোন কবল। আব আশ্চর্য, একটু বাদে ফোন ধবল এসে অণিমা। উকিল ভদ্রলোকেব স্ত্রী ভদ্রতা কবেছেন। ফোনে কথা বলবাব জন্য ডেকে দিযেছেন অণিমাকে। শিখিযে দিযেছেন ফোনেব ব্যবহাব।

ফোনে অণিমা সুসংবাদই দিল, 'হ্যাঁ, ডাক্তাববাবু এসে দেখে গেছেন। খুকু ভালো আছে, কোন ভয নেই'

একটু যেন আডষ্ট, একটু যেন বাধো-বাধো গলা অণিমাব।

বাসায ফিবে মেযেব জ্বব কম দেখে একটু স্বস্তি বোধ কবল নীবদ। ভাবল, যাক অল্পেতেই গেছে

হেসে স্ত্রীব দিকে তাকিযে বলল, 'ফোন এই প্রথম কবলে বঝি? আমাব কথা সব বুঝতে পাবছিলে?'

'হ্যাঁ। আব আমাব কথা?'

নীবদ একটু হাসল, 'অত জোবে, অত তাডাতাডি বলছিলে কেন? একটু আস্তে বলতে হয। তাহ'লেই ভালো শোনা যায।'

মেযেব অসুখ দিন দুযেকেব মধ্যেই সাবল। কিন্তু ফোন সম্বন্ধে নীবদেব এই উপদেশ হ'ল কাল। উকিল শ্রীপদবাবুব স্ত্রী সুভাষিণীব সঙ্গে অণিমাব আগেই সামান্য আলাপ ছিল। ফোনেব জন্য সেই আলাপকে আবো ঘনিষ্ঠ ক'বে তুলল।

পাবলিসিটি কোম্পানীব অফিস। গভীব মনোযোগে বিজ্ঞাপনেব কপি তৈবি কবছে নীবদ, অপাবেটব খবব দিল, ফোনে কে ডাকছে নীবদবাবুকে। ফোন ধ'বে নীবদ বলল, 'হ্যালো! কে?'

'বলতো কে। এবাবো কি বোঝা যাচ্ছে না? খুব আস্তে বলছি তো।'

নীবদ বলল, 'হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ ফোন কবলে যে? অসুখ বিসুখ কবল নাকি

কারো ? মঞ্জু কেমন আছে ?'

'ভালো খুব ভালো, বালাই অসুখ বিসুখ করবে কেন ? ফোনে বুঝি আর সুখের কথা বলা যায় না ?'

'তা যায়। কিন্তু ছ' আনা পয়সা লাগল তো ?'

'দুত্তোর ছ' আনা। এমন ষোল আনা সুখ পাচ্ছি, ছ আনা না হয় একদিন লাগলই। এবার আমার কথা বেশ বোঝা যাচ্ছে, না ?'

'তা যাচ্ছে।' ফোন ছেড়ে দিল নীরদ।

কিন্তু ফোন অণিমাকে ছাড়ল না। দু চার দিন বাদে বাদে সামান্য অছিলা অজুহাতে সে ফোনের পর ফোন করতে লাগল। কেবল নীরদকে নয় পরিচিত, আধা-পরিচিত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন--যে যেখানে আছে, উকিল, ডাক্তার ব্যবসায়ী অফিসের কেরানী যাকে যেখানে ফোনে পাওয়া সম্ভব ফোন গাইড খুঁজে তাকে দু একবার ক'রে ফোন করতে লাগল অণিমা। জরুরী, দরকারী কোন কাজে নয় অমনি, মিছামিছি সাধারণ আলাপের জন্য। কিন্তু ছ' আনা খরচ-করা সাধারণ আলাপ ফোনের মধ্যে কি যে অসাধারণ হয়ে ওঠে, তা কি সকলে জানে ?

বাসে ট্রামে যাতায়াতের নেশাটা কমে গেল অণিমার সেই পয়সায় ফোন করে। নগরের নতুন রহস্যের সন্ধান পেয়েছে সে। ঘরে বসে আলাপ করা যায় বাইরের সঙ্গে। শহরকে দেখবার দরকার হয় না। শহর এখন অণিমার কানের ভিতর দিয়ে মরমে—টালা থেকে টালিগঞ্জ বেলেঘাটা থেকে ক্লাইভ স্ট্রীট—সব জায়গার সঙ্গে ঘরে বসে আলাপ করতে পারে অণিমা। দূর সম্পর্কের দেবর, সইয়ের বররা ফোন ধ'রে অবাক হয়ে যায়। চিনতে একটু সময় লাগে। তারপর অতিমাত্রায় মুখর হয়ে ওঠে তার অজানা কোন গৃহকোণ থেকে ফোন করছে আধো জানা কোন বান্ধবী, কোন আত্মীয়া। রোমাঞ্চের ছোঁয়াচ লাগে অফিসে ফাইল পত্রে কাজ-কর্মে ঠাসা দুপুরের অফিস হঠাৎ যেন রাত্রের ফিসফিসে ভ'রে উঠেছে

অণিমা বলে, চিনতে পারছেন ? বুঝতে পারছেন আমার কথা ?'

জবাব আসে 'অমন ক'রে বলবেন না বেশি বুঝতে ভয় হয়।

ফোনে মুখ দিয়ে খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে অণিমা। বিসভাবের ভিতর দিয়ে আর একজনের কানে সে হাসি মধু হয়ে গ'লে গ'লে পড়ে

উকিল শ্রীপদবাবু একদিন নীরদকে ডেকে বললেন ও মশাই শুনুন।'

'কি ?'

'বলতে লজ্জাও করে, আবার না বলেও পারিনে ভদ্রমহিলার কাছে তো আর রোজ রোজ চার্জটা চেয়ে নেওয়া যায় না। ফোন বাবদ আপনাদের কাছে পাঁচ টাকা পাওনা হয়েছে। আজ দেবেন ?'

নীরদ বিস্মিত হয়ে বলল পাঁচ টাকা ?

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' শ্রীপদবাবু একটু হাসলেন, 'সারা কলকাতা ভ'রে আপনাদের যে এত বন্ধু-বান্ধব, ঠাট্টা ইয়ার্কির লোক আছে, তাতো জানতুম না। ভদ্রলোকের বাড়িতে ফোনে এত হাসি ঠাট্টা কিসের মশাই ? টাকাটা কি এখনই দেবেন ?'

'হ্যাঁ, এই নিন।'

পাঁচ টাকার একখানা নোট ব্যাগ থেকে বের ক'রে দিল নীরদ। দিতে কষ্ট-ই হল। মাসের শেষ। মিছামিছি কতগুলি টাকা অপব্যয় করল অণিমা। আর কি সব বিশ্রী অপবাদ উঠেছে তার নামে। ছি ছি ছি।

বাসায় এসে স্ত্রীকে খুব ক'রে ধমকাল নীরদ, 'খবরদার ফের যদি ফোন করতে যাও শ্রীপদবাবুর বাড়িতে, তবে আমার সঙ্গে এই তোমার শেষ কথাবার্তা।'

'কেন , হয়েছে কি ?'

কি হয়েছে, স্ত্রীকে সবিস্তারে জানাল নীরদ। অণিমা শুনে মন্তব্য করল, 'ভদ্রলোক তো ভারি অভদ্র। ফোন যেন আর কারো বাড়িতে নেই, ফোন যেন আর কেউ রাখে না। দাঁড়াও, অবস্থাটা

আমাদেব আব একটু ভালো হলেই আমবাও ফোন নেব। বেডিও নয়, ফ্যান নয, সবচেযে আগে চাই ফোন। বুঝেছ ?'

কথাব ভঙ্গি দেখে বাগ ক'বে থাকতে পাবল না নীবদ। হেসে বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা, অবস্থা তো ভালো হযে নিক আগে।'

টিফিনেব পব বেলা গোটা দুইযেব সময আবাব ক্রীং-ক্রীং ক'বে উঠল নীবদের অফিসেব ফোন। আব কাউকেই নয, নীবদবাবুকেই চাইছেন কোন এক ভদ্রমহিলা। অপাবেটব মুখ টিপে হাসল।

আবাব ভদ্রমহিলা। নীবদ বিবক্ত, অপ্রসন্নমুখে গিযে ফোন ধবল, যা ভেবেছে, ঠিক তাই, অণিমাই।

স্থান-কাল ভুলে নীবদ বলল, 'ফেব তুমি গেছ ওই বাডিতে ফোন কবতে ?'

অণিমা মধুবস্ববে জবাব দিল, গেছি তো কি হযেছে ? আগে শোনোই না আমাব কথা।'

কি আবাব শুনব ? তুমি জাত-কুল কিচ্ছু বাখবে না।'

'আবে আগে শুনেই নাও। মিছামিছি বাগ কবছ কেন অত? সুভাষিণীদি কি বলছেন জানো ? আমি স্বচ্ছন্দে তাঁদেব বাডিতে এসে ফোন কবতে পাবি। বাডি তাঁব নামে উকিলবাবুব নামে নয়। আব ফেব যদি উকিলবাবু ওসব কথা বলেন, আমবা যেন কেস কবি উকিলবাবুব নামে। পিছনে লাগিযে দিই ব্যাবিস্টাব। পাঁচ টাকা এক্ষুণি ফেবত দিতে চাইছেন সুভাষিণীদি। আমি অবশ্য নিলুম না। বললুম কি জানো ? কেস চালাবাব জন্যে ও-টাকা তোমাব কাছেই জমা থাক দিদি। আমি নিলে খবচ ক'বে ফেলব। কি বল, ঠিক বলিনি ?' অণিমা একটু হেসে উঠল,—তাবপব আবাব বলল, 'সুভাষিণীদি বলছেন উকিলবাবু বাডি এলে স্বামীকে আচ্ছা ক'বে বকে দেবেন। ফোন কবলুম ব'লে তুমি কিন্তু আবাব বকো না। তাব চেযে একটু মিষ্টি কথা বল দেখি। তুমি তো জানো না, ফোনেব ভিতব দিযে মিষ্টি কথা আবো কত মিষ্টি হযে আসে।'

তাবপব মিষ্টি কথা শুনবাব জন্য উৎকর্ণ হযে বইল অণিমা। কিন্তু তাব বদলে কিবকম একটা যেন গোলমাল শুনতে পেল। তর্ক-বিতর্ক বাগাবাগি চটাচটি। ঠিক যেন বোঝা গেল না। তাবপর ঝনাৎ ক'বে ফোন বেখে দেওযাব শব্দ হ'ল।

কনেকশন কেটে দিযেছে, একথা বুঝবাব পরেও 'হ্যালো, শুনছ ? কি হল তোমাদেব ?'—ব'লে বাবকযেক ডাকল অণিমা। কিন্তু ও-পাশ থেকে আব সাডা এল না। ফেব কনেকশন নিতে অণিমাব ভয হ'ল। কি জানি, নীবদ যদি পছন্দ না কবে, সে যদি বকুনি দিযে ওঠে।

কিন্তু বকুনিবই কপাল অণিমাব। ঘণ্টাখানেক বাদেই নীবদ ফিবে এল অফিস থেকে।

অণিমা সেই টেবিলক্লথ নিযে বসে ছিল। তিন দিকের বর্ডাবে পাতাব মধ্যে কাঠগোলাপ তোলা হয়েছে, আব একটা দিক বাকি। এবাব শেষ ক'বে দিতে হবে। সঞ্জীবনী সঙ্ঘেব বার্ষিক অধিবেশনেব আব দেবি নেই। তাডা দিচ্ছে সভ্যেবা।

স্বামীকে দেখে অণিমা বলল, 'এই যে, কি ভাগ্য। এত তাডাতাডি এলে যে আজ ?'

নীবদ নীবস গম্ভীব মুখে বলল, 'হুঁ।'

'হুঁ মানে ? উদ্বিগ্ন শোনাল অণিমাব গলা, 'কি যেন গোলমালেব মত শুনলুম তোমাদেব অফিসে ? হযেছে কি ?'

'বেশি কিছু হযনি, চাকবি গেছে।' নীবদ শান্তভাবে হাসল।

'চাকবি গেছে মানে ? বলছ কি তুমি। কি সর্বনেশে কথা। চাকবি গেছে—মানে কি তাব ?'

নীরদ বলল, 'ওই একই কথা। চাকবি ছেডে দিয়ে এসেছি।'

'ছেডে দিযে এসেছ ? কেন ?'

নীরদ নিষ্ঠুব স্ববে বলল, 'তোমাব জন্য। অফিসের ম্যানেজাব যে বকম অপমান করলেন, তাতে কোন ভদ্রলোকেব ছেলে আব ওখানে চাকবি কবতে পারে না। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে না খেয়ে মরলেও না।'

'কিন্তু হয়েছে কি ? আমাব এখনো গা কাঁপছে।' বলতে বলতে গলা কাঁপল অণিমাব।

কিন্তু নীবদের কাঁপল না। কি হয়েছে, সংক্ষেপে স্ত্রীব কাছে সব খুলে বলল। অণিমা যখন

নীরদকে ফোন করছিল, তখন ম্যানেজাব এসে দাঁড়িয়েছিলেন পিছনে। অফিসেব কাজে জরুবী একটা ফোনেব দবকার ছিল তাঁব। অপাবেটবেব কাছে লাইন চেয়ে পাননি। ছুটে এসেছেন ফোনের কাছে। কে আটকে বেখেছে ফোন? খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীবদেব আলাপ শুনছিলেন তিনি। তাবপর হঠাৎ কটুকণ্ঠে ব'লে উঠেছিলেন, 'মিস্টাব মজুমদাব, স্ত্রীব সঙ্গে বোজ বোজ বসালাপ কববাব জাযগা এটা নয। তাব জন্য আলাদা স্থান-কাল আছে।'

সেই কথাব উত্তব-প্রত্যুত্তব দিতে দিতে নীবদকে শেষ জবাব দিতে হযেছে চাকবি ছেড়ে। ম্যানেজাব আব কেউ নন, অফিসেব মালিকদেব একজন।

সব শুনে অণিমা বলল, 'তবু এক-কথায চাকবি ছেড়ে দিযে এলে তুমি! একবাব ভাবলে না, বাত পোহালে কি উপায হবে আমাদেব? যা দিনকাল আজকাল—কি উপায হবে আমাদেব বল দেখি?

'এতক্ষণ শান্তভাবে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে সব বর্ণনা কবছিল নীবদ, যেন সত্যই কিছু হযনি, যেন আব একজনেব কাহিনীব বিববণ দিচ্ছে। কিন্তু স্ত্রীব দুঃসহ খেদোক্তি তাকে আব শান্ত থাকতে দিল না। ছোট্ট জলচৌকিব ওপবে এমব্রযডাবীব কাজটা পড়ে ছিল অণিমাব। হঠাৎ তাব ওপব চোখ পড়ল নীবদেব, চোখ জ্বলে উঠল। উত্তেজিত স্বরে নীবদ বলল 'উপায? উপায তোমাব ওই কাঠগোলাপ। উপায তোমাব ওই কাঠগোলাপবা।

অণিমা বলল, 'ছিঃ, ওসব কি বলছ তুমি!'

'ঠিকই বলছি।' ব'লে হঠাৎ জলচৌকিব ওপব থেকে টেবিলক্লথটা তুলে নিল নীবদ তাবপব হাতেব মুঠোয কুচকে জড়ো ক'বে জানলা দিযে সেটাকে ছুড়ে ফেলে দিল বাইবে। জানলাব নিচে কাঁচা নর্দমা। জিনিসটা তাব মধ্যে গিযে পড়ল স্বামীব দিকে তাকিযে থ হযে দাঁড়িযে বইল অণিমা।

কিন্তু কতক্ষণ আব দাঁড়িযে থাকা যায। বেকাব স্বামীব স্ত্রীকে কতক্ষণ আব দাঁড়িযে থাকতে দেয সংসাব। দিন পনেব বাদে নীবদ একদিন বলল নতুন কিছু শিগগিব জুটবে ব'লে তো মনে হয না, চল তোমাদেব বেখে আসি। পবে সুবিধা মত আবাব আনব।

অণিমা ঘাড় নাড়ল, 'না আমি যাব না

নীবদ বলল, 'তাহলে মব না খেযে

ফোন গেছে, ট্রাম বাস গেছে সিনেমা গেছে পাড়াপড়শী সবুবপো ঠাকুবঝিদেব চা জলখাবাব খাওযানোব পবও শেষ হযে গেছে কেউ তাবা আব এদিকে ভেড়ে না সবাই বুঝে নিযেছে ব্যাপাবটা দু'জনেব মধ্যে দিনেব মধ্যে দু তিনবাব ক বে যে ঝগড়া লাগছে আজকাল তা ঠিক দাম্পত্য কলহ নয দুটি অর্ধভুক্ত বুভুক্ষু নবনাবীব বিসম্বাদ- পবস্পবকে আক্রমণ প্রতি আক্রমণ। ব্যাপাবটা বুঝতে কাবো আব বাকি নেই।

বুঝেছে নীবদেব ছেলে নান্টুও। বছব ছযেক বযেস নান্টুব সামনেব কর্পোবেশন স্কুলে শ্লেট পেনসিল নিযে সকালে পড়তে যায আগে আগে পযসা চেযে নিযে যেত নীবদেব কাছ থেকে, বলত, 'দু পযসায হবে না বাবা এক আনা দাও

সেদিন তাকে একটা আনি দিতে যাচ্ছিল নীবদ নান্টু ঘাড় নাড়ল, 'না বাবা, থাক।

'কেন, থাকবে কেনবে?

নান্টু কানেব কাছে মুখ এগিযে আনল নীবদেব, ফিস ফিস ক'বে বলল, তোমাব তো চাকবি-বাকবি নেই আজকাল পযসা দেবে কোত্থেকে? পাবে কোথায? আমি কিন্তু আব কাউকে বলিনি বাবা, মা বলতে নিষেধ ক'বে দিযেছে। তুমি ভেবো না; আমি কাউকে বলব না বাবা।'

ছেলেব পিঠ চাপড়ে দিযে নীবদ বলল, 'তুমি খুব বুদ্ধিমান, তুমি খুব বাহাদুব ছেলে। এবাব চলে যাও স্কুলে। চাবটে পযসা নিযেই যাও, কিচ্ছু ভাবনা নেই, আমি বলব না তোমাব মাকে।'

নান্টু খুশি হযে হাত পাতল, 'তবে দাও।'

প্রথম মাস গেল, কিন্তু দ্বিতীয মাস আব যায না। নীবদ অবশ্য পুবোপুবি বেকাব নেই, একটি পার্ট-টাইম চাকবি জুটিয়েছে। টাকা ষাটেক দেবে। কিন্তু তাতে হবে কি এ বাজাবে?

দিন কয়েক ঘোরাঘুরির পর নীরদ আবার প্রস্তাব করল, 'কিছুদিনের জন্য ঘুরে এলেও তো পারতে।'

অণিমা ঘাড় নাড়ল, 'না, যাইতো অন্য সময় যাব। এই দশায় এই বেশে যাব না, কলকাতা ছাড়ব না আমি।'

নীরদ রাগে ঠোঁট কামড়াল। বড় বেয়াড়া ঘাড় অণিমার। এক এক সময় মটকে দিতে ইচ্ছে করে।

কলকাতা ছাড়বে না অণিমা। বিলাস ব্যসন, সখ-আহ্লাদ--সব গেছে, তবু আছে শহর, তবু আছে কলকাতা। কলকাতা একাই তো সব।

একদিন নীরদ কোত্থেকে ঘুরে এসে বলল, 'বেলেঘাটার বাজারে দেখলাম,—ভুবন চন্দ, ফটিক চন্দ দুই ভাই কুমড়োর ফালি কেটে নিয়ে বসেছে। আমাকে দেখে প্রথমে ভাবি লজ্জিত হ'ল। এর আগে সেদিন শিয়ালদর মোড়ে দেখে বলেছিল ফলের ব্যবসা করে। ফল যে এত বড় বড় ফল, তা তখন বুঝিনি, প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেও ভুবনরা কিন্তু পরে বলল, বেশ দু' পয়সা থাকে।'

দেশে থাকতে ভুবন আর ফটিক রেজেস্ট্রী অফিসের সামনে দলিল লেখার কাজ করত। অণিমা স্বামীর কথা শুনে চুপ ক'রে রইল, কোন কথা বলল না।

নীরদ বলল, 'দেখব নাকি চেষ্টা ক'রে। ও কাজের মধ্যে তো কোন জটিলতা নেই। বেশি মূলধনও লাগে না।'

অণিমা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'ভয় নেই আমি এবার সত্যিই চলে যাব। বাজারে কুমড়োর ফালি নিয়ে বসতে পারো তুমি? দু' মাস বেকার থেকেই অতখানি মনের বল হয়েছে তোমার? আমাকে আর ঘাঁটিও না।'

নীরদ শহরতলী থেকে শহরে যায়, দু' একটি অফিসে চেষ্টা চরিত্র করে, বন্ধুবান্ধবের অফিসে গিয়ে দু' এক ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে কাটায়। তারপর ফিরে এসে স্ত্রীর কাছে জীবিকার জন্য এই সব অদ্ভুত প্রস্তাব করে।

চরকুসুমপুরের ভদ্রেরা গামছার দোকান দিয়েছে বউবাজারের মোড়ে। মন্দ থাকে না মাসে। গুটি চার পাঁচ ছেলেমেয়ে নিয়ে আছে তো এখনো টিকে শেখরকান্দীর নবীন নন্দী ঘড়ি, ফাউন্টেন পেন মেরামতের কাজ শিখেছে, বাঁধা দোকান নেই কোন জায়গায়। অফিসে অফিসে ঘুরে কাজ জুটিয়ে নেয়। বলল তো বেশ দু' পয়সা থাকে। নবীন এক সময় নীরদের সঙ্গে পড়ত। এর আগে মাস্টারী করছিল দেশে নবীন বলেছে পেন সারানো শিখতে বেশি বিদ্যাও লাগে না, সময়ও লাগে না। নীরদ যদি চায় নবীন তাকে আটঘাট সব ব'লে দিতে পারে

অণিমা গম্ভীর মুখে বলল, বেশ তো, পার তো আপত্তি কি?' তারপর হঠাৎ জ্বলে ওঠে, 'কেন, শহর থেকে কি সব অফিস আদালত উঠে গেছে? লেখাপড়ার কাজের জন্য কি একজন লোকেরও আর দরকার নেই?'

খরচ যতদূর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া যায়, কমানো হয়েছে। কয়লা ধরাবার জন্য আগে কাঠ কিনত অণিমা, এখন নিজের হাতে ঘুঁটে দেয়। আগে লণ্ড্রিতে সপ্তাহে সপ্তাহে কাপড় যেত, অণিমার শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ সব আর্জেন্ট। এখন অন্য রকম ব্যবস্থা হয়েছে দু' একটা জামা কাপড় মাত্র পাঠানো হয় লণ্ড্রিতে। তাও অর্ডিনারী চার্জে। বাকি সব নিজের হাতে কেচে নেয় অণিমা। জানলার ধার দিয়ে ফেরিওয়ালারা এখনো যাতায়াত করে, মাঝে মাঝে ডাকে, 'মা লক্ষ্মী, নেবেন না কিছু? ভালো ছিট কাপড় আছে ব্লাউজের জন্য। এমন সস্তা আর কারো কাছে পাবেন না।' অণিমা কোন কোন দিন শুনতে না পাওয়ার ভান করে, কিন্তু যেদিন চোখে চোখ পড়ে, এগিয়ে যায় জানলার কাছে, মধুর হেসে বলে, 'না বাপু, আজ থাক, আমার সব আছে। যখন দরকার হবে তোমার কাছ থেকেই নেব।'

হকারকে কাগজ বন্ধ ক'রে দিতে বলেছে নীরদ। বাইরের চায়ের দোকান থেকে কাগজ দেখে আসে। আগে দেখে কর্মখালির বিজ্ঞাপন। কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথ থেকে বেছে বেছে পুরনো বই কেনার নেশা ছিল সখের মধ্যে। আপাততঃ ছাড়তে হয়েছে। দু' টাকার বাজার নেমেছে এক টাকায়, চৌদ্দ আনায়। তার কমে আর পারা যায় না। কিন্তু আয় যদি না বাড়ে, শুধু ব্যয় কমালে হবে কি?

বড রাস্তার মোড়ে বসেছে রিলিফ-সেন্টার। পূর্ববঙ্গ থেকে শরণাগতদেব সাহায্যকেন্দ্র। রেশনকার্ড পিছু সপ্তাহেব যোগ্য চাল, ময়দা, আটা দেওয়া হয় বিনা পয়সায়। সকাল থেকে দুপুব, বিকেল থেকে রাত আটটা 'কিউ' দিয়ে লোক দাঁড়ায়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েবা দাঁড়াতে দাঁড়াতে শেষ দিকে থলে পেতে বসে। মেয়েছেলেরা একটু দূবে কার্ড হাতে ক'বে দাঁড়িয়েই থাকে। কাবো মুখ নিচু, কাবো মুখ ঘোমটায় ঢাকা। দেখা যায় কেবল হাত। শাঁখা-পবা হাতে নতুন সাদা সাদা কার্ডগুলি মন্দ মানায় না। দু'চাবজনকে চেনা-চেনা মনে হয় নীবদেব। কিন্তু কেউ চিনতে চায় না, তাবাও না, নীবদও না। যাতায়াতেব পথে আজকাল যেন এই দীর্ঘ শ্রেণীকে বেশি ক'বে চোখে পড়ে নীবদেব। চা খেতে খেতে একেক দিন স্ত্রীব কাছে তোলে এদেব প্রসঙ্গ।

অণিমা বলে, 'ও সব ছাড়া কি তোমাব মুখে কথা নেই? দয়া ক'বে থাম, আমাব গা কাঁপে।'

একেক দিন বলে, 'আজকাল শহবেব আব কোন কিছু বুঝি তোমাব চোখে পড়ে না? এত গাড়ি বাড়ি, সিনেমা, থিয়েটাব—'

কিন্তু শহবে এবাও আছে, এবাও এসেছে। একথাটা মুখে উচ্চাবণ না কবলেও দুজনেই মনে মনে ভাবে।

পাশেব বাড়িতে কলেজে পড়া মেয়ে আছে একটি,—কেতকী গুপ্ত। তাব সঙ্গে ভাব হয়েছিল অণিমাব। একদিন দেখা গেল, অণিমা সেজেগুজে তাব সঙ্গে বেরুচ্ছে। বাক্স থেকে বেবিয়েছে দামী শাড়ি, ব্লাউজ, হাই হিলওয়ালা জুতোয় ফেব কালি পড়েছে। মুখে পড়েছে পাউডাবেব পাফ। নীবদ জিজ্ঞাসা কবল, 'ব্যাপাব কি? যাচ্ছ কোথায়?

অণিমা মুখ মুচকে একটু হাসল, 'সিনেমায়, এবাব দেখতে নয় গো, পার্ট কবতে, দেখ তো হিবোইনেব ভূমিকায় মানাবে না কি?

কিন্তু ফিবে যখন এল তখন সেই হাসিখুশি ভাব আব নেই অণিমাব। ভাবি ম্লান, ভাবি শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে মুখ

সিনেমায় নয়, একটি ছোট স্কুলে গানেব মাস্টাবীব ইন্টাবভিউব জন্য গিয়েছিল অণিমা। কেতকীব জানাশোনা স্কুল তবু হ'ল না, কেবল গলা থাকলেই তো হবে না, ছাত্রীদেব শেখাতে হ'লে গ্রামাব জানা চাই গানেব

তবু আবো একদিন বেরুল অণিমা। সাজসজ্জাব ঘটাটা কম হ'ল না। কিন্তু আসবাব সময় আগেব দিনেব মতই লজ্জায় মুখ নিচু ক'বে ফিবে এল অণিমা। আজও হ'ল না। শ্যামবাজাবে কোন এক স্কুলে সেলাইব মাস্টাব চেয়েছিল কিন্তু ঘবেব কাজ চলনসই বকম মোটামুটি জানলেও সব জিনিস শেখাবাব মত বিদ্যা সেলাইতেও নেই অণিমাব। সেক্রেটাবীব পছন্দ হয়নি।

লেখাপড়াব মাস্টাবী তো হবে না। কাবণ লেখাপড়া অণিমা যা শিখেছে তা নাটক-নভেল প'ড়ে, স্কুল-কলেজে প'ড়ে নয়।

নীবদ মাঝে মাঝে ধমক দেয় 'কবো তোমাব যা খুশি যেমন পবেব কথায় বাববাব নাচ, তেমনি বোঝ মজা অত সস্তা নয়, অত সহজ নয়, এব নাম শহব'

অণিমা একদিন বলল, আচ্ছা নার্সগিবিতে তোমাব আপত্তি আছে?'

নীবদ বলল, 'কিছুমাত্র না পাবো তো ক্ষতি কি? দেখ না চেষ্টা কবে।'

অণিমা এক আধটু চেষ্টা যে না ক'বে দেখল তা নয়। বোগ ব্যাধিতে আত্মীয়-স্বজনেব সেবা শুশ্রূষা ক'বে দেশে থাকতে সে সুনাম কিনেছিল। কিন্তু সে সুনাম এখানে যথেষ্ট নয়। নার্স হতে হ'লে আলাদা শিক্ষা চাই। চাই শিক্ষকেব সার্টিফিকেট, কিন্তু সেই সার্টিফিকেট সংগ্রহেব অর্থ কোথায়, সময়ই বা কই অণিমাব?

আবো কাটল কিছুদিন একদিন এমনি চাকবিব চেষ্টা থেকে ফিববাব পথে বাসে দুই বুড়ীব সঙ্গে আলাপ হ'ল অণিমাব। ঠিক বুড়ী নয়, আধা বয়সী। থান কাপড পবনে। মাথায় পুরুষেব মত ছোট ক'বে ছাঁটা চুল, বেশ শক্তপোক্ত কাঠখোট্টা ধবনেব চেহাবা। তবু অণিমাব কাছে তাবা বুড়ী ছাড়া কি। কিন্তু বুড়ী হ'লেও অনেক হাসি-খুশী তাদেব মুখ। বেশ শ্রী-ছাঁদ মুখেব। হাসিতে কোন মুখ না সুন্দব দেখায়? এগিয়ে এসে আলাপ কবল অণিমা। তাদেবও বাড়িও মাদাবীপুব অঞ্চলে ধূলগ্রামে,

এখন বাসা করেছে বিশ্বাস নাসরী লেনে। দুই বোন মানদা, যশোদা। ব্রাহ্মণেরই মেয়ে। বোন-পো আছে সঙ্গে। দুই বোনেরই বোন-পো। যে বোনের ছেলে, সে বোন নেই, বোন-পো কোন কাজকর্ম করে না।

'কি ক'রে চলে ?' অণিমা জিজ্ঞাসা করেছিল।

দু'জনেরই মধ্যে যে বড়, সে পাশে গাঁট-বাঁধা এক গাদা খবরের কাগজ দেখিয়ে দিল, পুরনো ইংরেজী কাগজ। ভাঁজ করা। নারকেলের দড়ি-বাঁধা গাঁট। সেই বাঁধনের ফাঁকে ফাঁকে লণ্ডনের ছবি।

অণিমা জিজ্ঞেস করেছিল, 'এ সব কি ?'

যশোদা জবাব দিয়েছিল, 'এসব কি ? এস না একদিন বেড়াতে আমাদের বাসায়, সব বলব। এক দেশ থেকেই তো এসেছি। আবার এসে পড়েছিও এক জায়গায়। এস একদিন।'

অণিমা গেল এবং আজ আর ব্যর্থতায় মুখ ম্লান ক'রে ফিরে এল না।

বাসে ক'রে কাগজের মোট বয়ে আনতে হয় না। বাড়িতে লোক এসে দিয়ে যায় কাগজের গাঁট। নেওয়ার সময়ও সে-ই নেয়, টাকা-পয়সার লেন-দেনও তার সঙ্গেই চলে। নাম শ্রীবিলাস। যশোদা-মানদা তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল অণিমার। বলল, 'ভয় কি, আমরা আছি। শিক্ষিত মেয়ে, তোমার শিখতে ক'দিন লাগবে ? হালচাল, কায়দা-কানুন জানতে কতক্ষণ লাগবে তোমার ?'

যশোদা-মানদা এসে পানের বাটা নিয়ে বসল অণিমার ঘরে। জামা-কাপড় পরে বেরুবার আগে নীরদ তাদের দিকে একবার ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে তাকাল। তারপর অণিমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বলল, 'এরা আবার জুটল কোত্থেকে ?'

অণিমা বলল, 'দেশের লোক, পিসী হয় সম্পর্কে।'

নীরদ বলল, 'পিস-শাশুড়ীরা এখানে এবেলা আহারাদি ক'রে যাবেন না কি ?'

অণিমা হেসে ঘাড় নাড়ল, 'না, সে ভয় করো না। তার আগে জামাইকে তাঁরা নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াবেন।'

দিন কয়েক কিছু লক্ষ্য করল না নীরদ। তারপর তার মনে হল গোপনে গোপনে কি যেন অণিমা করে। নীরদের কাছে কিছু ভাঙে না, কিছু জিজ্ঞেস করলে এড়িয়ে যায়। আড়াল ক'রে রাখতে চায় সব। ফেরিওয়ালার কাছ থেকে যখন জিনিসপত্র কিনত, তখনো আড়াল রাখত অণিমা, অনেক কথা গোপন ক'রে যেত। এখনো যদি তাই করতে চায়, করুক। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করবার মত সময় আর সামর্থ্য নেই নীরদের।

দু' তিন দিন বাদে তবু একদিন নীরদ জিজ্ঞাসা করল, 'হচ্ছে কি, শুনি ?'

অণিমা হাসল, 'কি আবার হবে ? টেবিলক্লথে সেই কাঠগোলাপ তুলছি।'

এমব্রয়ডারীর কাজটা স্বামীকে এবারও দেখাল অণিমা। লংক্লথের নতুন কাপড়ে নতুন ধরনের কাজ। এক দিক হয়েছে, তিন দিক বাকি।

নীরদ বলল, 'আবার শুরু করেছ ! ক্লাবের সেই বার্ষিক অধিবেশন এখনো শেষ হয়নি ?'

অণিমা বলল, 'হয়েছে। এবার হবে বিশেষ অধিবেশন।'

নীরদ বলল, 'বেশ।'

হাঁটাহাঁটি, ঘোরাঘুরির ফলে নীরদের খুব ঘুম হয় রাত্রে। বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজে আসে। চোখ যখন খোলে, তখন রোদ উঠে যায়। চায়ের কাপের টুংটাং আওয়াজ শোনা যায় দাওয়ায়।

কিন্তু সেদিন কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখে শেষ রাত্রেই ঘুম ভেঙে গেল নীরদের। বেলে-বেলে জ্যোৎস্না এসেছে ঘরে। সেই জ্যোৎস্নায় দেখা গেল বিছানায় ছেলেমেয়েরা আছে, কিন্তু অণিমা নেই। বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল নীরদের। ব্যাপার কি, অণিমা গেল কোথায় ! স্বপ্নে দেখেছিল একটি সুপুরুষ যুবকের সঙ্গে অণিমা জানলায় দাঁড়িয়ে হেসে হেসে কথা বলছে।

ঘরের মধ্যে আবছা আবছা অন্ধকার। তক্তপোশ থেকে মেঝেয় নামল নীরদ। নিবু নিবু হ্যারিকেন জ্বলছে ঘরের মধ্যে। মেঝেয় মাদুর বিছানো। একরাশ খবরের কাগজ, কাঁচি, আঠার বাটি,

আর মাঝারি ধরনের একটি ঝাঁকায় কি সব সাজানো। তার পাশে মাথার তলায় হাত দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে অণিমা। ফের সন্তান হবে। ঘুমটি ইদানীং ওর একটু বেশিই হয়েছে।

হ্যারিকেনের মৃদু আলো পড়েছে মুখের আধখানায়। আলোছায়াঘেরা অণিমার মুখ নীরদ অনেকবার অনেকরকম ভাবে দেখেছে। এ সম্বন্ধে আর কোন কৌতূহল নেই। মুখের চেয়ে ঝাঁকাটাই বেশি ঔৎসুক্য জাগাল নীরদের মনে। কি আছে ঝাঁকায়? ভালো ক'রে দেখবার জন্য ঝাঁকার সামনে নীরদ মুখ বাড়াল। আর কিছু নয়, ঠোঙা! ঝাঁকার মধ্যে থরে থরে সাজানো ঠোঙার রাশ। কোন কোন ঠোঙার সবটাই আগাগোড়া ছবির কাগজে তৈরি। এক-রঙা নয়, নানা-রঙা।

চেয়ে থাকতে থাকতে নীরদের মনে হ'ল ঠোঙাগুলি যেমন-তেমন-ভাবে ঝাঁকার মধ্যে ঠেসে দেওয়া হয়নি। বেশ একটা ফুলের নক্সায় সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ফুলটি অবশ্য শেষ হয়নি। কেবল শুরু হয়েছিল। কি ফুল কে জানে। নীরদ তো সব ফুল চেনে না। হয়তো কাঠগোলাপই হবে।

ভাদ্র ১৩৫৭

চেক

চা খেতে খেতে পবিতোষবাবু বললেন, 'ইয়ে, কিছু মনে করবেন না, আজ কি হবে? ভারী মুশকিলে পড়ে গেছি।'

একটু বিরক্তও হলাম, লজ্জিতও হলাম। পবিতোষবাবু গোটা পঁচিশেক টাকা পান আমার কাছে। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার তাগিদ দিলেন। পকেট হাতড়ে দেখলাম খুচরো কয়েক আনার পয়সা ছাড়া কিছু নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে চেক বইটা হাতে ঠেকল। নামমাত্র একটা সেভিংস এ্যাকাউন্ট আছে ব্যাঙ্কে, চেক কেটে ইন্সিওরেন্স প্রিমিয়াম দিতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি একদিনের সিম্প্যাথেটিক স্ট্রাইকে ব্যাঙ্ক বন্ধ।

বললুম, 'নগদ ত' নেই পবিতোষবাবু। বেয়ারার চেকে দিচ্ছি। কেমন?'

পবিতোষবাবু ঘাড় নাড়লেন। আমি চেক লিখতে লাগলুম। হঠাৎ পবিতোষবাবু মুখ মুচকে হাসলেন।

একটু ক্ষুণ্ণ হলুম। বললুম, 'হাসছেন যে! ভাববেন না। সোমবারই ব্যাঙ্ক খুলবে। সেদিন ক্যাশ করতে পাববেন চেকটা।'

পরিতোষবাবু অপ্রতিভ হয়ে বললেন, 'না, না, না, আমি সেজন্য হাসিনি। আপনি তাই ভাবছেন বুঝি! তা নয়।'

'তবে?'

'বছর কয়েক আগেকার একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছিল। সেও এই চেক নিয়েই। আর আশ্চর্য, সে ঘটনা এখানেই ঘটেছিল। মাঝে মাঝে স্থান কালের ভারি নাটকীয় মিল ঘটে জীবনে।'

চারদিকে ভালো করে তাকালুম। বউবাজার ফরডাইস লেনের একটা সস্তা চায়ের দোকানে কাঠের পার্টিসন দেওয়া ছোট্ট একটু খোপ। টেবিলের দু'দিকে দু'খানি নড়বড়ে চেয়ার। চা খেতে খেতে ছারপোকার কামড় খাচ্ছিলাম মাঝে মাঝে। তবু লক্ষ্য করেছি এই জায়গাটার উপরে বেশ একটু পক্ষপাতিত্ব আছে পরিতোষবাবুর। বউবাজারের এদিকটায় যখনই ওঁর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়, চা খাওয়ার জন্য এই দোকানটায় টেনে নিয়ে আসেন। বলেন, 'বেশ চা করে এরা।'

চাযেব দাম যখন পবিতোষবাবু দেন, তখন আমি তাঁব কথায সম্মতি জানাই, যখন আমি দিই তখন ঠিক সম্মতি দিই না।

তবু পবিতোষবাবুব কথায বেশ খানিকটা কৌতূহল বোধ কবলাম, বললাম, 'বলেন কি ' এই বেষ্টুবেণ্টেব ঘটনা। বোমাণ্টিক কাহিনী-টাহিনী নাকি ।'

চেকটা শেষ কবে পবিতোষবাবুব হাতে তুলে দিলাম। চেকটা সঙ্গে সঙ্গে পকেটে না বেখে টেবিলেব ওপব বেখে দিলেন পবিতোষবাবু। দেশলাইটা চাপা দিলেন তাব ওপব।

আমাব কথাব জবাবে বললেন, 'না মশাই বীতিমতন বিয়্যালিস্টিক। অবশ্য শুরু হযেছিল বোমাণ্টিক ধবনেই।'

কাহিনী শুরু কবলেন পবিতোষবাবু, আমি উৎকর্ণ হযে বইলাম। মনে মনে কি যেন একটু গুছিযে নিলেন পবিতোষবাবু, তাবপব বললেন, 'গোড়া থেকেই বলি। এই গল্প আমাব বন্ধু সুবিমলেব মুখ থেকে শোনা। এই দেখুন, নামটা বলে ফেললুম। এসব ক্ষেত্রে নামধাম গোপন বাখাই ভালো। যাক গে। আমাব সেই বন্ধুকে তো আপনি চেনেন না। যদি না বলে দিতুম নামটা ছদ্মনাম বলেই আপনি ভেবে নিতে পাবতেন।

সুবিমল কাজ কবত একটা সদাগবী অফিসে, ক্লাইভ বোযে অফিস। বেশ নামজাদা কোম্পানী ইন্সিওবেন্স, ব্যাঙ্ক, কটন মিল, চা বাগান, এক্সপোর্ট-ইম্পোর্ট সব নিযে আট দশ বকমেব ব্যবসা আছে তাদেব। সুবিমল কাজ কবত ইন্সিওবেন্স বিভাগে। সাধাবণ অফিস এ্যাসিস্ট্যান্ট হযে ঢুকেছিল। তাবপব এ্যাকাউন্ট্যাণ্ট অফিস ইনচার্জ হযেছিল বছব খানেকেব মধ্যে। কাজেকর্মে নিষ্ঠা ছিল, দেখতে শুনতেও চেহাবাটা মন্দ ছিল না সুবিমলেব, বেশ ফর্সা, লম্বা দোহাবা চেহাবা। স্যুট পবলে বেশ মানাত। যদিও স্যুটটা পছন্দসই ছিল্ল না সুবিমলেব। নিতান্তই চার্কবিব খাতিবে পবতে হত। কিন্তু দেখলে তা মনে হত না। এমন টিপ টপ থাকত সুবিমল যে লোকে ভাবত সংসাবে স্যুট ছাড়া আর কিছু সে পবতে চায না, আব কিছু তাকে মানাযও না যাহোক কাজেকর্মে স্বভাবে ব্যবহাবে কর্তৃপক্ষেব বেশ সুনজবেই ছিল সুবিমল বোস। অথচ সহকর্মী এবং অধঃস্তনদেব সঙ্গে তাব খাতিবও কম ছিল না। প্রত্যেকেব সঙ্গেই বন্ধুভাবে মিশত অভাব-অভিযোগেব খোঁজ খবব নিত, নিজেকে বিশেষ অসুবিধায না ফেলে সহকর্মীদেব যদি কোন সুবিধা-সুযোগ কবে দেওযা যায তাতে সে সহজে পিছপা হত না।'

পবিতোষবাবু আমাব মুখেব দিকে তাকিযে একটু হাসলেন,— 'কেমন দেখছেন? নাযক কি খুব বোমাণ্টিক হচ্ছে না বিষ্যাল?'

হেসে বললুম, 'এগিযে যান, নাযিকাব সঙ্গে তাব আলাপ ব্যবহাবেব ধবনটা আগে দেখি তাবপবে জবাব দেব আপনাব কথাব।'

পবিতোষবাবু বললেন, 'আচ্ছা। হ্যাঁ সেই স্ত্রীভূমিকাবর্জিত অফিসে নাযিকাও একজন এল। অফিসসুদ্ধ লোক একদিন হঠাৎ বিস্মিত হযে দেখল উত্তব-পূর্ব কোণেব যে চেযাবটায নকুলবাবু সাবাদিন বসে খটখট শব্দে টাইপ কবতেন, সেখানে এসে বসেছে কুড়ি-একুশ বছবেব ছিপ-ছিপে চেহাবাব একটি মেযে। বর্ণ শ্যাম হলেও চোখ-মুখেব ছাঁদটুকু ভাবী সুন্দব, ভাবী মিষ্টি। দেহেব গঠনটুকুও বেশ সুঠাম, সুসম্বদ্ধ। দেখে মনে হয বঙ শ্যামলা হযে ভালোই হযেছে। অন্য কোন বঙ বুঝি এ মেযেব গাযে মানাত না। বুঝতেই পাবেন সমস্ত অফিসটা মুহূর্তেব মধ্যে চঞ্চল, চক্ষুময হযে উঠল। চক্ষু ঠিক চঞ্চল নয, হৃদয চঞ্চল, চক্ষুস্থিব। ক্যাসেব বুড়ো বিষ্ণুবাবু থেকে শুরু কবে ছোকবা বেযাবাগুলি পর্যন্ত সেই ঈশান কোণেব দিকে বাব বাব ঘাড় ফিবিযে তাকাতে লাগল। কিন্তু ঈশানী কোন দিকে চোখ তুলল না। সে যে সেই নত মস্তকে আনত চোখে, আব একটু যেন অনভ্যস্ত কম্পিত হাতে টাইপ বাইটাবেব ঢাকনি খুলে বসেছিল, তাব আব কোন সাড়াশব্দ পাওযা গেল না। এমন কি শব্দও নয। কেননা তখনো তাকে কোন কাজ দেওযা হযনি।

কেযাবটেকাব ভুবনবাবু প্রবীণ বযস্ক লোক। বযসেব সুযোগটা তিনিই প্রথম গ্রহণ কবলেন। নতুন টাইপিস্টেব কাছে গিযে জিজ্ঞেস কবলেন, কোন স্টেশনাবী জিনিসপত্রেব দবকাব আছে কিনা। পেপাব, কার্বন, পিন, ক্লিপ যা চাই তাই দিতে পাবেন ভুবনবাবু।

মেয়েটি তেমনি মুখ নিচু কবেই জবাব দিল, 'না সবই ত' পেয়েছি।' ভুবনবাবু ফিবে এলেন। খুব যে অখুশি দেখালো তাঁকে তা নয়। 'সবই ত' পেয়েছি।' কিন্তু কাব কাছে থেকে পেয়েছ? ভুবনবাবুব কাছ থেকেই ত'। তিনিই ত' নিজেব রুচি পছন্দমত টাইপিস্টেব টেবিল সাজাবাব নির্দেশ দিয়েছেন বেযাবাকে। আব প্রথম আলাপ ত' তাঁব সঙ্গেই হল। সে আলাপ মৃদু হলেও মিষ্টি, সংক্ষিপ্ত হলেও সদর্থক, সদ্ভাব-বাচক—'সব পেয়েছি।' ভুবনবাবুব পব ডেসপ্যাচেব বিনয়, প্রোপোজ্যালেব চিন্ময বাবকযেক ঘোবাঘুবি কবল, কিন্তু বিশেষ সুবিধা কবতে পাবল না। অথচ চারুদর্শন বলে দু'জনেবই খ্যাতি আছে অফিসে।

সুবিমল নিজেও যে একেবাবে চোখ বুজে ছিল তা নয়। কিন্তু অতটা অধীব, সহকর্মীদেব মত অতখানি অসহিষ্ণু হযনি। কলেজে একদল সহপাঠিনীব সঙ্গে পড়েছে, বিভিন্ন ছোট ছোট উপদলেব সঙ্গে মিশেছে। যুদ্ধেব সময ডি জি এম পি অফিসে পাশাপাশি টেবিলে কাজ কবেছে তাদেবই কাবো কাবো সঙ্গে। সাহিত্য, বাজনীতি নিয়ে আলাপ আলোচনাও কবেছে। মাঝে মাঝে সে সব আলোচনা যে সাহিত্য বাজনীতিব উচ্চ বিতর্ক থেকে মৃদুস্ববা হয়ে পড়েনি তাও নয। তাই লেডী টাইপিস্টেব আবির্ভাবে ঘাবড়াবাব কোন কাবণ ছিল না এক আধবাব তাকিয়েই সে নিজেব কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

কিন্তু দেখা গেল, মেয়েটি বড় বেশি বকম ঘাবড়ে গেছে কেমন যেন একটু করুণা হল সুবিমলেব। দিল কিছু টাইপেব কাজ পাঠিয়ে। কাজ ছাড়া আব মুক্তি কোথায অফিসে এতগুলি চোখেব সামনে চুপচাপ আড়ষ্ট আব দ্রষ্টব্য হয়ে বসে থাকাব চাইতে কাজেব মধ্যেই সুস্থ থাকবে মেয়েটি, স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে হলও তাই। বেযাবাব হাত থেকে কাগজগুলি নিতে নিতে মেয়েটি পলকেব জন্য [illegible] কৃতজ্ঞ চোখে একবাব তাকাল সুবিমলেব দিকে। তাবপব চোখাচোখি হতেই তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিলে সেই সকৃতজ্ঞ দৃষ্টি বহুদিন ভুলতে পাবেনি সুবিমল।

কাটল দিন তিনেক কিন্তু মেয়েটিব আড়ষ্ট মুখচোবা ভাব যেন কিছুতেই কাটতে চায না। টিফিন রুমে অফিসেব লাগা চাযেব দোকানে বিরূপ আলোচনা শোনা যেতে লাগল। এত 'নববধূ নববধূ ভাব নিয়ে অফিসে না এসে বাসবঘবে গিয়ে ঢুকলেই হত। নাচতে নেমে ঘোমটা টানাব কি দবকাব। কেউ বলল আবে ভাই তা না হলে কি কাউকে নাচান যায?' কাবো অভিমত শোনা গেল, লজ্জা নয ওটা দেমাক মেয়ে হয়ে পুরুষেব মত, পুরুষেব সঙ্গে চাকবি কবতে এসেছে, সেই অহঙ্কাব এব চেয়ে আগেব টাইপিস্ট নকুলবাবুই ভালো ছিলেন পুরুষ হলেও বেশ বসিকপুরুষ ছিলেন তিনি। আব কি অদ্ভুত স্পীড ছিল হাতেব। বেলা চাবটেব মধ্যে সব কাজ শেষ কবে গল্প কবতে বসতেন সব সেবা বসেব গল্প। শুনতে শুনতে সাবাদিনেব কলমপেষা বক্তহীন দেহমন বসস্থ হয়ে উঠতে চাইত তাছাড়া অনেকেব অনেকবকম ব্যক্তিগত কাজকর্ম চলত তাঁকে দিয়ে। কেউ অফিস কামাই কবেছে, তাব দবখাস্ত টাইপ কবে দিতে হবে, কেউ চুপি চুপি অন্য অফিসে চাকবিব আবেদন কবেছে, একবাশ সার্টিফিকেটেব সঙ্গে তাব টাইপড কপি চাই। নকুলবাবুব মুখে 'না' ছিল না। এক কাপ চা হলে ভালো হয, অন্ততঃ একটা সিগাবেট নিদেনপক্ষে একটা বিড়িতেও কাজ কবে দিতেন কিন্তু এই মেয়ে টাইপিস্ট পেয়ে কি লাভ হল? নিজেব কাজকর্ম শেষ কবতে পাবে না, পাঁচটাব পবও ফাইলে কাগজপত্রে বোঝাই থাকে টেবিল সে আবাব অন্যেব কাজ ক'বে দেবে। সবসী দত্তকে দিয়ে কোন আশা নেই কোন ভবসা নেই কাবো।

এ্যাটেনডেন্স বেজিস্টাব থেকে নামটা সবাই জেনে ফেলেছে সবসী দত্তেব। কিন্তু—

পবিতোষবাবু হঠাৎ থেমে গেলেন।

বললুম, 'ব্যাপাব কি পবিতোষবাবু। বেজিস্টাব না দেখে আমিও নামটা জেনে ফেললুম বলে অনুতাপ কবছেন নাকি?'

পবিতোষবাবু বললেন, 'না মশাই, অনুতাপ কববাব মত কাঁচা ছেলে নই আমি। নিতান্তই একজন ভদ্রমহিলাব নামটি বলে ফেললুম বলে ইতস্ততঃ কবছিলাম তবে তাও বলি। বন্ধুবান্ধবেব গল্প বলতে বসে যদি তাদেব নাম ধামই গোপন কবতে হয, বদলে দিতে হয, তাহলে সে গল্প বলে আবাম পাওয়া যায না। চেনা মানুষেব সঙ্গে তাব নামটা এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে লেগে থাকে যে নাম বদলালে

তার চেহারা পর্যন্ত যেন অন্য রকম হয়ে পড়ে। সরসীকে আমি চিনি। তাই সুলতা কি সুষমা বললে, আমার কাছে এ গল্পের আর কোন মাধুর্য থাকে না।

যাক গে। সরসী দত্তের নামটা অন্য সকলের মত সুবিমলও জেনেছিল। কিন্তু অন্য সকলের মতের সঙ্গে মনে মনে তার মিল ছিল না।

দেমাক কি অহঙ্কাবেব কোন লক্ষণ সুবিমল সবসীর মধ্যে খুঁজে পেল না। অহঙ্কারের কি আছে ওর। বাড়ির অবস্থা বেশেবাসেই বোঝা যায়। কোন দিন বা মিলের খয়েরীপেড়ে সাধারণ শাড়ি, কোন দিন বা তাঁতেরই হাল্কা সবুজ রঙের সস্তা পুবনো একখানা শাড়ি পরে অফিসে আসে। গায়ে সস্তা ছিট-কাপডেব ব্লাউজ। গয়নার মধ্যে হাতে দু'গাছি মাত্র চুড়ি। কানে কিছু নেই, গলায় কিছু নেই। খুব দরিদ্র ঘবের মেয়েরও এসব গয়না দু'একখানা থাকে। বাইরে বেরুবার সময় অন্ততঃ পাড়াপাড়শী কাবো কাছ থেকে ধার কবে আনলেও আনে। কিন্তু ধার করবাব মত কৃতিত্বও যে সরসীদের নেই তা তাব বেশভূষায় গোপন বইল না। সুবিমল লক্ষ্য করল স্পীডও মেয়েটির সত্যিই খুব কম। ড্রাফ্‌ট পড়বার সময প্রায়ই ভ্রূ কুঁচকায। তাতেই বোঝা যায় ইংরেজী জ্ঞানের বহর। সরসীকে যখন নেওয়া হয় তার দবখাস্ত আর সুপারিশ চিঠিগুলি সুবিমল দেখেছিল। সুবিমলদের কোম্পানীব একজন মহিলা অর্গানাইজার সুপারিশ কবে পাঠিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল 'সম্ভ্রান্ত কিন্তু ভাবী দবিদ্র আর দুঃস্থ পরিবারের মেয়ে'। আব সরসীর ওপরই পরিবারেব ভরণপোষণ বেশির ভাগ নির্ভর করে। ঠিক যোগ্যতাব জোরে নয়, অনুকম্পা আর সহানুভূতির পাত্রী হয়েই সরসী অফিসে ঢুকেছিল। এমন মেয়ের গর্ব করবার কি আছে ? কিন্তু সুবিমলের সহকর্মীদের ধারণা ছিল আলাদা। যার আর কিছু থাকে না তার অহঙ্কার থাকে।

একদিন কাজকর্মের খুব চাপ পড়েছে সুবিমলের ওপর। টেবিল ভবা ফাইল। হিসাবপত্রের

কাজকর্ম ছাডাও নানা ধবনের চিঠিপত্র লিখতে হত সুবিমলকে। সেক্রেটারী বেশিবভাগ সময় ফিলডওয়ার্ক নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

সাড়ে পাঁচটার পর নতুন আর একটি চিঠি সুবিমল ড্রাফ্‌ট কবতে শুরু করেছে, হঠাৎ চোখে পড়ল সমস্ত অফিসটি ফাঁকা হযে গেছে, কেবল উত্তর-পূর্ব কোণের সেই চেয়ারটায় বসে সরসী একটা চিঠি টাইপ করছে আর ড্রাফ্‌টের একটি নির্দিষ্ট জায়গায বাব বাব তাকাচ্ছে।

বার দুই ব্যাপারটি লক্ষ্য করবার পর সুবিমল একটু উঁচু গলায় বলল—'ড্রাফ্‌ট পড়তে আপনার কি অসুবিধে হচ্ছে ?'

মৃদু লজ্জিত স্বরে জবাব এল, 'হ্যাঁ, একটা জায়গা একটু—'

সুবিমল কিছু বিরক্ত হয়েই বলল, 'অসুবিধে হলে নিয়ে আসুন না এখানে।'

মেয়েটি তবু ইতস্তত করছে দেখে সুবিমল বলল, 'আপনাব যদি তাতেও অসুবিধা হয়, তা'হলে আমিই যাচ্ছি—'

'না না না।' সবসী ব্যস্ত হযে নিজেই এবার ড্রাফট হাতে উঠে এল। এসে দাঁড়াল সুবিমলের টেবিলেব সামনে।

মেয়েটির সেই ত্রস্ত ভাব, চলবার ভঙ্গি, দাঁড়াবাব ভঙ্গি দেখে বিবক্তি ভাবটা সুবিমলেব মন থেকে মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। একথা সুবিমল অকপটেই স্বীকার কবেছিল বন্ধুদের কাছে।

খসডাটা নিজের হাতের লেখা সুবিমলের। দুর্বোধ্য জায়গাটা শুনে নিয়ে সরসী যখন সীটে ফিরে যাচ্ছিল সুবিমল ডাকল পিছন থেকে, 'শুনুন।'

সরসী ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। সুবিমল দেখল সেই কালো বড় বড় দুটি চোখ কেবল একজন শান্ত নিরীহ নার্ভাস মেয়েরই নয, কিসের একটু চাপা আলোরও আভাস আছে সেই চোখে।

সুবিমল সঙ্গে সঙ্গে আরো গম্ভীর হয়ে গেল, বলল, 'অত যদি সঙ্কোচ থাকে আপনার তাহলে ত' কাজকর্মে সকলেরই খুব অসুবিধা হবে।'

সরসী মৃদুস্বরে জবাব দিল, 'অসুবিধা যাতে না হয় তার জন্য চেষ্টা করব।'

সুবিমল শুনে খুশি হল। কেবল মৃদুই নয় সরসীর স্বর, তার মধ্যে চাপা একটু দৃঢ়তাও আছে। বিনয়ের সঙ্গে আছে আত্মপ্রত্যয়।

সুবিমল বলল, 'কিছু মনে করলেন না ত।'

সরসী এবার মৃদু একটু হাসল, 'না'।

কাজ শেষ ক'রে দু'জনে একসঙ্গেই বেরুল। সন্ধ্যা হয়েছে, আলো জ্বলে উঠেছে শহরে।

সুবিমল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি থাকেন কোথায়?'

'বউবাজার।'

সুবিমল বলল, 'আমি শ্যামবাজার। কিন্তু উঠতে হবে একজায়গা থেকেই। ছ'টার পরেও দেখেছেন কি ভিড়! মিশন রো'র মোড় থেকে আপ গাড়ি ধরতে হবে। নাকি বাস ধরবার আশা রাখেন?'

সরসী মৃদু হেসে বলল, 'না, বাসে ত' আরো বেশি ভিড় হবে।'

দু'জনে একসঙ্গে হেঁটে গেল ট্রাম স্টপেজ অবধি। তারপর যার যার গাড়ি ধরল। দু'জনের রুট আলাদা।'

একটু চুপ ক'রে থেকে পরিতোষবাবু আমার দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'তারপর, বুঝতেই ত' পারছেন, কিছুদিন বাদে আলাদা আলাদা দুই রুট এক হওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ল। সোজা শ্যামবাজারে গাড়িতে না উঠে সুবিমল শিয়ালদার ট্রামে উঠতে লাগল। কোন দিন তার কাজ থাকে শিয়ালদা স্টেশনে, কোন দিন বউবাজার কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে। তাই সরসীর সঙ্গে একই ট্রামে যাওয়া ছাড়া তার কোন উপায় নেই।

প্রথম দু'একদিন একটু বিস্মিত চোখে তাকালেও সুবিমলের কাজের ধরনটুকু যে সরসী না বুঝতে পারল তা নয়। কিন্তু চুপ ক'রে রইল। তার কোন রকম আপত্তি কি অস্বস্তির ভাব দেখা গেল না।

প্রথম যেদিন তারা এক ট্রামে উঠল, আগাগোড়া ভর্তি ছিল গাড়ি; একটা লেডীজ সীট-মার্কা বেঞ্চ ছেড়ে দু'ভদ্রলোককে উঠে দাঁড়াতে হল একজনের চোখে বিরক্তি আর একজনের চোখে ঈর্ষা। সরসী গিয়ে বেঞ্চের এক প্রান্ত ঘেঁসে বসল। কিন্তু সুবিমল সঙ্গে সঙ্গেই তার পাশে বসে পড়ল না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বেঞ্চের ধারটা ধরল না পর্যন্ত।

একটু বাদে সরসী তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাঃ, বসুন।'

বিস্ময়ের সুর তার গলায়।

সুবিমল পাশে বসে মৃদু হেসে বলল, 'অনুমতি না নিয়ে বসা কি ঠিক?'

সরসী একটু হাসল, 'বাঃ, আপনারও অনুমতি নিতে হবে নাকি।'

সুবিমল চেয়ে দেখল পাশে দাঁড়ান যুবকটি তাদের দিকে তখনো ঈর্ষাকুটিল চোখে তাকিয়ে আছে।

তারপর সেই দৃষ্টি ট্রামের সহযাত্রীদের চোখে, অফিসের সহকর্মীদের চোখে আরো অনেকবার সুবিমল দেখেছে। কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত অন্য কারো ঈর্ষা-দ্বেষের অতীত ছিল তারা। সহকর্মীর সাধারণ সহানুভূতি ছাড়া আর কোন সম্পর্ক দীর্ঘদিন গড়ে ওঠেনি তাদের মধ্যে।

দিন কয়েকের আলাপে সরসীদের বাড়ির অনেক খবর সুবিমল জানতে পেরেছিল। পারিবারিক অবস্থা মোটেই ভাল নয় সরসীদের। রুগ্ন বৃদ্ধ বাপ। চাকরি করতেন কোন এক মার্চেন্ট অফিসে। হিসাবপত্রে সামান্য কি গোলমাল হওয়ায় সে চাকরি গেছে, তারপর আর কিছু জোটেনি। অসুখ বিসুখে স্বাস্থ্য এমন ভেঙে পড়েছে যে, কোন কাজ করবার সামর্থ্যও আর তাঁর নেই। অসুখবিসুখ ছাড়া আরো কারণ আছে অশান্তির। দেখতে বেশ সুন্দরী বলে সরসীর দিদি অতসীর ভালো ঘরেই বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বনিবনাও হয়নি। ছেলে নিয়ে ফিরে এসেছে বাপের বাড়িতে। সব খরচ সরসীদেরই চালাতে হয়। ভাগ্যে খানিকটা বাড়িতে, খানিকটা স্কুলে পড়ে পড়ে ম্যাট্রিকটা পাস করেছিল সরসী, আর পাড়ার হাইস্কুলেই নিয়েছিল মাস্টারী। তারপর নিজের উদ্যোগে ক্লাস নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে স্কুলের বুড়ো এ্যাকাউন্টান্ট ভদ্রলোকের কাছে শিখেছিল টাইপিংটা, তাই এই বাজারে চাকরি জোটাতে পেরেছে। প্রথমে অবশ্য খুব আপত্তি করেছিলেন সরসীর বাবা। মেয়েকে কিছুতেই পুরুষদের অফিসে চাকরি করতে দিতে চাননি। বলেছিলেন, না খেয়ে মরবেন, আধপেটা খেয়ে থাকবেন সেও ভালো, তবু মেয়েকে আগুনের মধ্যে আর পাঠাবেন না। এক মেয়ের কপাল পুড়তে

দেখে তাঁব যথেষ্ট শিক্ষা হযেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সঙ্কল্প বাখতে পাবেননি সবসীব বাবা। না খেযে মবা সহজ নয, আধপেটা খেযে থাকা আবও কঠিন। তাই ইচ্ছাব বিরুদ্ধে, রুচিব বিরুদ্ধে অবশেষে ছেড়ে দিতে হযেছে মেযেকে। স্কুলে চল্লিশ টাকা মাইনে পেত সবসী। তাতে মোটেই কুলোত না। অফিসে তাব ডবল পায। স্কুলেব হেডমিস্ট্রেসেব সমান। কিন্তু তাতেও কুলোয না।

শুনতে শুনতে সহানুভূতিতে মন ভবে উঠেছিল সুবিমলেব। বলেছিল সবসীব ডবল মাইনে পেযেও তাব একই দশা। দুটি আইবুড়ো বোন আছে বাড়িতে, একটি ভাই স্কুলে পড়ে, বিধবা মা আছেন, দুটি শিশু সন্তান নিযে আছেন বউদি। বছবে দু'বাব সুবিমলেব সঙ্গে ঝগড়া কবে ভাইযেব কাছে চলে যান, তাবপব ভাইযেব সঙ্গে খিটিমিটি কবে ফেব এসে শবণ নেন সুবিমলেব।

অমনিতে একটু দাম্ভিক প্রকৃতিব মানুষ সুবিমল। নিজেব অভাব-অনটনেব কথা ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে পর্যন্ত সে জানাতে চায না। কিন্তু মাত্র মাসকযেকেব আলাপে সুপিবিযব অফিসাব হযে নিজেদেব অফিসেবই একজন টাইপিস্ট মেযেকে সে প্রায সব কথা জানিযে ফেলল। জানাবাব পবে দেখল ভাবি তৃপ্তি ভাবি আনন্দ। অবশ্য কেবল দুঃখ নিবাশাব কথা নয, আশা আকাঙ্ক্ষাব কথাও হত তাদেব মধ্যে। সুবিমল তাব নানাবকম ভবিষ্যৎ পবিকল্পনাব কথা বলত। আলোচনা কবত দেশেব বাজনৈতিক অবস্থাব। সমাজেব কাঠামো বদলানোব সূচনা আব সম্ভাবনা সম্বন্ধে মুখব হযে উঠত। সবসী যে সব কথা বুঝত বা বুঝতে চাইত, তা নয। কিন্তু তাঁবও ব্যক্তিগত আশা, আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ, উদ্দীপনা কম ছিল না। বলতে গেলে পবিবাবেব কর্ত্রীই সবসী। কযেকটি প্রাণীব অন্ন যোগাবাব দাযিত্বেব বেশিবভাগই পড়েছে তাব উপব। বাড়িব সবাই তা জানে আব তাব উপব নির্ভবও কবে। সবাই সমীহ কবে, সম্মান কবে তাকে। অফিস থেকে ফেবাব সঙ্গে সঙ্গে দিদি তাব হাত পা ধোযাব জল এগিযে দেয, বাবা পাখাব বাতাস কবতে কবতে তাব শ্রান্ত শবীবেব জন্য উদ্বেগ জানান, মা মুড়িব বাটি আব চাযেব কাপ হাতে কবে এসে সামনে দাঁড়ান। বাড়িতে আগেকাব দিনে সবসীব বাবাব যে সমাদব ছিল, এখন সেই আদব সম্মান পাচ্ছে সবসী। বলতে বলতে আত্মপ্রসাদে সবসীব মুখ উজ্জ্বল হযে ওঠে। আব সেই উজ্জ্বল সুন্দব মুখেব দিকে চোখ বেখে তাকিযে থাকে সুবিমল।'

পবিতোষবাবু একটু থামলেন।

আমি বললুম, 'কিন্তু এত কথা আপনি জানলেন কি ক'বে? আপনি কি বোজ ট্রামে বাসে ওদেব ফলো কবতেন?'

পবিতোষবাবু ধমকেব ভঙ্গিতে বললেন, 'নাঃ, আপনি বড় বেবসিক আব অমনোযোগী শ্রোতা। বলেছি না সুবিমল আমাব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাদেব মধ্যে যখন যা হত খুঁটে খুঁটে সব আমাকে না বলে তাব তৃপ্তি ছিল না।'

বললুম, 'তাবপব?'

'তাবপব আব কি। দিনেবপব দিন ঘনিষ্ঠতা এগিযে চলল। নিজেকে সুবিমল বলে কল্পনা কবে নিন। তা'হলে আব 'তাবপব' তাবপব কববেন না। তাবপব, তাবা এই বেস্তবায প্রথম একসঙ্গে চা খেতে এল।'

এবাব বোমাঞ্চ বোধ কবলাম, 'এই বেস্টুবেন্টে? স্টান্টটা কি বাগ কবেই দিলেন নাকি পবিতোষবাবু? আমি কি খুব ব্লান্ট হযে পড়ছিলাম?'

পবিতোষবাবু বলে চললেন, 'এই কেবিনেই চা খেতে এসেছিল তাবা। কি একটা গোলমেলে ট্রাম বাস দুই-ই বন্ধ। অফিসেব পব সাবাটা পথ হেঁটে হেঁটে এল সুবিমল আব সবসী। প্রথমে খুব ফাঁকে ফাঁকে অনেক দূবত্ব বেখে হাঁটল, তাবপব এল কাছাকাছি। অফিস থেকে অনেক দূবে এসে পড়েছে তাবা, এমনকি সবসীদেব গলিব মোড়ও ছাড়িযে এসেছে।

হঠাৎ সুবিমল বলল, 'চলুন, একটু চা খাওযা যাক। ট্রামেব পযসা ক'টা বাঁচল। এবাব গলাটা একটু ভিজিযে নিই।'

সবসী বলল, 'না না না।'

সুবিমল ধমক দিল, 'কেবল না না। আপনাব নেতিবাদ এবাব ছাড়ুন তো। আসুন আমাব

সঙ্গে।'

ধাবে কাছে ভালো বেস্টুবেন্ট নেই। সবসীকে নিয়ে এখানেই এসে ঢুকল সুবিমল। মালিক আব খদ্দেবরা সমান অবাক হযে গেলেন। একটু পবে মালিক বিমূঢ়ভাব কাটিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, 'আসুন আসুন, দু'জনে বসবাব মত কেবিনও আমাদেব আছে।'

কি বকম কেবিন তা'তো দেখতেই পাচ্ছেন। এটুকু বোধ হয কল্পনা ক'বে নেওয়া যায যে, এই ছোট খোপেব গবমে তাবা দু'জন কোন অসুবিধা বোধ কবেনি। ছাবপোকাব কামড সম্বন্ধেও আমাদেব মত তাবা সেদিন সচেতন ছিল না।' পবিতোষবাবু একটু হাসলেন।

'সুবিমল জিজ্ঞেস কবল, 'কি খাবেন?'

সবসী বলল, 'কিচ্ছু না।'

'কিন্তু দু'কাপ চা অন্ততঃ না নিলে এবা আমাদেব এখানে বসে গল্প কবতে দেবে কেন? এক কাপ ক'বে চা অন্ততঃ নেওয়া যাক, কেমন? আব-'

সবসী বলল, 'আব কিচ্ছু না। আপনি খান আমি দেখি।

সুবিমল হেসে বলল, 'সে যদি নিজেব হাতে চা ক'বে খাওযাতেন তাহলে বলতে পাবতেন।'

আবক্ত মুখ নিচু কবে সবসী বলল, 'সে সৌভাগ্য কি আব হবে?'

আংশিকভাবে সৌভাগ্যটা কিছুদিন বাদেই অবশ্য দু'জনেব হযেছিল। বাড়িতে নয, চৌবঙ্গী অঞ্চলে ভালো বেস্টুবেণ্টে টী পট থেকে সুবিমলেব কাপে সেদিন সবসী চা ঢেলে দিযেছিল। অবস্থাব অনুপাতে একটু বেহিসেবী খবচই সেদিন কবে ফেলেছিল সুবিমল। তিনশ' পঁযষট্টি দিনই কি হিসাবেব মধ্যে বেঁধে বাখা যায জীবনকে? সবসীব হাত যে সেদিন সুবিমলেব হাতেব মধ্যে ঘেমে উঠেছিল, কেঁপে উঠেছিল তাবেও ঠিক হিসাব সম্মত বলা চলে না।

সবসী হাত ছাড়িয়ে নেযনি কিন্তু মৃদু গলায বলেছিল, 'তুমি এখনো ত' আমাদেব কথা সব জানো না।'

সুবিমল কথাটা ঘুবিয়ে নিয়ে বলেছিল, 'কেমন কবে জানব? তোমায আমায মিলে যে আমাদেব কথা, তা ত সবে শুরু।'

এদিকে দু'জনকে নিয়ে কানাকানি চোখ টেপাটিপি, গা টেপাটিপি, আড়ালে আবডালে হাসাহাসিও অনেকদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। অফিসে সুবিমলেব সতর্কতাব অন্ত ছিল না। তবু সহকর্মীদেব চোখে চোখে বিদ্যুৎ খেলতে লাগল। যাবা একটু বেশি সাহসী তাবা কেউ কেউ দু'একটা বাঁকা বাঁকা পবিহাসও কবল। খুব সাবধান হয়ে গেল দু'জনে। যেন কেউ কাউকে চেনে না। কাবো সঙ্গে কাবো বাক্যালাপ পর্যন্ত নেই যেন।

দিন কয়েক পবে ফেব সেই নিভৃত অফিসেই দেখা হল। একটা ড্রাফট ছ'টাব সময টাইপ কবতে শুরু কবল সবসী। তাবপব হঠাৎ যেন নিজেব মনেই মন্তব্য কবে উঠল, 'না, এত খাবাপ লেখা ভদ্রলোকেব! এ কি কেউ পড়তে পাবে?' সাবা অফিসে আব কেউ নেই। বেযাবাদেব ছুটি দিয়েছে সুবিমল। দাবোযানকে কিনতে পাঠিয়েছে পান সিগাবেট। সোজা উঠে গিযে দাঁড়াল সবসীব টেবিলেব কাছে। কোপেব ভাণ কবে বলল, 'ভদ্রলোকেব লেখাব কোন জাযগাটা অপাঠ্য শুনি?'

সবসী হেসে ঘাড় ফিবাল, বলল, 'সব জাযগায। কোথাও কিছু বুঝবাব জো নেই।' তাব কথাব ভঙ্গি দেখে সুবিমলও হাসল। আগেব চেযে অনেক সপ্রতিভ হযেছে সবসী, অনেক প্রগল্ভা। দু'জনেব কাছে কোথাও আব কিছু দুর্বোধ্য নেই। সব স্পষ্ট, সব প্রাঞ্জল। কোন জট নেই আব জীবনে, কোন জটিলতা নেই।

কিন্তু সুবিমলেব ভুল হযেছিল। জীবন কি সত্যিই অত সহজ, অত সবল, অত প্রাঞ্জল? আব জট কি জীবনে দু'একটি? জট অসংখ্য। জীবনেব এক জট খোলে, আব এক জট জড়ায। হৃদযেব এক পাট খোলে, আব এক পাট বন্ধ হয।'

বাধা দিযে বললুম, 'পবিতোষবাবু, আপনি যে একেবাবে philosophy-তে চলে গেলেন।'

পবিতোষবাবু হেসে বললেন, 'আচ্ছা এবাব economics এ ফিবে আসছি।

জানুযাবীব শেষে ইনক্রিমেন্টেব লিস্ট বেরুল অফিসেব। জেনাবেল ম্যানেজাবেব সইকবা,

সুবিমলেব হাতেব লেখা লিস্ট। টাইপের জন্য গেল সরসীব কাছে। একটির পর একটি সহকর্মীদের নাম আর তাব বিপরীত দিকে টাকাব অঙ্ক। সেক্রেটাবীব মাইনে বেড়েছে পঞ্চাশ টাকা। তিনি অনেক কাজ কবেছেন। এবাব হাজাব পঞ্চাশেক টাকা আমানত এনেছেন কোম্পানীতে, তাবপর সুবিমলেব নাম। তাবও দশ টাকাব জায়গায় পনেব টাকা মাইনে বেড়েছে। তাবও যোগ্যতায পবিতুষ্ট হয়েছেন কোম্পানী। তাবপব যথাযোগ্য পাঁচ, আড়াই, দুই ক'বে ক'বে সবাবই মাইনে বেড়েছে। দাবোয়ান, বেযাবাদেব দেড আব এক। কিন্তু সমস্ত তালিকা ঘেঁটে অবাক হয়ে গেল সবসী, তাব নাম নেই কোন জাযগায। কেবল সে-ই বাদ পড়েছে, সে-ই কোন যোগ্যতাব প্রমাণ দিতে পাবেনি। অপমানে চোখ ফেটে জল এল সবসীব। টাইপ কবতে হাত কাঁপতে লাগল। বাব বাব ভুল হতে লাগল নামে আব ফিগাবে।

শেষেব দিকে কিছুতেই মনকে শান্ত না বাখতে পেবে, সেই ইনক্রিমেন্টেব তালিকা হাতে সবসী এগিয়ে এল সুবিমলেব টেবিলেব সামনে। প্রথমে সংযত ভাবেই বলল, 'দেখুন ত' কোন ভুল আছে নাকি? বাদ পড়েছে নাকি কোন নাম?'

সুবিমল জানে ব্যাপাবটা কি, তবু শান্ত গাম্ভীর্যে বলল, 'সব ঠিকই আছে?'

সবসী এবাব অসহিষ্ণু হয়ে উঠল, 'ঠিক আছে? আপনি পড়ে দেখেছেন সব?'

সুবিমলেব লজ্জা কবতে লাগল। অফিসেব সমস্ত লোক তাদেব দিকে তাকিয়ে আছে। কৌতুকেব আভাস পাওয়া যাচ্ছে কাবো কাবো চোখে আব ঠোঁটেব কোণে। কাবণ ইতিমধ্যে সবাই ত' টেব পেয়েছে, সুবিমল আব সবসীব সম্পর্ক। নিশ্চযই এই ব্যাপাবটিকে ছদ্ম প্রণয-কলহ বলে মনে কবছে, ভাবছে এ সব নিতান্তই প্রণযেব মান-অভিমানেব পালা।

সুবিমল বলল, 'দেখেছি পড়ে। আপনাব নাম বাদ গেছে, ইনক্রিমেন্ট পাননি আপনি।'

সবসী অধীব হয়ে বলল, 'কিন্তু সবাই পেতে পাবল, আমি কেন পেলুম না? কি দোষ হয়েছে আমাব? কি কাজে গাফিলতি করেছি, ইচ্ছা ক'বে কামাই কবেছি কোনদিন? বোজ ন'টায এসে ছ'টা সাতটা পর্যন্ত অফিসে কাজ কবেছি আমি। কেন আমি ইনক্রিমেন্ট পেলুম না।'

সুবিমল বলল, 'আচ্ছা, সে কথা আপনাকে পবে জানানো হবে।

সবসী বলল, 'পবে নয, এখনই জানতে চাই আমি।'

সুবিমল কেবল বিবক্ত নয ক্রুদ্ধও হল। এত অবুঝ কেন সবসী? কেন অফিসেব সকলেব সামনে সবসী এমন হাস্যাস্পদ কবে তুলছে নিজেকে? কোন পুরুষ কর্মচাবী এমন নির্লজ্জতা দেখাতে সঙ্কোচ বোধ কবত। লজ্জায নিজেবই যেন মাথা কাটা যেতে লাগল সুবিমলেব।

তবু চেষ্টা ক'বে আত্মসম্ববণ কবে নিল সুবিমল। বলল, 'অফিসেব নিযম- -সার্ভিস এক বছব পুবো না হলে ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয না, আপনাব দশ মাসেব কিছু বেশি হয়েছে।'

সবসী বলল, এসব লেম এক্সকিউজ আমি শুনতে চাই না।'

এবাব সুবিমলও চটে গেল, 'তা'হলে আবো শুনুন। জেনাবেল ম্যানেজাব জানতে পেবেছেন যে, আপনাব স্পীড এখনো আশানুরূপ হয়নি, কাজকর্মে এখনো যথেষ্ট ভুল চুক থেকে যাচ্ছে, তাছাড়া আপনাকে গোড়াতেই বেশি মাইনেয নেওয়া হয়েছিল। আপনাব আগে যিনি কাজ কবতেন, তিনি তিন বছব কাজ কববাব পব আশিতে উঠেছিলেন।'

সবসী বলল, 'ওসব আমি শুনতে চাই নে। কিন্তু জেনাবেল ম্যানেজাব আমাব সম্বন্ধে বিপোর্ট কাব কাছ থেকে পেলেন?'

সুবিমল বলল, 'কাব কাছ থেকে পেলেন, তা তাঁকেই জিজ্ঞাসা কববেন।'

সবসী বলল 'বেশ তাঁকেই কবব।'

অন্য দু'একজন সহকর্মী উৎসাহিত কবল সবসীকে, 'করুন না এ্যাপলিকেসন, আপনাব কেস নিশ্চযই কনসিডার্ড হবে। গতবাবও এমন একজনেব নাম বাদ পড়েছিল। লেখালেখি কবে সে পেযে গেছে। যদি দবকাব হয, আমবা ড্রাফট কবে দিই আপনাব দবখাস্ত।'

সবসী ঘাড নাড়ল। না, কাবোবই মুরুব্বিদার দবকাব নেই। সে নিজেই লিখতে জানে। বলে, খসখস কবে একখানা দবখাস্ত সত্যিই লিখে ফেলল সবসী। ইংবেজী দুর্বল হলে কি হবে, মনে ত'

বলেব অভাব নেই। লিখে সঙ্গে সঙ্গে বেযাবা দিযে পাঠিযে দিল জেনারেল ম্যানেজাবেব ঘবে। টাইপ পর্যন্ত করল না, নিজেব কথা নিজেব হাতেব লেখাতেই সবচেযে ভালো ফোটে।

ছুটিব পব আবাব নিবালায দেখা হল দু'জনে। তখন তাপ পড়ে গেছে, অনুতাপ এসেছে মনে।

সবসী বলল, 'আমাব অন্যায হযে গেছে। মাপ কবো আমাকে। মনটা ভাবী খাবাপ ছিল। বেরুবাব সময় দিদিব সঙ্গে তাব ছেলেব চিকিৎসাব টাকা নিয়ে ঝগড়া হযে গেছে।'

সুবিমল বলল, 'তোমাব ইনক্রিমেন্টেব ব্যাপাবে আমি কিন্তু সত্যিই সাধ্যমত চেষ্টা কবেছিলাম। তবে জেনাবেল ম্যানেজাব যখন ওসব কথা বললেন, জোব কবে প্রতিবাদ কবতে পাবিনি। বুঝতেই ত' পাবো অমনিতেই কত বকম কথা উঠেছে। তাঁব কানেও যে কিছু কিছু না গেছে তা ত' নয। অবশ্য ইনক্রিমেণ্টটা হযে গেলে ভালোই হত—'

সবসী বলল, 'ভালো না ছাই হত। আমাকে আব লজ্জা দিযো না।'

সুবিমল সান্ত্বনা দিযে বলল, যাক, ওব জন্য দুঃখ ক'ব না। বড় জোব গোটা পাঁচেক টাকা ত' হাতে উঠত কর্তাদেব। ও টাকা না হয মাসে মাসে তুমি আমাব কাছ থেকেই নিযো।'

কথাগুলি ফেব খচ কবে বিঁধল সবসীব মনে। গোটা পাঁচেক টাকা! কিন্তু অফিসে ইনক্রিমেন্টেব সময পাঁচ টাকাব মূল্য কি কেবল পাঁচ টাকাই? যোগ্যতা, দক্ষতা, মান সম্মানে সেই পাঁচ কি পঁচিশ হযে ওঠে না? আসলে পাছে পক্ষপাতেব কথা ওঠে জেনাবেল ম্যানেজাব কিছু মনে ক'বে বসেন, সেই ভযে সুবিমল তাব নামটা পর্যন্ত তুলতে সাহস পাযনি, মুখ ফুটে একটা কথাও বলেনি তাব স্বপক্ষে। তাই নিজেব গাঁট থেকে পাঁচ টাকা দিযে ক্ষতিপূবণ কবতে চাইছে। কিন্তু তাব গাঁটেব পাঁচ টাকায কি সব ক্ষতিব পূবণ হয? তাছাড়া কথাটা ভাবী অপমানজনক বলে মনে হল সবসীব কাছে। এই পবিহাসেব মধ্যে কোথায যেন একটু অশুচিতা আছে

পবদিন লিস্টেব বাকিটা টাইপে চড়িযেছে সবসী, ডাক পড়ল জেনাবেল ম্যানেজাবেব ঘবে। সুবিমল দেখল মুখ শুকিযে গেছে সবসীব বুক কাঁপছে, পা কাঁপছে। দবখাস্তটা তাব সঙ্গে পবামর্শ ক'বে না পাঠানোয মনে মনে সুবিমল ক্ষুণ্ণ হযেছিল। তবু প্রকাশ্যে অফিসেব মধ্যে ভবসা দিযে বলল, যান না অত ভয কিসেব।

পাঁচ মিনিট গেল, সবসী ফেবে না। শঙ্কিত হযে উঠল সুবিমল। শেষে প্রায পঁচিশ মিনিটেব মাথায সবসী ফিবে এল মুখে তাব শঙ্কা ভয আতঙ্কেব চিহ্ন মাত্র নেই। খুশিতে জ্বল জ্বল কবছে মুখ। ব্যাপাবখানা কি?

হঠাৎ জেনাবেল ম্যানেজাবেব কথা মনে পড়ল সুবিমলেব। বলিষ্ঠ, দীর্ঘকায পুরুষ। সুবিমলেব চাইতে অনেক সুন্দব অনেক স্বাস্থ্যবান। বযস অবশ্য কিছু বেশি। পযত্রিশেব কাছাকাছি। কিন্তু দেখলে আবো কম বলে মনে হয। এখনো বিযে কবেননি। ফলে নানাবকমে কানা-ঘুষা মাঝে মাঝে কানে আসে। ভাবী বাশভাবী মানুষ নবনী চ্যাটার্জি। তাঁব মুখেব দিকে তাকিযে কর্মচাবীবা সহজে কথা বলতে পাবে না। তাঁব সিদ্ধান্তেব প্রতিবাদ কবেও তাঁব ঘব থেকে হাসি মুখ নিযে কি কবে ফিবে এল সবসী?

অফিসেব মধ্যে কথা বলবাব সুযোগ হল না, ছুটিব পব আড়ালে ডেকে সুবিমল জিজ্ঞাসা কবল, 'ব্যাপাব কি? ইনক্রিমেন্ট হাতে হাতে পেলে নাকি?'

সবসী মৃদু হেসে বলল, তা নয, উনি বললেন, আমাব সাহস দেখে খুশি হযেছেন। এত সাহস নাকি অফিসেব আব কাবো নেই।

সুবিমল গম্ভীব হযে বলল, তাই নাকি? আব কিসে কিসে খুশি হলেন তাবপব?'

সবসী নিজেব আনন্দে মগ্ন ছিল, সুবিমলেব গাম্ভীর্য লক্ষ্য কবল না। বলল, 'আমাব ইংবেজী হাতেব লেখাবও প্রশংসা কবলেন। বললেন, এব আগে এমন হাতেব লেখা উনি দেখেন নি।'

সুবিমলেব মনে পড়ল সবসীব হাতেব লেখাব প্রশংসা এব আগে সেও একদিন কবেছিল, ইংবেজী নয, বাংলা লেখাবই। টুকবো টুকবো চিঠিপত্র চলত দু'জনেব মধ্যে। সুবিমল একবাব বলেছিল, 'লেখা দেখলেই বোঝা যায হাতখানি কেমন।' সবসী লজ্জিত হযে বলেছিল, 'আহা!'

কিন্তু সে প্রসঙ্গেব সুবিমল উল্লেখমাত্র কবল না। সবসীবই যদি সে কথা মনে পড়ে না থাকে

সুবিমল বলতে যাবে কেন ?

সুবিমল বলল, 'কিন্তু কেবল সাহস আব হাতেব লেখাব প্রশংসায অত সময কাটল কি ক'বে ?'

'বাঃ, উনি বাড়িব কথা-টথাও জিজ্ঞেস কবলেন যে।'

সুবিমল বলল, 'হুঁ, ইনক্রিমেন্ট সম্বন্ধে কি বললেন ?'

সবসী সহাস্যে বলল, 'সে সম্বন্ধেও খানিকটা ভবসা পেযে গেছি। বললেন, আমাব কাজকর্ম এতদিন ভালো ক'বে দেখেননি, এবাব দেখবেন। ইনক্রিমেন্টেব জন্য ভাবনা কি। ছ' মাস বাদেই ত একটা স্পেশাল ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে, তখন পুষিযে দেবেন। তাব আগে সত্যি সত্যিই কিন্তু যোগ্যতা দেখান চাই। দেখ যতটা ভয কবেছিলাম, কাছে গিয়ে দেখি তাব কিচ্ছু নয। আলাপ-ব্যবহাবে খুব অমাযিক, খুব ভদ্রলোক।'

সুবিমল বলল, 'হুঁ, মেয়েদেব সম্বন্ধে ওব একটু বিশেষ ভদ্রতাই আছে।'

সবসী ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'তাব মানে ? আসলে তোমবা পুরুষেবা ভাবী হিংসুক জাত। ট্রাম বাসে ক'খানা লেডীজ সীট পাই আমবা তা নিযেও কত কথা, কত হিংসা তোমাদেব।'

পবিতোষবাবু একটু থেমে সিগাবেট ধবালেন।

বললুম, 'তাবপব ?'

পবিতোষবাবু বললেন, 'তাবপবেব ইতিহাস খুব দ্রুত। যোগ্যতা প্রমাণেব জন্য প্রায উঠে-পড়ে লাগল সবসী। যাতে স্পীড বাড়ে, যাতে কাজ পেণ্ডিং পড়ে না থাকে, যাতে ভুলচুক একেবাবেই না হয, তাব কাজেকর্মে অখণ্ড মনোযোগ দিল সবসী। কাজ কবতে কবতে আগে ফাইল থেকে যখন চোখ তুলে তাকাত, সুবিমলেব সঙ্গে চোখাচোখি হত। সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাসিব ঝিলিক খেলে যেতো তাব ঠোঁটে এত সতর্ক এত সাবধান কবে দেওযা সত্ত্বেও কিছুতেই সে হাসি সবসী গোপন কবতে পাবত না, মুখ থেকে, চোখ থেকে লুকিযে বাখতে পাবত না মনেব উচ্ছলতা। আজকাল যখন সুবিমল চোখ তুলে তাকাত, সবসীব সেই গভীব কালো চোখ দুটি চোখে পড়ে না, সে চোখ ড্রাফটে নিবদ্ধ। কখনো বা টাইপবাইটাবেব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিযে ব্যস্ত। আজকাল চোখ তুলে কেবল সরু পথেব মত ঘন কালো চুলেব মাঝখান দিযে সিঁথি চোখে পড়ে সুবিমলেব। সে পথ খানিকদূব গিযে গভীব অবণ্যে ফেব হাবিযে গেছে। সুবিমল অন্যমনস্ক হযে সে দিকে তাকিযে থাকে কিছুক্ষণ। তাবপব চমকে উঠে লজ্জিত হযে ফাইলেব আড়ালে মুখ ঢাকে। কিন্তু সবসীব কোন দিকে তাকাবাব ফুবসুৎ নেই, বোধ হয স্পৃহাও নেই।

অকাবণে মেজাজ খাবাপ হযে উঠে সুবিমলেব। বেযাবাদেব ধমকায, সহকর্মী অধঃস্তনদেব বকে। কাজকর্মে নিজেব এক-আধটু ভুলচুকেব জন্য সেক্রেটাবী সুধীববাবুব কাছে লজ্জা পায। তিনি তাব সাক্ষাৎ ওপবওযালা। ভাবী ঠাণ্ডা, কিন্তু গম্ভীব মেজাজেব মানুষ। এক-আধটি মন্তব্য কবেন মাঝে মাঝে, 'আপনাব কি হযেছে সুবিমলবাবু, কোন অসুখ-বিসুখ কবল নাকি ?'

না, অসুখ-বিসুখ কিছুই কবেনি সুবিমলেব, কিন্তু সুখই বা কই।

এদিকে প্রাযই দু তিনবাব কবে জেনাবেল ম্যানেজাবেব বেযাবা এসে সেলাম জানায সবসীকে। ব্যস্ত হযে সবসী কি সব কাগজপত্র নিযে চলে যায জেনাবেল ম্যানেজাবেব চেম্বাবে। এবই মধ্যে কেমন যেন একটু ক্ষুদে অফিসাবেব ভাব হযেছে সবসীব। সহকর্মীদেব চোখে-মুখে আবাব এক ধবনেব হাসি দেখা যাচ্ছে। সে হাসিব ব্যঞ্জনা আলাদা।

একদিন ছুটিব পব এক সঙ্গে ট্রামে যেতে যেতে আগেব মতই পাশাপাশি বসে সুবিমল জিজ্ঞাসা কবল, 'কি এমন কাজ তোমাব ? অত ঘন ঘন ও-ঘবে গিযে কবো কি ?'

সবসী বলল, 'ও-ঘবে মানে ?'

'ও-ঘবে মানে, বড় ঘবে ?'

সবসী বলল, 'বাঃ কাজ-কর্ম থাকে। ডেকে পাঠান তাই যাই, ডাকলে তুমি বুঝি যাও না। না গিযে পাবো বুঝি।'

আবো ক'দিন পবে। সেদিনও অফিসেব অন্য সবাই চলে গেছে। শুধু আছে সবসী আব সুবিমল। খানিকবাদে সুবিমলেবও শেষ হল কাজ। কিন্তু সবসীব কাজ আব ফুবোয না।

খানিক অপেক্ষা ক'রে সুবিমল নিজে এগিয়ে গেল সরসীর টেবিলের কাছে। এর আগে দু' একটা কাঢ় কথা বলেছে সরসীকে, হয়তো অভিমান হয়েছে ওর। মানভঞ্জন দরকার। দরোয়ান রেযাবাদের অন্য কাজে পাঠিয়ে সুবিমল নিজেই এগিয়ে গেল, বলল সন্ধ্যার সময় কি কাজ করছ এত ? বাকী যা আছে, দাও আমাকে আমি তাড়াতাড়ি টাইপ ক'রে দিচ্ছি।'

সুযোগ-সুবিধা মত এমন অনেকদিন সুবিমল সাহায্য করেছে সরসীকে। আধ ঘণ্টা এক ঘণ্টার মধ্যে সাফ ক'রে দিয়েছে তার টেবিল। সরসীর চোখ থেকে প্রশংসা ঝরে পড়েছে, বলেছে, 'তোমার মত আঙুল যদি আমার হত।'

সুবিমল হেসে জবাব দিয়েছে, 'আমার বহু ভাগ্য যে আমার মত আঙুল তোমার হয়নি।'

কিন্তু আজ সুবিমলের প্রস্তাবে মোটেই রাজী হল না সরসী মাথা নেড়ে বলল, 'না। তুমি টাইপ করে দিলে কি আমার স্পীড বাড়বে ? তাছাড়া ওঁর কাছে ধরা পড়ে যাব যে দু'জনের হাতের কাজ ত' এক নয়।'

তা ঠিক, দু'জনের হাতে হাতে বহুদিন মিল হয়েছে তাই ব'লে কি একজনের হাতের কাজের সঙ্গে আর একজনের হাতের কাজ কোন দিন মেলে ?

তবু সুবিমল বলল আচ্ছা ধরা পড ত' পড়বে। দেখিই না কি এমন জরুরী জিনিস টাইপ করছ ?

সরসী তাতেও মাথা নাড়ল দোহাই তোমার ওগুলি টানাটানি কোরো না। তা হলে আর চাকরি রাখতে পারব না। মিঃ চ্যাটার্জীর প্রাইভেট ফাইল ওটা। কাউকে দেখাতে নিষেধ আছে

সুবিমল বলল, ওঃ '

তারপর ...ও ...া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল

পাসনাল ফাইলের পরে এল কনফিডেনশিয়াল ফাইল অফিসের নতুন রুলস এণ্ড রেগুলেসনের ড্রাফট। সবই জরুরী। সব কাজই অফিসের ছুটির পর অতিরিক্ত খেটে ক'রে দিতে হল সরসীকে।

একদিন সরসী এসে খুশি মুখে বলল 'জানো, জেনারেল ম্যানেজার খুব খুশি হয়েছেন। অতগুলি টাইপড সীট কিন্তু ভুল বেরিয়েছে মাত্র একটি

সুবিমল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল ভুল তোমার একটিই হয়েছে সরসী বড় মারাত্মক ভুল। জেনারেল ম্যানেজার যদি খুশি হয়ে থাকেন তোমার সেই ভুলের জন্যই হয়েছেন বিশুদ্ধতার জন্য নয়।

সরসীর সমস্ত উৎসাহ সমস্ত উজ্জ্বলতা যেন নিবে গেল বলল তার মানে ?

'তার মানে কি বুঝতে পারোনি ' সুবিমল অদ্ভুত একটু হাসল।

সরসী আর একবার দীপ্ত হয়ে উঠল, বুঝেছি তুমি নিজে যেমন নোংরা জগৎশুদ্ধ সবাইকে তেমন ভাব।'

তারপর দেখা গেল, নতুন চেয়ার টেবিল আসবাবপত্রের আমদানী হয়েছে সরসীর জন্য। এ্যাসবেসটসের পার্টিসন তুলে চারিদিকে ঘিরে দেওয়া হল বহু লোকের চোখের সামনে বসে একজন মহিলা কর্মচারীর কাজ করতে ভারী অসুবিধা হয়। এ সব সাধারণ শিষ্টাচার ছাড়া কিছু নয় তবু নানা জনে নানা কথা বলতে লাগল।

ডেসপ্যাচার নীলকমলবাবু সুবিমলকে আড়ালে পেয়ে ফিসফিস ক'রে বলল গরীবের চোখ দুটো না থাকাই ভালো মশাই, থাকলেই বিপদ। না থাকলে বরং অন্ধ আতুর বলে ভিখ মেগে খাওয়া যায়। কিন্তু চোখ থাকলে চাকরিও থাকে না, ভিখও মেলে না।' সুবিমল হেসে বলল কেন, কি দোষ হল চোখের। চাকরি না থাকারই বা কি হল।'

নীলকমলবাবু বললেন, 'কাল একেবারে সামনা সামনি পড়ে গিয়েছিলাম মশাই। অনেকদিন পরে মেট্রোতে ভালো একটা বই এসেছে শুনে গিয়েছিলাম দেখতে। বেরিয়ে এসে চোখে ধাঁধা লাগল। আর একখানা নতুন ছবি। দু'জনে মোটরে উঠেছেন এক সঙ্গে।'

সুবিমল বলল, 'দু'জনে মানে ?'

নীলকমলবাবু বললেন, 'না মশাই আপনি আমার চাকরি না খেয়ে ছাড়বেন না। অফিস

আদালতে দেয়ালের কান থাকে তা জানেন?'

সুবিমল আর কোন কথা বলল না।

নীলকমলবাবুর চাকরি মোটেই গেল না বরং দু'তিন দিন সরসীরই কোন সাড়া মিলল না অফিসে। সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি গম্ভীর মুখে বললেন, 'সর্দিজ্বর হয়েছে মিস দত্তের। ছুটির দরখাস্ত করে পাঠিয়েছেন। বোধ হয় সপ্তাহ খানেকের বেশি দেরি হবে না।'

কিন্তু সপ্তাহ খানেকেও লাগে না। চার দিনের দিন সরসী এসে হাজির হল অফিসে। কেমন একটা তীক্ষ্ণ অদ্ভুত ভাব চোখে-মুখে। যেন দিন কয়েক আগে একটা ঝড়ের ঝাপটা চলে গেছে তার ওপর দিয়ে।

জিজ্ঞাসা করবার দরকার ছিল না, তবু জিজ্ঞাসা করল সুবিমল, 'কি অসুখ হয়েছিল সরসী?'

সরসী মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'কি আবার হবে!'

দিন কয়েক পরেই কিন্তু সরসীর সেই বিমর্ষ ভাব কেটে যেতে শুরু করল। চোখ-মুখের পরিবর্তন ঘটল সরসীর, রঙ ফিরল। দেখা গেল, বেশবাসেও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। সাধারণ মিলের শাড়ির বদলে তাঁতের শাড়ি, মিহি সস্তা ছিটের ব্লাউজের বদলে নামী আর্গাণ্ডী, কান গলাও আর খালি নেই। হালফ্যাসনের শূন্যগর্ভ, সুগোল রীং দুলছে কানে, চিকচিক করছে সরু স্বর্ণসূত্র; ডান হাতের অনামিকা, কনিষ্ঠায় দু' রঙের পাথর বসানো দু'টি আংটি। একটি নীল আর একটি রক্তবর্ণ।

সুবিমল মনে মনে ভাবল আংটির পাথরের নামগুলি একবার জিজ্ঞাসা করে নেয় সরসীর কাছ থেকে, কিন্তু ফুরসত পেল না। সরসী তাকে সব সময় এড়িয়ে চলে। কামরার ভিতর থেকে বড় একটা বেরোয় না। বেয়ারা ছাড়া কোন বাবুর ঢুকবার হুকুম নেই তার কামরায়।

মনে পড়ল, একবার মাইনে পেয়ে সরসীকে একখানা বিশ-পঁচিশ টাকা দামের তাঁতের শাড়ি কিনে দিতে চেয়েছিল সুবিমল, সরসী কিছুতেই নেয়নি, বলেছিল, 'তোমার কাছ থেকে বই আর ফুল পেতেই সব চেয়ে ভালো লাগে। ওসব দেওয়ার সময় আসুক তখন দিয়ো। জানো না ত' আমাদের বাড়ির হাবভাব। একখানা শাড়ি দেখলে হাজার রকম প্রশ্ন উঠবে।'

আজকাল সরসীদের বাড়িতে যত প্রশ্ন ওঠে তার সংখ্যাটা একবার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে সরসীকে। সে সব প্রশ্নের কি জবাব দেয় সরসী? কিম্বা কোন প্রশ্নই বোধ হয় আজকাল আর ওঠে না।

সরসীদের বাড়ি সম্বন্ধে সব চেয়ে শেষ সংবাদ যা পাওয়া গেল, তাতে আর কোন সংশয় রইল না সুবিমলের। সরসীর দিদি অতসীর স্বামীর সঙ্গে অবনিবনাও-এর কারণ শোনা গেল। বিয়ের ছ'মাস বাদেই অতসীর স্বামী ছেলের বাবা হতে অরাজী হয়েছেন। কিন্তু তাতে বিশেষ কোন অসুবিধা হয়নি অতসীদের। পাড়ার ছেলেরা পিছিয়ে গেলেও বিপত্নীক দু'একজন প্রৌঢ় সাদা সিঁথির চাইতে তার রাঙা সিঁথিই পছন্দ করেছেন।

এরপর ও-অফিসে থাকবার আর প্রয়োজন ছিল না সুবিমলের। কিন্তু ছাড়ব বললেই ত' আর ছাড়া যায় না, সুযোগ-সুবিধা জোটা চাই। বাড়িতে অসুখ-বিসুখ আর অভাব-অনটন লেগেই আছে। কিন্তু কেবল কি তাই? আরো কি কারণ ছিল না? আরো কি কোন ইচ্ছা ছিল না সুবিমলের। কৌতূহল ছিল না নাটকের পঞ্চমাঙ্ক পর্যন্ত চাক্ষুষ দেখবার?

পঞ্চমাঙ্কে পৌঁছতে খুব বেশি দেরি হল না। ছ'মাসের স্পেশাল ইনক্রিমেণ্টটা সরসী ঠিকই পেল। গোলমাল বাঁধল এ্যানুয়াল ইনক্রিমেণ্টের আগে আগে। শোনা গেল নবনী চ্যাটার্জীর বিয়ে। হকচকিয়ে উঠল সমস্ত অফিসে। বিয়ে? কার সঙ্গে? না, সরসী দত্তের সঙ্গে নয়। দক্ষিণ কলকাতার প্রখ্যাত ব্যাঙ্কার দুহিতা মমতা মুখার্জীর নামটাই বরং বেশি শোনা যেতে লাগল। মুখার্জীদেরও চ্যাটার্জীদের মত নানা ব্যবসা আছে, ইন্‌সিওরেন্স আছে, ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী আছে, তা ছাড়াও আর একটা বাড়তি জিনিস আছে, সংবাদপত্র। তাই শেষে প্রজাপতিমার্কা পরিণয়পত্রের মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল। নবনীবাবুর খুব বেশি মত ছিল না কিন্তু তাঁর দাদা অবনী চ্যাটার্জী বিশেষভাবে ধরে পড়লেন। নবনীবাবুর চাইতে ব্যবসা তিনি অনেক বেশি ভালো বোঝেন। ইদানীং চোখ পড়েছে রাজনীতির দিকে। একখানা মুখপত্র না থাকলে মুখ থাকে না।

আরো দিন কয়েক বাদে শোনা গেল নবনীবাবু রাজী হয়েছেন। ক'নে দেখে খুশি হয়েছেন তিনি।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসব কথা কানে যেতে লাগল সুবিমলের, সেই সঙ্গে চোখে পড়তে লাগল সরসীর বিচিত্র ভাব পরিবর্তন, রূপ পরিবর্তন। সে রূপ কখনো উগ্র, কখনো নিষ্প্রভ ; সে মুখ কখনো দীপ্ত, কখনো ম্লান।

তারপর একদিন সরসীকে অফিসে দেখা গেল না। এবারো কি ছুটি নিল নাকি সরসী ? না, এবার আর ছুটি নয়। সেক্রেটারী তাঁর শান্ত, গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করলেন, 'তিনি রিজাইন করেছেন।'

সবাই আর একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। কিন্তু সরসীর আসার সময় যতখানি আলোড়ন উঠেছিল, যাওয়ার সময় তেমন উঠল না। অফিসের ডিসিপ্লিন সম্বন্ধে জেনারেল ম্যানেজারের নতুন সার্কুলার বেরিয়েছিল দিন কয়েক আগে। নতুন টাইপিস্ট পরদিনই এসে হাজির হল। এবার আর মেয়ে নয়, পুরুষ. মেয়ে টাইপিস্টে মেলা ঝামেলা।

এই ত' সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত, পার্থিব পরিণতি. তবু কেন যেন মনটা ভারী ফাঁকা ফাঁকা লাগল সুবিমলের। আর কিছু দেখবার নেই। এবার অন্যত্র চলে যেতে পারে সুবিমল। আরো গোটাকয়েক অফিসে চাকরির জন্য দরখাস্ত করেছিল। কোন জায়গা থেকে একটা আশা এলে বাঁচে। দিনে দু'বার করে ডেসপ্যাচে খোঁজ নিতে লাগল, তার নামে কোন চিঠিপত্র এসেছে নাকি। ইনটারভিউ দেওয়া ছিল দু'একটি অফিসে। হাঁ, না, জবাব আসবার সময় হয়েছে।

তৃতীয় দিনে ডেস্‌প্যাচার নীলকমলবাবু নিজে হাতে করে নিয়ে এলেন তার ডাক। চিঠি এসেছে সুবিমলের। একখানা ইনসিওরেন্স প্রিমিয়মের নোটিশ, আর একখানা সাধারণ চিঠি। সাদা খামের ওপর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা তার নাম। লেখা দেখেই বুঝতে পারল সুবিমল কোন অফিসের ইনটারভিউর ক... ' নীলকমলবাবু মুচকি হেসে নিজের সিটে গিয়ে বসলেন। আর সমস্ত মুখ অপমানে লাল হয়ে উঠল সুবিমলের। এত স্পর্ধা সরসীর, এখনো তাকে চিঠি লিখতে সাহস পায় ! এত কাণ্ড এত কেলেঙ্কারীর পরও সুবিমলকে তার চিঠি লিখতে সঙ্কোচ হয় না। সরসীর মত মেয়েদের পক্ষে বোধ হয় কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু রাগ, ঘৃণার সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলও বোধ করল সুবিমল। কী তাকে লিখবার আছে সরসীর, এখনো কী সে তাকে লিখতে পারে ?

একটানে খামের একটা দিক ছিঁড়ে ফেলল সুবিমল। চিঠির কাগজের খানিকটাও সেই সঙ্গে ছিঁড়ে গেল। চিঠির অবশ্য তাতে কোন ক্ষতি হল না। ঠিকানা, তারিখের বালাই নেই, নেই কোন রকম সম্বোধন। সাদা কাগজের অনেকখানি জায়গা ছেড়ে দিয়ে আছে মাত্র দু'টি লাইন—'দরকারী কথা আছে তোমার সঙ্গে। ফরডাইস লেনের রেস্টুরেন্টেই কথা বলবার সুবিধা হবে। তোমার জন্য অপেক্ষা করব।'

সরসীর স্পর্ধায় আরো অবাক হয়ে গেল সুবিমল, আরো অপমানিত বোধ করল। একটা অদ্ভুত হিংস্র অস্বস্তি সারাদিন অফিসের কাজকর্মের মধ্যে বিঁধতে লাগল তাকে—অপেক্ষা করব ! যুগের পর যুগ, জন্মের পর জন্ম অপেক্ষা ক'রে থাকুক সরসী, ওদিক আর মাড়াবে না সুবিমল। সরসী কি মনে করেছে তাকে ! কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সাড়ে পাঁচটা বাজতে-না বাজতেই সুবিমল অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে। ঘৃণা, বিদ্বেষ, প্রতিশোধের স্পৃহা সব কিছু ছাপিয়ে এবারও কৌতূহল বড় হয়ে উঠেছে তার। নিতান্তই কৌতূহল। এত সব সত্ত্বেও কী তাকে বলবার থাকতে পারে সরসীর ? কোন রকম আঘাত, সরসীকে কোন রকম অপমান করবার ইচ্ছা পর্যন্ত সুবিমল বোধ করল না। আঘাত করা যায় কার ওপর ? যার সম্বন্ধে সামান্য মমতা, সামান্য দুর্বলতাও অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু সরসী সম্বন্ধে সুবিমল আজ সম্পূর্ণ নির্মম, সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। নিতান্ত বস্তুগত কৌতূহল ছাড়া আর কিছু নেই তার মনে। নিজের চোখে দেখতে ভারী ইচ্ছা সুবিমলের এসব সময় সরসীর মত মেয়েরা কী বলে, কি রকম ক'রে বলে। প্রেমের অভিজ্ঞতা যখন হলই, এটুকু দেখাশোনাই বা বাকী থাকে কেন ?

ছটা বেজে মিনিট দশেক হয়েছে, সুবিমল কাটা দরজা ঠেলে এই কেবিনে এসে ঢুকল। দেখল সরসী আগেই এসে রয়েছে, আপনি যে চেয়ারটায় বসেছেন এই চেয়ারটায়।' পরিতোষবাবু একটু

থামলেন। বোধ হয় একটু অপেক্ষা ক'রে দেখলেন আমি কোন সংশয়মূলক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি কিনা। কিন্তু আমি চুপ করে রইলুম। পবিতোষবাবু বললেন, 'চেয়ারটা সুবিমলই একদিন চা খেতে এসে আমাকে দেখিয়েছিল। সরসী ঠিক সময়েই এসেছে, হয়তো বা কিছু আগেই, সরসী চিরদিনই পাংচুয়েল, অফিসেও কোন দিন লেট হয়নি। সুবিমল লক্ষ্য করল সরসীর বেশে-বাসে ইনক্রিমেন্ট-পরবর্তী দিনগুলির জাঁকজমক আর নেই। কিন্তু তাই বলে অতি সাধারণ নিরাভরণতাও চোখে পড়ল না। হাতের আংটিগুলি খসিয়ে রেখেছে, কিন্তু কান আর গলা শূন্য নয়। শাড়ি, ব্লাউজও মাঝামাঝি ধরনের—খুব চড়া পারিপাট্য কিছু নেই, কিন্তু আগেকার দিনের মত একেবারে আটপৌরেও নয়।

এক কাপ চা সামনে ক'রে সরসী বসেছিল। সুবিমল দেখেই বুঝতে পারল সে চায়ে মুখ ছোঁয়ায়নি সরসী, আর সে চা অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

সুবিমল বলল, 'দু'কাপ চায়ের কথাই বলি। কিছু না নিলে এরা এখানে বসে গল্প করতে দেবে কেন?' সরসী একবার নিজের চায়ের কাপের দিকে তাকাল তারপর মৃদু স্বাভাবিক স্বরে বলল, 'মিছামিছি দু'কাপের কি দরকার?'

সুবিমল অদ্ভুত একটু হাসল, 'যে কাপ আছে তা কি মুখে দেওয়া চলবে? নাকি আজও একজন খাবে, আর একজনের সাধ যাবে চেয়ে চেয়ে দেখবার। তার চেয়ে দু'কাপই নেওয়া যাক, দামটা আলাদা দিলেই হবে?'

সরসী এ খোঁচার কোন জবাব দিল না, একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'আমি খুব একটা দরকারী কথার জন্য তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। এই রেস্টুরেন্টটা পাড়ার কাছাকাছি, তাছাড়া এদের সঙ্গে অনেকদিনের জানাশোনাও আছে। বেশ নিরাপদ ভদ্র জায়গা বলেই এখানে আসতে বলেছি তোমাকে। কথাগুলি খুব কাজের।'

সুবিমল হাসল, 'ভালোই ত'। অকেজো কথাগুলি বাদ দিচ্ছি, দরকারী কাজের কথাগুলিই শুনি।'

সরসী তবু একটু চুপ করে রইল, খানিক যেন কি একটু ইতস্ততঃ করল তারপর বলল, 'চাকরি-বাকরি ত' সব গেল, কি করা যায় তাই এখন ভাবছি।

সুবিমল ভাবল জিজ্ঞেস করে, কেন গেল চাকরি, কিন্তু ভদ্রতায় বাধল। নিস্পৃহভাবে বলল, 'ওরকম চাকরি-বাকরির অভাব কি? কাজ যখন জানা, খবরের কাগজের কর্মখালি দেখে দেখে দরখাস্ত ছেড়ে দিলেই পাবো।'

সরসী মাথা নাড়ল, 'না, চাকরি-বাকরির মধ্যে যাওয়ার আর ইচ্ছা নেই। আচ্ছা, কোন ব্যবসা-ট্যাবসা করলে হয় না?'

সুবিমল এবার একটু অবাক হল বলল 'ব্যবসা?'

সরসী বলল, 'হ্যাঁ। তুমি ত' নানা কনসার্নে কাজ-টাজ করেছ, নানারকম অভিজ্ঞতাও আছে। কি রকম ব্যবসা করলে এখন সুবিধা হতে পারে?'

সুবিমল একটু হাসল, 'ব্যবসায়ীদের কাছে এযাবৎ চাকরিই করেছি, ব্যবসা ত' কোন দিন করে দেখিনি। বরং তাদের কারো কারো সঙ্গে তুমিই ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছ, ব্যবসাবুদ্ধিটা ত' তোমারই বেশি থাকার কথা।'

সরসী এ-কথারও কোন জবাব দিল না। আরক্ত মুখে একটু কাল চুপ করে থেকে বলল, 'না ব্যবসাবুদ্ধি কিছু হয়নি, একেক বার একেক রকম কথা মাথায় আসছে। একবার ভাবছি স্টেশনারী দোকানের কথা আর একবার—। তোমরা পুরুষ মানুষ, শত হলেও এসব ব্যাপারে তোমাদের অভিজ্ঞতা বেশি। তাছাড়া ভালো একজন পার্টনার না হলে কোন ব্যবসাই আমি একা চালাতে পারব না—'

সুবিমল ভারী কৌতুক বোধ করল, 'আমাকে কি তা'হলে তোমার পার্টনার খুঁজে দেওয়ার জন্য ডেকেছো।'

সরসী ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না, না, খুঁজে দেওয়ার জন্য ডাকিনি।

সুবিমল বলল, 'তবে ?'

সবসী বলল, 'দযা কবে তুমি নিজেই যদি হও, খুব ভালো হয। আমাব চেযে তোমাব অনেক বেশি জানাশোনা, অনেক বেশি অভিজ্ঞতা আছে।'

সুবিমল হাসল, 'তা না হয আছে। কিন্তু তাবপব ? বিজনেসেব পার্টনাব হিসাবে আমি কি খুব উপযোগী হব ?'

সবসী এবাব চোখ তুলে তাকাল, 'উপযোগী না হবাবই বা কি আছে ? হিসাবপত্র ত' সব তোমাব কাছেই থাকবে। আব এ ত' কোন বকম অদেখা, আন্দাজী জিনিসেব হিসাব নয, স্পষ্ট টাকাকড়িব হিসাব। সামান্য লেখাপড়া জানা মেযেমানুষ হযে তোমাকে টাকা পযসাব ব্যাপাবে ঠকাতে পাবব না, সে চেষ্টাও কবব না।'

সুবিমল মুহূর্তেব জন্য নির্বাক হযে বইল। বন্ধুমহলে বাকচতুব বলে খ্যাতি আছে সুবিমলেব। কেউ কোন কিছু বলবাব আগে তাব জবাব যেন সুবিমলেব জিবেব আগায এসে থাকে। কেউ তাকে এক সেকেণ্ডেব জন্যও নিরুত্তব কবতে পাবে না কিন্তু সেই মুহূর্তে সবসীর কথাব জবাব যেন খুঁজে পেল না সুবিমল। এমন সপ্রতিভতা সবসীব সে কোনোদিনই দেখেনি। জেনাবেল ম্যানেজাবেব সঙ্গে চবম ঘনিষ্ঠতাব পব সবসীব যখন সব বকম চক্ষুলজ্জা কেটে গেছে, তখনো কোন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেব সবাসবি জবাব সবসী তাকে দিতে পাবেনি। বাব বাব এড়িযে গেছে। চোখেব দিকে চোখ তুলে তাকাতে পাবেনি। কিন্তু কিছুদিনেব মধ্যে বোধ হয খুব সেযানা হযে পড়েছে সবসী

একটু চুপ কবে থেকে সুবিমল আবাব হাসল বলল 'আচ্ছা, তাও নয মেনে নেওযা গেল ধবা যাক তোমাব সঙ্গে পার্টনাবশিপে বাজীই আছি আমি। কিন্তু বিজনেস ত কেবল পার্টনাব পেলেই হয না, টাকাব [illegible]। টাকা কোথায ?' কৌতুকে যেন আব একবাব উছলে উঠল সুবিমল।

কিন্তু সবসী মৃদুস্ববে বলল 'টাকা আছে।'

'আছে ?'

সবসী বলল হ্যাঁ, সেই টাকা নিযেই ত বিপদে পড়ে গেছি কি কবব ভেবে পাচ্ছি না।'

কেমন যেন কাতব আব ব্যাকুল শোনাল সবসীব গলা

সুবিমল হেসে মাথা নাড়ল যেন কানেব ভিতব থেকে, মনেব ভিতব থেকে, সেই অবিশ্বাস্য, অদ্ভুত করুণ সুবটুকু ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা কবল। সুবিমল হেসে বলল 'বলো কি, টাকা নিযে বিপদ আমাদেব ত টাকা নেই বলে বিপদ সবসী। কত টাকা আছে তোমাব ? কত টাকা নিযে বিপদে পড়েছ'

সবসী একটু যেন চমকে উঠল বহুদিন পবে নিজেব নামটা সুবিমলেব মুখে শুনল বলেই সেই চমকানিটা এল কিনা কে জানে। তাবপব মৃদুস্ববে বলল, অনেক, অনেক ' বলতে বলতে ব্লাউজেব ভিতব থেকে একখানা ভাঁজ কবা শক্ত কাগজ বেব কবে আনল সবসী, বলল, এই নাও'

সুবিমল অবাক হযে বলল, 'কি ওটা ?'

সবসী বলল খুলে দেখ।'

সুবিমলেব কৌতূহল এখনও প্রবল। কিন্তু ভাঁজ কবা কাগজখানা খুলে ফেলাব সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময প্রবলতব হল, বলল, একি, এ যে চেক'

সবসী কোন কথা বলল না। সুবিমলও না। কাবণ ততক্ষণে সম্পূর্ণ চেকটি সে দেখে ফেলেছে। সবসী দত্তেব নামে লযেডস ব্যাঙ্কেব ওপব দশ হাজাব টাকাব চেক কেটেছেন নবনী চ্যাটার্জী। বিস্মযেব ঘোব কাটলে খুঁটে খুঁটে আব একবাব দেখল সুবিমল চেকখানা। সন, তাবিখ ক্রসিং সইযে নির্ভুল, বিশুদ্ধ চেক। পাসন্যাল এ্যাকাউন্ট থেকে এই সইযে নবনীবাবুকে অনেকবাব টাকা তুলতে দেখেছে সুবিমল।

একটু চুপ কবে থেকে সামলে নিযে সুবিমল বলল, 'ভালোই তো, অনেক টাকাব মালিক হযেছ দেখা যাচ্ছে।'

সবসী বলল, 'না না, কেবল আমি নই, আমি নই।'

'তুমি নও মানে'

হঠাৎ কি রকম মনে হল সুবিমলের। তাড়াতাড়ি উল্টে দেখল চেকটা। পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে সরসী সুবিমলের নামটা সেখানে এনডোর্স করে রেখেছে।

চেকসুদ্ধ হাতখানা একেবারে কেঁপে উঠল সুবিমলের। দশ হাজার টাকা! দেড়শ টাকার মাইনের কেরানী সুবিমল। মাস অন্তে পাঁচটা টাকা হাতে থাকে না, বরং বন্ধুবান্ধবের কাছে পাঁচ দশ করে ধার থাকে। ঘৃণার আগে অদ্ভুত একটা ভয়ে অভিভূত হয়ে রইল মন। তারপর খালি-হওয়া চায়ের কাপ দিয়ে চেকখানা চেপে রাখল টেবিলের ওপর। একটু বাদে বলল, 'কিন্তু এ চেক তুমি আমাকে কেন দিলে? আমি কেন নিতে যাব?

সরসী মুখ নিচু করে বলল 'দিইনি তো। ব্যবসার জন্য ভাঙাতে দিয়েছি। তারপর দু'জনে মিলে

কথাটা সরসী শেষ করল না। কিন্তু 'দু'জনে মিলে' কথাটুকু সুবিমলের কানে গিয়ে বিঁধল। কথাটা আজ যত বেশি অর্থবান তত বেশি নিরর্থক।

হঠাৎ ঘৃণায় শরশির করে উঠল সুবিমলের সর্বাঙ্গ। বলল, 'কিন্তু এত টাকা কি করে পেলে তুমি?'

'এ চেক যে দেখবে সেই এ কথা জিজ্ঞাসা করবে। বুঝতে পেরেও বার বার জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু তোমার কাছে তো কিছু গোপন নেই, তুমি তো সব জানো। তোমার কাছে লজ্জা সঙ্কোচের তো কোন বালাই নেই আর।'

সরসীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠল বলে মনে হল। একটা বিষাক্ত তীর গিয়ে যেন বিঁধল তার বুকে। অত্যন্ত জানা ঘটনা তবু যেন নতুন ক'রে না জানালেই ভালো করত সরসী, ভালো করত নিজের মুখে না বললে, ভালো হত তার লজ্জা সঙ্কোচের অন্ততঃ সামান্য কিছু অবশিষ্ট থাকলে।

কিন্তু সুবিমলও যেন এবার মরিয়া হয়ে উঠল, 'তবু এত টাকা? সাধারণ একটি মেয়ের জন্য—'

চোখ দুটো এবার যেন জ্বলে উঠল সরসীর 'সাধারণ যে নই তার প্রমাণ ত ওই চেকেই আছে। সাধারণ যে নই তার প্রমাণ তোমার সঙ্গে ফের দেখা করতে পেরেছি।'

সুবিমল বলল, 'হ্যাঁ অন্তত এ ব্যাপারে তোমার অসাধারণত্ব স্বীকার করতে হয়।'

সরসী বলতে লাগল, 'না, কেবল এ ব্যাপারে নয়। ছেলেবেলা থেকেই মনে মনে ভাবতাম—পাড়ার সাধারণ মেয়েদের মত হব না, অন্য রকম হব। অনেক দূর অবধি পড়ব, অনেক বড় চাকরি করব। কিছুতেই দিদির মত হব না, দিদির মত ঠকব না। প্রথম প্রথম ভারি হিংসা হত দিদিকে, আমার চেয়ে সবাইর কাছে ঢের বেশি তার আদর। খুব হিংসা করতাম তাকে। তারপর বড় হয়ে দেখলাম সে বোকা। যত বেশি সুন্দর, তত বেশি বোকা। তার বোকামির সুযোগে আমাদের এক আত্মীয় ঠকিয়ে গেল।'

সুবিমল বাধা দিয়ে বলল, ও সব কথা থাক সরসী।

সরসী বলে চলল 'অনেক টাকা, অনেক গয়না-গাঁটি ঘুষ নিয়ে ঠকালেন জামাইবাবু। প্রথমে বললেন ওসব তিনি মাইণ্ড করেন না। কিন্তু ছেলে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গয়না গাঁটি কেড়ে রেখে তাড়িয়ে দিলেন।'

সুবিমল আবার বলল, 'ওসব থাক। ওসব কথার সঙ্গে আমাদের কি সম্পর্ক?'

সরসী বলল, 'কিন্তু আমার সম্পর্ক আছে। ভাবলুম দিদির মত হব না, দিদির মত ঠকব না। বাবা মা চিন্তায় পড়ে গেলেন। আমি জোর করে স্কুলে পড়ি, বাইরে বেরোই। বাবা বিয়ে দিয়ে আপদ চুকাবার কথা ভাবলেন। কিন্তু বিয়ে কি সহজে হয়! দিদির কথা কে না জানে? বিয়ে হল না। তার চেয়েও বড় ভাবনা হল, দিন কি করে চলবে। বললুম, আমাকে ছেড়ে দাও বাবা। দিদির দশা ত' চোখের ওপর দেখছি। তার মত বোকামি আমি করব না। বেরোতে দিতে হল। ঘেঁষতে চাইলে অনেকে, দিদির যারা চেয়েছিল। এড়িয়ে গেলাম, রুখে দাঁড়ালাম, ভান করলাম অভদ্রতার। কিন্তু সবাইকেই কি এড়ানো যায়?'

সুবিমল আবার বলল, 'ওসব থাক সরসী।'

সরসী বলতে লাগল, 'না এড়াতে পেরে খুব কাঁদলাম। কিন্তু সে যেন সাধ করে কান্না। তেমন

যেন দুঃখ নেই। ঠকলাম কি জিতলাম, ভেবে পেলাম না। ঠকা-জেতা দুই-ই যেন সমান। বাবা বললেন, অত কি ভাবছিস ? বললুম, অফিসের ভাবনা। মা বললেন, শরীর খারাপ হচ্ছে কেন ? বললুম, অফিসের খাটুনি। কিন্তু দিদির চোখে ধরা পড়ে গেলুম। দিদি বলল, অত খুশি-আহ্লাদ কিসের তোর। তুই তো মরেছিস আমার মত। বললুম, না দিদি, মরলেও তোমার মত মরিনি, তোমার মত মরব না। কিন্তু মরতে হল —না না সে মরণ নয়, অপমৃত্যু। কেবল দিদি নয়, বাবা মা সবাই টের পেলেন। বললেন, এ সব কি ?' বললাম চুপ করো, এও চাকরি।'

সুবিমল আবার বলল 'ওসব কথার তো আজ কোন প্রয়োজন নেই সরসী।'

সরসী বলল, 'আচ্ছা তা'হলে প্রয়োজনের কথাই হোক চেকের কথাই শোন। অত টাকা পেলাম কি করে তাইতো জিজ্ঞেস করছিলে ' সহজে পাইনি সাধারণ মেয়ে হয়ে পাইনি, দিনের পর দিন দর কষাকষি করেছি। চ্যাটার্জী দু হাজার থেকে শুরু করেছিলেন। কিন্তু আইন-আদালত, মমতা মুখার্জী তাদের নববঙ্গ পত্রিকা, এ্যাসেম্বলীতে অবনীবাবুর মেম্বারশিপ সব মিলিয়ে তো দু হাজার হতে পারে না। অনেক বেশি। আমি দয়া করে দশে রাজি হয়েছি চ্যাটার্জী সার্টিফিকেট দিয়েছেন, আমি সাধারণ মেয়ে নই জীবনে কাউকে এত খেসারৎ তিনি দেননি '

সুবিমল হাসল, 'কিন্তু ফলস চেক ও তো দিতে পারেন।'

সরসী ঘাড় নাড়ল, না, তা পারে না। উকিলের কাছে পরামর্শ নিয়েছি। তার জন্যে মামলা মোকদ্দমা চলে। দশ হাজার টাকা পাওয়ার জন্যে না হয় উকিল মোক্তারের পিছনে কিছু খরচই করলাম আমরা। পাটনার হওয়ার আগে না হয় মোকদ্দমার তদ্বিরই তুমি করলে কিছুদিন। কিন্তু তার দরকার হবে না এ চেক জেনুইন।'

সুবিমল বলল, তা হবে। কিন্তু এত লোক থাকতে আমাকে কেন ?'

সরসী বলল আর কে আছে ? বাবা ? তাঁকে এসব জটিল ব্যাপারে— তাছাড়া তিনি রুগ্ন বুড়ো মানুষ —

সুবিমলের কান দুটো লাল হয়ে উঠল 'ছিঃ। কিন্তু তোমার অন্য বন্ধুবান্ধব—'

সরসী বলল, 'কেউ নেই। যারা আছে তাদের বিশ্বাস নেই।'

সুবিমল বলল, কিন্তু আমাকেই বা তোমার এত বিশ্বাস কিসের ?'

সরসী একটু চুপ করে থেকে বলল 'দুনিয়ায় কাউকে না কাউকে বিশ্বাস তো করতেই হয়। না করে পারা যায় ? তাছাড়া তুমি যদি ঠকাও-ই আমার চেয়ে বেশি ঠকাতে তো আর পারবে না।' সরসী চোখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকাল।

মুহূর্তকাল দুজনেই চুপ করে রইল।

একটু বাদে সুবিমল বলল তা'হলে এবার আমি উঠি সরসী।'

সরসী ফিরে তাকিয়ে বলল কিন্তু চেকটা ?

সুবিমল বলল ও চেকটা ? ওটা কি আমাকেই নিতে হবে।'

সরসী বলল, 'হাঁ, দয়া করে ওটা তুমিই ভাঙাবার চেষ্টা করো।'

সুবিমল চায়ের কাপটা সরিয়ে ফেলে চেকখানা হাতে তুলে নিল, একবার বুঝি চেকসুদ্ধ কেঁপে উঠল সুবিমলের হাতখানা, কেঁপে উঠল সর্বাঙ্গ। কিন্তু পরক্ষণেই কাগজের ভাঁজে ভাঁজে চার খণ্ডে চেকটা ছিঁড়ে ফেলে টুকরোগুলি টেবিলের তলায় ছুঁড়ে দিল

পরিতোষবাবু থামলেন।

প্রশ্নটা ঠিক রসিকোচিত নয়, কিন্তু রসের চেয়ে তথ্যের তৃষ্ণাই আমার তখন প্রবল, তাই নিঃসন্দিগ্ধ হওয়ার জন্য একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর ?'

পরিতোষবাবু চটলেন না—হাসলেন, বললেন, 'তারপর আর কি ? সুবিমলের স্বজন-বন্ধুদের অনেকেই তাকে খুব কৃপণ মনে করে। কেউবা ভাবে অপদার্থ। অতগুলি টাকা ব্যাঙ্কে থাকা সত্ত্বেও লোকটা তেমন কিছু করতে পারল না চাল-চলনও তার ভালো হল না। তাদের বিশ্বাস সরসী যখন বউ হয়ে ঘরে এসেছে, হাজার দশেক টাকাও সুবিমলের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স বাড়িয়েছে। চ্যাটার্জীর কাছে

তো গল্পটা শুনেছে কেউ কেউ। সুবিমলেব কাছেও শুনেছে। কিন্তু সব গল্পই কি আব সবাইব কাছে সত্যি হয়?'

ভাদ্র ১৩৫৫

চড়াই উৎরাই

সকালেব ডাকে দুখানা চিঠিই একসঙ্গে পেলাম।

একসঙ্গে এলেও দুখানাব মধ্যে কোন বকম সাদৃশ্য ছিল না। একখানা এনভেলাপ, আবেকখানা সাধাবণ সবকাবী এনভেলপ নয়, কাঁঠালীচাঁপা বঙেব বড লেফাপা, বাঁ দিকে কোণাকুণিভাবে লেখা 'শুভবিবাহ'। সেইখানাই আগে খুলে দেখলুম। নিজেব ও-পাট শেষ হয়েছে অনেকদিন সেদিন নিমন্ত্রণেব বঙীন চিঠি আমিও স্বজনবন্ধুদেব পাঠিয়েছিলাম। প্রথম দু'এক বছব তাব এক আধখানা নিজেব ঘবেও ছিল। এখন আব খুঁজে পাওয়া যায় না। খোঁজেই বা কে। তবু এখনো যখন প্রজাপতি আঁকা হলদে কি গোলাপী বঙেব চিঠি মাঝে মাঝে পাই, বং যেন কেবল চিঠিব গায়েই লেগে থাকে না, মনেব মধ্যেও তাব ছোপ লাগতে চায়।

মনে মনে হাসলুম। কাব আবাব কপাল পুড়ল। লেফাপা খুলে বেব কবলাম গোলাপী বঙেব চিঠি। দু'চাব লাইন পডতেই বুঝতে পাবলাম, সব মনে পড়ে গেল, হাইকোর্টেব বিখ্যাত ব্যাবিস্টাব পবেশ মজুমদাবেব ছেলে অসিতেব বিয়ে। এ বিয়েব নিমন্ত্রণপত্র পাওয়াব কোন প্রত্যাশা ছিল না, কলেজে অসিতেব সঙ্গে পড়েছিলাম বছব কয়েক, সেই সূত্রে তখনকাব দিনে অল্পস্বল্প ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। তাবপব বহুকাল ছাড়াছাড়ি অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ ছিল না, কিন্তু সেদিন বাড়িওয়ালাব এক টাইটেল স্যুটেব মোকর্দমায় সাক্ষ্য দিতে গিয়ে ফেব দেখা হয়ে গেল। চিনবাব কথা নয়, তবু অসিত চিনে ফেলল।

'আবে কল্যাণ যে, এস এস।'

কাঁধে হাত দিয়ে বাব লাইব্রেবীতে তাব সীটে আমাকে টেনে নিয়ে গেল অসিত, সামনেব চেযাবে বসতে দিয়ে বলল, 'তাবপব খবব-টবব কি।

ঘব ভবা প্রবীণ নবীন ব্যাবিস্টাবেব দল। ইউবোপীয বেশ-বাস, কাবো মুখে পাইপ, কাবো সিগাবেট, অসিতও বছব তিনেক আগে বিলাত ঘুবে এসেছে। দীর্ঘাঙ্গ, সুপুরুষ, সাহেবী পোশাকে চমৎকাব মানিয়েছে তাকে, আধ-ময়লা খদ্দবেব পাঞ্জাবীতে যেন একটু মক্কেল মক্কেলই মনে হল নিজেকে। অসিতেব ঠিক বন্ধুশ্রেণীভুক্ত নিজেকে ভাবতে পাবলাম না।

কিন্তু কথাযবার্তায ব্যবহাবে অসিত ঠিক আগেব আমলটা ফিবিয়ে আনতে চেষ্টা কবল। সিগাবেট অফাব কবল, চা আনাল, তাবপব নিজেব পাইপে তামাক ভবতে ভবতে বলল, 'আঃ ভালো হয়ে ছড়িয়ে-টড়িয়ে বসো। অমন কুঁচকে বইলে কেন, কতকাল পবে দেখা হল বল দেখি, আছ কোথায়, কবছ কি?'

বললুম, 'বিশেষ কিছু না। তাব আগে তোমাব কথাই শুনি।'

অসিত হাসল, 'আমাবই বা এমন কি বিশেষত্ব। একেবাবে ব্রীফলেস নই। বাপেব দোহাইতে ব্রীফ কিছু কিছু আসে, ব্যস, ওই পর্যন্ত, এবাব তোমাব খবব কি বল।'

'খবব আব কি, এ অফিস থেকে ও অফিসে কেবানীগিবি ক'বে বেড়াচ্ছি। দু-এক বছব অন্তব

অন্তর বদলাচ্ছি অফিস।'

অসিত বলল, 'এহ বাহ্য, কাব্য সাহিত্যের খবরটবর বল শুনি। চর্চাটা এখনো রেখেছ তো।'

বললুম, 'হ্যাঁ, ভূতটা এখনো নামেনি ঘাড় থেকে।'

অসিত হাসল, 'সবাইর কাঁধ থেকেই যদি ও ভূত নামে তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকে নাকি, ভালো কথা মনে পড়ল, একটা কাজ ক'রে দাও দেখি আমার।'

'বল।'

অসিত বলল, 'বন্ধুদের তরফ থেকে বন্ধুর বিয়েতে একটা উপহার-টুপহার গোছের কিছু লিখে দাও দেখি, পদ্য নয়, পদ্য বড় সেকেলে হয়ে গেছে, একেলে মানুষের ভাষা গদ্য, গদ্যেই লেখ, কিন্তু বেশ নতুন রকমের হওয়া চাই।'

বললুম, 'ওসব উপহার-টুপহারের চলন তোমাদের মধ্যেও আছে নাকি?'

'আমাদের মধ্যে মানে?' অসিত হেসে উঠল, 'তুমি বুঝি আর আমাদের মধ্যে নও? না কি বিলাত ঘুরে এসেছি বলে একেবারে কেষ্টবিষ্টু হয়ে গেছি ভেবেছ? না বাবার একখানা বাড়ি আর দু'খানা গাড়ি আছে বলে বুর্জোয়া নাম দিয়ে বেদলে ঠেলছ আমাদের?' অসিত আবার একটু হাসল, 'ভুল করছ, আসল বুর্জোয়া ক্রোড়পতি ক্যাপিটালিস্টরা। আমরা কি হাতীর কাছে পিঁপড়ে, তোমরা আমরা বলো না। সব আমরা। সব সমান সবাই সেই ব্যাকুল চিত্ত মধ্যবিত্ত পিত্তপড়া পেট সেই' অসিত সশব্দে হাসল, 'এ ধরনের কবিতা আজকালও লেখ নাকি? সেই যে ফার্স্টইয়ারে থাকতে কলেজ ম্যাগাজিনে লিখেছিলে? মনে আছে?'

মনে ছিল না মনে পড়ল। লাইনটা অসিতের মনে আছে দেখে ভালোও লাগল খুব।

বেয়ারা ডেকে ক্লার্ককে খবর দিল অসিত। তারপর তার কাছ থেকে সাদা কাগজ একখানা চেয়ে নিয়ে আমার সামনে ঠেলে দিয়ে বলল, 'নাও' লেখ।'

বললুম, 'এখুনি?'

অসিত হেসে বলল, 'তবে কি একমাস বাদে? তোমাদের চালু কলম, ক' মিনিট আর লাগবে লিখতে। পাড়ার ক্লাবের বন্ধুরা ধরে পড়েছে। ভাগ্যক্রমে তোমাকে যখন পেয়ে গেলাম, তুমিই লিখে দাও। না হলে ওরা নিজেরা যা বিদ্যা ফলাবে তা আর কান পেতে শোনা যাবে না, নাম ধাম পরে বলছি। আগে ভিতরকার কথাটুকু চট ক'রে লিখে দাও দেখি।'

চট করে কোন জিনিস লেখার অভ্যাস নেই, তবু যা হোক দু'চার ছত্র কোন রকমে লিখে দিলাম।

পাইপে আস্তে আস্তে টান দিতে দিতে অসিত বলল, 'বাঃ, বেশ হয়েছে। এবার আন্দাজ করো দেখি এ ব্যাপারে আমার রোলটা কি।'

কথার ধরনে আন্দাজ করাটা শক্ত হল না, বললুম, 'বিয়ে করছ বুঝি?'

অসিত বলল, 'আঃ কোথায় একটু কাব্য টাব্য ক'রে বলবে, তা নয় একেবারে সরাসরি জেরা করছ, এসো কিন্তু, না এলে ভাবি দুঃখিত হব। যথা সময়ে পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণও করব, ত্রুটি মার্জনা করো।'

বড় লেফাফার মধ্যে দামী কাগজে সেই বড়লোক বন্ধুর বিয়ের ছাপান চিঠি, জবানী অবশ্য বন্ধুর নয় তার বাবার। কিন্তু এক কোণায় অসিত নিজেও এক লাইন লিখে দিয়েছে, 'অবশ্য, এসো। লৌকিকতার পরিবেতে লেখকের নিজস্ব রইয়ের সেট প্রার্থনীয়।'

ভারি ভালো লাগল বড় লোক বলে অসিত পুরনো সহপাঠীকে ভোলেনি। চাল-চলনে, কথা-বার্তায় সেই আগের দিনের ঘনিষ্ঠতাটুকু এখনো বজায় রেখেছে। 'বয়ে গেছে তিন দিন আগে, আজ ওদের সদানন্দ রোডের বাড়িতে প্রীতিভোজ। সময় বেঁধে দিয়েছে। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে আটটা।

এবার পোস্টকার্ডখানার দিকে তাকালাম। সম্বোধনটুকু দেখেই বুঝতে পারলাম এ চিঠির মালিক আমি নই, আমার স্ত্রী। তবু চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম। লিখেছে মল্লিকা। আমার পিসতুতো ভাইয়ের শালী। বিয়ের পর আরও একটু সম্পর্ক বেড়েছে। ইন্দিরার খুড়তুতো ভাইয়ের

সম্বন্ধী বিয়ে করেছে মল্লিকাকে। সেই সম্পর্কের জের টেনে মল্লিকা লিখেছে,'ভাই ইন্দুদি, কত কাল আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। মনেই হয় না এক শহরে আছি। সেদিন হাজরা রোডের মোড় থেকে দেখলাম আপনাদের। আপনারা ট্রামে যাচ্ছিলেন। খুব কথা বলছিলেন নিজেদের মধ্যে, তাই বাইরের দিকে তাকালেনই না। খুব ইচ্ছা করে নিজেই গিয়ে একবার দেখা সাক্ষাৎ ক'রে আসি। কিন্তু কি ক'রে যাব ভাই সময় পেয়ে উঠি না। ছেলেপুলে, সংসারের ঝামেলা, তা ছাড়া, উনিও এক মুহূর্ত সময় পান না। প্রেসের চাকরি। ছুটির দিনেও ওভার টাইমের জন্য বেরুতে হয়। নিজের শরীরও ভালো না। আবার সেই চোখের উপসর্গ বেড়েছে। ভালো কথা, মেডিকেল কলেজে আপনার একজন মামা আছেন না চোখের ডাক্তার? তিনি কি এখনো ঐ কলেজেই আছেন? কিভাবে তাঁকে ধরা যায়। দয়া ক'রে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন একবার? কল্যাণবাবু কেমন আছেন? তাঁকে আমার নমস্কার জানাবেন। আপনিও নেবেন। ইতি—মল্লিকা।—পুনশ্চ আমাদের মনোহরপুকুর রোডের বাসার নম্বর মনে আছে তো? চোদ্দ নম্বর। আপনি বলেন কি না, চেনা বাড়িতে চিঠি লেখা অসুবিধা। নম্বর ঠিক থাকে না।'

সাধারণ গতানুগতিক চিঠি। ইন্দিরাকে ডেকে হাতে দিলাম, তার সেখানা নিয়েও ইন্দিরা হাত বাড়াল বিয়ের চিঠিখানার দিকে। বলল, 'ওখানা বুঝি দেখতে পারি না?'

বললুম, 'পার, কিন্তু পেরে লাভ নেই। নিমন্ত্রণটা সবান্ধবে, সস্ত্রীক নয়।'

ইন্দিরা বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা। সবাই তো আর তোমার মত ভোজনানন্দ স্বামী নয়, যে, নেমন্তন্নের চিঠি দেখলেই জিভে জল আসবে?'

চিঠিটা আগাগোড়া একবার পড়ল ইন্দিরা, তারপর বলল, 'বাঃ কনের নামটি তো ভারি সুন্দর—শ্রীমতী রুচিরা। কিন্তু এও দেখছি কালীঘাট। ইচ্ছা করলে ফেরার পথে মল্লিকাদির সঙ্গে তো তুমি দেখা করেও আসতে পার। সদানন্দ রোড থেকে মনোহরপুকুর তো আর বেশি দূর নয়।'

বললুম, 'বরং কাছেই। আজই যে যেতে হবে তার কি মানে আছে। তেমন কিছু জরুরী খবর-টবর তো আর নেই। যাওয়া যাবে আর একদিন সুবিধা মত কিন্তু অসিতের বিয়েতে কি দেওয়া যায় বল দেখি।'

ইন্দিরা বস্তুবাদিনী, বলল, 'বড়লোকের বিয়েতে মানানসই কিছু কি আর দিতে পারবে। ফুল আর কবিতার বই দাও সেই ভালো। লেখক মানুষ, কোন দোষ থাকবে না। তা ছাড়া তোমার বন্ধুর নির্দেশ তো দেওয়াই আছে।

অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের বিয়েতে যেসব উপহারের জিনিস বাছাই করে ইন্দিরা, তার মধ্যে বই কি ফুলের নামগন্ধও থাকে না। একবার ভাবলুম ইন্দিরা নিজে নিমন্ত্রিত হয়নি বলেই বোধহয় আজ সস্তায় সারতে চাইছে। মনটা খানিকক্ষণ খুঁত খুঁত করতে লাগল। কিছুক্ষণ বাদে স্ত্রীর পরামর্শই অবশ্য নিখুঁত বলে মনে হল। মাসের শেষ। বই আর ফুলই ভালো।

সকাল সকাল অফিস থেকে বেরুলাম। খান তিনেক বই আছে নিজের। কিন্তু সেগুলি সংগ্রহ করা সহজসাধ্য নয়। কমপ্লিমেন্টারি কপি যতগুলি প্রাপ্য তার চাইতে আট দশ কপি বেশিই চেয়ে নিয়ে বিলিয়েছি। আরো চাইতে সংকোচ হল। খান দুই বই নগদ দামে কিনেই নিলাম অন্য দোকান থেকে। সেই সঙ্গে কিনলাম একখণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী আর ফুলের দোকান থেকে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। তারপর উঠে বসলাম বাসে।

যদিও বহুকাল যাতায়াত নেই, তবু বাড়ি চিনতে দেরি হোল না। দীপালী উৎসবের মতই আলোয় জ্বলছে অসিতদের সদানন্দ রোডের তেতলা বাড়ি। বহু দূর থেকে দেখা যাচ্ছে মোটরের সার। সদানন্দ রোডের এ মাথা থেকে ও মাথা গাড়িতে প্রায় ভরে গেছে। একখানা মোটর থেকে জনকয়েক সুদর্শন যুবক আর দুটি চারুদর্শনা মেয়ে নেমে এলেন। বাড়ির ভিতর থেকে কয়েকজন বেরিয়ে উঠে বসলেন আর একখানায়। গাড়িতে উঠবার সময় একটি সপ্তদশীর গাঢ় রক্ত বর্ণ দুটি দুল দুলে উঠল, সমস্ত আলো যেন কেন্দ্রীভূত হয়েছে সেই দুল দুটির মধ্যে।

'আরে তুমি যে, কখন এলে। যথাস্থানেই দাঁড়িয়েছ দেখছি।' অসিত পিছন থেকে এসে কাঁধে চাপড় দিল, মুখে মুচকি হাসি। সরু পেড়ে কোঁচান শান্তিপুরী ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবীতে চমৎকার

মানিয়েছে অসিতকে। বাড়ির ভিতর থেকে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বছরের আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে আসছিলেন, অসিত বলল, 'ইনি আমার বাবা, চিনতে পাচ্ছ ? আর আমার বন্ধু কল্যাণ। কলেজে পড়তুম একসঙ্গে। লেখেটেখে আজকাল। অনেকদিন আগে একবার এসেছিল। আপনার বোধ হয় মনে নেই।'

অসিতের বাবা মৃদু হাসলেন, 'নিজের ইনটিমেট ক্লাস ফ্রেণ্ডদের নাম আর মুখই আজকাল এক সঙ্গে মনে পড়ে না আর, তো তোমার সহপাঠী—'

অসিতও হাসল, 'কিন্তু বহুকালের পুরনো ক্লায়েন্টদের নাম তো আপনার কোনদিন ভুল হয না বাবা, চেহারাও বেশ মনে থাকে।'

পরেশবাবু কোন জবাব দিলেন না, মৃদু হেসে তাড়াতাড়ি সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন। আরো একখানা মোটর এসে দাঁড়াল। পরেশবাবুর এ ব্যস্ততা দেখে বোঝা গেল আগন্তুক বিশিষ্ট সম্মানিত অতিথি। কিন্তু অবাক লাগল পরেশবাবুর বেশবাসের ধবন দেখে। পবনে খাটো ধুতি, গায়ে হাতকাটা ফতুয়া, পায়ে সাধাবণ চটি। কিছুমাত্র বিদেশীয়ানা নেই। স্বাধীন হয়ে বেশবাসে আচারে আচরণে আমরা তাহলে সত্যিই স্বদেশী হলাম এতদিনে। ভারি খুশি হল মন। বিলাতফেরৎদের সঙ্গে তাহলে আমাদের সাত সমুদ্র তেব নদীর ব্যবধান এতদিনে ঘুচল।

অসিত সঙ্গে ক'রে আমাকে তাদের বৈঠকখানা গোছের একটা ঘরে নিয়ে বসতে দিয়ে বলল, 'একটু অপেক্ষা করো ভাই আসছি ওপব থেকে, আরো বন্ধুরা আছেন ওখানে। একটু খোঁজখবর নিযে আসি।'

ঘবখানা জনবিরল। ঘরের ভিতর দিয়ে লোকজন দলে দলে যাতায়াত করছে মাঝে মাঝে। হঠাৎ মনে পড়ল বইগুলিতে নাম লিখে আনা হয়নি। এই ফাঁকে লিখে ফেলা যাক।

লিখতে শুরু করেছি এক ভদ্রলোক এসে বললেন, 'এই যে, আপনি বসে বসে কি করছেন এখানে ? চলুন, চলুন, ওদিককার প্যাণ্ডেলে চলুন। সবাই গেছেন ওখানে।'

চেয়ে দেখি অসিতদের সেই ক্লার্কটি। প্রায় পরেশবাবুরই মত বযস। কিন্তু বেশবাসটা মোটেই পরেশবাবুর মত নয। পরনে মিহি ধুতি পাঞ্জাবী, পায়ে পালিশ করা শু, সোনাব বোতাম চিক চিক কবছে বুকে।

তিনি বললেন, 'চলুন।'

বিব্রত হয়ে বললুম, 'যাব ? কিন্তু এগুলি ?'

'ওগুলি কি। ও বই ?' ভদ্রলোক হাসলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা! এগুলির না হয একটা ব্যবস্থা করা যাবে।'

ইতিমধ্যে একদল বন্ধুব সঙ্গে অসিত নেমে এল দোতলা থেকে, আমাব দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর একটু বসো, এঁদের গাড়িতে তুলে দিয়ে এক্ষুনি আসছি।'

বেশি দেরী করল না অসিত। মিনিট কয়েক বাদে আরো পনের বিশ জন বন্ধুকে নিয়ে ঘরে এসে ঢুকল, তাবপব আমাব দিকে তাকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, এসো এবার।'

পিছনে পিছনে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। দোতলার বড় একখানা হল ঘরে ফুলশয্যার আসর বসেছে। ঘর তো নয়, গোটা একটা নার্সারী। দক্ষিণের দেয়ালটি চাল-চিত্রের মত সাজানো হয়েছে বিচিত্র ফুলে। তার নিচে চৌদোলায় সালঙ্কারা সুন্দরী বধূ। স্মিতমুখে স্বামীর বন্ধুদের উপহার গ্রহণ করছেন, নমস্কার বিনিময় হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। বাঁদিকে আরো কয়েকটি সুশ্রী তরুণী। বোধ হয় অসিতের বোনেরা, ভাগ্নী, ভাইঝিরা। একটি মেয়ে বউয়ের হাত থেকে উপহারগুলি নিয়ে এক পাশে জড়ো ক'রে বাখছেন আর একজন দাতা আর দানের নাম লিস্ট করছেন খাতায়। ডানদিকে কিউ ক'রে অসিতের বন্ধুশ্রেণী। আমিও দাঁড়িয়ে গেলুম।

স্ত্রীর সঙ্গে একে একে অসিত বন্ধুদের পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল। সুশীতল সেন, ব্যারিস্টার ; সমীরণ মুখোপাধ্যায়, এ্যাডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট ; সুদর্শন দাশগুপ্ত, জজ ; আরো বহু এ্যাডভোকেট, ব্যারিস্টার, মুনসেফ, উকিল, প্রফেসারদের পরে আমারও পালা এল।

অসিত বলল, 'কল্যাণ সেন। আমার লেখক বন্ধু।'

বইগুলি হাত থেকে নিতে নিতে অসিতের স্ত্রী আমার দিকে তাকালেন, তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'লেখক।'

অন্য কয়েকটি মেয়েও বিস্ময়ে, কৌতূহলে চাইলেন এদিকে।

অসিত মৃদু হেসে বলল, 'কেন, বিশ্বাস হচ্ছে না?'

রুচিরা লজ্জিত হাস্যে বললেন, 'বিশ্বাস না হবার কি আছে।'

অসিত হেসে আমার দিকে ফিরে তাকাল, 'যাক, এ যাত্রা উৎরে গেলে। ঠকে ঠকে আজকালকার পাঠক পাঠিকারা অনেক সেয়ানা হয়ে গেছে। বইয়ের নায়কের রূপ গুণের সঙ্গে তারা লেখককে মিলিয়ে দেখে না।'

অসিতের আর এক বন্ধু মন্তব্য করলেন, তাই বলে নিজেদের সঙ্গেও কি মেলাবার জো আছে? মেলাতে হয় রাঁধুনী, চাকর কুলী, মজুরদের সঙ্গে। লেখকেরা আরো সেয়ানা হয়েছেন আজকাল।' তিনি আরো কি বলতে যাচ্ছিলেন, বন্ধুদের আর একটি ছোট দল এসে দরজায় দাঁড়াল। পথ ছেড়ে দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম।

অসিত বাইরে এসে বলল, 'তারপর? চয়েস কেমন হয়েছে?'

বললুম, চয়েস? তবে যে শুনলুম লাভ ম্যারেজ?'

অসিত হেসে বলল, 'নাঃ, কেবল লিখতেই শিখেছ তাতে বুঝি আর চয়েসের বালাই নেই?'

ভোজের আয়োজন হয়েছে বাড়ির লাগা একটি খোলা জায়গায়। সামিয়ানা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে ওপরটা। ফ্যান আর ইলেক্‌ট্রিক বালবের নীচে অগুনতি চেয়ার। জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ব্যারিস্টার, এডভোকেট, মিঃ মজুমদারের ধনী মরোয়াড়ী মক্কেলদের ভিড়ে প্যাণ্ডেল ভরে গিয়েছে, অভ্যাগতদের অভ্যর্থনার ভারও দেখলাম গ্রহণ করেছেন একজন মারোয়াড়ীই তিনি ভাঙা বাঙলায় সবাইকে আপ্যায়ন জানাচ্ছেন। সিগারেটের কৌটা তুলে ধরছেন প্রত্যেকের কাছে। উর্দি পরা বেয়ারারা ট্রেতে ক'রে ভোজ্য, পানীয় বিতরণ ক'রে যাচ্ছে। ভোজ্য স্পেশাল প্রিপারেশনের আইসক্রীম, পানীয় এক কাপ কফি।

দৈবাৎ আমার দুই পাশে বসেছিলেন জন-দুই ম্যাজিস্ট্রেট আর জজ অসিতের বাবা তাঁর কোন একটি কুটুম্বের সঙ্গে তাঁদের যে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন তাতেই জানতে পারলুম তাঁদের পদস্থতার কথা। কিন্তু ট্রেতে ক'রে বেয়ারা যখন ভোজ্য পানীয় এগিয়ে নিয়ে এল, তিনজনের দু'জনই স্মিতমুখে ঘাড় নড়লেন। অসিতের বাবা সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'মাফ করতে হবে মিস্টার মজুমদার, বড্ড পেটের গোলমালে ভুগছি।'

তৃতীয় জন অনেক অনুরোধে এক কাপ কফি তুলে নিলেন। বেয়ারা বুঝি ভেবেছিল এঁদের সঙ্গে যখন বসেছি আমারও পেটের গোলমাল হওয়া স্বাভাবিক। তাই আমাকে ছাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, অসিতের বাবা দেখতে পেলেন, বেয়ারাকে ডেকে ধমক দিলেন, 'আঃ, একে দিচ্ছ না কেন? এঁকে দাও, এঁকে দাও', ধমক খেয়ে বেয়ারা ফিরে এসে ট্রে নিয়ে দাঁড়াল।

অসিতের বাবা বললেন, 'নিন, নিন। সংকোচ কিসের অত।'

নিলাম কিন্তু কেমন যেন একটু খিঁচ লাগল। একটু যেন বিরক্তির আভাস আছে মিঃ মজুমদারের গলায়।

শেষ করলুম আইসক্রীম। শেষ করলুম কফি। জজ ম্যাজিস্ট্রেটরা উঠে গেলেন। পাশে এসে বসলেন আর একজন আইন ব্যবসায়ী। তাঁর নেতৃত্ব কেবল বারেই নয়, রাজনীতিতেও। সভা-সমিতিতে বিশেষ যাই না বলে এতদিন সামনা-সামনি দেখিনি, কিন্তু কাগজে বহুবার ছবি দেখেছি।

মিঃ মজুমদার শশব্যস্তে এগিয়ে এসে বললেন, 'এলেন।'

শ্রীধরবাবু হাসলেন, 'আসব না ভেবে নেমন্তন্ন করেছিলে বুঝি?'

মিঃ মজুমদার হঠাৎ ভেবে পেলেন না কি জবাব দেবেন। এই সময়ে আর একটি বেয়ারা ট্রেতে ক'রে এগিয়ে নিয়ে এল ভোজ্য পানীয়।

শ্রীধরবাবু হেসে ঘাড় নাড়লেন।

মিঃ মজুমদাব বললেন, 'দয়া ক'রে একটা কিছু মুখে আপনাকে দিতেই হবে।'

শ্রীধববাবু হাসলেন। 'পাগল না ক্ষ্যাপা। আমি কোথাও কিছু মুখে দিই যে এখন দেব? দিতে হয় একটা সিগাবেট দাও।'

বেযাবা দাঁড়িযে ছিল। এবাবো আমাব দিকে চোখ পড়ল মিস্টাব মজুমদাবেব। তাবপব বেযাবাব দিকে তাকিযে বললেন · 'আঃ তাই বলে ওঁকে দিচ্ছ না কেন? ওঁকে দাও।'

আমি এবাব সজোবে ঘাড় নাড়লুম, 'আমি একবাব খেযেছি।'

মিস্টাব মজুমদাব বললেন, 'ওঃ, তা নিযেছেন-নিযেছেন, একবাব নিলে যে আব একবাব নেওযা যাবে না তাব কি মানে আছে। আপনাদেব বযসে'—মিস্টাব মজুমদাব একটু হাসলেন।

এবাব আমি উঠে দাঁড়ালুম। এই সমযে অসিত এসে উপস্থিত হল প্যাণ্ডেলে। হেঁট হযে পাযেব ধুলো নিতে গেল শ্রীধববাবুব—তিনি তাব হাত ধবে বাধা দিলেন। হেসে পিঠ চাপড়ে দিলেন একটু।

বললুম, 'অসিত, আমি চলি।'

অসিত বলল, 'ওঃ, আমি ভাই আবাব আটকে পড়েছিলাম বোঝই তো। আজ আব কেউ ছাড়তে চাইছে না। কিন্তু চলবে মানে? কিছু খেলে টেলে না।'

বললুম, 'না না, অনেক খেযেছি। এবাব—'

প্যাণ্ডেলেব দোব অবধি অসিত আমাব পিছনে পিছনে এল। এদিক ওদিক তাকিযে একবাব দেখল। কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই। অসিত আমাব কাঁধে হাত দিযে সহানুভূতিব স্ববে বলল, 'অনেক যে কি খেযেছো তা তো জানি। পেটই ভবল না তোমাব। কী যে সব সাহেবীপনা এদেব। দিব্যি লুচিমণ্ডাব ব্যবস্থা কববে-- তা না পার্টি। এ সব কি আমাদেব পোষায। এ সবে কি আমাদেব পেট ভবে? ভাবি দুঃখ হচ্ছে তোমাব জন্যে।' মনে পড়ল কলেজে থাকতে আমাদেব আব একজন বন্ধুব বোনেব বিযেতে নিমন্ত্রণ কবা হযেছিল অসিতকে। ছাদে কুশাসন পেতে আমবা সব ভুবিভোজনে বসে গিযেছিলাম, অসিত দাঁড়িযে দাঁড়িযে দেখেছিল কিন্তু নিজে একটি সন্দেশেব বেশি কিছুই নেযনি, বন্ধু প্রফুল্লকে বলেছিল, 'না ভাই, অভ্যাস নেই।'

সেই ভোজসভাব দৃশ্য হযতো অসিতেবও মনে পড়ে থাকবে। আমাব জন্য তাব দুঃখটা অকৃত্রিম বলেই মনে হল, তবু ঠিক তৃপ্তি পেলাম না। পেটেব মধ্যে অনেকক্ষণ ধবে চিন চিন কবছিল তা ঠিক। কিন্তু অসিতেব কথাব পব যেন আব এক ধবনেব অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

কফিটা বোধ হয বেশি কড়া হযে থাকবে

বললুম, 'আচ্ছা এবাব চলি অসিত।

'আঃ অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন দাঁড়াও। দেখি যানবাহনেব কোন—'

অসিতেব সেই ক্লার্কটি এসে উপস্থিত হল, 'অসিতবাবু।'

'আবাব কি?'

'বালীগঞ্জ স্টেশন বোডেব দাস সাহেবেব বাড়িব মেযেবা পেট্রোল নেই বলে নিজেদেব গাড়িতে আসতে পাবেন নি তাঁবা ট্রামে যেতে চাইছেন।

'কাবা, শর্মিষ্ঠা আব দেবযানী?

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'পাগল নাকি। বলুন, আমি নিজে তাঁদেব লিফট দিযে আসছি।'

অসিত আমাব দিকে ফিবে তাকিযে একটু হাসল, 'দুই সতীন নয, দুই বোন। তবে প্রায সতীন হব হব কবছিল। আব একজাযগায বিযে ক'বে বেঁচেছি, বাঁচিযেছিও তবু লিফট না দেওযাটা ভাবি অশিষ্টতা হবে, কি বলো? কিন্তু তুমি কববে কি।'

অবাক হযে বললুম, 'আমি তো বাসে যাব।'

অসিত বলল, 'হ্যাঁ, বাসে যাবে না আবো কিছু। বাস ট্রামে আজকাল মানুষ উঠতে পাবে? তুমি এক কাজ কবো—' হঠাৎ পকেট থেকে এক টাকাব একটা নোট বেব কবল অসিত, কিন্তু পবক্ষণেই সেটা বেখে দিযে বলল, 'উঁহু এক টাকায হবে না বোধ হয। বিক্সাওযালা ব্যাটাবা আজকাল ট্যাক্সিব

ভাড়া নেয। দু' টাকাই রাখ। মোড় থেকে একটা রিক্সা নিয়ে চলে যেও। জ্যোৎস্না রাত আছে। টুং টুং ক'রে ছুটবে। ট্যাক্সির চেয়ে অনেক বেশি রোম্যান্টিক লাগবে দেখ।'

মুহূর্তকাল নির্বাক হয়ে রইলাম, তারপরে বললাম, 'ওসবের কিছু দরকার নেই অসিত। আমি বাসে বেশ যেতে পারব।'

অসিত বিরক্ত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, ঝুলে ঝুলে যেতে যেতে একটা এ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে বস আর কি। নাও রাখ।'

বলে দু'টাকার নোটখানা আমার ডান দিকের ঝুল পকেটের ভিতরে টুপ ক'রে ফেলে দিয়ে বলল, 'Be worldly my friend, be practical'

অসিত আর দাঁড়াল না। একটু দূরে দুটি মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বোধহয় শর্মিষ্ঠা আর দেবযানীই হবেন। অসিত হাসিমুখে তাঁদের দিকে এগিয়ে গেল, আমি এগোলাম গেটের দিকে।

একবার ভাবলাম টাকা দুটো কোনো ভিখিরীর হাতে দিয়ে দিই, কিন্তু আশ্চর্য, এত বড় বিয়ে বাড়ির ধারে কাছে একটি ভিখারীকেও চোখে পড়ল না। কি হল পাড়াটার? বিলাত ফেরতের বাড়ি বলে কলকাতার এ অংশটা কি রাতারাতি লণ্ডন হয়ে গেল।

ফুটপাথ ধরে একটু একটু ক'রে এগুতে লাগলাম। মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। অসিতের বিয়ের চিঠিতে কি রঙীনই না হয়েছিল সকালটা। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত তার কিছুমাত্র যেন অবশিষ্ট রইল না। হলদে রঙের চিঠি। সে চিঠি তো এখনো পকেটে রয়েছে, কিন্তু তার রঙটুকু গেল কোথায়। হঠাৎ আর একখানা চিঠির কথা মনে পড়ল। মল্লিকার লেখা সেই সাধারণ পোস্টকার্ডখানার কথা। নিতান্ত সাদাসিধে আটপৌরে চিঠি। আমাকে নয়, আমার স্ত্রীকে লেখা। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের কথা নেই, বরং অসুখ বিসুখের কথাই আছে। চিঠিটা আমার পকেটে নেই, কিন্তু তার প্রতিটি লাইন যেন আমার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। দু'একটি লাইন গুঞ্জরণ করতে লাগল কানে। মনেই হয় না এক শহরে আছি। ট্রামে যাচ্ছিলেন খুব কথা বলছিলেন নিজেরা। বাইরের দিকে তাকালেনই না।—ইচ্ছা হয় নিজেই গিয়ে একবার দেখা ক'রে আসি।—এসব কথা আমাকে লেখেনি মল্লিকা। লিখেছে আমার স্ত্রী ইন্দিরাকে। কি ক'রে সরাসরি লিখবে আমাকে? মল্লিকা নিজেও তো মেয়ে। সে কি আর জানে না এসব বিষয়ে মেয়েদের চোখ কত তীক্ষ্ণ কত তীব্র তাদের ঘ্রাণশক্তি?

কিন্তু এখনো অত সতর্কভাবে, অত হিসাব ক'রে চলে কেন মল্লিকা? তখনকার কথা কি তার এখনো মনে আছে? আশ্চর্য, আমি কিন্তু একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

এও সেই কলেজী আমলের কাহিনী। পিসতুতো ভাইয়ের শ্বশুরবাড়িতে থেকে বি এ পড়তুম আর পড়াতুম বউদির ছোট ছোট তিনটি ভাই বোনকে। মল্লিকাও বউদির বোন। তবে তখন আর সে ছোট নয়, বেশ বড়। আমার কাছে বসে তার আর পড়া চলে না। কিন্তু তাই বলে ঠাট্টা তামাসার সম্পর্কে দূর থেকে হোলির দিনে আবীর ছিটাতে তো আর বাধে না। অবশ্য খুব বেশি দূর থেকে নয়, অনেকখানি কাছে এসেই এক মুঠো আবীর আমার চোখেমুখে সেদিন মাখিয়ে দিয়েছিল মল্লিকা। আত্মরক্ষার জন্য আমি তার আবীরসুদ্ধ হাতখানা চেপে ধরেছিলাম, বলেছিলাম, 'আর একটু হলেই চশমা ভাঙত।'

মল্লিকা বলেছিল, 'বেশ হ'ত। চশমাটার জন্যই তো রঙটা চোখে লাগল না।'

'চোখ নষ্ট করবার মতলবই ছিল বুঝি?'

'ছিলই তো। হাত ছাড়ুন এবার।'

'মনের অভিসন্ধি জেনেও ছেড়ে দেব? যদি আর না ছাড়ি?'

এবার আবীর ছাড়াও লাল টুকটুকে হয়ে উঠেছিল মল্লিকার মুখ। মৃদুস্বরে বলেছিল, 'ছাড়ুন, কেউ দেখে ফেলবে।'

তারপর অনেকদিন দেখেছি ভাঁড়ার ঘর থেকে রান্নাঘরে যাতায়াতের পথে মল্লিকা জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়েছে। আঙুলে হলুদের ছোপ। ছাত্রেরা কাছে না থাকলে এদিক ওদিক তাকিয়ে আমিও যে জানালার ধারে দু' একদিন এগিয়ে না গেছি তা নয়, শিকও ধরেছি কিন্তু ভাঙিনি।

তারপর তাঁয়েমশাই মরে যাওয়ার পর আমি অন্য জায়গায় টিউশনি নিলাম। মল্লিকাদের

জানালাও সেই সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেল। জীবনে এমন কত জানালা খোলে, কত জানালা নিঃশব্দে বন্ধ হয়, কে তার হিসাব রাখে, কে তার হিসাব রাখতে পারে।

মল্লিকার হিসাবও হারিয়ে ফেলেছিলাম। বছর চার পাঁচ বাদে বিয়ের পর আবার ওদের সঙ্গে যোগাযোগ হল। সম্পর্কটা আবিষ্কার করল আমার স্ত্রী। পুরনো সম্পর্ক নয়, নতুন সম্পর্ক। ইন্দিরার এক খুড়তুতো ভাইয়ের অন্নপ্রাশনে সস্ত্রীক আমিও গেছি, যতীশও গেছে। সেখানেই আলাপ পরিচয় হল। যতীশ ইন্দিরার জ্যেঠতুতো ভাইয়ের সম্বন্ধী। তারপর দু'একবার আমরাও গেছি, মল্লিকারাও এসেছে, কিন্তু সেই আবীরের প্রসঙ্গ আর কোন দিন ওঠেনি। চশমার পাওয়ার বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। কাপড় চোপড়ের দাম বেড়েছে তার চেয়েও বেশি। আজকাল দোলের দিনে আবীর আর খেলি না। ঘরের মধ্যে দোর জানালা বন্ধ ক'রে বসে থাকি।

স্মৃতির সেই রুদ্ধদ্বার হঠাৎ আজ এমন ক'রে খুলে গেল কেন ভেবে পেলাম না। কিন্তু একটু একটু ক'রে এগুতে লাগলাম মনোহরপুকুরের দিকে; দেখে আসি কে কেমন আছে। চোখের অসুখে শেষ পর্যন্ত মল্লিকাকেও ধরেছে তাহলে। তখনকার দিনে ভারি নভেল নাটক পড়ত মল্লিকা, আর অবসর পেলেই সেলাইয়ের কাজ নিয়ে পড়ে থাকত। সে অভ্যাস বোধ হয় মল্লিকা এখনো ছাড়তে পারেনি। আর তার ফল ফলতে শুরু হয়েছে।

পুরনো একতলা বাড়ি। সদর দরজা খোলাই ছিল। সবে তো সন্ধ্যা হয়েছে। সাতটা বেজে মিনিট কয়েক। তবু দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বার দুই কড়া নাড়লুম। আরো দু'ঘর ভাড়াটে আছে বাড়িতে। হঠাৎ ঢুকে পড়া ঠিক নয়। একটু বাদেই ছোট ছোট দুটি ছেলেমেয়ে এল এগিয়ে। আমাকে দেখে উল্লসিত হয়ে ভিতরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'মা দেখ এসে কে এসেছে।'

মল্লিকার ছেলেমেয়েদের চেনা শক্ত হল না। মায়ের মুখেরই আদল পেয়েছে ওরা। ঠিক সেই রকম ছোট্ট কপাল, জোড়া ভ্রূ, টানাটানা নাক চোখ। তাছাড়া আগেও তো দু'চারবার ওদের দেখেছি মল্লিকার সঙ্গে। কিন্তু ওদের এই উল্লাসে কেমন যেন একটু লজ্জা বোধ করলাম। 'কে এসেছে' খবরটা ওরা মাকে ডেকে দিতে গেল কেন—বাবাকে ডেকেও তো দিতে পারত।

'বাঃ, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন কাকাবাবু, আসুন, ভিতরে আসুন।' ছেলেটিই বড়। বছর সাত আট হবে বয়স। এসে হাত ধরল। তার দেখাদেখি মেয়েটি এসে ধরল আর একটা হাত। বছর পাঁচেক হবে বয়স। ফুটফুটে ফর্সা রঙ অবিকল মল্লিকার মত।

সদর দরজা থেকে খানিকটা প্যাসেজের মত গেছে ভিতরের দিকে। দুপাশে চুনবালি ঝরা দেয়াল। মাঝখানে ছোটমত একটু উঠান। উঠানের উত্তরে মল্লিকাদের ঘর। দাওয়ায় রান্নাবান্নার ব্যবস্থা। শিলনোড়ায় বাটনা বাটছিল মল্লিকা। আমি ঢুকতেই তাড়াতাড়ি আঁচলটা মাথায় তুলে দিতে দিতে বলল, 'আসুন, কি ভাগ্যি। আজই যে আসবেন ভাবতেই পারিনি। চিঠি পেয়েছিলেন বুঝি?'

বললুম, 'পেয়েছিলাম মানে? আমি তো আর পাইনি।'

মল্লিকার আঙুলগুলির দিকে চোখ গেল আমার। হাতে সেই লঙ্কা হলুদের ছোপ।

নখের দিকটা একটু ক্ষয়ে গেছে, একটু শীর্ণও হয়েছে যেন আঙুলগুলি, তা সত্ত্বেও ভারি সুন্দর লাগল।

ঘটির জলে হাত ধুতে ধুতে মল্লিকা বলল, 'তারপর একা যে! ইন্দুদি আসেন নি?'

বললুম, 'না, কেন, একা বুঝি আর আসা যায় না।'

মল্লিকা বলল, 'যাবে না কেন। কিন্তু আসা হয় কই। এপথ তো আজকাল ভুলেই গেছেন।'

বললুম, 'তোমরাই বুঝি খুব মনে রেখেছ। ভালো কথা, যতীশবাবু কোথায়। তাঁকেও তো দেখছিনে।'

মল্লিকা বলল, 'কি ক'রে দেখবেন এখনো তো প্রেসে। রাত দশটা পর্যন্ত ডিউটি আজকাল। বলে কয়ে একটু আগেই বেরোন। না হ'লে তো আর ট্রামবাস পান না।'

মনে পড়ল, দু'তিন ধরনের চাকরি বদলাবার পর কিছুকাল ধরে কম্পোজিটারী করছে যতীশ। ইতিমধ্যে গুটিকয়েক খবরের কাগজ অফিস বদলেছে।

'আসুন ঘরে আসুন। বন্ধু নেই বলে কি ঘরের ভিতরেও ঢুকতে নেই নাকি?'

দুখানা তক্তপোশে ঘবেব বাবো আনি জুড়ে গেছে। বিছানা বালিশ জড়ো হয়ে বয়েছে চৌকিব ওপব। একপাশে অয়েলক্লথে দু'তিন বছবেব আব একটি মেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। কোলেব কাছে পুতুল।

উঁচু ক'বে তক্তপোশ পাতা। তাব নিচে আব এক সংসাব। বাক্স-তোবঙ্গ, হাঁড়িকুড়ি। তক্তপোশেব তলা থেকেই ছোট একখানা দঁড়িব খাটিয়া বেব কবল মল্লিকা। তাকেব ওপব থেকে একখানা আসন নামিয়ে এনে পেতে দিল খাটিযায়। বলল, 'বসুন।'

বললাম, 'নিজেব হাতে বোনা বুঝি ?'

মল্লিকা একটু হাসল, 'সব দিকেই লক্ষ্য আছে দেখি। তাবপব কেমন আছেন বলুন। এদিকে কোথায় এসেছিলেন।'

বললুম, 'কেন, এখানে বুঝি আব আসতে পাবি না।'

মল্লিকা বলল, 'কই আব পাবেন। পাবলে তো দেখতামই। নিশ্চযই কোন কাজকর্ম উপলক্ষে এদিকে এসেছিলেন। সুবিধামত একটু ভদ্রতা বক্ষা ক'বে গেলেন।

বললুম, 'ঠিক কাজকর্ম নয়, এসেছিলাম এক বড়লোক বন্ধুব বিয়েব প্রীতিভোজে। খেয়েদেয়ে এত আইঢাই কবছে পেট যে, এক গ্লাশ ঠাণ্ডা জল খেতে এলাম তোমাদেব এখানে।'

'তা তো বটেই। জল ছাড়া আমবা আব কিই বা খাওয়াতে পাবি। কি কি খেলেন বিয়ে বাড়িতে ?'

যা যা খেয়েছিলাম, বললাম।

মল্লিকা বলল, 'দেখুন তো কাণ্ড। অফিস থেকে বেবিয়ে সবাসবিই তো এসেছেন এদিকে। খুব ক্ষিদে লেগেছে নিশ্চযই।'

বললুম, 'আবে না না। বললুম বলেই নাকি।'

মল্লিকা বলল, 'থাক থাক, আব লজ্জাব দবকাব নেই। আপনি যে খুব লাজুক ভদ্রলোক তা দুনিযায আব জানতে বাকি নেই কাবো।'

লাজুক ভদ্রলোক। কোন ইঙ্গিত আছে নাকি কথাটুকুব মধ্যে।

ছেলেকে ডেকে দাওযায নিয়ে গিয়ে আঁচল থেকে পযসা খুলে দিল মল্লিকা। কি যেন আনতে পাঠাল মোড়েব দোকান থেকে।

বললুম 'হচ্ছে কি ?'

'কিছুই হচ্ছে না, আপনি চুপ করুন দেখি। ববং একটু এদিকে এসে বসুন এগিয়ে।'

তাকেব ওপব থেকে কাঁচেব ময়দাব বৈয়ম আব ঘিয়েব টিন নামিয়ে আনল মল্লিকা। কাঁধ উঁচু একটি কাঁসাব থালায ময়দা মাখতে বসল। ময়দা ডলাব সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকাব চুড়ি আব শাঁখাব ঠুন ঠুন শব্দ হতে লাগল।

বললুম, 'তাবপব আছ কেমন ?'

মল্লিকা বলল, 'বেশ আছি।'

'চোখেব নাকি অসুখ।'

মল্লিকা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'চোখেব অসুখ আবাব একটা অসুখ নাকি। ওতো আপনাবও আছে।'

বললুম, 'আমাব আছে বলেই বুঝি তোমাবও থাকতে হবে।?'

মল্লিকা এ প্রশ্নেব কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'ইন্দুদি কেমন আছেন আজকাল ?'

সংক্ষেপে বললুম, 'ভালোই।'

তাবপর ঘাড় ফিবিয়ে তাকালাম দেয়ালেব দিকে। বুঝতে পাবলাম পুবনো প্রসঙ্গ একটুও আব তুলতে দিতে চায না মল্লিকা। যেতে চায না কোন বকম ঠাট্টা-তামাসাব মধ্যে। দেওযালভবা নতুন পুবনো নানা বকমেব ক্যালেণ্ডাব। বামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, সুভাষচন্দ্রেব ফটো। ফাঁকে ফাঁকে মল্লিকাব হাতে বোনা কার্পেট, কাঁচে বাঁধানো সূচিশিল্প। একটি শিল্পকাজ বিশেষ ক'রে চোখে পড়ল, এপাশে ওপাশে নাম না জানা গুটিকয়েক ফুল। মাঝখানে অলঙ্কৃত অক্ষবে দুটি পংক্তি—

'সতীত্ব সোনার নিধি বিধিদত্ত ধন
কাঙালিনী পেলে রাণী এহেন রতন।'

মনে মনে হাসলুম। একথা কি কোন বাঙালী হিন্দুর মেয়েকে কখনো ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রাখতে হয়? না কি মনের দেয়াল থেকে বার বার মুছে যেতে চায় বলেই তাকে ঘরের দেয়ালে এমন অক্ষয় ক'রে রাখবার চেষ্টা।

থালায ক'রে অনেকগুলি লুচি. তরকারি মল্লিকা সামনে এনে রাখল।

বললুম, 'এত কি হবে?'

মল্লিকা বলল, 'এত কই। খানকয়েক মাত্র তো লুচি। রাত্রে বাসায় ফিরে ভালো ভালো জিনিস খেতে পারবেন না, এই তো ভাবনা? বলবেন, বন্ধুর বাড়ি থেকে পেটভরে পোলাও মাংস খেয়ে এসেছেন সেইজন্যেই খেতে পারছেন না।'

মল্লিকাব ছেলেমেয়ে দুটি, ননী আর মযনা, কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাদের হাতে তুলে দিলাম খানকয়েক লুচি। চায়ের প্লেটে করে দুটি মিষ্টি দিযেছিল মল্লিকা. সে দুটিও ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দিলুম।

মল্লিকা বলল, 'বাঃ, সবই বিলিযে দিলেন যে।'

বললুম. 'সব বিলিয়ে দিতে আব পাবলাম কই। ওরা খেলেই আমাব হবে।'

খুব খুশি-খুশি. ভাবি উৎফুল্ল দেখাল ননী আব ময়নার মুখ। পান্তুযার রস আঙুলের ফাঁক দিয়ে বেযে পড়তে লাগল মযনাব। জল-খাবারেব পব চা ক'রে আনল মল্লিকা। নিজেও এক কাপ নিল।

বললুম, 'অনেকদিন পর চা খাচ্ছি মুখোমুখি বসে।'

মল্লিকা বলল. 'আহাহা. বাড়িতে বুঝি একজন আর একজনের দিকে পিছন ফিরে মুখ ঘুরিয়ে বসে খান?'

চাযেব পর আবাব রান্নাব আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পডল মল্লিকা। ভাতের হাঁড়ি নামিযে তুলে দিল ডালেব কড়া।

বললুম, 'এবাব উঠি।'

মল্লিকা বলল, 'আসবেন মাঝে মাঝে। পথ যেন একেবারে ভুলেই গেছেন। বউবাজার আর কালীঘাট যেন কেবল গডেব মাঠেব এপাব ওপাব নয়, সাত সমুদ্র তের নদীর পার।'

ভাবি ভালো লাগল কথাটুকু। এতক্ষণ পরে তাহলে সত্যিই অভিমানের সিন্ধু উথলে উঠেছে মল্লিকার!

জবাব না দিয়ে এগুতে লাগলাম সরু প্যাসেজটুকুব ভিতর দিয়ে। দোর পর্যন্ত মল্লিকা এগিয়ে দিল. ফিরে গেল না। দাঁড়িযেই রইল একখানা কবাটের আড়ালে মুখ ক'ড়িয়ে।

কিন্তু দু'এক পা এগুতেই দেখি ননী আর ময়না দুদিক থেকে ফেব এসে আমাব দুখানা হাত চেপে ধরেছে. 'কাকাবাবু, বাঃ দিব্যি পালিয়ে যাচ্ছেন। পয়সা দিলেন না!'

'ও পয়সা।'

ভারি লজ্জিত বোধ করলুম। তাইতো. কেবল বড়লোক বন্ধুর ওখানেই লৌকিকতা করেছি—মল্লিকার ছেলেমেয়েদেব জন্য কিছু কিনে নেওযাই হয়নি। একেবারে শুধু হাতে গিয়ে উঠেছি ওদের ওখানে।

বললুম, 'পয়সাই নেবে। না আম-টাম কিছু কিনে দেব?'

ননী নিজেই বলল, 'না না, পয়সাই চাই। আপনি ভাবি ফাঁকি দিচ্ছিলেন।' বলে ননী নিজেই আমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। এক পকেটে খুচরো আনা দুয়েক পয়সা ছিল। ময়না তা তুলে নিল। ননীর হাতে উঠল সেই দু'টাকাব নোটখানা। এক মুহূর্ত একটু স্তম্ভিত হয়ে রইল ননী, তারপর হঠাৎ বাড়ির দিকে ছুট দিল।

আমিও মুহূর্তকাল অবাক হয়ে রইলুম. তারপর ননীকে ডেকে বললুম, 'ছুটছ কেন। পড়ে টড়ে যাবে, আস্তে আস্তে যাও।'

ননী মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কেড়ে নেবেন না তো?'

'না না, কেড়ে নেব না, ভয় নেই।'

কেমন যেন লাগতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গেই হাঁটতে শুরু করতে পারলুম না। দেশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরালাম।

পরমুহূর্তে ফের ছুটে এল ননী, 'কাকাবাবু টাকা তো আপনি আমাকেই দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, তোমাকেই তো দিলাম।'

'তাহলে মা কেড়ে নিলে কেন। আসুন ধমকে দিয়ে যান মাকে।'

হাত ধরে টানতে টানতে ফের দোরের কাছে আমাকে নিয়ে গেল ননী। মল্লিকা তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। দু'টাকার নোটখানা তার মুঠির মধ্যে।

হাসতে গেলুম, কিন্তু হাসি যেন ঠিক এলো না, বললুম, 'ব্যাপার কি।'

মল্লিকা বলল, আচ্ছা কাণ্ড আপনার। ওদের হাতে অত টাকা দিতে গেলেন কেন।'

বললুম, 'তাতে কি হয়েছে।'

মল্লিকা বলল, 'না-না-না, এসব ভালো নয়। এসব কি, এসব দেবেন কেন।'

ননী এবার বলল, 'আচ্ছা কাকাবাবু। এ-টাকা আমাকে দেননি আপনি?'

আমি ঘাড় নাড়লুম।

'তবে মা কেন কেড়ে নিচ্ছে?'

মল্লিকা একটু হাসল, 'কথা শুনুন ছেলের। কেড়ে নিয়ে যেন পাড়ার পাঁচজনকে বিলিয়ে দেবে মা। এ যেন তোমাদেরই পেটে যাবে না। রাত পোহালে এক মুড়ি মুড়কিতেই কতগুলি পয়সার দরকার—সে হিসাব আছে।'

বলতে বলতে আঁচলে দু'টাকার নোটখানা বেঁধে রাখল মল্লিকা।

মনে হল ননীর চোখ দুটি ছলছল করছে। কিন্তু ছেলের দিকে মোটেই তাকাল না মল্লিকা আমার দিকে তাকিয়ে বলল 'লিখেটিখে খুব বুঝি হচ্ছে আজকাল?

কিসের এক আনন্দে চকচক করছে মল্লিকার চোখ। ঠোঁটের কোণে সেই আগেকার দিনের হাসি।

বলতে গেলুম, 'না না'—।

মল্লিকা বাধা দিয়ে বলল, 'আহা, বললে বুঝি সব আমি কেড়ে রাখব, না? ভয় নেই তা আমি রাখতে পারব না তা আপনি দিতেও পারবেন না কিন্তু দু-এক নাইট সিনেমা দেখাতে তো পারেন? মনে আছে, সেই কতকাল আগে একবার একসঙ্গে আসবেন একদিন? ওর তো আর সময় হয় না।'

নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে জানালুম 'আসব।'

তারপর প্রায় ননীর মত ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলাম গলি থেকে।

আশ্বিন ১৩৫৫

টিকেট

অফিস থেকে বেরিয়ে মিশন রো-র মোড়ে এসে শ্যামবাজারগামী ট্রামখানার দ্বিতীয় শ্রেণীর হাতল লক্ষ্য করেই এগিয়ে যাচ্ছিল শীতাংশু, হঠাৎ মানসী মিত্রের সঙ্গে একেবারে চোখাচোখি হয়ে গেল। ছুটির পর সেও ট্রামের জন্যই অপেক্ষা করছে। শীতাংশুকে দেখে মানসী মৃদু হেসে পূর্ব-পরিচয়ের স্বীকৃতি দিল। তারপর চোখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকাল। ভাবখানা এই—এবার শীতাংশু স্বচ্ছন্দে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠতে পারে, মানসী আর ওদিকে তাকাবে না। কিন্তু যদিও আজ মাসের ঊনত্রিশে, যদিও পকেটে পারানির কড়ি মাত্র পাঁচটি পয়সাই সম্বল তবু আর সেকেণ্ড ক্লাসে ওঠা চলে না, বরং মানসী মিত্রের চোখের সুমুখ দিয়ে প্রথম শ্রেণীতে গিয়েই উঠতে হয়। নিজের পরাক্রান্ত পৌরুষের পরিচয় দিয়ে কনুইয়ের গুঁতোয় সহযাত্রীদের হটিয়ে স্থান করে নিতে হয় ভিতরে। কিন্তু যার জন্য এত পরাক্রম সে এদিকে তাকিয়েও দেখল না, বরং শীতাংশুই আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মানসীর পাশে ততক্ষণে স্যুট-শোভিত আর একটি চারুদর্শন যুবক এসে দাঁড়িয়েছে। আর তার সঙ্গে বেশ হেসে হেসে কথা বলছে মানসী। ইদানীং ডালহৌসী স্কোয়ারের মোড়ে নিতান্তই চোখাচোখি হয়ে গেলে মানসী সৌজন্যরক্ষার জন্য শুধু একটু হাসে, কথা আর বলে না। কিছু বিচিত্র নয়, স্কটিশে একসঙ্গে পড়ত। ডিবেটিং আর কলেজ ম্যাগাজিনের মারফৎ আলাপটা আরও কিছুদূর এগিয়েছিল। তারপর মানসী ঢুকেছে সরকারী দপ্তরে আর সীতাংশু অখ্যাতনামা এক ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে। মানসী দেখে যে তাকে এখনও চিনতে পারে এই তো ঢের। নিজের মনকে সান্ত্বনা দিল শীতাংশু কিন্তু মন মানল না।

প্রথম শ্রেণীতে উঠেও শান্তি নেই, এপাশ ওপাশ থেকে সহযাত্রীদের ধাক্কায় বার বার স্থানচ্যুত হতে লাগল শীতাংশু। এবার মনে মনে আফসোস হল, দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিশ্চয়ই এত ভিড় হত না, সেখানে হয়ত দিব্যি বসে যাওয়া চলত। জীবনের আর-সব ক্ষেত্রেই প্রথম শ্রেণীর লোক কম, দশটা পাঁচটার ট্রামেই শুধু ব্যতিক্রম।

লালবাজার ছাড়িয়ে বউবাজার আর চিত্তরঞ্জন এভিনিয়ুর মোড়ে এসে দাঁড়ায় ট্রাম। একটি লোকও নামল না। বরং যারা বসে ছিল তারা দণ্ডায়মান সহযাত্রীদের দিকে একটু অনুকম্পার চোখে তাকিয়ে আরও আয়েস করে বসল। কারও একটু উঠবার লক্ষণ নেই, আশ্চর্য এরা সবাই কি একেবারে সীমান্তের যাত্রী?

ভিড়ের মধ্যে কণ্ডাকটারের এতক্ষণ কোন পাত্তা মেলেনি। এবার তার মুখ দেখা গেল। সে এবার নড়তে শুরু করেছে। হাত পাততে শুরু করেছে যাত্রীদের কাছে। মনটা আবার হাহাকার করে উঠল শীতাংশুর—পাঁচটি পয়সার সবকটিই তুলে দিতে হবে ওর হাতে। যদি বুদ্ধি করে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠত তাহলে তিনটি পয়সাতে কাজ চলত। গলির মোড়ের দোকান থেকে দু পয়সার বিড়ি কিনে নিতে পারত শীতাংশু। কিন্তু কি কুক্ষণেই আজ চোখাচোখি হয়েছিল মানসী মিত্রের সঙ্গে। আর হলেই বা কি। দেখিনি দেখিনি করে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে সেকেণ্ড ক্লাসেই তো দিব্যি উঠতে পারত শীতাংশু। যে সহপাঠিনী দেখা হলে মুখের কথাটি পর্যন্ত খসায় না, তার জন্য বোকা শীতাংশু কেন বিড়ি খাওয়ার দুটি পয়সা খসাতে গেল। নিজের মূঢ়তাকে, নিজের [illegible] প্রেস্টিজ-বোধকে শীতাংশু নিজেই ধিক্কার দিল।

ঠিক সেই সময় কণ্ডাকটার এসে দাঁড়াল শীতাং[illegible] পাশে, 'টিকিট'।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে অসীম মমতায় আনি আর ছিদ্র-গর্ভ পয়সাটির ওপর আঙুল বুলাল শীতাংশু। কিন্তু পকেট থেকে হাতটা তুলে আনতে না আনতেই অধীর কণ্ডাক্টার সেখান থেকে সরে গেল। শীতাংশু পয়সা বের করুক, ততক্ষণে তার আর বিশ-পঁচিশখানা টিকেট কাটা হবে।

কণ্ডাকটাব সবে যেতে শীতাংশু স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেলল—যাক এবাবেব মত পাঁচটি পযসা তো বেঁচেছে। সামনেব দিক থেকে টিকেট কেটে কণ্ডাক্টাব ঘুবে আসতে না আসতে সে নেমে পডবে। বাকি পথটুকু হেঁটে গেলেই হবে। এই তো শঙ্কব ঘোষ লেন। এমন প্রবৃত্তি শীতাংশুব এব আগে কোনদিনই হযনি। ট্রাম বাসেব কণ্ডাকটাবকে কোনদিন সে ফাঁকি দেযনি। ববং কণ্ডাকটাব টিকেট চাইতে ভুলে গেলে শীতাংশু নিজে যেচে টিকেটেব পযসা দিযেছে। দু একজন বন্ধু হাসিঠাট্টাও কবেছে এ নিযে। বলেছে, ধমপুত্র যুধিষ্ঠিবকেও সশবীবে স্বর্গে যাবাব আগে একবাব নবক দর্শন কবতে হযেছিল, কিন্তু আমাদেব কলিব যুধিষ্ঠিব শীতাংশুকে সেটুকুও আব দেখতে হবে না। ওবা হাসে হাসুক। টিকেট না কেটে ট্রাম-বাসে যাওযা শীতাংশুব ভদ্রতায বাধে ভাবি ক্ষুদ্রতাব পবিচয দেওযা হয, তা ছাড়া দুনিযা-জোড়া দুর্নীতিব বাজ্যে কোথাও যখন একটু মাথা গলাতে পাবেনি শীতাংশু, না আছে তেমন বুদ্ধি না প্রবৃত্তি, তখন কি হবে এই ট্রাম-বাসেব দুচাব পযসা ফাঁকি দিযে। তাব চেযে সততায অনেক সান্ত্বনা।

কিন্তু আজ যুক্তিব মুখ হঠাৎ ঘুবে গেল শীতাংশুব। কেন ফাঁকি দেবে না? তাকে কি কেউ ফাঁকি দিতে বাকি বেখেছে? মাত্র আশি টাকা মাইনেয দশটা ছটা সে খাটছে অফিসে। মাসেব তৃতীয সপ্তাহে শুরু হয ধাব। ক্ষুবধাব মুখ চলতে থাকে মল্লিকাব। আজও বেশনেব চাল ধাব কবতে হযেছে প্রতিবেশী অমলবাবুব স্ত্রীব কাছ থেকে। ছ' আনাব মধ্যে সাবতে হযেছে বাজাব। মল্লিকা বলেছে, 'ও চাকবি তুমি ছেড়ে দাও, যে চাকবিতে পেটেব ভাতেব সংস্থান হয না, সে চাকবি কবে লাভ কি, ছি ছি! আজকাল অফিসেব বেযাবা খানসামাবাও আশি টাকাব চেযে বেশি মাইনে পায।'

শীতাংশু হেসেছে, 'পায যদি আমি আটকাব কি কবে বল।'

মল্লিকা জ্বলে উঠেছে,' হেসো না। হাসি কি কবে আসে তোমাব তাই ভাবি! একটি মাত্র ছেলে। তাকে ভালো কবে খাওযাতে পাবিনে পবাতে পাবিনে আব তুমি হাস। এই তো অমলবাবু। চাকবি কবেন না, বাকবি কবেন না, তবু তো দিব্যি দুহাতে পযসা আনছেন। যখনকাব যা নিযম। সবাই পাবছে আব তুমি পাব না।'

স্ত্রীব কণ্ঠ ফেব প্রতিধ্বনিত হল শীতাংশুব মনে ঠিক বলেছে মল্লিকা, সবাই যদি পাবে শীতাংশুই বা পাববে না কেন। তাব এই ভুযো নীতিবোধ নির্বোধ অক্ষমতাবই নামান্তব, কোন মানে নেই, কোন মানে হয না

আবাব এসে দাঁড়াল কণ্ডাকটাব 'টিকিট বাবু।

খাকী পোশাকপবা লোকটাকে দেখে এবাব সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল শীতাংশুব। বিবক্তিব ভঙ্গিতে ঘাড নেড়ে শীতাংশু এবাব বাইবেব দিকে তাকাল। তবু যেন বেযাড়া কণ্ডাকটাবটা নডতে চায না। কিন্তু শীতাংশু আজ নাছোডবান্দা। কিছুতেই সে ঘাড ফেবাল না, চোখ ফেবাল না। বাইবেব সান্ধ্য শহবেব রূপ যেন তাকে তন্ময কবেছে।

কণ্ডাকটাব সবে গেছে একটু বাদেই টেব পেল শীতাংশু। তাব পব আব ঝুঁকি না নিযে একটা স্টপেজ আগেই ট্রাম থেকে নেমে পডল।

পেবেছে। শীতাংশুও পেবেছে। অভূতপূর্ব উল্লাসে মন ভবে উঠল শীতাংশুব। কালো বাজাবে পাঁচ লক্ষ টাকা বোজগাব কবেও কোন লাখপতি বোধ হয এমন উন্মাদনাব স্বাদ পায না। কিছুই কঠিন নয, চেষ্টা কবলেই পাবা যায। শীতাংশুও পাববে। আবও পাববে মল্লিকাব আদর্শপুরুষ অমলবাবুর মত সেও অদূব ভবিষ্যতে পৌরুষেব পবিচয দিতে পাববে একদিন।

মোড়েব বিড়িওযালাব দোকানেব সামনে এসে আজ আব বিড়ি কিনল না শীতাংশু। বলল, 'দুটো সিজার দাও তো।'

মাসেব শেষে শীতাংশুবাবু কোন দিন সিগাবেট কেনেন না। কোন দিন ধাব বাকি বাখেন না দোকানে। ভাবি হিসাবী মানুষ। বিড়িওযালা ফটিক দাস একটু অবাক হযেই শীতাংশুব মুখেব দিকে তাকাল, তাবপব প্যাকেট থেকে দুটো সিগাবেট বের কবে দিল।

পাঁচ লাখ টাকার সম্পত্তি ওড়াবার উত্তেজনাব স্বাদ পেতে পেতে পাঁচটা পযসা ফটিকেব হাতে তুলে দিল শীতাংশু, বলল, 'কই, দেশলাই দেখি।'

ফটিক বলতে যাচ্ছিল, 'ওই তো দড়িই রয়েছে বাবু।' কিন্তু তা না বলে দেশলাইটাই এগিয়ে দিল।

শীতাংশু মনে মনে হাসল, দিতেই হবে। দু পায়সার বিড়ি কিনলে কি আর দেশলাই চাইতে পারত শীতাংশু ? না ফটিকই দিতে চাইত ?

দেশলাই জ্বেলে একটা সিগারেট ধরাল শীতাংশু। আর একটা সঞ্চিত রইল পকেটে। নৈশ ভোজন শেষ হলে শুয়ে শুয়ে ধবাবে। মনে পড়ল তিন চার দিনের মধ্যে প্রাণ-ধরে সে একটা সিগারেট কেনেনি। সংসাবের জন্য এই চুল-চেরা হিসাবের কোন মানে হয় না। এত হিসাব করেও যখন সংসাব চলে না, তখন হিসাব না করেই এবার দেখা যাক না। দেখবে, তার এমন বেহিসেবী চাল সত্ত্বেও সংসার দিব্যি চলছে।

অন্যদিন ঘরের দোরগোড়ায় জুতো খুলে ঢোকে শীতাংশু, আজ গট গট শব্দ কবে জুতো সুদ্ধই ঘরে ঢুকল।

চার বছরেব ছেলে বিনুকে শ্লোক শেখাচ্ছে মল্লিকা, 'নীতি এই যথা তথা, বল সদা সৎ কথা। আমরা ছেলেবেলায় পড়তাম। এখন আর সে বই দেখিনে।'

কিন্তু শীতাংশুকে দেখে বিনু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'বাবা এসেছে মা।'

মল্লিকা মৃদু হেসে বলল, 'এসেছেন তো কবব কি ?'

সন্ধ্যায় ফের স্নিগ্ধ হয়েছে মল্লিকার রূপ। ধোপা বুঝি কাপড় দিযে গেছে। আটপৌরে হলেও খয়েরীপাড শাদা খোলের মিলেব শাড়িতে বেশ মানিয়েছে মল্লিকাকে। হয়তো ধোয়া শাড়ি পরেই মল্লিকাব মন আজ প্রসন্ন হযে উঠেছে। সকাল বেলায় 'ধোপা ধোপা' করেই ওর মেজাজ প্রথম বিগড়েছিল। খোঁপাটা আঁট করে বাঁধা। সিঁথিতে কপালে সিঁদুবেব চিহ্ন : সামান্য এই সান্ধ্যপ্রসাধনে রূপ যেন বদলে গেছে মল্লিকার। স্বামীকে দেখে মাথাব আঁচল টেনে দিতে দিতে মল্লিকা মৃদু হেসে বলল, 'ব্যাপাব কি, হঠাৎ যে এত সিগাবেটেব ঘটা। এবার উনত্রিশ তারিখেই মাইনে পেলে নাকি ?'

শীতাংশু বলল, 'কেন, মাইনে না পেলে বুঝি সিগারেট খেতে নেই ?'

আশ্চর্য, এই ধমক সত্ত্বেও মল্লিকা রাগ কবল না, আগের মতই হেসে বলল, 'খেতে নেই আমি কি বলছি ? খাও না!' তারপর একটু থেমে বলল, 'আজ সোনা কাকা এসেছিলেন। তোমার কত প্রশংসা। আজকালকার দিনে তোমার মত নাকি মানুষ দেখা যায় না।'

শীতাংশু জামাব বোতাম খুলতে খুলতে গম্ভীবভাবে বলল, 'হুঁ।'

বিনু এবার এগিয়ে এল, 'আমাব জন্য কি এনেছ বাবা।'

মল্লিকা সস্নেহে ধমক দিল, 'কি আবার আনবে বে দুষ্টু ছেলে।'

বিনু একবার মাব মুখেব দিকে তাকালে, আর একবার বাবাব মুখেব দিকে, তারপর পরম বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বলল, 'আজ বুঝি মাসেব শেষ ? এখনও মাইনে দেয়নি, না ?'

মল্লিকা বলল, 'ছেলে একেবাবে পাকা।'

মাইনে পেযে প্রথম দিকে ছেলের জন্য লজেঞ্জস, বিস্কুট কি কমলা লেবু কিছু না কিছু নিয়ে আসে শীতাংশু। শেষ দিকে আব আনা হয় না। মাসেব প্রথম আব শেষের এই প্রভেদটা বুঝতে বাকি নেই বিনুর। নিজের অশোভন দাবীতে সে যেন নিজেই লজ্জা পেল। আত্মগোপনের জন্য মার পিছনে চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি মনে পডল, ঘুবে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাবা টিকেট ?'

মাসের শেষেব দিকে ছেলেব জন্য যখন অন্য কোন উপহার আনতে পারে না, তখন ছেলে কিছু চাইবার আগেই পকেট থেকে ট্রাম কি বাসের টিকেটটা ছেলের হাতে তুলে দেয় শীতাংশু, 'নাও, জমিয়ে রাখ।' শীতাংশুকে আজ চুপ করে থাকতে দেখে বিন আরও একটু এগিয়ে এল, 'কই বাবা টিকিট দাও।'

মল্লিকা হেসে বলল, 'আচ্ছা কণ্ডাক্টারের পাল্লায় পড়েছ, দাও এবার টিকিট।'

শীতাংশু গম্ভীরভাবে বলল, 'টিকেট নেই।'

মল্লিকা উদ্বেগের স্বরে বলল, 'সেকি ! এতটা পথ হেঁটে এলে নাকি ?'

শীতাংশু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হাসল,' টিকেট না কাটলেই বুঝি হেঁটে আসতে হয় ?'

মল্লিকা আর কোন কথা বলল না, তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল।

কিন্তু শীতাংশুর ক্ষুদে কণ্ডাকটারটি নাছোড়বান্দা, সে হাতখানা আরও একটু প্রসারিত করে দিয়ে ট্রামের কণ্ডাকটারের গলার অনুকরণ করে পরম কৌতুকের ভঙ্গিতে আর একবার বলল, 'টিকেট বাবু।'

আষাঢ় ১৩৫৬

অবতরণিকা

সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হতেই সরোজিনী একটু কান খাড়া ক'রে রইলেন।

তারপর ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন 'এই বোধ হয় এলেন আমাদের মহারাণী। রাত আটটার সময় ঘরের লক্ষ্মীর ঘর সংসারের কথা মনে পড়ল। দুদিন ধরে মেয়েটার যে জ্বর সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নেই' যাই খুলে দিয়ে আসি।'

সরোজিনী উঠে দাঁড়ালেন।

সুব্রত ওপাশে বসে এতক্ষণ স্ত্রীর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগগুলি শুনছিল, সরোজিনীকে বাধা দিয়ে বলল তুমি থাক মা, আমিই যাচ্ছি।'

হাত দেড়েক দূরে পূর্বদিকের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে কর্তা নাতির কাছে বসে প্রিয়গোপাল দুহাতের তেলোয় ঠেকিয়ে অভ্যস্তভাবে হাঁটু নাড়ছিলেন মন্তব্য করলেন 'এত রাত্রি অবধি কোন গৃহস্থের বউ বাইরে থাকে। এমন যে হবে, আমি আগেই জানি। আস্তাবলের ঘোড়া আর ঘরের বউ ঝি'র রাশ যদি একবার ছেড়ে দেওয়া যায়—'

সরোজিনী বাধা দিয়ে বললেন 'থাক থাক। তোমাদের কার যে কতখানি মুরোদ, তা দেখা গেছে

তারপর ছেলের দিকে তাকালেন সরোজিনী 'যাচ্ছ, যাও। কিন্তু খবরদার ভোম্বল, বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া টগড়া করতে যেয়ো না, অশান্তি বাধিয়ে দরকার নেই। ধীরে সুস্থে যা বলবার পরে বলো।'

সুব্রত কোন কথা না বলে সদরের দিকে এগিয়ে গেল। দরজা খুলে দিতেই আরতি ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল কতক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছি। আচ্ছা বাতিক হয়েছে মনোমোহনবাবুর, সন্ধ্যা হতে না হতেই সব সদর বন্ধ করবেন, তারপর দোর ভেঙে ফেললেও কেউ খুলতে আসবে না।'

সুব্রত স্ত্রীর দিকে তাকাল।

সদর দরজায় আলোর ব্যবস্থা নেই। দোর খুললেই গলির মোড়ের গ্যাসের আলোর খানিকটা এসে পড়ে, সেই আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল আরতির চেহারা—দীর্ঘ দোহারা গড়ন। এই ক'মাসের মধ্যে যেন আরো ইঞ্চিখানেক বেড়েছে আরতি। কিংবা হাই হীল পরেছে বলেই ওই রকম মনে হয়। বাঁ হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। ডান হাতে একটা গ্লুকোজের টিন, আরো কি একটা ঠোঙা। মাথায় আঁচল নেই।

সুব্রত বলল 'সন্ধ্যা হয়ে গেছে দু ঘণ্টা আগে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?'

স্বামীর প্রশ্নের ভঙ্গিতে আরতি একটু হাসল, বলল 'বেড়াচ্ছিলাম লেকের ধারে।'

সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দিল সুব্রত।

আরতি বলল · 'ওকি, চললে নাকি ! দাঁড়াও, হাতের জিনিসগুলো ধরো দেখি একটু।'
সুব্রত বলল 'কেন ?'
আরতি বলল 'আহা ধরবই না, মান যাবে না তাতে, মাথার কাপড়টা একটু ঠিক ক'রে নিই, বাবা মা রয়েছেন।'
সুব্রত বলল 'সারা রাস্তাটাই যখন বেঠিক হয়ে আসতে পারলে, ঘরে ওটুকু লজ্জা না দেখালেও চলবে।'
হন হন ক'রে সুব্রত চলে গেল ভিতরে।
একটু বাদেই আরতি এসে ঘরে ঢুকল। দেখা গেল সুব্রতর সাহায্য ছাড়াই সে মাথায় আঁচল টানবার ব্যবস্থা করতে পেরেছে।
'কেমন আছে মন্দিরা ?'
হাতের জিনিসগুলি তাকের ওপর নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করল আরতি।
প্রথমে কেউ কোন কথা বলল না। একটু বাদে সুব্রত বলল 'সে খোঁজে তোমার কি কোন দরকার আছে ?'
আরতি এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে এগিয়ে এসে ঘুমন্ত মেয়ের কপালে একটু হাত রেখে বলল 'জ্বর এখন অনেক কম।'
পাশের ঘরে সুব্রতর ছোট ভাইবোনেরা পড়া মুখস্থ করছিল আরতির সাড়া পেয়ে ছুটে এল নীলা নন্তু আর সন্তু।
সন্তুর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি 'কমলা লেবু এনেছ বউদি ?'
আরতি ওদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল 'এনেছি।'
প্রিয়গোপাল ধমক দিয়ে উঠলেন 'যাও পড় গিয়ে। রোজ কমলালেবু তোমাদের না হলেই চলবে না, না ?'
আরতি শ্বশুরের দিকে তাকিয়ে বলল 'লেবুগুলো আজ একটু সস্তাতেই পেয়ে গেলাম বাবা। কাল যে লেবু আপনি আটটা ক'রে এনেছিলেন আজ তার চেয়েও বড় লেবু দশটা এনেছি টাকায়। আপনাকে ঠকিয়ে দিয়েছিল।'
প্রিয়গোপাল বললেন 'বুড়ো মানুষকে সবাই ঠকায় মা কিন্তু জিনিস কিনতে হয়, দিনের বেলায় কিনবে। কেনা কাটার জন্য এত রাত করা কি ভালো ?'
আরতি এবার গম্ভীরভাবে জবাব দিল 'কেনা-কাটার জন্য রাত হয়নি বাবা। অফিসের কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম তাছাড়া ট্রামের গোলমালেও দেরি হল খানিকটা।'
সরোজিনী এতক্ষণ বাদে কথা বললেন 'মেয়েকে কি আর রাখা যায় ? সারা বিকেল ভ'রে মা আর মা।'
আরতি একথার কোন জবাব না দিয়ে আটপৌরে একখানা শাড়ি তুলে নিল আলনা থেকে। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল।
সুব্রত এল পিছনে পিছনে 'দাঁড়াও কথা শোন।'
আরতি তাড়াতাড়ি দরজার পাল্লাটা ঠেলে দিয়ে বলল 'কাপড়টা ছাড়তে দাও আগে।'
সুব্রত কঠকণ্ঠে বলল 'পরে ছেড়ো আগে জবাব দাও আমার কথার। আমার নিষেধ সত্ত্বেও কেন অফিসে গেলে, আজ ?'
আরতি ঘরের ভিতর থেকে জবাব দিল 'না গেলে চলবে কি ক'রে ? মেয়ের অসুখের জন্যে বলছ তো ? মন্দিরার সামান্য জ্বর কি পেটের অসুখের জন্য তুমি কামাই করতে পার অফিস ? তা ছাড়া একা তো ফেলে যাইনি তোমার মেয়েকে। বাড়িতে আদর-যত্নের মানুষ আরো না ছিল, তা তো নয়।'
সুব্রত একটু চুপ ক'রে থেকে বলল 'অফিস তোমাকে আমি কামাই করতে বলিনি। যে অফিসের কাজে রাত আটটা অবধি তোমাকে বাইরে থাকতে হয়, বাড়ির কারো সুবিধা-অসুবিধা অসুখ-বিসুখ পর্যন্ত দেখা চলে না, তেমন অফিস তোমাকে কিছুতেই করতে দেব না আমি।'

আরতি বলল 'দেবি তো আব বোজই হয না। তা ছাড়া চাকবি না কবলে চলবেই বা কেমন ক'বে ?'

সুব্রত বলল 'কি ক'বে চলবে, তা আমি বুঝব। এতদিন যে চাকবি কবনি, তাতে অচল ছিল সংসাব ? তা ছাড়া আমাব যখন ভালো একটা পার্ট-টাইম জুটে গেছে, কি দবকাব তোমাব অত কষ্ট ক'বে ?'

শেষ কথাটা বেশ নবম সহানুভূতিব সুবে বলল সুব্রত।

শোযাব সময প্রসঙ্গটা ফেব একবাব উঠল। খাওযা দাওযা সেবে পান মুখে ঘবে যখন শুতে এল আবতি, হাতেব বইটা বন্ধ ক'বে এক-আধটু একথা-ওকথাব পব সুব্রত স্ত্রীকে বলল 'কালই একটা বেজিগনেশন লেটাব ছেড়ে দিযো।'

আবতি এবাব অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল 'আমাব চাকবি ছাড়া নিযে তোমাব অত মাথা ব্যথা হযেছে কেন বল তো ?'

স্থিব দৃষ্টিতে স্ত্রীব দিকে একটুকাল তাকিযে বইল সুব্রত, তাবপব শান্তভাবে বলল 'আজকাল কথাবার্তাব চমৎকাব ধবন হযেছে তোমাব।'

আবতি লজ্জিত ভঙ্গিতে চুপ ক'বে থেকে একটু হাসল 'সত্যি মেজাজ ঠিক থাকে না সব সময। আজ কি বকম ঘোবাঘুবিটা গেছে, তাতে জানো না। সেই টালিগঞ্জ পযন্ত গিযেছিলাম। দেবি তো সেই জন্যই হল। দেবি হলেও কাজ হযেছে, ইন্দিবাবা নেবে একটা মেশিন, বাব টাকা বোজগাবেব ব্যবস্থা হযে গেল।

আবতি ভেবেছিল, কথাটায সুব্রত আগেব মত একটু উল্লাস বোধ কববে। কিন্তু তেমন কোন লক্ষণই দেখা গেল না। সুব্রত তেমনি নীবস আব গম্ভীবভাবে বলল বাত আটটা অবধি যেখানে সেখানে তোমাব ঘোবাঘুবি কবেও দবকাব নেই বোজগাবেবও দবকাব নেই।'

আবতি বলল 'টাকা এলে তো ফেলা যায না' সংসাবেব কাজেই লাগে।

সুব্রত জবাব দিল 'কিন্তু টাকাব চাইতেও বড প্রেস্টিজ, বড পাবিবাবিক শান্তি। তা ছাড়া আমি চাইনে আমাব স্ত্রী শুধু একটা টাকা-আনা পাইযেব থলি হযে থাক।'

আবতি একটু হাসল তুমি আজকাল ঠিক যেন অনেকটা বাবাব মত কথা বলছ।'

বাবা মানে সুব্রতব বাবা।

সুব্রত স্ত্রীব মুখেব দিকে একটুকাল তাকিযে থেকে বলল 'হ্যাঁ বলছি। বলবাব দবকাব হযেছে বলেই বলছি। সংসাবেব প্রযোজনে তোমাকে আমিই চাকবি নিতে বলেছিলাম, আবাব দবকাব বুঝে আমিই তোমাকে ছাড়তে বলছি। চাকবি তোমাকে ছাড়তে হবে।

'বেশ।' ব'লে আবতি পাশ ফিবল এবং তাবপব আব কথা বলল না।

এ মৌনতা যে সম্মতিব লক্ষণ নয, তা বুঝতে দেবি হল না সুব্রতব। আশ্চর্য, দিনেব পব দিন আবতিব জেদ বেড়ে যাচ্ছে। অর্থেব লোভ যাচ্ছে সীমা ছাড়িযে। একে তো সুব্রত কিছুতেই প্রশ্রয দিতে পাবে না। দিনবাত আবতিব এই অর্থোপার্জনেব চেষ্টাকে ভাবি স্থূল মনে হয সুব্রতব, মনে হয আবতিব সমস্ত সুকুমাব বৃত্তি দিনেব পব দিন টাকাব নীচে তলিযে যাচ্ছে।

মাস ছযেক আগে গবজটা অবশ্য প্রথমে সুব্রতই দেখিযেছিল। অফিস থেকে যা মাইনে পায, তা মাসেব পনেব দিন যেতে না যেতেই নিঃশেষ হবাব উপক্রম হয। টিউশনিব টাকাটা নিযমিত আদায হয না। ফলে পবেব দুই সপ্তাহেব বেশন আব বাজাবেব টাকাটা সংগ্রহ কবতে প্রতি মাসে প্রাণান্ত হয সুব্রতব। সংসাবে বোজগেবে সে একা হলেও পোষ্য অনেক। নিজেবা স্বামী-স্ত্রী, আব দুটি ছেলে-মেযে। তা ছাড়া আছেন বুড়ো বাপ, মা, আব ছোট ছোট তিনটি ভাইবোন। ভাই দুটিকে স্কুলে দিতে হযেছে। উল্টোডাঙ্গাব সরু গলিব মধ্যে একতলায় ছোট ছোট দুখানা ঘব। তাবই ভাড়া গুণতে হয মাসে মাসে পঁযতাল্লিশ টাকা। সাংসাবিক খবচ ছাড়াও অসুখ-বিসুখেব খবচ আছে। লোক-লৌকিকতাও কিছু না দেখলে চলে না। ফলে প্রতি মাসে জমাব চেযে খবচেব অঙ্ক ভাবী হযে ওঠে।

টাকা ধাবেব চেষ্টায বেবিযে একদিন বন্ধুব বাড়ি থেকে শুধু হাতে ফিবে এল সুব্রত। আবতি

স্বামীর মুখ দেখেই সব বুঝতে পেরেছিল।

'দেখা হল না বুঝি?'

সুব্রত বিরস মুখে বলল 'দেখা আর হবে না কেন? পরিমল দুঃখ জানিয়ে বলল, তার হাতও এখন ভারি টেকা। বলল, দুজনে মিলে চাকরি করছে, তবু সংসারের খরচের সঙ্গে পেরে উঠছে না।'

কথাটা কানে বাধল আরতির, বলল 'দুজনে মিলে মানে?'

সুব্রত বলল 'দুজনে মিলে মানে মাধুরীও চাকরি করে আজকাল। মাস্টারি করে কি একটা গার্লস স্কুলে। সবাই তো আর আমাদের মত নয়।'

আরতি চুপ ক'রে রইল। খোঁচাটা হজম করল মনে মনে। পরিমলবাবুর স্ত্রী মাধুরীও তাহ'লে চাকরি নিয়েছে। এর আগে আরো কয়েকজন বন্ধু-পত্নীর চাকরির খবর দিয়েছে সুব্রত। কারো মাস্টারি, কারো কেরানীগিরি।

একটু বাদে সুব্রত ফের বলল 'পুরুষ হোক মেয়ে হোক, আজকাল বসে খাওয়ার কি জো আছে কারো? চেষ্টাচরিত্র করে তুমিও যদি একটা জোটাতে পারতে মন্দ হোত না। বিশ হোক, পঁচিশ হোক, যা আনতে, তাতেই সাহায্য হোত আমার।'

আরতি একটু বিস্মিত হয়ে বলল 'আমি? আমাকে চাকরি দেবে কে? তা'ছাড়া তোমরাই কি আর করতে দেবে?'

সুব্রত বলল 'করতে নামলে কেউ কি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারে?'

এতদিন আরতি সংসারের খরচ কমাবার চেষ্টা ক'রে এসেছে। জমা-খরচের খাতা খুলে খুঁটে খুঁটে দেখেছে ব্যয়ের শরণি কোথায় ছাঁটাই চলে। স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে সপ্তাহে তিনদিন নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা করেছে, জামা কাপড়ের বেশির ভাগ নিজেরা কেচে নিয়ে কমিয়েছে ধোপার খরচ কয়লার ব্যয় হ্রাস করবার জন্য সকালে বিকালে গুল দিতে বসেছে নিজের হাতে। প্রতি মাসেই ভেবেছে, সংসারের খরচটা অনেক কম হবে এমাসে। কিন্তু ঠিক সেই মাসেই হয়ত ছিঁড়ে গেছে শ্বশুরের পাঞ্জাবী, কাচতে গিয়ে ফেঁসে গেছে শাশুড়ীর শাড়ি, না হয় মেয়েটা পড়েছে কঠিন অসুখে, কিংবা পাড়ার সিনেমা-হাউসে এসেছে খুব ভালো একখানা বই। লুকিয়ে লুকিয়ে একা তো আর দেখবার জো নেই, সাধ আহ্লাদ সকলেরই আছে।

এবার তার খেয়াল হল, কেবল খরচ কমানো নয়, আয় বাড়াবার দিকেও সে চেষ্টা করতে পারে। একেবারে মূর্খ তো সে নয়। ম্যাট্রিকটা পাশ করেছিল বিয়ের আগে। কলেজেও পড়েছিল বছর খানেক। তারপর বিয়ে হয়ে গেল। শ্বশুর-বাড়ি গাঁয়ে, সেখানে স্কুল-কলেজ নেই। বাবা বলেছিলেন 'বেশ তো, যদি পড়তেই চাস, একটা বছর আমার বাসায় থেকে প ড পরীক্ষা দে। ভয় নেই খরচ নেব না তোর শ্বশুরের কাছ থেকে।'

কিন্তু প্রিয়গোপাল রাজী হননি। আরতির বাবাকে ঠাট্টা ক'রে বলেছিলেন 'বেয়াই মেয়েকে যা শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন, আগে তাই হজম করতে পারি কি না দেখি, তারপর না হয় স্কুল কলেজে পাঠাব।'

পুত্রবধূকে পুজোর ঘর থেকে গোয়ালঘর পর্যন্ত সব দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়ে বলেছিলেন 'সব ভার এবার থেকে তোমার মা। স্কুল বল, কলেজ বল সংসারের চেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় আর নেই। এখানে হাতে-কলমে যা শিখবে, দশটা ইউনিভার্সিটির সাধ্য নেই তা শেখায়।'

তারপর বছর দুয়েকের মধ্যেই জমিদারী সেরেস্তার চাকরি গেল প্রিয়গোপালের। খরচা বেশি পড়ায় গরুটা বিক্রি করে দিতে হল। পুজোর মণ্ডপে ধূপ দীপ থেকে নৈবেদ্যের থালা সবই সংক্ষিপ্ত হয়ে এল। আরো পরে এল পাকিস্তানের হাঙ্গামা। পাঁচজন ভদ্র প্রতিবেশীর দেখাদেখি প্রথমত বাড়ির বয়স্কা বউ-ঝিদের কলকাতায় পাঠালেন প্রিয়গোপাল। কিন্তু সুব্রত লিখল 'দু'জায়গায় খরচ চালাবার আমার সাধ্য নেই। মাকে নিয়ে আপনিও চলে আসুন।'

স্থাবর অস্থাবর খানিকটা ছাড়িয়ে, খানিকটা জ্ঞাতি ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে রেখে শেষ পর্যন্ত প্রিয়গোপালও চলে এলেন ছেলের বাসায়। ভেবেছিলেন, দু'এক মাস থেকেই চলে যাবেন। কিন্তু

যাই যাই ক'রে আব নড়তে পারলেন না। আজ নিজের অসুখ, কাল নাতির, তা ছাড়া সহস্র অভাব-অনটনের মধ্যেও কেমন এক ধরনের সুখও আছে শহরে থেকে। যৌবনের বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন প্রায় সবাই এসে জড়ো হয়েছে শহরে! আনা চারেক পয়সা কোন রকমে পকেটে করতে পারলেই এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে চলে যাওয়া যায়। দেখা-সাক্ষাৎ চলে পুরনো বন্ধু-বান্ধব, কুটুম্ব-স্বজনের সঙ্গে। চাযের দোকানে, রেশনের লাইনে নতুন আলাপও মন্দ লাগে না। মাঝে মাঝে আক্ষেপ করেন প্রিয়গোপাল: 'শহর তো নয়, সপ্তরথীর চক্রব্যূহ। এখানে কেবল ঢুকবার পথ আছে বেরুবাব রাস্তা নেই।'

আরতি বলে: 'বেরুবেন কেন বাবা? থাকুন আমাদের কাছে।'

তারপর আরতি দৈনিক কাগজের কর্মখালির বিজ্ঞাপনের চোখ বুলায়, আর খামের ওপর পোস্টবক্সের নম্বব উদ্ধৃত করে পাঠায আবেদন পত্র।

সে আবেদন নিজেই বচনা ক'রে দেয় সুব্রত, অফিস থেকে নিজেই টাইপ করিযে আনে। আরতি শুধু সুন্দর হাতে নাম স্বাক্ষর কবে। মাঝে মাঝে বেশ লাগে। যেন নতুন রোমাঞ্চেব সন্ধান পেয়েছে দুজনে। নতুন ধরনের যৌথ সৃষ্টি!

কিন্তু লক্ষ্য কেবল ভ্রষ্টই হয়, ভেদ আর হয় না। দু' একটা স্কুল থেকে 'ইণ্টার্বভিউ' হয়ত আসে। তারপর দেখা সাক্ষাৎ ক'রে আসবাব পর শোনা যায়, তারা সেই পোস্টে একজন গ্রাজুয়েটকে পেয়ে গেছে।

অবশেষে এল ক্যানিং স্ট্রীটেব মুখার্জী এণ্ড মুখার্জী ফার্ম থেকে সাক্ষাতেব আমন্ত্রণ। কিছুদিন আগে কয়েকজন ভদ্র ঘরের তরুণী ডিমনস্ট্রেটর চেযেছিলেন তাঁবা। মাইনে শুরুতে একশ, ভবিষ্যতে উন্নতিব আশা আছে।

সুব্রত একবাব বলল: 'কিন্তু—'

আরতিব মনেও যে খুঁতখুঁতি একটু না ছিল, তা নয। মাস্টারি কেবানীগিবিব মত তেমন সম্ভ্রান্ত চাকরি নয়। বন্ধু-বান্ধবদেব কাছে এ চাকবিব কথা কি তেমন ক'বে বলা যাবে?

'কিন্তু মাইনে তো একশ?' আর্বতিব ফেব মনে পড়ে গেল।

এদিকে সুব্রতর টিউশনিব টাকাটা নিয়মিত আদায় হচ্ছে না। ছাত্রটি ফেল কবেছে। এক মাসের টাকা হযত মাবাই যাবে।

একটু চুপ ক'বে থেকে সুব্রত বলল: 'আজকাল অবশ্য বাছাবাছিব কোন মানে হয না, কত জনে কত কি করছে।'

আরতি ম্লানভাবে একটু হাসল: 'আমি তো বাছতে চাইনে। কিন্তু যাবা নেবে, তারা তো বেছেই নেবে? ওদেব কি পছন্দ হবে আমাকে? ইণ্টারভিউতে কি পারব?'

সুব্রত বলল: 'তা কি ক'রে বলব? তবে আমি যদি বোর্ডে থাকতাম, হয়ত পছন্দই করতাম।'

আবতি হাসল: 'হুঁ, তাই না আরো কিছু। তুমি সব চেয়ে আগে অপছন্দ করতে। বঙ্কিমচন্দ্রেব আমলে বাঙ্গালীরা নিজের স্ত্রীর মুখই নাকি সবচেয়ে সুন্দর দেখত। এখন তাদের চোখ বদলেছে।'

অসুস্থ শাশুড়ীকে দেখবার নাম ক'রে সুব্রতই অফিসে যাওয়ার সময় স্ত্রীকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল ক্যানিং স্ট্রীটে। চারতলা বাড়ির দোতলা থেকে ঝুলছে মুখার্জী এণ্ড মুখার্জীর সাইন বোর্ড। করিডোরে একদল মেয়ের ভিড।

সুব্রত নিচ থেকেই বলল: 'যাও ভিড়ে পড়' গিয়ে।'

আর্বতি বলল: 'তুমি যাবে না সঙ্গে?'

সুব্রত বলল: 'হ্যাঁ তোমাব ইণ্টারভিউ হোক, আব আমি স্বামী হয়ে সাক্ষী গোপালের মত দাঁড়িয়ে থাকি! অত ঘাবড়াচ্ছ কেন, ভয় কিসের? আরো কত মেয়ে এসেছে। ক'জন স্বামীকে নিয়ে এসেছে সঙ্গে?'

অবশ্য স্বামী অনেকের হয়নি। সুব্রত আড়চোখে অন্যান্য সাক্ষাৎ-প্রার্থিনীর দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। বেশির ভাগই কুমারী।

সুব্রত বলল: 'তা ছাড়া অফিসে জরুরী কাজ আছে আমাব। দেরি করলে চলবে না।'

তবু আরতি আর একটু কাছে ঘেঁষে বলল : 'কি জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করবে বল দোখ ? ভয়-ভয় করছে, পারব কি পারব না।'

সুব্রত সাহস দিল স্ত্রীকে : 'না পারবার কি আছে ? দোকানের কাজে এমন কিছু সবজান্তা মেয়ের তো আর দরকার নেই। চটপটে চালাক চতুর আছ কিনা, তাই হয়ত দেখে নেবে। তাছাড়া, যে জিনসটা ওরা চেয়েছে, সেই সেলাই টেলাই তো তোমার ভালোই জানা আছে, ভাবনা কি ?'

যেতে যেতে আর একবার পিছন ফিরে তাকাল সুব্রত। আরতির মুখ দেখে মনে হল, বেশ একটু ঘাবড়ে গেছে। মায়াও হল খানিকটা। নিজের প্রথম দিককার ইন্টারভিউগুলির কথা মনে পড়ল। তখন সুব্রতও কি ঘাবাড়ত না ? হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল একটু। হাতে সময় থাকলে আর কাজের চাপ না থাকলে, আরতির কাছেই সে থেকে যেতে পারত।

অফিস থেকে ফিরে আসবার পর চায়ের সঙ্গে স্বামীকে সুখবব দিল আরতি—মেয়ে ছিল তেইশ জন, গ্র্যাজুয়েটও ছিল জন দুই, তাদের মধ্যে চার জনকে পছন্দ হয়েছে মুখার্জী এণ্ড মুখার্জীর, আরতি সেই চারজনের অন্যতম।

সুব্রত চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল : 'কি ক'রে বুঝলে যে তুমি মনোনীতাই হয়েছ, অমনোনীতাদের দলে পড়নি ?'

আরতি একটু হাসল : 'তা কি আর বুঝতে বাকি থাকে ? তা ছাড়া সিনিয়র মুখার্জী একরকম স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন আসবার সময়। আমাব সংসারে কে কে আছে, ছেলে পুলে রেখে আসতে পারব কিনা, অভিভাবকদের মত হবে কিনা—খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞেস করবার পর বলেই দিলেন, আমাকে তাঁদেব পছন্দ হয়েছে। দু'তিন দিনেব মধ্যেই এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার আসবে।'

এলও তাই। ইংরেজীতে চিঠি এল আরতি মজুমদারেব নামে। মুখার্জী এণ্ড মুখার্জী তাকে অস্থায়িভাবে অফিস এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হিসাবে নিয়োগ করতে পেরে আনন্দিত হয়েছেন। কাজের যোগ্যতা দেখে তিনমাস পবে স্থায়ী পদেব অধিকার দেওযা হবে।

সুব্রত জিজ্ঞেস করল : 'কাজটা কি ?'

কাজ এমন কিছু শক্ত নয়। স্টেশনারী স্টোর্স ছাড়াও বোম্বাই থেকে নূতন ধবনেব এক উলেন মেশিনের এজেন্সী নিয়েছেন মুখার্জী এণ্ড মুখার্জী। সে মেশিনে শীতের সোয়েটাব আর জাম্পার তৈরি হবে। গবমেব দিনেও তৈরি করা যাবে মেয়েদের নানা ধরনের অঙ্গাবরণ। প্রথমে যন্ত্রের ব্যবহাব শিখে নিতে হবে কোম্পানীরই এক মেমসাহেবেব কাছে, তারপর ব্যবহাব শিখিয়ে দিয়ে আসতে হবে ক্রেতাদেব মানে ক্রেতীদের ঘরে ঘরে গিয়ে। আড়াইশো টাকা দামেব মেশিন। প্রধানত সখেরই জিনিস। অবস্থাপন্ন বড় লোকের ঘবে ছাড়া বড় একটা বিক্রী হবে না। মুখার্জী এণ্ড মুখার্জী এমন মেয়ে চান, যে নিম্নমধ্যবিত্ত ঘব থেকে এলেও অভিজাত পবিবাবের মেয়েদের সঙ্গে রুচিসম্মতভাবে আলাপ ব্যবহার কবতে পাববে। যাদের চেহারা চোখকে পীড়িত কবে না, আচার-আচরণ, কথাবার্তা মনকে প্রসন্ন করে, এমন মেয়েদের চেয়েছিলেন মুখার্জী এণ্ড মুখার্জী।

আরতি সে পরীক্ষায উত্তীর্ণ হযেছে।

কিন্তু এরপব আব প্রসঙ্গটা বাপ-মার কাছে গোপন রাখলে চলে না।

সুব্রত স্ত্রীকে বলল : 'তুমিই বল বাবাকে। তোমাকে স্নেহ করেন।'

আরতি বলল : 'আব তোমাকে বুঝি করেন না ? আমি কিছুতেই ওঁদের কাছে বলতে পাবব না।'

সুতরাং সুব্রতই বলল।

প্রিয়গোপালেব গড়গড়া থেমে গেল। খানিকক্ষণ গম্ভীরভাবে চুপ ক'বে রইলেন। তাবপর বললেন : 'একথা তুমি উচ্চাবণ কবলে কি ক'বে ভোম্বল ! আমি বেঁচে থাকতে মজুমদার বাড়ির বউ চাকরি করবে, আর আমি তা চোখ মেলে দেখব ?'

সরোজিনী বললেন : 'তোমরা যে ভিতরে ভিতরে একটা কিছু পাকিয়ে তুলছ, তা আমি গোড়াতেই টের পেয়েছিলাম। বেশ করুক বউ চাকরি। আমি কিন্তু এখানে আর থাকব না। আমাকে তাহলে পটলডাঙ্গায় দিয়ে এস।'

পটলডাঙ্গায় সরোজিনীর বড় ভাইয়ের বাসা।

বন্ধু-বান্ধব মহলে চাকুবিবতী স্ত্রী কাব কাব ঘবে আছে, তাব একটা লম্বা তালিকা দিলে সুব্রত।

কিন্তু প্রিযগোপাল অটল থেকে বললেন 'যাবা কবে, তাবা করুক। আমাদেব বংশে ওসব কোনদিন হযনি, হবেও না।'

সুব্রতবও একগুঁযেমি কম নয। প্রথমে খুব একচোট তর্ক বিতর্ক কবল বাপেব সঙ্গে। তাবপব হঠাৎ বলে বসল 'বেশ, তাহলে সংসাব কিভাবে চলবে, তাই ভাবুন। আমি আমাব সাধ্যমত কবছি। এক মুহূর্তও তো বসে নেই। কিন্তু এত বড সংসাব একাব চাকবিতে চালিযে নেওযা কাবোবই সাধ্য নেই আজকাল।'

প্রিযগোপাল কি বলতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ ছেলেব মুখেব দিকে তাকিযে থেমে গেলেন। হাতুডিব ঘাযেব মত লাগল একটা কথা—এত বড সংসাব!

ভোম্বলেব সংসাব বড কবেছেন তাঁবাই—স্বামী-স্ত্রী আব নাবালক তিনটি ছেলেমেযে। সেই খোঁটাই কি তাঁকে দিচ্ছে ভোম্বল? এত বড আঘাত বুডো রুগ্ন বাপকে ভোম্বল দিতে পাবল? সে কি কোনদিন ছোট ছিল না? তাকে কি খাইযে পবিযে লেখাপডা শিখিযে প্রিযগোপাল মানুষ কবে তোলেনি? নাকি মাযেব পেট থেকে পডেই ভোম্বল বড হযেছে, চাকবি কবতে শিখেছে?

দুঃখে, ভাবাবেগে খানিকক্ষণ মুখ দিযে কথা বেরুল না প্রিযগোপালেব। তাবপব যে অস্ত্র ছেলে তাঁকে ছুঁডে মেবেছে সেই অস্ত্রেই তিনি ফেব আঘাত কবলেন ছেলেকে। দেখিযে দিলেন তাবও পৌরুষেব তাবও ক্ষমতাব ক্ষীণতা। বললেন 'এত বড সংসাব! কাচ্চাবাচ্চা নিযে সবসুদ্ধ সাত আটটি খাইযে। কিন্তু সতেব বছব বযসে চোদ্দটি পোষ্য আমি একা ঘাডে নিযেছিলাম ভোম্বল। তাব জন্য তোমাব মাকে চাকবিতে পাঠাতে হযনি।'

সুব্রত জবাব দিতে পাবত সেদিন আব নেই। তাছাডা স্ত্রীব চাকবি কবা সে মর্যাদাহানিকবও মনে কবে না। কিন্তু কোন কথা না বলে নিজেব সঙ্কল্পে অটুট বইল। প্রিযগোপাল বললেন তিনি স্ত্রী আব ছোট ছেলেদেব নিযে দেশে চলে যাবেন কিন্তু মাসেব শেষে কোথায পথ খবচ? নতুন ইংবেজী মাস না পডলে সুব্রত তাঁকে যাওযাব খবচও দিতে পাববে না।

তাবপব সুব্রতই জযী হল। বজায বাখল তাব নিজেব জেদ জেদ না যুক্তিমার্গ।

পবদিন শ্বশুব খেলেন না শাশুডী খেলেন না বেলা ন'টা বাজতে না বাজতে স্বামীব পাতে খেতে বসতে নিজেবও যেন বাধো বাধো লাগল আবতিব। সবোজিনী গম্ভীব মুখে পবিবেশন কবে গেলেন। অর্ধেকেব বেশি ভাত পডে বইল পাতে।

সাধাবণত বঙীন বেশবাসই আবতিব পছন্দ। কিন্তু সেদিন পবল ফিতে পেডে সাদা খোলেব শান্তিপুবী। গাযেব সাদা ব্লাউজেব হাতায সামান্য একটু এমব্রযডাবীব ছোঁযা গহনাব মধ্যে দু'গাছা কবে চুডি আব গলায সরু হাব। মুখে প্রসাধনেব ক্ষীণ আভাস আছে কি নেই। খাওযাব পবে একটা পান ছাডা আবতিব চলে না কিন্তু আজ শুধু মুখে তুলল এক টুকবো সুপাবীব কুচি। পান খেযে অফিসে বেবোন শোভন নয তাতে ঠোঁট দুটো লাল হয ঠিকই কিন্তু দাঁতেব কুন্দশুভ্রতা অক্ষুণ্ণ থাকে না।

তেব বছবেব ননদ নীলা এসে কানে কানে বলল বউদি, আজ কিন্তু তোমাকে ভাবি সুন্দব দেখাচ্ছে।

প্রথমে একটু লজ্জিত হল আবতি তাবপব সস্নেহে তাব গাল টিপে দিল 'নিন্দুক কোথাকাব! অন্যদিন বুঝি খুব কুচ্ছিৎ দেখায?

কিন্তু বাসা থেকে বেরুবাব মুখে আব এক ফ্যাসাদ বাধল। এক বছবেব ছেলে বাবলু তাব ছোটপিসীব কোল থকে বাব বাব ঝাঁপিযে পডছে, মাব কাছে যাবে। এদিকে তিন বছবেব মেযে মন্দিবা এসে আবতিব শাডিব খুঁট মুঠিব মধ্যে চেপে ধবেছে 'আমি চাকলি কবতে যাব মা। আমাকেও নিযে যাও!

আবতি মুখ ফিবিযে গোপন কবল ছল ছল চোখ। তাবপব ফেব মেযেব দিকে তাকিযে সস্নেহে হাসল 'যেযো, তোমাব চাকবি ঠিক হোক আগে, তাবপব যেযো।'

কিন্তু মন্দিবা এখনই যাবে। তাব চাকবি ঠিক হযে গেছে। আজই তাব 'জযেন' কবা চাই।

প্রিয়গোপাল বাসা থেকে বেবিয়ে গেছেন। কিন্তু সবোজিনী ঘব থেকে বেরুলেন না। জেদ কবেই ধবলেন না নাতি-নাতনীকে। বললেন 'কেন, চাকবি কবতে যেতে পাবে, ছেলেমেয়েব ব্যবস্থা ক'বে যেতে পাবে না? ঝি চাকব বেখে যাক ছেলেমেয়ে আগলাবে। আমি কাবো ছেলেমেয়ে বাখতে পাবব না'

দুঃখে অভিমানে চোখ সবোজিনীবও ছল ছল ক'বে উঠল আশা ক'বে বিয়ে দিয়েছিলাম ভোম্বলকে খুব সুখ হল আমাব।

দাদাব ধমক খেয়ে নীলা আব নন্তু সন্তুই জোব কবে সবিয়ে নিয়ে গেল মন্দিবা আব বাবলুকে। গলি ছাড়িয়ে বড বাস্তা পর্যন্ত ছেলেমেয়েব কান্না ভেসে আসতে লাগল। স্বামীব সঙ্গে ট্রামে উঠে পাশাপাশি বসেও সেই কান্নাব শব্দই বাজতে লাগল আবতিব কানে।

সুব্রত বলল ব্যাপাব কি বাব বাব বাইবেব দিকে কি দেখছ অমন ক'বে?'

আবতি কুণ্ঠিত কাতব স্বরে বলল মনটা ভাবি খবাপ লাগছে। অন্যদিনে ওবা তো আমাব কাছে মোটেই ঘেঁষে না ঠাকুবদা ঠাকুবমা কাকা পিসি--এদেব কোলেপিঠেই থাকে। কিন্তু আজ দেখালে তো কাণ্ড?

সুব্রত ঠোঁটে সিগাবেট চেপে সংক্ষেপে জবাব দিল দেখলাম

আবতি আর্দ্রস্বরে বলল আজ সাবাদিনই ওবা দুজনে বোধ হয় কাঁদবে'

সিগাবেটেব ধোঁয়া ছেড়ে সুব্রত হাসল কেবল কি দুজন? আবো একজনেব চোখেব জলে ভেসে যাবে কাদিন ধ'বে। এমনি ক'বেই চাকবি কববে তুমি?

কিন্তু দু সপ্তাহ যেতে না যেতে আবতি সুব্রতকে দেখিয়ে দিল সত্যিই কি ক'বে চাকবি কবতে হয় এমন যে অবিশ্বাসী সুব্রত সে পর্যন্ত হাব মানল। ভোবে উঠে সংসাব যাত্রা সুরু হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে আবতিব অফিস যাত্রাব প্রস্তুতিও চলতে থাকে। সকালেই স্নান সেবে নেয় চায়েব পাটটা কোন বকমে সাবে চোখ বুলায় খববেব কাগজে। কিন্তু বান্নাঘবেব পাট নিঃশেষে অনিবার্য ভাবেই পড়েছে সবোজিনীব ওপব আবতি মাঝে মাঝে সাহায্য কবতে যায় মাছ তবকাবি কুটে ধুয়ে দেয়। চাকবি নেওয়াব আগে আবতি যেটুকু কবত বড়জোব সেটুকুই কবে কান্নাব প্রধান দায়িত্ব নিতে হয় সবোজিনীকেই কাজ কবতে কবতে ক্ষোভ কবেন সবোজিনী এসেছি হেসেল ঠেলতে হেঁসেল ঠেলেই যাই ছেলেব বিয়ে দিয়ে খুব সুখ হল আমাব।

প্রায় সাতটা থেকেই আবতি নাইতে যাওয়াব তাগিদ দিতে থাকে সুব্রতকে বলে এখন ওঠ। এব পব বাথরুম খালি পাবে না লেট হয়ে যাবে অফিসে

সুব্রত জবাব দেয় আমাব লেট হবাব ভয় নেই ঠিক সময় গিয়েই পৌঁছব কিন্তু তুমি না হয় লেট এক আধ দিন হলেই

আবতি যেন শিউবে উঠে ওবে বাবা! হিমাংশুবাবু মোটেই তা পছন্দ কবেন না।

মুখার্জী এণ্ড মুখার্জীব ব্যবসেব দিক থেকেই জুনিয়াব হিমাংশু মুখুয্যে কিন্তু আধিপত্যে পদমর্যাদায় তিনিই সিনিয়বিটি সাহেবী মেজাজেব মানুষ সময় আব নিয়মানুবর্তিতা বক্ষাব দিকে বিশেষ ঝোঁক এক চোখ এ্যাটেনডেন্স খাতায় আব এক চোখ ঘড়িব কাঁটায়। কিন্তু সমান চোখে দেখেন সব কর্মচাবীকে। মেয়ে পুরুষ বলে ভেদ কবেন না। মেয়েদেব জন্য আলাদা বসবাব জায়গা অফিসে আছে কিন্তু তাই বলে মেয়েদেব জন্য আলাদা পক্ষপাত নেই তাঁব মনে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশেব মধ্যে বয়স দীর্ঘ বলিষ্ঠ গড়ন রূপবান ঠিক বলা যায় না কিন্তু স্বাস্থ্যে, সপ্রতিভ বুদ্ধিব ঔজ্জ্বল্যে রূপেব ত্রুটি চোখেই পড়ে না। অবস্থাপন্ন বড ঘবেব ছেলে। বিয়ে কবেছেন মধ্যবিত্ত ঘবেব একটি এম এ পাশ মেয়েকে।

'লাভ ম্যাবেজ'। বলে মৃদু হেসেছিল আবতি একদিন গাড়িতে এসেছিলেন অফিস পর্যন্ত। ভাবি মিষ্টি চেহাবা।

হিমাংশু মুখুয্যেব চমৎকাব স্বাস্থ্য আব তাঁব স্ত্রীব মিষ্টি চেহাবা। কিন্তু সবটুকু গর্ব যেন আবতিব নিজেব। তাব বর্ণনাব ভঙ্গিতে সেইবকমই মনে হয়েছিল সুব্রতব।

সুব্রতকে তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিয়ে আবতি তাব পাতে অসঙ্কোচে বসে যায়, সবোজিনীকে ডেকে

বলে : 'দিন মা, কি রান্না হয়েছে। দিন তাড়াতাড়ি।'

এখন আর আরতির পাতে ভাত পড়ে থাকে না। সুব্রতর চেয়েও সে তাড়াতাড়ি খেয়ে নেয়, দেরি হয়ে গেলে কোনদিন তার পাশেই আর একখানা থালা নিয়ে বসে পড়ে। সরোজিনী সরে যান। নীলা পরিবেশন করতে করতে মৃদুস্বরে বলে : 'আবার আলাদা কেন ? এক সঙ্গে বসে গেলেই পারতে বউদি। বেশ হোত দেখতে।'

খুবই স্বাভাবিক বন্দোবস্ত। তবু কোথায় যেন খোঁচা লাগে সুব্রতব মনে।

তারপরে শাড়ি বদলাবার পালা। তিনদিন বাদে বাদে অফিসের শাড়ি বদলায় আরতি। আর একখানা ধুতিতে সুব্রতকে কমের পক্ষে পাঁচ দিন চালাতে হয়। কথাটা একদিন উল্লেখ করায় আরতি বলেছিল : 'মিঃ মুখার্জী 'শ্যাবিনেস্' বড় অপছন্দ করেন। তিনি নিজেও যেমন 'টিপটপ' থাকেন, নিজেব অফিসটিকেও তেমনি রাখতে চান।'

কিন্তু আরতিব গর্ব কেবল হিমাংশু মুখার্জীকে নিয়েই নয়। নতুন মেসিনেব ক্রেত্রীদেব ব্যবহার শেখাতে গিয়ে ভবানীপুর, বালিগঞ্জেব নতুন নতুন অভিজাত পবিবাবেব সঙ্গে প্রায় বোজ আলাপ হয় আব্তর। তাঁদের বিচিত্র প্যাটার্নেব দোতলা, তেতলা সব বাড়ি। গ্যাবেজে গাড়ি পড়ে আছে নতুন নতুন মডেলের, কারো একখানা, কাবও বা একাধিক। বাড়িব বড় বড ঘরগুলি সুপরিচ্ছন্ন, রুচিসম্মত আসবাবে সাজানো। সুদৃশ্য কাচের আলমারিতে বাশি বাশি বাঁধান বই। দেখলে চোখ মুগ্ধ হয়। মেয়েরা প্রায় সবাই রূপবতী। শিক্ষায়, শালীনতায়, মধুর-স্বভাবা। আবতি যেখানেই যায়, আদর-আপ্যায়ন, খাতির-যত্ন পায়। একদিন গিয়েছিল চিত্তরঞ্জন এভিনিযুতে এক মাড়োযাবীব বাড়ি। সে বাড়িব একটি সুন্দরী বউ নিয়েছে আবতিদেব মেশিন। কেবল বউটিই সুন্দবী নয, তাব স্বামীও রূপবান। পঁচিশ ছাব্বিশ বছব বয়স। মাড়োযাবী হলে হবে কি ভুঁড়ি নেই। আলাপ-ব্যবহাবে ভাবি সুজন। আসবার সময় তিনি সস্ত্রীক গাড়ি নিযে বেরোলেন। আবতিকেও না তুলে ছাড়লেন না।

সুব্রত ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছিল · 'তুমি উঠতে গেলে কেন তাদেব গাড়িতে ?'

আরতি জবাব দিয়েছে : 'বা রে তাতে কি হযেছে ? ভদ্রলোক অত ক'বে বললেন, তাছাড়া তাঁব স্ত্রীও তো সঙ্গে ছিলেন। দোষ কি ?'

মাড়োযারী ভদ্রলোকেব খুব কৌতূহল। আরতিদেব বাড়ি আব অফিস সম্বন্ধে অনেক কথা তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা অবশ্য ইংবেজীতেই হচ্ছিল। তাঁব স্ত্রী ইংবেজী জানেন না, তাঁর সঙ্গে চালাতে হযেছিল হিন্দী। তাব ড্রাইভাবটি বাঙালী। ঢাকা জেলার লোক। তাব সঙ্গে একেবাবে নিজের মাতৃভাষা ব্যবহার কবেছিল আবতি।

'এক সঙ্গে তিন-তিনটি ভাষা—তোমাব কোনদিন সুযোগ হয়েছে বলবাব ?'

আত্মপ্রসাদে উচ্ছল, উৎফুল্ল দুটি চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়েছিল আবতি।

'কিন্তু ইংরেজী সত্যি সত্যি বলতে পারলে তো ?' সুব্রত সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস কবেছিল।

'কেন পাবব না ? কলোকিয়াল ইংলিশ এডিথেব সঙ্গে কথা বলতে বলতে আমার বেশ বপ্ত হয়ে গেছে।' জবাব দিয়েছিল আবতি।

এই এডিথের কথাও মাঝে মাঝে শুনেছে সুব্রত। আবতিব এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান 'কলিগ'। মুখার্জী এণ্ড মুখার্জী তাকেও নিয়েছেন। সাহেব পাড়ায় কি অন্যান্য অবাঙালী মহলে যেখানে যেখানে মেশিন বিক্রি হয়, সেখানে যায় এডিথ সিমনস। বয়সে আরতির চাইতে বড়ই হবে। কিন্তু এমন সেজে-গুজে আসে যে ছোট দেখায়। আবতিব কাছে তার রূপ-বর্ণনা শুনতে শুনতে বেঁটে, কালো ঠোঁটে কড়া লিপস্টিক আর আঙুলের নখে পালিশ লাগানো একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের রূপ সুব্রতর চোখে ভেসে ওঠে।

সুব্রত সাবধান ক'রে দেয় : 'খবরদার ওসব মেয়ের সঙ্গে মোটেই মিশবে না।'

আরতি বলে : 'মিশি কি আর তেমন ? এক সঙ্গে কাজ করতে গেলে যতটুকু আলাপ-পরিচয় রাখতে হয় ততটুকু, তার বেশি না। কিন্তু আগে কথায় কথায় বলত কি জানো ? —I can't follow you. তোমার ইংরেজী প্রায়ই জার্মান আব ইটালীয়ানের মত শোনায়। তার চেয়ে তুমি হিন্দীতেই বল। আমি হিন্দী জানি।'

কিন্তু আরতি নাছোড়বান্দা। সে যতটা লেখাপড়া শিখেছে, তার সিকির সিকিও এডিথও শিখেছে নাকি যে, সে আরতির ইংরেজী উচ্চারণের দোষ ধরতে যায়?

আরতিও এডিথকে শুনিয়ে দিয়েছে,—'তুমি 'ফলো' করতে না পারো আমি নাচার মিসেস্ সিমনস্। এতদিন তোমাদের উচ্চারণ আমরা নকল করেছি, তোমাদের বদ বাংলা উচ্চারণ সহ্য করেছি, এখন দয়া ক'রে আমরা যে ইংরেজী বলি, তাই যথেষ্ট। এবার থেকে আমাদের উচ্চাবণই তোমাদের রপ্ত ক'রে নিতে হবে।'

স্বামীর কাছে এডিথ-সমাচার বলতে বলতে খিল খিল ক'রে হেসে উঠেছিল আরতি : 'কি বল, ঠিক বলিনি?'

প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে দেবর, ননদ আর ছেলেমেয়েদের জন্য লজেনস্ আর লেবু, শাশুড়ীব জন্য এক কৌটো ভালো জরদা, অসুস্থ শ্বশুরের জন্য এক ঠোঙা আঙুর, আর স্বামীর জন্য এক টিন ভালো সিগারেট, আর নিজের দুটো ব্লাউসের জন্য দু' গজ অর্গাণ্ডি কিনে এনেছিল আবতি।

সুব্রত দেখে মুখ ভার ক'রে বলেছিল : 'অর্ধেক টাকা বোধ হয় বাজারেই রেখে এলে?'

আরতি বলেছিল : ঈস্! তাই ভেবেছ বুঝি? এই দেখ।'

হ্যাণ্ডব্যাগের ভিতর থেকে ছোট আর একটি ব্যাগ খুলে একশ টাকার আস্ত নোটখানাই স্বামীকে বের ক'রে দেখিয়েছিল আরতি।

সুব্রত একটু বিস্মিত হয়ে বলেছিল : 'তাহলে বাকি টাকাটা কোথায় পেলে? প্রথম মাসেই হিমাংশুবাবু কর্মচারীদের বক্‌শিস্ দিলেন নাকি?' বলে অদ্ভুত একটু হেসেছিল সুব্রত।

আরতি একটু যেন আরক্ত হয়ে উঠেছিল, তারপর স্বামীকে ধমকের সুরে বলেছিল : 'ভাবি বিশ্রী ধবন তোমাব কথা... : বক্‌শিস্ দিতে আসবেন তিনি কোন্ সাহসে? আমি কি ঝি-চাকর? বক্‌শিস্ নয়--পাওনা। হিমাংশুবাবুর দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না, আমরা জোর ক'রে আদায় ক'রে নিয়েছি।'

তারপব স্বামীকে সমস্ত ব্যাপারটা খুলে বুঝিয়ে দিয়েছিল আরতি। উলেন মেশিন বিক্রিব কমিশন। এডিথ নিজেব বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিক্রি করেছে দুটো, আরতি একটা, মল্লিকা একটা, রমা একটাও না। এজেন্টবা সাড়ে বাব থেকে পনের পার্সেন্ট কমিশন পায়। কিন্তু আরতিরা অফিসে কাজ কবে বলে হিমাংশুবাবুর একেবারেই ফাঁকি দেওয়ার মতলব ছিল। হাসতে হাসতে বলেছিলেন : 'এতো আপনাদের নিজেদেরই অফিস। মেশিনটার যত পাবলিসিটি হয়, ততই আপনাদের পক্ষে ভালো, আপনারা তো আব বাইরের কেউ নন, যে আলাদা কমিশন দিতে হবে।'

কিন্তু বড় ঝানু মেয়ে এডিথ। তাকে ভুলানো অত সহজ না। এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে তো। তাব চোখে মুখে কথা। কিন্তু এ ব্যাপারে সে নিজে মুখ খোলেনি, আরতিকেই চোখ টিপে দিয়েছিল। কাবণ যোগ্যতার জন্য আরতিকে মিঃ মুখার্জী যে বেশ একটু খাতির করেন, তা সবাই জানে। আরতিই বলে কয়ে শেষ পর্যন্ত ফাইভ পার্সেন্ট কমিশন আদায় করেছে। তার জন্য এডিথ্‌রা সবাই তার কাছে কৃতজ্ঞ। বেচারা রমা উপ্‌রি টাকা না পেয়ে মুখ কালো ক'রে ফিবে যাচ্ছিল। আরতিরা সবাই মিলে চাঁদা ক'রে তাকে রেস্টুরেণ্টে খাইয়ে দিয়েছে, সেই সঙ্গে উপহার দিয়েছে ভালো এক কৌটো স্নো।

সেদিন অনেকদিন পরে ভাল সিগারেট টেনেছিল সুব্রত। কিন্তু ঠিক যেন আগেকার মত স্বাদ নেই। অফিসের মাইনে থেকে পুরো টাকা কোনদিনই সুব্রত ঘরে আনতে পারে না। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আর রিফ্রেশমেণ্ট রুমে টাকা পনের রেখে আসতে হয়। কিন্তু চাকরির প্রথম মাসেই মাইনে ছাড়া উপ্‌রি এনেছে আরতি। এদিক থেকে তার কৃতিত্ব আছে বই কি! কিন্তু পার্সেন্ট আর কমিশন কথাগুলির মধ্যে কেমন যেন একটা কমার্শিয়াল গন্ধ। দামী সিগারেটের সুগন্ধকে তা ডুবিয়ে দিয়েছে।

একশ টাকার নোটখানা প্রথমে শ্বশুরের কাছেই নিয়ে গিয়েছিল আরতি। কিন্তু প্রিয়গোপাল সে টাকা ছোঁননি। পুত্রবধূর দিকে মুহূর্তকাল জ্বলন্ত চোখে তাকিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আশ্চর্য, গলায় তাঁর আগুন ঝরেনি, জল ঝরেছিল। আর্দ্র স্বরে প্রিয়গোপাল বলেছিলেন : 'আমাকে অপমান করতে এসেছ মা?'

শ্বশুরের কথার ভঙ্গিতে আরতির বুকের মধ্যে ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠেছিল। একটু চুপ ক'রে থেকে মৃদু মোলায়েম গলায় বলেছিল আরতি 'না, বাবা, প্রণামী দিতে এসেছি। আজ শুনেছি, আপনার জন্মদিন।'

রুগ্ন, শয্যাশায়ী প্রিয়গোপাল ঝোঁকের মাথায় উঠে বসেছিলেন, মাথা নেড়ে বলেছিলেন 'না না, ভুল শুনেছ, আজ আমার মৃত্যুদিন। যত মধুর ক'রেই বল না মা, ওটা প্রণামী না, ঘুষ। তোমরা ঠিকই জানো, এ ঘুষ কোন না কোন রকমে আমাকে নিতেই হবে। তাই এত সাহস তোমাদের।'

জমিদারী সেরেস্তার কাজে ঘুষ তো প্রিয়গোপাল মাঝে মাঝে নিয়েছেন, কেবল প্রজাদের কাছ থেকে নয় প্রজাদের বউয়েরাও সিকিটা আধুলিটা যে যা পারে দিয়েছে। তারাও বলেছে প্রণামী। তখন হাত ফেরাননি প্রিয়গোপাল। তাদের কাছে হাত পাতাই ছিল দস্তুর। সত্যি সত্যি যেন ন্যায্য প্রণামীই তখন আদায় করেছেন প্রিয়গোপাল। কিন্তু আজ পুত্রবধূর এই প্রণামীর স্বরূপ তাঁর বুঝতে বাকি নেই। তাঁর আদর্শ, তাঁর সংস্কার, তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বকে মাত্র ওই একশ টাকার একখানা নোটে কিনে নিতে এসেছে আরতি যৌবনে কি এমন শত শত টাকা রোজগার করেননি প্রিয়গোপাল? শত শত নোট ওড়াননি হাওয়ায়?

সরোজিনী কিন্তু ছেলে আর ছেলের বউয়ের পক্ষ নিয়েছিলেন, স্বামীকে তিরস্কার ক'রে বলেছিলেন তোমার কি বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে? প্রথম মাসের মাইনে বউটা কত সাধ ক'রে দিতে গেছে, আর তুমি অমন যা তা বলে ওকে কাঁদিয়ে দিচ্ছ? নাও, হাত পেতে নাও।'

কিন্তু প্রিয়গোপাল মাথা নেড়েছিলেন 'নিতে হয়, তুমি নাও ভোম্বলের মা।'

তারপর থেকে সবই আবার প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছিল। কেবল স্বাভাবিক নয় আগের চাইতে সচ্ছলও সব সময়ের জন্য বাসায় একটি ঝি রাখা হয়েছে। বাইরের কাজকর্ম সে সবই করে। ইচ্ছা করলে তাকে দিয়ে রাধানোও যায়। কিন্তু জাতে বামুন নয় বলে প্রিয়গোপাল আর সরোজিনী আপত্তি করেছেন। নীলা এতদিন বাড়িতে পড়ত বউদির কাছে। এবার থেকে তাকেও স্কুলে দেওয়া হয়েছে। অসুবিধার আর তেমন কোন কারণ নেই।

কিন্তু সাংসারিক সুবিধাটাই তো সব নয়। সুব্রতর মনে হয় সংসারের চেহারাটাও দিনের পর দিন বদলে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম হয় পাতে না হয় সঙ্গে খেতে বসত আরতি আজকাল সুব্রতর আগেই সে বেরিয়ে যায়। তাদের অফিস আধঘণ্টা এগিয়ে এসেছে। সাড়ে ন'টায় বসে আজকাল। আরতিরা আপত্তি করেছিল। কিন্তু কাজের চাপের কথা বলে মিঃ মুখার্জী তাদের নিরস্ত করেছেন, বলেছেন এস্টাব্লিশমেন্ট খরচ তো দেখছেন। গোড়ায় খেটেখুটে কোম্পানীকে একবার দাঁড় করিয়ে দিন। তারপর দুপুরে বিকালে যখন খুশি আসবেন। কিন্তু প্রথম প্রথম দয়া ক'রে একটু সকাল সকালই আসতে হবে সবাইকে।'

আরতি স্বামীর দিকে তাকিয়ে নিগূঢ় রহস্যে একটু হেসেছিল 'সেই ফাইভ পার্সেন্টের জের, বুঝেছ? আমরাও এর ওষুধ জানি, দেখা যাক।

সুব্রত সংক্ষেপে বলেছিল 'হু।

প্রথম দিন কয়েক অফিসে যাওয়ার সময় স্ত্রীর সঙ্গে একই ট্রামে উঠত সুব্রত। ট্রামের হাতলে ঠেকত পরস্পরের হাত, একই বেঞ্চে দুজনে বসত পাশাপাশি। ঠিক গা ঘেঁষে যে তা নয়, বরং একটু দূরে দূরে ফাঁক রেখে। কিন্তু সেই ফাঁকটুকু ভরে উঠত রোমান্সে। রোমান্স—হ্যাঁ,—বিবাহিতা স্ত্রীর পাশে বসেও রোমাঞ্চ হয়েছে সুব্রতর। আঁটসাঁট ভঙ্গিতে শাড়ি পরে অফিসে বেরোয় আরতি। একটু চটুল স্বভাবের ওপরে পড়ে গাম্ভীর্যের আভরণ। ট্রাম-বাসে, পথে ঘাটে সংযত গম্ভীরভাবে চলতে সুব্রত শিখিয়ে দিয়েছে স্ত্রীকে, সে উপদেশ আরতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। এমন কি স্বামীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটতে দেয়নি। যেতে যেতে খুব কম কথা হয় দুজনের মধ্যে। যেন সবে সামান্য পরিচয় হয়েছে,—খুলতে শুরু হয়েছে অসামান্য রহস্যের আবরণ। কল্পনা ক'রে ভারি অদ্ভুত লাগে সুব্রতর। প্রেমজ বিবাহ নয় তাদের। বিবাহজ প্রেমের স্বাদ প্রথম বছরে যা ছিল, দ্বিতীয়-তৃতীয় বছরে তা যেন অনেকখানি গিয়েছিল পানসে হয়ে। অফিস যাত্রার প্রথম ক'দিন নতুন ক'রে যেন সেই প্রথম বছর ফিরে এল। একেকবার এমনও মনে হল এ কেবল বিয়েরই প্রথম বছর

নয়, প্রাক-বৈবাহিক কোন প্রেমের প্রথম বছর। আরতি যেন শুধু আর অতি পরিচিতা নিত্যকার জীবনসঙ্গিনী নয়, সেই সঙ্গে মাত্র আধ ঘণ্টার যাত্রাসঙ্গিনীও। সহজলভ্যা স্ত্রীর পরস্ত্রীর সুদূর দুর্ভেদ্য রহস্যময় রূপ প্রথম ক'দিন দেখতে পেল সুব্রত।

কিন্তু অফিসের সময় বদলে যাওয়ায় শেষ হল সেই যৌথ যাত্রার রোমান্স। সুব্রতর অনেক আগে আরতি খেয়ে বেরিয়ে যায়। আগে আগে ছুটির দিনে বেলা দু'টোর সময় যখন বন্ধুদের বাড়ি থেকে আড্ডা দিয়ে ফিরত সুব্রত, দেখত সবাই খেয়ে ঘুমিয়েছে কিন্তু আরতি শুকনো মুখে বসে আছে তার ভাত নিয়ে। সুব্রত রাগ করত 'তুমি খেয়ে নিলে না কেন? আমার কি আর জায়গা আছে পেটে?'

আরতি বলত 'তাহ'লে আমারও নেই, আমিও খাব না কিছু।'

বিরক্ত হত সুব্রত 'কি যন্ত্রণা!'

কিন্তু ভিতরে ভিতরে খুশি হত অনেক বেশি।

সুব্রতর খাওয়ার আগেই আরতি যখন আঁচিয়ে এসে তোয়ালেতে মুখ মুছতে থাকে, তখনকার সঙ্গে এখনকার দিনের তুলনাটা সুব্রতর মনে পড়ে যায়।

কেবল তাই নয়, বিকালে বেশিরভাগ দিনই চা করে, বিছানা ঝাড়ে কুমুদিনী ঝি। কেন না ফিরতে আরতির সন্ধ্যা উৎরে যায় এসে হাঁপায় কোন কোন দিন টান হয়ে শুয়ে পড়ে। তখন তাকে গার্হস্থ্য কাজে ডাকা —নিষ্ঠুরতা। কুমুদিনীকে বলে বলে সব কাজই শিখিয়ে দিয়েছিল আরতি। সেই সঙ্গে শিখিয়েছে পরিচ্ছন্নতার মাহাত্ম্য। কাজ খুব গুছিয়ে পরিপাটি-ভাবেই করে কুমুদিনী। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হলেও দেখতে বেশ স্বাস্থ্যবতী। খুব খাটতে পারে, কাজে আলিস্যি নেই। তবু মনটা খুঁৎ খুঁৎ করে সুব্রতর অকারণে বিরক্তি আসে, মেজাজ বিগড়ে যায়। বউয়ের কাজ কি ঝি'কে দিয়ে চলে?

কিন্তু কেবল ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার জন্য মন খারাপ করবার ছেলে সুব্রত নয়। বউ যদি চাকরি করে, আর সে চাকরিতে যদি সময় আর সামর্থ্য দুইই বেশি দিতে হয়, দাম্পত্য-জীবনের চেহারা তো একটু আধটু বদলাবেই তাতে আপত্তি নেই সুব্রতর। কিন্তু আরতির মনের চেহারা যেভাবে বদলাতে শুরু করেছে, সেটাকে তেমন সুলক্ষণ বলে ভাবতে পারছে না সুব্রত। আগে ছেলেমেয়েদের সাজসজ্জার দিকে ভারী লক্ষ্য ছিল আরতির। রোজ নিজের হাতে তাদের কাজল পরাত, পাউডার মাখাত, মাথা আঁচড়ে জুতো পরিয়ে দিত। এসব না করলে আরতি যেন স্বস্তি পেত না। এখন সেসব গেছে। কেবল সময় নেই বলেই নয়, সুব্রতর মনে হয়, যেন মনও নেই। এখন ছুটি-ছাটার দিন ছাড়া ছেলেমেয়েদের আদর-যত্ন বেশির ভাগই সুব্রতর মা আর ঝিয়ের ওপর দিয়ে আরতি নিশ্চিন্ত হয়েছে।

আরো অনেক কিছুই বদলেছে আরতির। গানের সখ, সেলাইর সখ, মাসিক কাগজের গল্প পড়বার সখ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। কারণ সময়ে কুলোয় না। যেটুকু সময় পায়, সেটুকু সময়ও মেশিন বিক্রির চিন্তা ঘোরে তার মাথার মধ্যে। মেশিন বিক্রির চেষ্টায় সমস্ত শহরের পরিচিত মহলে ঘুরে বেড়ায় আরতি

টাকা অবশ্য আসে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরো কথা আসে কানে। ট্রামে বাসে বড় বেশি ঘোরে আরতি। বড় বেশি মেশে স্ত্রী পুরুষ সকলের সঙ্গে। ঘরের বউ ঝিদের পক্ষে এতটা স্বাধীনতা কি ভালো!

গাঁয়ের যেসব লোক সম্প্রতি শহরে এসেছেন তাঁরাই বাড়ি বয়ে এসব খবর দিয়ে যান প্রিয়গোপালকে। তিনি মাঝে মাঝে চটেন, চেঁচান, কোন দিন বা নিতান্ত শান্তভাবে ছেলের কাছে ঘটনাটা বিবৃত করেন মাত্র। ভবানীপুর অঞ্চলের কোন এক রেস্টুরেন্টে এক অপরিচিত যুবকের সঙ্গে আরতি নাকি চা খাচ্ছিল। নিজের চোখে দেখেছেন সুব্রতদের গাঁয়ের সুবোধ ভদ্র।

সুব্রত স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছিল 'ব্যাপারটা কি! কোন অপরিচিত ভদ্রলোক চা খাইয়েছেন তোমাকে?'

আরতি হেসেছিল 'ক্ষেপেছ? চা কি অতই সস্তা যে, অপরিচিত ভদ্রলোকেরা দল বেঁধে

ছ'পয়সা দু'আনা ব্যয় ক'রে আমাকে চা খাওয়াবে ? শৈলেনদা তোমাদের ভদ্র মশাইর কাছে অপরিচিত হলে কি হবে আমাদের ফ্যামিলিতে খুবই পরিচিত। বিয়ে করেছেন আমার মামাত বোনের ননদ কল্যাণীকে। শৈলেনদাকে গছালাম একটা মেশিন। নিজের কমিশন থেকে কিছু ছাড়তে হল। শত হলেও কল্যাণীর তো বর ! সেই খাতিরে কিছু সস্তায় করিয়ে দিলাম। আর সেই কৃতজ্ঞতায় চা আর ফাউল কাটলেট খাওয়ালেন শৈলেনদা।'

সেই টাকা আনা পাই, সেই স্থূল ব্যবসায়-বুদ্ধি। এর চেয়ে আরতি যদি বলত, শৈলেনদার একটু দুর্বলতা ছিল আমার ওপর, সেই দিনগুলির কথা মনে ক'রে দু'কাপ চা খেলাম আমরা। তাও যেন সুব্রতর এত অসহ্য লাগত না, কে জানে সম্পর্কটা হয়ত সেই ধরনেরই ছিল। আজ সেই সুবাদে আরতি তার কাছে কমিশনের লোভে মেশিন বিক্রী করে, আর সেই খাতিরে শৈলেন পাঁচ টাকা কমে মেশিন কিনে দু'টাকা ব্যয় করে রেস্টুরেণ্টে।

তারপর একদিন সুব্রত সত্যিই গিয়ে হাজির হল আরতিদের ক্যানিং স্ট্রীটের অফিসে। যাবে যাবে প্রথম থেকেই ভাবছিল, কিন্তু সংকোচের কাছে হার মেনেছে কৌতূহল। স্ত্রীর অফিসে গিয়ে পরিচয় দিতে হবে : 'আমি অমুক দেবীর স্বামী !' অন্যের কানে সেটা কৌতুকের মত শোনালেও নিজের মুখে যেন এখনও বাধে। তবু সুব্রতর শেষ পর্যন্ত মনে হল, হিমাংশুবাবুর সঙ্গে একবার গিয়ে দেখা করা দরকার। তাঁকে বলতে হবে এ্যাপয়েণ্টমেণ্টের সময় যে-সব সর্ত ছিল, তা তিনি পুরোপুরি মানছেন না। মানে পুরোপুরি ষোল আনার ওপরে আঠারো আনা আদায় ক'রে নিচ্ছেন। কনফাইনমেণ্ট বেশি করেছেন, খাটুনি বাড়িয়েছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে একবার খোলাখুলি আলাপ করা দরকার।

অফিস থেকে ঘণ্টাখানেক আগে বেরিয়ে সুব্রত গিয়েছিল ক্যানিং স্ট্রীটের মুখার্জী এণ্ড মুখার্জীতে।

নীচের তলায় স্টেশনারী দোকান। সেখানে দুটি অপরিচিত বাঙালী মেয়েকে দেখতে পেল সুব্রত। পুরুষ ক্রেতাদের ভিড় জমেছে। প্রৌঢ় গোছের আরো দুজন কর্মচারী কাজ করছেন একদিকে, কাউন্টারের আর একদিকে বসেছেন বুড়ো ক্যাশিয়ার। সেখানে আরতি নেই। ভাগ্যই বলতে হবে সুব্রতর যে স্ত্রীর সঙ্গে এখানে চোখাচোখি হয়নি। হিমাংশু মুখার্জীর নাম করতে দারোয়ান নিয়ে গেল দোতলায়। চেয়ার, টেবিল, ফ্যান, ফোনে সাজানো, পুরো অফিস। জন চার পাঁচ লোক মাথা গুঁজে কাজ করছে। আরতিদের সঙ্গে এখানেও দেখা হল না।

নাম লিখে স্লিপ পাঠাতে সঙ্গে সঙ্গে সাদর আহ্বান এল। হিমাংশুবাবু নিজেই উঠে এসে তাকে নিয়ে গেলেন নিজের কামরায়, 'আসুন, আসুন।'

সুব্রত একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনি কি চেনেন আমাকে ?'

হিমাংশুবাবু একটু হাসলেন : 'না চিনবার কি আছে ? মিসেস মজুমদারের অফিসিয়াল চিঠিপত্র তো আপনার কেয়ারেই যায়। 'প্রপার' নেম আমি ভুলি না। তা ছাড়া দূর থেকে একদিন আপনাকে দেখিয়েওছিলেন মিসেস মজুমদার। ওঁকে অনেকদিন বলেছি আপনাকে নিয়ে আসতে। কিন্তু আপনার বোধ হয় সময় হয়নি। ওঁরও সঙ্কোচ ছিল হয়ত।'

সুব্রত বলল : 'না, সঙ্কোচের কি আছে ?'

'সত্যিই কিছু নেই। আমরাও পূর্ববঙ্গের মানুষ মশাই। অত সঙ্কোচ-টঙ্কোচের ধার ধারিনে। দেশের মানুষ দেখলে রেখেঢেকে আলাপ করতে জানিনে। একেবারে প্রাণ খুলে দিই।'

সুব্রত খুশি হল : 'ও আপনিও পূর্ববঙ্গের ? কোন্ জেলার ?'

সিগারেটের কৌটা এগিয়ে দিতে দিতে হিমাংশুবাবু হাসলেন : 'খোদ ঢাকার। আপনাদের বাড়িও তো মুন্সীগঞ্জ সাবডিভিশনে ? সবই শুনেছি।'

দেশলাই জ্বেলে প্রথমে সুব্রতর সিগারেটটা ধরিয়ে দিলেন হিমাংশুবাবু তারপর ধরালেন নিজের। সত্যিই খুব বলিষ্ঠ লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান পুরুষ। মিহি ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবিতে চমৎকার মানিয়েছে। চওড়া কপাল, বড় বড় চোখ, গোল গোল ভরাট মুখ। ছাইদানিতে সিগারেট ঝাড়লেন

হিমাংশুবাবু। সুব্রত লক্ষ্য করল তাঁর হাতের দু'আঙুলে দু'টো হীরের আংটি জ্বলজ্বল্ করছে।

হিমাংশুবাবু আর একবার আত্মপরিচয় দিলেন 'সব বাঙাল মশাই, কোন চিন্তা করবেন না। বাঙালে বাঙালে ছেয়ে ফেলেছি আমরা, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রায় বার আনি তুলে আনতে হল পাকিস্তান থেকে। কিন্তু চুপচাপ বসে তো আর থাকা যায় না হাত পা কোলে ক'রে। ভাবলাম দেখি কপাল ঠুকে, আর ঢিল ছুঁড়ে। ভাগ্য পরীক্ষা করতে আমরা পূর্ববঙ্গের লোক তো কোনদিন পিছ-পা নই। আর পূর্ববঙ্গের লোক ছাড়া হঠাৎ মেয়েদের জন্য এমন একটা নিউ লাইন কেই-বা খুলতে সাহস করত? পূর্ববঙ্গের লোক না হলে আপনিই কি এত সহজে পাঠাতেন আপনার—'

হঠাৎ থেমে গেলেন হিমাংশুবাবু. ছাইদানিতে সিগারেটের মুখটা ফের একটু ঝেড়ে নিয়ে হাসলেন 'একটু অপেক্ষা করতে হবে আপনাকে সুব্রতবাবু। মিসেস মজুমদার বউবাজারের দিকে বেরিয়েছেন একটু।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হিমাংশুবাবু বললেন 'আর পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই ফিরে আসবেন।'

সুব্রত এবার বলল 'আউটডোর ডিউটিটাই বোধ হয় বেশি আপনার এখানে?'

হিমাংশুবাবু স্নিগ্ধ সৌজন্যে হাসলেন 'আজ্ঞে তা একটু বেশি। নতুন ধরনের মেশিন। প্রথম দিকে পুশিং সেলের দরকার, তারপর একবার চালু হয়ে গেলে—তবে একথা মনে করবেন না যে, প্রকাশ্যভাবে ক্যানভাস করবার জন্য মেয়েদের আমরা বাইরে পাঠাই। ওঁরা ডিমনস্ট্রেট করেন, কি ভাবে হ্যাণ্ডল করতে হয় শিখিয়ে দেন। মিসেস্ মজুমদার এদিক থেকে খুব এফিসিয়েণ্ট হ্যাণ্ড। যেসব পার্টির বাড়ি তিনি গেছেন সব জায়গা থেকে আমরা খুব ভালো রিপোর্ট পেয়েছি। যে বাড়িতে মিসেস মজুমদার যান, সে বাড়িতে অন্য কোন মেয়েকে পাঠাবার উপায় নেই পার্টির পছন্দ হয় না, তাঁরা খুৎ খুঁৎ করেন মিসেস মজুমদারকে ছাড়া চলে না তাঁদের। আলাপ আলোচনায়, কাজে সব দিক থেকে তিনি পার্টিকে খুশি করতে পারেন।

বসে বসে স্ত্রীর প্রশংসা শোনে সুব্রত অন্য একজন পুরুষের মুখে স্ত্রীর প্রশংসা। চাকরিতে পাঠাবার সুযোগ না হলে স্ত্রীর এসব গুণ সুব্রতর কাছে অনাবিষ্কৃত থাকত।

চা এল। সেই সঙ্গে চলল দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থার আলোচনা। হিমাংশুবাবু বললেন 'ব্যবসা-বাণিজ্যে তেমন সুবিধে করা যাচ্ছে না দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে ব্যাপার। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের আড়ত থেকেও এইরকম সব খবর আসছে

নিজের অভিযোগগুলি উত্থাপন করবার ঠিক যেন সুযোগ পেল না সুব্রত। তাছাড়া কেমন যেন নিরর্থকও মনে হল সেসব কথা।

একটু বাদে সত্যিই এসে উপস্থিত হল আরতি। পিছনে পিছনে চাকর এসেছে ছিট কাপড়ে ঢাকা লম্বা মত একটা যন্ত্র হাতে নিয়ে—অনেকটা সেতারের মত দেখতে কিন্তু বাদ্যযন্ত্র নয় সীবন-যন্ত্র।

স্বামীকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হল আরতি সুব্রতও হঠাৎ কি বলবে ভেবে পেলো না।

কিন্তু হিমাংশুবাবুর সপ্রতিভতা অটুট আছে। হেসে বললেন 'আসুন মিসেস মজুমদার, আমাদের নতুন একজন কাস্টমার এসেছেন।

আরতি লজ্জিত ভঙ্গিতে একটু হাসল 'কখন এসেছ?

'এই খানিকক্ষণ।'

হঠাৎ আর একদিনের কথা সুব্রতর মনে পড়ে গেল। বিয়ের বছর খানেক পরে আরতির কলেজের একজন বন্ধু এসেছিল দেখা করতে। ভারি লাজুক নম্রস্বভাবের ছেলে, নাম ছিল বুঝি পুলিন। খানিকটা ভয়, খানিকটা ঈর্ষার চোখে তাকাচ্ছিল সে সুব্রতর দিকে। সুব্রত পরম দাক্ষিণ্যে মুখ মুচকে হেসেছিল। তারপর আরতি ঘরে ঢুকতে প্রায় ঠিক এই ভঙ্গিতেই বলেছিলো 'এস আরতি, দেখো, কে এসেছেন, চিনতে পারো নাকি?'

সেদিন আরতি আর পুলিন কেউ কোন কথা বলতে পারেনি কিন্তু হিমাংশুবাবু আর আরতির সম্পর্ক এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। হিমাংশুবাবু তার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী নন, স্ত্রীর শ্রমের অংশীদার। মাত্র একশটি টাকা দিয়ে আরতির বেশির ভাগ শ্রম আর সামর্থ্যকে তাঁরা কিনে নিয়েছেন। স্ত্রীর কাছ থেকে সেই জন্যই পর্যাপ্ত পরিমাণে সেবা-শুশ্রূষা পাচ্ছে না সুব্রত। এখানে পুলিনের মতই তার

অবস্থা। কিন্তু সুব্রত ভেবে দেখল যতক্ষণ আবতি চাকরি কবছে হিমাংশুব অফিসে ততক্ষণ নিজেব ষোল আনা স্বামীত্বেব দাবী তোলবাব কোন মানে হয না। স্ত্রীব দেহ মন তাবই। কিন্তু দৈহিক শ্রমেব দশ আনাব সবিক হিমাংশু মুখার্জী।

তাবপব সুব্রতব সামনেই হিমাংশু আবতিব সঙ্গে অফিস সংক্রান্ত আলোচনা শুরু কবলেন। ঠিক যেমন পুলিনেব সামনে আবতিব সঙ্গে সুব্রত পাবিবাবিক সাংসাবিক আলোচনা তুলেছিল। জিজ্ঞেস কবেছিল কি কি আসবে বাজাব থেকে, বাবাব জন্য আজই ডাক্তাব ডাকা দবকাব হবে নাকি।

হিমাংশুবাবুও তেমনি বলতে লাগলেন 'মল্লিকাদেব ওখানে আব ক'দিন যেতে হবে আপনাকে? হ্যাঁ, শ্যামবাজাব থেকে যে তিনটা অর্ডাব আসবাব কথা ছিল—'

নমস্কাব জানিযে বিদায নিল সুব্রত। যে কথা বলবাব জন্য সে এসেছিল হিমাংশুবাবুই তা অন্য ভাষায বলে দিলেন 'আসবেন মাঝে মাঝে, ভাবি খুশি হব পাযেব ধুলো দিলে। একদিন মিসেসকে নিযে যাবেন না আমাদেব একডালিযা বোডেব বাড়িতে। আমাব স্ত্রী ভাবী খুশি হবেন।'

এই গেল ভূমিকা। তাবপব হিমাংশুবাবু নিজেই সুব্রতব দুঃখে সহানুভূতি দেখালেন মিসেস মজুমদাব অবশ্য কিছু বলেন না, তবু বুঝি, ছেলেপুলে নিযে সংসাব—এতক্ষণ আটকা থাকতে খুবই কষ্ট হয। সবই বুঝি। আমবাও তো গৃহস্থ মানুষ ঘব-সংসাব আছে। কিন্তু বুঝেও কি কবব বলুন? সবাই মিলে খেটেখুটে বিজনেসটা তো আগে দাঁড় কবাতে হবে। যা দিনকাল পডেছে, আব যা বাজাব, দেখতেই তো পাচ্ছেন। এই হিউজ এস্টাব্লিশমেণ্ট চার্জ দিযে কিছু থাকে না মশাই, কিছু থাকে না—'

ফিবে এসে আপ্রাণ চেষ্টা কবতে লাগল সুব্রত একটা পার্টটাইম জোটাবাব। ইন্সিওবেন্সেব এজেন্সীব কাজ সুব্রত প্রায ছেড়েই দিযেছিল ফেব শুরু কবল বেকতে। দু'তিনটে কেস জুটলও আব জুটল পার্টটাইম। পাঁচটাব পবে ছোট্ট একটা পাবফিউমাবী ফার্মে তাদেব হিসাবেব খাতাপত্রগুলি দেখে দিতে হবে। মাত্র ঘণ্টা দেডেকেব ব্যাপাব। প্রথম মাসে ষাট টাকা ক'বে দেবে তাবা তাবপব কাজ-কম দেখে সত্তব। ছুটিব দিনে লাইফ ইন্সিওবেন্সেব এজেন্সী নিযে বেকলে মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা সহজেই বোজগাব কবতে পাববে সুব্রত। সুতবাং এবাব সে আবতিকে চাকবি থেকে ছাড়িযে আনতে পাবে।

কিন্তু আবতি ছাড়বে না। তাব কত হিসাব কত যুক্তি, কত বাগ ক'ব কাকুতিমিনতি। চাকবি আবতি কববেই। চাকবিব মোহ—নিজেব হাতে টাকা বোজগাবেব মোহ তাকে পেযে বসেছে। তা সে কিছুতেই ছাডতে পাববে না। সংসাবেব তহবিল সবোজিনী বাখতে বাজী হর্নান। হিসাবপত্রেব ঝামেলা তিনি পোহাতে চান না। খবচেব টাকা আবতিব কাছেই থাকে। মাসেব প্রথম মাইনে পেযে সব টাকা সুব্রত তো আবতিব হাতেই তুলে দেয। কিন্তু শুধু সেই কটা পেযে তৃপ্তি নেই আবতিব। তাব নিজেব হাতে বোজগাব কবা চাই। কেবল সুব্রতব হাত থেকে টাকা নিযে সে খুশি নয আট ন' ঘণ্টা খাটুনিব বিনিমযে টাকা নেওযা চাই তাব হিমাংশু মুখুয্যেব হাত থেকেও

বাত্রে অত ক'বে নিষেধ কবা সত্ত্বেও পবদিন সুব্রতব চোখেব সমুখ দিযে ফেব সেজেগুজে হাই হিল জুতো পবে অফিসে বেকল আবতি।

সুব্রত বলল 'তুমি আবাবও যাচ্ছ।'

আবতি স্বামীব কাছে এগিযে এসে তাব গা ঘেঁষে দাঁড়াল, তাবপব মিষ্টি একটু হেসে বলল 'হ্যাঁ যাই, আজ আব অত বাত হবে না। ছ'টাব মধ্যেই ফিবব।'

সুব্রত বলল 'তবু তুমি যাবেই।'

আবতি তেমনি হাসিমুখে বলল 'না গেলে চলবে কি ক'বে? তা ছাড়া অফিস তো? একটা নিযম-কানুন আছে। নিজেও তো অফিস কব। সেসব যে না জানো তা তো নয। হুট ক'বে কি ছেড়ে দিযে আসা যায? নোটিশ-ফোটিশ দিতে হয তো একটা?'

অফিস থেকে ফিবে আসবাব পর সুব্রত ফেব জিজ্ঞেস কবল 'দিযেছিলে নোটিশ?'

আবতি তেমনি হেসে জবাব দিযেছিল 'দেব। এত ব্যস্ত কেন? ক্ষেপে গেলে নাকি?'

সুব্রত কঠিন স্বরে বলেছিল 'ক্ষেপে এখনো যাইনি, কিন্তু তুমি বোধ হয সত্যিই ক্ষেপিযে ছাড়বে।'

দিন পনের ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করল সুব্রত। ঠিক পুরোপুরি ধৈর্য নয়, মাঝে মাঝে দাম্পত্য-কলহ চলতে লাগল। এমন ভয় পর্যন্ত দেখাল 'তোমার হয চাকরি ছাড়তে হবে, নয আমাকে। চাকরি যদি করতে হয়, অন্যত্র থাকবার ব্যবস্থা কর।'

আরতি মাঝে মাঝে চটে ওঠে 'বেশ তো। তাই হবে।'

কিন্তু অফিস থেকে ফেরার পথে সেই দিনই হয়ত নিয়ে এল সুব্রতর ছোট ভাইদের জন্য জামা প্যান্ট, নিজের ছেলেদের জন্য চকোলেট সুব্রতর জন্য রজনীগন্ধার তোড়া, কিংবা দামী সুগন্ধী এক পাউণ্ড চা।

তারপর নিজের হাতে চা করতে বসে।

সুব্রত জিজ্ঞেস করে 'আজও বুঝি মেশিন বিক্রি হল একটা?'

আরতি সে কথার জবাব না দিয়ে বলে 'চা'টা কেমন? খুব ভালো গন্ধ বেরুচ্ছে না?'

সুব্রত সে কথার জবাব না দিয়ে চায়ের কাপটা ঠেলে সরিয়ে রাখে অর্ধেক চা-ই পড়ে থাকে বাটিতে।

প্রিয়গোপাল সরোজিনী আজকাল আর কোন কথা বলতে চান না। আরতির অসাক্ষাতে সুব্রতকে বলেন 'আমরা আর কি বলবো বাবা? বলবার মুখ কি তুমি রেখেছ? করো তোমাদের যা খুশি।'

বাপ মার ওপর রাগ করে ফোনে শ্বশুরকেও একদিন খুব শাসিয়ে দিল সুব্রত চরম কিছু করবার আগে আপনাকে [illegible] রাখা কর্তব্য মনে করছি। শেষে আমাকে দোষ দিতে পারবেন না'

কোর্টে আসামীর পক্ষসমর্থনের সময় কিছু কিছু অসংলগ্ন কথা বলায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একবার ধমক খেয়েছেন নিবারণ বাঁড়ুয্যে। বার লাইব্রেরীতে এসে জামাইয়ের কাছে ফোন মারফৎ ফের ধমক খেয়ে আরো ঘাবড়ে যান এক হাতে টেকো মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলেন 'ব্যাপারটা আমি কিছু বুঝতে পারছি না হয়েছে কি তোমাদের?'

সুব্রত ধমকে ওঠে যদি বুঝতে চান please come down here'

কোথায়, তোমার অফিসে?

বেশ বাসায় আসুন সেই ভালো।

বাসায় এলে শ্বশুরকে সংক্ষেপে সবই বলে সুব্রত 'আরতির ব্যবহার চাল চলন অত্যন্ত আপত্তিকর হয়েছে যদি এখনও আমার কথামত না চলে আমাকে আলাদা থাকবার ব্যবস্থা করতে হবে

নিবারণবাবু বলেন ওকে চাকরি-বাকরিতে দেওয়া আমার তো গোড়া থেকেই অনিচ্ছা ছিল। প্রকারান্তরে নিষেধও করেছিলাম কিন্তু তা তো কেউ শুনলে না।

তারপর মেয়েকে ডেকে ধমকে দেন 'এসব কি হচ্ছে খুকি? তুই নাকি কথাবার্তা কিছু শুনিসনে? সুব্রত যখন ছেড়ে দিতে বলছে ছেড়ে দে চাকরি। কেবল টাকা টাকা করছিস কেন? সংসারে টাকাটাই কি সব? টাকার এতই যদি তোর দরকার পড়ে থাকে—'

নিবারণবাবু থেমে গেলেন বলতে যাচ্ছিলেন 'নিস আমার কাছ থেকে। কিন্তু বললেন না। জামাই কি ভাববে। তাছাড়া যা দিনকাল নিজের সংসারই চালান কঠিন। মেয়ে হাত পাতলে সত্যিই কি কিছু দিতে পারবেন তিনি?

চা জলখাবার দিতে এসে স্বামীর দিকে ক্রুদ্ধ তিরস্কারের দৃষ্টিতে তাকাল আরতি, কিন্তু বাবাকে হাসিমুখে বলল লীগাল প্রাকটিশনার হয়ে তুমি এমন বেআইনী কাজ করছ কেন বাবা? ট্রেসপাসের দায়ে পড়ে যাবে যে।'

নিবারণবাবু গম্ভীর হয়ে থাকেন। তারপর আর বেশিক্ষণ থাকেন না। কাজের অজুহাতে উঠে চলে যান।

তারপর চলল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা বন্ধ আর অসহযোগিতার পালা।

আবতি বলেছিল : 'তুমি শেষ পর্যন্ত বাবাব কাছে নালিশ কবতে গেলে।'
সুব্রত জবাব দিয়েছিল 'নালিশ নয়, তিনি তোমাব বাবা, তাঁকে জানিয়ে বাখা সঙ্গত মনে কবলাম।'

কথা বন্ধ হল, কিন্তু অফিস যাওয়া বন্ধ হল না আবতিব। অদ্ভুত এক জেদে পেয়ে বসেছে তাকে। পাবতপক্ষে সংসাবেব সমস্ত কাজই সে কবে। অফিসেব পবেও এসে খাটে সংসাবেব জন্য। আগেব চেয়ে অনেক বেশি পবিশ্রম কবে। কিন্তু এ সমস্তই যে তাব জেদ, সে কথা বুঝতে কাবো বাকি থাকে না। ছেলেব অশান্তিব কথা ভেবে প্রিয়গোপাল আব সবোজিনীব মন খাবাপ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে দু চাব কথা বলতেও যান সবোজিনী। কিন্তু এ প্রসঙ্গ ওঠামাত্রই আবতি কাজেব অজুহাতে নিজেই উঠে যায় সেখান থেকে।
একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে থাকে সুব্রত আব আবতি। ছেলেমেয়েবা থাকে সবোজিনীব কাছে। কিন্তু এত ঘন সান্নিধ্যে থেকেও কোন কথা হয় না। পিছন ফিবে শোওয়া আবতিব উদ্ধত ভঙ্গিব দিকে তাকিয়ে এক একবাব সুব্রতব হাত নিস-পিস ক'বে ওঠে। অতি কষ্টে সংযত বাখতে হয় নিজেকে।
এভাবে আব চলে না। সুব্রত স্থিব কবল, কিছুদিন আলাদা থাকবাব ব্যবস্থা কবাই ভালো। ফোন কবলে শ্বশুবকে 'কিছুদিন ওকে আপনি নিজেব কাছে নিয়ে বাখুন। সব দিক ভেবে আমি এই প্ল্যান নেওয়াই ঠিক কবেছি। আব এই last attempt মানুষেব সহ্যেবও একটা সীমা আছে।'
শ্বশুব জবাব দিলেন সেই ভালো। আমি কালই কোর্টেব পব ওকে গিয়ে নিয়ে আসব। কড়া শাসনেবই দবকাব হয়ে পড়েছে ওব'
শ্বশুবেব বশ্যতা আব সহযোগিতায় মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল সুব্রতব কিন্তু সেই দিনই বিকালে একটা আকস্মিক কাণ্ড ঘটে গেল। ব্যাঙ্কেব ম্যানেজাব এসে বললেন এক কাজ করুন, ক্যাশিয়াবেব কাছ থেকে সমস্ত ক্যাশ বুঝে নিয়ে পাঠিয়ে দিন ক্লাইভ স্ট্রীটেব হেড অফিসে। নিজেদেব কোন বিসক নিয়ে কাজ নেই।'
এ্যাকাউন্ট্যান্ট সুব্রত বলল 'সে কি? আমাদেব ব্যাঙ্ক তো সাউণ্ড। দু'দিন ধ'বে সামান্য একটু বান হচ্ছে, কিন্তু তাতে—
ম্যানেজাব বললেন 'আরে মশাই যা বলছি, তাই করুন। সবই কর্তাব ইচ্ছায়, আমবা কি বুঝি? বুঝতে চান তো ম্যানেজিং ডিরেক্টবেব বাড়ি চলে যান।
ফোনে হেড অফিসেব সঙ্গে আবো খানিকক্ষণ কি আলাপ ক'বে ছুটিব পবে ম্যানেজাব তাকে ডেকে নিয়ে ফিস ফিস ক'বে বললেন 'ভালো চান তো কাল আব আসবেন না, পাবলিকেব হাতে মাবধোব খেতে হবে তাহলে। যতটা [illegible] পাবছি, আজ বাত্রেই তালা পড়বে।'
সুব্রত বলল 'তাব মানে?'
'মানে জানেন ম্যানেজিং ডিরেক্টব।'
পবদিন সুব্রতও জানল। শহবেব আব যাবা জয়লক্ষ্মী ব্যাঙ্কে টাকা বেখেছিল, তাদেব কাছেও খববটা অবিদিত বইল না। তাদেব টাকা গেছে, সুব্রতব গেছে চাকবি। সেভিংস এ্যাকাউন্টে শ' খানেকেব বেশি ছিল না। কিন্তু তাব চাইতেও দুশো টাকাব চাকবিব শোকটাই সুব্রতকে মুহ্যমান ক'বে বাখলো।
বিকালেব অনেক আগেই নিবাবণবাবু এসে পৌঁছলেন। আবতিকে নেওয়াব প্রসঙ্গটা চাপা পড়ল। কাবণ নিবাবণবাবুবও হাজাবখানেকেব একটি সেভিংস এ্যাকাউণ্ট ছিল জয়লক্ষ্মী ব্যাঙ্কেব হাইকোর্ট শাখায়। সুব্রতই গবজ ক'বে খুলিয়েছিল এ্যাকাউন্টটা।
নিবাবণবাবু খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে শান্তভাবে বললেন, 'তোমার আব দোষ কি? তবে তোমবা ভেতবে ছিলে, কেন যে খববটা আগে দিতে পাবনি তাই ভাবি। অফিসে কেবল ঘাড় নিচু ক'বে কলম পিষলেই কি দুনিয়াটা চলে? আমাব যা গেছে যাক। কিন্তু এখন থেকে চোখ কান

খোলা রেখে চলতে শেখ।'

আরতি এবার মুখ খুলল 'তুমি ভেব না বাবা। ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা যদি শেষ পর্যন্ত আদায় না-ই করা যায় আমি বছর দুইয়ের মধ্যে তোমার সব টাকা শোধ ক'রে দেব।'

পরদিন থেকে ফের পুরো দমে অফিস চলল আরতির। অনেক সকালে বেরোয়, অনেক রাত্রে ফেরে। মেশিন বিক্রির কমিশনের জন্য টালা থেকে টালীগঞ্জ টহল দিয়ে বেড়ায়। কেউ কোন কথা বলে না।

সুব্রতও চাকরির চেষ্টায় বেরোয়। মাঝে মাঝে দেখা হয় আরতির সঙ্গে। কোন কোন দিন তার সঙ্গে সেই এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েটিকে দেখা যায়। সুব্রত কিছু বলবে বলবে ভাবে। কিন্তু বলে না। আগে চাকরি জুটুক একটা।

সুব্রতর আগে আরতিই কথা বলল 'অত ভাবছ কেন? চলেই যাবে। একরকম ক'রে'

সুব্রত বিড়ি ধরাতে ধরাতে বলে 'আমি কি বলছি যে চলবে না?'

স্বামীর অন্যমনস্কতা দূর করবার জন্য মাঝে মাঝে অফিসের গল্পও করে আরতি। কিন্তু দু' মাস আগের গল্পের সঙ্গে এখনকার গল্পের মিল নেই। ভবানীপুর, বালীগঞ্জের সেই সব বড় বড় লোকের বাড়িঘর ঠিকই আছে। সেই গ্যারেজ গাড়ি কার্পেট মোড়া ঘরে দামী দামী সব আসবাব, সব ঠিকই আছে কিন্তু তার ভিতরকার চেহারা যেন বদলে গেছে আরতির চোখে। আরতি গল্প করে আজকাল মাত্র মিনিট পনের দেরি হওয়ায় রাসবিহারী এ্যাভিনিয়ুর ব্যারিস্টার এইচ এন হালদারের মেয়ে শুচিস্মিতা তাকে কিভাবে তিরস্কার করেছে টামের গোলমালেই দেরি হয়ে গিয়েছিল আরতির। কিন্তু শুচিস্মিতার ভঙ্গি দেখে মনে হয়েছিল কথাটা তার বিশ্বাস হয়নি। বলেছিল 'যে জন্যই হোক, আমার এ সময় অনেকখানি নষ্ট করলেন আপনি। বসে বসে অপেক্ষা করছি তো করছিই, আপনার আসবার নাম নেই। আমি এক্ষুনি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যেতাম। কিন্তু নেহাৎ যাতায়াতে আপনার কতকগুলি পয়সা দণ্ড যাবে-

আরতি সুব্রতর কাছে মন্তব্য করেছিল মেয়েটিকে যা ভেবেছিলাম তা নয়।'

বড়বাজারের লৌহ ব্যবসায়ী রসময় প্রামাণিকের বাড়িতেও একটা মেশিন বিক্রি হয়েছে আরতির। তাঁর পুত্রবধূ কমলাকে সেদিন উলেন মেশিনের ব্যবহার শেখাতে গিয়েছিল আরতি। গেলে খুব আদর আপ্যায়ন করে কমলারা চা জলখাবার খাওয়ায়। ঘরসংসারের কথা জিজ্ঞাসা করে। কিন্তু কিভাবে মেশিনটা হ্যাণ্ডেল করতে হয়, তা তিন চারদিন দেখাবার পরেও যখন কমলা ধরতে পারেনি, আরতি তখন একটু বিরক্ত হয়ে বলেছিল 'আঃ কি করছেন আপনি? হয় আপনার মন নেই এদিকে নয় বুদ্ধি শুদ্ধির অভাব আছে।'

বলেই অবশ্য হেসে ফেলেছিল আরতি।

কিন্তু কমলা হাসেনি। রাগে তার সমস্ত মুখ ফেটে পড়েছিল, বলেছিল আপনি আজ যেতে পারেন। আজ মেশিন নিয়ে বসবার সময় নেই আমার।

কিন্তু কেবল এতেই ব্যাপারটা শেষ হয়নি। কমলার শাশুড়ী উপস্থিত ছিলেন সেখানে, তিনি জবাব দিয়েছিলেন 'আমাদের ঘরের মেয়েছেলেদের বুদ্ধি শুদ্ধি একটু কম থাকলে ক্ষতি নেই মা যেটুকু আছে, তাতেই আমাদের চ'লে যায়। আমাদের ঘরের বউ-ঝিদের তো আর বেটাছেলের মত বাইরে বেরুতে হয় না, জিনিস ফিরি ক'রে বেড়াতে হয় না লোকের বাড়ি বাড়ি। গেরস্ত ঘরের মেয়ে-ছেলের বুদ্ধি একটু কম থাকাই ভালো।'

আরতি অবাক হয়ে গিয়েছিল। কমলা সেদিন কিছুতেই আর সেলাই নিয়ে বসেনি। কমলার স্বামী নিরঞ্জনবাবু নাকি আরতিদের অফিসে তাই নিয়ে রিপোর্টও করেছেন। হিমাংশুবাবু মৃদু তিরস্কারের সুরে বলছিলেন সেকথা।

বেশ বোঝা যায়, এসব অপ্রীতিকর গল্প স্বামীর কাছে আরতি করতে চায় না। কিন্তু চেপে রাখতে রাখতে কি ক'রে যেন হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কিসের একটা ঝাঁজ যেন ফুটে বেরোয় গলায়। কিছুতেই চেপে রাখতে পারে না আরতি।

সুব্রত সাবধান ক'রে দেয় 'খবরদার' এখন কিন্তু মেজাজ দেখাবার সময় নয় আমাদের। খুব

সাবধানে, খুব হিসাব ক'রে চলতে হবে। এসব রিপোর্ট-টিপোর্ট যাওয়া ভালো কথা নয়। সংসারের অবস্থাটা তো দেখছ।'

আরতি ম্লান একটু হাসল 'না দেখে কি জো আছে? হিসাব-জ্ঞান কারো চেয়ে আমার কম নয়। ভেব না।'

ফের চাপাচাপি চলল সংসারে। ঝি ছাড়িয়ে দেওয়া হল। দুধ, কয়লা, চা, ধোপা —সব খরচের ছাঁটাই হল যথাসম্ভব। সময় বুঝে শাশুড়ীও রোগে পড়লেন। বাড়ি আর অফিস একাই প্রায় সামলাতে হয় আরতিকে। চাকরির চেষ্টায় বেরোবার আগে সুব্রত স্ত্রীকে রান্না আর ঘর-সংসারের কাজে সাহায্য করে। স্ত্রীকে বলে 'দেখ যেন লেট-ফেট না হয়। এ সময় ইরেগুলারিটি ভালো হবে না।'

কিন্তু অফিস থেকে ফিরবার সময় আরতির মুখ প্রায় শুকনো শুকনো দেখা যায় আজকাল। সুব্রত জিজ্ঞাসা করলে বলে 'কিছু নয়। খাটুনি তো একটু বেশিই পড়ে আজকাল, তাই।'

সুব্রত এক'দিন ধরে বসল 'সত্যি ক'রে বল তো অফিসে গোলমাল-টোলমাল চলছে নাকি কিছু?'

আরতি হেসে নিশ্চিন্ত ক'রে দিল স্বামীকে 'না না, গোলমাল আবার কি হবে? তবে মিঃ মুখার্জীর মেজাজ একটু খিট খিটে হয়ে আছে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা, তা আমরা কি করব? আমরা তো চেষ্টার কোন ত্রুটি করছি না।'

সুব্রত বলল তোমাকে বলেছেন না কি কিছু?

আমাকে আবার কি বলবেন?'

সুব্রতর মনে হল তবে আরতির সম্বন্ধে ভালো ধারণাই আছে হিমাংশু মুখার্জীর।

আর একদিন সামান্য একটু উত্তেজিত দেখাল আরতিকে সুব্রত বলল 'কি ব্যাপার?'

আরতি হাসতে চেষ্টা ক'রে বলল 'কিছু না। কমিশন নিয়ে সামান্য কথান্তর হয়ে গেল হিমাংশুবাবুর সঙ্গে।'

সুব্রত বলল 'কথান্তর।'

আরতি বলল আমার সঙ্গে নয়, এডিথের সঙ্গে। মিঃ মুখার্জী বলেছিলেন—এক মাসে তিনটা মেসিন যদি বিক্রি করতে পারি, ফাইভ পার্সেণ্টের বদলে টেন পার্সেণ্ট কমিশন দেবেন। এ মাসে এডিথ বিক্রি করেছে চারটে আর আমি তিনটে। কিন্তু মিঃ মুখার্জী এখন তাঁর কথা উইথড্র করছেন। বলছেন, অত্যন্ত ডাল মার্কেট, এদিকে হিউজ এস্টাব্লিসমেণ্ট চার্জ। এ সময় যদি আপনারা এমন চাপ দেন—'

সুব্রত বলল 'ঠিকই তো বলেছেন।'

আরতি বলল 'বল কি তুমি! ঠিক বলেছেন?'

সুব্রত বলল 'আঃ যেতে দাও। অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। উপরি পরে হবে। আগে নিচের মূলটুকু ঠিক রাখ। যা সময় পড়েছে, দেখছ তো দুটো ব্যাঙ্কে চানস পেতে পেতেও পেলাম না, হার্ড লেক। ভাবছি ওই পঞ্চাশ টাকার পার্টটাইমটাই আপাতত ধরি। বসে থাকবার কোন মানে হয় না। ইয়ে—তোমার সঙ্গে কোন হিচ হয়নি তো?'

আরতি স্বামীকে আশ্বস্ত ক'রে বলল আরে নাঃ, আমি কিছু বলিনি। এডিথের সঙ্গেই যা একটু কথা কাটাকাটি হয়েছে। তবে আমার ভালো লাগছিল না।'

সুব্রত বলল আরে ভালো তো লাগেই না সময় বুঝে লাগাতে হয়। দাঁড়াও, একটা চাকরি-বাকরি জোগাড় করতে দাও আমাকে—তারপর সব দেখে নেওয়া যাবে। সবুর কর ক'টা দিন।'

কিন্তু ক'টা দিন সবুর বুঝি আর আরতির সইল না। সুব্রত একটা চাকরির ইণ্টারভিউয়ের জন্য বর্ধমান গিয়েছিল। পরে বুঝেছে, লোক দেখানো বিজ্ঞাপন, নিজেদের লোক আগেই ঠিক হয়ে আছে। জোর সুপারিশ নিয়ে গিয়েছিল সুব্রত, তবু সুবিধা হয়নি। বেলা দশটায় বাসায় ফিরে এসে দেখল, আরতি দিব্যি সংসারের কাজ করছে, অফিসে যাওয়ার নাম নেই।

সুব্রত জিজ্ঞাসা কবল 'ব্যাপাব কি তোমাব আজ ছুটি নাকি ?'
আবতি স্বামীব চোখেব দিকে না তাকিয়ে মুখ নীচু ক'বে জবাব দিল 'হুঁ।'
ভাবি বিষণ্ণ আব ম্লান মুখ আবতিব, কিসেব যেন একটা দ্বন্দ্ব চলছে ভিতবে ভিতবে। চোখ দেখে মনে হয় সা'বা বাত ঘুমোযনি।
সুব্রত বলল 'কিসেব ছুটি ?'
'পবে বলছি।'
'পবে নয়, এখনই বল
নিজেব ঘবেব ভিতবে স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে গেল সুব্রত 'ব্যাপাব কি—'
আবতি ফিস ফিস ক'বে বলল আস্তে। আমি বাবা-মাকে জানাইনি। ছুটি নয়, চাকবি ছেড়ে দিয়েছি।
সুব্রত মুহূতকাল স্তব্ধ থেকে বলল 'ছেড়ে দিয়েছ! কেন ?
আবতি বলল 'মান সম্মান নিয়ে ওখানে আব কাজ কবা যায় না
এবাব কঠিন দেখাল সুব্রতব মুখ, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল 'হিমাংশুবাবু তোমাকে কি অসম্মানকব কিছু বলেছেন ? I shall teach him a lesson ভেবেছে কি সে ?'
আবতি স্বামীব চোখেব দিকে তাকিয়ে থেকে একটু হাসল না, সে সব কিছু না'
সুব্রত একটু শান্ত একটু আশ্বস্ত হয়ে বলল 'তবে কি ?'
আবতি বলল 'এডিথকে হিমাংশুবাবু অপমান কবেছেন।
'ও এডিথকে! তাতে তোমাব কি ? কি বলেছেন তিনি এডিথকে ?'
আবতি সংক্ষেপে বলল ঘটনাটা।
কমিশন টুমিশন নিয়ে এডিথেব সঙ্গে হিমাংশুবাবুব একটু খিটিমিটি হয়ে যাওয়াব পব, তিনি ওদেব গতিবিধি সম্বন্ধে আবো একটু সতক হয়েছেন। কোন কাস্টমাবেব বাড়ি থেকে ফিবতে একটু দেবি হলে কড়া কৈফিয়ৎ তলব কবেন, আব কাউকে তেমন নয় এডিথেব ওপবই তাঁব আক্রোশটা বেশি ফিবতে একটু দেবি হলে সবাসবি জিজ্ঞেস কবেন কোত্থেকে আড্ডা দিয়ে ফিবলেন ?
আবতি এতদিন কোন কথা বলেনি। যা জবাব দেওযাব এডিথই দিয়েছে।
কিন্তু কাল এডিথ ছিল না। অসুস্থতাব কথা আগেই ফোন ক'বে জানিয়েছিল। চিঠিও দিয়েছিল একটা। এদিকে বিপন স্ট্রীটে একটি মাদ্রাজী ক্রিশ্চিযানেব বাড়িতে সেদিনই মেশিনটা ডিমনস্ট্রেট কবতে নিয়ে যাওযাব দবকাব। হিমাংশুবাবু এডিথকে না দেখে আগুন হয়ে গেলেন।
'সিমনস কোথায় ?'
আবতি বলল 'সে আসেনি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অফিসেব দাবোযানেব সঙ্গে চিঠি পাঠিয়েছে'
চিঠিটি দেখাতে গিয়েছিল আবতি।
হিমাংশুবাবু অধীব হয়ে বলেছিলেন: 'থাক থাক চিঠি দিয়ে আমি কি কবব ? অসুস্থ! অসুস্থ না ঘোড়াব ডিম! ইচ্ছা ক'বে আমাকে জব্দ কববাব জন্য কামাই কবেছে সে জানে আজ তাকে না হলে আমাব কাজেব ক্ষতি হবে, তাই--'
আবতি শান্তভাবে বলেছিল 'তা হয়ত নয় দাবোযান তাকে বিছানায় শোয়া অবস্থায় দেখে এসেছে'
হিমাংশুবাবু একটু চুপ ক'বে থেকে বলেছিলেন 'তা শুয়ে থাকবে না কববে কি ? কাল ববিবাব গেছে। উপবি বোজগাবেব লোভে গেস্টদেব এন্টাবটেন ক'বে আজ আব উঠতে পাব'ব কেন ?'
বমা আব মল্লিকা দু'জনেই ছিল কমেব মধ্যে। তাবা আবক্ত হয়ে মুখ নীচু ক'বে বইল। পূর্ব প্রান্তেব একজন যুবক কেবানী পশ্চিমেব আব একজন প্রৌঢেব দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।
হিমাংশুবাবু চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আবতি তীবেব মত চেযাব ছেড়ে সোজা উঠে দাঁড়াল 'আপনি এডিথেব নামে অমন যা তা বলতে পাববেন না।

হিমাংশুবাবু বললেন 'সবি, আপনাদেব সামনে কথাটা বলা হযত ঠিক হযনি। কিন্তু যা বলেছি তা ঠিকই। ওবা ও-ই।'

আবতি তীব্রস্ববে প্রতিবাদ কবেছিল 'কক্ষনো না। এডিথেব স্বামী আছে, সন্তান আছে—'

হিমাংশুবাবু একটু হেসেছিলেন 'তা সব মেযেবই থাকে। আপনি ওদেব চেনেন না।'

আবতি তেমনি অসহিষ্ণু উদ্ধত ভঙ্গীতে বলেছিল 'আমি খুবই চিনি। এডিথেব সঙ্গে আমি আজ ছ' মাস ধবে কাজ কবছি। আপনিই না জেনে শুনে তাকে ইনসাল্ট কবেছেন। আপনি যা বলেছেন উইথড্র কবা উচিত।'

হিমাংশুবাবু কিছুক্ষণ জ্বলন্ত চোখে আবতিব দিকে তাকিযে থেকে বলেছিলেন 'বটে! আমি যা বলেছি তাব একটা অক্ষবও উইথড্র কবা উচিত নয, উইথড্র আমি কবব না। আমি আবাব বলছি সে অত্যন্ত খাবাপ টাইপেব লুজ মবাল্সেব মেযে।'

আবতি কিছুক্ষণ চুপ ক'বে থেকে বলেছিল 'আপনি যা বলেছেন উইথড্র না কবলে কোন ভদ্রলোকেব মেযেছেলে আপনাব এখানে কাজ কবতে পাবে না।'

'বেশ তো।' বলে চেম্বাবে ফিবে গিযেছিলেন হিমাংশুবাবু, কিন্তু দশ মিনিটেব মধ্যে যখন বেজিগনেশন লেটাব বেযাবা দিযে পাঠিযে দিযেছিল আবতি তখন হিমাংশুবাবু ফেব উঠে এসেছিলেন 'আপনি কি পাগল হলেন নাকি মিসেস মজুমদাব? কোথাকাব একটা যা তা টাইপেব মেযে, জাতে মেলে না, ধর্মে মেলে না তাব জন্য আপনি চাকবি ছাডতে যাবেন কেন? আপনাকে তো কিছু আব বলা হযনি?'

আবতি বলল 'আমাদেবই বলা হযেছে।'

হল থেকে বেবিযে আসবাব সময ফেব ডেকেছিলেন হিমাংশুবাবু 'শুনুন, শুনুন। পাগলামি কববেন না। আপনাদেব বাডিব অবস্থা আমি জানি।'

আবতি ফিবে দাঁডিযে বলেছিল 'আপনি উইথড্র কবছেন তাহ'লে?'

হিমাংশুবাবু হঠাৎ থমকে দাঁডিযে গম্ভীব, কঠিন স্ববে বলেছিলেন 'না।'

আবতি আব দাঁডাযনি।

সমস্ত বাডিটা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হযে বইল। ছোট ছেলেমেযেবা পর্যন্ত কেউ কোনো সাডা শব্দ কবল না। কি একটা সাংঘাতিক অঘটন যে ঘটেছে, তা কাবো বুঝতে বাকি নেই। নন্তু সন্তু ফিস ফিস কবতে লাগল, 'বৌদিবও চাকবি গেছে।'

ছেলেব কাছে প্রিযগোপাল আব সবোজিনী সব শুনলেন। কিন্তু সব বুঝলেন না। সত্যিই তো কোথাকাব না কোথাকাব একটা অ্যাংলো ইণ্ডিযান মেযে। ওবা তো ওই ধবনেবই হয। কাজেব গাফিলতিব জন্য মনিব যদি চটে গিযে দু'চাব কথা তাব সম্বন্ধে বলেই থাকে তো কি হযেছে? দোষ দেখলে তাঁবা বলেন না তাঁদেব ঝি চাকবকে? যে গরু দুধ দেয তাব চাঁটও সয। চাকবি কবতে গেলে মনিবেব মেজাজ বুঝে চলতে হয বৈকি। তা ছাডা আবতিকে তো হিমাংশু কিছু বলেনি। বলবে কেন, একই জেলাব লোক, জাতে একই বামুন, বলতে গেলে আত্মীযেব মত।

প্রিযগোপাল অবশ্য কোন কথাই বললেন না। খলেব মধ্যে ডালিমেব বসেব সঙ্গে স্বর্ণসিন্দুব মেডে জিভ দিযে চেটে চেটে খেতে লাগলেন। সংসাবেব কোন কথাব মধ্যে তিনি আব নেই।

সবোজিনী বঁটিতে কুটনো কুটতে কুটতে নিজেব মনেই বলতে লাগলেন, 'আব এই কি আমাদেব মেজাজ দেখাবাব গোঁযার্তুমি কববাব সময? এমন চাকবি নেওযাই বা কেন, আব ছাড়াই বা কেন? কিছু বুঝিনে বাপু

সুব্রত কাছেই চুপ ক'বে বসেছিল, মাব দিকে তাকিযে অদ্ভুত একটু হাসল 'সবচেযে মজাব কথা মা, সত্যি সত্যি যাকে অপমান কবেছে সে হযত দিব্যি সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে অফিসে হাজিব হয়ে এতক্ষণে কাজও শুরু করে দিযেছে। সে তো আব সেন্টিমেন্টাল বাঙ্গালী মেয়ে নয।'

'তুমি, তুমিও তাই বলছ?'

আরতি চোখ তুলে তাকাল স্বামীর দিকে।

সুব্রত দেখল এতক্ষণে, এতদিন বাদে আরতির আয়তসুন্দর চোখ দুটি জলে ভরে উঠেছে।

শ্রাবণ ১৩৫৬

হেডমাস্টার

টাইপ করা কতকগুলি জরুরী চিঠিপত্রে নাম স্বাক্ষর করছিলাম। টাইপিস্ট পরেশবাবু নিজে এসে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আজই চিঠিগুলি ডাকে পাঠাতে হবে। সই করতে করতে একটু ধমকও দিলাম পরেশবাবুকে, একেবারে ছুটির সময় নিয়ে এলেন, এক্ষুনি উঠব ভাবছিলাম।'

পরেশবাবু বোধ হয় তাঁর সহকারীর ঘাড়ে দোষটা চাপাতে যাচ্ছিলেন বেয়ারা নিতাই এসে সামনে দাঁড়াল

বিরক্ত হয়ে বললাম, 'তোমার আবার কি।'

নিতাই বলল আরো একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, স্লিপ দিয়েছেন।'

একবার তাকিয়ে দেখলাম, অফিসেরই ছোট্ট ভিজিটিং স্লিপ। পেন্সিলে লেখা দর্শনপ্রার্থীর নাম কৃষ্ণপ্রসন্ন সরকার। দেখা করতে চান নিরুপম নন্দীর সঙ্গে উদ্দেশ্যটা উহ্য। হয়ত গুহ্য বলেই। নাম দেখে কারো মুখ মনে পড়ল না। ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে বেয়ারাকে বললাম, 'বল বসতে হবে। ব্যস্ত আছি। চিঠিগুলিতে নাম স্বাক্ষর শেষ করতে না করতে ক্লিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের বেয়ারা শীতল আর এক গাদা চেক এনে হাজির করল। চেকগুলির উল্টো পিঠে ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্ট্যান্টের সই চাই।

চটে উঠে বললাম, 'নিয়ে যাও। এখন সই হবে না।'

বেয়ারা চেকগুলি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে ক্লিয়ারিং-এর ইনচার্জ পরিমলবাবু নিজেই সেগুলিকে ফের বয়ে নিয়ে এলেন 'সব ঠিক ক'রে রেখেছি। শুধু আপনার সইটাই বাকি। কাল শনিবার। এসেই তাড়াতাড়ি হাউসে পাঠাতে হবে।

বললাম তা জানি, একটু আগে পাঠালেই পারতেন। এর পর থেকে কোন কাগজপত্রে দুটোর পর আমি আর সই করব না।

পরিমলবাবু মুখ কালো ক'রে বললেন, 'অমনিতেই আমার ডিপার্টমেন্টে একজন লোক শর্ট আছে। তারপর বিনয়বাবু আজ আসেন নি। সব ঠিকঠাক ক'রে আনতে দেরি হয়ে গেল। এখন শুধু আপনার সইটা হলেই হয়ে যায়।'

শুধু সই, ভাবখানা এই, আমরা এত পরিশ্রম করছি, আর আপনি শুধু সইটা করতে পারবেন না। সংক্ষেপে কেবল নিজের নামটুকু স্বাক্ষর করতে এত কষ্ট বোধ করছেন আপনি। কিন্তু সই করাটা যে সব সময় সহজ এবং প্রীতিপ্রদ নয় সে ধারণা এদের নেই।

মনে পড়ল ছেলেবেলায় নাম স্বাক্ষর করতে শিখে যেখানে-সেখানে দেয়ালে, কপাটে, বাবার নতুন পাঁজিকায়, পুরনো দলিলে, নিরুপম নন্দীকে অমর করে রাখবার কি চেষ্টাই না করেছি। কিন্তু ঠেকে ঠেকে এখন শিক্ষা হয়ে গেছে। যত্রতত্র নাম স্বাক্ষর করতে আজকাল সহজে স্বীকৃত হই না। অনেক কুণ্ঠা, অনেক কার্পণ্য প্রকাশ করি। তা সত্ত্বেও অফিসের রাশি রাশি কাগজপত্রে নিত্যই যখন নাম স্বাক্ষর করতে হয়, তখন আর নামটাকে নিজের বলে মনে হয় না,—এমনকি অক্ষর পরিচয়ের ওপর ঘৃণা জন্মে যায়।

স্বাক্ষব পর্ব শেষ ক'বে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ টেবিলেব ওপব সেই চিবকুটটি চোখে পডল। কৃষ্ণপ্রসন্ন সবকাব। জ্বালাতন ক'বে ছাড়ল। বেযাবাকে ডেকে বললাম, 'কে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন বাইবে। আসতে বল।'

একটু পবেই ভদ্রলোক আমাব চেম্বাবেব কাটা দবজা ঠেলে ভিতবে ঢুকলেন। তাঁকে দেখবাব সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়ালাম, 'একি মাস্টাবমশাই, আপনি।'

আমাদেব সাগবপুব এম ই স্কুলেব হেডমাস্টাব।

মাস্টাবমশাই ততক্ষণ আমাব সামনেব চেযাটায বসে বললেন, 'বসো, কযেকদিন ধবেই আসব আসব ভেবেছিলাম। শেষ পর্যন্ত এসে পডলাম।'

ছেলেবেলাব শিক্ষক। জোড হাতে নমস্কাব চলে না। পাযে হাতে প্রণামই বিধেয। কিন্তু ইউবোপীয পোশাকে প্রণামেব প্রাচ্যপদ্ধতিব অনুসবণ অশোভন না হোক, অসুবিধাজনক। তবু একটু ইতস্ততঃ ক'বে শেষ পর্যন্ত উঠে দাঁডালাম। তাবপব এগিযে এসে নিচু হযে মাস্টাবমশাইব পামশু ঢাকা পাযে দুটো আঙুল ছোঁযালাম। আঙুলে অবশ্য ধুলো লাগল না কিন্তু মনে হল নতুন কেনা টাইযেব আগাটা মেঝেব ধুলোয মাখামাখি হযে গেছে।

সত্যিই পাযেব ধুলো নিই কিনা দেখবাব জন্য মাস্টাবমশাইও এতক্ষণ অপেক্ষা কবেছিলেন। এবাব নিঃসংশয হযে হাত ধবে বসিযে বললেন থাক থাক, সিটে বস গিযে ভাল তো সব? নিশ্চিন্ত হযে আত্মপ্রসাদে এবাব একটু হাসলেন মাস্টাবমশাই। আব আমি অবাক হযে দেখলাম সামনেব দুটো দাঁত মাস্টাবমশাইব পড়ে গেছে। মনে পডল দাঁতেব ওপব ভাবি যত্ন ছিল মাস্টাবমশাইব। নিমেব ডাল ভেঙে বোজ সকালে দাঁত মাজতেন লবঙ্গ হবিতকি ছাড়া কোন দিন পান খেতে তাঁকে দেখিনি। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানেব দাঁতেব অধ্যাযটা একেবাবে লাইন বাই লাইন মেনে চলতেন মাস্টাবমশাই। তবু দন্তপংক্তিতে ভাঙন ধবেছে

ফিবে গিযে নিজেব চেযাবে বসে বললাম 'দুটো দাঁত পড়ে গেছে দেখছি

মাস্টাবমশাই ইংবেজীতে স্বীকৃতি জানালেন, yes, I have lost two of them কিন্তু আব গুলো সব শক্ত আছে।'

শেষ কথাটায মাস্টাবমশাইব দৃঢ আত্মপ্রত্যয ফুটে উঠল। মৃদু হেসে বললাম তাবপব স্কুলেব খবব কি বলুন। কেমন চলছে?'

মাস্টাবমশাই একটু চুপ ক'বে থেকে বললেন, 'স্কুল? তুমি কি দেশগাঁযেব কোন খববই বাখ না নাকি?'

অপবাধীব ভঙ্গিতে বললাম, 'না শীগগিব কোন খববটবব—'

মাস্টাবমশাই সংক্ষেপে গম্ভীবভাবে বললেন 'স্কুল আমি ছেড়ে দিযেছি' বিস্মিত হযে বললাম 'সেকি স্যাব, আপনি স্কুল ছাড়লেন?'

মাস্টাবমশাই বললেন, 'হ্যাঁ ছেড়ে এসেছি। এসেছি যখন সবই বলব, সবই শুনবে। তাব আগে যে জন্য আসা। একটা চাকবি-বাকবি জোগাড ক'বে দাও নিরুপম। তোমাদেব অফিসে আছে নাকি খালিটালি কোন জাযগা?'

'আমাদেব অফিসে?' মাস্টাবমশাইব মুখেব দিকে আমি একটুকাল অবাক হযে তাকিযে বইলাম। তিনি কি পবিহাস কবছেন? কিন্তু পবিহাসেব সম্পর্ক তো নয। তাছাড়া ঠাট্টা পবিহাসেব মত মুখেব ভাবও তাঁব এখন নেই। দাঁতগুলো শক্ত থাকা সত্ত্বেও গাল দুটো ভাঙা ভাঙা, চোযাল জেগে উঠেছে। গভীব বেখা পড়েছে কপালে। কালো লম্বাটে মুখখানায কেমন এক ধবনেব করুণ শীর্ণতা। মাথাব চুল ছোট ক'বে ছাঁটা, কিন্তু কালোব চেযে সাদা বঙেব ভাঁজই চুলে বেশি। হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেলাম। হেডমাস্টাবমশাইও বুড়ো হযেছেন। তাঁব যুবক বযসেব কিশোব ছাত্র ছিলাম আমবা। মাস্টাবমশাইব বার্ধক্যে নিজেব বযোবৃদ্ধি সম্বন্ধে যেন নতুন ক'বে সচেতন হযে উঠলাম।

কিন্তু একি বলছেন মাস্টাবমশাই। পঞ্চাশ পাব হযে গেছে বযস। এই বযসে তিনি নতুন ক'বে চাকবিতে ঢুকবেন। মাথা কি ওঁব—। মাস্টাবমশাইব প্রশ্নেব জবাব না দিযে বললাম, 'স্কুল ছেড়ে

এলেন কেন ?'

মাস্টারমশাই কাটকণ্ঠে বললেন, 'ছেড়ে এলাম কেন ? ছাড়ব না কি স্ত্রী পুত্র নিয়ে এই বুড়ো বয়সে না খেয়ে মরব ? তাই বল তোমরা।'

বেয়ারা একবার দোর ঠেলে উঁকি দিয়ে গেল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম দুটো বাজে। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'চলুন মাস্টারমশাই বেরুনো যাক। যেতে যেতে সব শুনব।'

ডালহৌসী স্কোয়ারের মোড় থেকে দক্ষিণ কলিকাতাগামী ট্রাম ধরলাম। তারপর মাস্টারমশাইর পাশাপাশি বসে শুনতে লাগলাম সাগরপুর এম ই স্কুল আর তাঁর ইদানীংকার ইতিহাস।

পাকিস্তানের হুজুগে গাঁয়ের বেশিরভাগ হিন্দু ছাত্র চলে আসায় স্কুলের ছাত্র সংখ্যা প্রায় দশ আনি কমে গেছে। বাকি ছয় আনির মধ্যে অর্ধেকের বেশি ছাত্রের কাছ থেকে নিয়মিত মাইনে আদায় হয় না। একমাত্র সরকারী সাহায্য পঞ্চাশ টাকা ভরসা। এম ই স্কুলের পাঁচজন মাস্টারের মধ্যে সেটা বাটোয়ারা হয়। সাহায্য বৃদ্ধির জন্য জেলা শহরে গিয়ে ধরাধরি করেছেন হেডমাস্টারমশাই, কিন্তু ইনস্পেক্টর এসে স্কুল পরিদর্শন ক'রে রিপোর্ট দিয়েছেন স্কুলের যা ছাত্র সংখ্যা তাতে পঞ্চাশের চাইতে বেশি সাহায্য সাগরপুর এম ই স্কুল আশা করতে পারে না। চার মাইল দূরে হোসেনপুরের নতুন এম ই স্কুলের ছাত্র সংখ্যা সাগরপুরের দেড়া অথচ সে স্কুলের বরাদ্দ পঞ্চাশের চাইতে এখনো পাঁচ টাকা কম আছে।

কিন্তু এতেও হেডমাস্টারমশাই ঘাবড়ান নি। টুকটাক ক'রে চালিয়ে নিচ্ছিলেন সংসার। সব চেয়ে বড় ভরসা ছিলেন স্কুলের সেক্রেটারী নিত্যনারায়ণ চৌধুরী। চৌধুরী বাড়ির টিউশনিও গোড়া থেকেই বাঁধা ছিল হেডমাস্টারমশাইর। নিত্যনারায়ণবাবুর ছোট ভাইদের থেকে শুরু ক'রে তাঁর ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনীদের পর্যন্ত হেডমাস্টারমশাই পড়িয়েছেন। প্রথমে পনের টাকায় আরম্ভ করেছিলেন। চৌধুরীমশাইর নাতি নাতনীর সংখ্যা বছরের পর বছর বাড়তে থাকায় টিউশনির টাকার অঙ্কও বেড়ে বেড়ে পঁচিশে পর্যন্ত উঠেছিল। স্কুলে লিখতে হত ষাট, মিলত চল্লিশ। মাইনের সঙ্গে টিউশনির এই উপরি টাকার সংযোগে সংসার চলত।

কিন্তু পাকিস্তান হওয়ার পর চৌধুরীরাও শেষ পর্যন্ত দেশ ছাড়লেন। ছেলেরা পুত্রকলত্র নিয়ে কেউ কলকাতা, কেউ এলাহাবাদ, কেউ দিল্লী পর্যন্ত পাড়ি দিল। নিত্যনারায়ণ নিজেও এলেন শহরে। হেডমাস্টারমশাই বললেন, আপনারা সবসুদ্ধ চলে গেলে চলবে কি ক'রে ? আমরা কি করব ?'

নিত্যনারায়ণ বললেন, 'তাই তো মাস্টার, তোমার সমস্যাটা তো রয়েই গেল। বাড়িতে ছেলেপুলে তো কেউ রইল না। পড়বে কে।'

নিত্যনারায়ণের চার বছরের নাতনী পার্পাড পয়সার লোভে দাদুর পাকা চুল বেছে দিচ্ছিল, সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এল। কেন দাদু, সরকারকাকা রইলেন দারোয়ান মন বাহাদুর রইল, ঝি রইল, মাস্টারমশাই তাদেরই তো পড়াতে পারবেন।

নিত্যনারায়ণ হো হো ক'রে হেসে উঠেছিলেন 'শুনলে ? শুনলে মাস্টার ? আমার দিদিমণির কথা শুনলে ?'

কিন্তু নিত্যনারায়ণের হাসিতে সমস্যাটার সমাধান হয়নি। চৌধুরী চলে আসবার পর কুণ্ডুপাড়ায় হেডমাস্টারমশাই পাঁচ টাকার আরো দুটো টিউশনি পেয়েছিলেন, কিন্তু নেন নি। সেকেণ্ড মাস্টারমশাইর মাস্টারী ছাড়াও মাতুল সম্পত্তি আছে, থার্ড মাস্টারমশাইর আছে মুদী দোকান, হেড পণ্ডিতের উপার্জনক্ষম দুই ছেলে, সেকেণ্ড পণ্ডিত শ্রীবিলাস চক্রবর্তীর যজমানী আর গুরুগিরি, কিন্তু হেডমাস্টারমশাইর সম্বল ছিলেন চৌধুরীরা তিনি সব চেয়ে বেশি নিঃসম্বল হলেন। এদিকে পোষ্যের সংখ্যা অনেক।

গোড়ার দিকে তিনটি মেয়ে। তাদের দুটিকে অবশ্য পার করেছেন। একটি আছে এখনো ঘাড়ের ওপর। তারপর পর পর ছেলে হয়েছে তিনটি। বড়টির বয়স সবে সাত।

হেডমাস্টারমশাই বললেন, 'দেখলে বিধাতার মার। এমন অসময়ে ছেলেপুলেগুলি হোল—। নইলে গীতাকে কোন রকমে পার করতে পারলে আমার আর ভাবনা ছিল কি। ওই হতচ্ছাড়াগুলোর

জন্যই তো—'

বুঝতে পারলাম ছেলেদের ভরণ-পোষণের ভাবনায় শেষ পর্যন্ত দেশ আর মাস্টারী দুই-ই তাঁকে ছেড়ে আসতে হয়েছে। মনে পড়ল এই হেডমাস্টারীর ওপর কি মমতাই না ছিল মাস্টারমশাইর। টিচার হিসাবে সুখ্যাতি ছিল বলে রতনপুরে আর বাধাগঞ্জের দুইটি হাই স্কুলে মাস্টারমশাই চান্স পেয়েছিলেন। কিন্তু যাননি। হাইস্কুলে তো আর হেডমাস্টার হয়ে যেতে পারবেন না। একবার আমাদের সাগরপুর এম ই স্কুলকেও হাইস্কুল করবার প্রচেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সবচেয়ে বেশি বাধা দিয়েছিলেন হেডমাস্টারমশাই নিজে। কমিটির মিটিংয় বক্তৃতা দিতে উঠে বলেছিলেন, 'এ প্রস্তাব নিতান্তই অযৌক্তিক। এ গাঁয়ে হাইস্কুল চলবে না, চলতে পারবে না। যদি বা চলে খুঁড়িয়ে চলবে। কিন্তু অখ্যাত একটি হাইস্কুলের চাইতে কীর্তিমান, খ্যাতিমান একটি এম ই স্কুলকে আমি বহুগুণে বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।'

হেডমাস্টারের কথায় যুক্তি ছিল, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে দৃঢ়তা ছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মনের কোণের গোপন দুর্বলতাটুকু টের পেতে কমিটির অন্যান্য সভ্যদের দেরি হয়নি। এই নিয়ে তাঁরা কেবল গা টেপাটিপিই করেননি, আড়ালে আবডালে টিপ্পনীও কেটেছিলেন, এম ই স্কুল হাইস্কুল হলে আমাদের হেডমাস্টারের হেডটুকু যাবে যে ? হেডমাস্টার সব ছাড়তে পারে, কিন্তু সাগরপুর এম ই স্কুলের ইন্দ্রত্ব কিছুতেই সে ছাড়তে রাজী নয়।

সেই ইন্দ্রপদও হেডমাস্টারমশাইকে ছেড়ে আসতে হল।

হাজরা রোডের মোড়ে ট্রাম থামতেই হেডমাস্টারমশাই উঠে দাঁড়ালেন, 'এখানে নামতে হবে আমাকে। হরীশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটে বাসা, চল না নিরুপম। গীতা, গীতার মা তোমাকে দেখলে সবাই খুশি হবে। ওরাই তো আমাকে ঠেলে পাঠাল তোমার কাছে। গীতা কার কাছ থেকে যেন তোমার ঠিকানা জোগাড় করেছিল।'

মনে পড়ল না গীতার চেহারা, যখন মাইনর ক্লাসে পড়তাম দু' তিনটি ছোট ছোট ফ্রক পরা মেয়ে দেখেছিলাম হেডমাস্টারমশাইর। হয়ত তাদেরই কেউ হবে, কিংবা তাদেরও পরে জন্মেছে। কিন্তু গীতাকে মনে না পড়লেও তার মার কথা মনে পড়ল। লুকিয়ে লুকিয়ে তখন সবে নভেল পড়তে শুরু করেছি, নায়িকার রূপ বর্ণনা পড়তে পড়তে হেডমাস্টারমশাইর স্ত্রীর কথা মনে হত। অমন সুন্দরী বউ আমাদের গাঁয়ে চৌধুরী বাড়িতেও ছিল না।

একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'কাজ ছিল একটু সন্ধ্যার দিকে, আচ্ছা চলুন দেখে যাই বাসা।'

কালীঘাটের টিনের বস্তী। তারই ভিতরে একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছেন হেডমাস্টারমশাই। সামনে খোলা দাওয়ায় তোলা উনানে রান্না উঠেছে।

হেডমাস্টারমশাই বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে ঢুকলেন, 'আলোটা ধর গীতা, দেখ এসে নিরুপমকে নিয়ে এসেছি।'

ছোট একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন হাতে এগিয়ে এল আঠারো উনিশ বছরের একটি মেয়ে, পিছনে পিছনে কৌতূহলী গুটি দুই ছেলেও এসে দাঁড়াল, হলুদ মাখা হাতে মাথায় আঁচল টানতে টানতে মুখ বাড়িয়ে দেখলেন একটু পৃষ্টাঙ্গী একজন মহিলা। চিনতে পারলাম ইনিই মাস্টারমশাইর স্ত্রী।

মাস্টারমশাই বললেন, 'নিরুপম নন্দী, আমার স্কুল থেকে থার্টিটুতে স্কলারশিপ পেয়েছিল, ফার্স্ট হয়েছিল ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে। মনে আছে আমাদের বারান্দার তক্তপোশে রাত জেগে জেগে বৃত্তি পরীক্ষার পড়া পড়ত ? নিরুপম নন্দী আর নুরুদ্দিন সিকদার। আচ্ছা নিরুপম, নুরুদ্দিন কোথায় আছে বলতে পার ?'

মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

তারপর নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিতে গেলাম মাস্টারমশাইর স্ত্রীর।

তিনি দু'পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'থাক থাক।'

একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে তিরস্কারের সুরে বললেন, 'তোমার নুরুদ্দিন ফুরুদ্দিন এখন রাখ তো।'

তারপর আমার দিকে চেয়ে মৃদু হাসলেন, 'আমাদের খুবই মনে আছে। তোমার বৃত্তি পাওয়া কীর্তিমান ছাত্রের দলই মাস্টারমশাইদের একেবারে ভুলে গেছে।'

মাস্টারমশাইর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম এই চল্লিশ বিয়াল্লিশ বছর বয়সে আগেকার সেই স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্যের সামান্যই অবশিষ্ট আছে। মাস্টারমশাইর মত অবশ্য অতটা চেহারা খারাপ হয়নি, দাঁত পড়েনি, কি চুলও পাকেনি। কিন্তু কঠিন জীবন সংগ্রামের ছাপ প্রৌঢ়ত্বকে আবো স্পষ্ট ক'রে তুলেছে। তা সত্ত্বেও হাসিটুকু ভারি ভালো লাগল, ভারি মিষ্টি লাগল অভিযোগেব ভঙ্গিটুকু।

বললাম, 'ভুলব কেন, তবে নানারকম কাজ-কর্মের চাপে খোঁজখবর আর নিয়ে ওঠা হয়নি।'

'ওরা কি দাঁড়িয়ে থাকবেন মা। বসতে বল না তক্তপোশে।'

মুখ ফিরিয়ে তাকালাম। এই বোধ হয় মাস্টারমশাইর মেয়ে গীতা। মায়ের মত অত সুন্দরী নয়। রঙটা একটু ময়লা। কিন্তু মায়েব চেয়ে স্বাস্থ্যবতী। কিন্তু দীর্ঘ দোহারা চেহারায়, মুখে ডৌলে, নাক চোখেব সুন্দর গড়নে ষোল সতের বছর আগেকার আর একটি তরুণী গৃহিণীব কথা মনে পড়ল। জ্যামিতিব উপপাদ্য মুখস্থ করতে কবতে হ্যারিকেনের তেল যখন ফুরিয়ে যেত, সলতে আসত নিবু নিবু হয়ে তখন মাস্টারমশাইর স্ত্রী উঠে এসে বোতল থেকে আমাদেব হ্যারিকেনে তেল ঢালতে ঢালতে বলতেন, 'আব পারিনে। বৃত্তি পেয়ে মাস্টাবমশাইকে মহারাজ করবেন। কাল থেকে বোতলে ক'রে বাড়ি থেকে তেল নিয়ে এস নিজেবা। আমি আব এক ফোঁটা তেল দিতে পাবব না।'

কিন্তু নিপুণ হাতে হ্যাবিকেনের মুখটুকু আটকে দিয়ে আমাদের মুখের দিকে চেয়ে স্নিগ্ধস্বরে বলতেন, 'নিরু, নুরুদ্দিন তোমাদের বোধ হয় খুব মশা লাগছে। মশারী টাঙিযে দিয়ে যাব ? মশাবীর মধ্যে বসে পড়বে ?'

নুরুদ্দিন জবাব দিত 'না মাসীমা। মশাবীব মধ্যে গেলেই শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। তার চেয়ে মশাব কামড ববং ভালো।'

মাসীমা হেসে উঠতেন, 'প্রাযই বিবেকের কামড়ের মত, তাই না ? ওদিকে ঘরের মধ্যে মশারীর ভিতবে আব একজনকে বিবেকে কামড়াচ্ছে। অতিষ্ঠ হয়ে তিনিও উঠে এলেন বলে।'

মাসীমা চলে গেলে আমি আব নুরুদ্দিন পরস্পবের মুখেব দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসতাম। মাইনর ক্লাসে পড়লে কি হয়, গোঁফেব রেখা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঠোঁটে। গাঁয়ের ছেলে, আন্দাজে আভাসে তখন থেকেই একটু-আধটু সব বুঝতে শিখেছি !

তক্তপোশে পা ঝুলিয়ে বসে চা জলখাবাব খেতে খেতে মাস্টারমশাইর আরও খানিকটা ইতিহাস শুনলাম মাসীমাব মুখে। চৌধুবীবা ছেড়ে এলেও মাস্টারমশাই স্কুল ছাড়তে ইতস্তত কবছিলেন, বলছিলেন, 'স্কুলেব কি দশা হবে ?'

মাস্টারমশাইব স্ত্রী রাগ ক'বে বলেছিলেন, 'যে দশা হয হোক। আমাদেব দশাটা কি তোমার চোখে পড়ছে না ? স্কুলের ভাবনা কি, তুমি চলে গেলে সেকেণ্ড মাস্টার হোক্ থার্ড মাস্টাব হোক্ একজনকে ওবা হেডমাস্টার বানিয়ে নেবে। ভাবি তো বিদ্যা লাগে তোমার ওই এম· ই· স্কুলের হেডমাস্টারীতে।'

মাস্টারমশাই তবুও বলেছিলেন, 'কিন্তু - -'

'কিন্তু টিন্তু বুঝি না, তুমি থাক তোমাব হেডমাস্টারী নিয়ে, আমি চললাম। ছেলেপুলে নিয়ে না খেয়ে মরতে পারব না।'

মাসীমাব দুই দাদা থাকেন ভবানীপুরে। একজন উকিল, আর একজন পুলিস ইনস্পেক্টর, তাঁদের সঙ্গে চিঠি লেখালেখি করলেন মাসীমা, তাঁবা বললেন, 'বেশ চলে এস, একটা গতি হবেই।'

কিন্তু থাকবাব মত ঘর নেই বাড়িতে। সপ্তাহ দুই থাকবার পব নানারকম অসুবিধা হ'তে লাগল। দাদা বললেন, 'অন্য একটা ঘরটর কোথাও খুঁজে নে। আমরা যা পারি কিছু কিছু—'

এদিকে ঘরও মেলে না শহরে। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে শেষে এই হরীশ চ্যাটার্জি স্ট্রীটের গলিতে মিলেছে বাসা। এই তো ঘর—আলো নেই, হাওয়া নেই, জল আনতে হয় রাস্তার কল থেকে। তবু মাসে মাসে এরই ভাড়া গুণতে হয় কুড়ি টাকা। ছ' মাসের ভাড়া আগাম দিতে হয়েছে বাড়িওয়ালাকে। মাঝখানে পাড়ার একটা রেশনের দোকানে খাতা লেখার চাকরি পেয়েছিলেন

মাস্টারমশাই কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতে কি সব গণ্ডগোলে গভর্নমেন্ট সে দোকান বন্ধ ক'রে দিয়েছে। এখন মাসখানেক ধ'রে একেবারে বেকার।

মাসীমা বললেন, 'তোমরা একটা ব্যবস্থা ট্যাবস্থা এবার ক'রে দাও নিরুপম।'

বললাম, 'আচ্ছা দেখি। আমাদের টালীগঞ্জ হাইস্কুলের সেক্রেটারীর সঙ্গে মোটামুটি জানাশোনা আছে। তাঁকে বলে টলে সেই স্কুলে যদি মাস্টারমশাইকে—'

মাস্টারমশাই প্রতিবাদ ক'রে উঠলেন, 'না নিরুপম, আর মাস্টারী নয়। না খেয়ে মরবো, তবু মস্টারী আর জীবনে করব না। কেরানীগিরি থেকে কুলিগিরি যা বল করতে রাজী আছি। কিন্তু মাস্টারী আর নয়। সাতাশ বছর ধ'রে মাস্টারী করার সুখ তো দেখলাম। যথেষ্ট হয়েছে। আর নয়।'

মাসীমা বললেন 'উনি মাস্টারী আর করতে চাইছেন না। অন্য কোন কাজকর্ম—'

আমি কিছু বলবার আগে গীতাই তার মাকে মৃদু তিরস্কারের স্বরে বলল, 'কি যে বল মা, নতুন অফিসে করার মত বয়স কি স্বাস্থ্য আছে নাকি বাবার।'

মাস্টারমশাই ধমক দিয়ে বললেন, 'না নেই, ওকে বলেছে নেই। কি হয়েছে আমার স্বাস্থ্যের। দেখতো নিরুপম, ছেলেবেলাও তো দেখেছ, এখনো দেখ।'

বলে মাস্টারমশাই পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটিয়ে তাঁর বাইসেপ দেখালেন আমাকে 'It is as strong as ever' দেখ, টিপে দেখ। তোমার প্রায় ডবল বয়সী হব তো আমি। কিন্তু বাজী রেখে বলতে পারি এখনো তুমি যতটা হাঁটতে পারবে, দৌড়তে পারবে তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম পারব না আমি। কলেজ জিমন্যাসিয়ামে একদিনও কেউ আমাকে গরহাজির হতে দেখেনি। বয়স হয়েছে বলে শরীরের সেই ফরম টরম একেবারেই কি ধুয়ে মুছে গেছে? স্পোর্টস-এও কারো চেয়ে কম যেতাম না। ফুটবলে অফেনসের চেয়ে ডিফেনসই আমাকে অবশ্য বেশি খেলতে হত। আমি যেদিন গোলে না দাঁড়াতাম—'

এবার স্ত্রীর ধমক খেলেন মাস্টারমশাই। তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ থাম, ওসব কে শুনতে চাইছে তোমার কাছে।'

মাস্টারমশাই বললেন 'মাসেলটা একটু টিপে দেখই না নিরুপম।

মাসেলের চাইতে মাস্টারমশাইর বাহুর ওপর দিয়ে যে রগগুলো জেগে উঠেছে তাই আমার চোখে পড়ল বেশি তবু বললাম, 'না না না, শরীর তো বয়সের তুলনায় সত্যিই বেশ ভাল আছে আপনার। তাছাড়া বয়সটাই বা কি। ওদের দেশে তো শুনি ষাট বছরে জীবন কেবল আরম্ভ হয়। আপনার কত হবে? বছর পঞ্চান্ন—'

মাস্টারমশাইর স্ত্রী বললেন, না না না। এই বৈশাখে সবে একান্নতে পড়েছেন।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'এক্জাক্টলি, যাস্ট ফিফটিওয়ান। কিন্তু দৌড়ে সাঁতারে যে কোন একুশ বছরের ছেলের সঙ্গে যদি তুমি আমাকে পাল্লা দিতে বল—'

মাস্টারমশাইর স্ত্রী আবার বিরক্ত হয়ে উঠলেন, কি যা তা বলছ। অফিসের চাকরীতে দৌড় ঝাঁপের জন্য কে ডাকতে যাচ্ছে তোমাকে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'তবে ওঁর মত ইংরেজী লিখতে আমি কাউকে আর দেখিনি নিরুপম। আমার বড় দাদা এম এ বি এল হলে কি হবে ইংরেজীতে ওঁর সঙ্গে পেরে ওঠে না। লেখার বাঁধুনী তো দূরের কথা, হাতের লেখাটাই যেন কেমন কাঁচা কাঁচা, আমাদের মেয়েদের মত। কিন্তু ওঁর লেখা সম্বন্ধে সে কথা কেউ বলতে পারবে না। আর লেখেনও খুব তাড়াতাড়ি। পাড়ার লোকের পক্ষ থেকে সেদিন ডাস্টবিন দেওয়া সম্বন্ধে কর্পোরেশনে একটা দরখাস্ত করেছিলেন। টাইপ ক'রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাতের লেখা কাগজটা আছে এখানে। কাগজখানা আন দেখি গীতা, দেখা তোর নিরুপমদাকে।'

গীতা কাগজখানা খুঁজতে লাগল।

মাস্টারমশাই তাঁর স্ত্রীর দিকে চেয়ে একটু হাসলেন, 'আমার ছাত্রের কাছে আমার বিদ্যার সার্টিফিকেট আর দিতে হবে না তোমাকে। ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত লেখার ব্যাপারে নিরুপম যেমন ছিল

শ্লো, তেমনি ওর হাতের লেখা ছিল কদর্য। ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলাম ওকে নিয়ে। একটা বছর স্কুলের স্কলারশিপটা বুঝি বাদই যায়। অথচ অঙ্ক, বাঙলা, ইতিহাস, ভূগোল সব বিষয়েই ভালো। কেবল ইংরেজী। ভাবলাম দু'বছরে একটা বিষয়ে কি আর টেনে তুলতে পারব না? থার্ডমাস্টার, পণ্ডিতমশাই সব হাল ছেড়ে দিলেন, কিন্তু আমি অত সহজে ছাড়বার পাত্র নই। হাতের প্রত্যেকটি অক্ষর ধরে ধরে শুধরে দিয়েছি, বেত মেরে মেরে মুখস্থ করিয়েছি গ্রামারের প্রত্যেক রুল।'

মাস্টারমশাই আমার দিকে তাকিয়ে পরম আত্মপ্রসাদে ফের হাসলেন, 'গ্রামারে আর বোধহয় তোমার ভুল হয় না, না নিরুপম?'

ভাষার গ্রামারের কথা জানি না, জীবনের গ্রামারে এখনো যথেষ্ট ভুল-ভ্রান্তি হয়। কিন্তু সেকথা মাস্টারমশাইর কাছে স্বীকার না ক'রে নিজের বৈয়াকরণিক বিশুদ্ধির কথাই ঘাড় নেড়ে বুঝিয়ে দিলাম।

ফেরার সময় সরু গলির মোড় পর্যন্ত দু'জনেই এলেন পিছনে পিছনে। মাস্টারমশাইর স্ত্রীর হাতে হ্যারিকেন লণ্ঠন। বিদায়ের আগে তিনি আর একবার বললেন, 'তোমার ভরসাতেই কিন্তু রইলাম নিরুপম।'

বললাম, 'আচ্ছা, সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

'চেষ্টা নয়, কিছু একটা তোমাকে ক'রে দিতেই হবে! সবই তো শুনলে।'

বললাম, 'আচ্ছা।'

প্রথমে মার্চেন্ট অফিসের দু'চারজন বন্ধুকে বললাম মাস্টারমশাইর কথা। কেউ কেউ মুচকি হাসল, কেউ [illegible]। মার্টিনের সতীশ বলল, 'এতই যদি গুরুভক্তি নিজের ব্যাঙ্কেই নিয়ে যাও-না-কেন।'

ধরলাম জেনারেল ম্যানেজার মিঃ গুপ্তকে। লোকজন নেওয়ার ভার তাঁরই হাতে।

তিনিও প্রথমে হাসলেন, 'বলছ কি নন্দী। একান্ন বছর বয়সে নতুন চাকরী। তারপর সাতাশ বছরের মাস্টারী। শুনি ও কাজ বারো বছর করলেই নাকি—। ব্যাঙ্কের এসব ফিগার ওয়ার্ক টোয়ার্ক তিনি কি পারবেন? তাছাড়া খাটুনিও তো কম নয়।'

বললাম, 'তিনি বলছেন, মাস্টারী ছাড়া তিনি সব পারবেন, সব করবেন। মাস্টারীতে নাকি তাঁর বিতৃষ্ণা এসে গেছে। যাই হোক আমাদের ব্যাঙ্কে ওঁকে একটা চান্স আপনার দিতেই হবে মিস্টার গুপ্ত।'

'আচ্ছা, তুমি যখন বলছ অত ক'রে দেখা যাক।'

ইন্টারভিউর জন্য আর চিঠি পাঠান হল না। মুখেই খবর দিয়ে এলাম। [illegible]ই খুব খুশি।

গীতা বলল, 'না নিরুপমদা, চা না খেয়ে যেতে পারবেন না।'

মাস্টারমশাইর স্ত্রী বললেন, 'দেখ দেখি বৈয়মটায় সুজি আছে খানিকটা। আর ওই টিনের কৌটোর মধ্যে চিনি আছে।'

বললাম, 'আবার ওসব কেন? শুধু চা হলেই তো হত।'

'ওই চা-ই, চা ছাড়া আর কিইবা তোমার সামনে ধরে দেওয়ার শক্তি আছে।'

চায়ের সঙ্গে একটু হালুয়াও প্লেটে ক'রে সামনে এনে রেখে দিল গীতা।

মৃদু হেসে বললাম, 'মিষ্টিমুখটা চাকরী হওয়ার পরে করালেই তো ভাল হত।'

গীতা কোন জবাব দিল না, তার মা বললেন, 'তুমি যখন রয়েছ, ও চাকরী হওয়ার মধ্যেই। তা ছাড়া চাকরীর জন্য কি। গরীব মাস্টারমশাইর বাসায় অমনিতেই না হয় একটু চা আর খাবার খেলে। তাতে জাত যাবে না।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'মাস্টারী ছেড়ে দিলাম, তবু মাস্টার মাস্টার করা ছাড়লে না তোমরা।'

মাস্টারমশাইর স্ত্রীও এবার হাসলেন একটু, 'আহা ছেড়ে দিলেও নিরুপমের তো মাস্টারমশাই তুমি।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'এখনো আছি, কিন্তু দু'দিন বাদে চাকরীটা যদি হয়েই যায় ওদের ওখানে,

তখন আব মাস্টাব নয়, কলীগ, সাবঅবডিনেট।'

চাকবি হলও। মিঃ গুপ্ত খুবই ভদ্রতা কবলেন। ইন্টাবভিউতে নাম ধাম ছাড়া বিশেষ কিছু জিজ্ঞেস কবলেন না। কেবল বলেছিলেন, 'এতদিনেব মাস্টাবী ছাড়লেন কেন, তাছাড়া ব্যাঙ্কেব কাজকর্ম কি আপনাব ভালো লাগবে।'

মাস্টাবমশাই জবাব দিয়েছিলেন, 'মাস্টাবীব মনোটনিব তুলনায় সব কাজই বোধ হয় ভালো।'

মিঃ গুপ্ত মৃদু হেসে বলেছিলেন, 'বেশ দেখুন, কেমন লাগে।'

বিশেষভাবে ধবে পড়ায় মাইনেব বেলায়ও বেশ একটু খাতিব কবলেন মিঃ গুপ্ত, আমাদেব ব্যাঙ্কে সাধাবণত আণ্ডাব গ্রাজুয়েটদেব স্টার্টিং ষাটে। জেনাবেল ম্যানেজাবকে বললাম, 'কিন্তু ওঁব নিজেব বয়সই তো প্রায় ষাট হ'তে চলল, এই বয়সে ষাট টাকা দিয়ে উনি কববেন কি,—তাছাড়া অতগুলি পোষ্য।'

ম্যানেজিং ডিবেক্টবেব সঙ্গে খানিকক্ষণ কি পবামর্শ ক'বে আবও খানিকটা দাক্ষিণ্য দেখালেন জেনাবেল ম্যানেজাব। স্পেশাল কেস হিসাবে গণ্য ক'বে ষাট থেকে উঠলেন পঁচাশিতে। বললেন, 'দেখি কাজ কর্ম কি বকম কবেন না কবেন, তাবপব দেখা যাবে।'

সপবিবাবে মাস্টাবমশাই কৃতজ্ঞতা জানালেন। এম ই স্কুলে সাবা জীবন থাকলেও এত টাকা পেতেন না মাস্টাবমশাই।

চৌধুবীদেব টিউশনিব টাকা ধবেও সংখ্যাটা অতখানি উঁচুতে পৌঁছত কিনা সন্দেহ। খবব পেয়েই কালীবাড়িতে ডালা পাঠিয়েছিলেন মাস্টাবমশাইব স্ত্রী। গীতাব চায়েব সঙ্গে ফুলেব পাপড়ি সুদ্ধ প্রসাদেব অংশও পেলাম

গীতা মৃদুস্ববে বলল মা ভাবি খুশি হয়েছেন।'

বললাম, 'আব তুমি ?'

গীতা বলল 'আমাকে একটা চাকবী জুটিয়ে দিন, আমিও হব।'

হেসে বললাম, 'খুশি হবাব জন্য জুটিয়ে অবশ্য তোমাকে কিছু একটা দিতে হবে, কিন্তু সে চাকবী কিনা তাই ভাবছি।'

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেবে গীতা একটু আবক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু পবক্ষণেই সামলে নিয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট সবল গদ্যে বলল, 'না নিরুদা আজকালকাব মেয়েদেব আব কিছু জুটিয়ে দিয়ে খুশি কববাব দবকাব হয় না। তাব চাইতে একটা কাজকর্মেব সন্ধান দিলেই তাবা সব চেয়ে বেশি খুশি হয়।'

•

প্রথমে পবিমলবাবুব ক্লিয়াবিং ডিপার্টমেণ্টেই দিলাম মাস্টাবমশাইকে, তিনি লোক চেয়েছিলেন। অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টেও অবশ্য লোকেব দবকাব। তবু পবিমলবাবুকেই সবচেয়ে আগে খাতিব কবলাম

পবিমলবাবু কিন্তু এ্যাসিস্ট্যান্ট পেয়ে খুব খুশি হলেন না। বললেন, 'শেষ পর্যন্ত একজন চুল পাকা বুড়োকে পাঠালেন আমাব ডিপার্টমেণ্টে ?'

পবিমলবাবুব নিজেব বয়সও চল্লিশ বিয়াল্লিশেব কম হবে না, ঘবে বিবাহ-যোগ্য মেয়ে আছে। মাঝে মাঝে ছেলেব সন্ধান কবেন আমাব কাছে।

হেসে বললাম, 'অত বয়স বিচাব কবছেন কেন পবিমলবাবু ? জামাই তো আব নিচ্ছেন না, এ্যাসিস্ট্যান্টই নিচ্ছেন। বয়স দিয়ে কি হবে, আপনাব কাজ চলে গেলেই হল। গোড়াতে একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবেন, তাহলেই হবে।'

ছুটিব পবে ডালহৌসীব মোড়ে মাস্টাবমশাইব সঙ্গে দেখা। দেখলাম এই বয়সে প্রায় তরুণ জামাইব মতই সেজেছেন মাস্টাবমশাই। যখন স্কুলে পড়েছি, তখন এত পারিপাট্য দেখিনি। ইস্ত্রী করা সাদা পাঞ্জাবীতে কালো বোতাম লাগানো। ঝুলন্ত কোঁচাটা নিপুণ হাতে কোঁচানো, পায়েব পামশুটা পুবনো হলেও সদ্য পালিসে চক চক করছে। গোঁফ দাড়ি নিখুঁতভাবে কামানো। চুলটা বোধ হয় আজই ছেঁটেছেন। সেলুনেব ছাঁট বেশ বোঝা যায়। স্কুলে যখন ছিলেন, তখন জামা থাকতো বোতাম থাকতো না, হয়তো দু'পাটি চটিব দু'খানা পায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়তেন।

বললাম, 'অফিস কেমন লাগছে মাস্টাবমশাই ?'

মাস্টাবমশাই একটু হাসলেন, বললেন, 'ভালোই তো ?'

ট্রামে পাশাপাশি বসে হঠাৎ বলে ফেললাম, 'একদিনেই আপনি যেন আমূল বদলে গেছেন। স্কুলেব অন্যান্য মাস্টাবমশাইবা আপনাকে দেখলে এখন আব চিনতে পাববে না।'

মাস্টাবমশাই আমাব দিকে তাকিযে বললেন, 'কেন ?'

বললাম, 'তখনকাব পোশাক পবিচ্ছদেব সঙ্গে একেবাবেই তো কোন মিল নেই কি না। এবাব দাঁত দুটো বাঁধিযে নিলেই— মনে হল ঠিক আগেকাব দিনেব মত ক্রুদ্ধ চোখে মাস্টাবমশাই আমাব দিকে তাকালেন।

একটু লজ্জিত হলাম। এতখানি প্রগলভতা হঠাৎ না দেখালেও পাবতাম। তখনকাব দিনে হেডমাস্টাবমশাইব মুখেব দিকে তাকিযে কথা বলতে পাবতাম না, আব এখন দিব্যি ঠাট্টা তামাসা কবছি। এতখানি আধুনিকতা মাস্টাবমশাই সহ্য কবতে পাববেন কেন।

ক্ষমা চাইতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু দেখলাম মাস্টাবমশাইব তাকানাব ভঙ্গিটা এবই মধ্যে বেশ বদলে গেছে।

মনে হল আমাব দিকে চেযে মাস্টাবমশাই একটু হাসলেন বললেন 'ও আমাব সাজসজ্জাব কথা বলছ। তুমি বুঝি ভেবেছ এসব আমি নিজেব গবজে নিজেব হাতে কবেছি ?

বিস্মিত হযে বললাম তবে ? গীতা বুঝি ?

মাস্টাবমশাই মাথা নেড়ে বহস্যগম্ভীব স্ববে বললেন তাও নয

বললাম তবে ?

মাস্টাবমশাই বললেন লাবণ্য I mean গীতাব মা মাস্টাবমশাইব স্ত্রীব নামটা এবাব মনে পড়ে গেল। তখনকাব দিনে লাবণ্যলেখা সবকাবেব নামে প্রাযই চিঠি যেত ডাকে। গাঁযে পোস্টঅফিসে পিওন ছিল না। পোস্টমাস্টাবেব হাত থেকে আমবাই চিঠি নিযে তাঁকে পৌঁছে দিতাম। ভাবি সুন্দব লেগেছিল নামটি লাবণ্যলেখা মনে হযেছিল তাঁব স্বভাবেব সঙ্গে চেহাবাব সঙ্গে নামটি চমৎকাব মানিযে গেছে। এছাড়া তাঁব অন্য কোন নাম যেন কল্পনাই কবা যেত না

এতদিন বাদে স্ত্রীব নাম আমাব সামনে উচ্চাবণ কবে ফেলে মাস্টাবমশাই নিজেও যেন ভাবি লজ্জিত হযে পড়লেন চোখ ফিবিযে নিযে তাকালেন বাইবেব দিকে, গড়েব মাঠেব ওপাবে গঙ্গা গঙ্গাব ওপাবে লাল হযে সূর্য অস্ত যাচ্ছে লজ্জায কি আবক্ত দেখাচ্ছে মাস্টাবমশাইব মুখ না কি এ বঙ সূর্যাস্তেব। একটু বাদে ফেব মুখ ফেবালেন, মাস্টাবমশাই বললেন এ সব গীতাব মাব কাণ্ড। বাধা দিযেছিলাম বলেছিলাম লোকে হাসবে যে। সে জোব কবে বলল না হাসবে না আব হাসে যদি হাসলই বা। এতদিন নিজেব হাতে বেশভূষা কবে লোক হাসিযেছ আজ না হয আমাব জন্যই হাসালে।

আমি প্রতিবাদ কবে বললাম 'না না হাসবাব কি হযেছে মাস্টাবমশাই।

মাস্টাবমশাই আমাব কথা যেন শুনতে পাননি নিজেব মনেই বললেন 'ভাবলাম ওব কোন সাধ আহ্লাদ তো মেটেনি, আজ যদি এভাবে একটু মেটাতে চায মেটাক

মনে হল আমাব পাশে বসে আমাদেব ছেলেবেলাব বেত হাতে সেই কড়া হেডমাস্টাব কৃষ্ণপ্রসন্ন সবকাব আব কথা বলছেন না, অন্নচিন্তায কাতব পঞ্চাশ বছরের কোন প্রৌঢ় কেবানীও নয, ইনি সম্পূর্ণ আব একজন। স্ত্রীব অপূর্ণ সাধ আহ্লাদেব কথা জীবন সাযাহ্নে যাঁব মনে পড়ে গেছে।

কথায কথায এম ই স্কুলেব হেডমাস্টাবেব জীবনেব আব এক গোপন অধ্যায আমাব কাছে উদ্ঘাটিত হল।

লাবণ্যলেখা তখন গীতা, গোবিন্দেব মা নন এমন কি আমাদেব শ্রদ্ধেয হেডমাস্টাবমশাইব স্ত্রীও নন, সিটি কলেজেব তৃতীয বার্ষিক শ্রেণীব ছাত্র কৃষ্ণপ্রসন্নেব সখেব ছাত্রী তখন লাবণ্য।

কৃষ্ণপ্রসন্ন তখন কলেজ হস্টেলে থাকে। স্ত্রী স্বাধীনতাব পক্ষে ডিবেটিং ক্লাবে জোব বিতর্ক কবে। জিমনাশিযামে বাব বাব বাববেলেব খেলা দেখায। ফুটবলে তেমন আসক্তি না থাকলেও টিমেব ক্যাপ্টেন জোব করে তাব হাতে তুলে দেয গোলবক্ষাব দাযিত্ব, এসব ছাড়া অবসব

বিনোদনের আরও একটু জায়গা আছে কৃষ্ণপ্রসন্নের, শ্যামবাজারের নলিন সরকার স্ট্রীটের একটি দ্বিতল বাড়ির দক্ষিণ খোলা একখানা ঘরে। বাড়িটি একেবারে নিঃসম্পর্কিত নয়। জেঠতুতো বোনের শ্বশুরবাড়ি। দিদির শ্বশুরের সেজো মেয়ে লাবণ্য। চৌদ্দ উৎরে পনেরোয় পড়েছে। পড়াশুনোয় ভারি আগ্রহ। কিন্তু দিদির শ্বশুরমশাই এসব বিষয়ে ভারি রক্ষণশীল। মেয়েকে ইংরেজী স্কুলের দু' তিন ক্লাস পড়িয়েই স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনেছেন। এনে তুলে দিয়েছেন পাকা দাড়িওয়ালা এক বুড়ো মাস্টারের হাতে। কৃষ্ণপ্রসন্নের পরম ভাগ্য দিদির শ্বশুরবাড়িতে যাতায়াত শুরু করার দিন পনের যেতে না যেতেই সেই বুড়ো মাস্টারের শক্ত অসুখ হল। দিদির শ্বশুরের মত বর আর দেবরেরা সেকেলে নয়। তাঁরা বললেন, 'লাবুর পরীক্ষা এসেছে, কৃষ্ণপ্রসন্ন তুমিই একটু ওকে দেখিয়ে শুনিয়ে দাও না।'

কৃষ্ণপ্রসন্ন জিভ কেটে বলে 'ওরে বাবা, থিয়েটার বাড়ি থেকে নারদের এক গোছা পাকা দাড়ি তাহলে ধার ক'রে আনতে হয়।'

কিন্তু দাড়ি ধার করবার দরকার হল না। দিদি আর দিদির শাশুড়ীর সার্টিফিকেটে কৃষ্ণপ্রসন্নই তরুণ হয়েও বসতে শুরু করল সেই বুড়ো মাস্টারের পরিত্যক্ত চেয়ারে। প্রথমে কেউ কোন কথা বলে না, কেউ কারো দিকে তাকায় না বইয়ের দিকে দুজনেই চোখ নিচু ক'রে থাকে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি সে ছাপার অক্ষরে আবদ্ধ থাকে না। তারপর মাস তিনেক বাদে ফের যখন সেই বুড়ো মাস্টারমশাইয়ের আসবার কথা হল, লাবণ্য বলল, 'আমি আর তাঁর কাছে পড়ব না।'

কৃষ্ণপ্রসন্ন বলল, 'তবে কার কাছে পড়বে?'

'এখন যার কাছে পড়ছি।'

'বা রে আমি কি সারা জীবন মাস্টারী করব নাকি?'

লাবণ্য হেসে বলল, 'করবেই তো, মাস্টারীর মত এমন মহৎ কাজ আর নেই।'

কিন্তু দু'বছর বাদে গাঁয়ের এম ই স্কুলে হেডমাস্টারী নেওয়ার সময় এই লাবণ্যই সবচেয়ে বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। জেঠতুতো বোনের মধ্যস্থতায় লাবণ্য তখন শুধু আর কৃষ্ণপ্রসন্নের ছাত্রীই নয়, সাগরপুর সরকার বাড়ির বউ হয়ে ঘরে এসেছে। আর বি এ পরীক্ষা দিতে বসে এক জ্ঞাতি ভাইয়ের মুখে স্ত্রীর ডবল নিউমোনিয়ার খবর পেয়ে পরীক্ষার হল ছেড়ে একেবারে দেশে চলে এসেছে কৃষ্ণপ্রসন্ন। বাবা বললেন, ইচ্ছা করেই আমরা খবর দিইনি। পরীক্ষার চেয়ে তোর বউ বড় হল?'

কৃষ্ণপ্রসন্ন বলল, 'স্ত্রীর. জীবনের চাইতে আমার পরীক্ষা বড় নয়।

রোগটা ঠিক ডবল নিউমোনিয়া ছিল না। অল্প দিনেই লাবণ্য উঠে বসল এবং উঠে বসেই বলল, 'তোমার পরীক্ষার কি হল?'

কৃষ্ণপ্রসন্ন জানাল পরীক্ষা সে দেয়নি।

লাবণ্য বলল, 'ছি ছি ছি আমার জন্য তুমি পরীক্ষা বন্ধ করলে? আমি মুখ দেখাব কেমন ক'রে? তুমি এক্ষুনি ফের কলকাতায় চলে যাও।'

কৃষ্ণপ্রসন্ন অতদূর গেল না। তখন দক্ষিণ পাড়ার চৌধুরীদের উদ্যোগে নতুন এম ই স্কুল হচ্ছে গাঁয়ে। নিত্যনারায়ণ তাকে ধরে বসলেন, 'তোমার কলেজ খোলার তো ঢের দেরি। তার আগে আমাদের স্কুলটা একটু ঠিকঠাক ক'রে দিয়ে যাও।' তারপর কতবার কলেজ খুললো, বন্ধ হল। কিন্তু কৃষ্ণপ্রসন্নের আর যাওয়া হল না।

লাবণ্য বলেছিল, 'তুমি কি সত্যিই মাস্টারী নিলে?' কৃষ্ণপ্রসন্ন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত একটু হেসেছিল, 'নিলামই বা। মাস্টারীই তো সব চেয়ে মহৎ বৃত্তি।'

বাড়ির আর গাঁয়ের সব লোক জানল বউকে এক মুহূর্ত ছেড়ে থাকতে পারবে না বলেই কৃষ্ণপ্রসন্ন বিদেশে গেল না। এমন স্ত্রৈণ পুরুষ আর দুটি নেই। লাবণ্য জানত অবশ্য অন্য কথা। তারপর—তার একটানা সাতাশ বছর।

হাজরা রোডের মোড়ে নেমে যাওয়ার আগে ফের সাতাশ বছরের পরের একটু খবর দিয়ে গেলেন মাস্টারমশাই, হেসে বললেন, 'ছেলেমেয়েদের চোখের আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে গীতার মা

চুপি চুপি আমাকে কি জিজ্ঞেস কবেছিল জানো নিরুপম ?'

বললাম, 'কি জিজ্ঞাসা কবেছিলেন ?'

মাস্টাবমশাই একটু হাসলেন, 'আচ্ছা, নিরুপমেব মত সবাই কি স্যুট পবে আসে ? তাব মানে সবাই যদি স্যুটধাবী হয়, তাহলে আমাবও পবিত্রাণ নেই। তাহলে তাঁব বড বউদিব কাছ থেকে তাঁব দাদাব পুবনো একটা স্যুট ধাব ক'বে আনবেন আব তাঁব বউদিদিব মতই নিজেব হাতে টাই বাঁধবেন আমাব গলায়।' হেসে বললাম, 'সামনেব মাসে আপনাকে একটা স্যুট আমি কবিয়ে দেব মাস্টাবমশাই।'

'পাগল নাকি ? এই ধুতী পাঞ্জাবীব চোটেই অস্থিব। দু'বাব ক'বে নিজেব হাতে কেচেছে, পাশের বাসাব ইস্ত্রীটা চেয়ে এনে ইস্ত্রী কবেছে, কেবল কি তাই ? কোঁচাটা পর্যন্ত নিজেব পছন্দমত কুঁচিযে দেওযা চাই।' বলে কি জানো।—এ তো তোমাব গাঁযেব স্কুল নয়, শহবেব অফিস।' হেড মাস্টাবমশাই ফোকলা দাঁতে একটু হাসলেন। তা সত্ত্বেও দাঁতেব সেই বিশ্রী ফাঁক আমাব চোখে তেমন যেন আব বিসদৃশ লাগল না। কাবণ সাতাশ বছব আগেকাব সেই লাবণ্য আব কৃষ্ণপ্রসন্ন আমাব মনকে তখনো আচ্ছন্ন ক'বে বযেছে।

কিন্তু মাস্টাবমশাই সম্বন্ধে এই বোমান্টিক আচ্ছন্নতা বেশি দিন বজায বইল না। সপ্তাহ খানেক যেতে না যেতেই ঝডেব বেগে ক্লিয়াবিং এব পবিমলবাবু আমাব চেম্বাবে এসে ঢুকলেন।

বললাম, ব্যাপাব কি পবিমলবাবু ?

আচ্ছা নিরুপমবাবু, ক্লিয়াবিং ডিপার্টমেণ্টেব ইনচার্জ আমি না কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু ?'

বললাম 'ইনচার্জি এতো সবাই জানে ?'

কিন্তু কৃষ্ণপ্রসন্নবাবু জানেন না জানলেও মানেন না ' তাবপব অভিযোগেব পূর্ণ বিববণ দিলেন পবিমলবাবু। এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হযেও কথায় কথায় তাঁব সমালোচনা কবেন মাস্টাবমশাই। ছোকবা কর্মচাবীদেব সামনে তাঁব ইংবেজীব ভুল ধবেন কথাবার্তায় খুঁত ধবেন। মুহূর্তে মুহূর্তে কাজেব ব্যাঘাত হয়। পবিমলবাবু বললেন 'লোকেব আমাব আব দবকাব নেই মশাই, একজন লোক শর্ট নিয়ে আমি আজীবন কাজ কবতে বাজী আছি বাত দশটা পর্যন্ত থাকতে হয তাও স্বীকাব। কিন্তু এই বুডোকে আপনি সবিয়ে নিন। দুষ্ট গরুব চেয়ে আমাব শূন্য গোযাল ভালো।'

পবিমলবাবুকে যেতে বলে মাস্টাবমশাইকে ডেকে পাঠালাম। তাঁব মুখও থম থম কবছে।

বললাম ব্যাপাব কি মাস্টাবমশাই ? পবিমলবাবুব সঙ্গে নাকি আপনি ঝগড়া কবেছেন।'

মাস্টাবমশাই উত্তেজিত হযে বললেন, 'ঝগড়া ? ওকে যে বেতিযে পিঠ লাল ক'বে দিইনি আমি সেই ওব

বাধা দিযে বললাম থামুন থামুন। কবেছেন কি তিনি

মাস্টাবমশাই বললেন, 'প্রথমে তো এক লাইনও ইংবেজী লিখতে পাববে না। একটা সেনটেনসে দুটো বানান ভুল, তিনটে গ্রামাটিক্যাল মিসটেক। শুধবে দিলেও শুনবে না, কেবল উড়ো তক।

মাস্টবামশাই বললেন, বেশ লিখছে লিখুক ভুল ইংবেজী। তা না হয নাই ধবলাম। কিন্তু ছেলেব বযসী সব ছোকবা। তাদেব সঙ্গে প্রকাশ্যে অফিসেব মধ্যে এসব কি ইযার্কি। ভদ্রঘবেব মেয়েদেব কথা নিযে সিনেমাস্টাবদেব নিযে এমনকি ব্রথেলেব—। ছি ছি ছি। এ সব তুমি সহ্য কবতে বল নিরুপম ?'

আদিবসে পবিমলবাবুব একটু বেশি আসক্তি আছে। আট ন' ঘণ্টা কলম পিষে পিষে অন্তবাত্মা যখন শুকিযে আসে, ঝিমিযে আসে, অল্প বযসী কেবানীব দল তখন স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত ব্যাঙ্কে নানা ধবনেব মেয়েদেব প্রসঙ্গ আব যৌনজীবনেব অভিজ্ঞতাব কথা তুললে তিনি নিজেব এবং সহকর্মীদেব কলম মন দুইই বসাপ্লুত কবেন। এ খববটা আমি জানি। কিন্তু পবিমলবাবু কাজকর্মে ভাবি দক্ষ লোক। ক্লিযাবিং মেলাতে ওঁব মত যোগ্যতা আব কাবো নেই ব্যাঙ্কে।

মাস্টাবমশাইকে বললাম: 'এখানে সবাই কলীগ। অত বাদ-বিচাব'—

মাস্টাবমশাই তেমনি তীব্র কণ্ঠে বললেন, 'কলীগ, তাই বলে স্থানকালপাত্র ভেদ নেই ? অশ্লীল অশ্রাব্য আলোচনায ছেলেব বযসী ছাত্রেব বযসী সব ছোকবাদেব মাথা চিবিযে খেতে হবে ? ফের যদি পবিমলবাবুব মুখে আমি এই সব কুৎসিত কথা শুনি, আমি থাপ্পড মেবে গাল ভেঙে দেব। হাতাহাতি হযে যাবে আমাব সঙ্গে।'

গম্ভীবভাবে বললাম, 'আচ্ছা যান। আমি এব ব্যবস্থা কবব।'

সেইদিনই মাস্টাবমশাইকে স্থানান্তবিত কবলাম বিল ডিপার্টমেণ্টে। পবিমলবাবু থেকে তাঁব অল্পবযসী সহকাবীবা সবাই খুশি।

'বাঁচিযেছেন নিরুপমবাবু। আব এক সপ্তাহ মাস্টাবমশাইব সঙ্গে থাকলে আমবা পাগল হযে যেতাম। লোক আপনি পাবেন দেবেন না পাবেন না দেবেন কিন্তু মাস্টাব-টাস্টাব আব পাঠাবেন না।'

কিন্তু দিন পাঁচ ছযও কাটল না। বিল ডিপার্টমেণ্টেও ফেব গোলমাল উঠল। বিলেব ইনচার্জ ননীবাবু এসে গম্ভীব মুখে নালিশ কবলেন, 'মাস্টাবমশাইকে সবিযে নিন। ওঁব দ্বাবা আমাব কাজ চলবে না।'

মাস্টাবমশাই নামটা এবই মধ্যে সমস্ত ব্যাঙ্কে ছডিযে পডেছে।

বললাম, 'কি হযেছে ননীবাবু।'

'আবে মশাই, নিজে কাজকম কিছু বুঝবেন না, বুঝতে চেষ্টা কববেন না। কেবল আমাব দোষ ধববেন। কাব দ্বাবা কতটুকু কাজ হয না হয আমি জানি, আমি বুঝি। ডিপার্টমেণ্টেব এ্যাডমিনিস্ট্রেশনেব ব্যাপাবে উনি কেন মাথা গলাতে আসেন বলেন তো। ওঁব সঙ্গে কাজ কবা impossible, বিল থেকে হয ওকে আপনি সবিযে নিন, না হয আমাকে সবান। আপনি যদি কোন ব্যবস্থা না কবেন আমি জেনাবেল ম্যানেজাবেব কাছে বিপোর্ট কবব

গম্ভীবভাবে বললাম 'আচ্ছা দেখছি। মাস্টাবমশাইকে ডেকে পাঠিযে বললাম ব্যাপাব কি, আপনাব নামে ফেব কমপ্লেন এসেছে।'

তিনি বললেন, কমপ্লেন ? আমি ননীবাবুব বিরুদ্ধে কমপ্লেন কবছি। মানুষ না ব্রুট।'

বললাম, 'ব্যাপাবটা কি।'

মাস্টাবমশাই বললেন, 'ব্যাপাব কি আব। ক্লিক কেবল ক্লিক জন পাঁচেক মাত্র লোক ডিপার্টমেণ্টে। তাব মধ্যে দুটো ক্লিক। একজন আব একজনেব বিরুদ্ধে লাগাচ্ছে ইনচার্জেব কাছে। কিন্তু ননীবাবু তো হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট। তাঁব তো উচিত নিবপেক্ষ থাকা সুবিচাব কবা কিন্তু পক্ষপাত তাঁবই সব চেযে বেশি। নির্মল বলে একটি ছেলে আছে। সবে ম্যাট্রিক পাশ ক'বে আই কম -এ ভর্তি হযেছে। ছেলেটি একটু স্পষ্ট বক্তা। সেই জন্য ননীবাবুব যত আক্রোশ তাঁব ওপব।'

বললাম, 'তা থাক, আপনি ওব ভিতবে না গেলেই তো পাবেন।'

মাস্টাবমশাই উত্তেজিত হযে বললেন, 'বল কি তুমি ? না গেলেই পাবি ? আমাব চোখেব সামনে ছেলেটাকে এমন ক'বে নির্যাতন কববে আব আমি কোন কথা বলব না ? পাঁচটাব মিনিট কযেক আগে থেকে ননীবাবু এমন ক'বে কাজ চাপাবেন ওব ঘাডে যে সপ্তাহে ছেলেটিব চাব পাঁচ দিন কলেজ কামাই হয। এই তো একবত্তি ছেলে, খাটাতে খাটাতে ওব জিভ বেব ক'বে ফেলেছেন ননীবাবু। কথা না বলে কোন মানুষে পাবে ?'

বললাম, 'ননীবাবু জেনাবেল ম্যানেজাবেব নিজেব ভাগ্নে। তিনি যদি কোন বিপোর্ট টিপোর্ট কবেন তাহলে কিন্তু শত চেষ্টা ক'বেও আমি আপনাব চাকবি বাখতে পাবব না মাস্টাবমশাই, মাস্টারীব মাযা যখন ছেডেছেন একেবাবে ছাডুন। অফিসে এসে আর কক্ষনো মাস্টাবী কববেন না মাস্টাবমশাই।'

আমাব শাসনেব ভঙ্গিতে মাস্টাবমশাই বেশ একটু ঘাবডে গেলেন, 'না বাবা দোহাই তোমাব, চাকবী টাকবিব যেন কোন গোলমাল না হয। তুমি বরং ননীবাবুকে আমাব হযে।—আচ্ছা আমিও না হয তাঁব কাছে ক্ষমা চাইব।'

বললাম, 'ক্ষমা চাওযাব হযত দবকার হবে না, কিন্তু খুব সমঝে চলবেন।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'আচ্ছা নিরুপম তাই চলব। কিন্তু খবরদার, তুমি যেন আমার বাসায় গিয়ে অফিসের এসব গোলমালের কথা বল না বাবা। গীতার মা শুনলে—।'

হেসে মাস্টারমশাইকে অভয় দিয়ে বললাম, 'না, তিনি এসব জানতে পারবেন না।'

কিন্তু দু'দিন বাদে ফের মাস্টারমশাইর নামে ননীবাবু অভিযোগ করলেন। তিনি ফের ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করেছেন। তাঁকে নিয়ে কাজ করা অসম্ভব।

সুতরাং আবারও অন্য ডিপার্টমেন্টে বদলী করতে হল মাস্টারমশাইকে।

মাস্টারমশাই মুখ ভার ক'রে বললেন, 'বারবার তুমি আমারই দোষ দেখছ নিরুপম। শাস্তি দিয়ে আমাকেই সরাচ্ছ।'

বললাম, 'তা ঠিক নয় মাস্টারমশাই, কিন্তু অফিসের একটা ডিসিপ্লিন আমাকে মেনে চলতে হবে। ননীবাবু এখানকার পুরনো লোক আর খুব এফিসিয়েন্ট হ্যাণ্ড। তা'ছাড়া জেনারেল ম্যানেজারের—।'

মাস দুয়েকের মধ্যে ব্যাঙ্কের প্রায় সমস্ত ডিপার্টমেণ্টই মাস্টারমশাইকে ঘুরিয়ে আনলাম। লেজার, লোন, ফিক্সড-ডিপজিট, এ্যাকাউন্টস, ডেসপ্যাচ—কোন বিভাগই বাদ রইল না, কিন্তু সব জায়গা থেকে অভিযোগ আসতে লাগল। মাস্টারমশাই সর্বত্রই অপ্রিয় হয়ে উঠেছেন তিনি 'কেঅস' সৃষ্টি করছেন অফিসে। তাঁকে নিয়ে কাজ করা অসম্ভব। কর্তৃপক্ষের কাছেও তাঁর নামে রোজ নানা ধরনের অভিযোগ যেতে শুরু করল।

ভারি চিন্তিত হয়ে পড়লাম। মাস্টারমশাইর চাকরী বুঝি আর রাখা গেল না।

এর মধ্যে একদিন তাঁর বাসায়ও গেলাম। খেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন মাস্টারমশাইর স্ত্রী। নানারকম ব্যঞ্জন রেঁধে পাতের চার ধারে সাজিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করছিলেন, 'উনি কেমন কাজকর্ম করছেন নিরুপম।'

আশায় উৎসুক তাঁর দুটি চোখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ফের ভাত মাখতে মাখতে মুখ নিচু ক'রে জবাব দিয়েছিলাম, 'ভালোই।

তিনি মেয়ের দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল স্বরে বলেছিলেন, 'কেমন বলিনি গীতা? ইচ্ছা করলেই উনি পারবেন।'

গীতা আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলেছিল, 'বাঃ রে, পারবেন না আমি বলেছি নাকি?'

কিন্তু ডেসপ্যাচ থেকেও যখন ক্রমাগত অভিযোগ আসতে লাগল আমি মাস্টারমশাইকে ডেকে বললাম, 'কেয়ার-টেকার প্রফুল্লবাবু কাজ ছেড়ে দিয়েছেন, আপনি তাঁর জায়গায় কাজ করুন, বেয়ারাদের দেখা শোনা করবেন।'

মাস্টারমশাই অভিমানের সুরে বললেন, 'সমস্ত না শুনে, না জেনে বার বার তুমি আমাকেই জব্দ করছ নিরুপম। ডেসপ্যাচের ভুবনবাবু সেদিন কানাই বেয়ারাকে সামান্য কারণে যেভাবে গালাগালি করেছিলেন তা কোন ভদ্রলোক করে না, কোন ভদ্রলোক তা সইতেও পারে না, আমি আপত্তি করেছিলাম, তাই বুঝি তিনি এসে লাগিয়েছেন?'

বললাম, 'সে যাক, আপনি আজ থেকে বেয়ারাদের ভার নিন। ওরা কখন আসে যায় লক্ষ্য রাখবেন, যে ডিপার্টমেণ্টে যে ক'জন বেয়ারার দরকার হয় ঠিক মত হিসাব ক'রে দেবেন। দেখবেন কেউ যেন কাজে ফাঁকি না দেয়, চুপচাপ বসে না থাকে। এই হল মোটামুটি কাজ। বোধ হয় এতে আপনার কোন অসুবিধা হবে না।'

রাগে অভিমানে মাস্টারমশাই যেন কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। তারপর বললেন, 'তার মানে তুমি আমাকে অপমান করছ। তার মানে বেয়ারাদের সর্দারি করা ছাড়া আর কোন কাজের যোগ্য বলে তুমি আমাকে মনে করছ না।'

বিরক্ত হয়ে ফাইল থেকে মাথা তুলে বললাম, 'কি মনে করছি, না করছি সে সব আলোচনা পরে আর এক সময় করব মাস্টারমশাই। আপাততঃ আমি ভারি ব্যস্ত।'

মাস্টারমশাই বেরিয়ে গেলেন।

প্রথম দিনকয়েক বেয়ারাদের কাছ থেকেও অভিযোগ আসতে লাগল, মাস্টারমশাই বড় কঢ়ভাষী। হাজিরা সম্বন্ধে ভারি কড়াকড়ি তাঁর। চাল চলন আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ভারি খুঁতখুঁতি। একদিন নাকি কি একটা বেফাঁস কথা বলে ফেলার জন্য শীতলকে চড় মেরেছিলেন।

কিন্তু সপ্তাহ দুই বাদে অভিযোগের ধরনগুলি অন্য রকম হতে শুরু করল। মাস্টারমশাই বেয়ারাদের হয়ে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন। কোনো বেয়ারাকে একটু কড়া কথা বলবার উপায় নেই, মাস্টারমশাই তেড়ে এসে প্রতিবাদ করবেন। কোনো ব্যক্তিগত কাজকর্মে তাদের পাঠানো চলবে না। মাস্টারমশাই বলেন, 'তা হলে অফিসের কাজ সারবে কবে। বাবুদের কেবল পান সিগারেট জোগাবার জন্য ওদের রাখা হয়নি।'

ক্লিয়ারিং-এর পরিমলবাবু এসে একদিন বললেন, 'ভালো চান তো বেয়ারাদের সদারী থেকে এখনো মাস্টারমশাইকে সরিয়ে আনুন, আস্কারা দিয়ে দিয়ে ওদের উনি মাথায় তুলে ছাড়বেন।'

বললাম, 'আচ্ছা যান দেখছি।'

ইয়ার ক্লোজিং এর সময় কাজ সারতে সারতে রাত প্রায় আটটা হল। অফিসের আর সব ডিপার্টমেন্ট চলে গেছে। নিজের ডিপার্টমেন্টের দু'জন সহকর্মীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। খানিকটা যেতেই মনে পড়ল দেরাজটা চাবিবন্ধ ক'রে আসিনি। কতকগুলি জরুরী চিঠি টেবিলেই পড়ে আছে। সহকর্মীদের ছেড়ে দিয়ে আমি ফের ঢুকলাম অফিসে। গেটের কাছে দারোয়ান খৈনি টিপছে, মাথা নিচু ক'রে সেলাম জানাল।

দেরাজে চাবি বন্ধ ক'রে ফিরে আসছি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম অফিসের পূর্ব দক্ষিণ কোণে ডেসপ্যাচ ডিপার্টমেন্টের কাছাকাছি আলো জ্বলছে। মৃদু আলাপ শোনা যাচ্ছে জনকয়েকের, বেয়ারাদের জনকয়েক অফিস বিল্ডিং এই রাত্রে থাকে। ছাতের ওপর রান্না বান্না করে, খায় দায়। ভাবলাম তারাই আড্ডা দিচ্ছে।

ফিরে আসছিলাম, হঠাৎ কানে গেল, 'আচ্ছা স্বাধীনতা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জানো তোমরা?' একি এ যে মাস্টারমশাইর গলা। এত রাত্রে মাস্টারমশাই কি করছেন এখানে। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলাম।

দেখলাম সাত আটটা ছোট ছোট টুল পেতে শীতল বিপিন নিবারণ, কানাই এবং আরও কয়েকজন মাস্টারমশাইকে প্রায় ঘিরে বসেছে। ডেসপ্যাচারের চেয়ারটায় বসেছেন মাস্টারমশাই। সবাইকে ছাড়িয়ে কাঁচা পাকা চুলে ভর্তি তাঁর মাথাটা উঁচু হয়ে উঠেছে। বেয়ারাদের কারো হাতে খাতা পেন্সিল ব্যাঙ্কেরই সব বাতিল কাগজপত্র। কারো হাতে খড়ি আর শ্লেট। আমাকে দেখে মাস্টারমশাই আর ছাত্রের দল সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল।

মুহূর্তকাল আমিও কোন কথা বলতে পারলাম না। তারপর বললাম, 'এসব কি হচ্ছে মাস্টারমশাই। ক্লাস নিচ্ছেন নাকি?'

মাস্টারমশাই অপ্রতিভ হয়ে অপরাধীর মত উঠে দাঁড়ালেন, 'না না ক্লাস ট্লাস কিছু নয়। অমনিই ওদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছিলাম। অফিস ডিসিপ্লিনটা ভালো ক'রে আয়ত্ত করানোই অবশ্য আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু তার জন্য আক্ষরিক শিক্ষাটাও কিছু কিছু দরকার, কি বল?'

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম।

মাস্টারমশাই বললেন, 'এদের মধ্যে একটি ছেলে কিন্তু অদ্ভুত মেরিটরিয়াস। আমাদের এই কানাই, চেন ওকে?' বার তের বছরের কালো, রোগাপানা একটি ছেলের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'চিনি।'

মাস্টারমশাই বললেন, অদ্ভুত মাথা। ইংরেজী বল, অঙ্ক বল, সব বিষয়ে সমান উৎসাহ। এই সব ছেলেকে দিয়েই স্কলারশিপের এ্যাটেম্পট নিতে হয়। প্রায় ক্লাস সিক্সের স্ট্যাণ্ডার্ডে আছে। জানো, খানিকটা কেয়ার নিতে পারলে ওকেও ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ফার্স্ট ক'রে তোলা যায়।'

বেরিয়ে আসছিলাম, দেখি মাস্টারমশাই আমার পিছনে পিছনে এসেছেন। আমার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে মাস্টারমশাই বললেন, 'চল, আমিও যাচ্ছি, একটা request নিরুপম, এসব কথা

যেন গীতার মা, কি জেনারেল ম্যানেজারের কানে না যায়।'

মনে মনে হাসলাম, প্রথম মাস্টারীও মাস্টারমশাই এমনি লুকোচুরির ভিতরেই শুরু করেছিলেন।

শ্রাবণ ১৩৫৬

দ্বিচারিণী

অ বউঠাইরেন, শোনেন, এইডা কি তেত্রিশ নম্বরের বাড়ি ?'

কোলের ছেলেকে ঘুম পাড়াবার জন্যে তার পিঠ চাপড়াবার সঙ্গে সঙ্গে গুন গুন করতে করতে মমতা সদর দরজা পর্যন্ত এসেছিল, ডাক শুনে বাইরের দিকে মুখ ফেরাল। পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি বউ তাদের একেবারে দোরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে নীল পেড়ে খাটো শাড়ি। আঁচলে মাথার সবটুকু ঢাকেনি। সিঁথিতে মোটা সিঁদুরের দাগ, কপালে ছোট্ট সুগোল ফোঁটা। দু হাতে দু'গাছা মোটা মোটা শাঁখা, আর গাছ দুই ক'রে কাঁচের চুড়ি দেখলেই বোঝা যায় নিম্নশ্রেণীর গৃহস্থঘরের বউ। গায়ের রঙ ময়লা চেহারাও একটু রোগাটে। কিন্তু ওরই মধ্যে মুখে বেশ একটু লক্ষ্মীশ্রী আছে নাক চোখ তেমন চোখা চোখা না হলেও মুখের গড়নটুকু ভারি মোলায়েম কথা বলবার ধরনটুকুও বেশ মিষ্টি।

মমতা একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, হ্যাঁ এ বাড়ির নাম্বার তেত্রিশই। কেন বল তো ?'

সে কথার জবাব না দিয়ে বউটি আবার জিজ্ঞাসা করল, 'আর এ বাড়ির কর্তার নাম বুঝি নারদবরণ মুখুজ্যে ?'

হ্যাঁ। কেন, তাকে দরকার নাকি তোমার ?'

বৌটি এবার ঠোঁট টিপে একটু হাসল বলল, 'না, তাঁকে না তাঁর পরিবারের নামেই চিঠি দিছেন বউদিদি। আপনার কাছেই পাঠাইয়া দিছেন। এই নেন চিঠি

নিজের নাম ঠিকানা লেখা ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ বউটির কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে মমতা আবার একটু হাসল, আমিই যে তাঁর 'পরিবার' কি ক'রে বুঝলে ? এ বাড়িতে আরো তো ভাড়াটে আছে ?

বউটি মৃদু হেসে বলল, 'আমারে ভোলায়েন ক্যান বউঠাইরেন, আপনারে দেইখাই বোঝতে পারছি আমি আপনি কেডা।

মমতা ততক্ষণে চিঠির ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করেছে।

"ভাই মমতা সেদিন সিনেমা দেখতে গিয়ে তুমি একটি ঝির কথা বলেছিলে। কিন্তু নতুন কোন ঝি অনেক খোঁজাখুজি করেও পেলাম না তোমার অসুবিধার কথা ভেবে আমাদের তরঙ্গকেই শেষ পর্যন্ত পাঠালাম। পুরোপুরি নয় আধাআধি, মাস দেড়েক হল আমাদের বাসায় ও কাজ করছে। কিন্তু এক জায়গায় কাজ ক'রে ওর পোষাবে কেন। আর একটা কাজ ওকে জুটিয়ে দেবার জন্যে কদিন ধরেই আমাকে ভারি ধরাধরি করছে। এদিকে তোমারও ঝির দরকার। ভাবলাম, ভাগ যদি কাউকে দিতেই হয় তোমাকে দেওয়াই ভালো। ওদেরও ইচ্ছা, আমাদের জানাশোনা ও 'আমাদের মত ভদ্রলোকের' বাড়িতেই ও আর একটা কাজ পায়। আমি তাকে বলেছি, কেবল আমাদের মত নয়, আমাদের চেয়েও বেশি ভদ্র লোকের বাসায় পাঠাচ্ছি তোমাকে।' কথাবার্তা বলে ঠিক করে নিয়ো, আমরা বার টাকা ক'রে দিচ্ছি। বাসন মাজা, জল তোলা, বাটনা বাটা, কয়লা ভাঙা—সবই

করে। স্বভাবচরিত্র বেশ ভালো। দু'দিন দেখলেই বুঝতে পারবে। ইতি—অসীমা মৈত্র।"

চিঠি পড়া শেষ ক'রে মমতা উৎফুল্লস্বরে বলল, 'ও, তাই বল। অসীমা পাঠিয়েছে তোমাকে? এস, ভিতরে এস। কাণ্ড দেখ অসীমার। এখান থেকে এখানে, তার জন্যে আবার মুন্সিয়ানা ক'রে একটা লম্বা চিঠি পাঠিয়েছে। আচ্ছা চিঠিলেখার বাতিক ওর। এস তরঙ্গ।'

নতুন ঝিকে নিয়ে মমতা বাসার ভিতরে ঢুকল। মনটা ভারি খুশি হয়েছে মমতার। অনেকদিন ধরে ঝির খোঁজ করছে, কিন্তু পছন্দমত কিছুতেই মিলছিল না। এই নিয়ে স্বামী দেবব্রতর সঙ্গে মমতার ঝগড়া পর্যন্ত হ'য়ে গেছে। তার ফলে দু'একটি বুড়ি ঝিকে তারা ধরেও এনেছে দু একবার। কিন্তু তাদের চেহারা আর চাল চলন দেখেই সঙ্গে সঙ্গে তাদের বাতিল ক'রে দিয়েছে মমতা। কী দেমাকের কথাবার্তা। ঝি তো নয়, যেন বাজার ঝি। তা ছাড়া, পনের ষোল টাকার কমে কেউ রাজীও হয়নি। অত টাকা কি ঝির পিছনে খরচ করা যায়। সেদিন 'রূপশ্রী' সিনেমায় বন্ধু অসীমার সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় তার কাছে নিজের কষ্টের কথাও বলেছিল মমতা, ঝি চাকরের অভাবে দুর্ভোগের সীমা নেই তার। অসীমা তাকে ভরসা দিয়েছিল, 'আচ্ছা, ঝি তোমাকে যেমন করে পারি একটি জুটিয়ে দেব।'

সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতে নিজের বাসায় ঝি পাঠিয়ে কথা রেখেছে অসীমা। সত্যি এমন বন্ধু আর হয় না।

বারান্দায় একটা ছোট্ট মাদুর পেতে তরঙ্গকে বসতে দিল মমতা।

কিন্তু তরঙ্গের ভারি কুণ্ঠা। সঙ্কোচের সঙ্গে একপাশে বসে বলল, 'আবার মাদুর ক্যান বউঠাইরেন, আমাগো বসবার জৈন্যে আবার মাদুর লাগে নাকি, মাটিতেই তো বসতে পারতাম।

মমতা বলল 'কেন, মেঝেয় বসবে কেন, ভালো হয়ে উঠে বসো। কোথায় থাকো তুমি? কে কে আছে?'

নারকেলডাঙার রেফিউজি ক্যাম্পে থাকে তরঙ্গরা। স্বামী আছে। কিন্তু থাকলে কি হবে ছ'মাস যাবৎ শয্যাধরা। রোগ কি আর একটি দুটি—হাঁপানি আছে, অম্বলের দোষ আছে। ক্যাম্প থেকে রেশন দেয় বাজারখরচ দেয়, কিন্তু রোগীর খরচ, ফাই ফরমাস তো তাতে মেটে না। তা ছাড়া, ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হয়। সেইজন্যই তরঙ্গ কাজে বেরিয়েছে। স্বামী কুঞ্জ দাস প্রথমে খুঁৎ খুঁৎ করেছিল। কিন্তু তরঙ্গ মোটেই আমল দেয়নি, বলেছে 'তুমি সাইরা ওঠ, রোজগার পত্তর কর, আমি তখন আর বাইর হব না। কিন্তু এখন মানের ভয়ে চুপ কইরা বইসা থাকলে চলবে ক্যামনে। তোমার দুধটুক চাই, কমলাডা চাই, বেদানাডা চাই, তা তো আর ক্যাম্প দেবে না। টাকার দরকার না তার জৈন্যে?'

তরঙ্গ মমতাকেই জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলেন বউঠাইরেন, ঠিক কই নাই?'

মমতা ঘাড় নেড়ে জানাল, ঠিক কথাই বলেছে তরঙ্গ। তার পর আরো অনেক খবর সংগ্রহ করল মমতা। ফরিদপুর জেলার খড়িসার গাঁয়ে তরঙ্গদের বাড়ি। জাতে তাঁতী, কিন্তু বাপের বাড়ি কি শ্বশুরবাড়ি কাউকে সে তাঁত বুনতে দেখেনি। বাপের বেনেতির দোকান ছিল, আর স্বামী হাটে বাজারে গামছা বিক্রি করত। কিন্তু রোগে রোগে শরীর এত খারাপ হয়ে পড়ল তার যে গামছার মোট মাথায় করবার শক্তি রইল না। বসে থাকলে খাওয়াবে কে। এদিকে ধানের মণ বিশ টাকা পঁচিশ টাকা। লোকের মুখে মুখে খবর গেল, কলকাতা শহরে নাকি গরীব দুঃখীদের থাকা খাওয়ার সরকারী ব্যবস্থা হয়েছে। সেই ভরসায় পাড়াপড়শীদের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গরাও এসে পড়েছে শহরে। কিন্তু পরের পয়সায় বসে বসে খাওয়া ভালো লাগে না তরঙ্গর। স্বামী একটু সুস্থ হয়ে কাজকর্ম করতে পারলেই সে ক্যাম্প ছেড়ে দেবে। ভদ্রলোকের মত স্বাধীনভাবে থাকবে আলাদা বাসা ক'রে।

বলতে বলতে হঠাৎ যেন খেয়াল হল তরঙ্গ'র। অপ্রতিভ স্বরে বলল, 'ওমা, গল্পে গল্পে বেলা তো মাইরা ফেললাম বউঠাইরেন। আসল কাজের কথা কিছু শোনলাম না। কি কি করতে হবে কয়েন। মানুষ কয়জন আপনারা?'

মমতা বলল, 'কাজের জন্য ভের না। অসীমাদের বাসায় যে কাজ এখানেও তাই। আর লোক?

লোকেব মধ্যে, যে মুখুজ্যে মশাইয়েব নাম মুখস্থ কবে এসেছিলে সেই ভদ্রলোক, তাঁব ভাই, আমি, আব আমাদেব এই দোলন।'

ঘবেব মধ্যে দোলনায ঘুমন্ত ছেলেকে দেখিয়ে দিয়ে মমতা বলল, 'এবাব গুনে দেখ তবঙ্গ, ক'জন হল।'

তবঙ্গ লজ্জিতস্ববে বললে, 'কি যে কযেন বউঠাইবেন! মানুষবে মানুষ নি আবার গোনে? কাজেব সুবিধাব জৈনাই জিজ্ঞাসা কবছিলাম কথাডা। ভালো কথা, আগে আপনাগো বাসায কাজ কবব না ওনাগো বাসায কাজ সাইবা তাবপব আসব আপনাগো এখানে?'

মমতা বলল, 'সে তোমাব যেমন সুবিধে তেমনি কবো।' তাবপব একটু হেসে বলল, 'অসীমাবা পুবনো মনিব। তাদেব কাজই তো আগে কবা ভালো'

তবঙ্গ বলল, 'না বউঠাইবেন, তানবা তেমন মানুষ না। আমি নিজেব ইচ্ছামত যাই আসি, কাজকম কবি, কেউ কোন কথা কযেন না। দাদাবাবুব মতও এমন মানুষ আব হয না। একেবাবে মাটিব মানুষ। আব দিদিমণি কলেজে পডলে হবে কি, কোন দেমাক নাই, অহংকাব নাই—'

মমতা বাধা দিযে বলল, 'দিদিমণি মানে সুধাংশুবাবুব পিসতুতো বোন ইলা বুঝি?'

তবঙ্গ বলল 'হ, তিনিই বউঠাইবেন। ভাবি সাদাসিধা মেজাজও খুব ঠাণ্ডা এদিকে ফুর্তিও আছে। প্রথম যেদিন কাজ আবম্ভ কবি ঠিক আপনাব মতই নামধাম কে আছে না আছে সব খুঁইটা খুইটা জিজ্ঞাসা কবলেন। নাম শুইনা বললেন ভাবি চমৎকাব নাম। আমি লজ্জায মবি।'

মমতাও হাসল সত্যি, তোমাব নামটি বেশ সুন্দব। তবঙ্গ না হয়ে ক্ষেন্তী, পাঁচী, যশোদা, মানদা হলেই হয়েছিল আব কি তাহলে নাম বদলে বাখতাম সহজে ছাডতাম না। নামেব ব্যাপাবে আমাব ভাবি খুঁতখুঁতে স্বভাব। ছেলেব নাম তিন বাব বদলেছি হ্যাঁ ইলা খুব ফূর্তিবাজ মেয়ে বটে। আমাব ঠাকুবপোও তাই। মেজাজটা অমনিতে ভাবি কডা। কিন্তু হাসিঠাট্টা আমোদস্ফূর্তিব বেলায যেন আব এক মানুষ

পবদিন থেকে মমতাদেব বাসাযও কাজ শুরু কবল তবঙ্গ কথকম অব মমতাদেব বান্নাঘব একেবাবে পাশাপাশি হল তোলায তেমন কোন কষ্ট নেই খুব বেশি বাসনপত্র ব্যবহাব কবে না মমতাবা এদিক থেকেও ভাব বিবেচনা তাদেব। কিন্তু সবচেযে বেশি বিবেচনা তবঙ্গব নিজেব। কাজে কোন বকম গাফিলতি নেই তাব। নিখুঁতভাবে কাজ কবে। তাব কাজ, তাব পবিষ্কাব পবিচ্ছন্নতা দেখে কেবল মমতা নয নীবদ নিমল দু'ভাইও খুব খুশি এমন ঝি আব হয না। তবঙ্গ কেবল বাইবেব কাজই কবে না, অবসব পেলেই ঘবেব ভিতবে ঢুকে তাকগুলি গুছিয়ে বাখে। ঝেডেপুছে পবিষ্কাব কবে দু'খানা ঘবেব মেঝে দেযালেব কোথাও একটু মাকডসাব জাল জমবাব জো নেই, তবঙ্গব চোখে পডলেই নাবকোলেব সলা দিযে সে তা ফেলে দেবে।

মমতা একদিন বলল, 'দূব থেকে দেখলে তোমাকেই কিন্তু ঘবেব বউ বলে মনে হয। যেন নিজেব ঘবই সাজাচ্ছ গুছাচ্ছ।

তবঙ্গ লজ্জিত হয়ে জবাব দিল, 'কি যে কযেন বউঠাইবেন! কাজেবে ডবাইলে, পবেব কাজ ভাবলে কি আব কাজ কইবা সুখ পাওযা যায। সব কাজই নিজেব কাজ মনে কইবা কবলে কাজে আব কোন কষ্ট থাকে না বউঠাইবেন।'

নিমল পাশেব ঘব থেকে বলে উঠল 'শোন বউদি, শুনে শেখ। বছব ছ সাত বিয়ে হয়েছে তোমাব। এতদিনেও শ্বশুববাডিকে নিজেব বাডি বলে ভাবতে শিখলে না, অফিস বাডিব মত দায সাবা কাজ কব। আব তবঙ্গ দু'দিনেই কেমন—'

মমতা হাসি চেপে জবাব দিল, 'আচ্ছা আচ্ছা, কলেজে-পডা পাশ কবা বউ এসে কেমন কাজকম কবে দেখব তখন—।'

তবঙ্গ ফিস ফিস ক'বে বলে, 'ও বাসাব ইলা দিদিমণিব সঙ্গে কিন্তু আমাগো ছোটদাদাবাবুবে চমৎকাব মানায। কলেজে পডলে হবে কি, কোন দেমাক-টেমাক কিছু নাই তাব।' মমতা হাসে, 'আমাব কাছে কেন, যাও ওই ছোটদাদাবাবুব কাছে গিযেই বলে এসো কথাটা।'

সপ্তাহখানেক বাদে অসীমা একদিন জিজ্ঞাসা করল, 'ও তরঙ্গ, নতুন মনিববাড়ির কাজকর্ম কেমন লাগছে, কেমন লোক তারা, বললে না তো?'

লজিকের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অসীমার ননদ ইলা জবাব দিল, 'না, বলে না আবার! আমাদের তরঙ্গ ও-বাসার প্রশংসায় দিনরাত একেবারে পঞ্চমুখ।'

তরঙ্গ বলল, 'মিথ্যা তো কই না বউদি। ও বাসার বউঠাইরেন সৈত্যই ভারি চমৎকার মানুষ। একেবারে আপনজনের মত ব্যবহার। আর দাদাবাবুরাও খুব সুনজরে দেখেন আমারে। ছোটদাদাবাবু তো সেদিন চা পর্যন্ত খাইলেন আমার হাতের। বললেন কি, 'আমরা জাতবিচার মানি না তরঙ্গ চা ক্যান তোমার হাতের ভাতও খাইতে পারি।' ভারি ফূর্তিবাজ মানুষ। ঠিক আমাগো দিদিমণির মত। চমৎকার মানায় দুইজনেরে।'

মুখ লাল ক'রে ইলা উঠে গিয়ে লজিক নিয়ে বসল। অসীমা হাসতে লাগল মুচকে মুচকে। প্রস্তাবটা একেবারে অসম্ভব নয়। মমতারা রাঢ়ী আর অসীমারা বারেন্দ্র। কিন্তু আজকাল তাতে বিয়ে আটকায় না। তাছাড়া মমতার দেবর নির্মল টেলিগ্রাফ অফিসে ভালো চাকরি করে। অসীমা ভাবল পিসিশাশুড়ীর কাছে একবার লিখবে কথাটা।

কিন্তু কেবল ছোট দাদাবাবুর প্রশংসাই নয়, মমতারও খুব সুখ্যাতি করল তরঙ্গ। গায়ের ব্লাউসটা ছিঁড়ে গেছে দেখে মমতা তাকে নিজের গায়ের একটা ব্লাউস দিয়েছে সেদিন।

অসীমা কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এল, 'কই দেখি দেখি—'

মমতার দেওয়া ব্লাউসটাই গায়ে দিয়ে এসেছে তরঙ্গ। ইলা আর অসীমা দুজনেই লক্ষ্য ক'রে দেখল, সত্যি প্রায় নতুন একটা ব্লাউসই তরঙ্গকে দিয়েছে মমতা। হাতা আর গলার কাছে এমব্রয়ডারির সক্ষ্ম কাজ করা সুন্দর একটি ব্লাউস, এমন জিনিস সত্যিই বাড়ির ঝিকে কেউ সাধারণত দেয় না।

ইলা আর অসীমা দুজনে পরস্পরের চোখের দিকে একবার তাকাল।

তারপর দিন তিনেক বাদে অসীমা চওড়া পেড়ে খয়েরী রঙের পুরনো একখানা তাঁতের শাড়ি দিল তরঙ্গকে।

তরঙ্গ বিস্মিত হয়ে বলল, 'একি বউদি শাড়ি আবার দ্যায়েন ক্যান আমারে? শাড়ি দিয়া কি করুম আমি?'

অসীমা বলল, 'করবে আবার কি, পরবে। তোমার ওই খাটো ময়লা শাড়ির সঙ্গে তো অমন সুন্দর ব্লাউস মানায় না। এই শাড়িখানা ওই সঙ্গে প'রো বেশ মানাবে।

শাড়ি দেখে লোভ যে একটু তরঙ্গর না হল তা নয় কিন্তু ভারি কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে বলল 'না না বউদিদি, এ রকম শাড়ি পরবার মত মানুষ নাকি আমরা।'

অসীমা একটু ধমকের সুরে বলল, 'আহা, নাও না। অমন ফ্যাশানওয়ালা ব্লাউস পরতে পারলে আর শাড়ি পরতে পারবে না?

শেষে বললে, 'না নিলে আমি কিন্তু ভারি অসন্তুষ্ট হব তরঙ্গ।

তরঙ্গ বলল 'তাইলে দ্যায়েন।

পরদিন নিজের দেওয়া শাড়িখানা তরঙ্গর পরনে না দেখে অসীমা আবার একটু বিরক্তি প্রকাশ করল, 'শাড়িখানা কি করলে তরঙ্গ?'

'তুইলা রাখছি বউদিদি। ভালো শাড়ি। এক জাগায় যাওনের আসনের কালে পইরা বাইরন যায়।'

ইলা বলল আচ্ছা, তেমন শাড়ি তোমাকে আমি আর একখানা বরং দেব। কিন্তু ওই নোংরা খাটো শাড়িটা তুমি আর প'রে বেরিয়ো না তরঙ্গ। বড় বিশ্রী লাগে চোখে। তার চেয়ে বউদির দেওয়া শাড়িটাই প'রো। বেশ মানাবে তোমাকে।'

তরঙ্গ অগত্যা বলল, 'আইচ্ছা।'

পরদিন তরঙ্গর পরনে খয়েরী রঙের শাড়ি দেখে মমতা একটু অবাক হয়ে গেল, 'ব্যাপার কি,

শাড়ি কিনলে নাকি তরঙ্গ ?'

তরঙ্গ মাথা নেড়ে বলল, 'কি যে কয়েন বউঠাইরেন, এমন ভালো শাড়ি কেনার সাইধ্য আছে নাকি আমাগো। ও বাসার বউদিদি দিছেন। আমি নিব না কিছুতেই। পুরা দুইমাস হয় নাই কাজে ঢুকছি, এইর মধ্যেই কি আস্ত একখানা শাড়ি নেওয়া যায়, আপনিই কয়েন ? কিন্তু বউদিদি কিছুতেই ছাড়লেন না। কি বললেন জানেন ? না নিলে রাগ করব। শোনেন কথা ! বলব কি বউঠাইরেন, একেবারে দেবতার মত মন তানাদের। এমন মানুষ আর হয় না ?'

মমতা গম্ভীর হয়ে বলল, 'হুঁ।' তারপর তরঙ্গর পরনের শাড়িখানার একটি আঁচল হাত দিয়ে ধরে একটু পরীক্ষা ক'রে দেখে বলল, 'সাবধানে প'রো তরঙ্গ, পুরনো শাড়ি কিনা, দু'তিন ধোপের বেশি টিকবে বলে মনে হয় না। আচ্ছা, সামনের মাসে তোমাকে আমি নতুন একখানা শাড়ি কিনে দেব। রংচঙে নয়, কিন্তু বেশ শক্ত ভালো জমিনের, প'রে কাজকর্ম করতে সুবিধে হবে।'

তরঙ্গ বাধা দিয়ে বলল, 'না বউঠাইরেন, আর শাড়ির দরকার নাই আমার, দিদিমণিও আমারে একখানা দেবেন কইছেন। এত শাড়ি দিয়া কি করুম আমি ?'

মমতা আরো গম্ভীরভাবে বলল, 'হুঁ।'

তারপর দিন চার পাঁচ বাদে মমতা হঠাৎ একদিন প্রস্তাব করে বসল, 'হ্যাঁ তরঙ্গ, কাল বেলা গোটা দু'যের সময় আসতে পার একবার ? স'দুটোতে এলেও হবে।'

তরঙ্গ বলল, 'ক্যান বউঠাইরেন ?'

মমতা বলল, দরকার আছে। সিনেমায় যাব একটু, তুমি দোলনকে কোলে নিয়ে সঙ্গে যাবে। সিনেমা দেখেছ কোনদিন ? ছবিতে কথা বলে ?'

তরঙ্গ বলল 'না বউঠাইরেন। কোনদিন দেখি নাই। কিন্তু যাব ক্যামনে কয়েন তো। বউদিদির কাজ-কম্ম আছে আপনাগোও তো জল তোলতে হবে, বাসন মাজতে হবে বিকালে।'

মমতা বলল, 'সে এক বেলার ব্যবস্থা যে ভাবে পারি ক'রে নেব।'

তরঙ্গ বলল কিন্তু ও বাসার বউদিদির যে কষ্ট হবে ?

মমতা ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল 'ভারি তো কষ্ট। একবেলা দু বালতি জল তারা তুলে নিতে পারবে না ননদ ভাজে ? এতই বড়লোক হয়েছে নাকি তারা ?'

তারপর সুর পালটে মমতা মিষ্টি হেসে বলল, 'ভেব না, তোমাকে তো খুব ভালোবাসে তারা। তুমি একটু বুঝিয়ে বললেই একবেলার জন্যে তারা তোমাকে নিশ্চয়ই ছুটি দেবে। তোমারো তো সাধ আহ্লাদ আছে, একটু দেখতে শুনতে ইচ্ছে করে ? বুঝিয়ে ব'লো তাহলেই ছেড়ে দেবে। আমার নাম ক'রে ব'লো, কোন আপত্তি করবে না।'

তরঙ্গ তবু আমতা আমতা করতে লাগল, 'না বউঠাইরেন, আমার জানি লজ্জা লজ্জা করে। অসুখ না বিসুখ না, মিছিমিছি কাজে কামাই করব—

মমতা অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বলল, 'একদিন বইতো নয়, তাতে আর কি হবে। আমার দরকার বলেই বলছিলাম। এদিকে তোমারো একটা নতুন জিনিস দেখা হয়ে যেত।'

তরঙ্গ বলল, 'আইচ্ছা বউঠাইরেন, কইয়া বইলা দেখি ও বাসার বউদিদিরে।'

প্রস্তাবটা একটু অদ্ভুতই, তবু নানা দিক ভেবে চিন্তে অসীমা শেষ পর্যন্ত রাজী হল। রাজী না হলে অনুদার মানুষ বলে প্রমাণিত হতে হয় মমতার কাছে। তা ছাড়া, দু'মাস ধরে কাজ করছে তরঙ্গ, এর মধ্যে বৃষ্টি-বাদল, অসুখ-বিসুখের অজুহাতে একটা বেলাও কামাই করেনি। একটা বেলার ছুটি মঞ্জুর ক'রে দাক্ষিণ্য দেখাতে না পারলে তার কাছেও মান থাকে না। অসীমা ভেবে দেখল ঠিক ঝিকে নিয়ে বড়লোকিয়ানা করে সিনেমা দেখতে চললেও এতে ছোট হতে হবে মমতাকেই, কারণ একবেলা ছুটির জন্যে হাত পাততে হল তো অসমীমার কাছেই। অসীমা দয়া করে ছুটি মঞ্জুর করল বলেই তো ঝির কোলে ছেলে আর হাতে ফীডিং বোতল তুলে দিয়ে সেজেগুজে মমতা সিনেমায় যেতে পারল। এ তো কেবল দেখা নয়, দেখানোও।

তরঙ্গ সেবেলাও ঠিক কামাই করল না। সন্ধ্যার সময় এসে উপস্থিত হল অসীমাদের বাসায়।

মুখখানা আনন্দে উজ্জ্বল।

অসীমা কয়লা ভাঙতে আরম্ভ করেছিল, তরঙ্গ তার হাত থেকে কাজ কেড়ে নিয়ে বলল, 'ওকি বউদিদি, আপনে আবার কয়লা ভাঙা ধরলেন ক্যান। দ্যায়েন, আমারে দ্যায়েন।'

তরঙ্গ যে আজ আসবে অসীমা আশা করেনি, একটু খুশি হয়ে বলল, 'দেখলে সিনেমা ?'

তরঙ্গ উল্লসিত হয়ে উঠল, 'দেখলাম তাজ্জব জিনিস বউদিদি। ছবিতে কথা কয়, গান গায়। আহাহা সেকি গান! তারপর দিদিমণির মত বয়সী একজন সুন্দরী অবিবাহিত মাইয়ার সঙ্গে—' তরঙ্গ মুখ টিপে একটু হাসল। 'আর পুরুষ মানুষটা ঠিক আমাগো ও-বাসার ছোট দাদাবাবুর মত। তারপর দুইজনে মিলা হাত ধরাধরি কইরা—'

ইলা কৃত্রিম ধমকের সুরে বলল, 'আঃ থাম তরঙ্গ।'

কিন্তু তরঙ্গ থামল না, সিনেমা-পর্বের আনুপূর্বিক বর্ণনা দিয়ে ছাড়ল। মুখুজ্যেদের বাসার বউঠাকরুনের মত মানুষ হয় না একেবারে দেবতার মত মন। আর রূপ ঠিক অবিকল লক্ষ্মীঠাকরুনের মত। বেরুবার আগে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সাজ সজ্জা করেছে মমতা। কেবল নিজেই সাজেনি, তরঙ্গকেও সাজিয়েছে। হাল ফ্যাশানের শাড়ি পরবার ধরন শিখিয়ে দিয়েছে, উঁচু খোঁপাটাকে আর একটু নামিয়ে দিয়েছে নিজের হাতে। পুরনো একজোড়া স্যাণ্ডাল ছিল মমতার, তরঙ্গকে দিয়েছে পরতে। লজ্জায় আর বাঁচে না তরঙ্গ! কোনদিন কি জুতো পায়ে হেঁটেছে যে আজ হাঁটবে। পায়ে পা জড়িয়ে যায়। মনে হয়, এই বুঝি হোঁচট খাবে। কিন্তু হোঁচট ঠিক খায়নি তরঙ্গ। বউঠাকরুনের স্যাণ্ডাল পায়ে দিয়ে হাঁটতে তার ভালোই লেগেছিল। বেশ আরাম আছে জুতো পায়ে দিয়ে হাঁটতে। তারপর গদি আঁটা চেয়ারে একেবারে মমতার পাশে বসে সে সিনেমা দেখেছে। এমন কি কেউ কাউকে বসায় ? বাড়ির ঝিকে কেউ এত সমাদর করে ? মাঝখানে দু'গ্লাস সরবৎ নিয়েছে মমতা। আপত্তি সত্ত্বেও তরঙ্গকে খাইয়েছে। সাধারণ সরবৎ নয়, দামী সরবৎ। তেমন জিনিস তরঙ্গ জীবনেও কোনদিন খায়নি। মুখে যেন এখনো স্বাদ লেগে রয়েছে। সরবতের পর পান চমৎকার সব মশলা দেওয়া। সে পানের স্বাদই আলাদা। স্যাণ্ডাল জোড়া মমতা আর ফিরিয়ে নেয়নি, তরঙ্গকে দিয়ে দিয়েছে। বলেছে কোন জায়গায় যেতে আসতে হলে পায়ে দিয়ে বেরুতে পারবে। রউদিদির মত মানুষ আর হয় না।

অসীমা সব শুনল। বন্ধুর মহত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ কোন মন্তব্য করল না। সায়ও দিল না প্রতিবাদও করল না।

কাজ সেরে সন্ধ্যার পর ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার সময় মানদা আর ক্ষ্যান্তমণির সঙ্গে দেখা হ'ল তরঙ্গর। তারাও ঝি গিরি করে। অসীমাদের বাসার কাজ মানদাই তাকে করে দিয়েছিল।

মানদা বলল, 'কি লো, এত রাত করে ফিরছিস যে, খুব খাটাচ্ছে বুঝি ?'

তরঙ্গ জবাব দিল, 'আমারে আবার খাটাবে কেডা রে! আমি নিজে ইচ্ছা কইরা খাটি, এইতো এক বউঠাইরেন আজ সিনেমা দেখাইয়া আনলেন, আর এক বউদিদি সেদিন শাড়ি দিলেন একখানা, ঝির মত কোন জায়গায় কাজ করি নাকি আমি ? যতক্ষণ থাকি বাড়ির মাইনষের মত থাকি, বউঠাইরেনরা একেবারে আসল ননদের মত দেখেন আমারে।

ক্ষ্যান্তমণি মিশি দেওয়া দাঁতে হাসল, 'আ মরণ, কথা শোন আমাদের তরুঙ্গির! এসব হল ওদের খাটিয়ে মারবার কায়দা। এখনো আপন বুঝে চলতে শেখ, ফাঁকি দিতে শেখ্, নইলে খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠে মরে যাবি আবাগী।'

এসব কথা ক্ষ্যান্তরা আগেও তরঙ্গকে অনেকবার বলেছে। কিন্তু তরঙ্গ মোটেই কানে তোলেনি, এরা যা বলে বলুক। তরঙ্গ তাদের মত পেশাদার ঝি নয়। সে গৃহস্থঘরের বউ, অভাবে পড়ে ভদ্র গৃহস্থবাড়িতে সে কাজ নিয়েছে। তাঁরাও কেউ তাকে ঝির মত দেখেন না, বাড়ির লোকের মতই আদরযত্ন করেন। দুই বাসাতেই তরঙ্গ'র খাতির। এমন সমাদর সম্মান কোন ঝি কোন বাড়িতে পায় না।

কেবল সমব্যবসায়িনী ঝিদের কাছেই নয়, ক্যাম্পে ফিরে এসে রুগ্ন স্বামী আর বৃদ্ধা শাশুড়ীর

কাছেও তরঙ্গ দুই মনিব-বাড়ির গল্প করে। বউঠাকরুন আর বউদিদি রূপে গুণে একজন লক্ষ্মী আর একজন সরস্বতী।

কুঞ্জ বিছানায় শুয়ে কমলালেবুর কোয়া ছাড়াতে ছাড়াতে রোগ শীর্ণ মুখে হাসে, 'আর তুই বুঝি একজনের পেঁচা আর একজনের হাঁস ?'

কিন্তু মুখে যত তামাসাই করুক, স্ত্রীর গুণে কুঞ্জ মুগ্ধ। এমন লক্ষ্মী বউ আর হয় না। দু'জায়গায় কাজ করে দুই মনিবের মন রক্ষা করে তরঙ্গ তাকে রুটি, মাখন, বেদানা, কমলালেবু এনে খাওয়ায়। এদিকে সুখ্যাতিও পায় দুই মনিবের বাসায়। ক্যাম্পের আরো কত বউঝিই তো বাবুদের বাসায় বাসায় ঝিগিরি করে, কত জনের নামে কত অভিযোগ, কত খিচ-খিচ। কেউ কাজে গাফিলতি করে, কারও হাতটানের দোষ আছে, বাসার সোমত্ত ছেলেদের সঙ্গে কেউবা ফষ্টি-নষ্টি করবার দোষে ধমক খায়, কত কেচ্ছা কেলেঙ্কারি। শুয়ে থাকলেও সবই কানে যায় কুঞ্জ দাসের। কিন্তু তার স্ত্রী তরঙ্গবালার নামে কেউ কোনদিন কোন নালিশ করতে আসেনি। কাজে কামাই করেছে বলে ছুটে আসেনি কোন বাড়ির বুড়োকর্তা কি কোন ছোকরা বাবু, অকারণে কিংবা তুচ্ছ কোন কাজের অছিলায় খোঁজ নিতে আসেনি তরঙ্গর। ক্যাম্পের সবাই তরঙ্গের মনিব-ভাগ্যের প্রশংসা করে, আর কুঞ্জ দাসের স্ত্রী-ভাগ্যের।

সিনেমা দেখে আসার পরদিন, যত সকালে সাধারণত ওঠে তার চেয়েও বেশি ভোরে উঠে হরমোহন ঘোষ লেনে অসীমাদের বাসায় কাজ করতে এল তরঙ্গ। জল তুলল, বাসন মাজল, ঘর ঝাঁট দিয়ে উনুন ধরিয়ে দিল। তারপর বলল, 'আমি এবার চললাম বউদি।' অসীমা বলল, 'সে কি কথা তরঙ্গ! এখনো তো সাতটা বাজেনি। আমার এই মাছটা একটু কুটে দিয়ে যাও।' তরঙ্গ বলল, 'ও বাসায় আবার ভাড়াটে বেশি কিনা, একটা কল চৌবাচ্চা। সকাল সকাল গিয়া জল তুইলা না দিয়া আসলে ভারি অসুবিধা হয় বউঠাইরেনের।'

অসীমা হাসিমুখেই বলল, 'সুবিধা-অসুবিধা তো সবারই দেখতে হয় তরঙ্গ। তাছাড়া, অন্যদিন তো বলি না, আজ তোমার দাদাবাবুর দুজন বন্ধুকে খেতে বলা হয়েছে, তাই একটু কাজকর্ম বেশি। কাল কয়লা ভাঙতে গিয়ে হাতে ফোসকা পড়েছে, নইলে আমিই কুটতাম মাছটা। তা ছাড়া তোমরা মাছের দেশের মানুষ। বড় মাছ-টাছ কুটতে ভালোবাস, জানও ভালো। তাই ভাবলাম—'

সুধাংশু গালে সাবান মেখে আয়নার সামনে দাড়ি কামাচ্ছিল, বলল, 'হ্যাঁ তরঙ্গ, তুমিই কুটে দিয়ে যাও মাছটা, এতবড় পোনা, তোমার বউদি দিশে পাবে না। নষ্ট করে ফেলবে।' তারপর স্ত্রী আর বোনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'মাছ তোমাদের চাইতে আমাদের তরঙ্গ কোটে ভালো। সেদিন চেতল মাছ কোটবার ধরন দেখেই বুঝতে পেরেছি। কোটা খারাপ হলে মাছের অর্ধেক স্বাদ চলে যায়। কেবল লেখা-পড়া শিখলেই হয় না, মাছ কোটা একটা আলাদা আর্ট। তরঙ্গ ছাড়া এত দামী মাছ আমি ভরসা করে আর কারো হাতে দিতে পারি নে।'

অসীমা বলল, 'ওই শোন, শুনলে তো ?'

প্রশংসায় খুশি হয়ে তরঙ্গ মাছ কুটতে বসল। কুটতে ধুতে প্রায় ঘণ্টা খানেক লেগে গেল। তারপর সুধাংশুর অনুরোধে নুন মসলায় মেখেও দিতে হল মাছ। তাতেও গেল খানিকক্ষণ।

প্যারীমোহন সুর লেনে মমতাদের বাসায় এসে পৌঁছল তরঙ্গ বেলা সাড়ে সাতটায়। তার আগেই মমতাদের জল তোলা দরকার। অন্য ভাড়াটেদের বউরা কলঘরে গিয়ে ঢুকেছে।

মমতা বলল, 'আজ এত দেরি করলে যে তরঙ্গ ? জানো তো সকালে না এলে জল তোলার কত অসুবিধা। পাঁচজনের ভাড়াটে বাড়ি—'

তরঙ্গ বলল, 'ও বাসায় আবার দাদাবাবুর দুজন বন্ধু খাবেন কিনা। তাই মাছ-টাছ কুটে দিয়ে আসতে হল।'

মমতা বলল, 'হুঁ, তুমি ওদিকে মাছ কোট, আর এদিকে জল টেনে টেনে আমার হাত ব্যথা হোক। কেবল একজনের সুখ-সুবিধা দেখলেই তো চলে না তরঙ্গ, সকলের সুবিধা অসুবিধাই দেখতে হয়।'

এতটুকু কড়া কথাও কোনদিন শোনেনি তবঙ্গ. একটু চুপ কবে থেকে বলল, 'আচ্ছা বউঠাইবেন আমি বাইবেব থিকা জল আইনা দেবনে আপনাবে।'
বাস্তাব কল থেকে দু' বালতি জল এনে দিযে মমতাকে খুশি কবে তবঙ্গ বাসায ফিবল।

বিকাল বেলায মমতাদেব বাসায আগে কাজে আসে তবঙ্গ। আজও তিনটা বাজতে না বাজতে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু অন্যদিন যেমন সাড়ে চাবটাব সময যায আজ তা যেতে পাবল না। জল তোলা, কযলা ভাঙা, বাসন মাজা সব শেষ হলেও মমতা হঠাৎ মিষ্টি হেসে বলল, 'ও তবঙ্গ, চললে নাকি ? শোন।
'কি বউঠাইবেন ?'
মমতা বলল দাঁড়াও একটু। তোমাব দাদাবাবুব পাশ-বালিশটা কেমন কবে ছিঁড়ে গেছে দেখ। কাল সাবা বিছানাময তুলোয একেবাবে মাখামাখি। গোটা-দুই ফোঁড দিযে ঠিক কবে দিযে যাও না

ববিবাব। •াবিদ বিছানায আড় হযে শুযে হাতেব তেলোব উপব মাথা বেখে কি-একটা নভেল পড়ছিল তবঙ্গব দিকে চেযে মৃদু হেসে বলল, 'কাল সাবাবাত ঘুমোতে পাবিনি তবঙ্গ। গাযে তুলো, নাকে তুলো। একেবাবে তুলোময হযে ছিলাম আব কি। বালিশটা তুমি যদি একটু ঠিক কবে না দিযে যাও আজও সেই দশা হবে। তোমাব বউদিব ভবসায থাকলে এ জন্মেও বালিশটা ঠিক হবে না। তুমিই যা হয ব্যবস্থা কবে দিযে যাও।
এ সব ছোটখাটো বাড়তি কাজ নিজেই যেচে নিযেছিল তবঙ্গ। দাদাবাবুবা তো শুধু মাইনে দেন না মাইনে ছাড়াও উপুবি হিসাবে শাড়ি দেন সাযা ব্লাউজ দেন, সিনেমা দেখান, বাসায ভালো জিনিস টিনিস কিছু এলে তবঙ্গ'ব রুগ্ন স্বামীকে তাব ভাগ না দিযে খান না। বাড়তি একটু আধটু কাজ না কবে দিতে পাবলে নিজেবই কেমন কেমন লাগে। লজ্জা লজ্জা কবে। তাই বিছানা ঝাড়া, বালিশ বোদে দেওযা এ সব ছোট ছোট কাজও তবঙ্গ নিজেব হাতে নিযেছিল।
দাদাবাবু যখন অমন কবে বললেন তখন বালিশটা নিযে বসতেই হল তবঙ্গকে। বালিশেব কিছু ছিল না আব একটা বালিশ ভেঙে খানিকটা তুলো বেব কবতে হল। তাবপব দুটো বালিশ ঠিক কবে মুখ সেলাই কবতে কবতে অনেক সময লেগে গেল তবঙ্গব
সাড়ে পাঁচটা নাগাদ অসীমাদেব বাসায গিযে হাজিব হতেই অসীমা মুখ ভাব কবে বলল, 'ব্যাপাব কি আজও সিনেমায গিয়েছিলে নাকি তবঙ্গ ?
না বউদিদি ও বাসায দাদাবাবুব কোল-বালিশটা ঠিক কইবা দিযা আসলাম। কি ছিবিই কইবা বাখছিলেন বালিশেব।
অসীমা বলল হুঁ তা তো কববেই এদিকে জল চলে যায আমাব, উনুনে আঁচ ওঠে না। তুমি যদি বোজই এমন কব তবঙ্গ -
তবঙ্গ লজ্জিত হযে বলল, 'না বউদিদি, আব এমন হবে না। আইজই একটু দেবি হইযা গেল—'
সন্ধ্যাব পবও ঘণ্টা খানেক কাজ কবতে হল তবঙ্গকে। কযলা ভাঙতে হল, জল টানতে হল আজ বেশি। তবু যেন অসীমাব মুখখানা ভাব ভাবই বইল।

কেবল একদিন নয, তাবপব থেকে বোজই এমন হতে লাগল। সকাল বেলায অসীমাব বোজই প্রায কাজ বেশি থাকে। প্যাবীমোহন সুব লেনে পৌঁছতে বোজই দেবি হয তবঙ্গ'ব। জল তোলা নিযে সেই হাঙ্গামা আব ঝগড়াঝাঁটি লাগে। মমতা বাগ কবে বলে, 'টাকা তো তুমি আমাদেব কাছ থেকেও নাও তবঙ্গ। এমন তো নয বিনি পযসায কাজ কব আমাদেব, না কি এখানকাব টাকাগুলো অচল ?
বিকালেব দিকে হবমোহন ঘোষ লেনে পৌঁছতে বোজই প্রায সন্ধ্যা হয়ে আসে তবঙ্গর। মমতাব নানাবকম কাজ থাকে তখন। সহজে তবঙ্গ ছুটি পায় না। তবঙ্গব হাতে ছাড়া মমতাব ছেলে দোলন শান্ত ভাবে দুধ খায না। তবঙ্গ'ব হাতেব চুল বাঁধা মমতাব স্বামী ভাবি পছন্দ কবে। তবঙ্গ ব্যস্ততা

দেখালে মমতা বলে, 'এসেই যদি এমন যাই যাই কর তাহলে চলে কি করে তরঙ্গ। আমি তো ঘড়ি ধরে দেখি এ বাসায় তুমি কতক্ষণ কাজ কর।'

তরঙ্গ ঠিক এই ধরনের কথারই প্রতিধ্বনি শোনে অসীমার মুখে, 'ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখ দেখি তরঙ্গ, কটা বাজে। মাস গেলে মাইনে আমরাও তোমাকে দিই। বরং ও বাসায় যেখানে সাত আট তারিখের আগে মাইনে পাও না, এ বাসায় সেখানে দোসরা তারিখেই তোমার সব পাওনা চুকিয়ে দিই। সেকথাও তো একটু বিবেচনা করতে হয়। এমন একচোখোমি করলে চলবে কি করে। ঝি আমিও রেখেছি, মমতাও রেখেছে। দুজনেরই ঠিকে ঝি তুমি। এমন তো নয় যে, সারা দিনরাতের বাঁধা ঝি তুমি মমতার। এমন করলে আমি পারব কি করে?'

ঝি! কথাটি এর আগে অসীমার মুখে কোনদিন শোনেনি তরঙ্গ। সারা চোখমুখ লাল হয়ে ওঠে। কানের মধ্যে যেন ঝি ঝি করতে থাকে তরঙ্গ'র।

একটু চুপ করে থেকে তরঙ্গ বলল, 'বউঠাইরেন আমারে ঝির মত দেখেন না বউদিদি।'

অসীমা বিকৃত মুখে বলল, 'তা কেন, একেবারে গুরুঠাকরুনের মত দেখেন তোমাকে। বেশ তো, এতই যদি ভালো তারা, সেখানকার গুরুঠাকরুনগিরি করলেই পার, নিষেধ করছে কে। ভাত ছড়ালে কাগের অভাব আছে নাকি আজকাল?'

মমতাও যে ঠিক আগের চোখে দেখে তা নয়। তারও মধুর ব্যবহার, কথা বলবার মিষ্টি ধরনটুকু একেবারে বদলে গেছে।

সেদিন বিকালের কাজ সেরে তরঙ্গ চলে যাচ্ছে—মমতা বলল, 'ও কি, চলে যাচ্ছ যে তরঙ্গ, কয়লা ভেঙে দিয়ে যেতে হবে বলিনি তোমাকে?'

তরঙ্গ বলল, 'আজকের মত কয়লা তো আছে বউঠাইরেন, কাইল আইসা ভাঙব। ও বাসায় আবার দেরি হইয়া যাবেনে—'

মমতা মুখঝামটা দিয়ে বলল,'এসেই কেবল ও-বাসা আর ও-বাসা। এ-বাসায় বুঝি মন টেঁকে না, না তরঙ্গ? আমার কাজকে আর কাজ বলে গ্রাহ্য হয় না? বেশ তো, অসীমাদের বাসায় যদি এতই মধু সেখানে দিনরাত লেগে থাকলেই পার। তোমায় তো জোর ক'রে আটকে রাখেনি এখানে কেউ। যদি না পোষায় কাজ ছেড়ে দিলেই তো হয়। মাসে মাসে বারোটা ক'রে টাকাও গুনবো, আর এদিকে কাজে তুমি দিনের পর দিন গাফিলতি করবে, তা আমি সইতে পারব না।'

একটু চুপ করে থেকে মমতা আবার বলল, 'টাকা বড় চীজ তরঙ্গ, বড় কষ্ট ক'রে ঘরে আনতে হয়। চোদ্দ হাত মাটি খুঁড়লে একটা পয়সা বেরোয় না, জানো তো।'

তরঙ্গ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি এসব বলছেন, ও বাসার বউদি কিন্তু—'

রাগে আরো জ্বলে উঠল মমতা, 'শুনেছি শুনেছি, ও বাসার বউদি দুধ দিয়ে মুখ ধুয়ে দেন তোমার। তিনি একেবারে ভালো মানুষের গোড়া।'

তরঙ্গ কদিন ধরেই লক্ষ্য করছে এ-বাসায় বউঠাকরুন ও-বাসার বউদিদির সুখ্যাতি ঠিক আগের মত শুনতে পারে না। ও-বাসার বউদিদিও যে এ-বাসার বউঠাকরুনের প্রশংসা শুনলে খুশি হয় তাও নয়।

একটু চুপ করে থেকে তরঙ্গ বলল, 'আমি তা বলছিলাম না বউঠাইরেন। বলছিলাম, আপনার এখান থিকা যাইতে একটু দেরি হইয়া গেছিল দেইখা, কি গাইলনটাই না গাইলাইলেন তিনি। আপনার বাসায় নাকি আমি বেশি কাজ করি, তাঁর কাজে ফাঁকি দেই—।'

মমতা বলল, 'তাই নাকি? এসব কথা বলেছে নাকি অসীমা? তা তো বলবেই। চিরকালই ওর ওইরকম কুঁদুলে স্বভাব, আর কথা একেবারে চাঁছাছোলা। কোন রকম মিষ্টত্ব নেই মুখে।'

তরঙ্গ লক্ষ্য করল, বেশ একটু সহানুভূতি আর অন্তরঙ্গতার ভাব এতক্ষণ বাদে মমতার মধ্যে ফের আবার দেখা যাচ্ছে।

তরঙ্গ উৎসাহিত হয়ে বলল, 'মিষ্টি কথা দূরে থাউক, এমন মুখ খারাপ কইরা গাইল্ দিলেন যে, কব কি বউঠাইরেন, সেই সব কথা ভদ্দরলোক ক্যান্, আমাগো মত ঝি-চাকরের মুখ দিয়াও বাইর হয় না।'

মমতা বলল, 'ভদ্র-অভদ্র জাতেব মধ্যে লেখা থাকে না তবঙ্গ, মানুষেব স্বভাব-ব্যবহাব চালচলনেই তা বোঝা যায। অসীমাব মুখ যে কি-একখানা বস্তু, তা আমাব জানতে বাকি নেই।'

ফেবাব সময মনটা একটু খচখচ কবতে লাগল তরঙ্গ'ব। এব আগে একজনেব কথা আব একজনেব কাছে সে লাগাযনি। কাজটা ভালো নয। আজ বড মুখ আলগা কবেছে, বড বাডাবাডি কবে ফেলেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পডল, অনেকদিন বাদে মমতা তাব সঙ্গে ভালোভাবে মন খুলে কথা বলেছে। আব কথায কথায কযলা না ভেঙে চলে আসাযও কোন বাধা দেযনি বা ওজব আপত্তি কবেনি।

সামান্য দেবি হওযাব জন্য অসীমা যখন আজও তাকে বকুনি দিল, খোঁটা দিল কাজ ফাঁকি দেওযাব, তখন মন আব ভালোবাসা পাওযাব নতুন অস্ত্রটি এখানেও প্রযোগ কবল তবঙ্গ, 'কি করুম কযেন বউদিদি। কাজ হইযা গেলেও নানান ছল-ছুতায ও-বাসাব বউঠাইবেন আটকাইযা বাখেন আমাবে। ইচ্ছা কইবা-কইবা দেবি কবাইযা দ্যান।'

অসীমা বলল, 'তা তো দেবেই। আমি তাকে নিজে সেধে ঝি জোগাড কবে দিযেছি যে—তাব শোধ নেবে না? মানুষেব উপকাব কবতে নেই তবঙ্গ। অনেক মেযে দেখেছি, কিন্তু মমতাব মত এমন হিংসুটে মেযে আমি আব দুটি দেখিনি, জিলিপিব প্যাঁচ ওব মনেব মধ্যে।'

তবঙ্গ বলল, 'আব যা মুখ বউদিদি, কব কি আপনাবে। কাজ তো আপনাব বাসাযও কবি, দোষ-ত্রিকটি হইলে আপনিও তো ধমক টমক দ্যান। কিন্তু এ যা মুখ! আউ আউ আউ, এমন মুখখাবাপ কবতে আমবাও পাবি না বউদিদি।

অসীমা বলল 'মুখ মমতাব চিবকালই খাবাপ।'

তবঙ্গ সাহস পেযে বলল, 'আব কেবল কি আমাবে? আপনাবে জডাইযা জডাইযা বউদিদি, আপনাবে জডাইযা জডাইযা—' যাউক, ওসব কথায কি দবকাব আমাব।'

অসীমা বলল, 'না না, কানে যখন একবাব গেলই সব শুনি। চিনে বাখা ভালো মানুষকে। কি কি বলেছে মমতা আমাব বিরুদ্ধে, সব খুলে বল তবঙ্গ। ভাবিস নে, কোন ভয নেই তোব। এব একটা কথাও এক কান থেকে আব এক কানে যাবে না। থাক থাক, ওটুকু হলুদ আমি নিজেই বেঁটে নেব।'

তক্তপোশেব তলা থেকে পানেব বাটাটি এগিযে আনল অসীমা, "আয পান খা।'

অনেকদিন এমন আদব ক'বে, এমন অন্তবঙ্গ সুবে তবঙ্গকে ডাকেনি অসীমা। তবঙ্গ কি সে ডাকে সাডা না দিযে পাবে?

তাবপব ধাপেব পব ধাপ এগিযে চলল তবঙ্গ। উপাযটা ভাবি চমৎকাব। একজনেব নিন্দা দিযে আব একজনকে যে বন্দনা কবা যায, সহানুভূতি সহৃদযতা আকর্ষণ কবা যায, পৌঁছনো যায মনেব কাছাকাছি, দিনেব পব দিন তা আবিষ্কাব কবে আনন্দিত হ'তে লাগল। মাইনে ছাডা বাডতি উপহাব ইদানীং একেবাবে বন্ধ হযে গিযেছিল। আবাব শুরু হল। অসীমা পান খাওযায, মমতা জর্দার কৌটো এগিযে দেয। অসীমা তবঙ্গ'ব স্বামীব জন্য বাজাবেব নতুন-ওঠা টাকায তিনটে ক'রে কেনা ফজলী আমের আধখানা কেটে দিল একদিন। আব জলপাইগুডিব বাপেব-বাডি থেকে পাঠানো চাবটে আনাবস থেকে পুবো একটি আনাবসই তবঙ্গকে দিযে দিল মমতা। কুঞ্জদাস খেযে ভাবি খুশি। কেবল নিজেই খেল না, দু-চাব খণ্ড স্ত্রীব মুখেও পুবে দিল। ভাবি মিষ্টি আনাবস। এমন জিনিস কলকাতায মেলে না। সুতবাং আরো স্বাদু, আবো মুখবোচক জিনিস মমতাকে দেওযাব জন্য মুখ চুলবুল কবতে লাগল তবঙ্গ'ব।

'কাইল কি কাণ্ডটা হইছে জানেন বউঠাইবেন?'

মমতা বলল, 'না বললে কি ক'বে জানব।'

তবঙ্গ বলল, 'বড ঘবেব সব বড কথা। কিন্তু এত কেচ্ছা কেলেঙ্কাবি আমাগো ছোটলোকের মধ্যেও হয় না বউঠাইবেন। যাউক, দবকার কি ওসব কথাব মধ্যে যাইয়া।'

কৌতূহলে ফেটে পডল মমতা—'আহা বল্ না। ওই তো তোঁব দোষ।'

বলবে কি। বলবাব মত কি আর কথা। অসীমা গিয়েছিল ববানগবে, বাপেব বাড়িতে। ফেবববার কথা ছিল না। কিন্তু ফিবে এসে দেখে, সেই ফাঁকে ইলা দিদিমণিকে নিযে দাদাবাবু সিনেমায চলে গেছে। তাবপব বাত প্রায বাবটাব সময মোটবে কবে ফিবে এসেছিল। বাত্রেব ঘটনাটা পবদিন সকালে কাজ কবতে গিযে শুনেছিল তবঙ্গ। স্বামী স্ত্রীব মধ্যে তাই নিযে কি তুমুল ঝগড়া। ইলা দিদিমণি মুখ চুন কবে দাঁড়িযে বইল। মুখ দেখলেই বোঝা যায ও মেযেব মনে পোকা ঢুকেছে। ও মেয়ে ঠিক নেই।

মমতা বলল, 'ছি ছি ছি। সম্পর্কে শত হলেও তো মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোন। কি ভাগ্যি যে, ঠাকুবপো'ব সঙ্গে বিযেব কথাটা তখন পেড়ে বসিনি।'

পাশেব ঘবে নির্মল কবিতা লিখছিল মাসিক কাগজেব জন্যে। সমস্ত লেখাটা কেটে দিযে কলম কামড়াতে লাগল। কিন্তু উৎকর্ণ হযে বইল তবঙ্গব কথা শোনবাব জন্যে।

'সুধাংশু দাদাবাবু প্রথম প্রথম একটু আমতা আমতা কবলেন। তাবপব একেবাবে হাটেব মধ্যে ভেঙে দিলেন হাঁড়ি। অসীমাই বা এমন কোন সতীলক্ষ্মী। তাব কীর্তি-কাণ্ডেব কথা কি ভুলে গেছে নাকি সুধাংশু। তাব নিজেব বন্ধু বিনযকে সেদিন ঘাড় ধবে বেব কবে দিতে হযনি? কিন্তু দোষ তো কেবল বিনযেবই ছিল না। এক কাঠিতে কি আব ঢোল বাজে?

মমতা গালে হাত দিয়ে বলল 'বলিস কি অ্যাঁ। আজ চাব পাঁচ বছব বিযে হযে গেছে। এখনো দোষ গেল না? ছি ছি ছি, শুনলে কানে আঙুল দিতে ইচ্ছে হয় যে রে তবঙ্গ। একি স্বভাব, একি প্রবৃত্তি।'

তবঙ্গ মৃদু হেসে বলল, 'ফাঁক পাইলেই এখনো বিনযবাবু আসেন কিন্তু বউঠাইবেন। তাবপব ঘবেব মধ্যে গুজ গুজ, ফিস ফিস'

মমতা বলল, ওসব দোষ এখনো গেল না অসীমাব? ছি ছি ছি।'

পবম অনুকম্পায তবঙ্গ হাসল, 'ও দোষ কি যাওযাব বউঠাইবেন? ও দোষ মাইযামানুষেবে যদি একবাব পাইযা বসে চিতায ওঠবাব আগে ছাইবা দেয না।

তবঙ্গ অকৃতজ্ঞ নয। পক্ষপাতিত্ব নেই তাব মনে। অসীমাব ফজলী আমেব স্বাদটুকুও ভালোই ছিল। সুতবাং তাকেও বঞ্চিত কবল না। বিকালেব কাজ সেবে বাসায যাওযাব আগে অসীমাকে একান্তে ডেকে নিযে বলল, 'এমন কেলেঙ্কাবী কাণ্ডও যে ভদ্দবলোকেব ঘবে হয, তা আমাব জানা ছিল না বউদিদি।

অসীমা উৎসুক স্ববে বলল, ব্যাপাব কি বে অত চেপে চেপে কথা বলছিস কেন?'

তবঙ্গ বলল 'না বউদিদি, যাই দবকাব কি আমাগো বড় ঘবেব কথায থাইকা। চললাম বউদিদি

অসীমা হাত টেনে ধবল তবঙ্গব। কি জ্বালা, যা বলছিলি খুলেই বল না তবঙ্গ। কোন ভয নেই তোব।'

তবঙ্গ শুরু কবল, 'বলব কি বউদিদি বলবাব মত কি আব কথা? বযস হইছে, ছাওযালপান হইযা গেছে, এখনো এই সব পিবর্বিত্ত—ছি ছি ছি।'

বলবাব মত কথা নয তবু বলব না বলব না ক'বে অসীমাব অনুবোধে সবই খুলে বলল তবঙ্গ। আজ বিকালে কাজ কবতে গিযে তবঙ্গ দেখে স্বামী-স্ত্রীব মধ্যে দারুণ ঝগড়া। সে ঝগড়ায কান পাতা যায না। বড়দাদাবাবু আব ছোটদাদাবাবুব মধ্যে কথাবার্তা মুখ দেখাদেখি বন্ধ। হবে না? পুরুষ মানুষে কি এসব সহ্য কবতে পাবে? দিনবাত কেবল সোমত্ত দেববকে নিযে ফষ্টিনষ্টি। আব কেবল কি হাসি তামাসা,—একেবাবে ঢলাঢলি। কতদিন তবঙ্গব নিজেবই চোখে পড়ে গিযেছে। চোখ পেতে তাকানো যায না।

অসীমা থুতনিতে আঙুল ঠেকিযে বলল, 'বলিস কি তবঙ্গ, ছেলেপুলে হযেছে, এখনো এই প্রবৃত্তি। আব নির্মল, তাকে তো ভালো ছেলে বলেই জানতাম?'

তবঙ্গব হাসিতে মনুষ্যচবিত্র সম্বন্ধে অগাধ অভিজ্ঞতা উদ্ভাসিত হযে উঠল, 'ভালো সবাই বউদিদি। আমি দেইখাই বোঝতে পাবছিলাম, মনেব মইধ্যে যদি কু থাকে বউদিদি, চোখ মুখ দিযা

আপনিই তা ছুইটা বাইব হয। কিন্তু মাইযামানুষেব কাছে আগে যদি আস্কাবা না পায বউদিদি, পুরুষেব সাইধ্য কি—'

অসীমা বলল, 'বড বেঁচে গেছি তবঙ্গ। ভাগ্যিস্ নির্মলেব সম্বন্ধে পিসীমাকে তখন আমি চিঠি লিখিনি। তাহলে আব বক্ষা ছিল না।'

কলেজ থেকে ফিবে এসে পাশেব ঘবে বইগুলি টেবিলেব ওপব সাজিযে বাখছিল ইলা, আব কান পেতে ছিল তবঙ্গ'ব কথায, হঠাৎ পবম অধীব হযে ববীন্দ্র বচনাবলীখানা সুদ্ধ আবো খানকতক বই একেবাবে ঠেলে ফেলে দিল টেবিলেব তলায, চেঁচিযে উঠে বলল, 'আমাব টেবিলে তোমাব চুলেব কাঁটা আব সিঁদুবেব কৌটোটা কেন এনে বেখেছ বউদি? আব কি জাযগা নেই?'

অসীমা তাব দিকে তাকিযে বলল, 'বড বাঁচা বেঁচে গেছিস ভাই।'

তবঙ্গ'ব যাওযাব সময কাঁঠালেব একটুকবো ইঁচড অসীমা তাব হাতে তুলে দিযে বলল, 'নে। বেঁধে খাস দুজনে। আমাকে তুই বক্ষা কবেছিস তবঙ্গ।'

দিন দুই পবে অসীমা বলল, 'কাল কিন্তু একটু সকাল সকাল আসিস তবঙ্গ। আমাব বাবা-মাকে খেতে বলেছি। অনেক কাজ বাডিতে।'

খববটা মমতাকে দিতেই সে বলল, 'খববদাব যেন আমাব এখানে আসতে দেবি কবিসনে। মামা আব মামীমাকে অনেকদিন ধবেই বলব বলব ভাবছি। আজই বলে পাঠাব। কাল ববিবাব, কালই সুবিধে। আগে আসবি আমাব এখানে।'

তবঙ্গ ঘাড নেডে সায দিযে বলল, 'আইচ্ছা বউঠাইবেন।'

পবদিন ভোবে ক্যাম্প থেকে বেবিযে বকুল গাছটাব তলায দাঁডিযে দাঁডিযে তবঙ্গ একবাব ভাবল কোন বাসায় আগে যায। যেখানে যাবে সেখানেই আটকা পডবে। ডাঙায বাঘ, জলে কুমীব।

মানদা আব ক্ষ্যান্তমণি কাজে চলেছে। তবঙ্গকে দেখে থেমে গেল।

মানদা বলল, 'কি লো তবঙ্গ, দাঁডিযে আছিস যে? কাজ কামাই কববাব মতলবে আছিস নাকি?'

ক্ষ্যান্ত বলল, 'আ-হা-হা, কা'কে কি বলছিস তুই মানু। ও কি আব ওসব কিছু জানে? আমাদেব তবঙ্গ হল ধর্মবাজ যুধিষ্ঠিবেব পবিবাব, খডদ'ব মা গোঁসাই।'

মানদাবা চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ তবঙ্গ তাদেব পিছন থেকে ডেকে বলল, 'ও ক্ষ্যান্ত দিদি, শোন।'

ক্ষ্যান্ত বলল, 'কি বে তবঙ্গ, কি বলছিস?'

তবঙ্গ একটু ইতস্তত কবে বলল, 'বলছি কি, একটা উপকাব কববা তোমবা আমাব?

'কি উপকাব?'

তবঙ্গ বলল, 'আমাব মনিবগো বাসা তো দুইজনেই চেন? একজন যাও হবমোহন ঘোষ লেনে, আব একজন প্যাবীমোহন সুব লেনে। যাইযা বলবা কি, তবঙ্গ আইজ কাজে যাইতে পাববে না, কলেবায সে মবো-মবো। বেছানা ছাইবা ওঠতে পাবে না। কাজ উদ্ধাব কইবা দ্যাও দিদিবা। পান-তামুক খাওযামু।'

কিন্তু পান তামাক খাওযাবাব আগেই মানদা আব ক্ষ্যান্ত উল্লসিত হযে উঠল, 'বলিস কি তবঙ্গি! এতদিনে সুবুদ্ধি হল তোব। ক'মাস আগে যদি বুদ্ধিটা খেলত, তাহলে কি আর খেটে খেটে এমন হাড্ডি-সাব হতিস?'

যাওযাব সময তবঙ্গ'ব মুখেব কাছে মুখ নিযে ক্ষ্যান্ত তাব গালে ছোট্ট একটু চুমু খেযে বলল, 'বড ভাবনা ছিল তোকে নিযে। এবাব বাঁচবি।'

ক্ষ্যান্তবা চলে গেলেও তবঙ্গ আবো খানিকক্ষণ দাঁডিযে বইল বকুল গাছেব নিচে। ভাবি দুর্গন্ধ ক্ষ্যান্তব মুখে। হাতেব তেলোয নিজেব গালটা মুছে ফেলতে আঙুলে মিশিব দাগ লেগে গেল। আব হঠাৎ দেখতে না দেখতে দুই চোখ জলে ভবে উঠল তবঙ্গ'ব। ঠিক এমন তো সে হতে চাযনি। কেন এমন হল?

শ্রাবণ ১৩৫৬

দীপান্বিতা

ভারি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল অরুণা। লজ্জার আর সীমা নেই। দাদার বন্ধুর হাতে চায়ের কাপটি কেবল ধরে দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আলো নিভে সারা বাড়িটা একেবারে অন্ধকার হয়ে পড়ল। আর সেই অন্ধকারে অসাবধানে বীরেনের আঙুলের সঙ্গে অরুণার আঙুলগুলির একেবারে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল। সেই মুহূর্তেই অবশ্য হাতটা সরিয়ে নিয়ে এল অরুণা। কিন্তু মনে হল আর একজনের হাতের স্পর্শটুকু তার সমস্ত আঙুলের সঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে। আর কেবল কি আঙুলে?

অরুণা সেখানে আর না দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

বন্ধুর পাশে বসে শিশিরও চা খাচ্ছিল। বোনকে ডেকে নির্বিকার ভাবে বলল, রুণি, ঘর থেকে তাড়াতাড়ি হ্যারিকেনটা জ্বেলে আন তো।

বীরেন অন্ধকারেই চায়ের কাপে একটু চুমুক দিয়ে বলল, ব্যাপার কি, হঠাৎ কারেন্ট বন্ধ হয়ে গেল যে।

জানালা দিয়ে একটু তাকিয়ে বলল, সামনের বাড়িটায় তো দিব্যি আলো জ্বলছে। তোমার মেইনে কোন গোলমাল আছে নাকি?

শিশির কাষ্ঠ হেসে বলল, আর ভাই বল কেন। এ বাড়িতে আসা অবধি এই বৈদ্যুতিক বিভ্রাট চলেছে। অন্তত পনের বিশ টাকাও কি খরচ করিনি ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর পেছনে? টুকটাক কি করে দিয়ে যায়। দু দিন ভালো চলে। ব্যস তারপর আবার যা তাই। আমি অনেক লোক দেখেছি, কিন্তু এই ইলেকট্রিক মিস্ত্রীগুলির মত এমন ফাঁকিবাজ আর দেখিনি।

বীরেন আর একবার চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, যা বলেছ

শিশির আর একবার হাঁক দিল, কই রুণি, হ্যারিকেনটা দিয়ে গেলি না?

কিন্তু হ্যারিকেনের বদলে অরুণা দু পয়সা দামের ছোট্ট একটি মোমবাতি জ্বেলে নিয়ে এল।

শিশির বলল ওটা আর কতক্ষণ জ্বলবে। কেন হ্যারিকেনটা কি হল?

অরুণা মুখ নীচু করে মৃদুস্বরে বলল হ্যারিকেনে তেল ভরা নেই দাদা।

শিশিরের ক্ষৌরি হবার ছোট্ট কাঁচের বাটিটায় জ্বলন্ত মোমের কয়েকটা ফোঁটা ফেলে তার মধ্যে বসিয়ে দিয়ে টেবিলের উপর রাখল অরুণা। বারান্দার খানিকটা জায়গা তাতেই খানিকটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কিন্তু আর সব অন্ধকার ঘরগুলোতে ততক্ষণে চেঁচামেচি শুরু হয়ে গিয়েছে। পাশের ঘর থেকে মা সুধাময়ী বকছেন নাঃ কি ভূতুড়ে বাড়ির পাল্লায় পড়েছি। ও রুণি, এ ঘরে তোরা একটা আলো টালো কিছু দিবি? না কি অন্ধকারে থাকব। ছেলেটা যে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠেছে। তা কি তোদের কানে যায় না?

শিশিরের দু'বছরের ছেলে বিশু ঠাকুরমাকে জড়িয়ে ধরে সমানেই চেঁচাচ্ছিল। এদিকে রান্নাঘরে কড়াতে মাছের ঝোল চড়িয়ে দিয়েছিল শিশিরের স্ত্রী মিনতি। সদ্য পরিচিত বাইরের একজন লোকের সামনে চেঁচিয়ে ওঠাটা তার পক্ষে শোভন নয়। তার হয়ে চার বছরের মেয়ে লতুই ডেকে বলল, ও পিসীমা আলো দাও আমাদের আমরা কি অন্ধকারে উনুনের আগুনে পুড়ে মরব?

গলাটা লতুর হলেও বক্তব্যটা যে আসলে কার তা বুঝতে কারো বাকী রইল না। তিনজনের প্রত্যেকেই একবার করে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাল।

অরুণা বলল, যাও দাদা কয়েকটা ক্যাণ্ডেল নিয়ে এস।

শিশির বিরক্ত হয়ে বলল, কি মুশকিল। জানিসই তো বাড়ির ইলেকট্রিকের এই অবস্থা। আগে থাকতে দু'চারটে মোমবাতি আনিয়ে রাখতে পারিস নে? সবই যদি আমাকে করতে হয়—

দাদার এ অভিযোগের অরুণা কোন জবাব দিল না। মুখ নীচু করে রইল। বীরেন আড়চোখে

তাকাল সেই মুখের দিকে। মোমের মৃদু আলোয ভারি নরম দেখাচ্ছে অরুণার মুখ। একটু লম্বাটে ধরনের গড়ন মুখের। নাক চোখ টানা টানা। রঙটিও বেশ ফরসাই। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের পক্ষে বেশ সুন্দরই বলা চলে। বয়স উনিশ কুড়ির কম হবে না। মুখের কচি মিষ্টি ভাবটুকু আছে বলে কিছু কম বলেই মনে হয। পাতলা ছিপছিপে চেহারা। কিন্তু তাই বলে অপুষ্টাঙ্গী নয। সাদা খোলের চওড়া কালো পেড়ে একখানা আটপৌরে শাড়িতে কোন মেয়েকে যে এত সুন্দর দেখায়, বহুকাল পরে বীরেনের তা যেন এই নতুন করে চোখে পড়ল। শিশির ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, তুমি একটু বসো ভাই। মোড়ের দোকান থেকে আমি গোটাকতক মোমবাতি নিয়ে আসি। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেছে।

বীরেন একটু বাধা দিযে বলল তার চেযে চল না কেন তোমার মেইনটা একবার দেখে আসি। কি গোলমাল হযেছে দেখাই যাক না।

বন্ধুর শৌখীন বেশবাসের দিকে তাকিযে শিশির মৃদু হাসল। সাজসজ্জার দিকে এখনো বীরেনের বেশ লক্ষ্য আছে। মাথার কালো মসৃণ একরাশ চুল সযত্নে ব্যাকব্রাশ করা। গাযে সদ্য ইস্ত্রি ভাঙা আদ্দির পাঞ্জাবি। বোতামগুলি অবশ্য সোনার নয – হাড়েরই। কিন্তু দেখলেই বোঝা যায বেছে শখ করে কিনেছে। চারদিকে নীল বর্ডার দেওযা, মাঝখানে সাদা ছোট ছোট বোতামগুলি মানিয়েছেও বেশ। চওড়া কপাল ভরাটে গাল গলার পাউডারের সূক্ষ্ম আভাস একেবারে অদৃশ্য নয। ছেলেবেলা থেকেই একটু শৌখীন রুচির মানুষ বীরেন। সে শখটা আজও বদলাযনি। শিশিরের প্রায সমবযসী হলেও এখন আর তা মনে হয না। মেজে ঘষে দু' তিনটে বছর অন্তত বেশ কমিযে এনেছে নিজের বযসকে বীরেন। ছাব্বিশ-সাতাশের চেযে একটা দিনও বেশি বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। বেশ আছে। সংসারে কেবল এক মা। এখনও বিযে থা করেনি। কোন ভাবনা চিন্তা নেই। আর এদিকে অল্প বযসে বিযে করে দুই সন্তানের বাপ হযে তিরিশ বছরেই যেন বুড়িযে পড়েছে শিশির।

বন্ধুর মেইন সুইচ দেখে আসবার আগ্রহে শিশির তাই একটু হেসে বলল থাক থাক। আর বিদ্যে ফলিযে দরকার নেই। তোমার মত ফিট বাবু ওসব সুইচ ফুইচ দেখে কি করবে। নিরুপদ্রবে কলম পিষে যাচ্ছ সেই ভালো। বৈদ্যুতিক ব্যাপারের মধ্যে গিযে কি দরকার? শেষে দারুণ একটা শক টক খাবে। মেইনে হাত দিতে গিযে আমার সেদিন কি হযেছিল দেখ "

বন্ধুকে ডান হাতটা তুলে দেখাল শিশির। হাতে অবশ্য কিছুই এখন আর দেখা গেল না।

বীরেন সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করল, কি হযেছিল, শক খেযেছিলে নাকি?

শিশির বলল, হ্যাঁ, ভারি লেগেছিল সেদিন। বীরেন মুচকে হাসতে লাগল।

অরুণাও হাসল, ভারি না আরো কিছু। অমন শক আমাদের কতদিন লাগে। এসব ব্যাপারে দাদার ভারি ভয। সেই থেকে নিজে তো সুইচে হাত দেনই না, আমাদের কাউকেও যেতে দেন না কাছে।

বীরেন হেসে বলল, ইলেকট্রিসিটিকে তুমি বুঝি তেমন ভয কর না? তুমি বলেই যেন একটু সঙ্কুচিত হযে পড়ল বীরেন। পাঁচ-ছয বৎসর পরে দেখা অরুণাদের সঙ্গে। এই কযেক বছরে অনেক অদল বদল হযেছে। অরুণা তখন ছিল কিশোরী বোগা লিকলিকে চেহারা। তখন 'তুমি' কেন 'তুই' বলতেও কোন সঙ্কোচ হত না। কিন্তু এখন এই পূর্ণ-যৌবনা সুশ্রী তন্বীটিকে হঠাৎ 'তুমি' বলতেও যেন কেমন কেমন লাগে।

বীরেনের সামনে অতগুলি কথা বলে ফেলে অরুণাও ততক্ষণে বেশ একটু লজ্জিত হযে পড়েছে। বীরেনের 'তুমি' বলার সঙ্কোচটুকুও তার চোখে এড়াল না।

গেঞ্জিটা গাযেই ছিল। স্যাণ্ডেল পাযে দিতে দিতে বোনকে বলল, অরুণা, আমার পকেট থেকে আনা চারেক পযসা নিযে আয তো, নিযে আসি ক্যাণ্ডেল।

পযসা দিতে অরুণা চলে গেল ঘরে। শিশির বেরিযে গেল মোমবাতি আনতে। অরুণাও তার পিছনে যেতে যেতে বীরেনের দিকে একবার তাকিযে বলল, আপনি বসুন, বউদি অন্ধকারে কি করছে দেখে আসি।

বীবেন বলল, তাব চেয়ে এই মোমবাতিটাই তাঁকে দিয়ে আসুন না।

অরুণা মৃদু হেসে বলল, আব আপনি বুঝি একা একা অন্ধকাবে বসে থাকবেন।

বীবেন বলল, একা একা থাকব কেন ?

তাবপব একটু থেমে বলল, শিশিব তো এখুনি আসবে। সত্যিই তাই। তিন চাব মিনিটেব বেশি দেবি হলো না শিশিবেব। আধ ডজন মোমবাতি, আব দুটো সিগাবেট নিয়ে সে তাডাতাডিই ফিবে এল। মোমবাতিগুলি বোনেব হাতে দিয়ে বলল, যা এবাব ঘবে ঘবে জ্বেলে দিয়ে আয়। একটু অন্ধকাব হয়েছে কি, চ্যাঁচামেচিতে সব অস্থিব। কাবো যদি একটু ধৈর্য থাকে ? তাবপব বন্ধুব দিকে সিগাবেট বাডিয়ে দিয়ে বলল ধবাও বীক।

বীবেন দেশলাই জ্বেলে বন্ধুব সিগাবেটটা আগে ধবিয়ে দিতে দিতে বলল, মোমবাতিতে তা'হলে একেবাবে কম যায় না শিশিব। এদিকে ইলেকট্রিক চার্জও দিতে হয়।

শিশিব বলল, খুবই দিতে হয়। তাবটাবগুলো খাবাপ হয়ে যাওয়ায় কাবেণ্ট বেশিই পোডে।

বীবেন সিগাবেটেব একটু ধোঁয়া ছেডে বলল, বিওয়্যাবিং কবে নিলেই তো পাবো।

শিশিব একটু হেসে বলল, যখন তখন আব পাবি কই। এ অঞ্চলেব একজন মিস্ত্রীকে ডেকে এনেছিলাম সেদিন। সে শ'খানেক টাকাব এস্টিমেট দিল।

বীবেন বলল, বল কি, অত পডবে কেন ?

শিশিব একটু হাসল, পডালে পডবে না কেন ?

তাবপব ধীবে ধীবে সুখ দুঃখেব কথা বন্ধুকে বলতে লাগল শিশিব। সুখেব চেয়ে দুঃখেব কথাই বেশি। বেলেঘাটাব এই শহবতলীতে তিনখানা ঘবওযাল' পুবনো এই একতলা বাডিটুকুব বাসিন্দা হওয়াব সৌভাগ্য অর্জন কবতে কম বেগ পেতে হয়নি। বাডিওয়ালা থাকেন টালিগঞ্জে নিতান্তই পিতৃবন্ধু বলে নামমাত্র তিনশ' টাকা সেলামীতে আব পঞ্চান্ন টাকা ভাডায় আবো অনেক প্রার্থীকে মনঃক্ষুণ্ণ কবে শিশিবকে তিনি বাডিখানা ছেডে দিয়েছেন এব উপব তিনি আব এ বাডিব পেছনে পয়সা খবচ কবতে বাজী নন। মেবামত কবাতে হয় শিশিবই কবিয়ে নিক তাবপব ভাডা থেকে না হয় ফি-মাসে টাকা পাঁচেক কবে কাটিয়ে নেওয়া যাবে। এদিকে মার্চেণ্ট অফিসেব কেবানীগিবি কবে শিশিবেব ভাতাটাতা ধবে এখনো পুবোপুবি দু'শোতে গিয়ে পৌছোয়নি। টাকা পনেব কমই আছে। অথচ দেশেব বাডিব সবাইকেই কলকাতায় নিয়ে আসতে হয়েছে। খবচেব সঙ্গে আব পেবে ওঠা যায় না। প্রত্যেক মাসেই ভাবে, লাইনটা ঠিক কবে নেবে কিন্তু হয়ে ওঠে না। মাইনে পাওয়াব সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অর্ধেক টাকা আগেব মাসেব মুদি, কয়লা, ধোপাব হিসাব শোধ কবতে জলেব মত বেবিয়ে যায়। বিদ্যুতেব পেছনে খবচ কববাব মতো অবশিষ্ট কিছুই থাকে না ফলে মাসেব মধ্যে পনেব বিশ দিন বাডিতে অমাবস্যা লেগে থাকে। কিন্তু উপায় কি ?

সবল আন্তবিকতায় বন্ধুকে সব কথা জানাল শিশিব। পাশাপাশি গ্রামে বাস। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে পডেছে। আগে খুবই যাওয়া আসা ছিল। তাবপব ম্যাট্রিকুলেশন পব পব দু'বছব ফেল কবে বীবেন হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। বছব পাঁচেক আগে একবাব দেশে এসেছিল। দিন কযেক ছিলও শিশিবদেব বাডিতে। এ গল্প সে গল্প। দেশ বিদেশ অনেক ঘুবেছে। পডাশুনো কববেই না ভেবেছিল। কিন্তু কি খেযাল হল। পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে প্রথমে ম্যাট্রিক তাবপব আই এস সি'টা শেষ পর্যন্ত পাশই কবে বসল বীবেন। মামা মামী আবো পডবাব জন্য চাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু শিশিব তো জানে, পবেব চাপে বীবেনেব কোনদিন পডা হয় না। যেটুকু হয়ে বইল, সেটুকুই থাক। আবাব যদি কোনদিন বই নিয়ে বসতে ইচ্ছা হয়, তখন দেখা যাবে।

ছ'বছব পবে আজ আবার খেলাব মাঠে দেখা হয়েছে দুই বন্ধুতে। শিশিব একেবাবে হাতজডিয়ে ধবেছিল, আবে বীরু যে ? কবে এলে কলকাতায় ?

বীবেন শিশিবেব মুখেব দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে জবাব দিযেছিল, কবে এলে মানে ? কলকাতাযই তো আছি।

শিশিব বলেছিল, কলকাতায় আছ, অথচ দেখাসাক্ষাৎ কিছুই কব না।

বীরেন পাল্টা অভিযোগ কবে বলেছিল, তুমিই যেন কত কবো, তা ছাডা ঠিকানাই তো জানিনে।

আব জানলেই বা কি ! ঠিকানা জানা কত বন্ধুব বাডিতে দেখা কবতে গিযে হতাশ হতে হয়েছে। কলকাতা শহবে এই নিযম। এখানে দেখা কবা হয না, দেখা হযে যাওযাব অপেক্ষায থাকতে হয।

ছেলেবেলা থেকেই খুব বাকপটু বীবেন। আব শিশিব মুখচোবা। কোনদিনই ওব সঙ্গে কথায পাবে না। কিন্তু তাই বলে বন্ধুত্বেব জববদস্তি চালাতে শিশিবেব জুডি নেই। জোব কবেই বীবেনকে সে নিজেব বাসায ধবে নিযে এসেছে। কাজকর্মেব নানা অজুহাতেব কথা পেডেও বীবেন বন্ধুকে নিবৃত্ত কবতে পাবেনি।

বাসে পিছনেব দিকেব বেঞ্চিটায পাশাপাশি বসে শিশিব জিজ্ঞাসা কবেছে, কি কব আজকাল ? বীবেন হেসে জবাব দিয়েছে, আবাব কি ! শিশিব বলেছে, সেই কেবানীগিবি ? কোথায ?

একটা মাডোযাবী মার্চেন্ট আফিসে।

শিশিব অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা কবেছে, কি বকম হয ?

বীবেন হেসে বলেছে, না, তোমাব সঙ্গে আব পাবা গেল না। অমনিতে কোন কথা বলো না, কিন্তু যখন আবম্ভ কব পেটেব কথা তো ভালো, একেবাবে নাডিভুঁডি পর্যন্ত বেব কবে আনতে চাও। কি বকম আবাব হবে ? দিনকালেব যা অবস্থা তাতে আমাদেব মতো লোকেব কোনবকম ছাডা অন্য কোন-বকম আছে নাকি ?

শিশিব একটু অপ্রতিভ হযে চুপ কবেছিল। কিন্তু যেভাবে সেজেগুজে বীবেন বেবিযেছে, তাতে খুব খাবাপ আছে বলে মনে হয না। বিদায নেওযাব সময আব একবাব ইলেকট্রিক লাইটেব কথা উঠলো।

শিশিব বলল, সস্তায কবে দিতে পাবে, জানাশোনা এমন মিস্ত্রী আছে নাকি কেউ ?

বীবেন একটুকাল চুপ কবে থেকে হেসে বলল, মিস্ত্রীব অভাব কি ? কিন্তু কোন মিস্ত্রীতে তোমাব বিশ্বাস নেই। এক কাজ কব না। যদি বল, কাল সকাল থেকে আমিই লেগে যাই তোমাব বাডিব লাইট ফিট কবতে।

শিশিব বলল, বল কি তুমি ?

শিশিবেব স্ত্রী মিনতিও বান্না শেষ কবে ততক্ষণে উঠে এসেছিল, হেসে বলল, আপনি লাইট ফিট কববেন, তবেই হযেছে। বন্ধুব মত আঙুলে ববিক কমপ্রেস কবে আপনাকেও তাহলে দিন তিনেক শুযে থাকতে হবে।

অরুণা বউদিব দিকে ফিবে বলল, উনি না হয দিন তিনেক শুযে কাটালেন। আমাদেব ক'দিন অন্ধকাবে কাটাতে হবে তাব বোধ হয ঠিক নেই বউদি। মনে আছে দাদাব মিস্ত্রীগিবিব কথা। মেইনটাকে এমনভাবে বিগডে দিযেছিল যে, যদি বা এক-আধটু জ্বলত, দাদাব হাত লেগে তাও বন্ধ হল। ওঁব হাতেব ছোঁযা লাগলে বিদ্যুৎ নিশ্চযই একেবাবে মেঘেব কোলে লুকোবে।

বীবেন অরুণাব দিকে তাকিযে একটু হাসল, তাই নাকি ? আমাব হাতেব ছোঁযায বিদ্যুৎ জ্বলবে বা নিভবে তা তুমি জানলে কি কবে ?

আবক্ত মুখে অরুণা তাডাতাডি চোখ ফিবিযে নিলে।

বন্ধুব বোনেব সেই লজ্জাটুকু উপভোগ কবতে কবতে বীবেন বন্ধুব দিকে তাকিযে বলল, কিন্তু তুমি একেবাবে মাটি কবে বেখেছ শিশিব। তোমাব উপব এদেব আব কোন আস্থা নেই, আব তোমাব বন্ধু বলে আমিও এদেব অনাস্থাভাজন হযেছি। আচ্ছা, ফলেন পবিচিযতে। কালই দেখা যাবে। কিন্তু গোটা চল্লিশেক টাকা দিতে হবে যে শিশিব।

শিশিব বলল, টাকা, টাকা দিযে কি কববে ? বীবেন হেসে বলল, নিযে পালাব আব কি। মানে বিওয্যাবিং কবতে হলে তোমাব কযেলখানেক হের্নলি, কেবল্ লাগবে। গোঁটা পাঁচ ছয সুইচ, প্ল্যাগপযেন্ট, হোল্ডাব সবই তো দবকাব হবে। টাকা চল্লিশেব মধ্যে আশা কবি সব কুলিযে যাবে। তাবপব তোমাব আব একটা পযসা খবচ লাগবে না।

শিশিব বিস্মিত হযে বলল, তা না হয লাগল। কিন্তু সত্যি সত্যি তুমি পারবে তো ? মিস্ত্রীগিবির তুমি জানো কি।

বীবেন বলল, আহা বিযে না কবলেও ববযাত্রী তো বহুবাব গেছি।' পুঁথিগত বিদ্যা কিছু কিছু

আছে এ সম্বন্ধে । একবাব ইলেকট্রো ইঞ্জিনিযাবীং পডবাব খেযাল হযেছিল । একবাব এক্সপোবিমেণ্ট কবে দেখই না আমাকে দিযে। টাকা জলে যাবে না তোমাব।

অকণা শিশিবকে ইঙ্গিতে আডালে ডেকে নিযে গিযে বলল, দাদা শোন, উনি যখন বলছেন অত কবে, দিযে দাও টাকাটা। আসলে নিজে তো আব একা আসবেন না । একজন মিস্ত্রীটিস্ত্রী নিশ্চযই সঙ্গে কবে অসবেন। তোমাব সঙ্গে তামাশা কবছেন।

শিশিব বলল, কিন্তু এখন অত টাকা পাব কোথায ?

অকণা একটু ভেবে বলল, বেশ আজ আমাব কাছ থেকে নাও মাসেব প্রথম মাইনে পেযে দিলেই হবে।

পাডাব গুটি দুই ছোট ছোট মেযেকে মাস চাবেক অকণা পডিযেছিল। সেই বাবদ গোটাপঞ্চাশেক টাকা তাব হাতে জমেছে। দাদাব অর্থসঙ্কটেব কথা উঠলেই সেই টাকাটা সে ধাব দিতে চায। শিশিব প্রাযই ঠাট্টা কবে বলে, বাজাব নেই যে ধন টুনিব আছে সেই ধন। কিন্তু আজ বোনেব দিকে তাকিযে একটু মুচকি হাসল শিশিব, বলল আচ্ছা দে, টাকাটা।

শিশিবেব বুঝতে বাকি নেই— অকণা এই ছলে বীবেনকে কাল আবাব বাসায আনতে চায। আনাক। শিশিবেবও অমত নেই তাতে। পুবনো বন্ধু বীবেন চক্রবর্তী। শিশিবেব চেযে বযসে বোধ হয বছব দুই ছোটই হবে। দেখতে আবো ছোট মনে হয চেহাবা দেখে বছব পঁচিশেকেব বেশি কেউ বলতে পাববে না। তা ছাডা কণিব বযসও তো কম হল না। পাত্রেব সঙ্গে পাত্রীব বযসেব কিছু ব্যবধান থাকাই ভালো। শিশিববা চাটুয্যে। বীবেন কুলীন নয বলে মা ব হযত একটু আপত্তি হবে। বুঝিযে শুনিযে ঠিক কবলেই চলবে আজকাল অত দেখলে চলে না। কই, কুলীনেব সম্বন্ধ তো ক টুই এল। কো.ৗি । কা ঠিক দবে পটল না। তাদেব তুলনায দেখতে শুনতে বীবেন চক্রবর্তী ঢেব ভালো।

পবদিন বিকশায মালপত্র চাপিযে সত্যি এসে হাজিব হল বীবেন। পাঞ্জাবিব বদলে গাযে আজ একটা শার্ট চাপিযে এসেছে। তাতে আবো স্মার্ট দেখাচ্ছে তাকে আবো যেন একটু ছোকবা ছোকবা।

শিশিব বলল, ফব নাথিং তোমাব আফিস কামাই হবে। বীবেন অকণাব দিকে তাকিযে চোখ ফিবিযে নিযে বন্ধুকে বলল একেবাবে ফব নাথিং হবে কেন ? তাছাডা মাঝে মাঝে অফিস কামাই কবা আমাব অভ্যাস আছে। বোজ বোজ গাধাব খাটুনি খাটতে ভাল লাগে ?

শিশিবেব মনে পডল ছেলেবেলায স্কুল পালাতেও বীবেনেব জুডি ছিল না। আব এ ধবনেব বেগাব কাজে তাব অবাল্যেব উৎসাহ। একবাব গোপাল ঘবামিব সঙ্গে সঙ্গে থেকে শিশিবদেব ছনেব আটচালাটা ছেযে দিযেছিল বীবেন ছুতোব বাডিতে ওকে নোকো গডবাব কাজে সহকবেদী কবতেও দেখা গেছে। ওব সাধেবও সীমা নেই সাধ্যেবও সীমা নেই।

শিশিব বলল, আমি কিন্তু ভাই থাকতে পাবব না, জরুবী কাজ আছে অফিসে।

বীবেন বলল, তোমাকে থাকতে বলেছে কে। শিশিব মনে মনে হাসল—তা তো বটেই। কেবল শিশিব কেন, বাডি সুদ্ধ লোক বেবিযে গেলে বীবেন আব অকণাব সুবিধা হয। বন্ধুব উপব অকণাব পক্ষপাতিত্বেব কথা ইতিমধ্যেই মিনতিব মাবফত কানে গেছে শিশিবেব।

শিশিব অফিসে যাওযাব আগেই অবশ্য কাজ শুরু কবে দিল বীবেন। তেব চৌদ্দ বছবেব একটি ছোকবাকে এনেছে সঙ্গে। নাম কানাই। ভাবি চালাক চতুব শিশিব বলল, ওকে আবাব কোত্থেকে জোটালে ?

বীবেন বলল, জোটালাম, আমাদেব পাডাবই এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রীব ছেলে। মিস্ত্রীকে আব আনলাম না, চার্জ অনেক বেশি। তাব চেযে দেখি নিজেবাই খেটে-খুটে কি কবা যায।

খেযেদেযে শিশিব অফিসে বেবিযে গেল। বীবেন পুবনো তাবগুলি খুলে ফেলতে লাগল একটা একটা কবে। স্ক্রু ড্রাইভাব, কাটিং প্লাস, ড্রিল মেশিন, ছুবি, ছোট্ট হাত-কবাত, দেখা গেল সব সবঞ্জামই আছে কানাইব ঝোলায। কেবল পাশেব বাসা থেকে মই একটা জোগাড কবে দিতে হল অকণাকে। আব মাঝে মাঝে চা। শার্ট খুলে ফেলেছে বীবেন। কাপড গুটিযে নিযেছে মালকোঁচা

করে। গায়ে শুধু একটা সাধারণ সাদা গেঞ্জি। গলার নিচে রোমশ বুকের আভাস চোখে পড়ে। ঘুরে ঘুরে বার বার মইয়ের নিচে এসে দাঁড়াতে লাগল অরুণা। কোন বার চা, কোন বার পান। কোন বার বা শুধু হাতে। সাধারণ একটা গেঞ্জি গায়েও অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে বীরেনকে। বার বার দেখেও যেন সাধ মেটে না।

মিনতি তেমন আলাপী নয়। তা ছাড়া লজ্জাও একটু বেশি। ফাই ফরমাশ অরুণাকেই প্রায় সর্বদা খাটতে হল। এদিকে বীরেনেরও ডাকাডাকির বিরাম নেই। জলচৌকিটা চাই, হাতুড়ি আছে নাকি বাড়িতে।

বসবার ঘরের পয়েন্টটা যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে না একটু পূবের দিকে সরিয়ে দিতে হবে, বলে যাক অরুণা।

মিনতি ছেলেকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে হেসে বলল, যাও ঠাকুরঝি বলে এসো।

হাসির ধরনটা ভালো নয় বউদির। অরুণা চটে উঠে বলল, আমি যেতে পারব না, তুমি যাও।

মিনতি আবার একটু হেসে বলল আহা আমি গেলে কি আর আলো জ্বলবে।

অরুণা আরও রাগ করল, অমন যদি কর বউদি, আমি আর একটুও বেরুব না বলে দিচ্ছি।

মিনতি বলল, না ভাই, তাহলে ভারি বিপদে পড়ব। তুমি যদি না বেরোও, তাহলে বাইরের লোকই হুট করে ঘরে এসে ঢুকবেন।

এর জবাবে প্রায় মিনিট পনেরো কুড়ি রাগ করে রইল অরুণা। কিন্তু তার বেশি থাকতে পারল না। বীরেন আবার ডাকাডাকি শুরু করেছে। কই অরুণা, কোথায় গেলে? এই বাল্‌বটা একটু ধর, এসো দেখি।

অরুণা ফের গিয়ে মই এর নিচে দাঁড়াল। সদরের দিকটায় কাজ করছে তখন বীরেন। কপালে একটু একটু ঘাম দেখা যাচ্ছে।

অরুণা বলল ব্যাপার কি। মই এর উপর থেকে বীরেন বলল, এই বালবটা একটু ধর।

অরুণা বলল, কেন আপনার সেই কানাই গেল কোথায়?

বীরেন হেসে বলল, কানাই নেই। তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ও মা, তাকে আবার কোথায় পাঠালেন দুপুরে? আপনারা দু'জনেই তো খাবেন এখানে। বীরেন বলল, তাকে বিড়ি আনতে পাঠিয়েছি।

অরুণা বলল, ছি বিড়ি খান বুঝি। কেন, আমাকে বললেই তো পারতেন, আমার কাছে টাকা ছিল। সিগারেট আনিয়ে দিতাম।

বীরেন বলল, আচ্ছা। জানা রইল। সিগারেট চাইলে তোমার কাছে পাওয়া যাবে। পরে দিও আনিয়ে। এবার ধর দেখি বালবটা, ছেড়ে দেব?

অরুণা কৃত্রিম শঙ্কায় বলল, না, না, এত উঁচু থেকে ধরতে পারব না।

মৃদু হেসে বীরেন দু তিন ধাপ নিচে নেমে এল, বলল এখন পারবে তো?

পাছে এতেও না পারে, নিচু হয়ে বালবটা অরুণার হাতের মধ্যে গুঁজে দিল বীরেন। বালবে কারেন্ট ছিল না, তবু সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল অরুণার।

দুপুর বেলায় মেঝেয় ফুলতোলা আসন পেতে ঠাঁই করে মিনতি বড় একখানা ভাতের থালা এনে সামনে ধরে দিল। দু'তিন রকমের ডাল তরকারি, ইলিশ মাছের ঝোল, টক। শেষে দই আর দুটো সন্দেশ।

ভিন্ন জাত আর জাত মিস্ত্রীর ছেলে বলে কানাইকে দেওয়া হলো বারান্দায়। ব্যবস্থাটাও একটু ভিন্ন রকমের হল।

পাতের কাছে সুধাময়ী এসে বসলেন, বললেন, চোখে আর তেমন দেখতে পাই না বাবা। তা ছাড়া বুড়ো বয়সে নানা রকমের রোগ এসে ধরেছে। কিছুই দেখতে শুনতে পারি নে। তোমার খাওয়ার বোধ হয় খুব কষ্ট হল।

বীরেন খেতে খেতে বলল, হ্যাঁ, আয়োজন বাড়িয়ে বউদি কষ্টই দিয়েছেন। কত পদ যে খাচ্ছি গুণে শেষ করতে পারছি না।

মিনতি বলল, কি যে বলেন, কি এমন করতে পেরেছি।

সুধাময়ী বললেন, দেখ তো মিছেমিছি অফিসটা আমাদের জন্য কামাই করলে। তোমার যতসব অদ্ভুত অদ্ভুত খেয়াল। এ সব মিস্ত্রীদের কাজ তাদেব দিয়ে করালেই হত। তোমার শখের সঙ্গে কি আর পারবার জো আছে।

বীরেন খেয়ে যেতে লাগল। কোন জবাব দিল না।

একটু চুপ করে থেকে সুধাময়ী আবার বললেন, হ্যাঁ বাবা, অফিসে কত করে পাও আজকাল।

বীরেন মাছের একটু কাঁটা চিবিয়ে ফেলে বলল, বলবাব মত নয় মাসীমা। শ' দুই টাকার মত কোন রকমে হয়।

সুধাময়ী বললেন, বাঃ, দু'শো টাকা কম হল নাকি। আমাদেব শিশির তো এখনো—বলতে বলতে কথাটা চেপে গেলেন সুধাময়ী, তারপর পুত্রবধূর দিকে চেয়ে বললেন, রুণি গেল কোথায়। ওকে ডাক না বউমা, পাখাটা নিয়ে বসুক এসে এখানে। বেচাবা গরমে হাঁপিয়ে উঠেছে। কাবো যদি কোন আক্কেল থাকে তোমাদেব।

অরুণা নিজের ঘবে তক্তপোশের ওপর পা ঝুলিয়ে চুপ কবে বসেছিল, মিনতি এসে বলল, যাও ঠাকুরঝি,ও-ঘবে ডাক পড়েছে তোমার। পাখা নিয়ে বাতাস করগে, যাও।

অরুণা বলল, আমাকে আবার কেন। তোমরাই তো আছ।

মিনতি জবাব দিল, ও, আমবা আছি বলেই বুঝি তুমি যেতে পারছ না?

খাওয়া দাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে ফের কাজ শুরু করল বীরেন। ফুট-ফরমাশ খাটতে কানাই বার বাব বাইরে যেতে লাগল। আর তার জায়গায় জোগান দেওয়ার জন্য বার বার ডাক পড়ল অরুণার। অরুণা কৃত্রিম বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, ভালো মুশকিল। দিনভর কি আপনাব সাকবেদী কবব। আমার নিজের কোন কাজকর্ম নেই বুঝি?

বীবেন হেসে বলল, ও, তোমাব নিজের কাজ? গা-ধোযা আর চুল বাঁধা তো? তার জন্য ঠিক সময়ে ছুটি দেব। ভেব না।

অরুণা বলল, অমন যদি কবেন, তাহলে আমি আব ডাকলেও আসব না।

কিন্তু বিকালের দিকে চুল বেঁধে চাঁপা ফুলেব বঙের শাড়ি পরে না ডাকতেই এল অরুণা। এসে জিজ্ঞাসা করল, তাবপর মিস্ত্রী সাহেব, আজ সন্ধ্যায় আলো জ্বলবে তো?

একটা দিনের ঘনিষ্ঠতায় দাদাব বন্ধু কখন যে তার নিজের বন্ধু হয়ে উঠেছে নিজেও টেব পায়নি। বীরেনও জবাব দিল, সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা কবতে হবে কেন। আলো তো আমার সামনে এখনই জ্বলে উঠেছে।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে লজ্জায় একটুকাল চুপ কবে রইল অরুণা, তাবপর যেতে যেতে বলল, ঈশ, আপনি যদি আলো জ্বালাতে পারেন আমি বা কি বলেছি।

বীরেন মৃদুস্বরে বললে, আগুন জ্বালাতে কিন্তু এখনই পেবেছি।

বিদ্যুৎ-দীপ সে সন্ধ্যায় অবশ্য জ্বলল না। তার পরদিনও অফিস কামাই করে বন্ধুর বাসায় শখের মিস্ত্রীগিরি কবতে এল বীরেন। অফিসে বেরুবাব সময় আজও বন্ধুকে একটু তিবস্কার কবে গেল শিশির—আচ্ছা পাগল তুমি যা হোক, মিস্ত্রীটিস্ত্রী একজন কাউকে ডেকে আনলেই হত। না হয় পাঁচ দশ টাকা নিতই।

কিন্তু তিরস্কারের মধ্যে প্রশ্রয়ের সুব মিশে রইল পনের আনা।

তারপর দিনভর বীরেন বাড়িব ঘরে ঘরে নতুন তাব বসাল, গুলি বসাল, সুইচ বসাল, টেস্ট বালবে পরীক্ষা করে নিয়ে বাল্‌বগুলি ফিট্ করে দিল। শিশিরের ঘবে একটা টেবিল ল্যাম্প করে দিল বীরেন, আর অরুণার ঘরে বাড়তি একটা নীল রঙের বেড সুইচ। টিপবার সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত ঘর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

বীবেন হেসে বলল, কেমন খুশি তো? অরুণা হাসিমুখে চুপ করে রইল।

বীরেন বলল, এবার আমার পুরস্কার? অরুণা হেসে বলল, পুরস্কার? দাঁড়ান সার্টিফিকেট লিখে দিচ্ছি, আপনি জাতমিস্ত্রীর চেয়েও সেরা। কাগজ-কলম নিয়ে সত্যিই কি যেন লিখতে যাচ্ছিল

অরুণা, বীরেন সেটা কেড়ে নিতে নিতে বলল, থাক থাক, সার্টিফিকেট তোমাকে আর লিখতে হবে না।

কাগজটুকু সুদ্ধ নরম মুঠিটুকু একটুকাল নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরল বীরেন। মুঠি তো নয়, যেন একমুঠো ফুল। অরুণা সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য হাতখানা ছাড়িয়ে নিল না। রুদ্ধশ্বাসে চুপ করে রইল।

তারপর বাইরে জুতোর শব্দ শোনা যেতেই চকিত হয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল অরুণা, মৃদুস্বরে বলল, ছাড়ুন, দাদা আসছে।

দেখেশুনে শিশিরও খুব খুশি হল। একে একে সমস্ত সুইচ অন করে দিল শিশির। সারা বাড়িটা ঝলমল করে উঠল আলোয়। শিশির তাকিয়ে দেখল বাড়ির চেয়েও যেন বেশি ঝলমল করছে অরুণার মুখ।

নৈশ ভোজের পর বন্ধুকে বাসে তুলে দিয়ে এল শিশিব, বলল, আবার কবে আসছ?

বীবেন জবাব দিতে না দিতে বাস ছেড়ে দিল।

দিন তিনেক পর সিনেমার একটা পাস নিয়ে এল শিশিব। বক্সে চাবজনের পাশ। সপরিবাবে দেখবার ব্যবস্থা আছে। সাহিত্যিক বন্ধুব বই, যিনি তুলেছেন সেই পবিচালকও শিশিবের বন্ধু। তাঁদের যৌথ সৌজন্যে একেবারে বক্সের পাস মিলেছে। ছেলেমেয়েদের মা'ব জিম্মায় রেখে স্ত্রী আর বোনকে নিয়ে বেবিয়ে পড়ল শিশিব। বলল, চল বীরেনকে এই সঙ্গে ধবে আনা যাক। মিনতি হেসে বলল, সেই ভালো। তিনিও ধরা দেওযার অপেক্ষায় আছেন। আমি ভেবেছিলাম সামনেব ববিবার তাঁকে খেতে বলব। তারপর মা বলবেন অন্য সব কথা। তাব আগেই তুমি পাশ নিয়ে এলে।

শিশির বলল, মন্দ কি? কিন্তু বীরেনের ঠিকানা? আমি তো জিজ্ঞাসা কবে বাখিনি।

মিনতি বলল, ঠিকানাব জন্য ভাবনা কি। ঠিকানা ঠিক লোকেব কাছে আছে। ঠাকুরঝি, বল দেখি। আমাকে কেবল বাগবাজারেব কথা বলেছিলেন। গলিব নাম আব নম্বরটা কি যেন।

অরুণা লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, নম্বব জানিনে। অনেকবাব জিজ্ঞাসা করতে কবতে গলিব নাম একবাব বলেছিলেন, কাঁটাপুকুব লেন।

শিশির অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বলল, আচ্ছা মানুষ তোরা। পুবো ঠিকানাটা টুকে বাখবি তা নয়। যাক, ওতেই হবে। গলিতে ঢুকে নাম আর চেহারাব বর্ণনা দিলে নিশ্চযই খুঁজে বের কবা শক্ত হবে না, চল।

দু'বার বাস বদল করে বাগবাজাবের মোড়ে নেমে তিনজনে খানিকটা পথ হেঁটে গিয়ে উপস্থিত হল কাঁটাপুকুর লেনে। যাকে সামনে দেখল তাকেই জিজ্ঞাসা কবতে লাগল শিশিব, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ভারত ইন্‌সিওরেন্সে কাজ করেন। চেনেন? এই গলিতেই থাকেন তিনি। বাড়ির নম্ববটা বলতে পারেন কেউ আপনারা?

কেউ পারে না।

চেহারা টেহারার বর্ণনা দেওয়ায় চোয়াল ভাঙা, ঘাড় চাঁছা বকাটে ধবনের একটি ছেলে হঠাৎ বলে উঠল, ও, বীরুদাকে খুঁজছেন। ওই বস্তির ভিতরে থাকেন তিনি।

স্যাতসেঁতে মেটে বস্তি। দিনের আলো সেখানে ঢোকে না। রাত্রিব দীপ এখনও জ্বালা হয়নি। একটি তালাবন্ধ ঘরের দিকে ছেলেটি আঙুল বাড়িয়ে দিল, ওই ঘরে থাকেন, বোধ হয় কাজে টাজে কোথাও বেরিয়েছেন।

শিশির বলল, আজ আবার কাজ কোথায়। আজ তো পাবলিক হলিডে।

অরুণা বলল, অসম্ভব, এসব জায়গায় তিনি থাকতেই পারেন না।

বস্তিবাড়ি থেকে বেরিয়ে সবাই ফের পথে নেমেছে, কানাইর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে সে উত্তরের দিকে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে।

অরুণাই থামাল তাকে, আরো শোন, শোন, বীরেনবাবু থাকেন কোথায় জানো? তার বাসা কোথায়?

কানাই থেমে দাঁড়িয়ে সবাইকে একবার দেখে নিয়ে বলল, বাসা? বাসায় তো তাঁকে পাবেন না।

সতেব নম্ববেব বাড়িতে কাজ কবছেন যে বীরুদা। আসুন আমাব সঙ্গে।

অরুণা বলল, কাজ কবছে? কি কাজ?

কি কাজ, সেটা অবশ্য দু'মিনিটেব মধ্যে স্বচক্ষেই দেখতে পেল সবাই। সতেব নম্ববেব বাড়িব একেবাবে সমানেব বৈঠকখানা ঘবেই দেযালে মই ঠেকিযে অনেক উঁচুতে উঠে একটি হোল্ডাবেব ভিতবে বালব বসিযে দিচ্ছে বীবেন। গাযে মযলা একটা গেঞ্জি। ঘাম চুইযে পড়ছে কপাল দিযে।

বাড়িব প্রৌঢ় কর্তা হুঁকোয তামাক খাচ্ছিলেন। শিশিবদেব দিকে একটুকাল অবাক হযে তাকিযে থেকে বললেন, আপনাবা?

শিশিবদেব হযে কানাই জবাব দিল, আজ্ঞে, ওঁবা মিস্ত্রীমশাইব কাছে এসেছেন। বাসায না পেযে -

কুঞ্জবাবু একটু হেসে বললেন, ও, আপনাদেবও লাইট বিগড়েছে বুঝি? কিন্তু আজ তো ওকে ছাড়তে পাবব না, কালও না। ও বীরু মিস্ত্রী, দেখ কা'বা খুঁজতে এসেছেন তোমাকে।

বীবেন সামনেব দিকে একবাব তাকিযে মুহূর্তকাল স্তব্ধ হযে থেকে পিছন ফিবে ফেব নিজেব কাজে মন দিল।

কুঞ্জবাবু জিজ্ঞাসা কবলেন, আজ অন্তত গোটা দুই বালব জ্বলবে তো মিস্ত্রী?

বীবেনেব জবাবেব জন্য অপেক্ষা না কবে কোন কথা না বলে শিশিব মিনতি আব অরুণা তিনজন ফেব বাস্তায নামল।

দু'দিকেব বাড়িগুলিতে এখন বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠছে।

৮.৮.১৩৭৬

অসবর্ণা

আজ আবাব একতলায অঞ্জলিদেব ঘবে পুলিস এসে হানা দিযেছিল। আধঘণ্টা যাবৎ ঘবেব সমস্ত জিনিসপত্র তছনছ কবে অঞ্জলিব ছোট ভাই হাবুলকে ওবা ধবে নিযে গেছে। সেদিনেব মত আজও পুলিস-সাব ইনস্পেক্টাবেব অনুবোধে সার্চ লিস্টে আমাকে সই কবতে হযেছে। বিনিমযে আমাকে কষ্ট দেওযাব জন্য দুঃখ জ্ঞাপন কবে তিনি আমাব সামনে সিগাবেট কেস খুলে ধবে মৃদু হেসে ধন্যবাদ জানিযেছেন।

তাবপব আসামীকে নিযে সেদিনেব মতই সদলে সদর্পে মোটবে গিযে উঠেছেন তাঁবা। সঙ্গে সঙ্গে আব একবাব ডুকবে কাঁদতে শুরু কবেছেন অঞ্জলিব মা। একপাশে হতভম্ব হযে ঠিক সেদিনেব মতই দাঁড়িযে বযেছে অঞ্জলিব ছোট দুই বোন মিন্টু আব বিন্টু।

বছব খানেক আগে অঞ্জলিব বাবা কালীমোহনবাবু যেদিন গ্রেপ্তাব হযেছিলেন দৃশ্যটা সেদিনও প্রায অবিকল এই বকমই ছিল। তবু সেদিন আব আজকেব দিনে অনেক তফাৎ। অনেক প্রভেদ দু' দিনেব অঞ্জলিব মধ্যে।

দেড় বছব আগে আমাদেব একতলাব দু'খানা ঘব পঁযতাল্লিশ টাকায ভাড়া নিযেছিলেন অঞ্জলিব বাবা কালীমোহন চক্রবর্তী। হাজবা বোডে আমাদেব আবও দু দু-খানা বাড়ি ভাড়া খাটছে। চারু এভিনিযুব এই বসত বাড়িতে ভাড়াটে বসাবাব মোটেই ইচ্ছা ছিল না আমাদেব।

কিন্তু দাদাব এটর্নীবন্ধু নিরুপম চৌধুবী বিশেষ অনুবোধ কবে চিঠি দিযেছিলেন। পাকিস্থান-ত্যাগী

উদ্বাস্তু কালীমোহন চক্রবর্তী তাঁব দূব সম্পর্কেব আত্মীয। স্ত্রী-পুত্র নিযে ভদ্রলোক উঠবাব জাযগা পাচ্ছেন না। আপাতত কোন বকমে আশ্রয় তাঁকে একটু দিতেই হবে। তাবপর সুযোগ সুবিধা পেলেই উঠে যাবেন কালীমোহনবাবুরা।

দাদা হেসে বলেছিলেন, 'উঠে যা যাবেন তা জানি। আজকাল ভাডাটেবা যদি একবাব মাথা গলায, তাবা ওঠায ছাডা ওঠে না। কিন্তু নিরুপমকেও তো disoblige কবতে পাবিনে প্রবীব। অনেক দিনেব পুবনো বন্ধু। তা ছাডা কাজকর্মও খুব দেখে শুনে কবে। আমি বলি কি, বাইবেব দু-খানা ঘব ওব আত্মীযদেব না হয ছেডেই দেওযা যাক, ঘব দু খানা তো পাডাব চাকব-বাকবদেব বীতিমত একটা আড্ডাব জাযগা হযে উঠেছে। তাব চেযে এক ঘব দুঃস্থ ভদ্রলোক যদি এসে থাকেন ক্ষতি কি। তা ছাডা মাসঅন্তে গোটা পঞ্চাশেক টাকাও তো আসবে।'

মনে মনে হাসলুম। বন্ধুকে সন্তুষ্ট কবাব সঙ্গে সঙ্গে বাডতি পঞ্চাশটি টাকাব দিকেও দাদাব নজব আছে। ঠিক বাবাব মতই খাঁটি বৈষযিক হযেছেন দাদা। বাবা বলতেন, 'পযসাকে তুচ্ছ কোবো না। পযসা গুণে গু'ণেই লাখ টাকা হয। আবাব লাখ টাকা থেকে এক পযসা গেলে আব লাখ টাকা থাকে না।

দাদাব হিসাবটাও প্রায ওই বকমই। এখন একটু মন্দা চললেও যুদ্ধেব বাজাবে হার্ডওযাব বিজনেসে আমাদেব আয তো নেহাৎ মন্দ হযনি। তা ছাডা ব্যাঙ্ক, ইনসিওবেন্স কোম্পানীব শেযাব থেকেও বেশ ডিভিডেণ্ড এসেছে। কিন্তু তখনও বাডি ভাডাব খাতে যদি কোন মাসে দশটা টাকা কম আদায হত দাদাব যেন অস্বস্তিব সীমা থাকত না। সবকাব মশাই তিনবাব ধমক খেতেন দাদাব কাছে।

আমি আব বউদি গোডাব দিকে খুবই আপত্তি কবলাম 'ভাডাটে এনে অনর্থক বাডিতে ভিড বাডানো কেন।'

দাদা সায দিযে বললেন, 'তা ঠিক', বছব কযেক আগেও এ-পাডাটা বেশ ফাঁকা ছিল। আবাব লোক গিজ গিজ কবছে। ভালো লাগে না আব এই শহবেব ভিড। একেক সময একেবাবে হাঁফ ধবে যায। কসবাব বাডিটা শেষ হযে গেলে এবাব ভাবছি সবাই মিলে সেখানেই উঠব গিযে, এটা দিযে যাব কালীমোহনবাবুব দলকে। শহবেব বাইবে দিব্যি একটু খোলা-মেলা জাযগায যেতে পাবলে হাঁপ ছেডে বাঁচা যাবে।

বউদি হেসে বলেছিলেন, 'হুঁ, তুমি আবাব যাবে ফাঁকা জাযগায। তোমাকে যেন চিনতে বাকি আছে আমাব। মানুষেব ভিড আব গোলমাল ছাডা তোমাব যেন একদণ্ডও চলে। সে কথা ববং ঠাকুবপো বলতে পাবে।'

দাদা জবাব দিযেছিলেন, 'ওব আবাব বলবাব কি আছে। প্রবীবেব পক্ষে কসবাও যা, বডবাজাবও তাই। গোটা কযেক বইযেব আলমাবী ওব সামনে খুলে দিলেই হ'ল।'

কালীমোহনবাবু কিন্তু ঠিক পঞ্চাশ টাকা দিলেন না। কাকুতি মিনতি কবে পাঁচ টাকা কমিয়ে দিলেন। আগাম কিছু সেলামী নেওযাবও বোধহয ইচ্ছা ছিল দাদাব। কিন্তু বন্ধুব সুপাবিশ নিযে ওঁবা এসেছেন বলে বোধহয চক্ষুলজ্জায বাধল। তবে কালীমোহনবাবুকে একথা স্পষ্টই বললেন।

'ভাডাটা কিন্তু ইংবেজী মাসেব দোসবা সবকাব মশাইব কাছে জমা দিতে হবে। আমাদেব তাই নিযম।'

'আজ্ঞে তাই দেব।'

দাদা এবাব জিজ্ঞেস কবলেন, 'এখানে কি কবেন আপনি।'

কালীমোহনবাবু বললেন, 'আজ্ঞে ধর্মতলায ন্যাশনাল স্টোর্সেব আমি হেড সেলসম্যান। মাঝে মাঝে ক্যাশেও বসতে হয।'

দাদা একটু ভ্রূকুঞ্চিত কবলেন। বোধহয আব একটু বেশি পদস্থ ভাডাটে আশা কবেছিলেন। আমাব আশঙ্কা হ'ল এবাব হযত দাদা ভদ্রলোকেব মাইনেব কথাটাই জিজ্ঞেস কবে বসবেন। নিযমিত ভাডা দেওযাব যোগ্যতা ভাডাটেব আছে কি না সে সম্বন্ধে আগে থেকেই দাদা একটু নিশ্চিন্ত হযে থাকতে চান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি ভেবে তিনি এবার আর মাইনের কথাটা

কালীমোহনবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন না।

কিন্তু কালীমোহনবাবুর বেতনের অঙ্কটা স্পষ্ট না শুনলেও তা'র আর্থিক অবস্থাটা বুঝতে আমাদের দেরী হ'ল না। দেখলাম, ওদের বাড়ির মেয়েরাই জল তোলেন, বাসন মাজেন। একটা ঠিকে ঝি পর্যন্ত কালীমোহনবাবু রাখেন নি।

আমার পিসীমা বালবিধবা। আমাদের সংসারেই ঠাকুরপুজো, জপতপ নিয়ে থাকেন। পাড়াপড়শী ঝি চাকর সকলের ওপরেই তাঁর অদ্ভুত সহানুভূতি। শুনলাম তিনি নাকি সেদিন কালীমোহনবাবুর স্ত্রীকে বলেছিলেন, 'সাত আট মাসের পোয়াতী মানুষ আপনি। আহা-হা, এ অবস্থায় কাজ-কর্ম করতে কত কষ্ট হয়। একটা ঝি-টি রেখে নিলেই তো পারেন।'

কালীমোহনবাবুব স্ত্রী জবাব দিয়েছিলেন, 'ঝি তো রাখতে চাই দিদি। কিন্তু পছন্দ মত লোক পাওয়া যায় কই, যাকে তাকে রাখতে প্রবৃত্তি হয় না। দু'টাকা বরং বেশি নেয় নিক, কিন্তু হাতের কাজটুকু পরিষ্কার হওয়া চাই। এর আগের ঝিটা ছিল ভারি নোংবা, তার ধোয়া বাসন ফের না ধুয়ে ঘরে নিতে পারতাম না। এবার দেখে শুনেই নেব।'

তারপর দু' মাস গেল তিন মাস গেল, ঝি আর রাখেনি ওঁরা।

আমাদের মেঝো ঝি ক্ষেমঙ্করী মুচকি হেসে বউদিকে বলেছিল, 'পিসীমা যেন কি। কিছু বুঝেও বুঝতে চান না। অনর্থক মানুষকে লজ্জা দেন।'

কেবল ক্ষেমঙ্করী কেন, আমাদের বাজার সরকার গণেশ দাসও হাসাহাসি করে। সে বিবরণও কানে এল। কালীমোহনবাবুর সঙ্গে নাকি মাছেব বাজাবে প্রায়ই দেখা হয় গণেশের। দেখতে শুনতে অমন তো বেঁটে খাটো ঠাণ্ডা মানুষ কালীমোহনবাবু। কিন্তু মেছুনীর সামনে তাঁর নাকি সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তি। দাম্পত্য কলহ যেমন তাঁর বাঁধা, মেছুনীর সঙ্গে ঝগড়াটাও তেমনি নিত্যকার। দর কষাকষি শেষ পর্যন্ত তুই তোকারিতে গিয়ে ঠেকে। একদিন রাগ ক'রে থলির মাছ মেছুনির ডালার ওপর ঢেলে দিয়ে আসেন কালীমোহনবাবু। গণেশ একেক দিন জিজ্ঞেস করে, 'কি চক্কোত্তি মশাই—মাছ নিলেন না?'

কালীমোহনবাবু জবাব দেন, 'না! ওই বরফ দেওয়া মাছগুলি আর নেব না গণেশ। একেবারে টেস্টলেস। তার চেয়ে গ্রীন ভেজিটেবলস্ অনেক ভালো। খেতেও বেশ। স্বাস্থ্যের পক্ষেও উপকারী।'

'গ্রীন ভেজিটেবলস্ কথাটার মানে কি বউদি ঠাকরুণ—?'—গণেশ একদিন আমার সামনেই জিজ্ঞেস করছিল বউদিকে।

বউদি মৃদু হেসে বললেন, 'কেন রে?'

কাহিনীটা তখন শোনা গেল।

বউদি অবশ্য ধমক দিলেন, 'ছিঃ ওসব সমালোচনা-টোচনা কোর না গণেশ। যার যে রকম জোটে সেই সে রকম খাবে।'

কিন্তু গণেশ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, 'আর কালীবাবু আমাদের যে নিন্দা করেন তার কি হবে? বলেন কি একরাশ বরফ-চাপা মাছ নিচ্ছিস গণেশ, ওতে কি মাছের কোন স্বাদ আছে? তা থাকবে কেন? মাছের স্বাদ আছে কালীমোহনবাবুর একফালি কুমড়ো আর দেড়-পো আলুতে।'

গণেশের বিক্রম দেখে বউদি অবশ্য হাসি চাপতে পারেননি। আর আমি গম্ভীর মুখে সেখান থেকে চলে এসেছিলাম!

তবু এই কালীমোহনবাবুরই যে অঞ্জলির মত অমন একটি সুন্দরী মেয়ে থাকতে পারে, আর সে রোজ কলেজে যাওয়ার জন্য বই-খাতা হাতে বাস-স্টপেজে গিয়ে দাঁড়ায়, প্রথম প্রথম এ ব্যাপারটা শুধু ঝি-চাকরকে নয়, আমাদের প্রত্যেককেই বিস্মিত করেছিল।

পিসীমা অনুকম্পার সুরে বলেছিলেন, 'আহা মেয়েটির স্বাভব ভালো, দেখতে শুনতেও বেশ। এবার দেখে শুনে একটা বিয়ে থা দিয়ে দিলেই পারে। পড়িয়ে কি হবে। পড়ানোর কি খরচ কম? এদিকে সংসারের হাল তো এই—'

কিন্তু কালীমোহনবাবুদেব এই বিদ্যানুবাগ আমাকে সত্যিই মুগ্ধ কবেছিল। অবশ্য বিয়ে দেওয়াব সঙ্গতি হযনি বলেই পডাতে হচ্ছে একথাও বুঝতে আমাদেব বাকী থাকেনি। তবু পবিবাবটিব যা আর্থিক অবস্থা তাতে মেয়েটিব ঘবে বসেই আইবুডো হবাব কথা.বি-এ ক্লাসেব ছাত্রী হবাব আশা ছিল না।

আমাব লাইব্রেবী ঘবেব জানালা থেকে প্রাযই চোখে পডত অঞ্জলিকে।যেদিন কলেজ থাকত না, সেদিন সকালেই মাযেব বান্নাব ও জোগান দিতে আসত। আটপৌবে শাডিখানা কোনদিন আধময়লা, কোনদিন বা একটু ছেঁডা। কিন্তু ভোববেলায বান্নাঘবেব সামনে বসে যখন অঞ্জলি তবকাবী কোটে, কি বাটনা বাটে শিল-নোডায, তখনও ওকে ভাবি অদ্ভুত মানায। এসব কাজতো সখ কবে এক একদিন বউদিও কবেন, কিন্তু অমন সুন্দব দেখায না তো।

অঞ্জলিদেব ঘবেব সুমুখ দিযেই আমাদেব বেকবাব বাস্তা। যেতে যেতে এক একদিন মা মেযেব আলাপ কানে আসে

'হয়েছে বাবা, আমিই পাবব। এসব আব দেখতে হবে না তোমাকে। তুমি যাও তোমাব পডা-টডা কব গিযে।'

'আমি কি এখনও মিন্টু বিন্টুব মত ছোট আছি নাকি মা যে বোজ বোজ পডাব তাগিদ দিতে হবে?'

মেয়েটিব গলা তো বেশ মিষ্টি, আব ভাবি চমৎকাব হাসিব ভঙ্গিটুকু।

কেবল ওদেব বান্নাঘবেব দাওযায না, আমাদেব সদবে, বাস স্টপেজে, কি পার্কেব ধাবেও মাঝে মাঝে চোখাচোখি হয অঞ্জলিব সঙ্গে। হাতে খান দুই একসাবসাইজ খাতাব সঙ্গে ওথেলো আব ইণ্ডিযান ইকনমিকস, কোনদিন বা একখণ্ড ববীন্দ্র বচনাবলী, পবনে তাঁতেব কমলাবঙেব শাডি, চুলেব বাশ কোনদিন পিঠময ছডানো, কোনদিন বা এলো খোঁপায স্তূপীকৃত, কোনদিন বা শুধু একটি সর্পিল বেণিতে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আশ্চয দেখে চেনা যায না, ঠিক এই মেয়েই কলতলায বসে বাসন মাজছিল কি ঘব নিকোচ্ছিল খানিক আগে। বাসবিহাবী এভিনিযুব বিটাযার্ড সাবজজ এইচ চ্যাটার্জিব মেয়ে ডলি কিংবা সাদান এভিনিযুব ব্যাবিস্টাব বীবেন ভাদুডীব মেয়ে শুচিস্মিতা, কিংবা সত্য শিব ব্যাঙ্কেব ম্যানেজিং ডিবেক্টব একডালিযা প্লেসেব পুবন্দীব ভটচাযেব বোন পাবমিতা ভটচাযেব চাইতে মোটেই বেমানান মনে হয না অঞ্জলিকে। ববং দেখে দেখে এই বিশ্বাসই আমাব দৃঢতব হয, ডলিব মত অঞ্জলিব গাযেব বঙ অত সুবর্ণপ্রভ না হলেও, শুচিব মত চোখ দুটো অত বড আব উজ্জ্বল না হলেও কি পবীব মত ঠোঁট দুটি পেলব আব বক্তাভ না দেখালেও অঞ্জলিব মধ্যে এমন কিছু আছে, যা ওদেব নেই। বিনা প্রসাধনে, বিনা সাধনায ওব মুখাবযবে স্নিগ্ধ শান্ত অথচ বুদ্ধিমার্জিত একটি পবিপূর্ণ মেযেব মুখ ছাব্বিশ বছব বযসে এই যেন আমি প্রথম দেখতে পেলাম। আব আভাস পেলাম অদ্ভুত এক বহস্যেব দুবন্ত শীতেব ভোবে উঠানে বসে একবাশ কাপড কাচাব কাযিক শ্রমেব সঙ্গে সেক্সপীযাবেব ট্রাজেডিব বস যে বহস্যেব সৃষ্টি কবেছে, আমাব কাছে তা বিস্ময়কব আব অতলগভ মনে হল।

বউদি একদিন মুচকি হেসে বললেন 'ব্যাপাব কি ঠাকুবপো, এব আগে কোন দিন তো আটটাব আগে ঘুম ভাঙত না, আব আজকাল বোজ এত ভোবে কোথায বেবোও বলতো?'

বউদিকে ধমক দেওযাব ভঙ্গিতে বললাম, 'দেখ, ঘুম যে মানুষেব সব বযসে, সব ঋতুতে একই সময ভাঙবে তাব কি মানে আছে? তা ছাডা ক'দিন ধবে সূর্যোদয দেখতে বড ভালো লাগছে, তাই বেবোই।'

বউদি আমাব ধমকে মোটেই ঘাবডালেন না, আগেব মতই হেসে বললেন, 'ব্যাকবণে ভুল হল নাকি ঠাকুবপো? সূর্য তো তোমাদেব ইংবেজী শাস্ত্রেব Masculine gender তাব চেয়ে চাঁদ বলাই বোধহয ভালো ছিল। অন্ততঃ মুখেব সঙ্গে চাঁদেব তুলনাটা সব দেশেব কাবোই আছে, শুনেছি। কিন্তু সূর্যেব সঙ্গে—'

বিবক্ত হয়ে বললাম, 'তুমি বলতে চাও কি?'

বউদি হাসি চেপে বললেন, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। আমবা শুধু দেখতে চাই আব শুনতে চাই।'

কিন্তু বউদি যাই চান না কেন, অঞ্জলি যেন কোনদিকে চাইতে জানে না, চাইতে চায় না। বাক্‌-বিনিময়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না, দৃষ্টি বিনিময় হয় না পর্যন্ত। অথচ এ বাড়িতে আসার এক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের চাকর, ড্রাইভার, বাজার-সবকাব থেকে শুরু করে, দাদা, বউদি, পিসীমা, ছোট দুটি ভাইপো-ভাইঝির সঙ্গে পর্যন্ত অঞ্জলির যে অন্তরঙ্গ আলাপ হয়ে গেছে, তা আমার টের পেতে বাকি নেই, শুধু আমার সঙ্গেই ওর আলাপ পবিচয় নিষিদ্ধ। যেহেতু আমাদের বয়সের মধ্যে ব্যবধান কম, যেহেতু শিক্ষায়, রুচিতে, মানসিকতায় আমবা সবচেয়ে কাছাকাছি, তাই সবাই যেন চক্রান্ত কবে আমাদের দূরে দূরে সরিয়ে রেখেছে। পবিচয় করিয়ে দেওয়ার কোন পক্ষের গবজ নেই, কোন সুযোগ সুবিধাটি পর্যন্ত জোটে না, আশ্চর্য, ওরও কি কোন আগ্রহ নেই আমার সঙ্গে আলাপ করবার ? কিন্তু তাতো মনে হয় না, চোখাচোখি হলেও চোখ নামিয়ে নেয বটে, কিন্তু সে দৃষ্টিব প্রসন্নতা তো আমাব চোখ এড়িয়ে যায় না। ওব সেই আনত চোখের ভাষা আমি যেন দু'কান ভরে শুনি, ওর সেই নতদৃষ্টির সানন্দ অভিনন্দন আমি সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে গ্রহণ করি। আশ্চর্য, তবু আলাপ হয় না। অদ্ভুত সভ্যতাব দায়। তাব নিয়ম মানতেই হবে, মনেব মধ্যে মুহূর্তে মুহূর্তে তা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাক ক্ষতি নেই, বাইবে অটুট বাখতে হবে তাকে।

এক একদিন মনে হয় অনন্তকাল ধরে এই চলতে থাকবে। দবজার ধারে, পার্কেব কোণায়, রাস্তার মোড়ে আমাদের এমনি দেখা হবে, আব আমবা চোখ ফিবিয়ে নেব, কথা বলাব ইচ্ছা হবে, আর আমরা মুখ ফিরিয়ে নেব, অনন্তকাল ধরে সামাজিক শুকনো আচারেব দায মেনে নেব, অন্তবের মধুর অনুরোধ কানে তুলব না। আব ভাষাহীন, ঘটনাহীন, হৃদযহীন কাল দিনেব পর দিন এমনি করে একটানা বয়ে চলবে।

কিন্তু অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হ'ল না। পক্ষকালের মধ্যেই আমাদের আলাপেব সুযোগ ঘটে গেল। ঠিক সুযোগ নয়, একটুখানি দুর্যোগই ববং এসে সাহায্য কবল আমাদেব।

ক্লাইভ রো'যেব ফার্ম দাদা নিজেই দেখাশোনা কবেন, এ ছাড়াও তাঁকে নানা কিছু দেখতে হয়। সুড়কিব কারখানা, ফ্যান ফ্যাক্টবি, গ্লাস ওযার্কস—নানা বিচিত্র ব্যাপাবের সঙ্গে দাদার যোগাযোগ। বাড়ির গাড়ি আব ড্রাইভার তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।

আমি তাঁকে বলেছিলাম ওসব ব্যবসা-বাণিজ্য আমি বুঝিনে, ওর মধ্যে আমাকে টানবেন না। আমাকে ছেড়ে দিন। আমি থাকি আমার লাইব্রেবী আব লেবরেটাবী নিযে। ডক্টব সা'র সঙ্গে কথাবার্তা আমার এক বকম ঠিক হয়ে গেছে।

দাদা বললেন, 'বেশ তো, তবে আমাদের ইণ্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টমেন্টেব দিকেও একটু নজর রেখ। যোগ্য লোকের অভাবে ওর যা হাল হয়েছে—ভাবছি শেষ পর্যন্ত তুলেই না দিতে হয়।'

বললাম, 'কেন, বড় বড় ডিরেক্টররা তো সব আছেন আমাদের, মিঃ চন্দ, মিঃ খাসনবিশ—'

দাদা বললেন, 'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। কাবো দ্বারা কোন কাজ হয় না। একজন এফিসিয়েন্ট জেনারেল ম্যানেজার দরকার, তাব জন্য হাজার বারোশ' পর্যন্ত দিতে আমরা রাজী আছি। কিন্তু লোক কই।'

আমি বললাম, 'লোকের অভাব কি।'

দাদা বললেন, 'লোকের অভাব নেই, কিন্তু যোগ্য লোকের অভাব চিবকালই। আমি ভাবছিলাম তোমার কথা।'

আমি হেসে উঠলাম, 'আমার কথা !

দাদা বললেন, 'কেন, নিজেব যোগ্যতায় নিজেরই সন্দেহ আছে না কি ?'

হেসে বললাম, 'তা নয়। কাজটাকেই নিতান্ত অযোগ্য মনে করি।'

দাদাও একটু হাসলেন, 'বেশ তো, ভেবে দেখ।'

ভেবে দাদার প্রস্তাবটা গ্রহণ করাই ঠিক মনে করলাম, নিজের প্রকৃতিকে তো চিনতে আর বাকি নেই, রুদ্ধদ্বার লেবরেটারীতে ঘণ্টাব পর ঘণ্টা নিবিষ্ট হয়ে যে না থাকতে পারি তা নয়, কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে মনে হয় নিজেকে বঞ্চিত করছি। এই রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শময় পৃথিবীর স্বাদ আমার কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল। কি হবে প্রকৃতির রহস্য-ভেদের সাধনায় ! তার রূপ আগে দু'চোখ মেলে দেখি,

তাব বসে আগে সমস্ত অস্তিত্ব সিক্ত কবে নিই, পড়ে থাকে পদার্থবিদ্যা । ফের আসি কাব্যসাহিত্যেব দ্বারে। আবাব কিছু দিন বাদে মন চঞ্চল হযে ওঠে। ভাবি, এই বা কি হচ্ছে। বইযেব পাতাব আড়ালে জগৎকে ঢাকব কেন। কেন মানব অন্যেব অক্ষবময়ী ব্যাখ্যা। নিজেব ভাগ্য আমি নিজে বচনা কবব।

ঠিক এই সময এল দাদাব ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ইনভেস্টমেন্টেব ডাক। ডুবুডুবু কোম্পানীকে ভাসিযে তুলতে হবে। এতদিন দাদাব এই কাববাবকে যমেব মত ভয কবেছি। কিন্তু আজ ভাবি কৌতূহল হ'ল। দেখাই যাক না, কি আছে এব মধ্যে। কোন বসে দাদা দিন-বাত এব মধ্যে মগ্ন হযে থাকেন। এতে কি আছে বসাযনেব স্বাদ, না বৈষ্ণব পদাবলীব অমৃত নির্ঝর ?

তা ছাড়া আবও একটা কথা মনে হ'ল। সাযানস কলেজেব বিসার্চ স্টুডেন্টদেব সঙ্গে পবিচয আছে। দেখেছি কি তাদেব কৃচ্ছ্রসাধন। কেউবা সামান্য কিছু এলাউন্স পায, কেউ পায না। অনেকেবই টিউশনি-নির্ভব সংসাব। গোপনে কাউকে কাউকে কিছু দিতে হয নিজেব পকেট খবচ থেকে। কিংবা হাত পাততে হয দাদা বউদিব কাছে। ভাবি খাবাপ লাগে। ভাবলুম তাব চেযে স্বোপার্জিত টাকায ওদেব সাহাযতা কবব। গবেষণা আমাব হবে না, হিতৈষণা যতটুকু হয। কিন্তু দেখতে গিযে ধবা দিলাম, ধবা পডলাম একথা স্বীকাব কবতেই হবে। দিনবাত পবিশ্রম কবে কোম্পানীকে যে খানিকটা তুলে ধবতে না পাবলাম তা নয। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীব রূপ পাল্টাতে লাগল। বন্ধুদেব ধবে এনে চাকবী দিলাম, সঙ্গে সঙ্গে গেল বন্ধুত্ব। তাবা কেউ আমাব স্যুটেব বঙেব প্রশংসা কবে, কেউবা আমাব কঠোব নিযমানুবর্তিতায পঞ্চমুখ হয, কেউবা মহানুভবতায অভিভূত হযে থাকে। অবশ্য বন্ধু-প্রীতিব ভাষা তো প্রায একই আছে। তবু যেন কি নেই, তবু যেন কি বদলেছে। তাবাই বদলেছে না আমি, ঠিক যেন বুঝে উঠতে পাবি নে। কিংবা বদল হযেছে সকলেবই।

কেবল কি অফিস ? অফিসেব বহির্ভূত পৃথিবীও ওই এক বিষয চক্রে বাঁধা। কোন বন্ধুব ভাগ্নেব চাকবী, কাবো বা ফার্নিচাবেব কনট্রাক্ট। কোন ভূতপূর্ব সহাধ্যাযিনী নিজে খুলেছন স্টেশনাবি স্টোর্স। আমাব আফিসে তাঁব দোকানেব জিনিসগুলিই সব চেযে ভালো মানানসই হওযা উচিত।

এক এক সময ক্লান্তি লাগে। তবু এই গ্রন্থি দুশ্ছেদ্য। এ কথা অস্বীকাব কবতে পাবিনে কাজেব নেশা আছে। বিশেষ কবে সে ক্রিযা যদি সকর্মক হয। আব কর্মময জীবনে কর্তৃপদেব মত বাঞ্ছনীয বস্তু আব নেই।

সেদিন এই রূপান্তবিত জগতেব কথা ভাবতে ভাবতে ড্রাইভ কবছিলাম, হঠাৎ দ্রুত হাতে ব্রেক কষলাম। বাস্তাব মাঝখানে wrong side-এ বাস থেকে একটি মেযে নেমে পড়ছে। আব একটু হলে—আব একটু হলে কি যে হত ভাবা যায না। নিজেব হৃদপিণ্ডেব কম্পন আবো বেড়ে গেল যখন মুখ তুলে দেখলাম সে মেযে অঞ্জলি। ও ততক্ষণে ফুটপাতে উঠে পড়েছে। একটু আগেকাব বিবর্ণ মৃত্যুভয ওব মুখ থেকে তখনও ভালো কবে মিলিযে যায নি। কিন্তু আমাকে এগিযে আসতে দেখে ওব মুখ ফেব বর্ণময হযে উঠল। হিতৈষী অভিভাবকেব সুবে বললাম, 'ওইভাবে বুঝি কেউ পথ চলে। আব একটু হলে কি কাণ্ডটা ঘাটাচ্ছিলেন বলুন তো ? নিন, উঠে আসুন।'

অঞ্জলি আবক্ত হযে বলল, 'না। আমি কাছেই যাব।'

বললাম, 'বেশ তো কাছেই যাবেন। গাড়িতো কেবল দূবে পৌঁছে দেওযাব জন্যই নয।'

অঞ্জলি একটু হাসল, 'আপাততঃ তাই তো দিচ্ছিলেন।'

একটু খোঁচা ছিল কথাটায। কিন্তু খোঁচাটা যেন লেগেছে আমাব মনেব মৌচাকে। ওর কথায কেবল অভিযোগ নেই অভিমানও আছে। বললাম, 'দোষটা বুঝি কেবল আমাবই। আসুন, ভিড জমছে।'

অঞ্জলি বলল, 'না, আজ থাক।'

সেদিনকাব মত বইল। আব কোন কথা হ'ল না। কিন্তু মৌনতাব বাঁধ ভাঙল। একটু একটু কবে বাঁধ ভাঙল কুণ্ঠাব, সংকোচেব।

অত তাড়াতাড়ি মোটবে না উঠলেও একতলা থেকে আমাদেব তেতলাব লাইব্রেবী ঘবে উঠে

আসতে অঞ্জলির দেরি হ'ল না।

বইয়ে ঠাসা কাচের আলমারীগুলির সামনে খানিকক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে অঞ্জলি একদিন বলল, 'এত ভালো লাগে আমার এসব ঘরে আসতে, এত লোভ হয়!'

লোভ! শাস্ত্রকারের ঘৃণিত এই তৃতীয় রিপুবাচক শব্দটিকে যে এমন মধুর করে উচ্চারণ করা যায়, এত অপূর্ব লাগে কারো কারো মুখে, তা আমি এই প্রথম অনুভব করলাম।

একটু হেসে বললাম, 'এ ধরনের লোভ তো ভালোই।'

অঞ্জলি আমার দিকে তাকাল, 'ভালো? কিন্তু সেই সঙ্গে আমার ভয়ও হয়, জানেন?'

একটু অবাক হয়ে তাকালাম। কিসের ভয়ের কথা বলছে অঞ্জলি? লোক-ভয়, অনিশ্চয়তার ভয়, ধরা দেওয়ার আগে সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করতে না পাবার ভয়, কোন্ ভয়ের ছায়ায় এমন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে ওর আয়ত সুন্দর দুটি চোখ, তা যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। ভীক শঙ্কিত বিহঙ্গীকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'আমি তো কোন ভয়ের কারণ দেখছিনে; কিসের ভয় বলুন তো?'

অঞ্জলি বলল, 'এত বই রয়েছে, এত জিনিস রয়েছে পড়বার, কিন্তু সময় নেই। ভয় হয় সময় বুঝি কোনদিন পাবও না।'

একটু চুপ করে রইলাম। কদিন ধরে অঞ্জলির মা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সংসারের সমস্ত কাজ ওকেই করতে হচ্ছে। সকাল থেকে দেখছিলাম বালতিতে করে জল টানছে অঞ্জলি, বাসন মাজছে, একটু বাদেই বসেছে ওর ভাই হাবুলের শার্টে সাবান মাখাতে।

কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি নেই। খানিক বাদেই কানে গেল নীচে থেকে হাবুল চেঁচিয়ে বাড়ি মাত করছে, 'ঈস এতক্ষণ হুঁস ছিল না, এখন বসেছে জামায় সাবান দিতে। বেশ তো, পারবে না আমাকে বলে দিলেই হত। আমি অন্য ব্যবস্থা করতাম।'

অঞ্জলি জবাব দিয়েছে, 'ব্যবস্থা তো এখনও করতে পার। কুঁড়ের বাদশা। এতই যদি দরকার ছিল, নিজের হাতে কেচে নিলেই পারতে জামাটি।'

হাবুল আরও জোরে চীৎকার করে উঠেছে, 'বেশ, বেশ। সরে যাও ওখান থেকে। আমার কোন জিনিস ধরতে হবে না। কোন জিনিস ছুঁতে হবে না তোমার। দরকার নেই আমার জামা কাপড়ে। মাসে মাসে রাশিকৃত শাড়ি, ব্লাউস আসুক তোমার, তাতেই হবে। মেয়ে কলেজে পড়েন তবে আর কি। তার জন্য আর কেউ খাবেও না, পরবেও না। অর্ধেক মা ষষ্ঠী, অর্ধেক বাবা গোষ্ঠী।'

ঘরের ভিতর থেকে ছেলেকে তেড়ে এসেছেন অঞ্জলির বাবা কালীমোহনবাবু, 'এই হারামজাদার ব্যাটা হারামজাদা। এত বাড় হয়েছে তোমার, তুমি আমার কাজের সমালোচনা করতে আসছ। লজ্জা করে না? দু' দু'বার ম্যাট্রিক ফেল করে ধর্মের ষাঁড়ের মত পাড়া চষে বেড়াচ্ছিস। লেখা নেই, পড়া নেই, কাজ নেই, কর্ম নেই, দিন রাত শুধু খাবি আর কোঁদল করবি। যা দূর হয়ে যা বাড়ি থেকে। একবেলাও আর জুটবে না আমার এখানে।'

কিন্তু এই অকৃতী, মূঢ় গোঁয়ার ছেলের ওপরেই মার মমত্ব সবচেয়ে বেশি।

ঘরের ভিতরে রোগশয্যা থেকে হাবুলের মা অভিমানে উদ্বেল হয়ে উঠেছেন, 'তাই দাও, ওকে একেবারেই তাড়িয়ে দাও তোমরা। দিনের মধ্যে হাজারবার সকলের লাথি ঝাঁটা খাওয়ার চাইতে ও শত্তুর আমার চোখের সুমুখ থেকে একেবারে দূর হয়ে যাক, সেই ভালো।' কিন্তু স্ত্রীর এই অযৌক্তিক সন্তান-বাৎসল্য কালীমোহনবাবুর সহ্য হয়নি, তিনি রুখে বলেছেন, 'তুমিই তো যত নষ্টের মূল। তুমিই তো আদর দিয়ে দিয়ে মাথাটা খেয়েছ ওর। তোমার জন্যই ও উচ্ছন্নে গেছে।'

অঞ্জলির মা এই অপবাদ সহ্য করতে রাজী হন নি, 'তা তো ঠিকই। ওই না হয় উচ্ছন্নে গেছে, কিন্তু তুমি? তুমি কোন স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি করেছ শুনি? তোমার মাথা তো আর কেউ খায় নি, না কি তাও আমি খেয়েছি?'

অঞ্জলির বাবা হঠাৎ যেন জবাব দিতে পারেন নি। কিন্তু একটু বাদেই দু'জনের তুমুল কলহ আরম্ভ হয়েছে। বাবা মাকে নিরস্ত করবার জন্য কাজ ফেলে ছুটে গেছে অঞ্জলি।

দৃশ্যটা মুহূর্তের জন্য ফের আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

কিন্তু বেশিক্ষণ ভেসে থাকতে পারল না। অঞ্জলির লজ্জা জড়িত স্বর আমার কানে এল—'কিন্তু

আপনার বোধ হয় ওসব সমস্যা নেই।'

মৃদু হাসল অঞ্জলি। সুন্দর শুভ্র ঝক্‌ঝকে দাঁতেব আভাস। উপমাটা পুবনো হলেও মুক্তার সঙ্গেই তুলনা করতে ইচ্ছা করে। আমার মন ফের মুক্তি পেল সংসারের সমস্ত তুচ্ছতার দৈন্য, কুশ্রীতার অগৌবব থেকে। অঞ্জলিব হাসি সব ঢাকতে পাবে, সব আড়াল করতে পারে ওর হাসিতে একতলা তেতলার সব ভেদ মিলিয়ে যায়।

বললাম, 'সময়েব সমস্যার কথা বলছেন তো ? নেই আবার ? নিশ্চয়ই আছে। পড়বাব সময় আমিও কি পাই ভাবেন ? পরীক্ষা আর প্রফেসবদের তাড়ায আপনার তবু কিছু না কিছু রোজ পড়তে হয়। কিন্তু আমাব তো আর সে বালাই নেই। পড়বাব মধ্যে কাগজের হেডিংটা দেখি। ব্যস। তারপর সারাদিন-রাতের মত অকলঙ্ক নিরক্ষরতা। অফিসের পর যখন ফিবি, তখন আব কিছু পড়বার মত উৎসাহ থাকে না। **I am a lost man**।' অঞ্জলি বলল, 'কেন, শুনেছি, আপনার নিজেবই তো অফিস।'

হেসে বললাম, 'অফিস নিজেবই হোক পবেরই হোক, সব এক। ফিস্‌ফিসেব জাযগা সেখানে নেই।'

ফিস্‌ফিস্ কথাটায় অঞ্জলির মুখে আবীবেব ছোপ লাগল। বলল,' আমি যাই এবাব।'

বললাম, 'বই নেবেন না ?'

অঞ্জলি বলল, 'কি বই নেব বলুন তো ?'

'কোন লাইব্রেরী-টাইব্রেরীতে গেলে আমি ভাবি ঘাবড়ে যাই। কি রেখে কি পড়ব ভেবে পাইনে। ইচ্ছা হয় সব পড়ি, যখন ভাবি তা কিছুতেই হবে না, তখন ইচ্ছা হয সব বাদ দিই।'

বললাম, 'আশ্চর্য, এ ব্যাপাবেও আপনাব সঙ্গে আমাব ভাবি মিল আছে দেখছি।'

অঞ্জলি হাসল, 'তাই নাকি ? বড ভয়ের কথা তো ?'

বললাম, 'সব কথাই যদি ভয়েব কথা হয, তা'হলে আব কথা হয কি ক'রে ?'

অঞ্জলি একটু চুপ কবে বইল। তাবপর আবাব ফেব বলল, 'কি বই নেব বলুন ?'

'আমি কি বলব ? যা খুশি নিন।'

অঞ্জলি একটু ইতস্তত ক'বে বলল, 'তা'হলে ওই বইটাই দিন। বীথি সেদিন বলছিল বইটাব কথা।'

বললাম, 'কোনটা ? **Body's Rapture** ? আপনি তো ভাবি সাঙ্ঘাতক মেযে দেখছি। ও বই আপনাকে দেওয়া কি ঠিক ?'

অঞ্জলি তরল স্ববে বলল, 'বাঃ, আপনিও কি গুরুমশাইগিবি শুরু কবলেন ?'

কিন্তু শুরু করলেও গুরুত্ব বেশি দিন রাখতে পারলাম না। নিজের অজ্ঞাতে কি ক'বে যে এই মেয়েটির সামনে নিতান্ত লঘু হ'যে পড়লাম তাই ভাবি। অফিসে বেশির ভাগ লোকই আমাব বয়োজ্যেষ্ঠ। কিন্তু তাঁদেব ভাবভঙ্গী সব কনিষ্ঠেব মত। প্রথম প্রথম কেমন যেন অস্বস্তিই লাগত। আমাদের অন্যতম ডিবেক্টর ষাট বছরের বুড়ো মিঃ খাসনবীশ পর্যন্ত যখন আমাব সঙ্গে পরম সমীহের সঙ্গে কথা বলতেন, আমার প্রত্যেকটি মত অভ্রান্ত ব'লে স্বীকাব কবতেন, তখন সংশয হত—আমি নিজেও বুঝি ষাট পার হ'যে গেছি। হযত আযনাব সামনে দাঁড়ালে এক্ষুনি চোখে পড়বে আমাব চুল সব সাদা, দাঁতের একটিও অবশিষ্ট নেই। কিন্তু মাস কযেক যেতে না যেতেই আমাব অস্বস্তি কাটল। এই সম্মান, এই শ্রদ্ধা, এই ভয় তো আমাকে নয়, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইনভেস্টমেন্টেব জেনারেল ম্যানেজাবকে। অর্থগৌরবে, পদমর্যাদায় এসব তার ন্যায্য প্রাপ্য—অফিসের ডিসিপ্লিন বক্ষার জন্য একান্ত অপরিহার্য। তাই চেম্বারে বসে যদি কোন কেরানীর একটু হাসির শব্দ কানে আসে, যদি চোখে পড়ে মিঃ খাসনবীশ কম কাজ কবছেন, স্বস্তি পাইনে, কেমন যেন আশঙ্কা হয় অফিসে ডিসিপ্লিনের ত্রুটি ঘটল। গাড়ি অফিসের দোর গোড়ায় থামবার সঙ্গে সঙ্গে ওজন ভারি হ'য়ে যায়, মুখের ভাব আপনিই বদলায়, চেম্বারে ঢুকলে খাস বেযারা নীলাম্বর আমার গায়েব কোট খুলে নেয় ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটি অদৃশ্য আবদালী আমার স্বভাবের সঙ্গে লৌহবর্ম এঁটে দিতে কসুর করে না।

সেই ভাবি সীসাব বর্মটিও কৌতুকী মীনধ্বজেব ছোঁযায খসে পডল। তাকে বেযাবা বলতে ভবসা হয না. নিজেই সেই মহাপ্রভুব বেযাবা হ'যে আছি কিন্তু আডালে বেযাডা ব'লে গাল পাডতে ভাবি ইচ্ছা কবে। কি ক'বে এমন হ'ল। অঞ্জলিব সঙ্গে আমাব বযসেব ব্যবধান, রুচিব ব্যবধান, বিদ্যাবুদ্ধিব ব্যবধান এমন ভাবে ভুলে গেলাম কি ক'বে। উনিশ কুডি বছবেব বি এ ক্লাসেব একটি ছাত্রেব সঙ্গে কেউ যদি আমাকে দু'মিনিট আলাপ কবতে বলে, আমি নিশ্চযই ক্লান্তি বোধ কবব। কিন্তু অঞ্জলিব সঙ্গে ঘণ্টাব পব ঘণ্টা কি ভাবে কেটে যায টেবও পাইনে। কিংবা ভুল বললাম, টেব পাব না কেন, নিশ্চযই পাই, প্রতিটি মুহূর্তকে সমগ্র অস্তিত্ব দিযে অনুভব কবি। কি বলে অঞ্জলি, তা শুনতে ভুলে গিযে ও কেমন ক'বে বলে তাই দেখি। ওব হাসিব আভা লাগে কানেব দুলে, চিবুকেব তিলটি স্পন্দিত হয। বেহালাব এক নির্জন মজা পুকুবেব ধাবে ঘাসেব ওপব পা ছডিযে বসে হঠাৎ অঞ্জলি মুখ ফিবিযে তাকায, মধুব গঞ্জনা গুঞ্জিত হ'তে শুনি ওব কণ্ঠে, 'যাও, তুমি কিচ্ছু শুনছ না। তোমাব মন নেই।'

হেসে বলি. 'আছে। মণি হ'যে চোখেব মধ্যে স্থান নিযেছ। ভালো ক'বে চেযে দেখ।'

কিন্তু আমাব দিকে চেযে দেখে না অঞ্জলি। পানাভবা পুকুবেব দিকে চুপ কবে চেযে থাকে, তাবপব আস্তে আস্তে বলে, 'দেখ আমাব ভাবি ভয হয।'

বলি, 'ভয তো তোমাব সেই গোডা থেকেই। সেই যেদিন মোটব-চাপা পডতে পডতে একটুব জন্য বেঁচে গিযেছিলে।'

অঞ্জলি বলল 'এখন ভাবি, বেঁচে না গেলেই ভালো হত, বেঁচেই তো মবলাম।'

একটু চুপ ক'বে বইলাম। আশাতীতভাবে অতি অল্প দিনেই অঞ্জলি কাছে এসেছে। কিন্তু ঠিক যেন আসেনি। ঠিক ধবা দেযনি। দ্বিধায, কুণ্ঠায, শঙ্কায, সঙ্কোচে পানাভবা পুকুবেব মতই মন ওব আচ্ছন্ন। আমি জানি ওব ভযটা কিসেব ভয আমাব ঐশ্বর্যকে। এই ঐশ্বর্যে ওব বিশ্বাস নেই, কিন্তু স্পৃহা আছে। আমাব বাডি, গাডি, আসবাব-আডম্বব ওকে যত দূব ঠেলেছে তত কাছে টেনেছে। আমি তো দেখেছি আমাদেব ডলি শুচিবা যে সব সামান্য বস্তুতে কিছুমাত্র ঔৎসুক্য বোধ কবত না, তাতেও ওব কি কৌতূহল, কি আনন্দ। বৌদিব প্রত্যেকখানি শাডি আব গযনাব সঙ্গে, বাডিব আসবাবপত্রে, গাডিতে ক'বে সদলবলে পিকনিক কবতে যাওযায অঞ্জলিব বিস্ময জডিযে আছে। কিন্তু সেই বিস্ময আব উন্মুখতাকে ও প্রকাশ কবতে চায না। অতি সন্তর্পণে চাপা দিযে বাখতে চায। তবুও যদি কোন ফাঁকে তা একটু প্রকাশ হ'যে পডে, ওব লজ্জা আব অনুশোচনাব সীমা থাকে না। এসব আমি লক্ষ্য কবেছি। কিন্তু তবু অঞ্জলি অঞ্জলিই। ওব কৌতূহল, স্পৃহা আব আনন্দে ওব খুশি হওযায আমাব সমস্ত বৈভব যে ধন্য হযেছে, সার্থক হযেছে, তাও তো অঞ্জলিব কাছে চাপা থাকেনি। তবু কেন ওব ভয, কিসেব ওব আশঙ্কা। অন্য দিনেব মত সেদিনও জিজ্ঞেস কবলাম কথাটা।

ও বলল, 'আমাদেব মিল কি সম্ভব? তুমি কি সত্যিই ভালোবাসতে পাব আমাকে?'

বললাম, 'কেন পাবিনে? তুমি যা খাও, আমি তা খাইনে, তুমি যা পব, আমি তা পবিনে, তোমাকে বাসে ট্রামে কলেজ কবতে হয আমাব বুইক আছে, এই জন্যে তোমাকে ভালোবাসতে পাবিনে ভাবছ? নাকি এছাডা আব কোন ব্যবধান আছে তোমাব আমাব মধ্যে?'

অঞ্জলি বলল. 'কিন্তু এ ব্যবধানগুলি কি কম?'

বললাম, 'অনেক কম আব অনেক ঠুনকো। এ ব্যবধান গাযেব চামডা নয, গাযেব পোশাক। যে কোন মুহূর্তে এটা খুলে ফেলা যায।'

অঞ্জলি আমাব দিকে তাকিযে একটু হাসল, 'ফেলা যায? ফেলতে তুমি পাব?'

একটু চুপ ক'বে থেকে বললাম, 'পাবি বই কি। কিন্তু আমাব সেই পাবা তোমাব পাবাব ওপব নির্ভব কবে। তুমি যদি তেমন ক'বে বলাতে পাব, তুমি যদি তেমন ক'বে খোলাতে পাব—আমি না পাবি কি? আমাদেব ব্যবধান তো অতি তুচ্ছ ব্যবধান, কত বাজ-ঐশ্বর্য মানুষ প্রেমেব জন্য ছেডে এসেছে, তাতো কেবল কাব্যে নেই, ইতিহাসেও আছে। কিন্তু ছাডতেই বা হবে কেন অঞ্জু। আমাব সম্পদ কি তোমাবও হতে পাবে না?'

অঞ্জলি একটু চুপ কবে থেকে বলল, 'কিন্তু তোমাব দাদা বউদি কি বাজী হবেন ?'

বললাম, 'না বাজী হওযাব তো কোন কাবণ নেই। ওঁদেব কাছে সামাজিক বাধাটাই তো সবচেযে বড বাধা। তেমন সামান্য কোন বাধাও তো দেখছিনে। দুজনেই বামুন। এমন কি কুলীন মৌলিকেব পার্থক্যটুকু পর্যন্ত নেই। আমি ভটচায, তুমি চক্রবর্তী, দু'পুরুষ আগে দু'জনেব বাবা-দাদাই হয়তো যজমানী কবতেন।'

অঞ্জলি বলল, 'কিন্তু—

বললাম, 'ফেব কিন্তু ? তোমাব কিন্তু-পবন্তুব কি শেষ হবে না ?'

অঞ্জলি একটু হাসল, 'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?'

না, ব্যস্ত আমি হইনি, কতবাব ইচ্ছে হযেছে ওব ছোট সুন্দব নবম হাতখানা নিজেব মুঠিব ভিতরে ভবে বাখি, কতবাব ইচ্ছে হযেছে ওই পবিপূর্ণ পেলব দুটি ওষ্ঠাধবেব স্বাদে বুভুক্ষু অন্তব ভবে নিই। কিন্তু সেই উদগ্র বাসনাকে সংযত কববাব শিক্ষা আব সামর্থ্য আমাব আছে। বন্ধুবা হযত শুনলে ঠাট্টা কববে, এসব আমাব দুর্বল ভীরুতা। কিন্তু তা নয। আব একটি ভীরু মেযেব ভযকে আমি ভালোবেসেছি, সম্মান কবেছি। আমি ব্যস্ত হব না, ভুল বুঝবাব কোন অবকাশ দেব না ওকে। মনে কবতে দেব না আমি ওব অবস্থাব বিন্দুমাত্র সুযোগ নিচ্ছি, জাহিব কবছি সম্পদেব জোব। আমাদেব সমাজেব কোন মেযে হলে আমি দেহকে এমন ভয কবতাম না, শুচিতাব মিথ্যা মোহকে প্রশ্রয দিতাম না, কিন্তু এখানে দিতে হবে। ও বুঝুক, আমি কোন সুযোগেব লোভী নই, হৃদযেব সঙ্গে হৃদযেব সংযোগই আমাব কাম্য। ওব মনেব সংশয ঘুচুক, দ্বিধা দূব হোক, ততদিন আমি অপেক্ষা কবব। সামাজিক অনুমোদন ছাডা ও যদি বল না পায, পুবোহিতেব অশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চাবণ ছাডা ওব মনে যদি পবিপূর্ণ নির্ভবতাব আশ্বাস না আসে, তাই হবে।

তাবপব একদিন বললাম বউদিকে। বউদি কিছুক্ষণ অবাক হযে তাকিযে থেকে বললেন, বল কি ঠাকুবপো, একতলাব ওই অঞ্জলিকে বিযে কববে তুমি ? এত ভালো ভালো সম্বন্ধ এসেছে কত ভালো ভালো ঘব থেকে তখন কিছুতে তোমাকে টলানো যাযনি, আব এখন কি না ওই পচা শামুকে তোমাব পা কাটল ?

উত্তেজিত হযে বললাম 'পচা শামুক তুমি কাকে বলছ বউদি ? অঞ্জলিবা ভিন্ন জাত নয, অবশ্য তা-ও যদি হত, আমাকে আটকাতে পাবত না।'

বউদি অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে হাসলেন 'ও বাবা, এবই মধ্যে এত ? এই তো মাস কযেকেব মাত্র জানা শোনা তাবই মধ্যে—

বললাম, 'হ্যাঁ, তাবই মধ্যেই। পুবোহিত মন্ত্র পডাবাব আগে তোমাব আব দাদাব মধ্যে তো কযেক মিনিটেব আলাপও ছিল না, তবু তো জানতে শুনতে বেশি দেবি হযনি।'

কিন্তু বউদি কাব্যেব ধাবেও ঘেঁষলেন না—পবম বস্তুনিষ্ঠাব পবিচয দিযে বললেন, 'আমি ভেবে অবাক হচ্ছি ঠাকুবপো, অঞ্জলিব মধ্যে তুমি কি দেখলে ওব চেযে ঢেব ফর্সা মেযে কি আমাদেব সমাজে নেই, কি ঢেব শিক্ষিত ? বায বাহাদুব শশাঙ্ক মুখুয্যেব মেযে মিনতি তো এম এ পাশ কবেছে। একটু কম বযেসী মেযেই যদি চাও, তাও তো যথেষ্ট আছে।'

বললাম, 'তা আছে, কিন্তু অঞ্জলি যথেষ্ট নেই, সে একটিই।'

বউদি বাগ ক'বে বললেন, তোমাব কথা আমি বুঝতে পাবিনে ঠাকুবপো।'

আমি বাগ কবলাম না, হেসে বললাম, 'তোমাকে বোঝাতেই কি আমি পাবি বউদি ?'

কিন্তু দাদাকে বোঝাতে হল, তিনি বুঝতে চাইলেন। দাদা যে আমাব চেযে বাব বছবেব বড, ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট ইনভেস্টমেন্টেব জেনাবেল ম্যানেজাব হযে তা ভুলেই গিযেছিলাম, তাঁব মুখ দেখে আবাব মনে পডল।

দাদা তাঁব শোযাব ঘবে আমাকে ডেকে পাঠিযে প্রথমে খানিক্ষণ বৈষযিক আলোচনা কবলেন, তাবপর হঠাৎ এক সময মৃদু হেসে মিষ্টি কবে বললেন, 'তোমার বউদিব সঙ্গে বুঝি সেদিন খুব ঠাট্টা করেছিলে, কিন্তু ও ভেবেছে সত্যি। সেই থেকে আমাকে যখন তখন জ্বালাতন কবে মাবছে। আগে আগে তোমাব বউদির বেশ বসিকতা বোধ ছিল, ঠাট্টা তামাসাটা বুঝত, কিন্তু আজকাল সব

গেছে।'

দাদা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন। মনে হল সে নিঃশ্বাস শুধু নাকের নয়, অন্তরেরও। একটু দূরে মেঝেয় বসে বউদি পান সাজছিলেন, একবার কষ্ট ভঙ্গিতে মাথা তুললেন, কিন্তু দাদার চোখের দিকে তাকিয়ে ফের পানের বাটায় চোখ রাখলেন, আর কোন কথা বললেন না।

কিন্তু আমি কথা বলতেই এসেছি। স্পষ্ট কথা সহজ ভাষায় বলতে চাই, ভূমিকা বাড়াতে ইচ্ছা নেই আমার। তবু একটু গুছিয়ে নিয়ে বললাম, 'অনর্থক বউদির দোষ দিচ্ছেন। আমার তো মনে হয়, বউদির রসবোধ ঠিক আগেকার মতই আছে, একটুও বদলায়নি। এখনো সপ্তাহে দুটি সিনেমা, আর তিনখানা ডিটেকটিভ বই ওঁর বাঁধা, ব্রীজ খেলায় চুরিতে আমি এখনো ওঁর সঙ্গে পারিনে।'

আমি একটু হাসলাম

দাদা হাসলেন না। আমার চাপল্যে বেশ একটু বিরক্ত হলেন, তারপর একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন, 'একটি কথা বলবার জন্য তোমাকে ডেকেছি প্রবীর। কথাটা না বলতে হলেই খুশি হতাম। তুমি আমার চেয়েও উচ্চশিক্ষিত, হয়তো আমার চেয়েও বুদ্ধিমান। তোমার জন্য গর্বের আমার শেষ নেই। কিন্তু তোমার নামে এসব যা তা শুনতে হবে, আমি আশা করিনি। প্রশান্ত [illegible] ভাইকে কেউ নিন্দা করুক, তার চরিত্রের দুর্বলতা নিয়ে হাসাহাসি করুক, তা আমি মোটেই সহ্য করব না।'

মুহূর্তকাল স্তম্ভিত হয়ে থেকে বললাম, আমিও করব না। আপনার এতখানি বিচলিত হওয়ার কোন কারণই ঘটেনি।'

দাদা রূঢ়স্বরে বললেন, 'ঘটেনি, তুমি বললেই তো হবে না। এ বাড়ির ঠাকুর-চাকরের পর্যন্ত দুটো করে চোখ আছে দুটো করে কান আছে। যতক্ষণ ব্যাপারটা তোমাদের ব্যক্তিগত আলাপ-পরিচয় মাত্র ছিল, আমি কোন কথা বলিনি। কিন্তু এখন সব সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এখন বিষয়টা শুধু ব্যক্তিগত নয়, পরিবারগত সমাজগত, আমাকে বাধা দিতেই হবে।'

বললাম, কিন্তু আমি যদি অঞ্জলিকে রীতিমত সমাজ সম্মতভাবে বিয়ে করতে চাই, তাতে আপনার বাধা দেওয়ার প্রশ্ন কিসে ওঠে?

দাদা আমার মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললেন 'বিয়ে করতে চাও? তুমি তা হলে মন একেবারে ঠিক করে ফেলেছ? ওদের সঙ্গে আমাদের মিলবে?

বললাম, 'না মেলার তো কোন কারণ দেখিনে। ওঁরা ধনী নন, এই যদি আপনার আপত্তির কারণ হয়, তা হলে যুদ্ধের আগে তাঁয়েমশাইরাও তো সাধারণ মধ্যবিত্তই ছিলেন।'

দাদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বেশ আমার আর কিছু বলবার নেই। কর তোমার যা খুশি।'

দু'তিনদিনের মধ্যে দাদা আমার সঙ্গে আর কোন কথা বললেন না। বউদিও অত্যন্ত মিতভাষিণী হয়ে গেলেন। তবু সংসার যথারীতি চলতে লাগল। কিন্তু একটু লক্ষ্য করেই বুঝতে পারলাম ঠিক যথারীতি যেন থাকেনি, বেশ খানিকটা রীতিভঙ্গ হয়েছে।

কাজ কর্মের ফাঁকে অঞ্জলি মাঝে মাঝে ওপরে আসত। পিসীমাকে কীর্তন শোনাত, বউদির তাসের আসরেও মাঝে মাঝে দেখা যেত ওকে। কিন্তু ক'দিন অঞ্জলি আর ওপরে এল না ওর ছোট বোনেরা এসে শাড়ি শুকোতে দিয়ে যায়। অঞ্জলির মা একটি মৃত সন্তান প্রসব করে একেবারেই শয্যা নিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আমার খুব কমই দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু প্রায় নিয়মিত দেখা হ'ত কালীমোহনবাবুর সঙ্গে সামনে পড়লেই তিনি স্মিতমুখে কুশল প্রশ্ন করতেন, 'এই যে, ভালো?'

ক্রিয়াপদটা উহ্য রাখতেন কালীমোহনবাবু। মেয়ের প্রেমাস্পদকে ঠিক আপনি বলবেন, কি তুমি বলবেন, যেন স্থির করতে পারতেন না। ক্রিয়াপদটা হয় উহ্য থাকত, না হয় থাকত ভাববাচ্যে 'আফিসে বেরুনো হচ্ছে বুঝি?' আমি মৃদু হেসে ঘাড় নাড়তাম। হয়ত আরও ঘনিষ্ঠ হওয়া উচিত ছিল ওঁদের সঙ্গে। কিন্তু আমি তেমন মিশুক প্রকৃতির নই। আকস্মিক আত্মীয় সম্বোধনে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠবার ক্ষমতা আমার স্বভাবে নেই। তবু একাধিক দিন গিয়েছি কালীমোহনবাবুদের ঘরে। খাবার না খেলেও চা খেয়েছি। অঞ্জলির ছোট বোনদের সঙ্গে আলাপ করেছি। অঞ্জলির মা নানা

প্রসঙ্গে তার কথা তুলেছেন। ওর যা রূপ, ওর যা রুচি, বিদ্যা-বুদ্ধি, তাতে বড়লোকের ঘরেই ওর জন্মান উচিত ছিল ; তা হলে হয়ত বড়লোকের ঘরে পড়তে পারত। অঞ্জলির অদৃষ্ট, কিন্তু মেয়েকে বড়লোকের ঘরের যোগ্য করে তুলতে অঞ্জলির বাবা-মা'র নাকি চেষ্টার ত্রুটি করেননি। ছেলেটার তো কিছু হল না, কিন্তু সেই দুঃখে মেয়েকে গো-মূর্খ করে রাখেননি। কিংবা নানা জনের নানা নিন্দা-মন্দ শুনেও কোন অযোগ্য পাত্রের হাতে সঁপে দেননি। নিজেরা কষ্টে থেকেও মেয়ের সাধ-আহ্লাদ, মরজি মেনে চলেছেন, তাকে সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়েছেন লেখা-পড়ার। কলেজেই যেন আধা মাইনে। কিন্তু আরো তো খরচ আছে। একটি ছেলেকে পড়ানোর চাইতে একটি মেয়েকে পড়াবার খবচ চর্তুগুণ বেশি। সেই খরচে কার্পণ্য করেননি অঞ্জলির বাবা-মা। এখন মেয়েব ভাগ্য। তবে এইটুকু তাঁরা বলতে পারেন যে অঞ্জলিকে যে নেবে সে ঠকবে না। ওকে গরীবের ঘরেও যেমন মানাবে, বাজার ঘরেও তেমনি।

তা মানাবে। কিন্তু ভাবী শ্বশুর শাশুড়ী হিসাবে অঞ্জলির বাবা-মাকে আমার মনের সঙ্গে ঠিক যেন সাজাতে পারিনি। কোথায় যেন বেধেছে। নিজের এই সঙ্কীর্ণতাকে শাসন করতে অবশ্য আমি ছাড়িনি। ছিঃ,আমিও কি মানুষকে কেবল তার আর্থিক সঙ্গতি দিয়েই বিচার করব ? আব কিছু দেখব না ? কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি কল্পনাও মনে মনে আপনা থেকেই যেন গড়ে উঠেছে। অঞ্জলিব গোত্র বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে ওর বাবা-মাও কি বদলাবেন না ? ওঁরা কি এই একতলার ঘরেই থাকবেন ? আমরা কসবার বাড়িতে উঠে যাওয়াব সঙ্গে সঙ্গে এ বাড়িব দোতলার ঘরগুলিও ওঁদেরই ছেড়ে দেব। অঞ্জলির বাবাকে ছাড়িয়ে আনব ন্যাসনাল স্টোর্স থেকে। না, নিজেব অফিসে ওঁকে নেব না, সেটা আমার নিজেরই খারাপ লাগবে ; তবে স্বাধীনভাবে কালীমোহনবাবু যাতে একটা ব্যবসা-বাণিজ্য কবতে পারেন তার একটা বন্দোবস্ত কবতে হবে বইকি।

কালীমোহনবাবুর শিষ্ট ভাষণের জবাবে আমিও তাই মিষ্টি করে হেসেছি, হাতে সময় থাকলে জিজ্ঞাসা করেছি তাঁর কাজকর্মের কথা, এক-আধদিন যোগ দিয়েছি প্রাকৃতিক আবহাওযা আব রাজনৈতিক পরিস্থিতিব আলোচনায। কিন্তু হঠাৎ দেখলাম কালীমোহনবাবুও নির্বাক গম্ভীব হয়ে গেছেন। তাঁর সেই ভাব-বাচ্য পর্যন্ত উহ্য।

বুঝতে পারলাম কিছু একটা হয়েছে। দাদার উপর রাগ হল। তিনিই হয়তো আড়ালে ডেকে কিছু বলেছেন কালীমোহনবাবুকে। কিন্তু ভালো ক'রে খোঁজ নিয়ে জানলাম দাদা নিজে কিছু বলতে যাননি। কালীমোহনবাবু বাজারে যাচ্ছিলেন, তাঁকে ফিবিয়ে এনে পথের মধ্যে আর একজন ভদ্রলোকের সামনে সরকার মশাই ভাড়ার তাগিদ দিয়েছেন, বলেছেন, এ-মাস ধ'রে এই তিন মাসেব ভাড়া পড়ল বাকি। এমন হলে সরকার মশাই আর পারবেন কি করে। বেশ তো এত ভাড়া দিতে যদি কষ্টই হয় কালীমোহনবাবুর সরকার মশাইব জানা অনেক বস্তিটস্তি আছে। বস্তি বলে খারাপ কিছু নয়। দিব্যি খটখটে বাড়ি। বেশ আলো-বাতাসও আছে। অথচ ভাড়াও কম। অনেক ভদ্রলোক স্ত্রী-পুত্র নিয়ে দিব্যি সেখানে বাস কবছেন।

কালীমোহনবাবু কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হযে থেকে আমতা আমতা ক'রে নাকি জবাব দিয়েছেন, 'এতদিন তো ভাড়া বাকি পড়েনি সরকার মশাই। ঠিক মাসের দোসরা তারিখেই দিয়েছি। কিন্তু এই ক'মাস ধবে বোগীর পিছনে কি বকম খরচটাই হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন তো। গোড়ার দিকে বাঁচবার তো আশাই ছিল না। বেশ,এই সপ্তাহের মধ্যে আপনার সব ভাড়া মিটিয়ে দিতে পারলেই তো হল।'

সরকার মশাই হেসে বলেছেন,'নিশ্চয়ই, ভাড়াটা মিটিয়ে দিলে আর কথা থাকে কি।'

কালীমোহনবাবুকে ভাড়ার তাগিদ দেওয়ার জন্য দাদার উপর আমি অসন্তুষ্ট হলাম। কিন্তু অঞ্জলির বাবার ব্যবহারেও খুশি হতে পারলাম না। আমাদের সম্বন্ধ যে কি ডেলিকেট তা তো তাঁর অজানা নেই, তবু কেন তিনি বাকি রাখতে গেলেন ভাড়া। আমি হ'লে তো পারতাম না। যেমন করেই হোক এক্ষেত্রে বাড়িওয়ালার ভাড়া মিটাতাম আগে।

কালীমোহনবাবু চুপ ক'রে গেলেও তাঁর স্ত্রী সেদিন ডেকে পাঠালেন। সন্ধ্যার পর অফিস থেকে ফিরে ইজিচেয়ারটিতে সবে গা এলিয়ে দিয়েছি অঞ্জলির ছোট বোন রিন্টু এসে বলল, 'মা আপনাকে

ডাকছেন প্রবীবদা।'

এমন সবাসবি আমন্ত্রণ এব আগে তিনি কোনদিন পাঠাননি। একটু অবাকই হলাম, বললাম 'আচ্ছা যাচ্ছি।'

মেঝেয বিছানা পেতে শুযেছিলেন অঞ্জলিব মা, অঞ্জলি ব্যস্ত ছিল বান্নাব আযোজনে, কালীমোহনবাবু তখনো ফেবেননি। অঞ্জলিব মা বললেন, 'এসো বাবা, ও বিণ্টু, জলচৌকিটা এনে দে এখানে, কি যে কবিস তোবা।'

বললাম, 'জলচৌকিব দবকাব নেই। আপনাব শবীব কেমন আছে আজকাল।'

তিনি একটু হাসলেন, বললেন, 'ভালোই আছি।' মাথাব কাছে দাগ কাটা মিকশ্চাবেব শিশি। খোসাব সঙ্গে কযেক বোযা কমলালেবু। হাসিটুকু খুব স্বাভাবিক দেখাল না। তবু মনে হল হাসিব ভঙ্গিতে কোথায যেন একটু মিল আছে অঞ্জলিব সঙ্গে।

তিনি আবাব বললেন, 'কই জলচৌকিটা দিলিনে তোবা? প্রবীব যে দাঁড়িযে বইল।'

সম্বোধন নিযে কালীমোহনবাবুব যে সমস্যা আছে তাঁব স্ত্রীব তা নেই। আমাব নাম থেকে সহজেই বাবু তিনি ছেঁটে ফেলেছেন।

বিণ্টু বলল, 'কি ক'বে আনব মা, দিদি যে সেটায চেপে বসে বান্না কবছে।'

হঠাৎ খিল খিল ক'বে হেসে উঠল বিণ্টু।

অঞ্জলিব মা বললেন, 'হাসছিস কেন অত। বাঁধতে আবাব জলচৌকি লাগে নাকি, মেমসাহেব হযেছেন মেযে। আসনটা বেব ক'বে দে।'

কিন্তু আসন বেব কববাব আগেই অঞ্জলি চৌকিখানা নিযে এসে পেতে দিতে দিতে বলল, 'বিণ্টুটা বড ফাজিল হযেছে মা, ওকে শাসন কবা দবকাব। জলচৌকিতো বাবান্দায অমনিই পডে ছিল, গামি পেতে বসব কেন।'

অঞ্জলিব মা বললেন 'কোথায গেল পাজী মেযেটা, হতচ্ছাডীকে দেখাচ্ছি আমি।'

কিন্তু বিণ্টুব আব দেখা নেই ফ্রক পবা ন' বছবেব মেযেব দুষ্টুমিতে আমি মনে মনে হাসলাম।

পবমুহূর্তেই পবিবেশটা ফেব গাম্ভীর্যে ভবে উঠল। অঞ্জলিব মা বললেন, 'তোমাকে একটা কথা বলবাব জন্য ডেকেছি বাবা। তোমাব পিসীমা আজ আমাদেব অপমান কবেছেন।'

বললাম, 'অপমান কবেছেন? কেন?

'কেন তা তুমি তো সবচেযে ভাল জানো।'

আমি একটু চুপ ক'বে বইলাম।

তিনি বলতে লাগলেন, 'শিক্ষিত ছেলে মেযেবা একজন আব একজনেব সঙ্গে মিশবে, তাতে দোষেব কি আছে, আমি তাই ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম তাদেব বযস হযেছে তাবা লেখাপডা শিখেছে, তাদেব ভালোমন্দ তাবা বুঝবে। কিন্তু দেখলাম, তাবা এখনও তা বুঝতে শেখেনি, তুমি নাকি বলেছ—'

বললাম 'হ্যাঁ বলেছি। আপনাদেবও তাই বলি। হযত আগেই বলা উচিত ছিল। অঞ্জলিকে—অঞ্জলিকে আমি বিযে কবব ঠিক কবেছি।'

অঞ্জলিব মা একটু চুপ ক'বে থেকে বললেন, 'কিন্তু তোমাব পিসীমা, দাদা বউদি—'

বললাম, 'তাঁদেব মত নেই। কিন্তু বিযে তো আব তাঁবা কববেন না।

অঞ্জলিব মা ফেব একটু কাল চুপ ক'বে বইলেন, তাবপব বললেন, 'তাব চেযে আমবা এখান থেকে উঠে যাই সেই ভালো। আমি ওঁকেও তাই বলেছি। বলেছি সবকা'ব মশাইকে সব ভাডা মিটিযে দিযে—'

হঠাৎ আমাব মুখ থেকে বেবিযে গেল, 'হ্যাঁ ভাডা বাকি বাখাটা কালীমোহনবাবুব সঙ্গত হযনি। তাব চেযে আমাকে যদি জানাতেন—'

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হযে বইলেন অঞ্জলিব মা, তাবপব বোগশীর্ণ ঠোঁটে ফেব একটু হাসলেন, 'তোমাব তো এসব জানবাব কথা না বাবা। আমাকে জানাতে পাবতেন, আমাকেই তিনি জানাননি। যতদিন টাকা পযসাব ভাব আমাব হাতে ছিল, আমি বেশ চালিযে নিযেছি। মাসেব মাইনে এনে হাতে

দেওযাব সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘব ভাড়াব টাকাটা আলাদা ক'বে বেখেছি। মাসেব শেষদিকে কষ্ট হযেছে সংসাবেব কিন্তু মান-সম্মান নিযে এমন টান পড়েনি।'

আমি বললাম, 'না না মান-সম্মানেব কোন প্রশ্ন—'

অঞ্জলিব মা বললেন, 'কিন্তু এখন তো আব পুবো মাইনে আনতে পাবেন না বাড়িতে, আমাব হাতেও দেন না, নিজেই সব দেখেন। তাব ফল হযেছে এই। তবু আমি ভাড়াব কথা জিজ্ঞাসা কবেছি। উনি বলেছেন সব দেওযা হযে গেছে। আগে তো এমন ছিলেন না উনি, মিথ্যা বলতেন না আমাব কাছে—'

জল বেরুলো অঞ্জলিব মা'ব চোখে।

আমি ভাবি অপ্রতিভ হলাম, ভাবি খাবাপ লাগতে লাগল। ভাড়ার কথাটা না পাড়াই ভালো ছিল। হঠাৎ অঞ্জলিব মা বললেন, 'অঞ্জু, চা দিলিনে প্রবীবকে ?'

বললাম, 'না না চা থাক।'

অঞ্জলিব মা স্নিগ্ধ বাৎসল্যে বললেন, 'থাকবে কেন, খাও একটু। শুধু চা-ই তো। এখানে নয অঞ্জলি, পাশেব ঘবে, তোদেব পড়বাব ঘবে নিযে দে। এখানে কত ওষুধ পথ্যেব গন্ধ, এখানে কি মানুষ কিছু খেতে পাবে। নিঃশ্বাস নেওযাই শক্ত—'

পাশেব ঘবে ঢোকাব সঙ্গে সঙ্গেই মিণ্টু বিণ্টুবা বেবিযে এল। বইযে খাতায ছোট টেবিলটুকু ভবে বযেছে। আমাব লাইব্রেবী থেকে চেযে নেওযা খান কযেক বইও বযেছে তাব মধ্যে। টলস্টযেব মোটা 'ওযাব এণ্ড পীস' খানাব ভিতব থেকে নীলবঙেব একটি ট্রামেব টিকিট উঁকি দিচ্ছে। বইটা অনেকদিন এনেছে অঞ্জলি, এখনো শেষ কবতে পাবেনি।

একটু বাদে চাযেব কাপ এনে অঞ্জলি টেবিলেব ওপব নামিযে বেখে একটু সবে দাঁড়াল। এই মাত্র উনুনেব কাছ থেকে উঠে এসেছে। আগুনেব আঁচ লেগেছে মুখে, কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। আটপৌবে কালোপেড়ে শাড়িখানাব আঁচল কোমবে জড়ানো। আঙুলগুলিতে ঈষৎ হলুদেব ছোপ। তবু এই বেশে ভাবি সুন্দব মনে হল অঞ্জলিকে, ভাবি নতুন লাগল। আব কোন মেযেব সুগৌব ছোট কপালে ঘামেব বিন্দুও যে এমন নযনাভিবাম হয, তা আমি এই প্রথম লক্ষ্য কবলাম।

অঞ্জলি বলল, চা নাও তোমাব।'

বললাম, নিচ্ছি। শোন, এমন ক'বে পালিযে বযেছ কেন।

অঞ্জলি মৃদু হাসল, 'পালিযে আব থাকতে পাবলাম কই।'

বললাম, 'পাববেও না। শুনেছ বোধহয কথাটা আমি সবাইকেই বলেছি।'

অঞ্জলি বলল, না বলাই বোধহয ভালো ছিল। এই সামান্য ব্যাপাব নিযে—'

বললাম, 'সামান্য ব্যাপাব! জীবনেব এত বড় ব্যাপাবটাকে তুমি সামান্য ব্যাপাব বল ?'

অঞ্জলি নীববে মুখ নীচু কবল মনে হল সে মুখ স্মিতহাসিতে উদ্ভাসিত। কোন কিছুকে সামান্য বললেই কি তা সামান্য হযে যায।

হঠাৎ কি হল। ওব হাতখানা নিজেব মুঠিব মধ্যে চেপে ধবলাম আমি। মুহূর্তকাল সেই হাত আমাব হাতেব মধ্যে ঘামতে লাগল কাঁপতে লাগল।

অঞ্জলি বলল, 'ছাড়।'

বললাম, 'না, ছাড়ব না। সকলেব কাছে বলেছি, তোমাব কাছে আবও স্পষ্ট ক'বে ঘোষণা ক'বতে চাই। সব দ্বিধা, সঙ্কোচ, সংশযেব আজ শেষ হযে যাক।' বলে আমাব হাতেব হীবাব আংটিটি অঞ্জলিব আঙুলে জোব ক'বে পবিযে দিলাম। বললাম, 'তিন বছব আগে জন্মদিনে মা দিযেছিলেন এই আংটি। আমি দিলাম তোমাকে। তিনি বেঁচে থাকলে আপত্তি কবতেন না, আশীর্বাদ কবতেন।'

অঞ্জলি এক মুহূর্ত স্তব্ধ হযে রইল, তাবপব বলল, 'কিন্তু এ আংটি আমি পবব কি কবে।'

বললাম, 'আমি তো দিলাম, তুমি কি ক'বে পববে তুমিই জানো।'

অনেক বাত পর্যন্ত সেদিন ঘুম হল না। ছাতে এসে আকাশেব দিকে তাকালাম। আকাশে চাঁদ নেই, তাবাও নেই, শ্রাবণেব ঘন মেঘ থম থম কবছে। এমন দিনে, এমন জাযগায, এমন ভাবে কারো হাতে আংটি পবাব, তা কোন দিন ভাবতে পাবিনি। এই দিনটি সম্বন্ধে কত কল্পনাই ছিল।

কিন্তু যা সমস্ত কল্পনাকে ছাড়িয়ে যায় তাই তো বড় রোমান্স।

পিসীমা সেদিন পুজোর ঘরে যেতে যেতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোর হাতের আংটিটা কি হলরে ছোটন ? বউদি যে আংটিটা দিয়েছিলেন তোকে ? মরা মানুষের হাতের চিহ্ন হারিয়ে ফেললি না কি ?'

বললাম, 'না হারায়নি, পিসীমা। সে আংটি ঠিক জায়গায় আছে।'

পিসীমা একটুকাল আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বুঝেছি।'

আমি ভাবলাম আরো অনেক কথা শুনতে হবে, আরো অনেক কথার জবাব দিতে হবে, কিন্তু পিসীমা আর কিছুই বললেন না, নিঃশব্দে ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কেবল দরজা দেওয়ার শব্দটা অন্য দিনের চাইতে বড় শোনাল।

অদ্ভুত লজ্জা অঞ্জলির। প্রকাশ্যে আংটিটা সে কিছুতেই পরবে না। সে আংটি পরে কলেজে যাবে না, কারো সামনে বেরোবে না। তা না বেরোক। সেই আংটি ওর আঙুলে নাই বা রইল তার অস্তিত্ব আছে ওর মনে, তার আভা ওর সমস্ত মুখ থেকে ফুটে বেরুচ্ছে। তা ও লুকবে কি করে।

তবু এক সময় সে আংটি পরত অঞ্জলি যখন পার্কের কোণে লেকের ধারে, কি রেস্তোরাঁয় নিভৃত চায়ের টেবিলে, আমরা মুখোমুখি বসতাম। ওর হাতের আঙুলে হীরা জ্বলত, আমার মনে জ্বলত হীরকময়ী।

ক্রমে আমাদের বাড়ির সবাই ব্যাপারটা মেনে নিলেন। এখন আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়েটা হয়ে গেলেই হয়। আমার একগুঁয়েমির ফল একদিন আমি ভোগ করবই। কিন্তু পরিচিত মহল এই নিয়ে গল্পে গুজবে দিনের পর দিন যেভাবে মুখর হয়ে উঠেছে, একমাত্র বিয়ের মিষ্টিতেই সে মুখ এখন বন্ধ করা সম্ভব।

এবার অঞ্জলির মার শরীরটা একটু সুস্থ হলেই হয়।

একদিন বিয়ে সম্বন্ধেও অঞ্জলির সঙ্গে আলাপ হল আমি বললাম, 'যাই বল হিন্দু বিয়ে বড় বিদঘুটে, মেয়েলি আচারের জ্বালায় অস্থির হতে হয়। আমার ইচ্ছে বিয়েটা আচার-সম্মত না হয়ে আইন সম্মত হোক।

অঞ্জলি বলল, না। আইনটা নিতান্তই আইন। কিন্তু মেয়েলি আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে যে কাব্যটুকু আছে তা তোমার আদালতের আইনে কোথায় পাবে ?'

আমি প্রতিবাদ করলাম না। এই আচার-অনুষ্ঠানের কাব্যে মেয়েদের যে কি আসক্তি তা তো জানি বিয়ের নিমন্ত্রণ পেলে বউদি কোনটি প্রত্যাখ্যান করেন না। বিয়ের কথা শুনলেই তাঁর মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বিয়েটা যেন আর কারো নয় তাঁরই। মনে হয় এই সোনার মুকুট আর ছাঁদনা তলার লোভ দেখিয়ে মেয়েদের বহুবার বিয়েতে রাজি করান যায়।

বউদির সঙ্গে সন্ধি করে বাজী রেখে সেদিন সন্ধ্যার পর তাঁকে নিয়ে তাস খেলতে বসেছি, হঠাৎ মিণ্টু এসে দোরের সামনে দাঁড়াল, 'প্রবীরদা।'

তাস থেকে চোখ না তুলেই বললাম, 'কি।

'শিগগির আসুন। আমাদের ঘরে পুলিস এসেছে। বাবাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।'

তাস ফেলে ফিরে তাকালাম। মিণ্টুর চোখ ছল ছল করছে। বছর দশ এগার হবে বয়স। কোঁকড়ানো চুল কাঁধ পর্যন্ত পড়েছে। ওর দিদির মুখের আদল আছে ওর সঙ্গে। মিণ্টু আবার বলল, 'শিগগির আসুন প্রবীরদা, বাবাকে ওরা ধরে নিতে এসেছে।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে বললাম, 'ভয় নেই, চল আমি আসছি।

জন দুই কনস্টেবলের সঙ্গে সাব-ইনস্পেক্টর নিশানাথ নন্দী দোরের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার সঙ্গে মুখচেনা ছিল এর আগে, আমাকে দেখে মৃদু হেসে বললেন, 'এই যে আসুন। ঠিকানা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। কালীমোহনবাবু কি কিছু হন আপনাদের ?'

হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,'ওরা আমাদের ভাড়াটে।' সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরের অঞ্জলি আর তার মা'র সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল। অঞ্জলির বাবা অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন।

নিশানাথবাবু বললেন, 'তাই বলুন।'

বললাম, 'কালীমোহনবাবুর নামে চার্জটা কি।'

নিশানাথবাবু বললেন, 'যা হয়ে থাকে আর কি, মিসএ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অব মানি, চীটিং, কনস্পিরেসি, সব আছে। মনিব বিশ্বাস ক'রে ক্যাশ রাখতে দিয়েছিলেন, সেই টাকা নিজে ভেঙে খেয়েছেন। আরো দু'তিন জন সেলসম্যানের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে সরিয়েছেন ডজন ডজন সাবানের বাক্স, ক্যাস্টর অয়েলের শিশি, গোটা তিরিশেক ফাউন্টেন পেনের হদিস মিলছে না। আরো কি কি গেছে, ক্রমে বেরোবে।'

বললাম, 'কিন্তু কালীমোহনবাবুই যে আছেন এর মধ্যে তার প্রমাণ—

নিশানাথবাবু বললেন, 'প্রমাণ না পাওয়া গেলে তো গোলমাল মিটেই যায়, প্রবীরবাবু। আমরাও তাই চাই। কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকমই মনে হচ্ছে। এই দুটো বুঝি এদের ঘর?'

বাড়ির ঠাকুর, চাকর, দারোয়ান, ড্রাইভার, সবাই এসে ভিড় করছিল। আমি তাদের ধমকে সরিয়ে দিলাম।

নিশানাথবাবু বললেন হ্যাঁ ওরা যাক। কিন্তু আপনি থাকুন আমাদের সঙ্গে। আপনার অমূল্য সময়, কিন্তু আপনাকে একটু কষ্ট দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

নিশানাথবাবু হেসে তাঁর সিগারেট কেস খুলে ধরলেন। আমি সিগারেট না নিয়ে তাঁকে ধন্যবাদ দিলাম, 'বেশ, আমি আছি এখানে। কতক্ষণ লাগবে আপনাদের?

নিশানাথবাবু বললেন, 'কতক্ষণ আর বড় জোর আধঘণ্টা। এই পাড়ায় আরো দুটো কেস আছে মশাই, তাও সেরে যেতে হবে। দুর্ভোগ কি কম। দিনের পর দিন অপরাধীর সংখ্যা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে খাবার ঘুমোবার আর জো থাকবে না।

কথা রাখলেন নিশানাথবাবু, আধঘণ্টার বেশি সময় নিলেন না। কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যে দুই ঘরের সমস্ত বাক্স প্যাঁটরা বিছানাপত্র উলটে তছনছ ক'রে ছাড়লেন।

সার্চলিস্টে অবশ্য বেশি জিনিসের ~ উঠল না। অপহৃত কোন মূল্যবান জিনিস পাওয়া গেল না। ন্যাশনাল স্টোর্সের ছাপমারা কয়েকটা খালি প্যাকেট, গোটা দুই খাতা তেলের শিশি টুকিটাকি আরো দুই একটা জিনিস নিশানাথবাবু কুড়িয়ে নিলেন বললেন, 'মালপত্র তো এখানে থাকবার কথা নয়, প্রবীরবাবু। সেগুলি যথাস্থানেই গেছে আপাতত মালিক মহোদয়কে যে ঠিক মত পেয়েছি এই পরম ভাগ্য।

তারপর কালীমোহনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাকে তহবিল তছরূপের দায়ে এ্যারেস্ট করলাম, চক্রবর্তী মশাই। ভদ্রলোকের ছেলে, বেশ তো চাকরি বাকরি ক'রে খাচ্ছিলেন- এ সব মতি গতি কেন হল বলুন তো।'

বললাম, 'ওঁকে এ্যারেস্ট করবার মত যথেষ্ট কারণ কি পেয়েছেন আপনারা?'

নিশানাথবাবু হাসলেন, একি বলছেন, প্রবীরবাবু। যথেষ্ট কারণ না পেলে পুলিসের বাবার সাধ্য আছে কারো গায়ে হাত দেয়?'

অঞ্জলি পাশের ঘরে এসে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরল, 'বাবাকে ছাড়িয়ে আন। উনি নিশ্চয়ই একাজ করেন নি, করতে পারেন না। ওঁকে বাঁচাও।'

মনে মনে ক্ষোভ ছিল অঞ্জলি যেন একটু বেশি চাপা স্বভাবের মেয়ে। ওর মধ্যে বয়সোচিত উচ্ছলতা নেই। ও উদ্বেল হয়ে দুই কূল ভাসিয়ে নিতে জানে না। আজ দেখলাম জানে। কিন্তু আমি ভেসে যেতে পারলাম না। যে টেবিলের ধারে আমি ওকে সেদিন আংটি পরিয়ে দিয়েছিলাম, সেইখানেই আজ ও আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। কিন্তু আশ্চর্য, উনিশ বছরের সুন্দরী মেয়ের আলিঙ্গনে কোন মাদকতা নেই, এ যেন কোন তরুণী নারীর বাহু ডোর নয়, দুশ্ছেদ্য লোহার বেড়ি মাত্র।

আস্তে আস্তে ওর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'এত অধীর হচ্ছ কেন অঞ্জু? এমন ব্যাকুলতা তোমাকে মানায় না। তুমি যথেষ্ট লেখাপড়া শিখেছ। পৃথিবীর রীতি নীতি আইন কানুন তোমার না বুঝবার কথা নয়। তোমার বাবা যদি দোষ না ক'রে থাকেন, তাঁকে কেউ কিছু করতে পারবে না। আর যদি দোষী বলেই গণ্য হন, তা হলে law will take its own course.'

অঞ্জলি বলল, 'law?'

বললাম, 'হ্যাঁ, আইন আদালত। বিযেব ব্যাপারে সেটা avoid কবা গেলেও এক্ষেত্রে যাবে বলে মনে হয না, যাওযা উচিত নয়।'

অঞ্জলি বলল, 'যা অনুচিত তা তোমাকে আমি কবতে বলব না। কিন্তু বাবা যেন বিনা দোষে কষ্ট না পান সেটা দেখ।'

দাদা অনেক বাত্রে বাড়ি ফিবে সব শুনে বললেন, 'বড অন্যায কবেছ, প্রবীব। ব্যাপাবটা এখানেই মিটিযে ফেলা উচিত ছিল। শত হলেও ওঁবা আমাদেব ভাড়াটে। তা ছাড়া—'

দাদা আমাব মুখেব দিকে তাকিযে কথা শেষ কবলেন না। কিন্তু তাঁব অনুক্ত অপমানটুকু আমাব মনে তীবেব মত এসে বিঁধল।

বললাম, 'তা ছাড়া ওঁবা আমাদেব যাই হন না কেন, এ ব্যাপাবে unfair means আমি আপনাকে নিতে দেব না, দাদা। আমাব বিশ্বাস কালীমোহনবাবু নিবপবাধ, আব যদি অপবাধ ক'বে থাকেন তিনি নিশ্চযই তাব শাস্তি ভোগ কববেন।'

দাদা বললেন, 'বেশ। ওদেব ব্যাপাবে আমি আব কোন কথা বলব না, সেই ভালো, তোমাব যা ইচ্ছা হয কব। হ্যাঁ, একটা কথা। পিসীমাব গুরুদেব সেদিন বুঝি পঞ্জিকা দেখেছিলেন। এই মাসেব শেষ দিকে নাকি বিযেব ভালো দিন আছে।'

বুঝতে পাবলাম unfair means কথাটাব জ্বালা দাদা এখনও ভুলতে পাবেন নি। আমাদেব business সম্বন্ধে আমি অনেক দিন অনেক বকম সমালোচনা কবেছি, দাদা তেমন চটেন নি , ববং বেশিব ভাগই হেসে উড়িযে দিযেছেন। বলেছেন, 'হাতেকলমে কাজ-কর্ম কব, ব্যবসাব বহস্য তখন বুঝবে।'

কিন্তু আজ . . চটলেন কেন।

তাঁব কথাব জবাবে বললাম, পিসীমাব গুরুদেবকে বলবেন আপাতত তাঁব পাঁজি দেখবাব দবকাব নেই।

বিযেব দিন স্থগিত বইল , কালীমোহনবাবুব মামলাব দিন পড়তে লাগল। হাজত থেকে তিন দিন পবেই তিনি bail পেযেছিলেন, আমিই জামিন হযেছিলাম তাঁব। ভালো একজন উকিল বন্ধুকেও ঠিক ক'বে দিযেছিলাম তাঁব জন্য। তবু কিছু হল না। এক বছব জেল হল কালীমোহনবাবুব। উকিল বন্ধু বললেন, শাস্তিটা আবও বেশিই হত, কমাবাব কৃতিত্বটা তাঁব।

অঞ্জলিকে বললাম, 'appeal কবতে চাও তো বল, ভালো ব্যাবিস্টাবেব কাছে নিযে গেলে পযেন্ট নিশ্চযই খুঁজে পাওযা যাবে।'

কিন্তু অঞ্জলি মাথা নাড়ল, বলল, না। appeal আব কবব না। টাকা পযসা স. ফুবিযেছে। তা ছাড়া বাবা আমাব কাছে অপবাধ স্বীকাব কবেছেন। আচ্ছা বাবা তো এমন ছিলেন না। কেন এমন হলেন বলতে পাব ?'

বললাম, প্রশ্নটা criminology-ব।

অঞ্জলি বলল, 'কেবল criminology-তেই এব সমাধান আছে ? আচ্ছা দিও তো দু'চাবখানা বই।' বলবাব ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ ছিল ধাবাল শ্লেষ ছিল অঞ্জলিব। তা আমাকে বিঁধল।

বললাম, তুমি কি বলতে চাও তা জানি। ন্যাশনাল স্টোর্সেব মালিকেবা তাদেব কর্মচাবীদেব ওপব অনেক দুর্ব্যবহাব কবেছেন। সময মত মাইনে মেলেনি, সামান্য কাবণে মাইনে কাটা গেছে, ওভাবটাইম খাটিযে পযসা দেননি, তাঁদেব আবো অনেক দোষ ত্রুটি মামলাব সময বেবিযেছে। কিন্তু তাব প্রতিকাবেব অন্য উপায ছিল। তিনিও চাকবি ছেড়ে চলে আসতে পাবতেন। ন্যাশনাল স্টোর্সই তো একমাত্র স্টোব নয।'

অঞ্জলি একটু হাসল, 'আমিও তাই বলি। ন্যাশনাল স্টোর্সই একমাত্র নয।'

আমি চটে উঠে বললাম, 'তাই বলে তোমাব বাবাব তহবিল তছরুপেব সমর্থন কবতে চাও ?'

অঞ্জলি মাথা নাড়ল, 'না, আমি শুধু তাঁব অপকার্যেব কাবণ খুঁজতে চাই।'

বললাম, 'কাবণ আমি আবও কিছু কিছু খুঁজে দেখেছি। আমাদেব সবকাব মশাই কড়া তাগিদ

দিচ্ছিলেন, বিশু ডাক্তারের বিলের ভয়ে তোমার বাবা ওপথ মাড়াতে পারতেন না, বন্ধু স্বজন সবাই তাঁর মহাজন হয়ে উঠেছিলেন, এমন অনেক কারণ আরো হয়ত আছে। কিন্তু তবু ভারতবর্ষের দরিদ্র ব্রাহ্মণ তেঁতুল পাতা খেয়ে বেঁচেছে, তাও না জুটলে উপবাস করে মরছে, কিন্তু চুরি করেনি।'

অঞ্জলি বলল, 'আজ কেন করে তাই তো জানতে চাইছি।'

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'যাকগে। যা হবার হয়েছে। তুমি কদিন ধরে কলেজে যাচ্ছ না কেন ? পার্সেণ্টেজ থাকবে ? পরীক্ষা তো এলো।'

অঞ্জলি একটু হাসল, 'হ্যাঁ, পরীক্ষা এসেছে।'

বললাম, 'কিন্তু preparation নিশ্চয়ই তেমন হয়নি। ইংরেজীটা নিয়ে সন্ধ্যার দিকে এসো আমার কাছে। যদিও আই-এস-সি পর্যন্ত ইংরেজী বিদ্যা, তবু কিছু কিছু সাহায্য বোধ হয় করতে পারব তোমাকে।'

অঞ্জলি একটু হাসল, 'তুমি শুধু জ্ঞানবানই নও, বিনয়বানও, কিন্তু এবার আমি appear করব না ঠিক করেছি।'

বললাম, 'করলে পারতে, এখনও সময় ছিল।'

অঞ্জলি বলল, 'সময় আর কই। একটা চাকরি বাকরি খুঁজতে হবে না এবার ?'

একটু কাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বললাম, 'চাকরি ? তুমি চাকরি করবে ?'

অঞ্জলি বলল, 'না করলে চলবে কি করে বল। হাবুলের তো কিছু হলই না। মিণ্টু রিণ্টুকে তো খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করতে হবে। তা ছাড়া মামলার ধার দেনাও যথেষ্ট হয়েছে।'

বললাম, 'কিন্তু তার জন্য তোমাকে চাকরিতে নামতে হবে ? আমার যা আছে তাতে কি কুলোবে না ?'

অঞ্জলি একটু চুপ করে রইল, তারপর আমার দিকে না তাকিয়ে চোখ নীচু করে বলল, 'তাতে শুধু দুজনের কুলোবে। তা ছাড়া তুমি তো অনেক দিয়েছ।'

এতক্ষণ কেবল কাটা কাটা কথা বলেছে অঞ্জলি, কেবল তর্ক করেছে, কিন্তু এবার সব কিছুর ওপর ও যেন মধু ছিটিয়ে দিল। 'শুধু দুজনের।' দুজন কথাটার মধ্যে এত মাধুর্য। সব জ্বালা সব দ্বেষ সেই মন্ত্রের ছোঁয়ায় অমৃত হয়ে ওঠে। আর আমি ওকে অনেক দিয়েছি। তা দিয়েছি, একথা স্বীকার করব। কিন্তু অঞ্জলি দিয়েছে কি ? দিয়েছে বইকি। ও না দিলে আমি ওকে দিলেম কোত্থেকে। ওর অস্তিত্বই তো একটা পরম দান।

এই মাস কয়েকের বিপর্যয়ে দুঃখ ধাঁধায় অঞ্জলি বেশ একটু বদলেছে। ওর কথার ধরন পালটে গেছে, ঘুরে গেছে ভাবনার মোড়। নানা ধরনের চিন্তা ওর মাথায় ঢুকেছে। তা ঢুকুক। আমি তো তাই চাই। ওর ধার বাড়ুক, তীব্রতা বাড়ুক, আত্মপ্রত্যয় বাড়ুক। তা বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে বৈচিত্র্য ; এবার সত্যিই যেন হীরার দ্যুতি ফুটে বেরুচ্ছে ওর ভিতর থেকে। এ গর্ব আমার, আমি গোড়াতেই ধরতে পেরেছিলাম ও কি। তাই তো বউদির মনোনীতারা আমার মনঃপূতা হয়নি।

দিন কয়েক বাদে অঞ্জলিকে বললাম, 'অনেক দিন একসঙ্গে বেড়াইনে, চল আজ একটু ঘুরে আসি।'

অঞ্জলি একটু কি ইতস্তত করল, তারপর বলল, 'আচ্ছা চল।'

এখানে ওখানে ঘুরলাম, হগ মার্কেট থেকে ফুল কিনলাম, বই কিনলাম, তারপর ঠিক করলাম লম্বা ড্রাইভ দেব ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত। বহুকাল ওদিকে যাওয়া হয় না। কিন্তু তার আগে চায়ের পিপাসা মেটান দরকার। কেবল তৃষ্ণা নয়, ক্ষুধাও পেয়েছে।

দুজনে মিলে বহুদিন বাদে চায়ের কাপ নিয়ে মুখোমুখি বসলাম নিভৃতে। সূর্যাস্তের রঙ পড়েছে অঞ্জলির গালে, চুলে, কপালে। কেটলি থেকে আমার কাপে চা ঢেলে দিচ্ছিল অঞ্জলি, হঠাৎ ওর আঙুলের দিকে আমার চোখ পড়ল। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ল অনেকদিন ধরে দেখিনে ওর হাতের সেই আংটিটি। চায়ের কাপে একটু চুমুক দিয়ে বললাম, 'তোমার সেই আংটিটি কি হল ? বহুদিন পর না, আজ প'রে এলেই পারতে।'

অঞ্জলি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বলি বলি করেও বলা হয় নি তোমাকে। আংটিটি আমার কাছে এখন নেই।'

আমি একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইলাম, তারপর হেসে বললাম, 'আমি এই রকমই আন্দাজ করেছিলাম। বিক্রি করে দিয়েছ তো?'

অঞ্জলি এক মুহূর্ত আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তারপর বলল, 'বিক্রি নয়, বাঁধা রেখেছি। আবার ফিরিয়ে আনা যাবে।'

বললাম, 'ওই একই কথা। না আনলেও ক্ষতি নেই। কিন্তু আংটিটি আমার মা'র স্মৃতি-চিহ্ন।'

অঞ্জলি বলল, 'আমার বাবাকে রক্ষা করার কাজে সেটা বাঁধা পড়েছে। মা'র বাক্সে সামান্য যা গয়না ছিল, তিনি বের করে দিলেন, মিন্টু, রিন্টু পর্যন্ত খুলে দিল তাদের হাতের একগাছা করে চুড়ি। সব এক ফুঁয়ে শেষ হল। সকলের চোখ পড়ল আমার হাতের আংটির দিকে। আমার নিজের চোখেও ভারি বিসদৃশ লাগছিল।'

বললাম, 'বেশ করেছ।'

কিন্তু মনের মধ্যে ব্যাপারটা কাঁটার মত বিঁধতে লাগল। অঞ্জলির তস্কর বাপের জন্য আমার পুণ্যবতী মায়ের অমূল্য স্মৃতিচিহ্ন বাঁধা পড়েছে—একথা কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। পিসীমার সেই তিরস্কার মনে পড়ল, 'আংটিটা তুই কি হারিয়ে ফেললি, ছোটন?'

কাপের চা বিস্বাদ লাগল। সেটাকে একটু সরিয়ে রেখে বললাম, 'কোন দোকানে বাঁধা রেখেছ। রসিদটা দিয়ো আমাকে?'

কিন্তু অঞ্জলি ঠিকানা দিল না, বলল, 'ভেব না, ও আংটি আমিই ফিরিয়ে আনব।'

আমার কোন সংশয় রইল না আংটিটি অঞ্জলি বেচেই দিয়েছে। তা দিক, কিন্তু আমাকে বললেই তো পারত। আমাকে বললে ও আংটি বেচবার প্রয়োজনই হত না। অঞ্জলির মা বোনেদের গয়নাও রক্ষা পেত। আমি অনেকবার টাকার কথা বলেছি অঞ্জলিকে। কিন্তু প্রতিবার অঞ্জলি মাথা নেড়েছে। বলেছে দরকার হলে নেব। ওদের অনেক দরকার আমি পরোক্ষভাবে মিটিয়েছি। কিন্তু সরাসরি টাকা চাইতে অঞ্জলির সম্ভ্রমে বেধেছে।

আশ্চর্য এই নিম্নমধ্যবিত্ত মন, আর আশ্চর্যতর এদের সম্ভ্রমবোধ। এদের কিসে যে মান যায়, কিসে যে থাকে তা আমার কাছে এক হেঁয়ালী। জাত দিয়েছে, মান দেয়নি, হৃদয় দিয়েছে, মাথা দেয়নি। আর আমাদের অফিসের কেরানীরা ঠিক উল্টো। তারা মস্তিষ্ক বিক্রয় করেছে, হৃদয় দেয়নি। ওরা হাতে কলম পেষে, দাঁতে পেষে দাঁত, মাথায় চক্রান্তের পর চক্রান্ত আঁটে। যেন আমি কিছু বুঝিনে। যেন আমি জানিনে ওদের মুবোদ। ওদের শঠতা, বঞ্চনা, চাটুবাদ, পরিবাদ, ঈর্ষা, অসূয়া, নাড়ী-নক্ষত্র যেন কিছু জানতে বাকি আছে আমার। ওরা ভাবে এসব ওদের কৌশল, ট্যাকটিকস ছাড়া কিছু নয়। সংগ্রামের অস্ত্র মাত্র। জীবনের পক্ষে সংগ্রাম, ধনিকের বিপক্ষে সংগ্রাম। দুই সংগ্রামে ওদের এক বাজী, এক পণ—জীবন নয়, চরিত্র। চরিত্র যদি যায় ওরা কি করে বাঁচবে, কি নিয়ে বাঁচবে। চরিত্র যদি হারায় তা কি আর ওরা ফিরে পারে? অঞ্জলির এই হীরার আংটির মত সে চরিত্র বাঁধা রাখাও যা, বিক্রি করাও তাই। একই কথা।

অঞ্জলি বলল, 'কি হল তোমার, চা খেলে না যে!'

বললাম, 'খুব খেয়েছি, ওঠ এবার, যাওয়া যাক।'

অঞ্জলি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল, কি বুঝল সেই জানে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অদ্ভুত একটু হাসল অঞ্জলি, বলল, 'আমার ভুল হয়েছিল। কিন্তু তোমার আংটি আমি সত্যিই উদ্ধার করে আনব।'

'তোমার' কথাটা খট করে কানে বিঁধল। বললাম, 'আমার? ও কি শুধু আমারই আংটি, অঞ্জু? ও কি আমাদের নয়?

অঞ্জলি বলল, 'আমিও তো তাই ভেবেছিলাম।'

বললাম, 'আরও একটু তলিয়ে ভেবে দেখ, তা হলেই বুঝবে।'

দুজনে ফের উঠলুম এসে মোটরে। ডায়মণ্ডহারবারে আর সেদিন যাওয়া হল না। বাষ্পীয় পোত

সামুদ্রিক ঝড়ে টলমল করছে। এ সময় আশ্রয় পেলে ভালোই হত ; কিন্তু আশ্রয় কি চাইলেই মেলে ?

কয়েকদিন বাদে অঞ্জলি একদিন বলল, 'দেখ, আমি একটা চাকরি পেয়ে গেছি।'

রাগ চেপে বললাম, 'বেশ তো, কোথায়।'

অঞ্জলি বলল, 'টেলিফোন অফিসে।'

বললাম, 'আর কোন অফিসে পছন্দ মত কাজ কি জুটল না ?'

অঞ্জলি বলল, 'জুটল আর কই। টিচারী অবশ্য পাই। কিন্তু আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট টিচারদের মাইনে তোমার খাস বেয়ারার চাইতে অনেক কম।'

বললাম, 'কিন্তু টেলিফোন অপারেটারের কাজ ছাড়াও আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট লেডী টিচারের একটি বিকল্প চাকরি আমার কাছে আছে।'

অঞ্জলি একটু হাসল, 'তা জানি। খাস বেয়ারা নয়, একেবারে খাস সেক্রেটারিগিরী। কি বল, তাই না ?'

বললাম, 'তাই যদি হয়, ক্ষতিটা কি ? টেলিফোন অপারেটারের চাইতে আশাকরি, কিছু বেশি মাইনেই দিতে পারব।'

অঞ্জলি বলল, 'তা তুমি পার। কিন্তু আমি পারিনে।'

বললাম, 'কেন, না পারবার কি আছে ?'

অঞ্জলি অদ্ভুত একটু হাসল, 'বানীগিবি ক'বে ক'রে যার হৃদয় পাকল, সে তোমার অধীনে কেবানীগিবি ক'বে হাত পাকাবে, একথা বলতে তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত ছিল।'

আমি আর কিছু বললাম না। ইচ্ছা কবলে পারি। ইচ্ছা কবলে এখনই ওকে জোব ক'রে হাত ধ'বে টেনে নিয়ে আসতে পারি আমার তে-তলার ঘরে। ইচ্ছা করলে বুকে চেপে ধ'রে বলতে পারি, 'না, কিছুতেই যেতে দেব না তোমাকে।'

কিন্তু যথেষ্ট হয়েছে। হৃদয়ের কাঙালপনা আর নয়। এই একটি সাধারণ মেয়ের জন্য আমার সমস্ত দম্ভ, সমস্ত পৌরুষ নিঃশেষ ক'রে কি একেবারে দেউলে হ'তে হবে ? দেউলে হবার আর বাকি আছে কি ? তাছাড়া দেউলে হ'লে ওর কাছে আমি এখন যা পাচ্ছি তার চেয়ে বেশি কিছু কি পাব ? মেয়েরা যদি একবাব টের পায় পুরুষ সর্বস্ব বিকিয়ে বসেছে, তারা তাকে সর্বস্ব দেয় না, সর্বস্বের চাইতে অনেক কম দেয়, যা দেয় তা না দেওয়াব নামান্তর। নারীর কাছে ভিক্ষা ক'রে স্নেহ মেলে, প্রেম মেলে না। আর জোর কবে ? জোর কবেও তাই। জোর কবে শ্রদ্ধা মেলে, ভয় মেলে, হৃদয় মেলে না। আশ্চর্য মেয়েদেব হৃদয। কিসে যে ওদের হৃদযের কপাট খোলে, কিসে যে বন্ধ হয, তা টেব পাওয়ার জো নেই। কিন্তু এ হয়ত নিছক কাব্য। হৃদয় আবাব কি, ভালবাসা আবাব নতুন একটি কি বস্তু ! অবসরকালেব সাহচর্য, শ্রদ্ধা আর ভয় তাবই রাসাযানিক ফল। তা ছাড়া আবাব কি। দেখি তো দাদা বউদিকে, বউদি দাদাকে ভয করেন, তাই বলে কি রসালাপ করেন না ? আমিও তাই চাই। একে জয় করতে চাই। ওর ভয় পেলেই আমার চলবে, ভালোবাসার প্রয়োজন নেই। আমি জোর করব। কিন্তু জোর তো যে কোন মুহূর্তে করতে পারি। তার আগে দেখিই না ওর মনেব জোর। ও নিজে ফিরে আসবে। ও নিজেই নতজানু হবে আমাব কাছে। টেলিফোন অপারেটারের চাকরি যে কি সুখের তা তো আমি আর না শুনেছি তা নয়। দু'দিনেই ওকে ফিরে আসতে হবে।

কিন্তু দু'দিনের বদলে দু'মাস কাটল অঞ্জলি ছেড়ে এল না ফোন অপারেটারের চাকরি। অথচ চাকবি করতে যে কষ্ট হচ্ছে তা তো নিজের চোখেই দেখি। দেখি ওর চোখে মুখে, ওর শারীরিক ক্লান্তিতে। ডিউটির ঠিক নেই। কখনো সকালে, কখনও দুপুরে, কখনো রাত্রে। ওর কলেজী সজ্জাও দেখেছি, এখনও দেখি, খুব যে বদলেছে তা নয়। প্রায় ঠিকই আছে সেই শাড়ি পরার ঢঙ, চুল বাঁধার ভঙ্গি। মাঝে মাঝে আমাব দেওয়া দামী শাড়ি পরেও বের হয়। তখন বুঝতে বাকী থাকে না ওর আটপৌরে শাড়ির টানাটানি পড়েছে। রাতের ডিউটি দিয়ে ও যখন সকালে ফেরে তখন এক একদিন চেয়ে দেখি। ওর সেই আয়ত সুন্দর চোখ কোটরে ঢুকেছে, চোখের কোলে কালি। যেন

নৈশ অভিসার থেকে ফিরে এল। হঠাৎ বুকের ভিতরটা ছাঁৎ ক'রে ওঠে। কিন্তু পর মুহূর্তে নিজের কাছে নিজে লজ্জা পাই। ওর দ্বিতীয় প্রেমিক কেউ যদি থাকে সে কোনো পুরুষ নয়, সে ওর প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজনকে প্রেমিক বলব, না স্বামী বলব ? প্রয়োজনকে ও কি ভালবেসেছে, প্রয়োজনাতীতের দিকেই কি ওর চোখ নেই, নেই সমস্ত মন পড়ে ? আমি সেই প্রয়োজনাতীত। প্রয়োজনের অনেক অতিরিক্ত। আমি পেয়েছি ও পায়নি, আমার কাছে ওকে আসতেই হবে।

মাঝে মাঝে ডিউটি দিয়ে ও একা আসে না। ওর সঙ্গে আসে আরো দু'চারটি ক'রে মেয়ে। আমি তাদের দিকে তাকাইনে। তাকাবার যোগ্য নয় তারা। ওদের দিকে তাকালে চোখ পীড়িত হয় আমার। কিন্তু শুধু চোখ নয়, কিছুদিন বাদে কানও পীড়িত হ'তে শুরু করল। অঞ্জলির সেই কুরূপা সঙ্গিনীর দল কেবল ওর সঙ্গেই আসে না, ওর ঘরে বসে জটলা পাকায়, আলোচনা করে, তর্ক করে, রাজনীতির দলবাদ আর মতবাদে একতলাটা মুখর হয়ে ওঠে। অঞ্জলি আজকাল আর আমার কাছে বই নিতে আসে না, বই দেয় ওর সঙ্গিনীবা। অঞ্জলি জানে না ওসব বই আমার কাছেও আছে, ওসব আমিও পড়ে দেখেছি। হয়তো অঞ্জলির সঙ্গিনীদের চাইতে আরো ভালো ক'রেই পড়েছি, কিন্তু অঞ্জলিরা তা বিশ্বাস করবে না। ওদেব বইয়েব প্রতিটি অক্ষরকে মেনে নিতে না পারলে ওদের বিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব নয়। ওবা জানে না অক্ষর পবিচয়ে বিদ্যার কেবল শুরু, অক্ষর পবিচয়ে সমস্ত বিদ্যা সীমাবদ্ধ নয়।

দাদা ফের ডেকে পাঠালেন তাঁর ঘরে। বললেন, 'ভেবেছিলাম, একতলার ভাড়াটের সম্বন্ধে আমি আর কোন কথা বলব না। ওটা তোমারই পোর্টফোলিও। কিন্তু আমার কথা বলবার প্রয়োজন হয়েছে।'

হেসে বললাম, 'বলুন,আমার পোর্টফোলিও হলেও প্রাইম-মিনিস্টারের উপদেশ নির্দেশ সর্বদাই বাঞ্ছনীয়।'

দাদা বললেন,'ঠাট্টার কথা নয়। একতলায় যে সব কাণ্ড হচ্ছে, তাতে ওদের এবার তুলে দেওয়া দরকার। সহজে না যায় আইনেব সাহায্য নিতে হবে।'

বললাম, 'এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে আইন আদালত করাটা কি ভালো দেখাবে ? তা ছাড়া আমি তো তার কিছু প্রয়োজন দেখছিনে। অঞ্জলি চাকরি করছে, এই তো আপনার আপত্তি ?'

দাদা বললেন, 'সে চাকরিও আবাব যে সে নয়, দিন নেই, বাত নেই—'

দাদার অভিযোগেব ভঙ্গিতে আমি হাসলাম : 'কিন্তু রাত্রে যদি অঞ্জলিরা ঘরে বসে থাকে আমাদের কাজকর্ম অচল হবে যে, প্রয়োজনটা তো আমাদেরই।'

দাদা বললেন, 'আব আমাদের বাড়ির একতলাতেই ওদের চিরকালের জন্য রেখে দেওয়া ? সেটাও প্রয়োজন ?'

বললাম, 'সে সম্বন্ধে আমি ভাবছি। কিন্তু একতলাতেই কি ওরা চিরকাল থাকবে ? না, আমরাই রাখতে পারব ?'

দাদা একটু হাসলেন, 'ও।'

তাবপর ফের গম্ভীব হযে বললেন, 'কিন্তু অঞ্জলি কেবল টেলিফোন অফিসে চাকরি করছে বলে নয়, কেবল কতকগুলি বাজে ধবনের মেয়ে ওদের ঘরে দিনরাত গুজ গুজ করছে বলেই নয়, আমার আরো আপত্তি আছে। জানো ওদের পড়বার ঘরটা ওরা একটা গ্লাস ওয়ার্কসের জনতিনেক ছোকরাকে সাবলেট করেছে ? তাদের সঙ্গে কোন মেয়ে ছেলে নেই, তারা নিজেরাই কখনো ঘরের সামনে কখনো ঘরের মধ্যে বান্না ক'রে খাচ্ছে ? ঘরেব কিছু আর থাকবে নাকি ? তা ছাড়া এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। এই সব সোমত্ত বয়সের ছেলেরা—'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'গ্লাস ওয়ার্কস ? সেটা আবার কি ? সেখানকার লোকেরা এখানে কেন আসবে ?'

দাদা বললেন, 'কেন আসবে আমিও তো তাই জিজ্ঞাসা করি।'

বললাম, 'তাদের আনলে কে ? অঞ্জলির সঙ্গে ওদের পরিচয়ই বা কি ক'রে হল ?'

দাদা একটু হাসলেন, 'একেবারেই চোখ বুজে আছ। কোন খোঁজ রাখ না। ভালো ক'রে খোঁজ

নিয়ে দেখ।'

একটু চোখ বুজেই ছিলাম। বুজে নয়, ফিরিয়ে ছিলাম চোখ। অফিসের কতকগুলি জরুরী কাজ পড়েছে। বেতন বৃদ্ধির আবেদন করেছে কেরানীরা। এদিকে আমার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শক্তি পিকচার্সের ডিরেক্টার বন্ধু মনোতোষ হাজার পঞ্চাশেক টাকা ধার নিয়ে তা জলে দিয়েছে। দু'একদিন সাদরে সুটিং দেখাতে নিয়ে গেছে তার স্টুডিওতে। ভোজ্য পানীয়ে আপ্যায়িত করেছে, অযাচিতভাবে আলাপ করিয়ে দিয়েছে নবোদিতা নক্ষত্রদের সঙ্গে ; এখন সব বন্ধ। আর পাত্তা নেই মনোতোষের। সিকিউরিটি যা সামান্য ছিল তাতে টাকাটার অর্ধেকও কভার করে না। আরও কতকগুলি ব্যাড্ ইনভেস্টমেণ্ট হয়ে গেছে। আর এক সহপাঠী বন্ধু অনেক ঘোরাঘুরি ক'রে ডিপজিট নিয়েছিলেন হাজার দশেক টাকা, তিনি না বলে কয়ে তালা বন্ধ করেছেন। দুনিয়ায় কাউকে আর বিশ্বাস করবার জো রইল না। দাদা কিছু জেনেছেন, কিছু জানেন নি। কিন্তু আমি ঘাবড়াইনি। ভিতরে বাইরে সব দিকেই আমি টাল সামলাতে পারব। সে মনের জোর আমার আছে।

কিন্তু অঞ্জলিদের পড়ার ঘর সাবলেট করার খবরটা এর পর আর না নিলেই নয়। চাকরকে দিয়ে আমার তে-তলার লাইব্রেরী ঘরে ডেকে পাঠালাম অঞ্জলিকে। একটু বাদেই অবশ্য অঞ্জলি এল, একটু হেসে বলল, 'কি বলছ।'

অনেকদিন পরে যেন দেখলাম অঞ্জলিকে। ওর চেহারা খারাপ হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, দেখতে খারাপ হয়নি। নাকি এতদিন না দেখার রঙে আমিও ওকে নতুন ক'রে দেখলাম। আমার নিজের মনের রহস্যে ভাবলাম ওর রূপ ?

বললাম, 'বোসো। কথা কি কেবল আমিই বলব ? তোমার নিজের কিছু বলবার নেই ?'

আশ্চর্য ! একি কাতরতা মনে। আমি ওকে ধমক দেওয়ার জন্য ডেকেছি, ওর কাছে কৈফিয়ৎ নেওয়ার জন্য ডেকেছি, কিন্তু আমার সুরে সেই রূঢ়তা ফুটছে কই।

অঞ্জলি ফের একটু হাসল, 'বলবার অনেক কথা সত্যিই জমেছে। কিন্তু সময় নেই যে, অফিসে বেরুচ্ছিলাম।'

এখনও হাসলে ওকে চমৎকার দেখায়, ওর গলার স্বর আমার কানে এখনও স্বরযন্ত্রের মত বাজে। বললাম, 'অফিসে বেরুচ্ছ, তাতো বেশ-বাস দেখেই বুঝতে পাচ্ছি। তবু বোসো। না হয় দু'চার মিনিট লেটই হবে।'

অঞ্জলি সামনের চেয়ারটায় বসে বলল, 'অফিসটা পরস্মৈপদী বলেই এত ঔদার্য, আর যদি নিজের হত ?'

কথার সঙ্গে হাসি মেশাল অঞ্জলি, তারপর বলল, 'অবশ্য তুমি খুব লিনিয়াণ্ট আমি জানি।'

বললাম, 'জানো।'

অঞ্জলি মনোরম ভঙ্গিতে ঘাড় কাৎ ক'রে বলল, 'হ্যাঁ।'

বললাম, 'তাই জেনেই বুঝি এইসব করতে সাহস পাচ্ছ ?'

অঞ্জলির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, বলল, 'কোন্ সব ?'

কিন্তু আমি মুখে হাসি টেনে বললাম, 'এই ধর আমাদের না বলে কয়ে আমাদেরই ঘর গ্লাস ওয়ার্কসের মজুরদের সাবলেট করা ? তা বেশ করেছ। কিন্তু ওদের সঙ্গে তোমার আলাপ হল কি ক'রে ?'

অঞ্জলি বলল, 'আমার সঙ্গে প্রথম হয়নি, হয়েছে হাবুলের সঙ্গে। ধীরেনবাবু আর গোবিন্দ হাবুলের কলীগ। বয়সে আমার চেয়ে একটু বড় হলেও ওঁরা আমাকে দিদি বলে ডাকেন।'

হেসে বললাম, 'ভালোই তো। সম্পর্ক কি সম্বোধনের ব্যাপারে আমার কিছু আপত্তি নেই। কিন্তু হাবুলের সহকর্মী তাঁরা হলেন কি করে ঠিক বুঝতে পারলাম না তো ? হাবুলও গ্লাস ফ্যাক্টরীতে ঢুকেছে না কি ? তুমিই বুঝি ঢুকিয়ে দিয়েছ ?'

অঞ্জলি মাথা নাড়ল। না, সে ঢুকায়নি। ঢুকেছে হাবুল নিজেই। ওর সম্বন্ধে আমার কৌতূহল খুব কমই ছিল। একটা বিতৃষ্ণার ভাব ছিল মনে। লেখাপড়া অল্পবয়সেই ছেড়ে দিয়েছে। তা দিক। সকলের তো আর লেখাপড়া হয় না। কিন্তু ওদের সংসারের কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও ওকে দেখেছি পাড়ায়

সস্তার চায়ের দোকানে আড্ড দিতে, বিড়ি ফুঁকতে ; নিচু শ্রেণীর ছেলেদের সঙ্গে রসালাপ করতে। কালীমোহনবাবু একাই বাজার করতেন, রেশন আনতেন, বরং মিণ্টু রিণ্টুকে দোকান থেকে ছোট ছোট ব্যাগ বয়ে নিতে দেখেছি, কিন্তু হাবুল কোনদিন কোন কাজে এসে তার বাবার সাহায্য করেনি। কালীমোহনবাবুর মামলার সময়ও এই ছেলেটিকে বিশেষ দেখতে পেতাম না। একদিন বুঝি দুঃখ করেছিলেন ওদের মা, বকাবকি করেছিলেন, তার ফলে কোন এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে কিছুদিনের মত নিরুদ্দেশ হয়েছিল হাবুল। সে হঠাৎ গ্লাস ওয়ার্কসে ভিড়ল কি ক'রে।

অঞ্জলিই বলল কাহিনী। একদিন খেতে এসে জ্বরাতুর মাকে ভাত বেড়ে দিতে দেখে হাবুলের ভারি করুণা হল, বলল, 'তুমি দাঁড়াতে পারছ না তো দিতে এসেছ কেন ? দিদি কোথায় ? দিদি বোধ হয় কলেজে গেছেন ? ওকে আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে সবাই মিলে তোমরা ওব মাথাটা খেলে। আব ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে কি হবে বলতে পার ?'

হাবুর মা একটু হাসলেন, 'তা তো ঠিকই। কিন্তু অঞ্জু কলেজে যায়নি। অফিসে চাকবি করতে গেছে।'

হাবুল ভাতের গ্রাস মুখে না তুলে বলল, 'চাকবি কবতে ? চাকরি করে নাকি ও ?'

'না করলে এসব খাচ্ছিস কি ?'

হাবুল গম্ভীর মুখে ভাত খেয়ে উঠল। ঘরে মাছ নেই বলে সেদিন আর কোন কোন্দল করল না, পরদিনও না। তৃতীয় দিনে এসে বলল, 'আমি গ্লাস ওযার্কসে কাজ নিলাম দিদি।'

'অঞ্জলি বলল, 'সে কি রে। ও কাজ তুই পারবি কেন।'

হাবুল বলল, 'কেবল, ও কাজ কেন, অনেক কাজই পারি। কেবল তোমাদের ওই লেখাপড়াটাই মাথায় ঢুকল না। বারেনদা বলে, আর একটু বয়স বাড়লে ঢুকবে। তারও নাকি এমনি হযেছিল।'

অঞ্জলি জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বীরেনদাটি কে।'

বীরেনদার কাছেই তো কাজ শিখেছে হাবুল। সখ ক'রে এক এক দিন তার সঙ্গে সিগারেটেব লোভে তার জোগান দিয়েছে। এখন সেই সখটা কাজে লাগল।

কত মাইনে, ক'ঘণ্টার চাকবি, কি রকম খাটুনি কিছুই অঞ্জলিকে বলেনি হাবুল। সেই স্বভাব, সেই একগুঁয়ে ভাব সবই প্রায় তেমনি রযে গেছে। আগেও সংসারে কোন কাজ করত না, এখনও করে না, আগেও খাওয়ার সময ছাড়া বাসায় আসত না, এখনও তাই। কেবল একটু পালটেছে। চায়ের দোকানে, বিড়িব দোকানে ওকে এখন আর দেখা যায না। তা ছাড়া মাস অন্তে কোন মাসে পঞ্চাশ, কোন মাসে ষাট ধ'রে দেয় অঞ্জলির হাতে।

বললাম, 'তা না হয দিল, কিন্তু এর ভবিষ্যৎ কি ? তার চেয়ে আমাকে যদি বলতে—'

কিন্তু কথাটা আমি আর শেষ করলাম না।

অঞ্জলিকে যেদিন চাকরি অফার করেছিলাম সে দিনের কথা মনে পড়ে গেল।

একটু গম্ভীর হয়ে থেকে বললে, 'আমার বোঝাবুঝির ও যেন কত ধার ধারে। বেকার বসে থেকে থেকে নষ্ট হয়ে যচ্ছিল তার চেয়ে কিছু একটা করে মন্দ কি। তারপর কাজে যদি একবার আগ্রহ আসে, একাজ ছেড়ে অন্য কাজেও ঢুকতে পারবে।'

'তা পারবে। সে তোমরা যা ভালো মনে কর করবে। কিন্তু কোন কারখানায় ঢুকলেই তার লোক এনে নিজেদের সাবলেট করতে হবে, এমন কি কোন কথা আছে ?'

অঞ্জলি বলল, 'তা নেই। কিন্তু বিশ্বাস কর, এ ব্যাপারে আমার যে খুব মত ছিল তা নয়, কিন্তু হাবুলের গোয়ার্তুমির কাছে আমি হার মেনেছি। সে বলে ওদের স্থান না দিলে ওরা যাবে কোথায় ? কথাটা ঠিক। যা শুনলাম, তাতে ভারি কষ্টই হল। এক হিসেবে ওরা আমাদের চেয়েও অসহায়। কাদের বাড়ির এক বাইরের ঘরে থাকত। কোন রসিদ টসিদ কিছু ছিল না। কি যেন কথান্তর হয়েছে বাড়িওয়ালার সঙ্গে, তারা তুলে দিয়েছে। আসলে অন্য ভাড়াটে বসিয়ে বেশি ভাড়া নেবার মতলব।'

বললাম, 'হুঁ, আর বীরেন, গোবিন্দদের দিদির মতলবটা কি।'

অঞ্জলি একটু হাসল, 'ধরেছ ঠিকই, মতলব যে একটু না আছে তা নয়। হাবুল যখন এনেই ফেলেছে তখন আর করা যাবে কি। ভাবলাম আমাদের নিজেদেরও পঁয়তাল্লিশ টাকা ভাড়া টানতে

কষ্ট হচ্ছে। সংসারের খরচ তো কম নয়, তা ছাড়া ফি মাসেই কিছু না কিছু দেনা শোধ করতে হয়। যে কদিন আছে ভাড়ার খানিকটা যদি হাবুলের বন্ধুরা বেয়ার করে একটু সুবিধাই হয়।'

বললাম, 'যতই ঘুরিয়ে বল, দাদাকে না জানিয়ে ঘরখানা সাবলেট করেছ, কথাটা ঠিকই।'

অঞ্জলি বলল, 'আবার বেঠিকও ধ'রে নিতে পার। ওদের আমরা রিসিট টিসিট তো কিছু দেইনি। সুবিধা হলেই ওরা চলে যাবে। কিংবা অসুবিধা হলেই আমরা তুলে দেব। ট্যাকটিক্‌স্‌টা তো শিখেই নিয়েছি।'

অঞ্জলি একটু হাসল।

বললাম, 'কোন জিনিসই অত তাড়াতাড়ি শেখা যায় না অঞ্জলি, শিখতে সময় লাগে।'

অঞ্জলি উঠে দাঁড়াল, 'অন্য সময় বেশি সময় বসে তোমার কাছ থেকে সব শিখব, এবার উঠি। অফিসের দেরী হয়ে গেল।'

অঞ্জলি চলে গেল।

মন ভারি খারাপ লাগতে লাগল। কিন্তু মনের অস্বাস্থ্যকে আমল দিলে কাজ করা যায় না। অথচ কাজ আমাকে করতেই হবে।

পরদিন একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলাম হাবুলের বন্ধুদের। অঞ্জলির নতুন ভাইদের ; একটির বয়স বছর বাইশ-তেইশ, এই বয়সেই চোয়াল ভেঙ্গেছে। কালো রোগা লম্বাটে চেহারা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। এরই নাম বোধহয় ধীরেন। আর একটি হাবুলেরই বয়সী, কি তার চেয়ে দু'এক বছর বেশি হবে। ফর্সাপানা খাটো চেহারা। দাঁতে বিড়ি চেপে তোলা উনানে তালপাখার হাওয়া করছে। অত্যন্ত আনইম্‌প্রেসিভ চেহারা। একবার দেখলে পরের বার মনে থাকে না। নিশ্চিন্ত হলাম। অঞ্জলির ওরা ভাই হবারই যোগ্য। ইদানীং হাবুলকেও প্রায় ওই রকম দেখাচ্ছে।

একথা ঠিক, আর কারো দিকে অঞ্জলির মন আকৃষ্ট হয়নি। স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে, বিদ্যা, বুদ্ধি, সম্পদে আর কোন পুরুষ আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওর সামনে দাঁড়ায় নি। মাঝখানে কোন দ্বিতীয় পুরুষ নেই, আছে শুধু মত, রাজনৈতিক আদর্শ। কিন্তু তার কি এতই জোর যে, ভালোবাসা তার তাপে শুকিয়ে যায়, প্রেম নির্জীব হয়ে আসে ? মতটাই কি মানুষের সবখানি ? তার জন্য সব বাদ দিতে হবে—হৃদয়কে পর্যন্ত ?

রেলিঙে ভর করে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলাম ; হঠাৎ কাঁধে হাত পড়ল। মুখ ফিরিয়ে দেখি দাদা।

'এত রাত্রেও ঘুমুসনি প্রবীর। হয়েছে কি তোর বল তো ?'

অনেকদিন পর যেন স্নেহের স্বর শুনতে পেলাম ওঁর। উৎকণ্ঠিত মুখে ফের দেখতে পেলাম ওঁর জ্যেষ্ঠত্ব। ছেলেবেলায় কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন দাদা। কত যে আবদার মেনেছেন তার ঠিক নেই।

বললাম, 'কি আবার হবে। অমনিই এসে দাঁড়িয়েছি এখানে, ঘুম পাচ্ছিল না।'

দাদা এক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলেন, তারপর বললেন, 'আমি সব বুঝি প্রবীর, সব জানি। আমাকে লুকিয়ে কোন লাভ হবে না।'

দাদার গলার স্বর গাঢ়, আর্দ্র। দিনের বেলার সেই রূঢ়তা রুক্ষতার চিহ্নমাত্র নেই। বললাম, 'আপনাকে তো কিছুই লুকোইনি দাদা।'

তিনি বললেন, 'তা ঠিক, কিছুই লুকোওনি। তুমি সবই বলেছ, আজ আমি একটা কথা বলি। পুরুষের জীবনে মেয়েদের ভালবাসাই একমাত্র নয়, প্রথম বয়সে তাই মনে হয় বটে, কিন্তু বয়স যখন বাড়ে, মন যখন পরিণত হয়, তখন বোঝা যায় নারীর প্রেম হাজার জিনিসের মধ্যে একটি মাত্র। তার ধ্যান-ধারণা, কাজ-কর্ম—তা সে কাজ যেমনই হোক না কেন, যে আদর্শেরই হোক না কেন,—এমনই করে মানুষকে ডুবিয়ে রাখে যে সে হাজার চেষ্টা করলেও শুধু প্রেমে ডুবু ডুবু হওয়ার তার সময় থাকে না, প্রবৃত্তি থাকে না।

এমন কি নারীর প্রেম না পেলেও তখন বেশ চলে যায়, আমারই কি চলছে না ?'

শেষ কথাটি কিন্তু অহঙ্কারের নয়, আক্ষেপের মতই শোনাল।

দাদার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিলাম। অন্ধকারে কেউ কারো মুখ যে ভালো

করে দেখতে পেলাম না, সে একরকম ভালোই হল। এমন স্বীকৃতি দাদার মুখে এর আগে কোনদিন শুনিনি। দাদা মাঝে মাঝে বউদিকে চোখ রাঙান বটে, কিন্তু শাড়ি, অলঙ্কার, তাঁর সব রকম দাবীই তো দাদা মেটান। না চাইতেই আনেন উপহার, উপঢৌকন, ছেলেমেয়েও তো হয়েছে ওঁদের। তবু একথা কেন তিনি বলছেন, কি করে তিনি বুঝলেন যে, প্রেম ছাড়াই চলছে তাঁদের। যা চলেছে, সেটা প্রেম নয়। বউদিরও কি এই বক্তব্য ? অন্ধকার রাতে ঘুম-ভাঙা বিছানা থেকে উঠে এসে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে আমার কাঁধে হাত দিয়ে এই কথাই বলতেন, 'ঠাকুরপো, প্রেম ছাড়াই চলছে আমাদের, প্রেম ছাড়াও চলে।'

মিথ্যা কথা। চলে না—যারা পায়নি, তারা চালিয়ে নেয়। কিন্তু যারা একবার পেয়েছে, তারাই জানে জিনিসটা কি। একবার পেলে তার স্বাদ সারা-জীবন জড়িয়ে থাকে, তার সৌরভ সারাজীবন ছড়িয়ে থাকে। আমি জড়িয়ে গেছি। এ জট আমি খুলতে চাই না।

দাদাকে বললুম, 'আপনি ঘরে যান। আমার জন্য ভাববেন না।'

আশ্চর্য ! আজ দাদার জন্যই আমার ভাবনা হচ্ছে, ভারি মমতা হচ্ছে ওঁর ওপর।

ধীরে ধীরে সবাই ফের কাছে এলেন। দাদা, বউদি, পিসীমা, সকলেরই স্নেহ পেলাম আবার। বুঝতে পারলাম এবারের স্নেহ ওঁদের দয়া-সঞ্জাত। যে একদিক থেকে বার বার ঘা খাচ্ছে, আর একদিক থেকে আঘাত তাঁরা তাকে আর করতে চান না। তাছাড়া আমাদের কসবার বাড়িও শেষ হয়ে এসেছে। সেখানে উঠে গেলেই সব আপদ যাবে। একতলায় যা কাণ্ড হচ্ছে হোক। একখানা ঘর বই তো নয়। আমার জন্য তার ক্ষতি না হয় ওঁরা স্বীকার করলেনই।

পিসীমা বললেন, 'নতুন বাড়িতে উঠেই কিন্তু নতুন বউ আমি ঘরে আনব। মেয়ে আমি দেখে রেখেছি।'

আমি মনে মনে হাসলাম, মুখে বললাম, 'বেশ তো।'

অঞ্জলিকে ডেকে বললাম কথাটা। 'পিসীমা কি বলছেন জানো ? তিনি নতুন বউ নিয়ে নতুন বাড়িতে উঠতে চান।'

বহুদিন পরে অঞ্জলির ফের আরক্ত মুখ দেখলাম। অঞ্জলি একটু চুপ করে থেকে বলল, 'বেশ তো।'

পিসীমার কথার পুরো জবাব যেমন আমি দেইনি, আমার কথাব পুরো জবাবও তেমনি যে অঞ্জলি দিল না, সে কথা বুঝতে পারলাম।

একটু বাদে অঞ্জলি আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে হাসল, 'কিন্তু পিসীমাব নতুন বাড়িতে কি আর আমি উঠতে পাবব ?'

অঞ্জলির অভিযোগের কারণ ছিল। ওর নাইট-ডিউটি, ওর স্বাধীন চালচলন নিয়ে পিসীমা অনেক রকম কথা বলেছেন। অঞ্জলির বাবার জেল হওয়ার পর মিণ্টু রিণ্টুকে পর্যন্ত পিসীমা সন্দেহ কবতেন। তারা আমাব দুই ভাইপো সন্তু-অন্তুর সঙ্গে ওপরে খেলতে গেলে পিসীমাব অস্বস্তির সীমা থাকত না। পাছে কোন জিনিস খোয়া যায়, পাছে অসৎ সংসর্গে খারাপ হয়ে যায় অন্তু-সন্তু। আমি অবশ্য তাঁব এই মনোভাব, এ ধবনের আচবণকে প্রশ্রয় দিই নি। তবু মিণ্টু-রিণ্টুকে বারণ করে দিয়েছেন তাদের মা। তিনি নিজেও বড একটা ওপবে আসতেন না। তাঁর শরীর খানিকটা সেরেছিল, কিন্তু স্বামীর জেল হবার পর থেকে পারতপক্ষে বাইরে আসতেন না, কথা বলতেন না, কারো সঙ্গে।

· অঞ্জলিকে বললাম, 'বেশ তো নতুন বাড়িতে পিসীমারাই যাবেন। আমরা এখানেই থাকব, তা হলে তো আর তোমার আপত্তি নেই ?

অঞ্জলি মৃদু হাসল, 'কিন্তু আমার আপত্তি কি আব তুমি শুনবে ?' অর্থাৎ অঞ্জলি তো আপত্তি করবেই। কিন্তু সে আপত্তি আমাকে জোর করে অগ্রাহ্য করতে হবে। এতদিন জোর না খাটিয়ে আমি কি তাহলে ভুল করেছি ? ভালোবাসার যে জোর, তা না খাটাতে পারলে ঠকতে হয়। আমি আর ঠকবো না। কসবায় নতুন বাড়ি যতদিনে শেষ হয় হোক, এই পুবনো বাড়িতেই আমি নতুন ঘর বাঁধব। তারপর চাকরি থেকে ছাড়িয়ে আনব অঞ্জলিকে। ছাডাব ওর এই দীন আড়ম্বর বেশ। দৈন্য

ওকে মানায না।

দাদাকে ফেব কথাটা বলব বলব ভাবছি। বলব পিসীমাব সেই গুরুদেবকেই না হয ডাকুন, অঞ্জলির যখন আচাব অনুষ্ঠানটাই এত পছন্দ, তখন তাঁবই শবণ নেওযা যাক। কিন্তু এই সময আব এক কাণ্ড ঘটল। অঞ্জলিব সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হযে গেল। ঝগড়াব কাবণটা সামান্য। বীবেন আব গোবিন্দবা উনানটা তাদেব ঘবেব সামনে থেকে একটু প্যাসেজের দিকে সবিযে এনে আঁচ দিচ্ছিল, আমাদেব সবকাব মশাই বাড়িতে ঢুকবাব সময বললেন, 'এখানে উনানে আঁচ দিচ্ছে কে, এখান থেকে সবিযে নিযে যাও। সাবা বাড়িটাই এবা নষ্ট কববাব জো কবেছে দেখছি।'

বীবেন বলল, 'আমাদেব জন্য আলাদা একটু বান্নাব জাযগা যদি দেখিযে দিতেন সবকাব মশাই, তা হলে আব সাবা বাড়ি নষ্ট হত না।'

সবকাব মশাই বলেছিলেন, 'ঈস, সখ দেখ দযা কবে থাকতে দিযেছি, এব পব আবাব বান্নাব জাযগাও দিতে হবে। বান্নাব জাযগা নেই তো হোটেলে খেলেই পাব। ধোঁযায ধোঁযায সাবা বাড়ি নষ্ট কববে তোমবা ?'

গোবিন্দ মুখ ভেংচিযে বলেছিল, 'ঈস, ভাবি তো দবদ। নষ্ট কবি তো কবব। আপনাব বাবাব বাড়ি তো নয, আব মাগনাও আমবা থাকি না, বীতিমত মাসেব পব মাস ভাড়া গুনি।'

সরকাব মশাই আব সহ্য কবতে পাবেননি। গোবিন্দেব গালে ঠাস কবে এক চড় মেবে বলেছিলেন, 'গুনিস তো হাবামজাদা তাতে আমাব কি। সে ভাড়া কি আমি খাই ? তুই আমাব বাপ তুলে কথা বলিস, এত বড় স্পর্ধা তোব।'

বলে দ্বিতীয চড় মাবতে উদ্যত হযেছিলেন সবকাব মশাই, কিন্তু গোবিন্দ যীশুখৃষ্টেব উপদেশ স্মবণ কবে গাল বাড়িযে দেযনি, সবকাব মশাই'ব হাত মুচড়ে দিযেছিল।

ব্যাপাবটা যখন আমাব কানে গেল, আমি অঞ্জলিকে ডেকে বললাম, 'অবশ্য সবকাব মশাইবও দোষ আছে। কথাবার্তা একটু ভদ্রভাবে বলা তাঁব উচিত ছিল, মারধব কবাটাও ঠিক হযনি, কিন্তু ওবা থাকলে এ ধবনেব গণ্ডগোল আবো হবে। ওদেব এবার তুলে দেওযা দবকাব।'

অঞ্জলি বলল, 'না, ওবা এমন কিছু দোষ কবেনি যে, ওদেব তুলে দিতে হবে। তোমাদেবই উচিত সবকাব মশাইকে ববখাস্ত করা।'

আমাব আব সহ্য হল না, বললাম, 'আমাদেব কি উচিত না উচিত, তা তোমাকে দেখতে আসতে হবে না অঞ্জলি, তুমি ওদেব যেতে বল, ওদেব বিরুদ্ধে আবো অভিযোগ আছে।'

'কি অভিযোগ ?'

'ওবা সন্ধ্যাব পব ছাতে এসে আড্ডা দেয, আব বিড়ি টানে।' অঞ্জলি অদ্ভুত একটু হাসল 'কি কববে বল, তোমাব মত দামী সিগাবেট তো ওদেব নেই, সস্তা বিড়ি টানা ছাড়া ওদেব আব গতি কি আছে। আব ছাতে ওবা আড্ডা দিতে যায় না। সাবাদিন ফার্নেসেব সামনে থেকে জ্বলেপুড়ে, কদাচিৎ দু'একদিন একটু হাওযায গিযে বসে। তোমাব বউদি তখন একটু সবে গেলেই পাবেন। ছাতটা তো কেবল দোতলা-তেতলাব বাসিন্দাদেবই নয, একতলাব জীবদেবও তাতে একটু আধটু অধিকাব আছে।'

অনেক সময অনেক বাঁকা কথা বলেছে অঞ্জলি। কিন্তু ওব আজকেব বলবাব ভঙ্গি এত রূঢ়, এত স্পর্ধিত যে, আমাব অত্যন্ত অসহ্য লাগল। তীব্র বিদ্রূপে বললাম, 'নতুন ধর্মভাইদেব ওপব তো তোমাব ভাবি টান, ভাবি দবদ দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওদেব তুমি যদি না তুলে দাও, আমি তোলাব ব্যবস্থা কবব।'

অঞ্জলি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাব দিকে তাকিযে বলল, 'বেশ তো তুমিই কব।'

আমি মুহূর্তকাল স্তব্ধ হ'যে বইলাম। তাবপব তাব সামনেই সরকাব মশাইকে ডেকে বললাম, 'সবকাব মশাই, ওই লোকদুটোকে তিন দিনেব মধ্যে আমাব বাড়ি থেকে তুলে দেবেন।'

অঞ্জলি একটু কাল আমাব দিকে তাকিযে রইল। তাবপব বলল, 'আচ্ছা। কিন্তু সরকার মশাই যেন নিজের গাযেব জোব খাটাতে না আসেন। তা'হলে হযতো অশিক্ষিত মজুবদেব হাতে ফের অপমানিত হবেন। যা করবার আইন আদালতেব সাহায্য নিয়েই তিনি কবেন যেন।'

বললাম, 'আইন আদালত ? তুমি আমাকে আইনের ভয় দেখাচ্ছ অঞ্জলি ?'

অঞ্জলি বলল, 'ভয় নয়। তুমি তো আইন আদালতই ভালোবাসো। আচার অনুষ্ঠানের কাব্যে তো তোমার বিশ্বাস নেই, তাই বলছিলাম।'

আমি স্তম্ভিত হ'য়ে রইলাম। অঞ্জলি আর দাঁড়ালো না।

অনেকদিন অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে। কিন্তু এত বিদ্বেষ, এত বিতৃষ্ণা কোনদিন বোধ করিনি। অঞ্জলির আজকের কলহের মধ্যে লালিত্য নেই, অভিমান নেই, অনুযোগ নেই, কেবল অপমান আছে। এ অপমান আমি সহ্য করতে পারি না।

খানিক বাদে মনটা শান্ত হলে সরকার মশাইকে অবশ্য আমিই নিষেধ করে দিলাম। বললাম, 'ব্যাপারটা আমি ভেবে দেখি। হঠাৎ কিছু করবার দরকার নেই আপনার।'

সরকার মশাই মৃদু হেসে জানালেন যে, হঠাৎ তিনি কিছু করবেন না। যা করবার দরকার আমার সুচিন্তিত মতামত নিয়েই করবেন।

দিন কয়েক কাটল। অঞ্জলিকে আমি আর ডাকলাম না। অনেক ডেকেছি, অনেক সহ্য করেছি, আর নয়। এবার ও নিজে আসুক, নিজের ভুল স্বীকার করুক। ঔদ্ধত্যের জন্য মার্জনা না চায়, লজ্জা প্রকাশ করুক। তার আগে আমি ওকে ক্ষমা করব না।

সেদিন সন্ধ্যাব পর অনেক কাল বাদে ফেব খুলেছি বইয়ের আলমারি। ভাবছি দর্শন, বিজ্ঞান নয়, কিছু বাঙ্গালা কাব্য পডব। হয় বৈষ্ণব পদাবলী, নয় রবীন্দ্রনাথ—বহুদিন কবিতা পড়ি না, ফুল কিনি না, তাকাই না আকাশের দিকে। অথচ ফুল ফুটেছে, কেবল তারা নয়, চাঁদও উঠেছে, কেবল ক্যালেণ্ডারের পাতায় তারিখে বসন্তেব আবির্ভাব দেখলাম না, মনেব মধ্যেও শুনলাম ফাল্গুনের গুনগুনানি। ওপরের তাক থেকে বই টেনে নিচ্ছি হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল। টোকা তো নয়, যেন ভিতবের আব এক রুদ্ধ দবজায় কে যেন ধাক্কা দিয়েছে।

বললাম, 'এস দোর খোলাই আছে।'

কিন্তু দোর খুলে ঢুকলেন আমাদেব সরকাব মশাই। সহর্ষে বললেন, 'আমাদের আব তুলতে হল না ছোটবাবু। যাবা তুলবার তাবাই তুলে নিয়ে যাচ্ছে। একতলায় দেখুন গিয়ে কাণ্ড।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কি হয়েছে একতলায় ?'

সরকার মশাই বললেন, 'কি আবার হবে। লালপাগড়ীতে ছেয়ে গেছে। ঠিক সেবারের মত।'

সেবারের মত আজ আমাকে কেউ ডাকতে এলো না। কিন্তু কৌতূহলী হ'য়ে নিজেই গেলাম। কেবল কি কৌতূহল ? বউদি, পিসীমা সবাই রেলিংয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে দেখছেন। আমি তাঁদেব পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলাম।

সাব-ইন্সপেক্টর নিশানাথবাবু আজও দোরেব সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখে হেসে বললেন, 'এই যে আপনি আছেন দেখছি। ভালোই হল।'

বললাম, 'তাতো হল। কিন্তু ব্যাপারটা কি ?'

গ্লাস ওয়ার্কসের প্রোপ্রাইটার রাধানাথ কুণ্ডুর জামাই শশিপদর মাথায় কারা লোহার ডাণ্ডা মেরেছে। তাঁকে পাঠাতে হয়েছে হাসপাতালে, কুণ্ডুমশাইয়ের সন্দেহ হাবুলদেরই এই কীর্তি। এদের নামেই পুলিসে ডায়েরী করেছেন তাঁরা।'

বললাম, 'কিন্তু এরাই যে করেছে তার প্রমাণ কি ? এরা কেন করবে ?'

নিশানাথবাবু বললেন, 'কেন করবে, আমরাও তো তাই ভাবি। তাঁদের কারখানায় এরা কাজ ক'রে খাচ্ছে এই দুর্দিনে, অন্ন জুটছে তাঁদের দয়ায়। তবে শশিপদবাবু একটু রূঢ়ভাষী. সে দোষ তাঁর আছে। কিন্তু যে গরু দুধ দেয়, তার লাথিটাও সয় মশাই। তাই ব'লে—'

তার কথায় বাধা দিয়ে হাবুল রূঢ় ভঙ্গিতে বলল, 'তাই ব'লে কেউ কারো মাথায় বাড়ি মারতে যায় না, আমরাও তা যাই নি। আমরা যা করব ইউনিয়নের মারফৎ করব। শশিপদবাবু মাথায় লোহার ডাণ্ডার ঘা খেল কেন, তা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন গিয়ে। কে আমাদের নীলকণ্ঠের বিধবা বোনের ঘরে ঢুকতে গিয়েছিল ? অনর্থক আমাদের ওপর দোষ চাপালেই হল।'

নিশানাথবাবু কঠিন স্বরে ধমক দিয়ে উঠলেন, 'চুপ, যা বলবার কোর্টে বলবে। তোমাদের কোন

দোষ নেই ? গুণ্ডা, বদমাস কোথাকাব, তোমবা যে কত গুণী, তা যেন জানতে বাকি আছে আমাদেব। এই তো সেদিন প্রবীববাবুদেব সবকাব মশাই'ব হাতখানা মুচডে ভেঙে দিযেছ তিনজনে মিলে। আজ ভোবে বাজাবে দেখা, কত দুঃখ কবলেন সবকাব মশাই। ওঁবা নেহাৎ সদাশয লোক। তাই তোমাদেব দযা ক'বে থাকতে দিচ্ছেন। কিন্তু কিছুদিন শ্রীঘবে না থাকলে তোমাদেব শিক্ষা হবে না।'

অঞ্জলি এগিযে এল। বলল, 'কিন্তু আমাব দৃঢ বিশ্বাস, এ ব্যাপাবে ওদেব কোন দোষ নেই। হাবুলেব একবোখা স্বভাবেব জন্যই আপনাবা ওকে সন্দেহ কবছেন।'

নিশানাথবাবু একটু হাসলেন, 'আপনাব দৃঢ বিশ্বাস তো আপনাদেব বাবাব সম্বন্ধেও ছিল। এবাব দেখা যাক কি হয। ওদেব দোষ না থাকলে তো ভালোই।'

খানাতল্লাসীতে বিশেষ কিছু পাওযা গেল না। বিডি সিগাবেট খাওযাব জন্য এ্যাম্পিউল ফাক্টবী থেকে কাঁচেব তিনটি চমৎকাব পাইপ তৈবি কবেছিল তিন বন্ধু। নিশানাথবাবু সেগুলি কুডিযে নিলেন, সেই সঙ্গে কিছু লিফলেট প্যাম্পলেটও তাঁব হাতে পডল।

নিশানাথবাবু ওদেব তিনজনকে এ্যাবেস্ট কবে নিযে বাডিব বাইবে যাওযাব পব হঠাৎ আমাব চোখ পডল অঞ্জলিব ওপব। স্পন্দনহীন পাথবেব মূর্তিব মত দাঁডিযে আছে অঞ্জলি। ওব মুখেব দিকে তাকিযে হঠাৎ আমাব বুকেব ভিতব ধ্বক ক'বে উঠল। বললাম 'একটু এ ঘবে এসো অঞ্জলি। ব্যাপাবটা ভালো কবে শুনি। গতবাব যে ভুল কবেছিলাম, এবাব আব তা কবব না। এবাব নিশানাথবাবু আব কুণ্ডুদেব ধবে বিষযটা গোডাতেই মিটিযে নিতে হবে। শোন কথা আছে তোমাব সঙ্গে।

অঞ্জলি বলল 'আমাবও কথা আছে। তুমি ও ঘবে অপেক্ষা কব, আমি এক্ষুণি আসছি।'

অঞ্জলিবও কথা আছে। এই বিসদৃশ পবিবেশেব মধ্যে কথাটুকু ভাবি মিষ্টি লাগল আমাব কানে।

একটু বাদে এ ঘবে চলে এল অঞ্জলি। ওব সেই পডাব ঘব। সেই টেবিল নেই সেই বইপত্র নেই কিন্তু ঘবতো ঠিকই আছে স্মৃতি তো ঠিকই আছে।

আমি কিছু বলবাব আগে অঞ্জলি আজও আমাব খুব কাছে ঘেঁযে দাঁডাল। আজও আমাকে হযতো তেমনি বিহ্বলভাবে জডিযে ধববে বিপদেব পব বিপদ যাচ্ছে ওদেব কতক্ষণ আব সয নাভে। ধবে তো ধরুক। আজ আব আমি আডষ্ট হযে থাকব না। ওব বাঁবাব দুষ্কৃতিব জন্য তো আব ও দাযী নয। ওব আলিঙ্গন আমি আজ সুস্থ প্রসন্ন মনে গ্রহণ কবব।

কিন্তু অঞ্জলি ঠিক সেদিনেব মত দুহাত দিযে আমাকে আজ আব আঁকডে ধবল না। মৃদু হেসে বলল 'তোমাব হাতখানা দেখি'

আমি হাত বাডিযে দিলাম।

অঞ্জলি ওব হাতেব মুঠি খুলে সেই হীবাব আংটিটা আমাব অনামিকায ধীবে ধীবে পবাতে লাগল, শিউবে উঠল গা। অনেকদিন পব ও আমাকে স্পর্শ কবেছে। অঞ্জলি বলল, আংটিটি উদ্ধাব কবে এনেছি। অনেক টাকায বাঁধা ছিল। একসঙ্গে দিতে পাবিনি টাকাটা, কিস্তিতে শোধ দিতে হযেছে।'

ওব কাণ্ড দেখে অবাক হযে যাচ্ছিলাম। বললাম, 'এই আংটিব দাম অনেক। ফিবিযে এনেছ, ভালই কবেছ। কিন্তু এ আংটি আমাকে পবাচ্ছ কেন ?'

অঞ্জলি অদ্ভুত একটু হাসল। বলল, 'তোমাব হাতেই থাক। ফেব তো মামলা মোকদ্দমা শুরু হল। আবাব কখন বাঁধা পডে, আবাব কখন বাঁধা পডি, তাব ঠিক কি' বললাম, 'কিন্তু বাঁধা তোমাকে পডতে হবে অঞ্জলি। আমি আব এক মুহূর্তও দেবি কবব না। হাবুলদেব কালই ছাডিযে নিযে আসব। কিন্তু তোমাদেব আব একতলায থেকে দবকাব নেই। বাঁধা-বাডা তো এখনও হযনি তোমাদেব। মিণ্টু বিণ্টুকে নিযে তোমবা সবাই ওপবেই আজ খাবে। চল আমাদেব সেই তেতলাব ঘবে যাই।'

চোখ তুলে আমাব দিকে তাকাল অঞ্জলি। যেন প্রবল এক ঝডেব দোলায ও স্থিব থাকতে পাবছে না। কিন্তু আস্তে আস্তে ফেব শান্ত হ'ল অঞ্জলি। মাথা নেডে ঠিক আগেব মতই মৃদু হেসে বলল, 'না, তেতলাব ঘবে গিযে আব কি কবব বল। আমি ও ঘবে গেলে তোমাব শুধু জাতই যাবে

না, হয়তো ধন প্রাণ নিয়েও টান পড়বে।' গলা তেমনি মিষ্টি অঞ্জলির, কিন্তু কথা মধুর নয়।
বললাম, 'কি বলছ তুমি ?'
আমার কথা অঞ্জলির কানে গেল না, ওর নিজের কথাব জেব টেনেই বলে চলল, 'হয়তো বাবার মত এক হাতে চুরি কবব, ভায়ের মত আব এক হাতে মাথায় লাঠি মেবে বসব। আমাব আর গিয়ে কাজ নেই ওখানে।'
আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অঞ্জলির দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলাম। তারপর তীক্ষ্ণতব স্বরে বললাম, 'সেই ভালো।'

ফাল্গুন ১৩৫৬

অভিনেত্রী

চিৎপুর অঞ্চলে মালতী মল্লিকের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট কবতে এসেছিল পবিচালক অনিমেষ চৌধুবী। বহুকাল সহকারী থেকে থেকে এবার সে নিজেই একখানা ছবি ডাইবেক্ট করবাব ভাব পেয়েছে। কিন্তু প্রযোজক বৈকুণ্ঠ পোদ্দারেব মতো বাযকুণ্ঠ লোক বোধ হয দুনিযায দুটি নেই। আশি-পঁচাশি হাজাব টাকার মধ্যে খুব ভালো বই তুলে দিতে হবে—এই শর্তে অনিমেষকে তিনি কাজ দিয়েছেন। টাকার অঙ্কটা শেষ পর্যন্ত লাখে গিয়ে পৌঁছবে তা অবশ্য অনিমেষ জানে। তবু গোড়া থেকেই বেশ একটু সতর্ক হযে অনিমেষকে কাজ কবতে হচ্ছিল। তাব জন্য ছুটোছুটি, পরিশ্রমও করছিল প্রচুব ; যেখানে অন্য লোক পাঠালে চলে সেখানেও অনিমেষ নিজে না গিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিল না।
অভিনয়ে অবশ্য মালতীব তেমন খ্যাতি নেই। যা হোক কবে কাজ মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারে। কিন্তু তাব জন্য নির্বাচিত ভূমিকাটিও বইযেব মধ্যে অপ্রধান। বেকার স্বামীব স্ত্রী, রুগ্ন সন্তানেব মা, পবিবারের ছোট বউয়ের ছোট অংশ। সব নিয়ে দু-তিন দিনেব স্যুটিং। এর জন্য দ্বিতীয় শ্রেণীর অভিনেত্রীরাও অনেক টাকা দাবি কববেন। তাঁদেব তুলনায় মালতীকে খুব অল্পেই পাওয়া যাবে। বন্ধুরা তাই বলেছিল। কিন্তু বাড়িতে গিয়ে সন্ধ্যাব পব মালতীকে পাওয়াই গেল না। ঝি ক্ষান্তমণি হেসে বলল, 'দিদিমণি বাবুব সঙ্গে গাড়িতে বেরিয়েছেন, কখন ফিববেন, কিছু ঠিক নেই। এলে কি বলব বলে দিন।'
স্টুডিওব নাম আব দেখা করবাব সময় এক টুকরো কাগজে লিখে দিয়ে অনিমেষ বিরক্তমুখে বেরিয়ে এল। মনে মনে ভাবল, সন্ধ্যাটাই মাটি হয়ে গেল একেবারে।
জয় মিত্র স্ট্রীটে একজন পুবনো বন্ধু আছে,বিনয় চক্রবর্তী। গেলে তার স্ত্রী লাবণ্য চা-টা দেয়, আদর-যত্ন করে। বিনিময়ে অনিমেষও দু-একখানা সিনেমার পাস সংগ্রহ করে দেয তাদের। বহুদিন ওদেব কোন খোঁজ-খবর নেওয়া হযনি। অনিমেষ ভাবল একবাব ঢুঁ মেবে যায় বন্ধুব বাসায।
গলিব ভিতরে তস্য গলি। পুবনো বাড়ির একতলা ঘর। খুব কষ্টেই আছে বিনয়। ভাল চাকরি-বাকরি কিছু পায়নি। তবু মাঝে মাঝে এই দরিদ্র দম্পতির বাসায় এসে খানিকক্ষণ কাটিয়ে যেতে খুবই ভালো লাগে অনিমেষের। বেশ একটা সরল আন্তরিকতার স্বাদ পাওয়া যায় এখানে এলে। এক কাপ চা, একটু রুটি-তরকাবি, মাসের প্রথম দিকে হলে কোনদিন বা একটু সুজি ছাড়া লাবণ্য তাব সামনে আর কিছু ধরে দিতে পারে না। কিন্তু গেলে এমন আদর-যত্ন করে, এত আনন্দ পায় যেন পরম অপ্রত্যাশিত কোন মহামান্য অতিথি তাদের ঘরে এসেছে।

ভিতরে কি যেন কথা কাটাকাটি চলছিল, বার-দুই কড়া নাড়তে তা থেমে গেল। বিনয় এসে দোর খুলে বলল, 'কে ?'

তারপর অনিমেষকে দেখে বলল, 'এস।' কিন্তু আমন্ত্রণের মধ্যে যেন তেমন উত্তাপ নেই—বড় শুকনো গলা, বড়ই যেন বিরস বিনয়ের মুখ।

লাবণ্যর মুখও ভার-ভার। ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো। বিনয়ের জামাটা মেঝেয় লুটাচ্ছে। দু'পাটি জুতো ঘবের দুই প্রান্তে। তার এক পাটি কোলের উপর তুলে নিয়েছে বিনয়ের কালো মাথানেড়া রোগা বছর তিনেকের ছেলেটি। মেঝের ওপর ছোট ছোট আরও গোটা দুই কাগজের মোড়ক। একটা ফেটে গিয়ে মেঝেয় খানিকটা মসুরির ডাল ছড়িয়ে পড়েছে।

অনিমেষেব বুঝতে বাকি বইল না, বেশ একটা খণ্ডপ্রলয় হয়ে গেছে খানিকক্ষণ আগে।

লাবণ্য একবার অনিমেষের দিকে তাকিয়ে কোন কথা না বলে দ্রুতহাতে ঘর গুছাতো শুরু করল।

অনিমেষ বলল, 'এসে বুঝি রসভঙ্গ করে ফেললাম। দাম্পত্য কলহটা খুবই জমে উঠেছিল দেখা যাচ্ছে। ঝগড়া কবাটা তোমাব কি অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে বিনয় ?'

তক্তপোশে বন্ধুকে বসতে দিয়ে বিনয় পকেট হাতড়ে একটা 'পাসিং শো' বার করে তার হাতে দিতে গেল।

অনিমেষ বলল, 'সিগারেট আমাব কাছে আছে।' বলে নিজেই গোল্ডফ্লেকের প্যাকেটটা খুলে ধবল।

বিনয় সিগাবেট ধবিয়ে দু-একটা টান দিয়ে বলতে লাগল, 'রোজ রোজ এই অশান্তি, এই ঝগড়া-ঝাটি আমারই কি ভালো লাগে ভাই। কিন্তু যাকে নিয়ে ঘর-সংসার, সে যদি এমন অবুঝ হয় তো পারি কি করে ? আচ্ছা, ছেলে কি কারও হয় না ? না কি, ছেলেপুলে থাকলে কোন রোগব্যাধি হতে নেই ? কিন্তু তার ওষুধ-পথ্য নিয়ে কার বউ এমন ঝগড়া করে শুনি ? যার যেটুকু সাধ্য, সে সেইটুকুই করতে পাবে। তার বেশি চাপ দিলে—'

লাবণ্য ফোঁস করে উঠল, 'কে কাকে চাপ দিতে গেছে ঠাকুরপো ? ছেলেটা টাইফয়েড়ে এবাব তো শেষই হয়ে গিয়েছিল, যে দেখেছে সেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, কেউ ভাবেনি ওকে ফের তুলতে পারব।'

ছেলেকে হাত ধবে হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টানে নিয়ে এসে অনিমেষের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে লাবণ্য বলল, 'দেখুন তো কি হাল হয়েছে, বলুন তো মানুষের কোন ছিরি আছে চেহারায় ? একটা পা এখনও টেনে টেনে হাঁটে। কাল নিয়ে গিয়েছিলাম ডাক্তাবের কাছে। বললেন ভাল করে খাওযাতে-টাওয়াতে না পাবলে সারবে না। সাধারণ স্বাস্থ্য ভালো হলে পাযেব দোষটুকু আপনিই সেরে যাবে। তাই বলছিলাম এক কৌটো ওভালটিনের কথা। তাতে যে কোন মানুষ এমন রাগ করতে পাবে, এমন মুখ খারাপ করতে পাবে—'

বলতে বলতে থেমে গেল লাবণ্য। পাযে আচমকা টান লাগায় ছেলেটি বোধ হয় ব্যথা পেয়েছিল। সে ঠোঁট ফুলিয়ে কাঁদবার উপক্রম করতেই লাবণ্য তাকে কোলে তুলে নিয়ে সস্নেহে মধুরস্বরে বলল, 'ছি ছি ছি, কাকাবাবুর সামনে বুঝি কাঁদে ? কাকাবাবু কি বলবেন বল তো ? দেশ-বিদেশে নিন্দে করে বেড়াবেন যে ? জান কত ভাল ভাল ছবি তোলেন তোমার কাকাবাবু ! আমাদেব বিন্তুর কিন্তু চমৎকার একখানা ছবি তুলে দিতে হবে ঠাকুরপো।'

লাবণ্য একটু হাসল।

অনিমেষের চোখে এই অপ্রত্যাশিত হাসিটুকু ভারি সুন্দর লাগল। বিনয়ের ছেলের তুলনায় তার স্ত্রীকে সুশ্রীই বলা যায়। রঙ ফর্সা, টানা নাক চোখ। মুখের গড়নের মধ্যে বেশ একটু মিষ্টত্ব আছে। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। দীর্ঘ দোহারা চেহারা, স্বাস্থ্য এত অভাব-অনটনেও ভেঙে পড়েনি। এমন রোগা-আকৃতির ছেলে লাবণ্যের কোলে মানায় না। কিন্তু মাতৃত্ব ওর স্নিগ্ধ সৌন্দর্যকে মধুরতর করেছে।

অনিমেষকে অমন করে তাকাতে দেখে লজ্জিত হয়ে লাবণ্য চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'আপনি

তো আজকাল আসেনই না, শুনেছি ডিরেক্টর হয়েছেন—'

অনিমেষ হেসে বলল, 'তা হয়েছি।'

তারপর বন্ধুর দিকে ফিরে তাকাল অনিমেষ : 'সত্যি, এ তোমার ভারি অন্যায় বিনয়—ছেলেটার একটু যত্ন-টত্ন নেওয়াই তো উচিত এখন। সবে অসুখ থেকে উঠেছে। বউদি ওভালটিন আনতে বলেছিলেন আনলে না কেন ?'

বিনয় উত্যক্ত হয়ে বলল, 'আনলে না কেন ! ফরমায়েস কি এক ওভালটিনেরই ছিল নাকি ? ছেলের জন্যে বিস্কুট, সংসারের জন্যে এক পো ডাল, চা, এদিকে মাসের শেষ ; কোন্‌টা রেখে কোনটা আনি শুনি। যা না আনব, তাই নিয়েই তো কুরুক্ষেত্র, আর ছেলের আদব-যত্নের কথা যদি বল, সওব টাকা মাইনেব কেরানীর ঘরে ছেলের আদরটা কিছু কম হচ্ছে নাকি ?'

মেঝেয় সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বিনয় অদ্ভুত একটু হাসল : 'ছেলে নিয়ে এর চেয়ে বেশি আদব-আহ্লাদ করবার শখই যদি ছিল, কেরানীর সন্তান পেটে না ধরে কোন বড়লোকেব ঘরে গিয়ে ছেলে বিয়োলেই হত।'

লাবণ্য বলল, 'শুনুন, কথা শুনুন একবার।'

অনিমেষ বন্ধুকে ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'ছিঃ, কি যা-তা বলছ বিনয়, এত মুখ খারাপ করতে শিখলে করে থেকে ? ছি ছি ছি !'

অপ্রস্তুত হয়ে বিনয় এবার একটুকাল চুপ করে রইল।

অনিমেষ আন্তরিক সহানুভূতিতে বন্ধুর দিকে তাকাল, কেবল মুখের কথাই তো খারাপ হয়নি, বিনয়ের মুখের গড়নও বড় বিশ্রীভাবে বদলে গেছে। ত্রিশ-একত্রিশের বেশি বয়স হবে না ওর। কিন্তু গাল ভেঙে চোয়াল জেগে এমন হয়েছে চেহারা যেন মনে হয় অনেক দিন চল্লিশ পার হয়ে গেছে।

অনিমেষ বলল, 'পার্ট-টাইম কিছু একটা জোগাড় করতে পারলে নাকি বিনয় ?'

বিনয় মাথা নাড়ল : 'না, তোমাকে এত করে বললাম—'

অনিমেষ বলল, 'চেষ্টা তো করে দেখলাম ভাই, কিন্তু আমাদের যা লাইন, তাতে—'

লাবণ্য তাক থেকে চা চিনি আর দুটি কাপ পেড়ে নিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ছেলে তার সঙ্গে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলল।

'আবার তুমি আসছ ?'

একটু পিছন ফিরে অনিমেষের দিকে তাকিয়ে লাবণ্য ফের একটু হাসল : 'এক নিমেষও চোখের আড়াল করবার জো নেই এমন জ্বালা !'

দোরের বাইরে গিয়েই ছেলেকে যে লাবণ্য কোলে তুলে নিল, তা অনিমেষের চোখ এড়াল না।

বিনয় বলল, 'তুমি তো এবার ডিরেক্টর হয়েছে অনিমেষ। দু-এক নম্বর পার্ট-টার্ট দাও না আমাকে। দু-দশ টাকা যদি আসে মন্দ কি ?'

অনিমেষ হেসে ফেলল : 'তোমাকে পার্ট দেব ? লোকের সামনে কথাই বলতে পার না ভালো করে,তো তুমি আবার অভিনয় করবে ! তোমাকে পার্ট দিলে তো মৃত সৈনিকের পার্ট দিতে হয় বিনয়।'

বিদ্রূপ শুনে বন্ধুর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল বিনয়, তারপর একটু হাসল : 'মৃত সৈনিকের পার্ট তুমি আর নতুন করে দেবে কি ভাই, মৃত সৈনিক হয়েই তো আছি। তুমি বড়জোর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিয়েছ। তার চেয়ে বেশি তো কিছু করনি।'

চায়ের কাপ হাতে লাবণ্য ঘরে ঢুকে একটু হেসে বলল, 'এবার বুঝি আপনার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেছে। এমন খিটমিটে মেজাজও হয়ে গেছে জানেন। ঝগড়া ছাড়া আজকাল এক মুহূর্তও থাকতে পারে না।'

চায়ের কাপে একটু চুমুক দিয়ে স্মিতমুখী লাবণ্যের দিকে তাকিয়ে অনিমেষ বলল, 'ঝগড়া নয়, বিনয় আমার কাছে পার্ট চাইছিল। আমি বলি কি বউদি, বিনয়ের দ্বারা তো হবে না, কিন্তু আপনি পারলেও পারতে পারেন। আপনি নিশ্চয় পারবেন। করবেন ?'

শুনে লাবণ্যও হাসল 'সত্যি নাকি ? বেশ তো, নামিয়ে দিন না। আপনি যেখানে ডিরেক্টর, আমার সেখানে অ্যাক্ট না করলে চলবে কেন ?'

অনিমেষ বলল, 'না ঠাট্টা নয়। আমি সত্যিই বলছি।' তারপর বিনয়ের দিকে ফিরে তাকাল অনিমেষ, 'আমি seriously বলছি বিনু। তোমরা যদি রাজী হও তা হলে বউদিকে একটা ছোটমতো রোল দেওয়া যায়।'

বিনয় হাসল 'তাই নাকি ?'

পরিকল্পনাটা এবার খুলেই বলল অনিমেষ। বিনয় হাসছে কেন ? এতে দোষের কি আছে ? আজকাল কত ভদ্রঘরের মেয়েরাও তো আসছেন এ লাইনে। খুব ছোট পার্ট, ফষ্টি নষ্টি কিছু নেই। লাবণ্যের উপযুক্ত ভূমিকাই তাকে দেবে অনিমেষ। রুগ্ন সন্তানের জননীর রোলেই সে নামাবে লাবণ্যকে। সবসুদ্ধ তিন-চারটি শটের বেশি হবে না। কথাও খুব সামান্য। স্বামীর সঙ্গে মাত্র একবার সাক্ষাৎ হবে। বাকি সব দৃশ্যই ছেলের সঙ্গে আর বুড়ো ডাক্তারের সঙ্গে। স্টুডিওতে বিনয় থাকবে, অনিমেষ থাকবে, কোনও অসুবিধা হবে না। বিনয়ের ছেলে বিন্তুকে সুদ্ধ নামাবে অনিমেষ। নিজের ছেলেকে ঘরে যেমন আদর যত্ন সেবা শুশ্রূষা করছে লাবণ্য, স্টুডিওতে ক্যামেরার সামনে তার চেয়ে বেশি কিছু করতে হবে না। সব দিয়ে দিন তিনেক বেরুতে হবে বড়-জোর। প্রযোজককে বলে-টলে শ'তিনেক টাকার ব্যবস্থা অনিমেষ করতে পারবে

তিন শ' টাকা। রুদ্ধশ্বাসে চুপ করে রইল লাবণ্য। সে যে অনেক। বিন্তুর চিকিৎসার জন্যে আগে যা কিছু ধার আছে তা শোধ দেওয়া যাবে। দিয়ে থুয়ে যা বাকি থাকবে তাতে ভাল ফুড হবে বিন্তুর ওর নতুন জামা জুতো প্যান্ট আসবে। ওর নামে পঁচিশ টাকার একটা সেভিংস অ্যাকাউন্টও খুলে রাখবে লাবণ্য। বড়লোকের ছেলেদের নামে ব্যাঙ্কে টাকা থাকে বলে সে শুনেছে। সে টাকায় হাত দিতে দেবে না বিনয়কে। কিন্তু তিন শ' টাকাই যদি এক সঙ্গে আসে বিনয়ের জন্যেও কিছু কিনে দিতে হবে বউকি, যে হিংসুটে মানুষ। বেরুবার মতো ভালো জামা কাপড় নেই তা করতে হবে একটা সিগারেট কেসের ভারি শখ বিনয়ের, তাও একটা কিনবে লাবণ্য ওর জন্যে। নিজের একখানা ভাল শাড়ি নেই বাক্সে। অবশ্য সে মুখ ফুটে চাইবে না, বিনয় যদি কেনে কিনবে হাতে অত টাকা এলে বিনয় অবশ্য শাড়ির কথাই আগে বলবে তা লাবণ্য জানে।

আপনি ঠাট্টা করছেন। লাবণ্য অস্ফুট স্বরে বলল

অনিমেষ বলল 'না বউদি আমি মোটেই ঠাট্টা করছি না। আপনারা যদি রাজী হন আমি সব ব্যবস্থা করে ফেলি।

লাবণ্য বলল কিন্তু লোকে যে নিন্দে করবে '

অনিমেষ বলল 'কেন নিন্দে করবে ? এতে নিন্দের কি আছে ? তা ছাড়া আপনি যদি নিজের নাম না দিতে চান না দেবেন। লাবণ্যের বদলে অন্য নাম রাখলেই হবে।

বিদায় নেওয়ার সময় বন্ধুকে আরও একবার অনুরোধ করে গেল অনিমেষ। তারা সারা রাত ভালো করে ভেবে দেখুক। কাল বেলা দশটার মধ্যে কিন্তু পাকা কথা দিয়ে আসতে হবে অনিমেষকে, বিনয় যদি রাজী না হয় তা হলে অন্য লোকের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে ফেলবে অনিমেষ। তার দেরি করবার সময় নেই। বইয়ের স্যুটিং প্রায় আধাআধি হয়ে গেছে বাকি অর্ধেক মাসখানেকের মধ্যে শেষ করা চাই।

সদর-দরজা পর্যন্ত লাবণ্য আর বিনয় এগিয়ে দিয়ে এল অনিমেষকে।

লাবণ্য বলল, 'কিন্তু ঠাকুরপো, আমি কি পারব ? আপনি কি শিখিয়ে নিতে পারবেন আমাকে ?'

অনিমেষ বলল, 'নিশ্চয়ই। মা কি করে ছেলের পরিচর্যা করে, ছেলের শক্ত অসুখে তার মনের অবস্থা কি রকম হয় না-হয় তা তো আর আপনাকে শিখিয়ে দেওয়ার বেশি দরকার হবে না।'

পরদিন সকালেই বিনয় গিয়ে অনিমেষকে খবর দিল, লাবণ্য রাজী হয়েছে। বিনয় বলল 'কিন্তু নামটা ভাই বদলে দেওয়াই ভাল।'

অনিমেষ হেসে বলল, 'এটা কি তোমার ইচ্ছে ? না, তাঁর ইচ্ছে ? শেষে বউদি যখন নামকরা লোক হয়ে পড়বেন, তখন নাম বদলাবার জন্যেই হয়তো অনুতাপ হবে। আচ্ছা, নামের ব্যাপার তো

সব চেয়ে পরে। সে তখন দেখা যাবে।'

দুপুরের পর মালতী গিয়ে স্টুডিওতে হাজির। ত্রিশ পেরিয়ে গেছে বয়স। চোখেমুখে অমিতাচারের ছাপ। পুরু পাউডারের প্রলেপে তাকে প্রাণপণে ঢাকবার চেষ্টা করেছে। ঠোঁটে লিপস্টিক, চড়া রঙের শাড়ি গয়নার চুল বাঁধবার ঢঙে নিজেকে অষ্টাদশী বলে প্রমাণ করবার প্রয়াস সুস্পষ্ট।

অনিমেষ ভ্রুকুঞ্চিত করে বলল, 'বড় দেরি করে এলেন মিস মল্লিক। আমি আর একজনের সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করে ফেলেছি।'

মালতী বলল, 'সে কি, আপনি তো আজ বারোটার সময় স্টুডিওতে দেখা করতে বলেছিলেন। এখনও তো পাঁচ মিনিট বাকি আছে বারোটার।'

নিজের হাত ঘড়িটা মালতী অনিমেষের চোখের সামনে তুলে ধরল

অনিমেষ বলল আমাকে আজ সকালেই কন্ট্রাক্ট করে ফেলতে হয়েছে। বড় তাড়াতাড়ি ছিল। কাল থেকেই ফের স্যুটিং আরম্ভ কিনা। তা ছাড়া ভেবে দেখলাম মায়ের ভূমিকা আপনাকে ঠিক মানাতও না আপনার উপযুক্ত কোন রোল থাকলে নিশ্চয়ই—'

মালতী চটে উঠে বিকৃতমুখে বলল, 'আপনার মত অমন পুঁচকে ডিরেক্টর ঢের ঢের দেখেছি অনিমেষবাবু। ছিলেন ফটোগ্রাফার, হয়েছেন ডিরেক্টর বলে কিনা—"যত ছিল নলবুনে সব হল কীর্তুনে। ধরাকে সরাজ্ঞান করছেন। মানাত না! না মানাবার কি আছে শুনি? কেবল মা কেন, জেঠিমা, খুড়ীমা, মাসীমা, পিসীমা ইচ্ছা করলে না পারি কি? এতদিন ওসব রোলে কেউ আমাকে নামাতে পারেনি। আপনার বইতে নিজের ইচ্ছেই নামতে চেয়েছিলাম। বেশ, কন্ট্রাক্ট আপনি না করতে চান না করলেন, কিন্তু এক মাঘে শীত যায় না, তাও বলে দিচ্ছি।'

খানিকক্ষণ চেঁচামেচির পর গট গট করে বেরিয়ে গেল মালতী।

স্টুডিও সম্বন্ধে যাতে একটা মোটামুটি ধারণা হয় তার জন্য সপুত্রক লাবণ্যকে আগেই একবার বিনয় ঘুরিয়ে নিয়ে গেল। সাজসজ্জা, যন্ত্রপাতি দেখে লাবণ্য তো অবাক। নির্জীব, দুর্বল বিস্তুরও উৎসাহের অবধি নেই। মার কোলে থেকে সে দুর্বোধ্য ভাষায় হাত-পা নেড়ে কি সব বলতে লাগল।

মাত্র একদিন আছে মাঝখানে। বিহার্সেলের সময় নেই। চলচ্চিত্রে এইরকমই দস্তুর। উদযোগের আয়োজনের ব্যাপারে অতি দ্রুত চলায় সে অভ্যস্ত। তবু বিনয়ের বাসায় গিয়ে লাবণ্যকে প্রথম দিনের স্যুটিংয়ের খানিকক্ষণ মহড়া দেওয়াল অনিমেষ। ছেলের মুখে সামান্য দু-একটি কথা ছিল। কিন্তু বিস্তু মা বাবা ছাড়া এখনও কোন ডাক শেখেনি বলে অনিমেষ তা কেটে দিল। বিস্তুর বিকলাঙ্গ কদাকৃতি চেহারাটাই ছবির পক্ষে এক বড় সম্পদ ওর মুখে কথার আর দরকার হবে না।

পরদিন গাড়িতে করে নিজেই বন্ধু আর তার স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে এল অনিমেষ। স্টুডিওর দরজায় দেখা হল মালতীর সঙ্গে।

অনিমেষ একটু সৌজন্য আর সহানুভূতির স্বরে বলল, 'এই যে মিস মল্লিক, আপনিও এসেছেন দেখছি। কাজ আছে বুঝি?

মালতী বলল, 'আপনার নতুন স্টার দেখতে এলাম। সেও তো এক কাজ।' বলে গাড়ির ভিতরে উঁকি দিয়ে লাবণ্যর দিকে ঈর্ষাকুটিল চোখে একটু তাকাল মালতী। লাবণ্য চোখ ফিরিয়ে নিল।

মালতী চলে গেলে লাবণ্য বলল, 'মেয়েটা কে ঠাকুরপো? কি রকম অসভ্যের মত বার বার তাকাচ্ছিল। আর কি রঙই না মেখেছে মুখে। ছি ছি ছি। কে ও?'

অনিমেষ মৃদু হাসল 'বড় সহজ পাত্রী নয় বউদি। আর একটু হলেই ও আপনার জায়গা কেড়ে নিত। আপনি তো লক্ষ্য করেননি, বিনয় এতক্ষণ তো ওকেই দেখছিল চেয়ে চেয়ে।'

বিনয় লজ্জিত হয়ে বলল, 'কি যে বল।'

প্রডিউসারকে আগেই বলে রেখেছিল অনিমেষ। লাবণ্যকে দিয়ে অভিনয় করালে টাকা কম লাগবে। তা ছাড়া বিজ্ঞাপনের সময়েও সুবিধা হবে খুব। নিজের ছেলে নিয়ে ভদ্রঘরের সুন্দরী কুলবধূ অভিনয়ে নেমেছেন। বইয়ের পক্ষে এর চেয়ে চমৎকার বিজ্ঞাপন আর কি হতে পারে।

লাবণ্যকে বৈকুণ্ঠবাবুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল অনিমেষ। মুখখানা বেশ মিষ্টি মিষ্টি। দেখেশুনে প্রসন্নই হলেন বৈকুণ্ঠ। বললেন, 'বেশ, বেশ। আমার কুঁড়েঘরে লক্ষ্মীর আগমন হয়েছে অনিমেষবাবু। আহাহা, মুখখানা কি রকম শুকিয়ে গেছে। ওঁকে রিফ্রেসমেণ্ট রুমে নিয়ে যান এক্ষুনি।'

সেট সাজানো হল। আডম্বর আয়োজনের কিছু নেই। দরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘর। ঠিক যেমন ঘর লাবণ্য দেখে এসেছে, অনিমেষ সেটে প্রায় তারই অনুকরণ করল। মেঝেয় ছেঁড়া বিছানায় রোগজীর্ণ ছেলে। দায়িত্বহীন ভীরু বেকার স্বামী কোথায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। এদিকে ভিজিট না পেলে ডাক্তার আসবে না। ডাক্তার ডাকবার লোক নেই, টাকা নেই। একবার ছেলের গায়ে হাত দেয় মা আব একবাব হাত তুলে আনে। নিজেব হাতে শাঁখা আর এয়োতির লোহা ছাড়া আর কিছু নেই। এক চিলতে হার এখনও আছে ছেলের গলায়। খানিক আগে হাব হার বলে কেঁদেছিল, তাই পরিযে দিতে হযেছে। এখন ঘুমন্ত ছেলেব গলা থেকে মা সে হাব কি করে তুলে নেবে? সোনাব অঙ্গ থেকে কি সোনা ছিঁড়ে নেওযা যায়! তবু নিতেই হল। ছেলেব হাব চুবি করে নিয়ে ঝড়বৃষ্টির মধ্যে মা চলল ডাক্তার ডাকতে।

প্রথম দিনের সেট এ পর্যন্ত। বিষয়টা বার বার লাবণ্যকে বুঝিয়ে দিল অনিমেষ। সেটেব ভিতবে নিয়ে গিয়ে বার বার তাকে মহড়া দেওয়াল। কিন্তু লাবণ্যর কিছুতেই যেন হতে চায না। নিতান্ত নিরুদ্বেগ মুখ লাবণ্যর, দুঃখ নৈরাশ্য ক্ষোভ কোন ভাব ফুটে উঠছে না। একান্ত অভাবব্যঞ্জক মুখ। বাইরেব অনেকগুলি পুরুষ যে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, তার জন্যে মাঝে মাঝে লজ্জা আর সংকোচ প্রকাশ পাচ্ছে তার। বাব বার মাথায় আঁচল টেনে দিতে চাইছে লাবণ্য। বিবক্ত হযে শেষ পর্যন্ত অনিমেষ ধমক দিল, 'আপনার লজ্জাব অত সময় কই! আপনাব ছেলেব ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেবিযা। টাইফযেডেব চেযেও শক্ত অসুখ। চব্বিশ ঘণ্টাব মধ্যে মাবা যেতে পাবে আপনার ছেলে। আপনি যান, ছেলের কাছে গিযে বসুন, তার গাযে হাত বোলান।'

কিন্তু সেটেব মধ্যে লাবণ্যর হাত কাঁপে, পা কাঁপে, ঠোঁট কাঁপে থব থব কবে। অদ্ভুত একটা ভয় তাকে পেযে বসেছে। সে ভয ছেলেব মৃত্যুভয় নয। অনেক কষ্টে যদি বা ছেলেব কাছে তাকে বসানো গেল, তাব আড়ষ্ট ভঙ্গি কিছুতেই যেতে চায না। ছেলেব মাথার কাছে বসে হাতে পাখা নিযে সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্য তা বেখে দিল। অনিমেষ ধমক দিযে উঠল, 'অমন কবে বাতাস কবে নাকি? আপনার নিজের ছেলে মবে যাচ্ছে—'

লাবণ্য মাথা নেড়ে বলল, 'না না না।'

পুবো ঘণ্টাখানেক চেষ্ট কবে শেষে সেট থেকে লাবণ্যকে নামিয়ে আনল অনিমেষ, তাবপর অসহায়ের মতো বলল, 'হল না।'

লজ্জায় অনুশোচনায় লাবণ্য মুখ নীচু কবল।

বৈকুণ্ঠ পোদ্দারেব পাশেব চেয়ারেই বসে ছিল মালতী মল্লিক। অনিমেষ আব লাবণ্যেব কাণ্ড দেখে মুখে রুমাল চেপে ধরেছিল। তবু তাব হাসির শব্দ অস্পষ্ট ছিল না।

বৈকুণ্ঠবাবু বললেন, 'মিস মল্লিক, আপনি এ যাত্রা উদ্ধার করুন, স্যুটিং ডিটেনড হোক আমি চাই না।'

মালতী বল, 'উদ্ধার আমি করতে পারি, কিন্তু হাজার টাকার এক পয়সাও কম হবে না।'

বৈকুণ্ঠ বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, সেজন্যে আটকাবে না। কাজ সারতে সারতে যদি রাত হয়ে যায়, আমি নিজেব গাড়িতে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসব, আপনি ভাববেন না।'

পলিতকেশ প্রৌঢ়ের দিকে তাকিয়ে মালতী ঠোঁট টিপে হাসল : 'বেশ তো, দেবেন, আপাততঃ ভ্যানিটি ব্যাগটি বাখুন আমার, আর কন্ট্রাক্ট ফর্মটা দিন।'

মেকআপ রুম থেকে মিনিট দশেকের মধ্যে ফিরে এল মালতী, আটপৌরে ময়লা শাড়ি পবনে। শাঁখা-সম্বল দরিদ্র গৃহস্থবধূ। অনিমেষের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কই ডিরেক্টর মশাই, ছেলে কই আপনার?'

আজকের মতো বিনয়ের ছেলে দিয়েই কাজ চালাতে হবে। স্টুডিওতে আর কোন ছেলে নেই,

সৌজন্যের খাতিরে বিনয় তাতে রাজী হল।

ছেলে দেখে নাক সিটকাল মালতী : 'ও ডিরেক্টর মশাই, এই নাকি ছেলের নমুনা আপনার ? এতকাল বাদে শেষ পর্যন্ত এই রকম ছেলে একখানা বানালেন বুঝি ? আনাড়ী ডিরেক্টরের ছেলে এর চেয়ে আর বেশি কি হবে ? কিন্তু ওর মা হব কি করে, ওকে ছুঁতেই যে ঘেন্না ঘেন্না লাগছে আমার।'

কিন্তু সেটে গিয়ে মালতীর চেহারা সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে গেল। বিন্তু একটু কাঁদতে শুরু করেছিল, তাকে টাকা আর খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখল মালতী। তারপর শুরু হল রুগ্ন ছেলের পরিচর্যা। উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে জননীর শঙ্কিত বিহ্বল মুখ দেখে দর্শকরা সবাই মুগ্ধ হল। অনিমেষের ডিরেক্শনের চাইতে মালতীর নিজের suggestionগুলি উৎকৃষ্ট বলে মনে হল সকলের।

মালতী এক ফাঁকে হেসে বলল, 'কিছু মনে করবেন না ডিরেক্টর মশাই, আপনি শত হলেও ওর পালক বাপ, আমি ওর সাক্ষাৎ মা। কি করতে হবে না হবে, আমার চেয়ে বেশি জানেন নাকি আপনি ?'

হার খুলে নেওয়ার দৃশ্যটিও চমৎকার অভিনয় করল মালতী : 'ওরে, এই বিষ্যুৎবার দিন কি করে আমি সোনামণির গলা থেকে সোনা কেড়ে নেব রে।' বলে রুদ্ধ কান্না চাপবার এমন ভঙ্গি করল মালতী যে বৈকুণ্ঠ পোদ্দারের চোখ দুটি পর্যন্ত সজল হয়ে উঠল।

ক্যামেরাম্যান খুশিমনে শট নিল। সবাই স্বীকার করল, এ দৃশ্যটি বইয়ের সেরা সম্পদ হবে।

জলভরা চোখে সেট থেকে নেমে এসেই মালতী কিন্তু হাত পাতল বৈকুণ্ঠ পোদ্দারের কাছে : 'কই, চেকটা দিন।'

অনিমেষ প্রসন্ন মনে বলল, 'খুব খুশি হলাম। মার ভূমিকায় আপনি এত ভাল অভিনয় করলেন কি করে বলুন তো ?'

মালতী হেসে বলল, 'হিংসেয় ডিরেক্টর মশাই, হিংসেয়। স্বভাব হল অভিনয়, মদ আর মাৎসর্য ছাড়া হবার নয়। এবার টের পেলেন তো বিন্তুর কে মা আর কে সৎমা।' বলে আড়চোখে নতমুখী লাবণ্যর দিকে একটু তাকিয়ে নিয়ে মালতী বৈকুণ্ঠকে বলল, 'আপনি গাড়ির বন্দোবস্ত করুন বৈকুণ্ঠবাবু। আমি মেকআপ রুম থেকে এলাম বলে।'

গাড়িতে করে অনিমেষও লাবণ্যদের পৌঁছে দিয়ে আসতে চাইল ; কিন্তু বিনয় আর লাবণ্য দুজনেই মাথা নাড়ল। গাড়িতে দরকার নেই, তারা ট্রামেই বেশ যেতে পারবে। বিন্তুর হাতে একখানা দশ টাকার নোট গুঁজে দিল অনিমেষ, কিন্তু লাবণ্য তাও নিল না, বলল, 'ও টাকা দিয়ে কাকাবাবুকে প্রণাম কর বিন্তু, ও নিয়ে তোমার কাজ নেই, কাকাবাবু পরে তোমাকে লজেন্স-বিস্কুট কিনে দেবেন তাই নিয়ো।'

অনিমেষ বলল, 'আমি খুবই লজ্জিত বউদি।'

লাবণ্য বলল, 'আপনার লজ্জার কি আছে ?'

রিলিজের পর সপ্তাহ চারেক বেশ ভালই চলল বই। মোটামুটি উতরে গেছে অনিমেষের প্রথম ছবি। পাস পেয়ে পরিচিত বন্ধুরা দেখে এসে সুখ্যাতি করল। কেবল এল না বিনয়। অনিমেষ ভাবল, ওরা লজ্জা পাচ্ছে। দুখানা পাস নিয়ে একদিন হাজির হল বন্ধুর বাসায়।

চেহারা আরও খারাপ হয়েছে। জামাকাপড় আরও জীর্ণ। ঘরটা যেন একটু ফাঁকা ফাঁকা। আসবাবপত্র সব নেই, তবু বিনয় খুশি হবার ভঙ্গিতে বলল, 'এস, এস। আমি ভাবলাম তুমি বুঝি সম্পর্ক তুলেই দিলে।'

লাবণ্য বলল, 'আপনার ছবির নাকি খুব নাম হয়েছে !'

অনিমেষ বলল, 'পরের মুখে ঝাল খেয়ে লাভ কি ! নিজেরা গিয়ে আগে দেখে আসুন। তারপর ভালো বলতে হয় বলুন, নিন্দে করতে হয় করুন। কিন্তু মহারাজ, এস তো এদিকে। এই নাও তোমাদের পাস। তোমার অভিনয় কেমন হয়েছে দেখে এসো গিয়ে। আপনারা তো ছেলে দিলেন না বউদি, অতিকষ্টে শেষে আর একটাকে জোগাড় করে নিলাম।'

রুগ্ন উলঙ্গ ছেলের দিকে একবার তাকাল অনিমেষ। পা'টা ওর আরও শুকিয়েছে।

অনিমেষ বলল, 'ওর শরীরটা বুঝি এখনও তেমন সারেনি বউদি ? ফের কি অসুখ-বিসুখ—'

কথা শেষ হতে পাবল না, দবজায কডা নডে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ভাবি গলাও শোনা গেল, 'বিনযবাবু আছেন ? বিনয়বাবু ?'

বিনয স্ত্রীব দিকে তাকাল, তাবপব ফিস ফিস কবে বলল, 'সেবেছে। অনিমেষ এসেই যত গোল বাধাল। না হলে আমি এতক্ষণে বেবিযে যেতাম, নাগাল পেত না।'

অনিমেষ বলল, 'কে ?'

বিনয় তেমনি ফিস ফিস কবে বলল, 'বাড়িওযালা গোবিন্দ প্রামাণিক। ভাডাব তাগিদে এসেছে। অস্থিব কবে ফেলল ভাই। এদিকে হাতে পযসা নেই একটি। পুবো মাইনে পাইনি অফিস থেকে। কিছু আগাম নেওয়া ছিল কেটে বেখেছে।' তাবপব স্ত্রীব দিকে তাকিযে বলল, 'যাও বলে এস—বাসায নেই।'

লাবণ্য একবাব অনিমেষেব দিকে তাকাল।

বিনয বলল, 'আহা, ওব কাছে আব তোমাব লজ্জা কবতে হবে না। ও আমাব ছেলেবেলাব বন্ধু। বলে এস -নেই, বেবিযে গেছে। পাওনাদাব ভাগাতে লাবণ্যেব জুডি নেই অনিমেষ।'

লাবণ্য স্থিবদৃষ্টিতে একটুকাল স্বামীব দিকে তাকিযে থেকে বলল, 'নেই বললে বিশ্বাস কববে কেন ? তোমাব গলা শুনতে পেযেছে।'

বিনয কাঁথাটা মুডি দিয়ে টান হযে শুযে পডল 'তা হলে বল গিযে—বড্ড অসুখ।'

সদব-দবজায লাবণ্যব সঙ্গে আগন্তুকেব মৃদু কণ্ঠে কি একটু কথা হল। তাবপব একজন প্রৌঢ মতো লোককে সঙ্গে নিযে লাবণ্য ফিবে এল 'আসুন কাকাবাবু। এমন দুর্বল হযে পডেছে যে, উঠে যাবাব পর্যন্ত সাধ্য নেই।'

বাডিওযালা গোবিন্দ প্রামাণিক ঘবেব ভিতবে এসে দাঁডালেন।

বছব পঞ্চাশেক হবে বযস। লম্বাচওডা স্বাস্থ্যবান পুরুষ। মাথায কাঁচা-পাকা চুল। ভুঁডিব কাছে ফতুযাব বোতাম দুটি খোলা।

কাঁথা মুডি দিযে বিনয ততক্ষণে পাশ ফিবে শুযেছে। লাবণ্যব দিকে তাকিযে গোবিন্দবাবু বললেন, 'হযেছে কি বিনযবাবু ? জ্বব-টব নাকি ?'

তিনি একটু এগিযে কপালে হাত দিতে গেলেন বিনয়েব।

লাবণ্য বলল, 'না কাকাবাবু, জ্বব নয। সামান্য জ্ববজাবি উনি গ্রাহ্যই কবেন না। কা'ল দিনেবাত্রে অন্তত বাব পঁচিশেক দাস্ত হযেছে।'

গোবিন্দবাবু একটু পিছিযে এলেন 'বলেন কি ?'

লাবণ্য বলল, 'হ্যাঁ, পঁচিশবাব তো হবেই। বেশিও হতে পাবে। শেষেব দিকে বিছানা থেকে আব উঠবাব ক্ষমতা ছিল না। ভযে আব বাঁচি নে কাকাবাবু। দিনকাল তো ভালো নয।'

অনিমেষ লক্ষ্য কবল, লাবণ্যব চোখে মুখে সত্যই যেন স্বামীব অসুখেব জন্য শঙ্কা আব উদ্বেগেব ছাপ এসে পডেছে। কালকেব ভয যেন তাব আজও কাটেনি।

গোবিন্দবাবু বললেন, 'ভযেবই তো কথা। চাবিদিকে যা অসুখ-বিসুখ হচ্ছে। শুধু দাস্ত, না কি বমি-টমিও ছিল ?'

লাবণ্য বলল, 'হুঁ, শেষেব দিকে সবই শুরু হযেছিল। মানুষ নেই, জন নেই, টাকা-পয়সাব টানাটানি—এমন বিপদেই পডলাম। শেষে দিশে-টিশে না পেযে মামাকে খবব দিলাম। শ্যামবাজাবেব মধু ডাক্তাবেব নাম শুনেছেন তো ? তিনি আমাব মামা। তিনি দেখে প্রথমে ঘাবডে গেলেন। তাবপব ভগবানেব দযায়—। দু' দিনে কি চেহাবা হযে গেছে দেখুন কাকাবাবু।'

লাবণ্য বিনযেব ‹‚‚ থেকে কাঁথাটা তুলে ধবল।

গোবিন্দবাবু বললেন, 'খাওযাদাওযাব কিছু গোলমাল হযেছিল নাকি ? না হলেই বা কি। মানুষেব শবীবেব কখন যে কি হয, তা কেউ বলতে পাবে না।'

লাবণ্য সস্নেহে স্বামীব কপালে হাত বুলাল 'ঘুমিয়ে পডলে নাকি ? কাকাবাবু ডাকছেন তোমাকে।'

গোবিন্দবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'থাক্ থাক। ওঁকে আব ডেকে কাজ নেই। আমি ভাড়াটাব কথা

বলব ভেবেছিলাম মা। যাক, আজ আর না বললাম। কিন্তু এদিকে দু'মাস হয়ে গেল। বিনোদ দু-তিন দিন এসে ঘুরে গেছে, বিনয়বাবুর দেখা পায়নি।'

লাবণ্য বলল, 'একটু সুস্থ হলে উনি নিজেই গিয়ে ভাড়া দিয়ে আসবেন কাকাবাবু। বিনোদকে পাঠাতে হবে না। স্কুলের ছেলে, পড়াশুনোর ক্ষতি হবে হয় তো ওর।'

তারপর অনিমেষের দিকে তাকিয়ে লাবণ্য বলল, 'চমৎকার ছেলে। এত ছেলে মেয়ে আসে যায়, কিন্তু বিনোদের মতো এমন শান্তশিষ্ট স্বভাব আমি আব কাবও দেখিনি। কাকাবাবু দুঃখ করেন পড়াশুনোটা তেমন হল না। দু-দুবার ফেল করেছে ফার্স্ট ক্লাসে। তা করলই বা। লেখাপড়াটাই কি মানুষের সব ? পড়াশুনো করে কি যে হয়, তাও তো চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি। মানুষের স্বভাবটাই আসল, কি বলুন ঠাকুরপো ? মানুষ যদি সৎ হয়, সত্যি কথা বলে—'

অনিমেষ একটু ঢোক গিলে বলল, 'তা তো ঠিকই।'

এক ফাঁকে গোবিন্দবাবুর সঙ্গে অনিমেষের পবিচয় করিয়ে দিলে লাবণ্য। বলল, 'মস্ত বড় ডিরেক্টর। আপনি তো সিনেমা-টিনেমা কিছু দেখেন না। কিন্তু সিনেমাওয়ালারা সবাই ওঁর নাম জানে। ওঁর ছেলেবেলার বন্ধু। অসুখের খবর পেয়ে দেখতে এসেছেন।'

একটু বাদে গোবিন্দবাবু বললেন, 'আমি তা হলে আজ চলি। আমার কথাটা কিন্তু—'

লাবণ্য বলল, 'নিশ্চয়ই, উনি সুস্থ হয়ে উঠেই আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। কিন্তু ও কি কাকাবাবু, উঠলে চলবে না। একটু বসুন, এক কাপ চা করে আনি। চা তো খুব ভালবাসেন আপনি।'

গোবিন্দবাবু একটু শঙ্কিত হয়ে বললেন, 'না না, চা আজ থাক, চা আজকাল আর আমি তেমন খাই নে।'

লাবণ্য বলল, 'তা হলে থাক্। আজ আমিও বেশি খেতে বলব না কাকাবাবু। যা দিনকাল। একটু পরিষ্কার-পবিচ্ছন্ন হযে সাবধান সতর্কমতো থাকাই ভালো। আব একদিন এসে কিন্তু চা খেয়ে যেতে হবে। কথা দিয়ে যান কাকাবাবু।'

লাবণ্যর মুখে হাসি, গলায় আবদারের সুর।

'আচ্ছা মা, আচ্ছা। আসব আর একদিন।' বলে গোবিন্দবাবু সদরদরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

বিনয় কাঁথা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসল। বন্ধুকে বলল, 'দেখলে তো ? তোমার চেয়ে আমি নেহাত খারাপ ডিবেক্টর নই।'

অনিমেষ এতক্ষণ বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে ছিল।

এ সম্বন্ধে কোন বকম মন্তব্য করতে প্রথমে সে একটু কুণ্ঠাবোধ করল, কিন্তু বিনয়ের সপ্রতিভ ভঙ্গিতে খানিকটা নিশ্চিন্ত হযে অনিমেষও সহজ হবার চেষ্টা করে হেসে বলল, 'তা ঠিক। তবে তোমার চেয়েও বেশি কৃতিত্ব কিন্তু বউদিব। এমন পাকা অভিনেত্রীর ডিরেক্টরের দবকার হয় না।'

লাবণ্যর দিকে ফিবে তাকাল অনিমেষ : 'আপনি মালতী মল্লিকের চেযে কোন অংশে কম নন। কিন্তু সেদিন অত ঘাবড়ে গেলেন কেন বলুন তো ?'

লাবণ্য স্থিরদৃষ্টিতে অনিমেষের দিকে তাকিযে থেকে অদ্ভুত একটু হাসল : 'মালতীও এখানে এসে ঘাবড়ে যেত ঠাকুরপো। এতখানি তাব সাধ্যেও কুলোত না।'

লাবণ্যর ধরা গলায় দুই বন্ধু চমকে উঠে ওর মুখের দিকে তাকাল। লাবণ্যর ঠোঁটে সেই হাসিটুকু এখনও লেগে রয়েছে। কিন্তু চোখ দুটো হঠাৎ অমন ছলছল করছে কেন ?

ভাদ্র ১৩৫৭

চাকরি

সদর-দরজার কড়া নড়ে উঠতে একটু বিরক্তির স্বরেই সাড়া দিল নীলাম্বর, 'যাই।' তারপর করিডোর পেরিয়ে এসে দোর খুলে দিয়ে বলল, 'ও তুমি!'

মাধবী লক্ষ্য করল নীলাম্বরের আহ্বানের মধ্যে তেমন আগ্রহ নেই, অন্যান্য দিনের মতো তাকে দেখে নীলাম্বরের চোখ তেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল না। 'এস' কথাটুকু পর্যন্তও ফুটে বেকল না মুখে। আজ যেন নীলাম্বর প্রত্যাশা করেনি ওকে, আজ যেন ওর না আসাই ভালো ছিল। নীলাম্ববের হয়তো মন ভালো নেই। কিন্তু মাধবী কি শুধু ওর সুদিনেব সহচরী, ওর মন ভালো-না-থাকা দিনের কেউ নয়?

একটু চুপ ক'রে থেকে মাধবী বলল, 'দু' দিনের মধ্যে তুমি তো আব গেলে না। তাই এলাম।'

নীলাম্বর বলল, 'যাওয়ার মতো মনের অবস্থাও ছিল না, সময়ও ছিল না।'

মাধবী একটু হাসল: 'আমার কিন্তু আসবার মতো মনেব অবস্থাও আছে, সময়ও আছে।'

নীলাম্বব গম্ভীরভাবে বলল, 'বেশ তো, এস।'

নীলাম্বরের পিছনে পিছনে ভিতরে ঢুকল মাধবী।

উঠানের এক দিকে কলের কাছে নীলাম্বরেব মা সুরবালা এক পাঁজা এঁটো বাসন নিয়ে বসেছেন। পায়ের শব্দে ঘাড় ফিরিয়ে মাধবীর দিকে তিনি একবার তাকালেন। তারপর ফের বাসন মাজতে শুরু করলেন। ভালোমন্দ কোন কথাই বললেন না। এর আগে যতবাব মাধবী এসেছে এমন হয়নি। এই দু'দিনেব মধ্যে এমন কি ঘটতে পারে ও ভেবে পেল না।

নীলাম্বরেব বোন উমা ছাদ থেকে শুকনো কাপড তুলে নিয়ে নীচে নেমে এল। চৌদ্দ-পনের বছরের সুন্দরী কিশোরী। নীলাম্বরের মতোই ফর্সা বঙ, পাতলা ঠোঁট, টানা-টানা নাক-চোখ। অন্যদিন মাধবীকে দেখলে সে ভাবি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, হয় কোমর না হয় হাত জড়িয়ে ধরে। কিন্তু আজ সে কাছে পর্যন্ত এল-না, দূরে দাঁড়িয়ে শুকনো গলায় বলল, 'ভালো আছেন মাধবীদি?'

মাধবী বলল, 'আমি তো ভালোই আছি। কিন্তু বাড়িসুদ্ধ তোমাদের হল কি?'

এ-কথার জবাব না দিয়ে উমা শুকনো কাপড়গুলি নিয়ে ঘরে ঢুকল। ঘরেব মধ্যে একখানা তক্তপোশ পাতা, তার উপর নীলাম্বরের বাতব্যাধিগ্রস্ত বৃদ্ধ বাবা নীলকণ্ঠ চাটুয্যে কাত হয়ে শুয়ে রয়েছেন। ঘুমিয়েছেন ব'লেই মনে হল।

মাধবী সেইদিকে একটু তাকিয়ে বলল, 'উনি কেমন আছেন? ওঁর অসুখ বেড়েছে নাকি?'

নীলাম্বব বলল, 'না, ওঁর আর বাড়া-কমা কি! চল, ওপরে চল।'

সিঁড়িতে পা রেখে মাধবী তবু আর একবার প্রশ্ন করল, 'মণ্টুকে দেখছিনে যে, সেবার ওরও তো জ্বর দেখে গিয়েছিলাম।'

মণ্টু নীলাম্বরের ছোট ভাই, ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে।

নীলাম্বর অধীর হয়ে বলল, 'জ্বরে মারা যায়নি, সেরে উঠেছে। স্কুল থেকে ফিরে এসে খেলতে বেরিয়েছে। শারীরিক আমরা সবাই ভালো আছি, মাধবী। সেজন্য তোমার কোন চিন্তা করতে হবে না, এস।'

অন্য ভাডাটেদের ঘরের সুমুখ দিয়ে হেঁটে এসে দক্ষিণ প্রান্তের ছোট ঘরখানায় ঢুকল মাধবী। এ ঘর নীলাম্বরের। দু'দিন বাদে এ ঘর তারও হবে। দু'বছর আগেও হতে পারত। কিন্তু নীলাম্বর বলেছে, 'অত তাড়া কিসের?' মাধবী বলেছে, 'বেশ তো, তোমার যদি তাড়া না থাকে, আমারও নেই।'

ঘরখানা ছোটই। ঠিক একেবারে দুজনের যোগ্য ঘর। দু'জনের বেশি এঘরে ধরে না।

আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই। বরং তার বিরলতাই চোখে পড়ে। দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁষে একটা মাদুর পাতা। ঢাকনিওয়ালা একটা বালিশও মাঝখানে টেনে আনা হয়েছে। নীল লতার বডার্র দেওয়া সাদা ঢাকনিটাও মাধবীর নিজের হাতের তৈরি। নীলাম্বরের জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল। পূব দিকের দেয়াল ঘেঁষে একটা ট্রাঙ্ক আর তার ওপর মুখ-খোলা একটা সুটকেস। উত্তর দিকে ছোট একটা বইয়ের র‍্যাক। ওপরের দেয়ালে আলনায় নীলাম্বরের আধময়লা লংক্লথের গোটা দুই জামা ঝুলছে।

'অত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি দেখছ? ঘরের জিনিসপত্র কিছুই খোয়া যায়নি। সব ঠিক আছে। বোস।'

দেয়ালে ঠেস দিয়ে নিজে বসে, মাধবীকে মাদুরের ওপর বসতে বলল নীলাম্বর।

মাধবী একটু হাসল · 'সব যদি ঠিকই থাকে তোমার মেজাজটা এত বেঠিক হয়ে পড়ল কেন?'

নীলাম্বর বলল, 'ও, তোমার সঙ্গে বুঝি তেমন মিষ্টি ক'রে কথা বলতে পারিনি! মেজাজ বেঠিক হবার সামান্য একটু হেতু আছে মাধবী। চাকরিটি নেই।'

মাধবী একটু চমকে উঠে বলল, 'সে কি!'

নীলাম্বর কোন জবাব না দিয়ে প্যাকেট থেকে সবশেষ সিগারেটটি ধরিয়ে মৃদু হাসল, তারপর বলল, 'কারণ অবশ্য অনেক। কিন্তু সমূহ কারণ আমাদের প্রমোদভ্রমণ। তা ছাড়া অফিসে দিন দশেক পরে জয়েন করায় এ মাসের কাগজ বেরুতে দেরি হয়েছে। বিজ্ঞাপন যোগাড় করা হয়নি, তাই নিয়ে শুকদেববাবুর সঙ্গে কথা কাটাকাটি। ঝগড়াটা এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে রিজাইন না ক'রে আর জো রইল না। তিনি নিজেই স্পষ্ট রিজাইন করতে বললেন। কারণ তাতে এক মাসের মাইনে বেশি দিতে হবে না।'

মাধবী এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল, তারপর বলল, 'কিন্তু তোমার এতদিনের চাকরি, এই সামান্য কারণে—'

নীলাম্বর বলল, 'কারণটা আমাদের কাছে সামান্য হতে পারে। কিন্তু উদয়ন প্রেসের মালিক শুকদেব রায়ের তা মনে হয়নি।'

মাধবী ফের একটুকাল চুপ ক'রে রইল। নীলাম্বরের কথার ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে, কারণটা ওর কাছেও এখন অসামান্য। এতক্ষণে বোঝা যাচ্ছে কেন নীলাম্বরের মা-বোনের মুখ মধবীকে দেখে বিরস হয়ে উঠেছে। কেন নীলাম্বরের বাবা তাকে দেখে ঘুমের ভান করেছেন।

মাধবী অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'তা হলে তোমার চাকরি যাওয়ার জন্যে এক হিসাবে আমিই দায়ী। আমিই তোমাকে দেরি করিয়ে দিয়েছি। অফিসে সময়মতো জয়েন করতে দিইনি।'

নীলাম্বর বলল, 'কি যে বল!'

কিন্তু গলাটা তেমন জোরাল শোনাল না।

একটু বাদে নীলাম্বর বলল, 'খানিক আগে বাবা বড় অদ্ভুত কথা বলছিলেন।'

মাধবী নীরবে চোখ তুলে তাকাল।

নীলাম্বর বলল, 'তিনি বলছিলেন—গরীবের সংসারে বিয়ে করাটাই ভালো। তাতে ঘর-গৃহস্থালীও থাকে, চাকরি-বাকরিও থাকে। কিন্তু প্রেমটা বড় সাংঘাতিক। তাতে হিতাহিত বিবেচনা থাকে না, সব নষ্ট হয়।'

মাধবীর মনে হল, কথাটা শুধু যেন এখন নীলাম্বরের বাবার না, নীলাম্বরেরও।

মাধবী বলল, 'কিন্তু এই সব সাংঘাতিক জিনিসের মধ্যে তোমাকেই বা কে যেতে বলেছিল! অনেক দিন আগেই তো তুমি শান্তশিষ্ট গৃহস্থ হতে পারতে।

নীলাম্বর বলল, 'তা ঠিক। তোমার দোষ নেই। তুমি অনেকদিন আগে থেকেই বিয়ের কথা বলেছ। অবস্থায় কুলোয়নি ব'লে আমিই রাজী হতে পারিনি। আজ আবার তোমার দাদা এসেছিলেন। বললেন, ওঁরা নাকি দিন তারিখ সব ঠিক ক'রে ফেলেছেন। এখন আমার মত হলেই—'

মাধবী বলল, 'তুমি কি বললে?'

নীলাম্বর অদ্ভুত একটু হাসল, 'আমার তো মত দেওয়াই উচিত। দিন তারিখ যখন ঠিক হয়ে

মাধবী একবার মাথা নীচু করল, তারপর ফের মুখ তুলে বলল, 'দাদা তো আর জানেন না তোমার চাকরি গেছে। কিন্তু গেলেই বা কি। চাকরি গেছে আবার হবে। ওঁরা যখন দিনটিন সব ঠিক ক'রে ফেলেছেন, আমি বলি কি ওঁদের মতে মত দেওয়াই ভালো। এদিকে মানসীর সম্বন্ধ ঠিক হয়ে আছে। বাবার ইচ্ছা আমাদেব দু' বোনের—'

নীলাম্বর ফের একটু হাসল : 'হ্যাঁ, দুই বোনের বিয়ে এক সঙ্গেই হয়ে যাক্। তারপর আমি গিয়ে তোমাদের বাড়িতে ঘরজামাই হয়ে থাকি। তাও না হয় থাকতাম মাধবী, কিন্তু আমাব যে আরও কয়েকজন কুপোষ্য রয়েছে। বুড়ো বাবা-মা, ভাই-বোন—'

মাধবী ফেব মাথা তুলল, 'তাঁদের খরচ আমি চালাব।'

নীলাম্বর বলল, 'তুমি!'

মাধবী বলল, 'হ্যাঁ। মাস্টারি ক'বে যদিও আমি বেশি পাইনে। কিন্তু দু' বেলা টিউশনি করব, তুমিও তাই কববে। আব ফাঁকে-ফাঁকে লিখবে। কোন রকমে চলে যাবেই। একটা ব্যবস্থা হবেই শেষ পর্যন্ত।'

নীলাম্বব বলল, 'তবু এই বেকাব অবস্থায় আমার বিয়ে করা চাই! পঞ্জিকাব দিন পালটানো যাবে না?'

মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে নীলাম্বব একটু হাসল : 'তোমার মনে জব্বলপুরের মাববেল রকেব পূর্ণিমা-রাতের সেই ছোঁয়াচ এখনও র'যে গেছে, মাধু। কিন্তু কলকাতা শহবটা মাবরেল বকে তৈবি নয়। আর, বেকাব জীবনেব দিনগুলিতে রোদের তাপ থাকে, কিন্তু রাতগুলিতে চাঁদের আলো থাকে না। তুমি অনেকদিনই তো অপেক্ষা কবেছ মাধু, আবও ক'টা দিন সবুর ক'র। তোমার বাবা আব বড়দাকেও বুঝিযে বল। কোন রকম একটা চাকরি-বাকরি জুটিযে নিই, তাবপবে পঞ্জিকায আবও বিয়ের দিন মিলবে।'

মাধবী একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বলল, 'আচ্ছা, আমি তা হলে যাই।'

নীলাম্বব বলল, 'চল, একসঙ্গেই বেবোই। তুমি কি বাগ করলে?'

মাধবীর হাতে নীলাম্বর আস্তে একটু চাপ দিল।

মাধবী বলল, 'না বাগ করবার কি আছে! আমিই ববং এতক্ষণ অবুঝের মতো কথা বলছিলাম, তুমি মাপ কব আমাকে।'

মাধবীর চোখ দুটো যেন ছলছল ক'বে উঠল।

এবার নীলাম্বব ওব হাতখানা নিজেব হাতেব মধ্যে তুলে নিযে বলল, 'ছিঃ।'

নরম সুন্দর হাত। রঙটা একটু মযলা। কিন্তু আঙুলগুলির গড়ন ভাবি চমৎকার। শুধু রঙের জন্যই চাঁপার কলি বলা যায না। না হলে যেত। কিন্তু রঙটাই কি সব! না, রঙ যে রূপেব সবখানি নয়, তা মাধবীর দিকে তাকালে বোঝা যায। ববং নীলাম্বরের মনে হয়, এমন সুন্দব নাক-চোখের সঙ্গে ফরসা বঙ যেন বেমানানই হত। রঙ নিয়ে একদিন মাধবী আফসোস কবায় বলেছিল, 'কালো রঙই ভালো। কালো বঙেব মধ্যে একটা গভীবতা আছে, ফর্সা বঙে তা নেই।'

মাধবী হেসেছিল, 'একেবাবে নেই বলা যায় না। ফর্সা বঙওয়ালাদের মধ্যেও দু' একজন ব্যতিক্রম থাকে। তাদেব সঙ্গে গাম্ভীর্যে গভীরতায কিছুতেই পাল্লা দিয়ে পাবা যায় না।'

নীলাম্বর বলেছিল, 'ও, আমার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ারই জন্যই বুঝি তুমি তা হলে অমন মুখ ভার ক'রে শান্তশিষ্ট হয়ে থাক।'

'দাদা, তোমাদের চা এনেছি।'

দরজার বাইরে উমার গলা শোনা গেল। উমা ভাবি বুদ্ধিমতী। নীলাম্বব আব মাধবী একসঙ্গে থাকলে সাড়া না দিযে সে ঘরে ঢোকে না। নীলাম্বব তাড়াতাড়ি মাধবীর হাত ছেড়ে দিযে ছোট বোনকে ডাকল, 'আয় ভিতরে।'

উমা চা দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল, মাধবী তাকে হাত ধ'রে টেনে বসাল।

উমা বলল, 'আমার কাজ আছে।'

মাধবী একটু হাসল 'আচ্ছা, এখানে একটু বসলে সে-কাজেব কোন ক্ষতি হবে না।'

নীলাম্বব মাধবীব অনেক আগেই চাযেব কাপ শেষ ক'বে ফেলল। তাবপব আলনা থেকে পাঞ্জাবিটা পেড়ে নিয়ে বলল, 'তুমি তা হলে ওব সঙ্গে ব'সে গল্প কব, আমি বেবোই।'

মাধবী বলল, 'এত তাড়া কিসেব?'

নীলাম্বব বলল, 'তাড়া আছে এক ভদ্রলোকেব সঙ্গে পাঁচটাব মধ্যেই দেখা কবতে হবে। এর পবে গেলে দেখা হবে না।'

নীলাম্ববেব বেকাবত্বেব কথা ফেব মনে প'ড়ে গেল মাধবীব। এখন আব ব'সে ব'সে গল্প কবাব সময নেই, চাকবিব খোঁজে তাকে এখনি বেরুতে হবে।

গবম চা মাধবী খেতে পাবে না, ভালোবাসে না। কিন্তু আজ তাড়াতাড়ি চা শেষ ক'বে সে-ও উঠে পড়ল 'চল, আমিও আসছি

উমা মাধবীব দিকে তাকিযে একটু হাসল, 'আমি এখন যাচ্ছি মাধবীদি। আমাব সত্যি কাজ আছে।'

মাধবীও মনে মনে হাসল। সাবাস মেযে। কিন্তু আজ উমাব অনুমান ভুল। আজ নীলাম্বব আব মাধবীব কাজেব অছিলা নেই কাজ খোঁজাব প্রযোজন আছে।

দু জনে বেবিযে এসে লোযাব সার্কুলাব বোডে পড়ল।

মাধবী বলল, 'তুমি কোন দিকে যাবে?'

নীলাম্বব বলল, শ্যামবাজাব। তুমি তো ভবানীপুবে?'

মাধবী বলল, হ্যাঁ, তবে ভাবছিলাম আব জি কব বোডে আমাব এক পিসতুতো ভাই থাকেন। তাঁব সঙ্গে একবাব দেখা ক'বে আসব কিনা।

নীলাম্বব ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'কেন?

মাধবী বলল 'তিনি সিভিল সাপ্লাইতে কাজ কবেন তাঁব কাছে শুনতাম কোথাও কিছু খালি আছে কিনা-

নীলাম্বব বলল, থাক থাক। তুমি ববং বাসায যাও তাব চেযে। অনর্থক ঘোবাঘুবিব দবকাব নেই।'

হাতঘড়িব দিকে একটু তাকিযে একটা চলন্ত ট্রামে নীলাম্বব তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। মধবীকে কিছু বলবাব সময পযন্ত দিল না। নীলাম্বব কি তাব কথা বিশ্বাস কবল না? সে কি ভেবেছে মাধবীব আব জি কব বোডেব পিসতুতো ভাই ভুযো। শুধু নীলাম্ববেব সঙ্গে যাওযাব জন্যই মাধবী একটা অজুহাত দিযেছে। সেইজন্যই 'অনর্থক ঘোবাঘুবিব' কথা তুলে অমন ক'বে বিবক্তি জানিযে গেল। কিন্তু নীলাম্বব ভেবেছে কি মাধবীকে? এতদিনেব পবিচযেও সে কি তাকে চিনতে পাবেনি। না কি নিজেব মুখে বিযেব আগ্রহ প্রকাশ কবেছে ব'লেই নীলাম্বব তাকে এমন মনে কবল।

কিন্তু দু'জনেব পবিচয তো দু' এক বছবেব নয, পুবো ছ'বছব ধবে পবস্পবকে তাবা জানে। যখন বযস অল্প ছিল, তখনই কোন অশোভন অধীবতা প্রকাশ কবেনি মাধবী, আব এখন কববে?

মাধবী তখন বি এ পড়ে। দাদাব সঙ্গে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এক সাহিত্য-সভায যোগ দিতে গিযেছিল। সভা ভাঙলে গৌববর্ণ ছিপছিপে লম্বা তেইশ-চব্বিশ বছবেব সুদর্শন এক যুবকেব সঙ্গে সুপ্রকাশ তাব পবিচয কবিযে দিযে বলল, 'আমাব বন্ধু নীলাম্বব চাটুয্যে। ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে বাংলায সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট হযেছে। কিন্তু সেকেণ্ড ক্লাস ফার্স্ট আব ফার্স্ট ক্লাস সেকেণ্ড তো বছব-বছবই বেবোয—তাদেব ভিতব থেকে কবি আব প্রাবন্ধিক বেবোয কজন? নীলাম্বব সব্যসাচী। ও ডান হাতে পদ্য লেখে, বাঁ হাতে গদ্য। না কি উল্টো বললাম নীলাম্বব আব ইনি আমাব সহোদবা শ্রীমতী মাধবী সেন, স্পেশাল বেঙ্গলি নিযে ফোর্থ ইযাবে পড়ছেন। এঁবও সাহিত্যবাতিক পুবো মাত্রায।'

নীলাম্বব একটু হেসেছিল, 'বাতিক।'

মাধবী প্রতিনমস্কাব ক'বে জবাব দিযেছিল, 'আপনি কিছু মনে কববেন না। দাদা নিজে লিখতে পাবে না ব'লে সব লেখককেই ঠাট্টা কবে।'

নীলাম্বর বলেছিল, 'তা করুক। অলেকখদের ঠাট্টায় আমাদের কিছু এসে-যায় না।'

সুপ্রকাশ জবাব দিয়েছিল, 'দুনিয়ায় দলে কিন্তু আমরা অলেখকরাই ভারি। সে-কথা মনে রেখো। তারপর আছ কোথায় আজকাল? না কি কেবল কবিতা লিখেই দিন কাটাচ্ছ?'

নীলাম্বর বলেছিল, 'তাতে কি আর দিন কাটে? একটা মাসিক কাগজের অফিসে চাকরি নিয়েছি। তাদের প্রেস-পাবলিকেশনও আছে।'

'তা তো আছে বুঝলুম। কিন্তু প্রসপেক্ট আছে তো?'

নীলাম্বর একটু মুচকে হেসেছিল, 'দেখা যাক্। মনের মত কাজ আর মনের মতো মাইনে দুই-ই কি একসঙ্গে মেলে ভাই? একটিকে ছাড়তে হয়।'

এই স্থূল প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গিয়ে মাধবী বলেছিল, 'আপনার কবিতা আমি অনেক পড়েছি। খুব ভালো লাগে।'

নীলাম্বব একটু হেসে বলেছিল, 'তাই নাকি? কিন্তু আপনি কি লেখেন তা তো বললেন না!'

মাধবী লজ্জিত হযে বলেছিল, 'আমার কথা ছেড়ে দিন। আমি লিখি কে বলল আপনাকে?'

তারপর মাধবী নিজেই একদিন বলল। সুপ্রকাশের আমন্ত্রণে নীলাম্বর তখন ওব শিক্ষকতার ভাব নিয়েছে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে পাঠ্যের বহির্ভূত কাব্যসাহিত্যের আলোচনাই চলেছে বেশি। তাবও পবে আলাপটা শুধু সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল না। ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে গিয়ে পৌঁছল। এম এ· পাস ক'রে হাই স্কুলে মাস্টাবি নিল মাধবী।

বাবা বললেন, 'মাস্টাবি ক'রে কি কববি?'

মাধবী একটু হাসল: 'ক'বে দেখি দিনকয়েক।'

সুরেনবাবু বললেন, 'তার চেয়ে নীলাম্বরকে এবারে বলি।'

মাধবী মুখ নিচু ক'রে বলল, 'না না, তোমায় কিছু বলতে হবে না বাবা।'

সুবেনবাবু বললেন, 'বেশ, তা হলে তোরাই বলিস। কিন্তু অসবর্ণ বিয়েতে নীলাম্বরের বাবা-মা রাজী হবেন তো? ওঁদের কোন অমত নেই তো?'

মাধবী ঘাড় নাড়ল: 'না। তুমি যা ভাবচ তা নয়। তেমন গোঁড়ামি নেই ওঁদের।'

গোঁড়ামি গোড়ার দিকে অবশ্য খুবই ছিল। কিন্তু নীলাম্বরের বাপ-মা যখন বুঝতে পারলেন, ছেলে নিজের পছন্দ-করা, এই মেয়েটিকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করবে না, তখন শেষ পর্যন্ত তাঁরা সম্মতি জানিয়ে বললেন, বেশ, তা হলে কর তোমার যা খুশি। কিন্তু যা কববার তাড়াতাড়ি ক'রে ফেল বাপু। যাকে বউ ক'রে আনতেই হবে, সে যত শিগগিব অন্তঃপুরে ঢোকে ততই ভালো। বিয়ের আগে এখন ঘনঘন যাতায়াত, মেলামেশা দেখলে লোকে হয়তো এক সময় এককথা ব'লে বসতে পারে। তা ছাড়া পরিচয় পুবনো হবার পব, দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর মাধবীর ওপর থেকে তাঁদের বিদ্বেষ ভাবটাও ক্রমে প্রশমিত হয়ে এসেছে। নীলাম্ববের মা'ব মুখে একথাও বলতে শোনা গেছে—বামুনেব মেয়ে না হলে কি হবে, মেয়েটি ভারি শান্তশিষ্ট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; স্বভাবে নম্রতা আছে, অত লেখাপড়া জেনেও তেমন অহংকাব নেই।

মাধবীর নিজের পরিবারের সমর্থন পেতেও কম সময় যায়নি। তাঁদেব আপত্তি ব্রাহ্মণ-বৈদ্যে নয়, নীলাম্বরের ভাল চাকরিবাকরি নেই, আর্থিক উন্নতির দিকে ওর মন নেই ব'লে। দিন তো ঠিক একভাবে যায় না। যখন বয়স বাড়ে, সংসার বাড়ে তখন এসব লোকের কষ্টের অবধি থাকে না। কিন্তু মাধবী নিজের সঙ্কল্পে অটুট রয়েছে। সংসাবযাত্রায় নীলাম্বব ছাড়া আর কেউ সঙ্গী হবে, এ কি কল্পনাও করা যায়? ওর স্থান আর কেউ গ্রহণ করেছে ভাবতেই বিসদৃশ লাগে, অস্বস্তি বোধ হয়। মাধবীর দৃঢ়তায় ওর বাবাও শেষ পর্যন্ত হার মেনেছেন। দাদা খুব ভালো ছেলে। সে মাধবীর সাহিত্যপ্রীতি নিয়ে ব্যঙ্গ করলেও এই বিশেষ সাহিত্যিক-প্রীতির ব্যাপারে কোনদিন মাথা গলাতে আসেনি। ক্রমে দুই পক্ষেরই সম্মতি মিলেছে। অন্তত তীব্র কোন বিরোধিতা কি মনঃক্ষোভের সামনে দাঁড়াতে হবে না, সে আশ্বাস পেয়েছে দুজনে। কিন্তু নীলাম্বর তবু নির্বিকার। ওর হাতে যেন অফুরন্ত কাল, অনন্ত যৌবন মজুত রয়েছে। কোন ভাবনা নেই।

তারপর একদিন মাধবী বলল, 'মাস্টারি আমার আর ভালো লাগে না।'

নীলাম্বর ওর মনের ভাব বুঝতে পেরে হাসল : 'কিন্তু আর্থিক দিক থেকে আমি যে রকম বিত্তবান তাতে বিয়ের পরও তুমি মাস্টারি থেকে রেহাই পাবে আমার মনে হয় না।'

মাধবী বলল, 'না-ই বা পেলাম। এখনকার চাকরির সঙ্গে তখনকার অনেক তফাত থাকবে।'

নীলাম্বর বলল, 'তা তো থাকবেই। এখন তোমার বাপের বাড়িতে রাঁধুনি আছে, ঝি-চাকর আছে। কিন্তু আমাদের বাসায় তুমি আসবার সঙ্গে সঙ্গে যে ওদের শুভাগমন ঘটবে তা মনে হয় না। তখন হাত পুড়িয়ে রেঁধে ঘর-গৃহস্থালীর সব কাজ সেরে তোমাকে বেরুতে হবে চাকরিতে। ক'দিন শরীর টিকবে!'

মাধবী অভিমান ক'রে বলেছিল, 'থাক থাক। আমার শরীরের জন্য তো ভারি ভাবনা তোমার ?

নীলাম্বর বলেছিল, 'শুধু শরীরের জন্য নয়, আমি তোমার মনের কথাও ভাবছি। এখন পর্যন্ত সংসার তো তেমন ক'রে দেখনি, জান না সংসারটি কি বস্তু। অভাব-অনটন দিয়ে তোমাকে চব্বিশ ঘণ্টা সে আটক রাখবে। এক মুহূর্তও দম ফেলবার ফুরসত দেবে না। কোথায় থাকবে সাহিত্য, পড়াশুনো, কোথায় থাকবে কি ! দৈহিক অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য দিনরাত যুঝতে হবে, মন ব'লে যে কোন-কিছু আছে সে কথা মনেও পড়বে না।'

মাধবী বলেছিল, 'যদি মনেই না পড়ল, তা হ'লে তো সব গোলমালই চুকে গেল। তা হলে আর দুঃখ কিসের ?'

নীলাম্বর বলেছিল, 'না, ঠিক ওই ধরনের দুঃখ-মুক্তি আমি চাইনে।'

'তা হলে কি চাও তুমি ?'

আরও একটু আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য। মোটামুটি ভালোভাবে বাঁচতে হলে যেটুকু দরকার শুধু সেইটুকু। যেন অন্নবস্ত্রের চিন্তায় সমস্ত সময় আর সামর্থ্য ব্যয় না হয়, যেন আরো কিছু অবশিষ্ট থাকে। যেন রেশন আর বাজারেই সব না ফুরোয়, মাসে একবার বইয়ের দোকানে যেতে পাবি, দিনে একবার বই নিয়ে বসতে পাবি, মুখোমুখি দুটো অসাংসারিক কথা বলবার অবকাশ যেন পাই। ঠিক এখন যেমন পাচ্ছি।'

মাধবী বলেছিল, 'কেবল এখন কেন, ইচ্ছা থাকলে তখনও তাই পাবে। বিয়ের পর শহরের পার্কগুলি তো আর হঠাৎ উধাও হয়ে যাবে না।'

নীলাম্বর জবাব দিয়েছিল, 'কিন্তু আর্থিক অবস্থাটা না বদলালে পার্কে আসবার ইচ্ছাটাও উধাও হবে।'

মাধবী আর কোন কথা বলেনি। যখন বিয়ের প্রসঙ্গ ওঠে তখনই নীলাম্বর আর্থিক অবস্থার দোহাই পাড়ে। কিন্তু আর্থিক অবস্থা যাতে ভাল হয়, ভাল চাকরিবাকরি মেলে সেদিকে ওর কোন উৎসাহ দেখা যায় না। অর্থ নিয়ে ওর চিন্তা আছে, কিন্তু চেষ্টা নেই। এদিকে মাসের পর মাস কাটছে, বছরের পর বছর। নীলাম্বরদের উদয়ন প্রেস আর পাবলিকেশন সেই যে যুদ্ধের সময় একবার একটু ভালো হয়েছিল, আর মাথা তুলতে পারেনি। বছরের পর বছর নীলাম্বর স্থাণুর মতো পড়ে আছে ওখানে। মাইনের অঙ্ক অপরিবর্তনীয়।

মাধবী একদিন বলল, 'তোমাদের উদয়নের অস্তগমনের দিন এসেছে। আগে আগে সরে পড়াই বোধ হয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

নীলাম্বর বলল, 'এটা প্রখর বুদ্ধিমতীরই পরামর্শ। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তুমি আরও একটু বেশি হৃদয়বতী। মনে আছে, এই উদয়নকে মধ্যবর্তী রেখেই একদিন আমাদের আলাপ জমে উঠেছিল। তোমার কত গল্প-কবিতা আলোচনা-সমালোচনা এই উদয়নের পাতায় ছাপা হয়েছে। নিজেদের গোপন মনের কথা আমরা এই কাগজে ছেপে বার করেছি। হাজার লোকের চোখের সামনে তাকে মেলে ধরেছি। তবু তার গোপনত্ব ঘোচেনি। উদয়ন তো আমাদের কাছে শুধু সাধারণ একখানা মাসিকপত্র নয়, তার চেয়ে বেশি।'

বেশ, সে কথা ঠিক। কিন্তু ক'বছর আগে যা ছিল দু'জনের মিলনের সেতু, তাই যেন আজ ব্যবধান হয়ে উঠেছে।

নীলাম্বরের এই উল্টোপাল্টা কথায় একেক সময় ভারি রাগ হয়, ভারি দুঃখ হয় মাধবীর। ওর

সমস্ত কবিত্ব কি শুধু উদযনকে ঘিবে, আব মাধবীব বেলাতেই নীলাম্বব হযে পড়ে অর্থনীতিব ছাত্র, ওব কবিতাব খাতা জমাখবচেব খাতাব রূপ নেয ? তবে কি নীলাম্ববেব মনে কোন সংশয আছে ? কিন্তু মাধবীব মনে তো কোন দ্বিধাব স্থান নেই।

জব্বলপুব মিলিটাবী অ্যাকাউন্টসে চাকবি কবে মাধবীব মাসতুতো ভাই নির্মল গুপ্ত। তাব স্ত্রী উর্মিলা মাধবীব সহপাঠিনী, পড়া কবে শেষ হযে গেছে কিন্তু চিঠি লেখাব আজও বিবাম নেই। একখানা চিঠিব জবাব দিতে না-দিতে উর্মিলা দুখানা চিঠি ছাড়ে। আব এমন মাস যায না যে মাসে মাধীবকে নিমন্ত্রণ না কবে, 'এসো, শুধু একা নয, একেবাবে সঙ্গী সমভিব্যাহাবে। কলকাতা শহবে পুরুতেব যদি অভাব থাকে, এখানে খাঁটি মাবাঠী ব্রাহ্মণকে মন্ত্র পড়াবাব জন্য ডেকে আনব।'

মাধবী জবাবে লিখল, 'কাকে মন্ত্র পড়াবে ভাই, তাব মন এখনও বুঝতে পাবছিনে।'

উর্মিলা লিখল, 'বল কি ! ভাগ্যে ববীন্দ্রনাথ মবে বেঁচেছেন, নইলে এই জব্বলপুবে টেনে এনে তাঁকে দিযে গানেব কলিটা নতুন ক'বে লিখিযে নিতাম, 'হে মাধবী দ্বিধা কেন' নয, 'হে মাধব দ্বিধা কেন।' আসলে যত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব মাধবদেব মনেই, মাধবীবা চিবকালই একবোখা। ববীন্দ্রনাথ তো নাবী কবি নন, দাড়িওযালা কবি। তাই সমস্ত দোষ মাধবীদেব ঘাড়ে চাপিযেছেন। যা হোক তোমাব কোন ভাবনা নেই। যেমন ক'বে পাব, ভদ্রলোককে এখানে টেনে নিযে এসো। তাবপব আছি আমি, আছে মাবাঠী ব্রাহ্মণ, আব আছে মাববেল বক। সেই বকে ধাক্কা লেগে লেগে ওঁব দ্বিধা যদি শতধা না হয, আমি কি বলেছি।'

পুজোব ছুটি হয-হয, মাধবী বলল, 'চল, বেড়িযে আসি

নীলাম্বব বলল, 'কোথায, ভবানীপুবে ?'

'না, জব্বলপুবে।'

নীলাম্বব বলল, 'ওবে বাপ বে, অত টাকা কোথায পাব ? বাবাব অসুখে অনেক খবচ হযে গেছে।'

মাধবী বলল, 'সেজন্য ভেবো না, স্কুলেব মাইনে থেকে আমি সামান্য কিছু জমিযেছি তা অসুখে খবচ হযনি।'

নীলাম্বব তবু দু-তিন দিন ইতস্তত কবল, সময নিল, তাবপব বলল, 'আচ্ছা, চল।'

দেখা গেল উর্মিলাব কথাই সত্য। কলকাতাব চৌহদ্দী পাব হবাব সঙ্গে সঙ্গে অম্ববে মেঘেব ছিটে-ফোঁটাও বইল না। আকাশ হল স্বচ্ছ নীল, ফেনিল হল হৃদযসমুদ্র। দুজনে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুবল, কখনো বা শ্রান্ত হযে শুধু পাহাড়েব দিকে তাকিযে বসে বইল, বানী দুর্গাবতীব দুর্গেব ওপব দাঁড়িযে সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে নতুন ক'বে হৃদযদুর্গেব দ্বাবোদ্ঘাটন হল দু'জনেব। তাবপব দল বেঁধে একদিন গেল মাববেল বক দেখতে। নির্মল আব উর্মিলা সুযোগ দিতে কোন কার্পণ্য কবল না। মাধবীবা দুজনে মিলে ধাবাস্নান কবল, কবিতা আবৃত্তি কবল, কিন্তু নর্মদা প্রপাতেব গর্জনে কোন কথা শোনা যায না ওব জলধাবাব তোলপাড়ে সব ঢেকে যায। না কি, এ তোলপাড় শুধু প্রপাতেব নয ?

এদিকে ছুটি ফুবিযে গেছে। কলকাতা থেকে কাজেব তাগিদ নিযে চিঠি যাচ্ছে। সব চিঠি খোলবাব সময হযনি। তবু নীলাম্বব একদিন বলল, 'এবাব যেতে হয।'

উর্মিলা বলল, 'সে কি ! এখানে এসে পূর্ণিমা বাত্রে মাববেল বক যদি না দেখলেন, দেখলেন কি ?'

মাধবীও জোব দিযে বলল, 'পূর্ণিমাব আগে যাব না।'

নীলাম্বব বলল 'কিন্তু পূর্ণিমাব তো এখনো বেশ দেবি আছে।'

মাধবী বলল, 'কি আব এমন দেবি ! ক'টা দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

তাবপব এল সেই প্রার্থিত পূর্ণিমা। একেক যুগলেব জন্য একেকখানা ডিঙি। বাত দুটো পর্যন্ত চলল জল-বিহাব। দু' ধাবে জ্যোৎস্না-ধোযা মর্মব প্রস্তব নীলাম্ববেব উজ্জ্বল চাপল্যেব নীরব সাক্ষী হযে বইল।

পবদিন ভোবে উর্মিলা বলল, 'কবি মানুষ, ভালো ক'রে একখানা বর্ণনা করুন তো দেখি, কেমন

দেখলেন ?'

নীলাম্বর বলল, 'তবেই হয়েছে ! আমাকে কিছু দেখতে দিলে তো দেখব !'

উর্মিলা মুখ টিপে হাসল, 'কেন, দেখায় বাধা হল কিসের ?'

নীলাম্বর বলল, 'সেই যে চক্রান্ত ক'রে একখানা কালো পাথরের মূর্তি নৌকায় তুলে দিলেন সেই হল কাল। আকাশ-নদী-পর্বত সব আড়াল ক'রে রইল।'

উর্মিলা বলল, 'কী সর্বনাশ ! তা হ'লে এক কাজ করুন। মূর্তিটিকে অমন সঙ্গে নিয়ে ঘুরে না বেড়িয়ে একেবারে গৃহমন্দিরে প্রতিষ্ঠা ক'রে রাখুন। চার দেয়ালের আড়ালে ফুল বেলপাতা দিয়ে ওকে যদি একবারে ঢেকে রাখতে পারেন বাইরের পৃথিবীটা তা হলে আর আড়ালে পড়বে না। এবার মূর্তি-প্রতিষ্ঠার দিনক্ষণ দেখা যাক, কি বলুন ? আমি মামাকে আজই চিঠি লিখে দিচ্ছি।'

কিন্তু বিয়ের তারিখের আগেই যে নীলাম্বরের চাকরি যাওয়ার তারিখ এসে পড়বে তা কে ভেবেছিল ? কিন্তু তার চেয়েও অভাবিত নীলাম্বরের এই অসহায় বিমূঢ়তা, চাকরি তো অনেকেরই যায়। কিন্তু ওর যেন সব গেছে।

সপ্তাহখানেক বাদে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের এক পরিচিত রেস্টুরেন্টের নীল-পর্দা-ঢাকা ছোট্ট কেবিনে ফের এসে বসল দুজনে।

চায়ে চুমুক দিয়ে মাধবী বলল, 'কি, কোন কিছুর খোঁজখবর পেলে ?'

নীলাম্বর মাথা নাড়ল : 'অত সহজেই কি পাওয়া যায় !'

মাধবী বলল, 'না হয় একটু কঠিনই হবে, অত ভাববার কি আছে ?'

নীলাম্বর মৃদু হাসল : 'তা তো ঠিকই।'

মানে, ভরসা দেওয়াটা যত সহজ, ভরসা পাওয়াটা তত সহজ নয়।

মাধবী আরও একটু বস্তুবাদিনী হল : 'আমি বাবা-দাদা, অন্য আত্মীয়স্বজনকে ব'লে রেখেছি।'

নীলাম্বর মাধবীর দিকে তাকাল : 'কি বলেছ ?'

'ব'লেছি আমার একটি চাকরির অত্যন্ত দরকার।'

নীলাম্বর বলল, 'ও, দেখ, কথাটা কিন্তু এই ক'দিনেই বন্ধুবান্ধদের মধ্যে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। শৈলেন, সোমনাথ ওরা সব ঠাট্টা করছিল।'

মাধবী বলল, 'কিসের ঠাট্টা ?'

'ওরা বলছিল, আজকাল তো প্রেমের জন্য ত্যাগ স্বীকারের কোন সুযোগ নেই। নীলাম্বরের ভাগ্য ভালো, সেই সুযোগ পেয়েছে। প্রিয়ার পায়ে চাকরিটিকে উৎসর্গ করেছে।

মাধবীর মুখ গম্ভীর হল : 'কথাটা তোমার মুখে কিন্তু তেমন ঠাট্টার মতো শোনাচ্ছে না।'

নীলাম্বর স্থির দৃষ্টিতে মাধবীর দিকে তাকাল : 'ঘরে যদি রুগ্ন বাপ-মা, ভাই-বোন তোমার সেই চাকরির ওপর নির্ভর ক'রে থাকত তা হলে ঠাট্টাটাকে তুমিও কতখানি হজম করতে পারতে আমার সন্দেহ আছে। তাছাড়া এখানে চাকরিটা তুচ্ছ। নিজের কর্তব্যে যে খানিকটা ত্রুটি হয়েছে একথা তো মিথ্যা নয়, শুকদেববাবু যে আমার বিরুদ্ধে এমন একটা অজুহাত খুঁজে পেলেন, সেখানেই আমার লেগেছে।'

নীলাম্বর একটু থেমে ফের বলতে লাগল, 'দেখ মাধবী, আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাজের ক্ষেত্র সংকীর্ণ। একটি পরিবার একটি অফিস নিয়েই হয়তো গোটা দুনিয়া। কিন্তু এর মধ্যেও ন্যায়, অন্যায়, মহত্ত্ব, ক্ষুদ্রত্ব, পৌরুষ, অপৌরুষ সব আছে। সেগুলি পরিমাপে ছোট, আকারে ছোট, কিন্তু প্রকারে এক। এখানেও দোষটা দোষই, তাকে কিছুতেই গুণ বলতে পারিনে। এমন কি নিজের দোষ হওয়া সত্ত্বেও না।'

মাধবী একটু হাসল : 'আত্মপীড়নে তোমার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। দোষটা কি কেবল তোমার ? শুকদেববাবুর কোন ত্রুটি হয়নি ?'

নীলাম্বর বলল, 'কে বলল হয়নি ! তাঁকেও এবার ভালো ক'রে চিনলুম। তোমাকে এতদিন বলিনি—'

কিন্তু মাধবীকে আজ সবই খুলে বলল নীলাম্বব। ওই কাগজ আব পাবলিকেশনেব জন্য এই ছ'বছব সে কি না কবেছে। অন্য জাযগায ভালো সুযোগ-সুবিধা পেযেও যায়নি। দিন নেই, বাত নেই সমানে খেটেছে। যা তাব কববাব কথা ছিল না তাও স্বেচ্ছায কবেছে। ওব ডবল মাইনে দিযেও কেউ তাকে অমন ক'বে খাটাতে পাবত না। কাজ কবত, কাবণ কাজ ক'বে আনন্দ পেত নীলাম্ববর্ব। সে জানত খুব বড লেখক হওযা হযতো তাব সাধ্যে নেই, তেমন আশাও সে করে না। কিন্তু ওই ছোট পত্রিকাখানিব মাধ্যমে অনেক বড বড লেখকেব সঙ্গে তাব আলাপ-পবিচয হবে, অনেক নতুন লেখককে আত্মপ্রকাশেব সুযোগ দেবে। তৈবি লেখকেব চেযে লেখক-তৈবিব দিকেই বেশি ঝোঁক ছিল নীলাম্ববেব। এই উপলক্ষে কত তরুণ সাহিত্য যশঃপ্রার্থীদেব সঙ্গে তাব পবিচয ঘটেছে। যাদেব লেখা নিতে পাবেনি, তাদেবও সস্নেহে আশ্বাস দিযেছে। তাদেব ওপবও যাতে অবিচাব না হয—

মাধবী একটু হাসল 'ববং যাদেব লেখা নিযেছ তাদেব ওপবই অবিচাব বেশি কবেছ তুমি।'

নীলাম্ববও হাসল ও সে কথা বুঝি তোমাব এখনও মনে আছে। তোমাব একটা প্রবন্ধকে অনেক এডিট ক'বে সেবাব ছেপেছিলাম—তাই নিযে এক সপ্তাহ তুমি আমাব সঙ্গে কোন কথা বলনি ছ মাসেব মধ্যে আব কোন লেখা দাওনি। কিন্তু এডিট কবাব পবে প্রবন্ধটি ভালোই হযেছিল একথাও তুমি পবে স্বীকাব কবেছ। দেখ, কোন কোন লেখকেব মন এক একটা খনিব মতো। কলমেব মুখে সেখান থেকে সম্পদ বেবিযে আসে। খাঁটি ধাতুব উজ্জ্বলতা বাড়াবাব জন্য সেখানে সম্পাদকেব কলমেব দবকাব হয। অবশ্য কোন কোন লেখিকা বড বেশি sensitive, তাঁদেব লেখাব ওপব কলম ছোঁযাবাব জো নেই।'

মাধবী বলল, 'আহাহা, কলম ছোঁযাতে যেন বাকি বেখেছ।'

নীলাম্বব বলল কিন্তু প্রত্যেকবাব তোমাব মুখ দেখে মাযা হযেছে। যেন কোন নিবীহ সম্পাদকেব কলমেব আঁচড নয, বুকে কোন হিংস্র জন্তুব নখেব আঁচড লেগেছে, মুখেব ভাব দেখে তেমনি মনে হযেছে আমাব।

চা খাবাব ছলে মুখ নিচু কবল মাধবী একটু ধমকেব ভঙ্গিতে বলল, 'কি যা-তা বলছ। শুকদেববাবুব সঙ্গে তোমাব অমন ঘনিষ্ঠতা কিসে নষ্ট হল তাই শুনি। সে কি শুধু জব্বলপুবে কযেকদিন বেশি কাটিযে এসেছিলে ব'লে? এক সংখ্যা কাগজ বেরুতে দিন কযেক দেবি হযেছিল ব'লে?'

নীলাম্বব স্বীকাব কবল ঘনিষ্ঠতা শুধু সেই দিনই যাযনি, একদিনেই যাযনি। শুকদেব বায শুধু একটা প্রেস আব কাগজেব স্বত্বাধিকাবী নয, উচ্চশিক্ষিত, সুপণ্ডিত, সাহিত্যবসিক। গোড়ার দিকে নীলাম্বব তার সৌজন্যে, শিষ্টাচাবে, সৌহৃদ্যে, বসবোধে মুগ্ধ হযেছে। আব সেই মুগ্ধতাব গল্প কবেছে বন্ধুজনেব কাছে। মাধবী মাঝে-মাঝে ঠাট্টা কবেছে 'কি ব্যাপাব, অফিসে তোমাব হঠাৎ মাইনে বেড়ে গেল নাকি, শহরভবে মনিবেব এমন সুখ্যাতি ক'বে বেডাচ্ছ।'

কিন্তু শুকদেববাবুব সঙ্গে প্রভু-ভৃত্যেব সম্পর্ক ছিল না নীলাম্ববেব। মাইনেব হ্রাসবৃদ্ধিব প্রশ্ন ছিল একান্ত গৌণ। কাজেব আগে-পবে, কাজেব ফাঁকে-ফাঁকে দেশবিদেশেব সাহিত্য-দর্শন-বাজনীতি-সমাজনীতি নিযে দুজনেব মধ্যে দিনেব পব দিন কত আলোচনা চলেছে। রাত হযেছে, বাত গভীব হযেছে তবু সেই আলাপ-আলোচনা বন্ধ হয়নি। কোন কোন দিন শুকদেববাবু নীলাম্ববকে আব যেতে দেননি। নিজেব ঘবে আটকে বেখে বলেছেন, 'ভেবো না, আমি তোমাব বাসায খবর পাঠাচ্ছি। আজ একসঙ্গে বসে এখানেই দুটি ডালভাত খাওযা যাক।'

অবশ্য আহার্যটা শুধু ডালভাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, মৎস্য-মাংসেও পৌঁচেছে।

এমন চাকবিকে শুধু চাকবি বলা যায় না, এমন মনিব শুধু মনিব নয, তিনি মনেব মানুষও।

কিন্তু মন নিযে খুব বেশি দিন চলল না। কাগজেব অবস্থা ক্রমেই অচল হ'তে লাগল। দেশে গুরুগম্ভীব প্রবন্ধাবলীব পাঠক মিলল না। ব্যবসায-বাণিজ্যেব বাজাব মন্দা। পূর্ববঙ্গ এখন পূর্ব-পাকিস্তান। শুকদেববাবুব কাগজেব নিয়মিত গ্রাহকদেব অনেকেরই ঠিকানা নেই। কাগজ গেল তো, টাকা এল না। বিজ্ঞাপনদাতাবা বিমুখ হলেন। তাগিদ দিয়ে দিয়েও বাকী টাকা আদায় হল না।

ব্যাঙ্কের তহবিল ক্রমেই তলায় এসে ঠেকল। শুকদেববাবু পরমার্থ থেকে হঠাৎ অর্থ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠলেন। কিন্তু ততদিনে অনর্থ যা ঘটবার ঘটেছে।

নীলাম্বরকে ডেকে কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'এতদিন কি করেছ ?'

নীলাম্বর জবাব দিল, 'আপনি যা করতে বলেছেন '

শুকদেববাবু বললেন, 'মিথ্যা কথা। কাগজটা যাতে উঠে যায় তার ব্যবস্থা করতে তোমাকে নিশ্চয়ই বলিনি।'

'কাগজ কি আমার জন্যই উঠে যাচ্ছে ?'

শুকদেববাবু বললেন, তোমার জন্যই নয়, কিন্তু তোমার জন্যও। সব দায়িত্ব তো আমি তোমার ওপরই ছেড়ে দিয়েছিলাম। এই ছ'মাসে ক'পাতা বিজ্ঞাপন এনেছ হিসাব দাও।'

নীলম্বর জবাবে বলল তার ওপর বিজ্ঞাপন দেওয়ার ভার যেমন ছিল, বিজ্ঞাপন আনার ভার তেমন ছিল না।

কথা কাটাকাটি চলতে লাগল, চলতে লাগল মন-কষাকষির পালা। এই সময় এল মাধবীর জব্বলপুর যাত্রার প্রস্তাব। নীলাম্বর ভাবল, দুটো দিন পালিয়ে বাঁচা যাক।

কিন্তু বাঁচা গেল না। ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে শুকদেববাবু বিষাক্ত ব্যঙ্গে হাসলেন 'কি, প্রামোদভ্রমণ শেষ হল ? কিন্তু জব্বলপুরই তো একমাত্র জায়গা নয়। ভারতবর্ষে পুর আর পুরী অনেক রয়েছে। সবগুলি সেরে এলেই পারতে। তুমি তো বান্ধবী নিয়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছ, এদিকে আমার যে সব লোকসান হয়ে গেল—'

নীলাম্বর বলল 'কিন্তু আপনার তো আরো লোকজন ছিল আপনি নিজে ছিলেন—'

শুকদেববাবু গর্জন ক'রে উঠলেন আমি ছিলাম কি ছিলাম না, তা তোমার বলবার কথা নয়। কিন্তু তুমি এতদিন কি করছিলে ? মাসে মাসে মাইনে গোণার বদলে বন্ধুবান্ধবের লেখা ছেপে তাদের সঙ্গে খাতির রাখা ছাড়া, আড্ডা দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজটা তুমি করেছ তার জবাব দাও।'

নীলাম্বর বলল, আমি আপনার এসব অন্যায় কথা, অভদ্র ব্যবহারের কোন জবাব দেব না।'

শুকদেববাবু বললেন 'অন্যায় কথা ! অভদ্র ব্যবহার ! তোমার মতো একজন সাধারণ কর্মচারীর মুখে একথাও শুনতে হবে আমাকে ! বেশ, জবাব না দিতে পার, রেজিগনেশন দাও।'

নীলাম্বর বলল তাই দিচ্ছি।'

আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনার বিবরণ শেষ ক'রে নীলাম্বর মাধবীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল 'এবার তোমার মন একটু হাল্কা হবে বোধ হয়।'

মাধবী বলল 'আমার মন হাল্কাই আছে। এখন তোমার মন হাল্কা হলেই বাঁচি। ভালো কথা, কাল একবার যেয়ো আমাদের ওখানে।'

'কেন ?'

'দাদা একটা চাকরির কথা বলছিলেন। সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেণ্টে। রাইটার্স বিল্ডিং-এ দাদার একজন বন্ধু আছেন। তাঁর সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিয়ে দেবেন।'

নীলাম্বর বলল 'তুমি বুঝি ওদের সব বলেছ ? শেষ পর্যন্ত ভাবী শ্বশুরকুলের সাহায্যে চাকরি জোগাড় করতে হবে—'

মাধবী বলল, 'তাতে ক্ষতি কি ? কাল সকালেই এসো একবার।'

নীলাম্বর একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'সকালে ! সকালে আমার অন্য এনগেজমেণ্ট আছে। দেখা যাক যদি সময় পাই তো—'

কিন্তু পরদিন দেখা গেল নীলাম্বর সময় পেয়েছে। শাঁখারীপাড়া লেনের হলদে রঙের বাড়িটার সামনে ঠিক গিয়ে হাজির হয়েছে নীলাম্বর।

মাধবী দোরের কাছেই ছিল। তাকে দেখে মৃদু হেসে বলল, 'এস। ভাবলাম, তুমি বুঝি এলেই না।'

'না এসে কি করি ! তুমি অত ক'রে ব'লে এলে—'

'হুঁ, সেইজন্যই বুঝি।'

নীলাম্বর বলল, 'সেইজন্য নয়। তুমি বলবে চাকরির জন্য। কিন্তু চাকরিটা কার শুনি?'

মাধবী বলল, 'ওদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ শেষ ক'রে আমার ঘরে যেয়ো। তখন বলব।'

মাধবীর বাবা সুরেন সেন মশাইও চাকুরিজীবী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ। তিনিও ভাড়াটে বাড়ির বাসিন্দা। তবে বছর পনের আগে বাড়িটা ভাড়া নিয়েছিলেন ব'লে এখনো পঞ্চান্ন টাকায় সাতখানা ঘরসুদ্ধ পুরো একটা দোতলা বাড়ি ভোগ করতে পারছেন। আর ছেলে মেয়ে পুত্রবধূরা তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে বেশ একটা আভিজাত্যের চেহারা দিতে পেরেছে। কিন্তু নীলাম্বর জানে এ বাড়ির ওপরের চাকচিক্য যত বেশি, ভিতরটা তত ভরাট নয়। কাস্টমস এ শ'চারেক টাকার মাইনের চাকরি করেন সুরেনবাবু। কিন্তু পোষ্যের সংখ্যাও জন চৌদ্দ। মাধবীর আগে গুটি দুই মেয়ের বিয়ে দিতে হয়েছে। তার দেনা এখনো সব শোধ হয়নি।

নিরীহ, শান্ত, টাক মাথা, বেঁটেখাট, অমায়িক ভদ্রলোক, কারো অনিষ্ট করেন না কিন্তু কারো ইষ্টসাধনের সাধ্যও তেমন নেই। বাজার সেরে এসে ঘরে ব'সে খবরের কাগজ পড়ছিলেন সুরেনবাবু, নীলাম্বরকে দেখে বললেন, 'এস।' পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বসতে বললেন তাকে। দু-একটা কুশল প্রশ্নের পরে বললেন, 'আমি মাধুর কাছে সব শুনেছি। ওসব প্রেসে-ট্রেসে এতদিন পড়ে থাকাই উচিত হয়নি, কিন্তু অন্য কোন চাকরি না পেয়ে হাতের চাকরি ছেড়ে দেওয়াটাও আজকালকার দিনে ঠিক বলা যায় না। কারণ চাকরিটা তো নিজের হাতে নয় সম্পূর্ণ অন্যের হাতে। অন্যে দেবে তবে হবে। অবশ্য ভাবনার কিছু নেই। লেখাপড়া শিখেছ কিছু না কিছু একটা জুটে যাবেই। বন্ধুবান্ধব সবাইকে ব'লেও রেখেছি—'

সুরেনবাবু আবার কাগজে চোখ রাখলেন।

মাধীবর ওপর রাগ হতে লাগল নীলাম্বরের। হোক না বাবা, তবু এই নির্বিরোধ প্রৌঢ় ভদ্রলোকের কাছে কেন সব বলতে গেছে মাধবী। ওঁকে ব'লে কি কিছু লাভ আছে। হিতোপদেশ ছাড়া আর তাকে তিনি কি দিতে পারেন।

একটু বাদে নীলাম্বর উঠে পড়ল 'সুপ্রকাশ আসতে বলেছিল। ওর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যাই।'

সুরেনবাবু যেন পরিত্রাণ পেলেন 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওর সঙ্গে দেখা কর। আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। কি একটা চাকরির কথা ও সেদিন বলছিল বটে। নিজে চাকরিবাকরির দিকে যায়নি কিন্তু সব রকম খোঁজ ও রাখে।'

আত্মজের জন্য আত্মপ্রসাদে এতক্ষণে মুখ উজ্জ্বল দেখাল সুরেনবাবুর

দোতলার সব চেয়ে বড় ঘরখানা বাড়ির বড় ছেলের। এরই মধ্যেই গুটি দুই ছেলেমেয়ে হয়েছে সুপ্রকাশের। তারা মেঝেয় ব'সে খেলা করছে। স্ত্রীর ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাচ্ছিল সুপ্রকাশ। আয়নায় নীলাম্বরের ছায়া পড়তেই ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে স্মিতমুখে বলল, 'এস, এস। দেখা-সাক্ষাৎই নেই একেবারে, ব্যাপার কি?'

দু-চার মিনিট বাদে চাকরির কথা উঠল।

সুপ্রকাশ বন্ধুকে মৃদু গঞ্জনার সুরে বলল, 'তোমাকে তখনই বলেছিলাম ওসব পত্রিকা-টত্রিকায় সুবিধে হবে না হে। একটি ভালো কাজকর্ম দেখ। তা তুমি মনের মতো কাজ, মনের মতো মাইনে, কত কথাই না বললে। যাক, এতদিনে সুবুদ্ধি হয়েছে তবু ভাল। ভাগ্যে হাতের পাঁচ ল-টা পড়ে রেখেছিলাম। তোমাকে তখন অত ক'রে বললাম, এস একসঙ্গে পড়া যাক। সবদিন তো আর যেতে হবে না। তোমার প্রকসি আমি দিয়ে দেব। তা তুমি কানেই তুললে না কথাটা।'

নীলাম্বর বলল, 'আজকাল নাকি হাইকোর্টেও বেরুচ্ছ? কি রকম হচ্ছে-টচ্ছে?'

সুপ্রকাশ বলল, 'বলতে গেলে হচ্ছে না কিছুই। কিন্তু চাকরি খুঁজতে হচ্ছে না—এই ঢের। হ্যাঁ, তোমার কথা আমি প্রশান্তকে সেদিন বললাম। সেই যে তোৎলা প্রশান্ত সিকদার, মনে নেই? সেক্রেটারিয়েটে বেশ চাকরি বাগিয়ে বসেছে। চালচলনে পুরোদস্তুর সাহেব। তা হলেও খুব সিম্প্যাথেটিক, কথাবার্তায় তাই তো মনে হল। তুমি ভাই ওর সঙ্গে একবার দেখা কর। কোথায় কি

খালিটালি আছে ও হদিশ দিতে পারবে। ওরা ভিতরের লোক। আটঘাটের খবরও সব জানে। কোথায় কি আছে একটু জানতে পারলে সোর্স-টোর্স বের করবার চেষ্টা করা যাবে।'

একটু বাদে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে সুপ্রকাশের স্ত্রী করবী এল ঘরে। খুব সুন্দরী নয়, কিন্তু স্মিতমুখী। নীলাম্বরকে অনুযোগ ক'রে বলল, 'আপনি তো আর আসেনই না এদিকে। আসবেন কি, যার জন্য এদিকে আসা সেই যখন ওদিকে যায়—'

সুপ্রকাশ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হাসল 'না হে, সেদিন আর নেই।'

করবী বলল, 'উঁহু নেই তুমি যেন কত খবর রাখ। নীলাম্বরবাবু বেকার হওয়ার পর মাধু ঠাকুরঝির যাতায়াত ছুটোছুটি আরো বেড়েছে। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না নীলাম্বরবাবু, গরজ যার বেশি সেই আপনাকে চাকরি জুটিয়ে দেবে।'

প্রশান্ত সিকদারের সঙ্গে দেখা ক'রেও বিশেষ কোন ফল হল না। চাকরি খালি আছে বটে। কিন্তু সব পাবলিক সার্ভিস কমিশনের হাতে। ফর্ম ফিল আপ ক'রে দিয়ে যাক নীলাম্বর। কম্পিটিটিভ পরীক্ষার ব্যাপার তাতে যা হয় হবে। অবশ্য সাধ্যমতো চেষ্টার ত্রুটি করবে না প্রশান্ত।

বিশ্বাস করা যায় প্রশান্ত তার কথা রেখেছে। চেষ্টার ত্রুটি করেনি। দু-দুটো প্রতিযোগিতায় গিয়ে পরীক্ষা দিল নীলাম্বর। কিন্তু কোন সাড়া এল না। সরকারী-বেসরকারী সব রকম অফিসেই ঢুঁমেরে দেখল, যে কোন রকমের * দেড়েক টাকার একটি চাকরি জুটলেই হয়। তার চেয়ে বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা আপাতত নেই নীলাম্বরের। কিন্তু দু'মাস, তিন মাস গেল, সেই অনুচ্চ আকাঙ্ক্ষাটুকু পূরণেরও কোন রকম লক্ষণ দেখা গেল না। সব জায়গায় আশ্বাস আছে, প্রতিশ্রুতি আছে, কিন্তু তারপর আর কিছু নেই। এদিকে বাবার অসুখ বেড়ে যাচ্ছে। মার মেজাজ সব সময়েই বিগড়ে রয়েছে। পরিধেয় সকলেরই জীর্ণ হয়েছে কিন্তু নববস্ত্র গ্রহণ করা যাচ্ছে না। বেকারের পক্ষে জীর্ণ দেহ ত্যাগ করা যত সহজ, জীর্ণ বস্ত্র ত্যাগ করা তেমন নয়। গীতাকার আজকাল জন্মালে আত্মার অবিনশ্বরতা বুঝবার জন্য তাঁকে অন্য উপমার আশ্রয় খুঁজতে হত।

স্কুলের ছুটির পর মাধবী ফের এল একদিন খোঁজ নিতে। নীল ম্বর অনেকদিন ধরে একটা প্রবন্ধে হাত দিয়েছে। কিন্তু মুখবন্ধের পর লেখাটা আর এগুচ্ছে না। মাধবী এসে পাশে বসল। নীলাম্বর লেখাটা সরিয়ে রাখল।

মাধবী বলল, 'তবু ভালো, আজ তোমাকে লিখতে দেখছি। ইদানীং তো কাগজকলমের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে তুলেই দিয়েছ। অত ক'রে বললাম, লেখার অভ্যাসটা নিয়মিত রাখ। কিন্তু কিছুতেই শুনলে না। আমার কোন কথাটাই বা তুমি আজকাল শুনছ।'

নীলাম্বর মৃদু হাসল, 'তাই নাকি?'

মাধবী বলল 'তা ছাড়া কি? কিন্তু আমার একটা কথা আজ তোমাকে রাখতেই হবে।'

'কি কথা?'

মাধবী কোন কথা না ব'লে [illegible] খুলে আটখানা দশ টাকার নোট নীলাম্বরের হাতে দিয়ে বলল, 'আজকেই মাইনেটা পেলাম।'

তার মাইনের টাকা নেওয়ার জন্য এর আগেও মধবী বার কয়েক অনুরোধ করেছে, নীলাম্বর কান পাতেনি, প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেছে। কিন্তু আজ মাধবী একবারে টাকা নিয়ে এসে হাজির হয়েছে।

নীলাম্বর মাধবীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে থেকে বলল, 'তোমাকে তো আগেই বলেছি। ও টাকা আমি নিতে পারব না মাধবী।

'কেন, না নিতে পারবার কি হয়েছে? আমার টাকা কি তোমার টাকা নয়? যার কাছ থেকে সব নেওয়া যায় তার কাছ থেকে শুধু গোটা কয়েক টাকা নিতেই দোষ? বেশ, তুমি না নাও, আমি মাসীমার হাতে দিয়ে যাচ্ছি।'

নীলাম্বর বলল, 'তুমি দিতে পারবে?'

মাধবী বলল, 'নিশ্চয়ই পারব, তিনিও নিতে পারবেন। তিনি তোমার মতো নয়। শুধু অনুষ্ঠানটুকু বাকি আছে ব'লে তিনি নিশ্চয়ই আমাকে পর ব'লে মনে করবেন না।'

নীলাম্বব একটু কাল চুপ ক'বে থেকে বলল, 'আচ্ছা, দাও।'

সুববালা আডালে দাঁডিযে দাঁডিযে সব দেখছিলেন। এবাব ঘবে এসে ঢুকলেন। তাঁব মুখে প্রসন্নতা ফুটে উঠেছে। কণ্ঠে মমতা। মাধবীকে সস্নেহে জিজ্ঞেস কবলেন, 'বাডিব সব ভালো আছে তো মাধবী, তোমাব বাবা দাদা বউদি—'

মাধবী ঘাড কাত ক'বে বলল, 'হ্যাঁ।'

নোটগুলি মেঝেব ওপব পডেছিল। হাওযায একটু এলোমেলো হযে ছডিযে পডল। সুববালা নিজেই নিচু হযে সেগুলি কুডিযে আনলেন 'তোমবা বড অসাবধান বাপু। টাকা এমন ক'বে ফেলে বাখতে আছে ? এ টাকা কাব ?'

নীলাম্বব কোন জবাব না দিযে মাধবীব দিকে তাকাল। মাধবী তাকাল সুববালাব দিকে, একটু চুপ ক'বে থেকে বলল 'ও টাকা আপনাব। আপনি তুলে বাখুন।'

সুববালা একটু বিস্মযেব ভঙ্গি ক'বে বললেন, 'আমি তুলে বাখব।'

মাধবী বলল, 'হ্যাঁ আপনিই বাখবেন। আমাব মাইনেব টাকা আপনাব ছেলে না নিতে পাবেন, কিন্তু আপনাব নেওযাব তো কোন বাধা নেই।'

ব'লে মাধবী মুখ নিচু কবল। আবেগার্দ্র শোনাল ওব গলা।

সুববালা একটু কাল চুপ ক'বে থেকে সস্নেহে বললেন, 'তা তো নেইই মা। কোন বাধা নেই। বাইবেব যেটুকু আচাব-অনুষ্ঠান আছে সেটুকু সেবে ঘবেব লক্ষ্মী তুমি এবাব ঘবে চ'লে এলেই হয। তা হলে কাবোই আব কোন সংকোচ থাকে না। হ্যাঁ বে নীলু, এসব বিযেতে পুরুত ডাকাব আগে কোর্টেটোর্টে নাকি যেতে হয শুনেছি, একদিন গিযে সব ঝামেলা মিটিযে আয।'

নীলাম্বব হাসল 'তুমি ওই আশি টাকা পেযেই একেবাবে জল হযে গেলে মা। কিন্তু ওই টাকাতেই কি সংসাব চলবে ? একটা চাকবিবাকবি জোটাব আগে ওসব ঝামেলা মেটাতে গেলে সে ঝামেলা মিটবে না, ববং বাডবে।

সুববালা বললেন, 'কেবল চাকবি আব চাকবি। সংসাবে চাকবি ছাডা কি বোজগাবেব আব কোন পথ নেই ?' মাধবীব দিকে তাকিযে একটু মৃদু হাসলেন 'দাও তো বাপু ওকে একটা চাকবি জুটিযে, দিনবাত এত হা-হুতাশ আমাব আব সহ্য হয না।

সুববালা চ'লে গেলে নীলাম্বব বলল 'নাও, এবাব আমাব আব ভাবনা বইল না। চাকবিব জন্য নিজেব আব কোন চেষ্টাচবিত্র আমাব না কবলেও চলবে। চাকবি জোটাবাব ভাব তো তুমিই নিলে।'

মাধবী বলল, হ্যাঁ, আমিই নিলাম, তোমাব আব কিছু কবতে হবে না। তুমি এই ফাঁকে সাহিত্য আব সমাজ সম্বন্ধে যে বইখানা লিখবে বলেছিলে সেখানা লিখে ফেল দেখি ছুটকো কাজে অনেক সময গেছে, এবাব বেশ একটা বড জিনিসে হাত দাও।'

নীলাম্বব একটু হেসে বলল, 'হুঁ, তাই দেব।'

হাসিব মানেটা মাধবী বুঝতে পেবে চুপ ক'বে বইল। গোটা পবিবাব যখন প্রায অনাহাবেব মুখে, নিশ্চিন্তে বসে বসে বই লিখবাব মতো মনেব অবস্থাই তখন বটে।

মাধবী মনে মনে স্থিব কবল, যেমন ক'বেই হোক নীলাম্ববেব চাকবি সে জোগাড ক'বে দেবেই। একটা চাকবিব আশ্রয না পেলে নীলাম্বব স্বস্তি পাবে না। কোন কিছু লেখানোও যাবে না ওকে দিযে। নীলাম্বব এতদিন তেমন ক'বে চেষ্টা কবতে পাবেনি ব'লেই কিছু জোটেনি। নইলে এত লোকেব কাজ জুটছে, নীলাম্ববেব জুটত না।

তাবপব থেকে শুধু নিজেব স্কুলেব সমযটুকু ছাডা বাকি সমস্ত সময নীলাম্ববেব চাকবিব চেষ্টায মাধবী আত্মনিযোগ কবল। আপাতত দ্বিতীয কোন উদ্দেশ্য নেই তাব, দ্বিতীয কোন আকাঙ্ক্ষা নেই। নিজেব পডাশুনো, সাহিত্যচর্চা সব বন্ধ বইল। ছুটিব দিনগুলি খোঁজখবব নিতে কাটে। কোথায কোথায কোন আত্মীযকুটুম্ব বড চাকুবে আছে, কোন্ বন্ধুব বন্ধু কোন অফিসের হর্তাকর্তা, কোন বান্ধবীর স্বামী কোন সবকাবী বিভাগেব ঘাঁটি আগলে বযেছেন, ভিতবে ভিতবে তাব খোঁজখবব

নিতে লাগল মাধবী। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করল। দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে যে দু-একজন অর্ধপরিচিত রয়েছেন, পূর্ণপরিচিত, পুরনো পরিচিত বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে পত্রালাপের সুযোগ খুঁজল। প্রথম আলাপেই তো আর চাকরির কথা পাড়া যায় না। স্থূল কাজের কথাকে নানা আলাপ আলোচনায় ঢেকে রাখতে হয়। তারপর একটু ইঙ্গিত, একটু ইসারা। যদি সাড়া মেলে তা হলে আর একপা এগিয়ে যাও, যদি না মিলল তো দু-এক পা ক'রে পিছিয়ে এস, আর এস না। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাধবীকে পিছিয়ে আসতে হল। শুধু মাথা নাড়া, শুধু মৌখিক প্রতিশ্রুতি। দেখলেই চেনা যায যখন চিনতে দেরি লাগে তখন অন্তরে ঘা লাগে আরও বেশি।

নীলাম্বর একদিন বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হল? এ কি শুরু করেছ?'

মাধবী মুখ তুলে তাকাল। কোন কথা বলল না। কিন্তু ওর চোখের বেদনার আভাস গোপন রইল না। এই তিরস্কার ওর প্রাপ্য নয়।

নীলাম্বর একটু অপ্রতিভ হয়ে বলল, মানে, আমার জন্যে কেন এত কষ্ট করছ, এত ছুটোছুটি করছ—'

মাধবী বলল, 'কেবল কি তোমার জন্যেই করছি?'

নীলাম্বর মনে মনে হাসল। তা ঠিক ঘর বাঁধবার গরজেই মাধবী আজ ঘরে থাকতে পারছে না, বার বার বেরুতে হচ্ছে। ওর জন্য ভারি সহানুভূতি বোধ করল নীলাম্বর। এবার আর দেরি করবে না। যত কম মাইনেরই হোক একটা মাস্টারি কি কেরানীগিরি কিছু জুটলেই বিয়েটা এবার ক'রে ফেলবে নীলাম্বর। যেমন ক'রে হোক চলে যাবেই। মাধবীকে আর অপেক্ষায় রাখা চলে না।

কিন্তু আশ্চর্য, তা'ও জুটল না। অনেকগুলি চাকরি হাতের কাছে এসে ফসকে গেল। কলকাতার বাইরে দু একটা কলেজ থেকে পরবর্তী সেসনের জন্য ভরসা মিলল, সমূহ আর কিছু মিলল না।

কাটল আরও মাস ছয়েক। দুটো টিউশনির মধ্যে যেটা বেশি টাকার সেটা গেল। একটা সাপ্তাহিক কাগজে ফিচার লিখতে শুরু করেছিল তার মেয়াদ ফুরোল নতুন চুক্তিতে সম্পাদক আর রাজী হলেন না। বললেন আরও একটু হাল্কা সরস লেখা চাই আমাদের, নইলে পাঠকরা নিচ্ছে না।

সরস লেখা! জীবনে রস কই যে কলমে রস আসবে।

মাধবীর অভিজ্ঞতাও একই রকম। অনেক মোহ ভেঙেছে, অনেক স্বপ্ন চুরমার হয়েছে। ব্যর্থতার বোঝা ভারি হচ্ছে দিনের পর দিন। অনেক স্বজন বন্ধুর স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে চোখের সামনে। আশা ভরসা যখন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে দেখা হল নীলিমা দাশগুপ্তর সঙ্গে। স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন উপলক্ষে পাড়ার বিশিষ্ট নাগরিক-নাগরিকাদের আমন্ত্রণ করা হয়েছে তার সভাপতি সুবিনয় দাশগুপ্ত —ন্যাশনাল এয়ারওয়েজ কোম্পানির কলকাতার অফিস ম্যানেজার। সম্প্রতি দিল্লী থেকে বদলী হয়ে এসেছেন। আর তাঁরই স্ত্রী নীলিমা সম্পর্কে মাধবীর মামাতো বোন। আত্মীয়তার দিক থেকে একটু দূরত্ব থাকলেও বন্ধুত্ব পরস্পরকে দূরে থাকতে দেয়নি।

অনুষ্ঠানের শেষে নীলিমা মাধবীকে তার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'ঈস, কতকাল পরে দেখা। আয় একদিন আমাদের বাড়িতে। তারপর বিয়ে থা করিসনি যে। কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে আমরা বুড়ো হয়ে গেলাম, আর তুই এখনো আইবুড়ো। ব্যাপারটা কি?'

মাধবী একটু হাসল 'এসব কথা এক নিঃশ্বাসে জিজ্ঞেস করা যায়, কিন্তু এক নিঃশ্বাসে জবাব দেওয়া যায় না।'

'বেশ, এক নিঃশ্বাসে না দিস ধীরেসুস্থে বয়ে সয়েই দিবি। পরশুই তা হলে আয়। একসঙ্গে চা খাব আর জবাব শুনব।'

বলি বলি ক'রেও প্রথম দিনই কথাটা ঠিক বলতে পারল না মাধবী। দ্বিতীয় দিনের সাক্ষাতেও আসল বক্তব্যটা অনুক্ত রইল। তৃতীয় দিনে মাধবী আর দেরি করল না।

'আছে না কি কোন খোঁজখবর?'

নীলিমা বলল, 'তোর নিজের জন্য? নিজে করবি চাকরি?'

মাধবী একটু হাসল 'নিজের জন্যই, তবে নিজে করব না।'

নীলিমা হেসে বলল, 'বুঝেছি, তা এতক্ষণ চেপে রাখছিলি কেন ? আচ্ছা, আমি ওঁকে জিজ্ঞেস করছি। ওঁদের অফিসে একজন পাবলিসিটি অফিসার নেবে ব'লে শুনেছিলাম। অ্যালাউন্স ট্যালাউন্স সুদ্ধ বোধ হয় শ' সাড়ে তিনেক এখন দেবে। ওঁর হাতেই সব ভার। ওঁকে তা হলে বলি, কি বলিস ?'

মাধবী বলল, 'যদি ক'রে দিতে পারিস খুবই উপকার হয়।

'থাক থাক, তোকে আর অত ফর্মাল হতে হবে না।'

কিন্তু পরদিন নীলিমা উল্টো সুর ধরল 'তুই এতদিন চেপে রেখেছিলি কেন ? প্রথম দিনই যদি বলতিস! ওঁর কোন এক মাস্টার মশাই-এর ছেলেকে নাকি উনি প্রায় কথা দিয়ে ফেলেছেন। সেও ভারি গরীব। বহুদিন বেকার আছে। একটা চাকরি-বাকরির তারও নাকি খুব দরকার।'

দরকার! মাধবীর চেয়ে কারও দরকার বেশি নয়। ওর চোখের সামনে নীলাম্বরের দুঃস্থ অবস্থার ছবি ভেসে উঠল। এতদিন তবু টিউশনি ছিল, ফিচার লেখা ছিল, এখন আর কিছু নেই। মাধবীর মাইনের সামান্য কট' টাকায় সংসারের আর ক দিন চলবে! ঘর ভাড়াই তো মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে গুনতে হচ্ছে বুড়ো বাপ মা, ভাই-বোন নিয়ে এবার হয়তো সত্যই উপোস করতে হবে নীলাম্বরকে। সেই নিষ্ঠুর সম্ভাবনার কাছে মাধবীর নিজের মান সম্মান তুচ্ছ।

নীলিমার হাতখানা চেপে ধরল মাধবী 'কিছুই কি করা যায় না ভাই? সুবিনয়বাবু কি তাঁকে একেবারে পাকা কথা দিয়েছেন ?'

মাধবীর মুখের দিকে নীলিমা একটুকাল তাকিয়ে কি দেখল, তারপর বলল, 'চাকরি বাকরির ব্যাপারে কোন কথাই পাকা কথা নয়। আমি তোর জন্য চেষ্টার ত্রুটি করব না মাধু। কাল একবার আয়। দেখি কতদূর কি করতে পারি।'

পরদিন ফের গেল মাধবী, গিয়েই জিজ্ঞেস করল 'কি খবর ?'

নীলিমা হেসে বলল, 'আসবার সঙ্গে সঙ্গেই খবরটি চাই। সবুর সইছে না বুঝি! খবর ভালো। তবে রাজী করাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। উনি নানারকম অসুবিধের কথা তুলেছিলেন। আমি জবাব দিয়েছি, আমার বন্ধুর বিয়ে আটকে রয়েছে—এর চেয়ে কোন অসুবিধেই তোমার কাছে বড় হতে পারে না। একটা অ্যাপলিকেশন কালই ছেড়ে দিন। বাকী যা করবার উনি করবেন। কিন্তু যার জন্য এত খেটে মরলাম, তাকে একবার দেখতেও দিলিনে! কবে নিয়ে আসবি বল।'

মাধবী বলল, 'আচ্ছা, আনব একদিন।'

মাধবীকে সদর পর্যন্ত নীলিমা এগিয়ে দিতে এসেছে এমন সময় রোগামতো চব্বিশ পচিশ বছরের শ্যামবর্ণ সাধারণ-দর্শন একটি যুবক সামনে এসে দাঁড়াল 'মিঃ দাশগুপ্ত আছেন ?'

নীলিমা বলল, 'না, তিনি এখনো ফেরেননি।'

'ও, আচ্ছা। আমি কি তার জন্য অপেক্ষা করব ?'

নীলিমা মাথা নাড়ল 'না, তাঁর ফিরতে অনেক দেরি হবে।'

'তা হলে কি অফিসে—। কিন্তু সেখানেও তো তাঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয় না।'

নীলিমা বলল, 'তিনি বলেছেন, দেখা করবার আর দরকার নেই। আপনি ঠিক সময়মতো খবর পাবেন।

'ও, আপনাকে বিরক্ত করলাম, কিছু মনে করবেন না।'

নীলিমা সৌজন্য দেখিয়ে হাসল, 'না না, মনে করবার কি আছে! আচ্ছা নমস্কার।'

প্রতিনমস্কার ক'রে সে চলে আসতে যাচ্ছিল, হঠাৎ মাধবীর দিকে চোখ পড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুমি!'

মাধবী তার অনেক আগেই লক্ষ্য করেছে, চিনেছে, বিস্ময়কে প্রশমিত করেছে। এবার নিস্পৃহ নিরুত্তেজ স্বরে বলল, 'তুমিও যে এখানে!'

নীলিমা বলল, 'অসিতবাবুকে তুই চিনিস নাকি ? ওঁর কথাই তো তোকে বলছিলাম সেদিন।'

মাধবী বলল, 'চিনব না কেন ? বছর দুয়েক আমরা একসঙ্গে পড়েছি।'

নীলিমা এবার মৃদু একটু হাসল 'তাই বল্।'

অসিত বলল, 'তুমিও তো বেরুচ্ছিলে। চল, একসঙ্গেই যাই, কতদিন বাদে দেখা হল।'

মাধবী একটু ইতস্ততঃ ক'রে বলল, 'চল।'

দিন তিনেক বাদে নীলাম্বর অফিস থেকে মাধবীদের বাড়িতে গিয়ে দেখা করল। মাধবী চুপচাপ নিজের ঘরে বসেছিল।

নীলাম্বর বলল, 'ব্যাপার কি, তুমি আর গেলে না যে?'

মাধবী একটু ম্লান হাসল, 'গেলাম না ব'লেই তো তুমি এলে। জয়েন করেছ?'

নীলাম্বর বলল, 'হ্যাঁ, আজই করলাম। মিঃ দাশগুপ্তর সঙ্গে আজ আরো আলাপ হল। চমৎকার অমায়িক ভদ্রলোক। তোমার পছন্দ করা-মনিব কি আর খারাপ হতে পারে? তা তো হল। কিন্তু এদিকে মার জন্য যে বাড়িতে টিকবার জো নেই।'

মাধবী বলল, 'কি রকম?'

'তিনি বলেছেন শুভ কাজটি এমাসেই সেরে ফেলতে। এর পর ভাদ্র মাস আমার জন্মমাস আর আশ্বিন কার্তিক দু'মাস পুরুতরা বিয়ের মন্ত্র পড়বে না। আমি অবশ্য বলেছি ম্যারেজ রেজিস্ট্রার সব মাসেই মন্ত্র পড়তে রাজী। কিন্তু মা তাতে রাজী নন। তাঁর ইচ্ছা এ মাসেই--'

নীলাম্বর মাধবীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসল।

কিন্তু আশ্চর্য, অতি প্রত্যাশিত হাসি ফুটল না মাধবীর মুখে।

নীলাম্বর আহত হয়ে বলল, 'কি হয়েছে মাধু, তোমার কি শরীর খারাপ করেছে?'

'না, শরীর ভালোই আছে।'

'কিন্তু মন ভালো না থাকার কারণটা কি?'

গলার স্বরে নীলাম্বরের অসহিষ্ণুতা ধরা পড়ল

মাধবী নীলাম্বরের দিকে তাকিয়ে একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'এই খানিকক্ষণ আগে অসিত এসেছিল।'

'অসিত কে?'

'অসিত দত্ত। আমাদের সঙ্গে পড়ত।'

নীলাম্বর বলল, 'তাই নাকি? তা হঠাৎ পুরনো সহপাঠিনীকে তার মনে পড়ে গেল যে?'

মাধবী বলল, 'সহজে মনে পড়েনি। প্রাণের দায়ে মনে পড়েছে।'

নীলাম্বর চেয়ারটি মাধবীর আরও একটু কাছে টেনে নিয়ে এসে বলল, 'প্রাণ, মন—খুব সাংঘাতিক সাংঘাতিক কথা বলছ যে! এতদিন তোমার মুখে ওসব কথা ছিল না' ব্যাপারটা দয়া ক'রে খুলে বল তো বড় ভালো হয়।'

খুলেই বলল মাধবী, পোস্টগ্র্যাজুয়েটে অনেক সহপাঠীর মধ্যে অসিত দত্তও একজন ছিল। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল বিশেষ একজন হবে। সেই আশা নিয়েই সে মাধবীর সঙ্গে মিশত। কিন্তু মাধবী তাকে কোনদিনই আমল দেয়নি। চিরদিন ঠাট্টা তামাসাই করেছে। সেই অসিতের সঙ্গে বহুকাল বাদে দেখা হল মিঃ দাশগুপ্তর বাড়িতে। অসিতও চাকুরীপ্রার্থী। সেও তদ্বিরের জন্য এসেছে। দু-একটা কথায় মাধবী তা বুঝতে পারল। কিন্তু নিজের উদ্দেশ্যটা সে অসিতকে ধরতে দিল না। বলল, নীলিমা তার ছেলেবেলার বন্ধু। তার সঙ্গে এমনিই দেখা-সাক্ষাৎ করতে এসেছে।

অসিত উল্লসিত হয়ে বলল, 'ভালোই তো, তা হলে আমি সব চেয়ে ভালো সোর্স পেলাম। মিসেস দাশগুপ্তও নিশ্চয়ই তোমার কথা ফেলতে পারবেন না, আর মিঃ দাশগুপ্তও নিশ্চয়ই স্ত্রীর অনুরোধ রাখবেন। এর চেয়ে ভালো সোর্স আর হয় না। তুমি আমার এই উপকারটুকু কর মাধবী। একটা চাকরির বড়ই দরকার। দাদা টি বি হাসপাতালে। এক পাল ছেলেমেয়ে নিয়ে বউদি আমার ঘাড়ে পড়েছেন। কিছুতেই আর কুলিয়ে উঠতে পারছি না। মাস ছয়েক ধরে ঠায় বেকার। তুমি যদি একটু ভালো ক'রে চেষ্টা ক'রো—'

মাধবী না ব'লে পারল না, 'চেষ্টা করব।'

অসিত ব'লে চলল, 'আগে তো বেশ খানিকটা ভরসা পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন যেন আবার

কেমন কেমন মনে হচ্ছে। তুমিই যদি একটু ভেতর থেকে—'

মাধবী ঘাড় নাড়ল।

খুবই আশা-ভবসা নিয়ে বাড়ি ফিরল অসিত। মনের ভাবটা—এই মাধবী হৃদয় দিতে না পেরেছে না পারুক কিন্তু একজন দুঃস্থ প্রাক্তন সহপাঠীকে একটা চাকবি জুটিয়ে দিতে নিশ্চয়ই পারবে।

'কিন্তু তাও কি পারলাম?'

মাধবী চুপ ক'রে রইল।

একটু বাদে নীলাম্বর বলল, 'তা হলে মাকে কি বলব?'

মাধবী মৃদুস্বরে বলল, 'যাক্ না আরো ক'টা দিন।'

নীলাম্বর বলল, 'তোমাকে বললাম না, এ মাসে বিয়ে না কবলে আরো দু তিন মাস অপেক্ষা কবতে হবে।'

মাধবী বলল, 'ততদিনে অসিতেব একটা চাকবিবাকরি ঠিক হয়ে যাবে, কি বল?'

'তা হয়তো হবে।' কিন্তু নীলাম্বরেব এই প্রথম মনে হ'ল চাকরিটা তাব না হওযাই ভালো ছিল।

চৈত্র ১৩৫৭

এ্যাজমা

পণ্ডিতিয়া প্লেসে সত্যেন বায়ের বাসায় সেদিনকাব সান্ধ্য মজলিসে আমাদেব অচ্যুত গোঁসাই একেবাবে ঝোড়ো কাকের চেহাবা নিয়ে এসে হাজির হল।

বললুম, 'ব্যাপার কি! তোমার আশা তো আমবা আজ প্রায় ছেড়েই দিযেছিলাম।'

অচ্যুত তক্তপোশের একটা কোণ ঘেঁষে বসতে বসতে বলল, 'আমি নিজেও আর বড় একটা আশা রাখতে পারছি নে।'

সত্যেন বলল, 'কেন, হয়েছে কি বল তো?'

বোহিণী আচার্য ইজিচেয়ারে ঠেস দিয়ে আয়েস ক'রে সিগারেট টানছিল, অচ্যুতেব দিকে তাকিয়ে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'হবে আবার কি! বউ বোধ হয় আটকে রেখেছিল। আসতে দিচ্ছিল না। অচ্যুতের যত বয়স বাড়ছে তত ও চরিত্রচ্যুত হচ্ছে। ওব মতো স্ত্রৈণ আমাদের মধ্যে কেউ নেই।'

আমি অচ্যুতের পক্ষ নিয়ে বললুম, 'তোমার আর সত্যেনের স্ত্রৈণ হওয়ার সুযোগ নেই ব'লেই স্ত্রী-ওয়ালা বন্ধুদের ওপর তোমাদের এত রাগ। অচ্যুত, তোমার শরীর ফের খারাপ হযেছে নাকি?'

অচ্যুত হতাশার ভঙ্গি করল: 'আর ব'লো না, এ্যাজমাটা ফের বড় কষ্ট দিচ্ছে।'

অরুণ মুখুজ্জে বলল, 'অচ্যুতের চেহারা দেখে অবশ্য তাই মনে হয়। স্ত্রীর চেয়েও এ্যাজমা ওর বেশি অনুরাগিণী। কিন্তু তুমি এমন হাত-পা ছেড়ে বসে আছ কেন বল তো? ভাল ক'রে চিকিৎসা-টিকিৎসা করাও। আচ্ছা, কোন ইঞ্জেকশন-টিঞ্জেকশন বেবোয়নি এর?'

রোগের চিকিৎসায় মনোযোগী না হওয়ার জন্য আমরা সবাই অচ্যুতকে অনুযোগ দেওয়া শুরু করলাম। অচ্যুত বলল, সাধ্যমতো চিকিৎসা সে সব রকমই ক'রে দেখেছে। কিন্তু বহুদিনের পুবনো রোগ। যাই যাই ক'রেও যাচ্ছে না।

এ্যাস-ট্রেটা সামনে থাকতেও রোহিণী সিগারেটের টুকরোটা আমাদের সবাইয়ের মাথার ওপর

দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে বলল, 'ভেবো না অচ্যুত, ওসব রোগ না যাওয়াই ভালো। জন্তু-জানোয়ারের মতো মারাত্মক রোগও এক সময় না এক সময় পোষ মানে। আর তাতে সব পুষিয়ে যায়। পোষা রোগ অনেক সময় অনেক কাজে আসে। ওকে তাড়াতে নেই।'

সত্যেন বলল, 'রোহিণী, তোমার ব্যাঙ্ক যাওয়ার পর এখন তো প্রায় আধা বেকার হয়ে আছ। এবার ডাক্তারি শুরু ক'রে দাও, বেশ পসার হবে।'

বললাম, 'তা ঠিক। বেশির ভাগ ডাক্তারই ওষুধ দিয়ে রোগ পোষে। যে ডাক্তার বিনা ওষুধে রোগ পুষবার পরামর্শ দেয়, ওষুধের দামটা সে ভিজিটের টাকার মধ্যে নিয়ে নিতে পারে।'

রোহিণী বিরক্তির ভঙ্গি ক'রে বলল, 'কেন মিছিমিছি বকবক করছ? আমি যা বলি তা নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলি। পৃথিবীতে পরের স্ত্রী আর নিজের অভিজ্ঞতার মতো দামী জিনিস আর নেই। পোষা রোগ যে কত কাজে লাগে তা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করেছি।'

এবার আমরা সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। রোহিণীর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার গল্প আমরা কেউ বিশ্বাস করি নে, কিন্তু উপভোগ করি।

বললুম, 'ও, তুমি গল্প বলবে? তা এত ভূমিকা করছিলে কেন? চটপট শুরু ক'রে দাও।'

রোহিণী বলল, 'আমি কি তোমার মতো? গল্প চট ক'রে শুরু ক'রে পট ক'রে শেষ ক'রে দিলাম? ধীরে সুস্থে রয়ে সয়ে যদি না বলতে পারলাম, বললাম কি। ঘোড়ায় চড়ে গুলি ছোঁড়া যায়, গল্প ছোঁড়া যায় না।'

রোহিণী অরুণের প্যাকেট থেকে আর একটা সিগারেট বের ক'রে নিয়ে শুরু করল, 'সে অনেক কাল আগের কথা। এগারো-বারো বছর হয়ে গেল। আমি তখন এম এ পড়ি আর একটি মেয়েকে মাঝে মাঝে পড়াই।

সত্যেন বাধা দিয়ে বলল 'রোহিণী, শেষ পর্যন্ত তুমি কি পুরনো ধাঁচের একটা প্রেমের গল্পই শুরু করলে? সেই ছাত্রী আর টিউটরের চিরন্তন প্রেম?' অধীর হয়ে রোহিণী চেয়ারের হাতলে একটা চাপড় মেরে বলল 'আলবৎ প্রেম আলবৎ প্রেমের গল্প। দেখ, পৃথিবীতে শুধু দুই জাতের খাঁটি গল্প আছে। ভূতের আর প্রেমের। বলতে পার ভূতের আর অদ্ভুতের। এক নম্বরেরটা কমবয়সী আর দু নম্বরেরটা বেশি বয়সীদের জন্য। যদি প্রেম না চাও, বল, ভূত নামাই।' '

আমরা তাড়াতাড়ি রোহিণীকে শান্ত ক'রে বললাম, 'আমাদের ভূত দরকার নেই।'

রোহিণী বলতে লাগল, 'পড়াতাম। ঠিক পেশাদারি পড়ানো নয়। যেদিন খুশি যেতাম, যেদিন খুশি যেতাম না। যেদিন খুশি পড়াতাম, যেদিন খুশি বসে গল্প করতাম। প্রেমের গল্প না, ভূতের গল্প। ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রীর কাছে আর কোন গল্প করা যায় না, সে জ্ঞান আমার ছিল। ছাত্রীর বাবা অবনীবাবু এতে খুব অখুশি হতেন না, কারণ তাঁকে মাইনে দিতে হত না। তাঁর স্ত্রী আর কন্যা শুধু বার দুই ক'রে চা যোগাতেন, তখনকার দিনে আমার তাতেই চলত। অবনী দাসের বাড়ি আমাদের বহরমপুর শহরেই। বাবার বন্ধু ব'লে ছেলেবেলা থেকে ওঁদের সঙ্গে জানাশোনা। সেই সুবাদে অবনীকাকা আমাকে খুবই ভালোবাসতেন। তাঁর এই ভালোবাসার আরও কারণ ছিল। কাস্টমস থেকে তাঁর চাকরি যাওয়ার পর ইউনিভার্সিটির অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের কাজটি চেষ্টা-চরিত্র ক'রে আমিই তাঁকে জুটিয়ে দিয়েছিলাম। দৃশ্য অদৃশ্য এই সব নানা কারণে বেণুকে—মানে, তার শিক্ষাদীক্ষার দায়িত্বকে তিনি নিশ্চিন্তে আমার উপরই ছেড়ে দিয়েছিলেন। ঠিক যে নিশ্চিন্ত ছিলেন তা না। কারণ মাঝে মাঝে তিনি অতর্কিতে পড়াবার সময় এসে হানা দিতেন। কিন্তু আপত্তিকর কিছুই পুলিসের হস্তগত হত না।

বেণুর বয়স তখন সতের আঠার। মুখচোরা শান্ত স্বভাবের মেয়ে। আমাকে খুব ভয় ভক্তি করত। চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলত না, পাছে আমি চোখ রাঙাই।

ম্যাট্রিক পাস করবার পর থেকেই অবনীবাবু ওর সম্বন্ধ খুঁজতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু পছন্দমতো ঘর বর মিলছিল না। তা ছাড়া যে ছেলের চেহারা আর চাকরি মোটামুটি চলনসই তার হাঁকডাক মোটা। অত টাকা অবনীবাবুর ছিল না। বেণুর পরেও কাচ্চাবাচ্চা অনেকগুলি ছিল। বিয়ে দিতে দেরি হওয়ায় আমার পরামর্শে অবনীবাবু বেণুকে কলেজে পড়তে দিয়েছিলেন।

ভালো একটা সম্বন্ধ হব হব ক'বে শেষ পর্যন্ত ভেঙে গেল।

আমি বললুম, 'তুমি বড অপযা। নইলে এমন সম্বন্ধ কাবও ভাঙে?'

বেণু মুখ নীচু ক'বে বলল, 'এমন ক'বে সব সম্বন্ধই ভেঙে যাক। আমি তাই চাই।'

'কেন?'

বেণু একটু চুপ ক'বে থেকে বলল, 'তা হলে পডাটা বন্ধ হয না।'

আব একদিন কথায কথায কাকীমা বললেন, 'বেণু বোহিণীকে যত ভক্তিশ্রদ্ধা কবে, তেমন আব কাউকে কবে না। বোহিণী যদি কাযেতেব ছেলে হত--

বেণু সেই ঘবেই ছিল। কাকীমাব কথা শেষ না হতেই উঠে চলে গেল।

অবনীবাবু স্ত্রীকে ধমক দিলেন, 'তোমাব কোন কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে! বোহিণী আমাব ঘবেব ছেলেব মতো। যত সব বাজে কথা বলে—'

কাকীমা তাডাতাডি সামলে নিযে বললেন, 'বললুম বলে নাকি! তুমিও যেমন!'

আমি এম এ পাস ক'বে বেরুলুম। বেণুবও বিযে হযে গেল। ছেলে মোটামুটি ভালোই। বি এ পাস। কৃষ্ণনগবে এক স্কুলে কাজ কবে। শহবে নিজেদেব বাডি আছে। জমিজমাও আছে কিছু। এত ভালো ছেলে পাওযা সত্ত্বেও পণ যৌতুক অবনীকাকাব অনেক কম লাগল। শীতাংশু বোস নিজে পছন্দ ক'বে জানিযে গেছে তাব কোন দাবি-দাওযা নেই।

অবনীকাকাব আত্মীযস্বজনেবা সবাই সায দিযে বললেন 'এব চেযে ভালো সম্বন্ধ আব হ'তে পাবে না।

কিন্তু বেণুব মুখ ভাব হযেই বইল। আমি বললুম ব্যাপাব কি! মুখটা অমন হাঁডি ক'বে বযেছ যে? লোককে দেখাবাব জন্যে বুঝি?

বেণু বলল, 'হুঁ, দেখাবাব জন্যেই তো।

বিযেব বাত্রে বেণু আবও এক কাণ্ড দেখাল। ববযাত্রীবা এসে পডেছেন। অবনীকাকাব আত্মীযকুটুম্বেব সঙ্গে আমিও তাঁদেব অভ্যর্থনায ব্যস্ত। বেণুব ছোট ভাই নানু এসে আমাকে খবব দিল, 'মা ডাকছে আপনাকে।'

ভিতবে গিযে বললুম, 'ব্যাপাব কি কাকীমা, ডেকেছেন যে!'

কাকীমা আমাকে আবও আডালে ডেকে নিযে বললেন, 'আমাব কিছু ভালো লাগে না বাপু। ইচ্ছে কবছে সব ছেডে-ছুডে দিযে এ বাডি থেকে চলে যাই।'

বললুম 'কেন, হযেছে কি?'

কাকীমা বললেন, কি জানি, কি হযেছে তোমবাই জানো। মেযে সেই সকাল থেকে কাঁদছে তো কেবল কাঁদছেই। বাডি-ভবা লোকজন। সবাই কি ভাববে বল তো? সকলেব মন তো সমান নয!'

বললুম, 'তা তো নযই, কিন্তু কাঁদছে কেন?'

কাকীমা বললেন, 'কেন, তা মন খুলে বললে তো হতই। কিন্তু এমন একগুঁযে মেযে, ওব মুখ থেকে কথা বেব কবে আমাব বাপেবও সাধ্য নেই। ভবসা ক'বে ওব বাপকেও খবব দিতে পাবছি না। তিনি শুনলে চেঁচিযে-মেচিযে সমস্ত বাডি মাথায ক'বে তুলবেন। কাবও কাছে মুখ দেখাবাব জো থাকবে না। অথচ মেযে সেই জেদ ক'বে বসে আছে তো আছেই। না পবছে শাডি গযনা, না শুনছে কাবও কোনও কথা। এদিকে বিযেব লগ্ন এল বলে। আব কোনও উপায না দেখে তোমাকে ডেকে পাঠিযেছি। তুমি ওকে একটু ধমকে-টমকে দিযে এস। তোমাকে যেমন ও ভয কবে, আব কাউকে তেমন কবে না।'

অস্বীকাব কবব না, এ কথা শুনে আমাবও একটু একটু ভয কবতে লাগল। তবু ধমক দেওযাব জন্যে মনে মনে গলাটা শানিযে নিযে এগিযে গেলাম। কাকীমাব কথায ওঁদেব আত্মীযকুটুম্বেব মেযেবা বেণুব কাছ থেকে সবে গেলেন।

ওকে একা পেযে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হযেছে বেণু?' আমাব মুখেব দিকে তাকিযে বেণু ফেব চোখ নামিযে নিযে শান্তভাবে বলল, 'কিছু হযনি।'

বললাম, 'তুমি নাকি কথা শুনছ না?'

বেণু বলল, 'ও, সেইজন্যেই তুমি বুঝি কথা শোনাতে এসেছ ! বল, কি শুনতে হবে ?'

একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, 'আমার কোন কথা শুনতে হবে না। ওঁরা যা বলছেন তাই শুনলেই হবে।'

বেণু বলল, 'ওঁদের কথা শুনতে হবে কি না-হবে তা আমি জানি। তোমার যদি কিছু বলবার থাকে বল।'

এমন নির্ভয়ে স্পষ্ট ভাষায় বেণু কোনদিন আমার সঙ্গে কথা বলেনি। ওর এই দৃঢ়তায় বিস্মিত হলাম। কিন্তু যতখানি বিরক্ত হব ভেবেছিলাম তা যেন হতে পারলাম না। বললাম, 'না, আমার আর কিছু বলবার নেই। পাগলামি না ক'রে ওরা যা বলছেন তাই কর, শাড়ি-টাড়ি পরে তৈরি হও।'

'যদি তৈরি না হই, ধর, যদি পাগলামিই করি ? তুমি ঠেকাতে পার ? তুমি কি করতে পার শুনি ?'

অবুঝ ছোট মেয়েকে শান্ত করবার ভঙ্গিতে বললাম, 'ছিঃ, অমন করে নাকি।'

ব'লে আলগোছে আমি ওর পিঠে হাত রাখতে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে বেণু স'রে দাঁড়াল, 'ছুঁয়ো না, তুমি আমাকে ছুঁয়ো না, যাও, চলে যাও এখান থেকে।'

দোরের বাইরে থেকে কাকীমা বললেন, 'রোহিণী, তুমি চলে এস।'

আমি ভেজানো দোরের এক পাট খুলে বেরিয়ে এলাম।

কাকীমা মৃদুস্বরে বললেন, 'ছিঃ, তোমার কাছ থেকে এসব আশা করিনি রোহিণী।'

রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল, বললাম, 'কি আশা করেননি ?'

কাকীমা তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললেন, 'কিছু না তুমি ওদিককার কাজকর্ম দেখ গিয়ে '

কাজকর্ম দেখবার মতো মনের অবস্থা সেদিন আর আমার ছিল না। কিন্তু পাছে আর কেউ কিছু মনে করে সেইজন্যে শেষ পর্যন্ত রয়ে গেলাম বরের সঙ্গে আলাপ করলাম, বরযাত্রীদের আপ্যায়ন করলাম। বেণুর এক মাসতুতো ভাইয়ের সঙ্গে আমি ওর বিয়ের পিঁড়ি পর্যন্ত ধরলাম।

পরদিন বেণু স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি চলে গেল।

মনে মনে ভাবলাম, আপদ গেল।

কিন্তু সপ্তাহ খানেক যেতে না যেতে দেখি আমার মেসের ঠিকানায় নীলরঙা এক এনভেলাপ এসে হাজির। সে চিঠি যে বেণুর লেখা তা আমার বুঝতে বাকি রইল না। আমি ভারি বিব্রত বোধ করলাম অবশ্য আর কিছুই যে বোধ করলাম না তা বললে তোমরাও বিশ্বাস করবে না, আমারও মিথ্যা কথা বলা হবে। চিঠিতে বেণু লিখেছে, তার সেদিনকার ব্যবহারে আমি কি রাগ করেছি ? রাগ যদি না ক'রে থাকব, কেন যাওয়ার সময় তার সঙ্গে দেখা করলাম না একটা কথা পর্যন্ত বললাম না ? যদি রাগ ক'রে থাকি সে রাগ যেন ভুলে যাই, যদি দুঃখ পেয়ে থাকি সে দুঃখ যেন মোটেই মনে না রাখি মন থেকে সব যেন ধুয়ে মুছে ফেলে দিই—সব।

তারপর বেণু লিখেছে কৃষ্ণনগর জায়গাটা তার মোটেই ভালো লাগছে না। এক এক সময় মনে হচ্ছে, সে যেন দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে। মরে যাওয়াই তার উচিত, না জেনে না শুনে ভালো ক'রে খোঁজখবর না নিয়ে সবাই মিলে যখন তাকে এক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের হাতে তুলে দিয়েছেন তখন আর তার বেঁচে লাভ কি ?

ব্যাধি ! আমি চমকে উঠলাম কি এমন ব্যাধি হতে পারে শীতাংশুর ! কালো বেঁটে একটু রোগা রোগা চেহারা অবশ্য লোকটির। কিন্তু রুগ্ন ব'লে তো মনে হল না। অবশ্য এমন অনেক রোগ আছে যা বাইরে থেকে ধরা যায় না, ভিতর থেকে বোঝা যায়। শীতাংশুর রোগ সম্বন্ধে আমি কৌতূহলী না হয়ে পারলাম না। কিন্তু বেণুকে চিঠি লিখে সে কৌতূহল মেটানো সঙ্গত মনে হল না। আর জটিলতা বাড়িয়ে কাজ নেই। কিন্তু মন তো কেবল সব সময়ে লাভই চায় না, লোকসানের দিকেও তার লোভ থাকে। কিংবা লোকসানের মধ্যেও সে এক ধরনের লাভের স্বাদ পায়। আমারও নানারকম লোকসান হতে লাগল। লিখব না লিখব না ক'রেও বেণুকে চিঠি লিখলাম। পয়সা খরচ ক'রে স্ট্যাম্প কিনে খামের মুখ বন্ধ করলাম। তারপর ডাকে দিতে গিয়ে মনে হল, এ চিঠি ডাকে দেওয়া যায় না। স্ট্যাম্প সুদ্ধ চিঠিটা ছিঁড়ে ফেললাম। তারপর ডাকে দেওয়ার যোগ্য চিঠির

মুসাবিদা মনেব মধ্যে দিন কযেক ধবে চলতে লাগল। কিন্তু ঘুবে ফিরে যে কথাগুলো মনে এল তাব সবই সেই ছেঁড়া চিঠির মধ্যে আছে। নিজেব মনকে আচ্ছা ক'বে ধমক দিলাম। নিতান্তই একটি সাধাবণ মেযে, লজিক যাব মাথায মোটেই ঢোকে না, শুদ্ধ ক'বে একটা ইংবিজী সেন্টেন্স লিখতে যাব আধ ঘন্টা লাগে, বাংলা লিখতে যাব অগুনতি বানান ভুল হয, তাকে নিয়ে কেন এ কাঙালপনা? কী আছে ওব, কী এমন দেখেছি ওব মধ্যে! কিন্তু এ ধমক যেন লোক দেখানো ধমক, তা কোন কাজে লাগল না। বাব বাব মনে পড়তে লাগল বেণুব এক বাত্রিব ব্যবহাব তাব সমস্ত ছাত্রিত্বকে ছাড়িযে গেছে। ওব সেই 'ছুঁযো না, ছুঁযো না' আমাকে যেন চিবদিনেব জন্য স্পর্শলোভাতুব ক'বে বেখে গেছে।

বাপেব বাড়ি এসে বেণু আব একটা চিঠি লিখল। সে চিঠি সংক্ষিপ্ত। আমাব সঙ্গে তাব কথা আছে। অবশ্যই যেন দেখা কবি।

যাব না যাব না ক'বেও শেষ পর্যন্ত একদিন সন্ধ্যাব দিকে গিযে হাজিব হলাম। অবনীকাকা বাড়ি ছিলেন না। কাকীমা আমাকে দেখে মুখ গম্ভীব কবলেন। বললেন, 'এস।'

তাঁব শুকনো মুখ আব শুকনো গলা আমি লক্ষ্য না ক'বে পাবলাম না। মনে মনে ভাবি ক্ষুণ্ণ হলাম। বাগও হল। এমন কী অপবাধ কবেছি যে কাকীমা আমাব সঙ্গে সাধাবণ ভদ্র ব্যবহাবটুকু পর্যন্ত কবলেন না! এতদিনেব এত হৃদ্যতা, অন্তবঙ্গতা সবই কি সেই সঙ্গে শেষ হযে গেল! যতটুকুই হোক, সমযে অসমযে কিছু উপকাব তো ওঁবা পেযেছেন। এমন অকৃতজ্ঞ ওবা যে সে-কথা একেবাবেই ভুলে গেলেন! আমাব এখানে না আসাই উচিত ছিল।

কিন্তু একটু বাদেই গা ধুযে চুল বেঁধে ঘি-বঙেব শাড়ি পবে বেণু যখন আমাব সামনে এসে দাঁড়াল, তখন আব কোন আফসোস বইল না। মনে হল, এই কযেক দিনেব মধ্যে ওব যেন রূপান্তব ঘটে গেছে। হাতে গলায সামান্য কযেকখানা গযনায, আব সিঁথিব সিঁদুবে একটি মেযেব চেহাবা যে এমন বদলে যেতে পাবে, তা যেন বিশ্বাস কবা যায না।

বেণু আমাব চোখ থেকে চোখ সবিযে নিযে বলল 'কেমন আছ?'

আমি এ প্রশ্নেব জবাব না দিযে বললাম, 'তুমি কেমন আছ বল?'

আমাব মতো বেণুও জবাব দিল না।

একটু বাদে আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস কবলাম, 'শীতাংশুবাবু কেমন আছেন? অসুখেব কথা লিখেছিলে—কি অসুখ তাঁব?'

কাকীমা যেন চমকে উঠলেন, আমাব দিকে তাকিযে বললেন, তোমাকে চিঠি লিখেছিল নাকি ও? কি লিখেছিল?'

মেযেকেও জিজ্ঞেস কবলেন কাকীমা, 'কি লিখেছিলি?'

আমি একটু অপ্রতিভভাবে বললাম, 'শীতাংশুবাবুব অসুখেব কথাই লিখেছিল।

কাকীমা নীবস স্ববে বললেন, 'তা অসুখেব কথা বোহিণীকে লিখে কি হবে? ও কি ডাক্তাব? আব এ্যাজমাব দোষ অনেকেবই থাকে। তা নিযে অমন লেখালেখিব কি আছে? আমি যে কবচটা আনিযেছি শীতাংশুকে সেটা পবতে দিস। যাবাই পবেছে একেবাবে অব্যর্থ ফল পেযেছে।'

আমি বললাম 'শীতাংশুবাবু বুঝি এ্যাজমায ভুগছেন? তা নিযে অত ভাববাব কি আছে? আজকাল অনেক ভালো ভালো সব ওষুধ বেবিযেছে—'

বেণু বলল, 'কোনও ওষুধেই কিছু হযনি, হবেও না, অনেক দিনেব পুবনো বোগ, বিযেব সময গোপন কবে গিযেছিল। কিন্তু বোগ কি আব কেউ চেপে বাখতে পাবে?'

কাকীমা বললেন 'তোব যত সব আদিখ্যেতা। এমন কি খাবাপ বোগ যে লুকিযে বাখতে যাবে?'

বেণু বলল, 'খাবাপ কি ভালো তুমি তাব কি বুঝবে?'

তাবপব আমাব দিকে তাকিযে বলল, 'পাশে শুযে একজন লোক যখন নিশ্বাসেব জন্যে অমন বিশ্রীভাবে হাঁপায, তখন কি যে খাবাপ লাগে তা তোমবা ভাবতেও পাব না। নিজেবই হাঁপ ধবে যায, মনে হয নিজেও দম বন্ধ হযে মবে যাব। এমন ক'বে আমি আব পাবব না, কিছুতেই পাবব না,

তা ব'লে বাখলুম।'

বলতে বলতে বেণু ঘর থেকে বেবিয়ে গেল।

কাকীমা আমাব দিকে একটুকাল স্থিবদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'বাবা বোহিণী, তোমাকে একটি কথা বলি।'

'বলুন।'

তুমি ছেলেবেলা থেকে বেণুকে দেখে আসছ, ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছ ওব যাতে ভালো হয় তাই ক'বে এসেছ '

আমি চুপ ক'বে বইলাম। এ সব যে কোন কথাব ভূমিকা তা আমাব বুঝতে বাকি বইল না।

কাকীমা বললেন, 'এখনও যাতে ওব ভালো হয়, তাই কব। হিন্দুব মেয়ে, বিয়ে হয়ে গেছে। আব তো কিছু কববাব নেই। স্বামী যেমনই হোক, তাকে ভালোও বাসতে হবে, তাকে নিয়ে ওব ঘব-সংসাবও কবতে হবে। মাঝখান থেকে মিছিমিছি কেন অশান্তিব সৃষ্টি।'

মনে মনে বেশ একটু অপমানিত বোধ কবলাম, বললাম, 'এ সব কথা আমাকে কেন বলছেন? আমি কি কোন অশান্তি ঘটিয়েছি ব'লে আপনাব ধাবণা?'

কাকীমা একটু থমকে গেলেন, 'না, তা ঠিক নয়, তাই বলছিলাম তুমি ঠিক তা কবতে পাব না, তুমি তেমন ছেলে নও। তবু মায়েব মন। কত ভাবনা-চিন্তাই তো আসে। সে তোমাদেব বোঝবাব কথা নয়। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। তোমাকে বেশি কিছু বলা দবকাব কবে না আমি বলি কি, দিন কয়েক তুমি ওব সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ চিঠিপত্র লেখালেখি একেবাবে বন্ধ ক'বে দাও। দেখবে দু দিন বাদেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আমাব ভাবি অসহ্য লাগছিল আব কোন কথা না ব'লে উঠে দাঁড়ালাম। কাকীমা সদব-দবজা পর্যন্ত পিছনে পিছনে এলেন 'বাগ কবলে না তো বাবা? আমি সকলেব ভালোব জন্যই বলছি।'

বললাম 'আমি তা জানি কাকীমা।'

কিন্তু কাকীমাব গায়ে-পড়া হিতোপদেশ আব শুভেচ্ছাটা আমাব মোটেই ভালো লাগল না। মনেব মধ্যে ববং কেমন এক ধবনেব জ্বালাই কবতে লাগল। কেন চুপচাপ সব মেনে নিলাম? ওঁব মুখেব উপব কড়া কড়া কথা কেন শুনিয়ে দিয়ে এলাম না? নিজেব বোকামিব জন্যে নিজেব ওপবই বাগ হতে লাগল। একবাব মনে হল, উল্টো দিক থেকে ববং এব শোধ নিই। বেণুব সঙ্গে খুব চিঠিপত্র লিখি, মেলামেশা কবি, আমি ওব গভীব প্রেমে পড়ে গেছি এমন ভাব দেখাই। বেণুব জন্যে যে শান্তি কাকীমা চেয়েছিলেন তা নষ্ট কবি, কাকীমাকেও স্থিব থাকতে না দিই। ওঁব হিতোপদেশেব দাম যে আমাব কাছে কানাকড়িও নেই তা বুঝতে দিই ওকে।

কিন্তু এ সব কবতে গিয়ে কবতে পাবলাম না। নিজেব কাছ থেকেই কিসেব একটা বাধা পেলাম। কোন নৈতিক বাধা নয়। বেণুব প্রেমপত্রেব জবাবে কিছুতেই আমি তাকে প্রণয়েব পাঠ লিখতে পাবলাম না। যাই লিখি তাতে নিজেব গালেই যেন চড় মাবতে ইচ্ছা কবে। বড় ন্যাকামি ন্যাকামি মনে হয়। আমি চাই যে এমন কিছু লিখি যাতে আমাব সম্বন্ধে ওব সেই পুবনো শ্রদ্ধা আব সমীহব ভাবটাও বজায় থাকে আবাব আমি যে ওকে ভালোবাসি সে কথাও জানানো যায় কিন্তু কিছুতেই আমি তেমন চিঠি লিখতে পাবলাম না। আব তা যত না পাবলাম তত বেশি ক'বে খাবাপ লাগতে লাগল। ভিতবে ভিতবে আমি তত ওব ওপব আকৃষ্ট হচ্ছি—এ কথাও বুঝতে বাকি বইল না। অথচ তা স্বীকাব কবতেও যে লজ্জা না পেলাম তা নয়। শেষপর্যন্ত ওকে জানালাম যে, ওব ওসব চিঠিপত্রেব জবাব দেওয়া আমাব পক্ষে সম্ভব নয়। সে চিঠিতে আমাব দুর্বলতা ধবা পড়বাব মতো বোধ হয় আবও কিছু ছিল। বেণু পাল্টা জবাবে লিখল, 'যাক, চিঠি আব তোমাকে লিখতে হবে না। তুমি একবাব এখানে এস, দেখে যাও কেমন আছি।'

কিন্তু যেতে লিখলেই কি আব যাওয়া যায়। নিজেব মনেব বাধাবিঘ্নেব অন্ত নেই। শেষ নেই এগুনো-পিছোনোব। ওব চিঠি পেয়ে ববং এক ধবনেব অনুতাপ হতে লাগল, ওব কাছে এমন ক'বে ধবা দিতে গেলাম কেন। কেন ওব সাহস বাড়িয়ে দিলাম? ফলে ওব সেই চিঠিব আব জবাব দিলাম না।

ঠিক এই সময়ে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারিগিরি জুটে গেল। আর কামিনী থেকে কাঞ্চন-সংসর্গে এসে আমি বেঁচে গেলাম। আমি যে আসলে দুর্বল নই, আমি যে কাজের লোক নিজের আর অন্যের কাছে তার প্রমাণ দিতে পেরে আমি খুশি হয়ে উঠলাম। তারপর পুরো দু বছর আমি কাজের মধ্যে একেবারে ডুবে রইলাম। এ কথা মনে করতে ভাল লাগল যে, রেণুকে আমার আর মনে নেই।

আমাদের কৃষ্ণনগর ব্রাঞ্চের ম্যানেজার হিসাবপত্রে কিছু গোলমাল ঘটিয়ে বসেছেন। গোলমালের জন্য কতখানি বা তিনি দায়ী কতখানি বা এ্যাকাউন্ট্যান্ট, ব্যাপারটা গড়িয়েছেই বা কতখানি তা তদন্তের ভার আমাব ওপর পড়ল। দু' বছর আগে হলে আমি হয়তো কৃষ্ণনগব যেতে সাহস পেতাম না। কিন্তু এখন আমার মনে কোন ভয় নেই। আর ভয় যে নেই তার প্রমাণ দেওয়ার জন্যেই আমি রেণুর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ঠিক ওকে দেখতে নয়, নিজেকে দেখাতে। আমি ওর সেই শ্রদ্ধা আর সমীহর পাত্রই আসলে রয়ে গেছি তাব প্রমাণ দিতে।

ব্যাঙ্কেব ব্যাপাবটা ভালোয় ভালোয় মিটে গেছে। আমার মন খুব প্রসন্ন। যে ম্যানেজারকে আমি ইচ্ছা কবলে জেলে দিতে পারতাম, বিনা স্বার্থে তাব মান-প্রাণ রক্ষা করেছি, তাকে সৎ হওয়ার আর একটা সুযোগ দিতে পেরেছি—এ কথা ভেবে আমি আত্মপ্রসাদ বোধ করলাম। কৃতজ্ঞতায় ম্যানেজারের বাপ মা স্ত্রী পুত্র প্রায় আমাব পায়ের তলায় লুটিয়ে পডল। তাদের সবাইকে আমি বাঁচিয়েছি। অথচ ব্যাঙ্কেব মর্যাদা নষ্ট করিনি।

মাঘেব শেষ। শীতটা যাই যাই কবছে অথচ একেবারে যায়নি। বছবের এই সময়টায় আমার শবীর সব চেয়ে ভালো থাকে। কাজকর্মেও খুব উৎসাহ পাই।

শীতাংশু বোসকে আমাদের ম্যানেজার প্রথমে চিনতেই পাবলেন না। তাব পেশা আব চেহারার খানিকটা বর্ণনা দেওয়ায় তিনি বললেন, 'ও, আমাদের ফটিক মাস্টারেব কথা বলছেন?'

আমার মতো প্রবল প্রতাপান্বিত পুরুষেব ফটিক মাস্টারেব সঙ্গে কী সম্পর্ক থাকতে পারে তা ভেবে তিনি যেটুকু বিস্মিত হলেন তা গোপন কববার জন্যেই আমাকে সঙ্গে ক'বে নিয়ে চললেন।

শহবের দক্ষিণপ্রান্তে পাটকেল রঙের পুবনো একতলা ছোট বাড়ি। আশপাশটা বড জংলা মনে হল। গাছগাছালি যা আছে তাব মধ্যে আগাছাই বেশি।

শীতাংশুর নাম ধরে ডাকতে ভিতর থেকে একটি মেয়ে মুখ বার কবল · 'তিনি তো নেই।'

মনে হল অনেক দিন পরে এমন মিষ্টি গলা শুনলাম। অনেক কাল পবে ফের একখানা সুন্দব মুখ দেখলাম। আমাব সমস্ত পৃথিবী অস্তিত্বে ভরে উঠল।

তিনি তো তিনি, রেণু যদি বলত—গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই নেই, তাতেও আমার কিছু এসে-যেত না। কাবণ ও যখন আছে তখন সব আছে।

ম্যানেজাব একটু পবেই বিদায় নিলেন।

বেণু আমাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বলল, 'অমন ক'রে তাকিয়ে কী দেখছ, চিনতে পাবছ না?'

এমন অন্তবঙ্গতা রেণুর সঙ্গে আমার ছিল না যে, এভাবে সে কথা বলতে পারে। কিন্তু এ কথা তো আজ শুধু হঠাৎ ও বলেনি, দু' বছর ধরে এ কথাব ও মহড়া দিয়ে আসছে। কল্পনায় আমাকে সামনে দাঁড় করিয়ে এমন আরও অনেক কথা রেণু অনেকবার বলেছে। তাই আজ ওর মুখে কিছু বাধল না। আব ওব এই অসঙ্কোচ বাক্‌স্ফূর্তিতে আমিও খুশি হলাম। ও আর ছোট নেই, ও আমার সমান হয়ে উঠেছে তা দেখে আমার ভালো লাগল।

বেণুর কথাব জবাবে বললাম, 'চেনা তো একটু শক্তই।'

'কেন, এতটা কি মোটা হয়েছি?'

ঠিক মোটা বলা চলে না, একটু পুষ্ট হয়েছে রেণু, লম্বায়ও যেন একটু বেড়েছে। এত দিনে কিছুতেই যেন ওর কৈশোর ঘুচছিল না, কিন্তু এবার ও পূর্ণতা পেয়েছে। পূর্ণ নারীত্ব।

বললাম, 'তোমার স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে।'

রেণু বলল, 'তা হবে। পুরুষের মতো আমাদের মনের ভাবনা-চিন্তাটা দেহেব ওপর দিয়ে দেখা যায় না। মনটা যতই শুকিয়ে যাক, শবীরটা ফুলতেই থাকে।'

বললাম, 'মনটাই বা শুকিয়ে যাবে কেন?'

বেণু আমাব দিকে স্থিবদৃষ্টিতে তাকাল 'সব কেনব জবাব কি সবাইকে দেওযা যায ? দিয়ে কি কোন লাভ আছে ?'

বলতে বলতে আমাকে ঘবেব ভিতবে নিয়ে গেল। বাইবেব দিকেবই একখানা ঘব। কিন্তু বেশ পাবিচ্ছন্ন পবিপাটি ক'বে গুছানো। গৃহস্থালীব ওপব বিন্দুমাত্র যে বেণুব অমনোযোগ আছে তা মনে হয না। ওকে জিজ্ঞেস কবলে হযতো বলবে যে, মেযেবা পুরুষেব মতো নয। যখন মন তাদেব বেশি অগোছালো থাকে তখনই ঘব তাবা বেশি ক'বে গুছোয।

বেণু বলল, 'ব'স, দাঁড়িযেই থাকবে না কি ?'

বললাম, 'না। এবাব দৌড়াতে শুরু কবব। আব ঘন্টা খানেক বাদেই আমাব ট্রেন।'

বেণু একটু হাসল 'তাই নাকি, তা হ'লে চল। তোমাকে স্টেশনেই পৌঁছে দিযে আসি। তোমাব সাহেবী পোশাক টোশাক এবাব ছাড। হাত মুখ ধুযে নাও। চল, তোমাকে ইঁদাবাটা দেখিযে দিচ্ছি। চমৎকাব জল শীতে গবম, গ্রীষ্মে ঠাণ্ডা। বললাম 'এমন ইঁদাবা যে আব হয না তা জানি। কিন্তু ইঁদাবাব মালিক গেলেন কোথায, তাঁকে দেখছি নে।'

বেণু আমাব দিকে একটু তাকিযে থেকে বলল 'ইঁদাবাব মালিক ? ব্যস্ত হচ্ছ কেন, তিনি এখনই এসে পডবেন। নাকি তাঁব অনুমতি ছাডা তাঁব ইঁদাবাব জল ছোঁবে না ?' বললাম, 'তা কেন। তোমাব অনুমতিই যথেষ্ট। কিন্তু শীতাংশুবাবু কেমন আছেন আজকাল, তাঁব সেই এ্যাজমাব দোষটা গেছে তো ?'

বেণু বলল, ও কি যাবাব ?'

বললাম 'এ্যাজমাব টান দেখতে দেখতে আজকালও কি তোমাব দম বন্ধ হয, না সযে গেছে ?'

বেণু এ কথাব কোন জবাব না দিযে বলল এস আমাব সঙ্গে।

হাত মুখ ধুযে ঘবে ফিবতে না ফিবতেই শীতাংশু এসে হাজিব হল। গাযে নস্যি-বঙেব সস্তা একটা র‍্যাপাব। তাতে আপাদমস্তক না হলেও পদ আব মস্তক ছাডা সবটুকুই লোকটিব ঢাকা পডেছে। কালো বোগাটে অত্যন্ত আনইমপ্রেসিভ চেহাবা। চোখ মুখেব ধবন দেখলে হঠাৎ ব্লান্ট বলেই মনে হয ঘষা কাঁচেব মতো তাব ভিতব দিযে কিছুই দেখা যায না আব তাব ফলে মন অদ্ভুত এক অস্বস্তিতে ভ'বে যায

শীতাংশু আমাব দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকাল

বেণু বলল অমন ক'বে তাকাচ্ছ কেন ? আমাব মাস্টাবমশাই ছিলেন। ওকে তুমি আমাদেব বিযেব সময দেখেছ।'

হাত জোড ক'বে নমস্কাব জানিযে পবম অপ্রতিভ ভঙ্গিতে শীতাংশু বলল, 'ও আমি ঠিক চিনতে পাবিনি।

বললাম তাতে আপনাব স্মবণশক্তিব খুব দোষ দিতে পাবি নে। বিযেব বাত্রে শ্বশুব-বাডিতে যত লোক আসে যায তাব সবাইকেই যদি মনে বাখা যেত তা হলে এক গাডি প্যাসেঞ্জাবেব মুখও লোকে মনে বাখত।

বেণু বলল কিন্তু বিযেব বাত্রেব কোন মুখই কি কাবও মনে থাকে না ?'

বললাম থাকে, তাও, বোজ বাত্রে দেখতে হয বলে কি বলুন শীতাংশুবাবু ?

শীতাংশু বক্তব্য খুঁজে না পেযে একটু হাসল।

বেণু এবাব স্বামীব দিকে তাকিযে বলল, 'তোমাব এত দেবি হল যে ' স্কুল তো সেই কখন ছুটি হযে গেছে '

শীতাংশু কৈফিযতেব সুবে বলল, 'লাইব্রেবীতে কতকগুলো বই এল কিনা সেগুলি লিস্ট কবতে কবতে—

বেণু বলল, 'লাইব্রেবীটা দেখাশোনা কববাব জন্যে তো গোটা পাঁচেক টাকা বেশি দেয। তাব জন্য অত খেটে মবছ কেন ? তা ছাডা বোজ বোজ তুমি যে অমনি ঠাণ্ডা লাগাচ্ছ—'

শীতাংশু চোখেব ইশাবায আপত্তি কবায বেণু থেমে গেল।

কিন্তু আমি সে আপত্তি না মেনে বললাম, বেশি ঠাণ্ডা লাগানোটা আপনাব পক্ষে তো খাবাপই,

আপনাব সেই এ্যাজমাব দোষ তো শুনলুম সাবেনি।'

শীতাংশু প্রতিবাদ কবে উঠল, 'ওব কথা আপনি শুনবেন না। ও-বোগ আমাব সেবে যাওযাব মধ্যেই। এই তো এত বড শীতটা গেল—কই, কোন কষ্ট পাইনি তো। ববং অন্যান্য বাবেব চেযে বেশ ভালোই তো আছি। আমাব বোগেব চেযে ওব ম্যানিযাটা বড।'

ব'লে স্ত্রীব দিকে তাকাল শীতাংশু। বেণু কোন কথা বলল না।

শীতাংশু এবাব উঠে দাঁডাল।

বেণু বলল, 'কোথায চললে?'

শীতাংশু বলল, 'বাঃ, বাজাবে যেতে হবে না। এতকাল বাদে উনি এই প্রথম এলেন। কিন্তু কিছু পাওযা যায না এখানে। মাছ তবিতবকাবি ব ১ না—সত্যি, এতদিন পবে আপনি এলেন, কিন্তু —'

বললাম, 'আপনি ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?'

বেণু বলল, 'বাত ক'বে ঠাণ্ডাব মধ্যে তোমাব যাওযাবই বা কি দবকাব? টাকা আব থলি দিযে ও-বাডিব ভঞ্জুকে পাঠিযে দিই ববং—

শীতাংশু বলল, 'কি যে বল। ভঞ্জুকে দিযে এসব কাজ হয?

ব'লে শীতাংশু ভিতবেব ঘবে চলে গেল। বেণুও গেল পিছনে পিছনে। তাবপব স্বামী স্ত্রীতে মিলে অতিথি-অভ্যর্থনাব আযোজন শুরু কবল। আমি বাইবেব লোক। বাইবেব ঘবেই ব'সে বইলাম।

কোন একটা লোকেব অস্তিত্বই আমাব কাছে ছিল না। বেণুব কাছেও যে ছিল আমি তাব প্রমাণ পাইনি। কিন্তু ফেব শীতাংশু অস্তিত্ব পেযেছে। কিন্তু ওকে আমি স্বীকাব কবব না, কিছুতেই স্বীকাব কবব না। ওকে যদি স্বীকাব কবি, আমাব নিজেকে অস্বীকাব কবতে হবে, ওকে যদি না ঠকাই আমি নিজে ঠকব। আজ আমি তা পাবব না। কিছুতেই পাবব না'।

বেণু বান্নাবান্নাব জোগাডে গেল। বাজাবে ভালো মাছ পাওযা যাযনি। শীতাংশু চডা দামে মুবগীব মাংস নিযে এসেছে। তবিতবকাবি, দই, মিষ্টি কিছুই বাদ বাখেনি। খুবই ভদ্রতা কবেছে শীতাংশু। ও যখন আমাব মেসে যাবে আমিও কবব। আমিও অনেক টাকা ব্যয ক'বে খাওযাব, নিজে মেঝেয শুযে আমাব তক্তপোশ ছেডে দেব কিন্তু তাই বলে সবত্যাগী হতে পাবব না। শীতাংশুই কি পাবে শীতাংশুই কি পাবত?

দ একটা মশলা আনতে ভুল হযেছে। শীতাংশুকে আবও একবাব দোকানে ছুটতে হল। বাঁধতে বাঁধতে বেণু ফেব আব একবাব খোঁজ নিতে এল বান্না হ তে বেশ কিন্তু দেবি হবে জেগে থাকতে পাববে তো—না ঘুমিযে পডবে?

'না খেযেদেযে ঘুমিযে পডব, আমাকে কি এমনই ঘুম-কাতুবে মনে হয নাকি তোমাব?

বেণু বলল 'কি জানি সঙ্গদোষে হযে যেতেও তো পাব।'

'কেন শীতাংশুবাবু ঘুমোন বুঝি খুব?

'ঘুমোয মানে? বাত্রে বাঁধতে একটু দেবি হলে একঘুম দিযে নেয। তাবপব আমি খেযে ঘবে আসতে আসতে আব এক ঘুম। বাত্রেও এমন নিঃসাডে ঘুমোয যে বাডিতে যদি চোব ডাকাতও ঢোকে —'

আমাব চোখেব দিকে তাকিযে বেণু একটু কাল চুপ ক'বে বইল, তাবপব বলল, তা ছাডা যেদিন একটু বেশি খাটুনি হয সেদিন তো কথাই নেই।'

বললাম বোগা মানুষকে অত খাটাও কেন?

বেণু বলল, 'আমি কি আব খাটাই। সে বোগা যে নয তাই প্রাণপণে প্রমাণ কববাব জন্যেই ইচ্ছা ক'বে খাটে। বিযেব সময যেমন বোগেব কথা চেপে গিযেছিল, এখনও তেমনি চেপে বাখতে চায। আব এই গোপন ভাবটাই আমাব সবচেযে খাবাপ লাগে। এত বিশ্রী লাগে দেখতে যে বলবাব নয। পৃথিবীতে আব কোন বোগই বোধ হয এত কদর্য হয না।'

বেণুব মুখে সত্যিই একটা ঘৃণাব ছাপ পডল।

বাত সাডে দশটাব সময আমি আব শীতাংশু ওদেব শোবাব ঘবেব মেঝেয আসন পেতে খেতে

বসলাম। মাংস ছাড়াও আবও কয়েকটা ভাল তরকারি বান্না কবেছে বেণু। আমি যে-তবকাবি যে ধবনেব বান্না পছন্দ কবি তাব কিছুই দেখছি ও ভোলেনি।

খাওযা সেবে প্রায দু'জনেই একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম। আলমাবিব আয়নায পাশাপাশি আমাদেব ছাযা পড়ল। তোমবা আমাকে রূপবান বলে অনেক দিন প্রশংসা কবেছ। আব আমি তাতে লজ্জিত হয়ে ভেবেছি মেয়েদেব মতো কেবল কি আমাব রূপটাই আমাব বন্ধুদেব চোখে পড়ল ' মনে হত রূপেব সঙ্গে পৌরুষেব যোগাযোগটা যেন খুব ঘনিষ্ঠ নয। রূপটা আসলে মেয়েলি। কিন্তু আয়নায় নিজেব চেহাবা দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম। কেবল লম্বায নয, শ্রীতে, শক্তিতে সব দিক থেকেই শীতাংশুব তুলনায আমাব জিত। আমি আবও জিতব। আমি ঠকতে আসিনি, ঠকতে চাইনি, আমি ঠকতে পাবব না।

লেপ তোষক টানাটানি ক'বে বাইবেব ঘবেব তক্তপোশে বেণু সযত্নে আমাব বিছানা পেতে দিল। শীতাংশুও স্ত্রীকে সাহায্য কবতে আসছিল বেণু ধমকে তাকে নিবস্ত কবল। শীতাংশু ফিবে গেল তাব ঘবে।

আমাব দিকে একটু কাল তাকিয়ে থেকে বেণু বলল, 'দেখ, আব কিছু তোমাব চাই না কি ?'

বললাম, 'কেন এত হৈ-চৈ কবছ। তাব চেযে আমাকে ছেড়ে দিলেই তো ভালো কবতে।'

বেণু একটু হাসল, 'ধ'বেই বা তোমাকে কে বেখেছে। যাও না।'

পানেব খিলি এগিয়ে দেওযাব সময ওব আঙুলগুলি আমাব হাত ছুঁয়ে গেল

এমনি ছোযাছুঁযি তো এব আগে কত দিনই হযেছে। কিন্তু কোনদিন কিছু টেব পাইনি, লক্ষ্যও কবিনি। আজ কিছুই আমাব চোখ এড়াল না। শুধু কি চোখ ? সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে আমি ওব অস্তিত্ব অনুভব কবতে লাগলাম। বুঝতে পাবলাম আজ আব কাবোবই এড়াবাব যো নেই। এড়াবাব ইচ্ছাও কি আব আছে ?

আমাব মনে হল এত দিন শুধু মনকে চোখ ঠেবেছি শ্যাঙ্কেব বড় বড় খাতাপত্রেব আড়ালে সব ঢেকে বাখতে চেয়েছি। কিন্তু কিছু কি চাপা বইল কিছু কি ঢাকা বইল ?

বেণু একটুকাল চুপ ক'বে থেকে বলল, 'তাবপব বিয়ে টিয়ে কববে কবে ? না কি ভেবেছ সংসাবে কোন কিছুব ভাব না নিয়ে এমনি চিবকাল কাটিয়ে দিতে পাববে ?'

বললাম, 'এতদিন তাই ভেবেছিলাম

'আব আজ ?'

'আজ কি ভাবছি তা কি তুমি টেব পাচ্ছ না ?'

বেণু বাইবেব অন্ধকাবেব দিকে একবাব চোখ বুলিয়ে বলল, ওমা তোমাকে জল দেওযা হযনি।'

বললাম, ঠিক, জলটা তো চাই আমাব জল নিয়ে এসো।

বেণু বলল 'আনছি। কিন্তু জল থেকে যে আগুন জ্বলে তাব ভালো বাংলাটা যেন কি তুমি সেবাব বলেছিলে—'

বললাম, 'বাড়বাগ্নি। তা জ্বলুক তাতে আমাব আব ভয নেই '

আমি উঠে ওব হাত ধবতে গেলাম। বেণু দু পা পিছিয়ে গিযে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'যাই, জল নিয়ে আসি।

বললাম, 'আসবে তো ?

'আসব। এসে যেন না দেখি তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ।'

বললাম, 'আমি সাবা বাত জেগে থাকব '

সাবা বাতই আমি জেগে বইলাম। আমি জানি জল নিয়ে বেণু একবাব আসবেই। না এসে ওব যো নেই। ও-ও যে তৃষ্ণার্ত তা আমি টেব পেয়েছি।

বাত গভীব হতে লাগল, অন্ধকাব গভীব হতে লাগল, সমস্ত পৃথিবী স্তব্ধ হয়ে গেল। শুধু শিযবেব কাছ থেকে আমাব হাতঘড়িটাব শব্দ হতে লাগল। কিন্তু হাতঘড়িব শব্দ কি অত জোবালো হয ? না, এ শুধু হাতঘড়ি নয। হৃৎপিণ্ড দিয়ে তৈবি এ আব একটা বড় ঘড়িব পেণ্ডুলাম ' আশায আশঙ্কায তা বাববাব দোল খাচ্ছে, ঘা খাচ্ছে।

কিন্তু আশ্চর্য, রাত প্রায় শেষ হয়ে এল, মোমের মতো জ্ব'লে জ্ব'লে আমি নিঃশেষিত হলাম—বেণু এল না। ব্যাপারটা কি? ও কি ভয় পেল, না ধরা পড়ল, না কি ছলনা করল আমার সঙ্গে? তা ঠিকমতো না জেনে আমি যেতে পারব না।

সরু লম্বা করিডোর পেরিয়ে পা টিপে টিপে আমি ওদের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। দোর যদি বন্ধ দেখি, সে দোরে আমি ঘা দেব। দোর না ভাঙলেও সুখনিদ্রা ভাঙবে।

কিন্তু না, দোর বন্ধ নয়। আধো-খোলা দোরের ভিতর দিয়ে ঘরের আলো দেখা যাচ্ছে। আমি একটু দাঁড়ালাম। আর সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত একটা শব্দ আমার কানে আসতে লাগল। হাঁপানির টান। একটা লোকের কাছে গোটা পৃথিবী একেবারে নির্বায়ু হয়ে পড়েছে। সহজ শ্বাস-প্রশ্বাসের এক ফোঁটা বাতাস সে খুঁজে পাচ্ছে না।

ফিরে আসছিলাম। ভিতর থেকে বেণু জিজ্ঞাসা করল, 'কে ওখানে?'

সাড়া দিয়ে বললাম, 'আমি।'

বেণু বলল, 'এস, ঘরে এস।

ঘরে গিয়ে শীতাংশুর বিছানার কাছে দাঁড়ালাম।

শীতাংশু তেমনি শ্বাস টেনে চলেছে। তার পাশে বসে পরিচর্যা করছে বেণু। বুকে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

আমি বললাম, কখন থেকে এমন শুরু হল?

বেণু বলল, 'সেই প্রথম রাত থেকে। সারা রাতের মধ্যে একটু যদি কেউ ঘুমিয়ে থাকি। এত ক'রে বলি অনিয়ম অত্যাচার ক'রো না, কিন্তু একটা কথাও আমার যদি কানে তোলে! এ যন্ত্রণা আমি আর সইতে পারি নে'

শীতাংশু ক্লিষ্ট স্বরে কি একটু প্রতিবাদ করতে করতে পাশ ফিরল। আর আমি ভোরের গাড়িতে কলকাতা ফিরলাম।

রোহিণী তার গল্প শেষ ক'রে আর একটা সিগারেট ধরাল।

সত্যেন বলল 'তুমি শুরুতে পোষা রোগের কথা কি বলছিলে?

রোহিণী একটু হাসল 'আমি শেষেও ঠিক এক কথাই বলছি। সে রাত্রের রোগটা শীতাংশুর শুধু পোশাক নয়, পোশাকী থিয়েটারের পোশাক।

অরুণ প্রতিবাদ করল 'তুমি কি ক'রে বুঝলে যে সেটা রোগ নয়—রোগের পোশাক? যত সব বাজে আন্দাজী কথা।'

রোহিণী বলল দেখ, জীবন্দাজের আন্দাজটাই সব। আমি দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। এ্যাজমা তো আমি এই নতুন দেখলাম না নিজে না ভুগলেও একজন বন্ধুকে তো ভুগতে দেখেছি। তা ছাড়া কেবল আমি কেন, সে রাত্রের এ্যাজমার টানটা যে আসলে কিসের টান আমার মনে হয় তা বেণুও বুঝতে পেরেছিল। বুঝতে পেরেই সে আর পা বাড়াতে পারেনি। নকল রোগের ভিতর থেকে আসল মানুষটিকে সেই বোধ হয় বেণু প্রথম চিনল। হয়ত সেই ওদের প্রথম শুভরাত্রি।'

জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮

পালঙ্ক

পোস্ট অফিস থেকে মকবুলই হাতে ক'রে নিয়ে এল এনভেলপের চিঠিখানা। ছোট ডিঙি নৌকায় ক'রে চৌধুরী-বাড়িতে সে দুধের যোগান দিতে গিয়েছিল। সেই বাড়িতেই গাঁয়ের পোস্ট অফিস। আসবার সময় পোস্টমাস্টার তার হাতেই রাজমোহন রায়ের চিঠিখানা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

প্রশস্ত উঠোনে কোণাকুণিভাবে বাঁশের আড় টানানো। সেই আড়ে ঝি আর চাকরের সাহায্যে নিজের হাতে ভিজে পাট মেলে দিচ্ছিলেন রাজমোহন। চিঠির দশা দেখে আগুন হয়ে উঠলেন, 'হারামজাদা, এ করছিস কি!'

মকবুল বিস্মিত হয়ে বলল, 'ক্যান, কি হইছে কর্তা?'

রাজমোহন ফের ধমক দিয়ে উঠলেন, 'কি হইছে! দ্যাখ চাইয়া দ্যাখ দেখি চিঠিখানার দিকে। বলি চিঠি কি খালের জলে চুবাইয়া আনছিস? দুধে জল মিশাইস বইলা চিঠিতেও জল মিশাইছিস? তোর সবখানেই জল, হারামজাদা?'

মকবুল গম্ভীর মুখে বলল, 'অমন কথা কবেন না কর্তা, আমার দুধে পানি নাই। আমার নৌকায় তো পাটাতন নাই। এত কান্দাকাটি করলাম একখান তক্তা আপনে দিলেন না। গলুইর চারোটের কাছে রাখছিলাম চিঠি, জল লাইগা গেছে।'

রাজমোহন বললেন, 'জল লাইগা গেছে! এই বুঝি তোমার তক্তা আদায় করবার ফন্দি। দ্যাখ মকবুল, তোর মত এমন কূচকুইরা মানুষ পাড়ায় আর দুইজন নাই। ওকি, যাইস ক্যান? রয় রয়, তামাক খাইয়া যা।'

উত্তর ঘরের বারান্দায় আগুন, মালসা, তামাকের ডিবে, মুসলমানদের জন্যে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে রাখা আলাদা হুঁকো কলকে। মকবুল অপ্রসন্ন মুখে গিয়ে তামাক সাজতে বসল।

রাজমোহন পাট মেলা ক্ষান্ত রেখে এবার চিঠির দিকে তাকালেন। মাস কয়েক আগে চোখের ছানি কাটানো হয়েছে, চশমা ছাড়া লেখাপড়ার কাজ কিছু করতে পারেন না। চাকরকে ডেকে বললেন, 'এই কালু, আমার চশমাজোড়া আইনা দে তো। ওই দ্যাখ, জলচৌকির উপর চশমা আর পঞ্জিকাখানা রইছে। যা নিয়া আয়।'

সাদা নিকেলের ফ্রেমে পুরু লেনস। কাপড়ের খুঁটে কাচটা মুছে নিয়ে সাবধানে চশমাটা পরলেন রাজমোহন। তারপর প্রসন্ন মুখে চিঠিখানার দিকে চেয়ে বললেন, 'বউয়ের লেখা। ঠিকানাটাও অসীমাই লেখছে নিজের হাতে। বাবু সময় পায়ন নাই। তা বাবুর চাইয়া আমার বউর হাতের লেখাই ভালো, অনেক ভালো। কেডা কবে যে, মাইয়া মাইনষের লেখা। ঠিক একেবারে পুরুষের ধরন, পুরুষের ছান্দ। টান টানগুলি একেবারে পাকা। দেখছিস কালু, দেখছিস?'

তের চৌদ্দ বছরের বালক চাকর কালু মণ্ডলের অক্ষর-পরিচয় হয়নি। তবু সে খামের উপর ইংরেজীতে লেখা ঠিকানাটির দিকে একবার তাকিয়ে দেখে তারিফ ক'রে বলল, 'তা ঠিকই কইছেন কর্তা, ঠাইরেনের হাতের লেখাটা খুব ভালোই। ঠাইরেন দেখতেও যেমন সোন্দর, তানার চাল চলন, কওন বলনও তেমনি। সেবারে যে আইছিলেন, আমারে দুইডা টাকা বকশিশ দিয়া গেলেন। নেব না, তবু জোর কইরা গছাইয়া দিলেন। আপনাদের কায়েতের ঘরের বউঝি কর্তা, রকমই আলাদা।'

বয়স অল্প হলে কি হবে, কালুর কথাবার্তা খুব পাকা। রাজমোহন একটু হেসে বললেন, 'আরে কেবল কায়েতের ঘরের মাইয়া হইলেই হয় না। ঘরখানা কেমন, বংশখানা কেমন, তা দেখবি না? চণ্ডীপুরের অম্বিকা বোসের নাতনী। এ অঞ্চলের মধ্যে অমন বিদ্বান বুদ্ধিমান গুণী মানী লোক আর ছিল না। তাঁর বাড়ির মাইয়া। আমি কি যেমন তেমন বউ ঘরে আনছিলাম?'

এবার এনভেলপের মুখখানা ছিঁড়ে চিঠিখানা সশব্দে পড়তে লাগলেন রাজমোহন। পড়বার আগে কালুর দিকে চেয়ে বললেন, 'কেবল হাতের লেখা না, চিঠির মুসাবিদাটাও একবার শোন। তার মুসাবিদার কাছে উকিল-মহুরীও হাইরা যায়।'

মকবুলকেও ডাকলেন রাজমোহন, 'ও মকবুল, আয় এখানে, শোন আইসা।'

কৌতূহলী মকবুল হুঁকো হাতে উঠানে নেমে রাজমোহনের পাশে এসে দাঁড়াল।

রাজমোহন পড়তে লাগলেন :

শ্রীচরণকমলেষু

বাবা, অনেকদিন হয় আপনার চিঠিপত্র পাইনে। আপনার চিঠি না পেলে আমরা বড়ই চিন্তায় থাকি। ওখানে আপনি একা একা আছেন। আমরা কেউ কাছে নেই, আপনার নাতি-নাতনীরা কেউ কাছে নেই, কেবল ঝি আর চাকব ভরসা ক'রে আপনি মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একা একা কাটাচ্ছেন। একথা যখন ভাবি, আমাব মন ভারি খাবাপ হয়ে যায়। আমরা থাকতে এই বৃদ্ধ বয়সে আপনার সেবা-শুশ্রূষা হচ্ছে না. একথা মনে হ'লে আমার দুঃখের অবধি থাকে না। কিন্তু কি কবব ? আপনি তো আমাদের কথা শুনলেন না, অপনি তো পাকিস্তান ছেড়ে কিছুতেই এলেন না ! অথচ বিষয়সম্পত্তি সব বিক্রি ক'রে পাড়াপড়শীরা একে একে সবাই তো প্রায চলে এসেছে। বাঁড়ুয্যেরা এসেছে, মুখুয্যেবা এসেছে, রাহারা এসেছে, সাহারা এসেছে। কুণ্ডুরা. নন্দীরা কেউ বাকি নেই। বলতে গেলে গ্রাম তো এখন একেবারে শূন্য। তবু আপনি এলেন না ! এলেন না, তা ছাড়া ভবিষ্যতের কথাও একবার ভেবে দেখলেন না। অথচ যাঁবা আপনার বযসী, যাবা বৈষয়িক মানুষ, তাঁরা সবাই এতদিনে এখানে বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। সময় থাকতে, দব থাকতে থাকতে ওখানকার স্থাবব-অস্থাবর সব বিক্রি ক'রে দিয়ে দু'পয়সা হাতেও করেছেন। কিন্তু আপনি কিছু করলেন না !

শুনতে পাই, আপনি নাকি লোকের কাছে বলে বেড়ান, বাড়ির সব জিনিস আপনার, সব সম্পত্তি আপনার, একগাছা কুটো, এক ছটাক জমিও আপনি নাকি বিক্রি করবেন না। মুসলমানেরা সব লুটে পুটে খাবে সেও স্বীকার, তবু আপনি কিছু ছাডবেন না ! আপনার বাড়ি, আপনাব ঘব, আপনার সম্পত্তি। আপনার যা ইচ্ছে, আপনি তাই করবেন। এব ওপব আমাদেব কি বলবার আছে ? অধিকারই বা কি ?

কিন্তু আজ একটা অনুরোধ করবাব জন্য আপনার কাছে এই চিঠি লিখছি। বেলেঘাটায় যে ঘর আমরা ভাড়ায় নিয়েছি, তা আপনি দেখে গেছেন। তার দেয়াল আব মেঝে থেকে যেন দিনরাত জল চুঁইয়ে চুঁইয়ে উঠছে : সেই স্যাঁতসেঁতে মেঝেয় শুয়ে শুয়ে কানু, টেনু, রীণা, মীনা—আপনাব অত আদরেব নাতি-নাতনীদের কারো অসুখবিসুখই আর সারছে না। প্রত্যেক মাসে জ্বব-জ্বাবি আব ডাক্তার-খরচ লেগেই আছে। আপনাব ছেলেব কাছে খাট-তক্তপোশের কথা বললে তিনি ধমক দিয়ে ওঠেন, বলেন, টাকা কোথায় ? তা আমি বলি কি, আমার বিয়ের সময় আমার দাদুব দেওয়া আমাদের সেই পালঙ্কখানা আপনি এবার বিক্রি ক'রে দিন। দিয়ে সেই টাকা এখানে পাঠান। আমি খাট পারি, তক্তপোশ পারি, যা হোক একটা আপনার নাতি-নাতনীদেব জন্যে কিনে নিই। ওদের কষ্ট আর দেখা যায় না।

ভেবে দেখুন, এতে আপনার আপত্তিব কারণ নেই, অমতেরও কিছু নেই। এ তো আপনাদের বাড়ির জিনিস নয়। এক হিসেবে পরের জিনিস, পবের কাছ থেকে যৌতুক পাওয়া। তা বিক্রি কবলে আপনাব সম্মানের কোনো হানি হবে না। আপনি আমার নাম ক'রেই বিক্রি কববেন। এখন পাটের সময়। মুসলমানদের হাতে টাকা-পয়সা আছে। এই বিক্রি করার সুযোগ। তাছাড়া ও পালঙ্ক রেখেই বা কি হবে ? কারো তো আর ভোগে আসবে না। মিছামিছি উঁইয়ে কেটে নষ্ট ক'রে দেবে। তার চেয়ে আপনি ওটা বিক্রি ক'রে দিন। টাকাটা কানু-টেনুর প্রয়োজনে লাগুক। আপনার ছেলেরও তাই মত।

এখানে শ্রীমান শ্রীমতীরা সকলে কুশলে আছে। অফিসের কাজকর্মের চাপে আপনার ছেলে একটুও সময় পান না। তিনি পরে সময় ক'রে চিঠি লিখবেন। পত্র-পাঠ আপনি পালঙ্কখানা বিক্রির

ব্যবস্থা করবেন। নিয়মিত চিঠি-পত্র লিখবেন। আপনি আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের অসীমা

সুরেন আলাদা চিঠি দেয়নি। স্ত্রীর চিঠির কোণায় এক লাইনে একটু সুপারিশ করেছে, 'আমার মনে হয় অসীমার প্রস্তাবে আপনার কোন আপত্তি থাকতে পারে না।'

'না, আপত্তি কিসের ? কিছুতে আমার আপত্তি নাই, তোগো যা খুশি তাই কর, যা ইচ্ছা তাই কর।'

বলতে বলতে চিঠিটা সজোরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন রাজমোহন। চড়া গলায় চাকরকে হুকুম করলেন, 'কাউলা, পুবের ঘর খুইলা পালংখানা বাইর কইরা আন দেখি। ও জিনিস আমি আর ঘরে রাখব না, ও পালং আমি আদাড়ে ফেলাইয়া দেব। তার বাপের বাড়ির সব জিনিস টোকাইয়া কুড়াইয়া তো নিয়াই গেছে। থাকবার মধ্যে আছে ওই পালং। ও জিনিস আর রাখব না। আরেক মেড়াকান্ত বউর গোলাম। তিনি আবার লেখছেন, আপনার আপত্তি থাকা উচিত নয়। না, আমার আর কোন আপত্তি নাই! ও পালং আমার ঘর থিকা না সরাইয়া আমি অন্নজল মুখে দেব না। যা পালং খুইলা নিয়া আয়।'

কালু বাধা দিয়া বলল, 'ধলাকর্তা, শোনেন।'

রাজমোহন বললেন, 'না, আর শোনা-শুনি নাই, কাউলা। আমার যে কথা, সেই কাজ। ও পালং ভইরা আমি পেচ্ছাব করি, পেচ্ছাব করি। ও জিনিস আমার বাড়ি থিকা দূর কইরা না ফেলাইলে আমার মনের জ্বালা মেটবে না, কাউলা, আমার বুকের আগুন নেববে না।'

এগিয়ে গিয়ে রাজমোহন বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে সশব্দে পুবের ঘরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলেন। এই ঘরে থাকত সুরেন আর তার স্ত্রী অসীমা। এক বছর আগেও সুরেন ছুটিতে এসে সপরিবারে এ ঘরে বাস ক'রে গেছে। পালঙ্কখানা দক্ষিণের দুটি বড় বড় জানালা ঘেঁষে এখনো পাতা রয়েছে। গদিটাকে পুরু চট দিয়ে ভালো ক'রে ঢেকে রেখেছেন রাজমোহন। রোজ একবার ক'রে এসে দেখেন, উঁই-ইঁদুরে কাটল কিনা। রোজ একবার ক'রে কাঁধের গামছা দিয়ে পালঙ্কের ধুলো মোছেন। পুব দিকের বেড়ায় সুরেন আর অসীমার বাঁধানো ফটো। উত্তর দিকে ধানের গোলা আর স্তূপীকৃত শুকনো সাদা পাট।

রাজমোহনের পিছনে পিছনে মকবুলও এসে দোরের কাছে দাঁড়াল।

রাজমোহন বললেন, 'আয়, ঘরে আয় মকবুল, পালং খুইলা নিয়া যা।'

মকবুল বলল, 'এ পালং সত্যিই আপনি বিক্রি করবেন ধলাকর্তা ?'

রাজমোহন বললেন, 'হ্যাঁ, নগদ টাকা পাইলে আইজই আমি এ জিনিস বিক্রি কইরা দেব। বিক্রি কইরা আইজই মনি-অর্ডার করব কইলকাতায়।'

মকবুল ঘরের ভিতরে ঢুকল। এ ঘরে খাওয়ার জল নেই, ঠাকুর-দেবতার আসন নেই, কামলা-কিষাণ—সবাই এঘরে আজকাল ঢোকে।

ঘরে এসে লুব্ধদৃষ্টিতে পালঙ্কখানার দিকে তাকাল মকবুল। ভারি শৌখীন দামী জিনিস। আগাগোড়া সেগুন কাঠের তৈরি। চারিদিকে চারটি পায়ায় বড় বড় বাঘের থাবা। হাত-খানেক চওড়া বাতায় ভারি সুন্দর নক্সার কাজ। উপরে লতা, নীচে লতা। মাঝখানে সুদীর্ঘ ছোট ছোট হাতীর সারি।

মকবুল আবার জিজ্ঞেস করল, 'পালংখানা আপনি বিক্রি করবেন ধলাকর্তা ? তা বউ-ঠাইরেন যে রকম খোটা দিয়া লেখছেন, তাতে আপনার মত মানী লোকের এ জিনিস রাখা উচিত না। তা এক কাজ করেন ধলাকর্তা, জিনিসটা আপনে আমারে দেয়ন গিয়া।'

রাজমোহন মকবুলের দিকে তাকালেন, 'তোরে ?'

মকবুল বলল, 'হ ধলাকর্তা। আমি মাগনা নেব না, সাইধ্য মত দাম দিয়া নেব। জিনিসটা তো আপনে আদাড়ে ফেলাইয়া দিতেই চাইছিলেন। তা আদাড়ে দেওয়াও যা, আমারে দেওয়াও তা। আমারে দিয়া দেয়ন জিনিসটা।'

বাজমোহনেব আক্রোশ তখনও মেটে নি। মনে মনে ভাবলেন, কথাটা মন্দ নয়। মকবুলেব ঘবেই এ জিনিস যাওযা উচিত। যে বকমেব মেযে তাঁব পুতেব বউ, আব যে বকম ছোট তাব প্রবৃত্তি, তাতে তাব বাপেব বাড়িব জিনিসেব এই গতি হওযাই ভালো।

মকবুলেব দিকে তাকালেন বাজমোহন, 'পাববি ? নগদ টাকা দিযা নিতে পাববি জিনিস ? আইজই এই মুহূর্তেই আমাব ঘব পবিষ্কাব কইবা দিতে পাববি ?'

মকবুল বলল, 'পাবব ধলাকর্তা, আমি বাড়ি গুনা টাকা নিযা আইলাম বুইলা। আপনি পালং খোলেন ততক্ষণ।'

মকবুল শেখেব বাড়ি কাছেই। বাজমোহনদেব বাড়িব দক্ষিণ দিকে ছোট একটা জংলা পোড়ো ভিটে, তাব দক্ষিণে সরু একটা খাল। অন্য সময শুকনো খট খট কবে, এখন বর্ষাব জলে ভবে উঠেছে। সেই খালেব ওপাবে মকবুলদেব বাড়ি। জংলা ভিটায একটা আমগাছেব সঙ্গে আব মকবুলদেব একটা তেঁতুলগাছেব গোড়ায বাঁধা বাঁশেব সাঁকো। পাযেব নীচে এক বাঁশ আব ধববাব [illegible] বাঁধা আব একটা সরু বাঁশ। সেই সাঁকোব ওপব দিযে উৎসাহে প্রায ছুটে গেল মকবুল।

তেঁতুলগাছেব নীচে ছোট একখানা ঘব। ওপবে পুবনো কবোগেট টিনেব চাল। জাযগায জাযগায মবচে ধবেছে। বেড়াগুলিব খানকযেক বাঁশেব বাখাবি দিযে তৈবি, সামনেব খান-দুই পাঁকাটিব। মাটিব ভিত বর্ষাব জলে থিক থিক কবছে। মাটি খুঁড়ে গোটাকযেক কেঁচো আশ্রয নেওযাব চেষ্টা কবছে ভিতবে। সামনে ভিজে স্যাঁতসেঁতে ছোট একটু উঠান। খালেব জল বাড়িব উপব উঠি উঠি কবছে। এখনো ওঠেনি। উঠানে বসে একুশ বাইশ বছবেব নীল বংযেব একখানা জোলাকি শাড়িপবা ফর্সাপানা একটি বউ শাপলা কুটছিল। খানিক দূবে শাপলাব ফুল নিযে খেলা কবছে চাব পাঁচ বছবেব উলঙ্গ বোগা বোগা দুটি ছেলেমেযে। কোমবে একটা ক'বে ফুটো পযসাব সঙ্গে একগাছি ক'বে কালো তাগা বাঁধা। দেহেব আব কোথাও কিছু নেই। উঠানেব পুবদিকে দিযে পাকাটি শুকোতে দেওযা হযেছে। তাতে জ্বালানি হবে, ঘবেব বেড়া হবে। সেই পাঁকাটিব আড়ালে একটা বোগা হাড় বেব কবা গরু খড় চিবুচ্ছে আব লেজ নাড়ছে।

রুদ্ধশ্বাসে মকবুল এসে স্ত্রীব সামনে দাঁড়াল, 'ফতি, ওঠ। উইঠ্যা শীগ্‌গিব টাহা বাইব কব।'

ফতেমা আঁচলখানা মাথায তুলে দিযে কালো বড় বড় দুটি চোখ মেলে সবিস্ময়ে স্বামীব দিকে তাকাল, 'এ তুমি কও কাব নাগাল ? টাহা পামু কই ?'

মকবুল মুচকি হেসে বলল, 'পাবিআনে।'

তাবপব নিজেই টাকাব সন্ধান দিল। বাঁশেব ছোট শুকনো চোঙাটাব মধ্যে আছে ভাঁজ কবা কযেকখানা নোট। পাট বেচে, গাছ বেচে, গাইযেব দুধ বেচে একটি একটি ক'বে সঞ্চয কবেছে সেই টাকা। স্ত্রীকে সেই টাকা বেব ক'বে দিতে অনুবোধ কবল মকবুল।

কিন্তু ফতেমা কিছুতেই উঠতে চায না। কেবল ইতস্তত কবে। স্বামীব দিকে তাকিযে পবম অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে বলল, 'সেই টাহা দিযা না তুমি গাই কেনবা, সেই টাহা দিযা না তুমি ঘব সাবাবা, সেই টাহায তুমি না আমাবে গযনা গড়াইযা দিবা কইছিলা। ও টাহা আমি দেব না, আমাবে মাইবা ফেলাইলেও না।'

মকবুল হেসে বলল, 'আবে গযনাই তো আনতেছি ঘবে। কেবল তোব গযনা না বউ, আমাবও গযনা। দুইজনে মিলা একসঙ্গে পবব। কী চমৎকাব পালং বে ফতি। তুই তোব বাপেব জনমেও দেখস নাই, আমিও না।'

সবিস্তাবে মকবুল পালঙ্কেব বর্ণনা দিল। ধলাকর্তা বাগ ক'বে পালঙ্কখানা সস্তায বেচে দিচ্ছেন। এ সুযোগ হাতছাড়া কবা সঙ্গত হবে না। বেশি দেবি কবলে হযত ধলাকর্তাব বাগ পড়ে আসবে। হযত অন্য কাবো হাতে গিযে পড়বে জিনিসটা। মকবুলেব আফসোসেব আব সীমা থাকবে না। এব আগে হিন্দুবা কত খাট, চেযাব, টেবিল, আলমাবি, বাসন-বাটি বিক্রি ক'বে গেছে। জলেব দামে মুন্সীবা কিনেছে, কাজীবা কিনেছে, সিকদাববা কিনে বেখেছে। মকবুল একটা জিনিসও ছুঁতে পাবেনি। একটা পযসাও তাব হাতে ছিল না। এখন সুযোগ যখন হাতেব কাছে এসেছে, এ সুযোগ

ছাড়া মোটেই সঙ্গত হবে না। একটা জিনিসের মত জিনিস অন্তত থাকুক মকবুলের ঘরে।

ফতেমা নরম হয়ে বলল, 'কিন্তু জিনিস যে রাখবা মেঞা, তোমার সে ঘব কই ? এই ভাঙা ঘরে রাজা-বাদশার পালঙ্ক মানাবে নাকি !'

মকবুল হেসে বলল, 'মানাবে ফতেমা, মানাবে। এই কুইড়া ঘরে আমার বেগমজান, আমাব দিলজানবে মানাইতেছে না ?'

দুই আঙুল দিয়ে স্ত্রীর থুতনি উঁচু ক'রে ধরল মকবুল, 'আমার এই ভাঙা ঘর রাঙা হইযা রইছে না তার রোশনাইতে ? এ ঘরে তোরে যদি মানায়, তাইলে পালংও মানাবে।'

ঘরেব ভিতর গিয়ে বাঁশের চোঙাটা মেঝের ওপর উপুড় ক'রে ফেলল মকবুল। নোটে আব রেজগিতে মিলিয়ে বায়ান্ন টাকা সাড়ে দশ আনা। খুচবো টাকাটা স্ত্রীকে ফিরিযে দিয়ে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে ফের সেই সাঁকোর উপর দিয়ে ছুটে চলল মকবুল। জংলা পোড়ো ভিটেয় পাড়ার ইয়াকুব চৌকিদার মাছ ধরবাব দোয়াইর তৈবি করবার জনো বুনো লতা খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে মকবুলকে ছুটতে ছুটতে যেতে দেখে বলল, 'অমন ঘোড়া দাবাড়াইয়া চললা কই মিঞা ?'

মকবুল বলল, 'আরে ভাই চকিদার নাকি ? আইস আইস, তোমারে দিয়া কাম আছে আমার। কথা আছে। তোমার দোয়াইর আমি বানাইয়া দেবনে, তুমি আইস।'

চৌকিদারের হাত ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে চলল মকবুল।

রাজমোহন ততক্ষণে পালঙ্কখানা খুলে উঠানে নামিযেছেন। মকবুল তাঁর পায়ের কাছে পঞ্চাশটি টাকা রেখে দিয়ে বলল, 'এই নেয়ন ধলাকর্তা।'

রাজমোহন বললেন, 'টাকা দিয়া কি হবে ? এ পালং তুই এমনিই নিয়া যা। নিযা খালের জলে ভাসাইয়া দে গিয়া। এ জিনিস আমি আব ঘরে রাখব না।'

মকবুল বলল, 'এমনিই নিতাম ধলাকর্তা। আপনার কাছ থিকা চাইয়া নিতাম, কিন্তু এ তো আপনাব জিনিস না, ঠাইরেনের বাপের বাড়ির জিনিস। টাহা আপনে ঠাইরেনরে পাঠাইযা দেবেন।'

একটা বিষাক্ত তীর যেন বিঁধল গিয়ে রাজমোহনের বুকে। ঠিক ঠিক, এ পালঙ্ক তো তাঁর নয় ! এ তাঁর পুত্রবধূর বাপের বাড়ির জিনিস। এতে রাজমোহনের কোনো অধিকার নেই। সে কথা অসীমা তো স্পষ্টই লিখেছে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাবা চিঠিখানা ভরে ওই একটি কথাই জানিয়েছে সে। দোয়াতেব বিষ, তার অন্তরের বিষ কলমেব ডগায তুলে তুলে সারা চিঠি ভ'রে ছিটিয়ে দিয়েছে।

রাজমোহন চেঁচিয়ে বললেন, 'তাই দেব, তাই দেব। টাকার যখন এত খাঁই হারামজাদীর, টাকাই পাঠাইয়া দেব তাবে। তুই এ জিনিস আমার চোখের সমুখ থিকা সবাইয়া নিয়া যা মকবুল, সরাইয়া নিয়া যা। ও তো পালং না, খাট না, ও আমার চিতার কাঠ। তুই সরাইযা, নিয়া যা।'

ইয়াকুব চৌকিদারের সাহায্যে পালঙ্কখানা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে পালাল মকবুল। এবার আর সাঁকোতে নয়, তাব ভাঙা ডিঙি নৌকোয় পার ক'রে নিল।

ভারি ভারি পায়াগুলি ডাঙায় নামাতে নামাতে ইয়াকুব বলল, 'তুমি ভারি জিত জিতা গেলা মেঞা-ভাই। এ পালং-এর দাম দুইশ' টাকার এক পযসাও কম হবে না, তোমারে আমি কইয়া দিলাম।'

কথাটা মকবুল এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'শালার বুইড়া কি আইচ্ছা বজ্জাত চকিদার ! মানুষ নয়, যখ। যখের ধনের মত সব আগলাইয়া রইছে। এত হিন্দু চইলা গেল, ও বুইড়ার যাওনের নাম নাই ! তা না গেছে না গেছে, ওয়ার জ্বালায় একটা ফল-পাকড়া ছোঁবার জো নাই, একটি জ্বালানি কুটা ছোঁয়ার জো নাই। অমনি ধাইয়া আসবে মারতে। আরে চউখ বোজলে খাব তো আমরাই, থাকব তো আমরাই। সুরেন ভুঁইঞা ফের আবার থাকতে আসবে নাকি ওই বাড়িতে ? ছাইড়া দ্যাও মোনে।'

ইয়াকুব বলল, 'তা ঠিক। পাকিস্তানে সে আর সাহস কইরা আসতে পারবে না। গেছে তো গেছেই।'

মকবুল বলল, 'বুইড়ার বাড়ি আমি খাস পাকিস্তান বানাব। আমার পোলাপান, আমার কবিলা ওয়ার ওই শানবান্ধানো ঘরের ভেতর দিয়া নইড়া চইড়া বেড়াবে। আমি জিতছি তুমি কইলা

মেঞ্জাভাই, কিন্তু আমার তো মনে হয় আমি ঠইগা গেলাম। এ খাট আমি এমনিই পাইতাম, কাইড়া নিতাম বুইড়ার কাছ থিকা।'

তারপর একটু চিন্তা করে মকবুল বলল, 'না ভাই, ওডা কথার কথা, কাইড়া নেওয়ার চাইয়া দাম দিয়া নেওয়া অনেক ভালো। জিনিসটা নিজেব হয়। কেউ কোন কথা কইতে পারে না। কি কও মেঞ্জাভাই ? সাচা কইলাম, না মিছা কইলাম ?'

ইয়াকুব ঘাড় নেড়ে বলল, 'ঠিকই কইছ।'

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খবরটা পাড়া ভ'রে ছড়িযে পড়ল, রাজমোহন তাঁব দামী পালঙ্কখানা জলের দামে বিক্রি ক'রে দিয়েছেন। যে ধলাকর্তা ভিটের একটা বাঁশ বেচেন না, গাছ বেচেন না, একগাছা খড় বিক্রি করতে পর্যন্ত যাঁর সম্মানে বাধে, তিনি অমন শৌখীন সুন্দর একখানা পালঙ্ক কিনা মাত্র পঞ্চাশ টাকায় ছেড়ে দিয়েছেন।

শবৎ শীল, মুরারি মণ্ডল, গেদু মুন্সী, ছদন মৃধা—পড়া-পড়শীরা সবাই এসে ভিড় ক'রে দাঁড়াল।

শরৎ বলল ধলাকর্তা, আপনার কি মতিচ্ছন্ন হইছে ! অমন জিনিসটা আপনি মোটে পঞ্চাশ টাকায় বেইচা ফেললেন। আমাবে দিলে আমি দেড়শ টাকা দিতাম।'

গেদু মুন্সী বলল, 'আরে থোও ফেলাইয়া তোমার দেড়শ। ও জিনিস আমি আড়াই শ' টাকা দিয়া নিতাম ধলাকর্তা। আমারে কইলেন না ক্যান্ ?'

রাজমোহন চটে উঠে বললেন, 'তোমরা যাও, চইল্যা যাও, আমাবে বিবক্ত কইরো না। ও জিনিস আমি বিক্রি করি নাই, বিলাইয়া দিছি, ফেলাইয়া দিছি। তোমরা চইল্যা যাও।'

কিন্তু চলে যাওয়াব আগে ছদন মৃধা অনুনয় ক'রে গেল, 'আলমারি, চেয়ার, টেবিল, সিন্ধুক যদি কোন জিনিস ফেব বিক্রি কবেন ধলাকর্তা, আমাবে কবেন, আমাবে আগে জানাবেন। আমি নগদ টাকা দিযা, ন্যায্য দাম দিযা জিনিস নেব, ঠগাইয়া নেব না।'

ছদন মৃধার অবস্থা পাড়ার মধ্যে সব চেয়ে ভালো। পাটেব কারবাব ক'বে বেশ কিছু জমিয়েছে। মাঠেও প্রায় শ'খানেক বিঘা খামার। ছদন মুসলমানদের মধ্যে মানী গুণী লোক।

কিন্তু রাজমোহন তার পিছনে পিছনে প্রায় ধেয়ে গেলেন, 'তুমি চইল্যা যাও মেবধা, তুমি নামো আমার বাড়ি থিকা। আমি মইরা গেলে আইসা ভোগ দখল কইরো। কিন্তু যতক্ষণ বাইচা আছি, আমি আমার বাড়ির কিছু বিক্রি করব না। বেচিও নাই, বেচবও না।'

রাজমোহনের মূর্তি দেখে সবাই সামনে থেকে স'রে পালাল। নিজেদেব মধ্যে বলাবলি কবতে লাগল, ধলাকর্তার এবার ছিট হয়েছে মাথায়। হবে না ? ছেলে-বউ নাতি-নাতনীদের ছেড়ে একা একা এই শূন্য পুরীতে থাকে মানুষটি, তার মাথা খারাপ হবে না !

সকলে চলে যাওয়ার পর রাজমোহন কিছুক্ষণ নিজের মনেই গুম হয়ে বইলেন। ঠকেছেন, তিনি ঠকেছেন কোনো সন্দেহ নেই। ঝোঁকের মাথায়, জেদের বশে তিনি নিজেব সর্বনাশ করেছেন। চোরের উপর রাগ ক'রে ভাত খেয়েছেন মাটিতে। মাটি খেয়েছেন।

খানিক্ষণ চুপ ক'রে চাকরকে ডেকে বললেন, 'কাউলা, নৌকা খোল। আমি কুমারপুর যাব।'

সোনাপুর থেকে মাইল দেড়েক দূরে কুমারপুর গঞ্জ। সেখানকার রেজেস্ট্রী অফিসে কাজ করেন রাজমোহন। দলিল লেখেন। আজকাল লিখতে ভারি কষ্ট হয়। হাত কাঁপে। অক্ষরগুলি অস্পষ্ট, এমন কি অপাঠ্য হয়ে ওঠে। লোকে আর তাঁকে দিয়ে কাজ করাতে চায় না। কিন্তু কাজ তাঁর না করলে চলে না। কাজের জায়গায় তাঁর রোজ একবার ক'রে যাওয়া চাই। কাজের আশায় অফিস ঘরের বারান্দায় খানিকটা সময় কাটিয়ে আসা চাই।

সবাই বলে, 'আর ক্যান ধলাকর্তা ? এখন বয়স হইছে। এখন এসব ছাইড়া দেয়ন। এখন আর এত কষ্ট করেন ক্যান ?'

রাজমোহন জবাব দেন, 'না করলে ভাত হজম হয় না হরবিলাস। না কইরা দেখছি। হজম হয় না, ঘুম হয় না, অসোয়াস্তি লাগে।'

ছোট বৈঠাখানা নিয়ে নৌকায় যাওয়ার আগে কালু বলল, 'ধলাকর্তা, নাইয়া খাইয়া নিলেন না ?'

রাজমোহন জবাব দিলেন, 'না আইজ আর নাওয়া খাওয়া লাগবে না ! তুই তো পান্তা ভাত

খাইয়া নাছস। তাইতেই হবে।' তারপর হঠাৎ আবেগরুদ্ধ স্বরে ব'লে উঠলেন রাজমোহন, 'কাউলা, এ আমি করলাম কি, আমি হাতে কইরা মাটি খাইলাম, এ্যা কাউলা ?'

'আমি তো আপনারে বারবার না করলাম ধলাকর্তা। আপনারে—' বলতে বলতে কালু থেমে গিয়ে বৃদ্ধ প্রভুর মুখের দিকে নির্বাক অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'চলেন, ধলাকর্তা।'

ধলাকর্তা। ধলাকর্তাই বটে, যৌবনে পাড়ার মধ্যে, গাঁয়ের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে সুপুরুষ ছিলেন রাজমোহন। দীর্ঘকায় চেহারা, উজ্জ্বল গৌর গায়ের রঙ, উন্নত নাক, প্রশস্ত কপাল আর আয়ত চোখ। দেখলে রাজপুত্র ব'লে মনে হত। এই পঁয়ষট্টি বছর বয়সে চেহারার সেই জৌলুষ আর নেই, দেহ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কুঁচকে গেছে গায়ের চামড়া। রঙ নিষ্প্রভ হয়েছে। সুন্দর সুগঠিত দাঁতগুলির একটি কি দু'টি মাত্র অবশিষ্ট আছে। কিন্তু আর একদিক থেকে রাজমোহন ধলাকর্তা হয়েছেন। এই কয়েক বছরে তাঁর মাথার চুল পেকে সব সাদা হয়ে গেছে। ভ্রূ সাদা হয়েছে, গোঁফ সাদা হয়েছে, বুকের ওপর একরাশ লোম বগী পাটের মত সাদা ধবধব করছে।

কালু চাকর বলল, 'ধলাকর্তা, নায় ওঠেন।'

'হ, উঠি।'

কাঁধে ময়লা লংক্লথের পাঞ্জাবি, হাতে পুরনো ছেঁড়া চটি, বগলে তালি-দেওয়া ছাতা আর লাঠিখানা চেপে ভাবাক্রান্ত হৃদয়ে উঠে বসলেন রাজমোহন, খাল ছেড়ে নৌকো কুমার নদীতে গিয়ে পড়ল।

রাত্রে ফিরে এসে হ্যারিকেন হাতে প্রথমেই পূবের ঘরখানায় ঢুকলেন রাজমোহন। ঘরের অর্ধেক খালি হয়ে গেছে। ঘরের দিকে আর চাওয়া যায় না! চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন রাজমোহন। কিন্তু সেই খালি ঘর যেন পিছনে পিছনে ছুটে এলো। খালি ঘর যেন বুকের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে। বুক খালি ক'রে দিয়েছে।

উত্তরের ঘরে—নিজের শোবার ঘরে ঢুকলেন রাজমোহন। কাপড় ছাড়লেন, হাত মুখ ধুয়ে আহ্নিকে বসলেন। কিন্তু মন বসল না। পূবের ঘরের সেই খালি জায়গাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। ইষ্টমন্ত্রের বদলে পালঙ্কখানাকেই বারবার ক'রে মনে পড়তে লাগল।

হঠাৎ বুকের মধ্যে এক অসীম শূন্যতা বোধ করলেন রাজমোহন। তাঁর কেউ নেই, তাঁর কেই নেই। বহুদিন, দশ বছর আগে মরে যাওয়া স্ত্রী সরলার মুখ মনে পড়ল, প্রবাসী পুত্র-পুত্রবধূর, নাতি-নাতনীর বিচ্ছেদ-দুঃখের কথা মনে পড়ল, কেউ যেন তাঁর থেকেও নেই, সংসারের সব সরে গেছে, সব চলে গেছে, সব ভুলে গেছে রাজমোহনকে। তিনি একা, এই শূন্য পুরীতে, এই শূন্য সংসারে তিনি একান্তই নিঃসঙ্গ।

পরদিন সকালে উঠে তিনি প্রথমে কালুকে দিয়ে মকবুলকে ডেকে পাঠালেন। মকবুল এল না। কালুকে বলল, তার এখন মেলা কাজ। পরে সময় মত ধলাকর্তার সঙ্গে সে দেখা করবে।

রাজমোহন অবশিষ্ট দাঁতগুলি কিড়মিড় করলেন, 'হারামজাদার আস্পর্ধা দেখ : আমি ডাকলাম, বলে কিনা, কাজ আছে! কাজ আমি ওয়ার বাইর কইরা দেব।'

কালু সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'কি করবেন ধলাকর্তা ? এখন ওয়াগো দিনকাল ওয়াগোই রাজত্ব। বড়া বাঁশের চাইয়া ছিটা কঞ্চির তাজ বেশি।'

রাজমোহন বললেন, 'হুঁ।'

তারপর খানিক বাদে নিজেই চললেন মকবুলদের বাড়ির দিকে ভালো ক'রে হাঁটতে পারেন না। বাতে বাঁ-পাটাকে প্রায় অকেজো ক'রে ফেলেছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। জল-জঙ্গল ভেঙে সেই বাঁশের সাঁকো পার হয়ে রাজমোহন মকবুলের উঠানে এসে দাঁড়ালেন, 'কি করতেছিস মকবুল ?'

দুধের যোগান দিয়ে এসে বারান্দায় বসে স্ত্রীকে নিয়ে গরুর দড়ি পাকাচ্ছিল মকবুল। রাজমোহনের গলার শব্দ শুনে ফতেমা তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে চলে গেল।

মকবুল বলল, 'আসেন ধলাকর্তা, আসেন।'

কিন্তু আমন্ত্রণের মধ্যে তেমন আন্তারকতা ফুটে উঠল না। অবশ্য উঠে দাঁড়িয়ে নিজের জলচৌকিখানা রাজমোহনকে ছেড়ে দিল মকবুল, বলল, 'বসেন ধলাকর্তা, তারপর কি মনে কইরা ? আমিই তো যাইতাম। আপনি কষ্ট কইরা আইলেন ক্যান আবার ?'

রাজমোহন বললেন, 'আইলাম তোগো দেখতে। কেমন আছিস খোঁজ নিতে। তা ঘরখানা তো ভালোই উঠাইছিস। ছাওয়ালপান নিয়া থাকবার মত বড়ও হইছে। তা পুরানো টিন দিছিস ক্যান চালে। বদলাইয়া নতুন টিন দে।'

কথার ফাঁকে একবার আড়চোখে মকবুলের ঘরের মধ্যে তাকালেন রাজমোহন। পালঙ্কখানা কালই পেতে ফেলেছে মকবুল। ওর সমস্ত ঘরখানাই প্রায় জুড়ে গেছে। উঁচু পালঙ্কের নিচে হাঁড়ি-পাতিল,ফতেমার গৃহস্থালি। উপরে গদি নেই, গদি মকবুলকে দেননি রাজমোহন। তার বদলে একটি মাদুব আর ছেঁড়া ময়লা কাঁথা বিছিয়েছে ফতেমা। একদিকে ওয়াড়হীন তেল-চিটচিটে গোটা দুই বালিশ। যেন চিতা থেকে কেউ তুলে নিয়ে এসেছে। তাঁর পালঙ্কের কি দশা করেছে এরা ! এ দৃশ্য দেখা যায় না। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আগেব কথায় ফিরে গেলেন রাজমোহন। বললেন, 'হ, টিন বদলাইয়া ফেলা, নইলে চাল নষ্ট হইয়া যাবে যে, জল পইড়া ঘর নষ্ট হইয়া যাবে।'

মকবুল বলল, 'বদলাব তো ধলাকর্তা কিন্তু টাকা কই ? মনে কতই তো সাধ—, একটা গাই কেনব, ভালো একখান নাও কেনব—কিন্তু টাকা কই ?'

রাজমোহন গলা নামিয়ে বললেন, 'টাকা তোব নিয়া আইছি।'

মকবুল চোখ তুলে তাকাল, 'কি কইলেন ?'

রাজমোহন বললেন, 'আয, তোর সাথে কথা আছে আমার। [illegible]ইয়া কই !'

চৌকি ছেড়ে উঠানে নেমে দাঁড়ালেন বাজমোহন।

কিন্তু মকবুল উঠতে চায় না। বলল, 'কয়ন কর্তা, যা ক'বাব এখানেই কযন। নাই কেউ এখানে।'

রাজমোহন সেকথা শুনলেন না। ওব হাত ধ'রে প্রায টানতে টানতে আডালে নিয়ে গেলেন।

চাবদিকে জল, চারদিকে জঙ্গল, তিনদিকে খাল, একদিকে নদী। আশে পাশে দূবে দূবে আরো খানকযেক মুসলমান-বাড়ি আছে। [illegible] জল উঠেছে। আর কোন বাড়ি জলেব ওপবে জেগে রয়েছে। এক একটি বাডি যেন এক একটি দ্বীপ। পূ[illegible]-দক্ষিণ কোণে ছোট একটা বাঁশেব ঝাড। সেখানে এসে দাঁডালেন রাজমোহন।

মকবুল বলল, 'ব্যাপার কি ধলাকর্তা ? কি কবেন, কইযা ফেলেন।'

রাজমোহন ট্যাঁক থেকে মকবুলের দেওয়া কালকের সেই নোটগুলি বের করলেন। সেই সঙ্গে আর একখানা নতুন পাঁচ টাকার নোট। মকবুলের দিকে টাকাগুলি বাড়িয়ে ধরে বললেন, 'গুইনা নে। মোট পঞ্চান্ন টাকা আছে। পাঁচ টাকা তোর ছাওয়াল-মাইয়ারে আমি মিষ্টি খাইতে দিলাম।'

রাজমোহনের বক্তব্যটা কি, তা মকবুল অনেক আগেই টের পেয়েছে। খানিকক্ষণ স্থিব দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বইল মকবুল। চোখ দুটো ভালো নয় মকবুলের। কেমন যেন লালচে লালচে। একটু পিছিয়ে গেলেন বাজমোহন। তিরিশ-বত্রিশ বছবের জোয়ান পুরুষ—গায়ের বং ঘোর কালো। যেন আস্ত একটি গাব গাছ। মাথায় তাঁর চেয়ে লম্বা। খুব চওড়া নয়. কিন্তু শক্ত চোয়াড়ে-চোয়াড়ে হাত পা। মাথায ঝাঁকডা কালো চুল। মুখে আবাব শখ ক'রে চাপ-দাড়ি রেখেছে মকবুল। তাতে ঠিক একটা জন্তুর মত হযেছে দেখতে।

রাজমোহনকে পিছিয়ে যেতে দেখে মকবুল একটু হাসল, 'ডরাইলেন নাকি ধলাকর্তা ! ডরাইবেন না। শত হইলেও আপনি বুড়া। এ মুল্লুকের মানী-জ্ঞানী মানুষ। আপনারে কি আমি অপমান কবতে পারি ? কিন্তু ও টাকা আপনে ফিরাইয়া নিয়া যায়ন। আমার ছাওয়াল-মাইয়া মিষ্টি খায় না। খাইলে তাগো প্যাটে কিরমি হয়, প্যাট কামড়ায়, আপনে বাড়ি যায়ন ধলাকর্তা। খাট আমি ফেরত দেব না।'

অপমানে রাজমোহনের মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠলো। রোমশ কান দুটো পুড়ে যেতে লাগল। টাকাগুলি ট্যাঁকে ফের গুঁজে রাখতে রাখতে রাজমোহন বললেন, 'আইচ্ছা, কিন্তু কথাটা মনে রাইখো

মকবুল শেখ, মনে রাইখো। পাকিস্তান পাইচ বইলা যে, সকলেই লাট হইয়া গেছ, তা ভাইবো না, ভাইবো না এক মাঘেই শীত যাবে।'

রাজমোহন চলে গেলে ফতেমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে বলল, 'হইছে কি ? ধলাকর্তা অমন রাগারাগি করলেন ক্যান্ ?'

মকবুল বলল, 'আর ক্যান্ ! খাট বিক্রি কইরা আবার সেই খাট ফিরাইয়া নিতি আইছেন। টাকা সাধাসাধি করতি আইছেন।'

ফতেমা বলল, 'কাণ্ড দ্যাখ। তা কি কইলা তুমি ?'

মকবুল হেসে বলল, 'পায়ে ধইরা কইলাম, ধলাকর্তা, যদি পছন্দ হয়, পালং-এর বদলে আমার বিবিরে নিয়ে যায়ন।'

ফতেমা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আউ আউ আউ। বুড়া মানুষডারে তুমি অমন কথা কইতে পাবলা ? শরম করল না ?'

মকবুল মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগল।

ফতেমা এবাব বুঝতে পারল, মকবুল তাকে ক্ষেপাবাব জন্যেই এসব কথা বলছে। ধলাকর্তার সঙ্গে তার মোটেই এ ধরনের কথাবার্তা হয়নি।

ফতেমা এবার বলল, 'কিন্তু মাইয়া-মানুষই যদি সব মেঞা, মাইয়ামানুষ থাকলে যদি তোমাগো আর কিছুই না লাগে, তাইলে পালং পালং কইবা তুমিই বা অস্থির হইছ ক্যান্। দিয়া দাওনা ধলাকর্তার পালং ধলাকর্তারে। উনি মানুষ তো সোজা না। ভালো না করতে পারেন, মন্দ করলে ঠ্যাকায় কেডা ? ছাওয়ালপান লইয়া ঘব কবি, যাই কও, আমার কিন্তু বুকের মদ্যি কাপে।'

মকবুল স্ত্রীব দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাপুক বিবি, কাপুক। তোমাগো বুক কাপবার জন্যেই হইছে, কাপলেই সোন্দর ঠেকে।'

আঁচলটা বুঝি একটু সবে গিয়েছিল, ফতেমা তাডাতাডি বুকেব ওপর তাকে ভালো ক'বে টেনে দিয়ে একটু সরে দাঁড়িয়ে লজ্জিতভাবে বলল, 'তোমাব সাথে কথা কওযার জো নাই। আর ও দুইডা চউখ তো না যেন—'

উপমাটা হঠাৎ ফতেমার মুখে যোগাল না।

কিন্তু মকবুল ওব কথাব ভাব বুঝতে পেবে হেসে বলল, 'পুরুষ মাইনষেব চউখ, জুয়ান মাইনষের চউখ ওই রকমই হয বিবি। এতো আর ধলাকর্তার ছানিপড়া চউখ না, এ চউখেব ধরনই আলাদা। দুনিয়ার অন্যায় অবিচাব দেখলে রাঙ্গা হয়, আব দুনিয়ার সোন্দব জিনিস দেখলে এ চউখে বঙ ধরে।'

দিন দুই বাদে সন্ধ্যার পবে রাজমোহনেব বাড়িতে ডাক পডল মকবুলের। উত্তর ঘরের চওড়া বারান্দায় পাশাপাশি দু'টি সতরঞ্চি পাতা। একটি মুসলমানদের জন্যে আর একটি হিন্দুদের। মাঝখানে তামাকের ডিবা, আগুন-মালসা, গুটিতিনেক ছোট বড হুঁকো, দু'টি হিন্দুব একটি মুসলমানের।

পাড়ায় বর্ণহিন্দু বলতে আর কেউ নেই। যাবা আছে, তারা সবাই কৃষ্ণবর্ণ। শরৎ শীল, মুরারি মণ্ডল, ফটিক কর্মকাব, নিবারণ রজক, এরা সকলেই রাজমোহনের অনুগৃহীত। অনেক সময় অনেক উপকার পেয়েছে। আর মুসলমানদের দলে আছে ছদন মৃধা, বদন সিকদার, গেদু মুন্সী।

মকবুল এসে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে গেদু মুন্সী মুরুব্বিব সুবে বলল, 'কাজটা তুমি ভালো কর নাই শেখের পো, দেশ ছাইড়া সব হিন্দু মশাইবা চইলা গেছেন। কিন্তু ধলাকর্তা আমাগো মায়া ছাডেন নাই, তিনি আমাগো জড়াইয়া ধইরা আছেন। এখনো আমরা তানার জমি চষি, তানার বাড়িতে বসি, আপদে-বিপদে তানারে ডাকি। তুমি ধলাকর্তাব জিনিস ধলাকর্তারে ফিরাইয়া দাও গিয়া।'

মকবুল বলল, 'এমন অন্যায় কথা আমারে কবেন না, মুন্সী সাহেব। ধলাকর্তা নিজের হাতে তানার খাট আমারে দইরা দিছেন, নিজের মুখে বিক্রি কইরা দিছেন। টাহা নিছেন আমার কাছ থিকা। ওই ইয়াকুব চকিদার তাব সাক্ষী। এখন ওই খাট উনি আর ফেরত চায়ন কি বইলা ?'

রাজমোহন বড একখানা জলচৌকিতে গম্ভীরভাবে বসে ছিলেন। ডানদিকে একটা হ্যারিকেন

জ্বলছে। তার ফিতেটা আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে চড়া গলায় বললেন, 'টাকা নিছি ? ওই পালং-এর দাম পঞ্চাশ টাকা হয় ? তুই কইলেই হইল ?'

মকবুল বলল, 'আপনি তখন তাই কইছিলেন, ধলাকর্তা। তাছাড়া শক্তি বুইঝা জিনিসের দাম। পঞ্চাশের বেশি দেওয়ার আমার শক্তি নাই। আমি পঞ্চাশ দিয়াই নিছি।'

শরৎ শীল বলল, 'এ তো আর একটা কথার মত কথা হইল না মকবুল, তোমার শক্তি নাই, আর একজনের আছে। তুমি হয় আর একশ ধলাকর্তারে গুইনা দাও, নইলে পালং নিয়া আইস।'

হিন্দুরা ঘাড় নাড়লেও মুসলমানরা একথায় কোন উচ্চবাচ্য করল না। হাতে হাতে হুঁকো ঘুরতে লাগল। কিন্তু সমস্যার কোন মীমাংসা হল না।

মকবুল স্পষ্টই বলল, 'এই যদি আপনাগো বিচার হয়, এ বিচার আমি মানতে পারব না। টাকা দিয়া জিনিস কিনা, জিনিস আমি ফেরত দেব না। আপনারা দেওয়ানী করেন, ফৌজদারী করেন, যা ইচ্ছা করেন গিয়া।'

গেদু মুন্সী ধমক দিয়ে বলল,'যা যাঃ ! ছোট মুখে বড় কথা ! বাড়ি গিয়া ভাইবা দেখ গিয়া, বিবির সাথে শলা-পরামর্শ কর গিয়া বাইত ভইরা। তারপর কাইল আইসা যা কবার কইস।'

মকবুল চলে গেলে গেদু মুন্সী আর ছদন মৃধা রাজমোহনকে প্রবোধ দেওয়ার সুরে বলল, 'আপনি ভাববেন না ধলাকর্তা ! ও অমন গোয়ার-গোবিন্দ মানুষ। পাড়ার কেডা ওযারে না চেনে ? ও কি কাউর কথার বাধ্য ? দেখি, বুঝাইয়া শুঝাইয়া। খাট নিয়া ও যাবে কোথায় ? আপনার খাট হজম করবে ওয়াব সাধ্য কি ? কিন্তু আপনেও রাগেব মাথায় বড় কাঁচা-কাজ কইরা ফেলছেন ধলাকর্তা। আপনেও আর আমাগো কথা কওয়ার মুখ রাখেন নাই।'

মুন্সী আব মৃধার সঙ্গে আর সবাই একে একে বিদায় নিল। শরৎ বলল, 'সব মেঞাই একজোট হইছে বোঝলেন ধলাকর্তা ! তলে তলে সকলেরই সায় আছে। নইলে মকবুল শেখের সাধ্য কি আপনাব মুখের পর বলে যে, বিচার মানব না। চুপ কইরা থাকেন ধলাকর্তা, সইয়া যায়ন, সইযা যায়ন। যখন যেমুন তখন তেমুন। আপনার তো একখানা খাট। বাড়িঘব, জমিজোত কত জনে জলেব দামে বিকাইয়া দিয়া গেছে না ? তাতে কি হইছে ? তাতে কি তারা মইরা গেছে ? মবে নাই। আপনে একখানা খাটের জন্যে আর মইরা যাবেন না, আপনি ইচ্ছা কবলে এখনো অমন পাঁচখানা খাট কিনা ঘর বোঝাই করতে পারেন, তা আমরা জানি না ? যায়ন ঘরে য়্যায়ন, রাইত হইয়া গেছে ঘরে যায়ন।'

আর এক ছিলিম তামাক টেনে শরৎ শীলও বিদায় নিল।

হ্যারিকেনটা বড চোখে লাগছে। আলো নিবিয়ে দিয়ে রাজমোহন অন্ধকারে চুপ ক'বে বসে রইলেন। পূবেব ঘরের বারান্দায় মাদুর পেতে কালু এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। সাবা বাড়ি, সারা পাড়াটাই নিস্তব্ধ। কোথাও আর কোন শব্দ নেই, বড় একা, একা রাজমোহন। সমস্ত অপমান তাঁকে একা একাই হজম করতে হবে। কোন উপায় নেই, কোন উপায় নেই। ভারি অসহায় বোধ করতে লাগলেন রাজমোহন। এই সময় যদি হারামজাদাটা বাড়ি আসত, যদি এসে তাঁর পাশে দাঁড়াত, তিনি কত বল পেতেন ! কিন্তু সে আসবে না। তাকে রাজমোহন আসতে লিখবেনও না। সে যেখানে আছে সেখানেই থাক, বউ ছেলে নিয়ে সুখে থাক।

বাপ-বেটায় কত মনোমালিন্য হয়, কত ঝগড়াবিবাদ হয়, তাঁদের মধ্যে তো তা হয়নি ! তবু সে দূরে স'রে গেছে। তার শিক্ষাদীক্ষা রুচি-প্রবৃত্তির সঙ্গে রাজমোহনের মিল নেই। রাজমোহন যা ভালোবাসেন, সে তা বাসে না। যে জমি-জায়গা, ভিটে-মাটি, ধান-পাট, গাছ-পালা রাজমোহনের কাছে প্রাণের চেয়েও বড়, তার কাছে তা তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ। সে দেশ চিনল না, দেশের মানুষ চিনল না। চেনার মধ্যে চিনেছে শুধু চাকরি আর শুকনো একগাদা বই। চোখের পাতা বুজে মানুষের কথা, মানুষের মানে সে বইয়ের পাতায় খুঁজে বেড়ায়। না, তার সঙ্গে কোন মিল নেই রাজমোহনের। পাকিস্তান হওয়ার আগেই সে স্থানান্তরী, দেশান্তরী হয়েছে। রাজমোহন আর সে এখন দুই ভিন্ন দেশকালের মানুষ।

জোলো হাওয়া দিচ্ছে। বাড়ির দক্ষিণ সীমান্তে দেবদারু গাছটার পাতা সেই হাওয়ায় অল্প অল্প

নড়ছে। কত বড় হয়েছে দেবদারু গাছটা ! রাজমোহন নিজের হাতে পুঁতেছিলেন এই গাছ। ঠিক সুরেনের বয়স গাছটার। সুরেনের মতই গাছটা রাজমোহনের চোখের সামনে বেড়েছে। কিন্তু তাঁর সমুখ থেকে সরে যায় নি।

'অনেক আপন, সে শত্তুরের চাইয়া, তুই আমার অনেক আপন দেবদারু। তোর হিন্দুস্থান-পাকিস্তান নাই। লেখাপড়া শিখা তুই পর হইয়া যাইস নাই। তুই আমার মতই ভিটামাটি আকড়াইয়া রইছিস। তোর মত আপন আমার কেউ না, সংসারে কেউ না।'

এই দেবদারু গাছটাকে কতজনে চেয়েছিল। একুশ টাকা পর্যন্ত দাম উঠেছিল গাছটার ! রাজমোহন দেননি। বলেছেন, 'আমি কিনি আমি বেচি না।'

জীবনে কিছুই বিক্রি করেননি রাজমোহন। শুধু একটা জিনিস ছাড়া। বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল বাজমোহনেব। কেন করলেন—কেন বিক্রি করলেন পালঙ্কখানা ? হঠাৎ তাঁর এ কী মতিভ্রম হল ! জিনিসটা আর কি তিনি উদ্ধার করতে পারবেন না ? এতজনের এত জায়গা-জমি তিনি উদ্ধার ক'রে দিয়েছেন, আর ভুল ক'রে বিক্রি করা নিজের জিনিসটা তিনি উদ্ধার করতে পারবেন না ! নিশ্চয়ই পারবেন। তাঁকে পাবতেই হবে।

কিন্তু উদ্ধার করা সহজ হল না। মকবুলকে জব্দ করবার কোন ছিদ্র খুঁজে পেলেন না রাজমোহন। ও তাঁর ভিটে-বাড়ির প্রজা নয়, কোন টাকাকড়ি ধাব নেয়নি। একটা মিথ্যা মামলামোকদ্দমায় ওকে জড়িয়ে দেওযাও যুক্তিসঙ্গত মনে হল না। পাকিস্তানের আমলে ওর বিরুদ্ধে সাক্ষী মিলবে না। তাছাড়া মাতব্বর মুসলমানেরা ক্ষেপে উঠবে।

কিন্তু বড়বকম কোন শত্রুতা না কবতে পাবলেও মকবুলের ছোটখাট অনিষ্ট করতে ক্ষান্ত রইলেন না রাজমোহ[illegible] কাছ থেকে আধসের ক'বে দুধ রোজ নিতেন, ছেড়ে দিযে ওয়াহেদের কাছ থেকে নিতে শুরু করলেন। কামলা-কিষাণ খাটাতে হলে, বাড়িব কাছে ব'লে সবচেয়ে আগে মকবুলকেই ডাকতেন, সেই ডাক বন্ধ হল।

মকবুল জাতচাষী নয়, কাবো কোন বরগা জমি চাষ করে না। কিন্তু দরকার পড়লে জমিতে মজুরিগিরি করে। পাটের সময় পাট কাটে, পাট ধুয়ে মেলে দেয় ; ধানের সময়ও দলের সঙ্গে মিলে ধান কাটতে যায়। যখন শস্যেব কোন কাজ থাকে না, ঘরামিগিরি করে, জ্বালানিব জন্যে অন্যের বাড়ির জঙ্গল পরিষ্কার কবে, কাঠ চেলা ক'রে দেয়। এ সব কাজের জন্য রাজমোহনের বাড়িতে মকবুলেরই আগে ডাক পড়ত। কিন্তু এখন থেকে তিনি ওকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে, সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে চলতে লাগলেন। হিন্দুবা বেশির ভাগ গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ায় মকবুলের কাজকর্ম এমনিতেই কমে গিয়েছিল। রাজমোহনেব এই শত্রুতায় তা প্রায় বন্ধ হবার জো হল। মুসলমানপাড়ায় কামলা-কিষাণের চাহিদা কম। অবস্থাপন্ন ঘরের লোকও নিজের হাতেই প্রায় এসব কাজ সেরে নেয়। কাজের অভাবে মকবুল ভারি অসুবিধায় পড়ল।

কালুর কাছেই সব খোঁজখবব পেতে লাগলেন রাজমোহন। ডিঙি-নৌকায় তাঁকে কুমারপুরে পৌঁছে দিতে দিতে কালু বলল, 'ধলাকর্তা, আইচ্ছা জব্দ হইছে শেখের পো ! হাতে না মাইরা ওয়ারে ভাতে মারবার জো করছেন আপনে। আপনার সাথে টেক্কা দিয়া ও পাববে ক্যান ? আপনাব এক দাঁতের বুদ্ধি রাখে নাকি ও ?'

রাজমোহন তোবড়ানো গালে খুশি হয়ে হাসেন, 'তবু তো দাঁত আমার নাই কালু। সবগুলিই প্রায় পইড়া সারছে।'

কালু আশ্বাস দিয়ে বলে, 'যা আছে তাই যথেষ্ট ধলাকর্তা। আপনার খালি মাড়ির চোটেই ও অস্থির হইয়া ওঠবে।'

অস্থিরতা মকবুলের মধ্যে সত্যিই দেখা দেয়। স্ত্রীর কাছে কঠিন শপথ ক'রে বলে, 'দেখি আর দুই চাইরডা দিন। শালার বুইডারে আমি খুন করব। ওয়ার চউখের সামনে লুইটা পুইটা নেব।'

ফতেমা শঙ্কিত হয়ে বলে, 'খবরদার, খবরদার, অমন কামও কইরো না, অমন কথাও ভাইবো না মনে।'

মকবুল বলে, 'ক্যান ভাবব না ? জেল হবে, ফাঁসী হবে ? হউক, একজনের পেছনে না হয় আর একজন যাব।'

ফতেমা বলে, 'কিন্তু আমরা যে পইড়া থাকব। আমরা যাব কোথায় ? খবরদার, অমন কামও কইরো না। রক্ত অত গরম কইরো না। বোঝলা ? ছাওয়াল হইছে, মাইয়া হইছে, মাথা এখন ঠাণ্ডা কইরা চল। ওয়াগো খাওয়াইয়া পরাইয়া বাঁচাও। তয় তো বুঝি ক্ষমতা। তয় তো বুঝি তুমি পুরুষেব মত পুরুষ।'

মকবুল বলে, 'হুঁ।'

ফতেমা বলে, 'হুঁ না। অমন লাফাইয়া-ঝাপাইয়া সর্দারি খেলাইতে তো সকলেই পারে। তার মধ্যে আর কেরামতি কি ? আসল কেবামতি পোলাপান মানুষ করায়, পোলাপান বাচাইয়া রাখায়, দেখছ ওয়াগো চেহারা ? শুগাইয়া শুগাইয়া কি দশা হইছে ওয়াগো, দেখছ ? আমার সোনার সবদুল আর মজনুর দিকে একবাব চাইয়া দেখ।'

রোগা হাড়-বের-করা ছেলেমেয়ে দুটিকে পবম স্নেহে কাছে টেনে নেয় ফতেমা। আস্তে আস্তে গায়ে মাথায় হাত বুলাতে থাকে। ওদেব খাদ্যের অভাব যেন শুধু স্নেহ দিয়েই মেটাবে। স্বামীব দিকে তাকিয়ে ফতেমা আবার বলে, 'দ্যাখ, চাইয়া দ্যাখ !'

ছেলেমেয়েদের দিকে না চেয়ে স্ত্রীর মুখের দিকেই ক্রুদ্ধভাবে তাকায মকবুল, রুক্ষ চড়া গলায বলে, 'ক্ষ্যাপাইয়া দিস না ফতি, আমারে ক্ষ্যাপাইয়া দিস না। আমার মাথায় খুন চড়াইস না।'

ফতেমা স্বামীর হাত ধ'বে বলে, 'না, খুনাখুনির কাম নাই, আমার কথা শোন। ধলাকর্তাব পালং ধলাকর্তারে ফিবাইয়া দিয়া আইস। কি হবে খাট-পালং-এ। প্যাটে যদি দুইডা ভাত থাকে, চাটাই পাইতা শুইয়াও সুখ। তাতেও ঘুম আসে।'

স্ত্রীর মুঠো থেকে বাগ ক'বে হাত ছাড়িয়ে নেয় মকবুল, তারপব আবক্ত চোখে বলে, 'খববদার ফতি, অমন কথা কবি না, মুখ গুতাইয়া ভাইঙ্গা ফেলব। আব বারবার ধলাকর্তার পালং— ধলাকর্তার পালং কবিস না আমাব সামনে। ও পালং আর ধলাকর্তাব না, ও পালং আমাব গাইটেব টাহা দিযা আনছি আমি। চুবি কইবা আনি নাই, ডাকাতি কইবা আনি নাই। নিজের রোজগাবেব টাহা দিয়া ঘরে আনছি পালং। এ জিনিস আমারই। বুঝলি ?'

এগিয়ে এসে পালংখানার একটা পায়া আঁকড়ে ধরল মকবুল। যেন ওর ঘব থেকে জিনিসটা কেউ কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে।

একটু বাদে বালিকাচায দা'খানা ধার দিয়ে কাজের খোঁজে বেবিয়ে পড়ল মকবুল। কোথাও কাজ মিলল না। গরীব চাষী মুসলমানের গ্রাম। সকলের অবস্থাই প্রায় এই বকম। কে তাকে কাজ দেবে ? মকবুল আক্রোশে অধীর হয়ে বেড়াতে লাগল। ধলাকর্তাকে সত্যি সত্যি খুন করবাব সাহস হল না, তাঁর বাড়িতে ডাকাতি করবারও সাহস হল না। শুধু দিনকয়েক ফাঁকে ফাঁকে চুরি ক'রে বেড়াতে লাগল। ঘব থেকে নয়, বাগান থেকে এককাঁদি পাকা সুপুরি চুরি করল, দুটো ডাব নারকেল চুরি করল।

রাজমোহন টের পেয়ে বাড়ির সীমানায় দাঁড়িয়ে খিস্তি ক'বে গালাগাল করলেন, থানা-পুলিসের ভয় দেখালেন, মুরারি মণ্ডলের ছেলে মুকুন্দকে কিছু পযসা কবুল করে সারাদিনের জন্যে বাড়িতে পাহারার বন্দোবস্ত করলেন।

সুপুরি চিবিয়ে আর ডাব নারকেলের জল খেয়ে তো আর পেট ভরে না। মকবুল ভারি ফাঁপরে পড়ে গেল। বর্ষার এই সময়টাই সব বছরই কষ্টে কাটে। কাজকর্ম থাকে না, রোজগারপত্রও থাকে না। ধান চাল তেল ডালের দাম আক্রা হয়। কিন্তু এবার যেন কষ্টের মাত্রা সব চেয়ে বেশি। পাটের খন্দ শেষ হয়েছে। ধানের খন্দ এখনো আসেনি। এই সময় সকলেই বেকার। থৈ থৈ বর্ষা। সকলেরই ঘরে জল, বাড়িতে জল। হাঁড়িতে চাল নেই। সকলেরই কষ্ট। তার মধ্যে মকবুলের কষ্ট সবচেয়ে বেশি। দু'চার টাকা যা সঞ্চয় করেছিল, পালঙ্কের পিছনে গেছে। এখন হাত একেবারে খালি, পেট একেবারে খালি। পিঠের সঙ্গে তার দিনরাত মিতালি। ছেলেমেয়েগুলি দাপাদাপি করে, বউ-এর ঝগড়ার চোটে বাড়িতে টেঁকা যায় না। নিজের ছেলেমেয়েদের খাদ্য নিজেই যোগাড় করে

ফতেমা। দু' মুঠো ক্ষুদের সঙ্গে একরাশ শাপলা সিদ্ধ করে, কোনদিন বা একঝাঁকা কচু। আঁচল দিয়ে খালের ঘাট থেকে টাকিব পোনা ধরে, চিংড়ি মাছ ধ'রে আনে।

এর মধ্যে ধলাকর্তার চাকর কালু এল একদিন খবর নিতে, 'কি মকবুল মেয়া, আজ কেমন ?'

মকবুল ভ্রূ কুঁচকে বলল, 'বেশ আছি। বড় মাইনষের বড় চাকর, তুই আছস কেমন ?'

কুশল প্রশ্ন আদান-প্রদানের পর কালু আসল কথা পাড়ল, 'পঞ্চাশের ওপর ধলাকর্তা আরো দশ টাকা তোমারে বেশি দিতে বাজী হইছে মকবুল। তানাব পালং তানারে তুমি দিয়া দাও গিয়া, অবুঝ হইও না। বোঝলা ?'

মকবুল তেড়ে প্রায় মারতে এলো, 'আমি তো বুঝছিই, তোরে এবার জন্মের বুঝ বুঝাইয়া ছাড়ব। নাম্, নাম আমাব বাড়িগুনা। ফের যদি অমন কুপেরস্তাব নিয়া আসবি, ঠ্যাং বাইড়াইয়া ভাঙব, কইয়া দিলাম তোরে।'

তাড়া খেয়ে কালু পালাল তো এলো ছদন মৃধা, এলো গেদু মুন্সী। আড়ালে ডেকে নিয়ে সকলেই একই কথা বলে। পালংখানা বিক্রি ক'রে দিক মকবুল। ধলাকর্তা জানতেও পাবরে না, আর জানলেই বা কি ? পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনেছে তো মকবুল, ছদন মৃধা পঁয়ষট্টি দেবে। গেদু মুন্সী উঠল পঁচাত্তরে। কিন্তু মকবুল ঘাড় নাড়ল। পালং সে বিক্রি করার জন্যে কেনেনি, নিজে ব্যবহার করবার জন্যে এনেছে। পালঙ্কের দর দু'চাব পাঁচ টাকা বেড়ে বেড়ে পুরো একশতে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু মকবুল কিছুতেই গোঁ ছাড়ল না। পালঙ্ক সে বেচবে না কাউকে। বউ-ছেলে নিয়ে নিজে শোবে, নিজে ব্যবহার করবে।

গেদু মুন্সী আর ছদন মৃধা দুজনেই দাঁত কিড়মিড় ক'রে মকবুলকে অভিশাপ দিয়ে গেল, 'মর শালা, না খাইয়া শুকাইয়া মব। যাওয়ার সময় গোরে নিয়া যাইস তোর খাট।'

ফতেমাও সেদিন বিরক্ত হয়ে বলল, 'আইচ্ছা, তুমি কি! কেমুন ধাবার মানুষ তুমি! এ যদি এক বিঘা জমি হইত, বোঝতাম বছর বছব ফসল দেবে। এ যদি একটা গাই হইত, বোঝতাম বছর বছর দুধ দেবে; একটা গাছও যদি হইত, বোঝতাম বছর বছর ফল দেবে। কিন্তু একখান শুকনো মরা কাঠ, তা তুমি ঘরে বাইখা মরতে চাও ক্যান ?'

মকবুল স্থিরদৃষ্টিতে স্ত্রীব দিকে তাকাল, কিন্তু রাগ না ক'রে আস্তে আস্তে স্নেহকোমল স্বরে বলল, 'রাখি যে ক্যান মাগী, তা তুই বুঝবি না। মাইয়া মানুষ হইয়া জন্মাইছিস, তা তোর বোঝবার কথা না। ও আমাব কাছে মবা কাঠ নারে ফতি, ভারি তাজা জিনিস, ও আমাব পুরুষেব তাজ!'

ফতেমা বলল, 'এতই যদি তাজ, বাইর হও বাড়িব থিক্যা, চাকরি-বাকরি জোটাইয়া আন। শুনি এখন তো আমাগো পাকিস্তান। আমাগো মোসলমানের রাজত্ব। এখন আমবা না খাইয়া মরব ক্যান ?'

মকবুল সে খোঁজ-খববও নিয়ে দেখেছে, লেখা জানে না, পড়া জানে না— তাকে কে দেবে চাকরি ?

স্ত্রীব কথায় পরম দুঃখে, পরম নৈরাশ্যে মকবুল শুকনো ঠোঁটে একটুখানি হাসল, 'গরীবের হিন্দুস্থানও নাই, পাকিস্তানও নাই, কেবল এক গোবস্থান আছে ফতি, গোরস্থান আছে।'

দিন দুই বাদে গরুটা বিক্রি ক'রে ফেলল মকবুল। তিন-বিয়ানো গাই। আজকাল দুধ দেওয়া প্রায় বন্ধই করেছিল। ঘাস-বিচালির অভাবে শুকিযে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছিল। একেবারে ভাগাড়ে দেওয়াব চেয়ে তাকে মকবুল বেচে দিল ভিনগাঁয়ের লোকের কাছে। আর বেচল ছোট ভাঙা ডিঙিখানা। কিছু টাকা দিল ফতেমার হাতে, আব বাকি টাকায় একখানা ছই-ওয়ালা পুরনো নৌকো কিনল। কেরায়া বাইবে। সেই নৌকো নিয়ে ভোরে উঠে কুমারপুরে চলে যায় মকবুল। কোনদিন ভাড়া জোটে, কোনদিন জোটে না। আশায় আশায় ব'সে থাকে ঘাটে। বাড়ি ফেরে বাত দুপুরে। কোন দিন একটাকা পাঁচসিকে আনে। কোন দিন আসে শুধু হাতে। দেশের দিনকাল বড় খারাপ। দূরে দূরে কেরায়া যখন পায়, সবরাত্রে বাড়ি ফিরতে পারে না—ফেরে না মকবুল। ভিন্ন গাঁয়ের হাটে ঘাটে নৌকো বেঁধে ঘুমোয়।

নৌকো নিয়ে সেদিন বাইরে চলে গেছে মকবুল, ফতেমা পাঁকাটি দিয়ে উনুন জ্বেলে রান্না

চড়িয়েছে, রাজমোহন এসে উপস্থিত হলেন বাড়িতে, 'ও মকবুল, বাড়ি আছিস নাকি, ও মকবুল ?'

ফতেমা তাড়াতাড়ি বেড়ার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল, ছেলেকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'যা কর্তারে বল, সে বাড়ি নাই, নাও নিয়া বাইর হইয়া গেছে। কর্তারে পুছ কর, ওনার কি দরকার।'

কিন্তু পাঁচ বছর বয়স হ'লে কি হবে, মকবুলের ছেলে বড় হাবা। মা-বাবার সঙ্গে দু'একটা কথা যদি বা বলে, বাবুদের সঙ্গে মোটেই মুখ খুলতে পারে না। তাই আড়ালে থেকে ফতেমাকে কথাবার্তা চালাতে হল। রাজমোহন বললেন, 'কাসে বড় কষ্ট পাইতেছি। বাসকের পাতার রসে নাকি ভালো হয়। তোমাগো বাড়িতে বাসকের গাছ আছে। দুইডা পাতা নেব নাকি বউ ?'

ফতেমা হেসে বলল, 'নেবেন না ক্যান কর্তা ?—নেয়ন। দুইডা পাতাই তো, আপনি বারান্দায় বসেন, আমি আইনা দেই।'

'না না, আমিই নেব নে, আমিই নেব নে।'

ব'লে আস্তে আস্তে বারান্দায় উঠে বসলেন রাজমোহন। ব'সে ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যে তাকালেন। ব্যথায় বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। তাঁর পালঙ্ক, তাঁর পালঙ্ক ! কিন্তু কি দশাই না ক'রে রেখেছে জিনিসটার ! অমন সুন্দর সুন্দর নক্সা-করা পায়াগুলিকে তেল মেখে চুন মুছে একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে। আর উপরে সেই তেল-চিটচিটে চিত্তার ছেঁড়া কাঁথা আর বালিশগুলি। ছি ছি ছি ! এত দামী জিনিস কি ওদের ঘরে মানায় ! এ সব জিনিসের যত্ন কি ওরা জানে !

একথা-সেকথার পর রাজমোহন আসল কথা পাড়েন, 'তোমারে একটা কথা বলি বউ, রাগ কইরো না। মকবুলেরে বুঝাইয়া শুঝাইয়া কও, পালংখানা ফিরাইয়া দিক আমাবে। ও যে দাম চায়, সেই দামই আমি ওয়ারে দেব।'

বেড়ার আড়ালে ফতেমা একটুকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'না, ধলাকর্তা, ও কথা আমি তারে কইতে পারব না। আপনে বাসকপাতা নিতে আইছেন, পাতা নিয়া যায়ন। ও সব কথা কবেন না।' ব'লে ফতেমা সেখান থেকে সরে গেল।

গালে যেন একটা চড় খেলেন রাজমোহন। খানিক্ষণ চুপ ক'রে চেয়ে রইলেন পালঙ্কখানার দিকে। বাসকপাতা আব নেওয়ার ইচ্ছা ছিল না রাজমোহনের। তবু যাওয়াব সময় ছিঁড়ে নিলেন দুটো পাতা।

বারবাড়িতে পুজোর মণ্ডপ। তার মধ্যে রাধা-গোবিন্দ প্রতিষ্ঠিত। চূড়ায় শিখিপুচ্ছ, হাতে মুরলী, বামে চিরসঙ্গিনী রাধিকা। ব্রজমোহন রসরাজ শ্রীগোবিন্দ স্মিতমুখে চেয়ে রয়েছেন। স্নান ক'রে এসে সেই মণ্ডপের সামনে খানিকক্ষণ বসে রইলেন রাজমোহন। ধ্যানমন্ত্র জপ ক'বে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বললেন, 'দয়াল, আমার সব মায়ার বন্ধন কাটাও, আমারে তোমার বৃন্দাবনের পথে নিয়া চল। তোমার ব্রজের রাঙ্গা ধূলায় আমার কামনা-বাসনা, আমার লাঞ্ছনা-অপমান ঢাইকা যাউক।'

মনে হল, সবই বুঝি গেল। কিন্তু গেল কই ? পরদিন ফের রাজমোহনের বাসকপাতার দরকার পড়ল। চাকরের সামনে ইচ্ছা ক'রে জোরে জোরে কাসির অভিনয় করলেন। বাসকপাতা না হ'লে আর চলে না।

ধলাকর্তার সাড়া পেয়ে আজ কিন্তু ফতেমা আর ঝাঁপের আড়ালে এসে দাঁড়াল না, কথা বলল না। দূরে এক কোণে লুকিয়ে রইল। কি জানি, আজ যদি আবার ধলাকর্তা পালঙ্কের কথা পেড়ে বসেন। রাজমোহন সে কথা বুঝলেন। বাসকগাছ থেকে আজও দুটো পাতা ছিঁড়ে নিলেন। তারপর যাওয়ার সময় ফের এসে বসলেন বারান্দায়। আর কাউকে না পেয়ে মকবুলের ছেলে সবদুলের সঙ্গেই আলাপ করতে শুরু করলেন। চোখ দুটো নিজের শাসন মানল না। বেড়ার ফাঁক দিয়ে পালঙ্কখানার দিকে তাকাতে লাগল। মকবুলের বাসকগাছ প্রায় নিষ্পত্র হবার জো হল। কিন্তু রাজমোহনের কাসি আর সারে না, আসা আর বন্ধ হয় না।

একদিন রাত্রে ফিরে এসে মকবুল স্ত্রীকে বলল, 'শুনি কি ? ধলাকর্তা নাকি রোজ আসা ধরছেন। আইসা এই বারান্দায় বইসা থাকেন ?'

ফতেমা বলল, 'হ, বাসকপাতা নেওয়ার জন্য আসেন।'

মকবুল হেসে বলল, 'দূব দূব। ঘোড়ার ডিম। তোবে দেখতে আসেন। তোব চান্দমুখ বুড়াব মনে ধবছে।'

ফতেমা বাগ ক'বে বলল, 'কি যে কও।'

মকবুল বলল, 'তাইলে আসল কথা কইয়া ফেল।'

ফতেমা বলল, 'কব আবাব কি? আসল কথা তুমিও জান, আমিও জানি।'

মকবুল বলল, 'তা তো বোঝলাম। কিন্তু খববদাব, খববদাব। টাকা-পযসাব লোভে পাছে বাজী হইস, কথা দিয়া ফেলিস। তাইলে আব আস্ত বাখব না।'

ফতেমা বলল, 'ক্ষ্যাপছ? পালং-এব কথা ওঠাবে বইলাই তো আমি তাব কাছ দিয়া ঘেঁষি না। কিন্তু বুইড়াব নজব বড খাবাপ। যতক্ষণ থাকে, বেড়াব ফাঁক দিয়ে চাইয়া চাইয়া দেখে। আমাব ভালো লাগে না। যাই কও, বুকেব মধ্যে কাঁপে। পোলাপান নিয়া ঘব কবি। কি হইতে কি হবে। মানুষেব নজবে বিষ আছে।'

মকবুল হেসে বলল, 'দূব দূব। ওই ছানিপড়া চউখেব নজবে কিছু হবে না। ও বিষ ধোড়া সাপেব বিষ। তাতে মানুষ মবে না। তুই শান্ত হইয়া ঘুমা আইচ্ছা, কাইলই আমি বুইড়াবে কইয়া দেব আমাব বাডি মুকসুম যেন আব না হয। হইলে পাও বাইডাইয়া ভাঙব।'

কিন্তু মকবুলেব নিষেধ কববাব দবকাব হল না। দিন দুই বাদেই বাজমোহন জ্বব আব বক্ত আমাশযে অসুস্থ হযে পডলেন। বিছানা ছেডে আব উঠতে পাবেন না গাঁযেব ডাক্তাব এলো চিকিৎসা কবতে, বলল, 'বাযমশাই আপনাব ছাওযাল-বউবে একটা চিঠি দেযন। বুডা বযসে বোগটা তো ভালো না।'

বাজমোহন মাথা নেডে বললেন, 'না ডাক্তাব, এখন না। খবব দেওযাব সময হইলে আমি তোমাকে কব। অফিসে নাকি তাব প্রমোশনেব কথা চলতেছে। এখন ছুটি নিলে সেডা আব হবে না। এখন যাউক

অসীমাব নামে অন্য তহবিল থেকে টাকা নিযে পুবো দুশোই পাঠিযে দিযেছেন বাজমোহন। পঞ্চাশ টাকায পালঙ্ক বিক্রি হওযাব কথা কি আব বউ বিশ্বাস কববে? ভাববে, বাকি টাকা শ্বশুব ভেঙে খেযেছেন। ডাক্তাব বোজ যাতাযাত কবতে লাগল। কিন্তু অসুখ বেডেই চলল।

এদিকে মকবুলও বড বিপদে পডে গেল। হাটেব দিন বাত্রে নওপাডাব ঘাটে মাদাবগাছেব সঙ্গে নৌকো শিকল দিযে আটকে বেখে উপবে হাট কবতে নেমেছিল, এসে দেখে নৌকা নেই। তালা ভেঙে নৌকো চুবি ক'বে নিযে গেছে নওপাডা চোবেব জাযগা গেদু মুন্সীব শ্বশুববাডিও ওইখানে তাব সঙ্গে বড বড চোবেব সাট। বুঝতে কিছুই বাকী বইল না মকবুলেব। আব এক জনেব নৌকায কোনবকমে বাডি ফিবল। পবদিন থেকে সেই আগেব অবস্থা, আগেব চেযেও খাবাপ। এখন আব গক নেই, নৌকো নেই, কিচ্ছু নেই। এখন বিক্রি কবাব মত আছে শুধু একখানা ঘব আব ঘবজোড়া একখানা পালঙ্ক।

শুযে শুযে সব খববই শুনলেন বাজমোহন। শবৎ শীল এসে বলল, 'হবে না! আপনাব সঙ্গে শত্রুতা কবতে গিযেছিল, তাব শাস্তি পাবে না ধলাকর্তা?'

দিন কযেক বাদে কালু এসে সেদিন চুপে চুপে আব এক খবব দিল, 'ধলাকর্তা, শোনছেন নাকি?'

বাজমোহন আস্তে আস্তে বললেন, 'কি?'

কালু বলল, তালাকান্দাব আতাজদ্দি শিকদাবেব কাছে নাকি মকবুল পালংখানা বিক্রি কইবা দেবে। আতাজদ্দি নতুন দালান উঠাইছে। সেই দালান সাজাবে পালং দিয়া।'

বাজমোহন নিস্পৃহভাবে বললেন, 'সাজাউক।

কালু বলল, 'দেডশ টাকা নাকি দব ওঠছে।'

বাজমোহন বললেন, 'উঠুক।'

কালু বলল, 'আইজ সন্ধ্যাব পব আতাজদ্দি নাকি নিজেই নাও আব টাকাব থইলা নিযা আসবে।'

বাজমোহন পাশ ফিবতে ফিবতে বললেন, 'আসুক।'

সন্ধ্যার একটু আগে কালু ধলাকর্তার কাছ থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে ছুটি নিয়ে গেল। পাশের গাঁয়ে মোল্লাদের বাড়িতে শখের থিয়েটার হবে। পালার নাম 'মীরকাশেম'। গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে লোক আসবে। আগে না গেলে কালু জায়গা পাবে না বসতে।

সন্ধ্যার পর বুবী ঝি পথ্যের বাটি রেখে গেল সামনে। রাজমোহন সে পথ্য মুখে তুললেন না। রাত বাড়তে লাগল, অন্ধকার গাঢ় হতে লাগল, সমস্ত গ্রাম নিঝুম হয়ে এল। রাজমোহন কেবল এপাশ ওপাশ করতে লাগলেন। চোখে ঘুম আর আসে না।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন রাজমোহন। দুর্বলতায় পা কাঁপছে। হাতড়ে হাতড়ে লাঠিগাছটা তুলে নিলেন। কোমরের তাগায় চাবি বাঁধা। সেই চাবি দিয়ে ঘরের তালা আটকালেন। বাইরে এসে দেখলেন আকাশে ঘন মেঘ। টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কিন্তু ছাতা কি হ্যারিকেন নেওয়ার জন্যে ফের আর ঘরে গেলেন না রাজমোহন। লাঠিতে ভর দিয়ে পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে এগুতে লাগলেন।

মিনিট পনের বাদে মকবুলের উঠানে দাঁড়িয়ে রাজমোহন ক্ষীণস্বরে হাঁক দিলেন, 'মকবুল, এই হারামজাদা, বাহির হ', ঘরের থিকা বাইর হ'।'

মকবুল ঘরের ঝাঁপ খুলে উঠানে এসে দাঁড়াল, 'কেডা?—ধলাকর্তার গলা না? ধলাকর্তা নাকি?'

রাজমোহন দুর্বল জড়িত স্বরে বললেন, হ আমি। পালংখানা তুই বেইচা ছাড়লি হারামজাদা? আমারে না জানাইয়া বেইচা ফেললি?

মকবুল অন্ধকারে মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'কেডা কইল আপনারে?'

রাজমোহন বললেন, 'আরে তা দিয়া তুই করবি কি? এসব কথা কি গোপন থাকে? মাছিতে গিয়া কয়।'

মকবুল বলল, 'এই বৃষ্টির মধ্যে এই অন্ধকারে অসুখ নিয়া আপনি আসলেন ক্যামনে ধলাকর্তা? পার হইলেন ক্যামনে?'

রাজমোহন বললেন, 'চারের ওপর দিয়া পার হইছি।'

মকবুল বলল, 'সর্বনাশ! আসেন, ঘরে আসেন ধলাকর্তা।'

রাজমোহন বললেন, 'আর তোর ঘরে যাইয়া করব কি? তুই তো যা করবার করছিস।

মকবুল বলল, 'না ধলাকর্তা, করি নাই। আসেন দ্যাখেন আইসা।'

হাত ধ'রে রাজমোহনকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল মকবুল। গায়ে জামা নেই, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা। পায়ে জুতো নেই। পরনে নেংটির মত একখানা কানি। যে চশমা ছাড়া চলতে পারেন না, ভুলে সেই চশমাটাও ফেলে এসেছেন।

ঘরে গিয়ে মকবুল স্ত্রীকে ডেকে বলল, 'ওঠ বউ, ওঠ। উইঠা বাতি জ্বালা। ধলাকর্তাকে দেখাই।'

পালঙ্কে প্রায় মূর্ছিতার মত পড়ে ছিল ফতেমা, স্বামীর ডাকে ধড়মড় ক'রে উঠে বসল, পালঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়াল।

তারপর কেরোসিনের ডিবাটা জ্বেলে উঁচু করে ধরল পালঙ্কের দিকে। বাঁ হাতে ঘোমটাটা একটু টেনে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল ফতেমা। কিন্তু ছেঁড়া ঘোমটায় মুখ ঢাকা পড়ল না।

পালঙ্কের এক ধারে দুইটি শিশু প্রায় মড়ার মত পড়ে আছে।

রাজমোহন বললেন, 'তাইলে বেচিস নাই? আছে?'

মকবুল বলল, 'আছে ধলাকর্তা।'

'আতাজদ্দি বুঝি আসে নাই?'

মকবুল বলল, 'আইছিল। দেড়শর ওপর আরও দশ টাকা বেশি দিতে চাইছিল। তবু ফিরাইয়া দিছি। দুইদিন ধইরা উপাস ধলাকর্তা। তবু শালারে ফিরাইয়া দিতে পারছি। তবু শালার ক্ষিদার জ্বালারে ঠেকাইয়া রাখতে পারছি। বউটা কান্দাকাটি করতেছিল। কইলাম কি ধলাকর্তা, কইলাম—মাগী, আমারে আইজকার রাতখান সময় দে। অবুঝ প্যাটটারে জোর কইরা খামচাইয়া

ধইরা থাক। আইজকার মত, আমার মান বাচা, জান বাচা, রাখতে দে পালংখানা।'
রাজমোহন বললেন, 'মকবুল!'
মকবুল বলল, 'ধলাকর্তা!'
তারপর কেউ আর কোন কথা বলল না। ফতেমা ঠিক তেমনি ক'রে কেরোসিনের ডিবাটা দু'জনের সামনে ধরে রইল। আর সেই ধোঁয়া-ওঠা ক্ষীণ দীপের আলোয় মুহূর্তকাল দুই যুগের দুই পালঙ্কপ্রেমিক, দুই জাতের দুই পালঙ্কপ্রেমিক, ধলা আর কালো—দুই রঙের দুই পালঙ্কপ্রেমিক অপলকে তাকিয়ে রইল পরস্পরের দিকে।
একটু বাদে স্ত্রীর দিকে চেয়ে মকবুল বলল, 'ফতি, পোলাপান দুইডারে নিচে নামাইয়া শোয়া। আমি পালং খুইলা ধলাকর্তারে দেই।'
রাজমোহন বললেন, 'সে কি কথা, মকবুল!'
মকবুল বললেন, 'হ ধলাকর্তা, আপনে নিযা যায়ন পালং। আইজ আমি রাখলাম। কাইল যদি না রাখতে পারি?'
ব'লে মকবুল সত্যিই ছেলেমেয়ে দুইটিকে সরিয়ে নিতে যাচ্ছিল, রাজমোহন বাধা দিয়ে ওর হাত ধরলেন, বললেন, 'খবরদার!'
তারপর আস্তে আস্তে যেন নিজের মনেই বলতে লাগলেন, 'এতদিন চুরি কইরা কইবা তোর ঘরের পালং আমি দেইখা গেছি মকবুল। কিন্তু খালি পালং-ই দেখছি। আইজ আর আমার পালং খালি না। আইজ আর আমার চৌদোলা খালি না। আইজ চৌদোলার ওপর আরো দুইজনরে দেখলাম—দেখলাম আমার রাধাগোবিন্দরে। আমারে পৌঁছাইয়া দিয়া আয় মকবুল।'
স্ত্রীর হাত থেকে কেরোসিনের ডিবাটা তুলে নিতে নিতে মকবুল বলল, 'চলেন ধলাকর্তা।'

শ্রাবণ ১৩৫৯

প্রতিভূ

বিয়ের পর দ্বিতীয়বার শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে এসে ইজিচেয়ারে আয়েস করে শুয়ে স্ত্রীর ছবির এ্যালবামটা উলটে পালটে দেখছিল শুভেন্দু। হাতে কোন কাজ ছিল না, ঘরে কোন লোক ছিল না। শুধু তারা দুজনে। শুধু সে আর সেবা, শ্বশুরমশাই এখনো অফিস থেকে ফেরেননি। সন্ধ্যার আগে ফিরবেনও না। শাশুড়ী রান্নাঘরে জলখাবার তৈরিতে ব্যস্ত। ন'দশ বছরের শালী রেবা ফুট-ফরমায়েস খাটছে। কখনো পান জোগাচ্ছে, কখনো সিগারেট, কখনও চা। শুভেন্দু এক মুহূর্তও তাকে ঘরে থাকতে দিচ্ছে না। সে ঘরে থাকলে সেবাকে মাঝে মাঝে ছোঁয়া যায় না, যখন তখন যা তা কথা বলা যায় না, ওর নরম সুন্দর তুলতুলে হাতখানাকে তুলে নেওয়া যায় না নিজের হাতে। রেবা ঘরে থাকলে অনেক অসুবিধে।
স্বামীর চালাকি বুঝতে পেরে সেবা একটু হেসে বলল, 'তুমি বড় নিষ্ঠুর, রেবার ওপর তোমার মোটেই দয়ামায়া নেই।'
শুভেন্দু বলল, 'আরও পাঁচ ছয় বছর পরে যখন ওর সম্বন্ধেও আমার দয়ামায়া জন্মাবে, হৃদয় আরও উদার হবে তখন হে হৃদয়েশ্বরী, তোমার নির্দয়তার সীমা থাকবে না।'
সেবা এবার বলল, 'তুমি বড় দুষ্টু।'

শুভেন্দু মৃদু হেসে এ্যালবামের দিকে চোখ ফেরাল। কত রকমের কত ফটোই যে কিশোর বয়স থেকে সেবা তার এ্যালবামে জড়ো করেছে তার আর ঠিক নেই। নিজের নানা বয়সের ছবি ছাড়াও আছে পারিবারিক গ্রুপ ফটো, রয়েছে পিকনিক পার্টির ছবি, স্কুল কলেজের সঙ্গিনী সহপাঠিনীর দল, দাদা বউদির যুগলরূপ। প্রকৃতিপ্রেমও নেহাত কম নয় সেবার। তার এ্যালবামে পূর্ব বাংলার শ্যামল সমতল শস্যভরা মাঠ, আছে পুরীর সমুদ্র, রয়েছে দার্জিলিং থেকে তোলা সাদা বরফের সাদা চাদরে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা।

একে একে সবগুলি ছবির ইতিবৃত্ত, সবরকম আত্মীয়-স্বজনের নামধামের পূর্ণ বিবরণ সেবা স্বামীকে শুনিয়ে যেতে লাগল। সেবা নিজে ছবি তুলতে পারে না। বেশির ভাগ ফটোই তার দাদা সুপ্রিয়র তোলা। কিছু কিছু বা তার অন্য দু-একজন বন্ধুর। সেবা পুরী কি দার্জিলিং কিছুই দেখেনি। সুপ্রিয় দেখেছে। যেখানে যেখানে গেছে বোনের জন্য ছবি তুলে নিয়ে এসেছে। কোন ছবিই এ পর্যন্ত হারায়নি সেবা। কিছুই সে হারায় না। সিউড়ী কলেজে প্রফেসারি করে সুপ্রিয়। সস্ত্রীক সেখানেই থাকে। ছুটিছাটায় আসে কলকাতায়। সেবার বিয়েতে সপ্তাহখানেকের জন্যে এসেছিল, তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়েছে শুভেন্দুর।

উলটাতে উলটাতে এ্যালবামের একেবারে শেষ পাতায় চলে এল শুভেন্দু, তারপর হঠাৎ বলে উঠল, 'বাঃ চমৎকার ছবিখানা তো, এ কার ফটো?'

তেইশ চব্বিশ বছরের একটি পরম রূপবান যুবকের প্রতিকৃতি, বেশ লম্বা চেহারা, মাথায় ঘন কালো চুল, একটু যেন কোঁকড়ানো। সুন্দর প্রশস্ত কপাল, টানা টানা বড় বড় চোখ, দীর্ঘ সুগঠিত নাক, পাতলা ঘনবদ্ধ দুটি ঠোঁট। কোমল চিবুক। গায়ে সাদা একটি টুইলের সার্ট। বুকের ওপর দুখানি হাত আড়াআড়িভাবে রেখে সামনের দিকে স্মিতমুখে তাকিয়ে রয়েছে যুবকটি। যেন মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে দেখছে রূপময়ী পৃথিবীকে। দেখে খুশি হয়েছে।

শুভেন্দুও খুশি হল। ছবি থেকে চোখ না ফিরিয়েই বলল, 'ভারি সুন্দর। তোমার এ্যালবামে যত ছবি দেখলাম তার মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর। আসলে তুলনা করলে দেখা যায় মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের রূপই পৃথিবীতে বেশি। কারণ তার রূপের মধ্যে একটা রহস্য আছে। কে এ বলতো?'

স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকাল শুভেন্দু।

কিন্তু সেবা ততক্ষণে চোখ নত করেছে। আর সুন্দর সুগৌর মুখ ফ্যাকাসে বিবর্ণ।

সেবা আস্তে মৃদু স্বরে বলল, 'ও কেউ না। ছবিটা দাও আমাকে?'

স্ত্রীর শেষ কথাটা কানে তুলল না শুভেন্দু, স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, কেউ না মানে? পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি একজন ভদ্রলোক। থিয়েটারের হিরো সেজে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কে এ? তোমার কোন আত্মীয়? মাসতুতো পিসতুতো কোন ভাই?

সেবা বলল, 'না।'

শুভেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'তবে? কোন বন্ধু? আগে দাদার বন্ধু ছিল তারপরে তোমার?'

অদ্ভুত একটু হাসল শুভেন্দু।

সেবা ঘাড় নাড়ল, 'না, তাও না।'

'তবে কে এ লোকটি?

সেবা বলল, 'আর একদিন বলব, আর এক সময়।'

কিন্তু সময় দিতে মোটেই রাজী নয় শুভেন্দু। বলল, 'না, আমি এখনই শুনতে চাই। সব খুলে বল আমাকে। গোপন করলে ফল আরও খারাপ হবে।'

শাসনের সুর ফুটে উঠল শুভেন্দুর গলায়। সেবা তবু চুপ করে রইল।

খাবারের থালা নিয়ে শাশুড়ী সরোজিনী ঘরে ঢুকলেন। পিছনে পিছনে জলের গ্লাস হাতে রেবা। অনেক যত্ন করে নানারকম খাবার তৈরি করেছেন সরোজিনী। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা লুচি, সিঙ্গারা, ডিমের হালুয়া, দু-তিন রকমের মিষ্টি। কিন্তু শুভেন্দু বলল তার মোটেই ক্ষিদে নেই, তার ভয়ঙ্কর মাথা ধরেছে। অনেক অনুরোধ উপরোধের পর যদি বা কিছু মুখে তুলল, ভারি বিস্বাদ লাগল খাবারগুলি। সুরভিত চায়ের পেয়ালা ঠোঁটে একবার ছুঁইয়েই তাড়াতাড়ি রেখে দিল টেবিলের ওপর। পৃথিবীর সব

কিছু কটু স্বাদে ভরে গেছে।

সরোজিনী বললেন, 'হলো কি তোমার ? হলো কি তোমাদের ?' কিন্তু কেউ কোন সদুত্তর দিল না।

সন্ধ্যার শো-তে শ্যালিকা আর স্ত্রীকে নিয়ে সিনেমায় যাওয়ার কথা ছিল শুভেন্দুর। সে প্রোগ্রাম বাতিল হলো। একা একা বেড়াতে বেরোল গড়ের মাঠের দিকে। তাও ভাল লাগল না। ভাবল সেবাকে রেখে ফিরে যায় নিজেদের শ্যামবাজারের বাড়িতে। তাও পারল না। বুক পকেট থেকে অজ্ঞাতনামা সেই সুপুরুষ যুবকটির ফটো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার বের করে দেখল, বার বার রেখে দিল পকেটে। শুভেন্দুর বুঝতে কিছু আর বাকি নেই। সেবা বলবে আর কি। বলবার তার আর কি-ই বা আছে। শুভেন্দুর মনে পড়ল সেবার সঙ্গে যখন তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে শুভেন্দুর দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় তাকে নিষেধ করেছিল। মেয়েটির সম্বন্ধে নানা রকম কানা-ঘুষা নাকি তিনি ওদের পাড়া থেকে শুনে এসেছেন। কিন্তু শুভেন্দু গ্রাহ্য করেনি। অবিবাহিতা সুন্দরী মেয়েদের সম্বন্ধে মাঝে মাঝে ওরকম মিথ্যে অপবাদ রটে। শুভেন্দু নিজে দেখে ওকে পছন্দ করেছে। ওর গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়েছে। আই· এ· পর্যন্ত পড়েছে সেবা। বিয়ের পরও ওকে বি· এ পাশ করিয়ে নেওয়ার কথা মনে মনে ভেবেছে। কিন্তু এখন সব ভাব ভাবনা গুলিয়ে গেল। মনে অনুতাপ হলো কেন সেই আত্মীয়ের কথা তখন শুনল না। সেই সুপুরুষ যুবকটির ছবিখানা বুক পকেটের ভিতরে থেকে সমস্ত বুকটাকে যেন জ্বালিয়ে দিতে লাগল। এখন ছবিখানাকে তত সুন্দর মনে হলো না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে অনেক খুঁত বেরোল. অনেক ত্রুটি বেরোল। লোকটির চোখে মুখে পরিষ্কার লাম্পট্যের ছাপ দেখতে পেল শুভেন্দু।

তবু ফি: এ., নসঙ্গা লেনের শ্বশুরবাড়িতে। হরিপ্রসাদ তখন সকালের কাগজ রাত্রে খুলে বসেছেন। অফিসের তাড়ায় দিনে কাগজ পড়বার তিনি সময় পান না। রাত্রে বসে ধীরে সুস্থে পড়েন. খবর আর সম্পাদকের মন্তব্য নিয়ে নানা রকম আলোচনাও করলেন, জামাইকে ডাকলেন সেই আলোচনার বৈঠকে। কিন্তু দেশের রাজনীতিতে শুভেন্দুর কোন আগ্রহ ঔৎসুক্য নেই, দশের দুর্দশায় তার কোন সহানুভূতি ধরা পড়ল না। একটু বাদেই মাথা ধরেছে বলে সে উঠে পড়ল।

রাত্রেও পঞ্চব্যঞ্জনের ভাতের থালা সামনে এগিয়ে দিলেন সরোজিনী। এই রেশনের দিনে রাত্রে ভাতের থালা দিতে পারা সহজ-সাধ্য নয়। পঞ্চব্যঞ্জনের আয়োজনও অবস্থায় কুলোয় না। তবু শুভেন্দু প্রায় কিছুই খেল না। সব ফেলে রেখে উঠে এল। শ্বশুর-শাশুড়ী বিমূঢ় বিস্ময়ে চুপ করে রইলেন। এত যে বকবক করে রেবা, সেও যেন কথা ভুলে গেছে। ধারে কাছে সেবার দেখা মিলল না।

সাড়া মিলল রাত্রে। নেটের মশারির মধ্যে স্বামীকে ঘুমন্ত ভেবে সে যখন দো:: খিল দিয়ে সুইচ অফ করে বিছানায় ঢুকতে যাচ্ছে শুভেন্দু তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, বলল, 'আগে আমাকে সব খুলে বল, তারপর এসো এখানে।' সেবা অন্ধকারে স্তব্ধ হয়ে একটুকাল দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আজই সব শুনতে চাও ?'

শুভেন্দু বলল, 'আজই. এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর দেরি করতে চাইনে।'

মশারির খানিকটা তুলে ফেলে খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসল শুভেন্দু। বসে সিগারেট ধরাল। আর তার পায়ের কাছে ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে বসল সেবা। হেলান দিয়ে আয়েস করে নয়। সোজা হয়ে বসল। তারপর ধীরে ধীরে স্বামীর কাছে সেই অজ্ঞাতনামা রূপবান্ যুবকের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করতে লাগল।

সেবারা তখন থাকত চেতলায়। পড়ত প্রভাবতী গার্লস হাই'তে। ফার্স্ট ক্লাসে। কত আর বয়স হবে তখন। বছর পনের ষোল। কিন্তু বাড়ন্ত গড়ন ছিল ব " লোকে একটু বেশিই আন্দাজ করত। স্কুলটা ছিল বাসা থেকে বেশ একটু দূরে। মিনিট দশ বার পথ হাঁটতে হত। পথটাকে একটু সংক্ষিপ্ত করবার জন্যে খানিকটা অপথ দিয়ে হাঁটত সেবা। একটা পোড়ো বাগান বাড়ির ভিতর দিয়ে, পানা ঢাকা মজা-পুকুরের পাশ দিয়ে গিয়ে পড়ত বড় রাস্তায়। স্কুল ছিল সকালে। ফার্স্ট বেঞ্চে নিজের জায়গাটিতে সবাইর আগে গিয়ে বসবার জন্যে সেবা একটু আগে আগেই বেরিয়ে পড়ত। খুব

ভোবে উঠতে তাব ভাল লাগত। বাস্তায একা একা হাঁটতে ভালো লাগত। পথে কাবো সঙ্গে দেখাশোনা হযে যায তা সে চাইত না। ছেলেবেলা থেকেই তাব এমন একটু কুনো স্বভাব ছিল। কি ছেলে, কি মেযে,কাবো সঙ্গেই সে তেমন মিশত না, আলাপ-পবিচয কবত না। শুধু বই নিযে থাকতে ভালোবাসত। কেবল পাঠ্য বই নয, নাটক নভেলেব সংখ্যাই তাব মধ্যে বেশি থাকত। ক্লাসেব মেযেদেব মধ্যে কেউ বলত একাচোবা, কেউ বলত অহঙ্কাবী, দেমাকী।

একদিন সে সদ্য শেষ কবা একখানা নভেলেব তরুণ নাযকেব কথা ভাবতে ভাবতে স্কুলেব পথে হেঁটে চলেছে হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন ডাকল, 'ও খুকি, শোন।'

দ্বিতীয বাবেব ডাকে সে ঘাড ফিবিযে দেখল, বেডাবাব ছডি হাতে এক বুডো ভদ্রলোক। মাথায অধেক টাক, বাকি অর্ধেকে কাঁচা-পাকা চুল। মুখখানা নিখুঁত কামানো, তবু কোঁচকানো চামডাটা বেশ চোখে পডে। গাযে সাদা আদ্দিব পাঞ্জাবি। ফুল-কোচা পাযেব পাম-শু পর্যন্ত লুটিযে পডেছে। ভদ্রলোক বেশ সৌখীন। কিন্তু বযস বছব ষাট পঁযষট্টিব কম হবে না।

কাহিনীব মাঝখানে শুভেন্দু বাধা দিযে বললে, 'সে বুডোব কথা কে শুনতে চাইছে?'

সেবা বলল, আগে শোনই।

ভদ্রলোক ততক্ষণে সেবাব পাশে এসে দাঁডিযেছেন। সেবাব দিকে একটা লালবঙেব পেনসিল এগিযে দিযে বললেন, পেনসিলটা কি তোমাব খুকি? বাস্তায পডে ছিল।'

ব্যাকবণ কৌমুদীখানাব মধ্যে পেনসিলটা গুঁজে এসেছিল সেবা। অসাবধানে পডে গেছে দেখে একটু অপ্রতিভ হযে বলল, হ্যাঁ, পেনসিলটা আমাবই। কিন্তু আমাব নাম খুকি নয। কেউ আমাকে খুকি বলে ডাকুক তা আমি পছন্দ কবিনে।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন 'তাই নাকি? দেখ কোন কিশোবী মেযেকে খুকি বলতে আমাবও যে ইচ্ছা কবে তা নয। কিন্তু তোমাব নাম তো আমি জানিনে, নাম কি তোমাব?'

ছেলে ছোকবা কেউ হলে চট কবে নিজেব নাম বলতে হযত ইতস্তত কবত সেবা। তাছাডা জিজ্ঞেস কবতে সে হযত সাহসও পেত না। কিন্তু এই বুডো ভদ্রলোককে নিজেব নাম বলতে সংকোচ কিসেব। আমাব নাম সেবা সেন'

ভদ্রলোক বললেন 'বাঃ, তোমাব মতই সুন্দব তোমাব নাম। আব বেশ অনুপ্রাসও বযেছে। আমিও অনুপ্রাস থেকে একেবাবে বঞ্চিত নই। আমাব নাম আদিত্য দে।'

সেবা হেসে বললে 'আপনাব নামও তো বেশ ভালো।' বলে স্কুলেব দিকে পা বাডাল সেবা।

তাবপব থেকে বোজই প্রায একই জাযগায আদিত্যবাবুব সঙ্গে দেখা হতে লাগল সেবাব। এব মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু দেখতে পেল না সেবা আদিত্যবাবুও বোজ ভোবে এই পথে বেডাতে বেবোন, সেবাও স্কুলে যায দেখা হওযাটাই স্বাভাবিক কোন সংকোচেব কাবণও খুঁজে পেল না, কাবণ আদিত্যবাবুকে অনেকটা তাব দাদুব মত দেখতে। বযসও তাঁব মতই, কি তাঁব চেযেও বেশি। দাদু থাকেন এলাহাবাদে ন মাসে ছ-মাসে একবাব কবে আসেন। দুচাব দিনেব বেশি থাকতে পাবেন না।

যে কদিন থাকেন নাতি-নাতনীকে নিযে খুব আনন্দ আহ্লাদ কবে যান। তাঁব সমযেব পবিমাণটা এতই অল্প যে তাতে সেবাব সাধ মেটে না, মন ভবে না। স্কুলেব পথে নিত্যকাব একটি দাদুকে পেযে সেবাব বেশ ভালই লাগতে লাগল।

আদিত্যবাবু অনেকটা পথ সেবাকে আজকাল এগিযে দিযে আসেন। সেবা আগে আগে যায, আব পিছনে পিছনে নানা বকমেব শ্লোকেব গুঞ্জনধ্বনি ওঠে। যেন মৌমাছিব ঝাঁক গুণ গুণ কবছে। সে গুণগুণানি কখনো ইংবেজী ছন্দের, কখনো বাংলা, কখনো সংস্কৃতেব।

লাল পেনসিলটা বোজ পডে যায না সেবাব। কিন্তু বোজই কিছু না কিছু ফুল সেবাকে তাঁব হাত থেকে নিতে হয। সে ফুলেব বঙ কোনদিন লাল, কোনদিন নীল, কোনদিন হলদে। সংখ্যায বেশি নয, অনাযাসে খোপায গুঁজে বাখা যায।

সহপাঠিনী শিপ্রা তা দেখে প্রাযই জিজ্ঞেস কবে, 'এত ফুল তুই পাস কোথায বল তো?'

শিপ্রাকে চটাবাব জন্যে, বাগাবাব জন্যে, হিংসেয জ্বলে মরবাব জন্যে সেবা জবাব দেয, 'কোথায

আর পাব। লাভার এসে দিয়ে যায়।'

শিপ্রা চোখ ছানাবড়া করে বলে, 'বলিস কি ? তলে তলে এত ? নিজের হাতে ফুলগুলি খোঁপায় গুঁজে দেয় নাকি ?'

সেবা বলে, 'নিজেব হাতে দেয় নাকি তোর বাড়িতে হাত ধার করতে যায় ?'

শিপ্রা বলে, 'দাঁড়া, আমি সবাইকে বলে দেব। দিদিমণিদেরও বলব।'

'বেশতো বলিস।' সেবা হাসে।

ভালো ছাত্রী আব সৎস্বভাবের মেয়ে বলে স্কুলে সুনাম আছে সেবাব। বছর বছব তার জন্যে অনেকগুলি করে প্রাইজ পায়। শিপ্রাকে তাব ভয় নেই।

একদিন আদিত্যবাবুকে সেবা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, এত ফুল আর এত শ্লোক আপনি বোজ রোজ কোত্থেকে পান ?'

আদিত্যবাবু হেসে বললেন, 'ফুলগুলি বাগানের। শ্লোকগুলি অবশ্য বাগানে পাওয়া যায় না। বইয়ের ভিতর থেকে কুড়িয়ে নিতে হয।'

সেবা বলল, 'আপনাব বুঝি অনেক বই আছে ?'

আদিত্যবাবু বললেন, 'তা আছে দু'চারখানা।'

সেবা বলল, 'আমাকে দেবেন পড়তে ? স্কুল লাইব্রেরীতে তেমন ভালো বই নেই। আর সব বই ইসুও করে না।'

আদিত্যবাবু বললেন, 'দিতে পাবি। তুমি যদি নিজে গিয়ে নিয়ে আস।'

'এক্ষুণি গেলে এক্ষুণি দেবেন ? কত দূর আপনাব বাড়ি ?'

আদিত্যবাবু বললেন, 'এই তো কাছেই। মিনিট পাঁচেকের পথ।'

তাঁর হাতঘড়িতে সময়ের হিসেব মিলল। সেবাদেব স্কুল আবম্ভ হতে আবও আধঘণ্টা দেরি আছে। আজ না হয় কয়েকটা বেঞ্চ পিছনে গিয়েই বসবে সেবা। তবু কতকগুলি বইতো নিয়ে আসতে পাববে।

লালরঙেব সুন্দব ছোট একটি বাড়ি। ঠিক যেন ছবিব মত দেখতে। সামনে সবুজ ঘাসের বন। বাবান্দায় নাম-না-জানা নানা রঙের ফুলের টব। খাঁচায় ঝুলছে সবুজ বঙেব একটি টিযা। সেবা ভিতবে ঢুকতেই মিষ্টি কবে ডেকে উঠল।

সেবা জিজ্ঞেসা করল, 'ও কি বলছে ?'

আদিত্যবাবু বললেন, 'তোমাব নাম ধরে ডাকছে ?'

সেবা লজ্জিত হয়ে বলল, 'বা রে আমার নাম ও শুনল কার কাছে '

আদিত্যবাবু হেসে বললেন, 'কি জানি কার কাছ থেকে শুনেছে।'

সেবাব প্রথমে বিশ্বাস হল না। কিন্তু টিয়াটা এরপর যতবার ডাকতে লাগল সেবা স্পষ্ট নিজের নামই শুনতে পেল।

বাড়িতে খানতিনেক ঘর। বড় বড় সোফা ইজিচেয়ারে সাজানো। আর একঘরে তিন চারটে কাঁচেব আলমারি ঠাসা বই। সেবা সেদিকে একবার লুব্ধ চোখ বুলিযে নিল। কিন্তু হাত দিতে সাহস পেল না। বেশির ভাগই মোটা মোটা ইংরেজী বই।

সেবা বলল, 'সব তো দেখলাম, কিন্তু আব সব কই ?'

'আর সব আবার কে আসবে ?'

'কেন আপনার ছেলে মেয়ে নাতি-নাতনীরা ?'

আদিত্যবাবু বললেন, 'আমার স্ত্রী এ পর্যন্ত আসেনি। তাই তারাও কেউ আসতে রাজী হয়নি।'

সেবা বলল, 'ও আপনি বুঝি বিয়ে করেননি ? কেন করেননি ?'

আদিত্যবাবু বললেন, 'সে অনেক কথা। পরে তোমাকে ধীরে ধীরে বলব।'

অনেক না শুনলেও দুচারটে কথা তাঁর কাছ থেকে না শুনে ছাড়ল না সেবা। আদিত্যবাবু রিটায়ার্ড সাবজজ। বছর দুই ধরে এই বাড়িতেই আছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কেউ নেই। দূর সম্পর্কের যারা আছে তারা দূরেই থাকে। এখানে আদিত্যবাবুব একটি চাকর শুধু সম্বল। সে-ই

বান্না-বান্না কবে । শুনে সেবাব ভাবি মাযা হল । আহা, তাব দাদুব যদি এই অবস্থা হতো তিনি কি কবে টিকতেন ।

আদিত্যবাবু নিজেব হাতে স্টোভ জ্বেলে তাকে চা আব ডিমেব অমলেট কবে খাওযালেন । কিছুতেই বাবণ শুনলেন না । অগত্যা সেবাও তাঁকে সাহায্য কবতে এগিযে এল । তাবপব দুতিন খানা বই নিযে বেবোবাব সময দেখে নটা বেজে গেছে, আহা, স্কুলটা কামাই হল । জিভ কাটল সেবা । তবে তেমন যেন দুঃখ হল না । কিন্তু দুর্ভোগ হল বাডিতে গিযে । মা একেবাবে চটে আগুন, 'হতভাগী, কোথায গিযেছিলি তুই ?'

'কেন, আদিত্যবাবুব বাডিতে ।'

সেবাব মা বললেন, 'তা হলে লোকে যা বলে বেডাচ্ছে সবই ঠিক ? হতচ্ছাডি, মববাব আব তুই জাযগা পেলিনে ? ওই বুডোব কাছে গেলি মবতে ?'

সেবা বলল, 'এসব তুমি কি বলছ মা, বুডো মানুষ ! তোমাব বাপেব বযসী ।'

মা বললেন, আমাব বাপেব বযসী কেন, আমাব বাপ আসুক না । তাকেই বা বিশ্বাস কিসেব ? চিতেয না ওঠা পর্যন্ত পুরুষ মানুষ সব পাবে । তা ছাডা ও বুডোব তো পাডা ভবে বদনাম । অল্প বযসী মেযেদেব পিছনে পিছনে ও ঘুবে বেডায ।'

সেবা বলল, ছি ছি ছি, চুপ কবো তুমি ।'

শুধু মা নয । বাবা আব দাদা দুজনেই শাসন কবলেন সেবাকে । বিশ্রী গ্লানিতে সেবাব মন ভবে উঠল । ছি-ছি-ছি শেষ পর্যন্ত একটা বুডোব সঙ্গে তাব বদনাম বটল । কোন কিশোব নয, কোন সুদর্শন তরুণ যুবক নয, তাব জীবনে কলঙ্কেব কালি লেপে দিল পাকা-মাথা একটা বুডো !

বইগুলি পবদিনই স্কুলে যাওযাব পথে আদিত্যবাবুকে ফেবৎ দিল সেবা । তিনি বললেন, 'এত তাডাতাডি পডা হযে গেল ?' সেবা কোন জবাব দিল না । তিনি ফুল দিতে গেলেন, সেবা তাঁব হাত থেকে ফুলগুলি কেডে নিযে দূবে ছুঁডে ফেলল ।

তিনি বললেন, 'হলো কি তোমাব ?'

সেবা বলল, 'আপনি আমাব সঙ্গে কথা বলবেন না । আপনি লোক ভালো নন । আপনাব দুর্নাম আছে । সেই দুর্নাম আপনি আমাব নামেব সঙ্গে জডিযে দিযেছেন । আপনাব লজ্জা কবে না কথা বলতে ?'

আদিত্যবাবু ম্লান মুখে চলে গেলেন ।

সেবা আব সে পথ দিযে হাঁটল না, অন্য ঘুব পথে যেতে লাগল, কিন্তু দেখা গেল সে পথেও আদিত্যবাবু আছেন, কাছে আসতে সাহস পান না দূবে দূবেই ঘোবেন । বোজ একবার করে যেন সেবাকে তাঁব দেখা চাই । লোকটি যে খাবাপ তাতে এবাব আব সেবার সন্দেহ বইল না । ঘৃণায বিদ্বেষে আব বিতৃষ্ণায তাব মন ভবে উঠল । এদিকে স্কুলটাও ফিস্ ফিস গুজ গুজ শব্দে ভবে উঠেছে, ছাত্রীবা কানাকানি কবে । টিচাববা এক অদ্ভুত চোখে তাকান তাব দিকে, স্কুল থেকে তাব নাম কাটিযে দেওযাব আলোচনাও নাকি চলতে লাগল । অস্বস্তিতে নিজেব অস্তিত্ব অসহনীয হযে উঠল সেবাব ।

শিপ্রা বলল, 'চিনলুম এবাব তোব লাভাবকে । তা ওই বুডোব ভুঁডিতে হাত বুলিযে ক-হাজার টাকা আদায় কবেছিস ভাই, তোব বাবা নাকি বাডি কবছেন ?'

শুধু শিপ্রাব মুখেই নয, পাড়ার আব সব প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষেব মুখে মুখেও কথাটা শোনা যেতে লাগল, সেবাব গবীব বাবা-মা নাকি নিজেবাই টাকাব লোভে মেযেকে এই বুডোর কাছে পাঠিয়েছেন ।

দূব থেকে ফেব একদিন কাছে এগিযে এলেন আদিত্যবাবু । সেবাকে নিরালায পেযে বললেন, 'তোমাব দুর্ভোগেব কথা আমাব কানে গেছে ।'

সেবা বলল, 'এবাব বুঝি চোখে দেখতে এসেছেন ?' আদিত্যবাবু বললেন, 'তা নয় । ভেবেছি আমি তোমাকে বিয়ে করব, তুমি যদি বাজী হও । আমি তোমাব বাবাকে বলি ।'

অপমানে সমস্ত অন্তরটা জ্বলে যেতে লাগল । একটু চুপ কবে থেকে বলল, 'আচ্ছা, এব জবাব

আপনাকে আমি পরে দেব।'

বাড়ি এসে ভাবতে লাগল কি করা যায়। বাবাকে মাকে বললে তারা আরো হৈচৈ করবেন, দাদাকে বলে পাড়ার ছেলেদের লেলিয়ে দিয়ে আচ্ছা করে লোকটাকে মার দেওয়াই উচিত। কিন্তু তাও নয়, নিজের হাতেই লোকটার শাস্তির ব্যবস্থা করবে সেবা, নিজে না মারলে তার বুকের জ্বালা মিটবে না। জুতো, চাবুক নানা রকম হাতিয়ারের কথাই মনে হল সেবার কিন্তু কোনটাই ঠিক মনঃপূত হল না। তবু তার মতলব ভাঁজার ফন্দি আঁটার বিরাম রইল না।

পরদিন আদিত্যবাবুর সাথে ফের দেখা। তিনি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি ঠিক করলে।'

সেবা বলল, 'আর মাসখানেক অপেক্ষা করুন, আমার পরীক্ষাটা হয়ে যাক তারপরই কথা পাকাপাকি হবে।'

আদিত্যবাবু বিশ্বাস করলেন, খুশি হয়ে বাড়ি ফিরলেন।

প্রেমে পড়লে লোকে বোকা হয় পাগল হয়, আর যারা বুড়োবয়সে প্রেমে পড়ে তারা দুইই হতে পারে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও সেবার মনে শান্তি এল না লোকটাকে শাস্তি দেওয়া হল না তো।

দিন কয়েক বাদে সেবার বাবা আর মা হাসপাতালে দূর সম্পর্কের এক কাকাকে দেখতে গেছেন, দাদা রয়েছে ডিউটিতে। সেবাকে ঘরে থাকতে বলে। সেবা বিকেল বেলা আস্তে আস্তে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। বড় এক জন নেতা পার্কে বক্তৃতা করতে এসেছেন, পাড়ার লোকজন সবাই সেখানে ভেঙে পড়েছে। পা টিপে টিপে সেবা গিয়ে উপস্থিত হল আদিত্যবাবুর বাড়িতে। টিয়েটা আজও তার নাম ধরে ডাকছে। কিন্তু সে ডাকে কানে যেন সূচ বিঁধল সেবার। আদিত্যবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'তুমি এসেছ?'

সেবা রুদ্ধশ্বাসে বলল হ্যাঁ, আসুন, আমার সময় নেই বাবা মা এসে পড়লে মুশকিল হবে।'

আদিত্যবাবু বললেন, কি, ব্যাপার কি।

সেবা বলল আসুন আমার সঙ্গে, বলছি।

তারপর যেখানে আদিত্যবাবুর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল সেই পোড়ো বাগানবাড়ির মধ্যে মজা পানা-ভরা পুকুরটার কাছে গিয়ে বলল 'শুনুন এই পুকুরটার মধ্যে আমার হাতের আংটি খুলে পড়ে গেছে। ঘাটের কাছেই পড়েছে আপনি দয়া করে তুলে দিন বাবা মা জানতে পারলে আর রক্ষে থাকবে না।

আংটিশূন্য অনামিকাটা উঁচু করে দেখাল সেবা

আদিত্যবাবু বললেন কি করে পড়ল?

সেবা বলল লাল সাপলা ফুলটা তুলতে গিয়েছিলাম আংটিটা টুব করে পড়ে গেল।'

আদিত্যবাবু বললেন কিন্তু এই সন্ধ্যেবেলা,—চাকরটা আসুক না হয়।

সেবা তাঁকে গায়ে হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে বলল না না ওরা এসে পড়বেন, আপনি এত ঘাবড়াচ্ছেন কেন আপনি কারো চেয়ে কম কিসে।'

গায়ের জামাটা খুলে রেখে আদিত্যবাবু আস্তে আস্তে জলে নামলেন ঘাটের কাছে আংটি পাওয়া গেল না।

সেবা বলল ভিতরের দিকে নামুন দু-একটি ডুব দিয়ে দেখুন না।

আদিত্যবাবু ডুব দিলেন। মজা পুকুর তো নয় প্রেমসমুদ্র। সেবা এক ফাঁকে পালিয়ে এল বাড়িতে।

দিন দুই বাদে শোনা গেল আদিত্যবাবুর জ্বর তৃতীয় দিনে শোনা গেল ডবল নিউমোনিয়া। আদিত্যবাবু তাঁর চাকরকে পাঠিয়ে দিলেন। সেবাকে একবারটি দেখতে চান, সেবার বাবা রেগে বললেন, কি আস্পর্ধা।

সেবা বলল, 'বাবুকে গিয়ে বলো, তিনি সেরে উঠলেই দেখা করতে যাব।'

তারপর দিন দশেক বাদে আদিত্যবাবু মারা গেলেন। পরদিন তাঁর চাকর ভজন সিং এসে সেবাকে একটা লেফাফা দিয়ে গেল। তার মধ্যে এক লাইনের একটি চিঠি ছিল। 'আমাকে ক্ষমা

করো।' আর ছিল ওঁর ফটো। যৌবনে তোলা, বার্ধক্যে রিপ্রিন্ট করা। চিঠিটা সঙ্গে সঙ্গে সেবা ছিঁড়ে ফেলল। কিন্তু ফটোটা ছিঁড়তে ছিঁড়তেও ছিঁড়ল না।

কাহিনী শেষ করে সেবা চুপ করল।

খানিক বাদে শুভেন্দু বলল, 'কেন ছিঁড়লে না, মরা মানুষের হাতের চিহ্ন বলে নাকি ফটোটা খুব সুন্দর বলে?'

সেবা বলল, 'না তাও নয়, ভাবলাম সবাই তো আমরা একদিন বুড়ো হব।'

শ্রাবণ ১৩৫৯

এক পো দুধ

ব্যবস্থাটা লতিকাই করল প্রথমে। স্বামীর জন্যে এক পো দুধ রোজ ক'রে বসল। দেড়পো দুধ খুকীর জন্যে রাখতেই হয়। দেড় বছরের শিশুকে খালি সাগু বার্লি খাইয়ে তো আর রাখা যায় না, তার থেকেও দু'চার চামচ চায়ে ব্যয় হয়। সস্তা মিল্ক পাউডার দিয়ে চা খেতে খেতে সকাল সন্ধ্যায় দু'কাপ চা মাঝে মাঝে একেবারেই বিস্বাদ হয়ে আসে বিনোদের। একদিন গোয়ালা দুধ দিয়ে যাওয়ার পর স্ত্রীকে সে বললো, 'এক চামচ দুধ দিয়ে আজ চা কর দেখি।'

দুধ দেওয়ার বদলে লতিকা মুখ ঝামটা দিল,—'তোমার যেমন কথা! দুধ পাব কোথায়? কত যেন সেরে সেরে দুধ রাখা হয়! খুকীর জন্যে এই তো এক ফোঁটা দুধ, তাও যদি তোমার চায়ে দেই তা হলে ও খায় কি?'

বিনোদ বলল, 'থাক থাক, আর চেঁচিয়ো না।'

দিন দুই চুপচাপ কাটল। লতিকা দেখলো স্বামীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। খাটতে খাটতে লোকটির চেহারা একেবারে হাড্ডী সার হয়ে গেছে। এই তো ত্রিশ বত্রিশ বছর মোটে বয়স। এরই মধ্যে বিনোদের দু'গাল ভেঙেছে, চোয়াল জেগেছে, কেমন যেন বুড়ো বুড়ো হয়ে গেছে দেখতে। লোকটির দিকে যেন আর তাকানো যায় না।

একদিন গেল, দু'দিন গেল, তিন দিনের দিন ভোরবেলায় হাতল ভাঙা চায়ের কাপটি ঠিক অন্যদিনের মতই স্বামীর সামনে এনে রাখল লতিকা। বিনোদ দেখে অবাক। চায়ের কাপে চা নয় কানায় কানায় ভর্তি দুধ।

বিনোদ বলল, 'এ আবার কি! খুকীর দুধ দিলে না কি সবটুকু!'

লতিকা বলল, 'না না, তুমি খাও। খুকীর দুধ দেব কেন, তোমার জন্যে আলাদা ক'রে রেখেছি। যা ছিরি হয়েছে তোমার, সপ্তাহখানেক কি পনের দিন খেয়ে দেখ। চেহারাটা যদি একটু ফেরে।'

এবার আর সামনে এক কাপ দুধ দেখল না বিনোদ, দেখল দুধসাগর। স্ত্রীর গোপন হৃদয়ের প্রেম-সাগরের প্রতিরূপ। কবে যে সে ললিতাকে বিয়ে করেছিল, তা ভুলেই যেতে বসেছিল বিনোদ। আজ ফের মনে পড়ল। লতিকার চোয়াল জাগা ফ্যাকাসে মুখ, বার বছর আগেকার কুঙ্কুম-চন্দনে সাজানো আর একটি মুখের কথা তাকে মনে করিয়ে দিল। বিবর্ণ কোটরগত দু'টি চোখ দেখে মনে পড়ল শুভদৃষ্টির সময়কার একটি ষোড়শী কমলাক্ষীকে।

বিনোদ বলল, 'কিন্তু খরচ বেশি পড়ে যাবে যে।'

লতিকা বলল, 'যায় যাবে। তুমি রোজগার কর, তোমার জন্যে সংসারের খরচ যদি একটু বাড়ে,

বাড়লই বা ।'

আর কিছু না ব'লে দুধের কাপে চুমুক দিল বিনোদ ।

একটু দূরে দরজার কাছে মেঝের ওপর মাদুর পেতে স্কুলের পড়া পড়ছে সুনীল । বিনোদের ন'বছরের ছেলে । ওর পরে আর খুকীর আগে আরো যে তিন-তিনটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল, তারা কেউ নেই , সুনীল পাড়ার হাইস্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ে । অনেক চেষ্টাচরিত্র ক'রে ওর হাফ ফ্রী-শিপ জোগাড় করেছে বিনোদ । বইপত্রও সব কিনে দিয়েছে ।

ইংরেজী গ্রামার পড়তে পড়তে বাপের দুধ খাওয়ার দিকে সে একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল । তারপর নিজেই লজ্জা পেয়ে, ফের গলা ছেড়ে আরো জোরে জোরে পড়তে লাগল, Lion—Lioness, Lion—Lioness, Fox—Vixen, Fox—Vixen

বিনোদ একটু কাল ছেলের জেণ্ডার-পাঠ কান পেতে শুনল, তারপর বলল, 'তুই একটু খাবি নাকি দুধ, ও সুনীল ।'

সুনীল মুখ না ফিরিয়ে বলল, না, তুমি খাও । আমার দুধ লাগবে না । Fox—Vixen, Fox—Vixen'

বিনোদের লজ্জা দেখে লতিকা বলল,'তুমি খাও, ওর জন্য আবার আর একদিন রেখে দেব । পরীক্ষার সময় আমার সোনার জন্যে রোজ দুধ রাখব ।'

সুনীল মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'আমার জন্যে কারো দুধ রাখতে হবে না । আমি দুধ খাইনে । Dog—Bitch, Dog—Bitch'

বিনোদ এবার কেন যেন ধমক দিয়ে উঠল, 'ওই কয়েকটা কথা মুখস্থ করতে তোর কতক্ষণ লাগবে ? কাল [illegible] তো ওই gender-ই পড়েছিস ।'

বিনোদের ছোট ভাই বিজন ওঠে একটু দেরিতে । হাতমুখ ধুয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে এসে ঢুকল , 'কি বউদি, চা টা হয়ে গেল নাকি তোমাদের ?'

বি এ পাশ ক'রে বিজন বছর দুই যাবৎ বেকার রয়েছে । প্রথম প্রথম ভারি ছটফট করতো । এখন গা সওয়া হয়ে গেছে । খানিকটা যেন নিশ্চিন্ত ভাবই এসেছে আজকাল ।

বিজনের কথার জবাবে লতিকা বলল, 'না ভাই, তোমাকে ফেলে কি চা আমরা খাই, যে আজ খাব ?

বিজন হেসে বলল, 'দাদা বুঝি তেষ্টার চোটে না থাকতে পেরে খালি কাপে চুমুক দিচ্ছে । দাদাকে এক কাপ চা ক'রে দিলেই পার ।

বিনোদ আর লতিকা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল । বিজন কি জেনে শুনে ব্যঙ্গ করছে । কিন্তু ও তো তেমন ছেলে নয় ।

বিনোদ লজ্জিত হয়ে অপরাধীর ভঙ্গিতে বলল, 'চা নয় বিজু, দুধ খেলাম এক কাপ । তোর বউদি রেখে দিয়েছিল ।'

বিজু লতিকার দিকে চেয়ে হেসে হেসে বলল,'ও তাই বল, চুরি ক'রে ক'রে দাদাকে খাওয়ানো হচ্ছে ?'

বিজন একটু ঠাট্টা তামাসা ভালোবাসে । তবু অভাবের সংসার ব'লে ঠাট্টাটা বিনোদ আর লতিকার কানে যেন একটু কেমন শোনাল । দু'জনের মুখই গম্ভীর হয়ে গেল ।

বিনোদ বলল, 'ওকে এককাপ দুধ কাল দিয়ো ।'

লতিকা বলল, 'দেব ।'

বিজন মহা অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল, 'আচ্ছা, তোমাদের কি হয়েছে বউদি, তোমরা কি ঠাট্টা-তামাসাও বোঝ না আজকাল ? দুধ কি আমি কোনদিন খাই, যে খাব ? দশ তোমাদের কাছে কে চাইছে শুনি ? চা দেবে তো দাও ।'

একটু বাদে কেটলি থেকে দু'টি কাপে যখন চা ঢালতে যাচ্ছিল লতিকা, বিজন হঠাৎ বলল, 'দুধের কাপটা ভালো ক'রে ধুয়ে দাও বউদি । চায়ের কাপে দুধের গন্ধ আমি মোটেই সহ্য করতে পারিনে ।'

লতিকা কোন কথা না ব'লে দেওরের দিকে একটু তাকাল, তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'ধুয়েই দিয়েছি ঠাকুরপো। তোমার দাদার এঁটো কাপ তোমাকে দেইনি।'

পরের দিন লতিকা একটু আড়ালে এনে দুধের কাপটি দিল স্বামীকে। বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দুধের কাপে চুমুক দিল বিনোদ।

ঘরের মধ্যে সুনীল আজ আর ইংরেজী গ্রামার পড়ছে না। স্বাস্থ্যপাঠ মুখস্থ করছে, 'দুগ্ধ শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী।' কে জানে ইচ্ছা ক'রেই এই কথাটা পড়ছে কিনা। বিজন আজ আর বিনোদের ঘরে ঢুকল না। বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁতন করতে করতে বৌদির সঙ্গে আলাপ করতে লাগলো। বিনোদ যাতে অপ্রস্তুত না হয়ে পড়ে, কে জানে ইচ্ছা ক'রেই সেইজন্যে সে দাদাব সামনে না এসে বাইরে দাঁড়িয়ে রইল কিনা। এমন আস্তে আস্তে দুধের কাপটি শেষ করলো বিনোদ, যেন চুমুকেব শব্দ কাবো কানে না যায়।

মাত্র দিনকয়েক এই সঙ্কোচটুকু রইল, কিন্তু সপ্তাহ খানেক যেতে না যেতেই সমস্ত লজ্জা সংকোচ ভেঙে গেল বিনোদের। এখন সে ছেলে, ভাই, স্ত্রী, সকলের সামনেই দুধ খায়। দিতে একটু দেরি হ'লে জোর গলায় হাঁক দেয়, 'কই গো, দিয়ে যাও আমার দুধ, আমাকে এক্ষুণি বেরোতে হবে।'

লতিকা বিরক্ত হয়ে বলে, 'আনছি গো আনছি। দুধ না হয় ঘুরে এসেই খেতে, তোমার দুধ তো আর কেউ নিয়ে যাবে না!

পটলডাঙা স্ট্রীটে বাণী পাবলিশিং-এ প্রুফ-রীডারের কাজ করে বিনোদ। সব সময কাজ থাকে না। মাঝে মাঝে দশ-পনের টাকার টিউশনি পায়। ইনসিওরেন্সের একটা এজেন্সী আছে। পবিচিত বন্ধুদের পিছনে হাঁটাহাঁটি ক'রে স্যান্ডাল ক্ষয় ক'রে ফেলে। তবু বছরে তিন চার হাজাবেব বেশি দিতে পারে না।

কিন্তু বিনোদ দাস বাইরে যতই অকিঞ্চন হোক, ইণ্টালীর এই অনরেট সেকেণ্ড লেনের ৭/৩/২-এর একতলা বাড়ির কোণের দিকের ঘরখানায সে সম্রাট। সংসারেব সর্বময কর্তা। এই সংসারের জন্যে সে শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত দিচ্ছে, আর এক কাপ দুধে তাব অধিকাব নেই। নিজেব রোজগারেব পয়সায় সে নিজে দুধ খাবে, তাতে অত লজ্জা কিসের?

বিনোদ দুধ খেতে লাগল।

দু' সপ্তাহ কাটল, তিন সপ্তাহ কাটল, লতিকা ভাবল বিনোদ বুঝি এবাব নিজেই না করবে,—বলবে, 'আর দিয়ো না দুধ, এবার বন্ধ ক'রে দাও।'

কিন্তু বিনোদের যেন সেদিকে মোটে খেয়ালই নেই।

এক মাস বাদে গয়লা সাড়ে সাত টাকা বেশি বিল করল দুধেব।

লতিকা তো ভাবনায় অস্থির—কোন দিক থেকে ক' টাকা কেটে এই সাড়ে সাত টাকা পুরিয়ে দেবে। গোয়ালাকে দু'তিন দিন বাদে টাকা নিতে আসবার অনুবোধ ক'রে লতিকা বলল, 'এক পো ক'রে যে বেশি দুধ নিয়েছি, এ মাস থেকে তা আর দিতে হবে না। তুমি আগের দেড় পো ক'রেই দিও।'

ঘরের মধ্যে প্রুফ দেখছিল বিনোদ, এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সে বেবিয়ে এসে নিজেই বলল, 'না হে, এ মাসও এক পো ক'রে বেশিই দাও, দুধটা বেশ ভালোই তোমার। শরীরটা যেন একটু শুধরেছে ব'লে মনে হচ্ছে। দেখি আর এক মাস খেয়ে।'

গোয়ালা চলে গেলে লতিকা বলল, 'আচ্ছা, তোমার আক্কেলখানা কি? তুমি যে দুধের খরচ এমাসেও বাড়িয়ে দিলে, টাকা দেব কোত্থেকে?' বিনোদ ভারি অপমানিত বোধ ক'রে স্ত্রীকে ধমক দিয়ে বলল, 'টাকা কি তুমি দাও, যে টাকার ভাবনা ভাবছ? টাকা যে দেয়, সে দেবে। সারাদিন তোমাদের জন্যে খেটে মরছি আর এক ফোঁটা দুধ জুটবে না আমার কপালে?'

লতিকা বলল, 'জুটবে না কেন। এক পো কেন, আমি বলি এক সের ক'বে দুধ রাখ তুমি। সত্তর পঁচাত্তর টাকা তো সব দিয়ে রোজগার কর, তা নিজেই তুমি খাও,—দুধ খাও, ঘি খাও, মাংস খাও, পোলাও খাও, সংসারের আর মানুষের দিকে তোমার চেয়ে দরকার কি।'

বিনোদ চটে গিয়ে বলল, 'খাবই তো, আমার টাকা-পয়সায় আমি খাব, আমি প'রব, তাতে তোর

কি

সকালবেলায় দুধের কাপটি ফিরিয়ে দিল বিনোদ। কিন্তু রাত্রে খাওয়ার সময় যখন বাটিতে ক'রে ফের খানিকটা গরম দুধ স্বামীর সামনে ধ'রে দিল লতিকা, বিনোদ আর ফিরিয়ে দিতে পারল না। সারাদিনভর আজ তার কাজের ফাঁকে ফাঁকে মনে হচ্ছিল, কি যেন খায়নি, কি যেন পায়নি, কি যেন বাদ গেছে জীবন থেকে। সারাদিনের খাটুনির শেষে অনেক বঞ্চনা, অনেক আশা-ভঙ্গের পর রাত দশটার সময় বাসায় ফিরে ডাল আর ডাঁটা চচ্চড়ি দিয়ে বাজে আটার শুকনো রুটি চিবিয়ে চিবিয়ে শেষে যখন ছোট একটু বাটিতে সাদা তরল পানীয়টুকু দেখতে পেল বিনোদ, ওর মন ব'লে উঠল,—এই সেই হারানো বস্তু, এই সেই পরম বস্তু।

বাটিটুকু ছোট হ'লে কি হবে, আজকের দুধটুকু বেশ ঘন আঁওটা, ওপরে একটু সরও পড়েছে। সরটুকু চেখে চেখে খেল বিনোদ। তারপর বলল, 'আরো দু'খানা রুটি দাও তো ছিঁড়ে, দুধের সঙ্গে খাই। পেটটা যেন কিছুতেই ভরছিল না। কাল থেকে দুধটা রাত্রেই দিয়ো।'

লতিকা হাসি চেপে বলল, 'তাই দেব।'

কিন্তু আশ্চর্য, পরদিন রাত্রে বিনোদ দেখে পাতের ওপর শুধু রুটির রাশই রয়েছে, পাতের কাছে দুধের বাটি নেই।

উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বিনোদ জিজ্ঞেস করল, 'দুধ কি হ'ল ?'

লতিকা বলল, 'সুনীলকে দিয়েছি। আজ তো এক-বেলার জন্যেও আর মাছ আসেনি। খাওয়া নিয়ে বড়ই মাতলামি করছিল। রোজ দুধ চায়, আজ দিলাম ও'কে।' বিনোদ গম্ভীর ভাবে বলল—'বেশ করেছ'।

দিনকয়েক বাদে ফের একদিন বিনোদের পাতের কাছে দুধের বাটির অভাব হ'ল। সে কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই লতিকা বলল, 'আজ কিন্তু তোমার দুধটুকু ঠাকুরপোকে দিয়েছি। চাকরির চেষ্টায় বেরিয়েছিল। ফিরে এল দুপুরের পর। খেতে ব'সে ভাত আর পারে না খেতে। রোজই তো ওই চিংড়ির কুচো আর পুঁই চচ্চড়ি। একটু আমসত্ত্ব ভিজিয়ে আজ দিলাম ওকে ওই দুধটুকু বললে বিশ্বাস যাবে না, তাই দিয়ে ঠাকুরপো আধ থালা ভাত খেয়ে উঠল।'

বিনোদ বলল, 'বেশ করেছো, কিন্তু চাকরির কথা কি বলল। অত যে সুপারিশ চিঠি-ফিটি জোগাড় ক'রে পাঠালাম, কি হ'ল তার ?'

লতিকা বলল, 'হয়নি। ব'লে দিয়েছে খালি নেই

বিনোদ বলে উঠল, 'ওর জন্যে খালি আর হবেও না, দুধই খাওয়াও আর আমসত্ত্বই খাওয়াও, জীবনে ওর চাকরি হবে না ব'লে দিলাম।' বেশির ভাগ রুটি-তরকারি ফেলে রেখে বিনোদ উঠে দাঁড়াল। পরদিন থেকে ফের দুধ পেতে লাগল বিনোদ মাঝখানে আবার দু'একদিন বাদ গেল।

লতিকা বলল, ভারি দুষ্টু হয়েছে সুনীল, ভারি ছোঁচা হয়েছে আজকাল। টিফিন করতে এসে রান্নাঘরে ঢুকে কড়ার মধ্যে কাপ ডুবিয়ে দুধ চুরি ক'রে খায়। ওকে নিয়ে আর পারা গেল না।'

বিনোদ বলল, 'হুঁ।'

লতিকা বলল, 'আমি ক'দিন ধরেই দেখছিলাম। আজ কড়া শাসন ক'রে দিয়েছি। আস্ত একখানা চেলাকাঠ ভেঙেছি পিঠে। যদি প্রাণের ভয় থাকে, জীবনে আর দুধের কড়ার কাছে যাবে না।'

বিনোদ বলল, 'হুঁ, ছেলেবেলা থেকেই এত লোভ ভালো না।'

আরও কাটল দিন কয়েক। তারপর ফের একদিন পাতের কাছে দুধের বাটি দেখতে না পেয়ে বিনোদ জিজ্ঞেস করল, 'আজও কি সুনীল দুধ চুরি ক'রে খেয়েছে নাকি ? ওর সাহস তো কম নয়, অত মার খাওয়ার পরেও—'

লতিকা মুখ টিপে একটু হেসে বলল, 'না, আজ আর ও চুরি করেনি। পাশের বাড়ির সাদা বেড়ালটা এসে দুধ খেয়ে গেছে।'

বিনোদ রাগ ক'রে উঠল, 'পাশের বাড়ির বেড়ালে এসে দুধ খেয়ে গেল, আর তুমি হাসছ। এত দামী দুধ। ঢেকে-টেকে সাবধান ক'রে রাখতে পার না। চার আনা ক'রে এক পো দুধ। সোজা

কথা। গেল তো কতগুলি পবেব বাড়ির্ব বেড়ালেব পেটে। পযসা তো আব নিজে কামাই কব না। কি বুঝবে তাব মর্ম।'

লতিক বলল, 'নিজে কামাই না কবলেও বুঝি। ভয নেই। সত্যিই আব পবেব বেডালে কড়া থেকে দুধ খেযে যাযনি। আমি অত অসাবধান না। তোমাব নিজেব বেডালই খেযেছে দুধ। হ'ল তো।'

লতিকা ফেব একটু হাসল।

বিনোদ এবাবও ব্যাপাবটা বুঝতে না পেবে বলল, 'বাত দুপুবে কি যে মস্কবা কব, ভালো লাগে না। কি হযেছে খুলেই বল না বিষযটা।'

লতিকা এবাব বিষযটা খুলেই বলল। ক'দিন ধ'বেই তাব অম্বলেব দোষটা বেডেছে। যা খায তাই ভিতব থেকে বেবিযে আসে। টক টক ঢেঁকুব ওঠে, সাবা দিন অস্থিব-অস্থিব লাগে। আজ দুপুবেব পব একেবাবে বমিই হযে গেল, যা খেযেছিল, কিছুই বইল না পেটে। বিকেলবেলায খিদেয় আব বাঁচে না। 'কি খায, কি খায। অথচ যা মুখে দেবে তাতেই অম্বল হবে। অবস্থা দেখে দোতলাব মুখুয্যেদেব মাসীমা বললেন, 'এক কাজ কব বউমা, ঘবে তো তোমাদেব দুধ আছে। তাব মধ্যে এক মুঠ খই ভিজিযে খাও। তাতে অম্বল হবে না। দেহটাও ভালো থাকবে।'

লতিকা তাঁব পবামর্শই নিল। তাই কি সুস্থভাবে খাওযাব জো আছে। স্কুল থেকে সুনীল এসে হাজিব। 'মা, তুমি লুকিযে লুকিযে কি খাচ্ছ ?'

'মধু খাচ্ছি, নে।'

তাব হাতেও দিতে হ'ল এক দলা।

খাওযা শেষ ক'বে থালাব ওপব সশব্দে গ্লাসটা তুলে বেখে বিনোদ বলল, 'তা খেযেছ খেযেছ, তাব অত ভণিতাব কি ছিল। বেড'ল, অম্বল, কত কি। বললেই পাবতে দুধ খাওযাব ইচ্ছা হযেছিল, তাই খেযেছি।'

লতিকা ভেবেছিল তাব দুধ খাওযাব কথা শুনে স্বামী একটু হাসবে, হযত একটু ঠাট্টা পবিহাস কববে। কিন্তু স্বামীব মুখ দেখে, মূর্তি দেখে সে প্রথমে খানিকটা অবাক হ'যে থেকে অতিমাত্রায সবাক হ'যে উঠল। 'তোমাব ধাবণা আমি সাধ ক'বে খেযেছি, ইচ্ছা ক'বে খেযেছি।'

বিনোদ বলল না, ইচ্ছা ক'বে খাবে কেন। পাডাব আব কেউ এসে তোমাব গলায ঢেলে দিযে গেছে।

লতিকা বলল, 'খেযেছি তো বেশ কবেছি। তুমি তিবিশ দিন খেতে পাব আব আমি একদিনও পাবিনে।

বিনোদ আঁচাতে যেতে যেতে মুখ ফিবিযে তাকিযে অদ্ভুত একটু হাসল, 'আসলে সেই হচ্ছে কথা। আমি যে একটু ক'বে দুধ খাই তা তোমাব প্রাণে সয না, তা তুমি দু'চোখে দেখতে পাব না। সেই হিংসেয জ্বলেপুডে মব।

লতিকা বলল, 'তোমাব দুধ খাওযা দেখে আমি জ্বলেপুডে মবি। মবি তো বেশ কবি। বুডো বেটা তুমি, লজ্জা কবে না বোজ বোজ সকলেব সামনে দুধ খেতে। একদিন দুধ কম পডলে তাই নিযে বাডি মাথায কবতে।'

এঁটো হাতেই বিনোদ কখে এল, 'লজ্জা কববে কেনবে হাবামজাদী, আমি কি তোব বাপের পযসায দুধ খাই, নিজেব পযসায খাই—নিজে খাই আমি। লজ্জা তোদের কবা উচিত।'

পাশেব ঘব থেকে বিজন এল বেবিযে, 'কি, হযেছে কি ? বাত দুপুবে কি শুরু কবেছ তোমবা ? কি নিযে ঝগডা ?'

লতিকা বলল, ঝগডা কি নিযে শুনবে। ক্ষিদেয় না থাকতে পেবে আমি আজ দুধটুকু খেযে ফেলেছি।'

বিজন বলল, 'ছি ছি ছি, তোমবা হ'লে কি বউদি।'

গোলমালে ঘুম ভেঙে যাওযায সুনীলও উঠে দাঁডাল। একটু কান পেতে সকলেব কথাবার্তা শুনেই সমস্ত ব্যাপাবটা সে বুঝতে পাবল। আস্তে আস্তে গিযে বিজনেব গা ঘেঁষে দাঁডিযে ফিস ফিস

ক'রে বলল, 'জানো কাকু, সেদিন একটু দুধ খেয়েছিলাম ব'লে আমাকে কি মারটাই না মারলে। আজ নিজে চুরি ক'রে খেয়েছে, আজ নিজে মার খাচ্ছে। বুঝুক মজা।'

বিজন বলল, 'ছিঃ, ওকথা বলে না কাকু। যাও তুমি ঘুমোও গিয়ে।'

সুনীল খানিক বাদেই ঘুমোল বটে, কিন্তু বিনোদ আর লতিকা সারা রাতের মধ্যে চোখ বুজল না। এক ফোঁটা দুধের জন্যে এত কেলেঙ্কারী ছিল ভাগ্যে! লতিকা বার বার নানা সুরে নানা স্বরগ্রামে এই কথাই বলতে লাগল। সংসারে এসে কোন্ সাধটা তার মিটেছে, শাড়ি গয়নার, কোন্ সুখটা করেছে। সুখ তো ভালো—সারাদিন যদি সে না খেয়েও থাকে, কেউ আহা বলবাব নেই, কেউ জিজ্ঞেস করবাব নেই। লতিকা সারা রাত ফোঁস ফোঁস ক'রে কাঁদতে লাগল আব বিলাপ কবতে লাগল। বিনোদ বাবকয়েক বিবক্তি প্রকাশ ক'রে বলল, 'আঃ, জ্বালাতন ক'রে ছাড়লে, রাত্রে কি একটু আমাকে ঘুমুতেও দেবে না? কাল তো ভোরে উঠে আমাকে ফের কাজে বেরোতে হবে।'

ধমক খেযে লতিকার কান্নার বেগ আবো বেড়ে গেল।

বিনোদ এবার স্ত্রীকে একটু কাছে টেনে নেওয়ার চেষ্টা কবল, বলল, 'সামান্য দুধের জন্যে—'

লতিকা বলল, 'হ্যাঁ, সামান্য দুধের জন্যে তুমি আমাকে মারতে পর্যন্ত গিয়েছিলে। আমি তো মরে গেলেও আর দুধ কোন দিন মুখে দেব না।' অনেক সাধ্য সাধনায় স্ত্রীকে শান্ত কবল বিনোদ। শেষ রাত্রে দেখা গেল কোলেব মেয়েকে বাঁ দিকে সবিয়ে বেখে লতিকা বিনোদের কোলের কাছে এসে ঘুমিয়েছে।

পবদিন ভোরে গোয়ালা দুধ দিয়ে গেল। লতিকা তাড়াতাড়ি জ্বাল দিয়ে নিয়ে এল দুধ। কাপে ঢেলে বিনোদেব সামনে এগিয়ে দিল। বিনোদ বলল, 'এ আবার কি!'

লতিকা বলল, 'তুমিই খাও, সাবাদিনভর এ দুধ আমি বাখতে পারব না। কে কখন এসে মুখ দেবে তাব ঠিক কি।'

বিনোদ আব কিছু না ব'লে বাঁ হাতখানা আলগোছে স্ত্রীর পিঠেব ওপর বেখে, মৃদু হেসে দুধের কাপটি তাব মুখের সামনে তুলে ধবল।

লতিকা হেসে বলল, 'হযেছে, থাক।'

'কি বউদি, চাযেব কদ্দুর।'

ব'লে বিজন ঘবে ঢুকেই থমকে গেল। মুখ ফিবিযে নিযে তাড়াতাড়ি পালিযে যাচ্ছিল, লতিকা দুধের কাপ হাতে ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, 'পালাচ্ছ কেন ঠাকুবপো, নাও, দুধটুকু খাও তুমি আজ। আহা কি চেহাবাখানাই করেছ। নাও দুধটুকু।'

বিজন বলল, 'তোমাব চেহারাখানাই বা এমন কোন বীরাঙ্গনার! তুমিই খাও বউদি।'

লতিকা বলল, 'তুমি খেলেই আমার খাওয়া হবে, ঠাকুরপো।'

বিজন আর কোন কথা না ব'লে, দুধের কাপটি হাতে নিল।

পূর্বদিকের বাবান্দায় সুনীল মাদুর বিছিযে বইপত্র নিয়ে বসেছে। আর আড়চোখে তাকাচ্ছে ঘরের দিকে। দেখছে বাবা মা কাকার অদ্ভুত কাণ্ড। সুনীল একা নয়। তার কাছে এসে বসেছে পাশের বস্তীর ফটিক। সে তাদের ক্লাসেই পড়ে। কিন্তু সুনীলদের চেয়েও তাদের অবস্থা খাবাপ। সব বই কিনে পড়তে পাবে না। শুধু যে নোটবইগুলিই তার নেই তা নয়, মূল ইংরেজী বইখানা পুরনো কিনেছিল ব'লে, একটা গল্পের খানতিনেক পাতাই তার মধ্যে নেই, বোধ হয় আগের মালিক নকল কববার জন্যে ছিঁড়ে নিয়েছিল। ফটিক পেনসিল দিয়ে নিজের খাতায় গল্পের সেই ছিঁড়ে-যাওয়া অংশটা লিখে নিচ্ছিল।

বিজন বারান্দায় নেমে সুনীলকে হাতের ইসারায় কাছে ডেকে নিল। তারপর দুধের কাপটি তার সামনে ধ'রে বলল, 'নে সুনীল।'

সুনীল বলল, 'তুমি খাও কাকা, তুমি তো কোন দিন খাও না।'

বিজন বলল, 'আরে তুই খা। তুই খেলেই আমার খাওয়া হবে।'

সুনীল আর কোন কথা না ব'লে কাপটি নিয়ে ফিরে এল নিজের জায়গায়। ফটিক মাথা নিচু ক'রে পড়া টুকছে। কালো রোগা চেহারা। কির-কির করছে হাড়গুলো। পিঠের দুটো হাড় গরুড়

পাখির দুই ডানার মত উঁচু হয়ে রয়েছে। দেখে দেখে সুনীল বলল, 'এই ফটিক, শোন। লেখা পরে টুকিস, দুধের কাপটা ধরতো।'

ফটিক মুখ তুলে লজ্জিত ভাবে বলল, 'না ভাই, তুই খা।'

সুনীল বলল, 'আরে দূর পাগল। আমি তো রোজই খাই, আজ তুই নে। তুই খেলেই আমার খাওয়া হবে।'

ভাদ্র ১৩৭৯

যাত্রাপথ

ছাব্বিশে জুলাই কলকাতার একটি বিখ্যাত দৈনিক পত্রিকায় সভাসমিতিব স্তম্ভে এই সংক্ষিপ্ত খবরটুকু বেরিয়েছিল : সুসাহিত্যিক অনন্তচরণ মালোর প্রথম স্মৃতিবার্ষিকী। স্থান—রামমোহন লাইব্রেরী হল। সময়—অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকা। সভাপতি—সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অনিরুদ্ধ সেন। আহ্বায়ক—বারিধি দত্ত।

সাধারণতঃ সভাসমিতিব স্তম্ভে আমার চোখে পড়ে না, কারণ কোথাও কোন সভায় আমি যাই নে। অফিসে বেবোবার আগে খবরেব কাগজের বড় বড় হরফগুলিতে শুধু একবার করে চোখ বুলিয়ে যাই। সেদিন যে সভাসমিতির কলমটা দেখলাম তা দৈবাৎ নয়, আহ্বায়ক বারিধিবাবু আমাকে আগের দিন একখানি হাতচিঠি পাঠিয়েছিলেন। সে চিঠিতে অনুবোধ ছিল অনন্ত মালোর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলতে হবে। আমার কোন ভয়ের কারণ নেই। এ সভা পার্ক-ময়দানের সভা নয়। গলা খুলে চেঁচিয়ে বক্তৃতা করতে হবে না, মন খুলে গল্প করলেই চলবে। অনন্ত'র জীবনের গল্প। সভায় বেশি লোকজন হবার আশা অথবা আশঙ্কা নেই, কারণ অনন্ত'ব সাহিত্যিক খ্যাতি নিতান্তই অল্প কয়েকজন বন্ধুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। খ্যাতিও ঠিক বলা চলে না। সে লিখত—এই তথ্যটুকুই শুধু আমাদের জানা ছিল। তার লিখিত বস্তুর সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল না।

সভাসমিতিতে না গেলেও অনন্ত'র স্মৃতিবার্ষিকীতে অনুপস্থিত থাকতে কেমন যেন বাধল। বন্ধুবর বারিধিবাবুর অনুরোধও অবহেলার যোগ্য নয়।

তাই অফিস ছুটির পরে পাঁচটায় গিয়ে হাজির হলাম রামমোহন লাইব্রেরী হলে। গিয়ে দেখি কবি নিরুপম গুপ্ত ছাড়া আর কেউ তখনো আসেনি। এদিকে সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে।

নিরুপম বলল, 'কল্যাণদা, ভেবেছিলাম আমরাই বুঝি লেট লতিফ। কিন্তু তা নয়, লতিফের পরেও রহিম রহমানদের দল আছেন। আসুন ধীরে সুস্থে দু কাপ চা খাওয়া যাক। আপনি তো জোর বক্তৃতা করবেন, গলা ভিজিয়ে নেন একটু।'

আমি মোটেই বক্তৃতা করতে পারিনে—সেই ঠাট্টাই করল নিরুপম। রাস্তা পার হয়ে পশ্চিম দিকের একটা রেস্টুরেন্টে আমবা চায়ের কাপ নিয়ে মুখোমুখি বসলাম।

নিরুপম চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'কিছু লিখে-টিখে এনেছেন তো?'

আমি পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বের করে ওকে দেখালাম। তাতে শুধু লেখা আছে—'মাননীয় সভাপতি মহাশয় ও উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী।' কাগজের বাকি অংশ সাদা।

নিরুপম হেসে বলল, 'করেছেন কি দাদা। আপনি তো কলমের মুখে ছাড়া এক অক্ষরও মুখে বলতে পারেন না, সভায় বলবেন কি করে।'

বললাম, 'ভেব না, নিরুপম,কলম থেকে নিবটা খুলে দুই ঠোঁটের মাঝখানে বসিয়ে নেব। হয়ে যাবে। আমার কথা ছেড়ে দাও। তুমি কি লিখেছ। কবিতা টবিতা এনেছ নাকি কিছু।'

নিরুপম বলল, 'কি যে বলেন। শোকসভায় কবিতা পড়া বড় সেকেলে হয়ে গেছে। তা ছাড়া ইচ্ছে করলেই আজকাল যখন তখন কবিতা লিখতে পারি নে। আচ্ছা, অনন্তবাবুও তো এক সময় কবিতা লিখতেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ, কবিতা দিয়েই শুরু করেছিল। বাংলা দেশের শতকরা নিরানব্বই জন সাহিত্যিক যেমন করে—তারপর বেশির ভাগ লেখকেরাই যেমন ছেড়ে দেয়, সেও তেমনি ছেড়ে দিয়েছিল কবিতা।'

নিরুপম বলল, 'কবিতা ওর দেখেছি মাঝে মাঝে। তেমন ভাল করে মনে নেই। কবিতা বোধ হয় শেষ দিকে ওঁর তেমন আসত না। অথচ আশ্চর্য দেখুন, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ওঁর জীবন একখণ্ড কাব্যই ছিল।'

বললাম, 'এ সম্বন্ধে আমার একটা থিয়োরী আছে নিরুপম। যারা জীবনশিল্পী, তারা কদাচিৎ জাতশিল্পী হয়। তারা জীবন দিয়ে জগতের বুকে গল্প লেখে, কবিতা লেখে—কাগজ-কলমের অপেক্ষা রাখে না। আর যদি বা কাগজ-কলম তারা ধরে, তাদের মনের কথা ছাপার অক্ষরে ঠিক তেমন করে ধরা পড়ে না। আমাদের অনন্ত ছিল সেই—সেই প্রথম জাতের শিল্পী।'

রেস্টুরেন্ট থেকে দেখতে পেলাম লাইব্রেরী হলের সামনে ততক্ষণে তিন চারজন লোকের ভিড় জমেছে। তার মধ্যে একজন স্বয়ং আমাদের আহ্বায়ক বারিধি দত্ত। আমাদের দেখতে পেয়ে রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে তিনি তখনো আমাদের আহ্বান করছেন। প্রবীণ সাহিত্যিক অনিরুদ্ধ সেনের গাড়িও এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণ। আমরা আর দেরি করলাম না। বয়কে চায়ের পয়সা চুকিয়ে দিয়ে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলাম

অতবড় লাইব্রেরী হলে মাত্র জনকয়েক লোক জমেছে। এদের বেশির ভাগই অনন্তর বিভিন্ন অফিসের সহকর্মী বন্ধু। সভাপতি ঘড়ি দেখলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও। ছটা বেজেছে। কিন্তু গুণতিতে তখনো বারজনের বেশি লোক হয়নি। বারিধিবাবু জনারণ্য আশা করেননি। কারণ, অনন্ত মরবার আগে জনপ্রিয়তা অর্জন করে যায়নি। তবু স্বজন বন্ধুদের সংখ্যা আরো দু-চারজন বেশি হবে—এইটুকু প্রত্যাশা বারিধিবাবুর ছিল। ভারি অপ্রস্তুত হলেন তিনি। বারিধি যেন শুকিয়ে গিয়ে জলবিন্দু হলেন।

অনিরুদ্ধবাবুই প্রস্তাব করলেন, 'লোক যখন তেমন জমল না চলুন আমরা দোতলার ছাদে গিয়ে বসি।'

তাঁর প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমেই গৃহীত হল। ছাদে নয়, ছাদের লাগা ছোট ঘরটিতে গিয়ে মাদুর বিছিয়ে তার ওপর বসলাম আমরা। দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসলেন প্রবীণ সম্পাদক প্রমথ লাহিড়ী, খ্যাতনামা সাহিত্যিক সুধীর ধর, রতীন সেন, ভূপাল ভৌমিক, অনন্তর পাবলিশার বন্ধু সুহাস রায়। ছোট্ট একখানা জলচৌকি সামনে করে আমাদের মুখোমুখি বসলেন সভাপতি অনিরুদ্ধ সেন। তাঁর ডানদিকে রইলেন আহ্বায়ক বারিধিবাবু আর তাঁর তীরবর্তী কাগজ-পেনসিল সামনে নিয়ে আমাদের কবিবন্ধু নিরুপম গুপ্ত। নিরুপম সব্যসাচী। গদ্যে পদ্যে বাদে অনুবাদে সমান সুদক্ষ। তা ছাড়া বক্তৃতার রিপোর্ট নেওয়াও ওর অভ্যাস আছে। নিরুপম সত্যিই আটপিঠে, আমার মত একপিঠে নয়।

অনিরুদ্ধবাবু প্রথমে বয়োজ্যেষ্ঠ লাহিড়ী মশাইকেই অনন্ত'র সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে বললেন। লাহিড়ী মশাই শুধু সুপণ্ডিত নন, সুবক্তাও। অনন্ত'র সঙ্গে কয়েক বছর ধরে তার খুব ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে তিনি তাঁকে শেষ কয়েক বছর এবং শেষ দিনটি পর্যন্ত জেনেছেন। তাঁরই চেষ্টায় কাঁচড়াপাড়া টি বি হাসপতালে অনন্ত স্থান পেয়েছিল। আরো নানা রকম ভাবে তাকে সাহায্য করেছেন লাহিড়ীমশাই। বক্তৃতায় সে সব কথা অবশ্য তিনি কিছুই উল্লেখ করলেন না। মানুষ হিসেবে অনন্ত যে কত সরল আর অনাড়ম্বর ছিল, কত সহজ তার পরার্থপরতা—সেই কথাই প্রাঞ্জল ভাষায়, ছোট-খাট দৃষ্টান্তে বলে গেলেন প্রমথবাবু। সভাপতিমশাই এর পর সুধীরবাবুকে বলবার

জন্যে অনুরোধ করলেন। ধরমশাই উপনিষদে সুপণ্ডিত। শোকসভার শ্লোক তিনি আবৃত্তি করলেন। সব শেষে বললেন, 'শিল্পীর চেয়ে মানুষ বড়। পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে বড় দান মনুষ্যত্ব। অনন্ত'র স্বল্পপরিসর জীবনে যে ক'জন স্বজন-বন্ধু তার কাছে আসতে পেরেছে, তাদের সে সাধ্যমত সাহিত্যরস পরিবেশন করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়ে বেশি দিয়েছে মানবত্বের মধু। সে মাধুর্যের অন্ত নেই। ব্যক্তিত্বের সেই স্বাদ জীবনান্ত স্থায়ী।'

ধীরে ধীরে সেই ছোট্ট শোকসভা জমে উঠল। জমে উঠলই বলছি। চোখের কোলে নিটোল অশ্রুবিন্দু যেমন জমে। অনন্ত'র মৃত্যুশোক আমাদের সদ্য শোক নয়, এক বছর আগেকার ঘটনা। রক্ত-সম্বন্ধের আত্মীয়তাও তার সঙ্গে আমাদের কারো নেই। তাই কারো গলা বাষ্পে আর্দ্র হল না, চোখের কোণে কারো অশ্রু দেখা দিল না, কিন্তু মনের মধ্যে সকলেরই যেন দু ফোঁটা তরল অশ্রু টল টল করতে লাগল।

কবি রতীন সেন অনন্ত'র স্মৃতিরক্ষার জন্যে কয়েকটি প্রস্তাব আনলেন। ওর নামে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার কথা তুললেন। প্রাবন্ধিক ও কবি বললেন, ওর বইগুলি প্রকাশের কথা। এ পর্যন্ত একখানা বইও অনন্ত'র প্রকাশিত হয়নি। নানা স্বল্পায়ু সাময়িকপত্রে ওর লেখাগুলি ছড়িয়ে আছে। দু-একখানা উপন্যাস আছে পাব্লিশারের দেরাজবন্দী হয়ে। ভৌমিকমশাই সেগুলি প্রকাশের জন্যে উদ্যোগী হতে বললেন সভাকে।

কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগল সুহাস রায়ের বক্তৃতা। বক্তৃতা বললে অন্যায় হবে। তিনিও আর সবাইর মতই মাদুরের ওপর বসে বসেই বললেন। অনন্ত'র কৈশোর, তার স্কুলজীবন, মাসপয়লা কাগজে কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে প্রথম হওয়া, তার কৃচ্ছ্রতা, তার সাহিত্যানুশীলনের অনেক কাহিনীই তিনি গল্পাকারে বলে গেলেন। বলবার ভঙ্গিতে দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ তথ্যগুলি যেন এক পরম সত্যের মর্যাদা পেল। আমার এই কাহিনীর কোন কোন অংশে রায়মশাই-এর সেদিনের বলা দু-একটি তথ্য ধরে নেব। শেষে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন তাঁর কাছে অনন্ত'র যে একখানি উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি রয়েছে, তা তিনি শিগগিরই প্রকাশ করবেন।

সভাপতির ভাষণের সময় হল। তিনিও সংক্ষেপে অনন্ত'র সারল্য, তার নীতিনিষ্ঠার কথা উল্লেখ করলেন। শেষে বললেন, 'অনন্ত ছিল খাঁটি সোনা। তার মধ্যে কোন খাদ ছিল না, তাই সে এত শিগগির গলে গেল। আমাদের মধ্যে খাদের ভাগ বেশি, গিল্টির ভাগ বেশি, তাই আমরা টিঁকে আছি।'

সেদিনের শোকসভার এই বিবরণ অত্যন্ত অসম্পূর্ণ। তাঁদের বক্তৃতার রিপোর্ট ঠিক ঠিক এখানে দিতে পারলাম না বলে সেদিনের সভাপতি আর উপস্থিত বক্তারা অপরাধ নেবেন না। রিপোর্ট দেব কি, রিপোর্ট নিতে আমি পারিনে। তা পারে নিরুপম গুপ্ত। তার সুদীর্ঘ রিপোর্ট পরদিনের দৈনিক কাগজে ছাপাও হয়েছিল।

সভা শেষ হলে আমরা সবাই উঠে দাঁড়ালাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হল আহা, আমি তো কিছুই বললাম না। অনন্ত'র স্মৃতিবার্ষিকীতে আমি একেবারেই চুপ করে রইলাম! গোড়াতেই অবশ্য বক্তাদের তালিকা থেকে আমার নাম বাদ দেওয়ার জন্যে আমি চুপি চুপি বারিধিবাবুকে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু সে অনুরোধ যে তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন, তা আশঙ্কা করিনি। অবশ্য আমাকে কিছু বলতে না বলে তিনি বন্ধুকৃত্যই করেছেন। বলতে আমার যে কি কষ্ট হয়, শ্রোতাদের যে আমি কি কষ্ট দিই, তা তিনি জানেন। তবু অনন্ত'র স্মৃতিসভায় কিছু বলতে না পেরে কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করলাম।

ঘর থেকে সবাই মিলে বেরিয়ে আসছি—দেখি, দোরের পাশে একটি তেইশ-চব্বিশ বছরের মেয়ে তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার সিঁথিতে সিঁদুর আছে কিন্তু মাথায় আঁচল নেই। তিন-চার বছরের পুতুলের মত একটি মেয়ে তার সঙ্গে। সেও চুপচাপ গা ঘেঁষে রয়েছে মায়ের।

শুধু আমি নয়, তাকে দেখে দলের আরো কেউ কেউ চিনলেন। চিনলেন প্রমথ লাহিড়ীমশাই, বললেন, 'এ কি আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন।'

মেয়েটি নতমুখে বলল, 'এমনই।'

তারপর মেয়ের হাত ধরে সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে নামতে লাগল।
গীতা ভিতরে যায়নি কেন একথা অবশ্য আমি তাকে আর জিজ্ঞাসা করলাম না। কিন্তু গীতা জিজ্ঞাসা করল।
রাস্তায় নেমে ও আস্তে আস্তে বলল, 'আপনি কিছু বললেন না কেন কল্যাণদা।'
হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'কই তুমিও তো ভিতরে গিয়ে কিছু বললে না।'
গীতার গায়ের রঙ এখনো উজ্জ্বল গৌর। তাই মুখের আরক্ত আভাস ও কিছুতেই গোপন করতে পারল না। একটু বাদে বলল, 'কি যে বলেন, আপনার সঙ্গে আমার তুলনা? আমি কি কিছু বলতে পারি?'
বললাম, 'আমিও তাই, আমিও পারি নে।'
তারপর হঠাৎ ওর মেয়ের সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিলাম, 'তোমার নাম যেন কি খুকী।'
'আমার নাম জানেন না?'
বললাম, 'না তো। সংসারে আমরা বড়ই কম জানি। তোমার নাম কি?'
'মিনু গঙ্গোপাধ্যায়। আমার বাবার নাম শ্রীশীতাংশু গঙ্গোপাধ্যায়। আমার বাবা আমার কাছে কত চিঠি লেখে।'
হেসে বললাম, 'তাই নাকি। কেবল কি তোমার কাছেই লেখে?'
আমি গীতার দিকে তাকালাম, 'শীতাংশুবাবু সিউড়ীতে বাসা করছেন না কেন? এখন তো কলেজে পার্মানেণ্ট হয়েছেন।'
গীতা বলল, 'এখানে বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ী রয়েছেন। তাঁরা যেতে চান না। তা ছাড়া, ভালো বাড়ি সব সময় পাওয়া যায় না।'
বললাম, 'তা ঠিক। তোমরা কি সেই বাগবাজার নিবেদিতা লেনেই আছো নাকি?'
গীতা বলল, 'হ্যাঁ। যাবেন একদিন বাসায়।'
বললাম, যাব। ভালো কথা—তোমার কাছে অনন্তর কি কোন লেখা-টেখা আছে?'
গীতার মুখ ফের আরক্ত হল—বলল, 'না। যদি থাকেই, কি করবেন তা দিয়ে। আপনাদের কাছে যেসব লেখা রয়েছে তাই তো এখন পর্যন্ত ছেপে বের করতে পারলেন না।'
বিনা প্রতিবাদে এই তিরস্কারটুকু সহ্য করলাম।
আমরা দুজনে দু দিকে যাব। গীতা উত্তরে, আমি দক্ষিণে। রাস্তা পার হয়ে আমিই ওকে বাসে তুলে দিতে গেলাম। প্রথম বাসটায় তেমন ভিড় ছিল না। গীতা তবু সেটা ছেড়ে দিল।
বললাম, ট্রামে যাবে নাকি?'
গীতা পরম উদাসীনভাবে বলল 'একটা কিছুতে গেলেই হয়। আমি কিন্তু ভেবেছিলাম আপনি সত্যিই কিছু বলবেন।'
গ্যালিফ স্ট্রীটগামী একটি ট্রাম এসে স্টপে দাঁড়াল। মেয়েকে নিয়ে গীতা ভিতরে গিয়ে ঢুকল। ট্রামটা চলে যাওয়ার পরও আমি মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইলাম। আশ্চর্য, এতদিন পরেও গীতা তাহলে ওকে মনে রেখেছে। অনন্তর স্মৃতিসভায় আসবার এখনো সাহস আছে ওর। আমাদের বাঙালী মধ্যবিত্তের ঘরে এ সাহস খুব সুলভ নয়। গীতা অবশ্য চিরদিনই সাহসের পরিচয় দিয়ে এসেছে। ভীরু ছিল অনন্ত। এসব ব্যাপারে ভয়ের ওর অন্ত ছিল না।
দক্ষিণমুখী ট্রাম কি বাস ধরতে হলে রাস্তা পার হতে হয়। কিন্তু আমি পার হলাম না। যে ফুটপাতে ছিলাম, সেই পথ ধরেই দক্ষিণমুখে এগোতে লাগলাম।
শহরের পথে মাঝে মাঝে একা একা হাঁটতে মন্দ লাগে না। ভাবতে ভাবতে হাঁটা যায়, হাঁটতে হাঁটতে ভাবা যায়। এটুকু অভ্যাস হয়ে গেছে, আর বিপরীতগামী পথচারীর সঙ্গে ধাক্কা লাগে না। অনন্তর সঙ্গে কথা বলতে বলতে এমন কতদিন হেঁটেছি। বাস-ট্রামটা পছন্দ ছিল না অনন্তর।
ও বলত, 'চল হে, হেঁটেই চল। গাড়ির ভিড়ের চেয়ে রাস্তার ভিড় ভালো।'
আজ আমি একলাই হেঁটে চলেছি। অনন্ত সঙ্গে নেই, কিংবা একথা ঠিক নয়, আজও অনন্ত সঙ্গে আছে। অনন্ত এই মুহূর্তে আছে। সত্যি, ওর সম্বন্ধে কিছু বললেই পারতাম। না হয় অনাহূত হয়েই

বলতাম। তাতেই বা কি ক্ষতি ছিল। কিন্তু কীই বা বলতাম। বলতে গেলে অনেক কথা এক সঙ্গে মিলে তালগোল পাকিয়ে যেত। তার চেয়ে বাসায় গিয়ে ওর সম্বন্ধে কিছু লিখলে হয়—আমার অকথিত অভিভাষণের অনুলিপি। এ রিপোর্ট খবরের কাগজে ছাপা হবে না। আমার খাতার কাগজেই আবদ্ধ হয়ে থাকবে। থাক না।

এই যে স্মৃতিসভায় বক্তার পর বক্তা ওর মহত্ত্বের কথা বললেন, ও জীবিত থাকতে সেই মহত্ত্ব কি ওদের সকলেরই চোখে পড়েছিল? মূল্যবান মণি বলে ওকে কি আমাদের বন্ধুর দল সত্যিই মনে করতে পেরেছিলাম? আমি তো অন্তত পারিনি। অথচ আমি তো ওর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই মিশেছি। ও আমার গাঁয়ের ছেলে। আমি তো ওর মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু দেখতে পাইনি। স্মৃতিসভায় বক্তার দল ওকে যতই মহৎ আখ্যা দিন, অনন্ত মহাবীর ছিল না, মহাপুরুষ ছিল না, মহা-সাহিত্যিক তো ছিলই না, কিন্তু আশ্চর্য, আজ মনে হচ্ছে তবু ও মহৎ ছিল। সংসারে ভালোমানুষ তো খুব বেশি মেলে না—তবু সাধারণ মানুষের ভালোত্ব আমাদের বিশেষ করে চোখে পড়ে না যেমন চোখে পড়ে একটি দুর্বৃত্তকে, একটি গুণ্ডা বদমাস লম্পটকে। ভালোমানুষ দুর্লভ হয়েও যেন আলো হাওয়ার মতই সহজ, একান্ত অনায়াসলভ্য। সে তো অপ্রত্যাশিত নয়, সে আমাদের চিরপ্রত্যাশিত। ভালো মানুষ যে আমাদের মনের মানুষ, একান্ত চেনা মানুষ। যেমন চেনা আমাদের বাপ মা ভাই বোন।

ওকে নিয়ে আমি কাল্পনিক গল্প বানাব না। ওর সাধারণ আটপৌরে জীবনের কথাই আমি লিখব তাতে যদি ওর মহত্ত্বকে চেনা না যায়, নাই বা গেল। কতকগুলি গুণবাচক বিশেষণ দিয়েই কি ওকে চেনাতে পারব। গুণের তালিকা মরা মানুষের অলঙ্কার। স্মৃতিসভায় বক্তারা তা নিয়ে বক্তৃতা করে। কিন্তু লোকসভার মানুষ আলাদা। কোন মানুষই খাঁটি সোনা নয়। খাঁটি সোনা একটি বস্তু, খাঁটি সোনা একটি ধাতু। কিন্তু মানুষ তো বস্তু নয়, সে ব্যক্তি, নানা ভাবে আর অভাবে, সাদায় কালোয়, আলোয় আঁধারে সে ব্যক্ত। নিরুপম বলেছে, ওর জীবন নাকি ছিল একটি খণ্ডকাব্য। কিন্তু সে কাব্য ছাপা বইয়ের মত ঝকঝকে তকতকে নয়। সে জীবন কবির পাণ্ডুলিপি। তাতে কত দাগ, কত কাটাকুটি, কত ভাবনা আর ভ্রূকুটির ছাপ। তবু তো কাব্য। সকলের জীবনকে তো এই আখ্যা দেওয়া যায় না।

অনন্ত আমাদের একই গাঁয়ের ছেলে কিন্তু একই পাড়ার ছেলে নয়। বামুন-কায়েতদের পাড়া ছাড়িয়ে গাঁয়ের উত্তর-পশ্চিমে নদীর ধার ঘেঁষে জেলেপাড়া। সব মিলে গায়ে গায়ে ঘেঁষা খানদশেক বাড়ি। শনের চাল আর বাঁশের বাঁখারির বেড়া ঘেরা ছোট ছোট ঘর। সামনে ছোট একটুকরো করে শরিকী উঠান। সে উঠানে দিনরাত জাল মেলা থাকে। ভেজা জাল বেয়ে বেয়ে জল পড়ে, গাবের কষ পড়ে। রোদে রাত'সে জাল শুকোয়, কিন্তু উঠোন আর শুকায় না।

অনন্ত'র বাবা গঙ্গাচরণ মালোর বাড়ি ছিল একেবারে ঘাটের ধারে। একটা কামরাঙ্গা গাছের সঙ্গে গঙ্গাচরণের জেলে-ডিঙিখানা বাঁধা থাকত। ঠিক বাঁধা থাকত না, নদীর এপার ওপার করত। ঘাটে দাঁড়িয়েই দেখা যেত নদীর ওপারে গঙ্গাচরণের ভেসাল। সে ভেসাল নদী ভরে নড়ে চড়ে বেড়াত। কখনো বাহাদের ঘাটের সামনাসামনি, কখনো বা সুতোরদের ঘাটের কাছে। ভেসাল নড়ত কিন্তু গঙ্গাচরণের ভাগ্য নড়ত না মাছ পড়ত না তার জালে। ছেলেবেলায় বড়দের ঠাট্টা করতে শুনেছি, 'মাছ পড়বে কি গঙ্গাচরণ, তুমি যে বোষ্টমচরণ হয়ে গেছ। এখন কণ্ঠী-টণ্ঠী বদলে ফেল।'

এ সব ঠাট্টার মানে তখন বুঝতাম না, বড় হয়ে বুঝেছি, প্রেমদাসের আখড়ায় তার বিধবা বোষ্টমীর সঙ্গে গঙ্গাচরণের ঘনিষ্ঠতা ছিল। রাত্রে রাত্রে তাকে নাকি মাছ যোগাত গঙ্গাচরণ। এই নিয়ে অনন্ত'র মা সারদা প্রকাশ্যে পাড়াপড়শীদের কাছে কোন্দল করত, আমার কাকার কাছেই নালিশ করত অনন্ত'র মা। খালুই নিয়ে আমরা ওদের বাড়িতে যেদিনই মাছ আনতে যেতাম, না ছাড়া হাঁ শুনতাম না গঙ্গাচরণের মুখে। গঙ্গাচরণ বলত, 'কাল রাত্তিরে মাছ পড়ে নি কর্তা।'

সারদা ঝঙ্কার দিয়ে উঠত, 'না পড়ে নি, রাতভরে মাছ পড়েছে। রোজ পড়ে, সে মাছ আপনিও দেখবেন না, আমিও দেখব না, কর্তা। সে মাছ সব যায় মাছরাঙার পেটে।'

প্রেমদাসের বোষ্টমী রাধারাণীর রঙটা ফরসাই ছিল। সারদা বলত 'মাগীটাকে আপনারা পাড়া

থেকে খেদিয়ে দিতে পাবেন না, কর্তা ? এ অনাচাব আপনাবা সইছেন কি কবে।'

কাকা মুখ টিপে টিপে হাসতেন। এ আচাব ওদেব ঘবে ঘবে ছিল। নিজেব সধবা স্ত্রী আব একটি বিধবা পবস্ত্রী, যাদেবই একটু অবস্থায় কুলোত, গঙ্গা যমুনা দুজন ছাড়া চলত না। গঙ্গাচবণেব অবস্থায় কুলোত না, তবু সে চালাতে চাইত। এই নিয়ে স্ত্রীব সঙ্গে বনিবনাও হত না, দিনবাত ঝগড়া লেগে থাকত। মাঝে মাঝে মাছমাবা বঁড়শীব ছিপ দিয়ে, সুপুবি গাছের তৈবি বৈঠা দিয়ে সাবদাকে বেদম মাবত গঙ্গাচবণ। অনন্ত বড় হয়েও সে মাব দেখেছে, বড় হয়েই সে মাব ঠেকিয়েছে। স্ত্রীকে তেমন ভালো না বাসলেও ছেলেকে খুবই ভালোবাসত গঙ্গাচবণ। আগে পিছে অনন্ত'ব অনেকগুলি ভাইবোন মাবা গেছে। মা-বাপেব আদবেব ধনই ছিল অনন্ত। ওব পাঁচ-ছয় বছব বয়স থেকেই গঙ্গাচবণ ছেলেকে নৌকোয় কবে ভেসালে নিয়ে যেত গঙ্গাচবণ উঠত ভেসালে আব অনন্ত গামছা গায়ে ডিঙি নৌকোয় চুপ কবে বসে থাকত। বোদেব তাপ যখন বেশি হত, পবনেব ছোট গামছাখানা মাথায় জড়িয়ে নিত অনন্ত। জাল উঠে এলে উৎসুক চোখ নিয়ে কখনো বা টিনেব কখনো বা বেতেব সেঁচনী হাতে জালেব কাছে এগিয়ে যেত। ছোট ছোট সাদা সাদা টাটকিনিগুলি নামিয়ে বাখত নৌকোব খোলে। যখন ওব চেয়েও বড় দু চাবটা বাযাক মাছ উঠত, অনন্তদেব ফুর্তিব সীমা থাকত না। কাবণ বাযাক মাছেব স্বাদ ভালো, বাজাবে বাযাক মাছেব দাম বেশি। ভাদ্র আশ্বিনে উঠত কালো কালো নইচাকাগুলো আব কালীবাউস। অনন্তব কথা মনে হলে আজো প্রথমে আমাব এই সব ছবিই মনে পড়ে আজও দেখতে পাই, শোল চাকিব মত কালো একটি ছেলে ছোট একটুকবো লাল গামছা কোমবে জড়িয়ে ডিঙি নৌকাব ওপবে অনন্ত বোদেব মধ্যে বসে আছে। কখনো বা বেতেব সেচুনীটাকে টুপিব মত চড়িয়েছে মাথায়। তাব ওপব টপ্ টপ কবে বৃষ্টি পড়ছে। বাড়িব চাকব আমাদেব নৌকা বেয়ে নিয়ে যেত কুমাবপুবেব গঞ্জে। বাবা কাকাব সঙ্গে এক একদিন আমবা কয়েক ভাই উঠতাম সেই নৌকোয়। জেলেদেব ঘাট দিয়ে যাওয়াব সময় দেখতাম অনন্তকে। নদীব উপবে ডিঙি। ডিঙিব উপবে অনন্ত। আবো অনেক উঁচুতে বাঁশেব ভেসালেব চুড়োয় নদীব তলায় জাল ফেলে জলেব দিকে অপলকে চেয়ে আছে গঙ্গাচবণ

কেবল গঙ্গাচবণ আব তাব ছেলেই নয় সপুত্র আবো অনেব জেলেই একটু দূবে দূবে নদীব মধ্যে ভেসালে এসে বসত যাদেব ছেলে থাকত না তাবা অল্পবয়সী মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে আসত। গঙ্গাচবণেব ভাযবা হবিচবণ ছিল গঙ্গাচবণেব শবিক একই বাড়িতে থাকত ওবা উত্তব-দক্ষিণে মুখোমুখি ছিল দুখানা ঘব। কিন্তু মাসেব মধ্যে পচিশ দিন ওদেব মুখ দেখাদেখি ছিল না। সাবদা আব মানদা দুই বোন প্রায় দুই সতীনেব মত ঝগড়া কবত। দুই ভাযবাব মধ্যেও যে ভ্রাতৃভাব ছিল, তা নয়। হবিচবণেব তিন মেয়ে ছিল পুঁটি বাতাসী আব মলুঙ্গী। বড় দুজনেব বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। ছোট মলুঙ্গীকে অত অল্প বয়সে বিয়ে দেয় নি হবিচবণ। বাপেব সঙ্গে সঙ্গে সেও ভেসালে যেত। গামছাকে শাড়িব মত কবে পবে সে ও গিয়ে বসত ডিঙিব ওপবে। মলুঙ্গীব বঙ ছিল অনন্তব মতই কালো, চুলগুলি ছিল কটা তেঁতুলেব ছড়াব মত গুটি দুই জট ছিল মাথায়।

কিন্তু মলুঙ্গীব কথা এখন যাক অনন্তব কথাটা বলি। একদিন নৌকোয় চড়ে ছাতা মাথায় দিয়ে পূজাব জামা কেনাব জন্যে যাচ্ছি বাবাব সঙ্গে কুমাবপুবে। গঙ্গাচবণেব ভেসালেব কাছে আমাদেব চাকব অনাথকে নৌকো ভিড়োতে বললেন বাবা। 'মাছ আছে নাকি গঙ্গাচবণ ?'

আজও বোদেব মধ্যে ডিঙিব ওপব বসে আছে অনন্ত। কিন্তু আশ্চর্য আজ ওব হাতে একখানা শ্লেট। কালো শ্লেটখানা আড়াআড়িভাবে ফাটা। পবনেব লাল গামছাব খুঁট দিয়ে শ্লেট পবিষ্কাব কবছে অনন্ত। বাবাব চোখও ওব দিকে পড়ল, 'ছেলেকে লেখাপড়া শেখাচ্ছ নাকি গঙ্গাচবণ ? এ বুদ্ধি হল কবে থেকে ?'

গঙ্গাচবণ ভেসালেব উঁচু চূড়া থেকে নিচে নেমে এল ডিঙিব ওপব। পবম অপ্রতিভ ভঙ্গিতে বলল, 'আজ্ঞে আমাব দোষ নেই কর্তা। সব অম্বিকা পণ্ডিতমশাই-এব কাণ্ড। তানাব খেযাল। মাছ নিয়ে পযসা দিতে পাবলেন না, ছেলেব কানে কু-মন্তব দিলেন, তাব হাতে ধবে দিলেন এই শ্লেট। আব দেখেন কি, আপনাদেব এবাব ভাত মাবা গেল কর্তা।'

গঙ্গাচবণ লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল

বাবা হেসে বললেন, 'তা বটে। কিন্তু তোমার ছেলের হাতের অক্ষরগুলি তো বড় সুন্দর। তুমি অ আ ক খ সব লিখতে পার খোকা?'

অনন্ত মৃদু হেসে বলল, 'পারি।'

গঙ্গাচরণ বলল, 'অ আ ক খ বলছেন কি কর্তা। মাস তিনেকের মধ্যে ও ফলা বানান সব সেরে ফেলেছে। ও নিজের নাম লিখতে পারে কর্তা।'

বাবা বললেন, 'লেখ তো তোমার নাম।'

অনন্ত পেনসিল হাতে আমাদের দিকে তাকাল, 'আগে বাবার নাম লিখব কর্তা?'

বাবা খুশি হয়ে বললেন, 'লেখ, লেখ।'

অনন্ত গোটা গোটা অক্ষরে লিখল 'গঙ্গাচরণ মালো।'

বাবা বললেন, 'তোমার দুঃখ ঘুচল গঙ্গাচরণ। ছেলে তোমার নাম রাখবে। দেখ, দেখ কী চমৎকার লিখেছে দেখ। খতে আর ওকে টিপসই দিতে হবে না।'

নিরক্ষর গঙ্গাচরণ ছেলের লেখা নিজের অক্ষরময় নামটির দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'ও আরো অনেক কথা লিখতে শিখেছে কর্তা।'

বাবা বললেন, 'তাই নাকি, লেখ তো।'

অনন্ত লিখল—

'রুই কাতলা বোয়াল শোল কই মাগুর সিঙ্গি
চুঁচড়া চাঁদা বাযাক পুঁটি টাটকিনি মলুঙ্গী।'

বাবা দেখে বললেন, 'বা! বা! এ যে রীতিমত এক মৎস্যকাব্য। চমৎকার হাতের লেখা। আর বেশ একটু ছন্দোজ্ঞানও আছে. এ কি তোমার নিজের বানানো, না বই থেকে নেওয়া?'

অনন্ত বলল, 'না কর্তা, বই থেকে নেব কেন। সবই তো আমাদের নদীর মাছ।'

বাবা আমার দিকে তাকালেন, 'খুব তো জামা জুতোর বায়না ধরেছ? পারো এমন সুন্দর করে লিখতে?'

বাবার প্রশ্নটা আমার বুকে তীরের মত গিয়ে বিঁধল। ঈর্ষার খোঁচা লাগল মনে। সে খোঁচা তারপরেও বহুদিন পর্যন্ত ছিল।

অনন্ত'র লেখা সেই প্রথম কবিতা।

আমি নিজেই আলাপ করলাম অনন্ত'র সঙ্গে, 'তুমি কোন ক্লাসে পড়?'

অনন্ত বলল, 'আমি ক্লাসে পড়িনে। তুমি পড় কোন ক্লাসে।'

আমি বুক ফুলিয়ে বললাম, 'অঘ্রাণ মাসে পরীক্ষা দিয়ে নিম্ন প্রাইমারি ক্লাসে উঠব। তারপর যাব এম ই স্কুলে।'

জানুয়ারি মাস থেকে অম্বিকা মাস্টারমশাই অনন্তকেও বোর্ড স্কুলে নিয়ে এলেন। বয়সে আমার সমান হলেও আমার চেয়ে দু ক্লাস নিচে ভর্তি হল অনন্ত। কিন্তু নিচে ভর্তি হলে হবে কি, ওর গুণপণার খ্যাতি আমাদের ওপরের ক্লাস পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। ওর হাতের লেখা ভালো. বানান নির্ভুল। রামায়ণ মহাভারত কণ্ঠস্থ। তা ছাড়া নিজে ও পদ্য লিখতে পারে। শুধু গাছের নাম দিয়েই নয়. ফুলের নাম দিয়ে পাখির নাম দিয়ে আবার এক সঙ্গে ফুল আর পাখি মিশিয়ে মিশিয়ে ও ছড়া লেখে।

বছরখানেক পরে ও নিজেও ভেসাল বাইতে শুরু করল। স্কুলের আগে ভেসালের কাজ সেরে আসে। কিন্তু বাবার সঙ্গে মাছ বেচতে যেতে পারে না বাজারে। তাই নিয়ে স্কুলের সামনে এসে গঙ্গাচরণ একদিন খুঁত খুঁত করছিল, মাস্টারমশাই তাকে ধমকে দিলেন, 'হারামজাদা, তুমি শালগ্রাম শিলা দিয়ে বাটনা বাটতে চাও? অনন্ত মাছ বেচতে যাবে কোন দুঃখে রে। ও আমার স্কুলের সেরা ছেলে। খবরদার ওকে যদি আর ভেসালের কাছে নিস! ওকি সোজা ছেলে রে? ও দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। তুই খরচ-পত্তর করে পড়া। এ ছেলে হয় জজ, না হয় ম্যাজিস্ট্রেট হবে—আমি বলে দিলাম।'

গঙ্গাচরণ বেশ মোটাসোটা জোয়ান পুরুষ। কালো গাব গাছের মত চেহারা। কিন্তু বিনয়ে ও যেন

একেবারে বাবলা হতে পারলে বাঁচে। ওর হাতের কালো ঘন লোমের মধ্যে ছোট ছোট সাদা সাদা মাছের আঁশ লেগে রয়েছে। সেই লোম আর আঁশভরা লম্বা হাতখানার বড় একটি থাবায় মাস্টার মশাই-এর পায়ের সবটুকু ধুলো যেন তুলে নিল গঙ্গাচরণ। ছেলেব মাথায় দিল, নিজের জিভে দিল। বলল, 'মাস্টারমশাই, জজ ম্যাজিস্ট্রেট দিয়ে আমার কাজ নেই, আপনারা দশজনে ভালো বললেই ভালো।'

আমি বোর্ড-স্কুল ছেড়ে দেওয়ার আগে ছোট্ট আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। নানা বড় বড় মারামারি হৈ-চৈ-এর কথা ভুলে গেলেও সে দিনের সেই ঘটনাটুকুর কথা এখনও বেশ মনে আছে।

মাস্টারমশাই স্কুলে এসেই কাঁধের জামাটা টেবিলের ওপব নামিয়ে রেখে বললেন, 'ঈস্, এক গ্লাস জল দে তো তোরা কেউ, কী রোদই উঠেছে বাইরে। তেষ্টায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে।'

ঘরের কোণে কালো একটি মাটির কলসী। তার মধ্যে ঠাণ্ডা জল। একটি তক্তার উপর গুটি দুই গ্লাস।

জেলা বোর্ডেব বাস্তা দিযে রোগা-মত একটা মুটে ঘোড়ার পিঠে বসে বেশ মোটাসোটা এক ভদ্রলোক কোথায় যাচ্ছিলেন। তাই দেখবার জন্যে সারা স্কুলের ছেলেরা জানলাব কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। আমিও ছিলাম তাদের মধ্যে। হঠাৎ আমাদের মাস্টারমশাই-এর গর্জনে চমকে উঠে আমবা ফিরে তাকালাম। জলভরা এনামেলের একটি গ্লাস হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে অনন্ত! আর মাস্টারমশাই তাকে অবিরাম ধমকে চলেছেন, 'হারামজাদা, ব্যাটা জেলে। তোর কি কোন আক্কেলবুদ্ধি জ্ঞানগম্যি হবে না? দিলি তো মাটির কলসীটাকে নষ্ট করে। গেল দু গণ্ডা পয়সা? তুই জল আনতে গেলি কোন্ আক্কেলে। তোর হাতেব জল এখানে খাবে কে?'

আমি স্পষ্ট দেখলাম অপমানে অনন্ত'ব ঠোঁট দুটি ফুলে উঠল। দু ফোঁটা চোখের জল টসটস করে পড়ল গ্লাসের মধ্যে।

অনন্ত বলল, 'কিন্তু মাস্টাবমশাই, আমাদেব হাতেব মাছ তো আপনারা খান।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'আরে ব্যাটা, সে জলের মাছ। হাতের মাছ খাই বলে তোর হাতের জল খাব? আমার বাপ দাদা কোনদিন খেয়েছে? বামুনের ছেলের জাত মারতে চাস তুই?'

শেষে কথাটা একটু তরল সুরেই বললেন অম্বিকা ভটচায।

অনন্ত এমনভাবে অপদস্থ হয়ে ধমক খাওয়ায় স্কুলেব ছেলেরা হাসাহাসি করতে লাগল। অস্বীকার কবব না, আমিও ছিলাম তাদেব দলে। যে কোনদিন ধমক খায় না, কোনদিন কোনরকম দুষ্টামি করে না, সেই ঠাণ্ডা শান্ত ভালো ছেলে অনন্তকে আজ মাস্টারমশাই শাসন করেছেন। কি মজা!

সারাটা দিন অনন্ত গম্ভীরভাবে তার নির্দিষ্ট জায়গায় বসে রইল। মাস্টরমশাই যা জিজ্ঞাসা করলেন, তার জবাব দিল। ছুটির পর বইপত্র নিয়ে শান্তভাবে বাড়ি চলে গেল। কিন্তু পরদিন স্কুলের সময় অনন্ত'র আর দেখা নেই। খোঁজ খোঁজ, কোথায় গেল অনন্ত। মাস্টারমশাই উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তার কি হয়েছে রে।'

সুতোরপাড়ার ফটিক হেসে বলল, 'মাস্টারমশাই, অনন্ত পালিয়েছে।'

'পালিয়েছে কি রে?'

'হ্যাঁ, মাস্টারমশাই, অনন্ত ভেসালে উঠে বসে আছে। ও আর স্কুলে আসবে না।'

মাস্টারমশাই হুকুম দিলেন, 'যাও ধবে নিয়ে এসো। বুঝিয়ে শুনিয়ে নিয়ে এস।'

মারের ভয়ে স্কুল থেকে এমন অনেক ছেলেই মাঝে মাঝে পালাত। গাব গাছে উঠে বসে থাকত, আম গাছে উঠে বসে থাকত। আমরা সবাই ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাকে নামাতাম। অনন্ত'র বেলায় কখনো এমন হয়নি। উৎসাহী অনেক ছেলে জেলেদের ঘাটে যেতে চাইল। কিন্তু মাস্টারমশাই তাদের বারণ করলেন, 'খবরদার ওর গায়ে কেউ ব্যথা দিস নে, ওর মনে কেউ ব্যথা দিস নে। ওকে বুঝিয়ে শুনিয়ে নিয়ে আসতে হবে।'

মাস্টারমশাই আমাকে দলপতি করে পাঠালেন।

জেলেদের ঘাটে গিয়ে দেখি নদীর বুকে ভেসালের ওপর অনন্ত চুপ করে বসে আছে। জেলেরা

মাছ বেচতে গেছে বাজারে। পুরুষ জেলে প্রায় কেউ আর বাড়ি নেই। কোনরকমে একটা ডিঙি যোগাড় করে আমরা ভেসালের কাছে গেলাম। বললাম, 'অনন্ত নেমে এসো, স্কুলে চল।'

অনন্ত'র গায়ে একটি জামা। বুক পকেটে লাল পেনসিলটা উঁচু হয়ে রয়েছে। অনন্ত বলল, 'না, কল্যাণ, তোমরা যাও স্কুলে—আমি যাব না। আমি আমার এই স্কুলেই দিব্যি পড়তে পারব। দেখ না, স্কুলের পোশাক পরে আমি এখানে এসেছি। আমি তো এখন মাছ মারতে আসি নি কল্যাণ।'

অনেক বুঝিয়ে শুনিয়েও আমরা ওকে সেদিন স্কুলে নিতে পারলাম না। অনন্ত বড় একগুঁয়ে।

শুনেছি সেইদিন রাত্রেই হ্যারিকেন-লণ্ঠন নিয়ে অম্বিকা ভট্‌চায গিয়েছিলেন অনন্তদের বাড়ি। তিনি প্রথমে গঙ্গাচরণ আর সারদাকে বোঝালেন। তারা বলল, 'ও যদি না যেতে চায় কি করব পণ্ডিতমশাই।'

ঘরের এক কোণে মুখ নিচু করে বসেছিল অনন্ত। মাস্টারমশাই গিয়ে তার পিঠে হাত রেখে বললেন, 'হারামজাদা, তোর হাতের জল খেলাম না কেবল তুই তাই দেখলি। আর খাতা শ্লেটে তোর হাতের লেখা দেখে আমি যে তোকে কোলে তুলে নিয়ে চুমু খেয়েছিলাম তা তুই এরই মধ্যে ভুলে গেলি। তোর ঘরের মধ্যে এক গ্লাস কেন এক কলসী জল এনে দে আমাকে, আমি তাই খাব। কিন্তু সমাজের সামনে কি করে খাই। তাহলে আমাকে যে পতিত করবে। কারো বাড়িতে পুজো-আর্চা করতে দেবে না। জানিস তো, যজমানী না করলে খালি মাস্টারীতে পেট ভরে না।'

এ কথার পর অনন্ত হঠাৎ উঠে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বলেছিল, 'মাস্টারমশাই আমাকে মাপ করুন। আমি কালই যাব স্কুলে। আপনি বাড়ি যান।'

এম ই স্কুলে এসে ছাত্র হিসাবে অনন্ত মালোর খ্যাতি আরো ছড়িয়ে পড়ল। আমি ওর দু ক্লাস ওপরে ছিলাম। আমার সঙ্গে ওর কোন প্রতিযোগিতা নেই। তবু হেডমাস্টার মশাই আমাদের পড়াতে এসে যখন মাঝে মাঝে অনন্ত'র দোহাই পাড়তেন, যখন বলতেন, 'কথাটার মানে তোমরা বলতে পারলে না কিন্তু অনন্ত পারে', তখন ঈর্ষার ছুঁচ আমাদের গায়ে বিঁধত। ছেলেটার স্পর্ধা দেখ। ও নিচের ক্লাসে দাঁড়িয়ে উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের কান মলতে চায়।

গাঁয়ের এম ই স্কুল থেকে আমি কুমারপুরের হাই স্কুলে এসে ভর্তি হলাম। দু বছর বাদে এম ই স্কুল থেকে বৃত্তি পেয়ে অনন্ত হাই স্কুলে এসে ঢুকল। শুনলাম জেলার মধ্যে ও সেকেণ্ড হয়েছে। আমি বললাম, 'তোমাদের সিডিউল কাস্টের মধ্যে?'

অনন্ত মুখ উঁচু করে বলল, 'আমি জেনারেল স্কলারশিপই পেয়েছি। সিডিউল কাস্টের বৃত্তি আমি নিতাম না।'

বললাম, 'নিতে না মানে?'

অনন্ত বলল, 'পরীক্ষাটা তো জাতের পরীক্ষা নয়, বিদ্যার পরীক্ষা। সরস্বতীর মন্দিরে জাতিভেদ কেন। নিচু জাতে জন্মেছি বলে বেশি সুযোগ কেন নেব। তাতে যে আরো নিচু হয়ে গেলাম।'

অল্প বয়স থেকেই অনন্ত এইরকম পাকা পাকা কথা বলত। এই বয়স থেকেই ওর প্রকৃতি ছিল গুরুগম্ভীর। ও পড়ত মোটা মোটা বই। মিশত দাড়িওয়ালা মানুষের সঙ্গে। খেলার মাঠে যেত না, ব্যায়ামের আখড়ায় যেত না। উঁচু জাতের আর ধনীর ছেলেদের সংস্পর্শ ও পারতপক্ষে এড়িয়ে চলত। ছেলেরা বলাবলি করত, অনন্ত'র মত এমন দাম্ভিক অবিনয়ী ছেলে আর নেই।

স্কুল-আমলের আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেই এই পর্ব আমি শেষ করব। একত্রিশ বত্রিশ সনের কথা। অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ আমাদের ছোট নদীর পারে ছোট গঞ্জ কুমারপুরে এসেও লেগেছে। নদীর এক পারে থানা। আর এক পারে স্কুল, পোস্ট অফিস, কাছারি। দু-চারদিন বাদে বাদেই ওপারের থানার লোকেরা খেয়া নৌকোয় পার হয়ে এসে এপারের লোকদের ওপর উৎপাত করত। যাকেই ওদের সন্দেহ হোত তার বাড়িঘর খানাতল্লাসি করে বই-পত্র বিছানা-বালিস রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে নিয়ে চলে যেত। সেবার কংগ্রেস ক্যাম্পে এসে ওরা হানা দিল। পারে তো ক্যাম্পটাকে সুদ্ধ কুমারের জলে ডুবিয়ে দেয়। স্থানীয় নেতারা কেউ বাইরে ছিলেন না। দু-চারজন ভলান্টিয়ার যারা অবশিষ্ট ছিল তাদের ওরা গ্রেপ্তার করল। সেই সঙ্গে ধরা পড়লেন আমাদের হিস্ট্রীর টিচার কেশব দত্ত। নিরীহ শান্ত প্রকৃতির মানুষ। কিন্তু ভিতরে

ভিতরে তাঁর নাকি সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে যোগ আছে। সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবির নিচে তিনি বিপ্লবের রাঙা আগুন পুষে রেখেছেন!

আমরা স্কুলসুদ্ধ ছেলে এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু সেক্রেটারী সরকারী উকীল রায়সাহেব ননীমাধব সেন তাঁর দলবল নিয়ে এসে বাধা দিলেন। বললেন, যারা ধর্মঘটে যোগ দেবে তাদের শাস্তি হবে। স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে তাদের। বাবা কাকা যদি সরকারী চাকুরে কেউ থাকে তাদের চাকরি যাবে। আর স্কলারশিপের ছেলেদের কাটা যাবে স্কলারশিপ। বিনা মাইনেয় তাদের আর পড়বার সুযোগ দেওয়া হবে না। শাসনের ভয়ে কিছু কিছু ছেলে ক্লাসে রয়ে গেল। তাদের মধ্যে রইল আমাদের অনন্ত মালো। আমরা সবাই ছি ছি করতে লাগলাম। বললাম, দেশমাতৃকার চেয়ে চার টাকার বৃত্তির লোভটাই ওর বড় হল। আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় সতীশ চাটুয্যে বলল, 'হবে না ? জাতটা কি। কতগুলি মাছ বিক্রি করলে চার টাকা পায় ভেবে দেখ তোমরা। চার টাকা কি সোজা কথা ? মাসে মাসে দুশো ছাপ্পান্নটি পয়সা।'

সবাই হেসে উঠল।

সেদিন আর ক্লাস-টলাস কিছু হল না। আমতলার মাঠে ঘরোয়া মিটিং সেরে আমরা বিকেলের দিকে খোঁজ নিতে বেরুলাম খাঁচায় বন্দী রায়সাহেব খানসাহেবের বাচ্চারা করছে কি। উঁকি মেরে দেখলাম ক্লাসে ক্লাসে। আমাদের দলে তখনকার বিপ্লবী ছাত্র আর এখনকার পাবলিশার সুহাস রায়ও ছিল। ফোর্থ ক্লাসের জানালার ধারে গিয়ে দেখি দু-চারজন ছেলে বাইরে দাঁড়িয়ে হল্লা করছে, একজন বোর্ডে চকখড়ি দিয়ে আমাদের ছাত্রনেতা বীরেন সিং-এর কার্টুন আঁকছে, আর ক্লাসের সব চেয়ে শেষ বেঞ্চে হাইবেঞ্চের উপর দুখানি হাত রেখে তার মধ্যে মাথা গুঁজে নিশ্চিন্তে বসে আছে অনন্ত মালো। আমার আর সহ্য হল না। শত হলেও তো আমাদের গাঁয়েরই ছেলে। নিজের ব্যবহারে আমাদের সারা গাঁ'টিকে ও অপমান করেছে। আমি পা টিপে টিপে ক্লাসের ভিতরে ঢুকলাম। তারপর ওর সামনে গিয়ে দু হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে ওর মাথাটা তুলে ধরে রূঢ় স্বরে বললাম, 'তোমার লজ্জা করল না অনন্ত ?'

অনন্ত চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। কচি তিন-চার বছরের ছেলের মত কান্নার আবেগে ওর ঠোঁট দুটি যেন ফুলে উঠেছে। সমস্ত দেহের সঙ্গে ঠোঁট দুটিও কাঁপছে আস্তে আস্তে। আর দুই চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমেছে।

এটুকু আমার বুঝতে বাকি রইল না, এই ধারা আমার ঝাঁকুনিতে বেরোয় নি, ভিতর থেকেই ঝাঁকুনি খেয়েছে অনন্ত।

আমি ওর মাথা ছেড়ে দিয়ে বললাম, 'অনন্ত চল, বাড়ি চল।'

অনন্ত বলল, 'না ভাই, তুমি যাও। আমি কোন্ মুখে যাব।'

হাত ধরে ওকে আমি বাইরে নিয়ে এলাম।

থার্ড ক্লাসে উঠে কলকাতার একটি শিশু মাসিক পত্রিকার কবিতা প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেল অনন্ত। কবিতাটি ছাপাও হল কাগজখানায়। আমরা পড়ে দেখলাম চমৎকার একটি দেশাত্মবোধক কবিতা। ভাবের সঙ্গে ছন্দটিও বেশ মিলেছে। আমাদের সতীশ বলল, 'ছেলেটি তো খুব ডুবে ডুবে জল খায় হে। ওর মত রাজভক্ত ছেলের রক্ত এত লাল হল কি করে ?'

ওকে ডেকে একটু ঠাট্টাও করল সতীশ। বলল, 'অনন্ত, পুলিসে দেখতে পেলে তোমার বৃত্তি কেটে নেবে তা জানো ?'

মাস দুই-তিন পরে ওই একই পত্রিকায় আমারও একটি কবিতা বেরোল। নাম বসন্ত, প্রতিযোগিতায় আমি পঞ্চম হয়েছি। কোন পুরস্কার পাইনি। ওই কাগজের গ্রাহক আমিও ছিলাম। গোপনে গোপনে আমিও পাঠিয়েছিলাম কবিতা, দেশাত্মবোধক কবিতা আমার খাতাতেও ছিল। কিন্তু ছন্দ আর মিলগুলি ভাল ছিল না। তাই বেছে বেছে আমি বসন্তের কবিতাটিই পাঠিয়েছিলাম।

অনন্ত সেই কবিতা পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ; বলল, 'কল্যাণ, পুরস্কার না পেলে কি হবে। তোমার কবিতা আমার চেয়ে অনেক্ ভালো। তোমার কবিতায় সত্যিই কাব্যগুণ আছে।'

আমি মুখ ভার করে বললাম, 'থাক, থাক। তোমাকে আমার আর পিঠ চাপড়াতে হবে না।'

অনন্ত বলল, 'পিঠ চাপড়ানো নয় কল্যাণ, সত্যিই বলছি। তোমার কবিতা খুব ভালো হয়েছে।'

ভালো কথাটা শত্রুর মুখেও ভালো লাগে। তারপর থেকে অনন্ত'র সঙ্গে আমার হৃদ্যতা বেড়ে চলল।

জেলা শহর থেকে ইণ্টারমির্ডিয়েট পাস করে আমি কলকাতার কলেজে এসে ভর্তি হলাম। আর অনন্ত গেল সেই জেলা শহরে। স্কুলের টিচারদের আশা সফল হয়নি। অনন্ত বাংলায় লেটার নিয়ে ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছে। কিন্তু দশ টাকার একটা স্কলারশিপও পায়নি। সবাই বলল, পাবে কি করে। পরীক্ষার পড়া পড়েছে নাকি। দিনরাত কেবল নাটক আর নভেল, নাটক আর নভেল। পাস করে যে গেছে, এই ঢের।

জেলা শহরের কলেজে অনেক চেষ্ট-চরিত্রের পর একটি হাফ ফ্রী-শিপ জুটল। কিন্তু থাকা খাওয়ার জায়গা আর জোটে না। যারা রেসিডেন্‌সিয়াল টিউটর রাখে, তারা কেউ জেলের ছেলেকে রাখতে চায় না। ভিন্ন জাতের ছেলে রাখার অনেক অসুবিধে। বহু খুঁজেপেতে মাইল তিনেক দূরে বীরপুর গাঁয়ে একটি জেলের বাড়িতে অনন্ত আশ্রয় পেল।

লালমোহনও মাছের ব্যবসা করে। তার অবস্থা মোটামুটি মন্দ নয়। নিজের হাতে মাছ ধরে না। নিজের হাতে বিক্রিও করে না। পাইকারীভাবে কেনে, পাইকারীভাবে বিক্রি করে। গঙ্গাচরণের মত নিরক্ষর নয়। নিজের হাতে নাম লেখে—লালমোহন দাস। বার-তের বছরের ছেলে আছে গুটি তিনেক। গাঁয়ের স্কুলে তারা পড়ে। আর একটি মেয়ে আছে তার বয়সও বছর এগার-বার। তার নাম লক্ষ্মী। সে স্কুলে পড়ে না। কিন্তু অনন্ত তাদের বাড়িতে যাওয়ার পর থেকে মায়ের রান্নাঘরের যোগান দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্মীও বই শ্লেট নিয়ে ভাইদের পিছনে মাদ্‌'রের ওপর এসে বসতে লাগল। এসব কাহিনী আমি পরে অনন্ত'র মুখেই শুনেছি। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটি বেড়ে যাওয়ায় অনন্ত প্রথমে বিরক্ত হয়েছিল। নিজে পড়বে, না ওদের পড়াবে। কিন্তু দিন কয়েক বাদেই সে লক্ষ্য করল, ছাত্রদের চেয়ে পড়াশুনোয় তার এই বাড়তি ছাত্রীটির মনোযোগ বেশি। গুরুভক্তিও খুব। লক্ষ্মী পড়ে বর্ণবোধ, লেখে শ্লেট-পেন্‌সিলে। কিন্তু শাড়ি বেশ ঘুরিয়ে পরতে পারে, কাঁটা গুঁজে গুঁজে চুল বাঁধতে পারে নিপুণভাবে। সংসারের সব কাজ সে জানে। রান্নাবান্না ঘরকন্নায় এই বয়সে সে মা'র চেয়েও দক্ষ হয়েছে। শুধু তাই নয়, পাড়ার বয়স্কা বিবাহিতা মেয়েদের সঙ্গে মিশে মিশে অনেক পাকা পাকা কথাও সে শিখেছে। এমন কি যৌন-জীবন সম্বন্ধেও নিজের ধরনে সে অনেক কিছু আন্দাজ করে নিয়েছিল। লক্ষ্মী অনন্ত'র পা ধোয়ার জল, আর জুতো গামছা এগিয়ে দিত। খাওয়ার সময় পাখা হাতে নিয়ে বসত কাছে। শোয়ার সময় বিছানা ঝেড়ে দিতে আসত। ওর দাদারা ঘুমিয়ে পড়ত, কিন্তু লক্ষ্মীর ঘুম আসত না। বহু রাত অবধি সে বারবার গিয়ে অনন্ত'র কাছে পড়া জিজ্ঞাসা করত। অনন্ত'র বিছানার এক পাশে বসে বলত, 'মাস্টামশাই, আমি এখানে বসে পড়ি ? মনে মনে পড়ব। আপনার কোন ক্ষতি হবে না।'

অনন্ত অপ্রসন্ন সুরে বলত, 'আচ্ছা পড়।'

মাস পাঁচ-ছয় যেতে না যেতেই পাড়ার লোকে বলতে শুরু করল, লালমোহন অনন্তকে ঘরজামাই রেখেছে। সবই হয়ে গেছে ওদের মধ্যে। এবার পুরুত ডেকে মন্ত্রটা পড়ায় না কেন।

লালমোহন বলল, 'এবার পড়াব মন্তর।'

স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে লালমোহন দেখল তারও সেই মত।

এর আগে লক্ষ্মীর আরো অনেক সম্বন্ধ এসেছে, পাঁচ-ছয় শো পর্যন্ত পণ উঠেছে। কিন্তু বরের বয়স তিন চার গুণ। তার চেয়ে এই আঠার-উনিশ বছরের নম্র, শান্ত, কলেজেপড়া ছেলেটি লক্ষ্মীর বর হিসেবে অনেক মানানসই। ও অবশ্য পাঁচশো টাকা কেন, পাঁচ টাকাও পণ দিতে পারবে না। কিন্তু সারা জীবন কেনা হয়ে থাকবে। এখন অবশ্য ও গরীব। কিন্তু ভালো করে লেখাপড়া শিখতে পারলে চিরকাল ওর আর এই অবস্থা থাকবে না। জামাই হিসেবে অনন্তকে লালমোহন আর নয়নমণি দুজনেই পছন্দ করল।

ছাত্রছাত্রীদের পড়ানো শেষ করে অনেক রাত্রে অ্যানুয়াল পরীক্ষার জন্যে তৈরি হচ্ছে অনন্ত। লালমোহন এসে বলল, 'এই যে অনন্ত, কেমন পড়াশুনো হচ্ছে তোমার।'

অনন্ত বলল, 'ভালো।'

পড়াশুনোর প্রসঙ্গে আর দু-একটা কথা বলে লালমোহন আসল কথায় এল, 'পাড়ার কুচক্রী লোকগুলি বড় পিছনে লেগেছে হে। তোমার বাবাকে একটা চিঠি লিখে দেই। সে এসে পড়ুক। তারপর বামুন ডেকে পাঁজি দেখে সব দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলি। আর দেরি করে দরকার কি। শুভ কাজ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলাই ভালো।'

লজিকের সিলজিসম-এর চ্যাপ্টার থেকে মুখ তুলে অনন্ত লালমোহনের দিকে তাকাল. 'কিসের দিনক্ষণের কথা বলছেন আপনি।'

'তোমাদের বিয়ে।'

'বিয়ের!' অনন্ত যেন আকাশ থেকে পড়ল। তারপর ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, 'একি অযৌক্তিক কথা বলছেন আপনি?'

লালমোহন ভেবেছিল প্রস্তাবটা পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত হাতে চাঁদ পাবে। কিন্তু ওর রকম-সকম দেখে লালমোহন খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইল। তারপর ওকে বুঝিয়ে বলল, এর মধ্যে অযৌক্তিক বলে কিছু নেই। লালমোহন ওকে পড়াশুনোর খরচ দেবে। যতদূর ইচ্ছে ততদূর পড়তে পারবে অনন্ত। ডাক্তারি পড়ুক, ওকালতী পড়ুক, কিছুতেই লালমোহন তাকে বাধা দেবে না, তার কোন সাধ অপূর্ণ রাখবে না। কিন্তু লালমোহনের কথা শুনে তাকে চলতে হবে, তার সব হুকুম মানতে হবে। বিয়েটা শুধু এই মাসে নয়, এই সপ্তাহের মধ্যেই হওয়া চাই।

অনন্ত বলল, 'আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করব না। পড়াশুনো শেষ করে চাকরি-বাকরি না করা পর্যন্ত ওসব কথা ওঠেই না। তা ছাড়া, লক্ষ্মীকে তো আমি সে চোখে দেখিনি। ও আমার চেয়ে বয়সে কত ছোট।'

লালমোহন বলল, 'কত আর ছোট হবে। বার উৎরে তেরোয় পড়েছে লক্ষ্মী। আমাদের সমাজে যা নিয়ম তাতে ওর চার বছর শ্বশুর ঘর হয়ে যেত। ওর তেরো আর তোমার কত হবে, আঠারো-উনিশ?'

অনন্ত বলল, 'হ্যাঁ।'

লালমোহন বলল, 'মাত্র ছ বছরের ছোট। কিন্তু লক্ষ্মীর মা আমার চেয়ে কত বছরের ছোট তা জানো? ষোল বছরের। তাতে কি কিছু আটকে রয়েছে? ছোট-বড়য় কিছু আটকায় না। ছোট সাপও সাপ বড় সাপও সাপ, ছোট নদীও নদী, বড় নদীও নদী। মেয়েছেলেও তেমনি। পুরুষের ছোঁয়া পেলে ওদের বড় হতে দেরি লাগে না।'

অনন্ত বলল, 'ওকে আমি ছোট বোনের মত দেখে এসেছি।'

বেড়ার ওপাশ থেকে একটি বালিকাকণ্ঠের ভ্যাংচানি শোনা গেল, 'আহা হা, কি সাধুপুরুষ আমার, বোনের মত! কথায় কথায় আমার গাল টিপে দাওনি, আমাকে আদর করে চুমু খাও নি? আমাকে জড়িয়ে ধরে—'

লক্ষ্মী আর কিছু বলতে পারল না। নয়নমণি ওর মুখ চেপে ধরেছে। এর চেয়ে বেশি বলা ঠিক নয়। কে কোত্থেকে শুনে ফেলবে! পরে অন্য কোথাও বিয়ে দিতে হলে গোলমাল বাধতে পারে।

এরকম একটি ছোট মেয়ে যে এমন নির্জলা মিথ্যা কথা বলতে পারে তাই দেখে অনন্ত স্তম্ভিত হয়ে রইল। ওর চমক ভাঙল ভাবী শ্বশুরের চপেটাঘাতে! লালমোহন আর ধৈর্য রাখতে পারেনি। প্রাণপণ শক্তিতে কষে এক চড় মেরেছে অনন্ত'র গালে। এর পর লালমোহন দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'হল তো, এবার হল তো? আমার মেয়ে নিজের মুখে সব কবুল করল। এর পর তুই বিয়ে না করে যাবি কোথায়, বিয়ে না করলে জেলে যাবি। কা'লই আমি দাঁড়িয়ে থেকে বিয়ে দেওয়াব। দেখি তোর কোন বাবা এসে ঠেকায়।'

বাকি রাতটুকু অনন্তকে ভাববার সময় দিয়ে লালমোহন অন্য ঘরে চলে গেল! একটা গাল পুড়ে যেতে লাগল অনন্ত'র। আর এক গালে হাত দিয়ে সে ভাবতে লাগল, লক্ষ্মী অমন কথা বলতে পারল কি করে। কেন বলল।

অনেক পরে অবশ্য এ প্রশ্নের জবাব নিজের মনেই খুঁজে পেয়েছিল অনন্ত। ছোট সাপও সাপ। বোন বলে, ছোট বলে লক্ষ্মীর নারীত্বকে অনন্ত অপমান করেছে। তাই প্রাণপণে ছোবল মেরেছে সে। অনেক বছর বাদে লক্ষ্মীর ওপর তার একটু সহানুভূতিও এসেছিল। অনন্ত আমাকে মৃদু হেসে বলেছিল, 'তখন যদি রাজী হতাম, বিয়ে করতাম হয়তো নেহাৎ মন্দ হত না কল্যাণ। বোধ হয় সাধা-লক্ষ্মী পায়ে ঠেলেছি।'

কিন্তু অনন্ত'র তখনকার মনের অবস্থা অন্য রকম। বিশেষ করে লালমোহনের হাতে অমনভাবে অপমানিত হয়ে এক মুহূর্তও তার ওখানে থাকা অনন্ত'র পক্ষে সম্ভব ছিল না। অনন্ত রইল না। সেই রাত্রে চাদরে বইখাতা বেঁধে সে পালিয়ে এল শহরে।

কথাটি গঙ্গাচরণের কানে যেতে সে চটে গিয়ে চিঠি লিখল অনন্তকে। এমন আহাম্মক কেউ হয়? এমন অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা কেউ ছাড়ে? শুধু চিঠিই নয়। গামছায় চিঁড়ে বেঁধে বাইশ মাইল পথ হেঁটে পাড়ি দিয়ে গঙ্গাচরণ এল জেলা শহরে ছেলেকে বোঝাতে। অবুঝ ছেলে তবু বুঝ মানে না দেখে অভিশাপ দিয়ে গেল, 'তুই আমার ছেলে নস! তুই বেজন্মা। তুই আর আমাকে বাপ বলে পরিচয় দিস নে।'

তারপর মাসকয়েক ভারি কষ্টে কাটল অনন্ত'র। শহরের কোথাও থাকবার জায়গা পায় না। আজ এখানে কাল সেখানে করে বেড়ায়। দু একদিন না খেয়ে থাকার শিক্ষাটাও তখন থেকেই অনন্ত আয়ত্ব করল।

তারপর জুটল এক আশ্রয়। অনন্ত'রই ক্লাসে পড়ে অমল দত্ত। তার বাবা জজ কোর্টে প্র্যাকটিস করেন। নিজেদের বাড়ি আছে শহরে। সবই আছে কিন্তু অমলের পড়াশুনোয় মন নেই। ডানপিটের একশেষ। ক্লাসে নাম প্রেজেন্ট করে আর থাকে না। ওই বয়সেই সাইকেল নিয়ে নানাবয়সী মেয়েদের পিছনে পিছনে সে ঘুরে বেড়ায়। একদিন তার চোখে পড়ে গেল অনন্ত। দুজনে একই বেঞ্চে বসেছিল পাশাপাশি। ইংরেজীর প্রফেসর সাহিত্যের অলঙ্কার বোঝাতে বোঝাতে অমলকে জিজ্ঞেস করে বললেন, 'পান-এর একটা উদাহরণ দাও তো।' অমল জুতো দিয়ে অনন্ত'র স্যাণ্ডালসুদ্ধ পা চেপে ধরল। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'বল হে, বলে দাও।'

একটি মাত্র কথা তো। অনন্ত না বলে দিয়ে পারল না। অমল ওর পা ছেড়ে দিল।

প্রফেসর চলে গেলে অমল অনন্তকে সিগারেট অফার করল। বলল, 'নাও, তুমি 'পান' দিলে, আমি সিগারেট। শোধবোধ।'

অনন্ত বলল, 'সিগারেট আমি খাইনে, মাফ করবেন।'

অমল বলল, 'মাফ করবেন কি হে। আমি বললাম তুমি, আর তুমি আপনি চালাচ্ছ। আমি কি বয়েসে তোমার ঠাকুরদাদা?'

অনন্ত হেসে বলল, 'না, বরং তুমিই আমার চেয়ে দু-এক বছরের ছোট হবে।'

অমল বলল, 'তা হলে দাদা, অনুজ লক্ষ্মণের কথাটি শোন। চল আমাদের বাড়িতে। সিগারেট না খাও, চা খাবে। আমাদের বাড়ির সবাই-এর সঙ্গে আলাপ করবে।'

মুখচোরা অনন্ত শহরে এসে এমন আন্তরিক আমন্ত্রণ আর কারো কাছ থেকে পায়নি। একটু-আধটু আপত্তির পরেই সে রাজী হয়ে গেল।

কাছারিপাড়ায় দু-তিনটি ঝাউ গাছের আড়ালে ছোট্ট সাদা রঙের দোতলা একটি বাড়ি। নাম নির্মলা-নিলয়। অমলের মার নামে বাড়ি। অল্প বয়সে ওর মা মারা গেছে। তারপর আর ভুবনবাবু বিয়ে করেন নি। অমলের দাদারা কলকাতায় কেউ বা পড়ে কেউ বা চাকরি করে। দিদিদের কারো কারো বিয়ে হয়ে গেছে। জন দুই আছে শুধু ঘরে। তাদের মধ্যে বড়টি বিধবা। ছোটটি কুমারী। সকলের দেখাশোনা করেন দূর সম্পর্কের এক খুড়ীমা। বিকেলবেলায় কোর্ট থেকে ফিরে এলেন প্রৌঢ় ভুবনবাবু। প্রত্যেকের সঙ্গে অমল অনন্ত'র পরিচয় করিয়ে দিল। ভুবনবাবু যখন জিজ্ঞেস করলেন, অনন্ত কোথায় থাকে, কিভাবে তার পড়াশুনো চলে, অনন্ত নিজের অবস্থার কথা কিছুই গোপন করল না।

বারান্দায় বেতের মোড়ায় বসে চা খেতে খেতে ভুবনবাবু সবই শুনলেন। তার ছেলেরা শুনল,

মেয়েরা শুনল।

একটু বাদে অমল বলল, 'বাবা, মিস্ত্রীদের কাঠের গুদামে থেকে কি কারো পড়াশুনো হয় ? তা ছাড়া সেখানেও তো বেশিদিন থাকতে পারবে না। অনন্ত আমাদের বৈঠকখানায় এসে থাকুক।'

এত তাড়াতাড়ি আর এত সরাসরি অমল এমন প্রস্তাব করে বসবে, তা কেউ আশা করেনি।

ভুবনবাবু বললেন 'বেশ তো। জায়গা তো আছেই এখানে। তুমি তোমার বাক্স বিছানা নিয়ে চলে এসো অনন্ত '

অনন্ত লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না না, সে কি—

ভুবনবাবু বললেন, 'তোমার কোন লজ্জার কারণ নেই। এর আগেও স্কুল-কলেজের অনেক ছেলে আমাদের বাড়িতে থেকে পড়েছে। অমলের মা খুব ভালোবাসত ছাত্রদের রাখতে।'

অমল সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, কাল সকালে অবশ্যই তুমি চলে আসবে। তুমি যদি স্বেচ্ছায় না আস আমি জোর করে টেনে আনব।'

অমল চলে যাওয়ার পরেও অনন্ত ভুবনবাবু আর তাঁর মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল।

অনন্ত বলল কিন্তু আমি এখানে কিসের বিনিময়ে থাকব। আপনাদের তো ছোট ছেলেপুলে নেই যে তাদের পড়াব।

ভুবনবাবু বললেন, 'বিনিময়টা কি সব সময় টাকাকড়ির সঙ্গে ? আর কাজের সঙ্গে ? সংসারে অন্য রকম আদান প্রদানও তো আছে ?'

অমলের বিধবা মেজদিদি ইন্দিরা বলল, 'আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম বাবা। তারপর অনন্ত'র দিকে চেয়ে বলল 'ও আমাদের সবচেয়ে ছোট মা মরা ভাই। ছেলেবেলা থেকে আহ্লাদ পেয়ে পেয়ে একেবারে বি[illegible] [illegible]দের সঙ্গে মেশে তাদের দলটাও খারাপ। আপনি যদি এখানে থাকেন ওর মতিগতি ফিরতেও পারে। সহপাঠী বন্ধুকে সৎপথে আনবার ভার রইল আপনার ওপর কোন ছোট ছেলেপুলে পড়ানোর চাইতে একাজ অনেক বড় অনন্তবাবু তাতে আমাদের অনেক উপকার হবে।'

অনন্ত লজ্জিত হয়ে বলল আমাকে বাবু বলবেন না।'

ইন্দিরা অনন্তর সমবয়সীই হবে কি এক বছর দেড় বছরের বড়ও হতে পারে। দেখতে কিন্তু ছোটই দেখায় ছিপছিপে ছোটখাট চেহারা। কালো ফিতে পেড়ে একখানা শাড়ি পরনে গলায় সরু একগাছি হার। মুখের ডৌলটুকু মিষ্টি। সমান ছোট ছোট দাঁতগুলি ভারি সুন্দর।

ওর ছোট বোনের নাম মন্দিরা। সে ঠিক এর বিপরীত। মাথায় ইন্দিরার চেয়ে লম্বা। দিদির চেয়ে সে পুষ্টাঙ্গী। গায়ের রঙ দিদির মত ফর্সা নয়, শ্যামবর্ণ ঘেঁষা।

ইন্দিরার প্রস্তাবে মন্দিরা হেসে বলল তবেই হয়েছে। অনন্তবাবুর মত মাস্টারমশাইকে তো আমাদের অমল ধমকেই সোজা রাখবে দিদি '

ইন্দিরা বলল 'আমার কিন্তু ঠিক উল্টো মনে হয় মন্দিরা। অমল আমাদের না মানতে পারে, মাস্টারমশাইদের না মানতে পারে কিন্তু বন্ধুকে মানবে। দেখিস না বন্ধু বলতে কেমন অজ্ঞান। ঘরে একজন ভালো বন্ধু জুটিয়ে দিলে বাইরের বাজে বন্ধুদের ও ত্যাগ করবে।'

অনন্ত ওদের অনুরোধ এড়াতে পারল না। রয়ে গেল ভুবনবাবুদের বাড়িতে। বৈঠকখানায় একখানি তক্তপোশে রাত্রে ভুবনবাবুর একজন মুহুরী ঘুমোয়। বড় মুহুরী থাকে দূরে আলাদা বাসা করে। মুহুরীর তক্তপোশের পাশে আর একখানা তক্তপোশ পেতে অনন্ত'র থাকবার জায়গা করে দেওয়া হল।

অমল বলল, 'ভাই অনন্ত কিছু মনে করো না। আমি তোমাকে দোতলায় নিয়ে যেতাম। না হয় ভিতরের অন্য কোন ঘরে থাকবার জায়গা করে দিতাম। কিন্তু আমার বিধবা কাকীমা বড় গোঁড়া। ওর বায়ু রোগ আছে। শুচিবায়ু রোগ। বাইরের ঘরে তোমার খুব অসুবিধে হবে।'

অনন্ত বলল, 'আমার কোন অসুবিধে হবে না অমল। এত সুযোগ-সুবিধে আমি জীবনে পাইনি।'

খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনো আরম্ভ করল অনন্ত। গত বছরের ক্ষতি এ বছরে পূরণ করবার জন্যে উঠে-পড়ে লাগল। কিন্তু অমলের ফার্স্ট ইয়ারও যা, সেকেণ্ড ইয়ারও তেমনি। বাড়ির সঙ্গে

সম্পর্ক কম, বইয়েব সঙ্গে একেবাবেই সম্পর্ক নেই।

অনন্ত মাঝে মাঝে চিন্তিত হয়ে বলে, 'তুমি যে একেবাবেই পড না অমল, পাস কববে কি কবে।'

অমল বলে, 'আবে তুমিই পড। তাতে হয়ে যাবে। ভালো কবে নোট-ফোটগুলি তৈবি কবে বাখ। আমি শর্টকাটে মেবে দেব।'

অমলেব চাল-চলন নিয়ে মাঝে মাঝে অনন্তব সঙ্গে আলাপ কবে ইন্দিবা। ছোট্ট ভাই এব আচাব-আচবণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ কবে। বলে, 'বাবা তো তাঁব মক্কেল নিয়েই আছেন। এদিকে ওব যে কিছুই হচ্ছে না, ও যে গোল্লায় যাচ্ছে, সেদিকে খেযাল নেই।'

অনন্ত নিজেব অক্ষমতা জানিয়ে বলে, 'আমি কিছুই কবতে পাবছি নে। আমাব চলে যাওযাই উচিত।'

ইন্দিবা বলে, 'না না, তবু আপনাব কথা ও মাঝে মাঝে শোনে। আগেব চেয়ে তবু এক আধটু বই-টই নাডেচাডে। আব কিছু না হোক আপনাব দৃষ্টান্তটা তো মাঝে মাঝে দিতে পাবি।'

অনন্ত লজ্জিত হয়ে বলে, 'আমাব আবাব দৃষ্টান্ত।'

ইন্দিবা বলে, 'আপনি সত্যই খুব ভালো ছেলে।'

অনন্ত জবাব দেয, 'আমি যদি ভালো হই, তাহলে আপনি আবো ভালো।'

ইন্দিবা লজ্জিত হয়ে বলে, 'কিসেব ভালো?'

মন্দিবা পাশেব ঘব থেকে এসে সামনে দাঁডায, 'কিসে আবাব? দেখতে গো দেখতে। কথাটা বুঝি স্পষ্ট কবে না শুনলে হয না?'

ইন্দিবা বোনকে ধমক দেয, 'যাঃ তুই বড ফাজিল হয়েছিস।' তাবপব উঠে যায সেখান থেকে। কিন্তু ফাঁক পেলেই ফেব আসে। আবাব তাদেব মধ্যে অমলেব প্রসঙ্গ শুরু হয। অনন্ত যেন অমলেব সহপাঠী নয, অভিভাবক। আব ইন্দিবা অভিভাবিকা। দুজনেব একই ভাবনা। কিসে অমলেব কল্যাণ হবে। একই ভাবনা থেকে একই ভাবেব সম্বন্ধও দুজনেব মধ্যে আস্তে আস্তে গডে উঠল। ইন্দিবাবও পডাশুনোব অভ্যাস আছে। শুধু গীতা ভাগবতই যে সে পডে তা নয, আধুনিক বাংলা সাহিত্যেব সঙ্গেও পবিচয আছে তাব। কখনো ইন্দিবা তাকে বই-এব সন্ধান দেয কখনো অনন্ত ইন্দিবাকে।

উকিলেব বৈঠকখানায সকাল-সন্ধ্যায মক্কেলেব ভিড জমে, মামলা মকদ্দমাব জটিল আলোচনা হয। সাক্ষীদেব রিহার্সেল চলে। ভুবনবাবু পাশেব ছোট্ট ঘবটিতে অনন্ত'ব তক্তপোশখানা সবিয়ে দিলেন। এ ঘবেব জানলা দিয়ে ভিতবেব আব একটি চোখে পডে অনন্ত'ব। ইন্দিবাব পূজাব ঘব। অনন্ত'ব মতই ভোবে ওঠে ইন্দিবা। স্নান সেবে পিঠ ভবে ভিজে চুল ছডিয়ে আসন পেতে বসে বিগ্রহেব সামনে। বাধামাধবেব যুগল মূর্তিকে শ্বেতচন্দন শ্বেতপুষ্পে অর্চনা কবে। তাব জীবনে মৃত্যু দযিতেব সঙ্গে বিচ্ছেদ এনে দিয়েছে, কিন্তু বাধাকৃষ্ণেব যুগলমিলন চিবদিনেব। ভাব সম্মেলনেও কোন বিবহ নেই, কোন বাধা নেই।

জানালাব দিকে চোখ যাওযা উচিত নয, তবু অনন্ত'ব চোখ যেত। চোখেব পলক পডত না, নাকেব নিঃশ্বাস পডত না। তাবপব একদিন সে নিজেই উঠে জানলা বন্ধ কবে দিয়ে এল। বন্ধ কবাব সময একটু বুঝি শব্দ হয়েছিল, ইন্দিবা ফিবে তাকাল, 'কে ওখানে?'

অনন্ত বলল, 'আমি জানলাটা বন্ধ কবে দিচ্ছি।'

ইন্দিবা একটু আবক্ত হয়ে বইল, তাবপব মৃদুস্ববে বলল, 'দিন।' তাবপব নিজেই বাধা দিয়ে ইন্দিবা বলল, 'দাঁড়ান, আমাদেব নতুন গাছে অনেক শেফালী ফুটেছে সব পূজায দিইনি। আপনি নেবেন? কবি মানুষ, নিশ্চযই আপনি ফুল খুব ভালবাসেন।'

অনন্ত বলল, 'তা বাসি। কিন্তু আমি কবি মানুষ, আপনি কি কবে জানলেন?'

ইন্দিবা বলল, 'জানি। আমাব নতুন গাছেব ফুল নেবেন আপনি?'

অনন্ত বলল, 'দিন।'

হাত পেতে ফুল নিল অনন্ত। জানলা কি কবে বন্ধ কববে সে। তাব হাত যে জোড়া। কিন্তু মুখ ফিবিয়েই দেখল ইন্দিবাই জানলা বন্ধ করে দিয়েছে।

অগ্রহায়ণ মাসে বিয়ে হয়ে গেল মন্দিবার। আর মাঘ মাসে কাশী থেকে ইন্দিরার শাশুড়ী তাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁর শরীব খুব খারাপ। তিনি ইন্দিরাকে দেখতে চান। দু বছর আগে এই শাশুড়ীই একদিন বলেছিলেন, 'তুমি আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও বউমা। আমি তোমাকে সইতে পারছি নে।'

ভুবনবাবু বললেন, 'এই শীতে কাশীর মত জায়গায় যাবি কি করে।'

ইন্দিরা বলল, 'না গিয়ে উপায় কি বাবা। অসুখ-বিসুখ কি শীত গ্রীষ্ম মানে? বুড়ো মানুষ, কখন কি হয় বলা যায় না। তুমি আমাকে রেখে এসো।'

স্টেশন পর্যন্ত অনন্ত আর অমল ইন্দিবাকে এগিয়ে দিয়ে এল। গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার আগে তার ভিতর থেকে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ইন্দিরা অনন্তকে লক্ষ্য করে বলল, 'অমলেব পরীক্ষা এসেছে। আমি কাছে থাকতে পারলাম না—কিন্তু আপনি রইলেন। সব ভাব রইল আপনাব ওপর, দেখবেন ও যেন পরীক্ষা দেয়। ও যেন পরীক্ষায় পাস করে।'

অনন্ত নিঃশব্দে ঘাড় নেড়েছিল।

ফিরে এসে ঘরখানা বড়ই খালি খালি লেগেছিল অনন্তব। কিন্তু খাতাব পাতা খালি থাকেনি। তা কবিতায় ভরে উঠেছিল। এই সময় পূজারিণী নামে যে কবিতাটি অনন্ত লেখে সেইটাই ওর প্রথম প্রেমের কবিতা এবং প্রথম-প্রেমের কবিতা। অনেকদিনেব কথা। সে কবিতার ছন্দ আর এখন আমার মনে নেই, ভাবটুকু মোটামুটি মনে আছে। অনন্ত লিখেছিল, 'পূজারিণী তোমার পূজার বিগ্রহ হব এমন দুরাশা আমি করি নে। আর ওই পাথরের বিগ্রহ হতে কোন লোভও আমার নেই। তার চেয়ে আমি হতে চাই তোমার পূজার উপকরণ। তোমার তামার টাটে শ্বেতচন্দনের ছিটা-লাগা বেল যুঁই শেফালী ফুলের বাশ। তোমাব ধূপদানির ধূপ, তোমাব পঞ্চদীপের পঞ্চ শিখা।'

ফেব্রুয়ারীতে পরীক্ষা শুরু হল অনন্তদেব। কলেজের বড় হলঘরে সামনের বেঞ্চে তার সীট পড়ল। আর অমলেব সীট রইল ঠিক তার পিছনে। অমল বলল, 'যাক, ভগবান আছেন দেখা যাচ্ছে, এবারকার পরীক্ষায় তিনিই ভরসা আর ভরসা তুমি। খাতা-টাতাগুলি একটু একটু দেখতে দিয়ো।'

অনন্ত শঙ্কিতভাবে বলল, 'তুমি বলছ কি।'

অমল বলল, 'ঠিকই বলছি। তুমি সাহায্য না করলে আমি ফেল করব। সারা বছর কি করেছি না করেছি তা তো তুমি জানো।'

অনন্ত বলল, 'না না, তা হতে পারে না, অমল, তা কিছুতেই হতে পারে না।'

কিন্তু পরীক্ষার হলে তাই হতে লাগল। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর অনন্তর খাতা দেখে নকল করতে লাগল অমল। অনন্ত শুধু যে ওকে খাতা দেখতে দিল তাই নয়, মাঝে মাঝে কিছু কিছু কথা বলে দিতেও বাধ্য হল। ফার্স্ট পেপারের তিনটি ঘণ্টা ভালোয় ভালোয় কাটল। কিন্তু সেকেণ্ড পেপারের প্রথম ঘণ্টাটিও পুরোপরি কাটল না। নতুন ভাইস প্রিন্সিপ্যাল প্রফেসর সেন গার্ড দিচ্ছিলেন। তিনি এসে সামনে দাঁড়ালেন, বললেন, 'হচ্ছে কি তোমাদের? আমি সকালেও দেখেছি। সকালেও তোমাদের ওয়ার্নিং দিয়েছি।'

কাউকে কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে প্রফেসর সেন দুজনের খাতাই কেড়ে নিলেন। মিলিয়ে দেখা গেল যে দুটি প্রশ্নই তারা জবাব দিয়েছে তা হুবহু এক। প্রিন্সিপ্যালের কাছে পাঠানো হল খাতা। তিনি বললেন, এসবের প্রশ্রয় দিলে সেণ্টারের দুর্নাম হবে। সুতরাং দুজনেই বহিষ্কৃত হল। কলেজ কম্পাউণ্ড থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে অমল প্রিন্সিপ্যালের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়াল, 'স্যার একটি কথা। স্যার আমাকে এক্সপেল করছেন করুন, কিন্তু অনন্তকে ছেড়ে দিন। ও বড় গরীব। তা ছাড়া, ওর কোন দোষ নেই।'

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'চোরের সাক্ষী গাঁট কাটা, তুমি যাও এখান থেকে।'

অমল বেরিয়ে এসে দেখে অনন্ত আগে আগে ছুটছে। ও চেঁচিয়ে বলল, 'অনন্ত শোন শোন, দাঁড়াও।'

কিন্তু অনন্ত ছুটতেই লাগল। ও আর অমলদের বাড়িতে গেল না। ওর এত কষ্টের কেনা বই

আব বিছানা বাক্স সেখানেই পড়ে বইল।

খববটা কলকাতায আমাদেব কাছে প্রথমে ভিন্ন বকম ভাবে গিযেই পৌঁছেছিল। বই খুলে নকল কবেছিল অনন্ত। ধবা পড়েছে। শুনে মর্মাহত হযেছিলাম। অমন ছেলেব এমন দুর্গতি। তাবপব মাস কযেক বাদে বাড়িতে এসে যখন সত্যি খববটা শুনলাম তখনও আঘাত কম লাগল না। অনন্তকে বললাম, 'এ একটা দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু নয। তুমি সামনেব বাব পবীক্ষা দেওযাব জন্যে তৈবি হও।

অনন্ত বলল, না ভাই আব না। বিদ্যামন্দিব আমি অপবিত্র কবেছি। আমি আজ সত্যিই অশুচি, অস্পৃশ্য। ওখানে ঢুকবাব আমাব আব অধিকাব নেই। আমি যা পাবি বাইবে থেকেই কবব।'

অনন্তকে কিছুতেই বোঝান গেল না। অমল কিন্তু বুঝেছিল। তাব পবেব বছব পবীক্ষা দিযে ও ফার্স্ট ডিভিসনে পাস কবে গিযেছিল। এম এ তে হাই সেকেণ্ড ক্লাস পেযেছিল ইংবেজীতে। অনেকদিন বাদে কলকাতায একবাব অনন্তই ওব সঙ্গে আমাব পবিচয কবিযে দিযেছিল। অনন্ত বলেছিল, সে যাতে ফেব পড়াশুনো কবে পবীক্ষা দেয তাব জন্যে ভুবনবাবুবা চেষ্টাব ত্রুটি কবেননি, কিন্তু অনন্ত কিছুতেই বাজী হযনি।

এব পব বছব চাব পাঁচ অনন্ত গাঁযেই কাটায। ওদেব জেলেপাড়াব নমঃশূদ্রপাড়াব ছেলেদেব নিযে স্কুল খোলে। কুমাবপুবে তপশীলী ফেডাবেশনেব যে শাখা অফিস বসেছিল তাব অবৈতনিক সহকাবী সম্পাদকেব কাজ কবে। তখন যুদ্ধ শুরু হযেছে, পাবচেজ অফিসে আমাব একটা অস্থাযী চাকবি জুটেছে।

একবাব দিন কযেকেব ছুটিতে বাড়ি গেলাম। বেড়াতে গেলাম অনন্তদেব বাড়ি। ঘবেব বাবান্দায ছোট ছেলেদেব পাঠশালা। আমাকে দেখে অনন্ত উঠে এল। বললে, এসো, এসো।

—'কবছ কি অনন্ত?

অনন্ত মৃদু হাসল বলবাব মত কিছু নয।'

বৃদ্ধ গঙ্গাচবণ উঠানে বসে জাল বুনছিল। সে অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বলল, 'বলবে কি কর্তা। বলবাব মুখ থাকলে তো বলবে। পণ্ডিতমশাই আশীর্বাদ কবেছিলেন আমাব ছেলে জজ ম্যাজিস্টেব হবে। তিনি মবে স্বর্গে গেছেন। নইলে তাঁকে আমি একবাব দেখে নিতাম। কেমন বামুন তিনি আব কেমন তাঁব বেদবাক্য। জজ ম্যাজিস্টেব তো ভালো, একটি দফাদাব কনস্টেবলও ও হল না কর্তা। ও এখন ঘবেব খেযে বনেব মোষ তাড়ায ঘবেব খেযে পবেব ছেলে ঠ্যাঙায। আপনি ওকে জোব কবে ধবে নিযে যান কর্তা। ওকে একটা চাকবি-বাকবি জুটিযে দিন।'

বললাম, 'তাই দেব।'

হাটেব বেলা হযে গিযেছিল। গঙ্গাচবণ মাছেব ঝুড়ি মাথায নিযে বেবিযে গেল।

ওদেব সামনেব দক্ষিণেব পোতাব হবিচবণেব ঘব থেকে পঁচিশ ছাব্বিশ বছবেব একটি মেযে বলল, 'অনন্ত তুই হাটে যাবি নাকি। আমাব জন্যে তাহলে দু পযসাব পান আব চাব পযসাব দোক্তা আনবি।'

আমি বললাম, 'এ কে অনন্ত?

অনন্ত বলল, 'চিনতে পাবছ না? মলুঙ্গী, আমাব দিদি। মাসতুতো বোন।'

চেযে দেখলাম মলুঙ্গীর চেহাবা বেশ বদলে গেছে। বেশ মোটাসোটা হযেছে। পাথবেব মত কুচকুচ কালো বঙ গাযেব। একবাশ মসৃণ চুল পিঠেব ওপব ছড়ানো। ওব সেই তেঁতুলে জট কবে অদৃশ্য হযেছে—আমি খোঁজই বাখিনি। মলুঙ্গীব পবনে চওড়া সবুজ পাড়েব শাড়ি। পানেব বসে ঠোঁট দুটি লাল। কিন্তু মাথায সিঁদুবেব চিহ্ন নেই।

মলুঙ্গী আমাব দিকে তাকিযে হেসে বলল, 'একেবাবেই চিনতে পাবছেন না কর্তা? চশমা নিযেছেন তবুও না? চশমা পবলে বুঝি গাঁযেব চেনা মানুষদেব অচেনা অচেনাই লাগে।'

অনন্ত ধমক দিযে উঠল, 'ও কি ধবনেব কথা হচ্ছে দিদি? ও আমাব বন্ধু না? ও তোমাব ছোট-ভাই-এব মত না? তোমাব কাণ্ডজ্ঞান একেবাবেই গেছে? যাও ঘবে যাও। যদি হাটে যাই তোমার পান দোক্তা নিযে আসব।'

মলুঙ্গী ঘরে গিয়ে ঢুকবার আগে আমি লক্ষ্য করলাম ও অন্তঃসত্ত্বা। একটু চমকে উঠলাম। সাত আট বছর আগে ওর স্বামী মারা গেছে। সে খবর পেয়েছিলাম।

অনন্তকে নিয়ে নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে লাগলাম, একটু বাদে বললাম, 'মলুঙ্গীর কি ফের বিয়ে দিয়েছ নাকি অনন্ত?'

অনন্ত বলল, 'ও কথা কেন আর জিজ্ঞেস করছ কল্যাণ? আমাদের মধ্যে বিধবার তো বিয়ে হয় না, তার এইসব দশাই হয়। মাসীমা মেসোমশাই মারা যাওয়ার পর থেকে ও একেবারে বেপরোয়া হয়ে গেছে। মাথার ওপর তো কেউ নেই। কাউকে মানে না। ওর জন্যে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারি নে কল্যাণ। ও নিজের পরিণামের কথা মোটেই ভাবে না। কিন্তু আমি যখন ভাবি, আমার গা কাঁপে। বড় দুঃখ হয় কল্যাণ।'

দুজনে চুপচাপ হাঁটতে লাগলাম। নদীভরা কচুরীব গাটনা। হাটুরেদের খেয়া নৌকা অতিকষ্টে পারাপার হচ্ছে।

অনন্ত বলল, 'বিধবা ইন্দিরাকেও দেখেছি আর মুলঙ্গীদিকেও দেখছি। দুজনের মধ্যে কত তফাত। দুজনের প্রকৃতি কত আলাদা। একজন যুঁই ফুলেব তোড়া আর একজন বন ধুতরা।' একটু থামল অনন্ত, তারপর ফের বলল, 'কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয় কি জানো কল্যাণ? এদের শুধু প্রকৃতিভেদই না, শিক্ষাব ভেদ, সমাজের ভেদও রয়েছে। আর তার ফলেই এই প্রকৃতিভেদ। তাছাড়া একা মলুঙ্গীবই বা দোষ দিলে কি হবে। গাঁয়ের লোকই যে ওকে পাগল করে তুলেছে। তোমাদের কায়েত বামুনদের পাড়ার লোকও আছে। আমাদের হাতে খেলেই শুধু তাদেব জাত যায়, আমাদেব মাছ আব মৎস্যগন্ধায় জাত যায় না।'

খানিক বাদে আমি বললাম, 'খুব তো সমাজ সংস্কার আর ফেডারেশন করে বেড়াচ্ছ। তোমার লেখার কি হল। লেখাটা একেবারেই ছেড়ে দিলে নাকি?'

অনন্ত বলল, 'না, একেবারে ছেড়ে দেই নি। এখনো মাঝে মাঝে নিয়ে বসি। একখানা উপন্যাস শুরু করেছি কল্যাণ।'

বললাম, 'খুব ভালো কথা। আমি তো ভাই উপন্যাস এ পর্যন্ত ছুঁতেই পারলাম না। তবু তুমি ধরেছ। বিষয়বস্তুটা কি?'

অনন্ত বলল, 'আমাদের এই জেলেপাড়া। নদীর মাছ আর নদীর জেলে। একজনের প্রাণ নিয়ে তবে আর একজনের প্রাণ বাঁচে। তবু মাঝে মাঝে এদের মধ্যে প্রাণের সম্পর্ক চোখে পড়ে কল্যাণ। মাছ জেলেবা ভালবাসে। মাছের নামে ওরা ছেলেমেয়েদের নাম বাখে। মাছের আঁশ, মাছের গন্ধ মাখে গায়ে। মাছ আমরা মারি কল্যাণ কারণ মাছ তোমরা খাও। আমরা জেলেরা আর কটা মাছ খাই। টিয়া, ময়না, শ্যামা, দোয়েল পাখীর মত যদি মাছ তোমরা পুষতে, আমরা তাহলে মাছ তোমাদেব পোষবার জন্যেই দিতাম, খেতে দিতাম না।'

বললাম, 'চমৎকার বিষয়, চল না, একটু পড়ে শোনাবে।'

অনন্ত বলল, 'না না, এখনো শোনাবার সময় হয়নি। আরো কিছুটা এগোক তখন শুনো।'

আরো বছব দুই বাদে কলকতায় আমাদের শোভাবাজারের মেসে এসে উঠল অনন্ত। আমি তখন চাকবি খুইয়ে বেকাব। টিউশন-সর্বস্ব। অনন্তও এতদিন বাদে চাকরির সন্ধানে এসেছে। সর্দি গবমি হয়ে গঙ্গাচরণ মারা গেছে বছবখানেক আগে। মুখে যতই বলুক পৈতৃক পেশাটা অনন্ত নিতে পাবেনি। অবৈতনিক স্কুল চালিয়ে কলা মুলো যা পাওয়া যায় তাতে পেট ভরে না। তাছাড়া ওদের ফেডারেশনের সঙ্গেও অনন্ত'র মতভেদ হয়েছে। সেখানেও তিনটে দল আর উপদল। সেখানেও ধনী আর শিক্ষিতের হাতে কলকাঠি। শেষ পর্যন্ত অনন্ত বিতাড়িত হয়েছে সেখান থেকে।

অনন্ত বলল, 'যতদিন চাকরি-বাকরি না জোটে তোমার ঘাড়ে বসে খাব।'

হেসে বললাম, 'কে কার ঘাড়ে বসে তার ঠিক কি।'

লম্বা মেঝের ওপর ছোট ছোট বিছানা পাতা। এক ঘরে সহবাসীদের সংখ্যা জন পাঁচেক। এরই মধ্যে অনন্ত'রও জায়গা করা হল। খাওয়া জন্যে ভাবনা নেই, পাইস হোটেল আছে। সারা কলকাতা ভরে আমাদের রান্নাঘর ছড়ানো।

অনন্ত মাসখানেকের সম্বল নিয়ে এসেছিল, বলল, 'যেমন করেই হোক, এই একমাসের মধ্যে আমাকে কিছু একটা জোটাতেই হবে। নিজের জন্যে নয়, দু পাঁচ টাকা না পাঠালে মা খাবে কি।'

বললাম, 'তা ঠিক।'

অবশ্য মাসখানেকের মধ্যেই ঠিক জুটল না। জুটতে জুটতে আরও তিন চার মাস কাটল। পটলডাঙা স্ট্রীটে যুবশক্তি নামে একটি সাপ্তাহিক কাগজে তিরিশ টাকা মাইনের প্রুফ রীডারের চাকরি পেল অনন্ত। বড় লোকের কাগজ। অনিরুদ্ধ সেন ছিলেন সেই কাগজের সম্পাদক। তিনি লক্ষ্য করলেন অনন্ত শুধু প্রুফ দেখতেই জানে না, আরও কিছু বিদ্যাবুদ্ধি এর পেটে আছে। তিনি অনন্তকে কিছু কিছু লিখতেও দিলেন। দেখলেন চলতি ঘটনার উপর নিবন্ধ অনন্ত মন্দ লেখে না। এমন কি প্রবন্ধের হাত ওর ভালো। তিনি মালিককে বলে কয়ে ওকে সহকারী করে নিলেন। অনন্তর মাইনে বাড়ল পাঁচটাকা। মাসকয়েক বাদে অনিরুদ্ধবাবু সিনেমা লাইনে চলে গেলেন। অনন্ত বসল তাঁর গদিতে। কিন্তু মাইনে রইল ওই পঁয়ত্রিশ টাকাই।

অনন্ত বলল, 'তা থাক কাজটা তবু তো পছন্দমত।'

এই সময়ে বারিধিবাবুর সঙ্গেও অনন্তর পরিচয় হয়। এই কোম্পানীরই এ্যাসিস্ট্যাণ্ট পাবলিসিটি অফিসার হয়ে গিয়েছিলেন তখন বারিধিবাবু। 'যুবশক্তি'তে বিজ্ঞাপনের লেখা নিয়েই অনন্তর সঙ্গে তাঁব পরিচয় হয়। এ সব ব্যাপারে অনন্ত সবিনয়ে তাঁকে যে সব পবামর্শ দিত তা গ্রহণের অযোগ্য হত না। বরং পাবলিসিটি অফিসারের নির্দেশের চেয়ে তা যোগ্যতরই হত। তবু ওপরওয়ালার নির্দেশই মানতে হত বারিধিবাবুকে। অনন্তর এই সময়কার বেহিসেবী বদান্যতার গল্প শুনেছি পরে। দু টাকা চার টাকা করে মাইনের অর্ধেকই ওর দান-ধ্যানে যেত। রিডিং ডিপার্টমেণ্টের প্যাকিং ডিপার্টমেণ্টের সহকর্মীরা অবশ্য দান বলে নিত না, ধার বলেই নিত। কিন্তু ফের যারা হাত উপুড় করত তাদের সংখ্যা কমই ছিল।

পাইস হোটেলে পাশাপাশি খেতে বসে আমি দেখতাম, ডাল আলু কুমড়ার ছক্কা ছাড়া ও কিছু নেয় না।

বলতাম, 'তুমি এত কৃপণ কেন অনন্ত?'

অনন্ত বলত, 'কী করব বল, এর বেশি সাধ্য কোথায়।'

বলতাম, 'কিন্তু এভাবে খেয়ে তুমি কদিন বাঁচবে।'

অনন্ত হেসে বলত, 'ভেব না কল্যাণ, আমাদের কই মাছ সিঙ্গি মাছের প্রাণ, সামান্য একটু জল পেলেই আমরা টিঁকে থাকতে পারি।'

মাঝে মাঝে আমি ওকে ডিম আর মাছের ভাগ দিতাম বলে ও আমার সঙ্গে খেতে আসাই ছেড়ে দিল।

কখনো কখনো আমি ওকে লেখার তাগিদ দিতাম, 'অনন্ত, তুমি কিছু লিখছ না যে।'

অনন্ত হেসে বলত, 'কোথায় লিখব। সম্পাদক হয়ে নিজের কাগজে তো লেখা যায় না। আর অন্য সম্পাদকের দোরে গিয়ে ধন্না দিতেও বাধে।'

বলতাম, 'তবে তো মহা বিপদ।'

কিন্তু অত সুখের সম্পাদকী চাকরিও অনন্তর বেশি দিন রইল না, মানে ও রাখতে পারল না। লেখা ছাপা নিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে ওর প্রায়ই মনোমালিন্য হতে লাগল। মাঝে মাঝে এমন সব গল্প কবিতা প্রবন্ধ ছাপবার অনুরোধ আসে যা অনন্তর মতে প্রকাশের অযোগ্য, অনন্ত যত ইতস্তত করে, যত দেরি করে. ততই একটু একটু করে অনুরোধের ছদ্মবেশ ঝরে পড়ে। শেষ পর্যন্ত কড়া হুকুম জারী হত লেখা ছাপাতেই হবে।

অনন্ত বলত, 'অসম্ভব। সম্পাদকের দায়িত্ব যতদিন আমার ওপর আছে—'

মালিক হেসে বললেন, 'কোন চিন্তা করবেন না। এসব বিশ্রী দায়িত্ব থেকে আপনাকে নিষ্কৃতি দিলাম। আপনি গিয়ে বসুন ফের রিডিং ডিপার্টমেণ্টে।'

'তাও আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়'—বলে কাজ ছেড়ে দিল অনন্ত। সীট ভাড়া নিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় আমাদের মেসও ছেড়ে দিল। আমাকে ঠিকানা না জানিয়েই

একদিন চলে গেল অনন্ত, ওর এই একগুঁয়েমিতে আমি মনে মনে খুবই রাগ করলাম। ভাবলাম জীবনে আমি আর ওর খোঁজ নেব না।

মাস ছয়েক কাটল, আমি অফিস আর মেস দুই-ই বদলালাম। তারপর একদিন সকাল বেলা দেখি সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের আমার নতুন মেস-এর ঠিকনায় অনন্ত এসে হাজির।

বললাম, 'কি ব্যাপার, তুমি অমন নিরুদ্দেশ হয়েছিলে কেন ? তোমার সঙ্গে তো আমার কথা বলাই উচিত নয়।'

অনন্ত হেসে বলল, 'তা না বল, নাই বললে। একটা গল্প কিন্তু তোমাকে দিতেই হবে।'

বললাম, 'ব্যাপার কি। ফের কোন সম্পাদক হয়ে বসলে নাকি ? সাপ্তাহিক তো গেছে। এবার কোন্ ধরনের কাগজ ? মাসিক না দৈনিক না ক্ষণিক ?'

না দৈনিক নয়, তবে মাসিক আর ক্ষণিক দুই-ই, কারণ নতুন কাগজ। কতদিন আয়ু বলা যায় না। সম্পাদক নয়, এবারও সহকারী সম্পাদকের পদ। নামে সম্পাদক না হলেও সম্পাদনার কাজ সব ওকেই করতে হবে। কাগজের নাম 'অন্বেষণ'। আরপুলি লেনে অফিস। কয়েক সংখ্যা এরই মধ্যে বেরিয়েছে। কাগজের যিনি মালিক তাঁর নিজস্ব বড় প্রেস আছে। তাই কাগজটা চট করে উঠে যাবে না এই ভরসা করা যায়।

অনন্ত বলল, 'এসো একদিন।'

বললাম, 'তা না হয় এলাম, কিন্তু তুমি ওসব চাকরি ছাড়। সম্পাদকগিরি করলে তুমি কেবল জীনভবে পরের লেখার বানান ভুল শুধরেই যাবে। নিজে আর লিখতে পারবে না।'

অনন্ত বলল, 'নিজের পছন্দমত চাকরি বেছে নেব তেমন যোগ্যতা কি আমাদের আছে। চাকরিই আমাদের বেছে নেয় কল্যাণ। তোমার তো কত চাকরি হল, কত চাকরি গেল, মনের মত কাজ কি কোনদিন পেয়েছ ?'

বললাম, 'না, কোনদিন পাবও না। আমার মনের মত কাজ শুধু লেখা।'

অনন্ত বসল আমার তক্তপোশের ধার ঘেঁষে। বলল, 'শুধু তোমার কেন ছোট বড় প্রত্যেক লেখকের মনের মত কাজই তাই, ছোট বড় প্রত্যেক আর্টিস্টের মনের মত কাজ শুধু ছবি আঁকা, ছোট বড় প্রত্যেক গায়কের মনের মত কাজ শুধু গান। কিন্তু প্রত্যেকে সে সুযোগ পাবে আমাদের দেশ সেই মনের মত দেশে গিয়ে পৌঁছতে অনেক দেরি। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় কল্যাণ, সব চেয়ে আগে, সব কাজ ফেলে আমাদের সেই মনের মত দেশ গড়ে তোলাই উচিত কিনা।'

বললাম,'অত উত্তেজিত হয়ো না অনন্ত। মনের মত দেশ গড়ে তোলার একটি মাত্র পথই আছে। যার যতদূর সাধ্য, যার যতক্ষণ সাধ্য নিজের মনের মত কাজ নিয়ে পড়ে থাকা। এ পথের কোন শর্টকাট নেই।'

আমার কথায় অবশ্য অনন্ত সায় দিল না। কিন্তু এ নিয়ে আর তর্কও করল না। আমি চা আনলাম। কাপে একটু ঠোঁট ছুঁইয়ে ও বলল, 'তা ছাড়া আরো একটা কারণে লেখা তেমন এগুচ্ছে না কল্যাণ।'

বললাম, 'কি কারণ।'

অনন্ত বলল, 'তুমি প্রমথ লাহিড়ী মশাইকে চেন ?'

বললাম, 'চিনি। নামজাদা কাগজের রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক। লেখকদের মধ্যে ওঁকে না চেনে কে ?'

অনন্ত বলল, 'আমি সেরকম চেনার কথা বলছি না।'

অন্যরকমভাবে আমিও যে একটু আধটু না চিনেছি তা নয়। কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে বললাম, 'তুমি কি রকমভাবে চিনেছ ?'

অনন্ত বলতে লাগল। লাহিড়ীমশাই-এর সঙ্গে তাঁর মুখচেনা আগেই ছিল। কলেজ স্ট্রীটের পুরনো বই-এর স্টলে মাঝে মাঝে দেখা সাক্ষাৎ হত। কিন্ত আলাপ হত না। অনন্ত তার নাম জানত, কিন্তু তিনি ওর পরিচয় জানতেন না। একদিন আলাপ পরিচয় হল। সিস্টার নিবেদিতার 'ওয়েভস অব ইণ্ডিয়ান লাইফ' স্টলওয়ালার কাছে আগের দিনই সে দেখে দাম করে গিয়েছিল।

দোকানী অনন্তর গরজ বুঝে একটু চড়া দামই হেঁকেছিল। পুরো টাকাটি অনন্তর পকেটে সেদিন ছিল না। পরদিন টিউশনির টাকা পেয়ে অনন্ত গেল বইখানা কিনতে। গিয়ে বইখানায় কেবল হাত দিয়েছে পিছন থেকে দীর্ঘকায় ছিপছিপে সুদর্শন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'বইখানা আপনি নিচ্ছেন ? আমি পরশুদিন দেখে দর করে গিয়েছিলাম ?'

অনন্ত একটু পিছিয়ে এসে বলল, 'ও তাই নাকি ? তাহলে আপনিই নিন লাহিড়ীমশাই।'

প্রমথবাবু বললেন, 'আপনি আমাকে চেনেন ?'

অনন্ত বলল, 'চিনি।'

প্রমথবাবু তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনাকেও চিনি চিনি মনে হচ্ছে।'

অনন্ত নিজেই নাম বলে অনুরোধ করল, 'বইখানা আপনি নিন প্রমথবাবু।'

প্রমথবাবু বললেন, 'না না, সে কি হয়। আপনি আগে হাত দিয়ে ধরেছেন। আমি কিছুতেই তা নিতে পারি নে। আপনি নিন ওটা। আমি আর এক কপি সংগ্রহ করে নেব।'

দুজনের মধ্যে আরো দু তিন মিনিট এই নিয়ে বিতর্ক চলল। শেষ পর্যন্ত অনন্তই হার মেনে বইখানা দাম দিয়ে নিল। তারপর মলাটটা উল্টে পকেট থেকে সস্তা দামের ফাউন্টেন পেনটা খুলে লিখল, 'শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ লাহিড়ী, শ্রদ্ধাস্পদেষু।'

প্রমথবাবু বললেন, 'ও কি করলেন।'

অনন্ত স্মিত মুখে চুপ করে রইল।

প্রমথবাবু একটু বাদে ওকে তাঁর চড়কডাঙার বাসার ঠিকানা দিয়ে বললেন, 'আসুন একদিন সকালবেলা ?'

অনন্ত বলল, 'কবে যাব ? রবিবার ?'

'না রবিবার নয়, রবিবার আরো অনেক স্বজন বন্ধুর ভিড় জমে।

অনন্তকে অন্য যে কোন একদিন যেতে বললেন প্রমথবাবু।

পরদিনই যাওয়াটা ভাল দেখায় না। কিন্তু তার পরদিন আর অনন্তর সবুর সইল না। ও গিয়ে হাজির হল সকালে।

একতলা বাড়ির ছোট ছোট খান তিনেক ঘর নিয়ে থাকেন প্রমথবাবু। কিন্তু প্রত্যেকটি ঘর বোঝাই শুধু বই। ঘরণী যে একটু হাত পা মেলে নড়াচড়া করবেন তার জো নেই। ছেলেমেয়েগুলির অবস্থাও তথৈবচ।

তার আর শোয়ার ঘর, বসবার ঘর নেই। সবই পড়বার ঘর। সামনের ঘরখানায় নিজের হাতে মাদুর বিছিয়ে প্রমথবাবু অনন্তকে বসতে দিলেন।

অনন্ত প্রথমেই প্রশ্ন করল, 'এত বই আপনি পেলেন কোত্থেকে ? বোধহয় হাজার দশেক হবে ?'

প্রমথবাবু বললেন, 'কিছু বেশিই হবে।'

কথায় কথায় আলাপ চলতে লাগল। লেখক বন্ধুদের দু-চারখানা উপহারের বই ছাড়া সবই প্রমথবাবুর নিজের টাকায় কেনা। সেই প্রথম জীবনে যখন পঁচিশ ত্রিশ টাকা মাইনের মাস্টারী করতেন তখন থেকেই বই কিনে চলেছেন প্রমথবাবু। ইংরেজী বাংলা সংস্কৃত তিন ভাষার সাহিত্য, দর্শন ইতিহাস—মূল্যবান সংগ্রহ। অনন্ত একটু চোখ বুলিয়েই তা বুঝতে পারল। খানকয়েক বই মেঝেতে নামানো। পাশে একটি লালনীল পেন্সিল। একখানি খোলা বই-এর মার্জিনে সুন্দর ছোট হস্তাক্ষরের মন্তব্য। বোঝা গেল লাহিড়ী মশায়ের এ সঞ্চয় উই আর ইঁদুরের জন্যে নয়, নিজের জন্যেই।

অনন্তরও বই কেনার অভ্যাস আছে কিন্তু অত নয়, তাছাড়া সাধ্যই বা কই। কিন্তু প্রমথবাবুর সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে তার বই-এর খরচ বেড়ে চলল। অনেক দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান গ্রন্থের সন্ধান মিলল তাঁর কাছে। অনন্তকে আর দ্বিতীয়বার আহ্বান করতে হল না। সময় পেলেই অনাহুত ভাবে ও যেতে লাগল লাহিড়ী মশায়ের বাসায়। ঠিক অনাহূতও নয়, অনন্তর জন্যে তাঁর দ্বার খোলাই ছিল, অনুচ্চারিত আহ্বান লেগেই ছিল তাঁর স্মিত মুখে। না—বই-এর লোভে অনন্ত তাঁর কাছে যেত না। অনন্ত যেত পাঠকের কাছে, অনন্ত যেত পণ্ডিতের কাছে, অনন্ত যেত মানুষটির

কাছে। অনন্ত আমার কাছে প্রায়ই ওঁর কথা বলত, 'এমন মানুষ আজকালকার দিনে খুব কম মেলে কল্যাণ। মনে হয় যেন বিগত শতাব্দীর কেউ। শিষ্টাচারে, সৌজন্যে, দাক্ষিণ্যে অমন মানুষ এ যুগে দুর্লভ।'

কিন্তু প্রমথবাবুর চরিত্রালোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। তাঁর সান্নিধ্য সাহচর্য, তাঁর বন্ধুত্ব অনন্তর মনে গভীর ছাপ ফেলেছিল তাই আমার বক্তব্য।

অনন্ত জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনি লেখেন না কেন?'

প্রমথবাবু সবিনয়ে হেসে বলেছিলেন 'সবাই কি লিখতে পারে? তা ছাড়া চাকরি-বাকরি কাজকর্ম সেরে লিখতে গেলে পড়া হয় না। আমি পড়ে আনন্দ পাই।'

'পড়ে আনন্দ পাই' কথাটা ভারি সুন্দর লাগল অনন্তর, ভারি নতুন লাগল। ওর মনে হল সত্যি অনেকদিন ও কোন ভালো বই পড়েনি। কেবল পাতার পর পাতা লিখেছে আর ছিঁড়েছে। আর কষ্ট পেয়েছে। আনন্দ পায়নি। পড়ার আনন্দের কথা অনেক দিন ধরে ভুলে আছে ও, অথচ পড়বার আনন্দ দিয়েই তো আমাদের যাত্রা শুরু। কিন্তু লিখতে গিয়ে পড়বার কথা আমরা ভুলে যাই। অনেক সময় বাধ্য হয়ে ভুলি। লিখব, পড়ব—দুই-ই করব এত প্রচুর সময় কই জীবনে। তা ছাড়া লেখা বড় সাংঘাতিক বস্তু। কোন কিছু লেখার কথা যদি মাথায় একবার ঢোকে অন্যের বই-এর পাতা চোখের সামনে ঝাপসা দেখায়। তাই যাঁরা লেখেন না তাঁরাই সৎ পাঠক। হিজবিজি লিখে অনেকগুলি পাতা ভর্তি করবার পর হঠাৎ এক এক সময় আত্মগ্লানিতে মন ভরে ওঠে। ছি ছি ছি, মূর্খ হয়ে রইলাম অশিক্ষিত হয়ে রইলাম। তার চেয়েও বড় কথা যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার রসভাণ্ডারের ধারে-কাছে পৌঁছতে পারলাম না! কিন্তু একটি ভালো লাইন লিখতে পারলে, একটি পছন্দমত শব্দ বসাতে পারলে আর কথা নেই। লেখকসত্তা বুক ফুলিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। নিজের মধ্যে এই দুই সত্তার দ্বন্দ্ব যেন দুই সতীনের লড়াই। দুই সতীনকে যাঁরা দুই সহোদরা করতে পেরেছেন তাঁরা ধন্য।

তাই অনন্তর কথা শুনে আমি বললাম, 'তিনি যদি তোমাকে লেখার ব্যাপারে নিরুৎসাহ করে থাকেন আমি বলব অন্যায় করেছেন।'

অনন্ত বাধা দিয়ে বলল, 'না না, তা তিনি করবেন কেন। তিনি বরং উৎসাহই দিয়েছেন। বলেছেন যাঁদের ভিতরে সৃষ্টির কিছুমাত্র ক্ষমতা আছে তাঁরা লিখে যান। কিন্তু দোহাই পড়াটাকে বাদ দেবেন না। তিনি উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু আমি নিজেই উৎসাহ পাচ্ছি নে। কি হবে ছাইভস্ম কতকগুলি লিখে। নিজের লেখাকে তুমি যতটা মূল্য দাও, আমি তা দিই নে।'

'নিজের লেখা' কথাটা আমার কানে লাগল।

বললাম,'নিজের লেখাকে আমি মোটেই মূল্য দিই না, কিন্তু লেখাকে মূল্য দিই। লেখার চর্চা আমাদের রাখতেই হবে। আমরা কি জানি নে আমাদের কার কত বছর পরমায়ু? কারো পাঁচ, কারো দশ। আমরা কি জানি নে আমাদের কার কতজন পাঠক? কারো পনের, কারো বিশ। তবু লেখার চর্চা না রেখে উপায় নেই। ভবিষ্যৎ মহৎ শিল্পীর আমরা পথের সিঁড়ি। সিঁড়ি বললে দম্ভ করা হবে, পথের খোয়া। তবু প্রতিজ্ঞা করে সবাই যদি এক সঙ্গে লেখা বন্ধ করি তাহলে কালি কলমের পাটই তো দেশ থেকে উঠে যাবে।'

অনন্ত একটু হেসে বলল, 'আমি তা বলছি নে কল্যাণ। তুমি তো লেখাকেই লেখার চরম বলে জানো? তুমি তো শিল্পকেই শিল্পের পরম উদ্দেশ্য বলে মানো।'

বললাম, 'হ্যাঁ, একথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। আমি বলি শুধু শিল্পের জন্যেই শিল্প নয়, শিল্পীও শিল্পের জন্যে।'

অনন্ত বলল, 'কিন্তু আমি তা নই। আমার মনে হয়, এই যে শিল্পীজীবন,এ একটা স্তর মাত্র। জীবন-সাধনায় শিল্প একটা পথ মাত্র, পদ্ধতি মাত্র। তার চেয়ে বেশি নয়। সেই পদ্ধতি বদলাতে পারো। তুমি যেমন এক গল্প থেকে আর এক গল্পে যাও, এক টেকনিক থেকে আর এক টেকনিকে, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে হাত বাড়াও এও তেমনি।'

এর পর অনন্ত উঠে দাঁড়াল, 'যাই হোক, একটা গল্প কিন্তু অবশ্যই দিয়ো।'

আমি হেসে বললাম, 'এর পরেও গদ্য ? তোমাকে আমি সদগুরু সঙ্গমাহাত্ম্য নামে একটি প্রবন্ধ কালই লিখে দিচ্ছি।'

অনন্ত হেসে বিদায় নিল।

এরপর নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোডে অনন্ত বাসা করল। পুরনো একতলা বাড়ির দুখানা ঘর। দুখানা বলা চলে না। দেড়খানা। একখানা একেবারেই ছোট। আগের ভাড়াটেদের রান্নার জায়গা ছিল। তাকে বেডরুম করা হয়েছে। ভাড়া কুড়ি টাকা। অনন্ত মাকে নিয়ে এল বাড়ি থেকে।

বললাম, 'যাক এবার তোমার সুমতি হয়েছে, না খেয়ে খেয়ে শরীরটাকে যা করেছ।'

অনন্ত বলল, 'যা আয় তাতে বাসা করা পোষায় না কল্যাণ। শুধু মার চিকিৎসার জন্যেই আনতে হল। দেশের ডাক্তার কিছু করতে পারছিল না। অনর্থক পয়সা যাচ্ছিল।'

একদিন ছুটির পরে গেলাম অনন্তর বাসায়। অনন্ত সাদরে আপ্যায়ন করে বলল, 'এসো এসো।'

সারদাও বেরিয়ে এল সামনে। বুড়ো হয়ে গেছে। মাথার কাঁচা-পাকা চুল ছোট করে ছাঁটা। আমাকে দেখে একটু আঁচল টেনে দিল সারদা। ছেলেবেলায় ধীরর বন্ধুর বাপ মাকে নাম ধরেই ডাকতাম। কিন্তু আজ তা ডাকতে সংকোচ হল, বললাম, 'কেমন আছ মাসী ?'

সারদা ভারি খুশি, বলল, 'ভালো আছি বাবা। ছেলে আমাকে বড় ডাক্তার দেখিয়েছে। কুচক্করে পাড়ার লোক বিশ্বাসই করতে চায় না—অনন্ত আমাকে শহরে আনবে, বড় ডাক্তার দেখাবে। এবার বিশ্বাস হল তো ?' এর পর ছেলের দিকে ফিরে তাকাল সারদা, 'তুই তো চিঠিপত্তর লিখিস। ওদের একটা চিঠি দিস তো। লিখবি ষোল টাকাওয়ালা ডাক্তার দেখিয়েছিস—না—না—না—বত্রিশ টাকার কথাই লিখিস। নইলে ওরা ভাববে আট টাকাওয়ালা ডাক্তারের কাছেই তুই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলি।'

অনন্ত হেসে বলল 'আচ্ছা মা তাই লিখব।

সারদা চা করতে পারে না। অনন্ত নিজেই আমার জন্যে চা করতে বসল।

সারদা বলল, 'তোমার বন্ধুর লেখা বেরিয়েছে দেখেছ ?'

বললাম, 'তাই নাকি ? নতুন কিছু লিখেছে নাকি অনন্ত ? ও আমাকে কিছু বলে না, কিছু দেখায় না মাসী '

'দাঁড়াও আমি দিচ্ছি।' বলে সারদা তাকের ওপর থেকে নতুন 'অন্বেষণ' খানা নিয়ে এল। বলল, 'অনন্তের লেখা এর মধ্যে আছে।'

অনন্ত আমাকে চোখ টিপে বলল, 'দেখবে মজা ? মা, তুমি নিজে বের করে দাও দেখি কোথায় আছে আমার লেখা।

সারদা বলল, 'আহা হা, ছেলে আমার সঙ্গে মস্করা করছে। তা বুঝি আর পারি নে।'

অনন্ত বলল 'দেখাও না কল্যাণকে।'

আমি বসে বসে নিরক্ষরা বুড়ি সারদার কাণ্ড দেখতে লাগলাম। ও বিজ্ঞাপনের পাতাগুলি উল্টে গেল, কয়েকটি প্রবন্ধ, কবিতার পাতা পার হল, তারপর 'জেলের মেয়ে' নামে একটি গল্পে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'এই তো।'

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, সত্যিই তাই। গল্পের নিচে অনন্ত মালোর নামই ছাপা রয়েছে। বললাম, 'কি করে তুমি খুঁজে বার করলে মাসী ?'

বাঁ দিকের পাতাটায় একটি তেলের বিজ্ঞাপনের ছবি ছিল। একটি কেশবতী মেয়ে গন্ধতেল মেখে চিরুনী দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছে। সারদা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল, 'ওই দেখে চিহ্ন রেখেছি। আর কোন পাতায় ও ছবি নেই।'

এর আগে অনন্ত একবার গল্পের জায়গাটা দেখিয়েছিল, খানিকটা পড়ে শুনিয়েছিল মাকে।

অনন্ত হেসে বলল, 'মার বুদ্ধি দেখেছ ? কালই তোমাকে আমি শ্লেট পেনসিল কিনে দেব মা। লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করব।'

দুটি চোখ সেই ছাপা গল্পটির ওপর রেখে সারদা আস্তে আস্তে সস্নেহে প্রত্যেটি লাইনের ওপর

আঙুল বুলাতে লাগল। যেন ছেলের গায়েই হাত বুলাচ্ছে।

একটু বাদে আমার দিকে চেয়ে বলল, 'আমাদের মলুঙ্গীকে নিয়ে লেখা। ওই হতচ্ছাড়ী মেয়েটাকে কেন যে ও অত ভালোবাসে।'

আমি অনন্তকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মলুঙ্গীর খবর কি।'

অনন্ত সংক্ষেপে বলল, 'সে আজকাল হলধর ধুপীর সঙ্গে আছে।'

মাস কয়েক বাদে অনন্তর আবার চাকরি গেল। কাগজে লোকসান যাচ্ছে বলে প্রেসের মালিক বন্ধ করে দিলেন কাগজ। তিন-চার মাস এ প্রেসে সে প্রেসে প্রুফ দেখে টিউশনি করে কাটাল অনন্ত।

তারপর বারিধিবাবুর চেষ্টায় অনন্তর ফের জুটল আর একটি চাকরি। দৈনিক কাগজে প্রুফ রিডিং-এর কাজ। শেষ পর্যন্ত সেই চাকরিতেই টিঁকেছিল অনন্ত।

আমরা ভাবলাম, এবার যখন অনন্ত একটি স্থায়ী চাকরি পেয়েছে ওর আর্থিক অবস্থা একটু ভালো হবে। অন্তত একবেলা খেয়ে আর ওকে থাকতে হবে না। মাইনে সামান্যই। তবু মা আর ওর নিজের খরচ তাতে মোটামুটি চলে যাবে

কিন্তু তা চলল না গাঁয়ে জেলেদের মধ্যে নমঃশূদ্র আর মুসলমান চাষীদের মধ্যে ওর মুখাপেক্ষী যে কত লোক ছিল তার আর সীমা ছিল না। গোপনে গোপনে ও তাদের টাকা পাঠাত। সহকর্মীদের মধ্যেও ওর কাছে অনেকে হাত পাততেন। অনন্ত কাউকে না করত না, না করতে হয়ত পারত না দান খয়রাতের পর বাকি যা থাকত তারও বেশির ভাগ টাকা যেত বই-এ এই নিয়ে মার সঙ্গে ওর প্রায়ই ঝগড়া লাগত। সারদা ছেলেকে অশ্লীল গালাগাল করে বলত, 'মুখপোড়া, তুই যে মরবি। ... কেবল জল আর বাতাস খেয়ে কি মানুষ বাঁচে?'

অনন্ত বলত, 'বাঁচা উচিত। মা বাঁচা উচিত, যে দেশে অন্নের এত দাম সেখানে জল আর বাতাস ছাড়া মানুষের আর খাবার আছে কি।'

বছরখানেক বাদে অনন্তর মা মারা গেল। সাধ্যমত চিকিৎসা করিয়েছিল অনন্ত, ডাক্তারের পরামর্শমত রক্ত পরীক্ষা করিয়ে রক্তের দোষ সারাবার জন্যে ব্যয়বহুল চিকিৎসা চালিয়েছিল মাস ছয়েক ধরে কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বয়সও হয়েছিল সারদার।

ওর মৃত্যুর খবর পেয়ে আমি একদিন অনন্তকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে ওর বাসায় গেলাম। কড়া নাড়তেই একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এল। আমি অবাক হয়ে দেখলাম, মলুঙ্গী। আরো মোটা হয়েছে। কিন্তু ঠোঁটের সেই পান-দোক্তার ঔজ্জ্বল্য অনেকটা যেন নিষ্প্রভ। চোখের সেই চটুল চাউনিও আর নেই, বয়স হয়েছে মলুঙ্গীর। তিরিশ পেরিয়ে গেছে।

বললাম 'তুমি এখানে?'

মলুঙ্গী বলল, 'হ্যাঁ ছোটকর্তা, মাসী মারা যাওয়ার দিন সাতেক আগে এখানে এসেছি। অনন্তই আনিয়েছে। মাসীর সেবাযত্ন হত না। ভাবলাম দিয়ে আসি দু-ফোঁটা জল দুনিয়ার আর তো আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই।'

বললাম, 'বেশ করেছ। অনন্ত কোথায়।'

মলুঙ্গী বলল, 'ও একটু বেরিয়েছে। এখুনি আসবে। বসুন এসে ছোটকর্তা।'

আমি একটু ইতস্তত করে অনন্তর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ওর ছোট তক্তপোশখানা বই-এর গাদায় ভর্তি, ঠেলে একটু জায়গা করে নিয়ে বসলাম কোনরকমে। আমার সাড়া পেয়ে গুটি তিনেক উলঙ্গ ছেলেমেয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। তাদের এক-একটির এক-একরকম চেহারা।

মলুঙ্গী লজ্জিত হয়ে তাদের তাড়া দিয়ে বলল, 'যা, যা। তোরা আবার এখানে এসেছিস কেন। তোরা ভিতরে যা।'

বললাম, 'আঃ, কেন ওদের বকছ মিছামিছি।'

মলুঙ্গীর সঙ্গে খানিকক্ষণ বসে ছেলেবেলার গল্প করলাম। খালের ঘাটে বঁড়শিতে কেঁচোর টোপ দিয়ে মলুঙ্গী যে টপাটপ ট্যাংরা আর পুঁটি মাছ মারত সেইকথা বললাম।

মলুঙ্গী হেসে বলল, 'আপনার সেসব মনে আছে ছোটকর্তা?'

একটু বাদে বলল, 'সেইদিনগুলিই সবচেয়ে ভালো ছিল কর্তা।' এবাব আব হাসল না মলুঙ্গী।

বাত আটটা পর্যন্ত অনন্তব জন্যে অপেক্ষা কবে আমি শেষে উঠে পডলাম।

মলুঙ্গী বলল, 'ওই বকমই মানুষ ছোটকর্তা। বাড়ি থেকে একবাব বেবোলে আব ফিবতে চায না। কথাব ঠিক নেই, নাওযা-খাওযাব ঠিক নেই।'

বললাম 'ওকে যত্ন-টত্ন কবো।'

মলুঙ্গী বললে, 'ওকে যত্ন কবব না তো কাকে যত্ন কবব ছোটকর্তা? আমাব আব আছে কে? আমাব সব দোষ ক্ষমা কবে ও আমাকে কাছে ডেকেছে, এখনো দিদি বলে ডাকে। আপন ভাইও তো এমন কবে না ছোটকর্তা, ও মানুষ না কর্তা, দেবতা। কোন মুনি-ঋষিব শাপে আমাদেব ঘবে এসে জন্মেছে।'

মলুঙ্গীব চোখ দুটো ছলছল কবে উঠল।

দিন দুই বাদে কলেজ স্ট্রীটেব মোড়ে ফেব একদিন অনন্তব সঙ্গে দেখা। বগলে একতাড়া প্রুফ। আমাকে দেখে অপবাধীব ভঙ্গিতে বলল, 'তুমি গিয়েছিলে আমি শুনেছি। কিন্তু গিযে যে তোমাব একবাব খোঁজ নেব—কিছুতেই তাব সময কবে উঠতে পাবিনি। বঙ্গভাবতী নামে আব একটি প্রেসে কাজ নিযেছি। যখন দুপুবেব শিফটে ডিউটি থাকে, সন্ধ্যাব পব সেখানে যাই।

ওকে টেনে নিযে গেলাম একটা চাযেব দোকানে।

বললাম, 'মলুঙ্গীব তো অনেক পবিবর্তন হযেছে।'

অনন্ত বলল, হ্যাঁ, তা হযেছে। জলধব শীলেব সঙ্গে বেষাবেষি কবে হলধব ওকে প্রায খুন কবতে বসেছিল। খবব পেযে মাব শুশ্রূষাব নাম কবে আমি ওকে আনিযেছি। কিন্তু ও যে বদলাতে পাবে তা আমাদেব পাড়াব লোকে বিশ্বাস কবছে না কল্যাণ। তাবা আবো বদনাম বটাচ্ছে।

আমি একটু চমকে উঠে জিজ্ঞাসা কবলাম, 'কি বদনাম বটাচ্ছে?'

অনন্ত বলল, 'সে তোমাব শুনে কাজ নেই কল্যাণ।'

আমি সবই বুঝতে পাবলাম। চটে উঠে বললাম, 'আব ওদেবই কিনা তুমি মাসে মাসে টাকা পাঠাচ্ছ। নেমকহাবাম অকৃতজ্ঞেব দল।'

অনন্ত হেসে বলল, 'কেন মিছামিছি মুখখাবাপ কবছ কল্যাণ। তাদেব দোষ নেই। দোষ অশিক্ষাব, দোষ দাবিদ্র্যেব। তা ছাড়া আগেব মত টাকা তো আব তাদেব পাঠাতে পাবি নে। বাসা কববাব পব আমাবও তো খবচ বেড়ে গেছে। আবো তো একটা চাকবি নিলাম। দেখি এবাব যদি কিছু বেশি কবে পাঠাতে পাবি।'

চাযে চুমুক দিযে অনন্ত বলল, 'মলুঙ্গীদিকেও চা কবতে শিখিযেছি কল্যাণ। যেও একদিন খেযে এসো ওব হাতেব চা। না কি তোমাব ঘেন্না কববে?'

আমি বললাম, 'দূব।'

অনন্ত বলল, 'এসব বদনামেব কথা শুনে মলুঙ্গীদি চলে যেতে চাইছিল। আমি ওকে জোব কবে ধবে বেখেছি। বলেছি, দিদি, মিথ্যে অপবাদ আমাব সইবে, কিন্তু তুই যদি সত্যি সত্যি ফেব বিগড়ে যাস তা আমাব সইবে না।'

মাস পাঁচ-ছয পবে অনন্ত একদিন আমাদেব অফিসে এল। প্রেসেব একটা জরুবী ব্যাপাব নিযেই এসেছিল। সে-কাজ সেবে অনন্ত আমাব কাছে এসে বলল, 'ছুটিব পব তোমার আজ অন্য কোথাও যেতে হবে নাকি কল্যাণ?'

বললাম, 'না, কেন?'

অনন্ত বলল, 'তাহলে চল আজ আমাব সঙ্গে।'

বললাম, 'কোথায়।'

অনন্ত বলল, 'তোমাকে নিযে যাব এক জাযগায। তাবা তোমাব চেনা। অনেকদিন ধবেই বলছে তোমাকে নিয়ে যেতে। আমাবও সময় হয় না, তোমাবও সময হয় না। আজ যখন দুজনেবই সময় মিলেছে, চল যাই।'

হাতেব কাজ শেষ কবে একটু আগে আগেই বেবিযে পডলাম। বললাম, 'কোথায় নিযে যাচ্ছ

বলই না।'

অনন্ত হেসে বলল, 'ছোট গল্পের সাস্‌পেন্স আগেই ভেঙে দেব, আমাকে কি এতই কাঁচা লেখক পেয়েছ ?'

এস্‌প্ল্যানেডে এসে দক্ষিণগামী একটি ট্রামে উঠে পড়লাম আমরা। ট্রাম স্টপেজে নেমে কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনে ঢুকে একটি দোতলা বাড়ির সামনে এসে আমরা দাঁড়ালাম। সন্ধ্যা ঘোর হয়ে গেছে। জানলা দিয়ে দোতলার ঘবের আলো ঠিক্‌রে পড়েছে রাস্তায়।

অনন্ত কড়া নাডতেই ন-দশ বছরের ফ্রকপরা একটি মেয়ে দরজা খুলে এসে দাঁড়াল। তারপর কলস্বরে বলল, 'অনন্তদা, আসুন। বাবা বেরিয়ে গেছেন। মা দিদি সবাই আছে ওপরে। চলুন। উনি আবাব কে। আপনার বন্ধু বুঝি ?'

মেয়েটিব কথার ভঙ্গিতে আমরা হাসলাম। তারপর ওর পিছনে পিছনে সরু সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম দোতলায। মেয়েটি গলা ছেড়ে ঘোষণা কবতে করতে চলল, 'অনন্তদা এসেছেন দিদি, তাঁর বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।'

তরুণী নারীকণ্ঠের মধুব ধ্বনি শুনতে পেলাম, 'তা বুঝতে পেবেছি গোপা, তোমায় আব চেঁচাতে হবে না।'

একটু বাদেই সিঁডির মুখে আঠাবো-উনিশ বছরের একটি সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে এসে দাঁড়াল।

অনন্ত তরল সুবে বলল, 'এই নাও। কল্যাণদা, কল্যাণদা করে অস্থির হয়ে গিয়েছিলে, আজ ধরে নিয়ে এসেছি।'

মেযেটি একটু অভিমানেব ভঙ্গি করে বলল, 'নিযে এসে কি হবে, উনি তো আমাকে চিনতেই পারছেন না। আপনারা বডলোক হযে গেছেন কি না, কত জাযগায় কত লেখাটেখা বেরোচ্ছে।'

এত খোঁটা সত্ত্বেও মেযেটিকে ঠিক চিনে উঠতে পাবলাম না। কি বলব ভাবছি—একটি বর্ষীয়সী মহিলা এসে দাঁড়ালেন। তিনি হেসে বললেন, 'তুই বাজে কথা বলছিস গীতা। কল্যাণ আমাদের তেমন ছেলে নয়। এসো বাবা, ঘবে এসো।'

এবাব চিনলাম। মাথা নিচু করে পাযেব ধুলো নিয়ে বললাম, 'কেমন আছেন মাসীমা ?'

আপন মাসীমা নয়। আমাব বড মামাব প্রতিবেশিনী। সেই সম্পর্কে মাসীমা। সোনাকান্দির সুরেন মুখুজ্যের স্ত্রী। ওঁবা পাঁচ-ছয় বছর আগে দেশ ছেড়ে কলকাতায় বাসা করে আছেন। অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। গীতাকে যখন শেষবার দেখেছি তখন ওর বয়স বার-তের বছরের বেশি নয। ত্রয়োদশী সেই লাজুক মেয়েটির সঙ্গে উনিশ বছবের এই প্রগল্‌ভাব অনেক তফাত। চিনব কি করে। গীতা মেঝেতে একটা মাদুর বিছিয়ে দিল। আমি আর অনন্ত বাসলাম পাশাপাশি।

অনন্ত বলল, 'সুবেনবাবু কোথায় গেছেন ?'

গীতা বলল, 'একটা পার্ট-টাইম কাজ হবার কথা আছে, সেই খোঁজে বেবিয়েছেন।'

অনন্ত বলল, 'ইয়ারবুকটায় কি হাত দিয়েছিলেন আর ?'

গীতা হেসে বলল, 'উনি আর হাত দিয়েছেন। ওঁকে তো তুমি—'

তাড়াতাড়ি গীতা একটু জিভ কেটে সংশোধন করে বলল, 'ওঁকে তো আপনি খোঁড়া বানিয়ে ছেড়েছেন।'

একথার পর গীতা আর দাঁড়াল না। কি একটা অছিলায পাশের ঘরে চলে গেল। বুঝতে পারলাম খুব লজ্জিত হয়েছে। অনন্তর মুখের বঙ কালো। ভিতবে ভিতরে রং বদলালেও বাইরে তা বুঝবার জো নেই। মাসীমার মুখখানা দেখলাম একটু গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

একটু বাদেই অবশ্য নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ ভাবে কথাবার্তা আরম্ভ কবলেন। দেশের কথা জিজ্ঞেস করলেন। পারিবারিক কুশল প্রশ্নের আদান-প্রদান চলল। সুখ-দুঃখের কথা বললেন। শুধু কাগজের অফিসে চাকরি করে সংসার চলে না আজকাল। মাসে মাসে এটা-সেটা করতে হয়। নোট লেখেন, ইয়ারবুক সংকলন করেন। তাতেও কুলোয় না। বড় মেয়ে গঙ্গার বিয়ে দিয়েছেন। তার দেনা এখনো শোধ হয়নি। মেজো মেয়ে গায়ত্রী কালাজ্বরে ভুগে মারা গেছে। তার চিকিৎসায়ও অনেক টাকা খরচ হয়েছে। জামাই-এর হাতে আর যমের হাতে দুই মেয়েকে দান করতে দক্ষিণা কম

লাগেনি।

আমি প্রসঙ্গটা পালটে দেওয়ার জন্যে বললাম, 'অনন্তর সঙ্গে আপনাদের আলাপ হয় কি করে ?'

মাসীমা বললেন, 'দুজনে এক অফিসে কাজ করেন। গত বছর একসঙ্গে একখানা বই বের করেছেন, এবার আবার একখানা করবেন। অনন্তর মত ছেলে হয় না কল্যাণ।'

আমি হেসে বললাম, 'যেখানেই আসি দেখি অনন্ত আমার বাজার নষ্ট করেছে।'

মাসীমা কৃতজ্ঞভাবে বললেন, 'সময়-অসময়ে ও আমাদেব কত যে কবেছে তা আর মুখে বলব না বাবা। ও যদি বামুনেব ঘরের ছেলে হত, ও যদি ভিন্ন জাত না হত—'

আমি এই সুযোগটা ছাড়লাম না। বললাম, 'জাত দিয়ে কি কববেন মাসীমা। জাতটা তো জন্মে নয়, জাতটা ধাতে। স্বভাবে ও ব্রাহ্মণ, একেবারে নিকষ কুলীন।'

অনন্ত সকলের অলক্ষ্যে আমাব হাতে চিমটি কেটে বলল, 'আঃ, কি করছ।'

প্লেটে ক'রে সামান্য জলখাবার আব দু কাপ চা নিয়ে গীতা ঘরে ঢুকল। বলল, 'কে ব্রাহ্মণ কল্যাণদা ?'

একটু মুচকি হেসে বললাম, 'বলছিলাম একজনের কথা।'

চা আব খাবার খেতে খেতে সুবেনবাবু এসে বসলেন। স্যাণ্ডালজোড়া দরজার বাইরে রেখে ঘরে ঢুকলেন। একটু ভ্রূ কুঞ্চিত কবে তাকালেন আমাদের দিকে। তারপর বললেন, 'ও কল্যাণ, তোমার কথা অনন্তব মুখে প্রায়ই শুনি। অনেককাল দেখা-সাক্ষাৎ নেই, তা ভালো আছ তো ?'

বললাম, 'এই কেটে যাচ্ছে কোনরকমে।'

যৌবনে সুরেনবাবু বেশ সুপুরুষ ছিলেন। এখন আর তাঁকে চিনবাব জো নেই। দীর্ঘ চেহারা সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে। বেশ একটু কুঁজোই দেখায়। মাথার চুলগুলি বেশিব ভাগই পাকা। আসল বয়স হয়তো পঞ্চাশ পার হয়নি। কিন্তু মনে হয় যেন ষাটের কোঠায় কে যেন ওঁকে জোর করে ঠেলে দিয়েছে।

সুরেনবাবু গ্র্যাজুয়েট। ইংবেজী বাংলা বেশ ভালোই জানেন। মনে আছে, মামারবাড়ি বেড়াতে গিয়ে ওঁর পারিবারিক লাইব্রেরী থেকে অনেক বই পড়েছি। দু-একটা মার্চেন্ট অফিস, ইন্‌সিওরেন্স অফিস ঘুরে শেষ বয়সে উনিও সংবাদপত্রে ঢুকেছেন।

অনন্তর দিকে তাকিয়ে সুরেনবাবু কৈফিয়তেব ভঙ্গিতে বললেন, 'তোমাব কাজে তো আমি একেবারেই হাত দিতে পারিনি। তবে খবরের কাগজেব কাটিং-টাটিংগুলি সব আছে।'

অনন্ত বলল, 'আচ্ছা, কাল এসে আমি সব গুছিয়ে নেব। আজ উঠি।'

গীতা সদর দবজা পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিতে এল। আমার দিকে চেয়ে বলল, 'আসবেন কিন্তু মাঝে মাঝে।'

আমি মৃদু হেসে বললাম, 'আসতেই হবে।'

কি বুঝল গীতা কে জানে, লজ্জিত হয়ে চোখ নামাল।

ট্রামের সবচেয়ে সামনেব সীট দখল করে আমরা দুজনে বসলাম। অনন্ত পিছনের একটা সীটে বসতে চেয়েছিল। আমাব অগ্রগতি দেখে হেসে বলল, 'অত আগে গিয়ে বসতে চাইছ কেন।'

বললাম, 'সব ব্যাপাবে তো পিছনেই পড়ে আছি। ট্রামবাসে না হয় একটু এগিয়ে গিয়েই বসলাম।'

অনন্ত কোন জবাব দিল না।

একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'ব্যাপারটা তো খুবই ঘোরাল বলে মনে হচ্ছে হে। তুমি বলেছিলে ছোট গল্প, আমার মনে হচ্ছে উপন্যাস।'

অনন্ত একটু হেসে বলল, 'না হে, ছোট গল্পই। সমাপ্তির দাগ টানবার সময় হয়ে এসেছে। তবে তোমার অনুমান ঠিক। ব্যাপারটা ঘোরালই হয়ে উঠেছে। আগে থেকেই আমার সাবধান হওয়া উচিত ছিল।'

আমি অনন্তকে চেপে ধরলাম। ব্যাপারটা সব খুলে বলতে হবে।

অনন্ত সংক্ষেপে সবই বলল।

যে কাগজের অনন্ত প্রুফরিডার, সুরেন মুখুজ্যে সেই কাগজের সাব-এডিটর। এক ধাপ উঁচু সিঁড়ির চাকুরে। তবু অনন্তদের যেদিন মাইনে হল সুরেনবাবু তাকে ঘরের বাইরে ডেকে নিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, 'অনন্তবাবু গোটা দশেক টাকা দিতে পারবেন? সাত তারিখে মাইনে পেয়েই আমি দিয়ে দেব।

অনন্তর আগে তার আরো দু তিনজন সহকর্মীকে বাইরে ডেকে এনে গোপনে কথা শেষ করে মুখ কালো করে সুরেনবাবু রুমে ফিরে এসেছিলেন। অনন্ত তা লক্ষ্য করেছিল।

অনন্ত একটু ইতস্তত করে বলল, 'আচ্ছা নিন।

দশ টাকার একখানা নোট বের করে দিল অনন্ত।

সুরেনবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'আপনি বাঁচালেন অনন্তবাবু। বলব কি, চাল কেনার টাকা ছিল না। আমি সাত তারিখে ঠিক দিয়ে দেব।'

অনন্ত বলল, 'আচ্ছা দেবেন। তার জন্যে কি আছে।

সাত তারিখে বাইরে এসে একখানা পাঁচ টাকার নোট সুরেনবাবু অনন্তর সামনে মেলে ধরলেন, 'কিছু মনে করবেন না। ও মাসে কিছু অ্যাডভান্স নেওয়া ছিল। মেয়ের বিয়ের দেনা বাবদ মাসে মাসে কাটা যাচ্ছে পঁচিশ টাকা করে। এ মাসে সবসুদ্ধ মাত্র পঁয়তাল্লিশ টাকা পেয়েছি। আর পেরে উঠছি নে মশাই। আজ এই পাঁচ টাকা নিন। আবার অ্যাডভান্স পেয়ে পরে দেব আপনার অসুবিধে হবে না তো?

অসুবিধে হলেও কি বলা যায়? যিনি মাত্র পয়তাল্লিশ টাকা পেয়েছেন, তাঁর কাছ থেকে কি পাঁচ টাকা এখনই [illegible] নেওয়া যায়?

অনন্ত বলল 'আচ্ছা আপনি পরে সুবিধে মত একসঙ্গেই দেবেন, এখন থাক।'

এমনি করেই আলাপ

পরের মাসেও ঠিক ওইরকম ব্যাপার ঘটল।

তারপর একদিন কথায় কথায় সুরেনবাবু বললেন একখানা ইয়াররবুক বের করার চেষ্টায় আছি মশাই। প্রেস আর পাবলিশার ঠিক আছে। সময়মত বের করে দিতে পারলে কিছু টাকা ঘরে আসবে। কিন্তু শরীরে আর কুলোচ্ছে না নাইট ডিউটি দিয়ে দিয়ে ডিসপেপসিআ্যা আর এসিডিটিতে ভুগছি। বয়সও তো হয়েছে মশাই। আপনার তো নানা গুণ আছে, নানা অভিজ্ঞতা আছে—যদি একটু সাহায্য করতেন বড় উপকার হত। বইটা বেরিয়ে গেলে আপনার পাওয়া টাকাগুলি তো মিটিয়ে দিতে পারতামই তা ছাড়া আরো কিছু হয়তো ধরে দিতে পারতাম।'

অনন্ত বলল, 'বেশ তো।

তারপর দুজনে মিলে শুরু করল ইয়াররবুকের কাজ। সুরেনবাবু ওকে ডেকে নিলেন বাড়িতে। নিজেদের থাকবার ঘরের পাশে যে ছোট্ট ঘরখানা ছিল সেইখানা ঠিক করে দিলেন অনন্তকে। বললেন 'এখানে বসে কাজ করুন আপনি, কোন সংকোচ করবেন না।'

কিন্তু সংকোচ না করে পারল না অনন্ত। ঘরখানি গীতার তার বইপত্র, বিছানা, শাড়ি, সেমিজ, টুকিটাকি প্রসাধনের জিনিস গুছানো রয়েছে তাকে। যে ছোট্ট টেবিলখানা সে দখল করেছে, সেখানাও তার। প্রথম প্রথম গীতাও আড়ষ্ট হয়েছিল, কষ্ট হয়েছিল। তারপর অল্পদিনের মধ্যে সে সহজভাবেই মিশতে শুরু করল চা যোগাল, মসলা যোগাল, কাজকর্মে সাহায্য করতে লাগল অনন্তকে। সুরেনবাবু আর তাঁর স্ত্রী আপনি থেকে তুমিতে নামলেন গীতার সম্বন্ধে বললেন 'অতটুকু মেয়েকে আবার আপনি আপনি করা কেন। ওকে তুমিই বলো অনন্ত।'

দেখতে যত বড়ই দেখাক, বয়সে গীতা অনন্তর বছর দ[illegible]কের ছোট। তুমি বললে আর কোন আড়ষ্টতা থাকবে না। সহজ স্বাভাবিক সম্পর্ক এই মনে করে অনন্ত ওকে তুমি বলতেই শুরু করল।

একদিন সুরেনবাবু গেছেন অফিসে, গোপা স্কুলে, আর তার মা প্রতিবেশিনীর বাসায় বেড়াতে বেরিয়েছেন, নাইট ডিউটি দিয়ে দুপুরে না ঘুমিয়ে অনন্ত এসে হাজির হল ইয়াররবুকের কাজ করতে।

গীতা বলল, 'চোখ দুটো অত লালচে দেখাচ্ছে কেন।'

অনন্ত বলল, 'রাত্রে ঘুম হয়নি।'

গীতা বলল, 'রাত জেগে জেগে গল্প-উপন্যাস লিখছেন বুঝি ?'

অনন্ত বলল, 'না অফিসের প্রুফ দেখেছি। আমি যে লিখি তা তুমি জানো ?'

গীতা বলল, 'জানি বই কি। অন্বেষণ কাগজটা আমাদের পাশের বাড়িতে আসে। ওরা নেয়, আমি পড়ি।'

একটু দুর্বল মুহূর্তে অনন্ত জিজ্ঞেস করল, 'তাই নাকি, কেমন লাগে আমার লেখা।'

গীতা বলল, 'মোটেই ভালো লাগে না।' আপনি মেয়েদের কথা কিচ্ছু জানেন না। তাদের মনের কথা কিচ্ছু বোঝেন না।'

অনন্ত বলল, 'তা হবে। তাদের মনের কথাটা কি।'

গীতা বলল, 'তাদের মনে কি একটা কথা, যে এককথায় বলা যায় ?'

দুজনে দুজনেব দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইল।

সেই নীরব দৃষ্টি সহ্য করতে না পেবে অনন্ত বলল, 'যাও, এক কাপ চা করে নিয়ে এসো তো।'

চাযের বদলে সরবত করে আনল গীতা। বলল, 'আপনি যে রকম ঠাণ্ডা মানুষ তাতে ঠাণ্ডা সরবতই ভালো। আর আপনি আমাকে তুমি তুমি করছেন যে ক'দিন ধরে ?'

'তোমার বাবা মা তো তুমি বলতেই বলেছেন।'

গীতা বলল, 'বাবা মা বললেই হল ? আমার বুঝি কোন মতামত নেই ? আমি যদি আপনাকে অমন একতরফাভাবে তুমি বলবাব অধিকার না দেই ? তুমি বললে, আমিও যদি আপনাকে নাম ধরে তুমি বলে ডাকি ?'

অনন্ত বলল, 'বেশ তো, পার যদি ডাক না।'

গীতা বলল, 'আমি সব পাবি—জানেন ? আমি আপনার মত নয। অনন্ত, আমি সব পাবি, আমি তোমার মত নয়।'

বলে মুখে আঁচল চেপে গীতা ঘব থেকে বেবিযে গেল।

আর কাঠের চেয়ারে কাঠ হয়ে বসে বইল অনন্ত।

কিন্তু কাঠ হয়ে বেশিদিন থাকতে পারল না। মানুষ তো আর সত্যি সত্যিই কাঠ নয। তা ছাড়া একটি অষ্টাদশী সুন্দরী প্রাণময়ী তরুণীব মুহুর্মুহু স্পর্শে নিবেট কাঠেও আগুন জ্বলে।

ইযারবুক বেরোল। পাবলিশার শ' তিনেক টাকা দিলেন সুরেনবাবুকে। তিনি অনন্তকে ভাগ দিতে যাচ্ছিলেন। অনন্ত বলল, 'ওটা রেখে দিন। আপনাব দেনা-টেনা আগে শোধ হয়ে যাক, আমি ববং পরের বছর নেব।'

সুরেনবাবু খুশি হযে বললেন, 'তোমাব মত ছেলে হয় না অনন্ত। নিজের ছেলেও আজকাল এতখানি করে না।'

এ বছবের ইয়াববুকের কাজ কিছুদিন আগে থেকে ফেব শুরু হযেছে।

অনন্ত বলল, 'কিন্তু এবাব আমি পালা শেষ করার কথা ভাবছি। ইযারবুক বেব করা পর্যন্ত বোধ হয় আর সবুর সইবে না। তার আগেই আমাকে সবে আসতে হবে।'

বললাম, 'সে কি হে ?'

অনন্ত বলল, 'গীতা বড় অধীব হয়ে উঠছে। ও চায় বিয়ে করতে। ও আর দেরি কবতে চায় না।'

আমি উল্লসিত হয়ে বললাম, 'তাই তো স্বাভাবিক।'

অনন্ত বলল, 'না, খুব স্বাভাবিক নয়। ওর বাবা মা কিছুতেই রাজী হবেন না। তাঁরা বড আঘাত পাবেন।'

বললাম, 'আশ্চর্য, সেইটাই কি তোমার কাছে বড় কথা মনে হল ? আঘাত তো একটু-আধটু পাবেনই। সে আঘাতের দাগ সময়ে মিলিয়েও যাবে। তাই বলে এই রমণীরত্ন তুমি হাতছাড়া করবে ? অনন্ত, তুমি সত্যিই কাপুরুষ।'

অনন্ত বলল, 'বোধ হয় তাই কল্যাণ। সুরেনবাবু আর তাঁর স্ত্রী খানিকটা-খানিকটা কেন সবই

আন্দাজ করতে পেরেছেন। কিন্তু সব জেনেও তাঁরা আমাকে ঘাড় ধরে বের করে দেননি কল্যাণ। না, এই সহিষ্ণুতা শুধু কয়েকটা টাকার জন্যে নয়। আমার ওপর তাঁদের বিশ্বাসের জোর আছে বলে। সুরেনবাবু সেদিন অফিস থেকে ফেরার পথে বেড়াতে বেড়াতে আমাকে একটা পার্কে নিয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরে ছলছল চোখে বললেন,'অনন্ত, আমি আমার মেয়েকে বিশ্বাস করিনে, কিন্তু তোমাকে বিশ্বাস করি। আমি জানি তুমি সেই বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবে।'

আমি হেসে বললাম, 'অনন্ত, এও শাসনের একটা ধবন। যেখানে শক্তিতে কুলোয় না সেখানেই ভক্তি, সেখানেই অনুনয়-বিনয়। তুমি ওই সব ছলাকলায় ভুলো না। তোমার নিজের মনে যদি কোন দ্বিধা না থাকে, গীতাব মধ্যে তুমি যদি জীবনেব স্বাদ—ভালোবাসাব স্বাদ পেয়ে থাক, তা হলে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে এসো—কেড়ে নিয়ে এসো। আমি হলে তাই করতাম।'

অনন্ত একটু হাসল, 'কল্যাণ, তুমি তোমার ছোট গল্পগুলিতে ওসব অনেক করেছ, হয়তো আরো অনেক কববে। কিন্তু জীবন তো একটা ছোট গল্প নয়। তার অনেক জট—অনেক জটিলতা। ওদের কথা ভাবতে গিয়ে শুধু গীতার মুখই যে আমাব মনে জাগে তা নয়, ওর বাপ-মার চোখের জলে-ভেজা দুখানি মুখও আমাব চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ভাবি, জগতে নিজের সুখটাই কি বড়। একটি আঠেরো বছবের মেয়ের দেহতৃষ্ণাটাই কি সব? আব একটি বর্ষীয়ান বন্ধুর প্রীতি, মায়ের মত স্নেহময়ী একটি নাবীব অগাধ স্নেহ, বিশ্বাস, ভালোবাসার কি কোন দাম নেই।'

আমি তবু তর্ক করতে লাগলাম, 'অনন্ত, এ তোমাব দুর্বলতা। মনে আছে—তুমিই না একদিন সমাজ সংস্কারে নেমেছিলে? এ তো সামান্য একটা অসবর্ণ বিয়ে। আজকাল প্রায় ঘরে ঘরে হচ্ছে। এব চেয়েও কত শত বড় কাজ সামনে অপেক্ষা কবছে। তার জন্যে কত আগাছা উপড়ে ফেলতে হবে, কতজনের কত সাধের ফুলের বাগান—সব্জির বাগিচা নষ্ট হবে তার ঠিক নেই। কিন্তু এর ভিতব দিয়েই সবাসবি তোমাকে পথ কেটে যেতে হবে অনন্ত। আব কোন ঘুব পথ নেই।'

অনন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'হয়তো তোমার কথাই ঠিক কল্যাণ। কিন্তু সবাই তো আর সমান নয়, সবাই তো আর অতখানি রক্তেব জোর নিয়ে আসে না। তা ছাড়া আমাদের কলমে যত জোব সত্যি সত্যিই বুকে কি তত জোর আছে? মুখে যত জোর; সত্যিই মনে কি তত জোর আছে?'

ওর এই মৃদু ধমকেব জাবাবে আমি কি বলব মনে মনে গুছিয়ে নিচ্ছি, হঠাৎ অনন্ত বলল, তা ছাড়া শুধু অসবর্ণ বিয়ে যদি হত, আমি এত চিন্তা করতাম না। কিন্তু এ যে অসম বিয়ে কল্যাণ। সাময়িক লোভে পড়ে শেষে কি আমি গীতার জীবনে অশান্তি আনব?'

বললাম, 'তার মানে?'

অনন্ত বলল, 'আমাব শবীবেব অবস্থা তো দেখছ? আমি কি ওকে খুশি করতে পারব? যত ভাববাদীই আমি হই না কল্যাণ, বিয়ের ব্যাপারে বায়োলজির স্থান যে বার ভূনা তা তো মানতেই হয়।'

আমি হেসে বললাম, 'তুমি এসব কথাও ভেবেছ তা হলে? বেশি দূরদর্শিতার জন্যেই তুমি যাবে।'

অনন্ত ম্লান একটু হাসল। কোন জবাব দিল না।

শিয়ালদার মোড়ে নেমে আমবা দুজনে পথ নিলাম।

এরপর মাস কয়েকের মধ্যে অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে উঠল। অনন্ত কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী হল না। গীতা বেশি পীড়াপীড়ি করায় অনন্ত ওদের বাসায় যাওয়াই ছেড়ে দিল। অপমানিত, আহত গীতা বলল, 'বুঝতে পেরেছি—ওই মুট্‌কী আল্‌কাতরার পিপে মলুঙ্গীই ওর সব সাধ মিটিয়েছে। অন্য মেয়ে ওর মনে ধরবে কেন।'

কিন্তু এই অপবাদ রটিয়েই গীতা ক্ষান্ত থাকতে পারল না। ভিতরকার আবেগে আর উত্তেজনায়, দাহে আর দেহতৃষ্ণায় ও ছটফট আর ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। একদিন এল আমার মেসে। মেসে বড় ভিড়। আমি ওকে নিয়ে গেলাম নিরালা এক চায়ের দোকানে।

খানিকক্ষণ চুপ কবে থেকে গীতা বলল, 'আচ্ছা, কল্যাণদা, ও কি দোষে আমাকে ত্যাগ কবল ?'
আমি বললাম, 'তোমাব কোন দোষ নেই গীতা। দোষ ওব নিজেব। দুর্বলতা ওব নিজেব মনেব।'
গীতা বলল, 'কিন্তু ও কেন এত দুর্বল হল কল্যাণদা ? ওকি পুরুষমানুষ নয় ?'
হেসে বললাম, 'আমবা বন্ধুবা তো বলি—ও মহাপুরুষ।'
গীতা বলল, মহাপুরুষ না ছাই। ও মহামেয়েমানুষ। মেয়েমানুষেবও অধম।'
মনে মনে ভাবলাম, 'হযতো তাই। যাবা মহাপুরুষেব অংশ নিযে জন্মায, তাদেব ভিতবে খানিকটা কবে মহানাবীব অংশও বোধ হয থাকে।'
গীতা আবো কিছুদিন অপেক্ষা কবল। তাবপব ওব বাবা মা আত্মীয-স্বজন যখন এম এ পাস সুদর্শন যুবকেব সঙ্গে ওব বিযে ঠিক কবে ফেললেন, গীতা যেন জেদ কবেই বাজী হল। অনন্ত বুঝুক—সে ছাডাও সংসাবে পুরুষমানুষ আছে। মহাপুরুষই দুনিযাব সব পুরুষ নয।
এব কযেক মাস বাদে অনন্ত ফেব সেই উপন্যাসে হাত দিল। অনেক খেটে, অনেক কাটাকুটি অদল-বদলেব পবে মাস ছযেক বসে শেষ কবল উপন্যাস। ঠিক হল এক ববিবাব সন্ধ্যায বাবিধি দত্ত, নিরুপম গুপ্ত আব আমি তিনজনে মিলে বাসায গিযে ওব সেই উপন্যাসখানা শুনব।
নিরুপম একটু ঠাট্টা কবে বলল, 'এক কাজ কবলে হত না ! অনন্তবাবু, গোটা বইটা পডতে তো বহু সমযেব দবকাব হবে। আমবা এক-একজন এক-এক অংশ শুনি। পবে আলোচনাব আঠায বই-এব তিন অংশ আমবা জোডা দিযে দেব।
অনন্ত হেসে বলল 'ভয নেই। সবটা পডব না। খানিকটা শুনলেই আমাব নমুনা বুঝতে পাববেন।'
ববিবাব সন্ধ্যাব পবে আমবা গেলাম। গিযে দেখি—ঘবটা অন্ধকাব। অনন্ত চুপচাপ গম্ভীবভাবে বসে আছে।
বললাম, 'ব্যাপাব কি অনন্ত, তোমাব উপন্যাস কি অন্ধকাবেই পডা যাবে নাকি আজ ?'
আমাদেব সাডা পেযে অনন্ত আলো জ্বালল আমবা চমকে উঠে দেখলাম--টুকবো ছেঁডা কাগজেব এক বিবাট স্তূপ অনন্ত সামনে কবে বসে বযেছে।
বললাম, 'একি অনন্ত।
অনন্ত একটু হাসল, 'ওই তো উপন্যাস '
খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হযে থেকে বললাম 'এ দশা হল কি কবে।
অনন্ত জবাব দেওযাব আগেই মলুঙ্গী তিন-চাব বছবেব একটি ছোট ছেলেব কান ধবে টানতে টানতে পাশেব ঘব থেকে বেবোল।
'ওই কবেছে ছোট কর্তা, এ ওবই কীর্তি।'
অনন্ত ধমক দিযে বলল, 'ফেব তুমি ওব গাযে হাত তুলেছ দিদি ? দেখ তো ওব গাযে তিল ফেলবাব জাযগা আছে নাকি আব ?'
চেযে দেখলাম ঠিকই। ছেলেটিব সর্বাঙ্গ লাঠিব দাগে কালো হযে উঠেছে।
অনন্ত ওকে সস্নেহে কোলে তুলে নিযে বলল, 'তুমি ঠিক কবেছ মামু, তুমি ঠিক কবেছ। ভাবীকালেব হাতে আমাদেব অনেকেব বচনাব মূল্যই তো এই।'
মলুঙ্গীব মুখেই শুনলাম কাহিনী। ধাবে-কাছে ভালো মিষ্টি পাওযা যায না বলে আমাদের আপ্যাযনেব জন্যে কিছু মিষ্টি আব সিগাবেট আনতে বেবিযেছিল। খাতাগুলি বেখে গিযেছিল তক্তপোশেব ওপব। এসে দেখে মলুঙ্গীব দুবন্ত ছেলে পবম শান্ত নিবিষ্ট মনে খাতাগুলি ছিঁডে চলেছে।
অনন্ত বলল, 'অল্পকাল বাদে আমবা অনেকেই থাকব না কল্যাণ, কিন্তু এই সামান্য ক'জন বন্ধু-বান্ধব স্বজন-প্রতিবেশী নিযে আমাদেব ছোট্ট জগৎ—এই মধুব জগতেব স্মৃতি যেন আমবণকাল থাকে, এ স্মৃতি যেন ভোলবাব মত না হয।'
বললাম, 'অনন্ত তুমি ফেব লেখ।'

বারিধিবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি একটু একটু করে লিখুন আর আমাকে দিন। আমি আমাদের সাপ্তাহিক কাগজেই ছাপব।'

অনন্ত একটু হাসল, 'কাগজে ছাপলে বুঝি তা আর কেউ ছিঁড়বে না বারিধিবাবু, তাতে বুঝি আর কালের হাত পড়বে না?'

আমি বললাম, 'অনন্ত, অত কাল কাল করলে আর লেখা যায় না। আসল অমরত্ব কালের হাতে নয় নিজের হাতে, যতক্ষণ তুমি লিখবে ততক্ষণ অমৃত পান করবে, ততক্ষণের জন্যে তুমি অমর। আমরা কেউ ক্ষণজন্মা নই, আমরা ক্ষণজীবী। কিন্তু যখন তুমি কলম ধরবে, তোমার নিজের কাছে যেন সেইক্ষণ মাহেন্দ্রক্ষণ হয়। তুমি লেখ অনন্ত, তুমি কাল থেকেই ফের লিখতে শুরু কর।'

অনন্ত আমাদের অনুরোধ রেখেছিল। দু চার দিন বাদেই ফের শুরু করেছিল লিখতে। কিন্তু শেষ করল কাঁচড়াপাড়া টি বি হাসপাতালে গিয়ে, মরবার সপ্তাহখানেক আগে।

মাস কয়েক বাদে ওর উপন্যাস কতখানি এগিয়েছে একদিন দেখতে এসে দেখলাম — মলুঙ্গীর কাঁধে ওর মাথা। মলুঙ্গীর পরনের শাড়ি অনন্তর বমি আর রক্তে ভেসে গেছে। আমি ওদের চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে ক্ষানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে রইলাম। তারপর বললাম, মলুঙ্গী, যাও, তুমি গাটা ধুয়ে এস, আমি ওকে দেখছি। ইস, রক্তে যে তুমি একেবারে নেয়ে উঠেছ।'

মলুঙ্গী বলল, 'তাতে কী হয়েছে কর্তা, আমাদের যে রক্তেরই সম্বন্ধ। যে যাই বলুক ও আমার আপন মাসতুতো ভাই ছোটকর্তা।' এতক্ষণ বাদে মলুঙ্গীর চোখ দুটি জলে ভরে উঠল।

অনন্তর জন্যে বেড পেতে বেশ কিছুদিন দেরি হল। শেষে প্রমথ লাহিড়ি মশাই-এর চেষ্টায় কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালে একটা ফ্রী বেড পাওয়া গেল।

ডাক্তার বললেন, 'একেবারে শেষ করে নিয়ে এসেছেন। দুটো লাংগসই ধরে গেছে।'

আশ্চর্য, তবু ওই অবস্থায় দু-বছর বেঁচেছিল অনন্ত। সত্যিই ওর কই মাছের প্রাণ।

ডাক্তারের বারণ শুনত না অনন্ত মাঝে মাঝে লিখত, মাঝে মাঝে পড়ত। আর আমরা কেউ গেলে শরীর যদি ভালো থাকত একটু বেশি কথা বলত।

বন্ধুরা সবাই গরীব। যার যতদূর সাধ্য কিছু টাকা, কিছু ফলমূল নিয়ে গেলে অনন্ত তা আবার অন্য রোগীদের মধ্যে বিতরণ করত।

আমরা রাগ করলে হেসে বলত, কল্যাণ, আমার তবু তোমরা আছ, ওদের যে তাও নেই।'

মাস চারেক বাদে একদিন গিয়ে দেখলাম, অনন্তর অবস্থা ফের খারাপ হয়েছে। ডাক্তার বেশি কথা বলতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু অনন্ত কিছুতেই তাঁর বারণ শোনেনি।

অনন্ত সেদিন বলল, 'কল্যাণ আমার মরবার ইচ্ছে ছিল না। আমার যে অনেক কাজ বাকি, লেখা বাকি, যাত্রা যে সবে শুরু করেছিলাম।'

সেদিন আর ওকে মিথ্যা আশা দিলাম না। বললাম, 'অনন্ত, তুমি নিজের দোষেই তো এমন করলে। এভাবে আত্মবলি দিয়ে ক জনের উপকার করা যায়। পরোপকারের এই অবৈজ্ঞানিক পথ তুমি কেন নিতে গেলে। প্রকৃতির নিয়ম বলে তো একটা কথা আছে। তাকে যদি তুমি না মানো, সে তার শোধ নেবেই।'

অনন্ত বলল, 'কি জানি কল্যাণ, বোধ হয় তোমার কথাই সত্যি। কিন্তু আমি পরোপকার করব বলে পরোপকার করিনি। কারো জন্যে কিছু করতে না পারলে আমার নিজেরই যেন নিঃশ্বাস আটকে আসত। মনে হত খুব একটা ছোট্ট সংকীর্ণ খাঁচার মধ্যে আছি কল্যাণ। নিজের হাত, নিজের পা, নিজের ক্ষুধা, নিজের তৃষ্ণা দিয়ে সেই খাঁচার চারদিক ঘেরা। বেরুবার পথ নেই। আমার প্রাণ-পাখি তাই সর্বদা ছটফট করত।' অনন্ত একটু-কাল চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'কিন্তু পাখির কথা থাক কল্যাণ, আজ মাছের কথা বল।'

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'মাছের কথা?'

অনন্ত একটু হাসল, 'হ্যাঁ, মাছের কথা। মনে আছে সেই কুমার? মনে আছে জেলেডিঙি? আজ আবার গিয়ে বসতে ইচ্ছে করছে সেই ডিঙির ওপর। লাল গামছা মাথায় জড়িয়ে ভেসালে উঠে জাল ফেলে বসে থাকতে ইচ্ছে করছে। সবাই তো আমরা জাল ফেলেই বসে আছি কল্যাণ। কারো

জালে মাছ পড়ে, কারো জালে পড়ে না। কারো জালে চুনোপুঁটি, কারো জালে রুই-কাতলা। যার যতটুকু ক্ষমতা, যার যতটুকু সাধ্য। কিন্তু জাতে আমরা সব এক। সবাই জেলে। আমরা জেলে। তবু কেন এই রেষারেষি, কেন এই দ্বেষ বিদ্বেষ।'

নার্স এসে বলল, 'অনন্তবাবু, আর নয়। আর কথা বলবেন না।'

অনন্ত নার্সের অনুরোধ রাখে। আর কিছু বলল না।

একটু বাদে আমি বললাম, 'চলি অনন্ত। আবার একদিন আসব। আবার দেখা হবে।'

কিন্তু দেখা আর হয়নি।

ভাদ্র ১৩৫৯

যবনিকা

গাড়িটা ভারি আস্তে আস্তে চলছিলো। এই ইন্টার ক্লাশ কামরাটিতে আমি আর আমার একটি সহযাত্রিণী বান্ধবী ছাড়া আর কেউ ছিলো না। গল্প করবার এমন নিভৃত অবকাশ আমাদের শিগ্‌গির জোটে নি। কিন্তু আমরা কেউ কোনো কথা না ব'লে চুপ ক'রে ব'সে ছিলাম।

এই নৈঃশব্দও আমাদের দু জনের অন্তরের ভাষায় ভ'রে উঠতে পারতো এমন দিন আসা অসম্ভব ছিলো না। কিন্তু তা আসেনি। দৈবাৎ পশ্চিমের কোনো স্টেশনে দেখা হ'য়ে গেলে আমরা একই ট্রেনে একই কামরায় ভ্রমণের অধিকার পরস্পরকে দিয়েছি, কিন্তু তার বেশি অগ্রসর হই নি। আমার দিক থেকে উৎসাহের আধিক্যই ছিলো, কিন্তু আমার বান্ধবী নিছক বন্ধুস্নেহের গণ্ডি অতিক্রম করতে কিছুতেই রাজী হননি।

কলকাতার একটি স্কুলে আমরা দু-জনেই মাস্টারী করতাম। বয়েজ সেকসনে আমি হেডমাস্টার ছিলাম, আমার বান্ধবী গার্লস সেকসনের হেডমিস্ট্রেস। এই পদমর্যাদার মিল ছাড়া আরো মিল আমাদের মধ্যে ছিলো, শিক্ষাদানের পদ্ধতি থেকে শুরু ক'রে সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতি সম্বন্ধেও আমাদের মতের ঐক্য হয়েছিলো। আমি ভেবেছিলাম আমরা আরো এগোতে পারবো। আমাদের এই মিল পরিপূর্ণ মিলনে গিয়ে পৌঁছবে। কিন্তু তা হয় নি, আমি সেই ধরনের পূর্ণতার ইঙ্গিত দিতেই আমার বান্ধবী আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি বিধবা। আর তাঁর বয়স তিরিশের বেশি। তিনি অবশ্য বিধবার বেশে থাকতেন না। রঙিন শাড়ি না পরলেও পাড়ওয়ালা শাড়ি পরতেন। গলায় হার আর হাতে চুড়িও ছিলো। আর তাছাড়া বয়সও তিরিশের অনেক কম ব'লেই মনে হ'ত। আমি বলেছিলাম, এ-তথ্য আমার জানা আছে এবং তিরিশের বেশি বয়সী বিধবা বিয়েতে আমার আপত্তি নেই। আমার বান্ধবী রূপবতী। রূপ আর স্বাস্থ্য তাঁর বয়সকে লুকিয়ে রেখেছিলো।

তিনি কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে আমাকে জানিয়েছিলেন, শুধু একজনের আপত্তি না-থাকাটাই যথেষ্ট নয়।

এ-ধরনের আলাপ এর পর আর আমাদের এগোয় নি। তারপর তিনি কলকাতা ছেড়ে এলাহাবাদের একটি স্কুলে চাকরি নিয়ে যান। ছুটি-ছাটায় আমার এখনো ওই শহরের স্বজন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। আমার বান্ধবী সবই বোঝেন, কিন্তু কোনো আপত্তি করেন না। ওই একটি বিষয় ছাড়া এখনো আমাদের অন্য সব রকম আলোচনাই হয়। তিনি এমন ভাব দেখান, যেন কোনোদিন কোনো ব্যাপার আমাদের মধ্যে হয় নি। মাঝে-মাঝে আমার বড়ো নিষ্ঠুর

মনে হয় অনীতা সেনকে। মনে হয় যেন ওঁর মধ্যে কোনো রক্ত-মাংস নেই। একটি শ্বেত পাথরে গড়া নারীমূর্তি। এর চেয়ে তিনি যদি সমস্ত সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন করতেন, তাহ'লে আমি খুশি হতাম। যতদূর বুঝেছি, পাত্র হিসাবে আমাকে তিনি অযোগ্য মনে করেন না। যতদূর জেনেছি, আমার চেয়ে, এমনকি আমার মতো ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওঁর আর নেই। আশ্চর্য, তবু এই তিন বছরের মধ্যেও আমাকে 'তুমি' সম্বোধনের অধিকার তিনি দেন নি এবং নিজেও ওই মধুর ঘনিষ্ঠ সম্বোধনের অধিকার গ্রহণ করেন নি। ওঁর নিকটআত্মীয়স্বজন কেউ আছেন ব'লে খবর পাই নি। পূর্বের স্বামী সম্বন্ধে কোনোদিন কোনো কথা আমার কাছে তিনি উল্লেখ করেন নি। আমার সমস্ত কৌতূহল তিনি স্বেচ্ছায় এড়িয়ে গেছেন। ওঁর স্বামীর পদবীটি ছাড়া কোনো চিহ্নই ওঁর সঙ্গে জড়িয়ে নেই। ওঁর ঘরে গিয়ে দেখেছি। কোনো ফটো, কোনো বই কি অন্য কোনো রকম কোনো স্মারক চিহ্ন আমার সন্ধানী দৃষ্টি আবিষ্কার করতে পারে নি। এক নিষ্ঠুর দুর্জ্ঞেয় রহস্যে নিজেকে কেন তিনি এমনভাবে আবৃত ক'রে রেখেছেন আমি জানি নে। মাঝে-মাঝে মনে হয় ওঁর প্রীতিলাভের চেয়ে এই রহস্যভেদের আকাঙ্ক্ষাই আমার মধ্যে প্রবল। এই মরুভূমি, এই তুহিনাচ্ছন্ন মরুভূমি কি কোনোদিন সবুজ শস্যশ্যামল হ'য়ে উঠেছিলো? যদি উঠে থাকে তা লুটে নিলো কোন দস্যুতে? সে কি মৃত্যু? মৃত্যুর শক্তি কি জীবনের চেয়েও বড়ো?

আমি নিজের বেঞ্চ থেকে ওঁর বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। শাদা একটি কাশ্মীরি শাল গায়ে জড়িয়ে আমার বান্ধবী বাইরের দিকে তাকিয়ে ব'সে ছিলেন। ঘণ্টাখানেক আগে সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি —সভ্য শিক্ষিত নাগরিকের সবরকম প্রিয় বিষয় নিয়েই আমাদের আলোচনা শেষ হ'য়ে গেছে। তারপর আমার মনে হয়েছে সব আলোচনাই নীরস, নিষ্ফল। একসময় ক্লান্ত হ'য়ে আমিই আগে থেমেছি [illegible] কি তিনি আগে থেমেছেন মনে নেই। কিন্তু এভাবে চুপ ক'রে ব'সে থাকাও দুঃসহ। আমিই আবার এগিয়ে গেলাম। গিয়ে ওঁর পাশে বসলাম, কাছে বসলাম।

বললাম 'কি দেখছেন?'

তিনি আমার দিকে মুখ না ফিরিয়ে বললেন, কুয়াশা। এদিক দিয়ে কতবার যাতায়াত করেছি, কিন্তু এমন ঘন কুয়াশা আর চোখে পড়ে নি। আপনার পড়েছে?'

ডিসেম্বরের শেষ। শীত আর কুয়াশা দুই-ই খুব বেশি পড়েছে। বেলা আটটা। তবু বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না।

আমি বললাম, 'বোধহয় পড়ে নি। প'ড়ে থাকলেও আমার মনে নেই। কারণ কুয়াশার সময় আমি জানলা খোলা রাখি নে বন্ধ ক'রে রাখি। তোমার কি কেবল কুয়াশা দেখতে, কুয়াশার মধ্যে থাকতেই ভালো লাগে, অনীতা? তুমি কি দুনিয়ায় আর-কিছু দেখতে পাও না?'

আমার বান্ধবী আমার দিকে তাকালেন না। শান্ত ঠাণ্ডা তিরস্কারের সুরে বললেন, ফের বুঝি পাগলামি আরম্ভ করলেন সুব্রতবাবু।'

ব'লে তিনি থেমে গেলেন।

আমার পাগলামি এর বেশি আর এগোলো না, এর বেশি কোনোদিনই এগোয় না। আপনি আর তুমির মধ্যে মাঝে-মাঝে ওঠানামা করে। হয়তো আরো এগোতে পারলে ভালো হ'ত। কিন্তু আমার রুচিতে বাধে, সংস্কারে বাধে। নিজের ব্যবহারের জন্যে লজ্জিত হই

আমার বান্ধবী আস্তে-আস্তে আমার দিকে ফিরে তাকালেন, একটু কোমল স্বরে বললেন, 'আপনাকে বার-বার দুঃখ দিতে আমার ভালো লাগে না। কিন্তু আপনি জানেন আপনি যা চাইছেন তা হবার নয়। আমার মন অনেক দিন ম'রে গেছে। সমস্ত যুক্তিতর্কের ওপর এ-সব ব্যাপারে প্রবৃত্তিই হ'ল বড়ো কথা। সেই প্রবৃত্তি আমার একেবারে নষ্ট হ'য়ে গেছে।'

তারপর ফের বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কুয়াশা [illegible] জীবনের সঙ্গে জড়ানো, তার কাছে ভালো লাগা না-লাগার প্রশ্নের কি কোনো অর্থ আছে?'

আমি বললাম, 'আপনার জীবন সম্বন্ধে অনেক দিন মেয়েদের মতো কৌতূহল প্রকাশ করেছি। কোনো ফল হয় নি। আজ আমি সে-ধরনের কোনো অনুরোধ করবো না। কিন্তু নিজের ভুল ভ্রান্তি দুঃখ-লজ্জার কথা বন্ধুবান্ধবকে জানানো ভালো। তাতে অনেক সময় অনেক গ্লানি কাটে, অনেক

আবিলতা দূব হয়।'

আমাব বান্ধবী একটু হাসলেন, 'এবাব কিন্তু বন্ধুব কথাব মতো শোনাচ্ছে না, ধর্মযাজকেব বাণী ব'লে মনে হচ্ছে। আচ্ছা শুনুন।' তিনি এবাব আস্তে-আস্তে তাঁব কাহিনী বলতে লাগলেন

'আমাব প্রথম স্বামী যখন মাবা যান তখন আমাব বয়স সতেবো।'

আমি এবাব একটু চমকে উঠে বললাম, 'প্রথম স্বামী? আপনাব কি—'

তিনি একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, না হ'লে প্রথম বলবো কেন। মাত্র দু-বছব আগে আমাদেব বিয়ে হয়েছে। একটি ছেলেও আছে আমাদেব। তাব বয়স তখন বছবখানেক। ঘবে বুড়ি শাশুড়ী ছিলেন। একেবাবে বুড়ি অবশ্য নয়। চল্লিশেব অল্প-কিছু বেশি ছিল তাঁব বয়স। আমাব স্বামীই ছিলেন তাঁব প্রথম আব একমাত্র সন্তান। আমাব সেই শাশুড়ী সংস্কৃত আব বাংলা লেখাপড়া বেশ ভালো জানতেন। প্রথম পড়াশুনো আমি বলতে গেলে তাঁব কাছেই শিখি। স্বামীব সামান্য কিছু সঞ্চয় ছিল। লাইফ-ইন্সিওবেন্সেব টাকাও কিছু পেয়েছিলাম। আমবা দু-জনে খোকনকে আদব কবতাম। আব অবসব মতো পড়াশুনো নিয়ে থাকতাম। আমি পড়তাম তিনি ব্যাখ্যা কবতেন আবাব কখনো তিনি পড়তেন আমি সেই সব শ্লোকেব গভীব তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা কবতাম। ইউনিভার্সিটিব পবীক্ষাগুলোব জন্যেও আমি এই সময় থেকে তৈবি হ'তে শুরু কবি। আমাব শাশুড়ী পড়াশুনোব ব্যাপাবে খুবই উৎসাহ দিতেন। তাঁব আশা ছিল, লেখাপড়া নিয়ে থাকলে আমাব মনে অন্য কোনো অসাব জিনিস ঠাঁই পাবে না। সহজে পায়ও নি। আমি আমাব দূব সম্পর্কিত দু-একজন আত্মীয় যুবকেব প্রলোভন অনায়াসেই জয় কবেছি। আমাব শোবাব ঘবে স্বামীব বাঁধানো দু তিনখানা ফটো ছিল। আমি বোজ সকালে সব চেয়ে সুন্দব, সবচেয়ে বড়ো ফটোখানায় নিজেব হাতে ফুলেব মালা গেঁথে দিতাম। জ্বেলে দিতাম ধূপ দীপ সে ঘবে আব কাবো ঢোকবাব অধিকাব ছিল না। দবকাবও ছিল না। শুধু আমাব শাশুড়ী আসতেন, আব ছেলে দু বেলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতো মালা কি ধূপদীপ দিতে কোনোদিন একটু দেবি হ'লে বলতো, "মা, বাবাকে পুজো কববে না?" পুজো কথাটায় আমি একটু লজ্জিত হতাম। ওব মধ্যে কোথায় যেন একটু অনাধুনিক পৌত্তলিকতাব গন্ধ আছে। আমবা ব্রাহ্ম ছিলাম না। তবে আমাদেব বেশিব ভাগ বন্ধুবান্ধবই ব্রাহ্ম কি ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। এখনকাব সকল শিক্ষিত হিন্দুই তাই। আমাদেব সেই সব বন্ধু কি প্রতিবেশীদেব দু-একজন আড়ালে মন্তব্য কবতেন, বাড়াবাড়ি। আজকাল এত আতিশয্য ভালো নয়।' আমি কোনো জবাব দিতাম না, কিন্তু মনকে বুঝাতাম, এ আমাব এক ধবনেব শিল্পচর্চা আমি তো কবিতা লিখতে পাবি নে, আমি তো ছবি আঁকতে পাবি নে। তাব বদলে আমি মালা গাঁথি, ধূপ জ্বালি, দীপ জ্বালি। আমাব শাশুড়ী এতে ভাবি খুশি হতেন ভাবতেন, ধূপেব ধোঁয়ায় দীপেব আলোয় আমাব ঘবে কোনো অশুভ হাওয়া বইতে পাববে না, আমাব মন অশুচি চিন্তা থেকে দূবে থাকবে।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও যা হবাব তা হল, যে আসবাব সে এল। আমাদেব পাড়ায় কিছুদিন আগে একজন তরুণ ডাক্তাব এসেছিলেন। অল্প দিনেব মধ্যেই তাঁব নাম যশ ছড়িয়ে পড়েছিল। খোকনেব টাইফয়েডেব সময় আমবা তাঁকে ডাকলাম। ভাবি সুজন ভাবি ভদ্রলোক। তিনি বোগীকে দেখে বললেন, "ভয় নেই" আমাব শাশুড়ী বললেন, 'আপনাব কিন্তু বোজ আসতে হবে।" তিনি বললেন, "এ-বোগে বোজ আসবাব তো দবকাব দেখি নে।" শাশুড়ী বললেন, "তা হোক। ওই আমাব শিববাত্রিব সলতে।"

একদিন দেখলাম, বোগীকে দেখতে-দেখতে ডাক্তাব আমাব দিকে তাকিয়ে বয়েছেন। আমি লজ্জিত হ'য়ে চোখ নামালাম। তিনি হয়তো মুহূর্তেব জন্য একটু অপ্রতিভ হলেন, কিন্তু তাব পবই ব'লে উঠলেন, 'আপনাব মতো এমন আমি আব কাউকে দেখি নি।"

আমি চমকে উঠে লজ্জিত হ'য়ে বললাম, "কি দেখেন নি?" তিনি সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলেন, "এমন সেবা কববাব ক্ষমতা।" বললাম, "বাঃ, নিজেব ছেলেব শুশ্রূষা নিজে কববো তাতে—" ডাক্তাব বললেন, "মমতা আব ক্ষমতা তো এক কথা নয়। যে-কোনো পাকা নার্স আপনাব কাছে হাব মানে। আপনাব হাতে বোগী দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা যায়।"

আমি কোনো কথা বললাম না। কিন্তু পরদিন থেকে রোগীর ঘর, রোগীর বিছানা আরো পরিচ্ছন্ন ক'রে তুললাম। ছেলে তো শুধু আমার ছেলে নয়, সে ডাক্তারেরও রোগী। ডাক্তার সব লক্ষ্য ক'রে খুশি হয়েছেন। তা দেখে আমিও খুশি হলাম।

নতুন রাস্তার মোড়ে নতুন বিল্ডিং-এর একটি সুন্দর সাজানো ঘরে ডাক্তারের ডিসপিনসারি। রোগীর খবর দেওয়ার জন্যে আমি মাঝে-মাঝে যেতাম। কোনোদিন ডাক্তার না এলে আমার শাশুড়ী ব্যস্ত হ'য়ে আমাকে পাঠাতেন। আমরা পর্দানশীন ছিলাম না আর ভুয়ো সম্মানবোধ থেকেও মুক্ত ছিলাম।

ডিসপেনসারিতে দু-খানা ঘর। একখানা বাইরের আর একখানা ভিতরের। বাইরের ঘরখানা সাধারণের জন্যে। ভিতরের ঘরখানায় গিয়ে আমি বসতাম। সে তো ডিসপেনসারি নয়, যেন আর্টিস্টের স্টুডিয়ো। জানলা-দরজায় রঙিন পর্দা, দেয়ালে দামী ছবি, সেল্‌ফে কেবল ডাক্তারি বই-ই নেই, সাহিত্য আর দর্শনের বইও আছে। আমি অবাক হ'য়ে একদিন বললাম, "আপনি এ-সবেরও চর্চা করেন নাকি?"

ডাক্তার একটু হেসে বললেন, "বরং এ-সবের চর্চাই করি। ডাক্তারিটা জীবিকা, এ-সব হল জীবন।"

আমি বললাম, "কিন্তু আপনার পসার দেখে তো তা মনে হয় না।"

ডাক্তার বললেন, "ওটা নেহাতই বাইরের দেখা।"

এমনি ক'রেই আলাপ। আমার ছেলের অসুখ সেরে গেলো। কিন্তু ডাক্তার গেলেন না। এই না-যাওয়ার মধ্যে কেবল তাঁর নয়, আমারও ইচ্ছার জোর ছিল। তিনি আমাদের পারিবারিক বন্ধু হিসেবে র'য়ে গেলেন। আমার শাশুড়ীর টুকটাক অসুখ-বিসুখ লেগেই ছিল। তার জন্যেও তাঁকে দরকার।

কিন্তু প্রথম থেকেই খোকন ওঁকে পছন্দ করতো না। ও প্রায়ই বলতো, "মা, ডাক্তার কেন এখনো আসে? আমার তো অসুখ সেরে গেছে?"

আমি তাকে ধমক দিয়ে বলতাম, "ছিঃ, ওইরকম ক'রে কথা বলে নাকি খোকন? আসে বলে নাকি? বলতে হয় আসেন। তিনি তোমার অসুখ সারিয়ে তোলেন নি? তোমার একটু কৃতজ্ঞতা নেই তাঁর ওপর?"

আট বছরের ছেলে কৃতজ্ঞতা কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারে না, কিন্তু আমার মনের ভাব ঠিকই আন্দাজ করতে পারে।

একটু কাল চুপ ক'রে থেকে ঠোঁট ফুলিয়ে ফের নালিশ করে, "ও ডাক্তার ভালো নয়, মা! ও আমাকে কেবল তেতো ওষুধ দেয়।"

আমি ওকে কোলে টেনে নিয়ে ওর সেই টুকটুকে ঠোঁটে চুমু খেয়ে বলি, "তুমি আচ্ছা বোকা হয়েছো খোকন। তেতো ওষুধ না দিলে অসুখ সারে?"

খোকন বলে, "না সারে না! আমি ওই ডাক্তারের ওষুধ আর কোনোদিন খাবো না।"

ডাক্তার এখন আর ওষুধ আনেন না। লজেনস আনেন, চকোলেট আনেন, একদিন একখানা খেলনা মোটরগাড়ি নিয়ে এলেন। তবু খোকনের মন পাওয়া গেল না।

তারপর আর খেলনা-গাড়ি নয়, একদিন সত্যিকারের মোটর গাড়ি এসেই আমাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াল।

ডাক্তার বললেন, "চল খোকন, তোমাকে গাড়িতে ক'রে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।"

খোকন এবার লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, "চলুন।"

তারপর আমার হাত ধ'রে টানতে-টানতে বলল, "মা তুমিও চল।" আমি একটু ইতস্তত করছিলাম, আমার শাশুড়ী অনুমতি দিয়ে বললেন, "যাও না, এসো না বেড়িয়ে। যাও না তো কোথাও।"

খুব যে অন্তর থেকে অনুমতি দিলেন না, চক্ষুলজ্জায় প'ড়ে একটু ভদ্রতা করলেন, তা বুঝতে পেরেও এমনভাব দেখালাম যেন বুঝতে পারি নি, ছেলেকে একটু বেড়াতে নিয়ে যাবো তাতে দোষ

কিসের। তাছাড়া পুরনো রোগী আর ডাক্তারের এই বন্ধুত্বে আমার মন খুশি হ'য়ে উঠেছিল।

সেদিন বিকেল বেলায় গঙ্গার ধার দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত আমরা বেড়িয়ে এলাম। নতুন ক'রে চোখে পড়লো সূর্যাস্তের আকাশ। চোখে পড়ল গঙ্গার জলে তার রঙিন ছায়া। বাড়িতে ফিরে এসেও সে রং কিছুতে মুছতে চাইল না।

কিছুদিন বাদে ডাক্তার আবার এলেন তাঁর গাড়ি নিয়ে। এবার আর একা নয়, ছোকরা ড্রাইভার আছে সঙ্গে।

আমি বললাম, "আবার ওকে কেন?"

ডাক্তার হেসে বললেন, "ওকে দরকার হবে।"

দরকাব যে কিজন্যে তা পরে বুঝতে পারলাম। বরানগরের একটা বাগানে এসে তিনি ড্রাইভারকে বললেন, "খোকনকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে এস তো।"

নেওয়া অবশ্য একটু শক্ত হল। আমি তেমন আপত্তি কবতে পাবলাম না। কিছুটা আন্দাজ কবতে পেরে আমার বুক কাঁপতে লাগলো, কিন্তু মুখ দিয়ে কথা বেরুল না।

ডাক্তার তাঁর গাড়ির ভিতর থেকে একটা রঙিন থলি বের করলেন। তার ভিতব থেকে বেরুল টকটকে রক্তরঙের বেনারসী।

আমি অবাক হ'য়ে বললাম, "একি!"

ডাক্তার বললেন, "তোমাকে পরতে হবে। তোমার ওই সাদা থান দেখতে-দেখতে আমার চোখ ক্ষ'য়ে গেছে। বসন্ত ঋতুর বং সাদা নয়, ও রং তোমাকে মানায় না।" আমি মৃদু স্বরে আপত্তি ক'রে বললাম, "কিন্তু ও-সব যে আমাকে পরতে নেই।"

ডাক্তার বললেন, "কে বললে নেই, পাঁচ মিনিটের জন্যে পবলে কি দোষ?"

ডাক্তার আপনাব মতো ছিলেন না। শক্ত জববদস্ত গোছেব মানুষ ছিলেন। পাছে তিনি আরো জবরদস্তি চালান সেই ভয়ে আমি শাড়ি বদলাতে গেলাম। মনে-মনে ভাবলাম, আব-কোনোদিন তাঁর সঙ্গে বেড়াতে আসব না, তাঁর সামনে বেরুব না, তাঁর সঙ্গে কথা বলব না, এই শেষ। কিন্তু আমার আব-একটা মন বলতে লাগল, এই আবম্ভ।

একটু বাদে কেয়া-ঝোপেব আড়ালে গিয়ে শাড়ি বদলে এলাম।

বললাম, "আমাকে ছেড়ে দাও। আমার গা কাঁপছে।"

তিনি বললেন, "আগুনের শিখা তো কাঁপেই।"

একটু বাদে খিলখিল হাসিব শব্দে আমি চমকে উঠলাম। ফিরে দেখি, খোকন। কি ক'বে ড্রাইভারেব হাত এড়িয়ে পালিযে এসেছে। "মা, তুমি সঙ সেজেছ। থিয়েটারেব বানী হযেছ। হি হি হি।"

হঠাৎ ডাক্তারেব দিকে তাকিযে ওব হাসি বন্ধ হ'যে গেল। ওব ছোট-ছোট চোখ দুটি জ্বলতে লাগল। মুখখানা যেন একটি রক্তগোলাপ। যে-আগুনের রং ছিল আমাব শাড়িতে, সেই রং আমার বাচ্চাছেলের চোখে দেখে আমি চোখ নামালাম।

খোকন ডাক্তারের দিকে চেয়ে বলতে লাগল, "তুমি আমার মাকে চুমু খেযেছ কেন, কেন খেয়েছ? আমি ব'লে দেব, আমি সবাইকে ব'লে দেব।"

ডাক্তার প্রথমে খানিকটা অপ্রতিভ হ'যে পড়েছিলেন, কিন্তু একটু বাদেই নিজেকে সামলে নিলেন। খোকনেব দিকে তাকিযে শান্ত হেসে বললেন, "তাতে কি হযেছে? আমার চুমুর সঙ্গে তো তোমার চুমুর কোনো বিরোধ নেই।" তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, "অনীতা, তুমি খোকনকে একটু শান্ত ক'র, আমি ঘুবে আসছি।"

আমি খোকনকে কোলে টেনে নিতে যেতেই ও ব'লে উঠল, "তুমি লাল শাড়ি ছেড়ে ফ্যালো মা, সঙ ছেড়ে ফ্যালো।" আমি অপ্রতিভ হ'যে তাড়াতাড়ি শাড়ি বদলে এলাম।

পথে আসতে-আসতে আমরা দু-জনেই খোকনকে ভালো ক'বে বোঝাতে লাগলাম এ-সব কথা যেন সে আর কাউকে না বলে। তাহ'লে লোকে তাব নিন্দা করবে, লোকে তাকে বোকা বলবে। ডাক্তার ওকে টাকা দিতে গেলেন, ও নিল না। কতরকম খেলনা কিনে দেবেন বললেন, ও গম্ভীর

হ'য়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

এত অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও খোকন কারো নিষেধ শুনল না। ও ওর ঠাকুরমাকে গিয়ে সব ব'লে দিল। প্রথমে একটা দারুণ বিদ্বেষ এল ওর ওপর। মনে হল, ও যেন আমার পেটের সন্তান নয়, ও আমার কেউ নয়। ওকে যেন টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে পারলে বাঁচি।

আমি খানিকক্ষণ দূরে-দূরে রইলাম। খাওয়ার সময় খোকন ওর ঠাকুরমাকে বিরক্ত করতে লাগল, আমি ওর কাছে গেলাম না। বেশির ভাগ দিনই ও ওব ঠাকুরমার কাছে শোয়, কিন্তু আজ নিজে যেচে এসে বলল, "মা, আমি তোমাব কাছে ঘুমোব।" আমি গম্ভীর মুখে বললাম, "না, বিরক্ত ক'র না খোকন। তুমি তোমার ঠাকুরমার কাছেই শোও গিয়ে।"

ও হঠাৎ এগিয়ে এসে আমার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, "আমি আর বলব না, কোনোদিন বলব না। আমাকে তোমাব কাছে শুতে দাও।"

আমি আস্তে-আস্তে ওর পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করলাম। শোওয়ার সময় ও আমার গলা জড়িয়ে ধরল, "তুমি আমার ওপর রাগ ক'বো না মা, আমাকে ছেড়ে যেযো না।"

আমি বললাম, "তুই কি পাগল হ'লি! কোথায় আবার যাব।"

সারা সন্ধ্যা. সাবা রাত শাশুড়ী আমার সঙ্গে কোনো কথা বললেন না। পাথরের মতো স্তব্ধ হ'য়ে রইলেন। আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক তো ভালো, সামান্য পবিচয়ও যেন নেই।

কিন্তু পরদিন ভোরে উঠে আমি যখন আমাব স্বামীর ফটোব সামনে ধূপকাঠি জ্বেলে দিতে গেলাম, তিনি বাঘিনীর মতো এসে মাঝখানে পড়লেন, "খবরদার! আমার ছেলের ফটো তুমি ছুঁয়ো না, কক্ষনো ছুঁয়ো না ব'লে দিলাম। এতদিন যথেষ্ট ভড়ং সহ্য করেছি, আর না।"

ব'লে তিনি তাঁর ছেলেব সমস্ত ফটো আমাব ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে নিজের বাক্সে বন্ধ ক'রে রাখলেন।

আমার বুকের ভিতরটা জ্বালা করতে লাগল। ভড়ং! কেন, ভড়ং কিসের। ডাক্তাবের সঙ্গে যখন দেখা হয় নি তখন যদি আমি মৃত স্বামীব ফটোতে মালা দিতে পেরে থাকি, ধূপ-দীপে সাজাতে থাকি এখনই বা পারব না কেন। কি দোষ করেছি আমি! সে-অধিকাব আমার কেন যাবে। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, আমি তাঁকে একান্তভাবে ভালোবেসেছি। মৃত স্বামীব স্মৃতিকে আমি যা দিতে পারি, জীবিত বন্ধু যদি তা নিয়ে খুশি না থাকে তো তাতে দোষের কি আছে। এক দেওয়ার সঙ্গে আর-এক দেওয়ার তুলনা হয় না। দুই দানের ধবন আলাদা। এ-সব ধারণা অবশ্য ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনার ফলেই আমার এসেছিল। তিনি আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে. পরস্পরকে ভালোবাসায় আমাদের কোনো অপরাধ নেই। আমরা কাউকে বঞ্চনা করি নি, তাঁর ওপর আর-কোনো মেয়ের দাবি নেই, আমার ওপর দাবি নেই কোনো পুরুষের। আমি আমার মৃত স্বামীর স্মৃতিকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ক'রেও জীবনের দাবি মেটাতে পারি।

কিন্তু আমার শাশুড়ী এ-সব যুক্তি মানলেন না। পাড়াপড়শীদের মধ্যে কথা উঠল। তারা বানিয়ে-বানিয়ে নানারকম কুৎসা রটাতে লাগল। কিছুদিনের জন্যে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করলাম। তবু শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া খিটিমিটি বন্ধ হল না। তিনি আমার হাতের রান্না খাবেন না, হাতের জল খাবেন না। এভাবে কি একসঙ্গে বাস করা যায়।

বিয়ের কিছুদিন পরেই বাবা-মা মারা গেছেন। দূর-সম্পর্কের এক দুঃস্থ কাকা আছেন। তাঁর ওখানে গিয়ে উঠব কি না ভাবছি, এই সময় শাশুড়ী অসুখে পড়লেন। হৃদরোগে অনেকদিন ধ'রেই তিনি ভুগছিলেন। ঝগড়াঝাঁটি মানসিক অশান্তিতে তাঁর সেই রোগ বেড়ে গেল। কিন্তু অসুখে প'ড়েও তিনি আমার হাতের সেবা নিলেন না। তাঁর এক সম্পর্কিত বোনকে আনালেন পরিচর্যার জন্যে। আমার ভারি দুঃখ লাগল। আমাদের মধ্যে প্রায় সখীর ভাব গ'ড়ে উঠেছিল। পড়াশুনোয়, গল্পে আলাপে আমাদের দেখে কেউ মনে করতে পারত না যে, আমাদের মধ্যে শাশুড়ী-বউয়ের সম্পর্ক। যেন আমরা দুই বন্ধু, দুই সখী। সেই বন্ধুত্ব গেল কিসে? ওঁর এতদিনের ঔদার্য এমন ক'রে নষ্ট হল কেন?

ডাক্তার অবশ্য এর এক কূট ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এ-ও এক ধরনের ঈর্ষা।

আমাব মতো ভাগ্য আমাব শাশুডীবও হ'তে পারত। হয় নি ব'লে, সেই সম্ভাবনাকে তিনি সফল ক'বে তোলেন নি ব'লে অনুশোচনা। আমি অবশ্য সে-ব্যাখ্যায় কান দিই নি। রুগ্ন শাশুডীব জন্যে সত্যিই আমি মমতা বোধ কবতাম, আমাব মন অস্থিব হ'যে উঠত।

তিনি তাঁব নাতিকে সব-সময় কাছে-কাছে বাখতেন, কিন্তু আমাকে তাঁব ঘবেও ঢুকতে দিতেন না। মববাব পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমাব ওপব তাঁব এই বিদ্বেষ আব ঘৃণা অটুট ছিল।

তাঁব মৃত্যুতে আমাব বুক ফেটে কান্না আসতে লাগল। তাঁব স্নেহ অবশ্য অনেকদিন আগেই হাবিযেছি। তবু তিনি চ'লে যাওযায ভাবি অসহায বোধ কবতে লাগলাম। কিন্তু পবে যখন শুনলাম তিনি তাঁব সমস্ত বাক্স-পেঁটবা তাঁব বোনকে দিযে গেছেন, তখন আব আমাব বাগেব অবধি বইল না। মবা মানুষকে তো আব হাতেব কাছে পাওযা যায না, যদি যেত সে-মুহূর্তে তাঁব সঙ্গে আমাব চবম বোঝাপড়া হ'তে পাবত।

খবব পেযে ডাক্তাব এলেন। তিনি বললেন, "অসম্ভব। এ-বাড়ি থেকে একগাছা কুটোও কেউ সবিযে নিতে পাববে না।" এই বিপদেব দিনে তাঁব মতো বন্ধুকে পাশে পেযে ভাবি ভবসা পেলাম। বললাম, 'সবিযে নেওযাব মতো দু-একগাছা কুটোই অবশ্য আমাদেব আছে। আব-কিছু নেই।"

তিনি বললেন, "আমি তো আছি। আমাব যদি একসন্ধ্যা জোটে, খোকনেবও জুটবে।"

আমাদেব সমস্ত পুঁজি শেষ হ'যে এসেছিল। মাসে-মাসে বাড়িভাড়া টানা, সংসাবেব খবচা চালানো আমাদেব পক্ষে অসম্ভব হ'যে উঠেছিল, তা তাঁব অজ্ঞাত ছিল না। আমি অনেকদিন থেকেই কোনো একটা কাজকর্মে ঢুকতে চেযেছিলাম, কিন্তু শাশুডী দেন নি। কেবলই বলেছেন, "যাক আবো কিছুদিন।" আমি ওঁকে বললাম, "এবাব আমাব জন্যে একটা চাকবি-বাকবি খোঁজ কব।'

তিনি বললেন, 'একটা চাকবিব খোঁজ আমাব কাছে আছে। আমাব একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট চাই।"

আমি হেসে বললাম, "তা তো চাই, বুঝতে পাবছি। আমি তো আব ডাক্তাবি জানি নে এমনকি সাধাবণ একজন নার্সেব বিদ্যেও আমাব নেই। তোমাব অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হওযাব যোগ্যতা আমাব কই।"

তিনি বললেন, "কিন্তু সঙ্গিনী হওযাব যোগ্যতা তো আছে। তাতে তো আব ডাক্তাবি বিদ্যাবুদ্ধিব দবকাব হয না। হৃদয সম্বন্ধে সাধাবণ বোধ থাকলেই চলে।"

আমি এ-কথাব কোন জবাব দিলাম না। কিন্তু তিনি জবাব পাওযাব জন্যে অধীব হ'যে উঠলেন।

শেষে আমি একদিন বললাম, "কিন্তু খোকনেব কি হবে?"

তিনি বললেন, "কি আবাব হবে। ও থাকবে আমাদেব সঙ্গে। আমাদেব দু জনেব চেষ্টায ও মানুষ হবে তোমাব মতো অল্প বযসে বিযে হ'লে একটি তো ভালো, আমাব অমন একগণ্ডা ছেলেমেযে হ'তে পাবতো। তাবপব বউ মবলে ফেব কি বিযে কবতে আটকাত?"

আমি ওব ঔদার্যে মুগ্ধ হলাম। এ-ও মনে হল, খোকনকে শিক্ষাদীক্ষা দিযে মানুষ ক'বে তোলা আমাব একাব সাধ্যে কুলাবে না। ওঁব মতো লোকেব সাহায্য পেলে তা সহজ হবে।

সম্মতি দিতে হল। তিনি আমাব কাছ থেকে সম্মতি আদায ক'বে ছাড়লেন।

কিন্তু বাধা এল ওঁব বাপ-মাব পক্ষ থেকে।

ওদিকটা আমি এতদিন চিন্তাই কবি নি। কেবল নিজেব আব খোকনেব কথাই ভেবেছি।

আমি বললাম, "তাহ'লে থাক। ওঁদেব দুঃখ দিযে কাজ কি।"

তিনি বললেন, "তা যদি না দিই, তোমাকে না-পাওযাব দুঃখ আমাকে অকেজো ক'বে তুলবে। সংসাবে অনেক কাজ আমাব কববাব আছে। আব আমাব সকল কাজেব কেন্দ্রে আছো তুমি।"

আমাদেব বিযে হ'যে গেল। ওঁব মা-বাবা আমাদেব সঙ্গে কোনো সম্পর্ক বাখলেন না। তিনি ওঁদেব একমাত্র ছেলে। একটি বোন ওঁব আছে। সে ছেলেপুলে নিযে স্বামীব ঘব করছে কলকাতাব বাইবে। সেখান থেকে ধিক্কাব দিযে দাদাকে সে চিঠি লিখল। ওঁব বন্ধু-বান্ধববাও সবাই নিষেধ কবলেন। কিন্তু তিনি কাবো বাবণ শুনলেন না। এদিকে পাড়াপড়শীব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে আমাব অবস্থাও কাহিল হ'যে উঠেছিল। আইনেব সাহায্যে আমাদেব সম্পর্ককে বৈধ করা ছাড়া উপায ছিল না।

প্রথমে আমবা শহবেই একটা আলাদা বাসা ক'রে রইলাম। তিনখানা কমেব একটা ফ্ল্যাট ভাডা

নিলেন তিনি। নিজের মনের মতো ক'রে ঘর সাজালেন। আমিও রেহাই পেলাম না।

খোকনকে নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়তে হল। সে ওঁকেও দেখতে পারে না, আমাকেও দেখতে পারে না। আমার রঙিন শাড়ি আর গায়ের গয়না দেখে দূরে দাঁড়িয়ে টিটকারি দেয়। বলে, "আমার সঙ-সাজা মা।"

আমাদের পাশের ফ্ল্যাটের ভাড়াটেদের কাছে একদিন ও গিয়ে গল্প ক'রে এল, "ডাক্তার আমার বাবা নয়। আমার বাবা ম'রে স্বর্গে গেছেন। ঠাকুরমাকে মেরে ফেলে ডাক্তার আমার মাকে চুরি ক'রে নিয়ে এসেছে।"

কথাটা ওঁরই প্রথমে কানে গেল। উনি এসে গম্ভীর মুখে আমাকে বললেন, "দ্যাখো, তোমার ছেলে কি-সব বলছে। ও একটি আস্ত খুদে শয়তান।"

দরজার আড়াল থেকে প্রতিধ্বনি এল, "তুমি শয়তান।"

আমি ওর গালে ক'ষে চড় চাপড় লাগালাম কয়েকটা। ও কাঁদল না, প্রতিবাদ করল না, নিঃশব্দে দাঁতে দাঁত চেপে সব সহ্য করল।

আমার স্বামীই এসে শেষপর্যন্ত ওকে ছাড়িয়ে নিলেন।

তিনি বললেন, "ওর গায়ে তুমি হাত তুলতে পারবে না। এর ফল আরো খারাপ হবে তা জানো।"

আমি লজ্জিত হলাম। তারপর রাগ কমলে মন শান্ত হ'লে ছেলেকে আমি ভালো ক'রে সমস্ত ব্যাপারটা বোঝালাম। বললাম, আমরা কোনোই অন্যায় করি নি। আমাদের সম্পর্ক সম্পূর্ণ সামাজিক আর বৈধ। বরং খোকনই অন্যায় করছে। যে ভদ্রলোক তাকে রোগ থেকে বাঁচিয়ে তুলেছেন তাকে ... পরিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রে তুলছেন তাঁর ওপর কি ওর কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত নয়? নইলে লোকে যে মন্দ বলবে লোকে যে নিন্দে করবে। শেষে বললাম, "এর পর থেকে তুমি খুব ভালো হবে শান্ত হবে সভ্য হবে, কেমন?"

খোকন সুবোধ ছেলের মতো ঘাড় নাড়ল।

তারপর হঠাৎ আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস ক'রে বলল, "মা, আমি আজ থেকে তোমার কাছে শোবো।"

আমি মুহূর্তের জন্যে লজ্জিত হয়ে চুপ ক'রে রইলাম। তারপর মুখ তুলে ওর দিকে চেয়ে বললাম 'তুমি বড়ো দুষ্টু হয়েছ খোকন। ছি ছি ছি, এত বড়ো ছেলে মা-র কাছে শোয় নাকি! কি লজ্জার কথা! তোমার ঘরখানা কী সুন্দর। কেমন দক্ষিণ খোলা, নতুন রাস্তা দেখা যায় নতুন পার্ক দেখা যায়। কেমন সুন্দর আর দামী তোমার খাট বিছানা।'

খোকন বলল 'কিন্তু তুমি কাছে না থাকলে আমার ঘুম আসে না মা, ... ভয় করে।"

আমি বললাম, 'দূর পাগল ভয় কিসের। আমরা তো পাশের ঘরেই আছি।'

তারপর থেকে অনেক রাত পর্যন্ত ওর কাছে থাকতে লাগলাম। ওর মাথায় হাত বুলাই, পিঠে হাত বুলাই, ওর ঘুম গাঢ় হ'লে তারপর উঠে আসি। স্বামী অপেক্ষায় থেকে মাঝে-মাঝে অধীর হ'য়ে ওঠেন তা বুঝতে পারি। কিন্তু উপায় কি। আমাকে যে দু-জনেরই মন রাখতে হবে।

তবু মাঝে মাঝে রাত্রে ও ঘুমের ঘোরে কেঁদে ওঠে চেঁচিয়ে ওঠে। 'মা মা' ব'লে ডাকতে থাকে। আমি উঠে না গেলে ও শান্ত হয় না।

স্বামী এক-একদিন বিরক্ত হ'য়ে বলেন, 'ও ইচ্ছে ক'রেই অমন করে। সব ওর দুষ্টুমি।"

আমি হাসতে চেষ্টা করি 'কি যে বলো।"

স্বামী বলেন, "আমি ঠিকই বলি। তুমি বরং ওর কাছেই শুয়ো।"

দিন কয়েক একটু শান্তভাবে কাটে। আবার ছেলের উদ্ধ...তা বাড়ে। স্বামীর সঙ্গে আমাকে ব'সে একটু হাসি-গল্প করতে দেখলে, কি কোথাও বেড়াতে বের হ'তে দেখলে ওর আর সহ্য হয় না।

স্বামী মাঝে-মাঝে সহিষ্ণু বৈজ্ঞানিকের মতো নানা মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা ওর ওপর দিয়ে করতে লাগলেন। কিন্তু ফল আরো খারাপ হল। খোকন একদিন ওঁর ঘড়ি ভেঙে ফেলল, আর-একদিন চশমা।

স্বামী চিন্তিতভাবে বললেন, "ওকে কিছুদিন দূরে সরিয়ে রেখে দেখলে হয়। যদি বলো তো একটা ভালো বোর্ডিং-হাউসে ওর থাকবার ব্যবস্থা করি। সেখানো আরো-দশজন ছেলের সঙ্গে থাকলে ওর স্বভাবটা হয়তো বদলাতে পারে। আমার এক বন্ধুই সেখানকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। কোনো অসুবিধা হবে না।"

আমি একটু চুপ ক'রে থেকে বললাম, "সেই ভালো। এ-ব্যবস্থা আমাদের আগেই করা উচিত ছিল। মিছিমিছি তোমার এতদিন কত কষ্ট হল।"

স্বামী বললেন, "কেবল কি আমার একার কষ্ট?"

আমি শুধরে নিয়ে বললাম, "আমাদের দু-জনেরই।"

খোকন কিছুতেই বোর্ডিং-এ যাবে না। ওকে একরকম জোর ক'রেই আমরা পাঠিয়ে দিলাম। বললাম, "আমি রোজ তোমার সঙ্গে গিয়ে দেখা ক'রে আসব, ভয় কি। ওখানে তোমার পড়াশুনো কত ভালো হবে। সেই জন্যেই তো দিচ্ছি।"

কিন্তু এক সপ্তাহও গেল না। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানালেন, খোকনকে ওখানে রাখা কিছুতেই সম্ভব নয়। কেঁদে, চিৎকার ক'রে, জিনিসপত্র ভেঙে তছনছ ক'রে ও সবাইকে অস্থির ক'রে তুলেছে। এভাবে বেশিদিন ওকে ওখানে রাখলে নিজে তো পাগল হবেই সবাইকেই পাগল ক'রে ছাড়বে।

স্বামী বললেন, "কি করা যায় বলো তো?"

আমি বললাম, "ওকে আরো দূরে কোথাও পাঠিয়ে দাও। টাকা দিলে বোর্ডিং এর অভাব আছে নাকি দেশে?"

স্বামী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে খানিকক্ষণ কি দেখলেন তারপর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস চেপে বললেন, "তা হয় না।"

আমি মুখ নামিয়ে নিয়ে বললাম, "কেন হয় না?"

স্বামী বললেন, "কেন হয় না, আয়নার দিকে একবার তাকিয়ে দ্যাখো তাহলেই বুঝবে।" তারপর তিনি নিজেই বুঝিয়ে বললেন, "দু দিনেই তোমার কি চেহারা হয়েছে। সময় মতো নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। সব সময়ই অন্যমনস্ক হ'য়ে আছ।"

আমি লজ্জিত হ'য়ে নিজের অপরাধ ঢাকবার জন্যে বললাম "কি যে বলো। ও তোমার চোখের ভুল।"

স্বামী একটু রূঢ়স্বরে বললেন, 'আমি ঠিকই দেখেছি। ঠিকই বুঝেছি। আমাকে ঠকাতে চেষ্টা ক'র না, অনীতা। আমি তো তোমাকে ঠকাই নি।"

আমি বললাম, "আমিও তোমাকে ঠকাচ্ছি না। আমাকে একটু সময় দাও। সব ঠিক হ'য়ে যাবে। তুমি আমার জন্যে এত পেরেছ, আর আমি পারবো না?"

স্বামী কোনো কথা বললেন না। পরদিনই বিকেলে খোকনকে গাড়িতে ক'রে নিয়ে এলেন। গম্ভীর মুখে বললেন, "তোমার গুণধর ছেলের কীর্তি শোনো। সেখানেও আমার নামে যা তা সব ব'লে বেড়িয়েছে। ছি ছি ছি, বন্ধু-বান্ধব কারো কাছে আর মুখ দেখাবার জো রইল না।"

আমি বললাম, "এবারকার মতো ওকে ক্ষমা ক'র। বড়ো হ'লে নিশ্চয়ই ওর এই পাগলামি সারবে।"

তিনি বললেন, "সারলেই ভালো। না সারলেও সইতেই হবে। আমি তো জেনে-শুনেই সব করেছি। কাঁটাসুদ্ধ ফুলকে তুলে নিয়েছি। এখন আফশোষ করলে চলবে কেন।"

ছেলেকে নিয়ে আমারও শান্তি ছিল না। তবু ওঁর মুখের 'কাঁটা' কথাটা আমার কানে খট ক'রে লাগল, বুকে গিয়ে বিঁধল।

আমি ওঁর অসাক্ষাতে ছেলেকে ডেকে শাসন ক'রে দিলাম। "ফের যদি ও-সব কথা বল, ফের যদি অমন অভদ্রপনা কর, তোমাকে এমন দূরে পাঠিয়ে দেব যে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না।" খোকন আমার কাছে এগিয়ে এল, আমার গায়ের সঙ্গে গা মিশিয়ে বলল, "না, মা, আর আমি কক্ষনো অমন করব না। আমাকে দূরে পাঠিয়ো না। আমি তোমাদের সব কথা শুনব।" তারপর আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, "আমি আর কিছুতেই দূরে যাব না। জোর ক'রে পাঠিয়ে

দিলেও না। আমি তোমাকে জোব ক'বে আঁকড়ে ধ'বে শুযে থাকব, দেখি কি ক'বে পাঠাও।'

"আচ্ছা পাগল তুই।" ব'লে আমি ওকে বুকে টেনে ওব কপালে চুমো খেলাম।

জুতোব শব্দে মুখ তুলে চেয়ে দেখি আমাব স্বামী ঘবে ঢুকতে-ঢুকতে তাড়াতাড়ি বেবিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাড়াতাড়ি খোকনকে ছেড়ে দিয়ে খাট থেকে নেমে দাঁড়ালাম। কিন্তু ওঁকে ধবতে পাবলাম না।

আব একদিন খোকন বলল, "মা, বোর্ডিং-এব ঘবে শুযে আমি বোজ বাত্রে কী চমৎকাব স্বপ্ন দেখতাম জানো?"

বললাম, "কি স্বপ্ন?"

খোকন বলল, "দেখতাম কত বাজ্যেব সাদা ফুল। শেফালী জুঁই টগব বজনীগন্ধা। আব সেই সাদা ফুলেব বাগানে তোমাব গাযে সাদা পোশাক। ঠিক আগেকাব মতো। কী চমৎকাব তোমাকে মানিযেছে। সাদা কাপড় প'বে ঠিক আগেকাব মতো বড়ো একখানা ফটোব সামনে দাঁড়িযে-দাঁড়িযে তুমি সাদা ফুলেব মালা গাঁথছ। কী সুন্দব তোমাকে দেখাচ্ছে। আব-একদিন ওইবকম কববে মা?"

বললাম, "ও সব কথা বলে না, খোকন।"

ও বলল, "কেন, তাতে কি। আচ্ছা বেশ মালা না গাঁথলে, ফটোব সামনে দাঁড়িয়ে ধূপ-দীপ না জ্বালালে, কিন্তু আগেকাব মতো ওইবকম একখানা সাদা শাড়ি পববে?'

আমি একটু কাল স্তব্ধ হ'যে থেকে বললাম "ছিঃ।'

খোকন বলল "কেন মা, দোষ কিসেব শুধু একটি বাবেব জন্যে আমি তাহ'লে তোমাব সব কথা শুনবো। কোনোদিন আব দুষ্টুমি কববো না।' বলতে-বলতে খোকন আলনা থেকে ওব একখানা চুল পেড়ে ধুতি এনে আমাব সামনে এসে দাঁড়াল বলল, 'পবো-না মা, একটি বাবেব জন্যে পবো। আমি তোমাব সব কথা শুনবো। তোমাব পা ছুঁয়ে বলছি। এব পব থেকে তোমাব সব কথা শুনবো।'

আমি একটু কৌতুক বোধ কবলাম 'সত্যি শুনবি তো?'

'ঠিক শুনবো।"

কি আমাব খেযাল হল। ওব কথামতো বঙিন শাড়িটা বদলে সেই ধুতিখানা পবলাম। ও ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধবল, "তুমি ঠিক আমাব সেই স্বপ্নেব মা হযেছ। ঠিক সেই আগেব মা হযেছ। এ-কাপড় তোমাকে আব আমি ছাড়তে দেব না মা।"

দবজা যে ভেজানো ছিল তা আমাব খেযাল ছিল না। স্বামীব সে সময আসবাব কথা নয। তবু তিনি কি একটা দবকাবি কাজে ডিসপেনসাবি থেকে এসে পড়লেন। আব আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালেন। মুহূর্তকাল স্তব্ধ হ'যে থেকে বিদ্রূপেব ভঙ্গিতে হেসে উঠে বললেন 'বাঃ, চমৎকাব হযেছে।"

দেখলাম তাঁব দু চোখ দিযে আগুন ঠিকবে বেবোচ্ছে

আমি অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গেই কাপড় বদলে ফেললাম। আব এমন কবাব কাবণও তাঁকে বুঝিযে বললাম। কিন্তু তিনি দু দিনেব মধ্যে আমাব সঙ্গে কোনো কথা বললেন না।

অনেক সাধাসাধিব পব ওব বাগ পড়ল, অভিমান ভাঙল। কিন্তু খোকনেব স্বভাব বদলাল না। আব ওঁব মেজাজও দিনেব পব দিন খাবাপ হ'যে উঠতে লাগল। ওঁব অসহিষ্ণুতা দিনেব পব দিন বেড়ে চলল। কাজকর্মেব ক্ষতি হ'তে লাগল। বোগীদেব সঙ্গে পর্যন্ত তিনি আজকাল খাবাপ ব্যবহাব কবেন শুনতে পেলাম।

একদিন বললাম, "তোমাব হল কি? তুমিও কি খোকনেব মতো হ'লে, একটু দেখে-শুনে সমঝে চল। লোকেব কাছে তোমাব নিন্দে শুনলে ভাবি খাবাপ লাগে।"

তিনি চিন্তিতভাবে বললেন, "তা ঠিক। যেমন ক'বে পাবি নিজেকে শোধবাতেই হবে। তোমাব ছেলেব সঙ্গে আমাব প্রতিদ্বন্দ্বিতা তো জীবন-ভবই আছে।"

বললাম, "ছিঃ। ওই একফোঁটা ছেলে। ও কি তোমাব প্রতিদ্বন্দ্বী হওযাব যোগ্য।"

তিনি বললেন, "সেই জন্যে হযেছে আবো মুশকিল। এ এক বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বথীব সঙ্গে

পদাতিকের সংগ্রাম।"

বছরখানেক কাটল। কিন্তু কেমন যেন সুর কেটে যাচ্ছে। ওঁর মেজাজ দিনের পর দিন রুক্ষ হ'য়ে উঠছে। খোকনের উগ্রতাও বাড়ছে ছাড়া কমছে না। ওকে স্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়েছি। কিন্তু পড়াশুনোর দিকে ওর মন কম। নিত্য নতুন উপদ্রব উৎপাতের দিকেই ওর ঝোঁক যেন বেশি।

শেষে আমি একদিন বললাম, "চল, বাইরে থেকে কোথাও ঘুরে আসি। কতকাল যে এই শহরে প'ড়ে আছি তার ঠিক নেই।"

এ-প্রস্তাবে তাঁরও খুব উৎসাহ দেখা গেল। তিনি বললেন, "বেশ, চল। কিন্তু যে-সব জায়গায় সকলে যায় আমরা সেখানে যাব না। নিজেদের চেঞ্জের জায়গা আমরা নিজেরা আবিষ্কার ক'রে নেব।"

প্রথমে আমরা ভাবলাম খোকনকে কলকাতায় রেখে যাব। কোনো হোস্টেল বোর্ডিং-এই হোক, কি কোনো বন্ধু-বান্ধবেব বাড়িতেই হোক, ওকে রেখে যাওয়াই ঠিক হল। একথা শুনে খোকন প্রথমে খাপ্পা হ য়ে উঠল। সে-ও যাবে। আমরা কিছুতেই তাকে ফেলে যেতে পারব না। আমরা ভেবেছি কি, লুকিয়ে-লুকিযে আমরা সিনেমায় যাই থিয়েটাবে যাই, কত জায়গায় বেড়াতে যাই। এবার তাকে একা ফেলে চেঞ্জেও যাব। তা সে কিছুতেই হ'তে দেবে না।

আমি কোনো কথা বললাম না। কারণ স্বামীর বেড়াবার পরিকল্পনাব মধ্যে কোনো তৃতীয় ব্যক্তির স্থান ছিল না। পাহাড়ে জঙ্গলে ঝর্নার ধারে শুধু আমরা দু-জন হাত ধবাধরি ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এই স্বপ্নই তিনি দেখছিলেন।

কিন্তু খোকন কিছুতেই ছাডল না, বাদ-প্রতিবাদ ছেড়ে সে এবাব অননয়-বিনয়ের পথ ধরল। যাওয়ার দু-দিন আগে থেকে সে আমাব পিছনে-পিছনে পায়ে-পাযে ঘুরে বেড়াতে লাগল আর কাতরভাবে বলতে লাগলো, "মা, আমাকে তোমবা সঙ্গে নিযে চল। সত্যি বলছি, আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করব না। কোনো অসুবিধে কবব না। আমি একা-একা ঘুবে বেডাব। আমি পাহাড়ের চুড়োয় উঠব, আমি ঝর্নার জলে নাইব। আর যদি সমুদ্রের ধাবে যাও আমি তার মধ্যে ডুব দিয়ে ব'সে থাকব। আমি কিছুতেই তোমাদেব সামনে যাব না।"

আমার বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে উঠল। স্বামীকে ডেকে বললাম, "শুনছো ওর কথা? ও-ও কিন্তু ভিতরে-ভিতরে তোমাব মতো কবি। যাবে নাকি নিয়ে? চেঞ্জের ফল হয়ত ওর পক্ষেও ভালো হ'তে পারে।"

তিনি আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "না না, থাক। নিয়ে দরকার নেই ওকে। ওর পড়াশুনোর ক্ষতি হবে।"

তিনি বললেন, "না না না, কোনো ক্ষতি হবে না। ওকে আমি নিয়ে যাব গোড়া থেকেই ঠিক ক'রে রেখেছিলাম। কেবল তোমার মন বুঝছিলাম এতদিন। ওকে নিয়ে যেতেই হবে।"

বললাম, "কেন?"

তিনি বললেন, "ওকে না নিয়ে গেলে তোমাকে পুরোপুরি নিয়ে যেতে পারব না।"

সাঁওতাল পরগনার এক অখ্যাত গ্রামে আমরা টাঙ্গা থেকে নামলাম। তিনি যেমন চেয়েছিলেন তেমনি হল। ধারে কাছে শহর নেই। জন-মানব খুবই কম। একটা বড়ো পুরনো বাড়ি তিনি আগে থেকেই বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিলেন। আমরা তাতে গিয়ে উঠলাম। সাঁওতালদের ধারণা, বাড়িটায় নাকি ভূত আছে। কোনো-এক ধনী বাঙালী বাড়িটা তৈরি করিয়েছিলেন। এ-বাড়িতে তাঁর স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তিনি আর এখানে আসেন নি।

আমি বললাম, "এত বড়ো বাড়ির কি দরকার ছিল। কেমন যেন গা ছমছম করে।"

তিনি হেসে বললেন, "তুমি বুঝি সাঁওতালদের ওই সব গল্প শুনেছ। আসলে ভূতের ভয় মেয়েদের মজ্জাগত।"

আমি বললাম, "শুধু নিজের জন্যেই ভয় কি না!"

সাঁওতালদের গল্প খোকনও শুনেছিল। তার ফলে মুশকিল হল, ও কিছুতেই আলাদা ঘরে শুতে চাইল না।

আমি বললাম, "তুই তো একা শুবি নে। ঝমরু থাকবে তোর সঙ্গে। ভয় কি। তাছাড়া আমাদের ঘরের দরজা খোলা থাকবে। আলো জ্বালা থাকবে সারা রাত। ভয় কি।"

কিন্তু খোকন নাছোড়বান্দা। ও আমাদের ঘরেই শোবে।

স্বামী বললেন, "সব ওর দুষ্টুমি।"

অগত্যা আমাদের ঘরেই আলাদা বিছানা ক'রে ওর শোয়ার ব্যবস্থা করলাম। তাতেও ওর ভয় যায় না। মাঝরাত্রে উঠে ও চুপিচুপি এসে আমার আর-একপাশে শুয়ে থাকে। একদিন স্বামী আমাকে আদর করতে গিয়ে তা টের পেলেন। দেখলেন, ও আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রয়েছে। তিনি ভারি অপ্রতিভ হলেন। সেই রাত্রেই তিনি উঠে গিয়ে পাশের ঘরে আলাদা বিছানা করলেন।

আমরা খুব বেড়াতে লাগলাম। আশেপাশের সমস্ত পাহাড়গুলি দেখলাম। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ঘুরে বেড়ালাম। ছোট-ছোট নদী আর ঝর্নার জলে স্নান করলাম। খোকন বেশির ভাগ সময়ই বুড়ো ঝমরুর কাছে থাকে। মানে, ঝমরু তাকে জোর ক'রে ধ'রে রাখে। স্বামী তাকে গোপনে ব'লে দিয়েছিলেন, খোকনকে ভুলিয়ে দূরে দূরে রাখতে পারলে তিনি ওকে আলাদা বকশিস দেবেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা। দেবদারুর সারের ওপর গোল হ'য়ে চাঁদ উঠেছে। সেই চাঁদ কাঁপছে আমাদের সামনে ছোট ঝর্নার জলে। ওঁর হাতের মধ্যে আমার হাত। তিনি গুনগুন ক'রে কবিতা আবৃত্তি করছেন। হঠাৎ দূর থেকে একটা পাথর সশব্দে ঝর্নার জলে পড়ল। জল ছিটকে এসে লাগল আমাদের চোখে-মুখে। আর আমাদের পিছনে আর-একটা ঝর্না যেন খিলখিল ক'রে হেসে উঠল, "আমি দেখে ফেলেছি, আমি দেখে ফেলেছি।"

স্বামী মহাবিরক্ত হলেন। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "দ্যাখো, শয়তানের কাণ্ড দ্যাখো। এমন মুডটাই নষ্ট ক'রে দিল।"

ব'লে তিনি উঠে ওকে ধরবার জন্যে ছুটে গেলেন। খোকন ওঁর সেই মারমূর্তি দেখে দৌড়ে পালাল। রাত আটটা অবধি ওকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। আমি ভারি উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলাম। সাপে বাঘেই খাবে না কি! ঝমরু শেষপর্যন্ত ওকে ধ'রে নিয়ে এল। গায়ে একটা গরম জামা পর্যন্ত নেই। শুধু একটা ছিটের হাফসার্ট গায়ে। খক্‌খক ক'রে কাসছে। ভয়ে ওর মুখ নীল হ'য়ে গেছে। কেবলই বলছে, "আমাকে মের না, আমাকে মের না। আমি আর করব না।"

আমি রাগ ক'রে ওর গালে ক'ষে দুই চড় বসিয়ে দিলাম, "হতভাগা, তোর মরাই ভাল।"

তারপর একবাটি গরম দুধ খাইয়ে তাড়াতাড়ি লেপের তলায় নিয়ে গেলাম। সারারাত ও আমার বুকের সঙ্গে মিশে রইল। শেষরাত্রে খুব জ্বর এল ওর। আমি স্বামীকে ডেকে বললাম, "কি হবে?"

তিনি বললেন, "কোনো ভয় নেই, সাধারণ জ্বর। ঠাণ্ডা লেগে হয়েছে। দু-তিন দিনেই সেরে যাবে।" তিনি একখানা কাগজে কয়েকটা ওষুধের নাম লিখে ঝমরুকে পাঠিয়ে দিলেন শহরে।

ওষুধ চলতে লাগল। কিন্তু জ্বর থামল না।

আমি আবার বললাম, "কি হবে!"

তিনি বললেন, "ভয় কি।"

আমি বললাম, "তোমার মতো বড় ডাক্তার যখন কাছে আছে তখন আমার আর-কোনো ভয় নেই। তুমিই তো সে-বার ওকে সারিয়ে তুলেছিলে।"

মনে পড়লো খোকনের রোগশয্যাতেই ওঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। তখন থেকেই আস্তে-আস্তে ঘনিষ্ঠতার শুরু। কিন্তু তখনকার মতো এবার আর আলাপ জমল না। আমরা দু-জনে দু-পাশে গম্ভীর হ'য়ে ব'সে থাকতাম। যেন দু-জনে স্তব্ধতার পাহাড় ব'নে গেছি। আমাদের ভিতরকার সমস্ত ঝর্না গেছে শুকিয়ে।

খোকনের অবস্থা দিনের পর দিন খারাপ হ'তে লাগল। তিনি বার-বার ওষুধ পাল্টালেন। ওষুধ কেনবার জন্যে নিজে গেলেন শহরে।

আমি বললাম, "দ্যাখো, আর-কোনো ডাক্তার-টাক্তার যদি পাও তাদের সঙ্গে একটু পরামর্শ ক'র।"

তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন, "কেন ?"

বললাম,"শত হ'লেও আত্মীয়-স্বজনের রোগের সময় মাথার ঠিক থাকে না। ওর অসুখটা কি ?"

তিনি বললেন, "নিউমোনিয়া।"

কিন্তু শহরে আর-কোনো বড় ডাক্তার পাওয়া গেল না। যারা আছে তারা নেহাৎই হাতুড়ে।

দ্বিতীয় সপ্তাহে খোকন প্রলাপ বকতে শুরু করল,"আমাকে দূরে পাঠিয়ো না মা। আমি তোমাদের সব কথা শুনবো। একটুও বিরক্ত করব না। আমি সেখানে একা থাকতে পারব না। তোমাকে ছেড়ে একা-একা থাকতে পারব না।"

আরো দু-দিন কাটল। অবস্থা আরো খারাপ হল। আমি স্বামীকে বললাম, "টাকা না থাকে আমার গায়ের সব গয়না নাও। জেলার সিভিল সার্জনকে ডেকে নিয়ে এসো। হাজার টাকা দিলেও কি তিনি আসবেন না ?"

স্বামী আমার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকালেন, তারপর বললেন, "তা আসবেন। তোমার গয়না এখনই খোলার দরকার নেই। এখন থাক।"

সিভিল সার্জন এসে রোগীকে দেখে মুখ গম্ভীর করলেন। আমি তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম, আর কোনো আশা নেই, আর কিছু করবার নেই।

একটু বাদে তাঁরা দু-জনে পাশের ঘরে চ'লে গেলেন। আমি গিয়ে পা টিপে-টিপে দাঁড়ালাম জানলার বাইরে। যদি কোনা আশা এখনো থাকে। একটু বাদে সিভিল সার্জনের মৃদু গলা শুনতে পেলাম, "ছি ছি ছি, ডাক্তার হ'য়ে এত বড় ভুল করলেন আপনি।"

স্বামী কি বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ আমার সঙ্গে তাঁর চোখাচোখি হ'যে গেল। তিনি চেষ্টা ক'রেও যেন আর কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর অমন ভীত বিমূঢ় বিহ্বল ভাব আমি এর আগে কোনোদিন দেখি নি।

আমি খোকনের কাছে ফিরে গেলাম। সারারাত ব'সে রইলাম তার কাছে। ভোর-ভোর সময় সে মারা গেল।

আমি কাঁদলাম না, চেঁচিয়ে উঠলাম না। দাঁতে দাঁত চেপে স্তব্ধ হ'যে ব'সে রইলাম। স্বামী আস্তে-আস্তে আমার কাছে এলেন, হাতখানা নিতে চাইলেন হাতের মধ্যে।

আমি সঙ্গে-সঙ্গে স'রে গিয়ে তাঁর দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে চেঁচিয়ে উঠলাম, "খবরদার, ছুঁয়ো না আমাকে, ছুঁয়ো না। আমি সব শুনেছি।"

তিনি আমার দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন, তারপর উঠে আস্তে-আস্তে বাইরে চ'লে গেলেন।

ঝমরুদের সাহায্যে খোকনের সৎকারের ব্যবস্থা হল। তিনিই সব করালেন। অচল অটল নিষ্ঠুর এক পুরুষ। চোখে জল নেই। পা টলছে না, হাত কাঁপছে না। গলার স্বর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কেবল চুরুটের পর চুরুট খেয়ে যাচ্ছেন আর লোকজনদের দরকারী নির্দেশ দিচ্ছেন।

বিকেল বেলায় তিনি একবার শহরে গেলেন। ফিরলেন অনেক রাত্রে। শোবার আগে তিনি একবার এসে আমাকে দেখে গেলেন। শুধু দেখা। তিনিও কোনো কথা বললেন না, আমিও না। সমস্ত কথা আমাদের হারিয়ে গেছে।

আশ্চর্য, অমন রাত্রেও ঘুম আসে। আমি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কয়েকটি ভয়ার্ত সাঁওতালের চেঁচামেচির শব্দে জেগে উঠলাম। শুনতে পেলাম, পাশের ঘরে ডাক্তারবাবুকে ভূতে মেরে রেখেছে। ভূতই বটে, সে-ভূতের নাম পটাসিয়াম সায়েনায়েড।

'আমার মৃত্যুর জন্যে আর কেউ দায়ী নয়।' আত্মহত্যাকারীরা সাধারণত যা লিখে যায় তিনিও তাই লিখে গেছেন। তার বেশি একটি লাইনও না। আমি অনেক খুঁজলাম। সব কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করলাম। কিন্তু কোথাও কিছু নেই। লিখবেন ব'লে বড় মোটা একখানা ডায়েরি নিয়ে এসেছিলেন সঙ্গে। কিন্তু তার সবগুলি পাতা সাদা। কোথাও একফোঁটা কালির দাগ পড়ে নি। সমস্ত কালি আমার মনের মধ্যে ঢেলে দিয়ে তিনি চ'লে গেছেন। খোকনের চিকিৎসার ভুলটা তিনি ইচ্ছে ক'রেই করেছিলেন কি না তা স্পষ্ট ক'রে কিছুতেই আমার আর জানবার জো নেই।'

আমার বান্ধবী থামলেন।

খানিকক্ষণ দু-জনেই চুপ ক'রে রইলাম। তারপর আমি বললাম, 'কিন্তু সে-কথা জানবার চেষ্টা ক'রেই বা আর লাভ কি। সে-অধ্যায় যখন একেবারে শেষ হ'য়ে গেছে—'

বান্ধবী বাধা দিয়ে বললেন, 'শেষ হয়েছে কে বললে?'

আমি একটু চমকে উঠে বললাম, 'তবে?'

মনে হল তাঁর মুখে একটু রক্তের ছোপ লাগল। তিনি মৃদু স্বরে বললেন, 'তিনি মারা যাওয়ার ছ' মাস পরে আমার একটি ছেলে হয়। প্রথমে তার ওপর আমার ভারি ঘৃণা এল। এ কি পুতুল যে একটিকে ভেঙে ফেলে আমাকে ভোলাবার জন্যে তিনি আর-একটিকে দিয়ে গেছেন! এই বিদ্বেষ আর বিতৃষ্ণা আমার অনেকদিন পর্যন্ত ছিল। খানিকটা এখনো আছে। কিন্তু তাঁর মা-বাবা ছেলের শেষ চিহ্ন ব'লে ওকে আদর ক'রে বুকে তুলে নিলেন। আর সেই নাতির খাতিরেই তাঁদের ঘরে আমারও একটু স্থান হয়েছিল। কিন্তু সেখানে আমি বেশি দিন থাকতে পারলাম না। সংসারে দুটি খাওয়া-পরাই তো সব নয়। আমার আরো চাই।

'কিছুদিন বাদে ওঁরা কাশীবাসী হলেন। ছেলে রইলো ওঁদের কাছেই। ভাবলাম, তাই থাক। আমাকে ওর না হ'লেও চলে। ওকে দিয়ে আমারই বা আর কি দরকার। আব মায়া বাড়িযে লাভ কি। কিন্তু কিছুদিন আগে শ্বশুর মারা গেছেন। শাশুড়ীও খুব অসুস্থ, লিখেছেন "তোমার জিনিস, তুমি এসে এবার নিয়ে যাও।"

আমি বললাম, 'ক' বছর হল বয়স?'

তিনি বললেন, 'ছ' বছরে পড়েছে।'

বললাম, 'সেইজন্যেই বুঝি কাশী যাচ্ছেন?'

তিনি কোনো জবাব দিলেন না।

আমি বললাম, 'একথা আমাকে আগে বলেন নি কেন?'

তাঁর মুখে আবার সেই লজ্জার আভাস দেখলাম। তিনি চোখ নামিয়ে নিয়ে বললেন, 'এমনিই।' তারপর ফের বাইরের দিকে তাকালেন।

আমি আস্তে উঠে গিয়ে আমাব বেঞ্চে এসে বসলাম। জানলাটা খুলে দিলাম এবার। এ-জানলার বাইরে ও-জানলাব মতোই ঘন কুয়াশা জমাট বেঁধে রয়েছে।

মাঘ ফাল্গুন ১৩৫৯

ধূপকাঠি

মান্যবরেষু

আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিতা। বিনা পরিচয়ে আপনাকে এই চিঠি লিখতে বসেছি, আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। তবে আমার পক্ষ থেকেও একটি বলবার কথা আছে। আমি আপনার একটি পরিচিতা মেয়ের অনুরোধেই তার বক্তব্য আপনাকে লিখে জানাচ্ছি। প্রথমে তার জবানীতেই লিখতে শুরু করেছিলাম; কিন্তু সে এমন অগোছাল এলোমেলোভাবে বলতে আরম্ভ করল যে, আমার পক্ষে তা গুছিয়ে লেখা অসাধ্য। তাই আমি তার কাছ থেকে সমস্ত ঘটনাটা জেনে নিয়ে তার বলবার কথা সাধ্যমত বুঝাতে চেষ্টা করে আপনাকে এই চিঠি লিখছি। জানি না এতে উদ্দেশ্য

কতটুকু সিদ্ধ হবে ; তার মনের কথা কতটুকু আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব !

প্রথমে আমি তাকে বলেছিলাম, 'তুমিই দু-চার লাইন যা পার লিখে দাও। তোমার নিজের হাতের লেখা চিঠি পেলেই বিমলবাবু খুশি হবেন।' কিন্তু রেণু তাতে কিছুতেই রাজী হল না। এ-ও হতে পারে, আপনার সঙ্গে ওর যা সম্পর্ক তাতে ঘটনাটা সব খোলাখুলিভাবে লিখতে ওর লজ্জা করছে।

আপনি বোধ হয় রেণুকে এবার চিনতে পেরেছেন। আপনাদের গ্রামের সেই অনাথা মেয়েটি ; বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়িতে তিন বছর আগে আপনি যাকে রেখে এসেছিলেন। চৌধুরীরা আপনার আত্মীয়। হিসেব করলে যত দূরেরই হোক ওঁদের সঙ্গে রেণুরও একটু সম্পর্ক বেরোয়। সেই কথা ভেবেই আপনি ওকে অন্য কোথাও না রেখে, কোনো আশ্রমে-টাশ্রমে না পাঠিয়ে চৌধুরীদের ওখানে দিয়েছিলেন। এখন মনে হয় মেয়েটার অন্য কোনো ব্যবস্থা করলেই বোধ করি ভাল করতেন। তা হলে ও খানিকটা লেখাপড়া কি হাতের কাজ-টাজ কিছু শিখতে পারত। চৌধুরীদের বাড়িতে তেমন কোনো সুযোগই ও পায় নি।

প্রথমে অবশ্য বাড়িব বউঝিদের অল্পস্বল্প ফুটফরমায়েশ খাটা, বাচ্চা ছেলেদের কোলে নেওয়া, খাওয়ানো, ঘুমপাড়ানো এই সব ছোটখাট কাজের ভারই ওর ওপর ছিল। সবাই বলেছিলেন, 'বাড়ির মেয়েদের মতো থাক। তুমি তো আমাদের আত্মীয়, লজ্জাসংকোচের কি আছে ?'

এমন অভ্যর্থনা পেয়ে রেণুর খুব আনন্দ হয়েছিল। বড় তেতলা বাড়ি। বাড়িভরা লোকজন। ওর মতো ষোল-সতেবো বছরের মেয়েই আছে বাড়িতে গুটি চারেক। কেউ স্কুলে পড়ে, কেউ কলেজে। সবাই ওকে ভাব জমাবার জন্যে, দলে টানবার জন্যে ব্যস্ত। কেউ নিজেব পুবনো শাড়ি দেয়, কেউ স্নো-সাবান দিয়ে বন্ধুত্ব কবাব চেষ্টা করে। বাড়িব ছেলেরাও যেন ওব ওপর একটু মনোযোগী। বোনদের বাদ দিয়ে রেণুকেই তারা নানা কাজে ডাকে, নানা শৌখিন কাজে খাটায়। দামী কলমটা রেণুর হাতে ছেড়ে দিয়ে বলে, 'ধুয়ে এনে কালি ভবে দাও তো।'

বিছানা পেতে দেওয়া, ফুলদানিতে ফুল সাজিযে রাখা, এসব কাজে রেণু আনাড়ী হলেও তাকে দিয়ে কবিয়েই যেন বাড়ির ছেলেদের আনন্দ। বাড়ির মেয়েবা ঠাট্টা করে বলে, 'রেণু একা আমাদের সকলের জাযগা কেড়ে নিয়েছে।'

বউরাও পরিহাস করে, 'তোমাদের জাযগা ঠিকই আছে ঠাকুবঝি, আমাদের নিয়েই ভাবনা।'

এসব ঠাট্টা-পবিহাস বুঝবাব বযস বেণুর হযেছে। সেখান থেকে লজ্জায় পালিযে গিযে গিন্নীদের কাছে এসে বসে।

এ সময় মাঝে মাঝে আপনি খোঁজখবর নিতে আসতেন। বেণুকে ডেকে জিজ্ঞাসা কবতেন 'কেমন আছ ?'

রেণু হেসে বলত, 'ভালোই।'

বাড়ির গিন্নীদের কাছে আপনি ওর প্রশংসাই তখন শুনতে পেতেন। এমন শান্তশিষ্ট কর্মঠ ভালো মেয়ে আর হয় না।

কিন্তু অবস্থাটা ক্রমে ক্রমে বদলাতে লাগল। শোভাবাজারে চৌধুরীদেব যে কাপড়ের দোকান আছে, তাতে লাভের অঙ্ক কমে গেল। অফিসের ছাঁটাইয়েব ফলে বাড়ির গুটি দুই ছেলে বেকার হল। আর কলেজ থেকে নতুন যারা পাস করে বেরোল তাদেব চাকবি জুটবাব কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। কাপড়ের দোকানের আয় এমন নয় যাতে এতবড় পরিবারেব খরচ বেশ ভালোভাবে চলতে পাবে।

এসব বাইরের খবর আপনি নিশ্চয়ই জানেন। কিন্তু ভিতরেব মেয়েদের ব্যাপারটা বোধ হয় তেমন করে জানেন না। কারবারের অবস্থা খারাপ হওয়ায় বড়কর্তা ছোটকর্তা দুজনের মেজাজই গেল বিগড়ে। সংসারে ঝগড়াঝাঁটি কথা-কাটাকাটি শুরু হল। সবাই ধমক খেতে লাগল। রেণুও বাদ গেল না।

বড়কর্তা বললেন, 'ওসব বাবুগিরি বিলাসিতা চলবে না, খরচ কমাও।'

দোকানের দুজন কর্মচারীকে ছাঁটাই করলেন। বাজারের পয়সা চুরি করে বলে চাকরটাকে বিদায়

দিলেন। একটা ঝি ছিল, খাওয়াপরা ছাড়া দশ টাকা ক'রে মাইনে নিত, তাকেও বাদ দিলেন। বললেন, 'নিজেরা করেকর্মে খাও। এত বাবুগিরি চলবে না।'

বাইরের লোকজনদের মধ্যে রইল একটা ঠিকে-ঝি আর রেণু। ওর ভয় হতে লাগল বড়কর্তা তাকেও চলে যেতে না বলেন, তা হলে সে কোথায় দাঁড়াবে! এই চৌধুরীবাড়ি ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথাও যে কোনো জায়গা আছে, সে কথা রেণুর মনে হয় নি। রেণু নিজেই ইচ্ছা করে সংসারের বেশি বেশি কাজ করতে লাগল। গিন্নীদের, বউদের হাতের কাজ কেড়ে নেয়। রাঁধে, জল টানে, কুড়িজন লোকের রেশনের চালের কাঁকর বাছে, পাছে কেউ তাকে অনাবশ্যক মনে করে।

তা অবশ্য কেউ মনে করলেন না। সংসারের অনেক কাজের ভারই গিন্নীমা ওর হাতে ছেড়ে দিলেন। বিশেষ করে রান্নাঘরের ভারটা প্রায় সম্পূর্ণই রেণুর ওপর পড়ল। না পড়ে উপায় কি! বড়গিন্নী, ছোটগিন্নী কারোরই ছেলেপুলে হওয়া বন্ধ হয় নি। আর বউদের তো সবে শুরু হয়েছে। তা ছাড়া অসুখবিসুখ আছে। মেয়েদের স্কুলকলেজের পড়া আর পরীক্ষার কড়াকড়ি বেড়েছে। তাদের পক্ষে সংসারের অন্য কাজকর্ম করা পোষায় না। তাই স্বাভাবিকভাবেই রেণুকেই সব বুঝে নিতে হল।

আপনি তখন চাকরি-বাকরি আর সভাসমিতি নিয়ে ব্যস্ত। আসবার অবসর বেশি পান না। তবু দু-চার মাস অন্তর মাঝে মাঝে এসে যখন জিজ্ঞেস করতেন, 'কেমন আছ রেণু?' তার কাছ থেকে ওই একই উত্তর পেতেন, 'ভালোই আছি বিমলদা।'

আপনি ব্যস্তভাবে চলে যেতেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন করতেন না। যদি করতেন তা হলে তখনই হয়ত আপনি কিছু কিছু বুঝতে পারতেন। আমার মনে হয়, জিজ্ঞাসা না করেই আপনি বুঝেছিলেন। কিন্তু কিছু করাটা আপনার পক্ষে সহজসাধ্য হয় নি। আপনি অবিবাহিত, মেসে থাকেন। নিজের নানারকম ঝামেলা আছে। এ সব জানত বলেই রেণু আপনাকে কিছু খুলে বলত না। ভাবত, অনর্থক বিব্রত করে কি লাভ! আপনি ওর জন্যে যথেষ্ট করেছেন। আরও যদি কিছু করবার থাকে তা আপনি নিজেই করবেন।

গত বছর বড়কর্তার সেজো আর ছোটকর্তার মেজো মেয়ে দীপ্তি, তৃপ্তি দুজনের একসঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। সেই বিয়েতে আপনি নিমন্ত্রণ খেতে এসে বড়গিন্নীর কাছে রেণুর নামে প্রথম নালিশ শুনে যান। রেণু আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছিল। বড়গিন্নী আপনার কাছে বলেছিলেন, রেণুর সেই আগের মতো শান্ত স্বভাব আর নেই। ভারি মুখ হয়েছে ওর। কথায় কথায় তর্ক করে। মুখে মুখে জবাব দেয়। আরও একটা গুণ বেড়েছে। রাস্তার ফেরিওয়ালা ডেকে হাসিগল্প করে। এ কথা শুনে আপনি যে ভ্রূ কুঁচকেছিলেন, তা রেণুর চোখ এড়ায় নি। আপনি বলেছিলেন, 'এসব তো ভালো নয় মাসীমা। আপনি ওকে শাসন করে দেবেন।'

আপনার এই কথায় রেণু বড় দুঃখ পেয়েছিল। ওর হাতে ছিল দইয়ের হাঁড়ি, ভেবেছিল সেটা রেখে এসে আপনাকে বুঝিয়ে বলবে।

রেণু মাঝে মাঝে তর্ক করে, কথার পিঠে কথার জবাব দেয় তা ঠিকই। তার একার ঘাড়ে সবাই সব কাজ চাপিয়ে দেন, আর পান থেকে একটু চুন খসলেই যদি তা নিয়ে বকাবকি করেন, তা হলে একেবারে মুখ বুজে ও কি করে থাকে! সেও রক্তমাংসের মানুষ। কিন্তু কোনও খারাপ কথা সে কাউকে বলে নি। একদিন শুধু ছোটগিন্নীকে বলেছিল, 'এমন বিনে মাইনের ঝি আর পাবেন না।' তিনিও জবাব দিতে ছাড়েন নি, বলেছিলেন, 'যেখানে মাইনে পাস গেলেই পারিস। ভাত ছড়ালে আবার কাকের অভাব! আজকালকার দিনে খেতে পরতে দিলে অমন কত গণ্ডা পাওয়া যায়।'

সব কথাই আপনাকে বলবে ভেবেছিল। কিন্তু গিয়ে দেখে, আপনি বিয়েবাড়ির পান মুখে দিয়ে চলে গেছেন। আপনি শুধু একপক্ষের কথাই শুনে গেলেন, আর একপক্ষের কিছুই শুনলেন না, সেজন্যে রেণুর মনে সেদিন ভারি দুঃখ, অভিমান, এমন কি একটু রাগও হয়েছিল আপনার ওপর। সুযোগ পেলে সেদিন অনেক কথাই রেণু আপনাকে বলত। চৌধুরীদের কারবারের অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হওয়া সত্ত্বেও বাড়ির কাজকর্মের জন্যে ওঁরা যে আর নতুন লোকজন রাখেন নি, জল তোলা, বাটনা বাটা, দু বেলা রান্না, সবই রেণুকে করতে হচ্ছে এ খবরটা আপনাকে সে জানাত।

আর ফেরিওয়ালাদের ডেকে গল্প করার কথা ! তা-ও রেণুর মুখেই আপনি তখন শুনতে পেতেন। কারণ, ব্যাপারটা তখনও খুব ঘোরাল হয়ে ওঠে নি। ওদের সেই রামকান্ত বোস স্ট্রীটের গলি দিয়ে কত ফেরিওয়ালাই তো যেত। কেউ জিনিস বেচতে চায়, কেউ কিনতে চায়। ছিট কাপড়, বাসন, শিশিবোতল, শোনপাপড়ি, চিনেবাদাম, ফুল, ধূপকাঠির ফেরিওয়ালারা সকলেই চৌধুরীবাড়ির কাছ দিয়ে যাতায়াত করত। দুপুরবেলায় কি বিকেলবেলায় এসে হাঁক দিত। বাড়ির বউঝিরা দোরের কাছে এসে নেড়েচেড়ে দেখত, দরদাম করত, কোন কোনদিন জিনিস রাখত, বেশির ভাগ দিনই ফেরত দিত।

সেদিন বিকেলবেলা নতুন বউ নীলিমা দোতলা থেকে বলল, 'রেণু, আমি চুল বাঁধছি ভাই। ধূপকাঠিওয়ালা এসেছে। দু আনার ধূপকাঠি রাখ তো ওর কাছ থেকে। ওর কাঠিগুলো বেশ ভালো।'

বিকেলের জলখাবারের জন্যে রেণু সবে ময়দা মাখতে বসেছিল। তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে সদরের কাছে এসে দাঁড়াল, 'দু আনাব ধূপকাঠি দিন তো।'

'দাও' কথাটা ঠিক মুখে এল না রেণুর। বাইশ-তেইশ বছরের যুবক। লম্বা ছিপছিপে চেহারা। গায়ে একটা ছিটের হাফশার্ট। পায়ে একজোড়া স্যাণ্ডালও আছে। একে চট্ করে 'তুমি' বলা কি সহজ ! হলই বা ফেরিওয়ালা।

'চার-আনা দামের প্যাকেট যদি নেন সেগুলি আরও ভালো হবে।' ফেরিওয়ালা একটু হেসে বলেছিল।

রেণু বলেছিল, 'না না, আপনি দু-আনারটাই দিন।'

ফেরিওয়ালা আর কিছু না বলে দু-আনার ধূপকাঠি দিয়ে চলে গিয়েছিল।

পরদিন দুপুরের একটু পরে ফেরিওয়ালা ফের এসে হাজির—'ধূপকাঠি'।

রেণু দোরের কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'আজ আর দরকার নেই আমাদের। কাল যা দিয়ে গিযেছিলেন, তা-ই পড়ে আছে।'

ফেরিওয়ালা বলল, 'অল্প করে কিছু নিন। কাল আপনাদের এখানে বউনি করায় আমার বিক্রি খুব ভালো হয়েছিল।'

বেণু হেসে বলল, 'এ কথা বোধ হয় সব বাড়িতেই একবার করে বলেন !'

ফেরিওয়ালাও হাসল, 'না না, সত্যি বলছি। আপনার হাতে প্রথম বউনি হওয়ায় কাল আমার খুব ভাল হয়েছে।'

এমন শুভলক্ষণ যে রেণুর মধ্যে আছে, সে কথা এর আগে কেউ তাকে বলে নি। ভারি ভালো লাগল ওর। বলল, 'দাঁড়ান। আমি পয়সা নিয়ে আসছি।'

সেদিন আর পয়সা চাইতে নতুন বউদির কাছে গেল না রেণু, পুরনো বউদের কাছেও নয়। ছোট একটা বার্লির কৌটোর মধ্যে দু-চার পয়সা করে নিজে যা সঞ্চয় করেছিল, তার থেকে একখানা দু-আনি বের করে নিযে এল।

ফেবিওয়ালা রঙিন কাগজে মোড়া ধূপকাঠির আর একটি প্যাকেট ওর হাতে দিয়ে গেল। কাঠিগুলি সব রেণু নিজে নিল না। বাড়ির বউঝিদেরও দুটি-চারটি করে বিলোতে লাগল। নতুন বউ বলল, 'খুব যে ফুর্তি ! এতক্ষণ ধরে কি গল্প হচ্ছিল ধূপকাঠিওয়ালার সঙ্গে !'

'বাঃ রে, কি আবার হবে।'

নীলিমা হেসে বলল, 'আমি সব শুনেছি।'

বড়গিন্নী ধূপকাঠিগুলি দেখে রাগ করতে লাগলেন : 'এই তো কালও কতকগুলো কাঠি কিনেছ নতুন বউমা। আজ আবার কেন মিছামিছি পয়সা নষ্ট করলে ?'

নীলিমা জবাব দিল, 'আজ আর আমি কিনি নি মা। রেণু তার নিজের পয়সায় কিনেছে।'

বড়গিন্নী জবাব দিলেন, 'নিজের পয়সা পরের পয়সা বুঝি নে বাপু। পয়সা তো সব এক জায়গা থেকেই আসে। বাড়িসুদ্ধ সকলেই যদি এমন বিলাসী হয়ে ওঠে তা হলেই হয়েছে।'

কিন্তু বড়গিন্নীর রাগ আর বকুনিতে রেণুর সেদিন মন খারাপ হল না। তাঁর কথার কোনও জবাব

দিল না রেণু। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ির কাজকর্ম সেরে, গা ধুয়ে, চুল বেঁধে, একখানা ধোয়া শাড়ি পরে নিজের ঘরে ধূপকাঠি জ্বালল।

রান্নাঘর আর ভাঁড়ারঘরের মাঝখানে ছোট্ট একটু খুপরির মতো জায়গা আছে। সেই ওর থাকবার ঘর। আগে অবশ্য দোতলায় একটি ঘরে ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ও থাকত। কিন্তু বাড়ির দুটি ছেলের বিয়ে হওয়ায় ও-বাড়িতে ঘরের খুব অনটন হয়েছে। রেণু নেমে এসেছে এই নীচের ঘরে। সন্ধ্যাবেলায় সে ঘরে এই প্রথম ধূপকাঠি জ্বালল।

খাওয়াদাওয়া চুকতে এগারোটা বাজল। সকলের ঘুমোতে বারোটা; কিন্তু রেণুর চোখে ঘুম নেই। সে একটার পর একটা ধূপকাঠি জ্বেলেই চলেছে।

তারপর রেণু প্রায়ই ধূপকাঠি রাখত। ধূপকাঠিওয়ালার সঙ্গে কিছু কিছু আলাপও চলত : এসব ধূপকাঠি কি নিজেরা তৈরি করা যায়, না বাজার থেকে কিনে আনতে হয় ; টাকায় কত লাভ থাকে, ধূপকাঠিওয়ালা কখন বেরোয় কখন ফেরে ; হলই বা মা আর ছেলের সংসার ; চলে কি করে—এই সব সাধারণ কৌতূহল, তুচ্ছ কথাবার্তা।

বড়গিন্নী এইটুকুকেই অতবড় করে সেদিন আপনার কাছে লাগিয়েছিলেন।

কিন্তু ব্যাপারটা গোপন রইল না। ধূপকাঠিওয়ালার সঙ্গে রেণুর এই ঘনিষ্ঠতা শুধু ওদের বাড়ির নয়, পাড়ার সকলেরই চোখে পড়ল। ধূপকাঠি এ পাড়ায় বিক্রি হোক আর না হোক, ছেলেটি রোজই আসে। রেণুও জানলার ধারে এসে দাঁড়ায়। রোজ দুজনের কথা হোক আর না হোক, যেন দেখা হলেই যথেষ্ট। সারাদিন নানা কাজকর্মের মধ্যে রেণু এই মুহূর্তটির জন্যে প্রতীক্ষা করে। রোজ সেই বিশেষ সময়টিতে জানলার কাছে আসে। এক প্যাকেট করে ধূপকাঠি নেয়। কিন্তু ফেরিওয়ালা আর পয়সা নেয় না। রেণুরও পয়সা দেওয়ার তেমন গরজ নেই। জানলার একটা শিক আপনিই ভেঙে গিয়েছিল (রেণু তাই বলে), কি সে নিজেই তুলে ফেলেছিল (চৌধুরীদের অভিযোগ তাই) জানি না,—সেই বড় ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে নাকি চায়ের কাপও রেণু ফেরিওয়ালার হাতে তুলে দেয়।

ব্যাপারটা নিয়ে যে পাড়ায় নানারকম কানাকানি, হাসাহাসি চলছে, তা আমিও লক্ষ্য করেছিলাম।

তারপর কালকের ঘটনার কথা বলি। শনিবারের অফিস, সকাল সকাল ছুটি হয়ে গেছে। বাড়িতে কাজ আছে বলে আমি আর কোথাও না গিয়ে তাড়াতাড়ি চলে এলাম। কিন্তু আমাদের গলির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে দেখি, এগুতে আর পারি নে। ভিড়—গোলমাল—হৈচৈ। সেই ধূপকাঠিওয়ালাকে ধরে চৌধুরীবাড়ির পালোয়ানের মতো দুটি ছেলে ঘুষির পর ঘুষি চালাচ্ছে। পাড়ার আর সব ছেলেবুড়োরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

ফেরিওয়ালা সেই মার ঠেকাতে ঠেকাতে বলছে, 'আগে আমার কথা শুনুন। আমরা বিয়ে করব ঠিক করেছি।'

পাড়ার সব মেয়ে-পুরুষ হো-হো করে হাসছে আর নানারকম ব্যঙ্গবিদ্রূপ করছে। একজন তরুণ ছেলে আর একটি তরুণীকে বিয়ে করবে, এর চেয়ে পরিহাসের ব্যাপার সংসারে যেন আর কিছুই নেই—যেহেতু ছেলেটি ফেরিওয়ালা, আর মেয়েটি বাড়ির ঝি।

ছেলেটির পক্ষ নিয়ে আমি দু-চার কথা বলতে যাচ্ছিলাম, লোকে এমন সব মন্তব্য শুরু করল যে, ঘরে চলে আসতে বাধ্য হলাম।

শেষ পর্যন্ত ওরা ছেলেটিকে আধমরা করে ঘাড় ধরে গলি থেকে বের করে দিল। বাণ্ডিল থেকে পড়া ধূপকাঠিগুলি রাস্তার ধুলোয় ছড়িয়ে রইল।

দাদার কাছে ব্যাপারটা বলায় তিনিও আমার ওপর একটু রাগ করলেন, 'তোর এসবের মধ্যে যাওয়ার কি দরকার ছিল?'

আমি আর যাই নি। কিন্তু রেণুই ও-বাড়ি থেকে কি করে যেন পালিয়ে আমার কাছে চলে এসেছে। সামনাসামনি বাড়ি। ওর সঙ্গে আমার সামান্য মুখচেনা ছিল। কিন্তু এখন ও আমাকে এমন করে ধরেছে যেন আমি ওর চিরকালের চেনা।

ওকে বলেছিলাম, 'তুমি যাও, কটা দিন চুপচাপ থাক, তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।'

কিন্তু রেণু বলল, 'না দিদি, যারা ওকে অমন করে মেরেছে, আমি তাদের বাড়িতে আর

একমুহূর্তও থাকব না।'

দাদা শান্তশিষ্ট নির্বিরোধ মানুষ। তিনি বড় বিব্রত বোধ করছেন। চৌধুরীরা শাসাচ্ছে পুলিস-কেস করবে। তাতে অবশ্য সুবিধা করতে পারবে না। বেণুর বয়স আঠারো উতরে গেছে। কিন্তু আইনটাইন তো সব সময় বড় কথা নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা প্রবলের হাতের অস্ত্র।

বেণুর অনুরোধে আপনাকে সব কথা খুলে জানালাম। ছেলেটির নাম ঠিকানাও ওর কাছ থেকে শুনে নিয়েছি। অজিত বিশ্বাস। বেলগাছিয়ার উদ্বাস্তু কলোনিতে থাকে।

আপনি যদিও চৌধুরীদের আত্মীয়, তবু আপনার ওপর বেণু খুব ভরসা রাখে।

সশ্রদ্ধ নমস্কার গ্রহণ করবেন।

অনধিকার-চর্চার জন্য আর একবার মার্জনা চাইছি। ইতি—

বিনীতা

মাধুরী সেনগুপ্ত

আশ্বিন ১৩৬০

ছোটদিদিমণি

অনেক ধরাধরি অনেক সুপারিশের পর শেষ পর্যন্ত পাড়ার বনমালী বিদ্যাপীঠে চল্লিশ টাকা মাইনের একটি চাকরি জুটে গেল রেবার

স্কুলের চাকরি কিন্তু মাস্টারী নয় কেরানীগিরী। রেবা বললে, 'আমাকে কোন ক্লাসে পড়াতে হবে না ?'

হেডমিস্ট্রেস মৃদু হেসে বললেন, 'না, চেঁচানীর পালাটা আমাদের উপরেই রইল, আজকালকার মেয়েরা বড় দুষ্টু, তাদের ম্যানেজ করা আপনার মত শান্তশিষ্ট মেয়ের কাজ নয়।'

কিন্তু প্রশংসায় রেবা তেমন যেন খুশি হল না। মুখভার করে বললে, 'তবে শুনেছিলাম আমাকে নিচের ক্লাসের অঙ্ক আর বাংলা পড়াতে হবে ?

হেডমিস্ট্রেস বললেন, 'না, সেক্রেটারীর সঙ্গে আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত আমরা মত বদলেছি।'

অফিস ঘরের বাঁদিকে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে একজন বুড়ো ভদ্রলোক টাকা আনা পাইয়ের হিসাব মিলাচ্ছিলেন। হেডমিস্ট্রেস তাঁর কাছে এসে বললেন, 'রামজীবনবাবু, একে কাজকর্ম একটু বুঝিয়ে দেবেন। আপনার এ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে ইনি কাজ করবেন। ক্রমে গার্লস সেকসনের সব কাজ ইনিই দেখবেন।'

রেবার বয়স সাতাশ আটাশ, দেখতে আর দু-এক বছর বেশিই দেখায়, স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়, রোগা ছিপছিপে চেহারা। গায়ের রং এখন আর গৌর বলা চলে না, ফ্যাকাসেই বলতে হয়। পরনে একখানি তাঁতের শাড়ি। হাতে শাঁখার সঙ্গে দুগাছি করে ক্ষয়ে যাওয়া চুড়ি। সিঁথিতে মোটা সিঁদুরের দাগ। হেডমিস্ট্রেস চলে গেলে রামজীবনবাবু রেবার দিকে তাকিয়ে সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'বসুন।' রেবা লজ্জিতভাবে চেয়ারটায় বসল।

রামজীবনবাবু বললেন, 'এই বুঝি প্রথম নেমেছেন চাকরিতে।'

রেবা মুখ নিচু করে বলল, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনি আমাকে তুমিই বলবেন।'

রামজীবনবাবু খুশি হয়ে বললেন, 'অনুমতি পেলেই বলতে পারি মা। তুমি কথাটা বলতে আর

কেউ বলে না, এখানে মেয়ের বয়সী তো ভাল আমার নাতনীর বয়সীরাও সব কাজ করে।'

বৃদ্ধের অভিযোগের ধরনে মুখ নিচু করে হাসি গোপন করল রেবা। রামজীবনবাবু বললেন, 'কিছু মনে ক'র না মা, বুড়ো মানুষ, বড় বেশি কথা বলবার অভ্যাস। যাকে পাই, তার সব কথা জানতে ইচ্ছে করে। সংসারে কে কে আছেন তোমার, স্বামী আছেন তাতো বুঝতেই পারছি। কি করেন তিনি ?'

রেবা একটু ইতস্তত করে বললে, 'একটা ডিসপেনসারীর কম্পাউণ্ডার।'

রামজীবনবাবু বললেন, 'শুধু তার আয়ে চলে না বুঝি ?'

একটু অনুচিত কথা বলে ফেলেছেন বুঝতে পেরে তিনি তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললেন,'কিছু মনে ক'র না মা। তোমাদের ছেলে মেয়ে কটি ?'

রেবা লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করে বলল, 'পাঁচটি। বড়টি ছেলে, স্কুলে পড়ে ক্লাস সিকসে। আর সব ছোট। তাদেব স্কুলে দেইনি।'

রামজীবনবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'সংসারে আর কে কে আছেন—শাশুড়ী ননদ ?'

রেবা মাথা নেড়ে বললে, 'না তাবা কেউ নেই।'

রামজীবনবাবু বললেন, 'তাহলে তোমাব বাচ্ছা ছেলেমেয়েগুলোকে কে দেখবে ? তোমার স্বামী, তিনি বুঝি সকালে বাড়িতে থাকেন ?'

রেবা বললে, 'না, তাঁকে সকালেই বেরোতে হয়, ন-বছরের মেয়ে আছে। তার ওপরেই ভাই বোনেদেব দেখাশোনার ভাব দিয়ে এসেছি।'

ঢং ঢং করে দেয়ালেব ঘড়িতে আটটা বাজল, রামজীবনবাবু তাড়াতাড়ি হিসাবের খাতায় চোখ দিলেন। রেবাকে বললেন 'সোমবার থেকেই তোমায় কাজকর্ম বুঝিয়ে দেব মা। আজ শনিবার, আজকেব দিনটায় কোন কাজ আবম্ভ করবাব পক্ষে প্রশস্ত নয়। তাছাড়া খানিক বাদে আজ ছুটিও হয়ে যাবে।'

পূবেব দিকে সাবি সাবি দুটি কাচের আলমারি। একটাব ভিতবে বই, আর একটার ভিতরে বড একটা গ্লোব দেখা যাচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের ভূগোল শেখাতে এটা দরকার হয তা রেবা জানে। কিন্তু বিশ্ব গোলক থেকে এক মুহূর্ত বাদেই দৃষ্টি বাইরে গিয়ে পড়ল। সশব্দে একখানা যাত্রী-বোঝাই বাস চলে গেল বাস্তা দিয়ে, জানলাব শিকের ফাঁকে তা দেখতে দেখতে বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল রেবাব। ছেলেমেযেগুলো বড দুবন্ত হয়েছে। কেউ গাড়িঘোড়া না চাপা পড়ে।

ডিহি শ্রীরামপুব রোডেব যে গলিটায় রেবারা থাকে তাব মধ্যে গাড়িঘোড়া বড় একটি ঢোকে না, ঢুকতে পাবে না। কিন্তু না পাবলেই বা কি,বাড়ির ভিতবেই কি বিপদ আপদের ভয কম, মিণ্টু রিণ্টু সব সময়ই কলেব কাছে থাকতে চায়। কলতলাটা এমন পিছল হয়েছে,একবার আছাড় খেয়ে পডলেই হল। তাহলে হাতপা আর কারো আস্ত থাকবে না। লতুর কি সাধ্য আছে ওদের সামলে রাখাব, রেবা নিজেই হযবান হয়ে যায়।

স্কুল থেকে বাসা বেশি দূব নয়। একটু জোবে পাযে হেঁটে গেলে মিনিট দশেকের মধ্যেই পৌঁছান যায়। কিন্তু বেশি জোবে হাঁটার অভ্যাস রেবার নেই, শক্তিও কম।

স্কুল থেকে ফিরে স্বামীর সঙ্গে দেখা হল। দুপুরবেলা, অজয় এসময়ে খেতে আসে। তালতলা থেকে গোবরা কম বাস্তা নয়, কিন্তু এতটা পথ দুপুব রোদে হেঁটেই আসতে হয় অজয়কে। বাস-ট্রামেব বাবুগিরি করা চলে না। এমনিতেই কালো রঙ্। বোদে পুড়ে এ সময়টা একেবারে অঙ্গারেব মত চেহাবা হয়।

রেবা কাছে এসে হাতপাখাখানা নাড়তে নাড়তে স্বামীর দিকে তাকিয়ে কোমল স্ববে বলল, 'ঈস ঘামে যে একেবারে নেয়ে উঠছ। কাল থেকে তোমার আর এতটা পথ হেঁটে আসার দরকার নেই। ট্রামে এস।'

অজয় মৃদু হেসে বলল, 'ট্রামে, আমি ভেবেছিলাম, বুঝিবা ট্যাকসির কথাই বলবে।'

রেবা বলল, 'আহা। বললেই বা ক্ষতি কি, আজ না হোক একদিন হতেও তো পারে। চিরকালই যে এমনি অবস্থা থাকবে তার কি কথা আছে।'

অজয় বলল, 'তাতো ঠিকই, তুমি যখন প্রমোশন পেয়ে পেয়ে হেডমিস্ট্রেস হবে ; ভাল কথা এখন তোমার পোস্টটা কিসের , বড়, মেজো, সেজোদের পরে তুমি কোন্‌টি, রাঙা না পাটকেলে ? কোন্ ক্লাসে পড়াতে দিয়েছে তোমাকে ?'

রেবা গম্ভীর মুখে বললে, 'কোন ক্লাসেই না। আমাকে অফিসের কাজে—মানে কেরানীগিরি করতে হবে।'

অজয় বলল, 'ভালোই তো।'

রেবা বলল, 'ভালো না ছাই ! স্কুলে ঢুকে যদি পড়াতেই না পারলাম, তা হলে আর কি হল।'

প্রথম কয়েক দিনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলাপ আলোচনা চলল, এই বাড়তি চল্লিশ টাকা আয়ে সংসারের কোন সুখ-সচ্ছন্দ্য বাড়ান হবে।

অজয় বলল, 'বাইবে বেরোবার মত তোমার তো ভাল শাড়ি নেই। তুমি একখানা ভাল শাড়ি কিনে নিও।'

রেবা বলল, 'হুঁ তাই বুঝি। আগে তোমার জুতো, শিবুদের জামা, প্যাণ্ট, তারপর শাড়ির কথা ভাবা যাবে। আরো অনেক জিনিসপত্তর কিনতে হবে সংসারের, থালা-বাসন, আলনা, আলমারী একেক মাসে একেকটা করে কিনব।'

অজয় বলল, 'কিনে রাখবে কোথায়, যা বাড়ির অবস্থা !'

তা ঠিক। বাড়ি পুরনো। আব বেবাদের একতলার ঘরখানা বড়ই স্যাঁতস্যেঁতে। আর অন্ধকার। এমন ঘরে থাকার জন্যই ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ভাল হচ্ছে না। সুবিধামত এবার ভাল একটা নতুন বাড়ি দেখে, আলো-হাওয়া-ভরা সুন্দর একখানা ঘরে উঠে যাবে রেবারা।

কিন্তু এই নিভৃত মধুব দাম্পত্যালাপ বেশি দিন স্থায়ী হল না। মাস কয়েকের মধ্যেই গোলমাল শুরু হল, গোলমালটা বাধল বড ছেলে শিবুকে নিয়ে। বছর এগারো বয়স হয়েছে শিবুর। নাক-চোখেব গড়নটা অনেকটা মায়েব মত টানা টানা, গায়ের রঙও ফর্সা। কিন্তু মায়ের সঙ্গে তার আকৃতির মিল খানিকটা থাকলেও স্বভাবেব মিল তেমন নেই। শিবু দুষ্টু আর দুরন্ত। স্কুলেব টার্মিনাল পবীক্ষায় অনেকগুলি বিষয়ে শিবু এবারে ফেল করে বসল।

অজয় চটে গিয়ে বলল, 'করবে না কেন ? ওকি পড়ে ? সারা সকালটা ঘুরে ঘুরে আড্ডা দিয়েই বেড়ায়।'

শিবুর ছোট বোন লতা সাক্ষ্য দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ মা তাই। দাদা একটুও বাড়ি থাকে না। তুমি বেবোবার সঙ্গে সঙ্গেই বইপত্র রেখে চলে যায়। বস্তির ফটিক আর মদনের সঙ্গে চাকতি খেলে। আমি যদি বলি যাসনে যার্সনে আমার মাথায় গাঁট্টা লাগিয়ে দেয়। আমার কথা মোটেই শোনে না মা।'

রেবা ধমক দিয়ে বলল, 'থাক বাবা তোব আর গিন্নীপনা করতে হবে না। তারপর স্বামীর দিকে মুখ ঘোরালো রেবা। ছেলে আড্ডা দিয়ে বেড়ায় জান তো প্রতিকার ক'র না কেন ? শাসন ক'ব না কেন, সকালে বসে এক-আধ ঘণ্টা পড়ালেও তো পার, তাও তো দেখি না কোনদিন।'

অজয় বলল, 'হুঁ কত সময় আছে পড়াবার, চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে এখন ছেলে পড়াতে বসি। তোমার ঐ চল্লিশ টাকায় সারা গুষ্টির পেট ভরবে না।'

রেবা চুপ করে থাকে। জিভের ডগায় এসে পড়া খুব একটা কঠিন কথা কোন রকমে সামলে নেয়। রেবার চল্লিশ টাকা কেন, এতগুলো মানুষের পেট অজয়ের আশি টাকায় ভরে না। এতদিন তো প্রায় আধপেটা খেয়েই কেটেছে। রেবা মাসে মাসে চল্লিশ টাকা করে আনবার পর দু-বেলা দু-মুঠো জুটছে বাচ্ছাগুলোর। না, নিজের মাইনে দিয়ে সংসারের আর কোন স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে পারেনি রেবা। ভালো শাড়ি পরে যেতে পারেনি, দামী আসবাবপত্র কিনতে পারেনি। শুধু খোরাক পোশাকটা একটু ভদ্রলোকেব মত করার চেষ্টায় সব টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে। আগে এই চল্লিশ টাকা না হলেও চলত। এখন আর চলে না।

শিবুকে ধরে এনে সেদিন আচ্ছাকরে মার লাগাল রেবা। তার পাঁচ আঙুলের দাগ ছেলের দুই গালে ফুটে উঠল।

'সকালবেলায় খেলতে যাবি আর কখনও ? মিশবি আর ঐ বস্তির ছেলেদের সঙ্গে ?'

পিঠে আরো কয়েকটা কিল চড় পড়ার পর শিবু কাঁদতে কাঁদতে বলল, না সে আর ফটিক মদনের সঙ্গে মিশবে না। মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করবে।

চাকবি করতে এসে এখন আর এত কাজ করা যায় না। তবু চাকরি না করেও উপায় নেই। দিন কয়েক বাদে অফিস ঘরে রামজীবনবাবু বললেন, 'বড় দুঃখের কথা মা, বললে তুমি কষ্ট পাবে। কিন্তু হিতৈষী হিসাবে কথাটা তোমার কাছে আমার গোপন কবা উচিত নয়।'

বেবা বলল, 'গোপন করবেন কেন, কি হয়েছে বলুন।'

স্কুলে আসবার পথে শিবুকে তিনি বিড়ি টানতে দেখেছেন। বস্তির সেই মার্কামারা বকাটে ছেলেও তার সঙ্গে আছে, রামজীবনবাবু ধমক দিতে শিবু বুড়োকে দুটো বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ছুট দিয়েছে।

ছোট্ট কৌটোটা থেকে নস্যি নিতে নিতে রামজীবনবাবু বললেন, 'হাসিও আসে মা, আবার দুঃখও হয়। লেখাপড়াটা সব সময় বড় কথা নয়। কারো হয় কারো হয় না। কিন্তু স্বভাব চরিত্র যদি এই বয়সে বিগড়ে যায়, তাতো আর ফেবান যাবে না মা, ছেলের দিকে নজব রাখ।'

স্কুলে যতক্ষণ রইল রেবা গম্ভীরমুখে কাজকর্ম শেষ করল। তারপর বাড়ি গিয়ে দুপুরবেলায় স্বামীকে ঝাঁঝাল গলায় বলল, 'শুনেছ তোমার ছেলের কীর্তি ?' রামজীবনবাবু যা বলেছিলেন সব সবিস্তারে অজয়কে জানালো রেবা।

অজয় মাথায় তেল মাখতে মাখতে নির্বিকার ভঙ্গিতে বললে, 'আরো কত শুনব। তুমি তো ছোট দিদিমণি হয়েছ তাতেই আমাব আনন্দ। তুমি তো রঙিন শাড়ি পর, নিত্য নতুন ধাঁচে খোঁপা বেঁধে স্কুলে চাকবি কবতে যেতে পাবছ তাতেই আমাব সুখ। ছেলে বয়ে গেলে বা বকাটে হলে তোমার কি আসে যায় ?'

বেবা অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করে দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইল।

অজয়ের কথাব জবাব দিতে গেলে তার সঙ্গে এই ভর দুপুর বেলায় ঝগড়া বেঁধে যাবে। ভিতরেব বাইরেব যত জ্বালা সব কিছুব শোধ অজয় স্ত্রীর ওপর দিয়ে নেয়। বাইরে এত শান্ত, শান্তিপ্রিয় বলেই ঝগড়া বিবাদের সবটুকু স্পৃহা স্ত্রীর উপব দিয়ে মেটায় অজয়। নইলে ছেলে বকাটে হওয়ার সব দোষ অজয় স্ত্রীর উপর চাপাব কি কবে ? সেও তো বাপ। সেও কি পারে না ছেলেকে ধমকাতে, শাসন করতে! ছেলের শিক্ষা দীক্ষা চরিত্র গঠনের দায়িত্ব কি তার উপরেও নেই ? কিন্তু টাকা রোজগাবের অজুহাতে অজয় সেসব দায়িত্ব এড়িয়ে যায়। ভোর হতে না হতে স্ত্রীর আগেই যে তার ছোট ব্যাগটি নিয়ে বেবিয়ে পড়ে। কয়েকটি গরীব নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার তার চেনা আছে। তাদের কারো অসুখ বিসুখ হলে, ইনজেকসন দেওয়ার দরকার হলে অজয়কেই তারা ডাকে। এক টাকা কি বারো আনা ফি দিতে হয় তাকে, তাও বাকি থাকে। সেই বাকি-বকেয়া আদায়ের অজুহাতেও রোজ বেরোয। আব একটা অজুহাত আছে। এক ইনসিওরেন্স কোম্পানীর দালালী নিয়েছে অজয়। বছরে দু-একটার বেশি কেস দিতে পারে না, কিন্তু তাবজন্য রোজই বেরুনো চাই। অজয় বলে, 'ঘরে বসে নিজের ছেলেমেয়ে আগলালে আমাকে পয়সা দেবে কে। বাইরে বেরুলে নগদ কিছু আসুক আব না আসুক ভবিষ্যতের আশা থাকে।

ছেলেমেয়েরা আরো বড় ভবিষ্যৎ সেকথা অজয়কে কে বোঝাবে। বলে বলে রেবা তো হার মেনেছে।

রেবার ছোট দিদিমণি নামটা দিয়েছে স্কুলের ঝি সুধা। স্কুলের অনেক টিচারেব চেয়েই রেবা বয়সে বড়। কিন্তু চাকরি নিয়েছে সব চেয়ে শেষে। মাইনে সবচেয়ে কম, পদমর্যাদায় কনিষ্ঠ।

তাই বোধ হয় সুধার এ সম্বোধন মনে এসেছে। আর তার মুখ থেকে কথাটা শিখে নিয়েছে ছাত্রীরা। তারাও রেবাকে ছোট দিদিমণি বলে ডাকে। স্কুলে চাকরি নিয়ে মিণ্টু রিণ্টুকেও সেখানে ভর্তি করে দিয়েছে রেবা। একজন ক্লাস টুতে আর একজন ওয়ানে।

স্কুলের অফিস ঘরে বই স্লেট বগলে করে এসে একদিন রিণ্টু বলেছিল, 'ছোট দিদিমণি আমি বাড়ি যাচ্ছি।' তার পরই মুখে হাত চাপা দিয়ে খিল খিল করে এই হাসি।

মেয়ের কাণ্ড দেখে রেবা তো অবাক! তারপর সে নিজেও হেসেছিল, 'তুইও আমাকে ছোট

দিদিমণি বলবি।'

বিণ্টু লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'বারে ক্লাসে সবাই যে বলে। আমার একা একা মা বলতে লজ্জা করে।' সেদিন স্বামীর কাছে সেই গল্প হাসতে হাসতে করেছিল, 'শুনেছ মেয়ের কাণ্ড? ওরাও আমাকে ছোট দিদিমণি বলতে শুরু করেছে।'

অজয় হেসে বলেছিল, 'ভালই তো, আমিও তোমাকে ছোট দিদিমণি বলে ডাকব। ও ছোট দিদিমণি এককাপ চা দেবে?'

রেবা লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'যাঃ, অসভ্য কোথাকার। ওরা যদি কেউ শুনে ফেলত। তোমার যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে।'

কিন্তু সেদিন যা ছিল কৌতুক, আজ অজয়ের মুখে তাই নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে রূপান্তরিত হয়েছে। রেবার সর্বাঙ্গ জ্বলে যেতে লাগল।

শিবুকে ডেকে ফের শাসন করল রেবা। তার গালে সশব্দে গোটা দুই চড় কষিয়ে দিয়ে বলল, 'আর বিড়ি খাবি? আর মিশবি ঐ বস্তির ফটিক আর মদনের সঙ্গে?'

শিবু দাঁতে দাঁত পিষে বললে, 'হারামজাদী, আমার ওপর দিদিমণিগিরি ফলান হচ্ছে।' মিণ্টু বলল 'বলে দেব দাদা? মাকে বলে দেব?' বলে দিতে হল না, ঘরের ভিতর থেকেই রেবা ছেলের কথা সব শুনতে পেল। কিন্তু শুনতে পেয়েও আর টুঁ শব্দটি করল না রেবা। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া আর ছেলেমেয়েদের মারধোর করে এখন ভারি ক্লান্তি লাগছে। আর যেন সয় না, এ দেহ যেন আর বয় না। আবার একটা শত্তুর আসছে।

শত্তুরই তো, শত্তুর ছাড়া কি।

ছেলের পড়াশুনার তত্ত্বাবধানের আর চরিত্র শোধরাবার জন্যে চট করে চাকরিটা যে ছেড়ে দেবে রেবা একথা সে ভাবতেই পারে না। ছেড়ে দিলে আবার অভাব অনটনের মধ্যে পড়তে হবে। কত কষ্টে এইটুকু জুটেছে। এ কি ছেড়ে দেওয়া যায়? বরং চাকরি যাতে স্থায়ী হয় তার জন্যে চেষ্টার অন্ত নেই রেবার। সকলের আগে স্কুলে যায়, সকলের শেষে হেডমিস্ট্রেস চলে এলে তারপর বেরোয়। কি জানি তার কখন কি দরকার হবে, কখন রেবার ডাক পড়বে তার কি কিছু ঠিক আছে? খাতাপত্র গুছিয়ে স্কুল থেকে বেরোতে বেরোতে বারটা বেজে যায়। তার ঘণ্টাখানেক আগে কলেজ সেকসন শুরু হয়। মেয়েরা বেরিয়ে যাওয়ার পর কলরব করতে করতে বইখাতা বগলে করে কচি কচি ছেলেরা স্কুলে ঢোকে। তরুণ প্রবীণ নানা বয়সের শিক্ষক আসেন। রেবা যে ঘরে বসে কাজ করে সেই ঘরেই তাঁরা প্রথম এসে ঢোকেন। এইটাই তাদের বসবার আর বিশ্রামের ঘর। এখনো পার্টিশান দিয়ে আড়াল করা হয়নি।

শুধু রেবার চেয়ার টেবিল আর খাতাপত্র রাখবার আলমারী উত্তর দিকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অপরিচিত পুরুষদের সামনে আগে ভারি আরষ্ট হয়ে থাকত রেবা। কাজ করতে ভারি অসুবিধা বোধ করত। কিন্তু ক্রমে সবই অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।

'একি আপনি এখনও রয়েছেন।' ঘরে ঢুকে সুনীলবাবু সেদিন জিজ্ঞাসা করলেন। তার কথার মধ্যে শুধু সৌজন্য ভদ্রতাই নয় বেশ একটু সহানুভূতিরও স্পর্শ পেল রেবা। কিছুদিন আগে এই টিচারটির সঙ্গে আলাপ হয়েছে। বছর ছাব্বিশ সাতাশ বয়স। বি এ বি টি পাশ করে এই স্কুলে এসেছে। শিবুদের ক্লাস টিচার। সেকথা জেনে রেবাই একদিন তার সঙ্গে আলাপ করেছিল। বেশ ভদ্র, সৌম্যদর্শন, ছাত্রদের খুব প্রিয় বলে খ্যাতি আছে স্কুলে।

রেবা তার কথার জবাবে মৃদু হেসে বলল, 'হ্যাঁ কাজ এখনও শেষ হয়নি।'

সুনীল একটু হাসল, 'রোজই তো দেখি আপনার কাজের খুব চাপ।

'হ্যাঁ, চাপটা একটু বেশি।' বলে রেবা শঙ্কিতভাবে এদিক ওদিক তাকাল। কেউ শুনে ফেলেনি তো? দেওয়ালেরও কান আছে।

তারপর এই ভয়টুকু ধরা পড়ায় নিজেই যেন একটু লজ্জিত হল রেবা, প্রসঙ্গ পালটে নিয়ে বলল, 'তারপর আপনার ছাত্রের খবর কি? কিছু পরিবর্তন-টর্তন বুঝতে পারলেন?'

ছাত্র বলতে রেবা কাকে বোঝাচ্ছে তা সুনীল জানে। জবাব দিতে গিয়ে তার হাসিমুখ একটু

গম্ভীর হল। সুনীল বলল, 'আপনি আমাদেব কলীগ, আপনাকে সুখবব দিতে পাবলে খুশিই হতাম মিসেস দাস। কিন্তু আপনাকে মিথ্যে বলে তো লাভ নেই। শিবুব পবিবর্তনটা মোটেই ভালোব দিকে হচ্ছে না। ওব দুষ্টুমি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। আব বেছে বেছে যত সব খাবাপ ছেলেব সঙ্গে ওব বন্ধুত্ব। ভাল এসোসিয়েশন ওব পক্ষে দবকাব।'

বেবা বলল, 'কিন্তু তা পাই কোথায়। আচ্ছা ওদেব ক্লাসেব ফার্স্ট বয় কে?'

সুনীল বলল, 'সমীব ব্যানার্জী। এখানকাব ডাঃ ব্যানার্জীব ছেলে। উবা তো আপনাদেব পাড়াতেই থাকেন। ছেলেটিব সঙ্গে আপনাব বুঝি আলাপ নেই।'

সুনীল বলল, 'আচ্ছা আমি এক্ষুনি আলাপ কবিয়ে দিচ্ছি। ছেলেটি শুধু যে পড়াশোনায় ভালো তাই নয়, স্বভাব-চবিত্রেব দিক থেকেও চমৎকাব। বুদ্ধিমান, ধীব, স্থিব, শান্ত, বিনয়ী। শুধু ক্লাসে নয়, স্কুলেব মধ্যেও বেষ্ট বয়।'

বেবা সাগ্রহে বলল, 'একটু ডেকে আনুন না, দেখি আলাপ কবি।'

বেয়াবাকে দিয়ে সমীবকে ডেকে পাঠালো সুনীল। শিবুব চাইতে ছোটই হবে। বছব নয়েক বয়স। ছিপছিপে ফর্সা সুন্দব চেহাবা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। পবনে শার্ট আব হাফ প্যান্ট, খুব দামী কাপড়ে অর্ডাব দিয়ে তৈবি। চমৎকাব মানিয়েছে। হাতে একটা লাল পাথব বসানো আংটি। বোধ হয় জন্মদিনে মা কি আব কাবো কাছ থেকে উপহাব পেয়েছে।

সুনীল বলল, 'এব কথাই বলছিলাম, এব নামই সমীব। আব ইনি—'

সমীব মৃদু মিষ্টি হেসে বলল 'ওঁকে আমি চিনি ছোট দিদিমণি।'

বেবা একটু লজ্জিত হল। সমীব তাব শিবুব বয়সী। পাড়া সম্পর্কে ডাকলে মসীমা বলেই ডাকত। কিন্তু স্কুল সম্পর্কে বেবা তাব ছোট দিদিমণি। কথাটা বলে ফেলে সমীব যেন একটু লজ্জা পেল।

বেবা বলল, 'তুমি শিবুকে চেন?'

সমীব বলল, 'হ্যাঁ, ওতো আমাদেব সেকসনেই পড়ে।'

'ওব সঙ্গে তোমাব ভাব আছে?'

এ কথাব জবাবে সমীব একটু চুপ কবে থেকে বলল, 'ওতো আমাদেব সঙ্গে মেশে না।'

বেবা বলল, 'ও না মিশলে তোমবা জোব কবে মিশবে। শুধু নিজেব ভাল হলেই হবে না, ক্লাসসুদ্ধ, স্কুলসুদ্ধ ছেলেদেব ভাল কবে তোলাও তোমাদেব কাজ।'

সমীব স্মিত মুখে চুপ কবে বইল। বেবা তাকে নিজেব বাসাব ঠিকানা দিল, যাওযাব জন্য বাব বাব অনুবোধ কবল, সমীব শেষ পর্যন্ত বলল, 'আচ্ছা যাব।'

সমীবেব বাবা ডাঃ এস কে ব্যানার্জীব সঙ্গেও এই অফিস রুমেই একদিন আলাপ হল বেবাব। আলাপ হল মানে কবল। তিনি স্কুল কমিটিব একজন মেম্বাব। মাঝে মাঝে স্কুলে আসেন। তাঁব একটি মেয়েও এই স্কুলে পড়ে। তাব সম্বন্ধে হেডমিস্ট্রেসেব সঙ্গে কি আলাপ কবতে এখানে এসেছিলেন। বামজীবনবাবুকে আগেই বেবা অনুবোধ কবে বেখেছিল। তিনি মধ্যবর্তী হয়ে পবিচয় কবিয়ে দিলেন, 'ডাঃ ব্যানার্জী, আমাদেব মিসেস দাস, আপনাব সঙ্গে একটু কথা বলতে চান।' এই বোগা শীর্ণ কেবানী মেয়েটি তাব সঙ্গে কি কথা বলবে ডাঃ ব্যানার্জী প্রথমটা ভেবে পেলেন না। বেবাব সামনে চেয়াবটা টেনে নিয়ে একটু বিস্মিতভাবেই বললেন, 'কি ব্যাপাব বলুন তো।'

বেবা লজ্জিত ভাবে তাব দিকে তাকাল। বছব চল্লিশেক বয়স। স্বাস্থ্যবান, লম্বা-চওড়া পুরুষ, সুপুরুষ। দামী সুটটি চমৎকাব মানিয়েছে।

বেবা একটু ইতস্তত কবে বলল, 'আপনাব ছেলেব সঙ্গে সেদিন আলাপ হল। সমীব খুবই ভাল ছেলে।'

ডাঃ ব্যানার্জী মৃদু হেসে বললেন, 'ও।'

বেবা একটুকাল চুপ কবে বইল। এব পব কি বলা যায় যেন ভেবে পেল না।

ডাঃ ব্যানার্জী কিছুটা কৌতুকেব সঙ্গে বললেন, 'আপনি কি শুধু এই জন্যই আমাকে ডেকেছিলেন? আমার কিন্তু এখন থেকেই পুত্রনামে ধন্য হওয়াব ইচ্ছা নেই। যতটুকু পাবি স্বনামধন্য

হতে চেষ্টা করি।'

রেবা মনে মনে ভাবল এদিক থেকে ডাঃ ব্যানার্জী আর তার স্বামীর মধ্যে মিল আছে কিন্তু দু'জনের দুই ছেলের মধ্যে কি তফাৎ।

ডাঃ ব্যানার্জীর কথার জবাবে রেবা কিন্তু এবার নিরুত্তর রইল না, তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার ছেলে খুব ভালো তাই এই কথা বলতে পারছেন। ছেলে যদি খারাপ হত তাহলে দেখতেন স্বনামধন্য হয়েও আনন্দ নেই।'

রেবার গলা শান্ত করুণ গম্ভীর। সে যেন স্কুলের একটি সাধারণ তুচ্ছ কেরানী নয়। এক গভীর বিষাদময় ট্র্যাজেডির নায়িকা, খারাপ বকাটে ছেলের মা।

ডাঃ ব্যানার্জী এবার সোজা হয়ে বসলেন, রেবার দিকে কৌতূহলী হয়ে তাকালেন। বললেন, 'আপনারও বুঝি ছেলে আছে।'

রেবা বলল, 'হ্যাঁ, আপনার ছেলের মত ভাল নয়।' রামজীবনবাবু শিবুর পরিচয় দিয়ে বললেন, 'ছেলেটিকে কিন্তু কিছুতেই শোধরানো যাচ্ছে না ডাক্তারবাবু।'

ডাঃ ব্যানার্জী সহানুভূতির স্বরে বললেন, 'বড় দুঃখের কথা। আপনি ভাববেন না মিসেস দাস। পরে ঠিক হয়ে যাবে।'

রেবা বলল, 'আচ্ছা আপনি কি নিজেই ছেলেকে পড়ান?'

ডাঃ ব্যানার্জী হেসে বললেন, 'তেমন একটা সদিচ্ছা ছিল, কিন্তু সে সময় কই মিসেস দাস। জীবিকার দায় বড় দায়। টিউটর রেখে দিয়েছি। এই স্কুলেরই এ্যাসিসট্যান্ট হেডমাস্টার। আপনিও তো একজন—'। বলেই থেমে গেলেন।

রেবা বলল, 'আমার সে ক্ষমতা নেই ডাঃ ব্যানার্জী। আমি আপনার ছেলের সাহায্য চাই। সমীর যদি আমাদের বাসায় যায়, শিবুর সঙ্গে মেশে, পড়াশুনা নিয়ে ওর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে। আপনি সমীরকে একটু বলে দেবেন—'

ডাঃ ব্যানার্জী বললেন, 'বেশ তো তাতে আপত্তির কি আছে। আপনিও মাঝে মাঝে ছেলেকে নিয়ে যাবেন আমাদের বাড়িতে। আমরা তো কাছেই থাকি, আপনি গেলে মিসেস ব্যানার্জীও খুব খুশি হবেন আপনার সঙ্গে আলাপ করে আনন্দ পেলাম মিসেস দাস। I have found a genuine mother in you. আমাদের ছেলে মেয়ে হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমরা মা বাপ হতে পারি না।'

রেবা লজ্জিতভাবে মাথা নিচু করে রইল। ডাঃ ব্যানার্জী নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন।

ডাঃ ব্যানার্জীর আমন্ত্রণে রেবা একদিন গিয়ে তাঁদের বাড়িতে বেড়িয়ে এল। কাছেই, গোবরা রোড়ে, বড় বাড়ি। দামী ফার্নিচার আসবাবপত্রে সাজানো। মিসেস ব্যানার্জী সৌজন্যের সঙ্গে বললেন, 'আসুন আসুন। আপনার কথা সমীর আমাকে বলেছে। ওঁর মুখেও শুনেছি আপনার প্রশংসা।'

মিসেস ব্যানার্জী ঠোঁট টিপে হাসলেন। রেবা লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমার প্রশংসা করবার কিছু নেই। প্রশংসা আপনার প্রাপ্য—আপনি সমীরের মা।'

মিসেস্ ব্যানার্জী বললেন, 'আপনি ওই কথা বলছেন? কিন্তু আমার পাড়াপড়শী,—বন্ধু-বান্ধব কেউ সে কথা বিশ্বাস করতে চায় না, তারা বলে আমাকে নাকি সমীরের দিদির মত দেখায়।' বলে মধুর কণ্ঠে হেসে উঠলেন মিসেস ব্যানার্জী।

রেবা তাকিয়ে দেখলো—সত্যি তাই মনে হয়। এবং যাতে মনে হয় সে চেষ্টাও মিসেস ব্যানার্জীর আছে। বয়স তিরিশের কম হবে না। কিন্তু দেখে মনে হয় যেন বিশ বাইশ বছরের একটি অনূঢ়া মেয়ে। সিঁথিতে সামান্য সিঁদুরের আভাস দেখা যায় কি যায় না। পরনে চড়া রঙের শাড়ি, নিপুণ করে বাঁধা বড় খোঁপা, সুন্দর স্বাস্থ্য। ছেলে মেয়ে হয়েছে বলে যেন মনেই হয় না। মিসেস্ ব্যানার্জী বাড়ির সবগুলি ঘর ঘুরে ঘুরে রেবাকে দেখালেন। শোয়ার ঘর, বসবার ঘর, খাবার ঘর, ঘরের যেন শেষ নাই। দামী দামী সব আসবাব, রঙীন পর্দা, টেবিল ঢাকনি। কাঁচের আলমারিতে কত জায়গার কত রঙীন জিনিস। শ্বেতপাথরের, কালো পাথরের, কত রকমের কত মূর্তি। শিব, বিষ্ণু, বুদ্ধ,

নটরাজ। সেই সঙ্গে মাছ, হরিণ আরো নানা রকমের সুন্দব সুন্দব সব পশু পাখি। মিসেস্ ব্যানার্জী সব নাম বলে যেতে লাগলেন, কোনটা কোন জায়গা থেকে কত দাম দিয়ে কিনেছিলেন তার ইতিবৃত্ত শোনালেন। বুড়ো শাশুড়ী, বিধবা ননদ আর নিজেব মেযে ডলির সঙ্গে পবিচয কবিযে দিলেন মিসেস্ ব্যানার্জী। বছব সতের বযস-এব মধ্যে নাচতে গাইতে খুব ওস্তাদ হযে উঠেছে ডলি। মিসেস্ ব্যানার্জীব ইচ্ছা নয নিজেব ছেলে মেযেকে অমন একটা সাধারণ স্কুলে ফেলে বাখা। কিন্তু স্কুলেব প্রেসিডেন্ট সেক্রেটাবী হেডমাস্টাব সবাই এসে ধবে পড়েছেন। সেক্রেটাবীব সঙ্গে তাঁদের আবাব একটু আত্মীযতাও আছে। অবশ্য স্কুল নামমাত্র। বাড়িতে দুজনেব জন্যই আলাদা আলাদা টিউটবেব ব্যবস্থা কবতে হযেছে, তবু সামনেব বছব ও-স্কুলে মিসেস্ ব্যানার্জী ছেলেমেযেকে আব বাখবেন না, অন্য স্কুলে দেবেন।

যেতে যেতে দোতলাব আব একটি ঘবও দেখালেন মিসেস ব্যানার্জী। 'বলুন তো এটা কি।' তিনি হেসে বললেন। বেবা বলল, 'ঠাকুব ঘর নাকি ?'

তিনি বললেন, 'একবকম ঠাকুব ঘবই।'

ভেজানো দবজা ঠেলে দিযে ঘুবে ঢুকে বললেন, 'আমাব স্টুডিযো।'

এবাব বুঝতে পেরে বেবা বলল, 'আপনাব ছবি আঁকাবও সখ আছে নাকি ?'

'আছে অল্প স্বল্প।'

সম্প্রতি স্বামী আব ছেলেব পোর্ট্রেট এঁকেছেন। বেবাকে তাই দেখালেন মিসেস ব্যানার্জী।

বেবা মুগ্ধ হযে বলল, 'সুন্দব হযেছে।'

মিসেস ব্যানার্জি ব-।-লেন, 'আপনাব শিবুকে পাঠাবেন। ওব ছবিও এঁকে দেব। নতুন ধবনেব মডেল হিসেবে ও খুব চমৎকাব হবে, আমি ওকে দেখেছি। এতদিন অনেক শিব এঁকেছি। এবাব একটু শিবুকে আঁকবো।' তিনি মৃদু হাসলেন।

বেবা একটু চুপ কবে থেকে বলল, 'ছবি আঁকতে চান আঁকুন। কিন্তু ওকে আপনাবা ভাল কবে দিন মিসেস ব্যানার্জী। ও যেন সমীবেব মত হয।'

মিসেস ব্যানার্জী বোধ হয তাঁব মডেল আব ছবিব কথাই ভাবছিলেন। বললেন, 'সবাই যদি একবকম হবে মিসেস দাস তাহলে আব বৈচিত্র্য বইল কোথায ?' বেবা নিজে গরজ কবে সমীবেব পড়াব ঘবও দেখে এল। দক্ষিণ খোলা সুন্দব ছোট ঘব। টেবিল চেযাব বই-এব ব্যাকে সাজানো।

বেবাব অনুবোধে সমীব দু এক দিন গেল তাদেব বাসায শিবুব সঙ্গে আলাপ জমাবাব চেষ্টাও কবল। কিন্তু শিবু যেন ওকে তেমন আমল দিল না, এড়িযে এড়িযে গেল।

দো-ভাজা চিঁড়া চিনি আব নাবকোল মিশিযে একটি বাটিতে কবে সমীবেব সামনে এনে দিযে বেবা একটু হেসে বলল, 'তোমবা যা খাও তা তো দিতে পাবব না।'

সমীব লজ্জিতভাবে বলল, এ সবও আমাব খুব ভাল লাগে।'

কিন্তু ছেলেকে এমন সৎ বন্ধু জুটিযে দেওযাব চেষ্টা সফল হল না বেবাব। একদিন শোনা গেল খেলাব মাঠে সমীবকে শিবু গাঁট্টা মেবেছে আব যা নয তাই বলে গালাগালি কবেছে। আব সঙ্গে ছিল বস্তিব ফটিক আব মদন।

ছেলেকে ডেকে শাসন কবল বেবা, বলল, 'সমীবকে মেবেছিস কেন ?'

শিবু বলল, 'মাববো না ? ওব দোষেই তো আমবা অতগুলি গোল খেলাম। সবুজ সমিতিব কাছে হেবে গেলাম ম্যাচে। আমাদেব মান বইল কোথায। ও খেলতে জানে না তো ব্যাক হওযাব জন্যে অমন জেদ কবল কেন। ভাল ছেলে আব বড়লোকেব ছেলে হলেই বুঝি ভাল ব্যাক হওযা যায ?'

'তাই বলে তুই ওকে মাববি ?' বলে ছেলেব গালে ঠাস কবে এক চড় মাবলো বেবা।

দিন কযেক সমীব আব এল না। বেবা নিজেই গেল মিসেস ব্যানার্জীব সঙ্গে দেখা কবতে। খবব পেযে তিনি বসবাব ঘবে নেমে এলেন। তাঁব মুখ গম্ভীব। বেবা বলল, 'শিবুব জন্য আমি ভাবী লজ্জিত। কিন্তু আপনি সমীবকে আব যেতে দিচ্ছেন না কেন ?'

মিসেস ব্যানার্জী বললেন, 'ও নিজেই যায না।'

বেবা বলল, 'দেখা হলে আমি ওকে বুঝিযে বলব,আপনিও বলুন। ছেলেতে ছেলেতে মাবামারি কি হয না ?'

মিসেস্ ব্যানার্জী বললেন, 'তা হবে না কেন। কিন্তু আপনাব ছেলেব মুখেব যা ভাষা তা শুনলে কানে আঙুল দিযে থাকতে হয। অতি ছোটলোকেও ও-ধবনেব গালাগালি কবে না। আমি একদিন নিজেব কানে শুনেছি। তাছাড়া ওব সম্বন্ধে টিচাববা আমাব কাছে অনেকেই অনেক কথা বলেছেন, ওব গুণেব অবধি নেই। সব জেনে শুনে আমি তো আব ওদেব দলে যেতে দিতে পারিনে।'

বেবা মুখ নীচু কবে ফিবে এল। ছেলেব জন্যে তাব আব লজ্জা অপমানেব শেষ নেই। শিবুর ভাষা যে খাবাপ তা বেবা জানে। কিন্তু এ সব ও পেল কোথায় ?

অজয কোনদিন ওসব গালাগালি কবে না। এ ভাষা শিবুব মাতৃভাষাও নয। এই বস্তিব ছেলেদের কাছেই এসব কথা শিখেছে। বস্তি বাসেব চবম ফল ফলেছে ছেলেব ওপব দিযে।

বেবা স্বামীকে বলল, 'এ জাযগা ছাড়া না হলে ছেলেকে ফেবাতে পাববে না।'

অজয বলল, 'ছেড়ে যাব কোথায ? বালিগঞ্জে কে তোমাব জন্যে প্রাসাদ তৈবি কবে রেখেছে। এতো সস্তায ঘব আব কোথাযও পাওযা যাবে না। আমি কি খুঁজিনি মনে কব, কিন্তু যা ভাড়া শুনি তা আমাদেব সাধ্যেব বাইবে। অত টাকা ঘবভাড়া দিতে গেলে একবেলা না খেযে থাকতে হবে। পাববে তো থাকতে ? তখন আবাব বলবে চল, সেই বস্তিতেই চল।'

বেবা আব তর্ক কবল না। অজযেব কথা মিথ্যা নয। বেশি টাকা ঘবভাড়া তাবা গুণবে কি কবে। সব চেযে বাগ হল বেবাব ফটিক আর মদনেব উপব। একটিব বযস বাবো আব একটিব বযস চৌদ্দ। পড়াশুনা কিছুই কবে না,স্কুলে পাঠাবাব ক্ষমতা নেই ওদেব মা বাপেব। একটিব বাপ কেঠো-মিস্ত্রী আব একটিব বাপেব পেশাব কিছু ঠিক নেই। যা পায তাই কবে,বোধ হয চুবি জোযাচুবিও বাদ দেয না। তা সত্ত্বেও খবচ পোষায না ওদেব সংসাবেব। এই মার্কা-মাবা বকাটে ছেলে দুটিই হযেছে শিবুব ঘনিষ্ট বন্ধু। ওদেব মধ্যে কি দেখেছে সেই জানে। স্কুলেব পাড়াব ভালো ভালো ছেলেদেব সঙ্গ ছেড়ে শিবু ঐ বদ সঙ্গে মিশেছে। ঘুড়ি ওড়াতে ঘুড়ি বানাতে ওদেব জুড়ি নেই। আতসবাজী তৈবি কবতে ওবা ওস্তাদ। শিবুব মুখে ওদেব আবো অনেক গুণেব কথা শোনা যায। কিন্তু বেবা ওই ছেলে দুটিকে দুচক্ষে দেখতে পাবে না। ওবাই শিবুকে নষ্ট কবেছে। ওবাই তাব মাথা খেযেছে।

সমীবেব সঙ্গে গোলমাল হবাব পব দুই বন্ধু ফেব একদিন শিবুকে খুঁজতে এল। ছেলেকে বেবা বেশনেব দোকানে পাঠিযেছিল। 'শিবু কোথায মাসীমা ?'

কেন তাকে দিযে তোমাদেব কি দবকাব ? বেবা ঝাঁঝালো গলায বলল।

ফটিক ঢোক গিলে বলল, অমনিই ডাকছিলাম।' মদন আলাপ জমাবাব চেষ্টায মিষ্টি গলায বলল, আমাকে একগ্লাস জল দেবেন মাসীমা ?'

বেবা বলল তোমাদেব জন্য আমি জলছত্র খুলে বসেছি, না। বকাটে বদমাযেসেব দল আমাব ছেলেব মাথা তোবা চিবিযে খেযেছিস, তোদেব আবাব জল দেবো ? যা চলে যা এখান থেকে, ফেব যদি শিবুকে কেউ ডাকতে আসবি।'—তাড়া খেযে ছেলে দুটি পালিযে গেল।

'একটু বাদে শিবু বেশনেব ব্যাগ দুটো সশব্দে ঘবেব মেঝেয ফেলে দিযে বেবাব উপব রুখে উঠল, 'তুমি আমাব বন্ধুদেব অপমান কবলে কেন মা ?'

'বন্ধু ! ওই হতচ্ছাড়া ছেলে দুটো তোব বন্ধু !'

শিবু বলল, 'আলবৎ বন্ধু ! লোকে জল চাইতে এলে তুমি জল দাও না। তোমাব লজ্জা কবে না মা। এই তোমাব স্কুলেব দিদিমণিগিবি ?

এই শুনে বেবা ছেলেকে লাঠি নিযে তাড়া কবল, 'যা দূব হযে যা।'

কিন্তু এত শাসন এত তিবস্কাবেও কোন ফল হল না। বার্ষিক পবীক্ষায প্রথম ইংবেজী পবীক্ষাব দিন নকল কবিতে গিযে এ্যাসিসট্যান্ট হেডমাস্টাবেব হাতে ধবা পড়ল শিবু। হেডমাস্টাব ওকে কান ধবে স্কুল থেকে বাব কবে দিলেন। বললেন, 'কোন পবীক্ষাই আব ওকে দিতে হবে না'। সুনীল অনুবোধ কবে বলল, 'শিবু আমাদেব একটি কলীগেব ছেলে মাস্টাবমশাই।'

হেডমাস্টার বললেন, 'তা আমি জানি, সেই জন্যই আমাদের আরও স্ট্রিক্ট হওয়া দরকার।'

রেবা তখন স্কুলেই ছিল। সেকেণ্ড ক্লাসের মেয়েদের বাংলা পেপার শেষ হয়েছে। যত মেয়ে পরীক্ষা দিয়েছে খাতা ততগুলি ঠিক আছে কিনা তাই গুনে দেখছিল। এ কথা শোনার পর তার হাত কিছুক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে রইল। মনে হল ছেলেবেলায় শেখা শতকিয়া সে সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। পৃথিবীতে আর কোন সংখ্যা নাই, আছে শুধু শূন্য, আছে শুধু নিঃসীম অন্ধকার।

সুনীলবাবু এসে সহানুভূতি জানালেন। 'দুঃখ করবেন না মিসেস দাস—।'

রেবা একটু হেসে বলল, 'তা ঠিক, আমার আবার দুঃখ কিসের সুনীলবাবু।'

হেডমিস্ট্রেস আর তার সহকারিণীদের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন সবাই এসে সমবেদনা প্রকাশ করলেন। রেবা স্তব্ধ হয়ে গেল।

অনেক রাত পর্যন্ত শিবুর কোন পাত্তাই মিলল না। অজয় বস্তির আর দুজন লোককে নিয়ে ওর খোঁজে বেরুল, তারপর রেলওয়ে ব্রীজের নিকট থেকে ধরে আনল ছেলেকে।

বাসায় এলে অজয় ছেলেকে গোটা কয়েক চড় বসিয়ে দিল। 'না হয় fail করতিস, এই ক্লাসে আর এক বছর পড়তিস, নকল করতে গেলি কেন হারামজাদা। এমন করে আমাদের নাম ডুবালি কেন।'

শিবু ভেবে ছিল মাও তাকে খুব মারবে। কিন্তু রেবা তাকে হাত দিয়ে ছুঁল না, তার সঙ্গে কথা বলল না। একবার তাকাল না ছেলের দিকে, শিবু যেন তার কেউ নয়।

স্বামীর দিকে চেয়ে রেবা শুধু বলল, 'কাল থেকে আমি আর স্কুলে যাব না। চাকরি ছেড়ে দেব ভাবছি। কোন মুখে আর যাব ওখানে'

অজয় গম্ভীরভাবে বলল, 'যা ভালো বোঝ তাই কর।'

পরদিন কিন্তু রেবা ঠিক সময়েই স্কুলে গেল। কাজ যা ছিল যথানিয়মে করে গেল, একটুও ভুল হল না, একটুও দেরি হল না। রামজীবনবাবু তার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে সাড়া না পেয়ে নস্যের কৌটো খুলে এক টিপ নস্য নিয়ে ফের নিজের হিসাবের খাতায় মন দিলেন।

খানিক বাদে এগারোটার সময় ছেলের দল পরীক্ষা দিতে এল। রেবা বাইরে এসে দাঁড়াল। দলের ভিতরে সমীরকে দেখে হেসে বলল 'কাল কেমন পরীক্ষা দিলে সমীর?'

শিবুর ঘটনা সমীর সব জেনেছে। সে একটু সংকোচের সঙ্গে বলল, 'ভাল।'

'আজ কি পরীক্ষা? বাংলা না?'

'হ্যাঁ।'

'ফার্স্ট তো হবেই কিন্তু বাংলায় যদি নব্বুই এর ঘরে তুলতে পার তোমাকে আমি নিজে একটা আলাদা পুরস্কার দেব, রবীন্দ্রনাথের বই।'

'আচ্ছা' বলে সমীর তাড়াতাড়ি পরীক্ষার হলে গিয়ে ঢুকল। তার যেন কিরকম একটা অস্বস্তি লাগছিল। রেবা মনে মনে ভাবল এবার তার স্কুলে কাজ করবার সকলের কাছে মুখ দেখাবার ফের অধিকার জন্মেছে। সে শুধু সকলের মা নয় সকলের ছোট দিদিমণি।

ক্লাস সিক্সের বাংলা পরীক্ষার ফলটা মনিবাবুকে জিজ্ঞাসা করে আগেই দেখে নিল রেবা। হ্যাঁ সমীরই ফার্স্ট হয়েছে। বিরানব্বই পেয়েছে। চমৎকার খাতা, একটি বানান ভুল নেই, একটি ব্যাকরণ ভুল নেই, ওকে পুরা একশো দিলেও তৃপ্তি হয় না।

মনিবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে বললেন, 'অন্য বছরের চেয়েও এবার ভাল পরীক্ষা দিয়েছে সমীর।'

মাসের শেষ, হাতে অল্পই টাকা ছিল। তবুও পাঁচসিকা দিয়ে, কাছাকাছি একটা বই-এর দোকান থেকে একখানা 'নৈবেদ্য' কিনে নিয়ে এল রেবা। ওকে যেন এক অদ্ভুত জেদে পেয়েছে। সব চেয়ে আগে সমীরকে সে পুরস্কার দেবে। সে কথা রাখবে।

বই কিনে সন্ধ্যার দিকে ছুটল সমীরদের বাড়িতে। নৈবেদ্যখানা তার হাতে পৌঁছে দিয়ে তার মুখের হাসিটুকু না দেখা পর্যন্ত যেন রেবার শান্তি নেই।

বাইরের ঘরে একটা টুলের উপর বসে সমীরের ঠাকুরমা মালা জপ করছিলেন। রেবাকে দেখে ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে?'

রেবা বলল, 'আমি।'

'শিবুর মা ?'

রেবা অস্ফুট স্বরে বলল, 'হ্যাঁ।'

সমীরের ঠাকুরমা বললেন, 'আমি সবই শুনেছি বাছা,বড় লজ্জার কথা। তুমি ঐ স্কুলের মাস্টারি কর আর তোমারই ছেলে—'কথাটা শেষ না করে থেমে গেলেন।

রেবা বলল, 'মিসেস্' ব্যানার্জী কোথায় ?'

সমীরের ঠাকুরমা অপ্রসন্ন স্বরে বললেন, 'ছবি আঁকতে বসেছে।'

রেবা একটু হেসে বলল, 'আচ্ছা, ওঁর আর ব্যাঘাত করব না। সমীর কোথায় ?'

'সে তার বাবার সাথে সার্কাস দেখতে গেছে।'

রেবা বড় হতাশ হল। ভেবেছিল আজ ও বইখানা ওর হাতে দিয়ে যাবে, তা বুঝি আব হল না। মিনিট খানেক কি চিন্তা করল রেবা তারপর ঠিক করল বইটা এনেছে যখন হাতে করে তখন আর ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে কি হবে। নাম লিখে ওর ঠাকুরমার কাছে দিয়ে যাবে রেবা, তাহলেই সমীর পাবে। পেয়ে সমীর নিজেই রেবার সঙ্গে দেখা করতে যাবে—সেই ভাল হবে। সমীরের ঠাকুরমা বললেন, 'ব্যাপারটা কি ?'

রেবা তখন তাব ইচ্ছাটা তার কাছে খুলে বলল, সমীর বাংলায় খুব ভাল নম্বর পেয়েছে, তাই প্রতিশ্রুতি মত তাকে একখানা বই পুরস্কার দিতে এসেছে রেবা। বলে সস্তা দামের একটা ফাউন্টেনপেন সে বুকের ভেতর থেকে বার কবে ফেলল। তারপর নৈবেদ্যর প্রথম পাতা খুলে আস্তে আস্তে লিখল, কল্যাণীয় সমীরকে—'ছোট দিদিমণি।' কিন্তু লেখাটা শেষ কবতে পারল না। তার আগেই বড় বড় দু' ফোটা চোখের জল নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে শব্দটিব উপর নিঃশব্দে ঝরে পড়ল।

ভারী অপ্রস্তুত হল বেবা। আঁচল দিয়ে জলটা মুছে নিয়ে বইখানা সমীরেব ঠাকুরমাব দিকে এগিয়ে দিতেই তিনি বলে উঠলেন, 'ও বই তো আমি সমীরেব জন্য নিতে পাবব না বাছা।'

রেবা বিস্মিত হয়ে বলল, 'কেন ?'

সমীরের ঠাকুরমা বললেন, 'তোমার মনে দুঃখ অশান্তি, তোমার কাছ থেকে বই নিলে সমীরেব কল্যাণ হবে না। তুমি এখন এস। পরীক্ষার ফল ভাল করে বের হোক তারপর Prize তো ওকে স্কুল থেকে দেবে, ওব প্রাইজের জন্য ভাবনা কি ?'

রেবা মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

বস্তির সামনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শিবুর বন্ধুরা ফিস্ ফিস্ কবে আলাপ করছিল—'তুই ভাবিস নে কিছু, ও শালা মাস্টারের ঠ্যাং যদি আমি না ভাঙ্গি তো আমার বাপের জন্ম নয়।'

'ঠ্যাং কি বলছিস্ ফটিক ! হাত দুটো ওর ঠুঁটো করে দেব। বাছাধনকে আব মাস্টারি করে খেতে হবে না। আমি কেবল তাকে তাকে আছি, যদি সাত দিনের মধ্যে আমি ওকে শয্যাধরা না করতে পারিতো আমি শূয়োরের বাচ্ছা।'

'চুপ চুপ, মা এসেছে।'

রেবা খানিকক্ষণ আগেই পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল,তাঁর সবই কানে গেছে। তাকে দেখে তিন বন্ধু পাথর হয়ে রইল। একটু বাদে মদন আর ফটিক সরে যাচ্ছিল।

রেবা বলল, 'যেয়ো না তোমরা। আমার সঙ্গে এস।'

মদন ভয়ে ভয়ে বলল, 'কোথায় যাব !'

রেবা বলল, 'আমাদের ঘরে।'

সে কি কথা। শিবুর মা কোনদিন তাদের নিজের ঘরে এমন করে ডেকে নেয়নি। মদন আর ফটিক পরস্পরের দিকে তাকাল। গুম করে রাখবার মতলব নাকি। কিন্তু মাস্টার হোক্ আর যাই হোক মেয়েমানুষ। তার সাধ্য নেই ফটিক আর মদনের মত জোয়ান ছেলের গায়ে হাত দেয়। তাহলে হাত মুচড়ে ভেঙে ফেলবে না। তাছাড়া বন্ধু হিসেবে শিবুট্ তো আছে। সেও সাহায্য করবে। প্রতিবাদ না করে তিনজনে রেবার পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকলো।

রেবার বড় মেয়ে হ্যারিকেনটা জ্বেলে দিয়ে মার ফিরে আসতে দেরি দেখে পিছনের বারান্দায় নিজেই গিয়ে রান্নার আয়োজন শুরু করেছে। ছোট বোনদুটি দিদির কাছ ঘেঁষে বসেছে।

রেবা সেদিকে না তাকিয়ে মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে মদনের দিকে চেয়ে বলল, 'বোসো।'

বিস্মিত তিন বন্ধু বসল পাশাপাশি। রেবা নৈবেদ্যখানা ফটিকের দিকে মেলে ধবে বলল, 'পড় দেখি একটা কবিতা।'

ফটিক লজ্জিত হয়ে বলল, 'আমি প্রথমভাগের কয়েকটা পাতা অরধি পড়েছিলাম। অত কঠিন বই তো পড়তে পারব না।' মদনের দিকে তাকাতে সে লজ্জা পেয়ে বলল, 'আমি সব ভুলে গেছি।'

শিবু উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আমি পারি মা। আমি পড়ব।'

রেবা তাদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমিই পড়ছি প্রথমে। তোমরা শোন, পড়ে যাই, তারপর বুঝিয়ে দেব।'

পাতা উল্টে উল্টে রেবা হঠাৎ পড়তে শুরু করল ;—

"চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির—"

মজা পেয়ে রিণ্টু মিণ্টুরাও এগিয়ে এসে মাকে ঘিরে বসল।

খানিকবাদে বাইরে জুতোর শব্দ শোনা গেল। অজয় অফিস থেকে ফিরে এসেছে। ঘরে ঢুকতে গিয়ে দরজাব সামনে থমকে দাঁড়াল অজয়। তারপর স্ত্রীর কাণ্ড দেখে পরিহাসের সুরে বলল, 'কি ব্যাপার। ঘরেও দিদিমণি হলে নাকি?'

আশ্বিন ১৩৬০

জামাই

গভর্নমেণ্ট প্রেসের বড় অফিস-বাড়িটার সামনে দশটা বাজতে না-বাজতেই পানেব পুঁটলি নিয়ে এসে বসল প্রমদা। এত সকালে বাবুরা পান খায় না। অন্য কেউ এসে যে তার জায়গা দখল ক'রে বসবে তেমন আশঙ্কাও নেই। তবু প্রমদা সকাল-সকালই আসে। বিক্রি তেমন হোক আর না হোক অফিসের সামনে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠায় ব'সে থাকে। বয়স বছর পঁয়তাল্লিশেক হবে। কিন্তু চেহারায় আরো বেশি বুড়ি ব'লে মনে হয়। চুলে পাক ধরেছে। রোগা লম্বা দেহটা নুয়ে পড়েছে সামনের দিকে। বেশ-বাসের ওপব কোনোরকম লক্ষ্য নেই। চুলপেড়ে সাদা একখানা আধময়লা ধুতি পরনে। গায়ে কোথাও কোন গয়না নেই। অথচ একটু যত্ন নিলে দেহ এখনো সুন্দর দেখায় প্রমদার, লক্ষ্য করলে চোখে-মুখে বিগত যৌবনশ্রীর এখনো কিছুটা আভাস মেলে।

ভাগ্য ভাল। অফিসে ঢুকবার আগে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের দু-জন যুবক আজ সামনে এসে দাঁড়াল।

একজন জিজ্ঞাসা করল, 'মিঠে পান হবে?'

'হবে বাবা।'

'তাহ'লে দাও দুটো।'

সঙ্গীটি বলল, 'আঃ, আবার আমার জন্যে নিচ্ছো কেন, সুকুমার? আমি পান খাবো না।'

সুকুমার বলল, 'আহা, খাও না শুভেন্দু, বেশ ভালো পান।'

শুভেন্দু বলল, 'তাহ'লে দাও। কিন্তু জর্দা-টর্দা দিয়ো না যেন।'

প্রমদা পান সাজতে-সাজতে যুবক দু'টির দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'জর্দা না খেলে দেব কেন বাবা।'

সুকুমার বলল, 'আমারটায় দাও। ওরটায় দিয়ো না। খাওয়া তো ভালো, জর্দার নাম শুনলেই আমাদের শুভেন্দুর মাথা ঘোরে।'

শুভেন্দু বাধা দিয়ে বলল, 'আঃ, কি হচ্ছে। তাড়াতাড়ি সেরে নাও। দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।'

দাম চুকিয়ে দিয়ে সুকুমার একটু স'রে এসে সিগারেট ধরাল।

শুভেন্দু বলল, 'পানওয়ালীদের মুখে অমন বাবা বাবা শুনতে আমার বড়ো খারাপ লাগে।'

সুকুমার একটু হেসে বলল, 'কি করবে বলো, ওর বাবু ডাকবার বয়স তো আর নেই।'

শুভেন্দু লজ্জিত হ'য়ে বলল, 'যাঃ। কিন্তু বয়স না থাকলেও তাকাবার ভঙ্গিটি প্রায় তেমনি আছে। পান সাজতে-সাজতে আমাদের মুখের দিকে কিরকম ক'রে বার-বার চাইছিল দেখলে তো?'

সুকুমার বলল, 'দেখেছি। শুধু তোমার মুখের দিকে নয়, তোমার আমার বয়সী সকলের মুখের দিকেই ও অমনি ক'রে তাকায়। কিন্তু তুমি যা ভাবছো তা নয়। প্রমদা ওর জামাইকে খোঁজে।'

হাসতে গিয়ে সুকুমার হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গেল।

শুভেন্দু বিস্মিত হ'য়ে বলল, 'জামাই মানে?'

গলাটা একটু চ'ড়ে গিয়েছিল শুভেন্দুর। সুকুমার তার দিকে চেয়ে ফিসফিস ক'রে বলল, 'আস্তে হে আস্তে। শুনতে পাবে। চল, এবার ভিতরে চল।'

রাস্তা পার হ'য়ে দুই বন্ধু অফিসে গিয়ে ঢুকল। একদল মেয়ে ঢুকল তারপর। তাদের পিছনে-পিছনে আর-একদল ছেলে। প্রমদা পান-সাজা থামিয়ে তাদের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে রইল, তারপর ফের কাজে মন দিল। শুনতে সে পেয়েছে। চোখের মতো কানও আজকাল তীক্ষ্ণ হ'য়ে গেছে প্রমদার। কে কি বলে না-বলে সব সে বুঝতে পারে। প্রমদা সব দ্যাখে, সব শোনে, সব টের পায়। লোকে ভাবে আগের মতো এখনো বুঝি তার মাথা খারাপই আছে। ওদের ভুল। প্রমদার মাথা অনেক দিন হল ফের ঠিক হ'য়ে গেছে। আজকাল তার সব মনে পড়ে।

মনে পড়ে সেই কৃপানাথ দে-র গলি। দোরের সামনে রাতের পর রাত সেই আগন্তুকের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় দাঁড়ান। শীত নেই গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা-বাদল নেই, পথে এসে দাঁড়াতেই হবে। মাস-মাস ভাড়া না পেলে বাড়িওয়ালী ছাড়ে না। পোড়া পেটের তাগিদও কি কম। কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হত না প্রমদাকে। মানদা-মোক্ষদাদের তুলনায় ওর ঘরে লোকজন ঘন-ঘনই আসতো। রূপ স্বাস্থ্য বয়স বুদ্ধি দলের মধ্যে তারই সবচেয়ে বেশি ছিল। নিত্য নতুন ধরনের সাজসজ্জা করতো প্রমদা। সিঁথিতে কপালে সিঁদুর লেপে শাঁখা চুড়ি প'রে কোনোদিন কুলবধূ হত, কোনোদিন বা কুমারীর বেণী পিঠে লুটিয়ে পড়ত।

মানদা মুখ ঘুরিয়ে বলতো, 'ঢং। তুই থিয়েটারে গেলেই পাবিস। এখানে প'ড়ে মরছিস কেন।'

মালতী বলত, 'সোনাগাছিতে চ'লে যা'। ছ' বছর বাদে বড় রাস্তার ওপর বাড়ি তুলতে পারবি। এই এঁদো গলিতে প'ড়ে মরছিস কেন।'

প্রমদা হেসে জবাব দিত, 'তোদের জ্ব'লে মরা দেখব ব'লে।'

তারপর তেইশ বছর বয়সে বকুল কোলে এল প্রমদার। বাড়িওয়ালী বললো, 'এতদিনে তোর দুঃখ ঘুচল প্রেমো। পেট থেকে পড়তে না-পড়তেই যা চোখ-মুখ বেরিয়েছে, তোর চেয়ে লাখো গুণে রূপসী হবে। সারাজীবন পায়ের ওপর পা তুলে নিশ্চিন্তে খেতে পারবি।'

মোক্ষদা বলল, 'একেই বলে ভাগ্যি। আমাদের ঘরে ব্যাটাছেলে পাঠিয়ে ভগবান ওকেই মেয়ে দিলে। দেবে না? সে-ও তো একচোখা পুরুষের জাত। সুন্দর মুখ দেখলে সে-ও ভোলে।'

কিন্তু সবাই যা ভেবেছিল তা হল না। বকুলের বছর সাতেক বয়স হ'তে না-হ'তেই তাকে নিয়ে কৃপানাথ- দে-র গলি ছেড়ে চ'লে এল প্রমদা। সোনাগাছিতে রূপাগাছিতে নয়, বেলগাছিয়ার বস্তিবাড়িতে এসে বাসা বাঁধল।

নিজের পেশার ওপর তার অপ্রবৃত্তি জন্মে গেছে। দু-দু'বার যথাসর্বস্ব চুরি হয়েছে প্রমদার।

একবার হতাশ প্রেমিকের ছোরার মুখ থেকে বেঁচেছে। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে প্রমদার। এ-পথ আর নয়। পথে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সামনের দোতলা বাড়ির অল্পবয়সী বউটির স্বামী-শাশুড়ী-ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখের ঘরকন্না দেখতে-দেখতে প্রমদা মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছে—তার বকুলকে কিছুতেই সোনাগাছিতে পাঠাবে না সে, বোসেদের বউয়ের মতোই একটি সোনার সংসার বকুলের সে গ'ড়ে দেবে।

বেলগাছিয়াতে এসে সধবার বেশ ছেড়ে ফেললো প্রমদা। পুরুষ সঙ্গে না থাকলে শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে অনেক কৈফিয়তের তলায় পড়তে হয়। তার চেয়ে শাদা থান আর শাদা সিঁথিতে আপদ কম। বহুনাথা থেকে একেবারে অনাথা বিধবা সাজল প্রমদা। এই বয়সেই সব সোহাগ, আহ্লাদ, সাজসজ্জা ছেড়ে ফেলতে প্রথমটায় অবশ্য খুবই কষ্ট হল। কিন্তু মেয়ের দিকে তাকিয়ে প্রমদা নিজেকে সান্ত্বনা দিল। ওর সিঁথিতে সত্যিকারের সিঁদুর তুলে দেওয়ার জন্যে নিজের লোক-দেখানো সিঁদুরের দাগ না-হয় মুছেই ফেলল প্রমদা। তাতে দুঃখ কিসের।

বস্তিতে সবাই গৃহস্থ নয়। আধা-গৃহস্থও কয়েক ঘর আছে। দিনদুপুরে রাতদুপুরে ভুল ক'রে কেউ-কেউ প্রমদার দোরে এসেও হানা দিতে লাগল। কিন্তু ফের কোনো ফাঁদে পা দেওয়ার মতো মেয়ে নয় প্রমদা। জীবনে তার শিক্ষা কম হয় নি।

কয়েক পা এগিয়েই পাইকপাড়া। সেখানে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে ঠিকে-ঝির কাজ নিল প্রমদা। বাসন মাজে, বাটনা বাটে, বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা কাঁদলে কোলে তুলে নেয়। আর মনে-মনে স্বপ্ন দ্যাখে, নিজে ঝি-গিরি করলেও বকুলকে সে এমনি একটি বড়োলোকের বাড়ির বউ ক'রে পাঠাবে।

শুধু ঝি-গিরির পয়সায় সংসার চলে না। যুদ্ধের বাজারে জিনিসপত্রে আগুন লেগেছে। দুপুরবেলায় পানের পুঁটলি নিয়ে প্রমদা অফিস-আদালতের সামনে গিয়ে বসে। বিক্রি মোটামুটি মন্দ হয় না। অফিসের বাবুরা অনেকেই এসে ভিড় ক'রে দাঁড়ায়, চুনের বোঁটা হাতে নিয়ে গল্প করে।

একদিন ডাক্তারবাবু বললেন, 'তোমার মেয়ে তো বেশ চালাক চতুর দেখছি। লেখাপড়া শিখল কোথায়? ওকে স্কুলে দিয়েছ নাকি?'

প্রমদা লজ্জিত হ'য়ে বলল, 'না বাবু। বস্তির সামনে নিমাই মুদির দোকান আছে। বই-খাতা নিয়ে সেখানে যায়। পড়াশুনো পেলে বকুল আর কিছু চায় না। দিনরাত বই নিয়ে থাকে। রামায়ণ-মহাভারত ওর মুখস্থ।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'শুধু রামায়ণ-মহাভারত কেন। ও আরো অনেক বই পড়েছে। ওকে এবার ভাল একটা ইস্কুল-টিস্কুল দেখে ভর্তি ক'রে দাও, প্রমদা। মুদির দোকানে ফেলে রেখ না। তোমার মেয়ে দেখতে তো অমনিতেই সুন্দরী। লেখাপড়াটা যদি ভালো ক'রে শেখে ওর বিয়ের জন্যে তোমাকে আর ভাবতে হবে না। যে দেখবে সে-ই ওকে পছন্দ করবে।'

প্রমদা আধখানা ঘোমটার আড়াল থেকে অস্ফুটস্বরে বলল, 'সে আপনাদের আশীর্বাদ, কর্তা।'

শ্যামবাজারে ডাক্তারবাবুর জানা মেয়ে-স্কুল আছে। সেখানে আধা-মাইনেতে বকুলকে ভর্তি ক'রে দিল প্রমদা। স্কুলে পুরো নাম জিগ্যেস করায় বলল, 'বকুলমালা দাসী।'

পরদিন বকুল এসে বলল, 'আজকাল আর মেয়েরা দাসী লেখে না মা। আমাদের ক্লাসের দিদিমণি রেজিস্টার খাতায় আমার নাম বকুলমালা দাস লিখে দিয়েছেন।'

প্রমদা চমকে উঠে বলল, 'রেজিস্টার। সে আবার কি রে!'

বকুল হেসে বলল, 'বাঃ রে। রোজ যে নাম ডাকা হয় ক্লাসে। স্কুলে গেলাম কি গেলাম না তার হিসেব রাখার জন্যে নামের খাতা আছে প্রত্যেক ক্লাসে।'

প্রমদা আশ্বস্ত হ'য়ে বলল, 'ও।'

ক্লাসের পর ক্লাস ডিঙিয়ে চলল বকুল। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরল। স্কুল ছেড়ে কলেজ। বস্তির সবাই বলল, 'আর কেন, এবার মেয়ের বিয়ে দাও।'

প্রমদা বলল, 'আমি তো অনেক দিন ধ'রেই বলছি। কিন্তু মেয়ে যে কথা শোনে না।' কত সম্বন্ধ এল, কত সম্বন্ধ হাত-ছাড়া হল, কিন্তু বকুল কিছুতেই বিয়ের প্রস্তাবে সায় দিল না। প্রমদা একদিন মেয়েকে ডেকে বলল, 'তুই কি ভাবলি বল দেখি। বিয়ে-থা ঘর-গেরস্থালি করবি

নে ?'

বকুল বলল, 'না মা, এই বেশ আছি।'

.প্রমদা বিরক্ত হ'য়ে বলল, 'এই বেশ আছি। তুই দিনরাত বই নিয়ে প'ড়ে থাকবি আর আমি জীবন-ভর পরের বাড়িতে দাসীগিরি করব, রাস্তায় ব'সে পান বেচব, এই বুঝি তোর ইচ্ছে ?'

বকুল কালো ব্যথাভরা চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল, 'আমি তো তোমাকে বলেছি মা, ও-সব কাজ ছেড়ে দাও।'

প্রমদা রাগ ক'রে বলল, 'কেবল ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। ছেড়ে দিলে চলবে কি ক'রে শুনি ? দু-বেলা অন্ন জুটবে কি ক'রে ?'

বকুল বলল, 'আমি টিউশনি করব মা, চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নেব। তবু তোমাকে ও-সব কাজ কবতে দেব না।'

তাবপর সত্যিই যখন বকুল একটা স্কুলের মাস্টারির খবর আনল, প্রমদা বাধা দিয়ে বলল, 'উঁহু, তা হবে না। তাব চেয়ে তুমি যা করছিলে তাই করো বাপু। পাস-পরীক্ষা শেষ ক'র। ভাতের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

বকুল বলল, 'কিন্তু বাস্তায় ব'সে পান বিক্রি করতে তোমাকে আর আমি দেব না মা। কলেজে তো আমার মাইনে লাগে না। প্রিন্সিপ্যাল যে টিউশনিটা আমাকে জুটিয়ে দিয়েছেন, তাতে সংসারের অনেক খরচ আমাদের চ'লে যাবে। তারপর বি এ-টা পাস ক'রে কোন অফিস-টপিসে ঢুকতে পারলে যা আনবো, কষ্টেসৃষ্টে আমাদেব দু-জনের তাতেই চলবে। তোমাকে আর আমি কষ্ট করতে দেব না।'

মেয়ের মুখের দিকে মমতাভরা চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে প্রমদা বলল, 'দুব পাগলী। আমার আবার কষ্ট কিসের। তোকে পেয়ে আমি সব দুঃখ ভুলেছি।'

বি· এ· পাস করবাব কিছুদিন বাদেই চাকবি জুটিয়ে নিলো বকুল। আগে থেকেই চেষ্টা-চরিত্র কবছিল। কলেজের এক প্রফেসারের স্বামী সরকারী অফিসে ভালো চাকবি করেন। সেখানেই কাজ জুটলো বকুলের।

পান বিক্রি আগেই বন্ধ হয়েছিল, চাকরি পাওয়াব পর ডাক্তারবাবুব বাড়িতে ঝি-গিরিও আব মাকে করতে দিল না বকুল।

প্রমদা বলল, 'কেন, পেটের জন্যে তুই খাটবি আর আমি খাটতে পারব না ? আমার কি গতব গেছে ?'

বকুল বলল, 'ও কথা কেন বলছ, মা। এতকাল তো তুমি আমাকে খাইয়ে-পরিয়ে মানুষ করেছ। এবার তুমি বিশ্রাম ক'র। নিজেব ঘর-সংসাঘ দ্যাখো।'

প্রমদা বলল, 'ঘর-সংসার না ছাই। তোর বিয়ে হবে, জামাই আসবে ; কোল ভ'রে ছেলেমেয়ে আসবে—তবে তো আমার সংসার। তার আগে আমার সংসার কিসের রে ?' ব'লে মেয়ের দিকে তাকাল প্রমদা। একুশ-বাইশ বছরের সোমত্ত মেয়ে। কিন্তু বিয়েব কথায় ওর মুখে রং লাগল না। চোখেব পাতা লজ্জায় আনন্দে নেমে এল না।

মা-র দিকে স্থিরদৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বকুল মৃদু কিন্তু স্পষ্ট গলায় বলল, 'সে-সব হবার নয়, মা।'

প্রমদা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন বকুল ? ও-কথা বলছিস যে।'

বকুল আস্তে-আস্তে বলল, 'কেন বলছি তা তুমি নিজেই তো সব জান।'

বকুল আর কোন কথা না ব'লে চোখ নামিয়ে নিল। একটু বাদে সে উঠে চ'লে যাচ্ছিল, প্রমদা তাড়াতাড়ি তার হাত চেপে ধ'রে ব্যাকুল স্বরে বলল, 'হ্যাঁ জানি। কিন্তু তাতে তোব তো কোনো দোষ নেই ; তুই যে আমার পাঁকের পদ্ম, বকুল। সেই দুঃখে তুই কেন বিয়ে করবি নে ?'

বকুল বলল, 'আমার কোন দুঃখ নেই, মা। আমার জন্যে তুমি ভেব না, আমি বেশ আছি।'

এবার বকুল উঠে গিয়ে কালো মলাটের একখানা ইংরেজী মোটা বই খুলে বসল। দুঃখে বুক ভেঙে যেতে লাগল প্রমদার। মেয়েরা হৈচৈ করে, কত আনন্দ আহ্লাদ করে, কিন্তু বকুল সেই

এগারো-বারো বছর বয়স থেকেই ভারি গম্ভীর, ভারি বিষণ্ণ। বকুল প্রথম-প্রথম তার বাপের খোঁজ করেছে, কাকা, মামা, দাদাদের খোঁজ করেছে। প্রমদা মেয়েকে বুঝিয়েছে, তারা কেউ বেঁচে নেই। বকুল তবু অবুঝের মতো জিজ্ঞাসা করেছে, 'মা, কি অসুখে মরলো বাবা ? শীলা-লীলাদের মতো আমার কি জ্যাঠামণি ছিল ? তাঁর কি নাম ছিল মা ?'

ধৈর্যের সীমা আছে সকলেরই। প্রমদাকেও একসময়ে বিরক্ত হ'য়ে বলতে হয়েছে, 'রাতদিন অত আমি বকতে পারি নে বাপু, যা বলেছি বলেছি। আর আমি কিচ্ছু জানি নে।'

কিন্তু প্রমদা না জানালে কি হবে, বকুল ক্রমে ক্রমে সবই জেনেছে। বস্তিতে কূট-কচালো লোকের তো অভাব নেই। তাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে, ইশারা-ইঙ্গিতে সবই বুঝতে পেরেছে বকুল। ঝগড়ার সময় প্রতিবেশিনীদের ভাষা আরও স্পষ্ট, আরও বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে। বকুলের খেলার সঙ্গীরা পর্যন্ত খোঁটা দিয়েছে, 'বেশ্যার মেয়ে, তোর বাপের ঠিক নেই ! তুই কেন খেলতে আসিস আমাদের সঙ্গে ?'

প্রমদা ঝাঁটা নিয়ে ছুটে গিয়েছে তাদের মারতে, কোমরে আঁচল জড়িয়ে অকথ্য ভাষায় তাদের বাপ-মা'র সঙ্গে ঝগড়া শুরু করেছে। বকুল ব্যাকুল হ'য়ে তাড়াতাড়ি মাকে হাত ধ'রে ঘরে টেনে এনেছে। 'মা, চুপ ক'র, চুপ ক'র।'

কিন্তু ক'বছর পরে সেই দুঃখের দিনগুলিও গেছে। নিজের কুলপরিচয়ের কথা, আত্মীয়-স্বজনের কথা বকুল মাকে আর জিজ্ঞাসা করে না। তার সঙ্গে বস্তির কারো আব ঝগড়া হয় না। কারো সঙ্গে বড় একটা মিশতে যায় না বকুল। স্কুলে যায়, স্কুল থেকে ফিরে এসে আবার বই নিয়ে বসে।

প্রমদা মাঝে-মাঝে জিজ্ঞাসা করে, 'এত বই তুই কোত্থেকে পাস, বকুল ?'

বকুল জবাব দেয়, 'শহরে বইয়ের কি অভাব আছে, মা ? স্কুলের মেয়েদের কাছ থেকে আনি, দিদিমণিদের কাছ থেকে আনি।'

প্রমদা বলে, 'বই ছাড়া তুই কি দুনিয়ায় আর কিছু চোখে দেখতে পাস নে ? লীলারা কেমন সুন্দর তাদের ক্লাসের মেয়েদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে, তোর সঙ্গে বুঝি কারো ভাব নেই ?'

'আছে।'

'তবে আনিস নে কেন তাদের ?'

বকুল খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলে, 'ভয় ক'রে মা। যদি তারা আমাদের ঘেন্না করে।'

প্রমদা হঠাৎ কোন কথা খুঁজে পায় না।

স্কুল থেকে ভালো ভাবে পাস ক'রে কলেজে ভর্তি হল বকুল। কিন্তু মেয়ের স্বভাব বদলাল না। সেই বইযের বাশ, ঘরের কোণ আর নিজের মন নিয়ে প'ড়ে থাকে। দুনিয়ার আর-কিছুতে ওর কোন আসক্তি নেই।

ওর সমবয়সী শীলা লীলা দু-জনেরই বিয়ে হ'য়ে গেল। বছর ঘুরতে না-ঘুরতে একজন ছেলে কোলে নিয়ে আর-একজন পেটে নিয়ে বাপের বাড়ি এল বেড়াতে। প্রমদার সাজা পান খেয়ে তারা ঘরের মেঝেয় পা ছড়িয়ে শ্বশুরবাড়ির কত গল্প করল। শেষে লীলা হাসতে-হাসতে বলল, 'মাসীমা, ওই গোমরামুখীকে এবার বিয়ে দিয়ে দিন। ওর যা ভাবভঙ্গি দেখছি, কবে যে ও সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হ'য়ে যাবে তার ঠিক নেই।'

সন্ন্যাসিনী হ'তে বাকিই বা কি। বকুল গয়নাগাঁটি কিছু পরে না, অত বড়ো চুলের গোছা মাথায়, কিন্তু ভালো ক'রে যত্ন নেয় না। মেয়ে তো নয়, এ এক অনাসৃষ্টি।

প্রমদা জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা বকুল, লীলাকে দেখে তোর কি হিংসে হয় না ?'

'হিংসে কেন হবে মা ?'

'তুই কি চাস বল তো ?'

বই থেকে মুখ তুলে বকুল মৃদু হাসে, 'সেই তো সমস্যা। কী চাইব ব'ল তো ?'

প্রমদা বিরক্ত হ'য়ে বলে, 'হাসিস নে বাপু, তোর হাসিতে আমার গা জ্বলে। কী চাইবি, তা-ও আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে ? সোয়ামী, সংসার, গা-ভরা গয়না, কোল-ভরা ছেলে। মেয়েমানুষে দুনিয়ায় আর কী চায়।'

বকুল বইয়ের দিকে চোখ রেখে মৃদুস্বরে বলে, 'ও-সব আমি কিচ্ছু চাই নে।'

প্রমদা গালাগাল দিয়ে ওঠে, 'তা চাইবি কেন, পোড়াকপালী, হতচ্ছাড়ী। এ যে রক্তের দোষ, ঘর-সংসার তোর মন চাইবে কেন ? কিন্তু তুই চাস নে, আমি চাই। যেমন ক'রে পারি জামাই আমি আনবই।'

বকুল বই নিয়ে মায়ের চোখের আড়ালে গিয়ে বসে।

রাগে জ্ব'লে যায় প্রমদা। ইচ্ছা করে টুকবো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে ওই বইয়েব বাশ। বই তো নয়, শত্রু। ওই বইপ'ড়া বিদ্যার জন্যেই মেয়ে তাব এমন ক'বে পর হ'যে গেছে। ও কী ভাবে, কী চিন্তা করে, তা প্রমদা বুঝতে পারে না। এমনকি ওর মুখের ভাষা পর্যন্ত যেন আলদা। অথচ এই মেয়েকে বুকে ক'রেই,এই মেয়েব সুখের জন্যেই প্রমদা অকালে নিজেব সব সাধ-আহ্লাদ ত্যাগ কবেছে। একেক সময় তার মনে হয়, এর চেয়ে বকুলকে নিয়ে তাব সেই কৃপানাথ দে লেনেই প'ড়ে থাকা ভালো ছিল। বাড়িওয়ালী মাসীব মেয়ে আলতাব মতো বকুলেবও সেখানে দব থাকত, আদর থাকত। আর বকুলেব খাতিরে খাতির বাড়ত প্রমদার। সব আটঘাট, ফিকিব-ফন্দী বকুলকে সে শিখিযে দিত। যেমন বাড়িওযালী মাসী শেখায তাব মেযেকে। হযত তাদেব মধ্যে মাঝে-মাঝে চুলোচুলি খুনোখুনি হত, যেমন আলতা আব তাব মা বিনী মাসীব মধ্যে প্রমদা হ'তে দেখেছে। কিন্তু ঝগড়া মিটে গেলে আবার সুখ-দুঃখেব কথাও হত দু-জনেব মধ্যে, একজন আর-একজনের যত্ন করত, মাতাল হ'য়ে প'ড়ে থাকলে বিছানায তুলে দিত, খাবাপ অসুখ-বিসুখ হ'লে প্রাণ দিযে সেবা কবত, মা মেযে কেউ কারো কাছে কিছু লুকোত না। কেউ কাউকে ঘৃণা কবত না। নিজেব রক্তমাংসেব মেযেকে একেবারে নিজের ক'বে পেত প্রমদা। বকুল তখন মা-ব কাছে থেকে এমন দূরে-দূরে থাকতে পাবত না, মনে-মনে এমন ক'রে ঘৃণা কবতে পাবত না। মেযেকে লেখাপড়া শিখিয়ে, ভদ্রলোকদের সঙ্গে মিশতে দিয়ে ভারি আহাম্মুকিই কবেছে প্রমদা।

কিন্তু কলেজেব পড়া শেষ ক'রে অফিসে ঢুকে একমাস বাদে যখন মাইনেব টাকাগুলি তার হাতে এনে দিল বকুল, প্রমদার মন অন্যবকম হ'যে গেল। সে যা ভেবেছিল তা নয। মেযেটার মনে তাহ'লে সত্যিই মাযা-মমতা আছে।

'এই কি সব টাকা, বকুল ?'

'হ্যাঁ মা, সব।'

'হ্যাঁ রে, সব দিলি ? তোর নিজের কাছে কিছুই রাখলি নে ?'

'না মা, তোমার কাছেই সব থাক।'

এতখানি বিশ্বাস আলতা তার মাকে করত না। নিজের রোজগারেব পুবো টাকা তো ভালো, অর্ধেক টাকা, সিকি টাকাও সে মাকে প্রাণ ধ'রে দিত না কোনদিন। তাব চেয়ে প্রমদাব বকুল হাজাব গুণ ভালো, লক্ষ গুণ ভালো।

প্রমদা এগিয়ে এসে সস্নেহে মেযের চিবুক তুলে ধরল, 'হ্যাঁ রে বকুল, আমি কি তোব কাছে রোজগার চেয়েছি, টাকা চেয়েছি ?'

বকুল বলল, 'কিন্তু সংসাবে টাকাবও তো দবকাব আছে, মা।'

প্রমদা বলল, 'না, কোন দরকার নেই। টাকা আমি যেমন ক'রে পারি আনব। ঝি-গিবি কবব, পান বিক্রি করব। টাকার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। তোব কাছে আমি টাকা চাই নে।'

বকুল মৃদুস্বরে বলল, 'তবে তুমি কি চাও ?'

'কি চাই ? হতভাগী, তা কি তুই এতদিনেও বুঝতে পারলি নে ? আমি, আমাব জামাই চাই, ঘর-ভরা নাতি-নাতনী চাই। সেই দোতলা-বাড়ির বউয়ের মতো আমি তোকে ভরা-সংসারের মাঝখানে দেখতে চাই যে বকুল।'

প্রমদার দু-চোখ জলে ভ'রে উঠল।

বকুল কোন কথা না ব'লে আস্তে-আস্তে সরে গেল সামনে থেকে।

তারপর খেতে ব'সে মাকে আনমনা করার জন্যে নিজের অফিসের গল্প শুরু করল। খুব বড় অফিস। ঠিক যে-তেতলা বাড়িটার সামনে ব'সে প্রমদা পান বিক্রি করত, সেই বাড়ি। বকুলের

মতো আরো কত মেয়ে আছে সেখানে। শুধু মেয়ে? না, শুধু মেয়ে না, ছেলেরাও আছে। তাদের সংখ্যাই বেশি। মিলেমিশে কাজ করতে প্রথম-প্রথম খুব লজ্জা করত বকুলের, এখন আর করে না।

প্রমদা অবাক হ'য়ে বলে, 'বলিস কি? আমাকে একদিন দেখিয়ে আনবি?'

বকুল হেসে বলে, 'বেশ তো, যেয়ো একদিন।'

কিন্তু ওই কথাই। সত্যি-সত্যি প্রমদাও যায় না বকুলেরও তাকে নিয়ে যাওয়ার কোন গরজ নেই।

তারপর মাস পাঁচ ছয় চাকরি করতে না-করতেই মেয়ের বেশে-বাসে চেহারায় বেশ একটু পরিবর্তন লক্ষ্য করে প্রমদা। বকুল আগে পরতো আটপৌরে মিলের শাড়ি, এখন রঙিন তাঁতের শাড়ি প'রেই বের হয়। সে-রং কখনো সবুজ, কখনো গোলাপী, কখনো হলদে। বকুলের নিজের গায়ের রং গৌর। ওকে সব রংই মানায়। আগে চুলের রাশ ছিল যেন বাবুই পাখির বাসা, এখন বকুল নিজেই বিনুনি করে। সে বেণী কোমর ছাড়িয়ে অনেক নিচে যায়। কোনোদিন বা আলগা খোঁপা বাঁধে বকুল। তাতেও ওকে চমৎকার দেখায়। স্নো পাউডারের দিকে এতকাল মেয়ের বিশেষ ঝোঁক ছিল না। এখন একেকটি ক'রে সে সবও আসতে শুরু করেছে। সময় বুঝে নিজের হার, চুড়ি আর দুল মেয়েকে বের ক'রে দিল প্রমদা। এর আগেও কয়েকবার দিয়েছে। কিন্তু বকুল কিছুতেই পরে নি।

এবার বললো, 'ওই-সব ডিজাইন আজকাল কেউ পরে নাকি মা?'

প্রমদা মনে মনে হাসল— ভিতরে ভিতরে সব জ্ঞানই দেখি আছে মেয়ের।

বকুল লজ্জিত হ'য়ে বলল, 'হাসছো যে?'

প্রমদা বলল, হাসলাম আবার কই। বেশ তো ও সব ডিজাইন পুরনো হ'য়ে গিয়ে থাকে, হালের নতুন ডিজাইন গড়িয়ে নে। দু-বার বলার পর নিমরাজী, তিনবারের বার পুরোপুরি রাজী হ'য়ে গেল বকুল।

তারপর ক্রমে মেয়ের চালচলন ভাবভঙ্গি দেখে আরো অনেক কথা টের পেল প্রমদা। এ কেবল শাড়ি-বদল নয়, মেয়ের ঘর-বদলের দিনও এসেছে বকুল আজকাল আর শুধু মনে-মনে বই পড়ে না, সুর ক'রে ছড়া আওড়ায়। ছড়া বললে বকুল ভারি রাগ করে ও বলে, কবিতা। বেশ, না-হয় কবিতাই হল। তুই যা ব'লে খুশি হ'স তাই বল। এতদিন বইয়ের শুকনো পাতা ছাড়া কোন দিকে মেয়ের লক্ষ্য ছিল না। এখন গোছায় গোছায় নিয়ে আসে রজনীগন্ধার ডাঁটা। একদিন চোখে পড়ল, বকুলের খোঁপায় লাল গোলাপ ফুল গোঁজা।

ও যখন ছোট ছিল এক বিছানায় শুতো প্রমদা। কিন্তু বড়ো হওয়ার পর মেয়ে নিজেই আলাদা বিছানা ক'রে নিয়েছে। কিন্তু সে-বিছানাও প্রমদা নিজে পেতে দেয়। মশারি গুঁজে আলো নিবিয়ে মেয়ের বিছানার কাছে সেদিন একবার দাঁড়াল প্রমদা তারপর আস্তে-আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'বকুল, আমার কাছে আর লুকোস নি। বল না সে কে?'

'কার কথা বলছ, মা?

তুই যাকে ভালোবেসেছিস। তোকে যে ভালোবেসেছে।'

'কি বাজে বকছ। আমাকে আবার কে ভালোবাসবে?'

প্রমদা একটু হাসল, 'আচ্ছা বকুল, তুই আমার পেটে হয়েছিস, না আমি তোর পেটে হয়েছি?'

বকুল তরল সুরে বলল, 'তুমিই আমার পেটে হয়েছ, মা। লক্ষ্মী খুকু, যাও, এখন ঘুমোও গিয়ে। অনেক রাত হ'য়ে গেছে।'

প্রমদা হাসি চেপে নিজের বিছানায় গিয়ে শোয়। আজ গোপন করল, কিন্তু ক'দিন আর তার কাছ থেকে সব গোপন রাখতে পারবে, বকুল। কালই হোক, পরশুই হোক, বলতে তাকে হবেই।

অনেক রাত অবধি সেদিন প্রমদার ঘুম এল না। বার-বার মনে পড়তে লাগল সেই প্রথম মানুষটির কথা। সে বলেছিল প্রমদাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে। প্রমদা বিশ্বাস করেছিল। ভেবেছিল, মানুষের সব কথাই বুঝি সত্যি। প্রমদা ভারি বোকা ছিল তখন। তারপর ক্রমে বয়স বাড়ল, জ্ঞান বুদ্ধি বাড়ল। প্রমদা চিনতে শিখল মানুষকে। এমন অবিশ্বাসী জীব দুনিয়ায় আর দুটি নেই। তার

কথা মানেই মিছে কথা। কিন্তু এমন শুভদিনে এ-সব কি অলক্ষুনে কথা মনে আনছে প্রমদা। তার চেয়ে বকুলের যে-বর আসবে তার কথা ভাবুক। প্রাণ জুড়িয়ে যাবে। তার অল্প বয়স, কিন্তু অগাধ বিদ্যাবুদ্ধি। যেমন রূপ তেমনি স্বাস্থ্য। এতকাল তপস্বিনী থেকে বকুল কি আর যাকে তাকে পছন্দ করেছে। সে কি প্রমদার তেমন মেয়ে।

আর-একদিন মেয়েকে প্রমদা অনুরোধ করল, 'তার নামটা আমাকে বল-না, বকুল।'

বকুল ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বলল, 'কি যে ব'ল, মা। কার নাম আবার বলব?'

প্রমদা একটু হাসল, 'নাম ধ'রে ডাকতে তোর বুঝি লজ্জা করছে, আচ্ছা তাকে তুই অফিসের পর একদিন আমার কাছে নিয়ে আয়। আমি তার কাছ থেকেই সব জেনে নেব।'

বকুল একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বলল, 'তাকে কি এ-সব জায়গায় আনতে পাবি, মা?'

প্রমদা বলল, 'খুব বড়োলোক বুঝি? তবে থাক, এই বস্তির মধ্যে তাকে আর এনে কাজ নেই। এবাব একটা ভালো ঘর-টর দেখে উঠে যেতে হবে। আর এই নোংরা বস্তির মধ্যে আমবা প'ড়ে থাকব না।'

বকুল যেন নিজেব মনেই বলল, 'শুধু বাড়িঘর বদলালেই বা কি হবে।'

প্রমদা একদৃষ্টিতে মেয়েব দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'ওঃ, নিজের মা বদলাতে না পারলে বুঝি তুই আর তাকে আনবি নে! আমাকে এত ঘেন্না তোর! কেন কী কবেছি আমি? জ্ঞান হওয়ার পব থেকে তুই আমাকে মদ খেতে দেখেছিস, না কোন পুরুষেব সঙ্গে বেলেল্লাপনা করতে দেখেছিস, যে, এত ঘেন্না করবি তুই আমাকে? হায়, হায়, দুধ-কলা দিয়ে এতদিন কি সাপই আমি পুষছি রে! এর চেয়ে তখন যদি বিনী মাসীর কথা শুনতুম, বিক্রি ক'রে দিতুম, সে-টাকা আমাব আখেরে লাগত।'

বকুল বলল, 'চুপ ক'র মা। ঘরে-ঘরে সবাই কান পেতে রয়েছে। সবাই শুনতে পাচ্ছে তোমার কথা।'

প্রমদা মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'শুনুক, আমার ব'য়ে গেল।'

ঘব-সংসারেব কাজ সেরে খানিক বাদে প্রমদা মেয়ের খোঁজ নিতে এসে দেখল, বকুল তার ছোট্টো টেবিলখানিব উপর মাথা নুইয়ে চুপ ক'রে রয়েছে। পিঠ ভ'রে ছড়িয়ে পড়েছে কাল চুলের রাশ। প্রমদা আস্তে-আস্তে সেই চুলগুলির উপব হাত রাখল। পবেব বাঁড়িতে বাটনা বেটে-বেটে ক্ষ'য়ে গেছে, ফেটে গেছে আঙুলগুলি। বকুলের মসৃণ চুলের রাশের ওপর নিজেব খরখবে, খসখসে হাতখানা রেখে একটুকাল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল প্রমদা। তাবপর আস্তে-আস্তে বলল, 'বকুল, তুই কাঁদিস নে। সত্যি, আমি তোর মা হওয়াব যুগ্যি নই মা, আমি যুগ্যি নই।'

বকুল হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে ছোট মেয়ের মতো প্রমদাকে আঁকড়ে ধরল, 'ও-কথা ব'ল না, মা।'

জল-ভরা ঝাপসা চোখে আর দুটি ছলছলে কালো চোখেব দিকে তাকাল প্রমদা, তেমনি আস্তে-আস্তে বলল, 'সত্যি বকুল আমি তোর মা নই। আমাব কথা তার কাছে তুই বলিস নে। বলিস, তোর আসল মা তোর ছেলেবেলায় ম'রে গেছে। সে ঠিক তোর মতোই ছিল, তোর মতোই লেখাপড়া জানতো, ভদ্দরলোকের ঘরে থাকত, ভদ্দরলোকেব সঙ্গে মিশত। আমি তোর মা নই বকুল, সে-ই ছিল তোর আসল মা। আমি কেবল তোকে পেলে-পুষে বড করেছি।'

বকুল ধরা-গলায় বলল, 'কোথায় বড় করেছ, মা। আমি সেই ছোটই র'য়ে গেছি।'

প্রমদা নিজের কথাই ব'লে চলল, 'তাকে আমার কথা ব'লে দরকার নেই, তাকে আমার সামনে এনে দরকার নেই তোর। শুধু একবার আড়াল থেকে আমাকে দেখাস। এখানে আনতে হবে না। আমি তোর অফিসের সামনে ব'সে পান বেচতে-বেচতে একবার শুধু তার মুখখানা দেখে নেব।'

বকুল বলল, 'ছিঃ, মা। আবার ও-সব কথা বলছ। আমি তাকে এখানে নিয়ে আসব। সে তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে তোমাকে প্রণাম করবে। সে মোটেই অহংকারী নয় মা। সে বড় ভালো।'

'সত্যি!' প্রমদা একটু হেসে মেয়ের দিকে তাকাল। দু-জনেরই চোখে জল, ঠোঁটে হাসি।

বকুল লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'হ্যাঁ মা, সত্যি। অত ভালো আমি আর কাউকে দেখি নি।'

প্রমদার দুটি কান যেন মধুতে ভ'রে গেল। আর তার কিছু জানবার দরকার নেই। নাম নয়, ধাম নয়, অবস্থার কথা নয়। মানুষ ভালো হ'লেই সব হয়। ভালোবাসলেই সব পায়।

কিন্তু তারপর ফের মাস দুই যেতে না-যেতেই দেখা গেল, বকুলের আবার পরিবর্তন শুরু হয়েছে। ওর মুখে হাসি নেই। গলা ছেড়ে কবিতা পড়া বন্ধ হয়েছে। চুল বাঁধায়, রঙিন শাড়ি পরায় তার ফের সেই ঔদাসীন্য দেখা দিয়েছে। ক'দিন বাদে গয়নাগুলিও বকুল খুলে ফেলল।

প্রমদা এবার রাগ ক'রে বলল, 'তোর কি হয়েছে রে?'

বকুল বলল, 'কি আবার হবে?'

প্রমদা বলল, 'নিশ্চয়ই ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে।'

বকুল চুপ ক'রে রইল।

প্রমদা এবার হেসে বলল, 'যত ভালো ছেলে আর ভালো মেয়েই হোক, দু-জনে কাছাকাছি এলে ঝগড়া দু-চার বার হবেই। সেই দোতলার বউটিকেও দেখতুম। সোয়ামী-স্ত্রীর মধ্যে দিনরাত যেমন ভাব ঠিক তেমনি ঝগড়া। ঝগড়া শুনে মনে হত ওরা বুঝি কোনোদিন জীবনে কেউ আর কারো মুখ দেখবে না। কিন্তু দু-দণ্ড যেতে না-যেতেই আবার তাদের মধ্যে বেশ মিলমিশ হ'য়ে যেত। বিয়ে-করা বউ, বিয়ে-করা সোয়ামী, একজন আর-একজনকে ফেলে যাবে কোথায়। তোরা এবার বিয়ে ক'রে ফ্যাল বকুল।'

মুখ নিচু ক'রে বকুল বলল, 'তার আর উপায় নেই, মা।'

প্রমদা চমকে উঠে বলল, 'সে কি রে! বিয়ে করার উপায় নেই কেন? সে কি জাতের কথা তুলেছে? তাকে বলিস, তুই বামুনের মেয়ে। আমি যা-ই হই, জাতে সে বামুনই ছিল। পৈতে ছিল গলায়। বামুনের চেয়ে তো উঁচু জাত কিছু আর নেই। তার মেয়েকে সবাই বিয়ে করতে পারে।'

বকুল তেমনি নতমুখে বলল, 'বামুন-কায়েতের কথা নয় মা, তার ঘরে বউ আছে, ছেলেমেয়ে আছে। আমাকে সে আর বিয়ে করতে পারে না।'

প্রমদা মুহূর্তকাল স্তব্ধ হ'য়ে রইল, তারপর বলল, 'গোড়া থেকে তুই সব জানতিস?'

বকুল বলল, 'না। আমিও তাকে সব কথা জানাই নি, সে-ও আমাকে সব কথা বলে নি। কিন্তু তার কথা যে এত মারাত্মক সে আমি ভাবতে পারি নি, মা।'

প্রমদা মেয়ের দিকে তাকিয়ে আরো কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো, তারপর বলল, 'কিন্তু বিয়ে করেছে, করেছে; ছেলেমেয়ে আছে, আছে। তোর কাছে তাকে আসতেই হবে। এমন কত সুন্দরী গরবিনী বউয়ের স্বামী, কত সোনার চাঁদ ছেলেমেয়ের বাপকে আমি ঘর ছাড়িয়েছি, আর তুই একজনকে ছাড়াতে পারবি নে? খুব পারবি। কি ক'রে পারতে হয় আমি তোকে শিখিয়ে দেব।'

বকুল বললো, 'ছিঃ, মা, চুপ ক'র।'

আস্তে-আস্তে সেখান থেকে উঠে চ'লে গেল বকুল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়ের সেই যাওয়ার দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে প্রমদা দ্রুতপায়ে তার পিছনে-পিছনে গেল। তারপর খপ্ ক'রে মেয়ের একখানা হাত শক্ত ক'রে ধ'রে কঠিন স্বরে বলল, 'বকুল, আমার দিকে তাকা। আমার চোখের দিকে চেয়ে কথা বল।'

কিন্তু বকুল আর মুখ তুলল না।

প্রমদা মেয়ের হাত ধ'রে টানতে-টানতে ঘরের এক কোনায় নিয়ে এল। দোর-জানলা সন্তর্পণে বন্ধ ক'রে গলা নামিয়ে বলল, 'পোড়ারমুখী, নিজের এমন সর্বনাশ কেন করতে গেলি! তুই-না লেখাপড়া শিখেছিস!'

বকুল তেমনি চুপ ক'রে রইল।

প্রমদা বলল, 'আমার গোড়া থেকেই সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু তুই আমার পেটের মেয়ে আমার চোখে এই তিন মাস ধ'রে ধুলো দিয়েছিস, আমার কাছে কেবল মিছে কথা বলেছিস। কেন এমন

সর্বনাশ করলি বকুল ? কেন না-জেনে-শুনে নিজেকে এমন ক'রে বিলিয়ে দিলি ! ভেবেছিলি সব দিলেই বুঝি সব পাবি। ওরে পোড়াকপালী, যারা অমন ক'রে নেয়, তারা কিছুই দেয় না, কিছুই দেয় না।' চাপা কান্নায় গলা ধ'রে এল প্রমদার।

কিন্তু বকুলের চোখে একফোঁটাও জল নেই।

সে শান্ত স্বরে বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও মা, যেতে দাও আমাকে।'

প্রমদা বলল, 'কোথায় যাবি তুই মুখপুড়ী, দু-দিন বাদে যে আর তুই বেরুতেও পারবি নে। তোকে ঘরেই বা ক'দিন আমি লুকিয়ে রাখতে পারব। আমার সেই বিনী মাসী এখনো বেঁচে আছে। তোকে তার কাছে রাখব। সে সব ফিকির-ফন্দী জানে। ডাক্তার-বদ্যির বাবা। চল আমার সঙ্গে।'

বকুল শঙ্কিত হ'য়ে বলল, 'না মা, সেখানে আমি একমুহূর্তও টিঁকতে পারব না।'

প্রমদা বলল, 'ঈশ্, কি আমার সতীসাধ্বীরে। না টিঁকতে পারবার কি হয়েছে। সে তোকে নিজের মেয়ের মতো রাখবে।'

বকুল বলল 'না। আমার জন্যে তোমাদের কাউকে কিছু ভাবতে হবে না। আমার ব্যবস্থা আমি নিজে করব।'

প্রমদা রাগ ক'রে বলল, 'কী ব্যবস্থা করবি তুই ! এ-সবের কী তুই জানিস ! ব্যবস্থা করতে-করতে বুড়ি হ'য়ে গেলাম। তবু এখনো আমাদের গা কাঁপে।'

বকুল মৃদু হাসল, 'আমার গা কাঁপে না, মা। তার সব চিহ্ন আমি মুছে ফেলব।'

প্রমদা বলল, 'সেই হাড়হাভাতে আঁটকুড়োর ব্যাটার নামটা এবার বল। সব খরচ তার কাছ থেকে আদায় করব, সহজে না দেয় আদালতে নালিশ করব। কি নাম তার ?'

বকুল বলল, 'তার নাম মুখে আনার মতো নয়, মা। এতদিন যখন শোনো নি আজও সে-নাম তোমার শুনে কাজ নেই।'

প্রমদার কোন পরামর্শই বকুল নিল না। অফিস থেকে এক মাসের ছুটি নিল। গয়না বিক্রি করল। মোটা-মোটা বইগুলি সব বিক্রি ক'রে ফেলতে তার চোখে জল এল।

তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রমদার পায়ের ধুলো নিয়ে বকুল বলল, 'আসি মা।'

প্রমদার মনে পড়ল, বকুল বলেছিল, তার পায়ের ধুলো আর-একজন এসে নেবে। প্রমদা ভেবেছিল, ওরা দু-জনে একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নেবে। সেদিন আর এঁল না। আজ না আসুক, একদিন আসবেই। যেমন ক'রে পারুক, বকুলের বিয়ে দেবেই প্রমদা। বয়সের মেয়ে। শরীর সারতে ওর আর ক'দিন লাগবে।

প্রমদা বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস ? কত দূরে ?'

বকুল বলল, 'দূরে নয়, মা। এই শহরের মধ্যে। খুব ভালো ডাক্তারখানা। ভারি যত্ন করে। টাকা পেলে তারা সব করে।'

প্রমদা বলল, 'আমাকে ঠিকানা দিয়ে যা। আমি তোকে দেখতে যাব।'

একটু ইতস্তত ক'রে এক টুকরো কাগজে মাকে ঠিকানাটা লিখে দিল বকুল।

প্রমদা সেই কাগজখানা হাত পেতে নিয়ে বলল, 'দাঁড়া।'

তারপর বাক্সর ভিতর থেকে একটা পুরনো কবচ এনে বকুলের বাহুতে যত্ন ক'রে বেঁধে দিয়ে বলল, 'এটা প'রে থাকিস, বকুল। আমাদের সেই বিনী মাসীর দেওয়া কবচ। আপদে-বিপদে সকলেই এতে ফল পেয়েছে। তুই তো বিনী মাসীর কাছে গেলি নে। ও-সময় কিন্তু তার নামটা স্মরণ করিস। ধন্বন্তরী আমাদের বিনী মাসী। পুরো নাম বিনোদিনী দাসী। মনে থাকবে, বকুল ?'

বকুল একটু হেসে বলল, 'থাকবে।'

দু-দিন বাদে সেই গোপন ডাক্তারখানার লোকই রাত্রির অন্ধকারে গোপন সংবাদ ব'য়ে নিয়ে এল। বকুলকে বাঁচানো যায় নি।

মাস-কয়েকের জন্য মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল প্রমদার। পোড়া অফিসের ঘরে-ঘরে গিয়ে প্রত্যেকের কাছে দাবি করত, 'কে আমার মেয়েকে খুন করেছ, বাপের বেটা হও তো বল। তাকে

ফিরিয়ে দাও।'

গোলমালে কাজের ক্ষতি হয়। অফিসেব দারোযান পাগলীকে জোর ক'বে বের ক'রে দিয়েছে। তারপর থেকে কিছুতেই তাকে আর ভিতরে ঢুকতে দেয় নি।

বন্ধ-দরজায় মাথা ঠুকতে-ঠুকতে মাথা ফের ঠিক হ'য়ে গেছে প্রমদার। পাইকপাড়ার ডাক্তারবাবুর বাড়িতে আবার সে ঠিকে-কাজ নিয়েছে। দুপুরবেলা পানের পুঁটলি নিয়ে অফিসেব সামনে আগের মতো ফের বসতে শুরু করেছে। তার বকুলের অফিস।

পান বিক্রি করতে-করতে প্রমদা প্রত্যেকটি যুবকের মুখের দিকে তাকায়। তার ঝাপসা চোখে আর জ্বালা নেই। সে জানে, কোনোদিন সে শোধ নিতে পাববে না। শোধ নিতে আর চায়ও না প্রমদা। কি হবে শোধ নিয়ে। যে গেছে তাকে কি আর ফিরে পাবে। শোধ নিতে চায় না প্রমদা। শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে চায়। বকুল যাকে ভালোবেসেছিলো তার মুখখানা কেমন। শুধু একবার দেখবে।

অগ্রহায়ণ ১৩৬০

রানু যদি না হ'তো

ডিসপেনসাবিটি যে অনেক দিনেব পুবনো তা ঘরখানিব চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। লম্বা লম্বা কয়েকটা ওষুধেব আলমাবি, তাব সামনে ছোট্ট একটা টেবিল, খানকয়েক হাতলওয়ালা পুবনো ধবনেব চেয়াব। কোন ফার্নিচারেই পালিশেব বালাই নেই। রঙ একেবারে কালো হয়ে গেছে। কিন্তু পালিশ না থাক না-ই থাকল, ছাবপোকা যে অগুনতি আছে তাতেই রানুর আপত্তি। এই পনের বিশ মিনিটের মধ্যেই দু'দুবার চেয়ার বদলেছে রানু, কিন্তু কোনটিই সুখাসন হয়ে ওঠেনি। আচ্ছা, ডাক্তাববাবু এত বোজগার কবেন, এই চেযারগুলি বদলে ফেলতে পারেন না? গদি আঁটা তাঁর নিজের বসবাব চেযারটির দশাই বা কি। বুড়ো ডাক্তারের বোধ হয় এই ফার্নিচারগুলির ওপর মায়া জন্মে গেছে। কিছুই তিনি বদলাবেন না। শুধু ফার্নিচার না, এই ডিসপেনসারিটির সবই পুরনো। ডাক্তাব পুরনো, কম্পাউণ্ডার পুবনো, চাকর পুরনো। দাইটি পর্যন্ত বুড়ি থুড়থুড়ি। ওর বয়সও ষাট পঁয়ষট্টির কম হবে না। কাঠের পার্টিশন দেওয়া ছোট্ট কেবিনটির মধ্যে সারদা দাই একটি অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীলোকের সঙ্গে সেই থেকে বক বক কবছে। ডাক্তারবাবু এই বিকেলবেলায় থাকেন না তা রানু জানে, কিন্তু কম্পাউণ্ডারটিও যে কোথায় উধাও হয়েছে তার ঠিক নেই। অথচ কলেজে যাওয়ার সময় রানু এতবার করে বলে গেল "মা'র মিকশ্চারটা তৈরি করে রাখবেন আমি বিকেলে ফেরার পথে নিয়ে যাব" তা তাঁর গ্রাহ্যই হল না। এই ডিসপেনসারির ব্যবস্থাই এইরকম। এতদিনের পুরনো কাস্টমার রানুরা, কিন্তু তাদের সঙ্গে মোটেই ভদ্র ব্যবহার করেন না ডাক্তার কম্পাউণ্ডার। কোনবারই এক ঘণ্টা দেড ঘণ্টা বসে না থেকে এখান থেকে ওষুধ নিয়ে যেতে পারেনি রানু। অথচ বাবা মা'র ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয় এই ডাক্তার এই ডিসপেনসারি ছাড়া শহরে আর কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। বাড়ির যে-কারো অসুখে, যে-কোন অসুখে, তাঁরা এই বুড়ো ডাক্তার শ্রীপতি দত্তের শরণ নেবেন। কোথায় এই শ্যামপুকুর আর কোথায রানুদের বাসা রামকান্ত বোস স্ট্রীট। এতখানি রাস্তা পার হয়ে এই ডিসপেনসারিতে রানুর বাবা মা চিকিৎসা করাতে আসবেন তবু কাছাকাছি কোন ডাক্তারকে দেখাবেন না। মা ক'দিন যাবৎ জ্বরে ভুগছেন। ডাক্তারবাবু একবার দেখে ওষুধ পথ্যের

ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছেন। কলেজে যাওয়ার পথে তাঁকে রিপোর্ট দিয়ে গেছে রানু। তিনি বলেছেন, আগের ওষুধটাই চলবে। তাই ফেরার পথে রানু মিকশ্চারটা নিয়ে যাবে বলে এসেছে। কিন্তু কোথায় কম্পাউণ্ডার, কোথায়ই বা ওষুধ। শিশিটা ফটিকবাবুর টেবিলে ঠিক আগের মতই খালি পড়ে আছে। দেখে সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল রানুর। কেন, তারা কি পয়সা দিয়ে ওষুধ কেনে না? কিছু টাকা মাঝে মাঝে বাকি পড়লেও দু'এক মাসের মধ্যেই তারা শোধ দেয়। এত অবজ্ঞা অবহেলা কেন তাদের ওপর। বাবাকে এবার সে পরিষ্কার বলে দেবে, "ও-ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ আনতে হয় তুমি আন গিয়ে, আমি আর পারব না।"

সত্যি কলেজ থেকে ফিরে এসে এমন বিকেলটা নষ্ট করতে কার ইচ্ছা হয়? বিশেষ করে এই ফাল্গুনের বিকেল? কথা ছিল গোঁসাইপাড়া লেনে আজ রানু তার বন্ধু হেনাদের বাড়ি হয়ে যাবে। হেনার মাসতুতো ভাই সুনীলদা আসবে সেখানে। নামটা মনে পড়তেই মুখে একটু হাসি ফুটল রানুর। সুনীলকে আজকাল আর সে সুনীলদা বলে ডাকে না। মুখে কিছু বলে না, মনে মনে নাম ধরে ডাকে। অন্য সকলের সামনে এখনো অবশ্য আপনিই বলে, কিন্তু আড়ালে তারা দু'জনে দু'জনেব তুমি। যদিও সুনীলেব বয়স তেইশ, আর রানুর সতেব, যদিও সুনীল এক বছর আগে এম· এ· পাশ কবে চাকবিতে ঢুকেছে, আর রানু এখনো মাত্র সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্রী, তবু বিদ্যা আর বয়সের সব ব্যবধান তারা মাত্র বছর দেড়েকের আলাপ পরিচয়ের পরই পার হয়ে এসেছে।

ঢং করে করে দেয়ালের ঘড়িটায় একটা শব্দ হল। সাড়ে পাঁচটা। ঈস, পাঁচটার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। অবশ্য যতক্ষণ রানু না যাবে, সুনীল তাব জন্যে অপেক্ষা করেই থাকবে, তবু ভদ্রতা বলেও তে একটা কথা আছে। যে ছেলে ভালোবাসে তার সঙ্গেও সময়টা ঠিকই রাখতে হয়। আজকে অবশ্য বেশি দেরি করত না রানু। মা'ব অসুখ, সংসাবের কাজকর্ম গুছোতে হবে, ভাই বোনগুলিকে দেখতে হবে, দেরি করবে কি করে। কিন্তু দেবি না করলেও দু'-চার মিনিটেব জন্যে দেখা তো হতো, দু'একটা কথা তো হতো। কিন্তু বুড়ো ফটিক কম্পাউণ্ডার সব মাটি কবে দিল।

"সারদা দি!" রানু এবার অধীব হয়ে বুড়ি দাইকে ডেকে উঠল।

"কি বলছ।" পার্টিশনের আড়াল থেকে জবাব দিল সারদা।

"আচ্ছা, ফটিকবাবু কি আজ আর ফিরবেন না?"

সারদা বলল, "একটু সবুর করো দিদি, এই এল বলে।"

রানু অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল, "তুমিতো সেই কখন থেকে বলছ এল বলে, এল বলে। আমি আর কতক্ষণ বসে থাকবো।"

সারদা হেসে বলল, "যা বলেছ। তোমার বয়সে একা একা বেশিক্ষণ বসে থাকা যায় না। এসো, ভিতরে এসো।"

রানু রাগ করে উঠে গিয়ে কামরার দোরটা ঠেলে দিয়ে বলল, "কোথায় গেছে সত্যি করে বল।"

সারদা বলল, "বলে তো গেছে, ক'টা ইন্‌জেকশন আনতে চললুম। আসবার পথে বোধহয় বাসায় যাবে। চা-টা খেয়ে আসবে। বউয়ের কথা মনে পড়েছে।"

বিরক্ত হয়ে রানু ফিরে যাচ্ছিল, সারদা উঠে এসে হাত ধরে তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে টুলের ওপর বসিয়ে দিল।

একটু সঙ্কুচিত হয়ে উঠল রানু। ডিসপেনসারির দাইয়ের এতটা ঘনিষ্ঠতা সে পছন্দ করে না। কিন্তু কিছু বলবার জো নেই। সারদা দাই শুধু তাকে হতে দেখেনি হওয়ার সময় সাহায্য করেছে। ঠাকুরমা দিদিমার বয়সী। মাথার চুল বেশির ভাগই পাকা। ঘাড়ের কাছে বড় একটা খোঁপা করে জড়িয়ে রেখেছে। বেশ মোটাসোটা মাংসল চেহারা। গায়ে সাদা একটা জামা। তাকে ব্লাউজ বললেও চলে, আবার পুরুষের ফতুয়াও বলা যায়। পরনে কালো ফিতে পেড়ে শাড়ি। সারদা বালবিধবা। ছেলেপুলে কিছু নেই। নিকট আত্মীয়-স্বজনও না।

রানু টুলের ওপর বসতেই, তার পাশের স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। বছর চল্লিশেক হবে বয়স। নিম্ন শ্রেণীর গরিবের ঘরের বউ। আধ ময়লা শাড়িখানা দেখলেই তা বোঝা যায়। কিন্তু মাগো, কি বিশ্রীই না হয়েছে। এই অবস্থায় বেরিয়েছে কি করে। লজ্জা-টজ্জাও নেই।

স্ত্রীলোকটি বলল, "আমি তাহলে যাই দিদি।"
সারদা বলল, "হ্যাঁ, এসো। এখনো দেরি আছে। ও ব্যথা সে ব্যথা নয়। পুরনো পোয়াতি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন।"
স্ত্রীলোকটি এবার হাসল, "ঘাবড়ে আর কি করব দিদি।" পিছনের ছোট দরজা দিয়ে সে এবার বেরিয়ে গেল।
সারদা বলল, "অমন করে কি দেখছ। এ অবস্থা তোমারও একদিন হবে।"
রানু আরক্ত মুখে বলল, "যাও, ও-সব বাজে ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।"
সারদা হেসে বলল, "বাজে নয় দিদি বাজে নয়। আর বড়জোর দুটি একটি বছর, তারপর তোমাকেও অমনি সুখের বোঝা নিয়ে আসতে হবে এখানে।"
রানু রাগ করে উঠে যাচ্ছিল, সারদা তাকে ফের টেনে বসাল। তারপর হেসে বলল, "অবশ্য এখানে না এসেও পারবে। বুড়ি দাইয়ের কাছে আর আসবে কেন, বড় বড় হাসপাতালেই যেতে পারবে। তোমার মা তো এখন খালাস হতে হাসপাতালেই যায়। তোমার বারে কিন্তু যা করবার আমরাই করেছিলাম।"
রানু বলল, "তাতো অনেকদিন শুনেছি।"
সারদা রানুর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল, "ঘোড়ার ডিম শুনেছ! আসল কথার কিছুই শোননি। সে কি কম কেলেঙ্কারি। বাপরে বাপ। মনে হলে এখনো আমার গা কাঁটা দিয়ে ওঠে।"
এতক্ষণে রানুর কৌতূহল হল। সারদার দিকে আর একটু সরে এসে বলল, "কী ব্যাপার বল তো? কী হয়েছিল?"
সারদা বলল, "শুনবে? আচ্ছা শোন। এখন আর শুনতে বাধা কি। এখনতো সবই বুঝতে শিখেছ।"
রানু বলল, "আঃ অত ভূমিকা করছ কেন সারদাদি। যা বলবার বলে ফেল। সত্যি সত্যি হয়েছিল কি।"
সারদা পরম কৌতুকের স্বরে বলল, "কি হয়েছিল? কিছুই আর হওয়ার জো ছিল না দিদি। যা একখানা কাণ্ড বাধিয়েছিল তোমার বাপ মা, তাতে তোমাকে আর এ পৃথিবীতে আসতে হতো না।"
রানু ভ্রূ কুঁচকে বলল, "তার মানে?"
সারদা বলল, "মানে আবার কি। মানে বুঝি কিছুই বোঝনি? খুব ভাল করেই বুঝেছ। কে কতটুকু বোঝে না বোঝে মুখ দেখলেই আমরা টের পাই।"
রানু ব্যাকুল হয়ে বলল, "না-না, গোড়া থেকে সব খুলে বল দিদি। সত্যি বলছি, আমার কাছে সব হেঁয়ালির মত লাগছে।"
সারদা হাসল, "হেঁয়ালিতো বটেই। মানুষের জন্ম হেঁয়ালি, মানুষ নিজে একটা হেঁয়ালি, দুনিয়া সুদ্ধ তো হেঁয়ালিরই মেলা।"
একটু থেমে সারদা বলল, "তোমার বাপের নাম তো হেমাঙ্গ বোস আর মা'র নাম কমলা, তাই না? দেখ কি রকম মনে রেখেছি।"
রানু একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "নাম দুটো মনে রাখা এমন কি আর শক্ত। তাছাড়া অসুখ বিসুখ হলে ওঁরাতো তোমাদের এখানেই আসেন।"
সারদা তেমনি তরল স্বরে বলল, "কেবল নাম কেন, কীর্তি-কাহিনী সব কথাই মনে আছে! তোমার কত বয়স হল, সতের আঠার, তাই না?"
"আঠার এখনো হয়নি।"
সারদা বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সতেরই হবে। প্রথম দিনটির কথা বেশ মনে আছে আমার। ঠিক এইরকম সময়। কি এর চেয়ে আর একটু বেশি বেলা গেছে। তখন তোমাদের বাসা ছিল শ্যামবাজার স্ট্রীটে। তোমাদের মানে তোমার ঠাকুরদার। ষাটের কাছাকাছি বয়স। তবু বেশ লম্বা চওড়া জোয়ান চেহারা। ভদ্রলোক প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে এসে এই ডিসপেনসারিতে ঢুকলেন। ঘর-ভরা রোগী। তবু ডাক্তারবাবু সব ফেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন 'কি ব্যাপার। কি হয়েছে

আপনার ?' তিনি বললেন 'সর্বনাশ হতে বসেছে। আমার বউমার খুব অসুখ, আপনি এখুনি চলুন।'
সারদা একটু থেমে রানুর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল।
রানু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "হাসছ কেন ?"
সারদা বলল, "এখন হাসছি। তখন কি আর হাসবার জো ছিল ? ডাক্তাববাবু তোমার ঠাকুরদাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'কি হয়েছে ব্যাপারটা বলুন আগে।' তখন তোমাব ঠাকুরদা বললেন, তোমার মা তিন মাসের পোয়াতি। কিন্তু হঠাৎ ব্লিডিং হচ্ছে, আর পেটে অস্বাভাবিক যন্ত্রণা। ডাক্তারবাবু আমাকে বললেন, 'চল সারদা দেখে আসি, তুমিতো এসব ব্যাপারে আমার চেয়েও ওস্তাদ।' এইতো এখান থেকে ওখানে। হেঁটেই গেলাম আমরা। গিয়ে দেখি তোমার মা যন্ত্রণায় মেঝেয় গড়াগড়ি যাচ্ছে। তোমার ঠাকুরমা কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না। তোমার মাকে দেখে আমার ভারি মায়া হল। আহা বাচ্চা মেয়ে, ঠিক তোমার এই বয়স, কি একটু কমও হতে পারে। আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। দেখেই আমার যেন কেমন সন্দেহ হল। ডাক্তারবাবুকে বললাম 'ব্যাপার সহজ নয়।' ডাক্তারবাবু গম্ভীর মুখে বললেন 'হুঁ'!"
পানের কৌটো থেকে একটা পান বার কবে মুখে পুরল সাবদা, খানিকটা তামাকপাতা সেই সঙ্গে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চিবুতে লাগল। রানু অধীব হয়ে বলল, "তারপব ?"
সারদা বলল, "তারপর আর বেশি কিছু শুনে তোমার কাজ নেই দিদি। ডাক্তারবাবু প্রায় ধমকে উঠলেন, 'এমন হল কেন ? এমন হওযার তো কথা নয়!' তোমার ঠাকুবদা ঠাকুবমা বললেন, 'আমরাতো কিছুই জানিনে ডাক্তারবাবু।' তিনি বল্লিলেন, 'আপনাব ছেলে নিশ্চয়ই সব জানে, ডাকুন তাকে।' কিন্তু তোমার বাবাকে কোথাও পাওয়া গেল না। তখনই তখনই ডিসপেনসারি থেকে ঔষধ আনিয়ে দেওয়া হল। তোমার মাকে খানিকটা সুস্থ করে আমবা বেরিযে এলাম। পবদিন ফেব রোগী দেখতে গিয়ে ডাক্তারবাবু তোমার বাপকে পাকড়ে ধবলেন। 'কি করেছ সত্যি কবে ব'ল।"
রানু রুদ্ধশ্বাসে বলল, "তারপর ?"
সারদা মৃদু হেসে বলল, "তেইশ চব্বিশ বছরের জোযান ছেলে। কিন্তু ডাক্তাববাবুর ধমকে ভয়ে একেবারে কেঁচো। ডাক্তারবাবু সহজ পাত্র নন। সব কথা তার কাছ থেকে বেব কবে নিয়েছিলেন। আমাদের কাছে আসবার আগে তোমার বাবা আব এক গুণধর ডাক্তাবের ওষুধ খাইয়েছিল তোমার মাকে। তাও কি একবার ? তিন তিনবাব। একদিন এই ডিসপেনসারির মধ্যেই ডাক্তারবাবু আর আমি দুজনে মিলে তোমার বাবাকে ফের ধরে বসলাম, 'কেন এমন কর্ম করতে গিয়েছিলে বাপু বল। এই তোমাদের প্রথম সন্তান।' ছোকবা আমতা আমতা করে কত কথাই না বলল। সবে বি এ পাশ করে বেবিয়েছে। চাকরি বাকরি হয়নি, ছেলেপুলে হলে খাওয়াবে কি। তাছাড়া এত অল্প বয়সে ওসব ঝামেলা বাড়ুক সে আর তার স্ত্রী কেউ তা চায়নি। তাদেব জীবনের আরো অনেক সাধ আহ্লাদ আছে। বউকে সে পড়াবে পাশ পরীক্ষা দেওয়াবে—" বানু উঠে দাঁড়াল।
সারদা বলল, "চললে ? তা দিদি বড় প্রাণের জোব তোমার। যা দশা হয়েছিল তাতে কেউ আশা করিনি তুমি তাজা অবস্থায় পেট থেকে পড়বে। মেয়ে মানুষের জান, তাই বেঁচেছ। ছেলে হলে বোধ হয় আর রক্ষে পেতে না।"
রানু কোন কথা না বলে দোর ঠেলে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল, সারদা বলল, "এসব কথা তোমাকে যে বললাম, তা যেন আবার তোমার বাপ-মাকে বলে দিয়ো না। লজ্জা পাবে। আপদ-বিপদ সব চুকে গেছে তাই আজ গল্পটা বললাম। বেঁচে থাক, সুখে থাক। আহাহা সন্তান যে কি জিনিস—"
কথা শেষ না করে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল সারদা।
রানু কামরা থেকে বেরিয়ে এসে দেখে কম্পাউণ্ডার ফটিকবাবু তাঁর ছোট্ট ডেস্কটির ধারে গিয়ে বসেছেন, রানুকে দেখে ফোকলা মুখে একগাল হেসে বললেন, "এই নাও দিদি তোমার মার ওষুধ। দেরি দেখে খুব রেগে গিয়েছিলে বুঝি ?"
দাগকাটা মিক্‌শ্চারের শিশিটা রানুর হাতে তুলে দিয়ে ফটিকবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছে তোমার মা ?"

রানু সংক্ষেপে জবাব দিল, "ভালো।"

তারপর ডাক্তারবাবুর টেবিলের ওপর থেকে বইখাতাগুলি তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ডিসপেনসারি থেকে বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসে প্রথমেই তার মনে হল, এই পৃথিবীতে সে জোর করে এসেছে। তার আসবার কোন কথা ছিল না। তাকে কেউ চায়নি। সে যাতে না আসে তার জন্যেই সবাই প্রাণপণ চেষ্টা করেছে। কি হতো যদি সে না হতো, যদি সে না আসত।

ট্রাম বাসে অফিস ফেরত কেরানিদের ভিড়। তার বাবাও কেরানি। ট্রাম বাসে উঠল না রানু। হেঁটে হেঁটে বাড়ির দিকে চলল। ভারি অদ্ভুত, ভারি অদ্ভুত কথা। পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব একান্ত আকস্মিক। সে না হতেও পারত, সে না আসতেও পারত।

গোঁসাইপাড়া লেন কখন ছাড়িয়ে এল রানু। সুনীলের খোঁজে আজ আর হেনাদের বাড়িতে তার যেতে ইচ্ছা করল না। গেলে অবশ্য এখনো দেখা হয়। সুনীল তার জন্যে নিশ্চয়ই অপেক্ষা করে বসে থাকবে। থাকুক, কি হবে দেখা ক'রে। রানু যদি না হতো, তাহলে কেইবা দেখা করতে যেত। এ পৃথিবীতে তার না আসবার, না থাকবার কথাইতো সব চেয়ে বেশি ছিল। এই যে সন্ধ্যাবেলায় এমন আলোয়-ভরা লোকজন-ভরা শহরের পথ দিয়ে সে হেঁটে চলেছে এই চলবার কোন কথা ছিল না।

ঠিক ইচ্ছা করে নয়, নেহাৎই অভ্যাসের বসে নিজেদের গলিতে ঢুকে পড়ল, ঠিক অন্যদিনের মতই বাড়ির সামনে এসে রুদ্ধ দরজার কড়া নাড়ল। কিন্তু আজকের রানু আর অন্যদিনের রানু সম্পূর্ণ আলাদা। আজকের রানু আর পুরোপুরি এ পৃথিবীর মেয়ে নয়, এমন এক জগতের যেখানে কেউ নেই, কিছু নেই।

কড়া নাড়ার শব্দে একটি কিশোরী মেয়ে এসে দোর খুলে দিল। রানুর বোন বুলু। বছর চোদ্দ বয়স, দেখে অতটা মনে হয় না। রানুর মত অমন স্বাস্থ্যবতী নয়, সুন্দরীও নয়। দেখতে যেমন কালো তেমনই রোগা।

বুলু সাগ্রহে বলল, "দিদি এলি ? এত দেরি করলি যে ?" রানু রুক্ষ স্বরে বলল, "দেখছিস না হাতে ওষুধ। দেরি করেছি কি সাধে! ডিসপেনসারিতে গিয়েছিলাম।"

বুলু বলল, "ও। মার জ্বর অনেক কমেছে দিদি, কিন্তু ভারি দুর্বল। মাথা তুলতে পারছে না।"

রানু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, "আচ্ছা আচ্ছা, নে ওষুধটা এবার খাইয়ে দে গিয়ে।"

বুলু একটুকাল অবাক হয়ে বলল, "কি হয়েছে তোর ? একেবারে ঝগড়া মুখে করে মিলিটারি মেজাজ নিয়ে এসেছিস।"

রানু বলল, "তোকে আর বকবক করতে হবে না। যা বললুম তাই কর গিয়ে।"

বুলু আর কোন কথা না বলে সামনে থেকে সরে গেল। ভিতরের দিকে আর একটু যেতেই রানুর ছোট দুটি ভাই বঙ্কু বঙ্কু এগিয়ে এল। দুজনের খোলা গা। পরনে হাফপ্যান্ট। রোগাটে চেহারা একজনের বয়স বছর দশ, আর একজনের সাত।

বঙ্কু বলল, "দিদি আমার খাতা পেনসিল এনেছ ?"

রানু ঝাঁঝালো ধমকের সুরে বলল, "খাতা পেনসিল আনবার কর্তা কি আমি ? বাবাকে বলতে পারিসনে ?"

বঙ্কুর লোভ ছিল লজেন্সের ওপর। নিজের হাতখরচের পয়সা থেকে দিদি এক একদিন দু-এক আনার লজেন্স কি বিস্কুট তাদের জন্যে কিনে নিয়ে আসে। কিন্তু আজ দিদির মেজাজ দেখে রঙ্কু আর তার দিকে ঘেঁষতে সাহস পেল না।

একতলা পুরনো বাড়ি। গুনতিতে তিনখানা ঘর। কলেজে-পড়া বড় মেয়ে বলে রানুর ভাগ্যে পুরোপুরি একখানা ঘরই জুটেছে। অন্যদিন কলেজ থেকে ফিরে এসে নিজের ঘরে না গিয়ে রানু মা'র কাছে এসে বসে। তার চুলের মধ্যে আঙুল বুলিয়ে দেয়, জোর করে ধমক দিয়ে ওষুধ পথ্য খাওয়ায়। কিন্তু আজ আর এসব করবার তার প্রবৃত্তি হল না। কেন করবে। এ সংসারে রানুকে তো এরা কেউ চায়নি। সে জোর করে এসেছে। সে অনাহূতা, অবাঞ্ছিতা।

অন্য কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা নিজের ঘরটিতে গিয়ে ঢুকল রানু। তক্তপোশের শিয়রে ছোট

একখানি টেবিল। তার ওপর বইখাতাগুলিকে সশব্দে নামিয়ে রাখল। এক পাশে সস্তা দামের একটা র‍্যাক। কলেজের বই-খাতা সাজানো। সুনীলের দেওয়া কয়েকখানি গল্প কবিতার বইও আছে।

অন্যদিন ঘরে এসে রানু টেবিল আর র‍্যাকটা একটু গুছিয়ে রাখে, রঙীন চাদরে ঢাকা বিছানাটা ঝাড়ে। কিন্তু আজ আর সে সব কিছুই করল না। ঘরে আলো জ্বালল না। অন্ধকার ঘরে আঝাড়া বিছানায় টান হয়ে শুয়ে পড়ল। এ ঘরে সে নাও আসতে পারত, একান্ত নিজস্ব এই বিছানাটুকুতে শুয়ে সে নাও থাকতে পারত। সত্যি তার থাকাটাই আশ্চর্য, তার থাকবার কোন কথা ছিল না।

একটু বাদে বুলু এসে ঘরে ঢুকল। সুইচ টিপে লাইট জ্বেলে দিয়ে বলল, "দিদি, অমন ক'রে শুয়ে পড়লি যে, মা তোকে কতবার ডাকল।"

রানু বলল, "ডাকুক গিয়ে। বল গিয়ে আমার শরীর খারাপ করেছে।"

তাড়া খেয়ে বুলু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। একটু বাদে এক হাতে চায়ের কাপ, আর এক হাতে মুড়ির বাটি হাতে নিয়ে বুলু ফের এসে দাঁড়াল রানুর কাছে। বলল, "নে দিদি, খা।"

রানু বলল, "মুড়ি নিয়ে যা। মুড়ি আর খাব না। চায়ের কাপটা বাখ ওখানে।"

তারপর বোনের হাত থেকে কাপটা নিয়ে বানু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা বুলু, আমি যদি না হতাম তা হলে কি হতো রে?"

বুলু বলল, "কি বলছ দিদি, আমি কিছু বুঝতে পারছিনে।"

সত্যি ও কি ক'রে বুঝবে। ওর তো কিছু বোঝবার কথা নয়। রানু আর একটু পরিষ্কার করে বলল, "মানে আমি যদি এ পৃথিবীতে না আসতাম, না জন্মাতাম—"

বুলু বলল, "কি মাথা খারাপেব মত যা তা বলছিস। আমি যাই এবাব। অনেক কাজ আছে। রান্নাবান্না সাবতে হবে। তুই খেয়ে নে।" মায়ের মত গিন্নীপনাব ভঙ্গি করে বুলু বেরিয়ে গেল।

রানু মনে মনে ভাবল, সত্যি ওকে বোঝানো যাবে না। নিজের দুঃখ, শুধু ওকে কেন, কাউকেই বোঝাতে পারবে না রানু।

পাশের ঘবে বিছানায় শুয়ে শুয়েই মা কয়েকবার ডাকলেন, "রানু এখানে আয়, আয আমার কাছে।"

রানু প্রত্যেকবারই সে ডাক শুনল, কিন্তু একবারও সাড়া দিল না। কি করে যাবে? যেতে তার প্রবৃত্তি হচ্ছে না যে। কি করে তাকাবে মাযের মুখের দিকে, চোখেব দিকে? তাকালে নিজেব মাকে কি আব সে দেখতে পাবে? পাবে না, কিছুতেই পাবে না! যে রানুকে চায়নি, হওয়ার আগেই সরিয়ে দিতে চেয়েছে, তাকে কি কবে মা বলে ভাবতে পারবে রানু। পারবে না, কিছুতেই পাববে না।

খানিক বাদে রানুর বাবা হেমাঙ্গ অফিস থেকে বাসায় ফিরল। শুয়ে শুযেই সব টের পেল রানু। শুয়ে শুযেই শুনতে পেল বাবা তাব কথা জিজ্ঞাসা করছে, "শবীর খারাপ হয়েছে? কেন কি হয়েছে রানুর?" মা বলেছে, "কি আবার হবে? সব কথাই তোমার শোনা চাই, না?"

অন্যদিন পড়া রেখে রানু বাবার হাতমুখ ধোয়ার জন্যে জল গামছা, স্যাণ্ডাল এগিয়ে দেয়। চা করে। কিন্তু আজ আর উঠে সে বাবার সামনে গেল না। কেমন একটা যেন বীতস্পৃহা আর বিদ্বেষ বোধ করেছে রানু। কার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। কি ক'রে তাকাবে আজ সে বাবার মুখের দিকে? সে মুখে কি রানু আজ একজন খুনীর হিংস্র মুখই দেখতে পাবে না? নিজের স্বার্থের জন্যে, নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সতের বছর আগে তাকে যে লোকটি একেবারে মুছে ফেলতে চেয়েছিল, যাতে সে না আসতে পারে তার জন্যে প্রাণপণে যে বাধা দিয়েছে, তাব ওপর কোন মমতাই আজ আর বোধ করল না রানু। বরং তীব্র এক ধরনের দ্বেষ আর জিঘাংসায় তার মন ভবে উঠল।

কিছুক্ষণ বাদে চা-টা খেয়ে হেমাঙ্গ রানুর ঘরে ঢুকল। আলোটা জ্বেলে দিয়ে মেয়ের বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল হেমাঙ্গ। পাশ ফিরে শুয়ে আছে রানু। সে দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, "কি রে তোর নাকি শরীর খারাপ হয়েছে?"

রানু বাবার দিকে পিছন ফিরে শুয়ে অস্ফুটস্বরে বলল, "হুঁ।"

হেমাঙ্গ বলল, "তাহলে আজ আর পড়াশুনো ক'রে কাজ নেই। রাত জাগিস নে। সকাল সকাল দুটি খেয়ে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়। শরীর ঠিক হয়ে যাবে।"

একটু বাদে হেমাঙ্গ নিজের মনেই বলল, "যাই দেখি একটু হাতিবাগানের দিকে। হরেন দত্ত বলেছিল আজ গোটা দশেক টাকা দেবে। দেখি পাই নাকি। মাসের শেষ ক'টা দিন যেন আর কাটতে চায় না। অসুখ বিসুখে অস্থিব হয়ে গেলাম। আর পারিনে বাপু। ডালভাত আর বড়া ভাজা হয়ে গেছে। গরম গরম খেয়ে নিগে যা রানু। খেলেই শরীর একটু ভালো লাগবে দেখিস।"

হেমাঙ্গের জুতোর শব্দ বাড়ির সদর পর্যন্ত গিয়ে মিলিয়ে গেল। ঠিক মা'র মতই বাবার গলা মাঝে মাঝে স্নেহকোমল হয়ে ওঠে। কিন্তু আজ আর এই স্নেহে রানুর মন ভিজল না। তার মনে হল সব ভান, সব মিথ্যে। সে আকস্মিকভাবে বেঁচে গেছে ব'লেই তার ওপর বাবা মা'র এই স্নেহ, এই দয়া মায়া। কিন্তু সতের বছর আগে তো ওঁদের মনে একটুও দয়ামায়া ছিল না। ওঁরা তো চাননি রানু হয়, রানু বেঁচে থাকে। ওঁরা তো তাকে সাধ ক'রে আদর ক'রে ডেকে আনেননি, ববং বারবার বাধা দিয়েছেন। এখনকাব এই স্নেহমমতাব কোন মানে হয় না। রানুদের বাসায একটা নেড়ী কুকুর আছে। কে যেন জব্দ করবার জন্যে তাদের বাসায় বচ্চাটাকে ফেলে গিয়েছিল। বাবা তাকে অনেকবাব দূর দূর করেছেন, নিজে হাতে ক'রে বড় রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে এসেছেন, তবু বাচ্চাটা আবার ফিবে এসেছে। এখন বাবা নিজের হাতেই তাকে ভাত তরকারি আর মাছের কাঁটা দেন। এ বাড়িতে রানুর আদরও সেই অভ্যাসের আদর, সেই নেড়ী কুকুরের কেড়ে নেওয়া আদর। এ আদর সে চায় না, চায় না।

'আমি খাব না, কিছুতেই খাব না। রোজ রোজ ডাল দিয়ে খাব কেন ? বাঃ রে !'

হঠাৎ চমক ভাঙল রানুর। বান্নাঘর থেকে বঙ্কুর নাকে কান্না শোনা গেল। সাত আট বছর বয়স হয়েছে। কিন্তু খাওয়া নিয়ে আজও কোঁদল গেল না। রানু মনে মনে ভাবল।

বুলু ভায়েব গলার অনুকরণ করে বলল, 'না খাবি তো উঠে যা। রাজপুত্তুব এসেছেন। ডাল ভাত বোচেনা মুখ দিযে।'

বানুর মা পাশেব ঘরে বিছানায় শুয়ে শুযেই চেঁচিযে উঠল, 'কি হয়েছেরে বুলু ? হয়েছে কি তোদের ? ডাকাত পড়েছে নাকি ? বাবাবে বাবা, চেঁচিয়ে মেচিয়ে একেবারে অস্থিব করে তুলেছে।'

বুলু বলল, 'আমাকে রাগ দেখাচ্ছ কেন মা। বঙ্কু রঙ্কু কেউ শুধু ডাল দিয়ে খেতে চাইছে না।'

বঙ্কু প্রতিবাদ করে উঠল, 'এই ছোড়দি আমাব নামে নালিশ করছিস যে। আমি কি করলাম।'

বুলু তাকেও রেহাই দিল না, বলল 'না উনি বিষ্টুদেবেব গোড়া এসেছেন। নালিশ করবে না। তুইও তো ভাত খাচ্ছিস নে। কেবল ঠেলে ঠেলে একপাশে সরিয়ে রাখছিস।'

রানুর মার আর সহ্য হল না। আরো জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'ঠাস ঠাস করে গোটা কয়েক চড় মারতো বুলু, চড মার। তারপবে কান ধরে দু'টোকে ঘর থেকে বের ক'বে দে। দরকার নেই ওদের খাওয়ার। ডাল দিয়ে খেতে পাববিনে, তোদেব জন্যে পোলাও মাংস কোত্থেকে আসবে শুনি ? আব একজনকেও বলি। কি আক্কেল খানা তোমার। শিয়াল কুকুরের মত শুধু জন্ম দিযেই খালাস। ওবা কি খাবে কি পববে, তাব একটুও যদি খোঁজ খবর নেয়। আমি শুয়ে শুয়ে আর ক'দিক সামলাব।'

রানু এবার তক্তপোশের ওপব ব'সে আঁচলটা ঠিক করে নিতে নিতে বলল 'মা আর চেঁচিও না। অত চেঁচালে তোমাব অসুখ আরো বাড়বে।'

রানুর মা বলল, 'বাড়ে বাড়ুক। এখন মবলেই আমাব হাড় জুড়োয়। যতদিন থাকব, সবগুলি আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে। যন্ত্রণা আর সয় না। এর চেয়ে সাতজন্ম বাঁজা হয়ে থাকাও ভালো বাপু।'

রানু ডাকল, 'মা'।

'কিরে।'

'আচ্ছা তুমি যে ও কথাগুলো বললে তাকি সত্যি ?'

'কোন কথাগুলি ?'

'আমি যদি না হতুম, আমরা যদি না হতুম তাহলে তোমাদের কি সত্যিই ভালো লাগত?'

'ও সে কথা বুঝি তোমার কানে গেছে। লাগতই তো, খুব ভালো লাগত।' বলে রানুর মা ফিক

করে হেসে ফেলল।

শীর্ণ মুখ, শুকনো ঠোঁট। তবু মা'র মুখের হাসিটুকু কি মিষ্টি। রানু অপলকে একটু বসে সেই মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। না এই সুখস্নিগ্ধ হাসির মধ্যে সতের বছর আগেকার কোন অপরাধের স্মৃতিচিহ্নও আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

রানু এবার উঠে দাঁড়াল।

মা বলল, 'কোথায় যাচ্ছিস।'

রানু হেসে বলল, 'যাই দেখি রান্না ঘরে। শোননা এখনও কিরকম চাপা ঝগড়া চলছে তিনজনের মধ্যে।'

মা বলল, 'তা হলে যা। দেখ গিয়ে ভুলিয়ে টুলিয়ে খাওয়াতে পারিস নাকি। আর তুইও দুটো খেয়ে নিস রানু।

রানু মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এতক্ষণে সব তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। কেন বাবা মা তখন তাকে চাননি, কেন তাঁরা এখনও রানুদের সমস্ত অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পারছেন না। আশ্চর্য, এই সোজা কথাটা বুঝতে তার এত সময় লাগল।

নিজের শোবার ঘর থেকে পাশের বড় ঘরখানায় চলে এল রানু। সারা মেঝেয় ঢালা বিছানা পাতা। মা অসুস্থ বলে তার বিছানা একটু আলাদা করে কোণের দিকে সরানো। আস্তে আস্তে রানু এবার সেই আধময়লা রোগ শয্যার পাশে এসে বসে পড়ল।

রানুর মা বলল, 'ওকি তুই আবার এখানে এলি কেন? তোর না শরীর খারাপ হয়েছে।'

রানু বলল 'এখন আর তত খারাপ লাগছে না মা।'

তারপর মায়ের আরো কাছ ঘেঁষে বসল রানু। রোগা হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে রানু বলল, 'বাবা আসুক মা, এলে একসঙ্গে খাব।' দরজার দিকে এগিয়ে গেল রানু। কিন্তু মা আবার পিছু ডাকল, 'ওরে শোন। কথাটা তোকে বলতে ভুলেই গিয়েছিলাম। কি যে পোড়াছাই মন হয়েছে আমার। সুনীল এসেছিল। অনেকক্ষণ বসেছিল আমার কাছে। কত কথা আর কত গল্প। চমৎকার স্বভাব ছেলেটির।'

শুনব না শুনব না ক'রে রানু এবার বাইরে চলে এল। তাদের শোয়ার ঘর আর রান্নাঘরের মাঝখানে ছোট্ট একটু উঠোন। সেই উঠোনের বরাবর মাথার ওপরে একফালি আকাশ। রানু তাকিয়ে দেখল সেই আকাশটুকু কখন যেন তারায় ভরতি হয়ে গেছে।

আশ্চর্য আকাশ, আর আরো সুন্দর এই পৃথিবী। রানু মনে মনে ভাবল, সে যদি না হ'ত তাহলে এই বিরাট আকাশ আর বিপুলা পৃথিবীর হয়ত কিছুই এসে যেত না। কিন্তু কোন না কোন ভাবে রানু যখন একবার এসে পড়েছে তখন এর চেয়ে বড় কথা আর কিছু নেই।

ফাল্গুন ১৩৬০

কন্যা

চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ভবেশ দত্ত তাঁর চেম্বারে বসে বীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে একজন যুবক রোগীর চোখ পরীক্ষা করছিল। সিনিয়রের আদেশ নির্দেশের জন্যে এক পাশে দাঁড়িয়েছিল ভবেশের তরুণ সহকারী সুরজিৎ সেন। খানিকবাদে রোগীর দিকে তাকিয়ে বরাভয়ের হাসি হাসল ভবেশ, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই মিঃ লাহিড়ী। তবে চশমা আপনাকে নিতেই হবে।'

রোগী ক্ষীণ আপত্তি করল 'না নিলে চলবে না?'

ভবেশ স্মিত মুখে মাথা নাড়ল, তারপর সহকারীর দিকে তাকাতেই সে রোগীকে বলল 'মিঃ লাহিড়ী, আপনি আমার সঙ্গে এঘরে আসুন।'

একজন রোগীর জন্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় দেওয়ার জো নেই ভবেশের। বাইরের বসবার ঘরে আরও পেশেন্ট অপেক্ষা করছে কেসগুলি দেখে আজ একটু তাড়াতাড়িই বেরুতে হবে। হার্ট স্পেশালিস্ট ডা. নাগের বাড়িতে পার্টি আছে তাঁর মেয়ের আজ জন্মদিন। সেই উপলক্ষে সস্ত্রীক ভবেশের নিমন্ত্রণ সেজেগুজে ডলি হয়ত এতক্ষণ ছটফট শুরু করেছে

অ্যাসিস্ট্যান্টের দিকে তাকিয়ে ভবেশ বলল 'সুরজিৎ, প্রিন্সিপ্যাল সেনের রেকমেণ্ডেশন নিয়ে যে ভদ্রলোক এসেছেন তাঁকে ডাকো এবার আমি ওঁর ছাত্র ছিলাম গুরুদক্ষিণা প্রতি বছরই কিছু কিছু দিতে হয় তিনি যেসব পেশেন্ট পাঠান তা হয় অর্ধমূল্যে না হয় বিনামূল্যে '

ভবেশ একটু হাসল সে হাসি দাক্ষিণ্যের নয়।

সুরজিৎ বলল, স্যার নলিনী দেবী নামে একজন মহিলা অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন। তিনি আমাকে এরই মধ্যে কয়েকবার অনুরোধ করেছেন, তাঁর কেসটা একটু আগে দেখে দেওয়ার জন্যে। তিনি অনেক দূর সেই দমদম থেকে এসেছেন

ভবেশ এবার কৌতুকের ভঙ্গিতে বলল খুব যে ওকালতি করছ জানাশোনা আছে নাকি?'

সুরজিৎ লজ্জিত হয়ে বলল না স্যার।

তবে আর কি একটু বিশ্রাম করুন না বসে দমদমের বাস রাত বারটা পর্যন্ত চলে এখনতো সবে ছটা কারো চিঠিপত্র নিয়ে এসেছেন নাকি?

সুরজিৎ বলল, সেকথা তো কিছু বলেন নি।

ভবেশ বলল তবে? তুমি এত সুপারিশ করছ কোন ভরসায়? দেখেশুনে কি মনে হয়? ষোল টাকা ভিজিট দিতে পারবে না শেষে ধরাপড়া শুরু করবে?

সুরজিৎ একথার কোন জবাব দিল না। সহকারীর কাছে এতখানি স্থূলতা প্রকাশ করে যেন একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল ভবেশ। সুরজিতের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে পরিহাসতরল স্বরে বলল, 'আচ্ছা ডাকো তোমার নলিনী দেবীকেই ডাকো।

মিনিট খানেক বাদে নবাগতাকে সঙ্গে নিয়ে এল বেয়ারা। আর তাকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে ভবেশ ডাক্তার বলে উঠল, তুমি!

তারপর সহকারীর দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা তুমি যাও সুরজিৎ লাহিড়ীর কেসটা অ্যাটেণ্ড করো গিয়ে আমি এসে দেখছি।'

হাসি গোপন করে সুরজিৎ পাশের ঘরে চলে গেল।

তারপর একটু কাল চুপচাপ রইল দুজনে। একটু সময় নিল ভবেশ। ভারি রোগাটে হয়ে গেছে নলিনীর চেহারা। মুখে কিসের একটা রুক্ষতার ছাপ পড়েছে। হিসেবমত বয়স তো এই পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ। কিন্তু দেখে মনে হয়, আরও বেশি। সেই রঙের জলুস রূপের ঔজ্জ্বল্য আর নেই নলিনীর। বেশবাসও খুব সাধারণ রকমের। কম দামী সাদা খোলের একখানা তাঁতের শাড়ি পরনে, খয়েরী

বঙের পাড, আধখানা আঁচল মাথায তুলে দিযেছে। সিঁথিতে সিঁদুরের রেখাটি বেশ পুরু আর স্পষ্ট। গলায একগাছি সরু হার আছে। আর হাতে দুগাছি চুড়ি। এছাড়া আর কোন আভরণ নেই।

ভবেশ গম্ভীরভাবে বলল, 'দাঁড়িযে রইলে কেন, বসো।'

ঠিক সামনাসামনি বসল না নলিনী, পাশের গদি আঁটা বেঞ্চটার এক কোণে গিযে বসল। তারপর একটু কাল চুপ করে থেকে বলল, তোমার কাছে একটা বিশেষ দরকারে পড়ে এসেছি।'

ভবেশ বলল, 'তা জানি। আমার কাছে অ দরকারে কেউ আসে না। তোমার চোখে অসুখ হযেছে ? কি ট্রাবল বল।'

নলিনী একটু হাসল। 'তুমি নিজে নিশ্চযই মনে মনে জানো চোখের চিকিৎসার জন্যে তোমার কাছে আসিনি।

ভবেশ বলল 'ও। কিন্তু অন্য কোন রোগের চিকিৎসা তো আমি আজকাল আর করিনে। তাতে আমার নিজের প্র্যাকটিস সাফার করে। তাছাড়া সমযও হয না।'

নলিনী এবার চোখ তুলে ভবেশের দিকে তাকাল তারপর একটু হেসে বলল, 'তোমার দামী সময তাহলে আর নষ্ট করব না। আমার কথাটা বলি। গীতার সম্বন্ধ ঠিক করেছি।'

ভবেশ ভ্রূ-কুঁচকে বলল, 'গীতা! গীতা কে।'

এ প্রশ্নের জবাবে নলিনীর মুখ আরক্ত হযে উঠল। চোখ নামিযে একটুকাল চুপ করে রইল নলিনী।

ভবেশের এবার মনে পড়ে গেল। অদ্ভুত হাসি ফুটল তার মুখে। 'ও তোমার সেই মেযে ? বিযের সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলেছ ? বেশ বেশ, তা আমি কি করতে পারি বল। টাকার দরকার বুঝি কত টাকা দিতে হবে বল।'

কোটের পকেট থেকে সেভিংস অ্যাকাউন্টের চেক বইটা বের করে ফেলল ভবেশ।

নলিনী মাথা নেড়ে বলল, না। আমি টাকার জন্য তোমার কাছে আসিনি।

তবে ?'

নলিনী মৃদুস্বরে বলল, 'বিযের চিঠি এখনো ছাপতে দিইনি। তুমি যদি অনুমতি দাও তোমার নামে চিঠিটা ছাপতে দিই '

ভবেশ স্থির জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নলিনীর দিকে কিছুক্ষণ চেযে রইল। তারপর আস্তে কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল, 'তুমি নিজেই জানো নলিনী কি অসঙ্গত অসম্ভব প্রস্তাব তুমি করছ। অন্যের সন্তানের পিতৃত্ব যদি স্বীকারই করতাম, তাহলে উনিশ বছর আগেই তা করে ফেলতাম। তোমার বাবা মা তখন অনেক চেষ্টা করে দেখেছিলেন। উৎপীড়ন অত্যাচারের কিছুই বাকি রাখেননি।'

'তাঁদের কথা আর কেন তুলছ। তাঁরা তো আর নেই।'

'কিন্তু তুমি তো আছ তোমার তো কিছুই ভুলে যাওযার কথা নয। তবু তুমি কোন সাহসে --

নলিনী বলল, 'সাহসের জোরে আসিনি। ভেবেছিলাম মেযেটার সুখশান্তির কথা ভেবে তোমার মনে যদি একটু দযা হয, তোমারও তো ছেলেমেযে হযেছে।'

ভবেশ একটু হাসল, 'তা হযেছে। কিন্তু এতো শুধু দযামাযার কথা নয নলিনী, এর সঙ্গে মানমর্যাদার প্রশ্নটাও জড়িযে রযেছে যে। জানো তো এই কলকাতা শহরে আমাকে ডাক্তারি ব্যবসা করে খেতে হয— ।

নলিনী বলল, 'তা জানি। আমারই ভুল হযেছিল। অনর্থক তোমাকে বিরক্ত করে গেলাম। আমাকে ক্ষমা করো।'

মুহূর্তকাল দুজনে মুখোমুখি দাঁড়াল। মনে হলো আশাভঙ্গ নলিনীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠেছে।

ভবেশ বাধা দিযে বলল, 'দাঁড়াও। তোমার ঠিকানাটা দিযে যাও। কোথায থাক আজকাল ?'

নলিনী বলল, 'তোমাদের বালীগঞ্জ থেকে অনেক দূরে।'

'তা হোক, রাস্তার নাম ঠিকানা ব'ল,' নলিনীর ঠিকানাটা পকেট ডাযেরিতে লিখে নিল ভবেশ। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি কর আজকাল ? মাস্টারী ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'দমদমেরই একটা স্কুলে।'

একটু চুপ করে থেকে ভবেশ ফের জিজ্ঞাসা করল, তোমার মেয়ের বিয়ে করে?'

দিন তারিখ এখনো ঠিক হয়নি। ভেবেছিলাম তো এই শ্রাবণ মাসের মধ্যেই, দেখি কি হয়।'

ভবেশ বলল, তাহলে তো এখনো দেরি আছে।'

'দেরি আর কই। সপ্তাহ দুই মাত্র বাকি। এখনোতো সবই পড়ে রয়েছে। আচ্ছা যাই, তোমার রোগীরা নিশ্চয়ই আমাকে অভিশাপ দিচ্ছে।

ভবেশ বলল 'রোগীদের ডাক্তার কি করছে তা বললে না।

এর থার কোন জবাব না দিয়ে নলিনী বেরিয়ে গেল।

নলিনী চলে যাওয়ার পর কি একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল ভবেশ।

একবার ভাবল অ্যাসিস্টান্টকে বলে দেয় তার মাথা ধরেছে সব রোগীকে আজকের মত বিদায় করে দিক, কিন্তু তা কি ভবেশের মত একজন মর্যাদাবান ডাক্তারের পক্ষে শোভন হবে? তাই সে অশোভন কিছু করল না। যন্ত্রের মত কাজ করে গেল। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রোগী দেখল, সুরজিৎকে পরের দিনের কাজ সম্পর্কে যথারীতি উপদেশ নির্দেশ দিল, তারপর ধর্মতলার সেই চেম্বার থেকে বেরিয়ে নিজের গাড়ি নিয়ে ছুটল বালীগঞ্জের দিকে। ড্রাইভ করতে গিয়ে মোটেই অন্যমনস্ক হয়ে অপটু হাতের পরিচয় দিল না ভবেশ। সুস্থ স্বাভাবিকভাবে অন্য দিনের মতই বাড়ি এসে পৌঁছল।

স্টেশন রোডের এই ছোট্ট সাদা দোতালা বাড়িটি ভবেশ সম্প্রতি তুলেছে। এ বাড়িকে সাজিয়ে তুলবার ভার নিয়েছে ডলি নিজে। সামনে সারি সারি দেশী বিদেশী ফুলের টব। জানালায় দরজায় রঙীন পর্দা শোয়ার ঘরে শেডে ঢাকা নীলচে নরম আলো বাড়িতো নয় আর্টিস্টের আঁকা বাড়ির একখানি ছবি।

আর ছবির মতই সুন্দর ভবেশের স্ত্রী ডলি বিলাত থেকে ফিরে এসে ভবেশ ওকে বছর দশেক হল বিয়ে করেছে স্বচ্ছল সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে বয়স এখন সাতাশ আটাশ হবে দুটি ছেলে হয়েছে কিন্তু ডলিকে দেখে কে বলবে তার বয়স কুড়ি পেরিয়েছে। তা ভবেশকে দেখেও তার আসল বয়েস বুঝবার জো নেই পুষ্টিকর খাদ্যে বাঁধা নিয়মকানুনে নিজের স্বাস্থ্যকে সে অটুট রেখেছে। না রাখলে কি চলে। নিজের চেহারা ডাক্তারের পেশার পক্ষে একটা বড় বিজ্ঞাপন। তেতাল্লিশ পেরিয়ে গেলেও ভবেশকে দেখলে মনে হয় না যে তার বয়স তেত্রিশ বছরের ওপরে।

স্বামীকে দেখে ডলি একটু অভিমানের ভঙ্গিতে বলল, 'সাড়ে তোমার সেই সাড়ে আটটা। পাঁচ মিনিট আগে ফিরতে পারলে না বুঝি ডাঃ নাগের মেয়ের জন্মদিনে যেতে হবে না। দেরি দেখে তিনি কি ভাবছেন বলতো।

ভবেশ হেসে বলল 'কিচ্ছু ভাববেন না। তিনি নিজেও তো ডাক্তার। তিনি জানেন আমাদের সময় আমাদের হাতে নয়, রোগীদের মুঠোয়।'

একবার অবশ্য ইচ্ছে হলো যে, ডলিকে বলে তার শরীরটা খারাপ হয়েছে। আজ আর সে নিমন্ত্রণে যাবে না। কিন্তু স্ত্রীর কাছে এই দুর্বলতাটা প্রকাশ করতে লজ্জা হল ভবেশের। তাছাড়া একবার যদি বলে ফেলে তার শরীর ভালো নেই, তাহলে কি আর রক্ষা আছে। ডলি হাজার প্রশ্ন তুলে ব্যস্ত হয়ে উঠবে। আর শরীর ভালো না থাকার তো কোন কারণ নেই। কেন এমন একটা দৌর্বল্যের প্রশ্রয় দেবে ভবেশ?

তাই ভবেশ গাড়িতে চড়ে সস্ত্রীক নিমন্ত্রণে গেল। সেখানকার সমশ্রেণী, সমবয়সী ও সমব্যবসায়ী বন্ধুদের সঙ্গে হাসি গল্প ঠাট্টা তামাসা করল, তারপর ফিরে এল বাড়িতে। না, আজকের চেম্বারের সেই ছোট একটু ঘটনায় ভবেশ ডাক্তারের মনে কি আচরণে কোন বৈলক্ষণ্যই ঘটেনি। যদি ঘটত, তাহলে ডলি অন্তত সে কথা উল্লেখ না করে ছাড়ত না, স্বামীর চালচলন আচার আচরণ সম্বন্ধে তার দৃষ্টি অত্যন্ত সজাগ, ডলি ভবেশের ব্যারোমিটার। বিছানায় শুয়ে স্ত্রী যখন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে তখন ভবেশেরও ঘুমিয়ে পড়া দরকার। কিন্তু বার বার ঘুমোবার চেষ্টা করেও ঘুমোতে পারল না ভবেশ,

উনিশ বছর আগেকার টুকরো টুকরো কতকগুলি ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল।

নলিনীর সঙ্গে আজ যদি বেশি রূঢ় ব্যবহার করে থাকে ভরেশ তা মোটেই অন্যায় হয়নি। তার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে। উনিশ বছর আগে এই নলিনী ভরেশকে বড়ই প্রবঞ্চিত করেছিল। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে মুখ দেখাবার আর জো ছিল না ভরেশের। তখনকার সেই প্রতিটি দিন প্রতিটি মুহূর্তের কথা আজও ভরেশের সমস্ত মনে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

তাদের যশোহর শহরেই প্রতিপত্তিশালী পসারওয়ালা উকিলের মেয়ে নলিনী, তার রূপের খ্যাতি শহর ভরে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভরেশের বাবারও খ্যাতি প্রতিপত্তি নেহাৎ কম ছিল না। শহরে ছ'খানা বাড়ি গাঁয়ে তালুকদারী, বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলে সম্মান ছিল অমূল্য দত্তের। ভরেশ তখন মেডিকেল কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। শুধু যে কলেজেই তার খ্যাতি তা নয়, খেলার মাঠে ক্লাবের বক্তৃতায় তার সমান নৈপুণ্য। তাই ভরেশের সঙ্গে যখন নলিনীর সম্বন্ধ এল সবাই বলল এ একেবারে রাজজোটক, ভরেশের বাবা মেয়ে দেখে পছন্দ করে এলেন, এসে বললেন এমন সুলক্ষণা মেয়ে তিনি কখনো দেখেন নি। শুধু রূপ নয় গুণ যোগ্যতাও যথেষ্ট। ধনীর মেয়ে হলে কি হবে রান্নাবান্না সেলাই সাধারণ গৃহস্থ ঘরের সব কাজ সে জানে। লেখাপড়া অবশ্য ঘরেই করেছে। ইংরেজী বাংলা যতটুকু শিখেছে একেবারে পাকা হাতের অক্ষরগুলি একেবারে মুক্তোর মত। পণযৌতুকের যা যদ পাওয়া গেছে তাতে অভিজাত পরিবারের মর্যাদা বজায় থাকবে।

ভরেশ অবশ্য মাথা নাড়ল, উঁহু সে পাঠ্যাবস্থায় বিয়ে করবে না। বিয়ে যদি আদৌ করে ডাক্তারি পাশ করে প্র্যাকটিস জমিয়ে তারপরে।

নলিনীর বাবা জিতেন বোস বললেন, 'বেশ তো বিয়ে না হয় ক' বছর পরেই হবে, মেয়ে দেখে ভরেশের পছন্দ হয় কিনা সেইটেই বড় কথা।

কিন্তু নলিনীকে দেখে আসবার পর ভরেশের মত বদলাতে আর দেরি হল না বন্ধুমহলকে জানিয়ে দিল শুধু পাঠ্যাবস্থায় কেন ― কোন অবস্থায় এ মেয়েকে বিয়ে করা যায়।

ছেলের বাবা মেয়ের বাপ দুজনেই মুখ মুচকে হাসলেন। খুব ঘটা পটা আড়ম্বর আয়োজনের মধ্যে বিয়ে হল ভরেশের, শহরের প্রায় অর্ধেক লোক বিয়ের রাতে বউভাতে দু'বাড়িতে পোলাও মাংস খেল

ফুলশয্যার রাত্রে স্ত্রীকে আদর করে কাছে টেনে নিল ভরেশ হেসে বলল 'তুমি এত লাজুক কেন মোটে কথাই বলছ না। স্ত্রীর কাছ থেকে তবু কোন সাড়া না পেয়ে তার সুন্দর কোমল চিবুকটি তুলে ধরল ভরেশ। আর সঙ্গে সঙ্গে টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল তার হাতে ঝরে পড়ল।

ভরেশ আশ্চর্য হয়ে বলল 'একি তুমি কাঁদছ' ছি, আজকের দিনে কেউ কাঁদে নাকি কি হয়েছে বল, তোমাকে কেউ কিছু বলেছে?

নলিনী মৃদু স্বরে বলল, 'না।'

শুধু না আর না আর শুধু কান্না। কিন্তু রূপবতীর কান্নারও রূপ আছে। যার চোখ সুন্দর তার চোখের জলও সুন্দর। ভরেশ ভাবল হয়ত বাবা মা ভাইবোনদের জন্যেই মন কেমন করছে নলিনীর যদিও তার বাপের বাড়ি আর শ্বশুর বাড়ি সাত সমুদ্রের এপার ওপার না নেহাতই এপাড়া থেকে ওপাড়ায়, তবু আদুরে মেয়ের প্রথম প্রথম মন খারাপ হয়ে যাওয়াটা একেবারে অস্বাভাবিক নয়। স্ত্রীকে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করে বুকে টেনে নিল ভরেশ। চুমোয় চুমোয় মুখ ভরে দিল। একটু নোনতা স্বাদ লাগল অবশ্য কিন্তু ভরেশ তা গ্রাহ্য করল না। সে কি জানে সেই কটুস্বাদ শুধু প্রথম রাত্রের না তা জীবনের সমস্ত দিন রাত্রির

ধরা পড়ল এক মাস পরে অবশ্য তারও কিছুদিন আগে থেকে ভরেশদের অন্দরমহলে মেয়েদের মধ্যে ফিসফিস শুরু হয়েছিল। কিন্তু মাসখানেক পরে কলঙ্কের কথাটি একেবারে সশব্দে উচ্চারিত হল, দু'মাসের অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় নলিনীর বিয়ে হয়েছে।

ভরেশের বাবা মা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন এখনই ত্যাগ কর, এখনই ত্যাগ কর। ও আপদ দূর করে দাও বাড়ি থেকে। ভরেশ স্ত্রীকে আড়ালে ডেকে বলল, 'তোমার চোখের জলের মানে এতদিন পরে বুঝলুম। কিন্তু এত কলঙ্ক, এত কালি কি ওই দু এক ফোঁটা জলে ধুয়ে যায়।'

নলিনীর চোখে এখন আর জল নেই। সে পূর্ণ দৃষ্টিতে একবার স্বামীর দিকে তাকাল তারপর চোখ নামিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'না তা যায় না।'

ভবেশ বলল, তা যদি জানো তবে আমাকে এমন করে ঠকালে কেন ?' একথার কোন জবাব না দিয়ে নলিনী অস্ফুট স্বরে বলল, 'আমাকে ক্ষমা কর।'

'ক্ষমা ! তোমার অপরাধের কোন ক্ষমা নেই নলিনী। যাকে তুমি ভালোবেসেছিলে তাকেই কেন বিয়ে করলে না ?'

নলিনী তেমনি মুখ নীচু করে বলল, আমি তো তাকে ভালোবাসিনি, সে জোর করে—'

এর পর নলিনী শুধু কাঁদতে লাগল। কাউকে আর কোন কথা সে বলল না, কি বলতে পারল না।

নলিনীর বাবা জিতেনবাবুকে খবর দেওয়া হল, দোর এঁটে দুই বেয়াইয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলল বাইরে থেকে মাঝে মাঝে তর্জন গর্জন শোনা গেল। মনে হল দুজনের মধ্যে মল্লযুদ্ধ চলছে। কিন্তু সে যুদ্ধ তখনকার মত বাকযুদ্ধেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ঘণ্টা দুয়েক বাদে নলিনীর বাবা বেরিয়ে এলেন। একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে চলে গেলেন মেয়েকে নিয়ে। যাওয়ার আগে নলিনী নাকি ভবেশের সঙ্গে আর একবার দেখা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ভবেশের বাবা মা তাতে রাজী হননি। ভবেশেরও নিজেরও কোন আগ্রহ ছিল না। লজ্জায় ধিক্কারে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছিল। তার মত চতুর আর বুদ্ধিমান ছেলেকে কেউ কোনদিন ঠকাতে পারেনি। বন্ধুর দল হাজার চেষ্টা ক'রেও তাকে কোন বছর এপ্রিল ফুল করতে পারেনি। আর সারা জীবনের মত তাকে বোকা বানিয়ে দিয়ে গেল পনের ষোল বছরের একটি মেয়ে। হাজার শাস্তি দিলেও কি এই প্রবঞ্চনা, প্রতারণার শোধ যায়।

বাড়ির ঝি চাকরের কল্যাণে কথাটা মোটেই চাপা রইল না। সারা শহর ভরে ছড়িয়ে পড়ল। ভবেশ যেখানেই যায় মনে হয় একটু আগে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিচিত আধাপরিচিত— ভবেশ যার দিকেই তাকায় মনে হয়, সে মুখ টিপে হাসছে। ভবেশ অস্থির হয়ে উঠল মানুষ জনের সঙ্গ সহ্য হয় না, নির্জনতাও অসহনীয়।

ওপক্ষ থেকে মিটমাটের নানারকম চেষ্টা হয়েছিল, প্রথমে ওরা খুব অনুনয় বিনয় করেছিল, যা হয়ে গেছে তারতো আর চার নেই একটি মেয়ের সর্বনাশ ক'রে লাভ কি। ভবেশ দয়া করুক, ক্ষমা করুক সে মেনে নিক। কিন্তু ভবেশ তাতে রাজী হয়নি। তার বাবা মা আরো অরাজী ছিলেন।

তারপর শুরু হ'ল শত্রুভাবে ভজনার পালা। জিতেন বোস শাসালেন তিনি মামলা করবেন। তাঁর মেয়ের নামে অযথা অপবাদ দেওয়ার জন্য ফৌজদারী করবেন, খোরপোষের নালিশ আনবেন। কিন্তু বন্ধুদের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত রাজদ্বারে আর গেলেন না। নিজেই রাজার ভূমিকা নিলেন। দত্তদের বাড়ির ছেলেরা খেলার মাঠ থেকে ফেরার পথে বোসেদের বাড়ির লোকজনের হাতে মার খেল। আর একদিন বাজারের ধার দিয়ে ফেরার সময় বোসেদের বাড়ির ছেলেদের মাথায় ইঁট পড়ল এমনি চলল মাস দু'তিন। তারপর একদিন সন্ধ্যার পর নদীর ধারের নির্জন পথ থেকে দুই ভোজপুরী দারোয়ান ভবেশকে পাঁজা কোলে করে তুলে নিয়ে তার শ্বশুর বাড়িতে হাজির করে দিল।

জিতেন বোস তার অন্দর মহলের এক নিজন ঘরে নিয়ে জামাইকে অনেক বোঝালেন। একবার পিঠে হাত বুলালেন, আর একবার সশব্দে টেবিল চাপড়ালেন। ভাবখানা এই, কথা না শুনলে সে চাপড় ভবেশের গালেও পড়তে পারে। শাশুড়ী, পিস শাশুড়ীরা করলেন গুণজ্ঞানের চেষ্টা। চায়ের সঙ্গে কি একটা শিকড় বাটা যেন খাইয়ে ছিলেন তাঁরা। বার দুই বমি ক'রে ভবেশ সেই বশীকরণের উদ্যোগকে নিষ্ফল ক'রে দিল। ভয় পেয়ে জিতেনবাবুই শেষ পর্যন্ত গাড়িতে ক'রে বাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন জামাইকে। সেই সময় এক টুকরো চিঠি হাতে এসে পৌঁছেছিল ভবেশের। 'ওদের কাণ্ড দেখে মরি। আমাকে ভুল বুঝো না। চিঠি লেখার ছলে স্পর্ধাকে ক্ষমা করো।'

কিন্তু শিকড় বাটা খেয়ে ভবেশের তখন মাথা গরম হয়ে গেছে। সে ভাবল এও আর এক ধরনের মন্ত্রতন্ত্র। বশীকরণের রকমফের। সে চিঠি ভবেশ টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিল।

তারপরও দুই পরিবারের মধ্যে বহুকাল ধরে শত্রুতা চলেছিল। কিন্তু তার সাক্ষী হিসাবে ভবেশ আর যশোহরে উপস্থিত ছিল না। এম বি পাশ ক'রে সে বিলাত চলে যায়। তাই স্পেশালিস্ট হয়ে যখন ফিরে এল, তখন শহরের অদল-বদল হয়েছে। বোসেদের সেই দাপট আর নেই। জিতেনবাবু মারা যাওয়ার পর সম্পত্তি নিয়ে ছেলেদের মধ্যে দেওয়ানী ফৌজদারী বেঁধেছে। দাদাদের সংসারে নলিনীর স্থান হয়নি। কোলের মেয়ে নিয়ে সে কলকাতায় চলে গেছে জীবিকার সন্ধানে।

আর সাফল্যের গৌরবে ভবেশের সেই প্রবঞ্চিত হওয়ার ইতিবৃত্ত চাপা পড়ে গেছে। বাড়ি, গাড়ি, যশ, অর্থ, সুন্দরী স্ত্রী, স্বাস্থ্যবান সন্তান সবই পেয়েছে ভবেশ। নিজের ক্ষমতায় অর্জন করেছে। জীবনে কোথাও কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখ নেই, অতৃপ্তি নেই, আশ্চর্য তবু সারারাত ঘুম এল না ভবেশেব। একখানি ম্লান মুখ তাব বিনিদ্র চোখের সামনে কেবলি ভেসে বেড়াতে লাগল। আর বহুকাল আগের সেই একটি 'ফুলশয্যার রাত। শিশিরে ভেজা পদ্মেব মত একখানি মুখ।

এতদিন পরে ভবেশের মনে হল নলিনীর হয়ত তত অপরাধ ছিল না। কিন্তু বাবা-মা তখন মাথার ওপর। সে অবস্থায় ভবেশ কি-ই বা করতে পারত। এখনো নলিনী যা বলছে তা কববার সাধ্য অবশ্য ভবেশের নেই। আগে ছিলেন বাবা-মা এখন মানমর্যাদা। যে সমাজে সে বাস করে, তার রীতিনীতি আচার-আচরণ তাকে মানতেই হবে। যাতে ডলির আর বিশু যীশুর মুখ নীচু হয়, এমন কাজ সে কিছুতেই করতে পারে না।

এই উনিশ বছরের মধ্যে নলিনীর সঙ্গে আরো বার দুই ভবেশের দেখা হয়েছিল। বউবাজারে এক আত্মীয়ের ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল ভবেশ। গিয়ে দেখে নলিনী সেখানে এসেছে। শুধু চোখের দেখা। তারপর নলিনী বোধ হয় লজ্জা পেয়ে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছিল। ভবেশও সরে পড়তে পারলে বাঁচে। কারণ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ডলি তখন সঙ্গে আছে। দুজনের দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। ডলিব কাছে অবশ্য ভবেশ কিছুই গোপন করেনি। প্রথম জীবনের লজ্জাকর সেই ঘটনার কথা স্ত্রীকে সে বলেছিল। সেই সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিয়েছিল নিজেব জীবন কাহিনী থেকে সে অধ্যায়টি ভবেশ একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে মুছে ফেলেছে।

ডলি জবাব দিয়েছিল, 'মুছে ফেলাই তো উচিত। তাছাড়া তুমি আব কি করতে পাবতে।'

তারপর আরো একবার আকস্মিকভাবে কলেজ হাসপাতালের আঁউট-ডোবে ভবেশেব দেখা হয়েছিল নলিনীর সঙ্গে। ঠিক দেখা হওয়া নয়, নলিনী দূব থেকে তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। ভবেশ ডাঃ সান্যালের সঙ্গে করিডরে দাঁড়িয়ে একটি পেশেণ্টের কেস নিয়ে আলোচনা কবছিল। সান্যালই ভবেশকে ইশারা করে বলল, 'ওহে দত্ত, ভদ্রমহিলা বোধ হয় তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন।'

চোখ ফেরাতেই ভবেশ দেখল, নলিনী দাঁড়িয়ে আছে। সান্যাল চলে যাওযাব পব ভবেশ কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'তুমি এখানে।'

নলিনী বলল, 'থ্রোট ডিপার্টমেণ্টে এসেছিলাম।'

ভবেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে, তোমার গলায়?'

নলিনী একটু হেসেছিল, 'আমার গলায় আবার কি হবে। আমার একটি ছাত্রীর টন্সিলিটিস, অপারেশন কেস। তাকে ভর্তি করাতে এসেছিলাম।'

'ভর্তি হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

ভবেশ আর জিজ্ঞেস করেনি ই এন টি ছেড়ে আই ডিপার্টমেণ্টের এদিকে নলিনী কোন কাজে এসেছিল।

একটু বাদে নলিনীই নিজে থেকে বিদায় নিল। 'যাই এবার। ভালো আছো? ছেলে দু'টি ভালো তো?'

ভবেশ বলেছিল 'হ্যাঁ।'

কিন্তু কুশল প্রশ্নের বিনিময়ে আর কোন কুশল প্রশ্নের কথাই ভবেশের মনে হয়নি। জিজ্ঞেস

করেনি কোথায় আছে, কি করছে নলিনী। বরং ভবেশ যেন একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল পাছে এই দেখা সাক্ষাৎ আর কারো চোখে পড়ে যায়। পাছে কোন বন্ধুর কৌতূহল মেটাতে হয়। অনেক সহকর্মীরই তো যাতায়াত আছে ভবেশের বাড়িতে। পাছে তারা কেউ গিয়ে ডলির কাছে এই সাক্ষাৎকারের গল্প করে।

ভবেশের দুর্বলতাব কথা নলিনী কি টের পেয়েছিল? কে জানে?

ভোরে উঠে ডলি বলল, 'ব্যাপার কি, তোমার কি কাল ভালো ক'রে ঘুম হয়নি। চোখ দুটো লালচে হয়েছে যে।'

ভবেশ অনিদ্রার কথাটা জোর ক'রে অস্বীকার ক'রে বলল, 'না না,কাল তো খুব ঘুমিয়েছি ডলি। এত ঘুম শিগগিব ঘুমোয়নি।'

তাবপর হাসপাতালেব আউট-ডোব ডিউটিতে বেরোবাব আগে ছেলে দুটিকে ডেকে আদর করল ভবেশ। বডটির গাল টিপে দিল। ছোটটিকে কোলেব কাছে টেনে নিয়ে চুমো খেল কপালে। ভারি সুন্দর হয়েছে ওরা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, ফুটফুটে রঙ। রঙীন প্যান্ট আর হাফ শার্টে চমৎকার মানিয়েছে।

ডলি হেসে বলল, 'কি ব্যাপার আজ যে বাৎসল্যের বন্যা বইছে একেবাবে। কি ভাগ্য ওদের। আজ ওবা কাব মুখ দেখে উঠেছিল।'

ভবেশ হেসে বলল, 'যার সুন্দর মুখ দেখে রোজ ওঠে।'

হাসপাতালে চেম্বারে রোগীদেব চিকিৎসার আর বাড়িতে ফিবে স্নিগ্ধ পারিবারিক পরিবেশে স্ত্রীর সঙ্গে অবসব যাপনে সপ্তাহ খানেক কাটিয়ে দিল ভবেশ। কিন্তু ঠিক আগের মত নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে কাটল না। দযা ভিখারিণী একটি নারীর বিষাদ করুণ অস্পষ্ট একখানি মুখ ভবেশের মনের পটে বাববাব ফুটে উঠতে লাগল।

নলিনীব মেযেব বিযের দিন এগিযে এসেছে। তা আসুক। ভবেশ অমন অসঙ্গত প্রস্তাবে রাজী হ'তে পাবে না। নিজেব মানসম্মানেব কথা ভাবতে হবে, ভাবতে হবে পারিবারিক সুখ শান্তিব কথা। অমন একটা অসমীচীন মিথ্যাচারে ভবেশ কি ক'রে রাজী হ'তে পাবে? তা পারে না। তবে টাকা দিযে সাহায্য করা তাব পক্ষে অসম্ভব নয়। আর সেই সাহায্যই বড সাহায্য। মেয়ের বিয়েতে ভবেশের নামের চেয়ে তার টাকাব দাম নিশ্চয়ই নলিনীর কাছে অনেক বেশি। নলিনী নিজেও হয়ত সে কথা জানে। শুধু লজ্জায় স্বীকাব করতে পারেনি।

ভবেশ প্রথমে ভাবল, শ' পাঁচেক টাকার একটা চেক ডাকে পাঠিয়ে দেয় নলিনীকে।

বহু দুঃস্থ আত্মীয় বন্ধুর কন্যাদায়ে, এমন দান খয়রাত ভবেশকে মাঝে মাঝে করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে টাকাব অঙ্কটা একটু বেশি হযে যাবে। তা না হয় হলই। বিয়ের আগে নলিনী যদি অমন একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে না আসত তাহলে তো সে-ই সমস্ত কিছুর অধিকারিণী হত।

কিন্তু চেক কাটতে গিযে ভবেশের মনে হল চেকটা ডাকে না পাঠিয়ে একেবারে ওর হাতে দিয়ে এলে কেমন হয। নলিনী অবাক হবে, নলিনী খুশি হবে। ওর মুখে হাসি কোনদিন দেখেনি ভবেশ। ভারি সাধ হল আজ একবার দেখবে। আশঙ্কায় ভয়ে চোখ ভরা জল নিয়ে যে মেয়ে বাসরঘরে এসেছিল, এই যৌবন-সীমান্তে তার মুখে এক ফোঁটা হাসি কেমন মানাবে ভাবতে চেষ্টা করল ভবেশ।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একদিন ধর্মতলার চেম্বারে না গিয়ে লিণ্ডসে স্ট্রিটের এক পরিচিত অভিজাত ড্রাগিস্টের দোকানের সামনে গাড়ি থামিয়ে দোকানে ঢুকে সহকারী সুরজিৎকে ভবেশ ফোন ক'রে দিল। ভবেশ আজ জরুরী কাজে আটকা পড়েছে। তাই চেম্বারে যেতে পারবে না। সুরজিৎই যেন রোগীদেব অ্যাটেণ্ড করে।

তারপর উত্তরমুখে ছুটে চলল ভবেশেব স্টুডিবেকার। বহুদিন বাদে ছুটি নিয়েছে, ছুটি পেয়েছে শহরেব কর্মব্যস্ত ভবেশ ডাক্তার। এমন অহেতুক নিরুদ্দেশ যাত্রার আনন্দ যেন তার ভাগ্যে শিগগির জোটেনি।

মোটরযানের পক্ষে সুগম নয় এমন অনেক আঁকা-বাঁকা সঙ্কীর্ণসর্পিল পথ পেরিয়ে ভবেশের গাড়ি

পুরনো একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

আশে পাশে শহরের চেয়ে গ্রামের পরিবেশই বেশি। রাস্তার ওপারে খানিকটা পোড়ো জমি। তার লাগা ছোট পানাপুকুরটিতে গুটি দুয়েক সাপলা জলের ওপর মাথা উঁচু ক'রে রয়েছে। একটি ফুটেছে আর একটি ফোটেনি। আরো পশ্চিমে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একটি নতুন বাড়ি উঠছে। মজুরের দল কাজ করে চলেছে। আকাশে আজ মেঘ নেই। আছে রক্তিম গোধূলির রঙ।

গাড়ি থেকে নেমে একটু ইতস্তত ক'রে রুদ্ধ দরজার কড়া নাড়ল ভবেশ। সঙ্গে সঙ্গে দরজার খিল খুলে আঠার-উনিশ বছরেব একটি মেয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। শ্যামবর্ণা, তন্বী সুঠাম চেহারা। নলিনীর মতই টানা নাক, কালো বড় বড় চোখ। সেই চোখ অভিজাত ভবেশ ডাক্তাবের বিস্মিত কৌতূহলেব উদ্রেক কবেছে। কি জিজ্ঞাসা করবে ওকে একটু যেন ভাবতে হল ভবেশকে। সন্তানের বযসী এই মেয়েটিব সামনে নিজেব পবিত্যক্তা স্ত্রীর নাম ধ'রে ডাকতে কেমন একটু লজ্জা বোধ কবলে ভবেশ, তারপব সঙ্কোচের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করল, 'নলিনী আছে।'

মেয়েটি স্নিগ্ধকণ্ঠে জবাব দিল, 'না। মা তো এখনো স্কুল থেকে ফেবেননি। আপনি আসুন ঘরে বসুন এসে। তাব ফিবতে বেশি দেরি হবে না।'

ভবেশ ভিতবে এসে ঢুকল। পরিপাটি ক'রে গুছানো ছোট্ট সুন্দর একখানি ঘর। পুরনো জীর্ণতার ওপব পরিচ্ছন্ন রুচির ছাপ পড়েছে। জানালায় নীলরঙের পর্দা। এমব্রয়ডারি কবা সাদা ঢাকনিতে ঢাকা ছোট একটি টেবিল। তার ওপর কিছু দর্শন ইতিহাসের পাঠ্য বই। দু'খানি চেয়ার। একখানা সামনে একখানা পাশে। দেয়াল ঘেঁষে একটি তক্তপোশ, মাথাব কাছে বইয়ে ভবতি একটি শেলফ, তাব ওপর ছোট একটি সবুজ ফুলদানী, তাতে কযেকটি চন্দ্রমল্লিকা।

প্রসন্নতায মন ভরে উঠল ভবেশেব। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কবল, 'তোমাব নামই বুঝি গীতা ?'

'হ্যাঁ।' মেয়েটি স্মিতমুখে জবাব দিল।

'আমাব নাম ভবেশচন্দ্র দত্ত।'

'বাবা !'

অস্ফুটস্বরে কথাটি বলে নিজেই লজ্জিত হযে উঠল মেয়েটি। তারপর অপলকে একটুকাল ভবেশের দিকে তাকিযে রইল। বিস্ময় কৌতূহল, অভিযোগ অভিমানে মেশা সে এক অপরূপ দৃষ্টি, তারপব কি তাব মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ভবেশের জুতো ছুঁয়ে প্রণাম কবল গীতা।

ভবেশ একটু যেন বিমূঢ় হ'যে বইল। তারপর আস্তে আলগোছে গীতাব মাথায় হাত রেখে বলল, 'থাক থাক।'

নিজের ছেলেদেব মুখে এ সম্বোধন তো ভবেশ রোজ শোনে। কিন্তু গীতাব মুখের এই লজ্জিত অস্ফুট শব্দটি ভারি অশ্রুতপূর্ব মনে হল ভবেশেব। এক অনাস্বাদিত অনুভূতিতে তার মন ভবে উঠল। ভবেশ ভাবল এমন পবম মিথ্যা একটি সম্বোধনে হঠাৎ এত বড় সত্য হয়ে উঠল কি ক'রে। কই গীতাকে দেখে, ওব মুখের ডাক শুনে তো মোটেই মনে হচ্ছে না তার সঙ্গে ভবেশের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই, ববং পরম আত্মীয় বলেই তো মনে হ'চ্ছে ওকে। তবে সত্যিকারের আত্মীয়তা মানুষের রক্তের মধ্যে নয়, আসল সম্পর্ক মানুষের ভাবের মধ্যে, অনুভবের মধ্যে !

'আপনি ঘামছেন। ঘরটা বড় গবম।' বলে গীতা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করতে শুরু করল।

ভবেশ এবার আব বাধা দিল না। মৃদু হেসে স্নেহার্দ্র দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকাল।

ডাক্তার হিসেবে এই বয়সী কত তরুণী মেয়ের সান্নিধ্যেই না এর আগে এসেছে ভবেশ। কিন্তু কই এমন বাৎসল্যের ভাব তো কাউকে দেখে এর আগে জাগেনি। মনে মনে কর্তব্য ঠিক করে ফেলল ভবেশ। নলিনীর সব প্রার্থনাই আজ সে পূরণ করবে। একথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গে তার মন এক পরম প্রসন্নতায় ভরে গেল। এই স্নিগ্ধ সেবা-নিপুণা লাবণ্যময়ী মেয়েটি পিতৃপরিচয় পেয়ে সমাজে স্বীকৃতি লাভ করুক, একটি ভদ্র পরিবারের মর্যাদাময়ী বধূর আসন পেয়ে ওর জীবন সার্থক হয়ে উঠুক। তার জন্যে যত অসুবিধে অশান্তি ভোগ করতে হয় ভবেশ করবে। সামাজিক মান সম্মান

তুচ্ছ করবার নয়। কিন্তু তার চেয়ে বড় মানুষের হৃদয়। নিজের মধ্যে এক পরম উদার হৃদয়বান পুরুষের অস্তিত্বের সাড়া পেয়ে ভবেশ গৌরব বোধ করল। তারপর খুঁটে খুঁটে মা আর মেয়েব জীবন সংগ্রামের অনেক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করল ভবেশ। বহু কষ্টে আর কৃচ্ছ্রতার মধ্যেই মেয়েকে মানুষ করেছে নলিনী। এখনো দুটো টিউশনি ক'রে গীতাকে নিজের পডাব খরচ চালাতে হয়। শুধু নলিনীব রোজগারে এ সব ব্যয়েব সঙ্কুলান হয় না। খানিক শুনে এবং অনেকখানি আন্দাজ ক'রে ভবেশের মন সহানুভূতিতে ভরে উঠল।

স্বাচ্ছন্দ্য স্বচ্ছলতার মধ্যে গীতাকে যদি বড় করে তুলত ভবেশ ডাঃ নাগের মেয়ে রুচিরা ওর কাছে দাঁড়াতে পারত নাকি! গীতার হাতে গলায় কোথায় কোন অলঙ্কার নেই। ধানী রঙের সাধারণ একখানি তাঁতের শাড়ি ঘুরিয়ে পরা। তাতেই কি চমৎকাব মানিয়েছে। কি অপূর্ব্ব সুন্দরই না দেখাচ্ছে এই নিরাভবণা মেয়েটিকে।

দোবেব কাছে জুতোব শব্দ হল। সিঁড়িতে পা বেখে নলিনী একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। তার পর অস্ফুট স্বরে বলল, 'তুমি!'

নলিনীব পরনে সেই খয়েরী পাড়ের সাদা খোলেব শাড়ি, হাতে একটি পুরনো ছাতা, আর এক হাতে কতগুলি খাতা।

ভবেশ একটু হেসে বলল, 'ভাবতে পারনি যে খুঁজে বের করব? মেয়ের বিয়েটা চুপি চুপি একা একাই সেরে ফেলবে ভেবেছিলে বুঝি?'

একথার কোন জবাব না দিয়ে নলিনী মেয়ের দিকে তাকাল, 'গীতু, তুমি একবার ও ঘবে যাও তো মা। চা ক'রে নিয়ে এসো।'

আবক্ত হয়ে উঠল গীতার মুখ, মৃদু হাসি গোপন কবতে করতে দ্রুতপায়ে সে পাশেব ঘরে চলে গেল।

মৃদু হেসে প্রথম তারুণ্যেব সেই মধুর লজ্জা উপভোগ কবল ভবেশ। তাবপর নলিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মেয়েকে তাড়াতাড়ি সরিয়ে দিলে কেন। আমি কি কোন বেফাঁস কথা বলেছি?'

নলিনী বলল, 'না।'

'তবে?'

নলিনী বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার নিজের কিছু কথা আছে।'

ভবেশের সঙ্গে নলিনীর নিজের কথা! কি কথা বলবে নলিনী! এই উনিশ বছর ধরে যত কথা জমেছে তার কতটুকুই বা বলে প্রকাশ করতে পাববে?

ভবেশ নলিনীর দিকে তাকিয়ে মৃদুস্ববে বলল, 'কি বলবে বল।'

নলিনী বলল, 'নির্মলকে আজ সবই বলে এলাম।'

ভবেশ বলল, 'নির্মল কে?'

নলিনী একটু হাসল, 'অমন করে তোমাকে ভ্রূ-কোঁচকাতে হবে না। নির্মল আমার ছেলেব মত। গীতা যে কলেজে পড়ে সেখানকাব লেকচাবাব। ওব সঙ্গেই গীতার সম্বন্ধ ঠিক হয়েছে।'

ভবেশ বলল, 'তাই বল। আগে থেকেই ওদের মধ্যে জানা শোনা হয়েছিল নাকি!'

নলিনী বলল, 'তা হয়েছিল। মাইনে শ' খানেক টাকার বেশি পায় না। তবে প্রাইভেট টিউশনি করে, নোট লিখে কোন রকমে পুষিয়ে নেয়। বেশ ভালো চরিত্রবান ছেলে।' তারপর নলিনী একটু থেমে বলল, 'তোমার চেম্বার থেকে ফিরে এসে এই সাতদিন ধরে আমার ভাবনার আর সীমা ছিল না। মাথা ঠিক করে ক্লাস করতে পাবতাম না, পরীক্ষার খাতা দেখতে পারতাম না, ঘরের কাজকর্মে পর্যন্ত ভুল হয়ে যেত। জীবন ভরে এত দুঃখ কষ্ট গেছে, কই আমার মন এমন অস্থির তো কোন দিন হয়নি।'

ভবেশ বলল, 'থামলে কেন নলিনী, বল।'

নলিনী বলতে লাগল, 'কিন্তু অস্থির হলে তো চলবে না আমার। আমাকে যে কর্তব্য ঠিক করে ফেলতেই হবে। ওদের বিয়ের দিন যে এগিয়ে আসছে। একবার ভাবলাম গীতাকেই আগে বলি। ও সব খুলে বলবে নির্মলকে। কিন্তু পরে মনে হল ও কি পারবে? আমার গীতার তো কোন অপরাধ

নেই। এমন একটা শক্ত কাজের ভার কেন ওর মাথার ওপর তুলে দেব ? তাই নিজের লজ্জার কথা নিজের মুখেই বললাম। সব খুলে বললাম নির্মলকে।'

ভবেশ চমকে উঠে বলল, 'তুমি কি বলেছ নলিনী, কি বলেছ তাকে ?'

নলিনী বলল, 'যা সত্যি তাই বলেছি। বললাম নির্মল, তোমরা এতদিন যা জানতে তা মিথ্যে, গীতা ডাঃ দত্তের মেয়ে নয়। ও আমার।'

ট্রেতে ক'রে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে আসছিল গীতা। দরজার সামনে থমকে দাঁড়াল, অস্ফুট স্বরে বলল, 'মা'।

নলিনী মেয়ের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলল. 'এসো গীতু ঘরে এসো। সবাইকে চা দাও।'

কিন্তু গীতা দুজনের দিকে একবার ক'রে তাকিয়ে চায়ের ট্রেটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে ফের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এবারো বোধ হয় লজ্জা পেয়েছে গীতা। কিন্তু তখনকার লজ্জা আর এখনকার লজ্জায় তফাৎ অনেক।

ভবেশ আবেগের গলায় বলে উঠল, 'কেন এমন সর্বনাশ করলে নলিনী। আমি যে, আমি যে—।'

নলিনী বলল, 'আমি জানি তুমি কি জন্যে এসেছিলে। কিন্তু সত্য গোপন করে অল্প-বয়সে নিজের যে সর্বনাশ করেছি কোন লোভেই গীতার তেমন সর্বনাশ যেন না করি। নির্মল দু'একদিন সময় নিয়েছে। জানিনে মেয়ের ভাগ্যে কি আছে। কিন্তু যাই থাক, ওর ঘর-সংসারেব ভিত চোরাবালি দিয়ে কোনদিন গেঁথে তুলতে দেবে না।'

ঘরের মধ্যে অন্ধকার ঘন হয়ে এল। কিন্তু কেউ গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালবার প্রযোজন বোধ করল না. ভবেশ বাইরের দিকে তাকাল। পুকুরের জলেই সেই একজোড়া ফুল কোথায় মিলিযে গেছে। নারকেল গাছগুলির আড়ালে সেই অসম্পূর্ণ নতুন বাড়িটাকে এখন মনে হচ্ছে কদাকার একটা ভূতের মত।

আস্তে আস্তে উঠে পড়ল ভবেশ। বেরোতে বেরোতে বলল, 'যাই নলিনী।'

নলিনী যন্ত্রের মত আবৃত্তি করল, 'আর একদিন এসো।'

ভবেশ নিঃশব্দে গাড়িতে গিয়ে উঠল, যদি কাজ কামাই করে সে ফের আর একদিন এদিকে আসেই, আব নলিনী বাড়িতে না থাকে গীতা কি আজকের মত ওর সামনে এসে দাঁড়াবে, পা ছুঁয়ে প্রণাম করবে, তাবপর পাশে বসে হাতপাখা নিয়ে বাতাস করতে থাকবে ? তা বোধ হয় কখনো আর করবে না। ওব মুখের পিতৃ সম্বোধন দ্বিতীয়বার ভবেশের আর শোনা হবে না।

ভাদ্র ১৩৬১

বিকল্প

তিনজনের ছোট্ট সংসাবে কোন অশান্তি ছিল না। সুধা, তার বাবা হরগোবিন্দ আর সুধার ছোট ভাই হাবুল—তিনজনে মিলে শহরের সীমান্তে যে একটুখানি সংসার রচনা করেছিল তাতে অভাব অনটন অসুবিধে অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু অশান্তির কথা কারও মনে হয় নি। সরু গলির মধ্যে পুরনো' দোতলা ভাড়াটে বাড়ি। তার একতলায় একখানি মাত্র ঘর তিনজনের ভাগে জুটেছে। এই ঘরখানির মধ্যেই রান্না খাওয়া শোওয়া সব। আবার এই ঘরে ব'সেই হাবুল তার স্কুলেব পড়া পড়ে।

অসুবিধে খুবই হ'ত। সুধা মাঝে মাঝে হরগোবিন্দকে বলত, 'বাবা আর একটা ভাল বাড়ি দেখ। এই একখানা ঘরে কি চলে ?'

হরগোবিন্দ বলতেন, 'তা ঠিক। তোদের ভারি কষ্ট হচ্ছে। বাড়িটা বদলাতে হবে।'

কিন্তু বছর তিনেকের মধ্যে বদলানো আর হয়ে ওঠে নি। অবশ্য ভাল বাড়ির খোঁজ অনেকবারই এসেছে। দুখানা ঘর আর রান্নাঘর, বাথরুম সমেত ফ্ল্যাটের খবর কয়েকবারই নিয়ে এসেছে হাবুল। হরগোবিন্দ চাটুয্যে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। ছেলেমেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বাড়িও দেখে এসেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাড়া, সেলামি আর অ্যাডভান্সের অঙ্ক শুনে আর এগোন নি। পুরনো বাসায় ফিরে এসে ছেলে-মেয়েকে বলেছেন, 'দূর মিছিমিছি কতকগুলো টাকা নষ্ট করা। তার চেয়ে এই কুড়ি টাকার ঘর আমাদের ঢের ভাল। আর এর চেয়ে বেশি জায়গায় আমাদের হবেই বা কি ?'

সুধা হেসে বলত, 'আমি জানতুম বাবা। তুমি এ ঘর ছেড়ে কোথাও নড়বে না।'

হরগোবিন্দ জবাব দিতেন, 'নড়ব রে নড়ব। আগে দায় মুক্ত হই, তারপর অন্য দিকে তাকাব। এখন কি আমার বাজে খরচ করবার সময় আছে ?'

বাবার কথার মানে যে কি তা ভাইবোন দুজনেই বুঝতে পারত। হাবুল পড়তে পড়তে দিদির দিকে একবার তাকিয়ে মুখ মুচকে হেসে ফের বইয়ে মন দিত।

সুধা লজ্জিত হয়ে বলত 'বাবা আমি বুঝি তোমার একটা দায় ? তুমি কেবলই ওই এক কথা বল।'

হরগোবিন্দ বলতেন, 'দায়ই তো। পিতৃদায়, মাতৃদায়, কন্যাদায়। কিন্তু তোকে বিদায় দিয়ে কি ক'রে যে আমি থাকব তাই ভাবি।'

সুধা একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বলত, 'আমাকে বিদায় দেওয়ার কথা তোমাকে অত ভাবতে হবে না। আমি চ'লে গেলে তোমাদের চলবে কি ক'রে ? হাবুল তো এখনও কত ছোট। ও কি তোমার যত্ন-আত্তি করতে পারবে ? ও বড় হোক, বিয়ে-থা করুক, তারপর—'

হরগোবিন্দ হাসতেন, 'পাগলী। ততদিনে তুই যে একেবারে বুড়ী হয়ে যাবি।'

সুধা বলত, 'তা হ'লে তো ভাবনাই চুকে গেল। চিরকালের জন্যে তোমার বুড়ীমা হয়ে তোমার কাছে থেকে যাব। আমাকে কাছছাড়া করবার কথা তুমি আর তখন ভাবতেই পারবে না।'

কিন্তু ওই একটি মাত্র কথা ছাড়া হরগোবিন্দের আর কোন ভাবনাই যেন নেই। দিনের বেশির ভাগ সময় অফিসের কাজে কাটে। বাকি সময়টুকু সুধার বিয়ের চিন্তা, চেষ্টা আর আলোচনা নিয়েই থাকেন হরগোবিন্দ।

পাড়ায় কৃপণ ব'লে বদনাম আছে তাঁর। কোন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের জন্যে চাঁদা চাইতে গেলে সিকি-আধুলির বেশি তাঁর হাত দিয়ে গলে না। নিজের জামা কাপড় জীর্ণ হয়, ময়লা হয় ; সে সম্বন্ধে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু ছেলের পোশাক আর মেয়ের শাড়ি গয়না কিনে দেওয়ার দিকে দারুণ ঝোঁক। ফুরসৎ পেলেই মেয়েকে নিয়ে স্যাকরার দোকানে যান। পুরনো গয়না ভেঙে নতুন ডিজাইনের ফরমায়েস দেন। বছরে দু-চারখানা ক'রে নতুন গয়না না গড়ালে হরগোবিন্দের তৃপ্তি হয় না। সুধা প্রায়ই আপত্তি করে, 'এত গয়না কেন করছ বাবা ?'

হরগোবিন্দ জবাব দেন, 'সব তো এক সঙ্গে করতে পারব না, আস্তে আস্তে ক'রে রাখি। তোর মার তো কিছুই পেলিনে।'

প্রায় বছর তিনেক যক্ষ্মায় ভুগে সুধার মা নির্মলা মারা গেছেন। সেও বছর দশেক হ'ল। তখন মাইনে বেশি ছিল না হরগোবিন্দের। স্ত্রীর ওষুধ-পথ্যের খরচ জোগাতে তাঁর গায়ের গয়না থেকে শুরু ক'রে নিজের ঘড়ি বোতাম পর্যন্ত গেছে। আরও প্রায় সাত-আট শ' টাকা দেনা হয়েছিল। কষ্ট করে থেকে বিলাস-ব্যসন ত্যাগ ক'রে সব দেনাদায় শোধ দিয়ে আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পেরেছেন হরগোবিন্দ। তাঁর মত একজন দেড় শো টাকার কেরানীর পক্ষে এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। সুধাকে ভাল ঘরে-বরে দেবেন—এখন এই তাঁর একমাত্র সাধ। সেই সাধ মেটাবার জন্যে তিনি অসাধ্য সাধন করছেন। অফিসের চাকরির পরে একটি পার্টটাইম কাজ নিয়েছেন। সংসার খরচের জন্যে যা লাগে মেয়ের হাতে তুলে দেন, বাকী টাকাটা ব্যাঙ্কে রাখেন। গয়নাও অল্প স্বল্প মেয়ের গায়ে

থাকে। পাছে হারিয়ে যায় কি চুরি যায়, সেই আশঙ্কায় বিদেশী ব্যাঙ্কে বেশি ভাড়া দিয়ে বাকীগুলি নিরাপদে রাখেন হরগোবিন্দ।

মাঝে মাঝে হাবলু সুধাকে বলে, 'দিদি, বাবা তোকেই সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন।'

সুধা হেসে জবাব দেয়, 'ভারি হিংসুটে তো তুই! কিসে প্রমাণ পেলি? বাটখারায় ওজন ক'রে দেখেছিস?'

হাবলু বলে, 'দেখেছি বই কি। আমার যেখানে এক পো তোর সেখানে এক সের। তোর বিয়ের জন্যেই তো বাবা কেবল টাকা জমাচ্ছেন।'

সুধা বলে, 'ও, তোর বুঝি সেই দুঃখ! তোর বিয়ের জন্যেও আর একজনের বাবা এর চেয়ে বেশি টাকা জমিয়ে তুলছে তা জানিস?'

টাকাও জমে, গয়নাও জমে। বিয়েই শুধু হয় না সুধার। তিন চার বছর ধরে এত সম্বন্ধ এল গেল, কিন্তু হরগোবিন্দের মোটে পছন্দই হয় না। যে ছেলের রূপ আছে তার বিদ্যা কম যার বিদ্যা আছে তার আবার বিদ্যা বিক্রির সামর্থ্য কম, যার অর্থ আছে তার আবার কুল নেই, এমনি বাছাই করতে করতে সুধার বয়স কুড়ি পেরিয়ে গেল।

সুধার মাসীমা থাকেন বউবাজারে। তিনি প্রায়ই এসে হরগোবিন্দকে তিরস্কার ক'রে যান 'জামাইবাবু, এ করছেন কি? দেখে শুনে মেয়ের এবার বিয়ে দিন। বয়স হয়ে গেছে। এখন বেশি বাছবিচার করা কি ভাল?'

হরগোবিন্দ জবাব দেন 'কি করব বল কমলা? তোমার মত চার পাঁচটি তো নয় আমার ওই একটি মাত্রই মেয়ে। বাছবিচার একেবারে ছেড়ে দিলে কি চলে? তা ছাড়া হিন্দুর ঘর। একবার ভুলভ্রান্তি হ'লে তো আর শোধরাবার জো নেই।

সুধাও বাপের পক্ষ টেনে কথা বলে। তারও বিয়েতে ভারি অমত। হাবুল আরও বড় হোক স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকুক, নিজের শরীরের আর জিনিসপত্রের যত্ন নিতে শিখুক, তারপর বিয়ে করবে সুধা। এখন দিদিকে না হ'লে হাবুলের যে একদিনও চলে না

মেয়ের এই যুক্তিতর্কে মনে মনে খুশিই হন হরগোবিন্দ। শুধু বাইরের চেহারাই নয়, হৃদয়টাও মায়ের মতই পেয়েছে সুধা। ভারি কোমল মন, স্নেহভরা বুক। হরগোবিন্দ অফিসে বেরবার আগে লন্ড্রি থেকে ধুইয়ে আসা শার্টে যখন বোতাম পরাতে বসে সুধা, কি উপুড় হয়ে তাঁর পায়ের জুতা ব্রাশ করতে থাকে, দেয়ালে টাঙানো নির্মলার প্রথম যৌবনের ফোটোর সঙ্গে মেয়েকে মিলিয়ে দেখেন হরগোবিন্দ। আকৃতি-প্রকৃতিতে ঠিক একেবারে দ্বিতীয় নির্মলা। তেমনি পিঠভরা কালো চুলের রাশ, তেমনি শ্যামলা গায়ের রঙ, আর ঠিক তেমনি নাক চোখ ঠোঁটে চিবুকের ছাঁদ। সুধার মায়ের সঙ্গে তার যে এত মিল আছে, তা ওর মাসী মেসো স্বীকার করতে চায় না। কিন্তু নির্মলাকে কি হরগোবিন্দের চেয়ে তারা বেশি দেখেছে, না বেশি জেনেছে?

শুধু বাপকেই নয়, ভাইকেও ভারি যত্ন করে সুধা। হরগোবিন্দের মনে হয় নির্মলা বেঁচে থাকলেও যেন হাবুলের এত বেশি যত্ন হ'ত না। এই সেদিন পর্যন্ত গামছা দিয়ে ভিজে মাথা মুছে তার টেরি কেটে দিয়েছে সুধা। আজকাল হাবু দিদির চেয়ে ইঞ্চি দুই লম্বা হয়ে গেছে ব'লে সুধার পক্ষে ভাইয়ের মাথা আঁচড়ে দেওয়ার সুবিধে হয় না। কিন্তু এখনও নাওয়ার খাওয়ার সব ব্যাপারেই হাবুল দিদির ওপর নির্ভরশীল। থার্ড ক্লাসে পড়লে হবে কি, বয়স চোদ্দ উতরে পনেরোয় পড়লেই বা কি হবে, স্বভাবে এখনও হাবুল প্রায় আট দশ বছরের বালক। যেমন আগোছালো, তেমন অন্যমনস্ক। ওর বইপত্তর খাতা-কলম কোথায় থাকে, স্কুলের সময় সব খোঁজ পড়ে। অফিসে যাওয়ার সময় হরগোবিন্দ যেমন ব্যস্ত হতে থাকেন—সুধা, সুধা, হাবুলও তেমনি স্কুলে যাওয়ার সময় ডাকে—দিদি, দিদি।

রান্না রেখে, কি হাতের অন্য কাজ ফেলে সুধাকে তৎক্ষণাৎ উঠে আসতে হয়। বিয়ের কথায় ও যে হাবুলের নাবালকত্বের দোহাই দেয় তা একেবারে অযথা বলা চলে না।

হরগোবিন্দও সন্তানবৎসল কম নন। ঠিকে-ঝি যেদিন কাজ কামাই করে তিনি নিজের হাতে বালতিতে ক'রে জল টানেন, মেয়ের উনুন ধরিয়ে দেন।

সুধা আপত্তি ক'রে বলে, 'আচ্ছা বাবা, তুমি যদি এসব করবে তো আমি আছি কি জন্যে ? দু বালতি জল কি আমি তুলতে পারি না ?' হরগোবিন্দ মাথা নেড়ে বলেন, 'না পার না। জল তুলতে গিয়ে তোমার মোমের মত তুলতুলে হাতে যদি কড়া প'ড়ে যায় তোমার শ্বশুর শাশুড়ী কি আমাকে খোঁটা দিতে ছাড়বেন ? আর শুধু কি শ্বশুর শাশুড়ী ? তাঁদের সুপুত্রটিও আমাকে ছেড়ে কথা কইবেন না।' সুধা লজ্জিত হয়ে মুখ নীচু ক'রে বলে, কি যে বল বাবা।'

উনুন ছাড়াও একটি স্টোভ আছে ঘরে। কিন্তু পারতপক্ষে সেটা সুধাকে হরগোবিন্দ ধরাতে দেন না। যদি কোন বিপত্তি ঘটে ! যদি কোন খুঁত হয়ে যায় মেয়ের, তা হ'লে কি রক্ষা আছে ! প্রথম প্রথম ঘরের মেঝেয় ঢালা বিছানা ক'রে ছেলেমেয়েকে নিয়ে একসঙ্গেই শুতেন হরগোবিন্দ। এক পাশে তিনি, মাঝখানে হাবুল, আর একপাশে সুধা। কিন্তু একদিন ঘুমের ঘোরে 'গোল' 'গোল' ক'রে দিদির গায়ে লাথি ছুঁড়ল হাবুল। সুধা না ঠেকালে হাবুলের কপালে যে সেদিন কি হ'ত তা বলা যায় না। মেয়ের জন্যে ছেলেকে মারতে পারলেন না হরগোবিন্দ কিন্তু আচ্ছা ক'রে বকুনি লাগালেন। তারপর ছোট একখানা তক্তপোশ কিনে এনে সুধার আলাদা বিছানার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। তার কোনও আপত্তি শুনলেন না। কেবলই বলতে লাগলেন, যদি চোখে মুখে লেগে যেত তা হ'লে কি হ'ত ?

সুধা বললে ম'রে যেতাম একেবারে। আমার কি এমনই মোমের শরীর যে, একটা টোকা পর্যন্ত সইতে পারি না !

হরগোবিন্দ বললেন কেন সইবি ? মেয়ে হয়ে যখন জন্মেছিস জীবনভোর কত কি সইতে হবে। কিন্তু আমার কাছে যতদিন আছিস একটু আঁচড়ও তোর গায়ে আমি লাগতে দেব না

তক্তপোশে শোয় সুধা আর নীচে হাবুলকে নিয়ে থাকেন হরগোবিন্দ। কিন্তু হরগোবিন্দ ঘুমোন না। শুয়ে শুয়ে মেয়ের সঙ্গে গল্প করতে থাকেন। তাঁর সেই প্রথম জীবনের গল্প প্রথম যৌবনের গল্প। স্কুল কলেজ, বন্ধু বান্ধব সাঁতার শিকার দেশভ্রমণ আর দুঃসাহসিকতার কাহিনী। সুধার মায়ের কথাও ওঠে। মেয়ের কাছে কিছুই গোপন করেন না হরগোবিন্দ। মেয়ে এখন তাঁর বান্ধবীর মত। নির্মলার সেই প্রথম বয়সের মান-অভিমান শাড়ি-গয়নার আবদার খুঁটিনাটি নিয়ে কলহ মিলনের কাহিনী এসব গল্প সুধা বহুবার শুনেছে। কিন্তু কোন কথা ব'লে বাবাকে একবারও বাধা দেয় না তারপর অতীত থেকে ভবিষ্যতে চলে যান হরগোবিন্দ। সুধার ভাবী ঘর-সংসারের চিত্র আঁকেন। মেয়ের শ্বশুর-বাড়িতে কত ছলে কতবার ক'রে যাবেন, শ্রদ্ধাভাজন হয়েও জামাইয়ের সঙ্গে কি রকম বন্ধুর মত ব্যবহার করবেন বছরের কবার ক'রে মেয়ে জামাইকে নিয়ে কলকাতার বাইরে সমুদ্র কি পাহাড়ের ধারে বেড়াতে বেরুবেন তার কল্পনাকল্পনা চলে জামাই পেশায় কি হবে ডাক্তার না উকিল প্রফেসার না ইঞ্জিনিয়ার, সে সম্বন্ধে মেয়ের মতামত জিজ্ঞেস করেন হরগোবিন্দ তার গায়ের রঙ, চোখ-মুখের গড়ন, শরীরের দৈর্ঘ সম্বন্ধেও মেয়ের মত নিতে ছাড়েন না।

হরগোবিন্দের এত জিজ্ঞাসার এত জল্পনা-কল্পনার উত্তরে সুধা সংক্ষেপে বলে, 'তোমার পছন্দেই আমার পছন্দ বাবা। তুমি যেমন চাইবে তেমনি হবে।'

ছেলে মেয়ে নিয়ে হরগোবিন্দ বেশ ছিলেন। তাঁদের এই ছোট্ট সংসারে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কারুরই বিশেষ কোন স্থান ছিল না। যেন বাইরের জগতের কাউকে দিয়ে তেমন কোন প্রয়োজন নেই হরগোবিন্দের। কিংবা যেটুকু প্রয়োজন আছে সেটুকু শুধু বাইরেরই প্রয়োজন। কাগজের হকার দুধওয়ালা, কয়লাওয়ালা, মুদী আর ট্রামবাসের কণ্ডাক্টারের মতই স্বজনবন্ধু পাড়'পড়শীর সঙ্গে ব্যবহার করতেন হরগোবিন্দ। তাঁরা কেউ এলে দু মিনিট যেতে না যেতেই তিনি তাঁদের বুঝিয়ে দিতেন, তৃতীয় কি চতুর্থ মিনিটে তাঁদের ঘরে আগন্তুকের আর থাকবার দরকার নেই। হরগোবিন্দের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মধ্যে সবচেয়ে যাঁরা কাছে থাকেন—তাঁর শ্যালিকা কমলা আর ভায়রাভাই মণিময় চক্রবর্তী—তাঁরা পর্যন্ত এসে অস্বস্তি বোধ করতেন। বেশিক্ষণ টিকতে পারতেন না। কমলা বোনপো-বোনঝিকে মাঝে মাঝে নিয়ে নিজের কাছে রাখতে চাইতেন, কিন্তু 'আজ নয়, কাল' ব'লে

একটা না একটা অজুহাতে হবগোবিন্দ প্রাযই তাঁব অনুবোধ এড়িযে যেতেন। ইদানীং অভিমানে কমলা আব তাদেব নেওযাব কথা মুখে আনতেন না।

ছুটিছাটাব দিনে হবগোবিন্দ নিজেই মাঝে মাঝে ছেলে-মেযেকে নিযে বেড়াতে বেকতেন। কোনদিন আত্মীযস্বজনদেব বাড়ি, কোনদিন চিড়িযাখানা যাদুঘব, কোনদিন বা গঙ্গাব ধাব দিযে ঘুবে বেড়াতেন। বছবে একবাব ক'বে সিনেমা আব একবাব ক'বে সার্কাস ববাদ্দ ছিল সুধা-হাবুলেব জন্যে। হবগোবিন্দ নিজেই ওদেব সঙ্গে ক'বে নিযে যেতেন। তাদেব মাঝখানে আব কেউ আসুক আব কেউ থাকুক, তা তিনি বড একটা পছন্দ কবতেন না।

তবু চতুর্থ ব্যক্তিব আবির্ভাব ঘটল।

ডাক্তাব নয, উকিল নয, প্রফেসব, ইঞ্জিনিযাব কিছু নয, সে নেহাতই সাধাবণ একজন প্রাইভেট টিউটব, নাম ইন্দুভূষণ দাস। তাব বযস ছাব্বিশ-সাতাশ, বঙ কালো, আকাব মাঝাবি, চোখ ছোট, নাক চ্যাপটা। সুপুকষ তাকে কিছুতেই বলা চলে না, ববং স্বভাব এত শান্ত আব নিবীহ যে পুকষ বলতেও দ্বিধা হয।

থার্ড ক্লাস থেকে সেকেণ্ড ক্লাসে প্রমোশন পেল বটে হাবুল, কিন্তু কোন বিষযেই নম্বব ভাল পেল না। ইংবেজীতে টেনে-টুনে পাশ কবেছে, অঙ্কে পাশেব নম্বব পর্যন্ত পায নি।

সুধা বলল, 'বাবা, আমাকে না হয সেকেণ্ড ক্লাস থেকেই পড়া ছাড়িযে এনে ঘবে বসিযে বেখেছ, হাবুলকে তো আব তা পাববে না। ওকে পড়াতেই হবে। কিন্তু শুধু স্কুলেব ওপব যদি ভবসা কব, ওব কিচ্ছু হবে না তা ব'লে দিচ্ছি।'

হবগোবিন্দ বললেন 'তা হ'লে কি কবতে হবে?'

সুধা বলল, 'প্রাইভেট টিউটব বাখ।'

হবগোবিন্দ বললে, 'ওবে বাবা, সে যে বহু টাকাব ধাক্কা।'

সুধা বলল, 'হোক। ও যদি মানুষ না হয, টাকা দিযে কববে কি? তোমাব দেখবাব যখন সময নেই, মাস্টাব একজন না বাখলে চলবে না।'

প্রথম খোঁজ পড়ল পাকা দাড়িওযালা অভিজ্ঞ শিক্ষকেব, কিন্তু তাদেব দক্ষিণা অনেক। চল্লিশ-পঞ্চাশেব কমে কেউ সব বিষযে পড়িযে যেতে বাজী নন। শেষ পর্যন্ত দবকষাকষি ক'বে কুড়ি টাকায ইন্দুভূষণকে পাওযা গেল। সে শ্যামবাজাবেব একটা মেসে থাকে। ওঁদিকেবই কোন একটা হাই-স্কুলে পড়ায আব টিউশনি কবে। বেলগাছিযাব এদিকে আবও দু-এক বাড়িতে ছেলে পড়িযে সুনাম কিনেছে। হবগোবিন্দেব দু'তিনজন প্রতিবেশী তাব জন্য সুপাবিশ কবলেন।

হবগোবিন্দ ইন্দুভূষণকে নিজেব ঘবে নিযে এসে ছেলেমেযেদেব সঙ্গে পবিচয কবিযে দিলেন। তাবপব হেসে বললেন,'আপাতত কুড়ি টাকা ক'বেই দেব। তাবপব ছেলেব বেজাল্ট যদি ভাল হয তখন আলাদা বকশিস আছে। মিথ্যে বলছিনে, তখন যা চাইবেন—'

ঘবেব এক কোণে ব'সে তবকাবি কুটছিল সুধা, বাবাব কথা শুনে ভাবি লজ্জা পেল। ছি-ছি, একজন ভদ্রলোকেব সঙ্গে কি অমন ক'বে কথা বলতে হয।

ইন্দুভূষণ হেসে বলল, ও যদি ভাল বেজাল্ট কবে, সেই তো আমাব সবচেযে বড বকশিস হবগোবিন্দবাবু।'

বঁটি থেকে চোখ তুলে ইন্দুভূষণেব দিকে তাকাল সুধা। তাব ঠোঁটে তখন একটু হাসি লেগে বযেছে। সুধাব মনে হ'ল, এমন শান্ত সুন্দব হাসি সে জীবনে আব কাবও মুখে দেখে নি। তা'ছাড়া পাল্টা জবাবটাও ভাবি চমৎকাব লাগল। এমন কথা যে কোন পেশাদাব শিক্ষকই হযতো বলেন, বলতেন। কিন্তু সুধাব মনে হ'ল, এমন অন্তব দিযে কেউ বলতে পাবতেন না।

পবদিন থেকে বোজ সন্ধ্যায ইন্দুভূষণ হাবুলকে পড়াতে আসে। সুধা নিজেব খাটেব ওপব ফবসা চাদব পেতে শিক্ষক-ছাত্রেব বসবাব আসন কবে দেয। ইন্দুভূষণ হাবুলকে একমনে পড়াতে থাকে। ঘবে যেন আর দ্বিতীয কেউ নেই। এতটা মনোযোগ সুধাব কেন যেন ভাল লাগে না। ডালে সম্ববা দিতে দিতে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা কবে, 'বান্নাব গন্ধে আপনাব খুব কষ্ট হচ্ছে না?'

ইন্দুভূষণ হাবুলেব অঙ্কেব ভুল বাব কবে দিযে সুধাব দিকে তাকায, 'আমাকে বলছেন?'

সুধা হেসে বলে, 'নয়তো কাকে ? আপনি কি ভেবেছেন হাবুলের সঙ্গে এতক্ষণ ভদ্রতা করছিলাম ?'

ইন্দুভূষণও না হেসে পারে না, বলে 'ও ! ভদ্রতা ! তা হলে তো ভদ্রতা করে আমাকেও জবাব দিতে হয়—না না, মোটেই কষ্ট হচ্ছে না, ভাবি চমৎকার লাগছে।'

সুধা হাসি মুখে বলে, 'আর যদি ভদ্রতা বাদ দিয়ে বলেন তাহলে ?'

ইন্দুভূষণ জবাব দেয়, 'তা হলেও আমার বক্তব্যটা বদলায় না। আপনি মোটেই উদ্বিগ্ন হবেন না। রান্নার গন্ধ আমার সত্যিই খুব ভাল লাগে।'

'আপনি ঠাট্টা করছেন। এমন জায়গায় বসে কেউ পড়াতে পারে ?'

ইন্দুভূষণ একটু চুপ করে থেকে বলে, 'না ঠাট্টা নয়। আপনাকে রাঁধতে দেখে নিজের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তখন পড়াতুম না, পড়তুম। বাবা ছিলেন ওষুধের ক্যানভাসার। বাইরে বাইরে ঘুরতেন। মার ওপর ছিল সব ভার। তিনি জোর করে টেনে নিয়ে রান্নাঘরে বসাতেন। হলুদ মাখা হাতে কালো শ্লেটের ওপর অঙ্ক লিখে দিতেন। অনেক দিন পরে ঠিক সেই রান্নার ঝাঁজ, রান্নার গন্ধ আজ পেলাম এখানে।'

শুনতে শুনতে সুধার গা কেন যেন সিরসির ক'রে ওঠে। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনার মা এখন কোথায় আছেন ?'

ইন্দুভূষণ জবাব দেয় 'আমার স্মৃতিতে।

'আর বাবা ?'

'বছর পাঁচেক হল তিনিও চলে গেছেন।'

সুধা খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। কড়ার মধ্যে অনড় হয়ে থাকে খুন্তি। একটু বাদে ফের সে জিজ্ঞাসা করে 'আর কে কে আছেন আপনার ? ভাই বোন ?'

ইন্দুভূষণ বলে, কেউ না।'

সুধা যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠে, 'কেউ না ! কেউ না থাকলে মানুষ থাকে কি করে ? আমারও মা নেই, কিন্তু বাবা আছেন, ভাই আছে। আর আপনার সত্যিই কেউ নেই ?'

ইন্দুভূষণ এ কথার কোন জবাব না দিয়ে সুধার সেই মমতাভরা করুণা-ভরা কালো বড় বড় চোখ দুটির দিকে অবাক হয়ে একটুকাল তাকিয়ে থাকে। তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে ছাত্রকে বলে, 'হাবুল এবার রেকারিংয়ের অঙ্কটা কর তো।'

এমনি করে আস্তে আস্তে আলাপ জমে, আলাপ এগোয়।

একদিন সুধা বলে, 'আপনি তো রোজ শুধু রান্নার গন্ধ নিয়েই যান। আজ আপনাকে খেয়ে যেতে হবে।'

ইন্দুভূষণ আপত্তি করে, 'না, না। তারপর একটু হেসে বলে, 'ঘ্রাণেই তো রোজ অর্ধভোজন হয়ে যায়।'

সুধা বলে কিন্তু দু-একদিন পূর্ণভোজনও হতে পারে। তাতে আপনার জাত যাবে না।'

ইন্দুভূষণ বলে, 'আমাদের জাতের জন্যে তো ভয় নেই।'

সুধা বলে, 'আমাদের জাতের জন্যেই বুঝি ভয় ! আপনি ভাববেন না, অত বাচবিচার আমরা করি নে। তা হ'লে কি আর এ ভাবে থাকতে পারি ?'

পড়ানো হয়ে গেলে ইন্দুভূষণকে খেতে বসতে হয়। আয়োজনে পরিবেশনে খুবই যত্ন নেয় সুধা। দু-একটা নতুন তরকারি রাঁধে। যেন কোন উৎসবের দিন এসেছে। এ ধরনের নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ মাসে দু-তিন দিন লেগেই থাকে।

একদিন অফিসে বেরুবার সময় হরগোবিন্দ ছেলেকে ডে'ক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি রে হাবুল, মাস্টারমশাই কেমন পড়াচ্ছে তোকে ?'

হাবুল বললে, 'ভালই পড়াচ্ছেন বাবা।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'আচ্ছা তুই আমার জন্যে একটা সিগারেট নিয়ে আয় তো।'

হাবুল বেরিয়ে গেলে মেয়েকে বললেন, 'সুধা, তোকে একটা কথা বলি।'

'বল।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'মাস্টার যাতে ফাঁকি না দেয়, যতক্ষণ থাকে যাতে মন দিয়ে পড়ায় তুইই তা দেখবি। কিন্তু তুই নিজে নিজেই নাকি তার সঙ্গে গল্পগুজব করে সময় নষ্ট করিস?'

বাপের শাসনে সুধার মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'এ নালিশ তোমার কাছে কে করেছে বাবা? হাবুল?'

'হাবুল কেন করবে? সে করলে কোন দোষের হত না। কলতলায় অন্য ভাড়াটেরা সব আলোচনা করছিল, তাই কানে গেল।'

সুধা বললে, 'এর আগে অন্য কারও কথা তো তুমি কানে তুলতে না বাবা।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'এখনও তুলি নে। তবে জানিস তো, বাড়িটায় যত সব বাজে লোকের আড্ডা। তা ছাড়া আমার ঘরে আর তো কোন মেয়েছেলে নেই। তাই আমাদের একটু সাবধান হয়ে চলাই ভাল।'

'বেশ তুমি যদি বল, তাই চলব বাবা।'

হ্যাঁ, তাই চলিস। আর অত খাওয়ানো-দাওয়ানোরই বা দরকার কি! কোন উপলক্ষ টুপলক্ষ হলে বললি, সে এক কথা।

সুধা বলল, বেশ।'

কলতলায়, বাথরুমে, বাড়ির আরো সব ভাড়াটের ঘরে ইন্দুভূষণের সঙ্গে তার এই ঘনিষ্ঠতা নিয়ে যে ফিসফিস গুজগুজ শুরু হয়েছে তা সুধারও কানে গেছে। তারই প্রায় সমবয়সী কোণের ঘরের বেণু সেদিন গায়ে পড়ে হেসে বলেছে, 'কি ভাই মাস্টারমশাই শুধু হাবুলকে পড়ান না তোমাকেও পড়ান?

সুধা গম্ভীরভাবে জবাব দিয়েছে, 'আমাকেও পড়ান।'

দোতলার সরকারদের ছোট বউ সুলতা কাছেই ছিল, সে সঙ্গে সঙ্গে হেসে জিজ্ঞাসা করেছে, ও মা, তাই বল। তা কোন ক্লাসের পড়া পড়ান তোমাকে—বি এ ক্লাসের বুঝি?' বলতে বলতে হেসে বেণুর গায়ে গড়িয়ে পড়েছিল সুলতা।

সুধা কোন কথা না ব'লে জল নিয়ে ঘরে চ'লে এসেছে।

কিন্তু শুধু বউ ঝিরাই নয়, এ বাড়ির পাঁচঘর ভাড়াটের নানাবয়সী পুরুষরা পর্যন্ত ব্যাপারটা সম্বন্ধে উৎসুক হয়ে উঠেছে। সুধা যাদের কাকাবাবু আর মেসোমশাই বলে সেই প্রৌঢ় কম্পাউণ্ডার পঞ্চানন সরকার পোস্ট-অফিসের কেরানী হীরালাল গাঙ্গুলি, রেল অফিসের বীরেশ্বর মিত্র, সুধা যাদের নামের সঙ্গে দাদা যোগ করে ডাকে, সেই বাসু, রণজিৎ আর সুরেন সকলেরই কানে গেছে, চোখে পড়েছে বিষয়টা। তাদের ভাবভঙ্গি, হাসি আর তাকাবার ধরন দেখলেই সুধা টের পায়, সকলেই যেন কিছু একটা মনে মনে আন্দাজ করেছে।

এতদিন হরগোবিন্দকে সবাই বলত দাম্ভিক, অমিশুক, অসামাজিক। সুধাকেও তাই বলত। বেশিরকম দেমাকী, অহংকারী। তারপর সকলেই তাদের সম্বন্ধে উদাসীন হয়ে থাকত। সুধা আজও সেই উদাসীনই রয়েছে, কিন্তু অন্য সবাই যেন আগের মত আর দূরে স'রে থাকতে পারছে না। বাবা আর ভাই ছাড়া তৃতীয় আর একটি পুরুষের সঙ্গে সুধার সামান্য আলাপ হয়েছে বলে এই গোটা বাড়িটা যেন তার ছোট্ট ঘরখানির মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়তে চাইছে। শুধু যে তারাই সুধার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে তাই নয়, সুধাও তাদের সম্বন্ধে অচেতন থাকতে পারছে না। এ বাড়িতে যে এতগুলি লোক থাকে তা কি সুধাই এতদিন টের পেয়েছে। শুধু এ বাড়িটাই বা কেন, তাদের গলির আরও দু-তিনখানা বাড়ির মেয়ে পুরুষে পর্যন্ত জেনে ফেলেছে কথাটা। ইন্দু মাস্টার সম্বন্ধে তাদের খোঁজ খবর নেওয়ার ধরন দেখেই সুধা তা বুঝতে পেরেছে। যেন প্রাইভেট টিউটর আর কারও বাড়িতে আসে না, তার সঙ্গে বাড়ির আর কোন মেয়ে কি বউ কথা বলে না, যেন এ পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে একটি মেয়ের এই সর্বপ্রথম আলাপ হয়েছে।

কিন্তু অন্য কারও বাঁকা কটাক্ষে, খোঁচা দেওয়া কথায় সুধার কিছু এসে যায় না। বাবা যে তাকে আরও একদিন সতর্ক করে দিলেন, তাতেই সুধার মনে একটু লাগল।

হবগোবিন্দ বললেন, 'সুধা, একটু সাবধান হয়ে চলিস। তোব ঘবে তো মা নেই, আব কাজকর্ম ফেলে বেশিক্ষণ ঘবে বসে থাকা আমাব পক্ষেও সম্ভব নয়। তোব নিজেকেই বুঝে সমঝে চলতে হবে।'

সুধাব ভাবি দুঃখ হল, মনে মনে ঠিক কবল ইন্দুভূষণেব সঙ্গে সে আব কোন কথা বলবে না। চাযেব কাপটি পর্যন্ত হাবুলকে দিয়ে দেওযাবে

কিন্তু সঙ্কল্প বাখা গেল না। সুধা কথা না বললে কি হবে, আজ অন্যপক্ষ থেকে কথা শুরু হল। হাবুলকে এক প্যাসেজ ট্রানস্লেশন কবতে দিযে চাযেব কাপে চুমুক দিতে দিতে ইন্দুভূষণ হঠাৎ জিজ্ঞাসা কবল 'আজ বড গম্ভীব হয়ে বযেছেন যে? শবীব খাবাপ কবেছে নাকি?'

শেষেব কথাটুকুতে ভাবি মমতা প্রকাশ পেল ইন্দুভূষণেব। সে নিজে থেকে সহজে আগে আলাপ কবে না। আজ কবল। এটাও ভাবি নতুন লাগল সুধাব ভাবি ভাল লাগল। বাডিসুদ্ধ লোকেব বিরূপতা ইন্দুভূষণেব ওই এক ফোঁটা দবদে যেন সব ধুযে মুছে গেছে।

প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়ে সুধা বলে ফেললে 'মানুষেব শবীবটাই বুঝি সব?

সুধাব অভিযোগেব ভঙ্গিতে ইন্দুভূষণ মৃদু হাসল, 'ও, আপনি বুঝি মন খাবাপ কবাব কথা বলছেন। সত্যি মন খাবাপ হওযাটা শবীব খাবাপ হওযাব চেযে ঢেব কষ্টেব '

মন খাবাপ হওযাব কথা শুনতেও এত ভাল লাগে।

সুধা হেসে বলল, আপনি কি কবে জানলেন? আপনাবও মাঝে মাঝে মন খাবাপ হয নাকি?'

হয বৈকি।'

তখন কি [illegible]?

চুপচাপ বসে থাকি না হয বই পডি। আচ্ছা আপনি কি কেবলই বান্নাবান্না ঘব সংসাব নিয়ে থাকেন বইটই পডেন না?

পডি বই কি হাতেব কাছে যা পাই তাই পডি।

ইন্দুভূষণ হাসল, আপনি বুঝি প্রতিজ্ঞা কবেছেন হাতেব কাছে যা পাবেন শুধু তাই পডবেন?'

সুধা মুখ তুলে একবাব তাকাল তাবপব চোখ নামিযে মৃদু স্ববে বলল, 'কেউ যদি খুঁজে পেতে এনে দেয তাও পডতে পাবি।

ইন্দুভূষণ যেন শুধু এইটুকুব অপেক্ষায ছিল তাবপব থেকে প্রায বোজ সে বই আনতে লাগল। সব গল্প-উপন্যাস নয। জীবন চবিত ভ্রমণ-কাহিনীও আছে। কিন্তু সুধাব গল্প উপন্যাস ছাডা আব কিছুতে মন ওঠে না।

আস্তে আস্তে সুধাব কাছে আব এক জগতেব দ্বাব খুলে যেতে লাগল। সে জগৎ এই ভাডাটে বাডিব লোকজনেব মত অনুদাব নয প্রতিকূল নয সে জগৎ বড মনোবম আব মধুব। এব আগে কে জানত পৃথিবীতে এত ভাল ভাল বই আছে। আব সে সব বইযেব লেখকেবা সুধাবই মনেব কথা চুবি ক'বে নিয়ে লিখেছে। এব আগে কে জানত তাদেব বাডিব সামনে ছোট্ট পুকুবটাব ধাবে যে দুটো নাবকেলগাছ বযেছে তাদেব পাতাগুলি সবুজ, বোসেদেব বাডিব ছাদে সাদা সাদা চন্দ্রমল্লিকাব টবগুলি এত সুন্দব। তাবও ওপবে অগুণিত তাবাভবা আবও সুন্দব আকাশ কি চোখে পডেছে এব আগে।

মাঝে মাঝে দশ-বাবো বছবেব একটি ছেলে এই বাস্তায ফুল ফিবি কবতে আসে, তাব নাম সুখন। ওব নামটি যে এত ভাল, এমন ধ্বনিময, অর্থময কই, এব আগে তো সুধাব খেযাল হয নি। তাব কাছ থেকে প্রাযই চাব আনা ছ' আনাব ফুল কিনে নেয সুধা। কোনদিন সাদা বেল কি বজনীগন্ধা। কোনদিন বা বক্তগোলাপ। কোনদিন সে ফুলে ফুলদানি সাজায, কোনদিন নিজেব খোঁপায গোঁজে।

হবগোবিন্দেব কিছুই চোখ এডায না। মনে মনে ভাবেন, আজকালকাব মেযেগুলিব লজ্জা শবম বড কম। একদিন স্পষ্ট কবেই বললেন, 'মিছিমিছি ফুলেব পেছনে এত পযসা নষ্ট কবিস কেন সুধা?'

সুধা জবাব দেয়, 'কই ফুল তো বেশি কিনি নে বাবা।'

হরগোবিন্দ ভিজে গামছা দিয়ে গা রগড়াতে রগড়াতে বলেন, 'এতেও তোর বেশি কেনা হয় না। তুই কি বাগান সুদ্ধ কিনতে চাস ? হ্যাঁ, আর এক কথা। গয়না যদি পরতে ইচ্ছা হয়, বল্, ভল্ট থেকে সব নিয়ে আসি। ওসব ফুলের সাজ-টাজ ভাল না। ভদ্রলোকের মেয়েরা ও ভাবে সাজে না। ও সব করে—' রূঢ় কথাটা পালটে নিয়ে হরগোবিন্দ বলেন, 'ইয়েরা।'

সুধা হয় নিরুত্তর থাকে, না হয় অন্য কথা পাড়ে। মনে মনে খুবই রাগ হয় তার। বাবা যেন আজকাল কি রকম হয়ে যাচ্ছেন। সে খোঁপায় ফুলের মালা জড়াল কি না জড়াল তা কেন বাবা দেখতে আসবেন। সংসারের কাজ-কর্ম কি সেবাযত্নের যদি কোন ত্রুটি হয় তবেই তিনি রাগ করবেন। মেয়ের সাজসজ্জার দিকে কেন তাঁর চোখ পড়বে।

কিন্তু হরগোবিন্দ পছন্দ না করলে কি হয়, ইন্দুভূষণ যে ফুল খুব ভালবাসে তা সুধাব বুঝতে বাকি নেই। সে প্রশংসা-ভরা চোখে সুধার ফুলদানির দিকে তাকায়, ছাত্রকে জ্যামিতির উপপাদ্য বোঝাতে বোঝাতে এক-একবার খোঁপার গোলাপটির দিকে অপলকে চেয়ে থাকে।

সুধা সন্ধ্যাব আগেই রান্নার পাট চুকিয়ে দিয়ে টুল পেতে বোনার কাজ নিয়ে বসে, না হয় ইন্দুভূষণেব এনে-দেওয়া গল্পের বই পড়তে থাকে।

হরগোবিন্দ এক-একদিন অফিস থেকে ফিরে এসে সুধাকে অমন ইন্দ্রাণীর মত বসে থাকতে দেখে গম্ভীর হয়ে যান। মেয়েকে কাজের ফরমায়েস করে ঘরের বাইরে পাঠিয়ে দেন। তারপর ইন্দুভূষণের দিকে চেয়ে বলেন, 'কি মাস্টার, পড়ানো-টড়ানো কেমন চলছে ?'

ইন্দুভূষণ সংক্ষেপে বলে, 'ভাল।'

'হুঁ, কি রকম ভাল, ছেলের পরীক্ষার ফল দেখলেই তা টের পাব।'

ইন্দুভূষণ হেসে বলে, 'বেশ তো, দেখবেন।'

ওর এই নিশ্চিন্ত হাসিতে ভিতরে ভিতরে হরগোবিন্দ কেমন যেন একটা অপমান বোধ করেন। মনে মনে ভাবেন, এত জোর ও কোত্থেকে পায়। ও কি বোঝে না হরগোবিন্দ সব টের পেয়েছেন। বামন হয়ে ওর যদি চাঁদে হাত দেওয়ার স্পর্ধা হয়ে থাকে হরগোবিন্দ যে কোন মুহূর্তে সেই হাত মুচড়ে ভেঙে ফেলতে পারেন। মিটমিটে শয়তান ছোকরা। কি করে সুধার সঙ্গে কথা বলবে সেই ছল খোঁজে। সুধা যখন হরগোবিন্দেব সঙ্গে কথা বলে, ও কান খাড়া করে থাকে ; সুধা যখন ওকে কিছু বলে, ও যেন হাতে স্বর্গ পায়।

যে কোন সময় হরগোবিন্দ ওকে তাড়িয়ে দিতে পারেন, বলতে পারেন, তোমার পড়ানো ভাল হচ্ছে না মাস্টার, তোমাকে দিয়ে আমার কাজ চলবে না।

কিন্তু এইটুকু অপমানে যেন বড় লঘু শাস্তি হয়ে যায়। হবগোবিন্দের ইচ্ছা আরও কঠিন শাস্তি দেন ওকে। শূদ্র হয়ে বামুনের মেয়ের দিকে তাকাবার গুরু দণ্ড। না, কাজ থেকে ওকে ছাড়িয়ে দেবেন না হরগোবিন্দ। কাজে বহাল রেখেই ওকে অপমান করবেন। ওর চোখের সামনে সুধার বিয়ে দিয়ে দেবেন। বিয়ের দিন নিমন্ত্রণ করে এনে চাকরের মত ফাই-ফরমায়েস খাটাবেন। সুধা শ্বশুর-বাড়ি চলে গেলে ওর আরও পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে টিউটরের চাকরিতে বহাল রাখবেন। তারপরে ছোকরা খালি ঘরে কি ভাবে ছটফট করে দেখবেন চেয়ে চেয়ে। তার আগে মশা মেরে হাত নষ্ট করে লাভ নেই।

শত্রুনির্যাতনের সহজ পথ হরগোবিন্দের মনঃপূত নয়। অফিসে যারা তাঁর বিরুদ্ধে ক্লিক করে তাদেরও তিনি এমনি বহু দিন ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জব্দ করেন। তাতে শত্রুকে শাস্তি দেওয়ার সুখানুভূতি দীর্ঘস্থায়ী হয়। যে লজেনস্ চুষে খাওয়ার জন্যে, তা তিনি চিবিয়ে খেতে চান না। বরানগরে মুখুয্যেদের সঙ্গে যে সম্বন্ধটা চলছিল তা তিনি পাকা করে ফেললেন। ছেলেটি এ. জি. বেঙ্গলে চাকরি করে। নিজস্ব বাড়ি আছে শহরে। তার বাবা মেয়ে দেখে পছন্দ কবে গেছেন। ছেলে নিজেও এসে দেখবে কি না জিজ্ঞাসা করায় বলেছেন, 'ওসব বেয়াড়াপনা আমাদের ফ্যামিলিতে নেই মশাই। ছেলে আগে দেখবে কি। দেখবে সেই শুভদৃষ্টির সময়।' সুধার ঠিকুজী নিয়ে মুখুজ্যে মশাই কুলপুরোহিত দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে জেনেছেন একেবারে রাজযোটক। 'এমন মিল আর কোন কনের

ঠিকুজীতে পান নি। সুধার মত-এমন সুলক্ষণ আর কোন মেয়ের মধ্যে মেলে নি। ঠিকুজী আর মেয়ের মুখশ্রী দেখেই এগিয়েছেন মুখুয্যে মশাই। নইলে হরগোবিন্দের সামাজিক অবস্থা বিচার করলে এতদূর অগ্রসর হওয়ার কারণ ছিল না।

রাত্রে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘরেব মেঝেয় যখন বাবা আর হাবুলের জন্যে বিছানা পাতবার উদ্যোগ কবছিল সুধা, হরগোবিন্দ তক্তপোশে পা ঝুলিয়ে বসে সিগারেট টানতে টানতে বললেন, 'বরানগরের সম্বন্ধটাই ঠিক করলাম সুধা। বেশি বড়লোকের পেছনে ছুটোছুটি করে লাভ নেই। নিজের শক্তিসামর্থ্যে যা কুলোয় তাই করা ভাল। দেখে শুনে মনে হল ওরা আমাদের মতই গেরস্থ। ঠাকুর-দেবতা ধর্ম-কর্ম মানে। আমাদের সঙ্গে বেশ মিলবে। পাকা দেখার দিন ঠিক করার আগে তোব মাসীকে একবাব খবর দিতে হবে। শত হলেও এসব কাজ মেয়েছেলে না হ'লে—'

হাবুলেব জন্যে একটি আব হরগোবিন্দেব জন্যে জোড় বালিশ পেতে দিয়ে সদ্য সাবান-কাঁচা পরিষ্কার ঢাকনি সেই বালিশের ওপর বিছিয়ে দিল সুধা। ছোট ভাইয়ের দিকে চেয়ে বললে, 'বসে বসে ঝিমুচ্ছিস কেন হাবুল, এবার শুয়ে পড়।'

তাবপর ফের বিছানার চাবদিকে চাদর গুঁজে দিতে লাগল।

হরগোবিন্দ বললেন, 'আমার কথার জবাব দিচ্ছিস নে যে?'

সুধা বললে, 'জবাব দেওয়ার আর কি আছে? ওসব বিয়ে-টিযের মধ্যে তোমার গিয়ে কাজ নেই।'

'গিযে কাজ নেই মানে? কেন, সম্বন্ধ কি তোর পছন্দ হচ্ছে না? ছেলেটির ফোটো তো আমি তোকে দেখিয়েছি। বেশ সুন্দব স্বাস্থ্যবান চেহাবা। আমাব অফিসের বন্ধুরাও এ সম্বন্ধের বেশ তারিফ করল।'

সুধা বললে, 'সে জন্যে নয় বাবা। আমি কোনদিন বিয়ে কবব না। আমি তোমার কাছেই থাকব।'

হবগোবিন্দ সস্নেহে বললেন, 'তাই কি হয় রে পাগলী! তুই চলে যাবি ভেবে আমারও কি কষ্ট হয না? খুবই হয। কিন্তু হলে কি করব। এই তো সংসারেব নিয়ম। মেয়েকে পরের ঘরে পাঠাতেই হবে। সেই পবই তার আপন। সেই ঘরে গিয়ে তুই যদি স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে থাকতে পাবিস সুধা, আমাব তাতেই সুখ, তাতেই শান্তি।'

সুধা বাবার মশারি টাঙিযে দিতে দিতে বললে, 'তুমি এবার শুতে যাও বাবা।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'যাচ্ছি রে যাচ্ছি। আমার কথার জবাব দে। তা হলে বরানগরের—'

সুধা বললে. 'না বাবা। আমি ও-ধবনের সুখশান্তি চাই নে।'

সিগারেটের টুকবোটা জানালা দিয়ে ফেলে দেওয়ার জন্যে হরগোবিন্দ তক্তপোশ ছেড়ে উঠে এসেছিলেন. সেই অবসরে আলো নিবিয়ে নিজের মশারিটা ফেলে দিযে সুধা নিজেই শুয়ে পড়ল। যেন সব আলোচনায এতেই ছেদ পড়ে যাবে।

মেয়েব এই অভব্যতা দেখে মনে মনে ভারি চটলেন হরগোবিন্দ। এত স্পর্ধা ওর হ'ল কোত্থেকে। অবশ্য বিয়ের নামে সুধা এব আগেও আপত্তি কবত। কিন্তু সে আপত্তির সুর ছিল অন্য ধরনের, এখনকাব মত এমন একগুঁয়ে স্বভাব তো তখন ছিল না সুধার! এমন উদ্ধত ভঙ্গিও তখন দেখা যায় নি।

হরগোবিন্দ শুতে গেলেন না। মেয়ের মশারিব কাছে দাঁড়িয়ে গলা যথাসাধ্য নরম করে বললেন, 'তুই না চাইলেই তো আমি না চেয়ে পারি নে। বাপ হয়ে নিজের স্বার্থের জন্য তোকে চিরকাল আইবুড়ো কবে রাখব, তোর জীবনটাকে নিষ্ফল ক'রে দেব—এ কথা যে আমি ভাবতেও পারি নে সুধা। তোব কিসে অমত তাই বল, বরানগরের ওই সম্বন্ধ যদি তোব পছন্দ না হয়, ভবানীপুরের সেই ওভারসীয়ার ছেলেটিরই তা হলে ফের খোঁজ করি।'

সুধা মশারির ভেতর থেকে বললে, 'না বাবা, তোমার আর কোন খোঁজখবর করতে হবে না।'

হরগোবিন্দ ধৈর্য হারিয়ে হঠাৎ বলে ফেললেন, 'তার মানে? তুমি নিজেই বুঝি খোঁজ-খবর করে রেখেছ? গুণবতী মেয়ে কিনা! বেশ, কাকে পছন্দ করেছ তুমিই বল।'

সুধা চুপ ক'বে বইল।

হবগোবিন্দ বললেন, 'বলে ফেল। আজই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। বলি, তাব নাম ধাম তো আমাকে জানাবি, না কি?'

সুধা বললে, 'তুমি শুযে পড বাবা। চেঁচামেচিতে হাবুলেব ঘুম ভেঙে যাবে।'

হবগোবিন্দ বললেন, 'ভাঙে ভাঙুক। আমি সব জানতে চাই। তুই সব আমাকে খুলে না বললে আমি কিছুতেই আজ ঘুমোতে পাবব না।'

সুধা মৃদুস্ববে বললে, "তোমাব সে সব কথা জেনে দবকাব নেই বাবা।'

হবগোবিন্দ বললেন, 'জেনেও দবকাব নেই। আমাকে না জানিযে শুনিযেই বুঝি তুই বিযে কববি?'

সুধা বললে, 'না বাবা, তা কোনদিনই কবব না। আমি কোনদিনই জীবনে বিযে কবব না। তুমি নিশ্চিত থাকতে পাব।'

হবগোবিন্দ চটে উঠে বললেন, 'বিযে কর্ববি কেন, দিনবাত সেই মাস্টাবেব সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি কববি। নিন্দেয পাড়া ভবে গেল। কাকে পছন্দ করেছিস তাই শুনি?'

সুধা তেমনি মৃদু কিন্তু স্পষ্ট স্ববে বলল 'তোমাব শুনে লাভ নেই বাবা। তাব সঙ্গে তুমি কোনদিন আমাব বিযে দেবে না। আব তোমাব অমতে আমিও তাকে বিযে কবব না। যেমনি আছি তেমনিই থাকব।'

দাঁতে দাঁত ঘষলেন হবগোবিন্দ, বললেন, 'থাকা না থাকা বুঝি তোমাব ইচ্ছে? হাবামজাদী! ওই হতভাগা মাস্টাব ছোকবাকে তুমি সব সমর্পণ কবে বসেছ। এতক্ষণে বুঝতে পাবলাম।'

সুধা শান্তভাবে বলল, বুঝতে তুমি অনেক আগেই পেবেছ বাবা বাতদুপুবে আব চেঁচামেচি কবো না— বাড়িসুদ্ধ লোক সব শুনতে পাচ্ছে। তুমি যাও, শুযে ঘুমোও গিযে।

হবগোবিন্দ বললেন 'হ্যাঁ, ঘুমোব ঘুমোবাব তুমি কত ব্যবস্থা কবে বেখেছ।

সুধা কোন কথা না বলে পাশ ফিবল। যেন গভীব ঘুম পেযেছে তাব।

হবগোবিন্দ ফিবে এসে নিজেব বিছানায ঢুকলেন। হাবুল ঘুমেব ঘোবে পাশবালিশ ভেবে বাপকে জড়িযে ধবল বছব চোদ্দ পনেব হ'ল বযস। কিন্তু এই বযসেও ওব মুখ থেকে লালা পড়ে। সেই লালা লাগল হবগোবিন্দেব গাযে। কিন্তু তাঁব মনে মোটেই বাৎসল্যবস উদ্রিক্ত হ'ল না। ঘৃণা বিবক্তি আব বিদ্বেষে তিনি ঠেলে দূবে সবিযে দিলেন ছেলেকে। সব শত্রু সব শত্রু। অল্পবযসে সুধাও তো এমনি করে তাঁকে জড়িযে ধবত। তাঁব বুকেব সঙ্গে মিশে না থাকলে তাঁব বুকেব মধ্যে মুখ গুঁজে না থাকলে সুধাব ঘুম আসত না। সুধাব মা নির্মলা হাসত, কি পাজী আব হিংসুটে মেযে দেখেছ? হবগোবিন্দেব সেই বুকেব সুধা আজ বিষ হযে গেছে।

একটা মশা কি কবে যেন ঢুকেছে মশাবিব মধ্যে। গুণ গুণ কবে অনেকক্ষণ ধবে বিবক্ত কবছে কানেব কাছে। হবগোবিন্দ সোজা হযে উঠে বসলেন। তাবপব সেই অন্ধকাবেই দু হাতেব তালুতে প্রচণ্ড শব্দ ক'বে স্তব্ধ কবে দিলেন সেই গুণগুণানি। মনে মনে হাসলেন হবগোবিন্দ। তাঁব লক্ষ্য অব্যর্থ।

ভোব-ভোব সমযে ডেকে তুললেন ছেলেকে, 'এই ওঠ ওঠ। কত আব ঘুমোবি?

হাবুল বললে, 'আব একটু পবে উঠব বাবা।'

না, 'ওঠ। সকালে ওঠা ভাল।'

হাতমুখ ধোযাব পব হাবুলকে বললেন, 'চল, বেড়িযে আসি। সকালের হাওযা গাযে লাগলে শবীব ভাল থাকে।'

পুকুব ছাড়িযে ছোট্ট মাঠ। সেই মাঠে নেমে হঠাৎ ছেলেব হাতখানা নিজেব মুঠিব মধ্যে তুলে নিলেন হবগোবিন্দ।

হাবুল ভযে আঁতকে উঠল, বলল, 'আমাব কোন দোষ নেই, আমাকে মেবো না। আমি দিদিকে গোড়াতেই বাবণ কবেছিলাম।'

হবগোবিন্দ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলেব দিকে তাকালেন। পবনে হাফপ্যান্ট, ছিপছিপে বোগা

চেহারা। গায়ের রঙ খুব ফরসা। মাথার চুলগুলি কটা আর কোঁকড়ানো। ছেলেটার চোখ দুটো ঠিক ওর মার মত বড় বড় হয়েছে। কিন্তু এই মুহূর্তে স্নেহের পরিবর্তে নির্মম কৌতুক আর কৌতূহল উদগ্র হয়ে উঠল হরগোবিন্দের। মৃদু হেসে বললেন, 'আমি জানি, তোর কোন দোষ নেই। তুই খুবই ভাল ছেলে। আমাকে সব খুলে বল। ভয় নেই সুধা কিছু জানতে পারবে না।'

হাবুল তবু বলতে চায় না। কেবল আমতা আমতা করে। কিন্তু ঝানু উকিলের মত জেরা করে করে সব বের ক'রে নিলেন হরগোবিন্দ। বই এনে দেওয়ার আর ফিরিয়ে দেওয়ার সময় কি করে টুকরো চিঠির আদান প্রদান চলেছে দুইজনের মধ্যে, করে সহপাঠিনী সখীর সঙ্গে দেখা করার নাম ক'রে দেশবন্ধু পার্কে সুধা গিয়ে সাক্ষাৎ করেছে ইন্দু মাস্টারের সঙ্গে। করে একদিন ম্যাটিনি শোতে ওরা সিনেমা দেখতে গিয়েছিল, হাবুলের যাওয়ার কথা ছিল সেই সঙ্গে, কিন্তু হঠাৎ ওরা তাকে আর এক বন্ধুর সঙ্গে চিড়িয়াখানায় নতুন বাঘ দেখতে পাঠিয়ে দিয়েছিল। হাবুল কিছুই গোপন করল না, গোপন করতে পারল না।

ফেরবার সময় মোড়ের দোকান থেকে এক ঠোঙা কচুরি, জিলিপি আর হালুয়া কিনে নিলেন হরগোবিন্দ এসব খাবারের ওপর হাবুলের দারুণ লোভ। কিন্তু কোনদিন তিনি ছেলেমেয়েকে এগুলি খেতে দেন না। আজ দিলেন

হাবুল কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করলে, ওসব কেন নিচ্ছ বাবা?'

হরগোবিন্দ বললেন খা একদিন। এসব তো তোরা ভালবাসিস।'

হাবুলের মনে হল মুখে ও কথা বলছেন বটে বাবা, কিন্তু চোখ দুটো সদ্য ধ'রে আনা চিড়িয়াখানার সেই বাঘের মতই জ্বলজ্বল করছে ভয়ে ভয়ে বাপের পিছনে পিছনে সে বাড়িতে ঢুকল না জানি কি কাণ্ড ঘটে চা খাওয়ার সময়।

কিন্তু হরগোবিন্দ সুধাকে কিচ্ছু বললেন না। শুধু চা আর খাবার খেতে খেতে মেয়ের দিকে বার কয়েক চোখ তুলে তাকালেন সেই চোখের দিকে চেয়ে সুধা একবার শুধু শিউরে উঠল। কিন্তু দ্বিতীয় বার আর ভয় পেল না তার দু চোখ থেকেও ঘৃণা আর বিদ্বেষ আগুনের হলকার মত বাপের ওপর ঝরে পড়তে লাগল। বাপ আর মেয়ের মধ্যে যেন কোনদিন কোন মধুর সম্পর্ক ছিল না। স্নেহ আর শ্রদ্ধার স্বাদ যেন কেউ কোন দিন পায় নি। দুজনে যেন দুজনের শত্রু হয়েই জন্মেছে।

হরগোবিন্দ মুখে কিছুই বললেন না মেয়ের কাছে কোন কৈফিয়ত চাইলেন না। অন্য দিনের মতই বাজার করলেন ফিরে এসে দাড়ি কামালেন, নাওয়া-খাওয়া শেষ করে অফিসের জন্যে তৈরি হলেন। সুধা অন্য দিনের মতই ঘরের কাজকর্ম ও রান্নাবান্না সারল ঠাঁই ক'রে বাপ আর ভাইকে ভাত বেড়ে দিল। তবু হাবুলের মনে হতে লাগল আজকার দিনটা আলাদা। কেমন যেন থমথমে ভয় ভয় ভাব তাকে সারা দিন আচ্ছন্ন করে রাখল। খেয়েদেয়ে স্কুলে যাওয়ার পথে বাবার জলন্ত চোখ আর দিদির নিরন্ত মুখের কথা হাবুলের বার বার মনে পড়তে লাগল।

হরগোবিন্দ বলে গিয়েছিলেন অফিস থেকে তাঁর ফিরতে অনেক রাত হবে। কিন্তু দেখা গেল অন্য দিনের চেয়ে অনেক সকাল সকাল সন্ধ্যার বেশ একটু আগেই ফিরে এলেন তিনি। সুধা বাবাকে এত তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে একটু বিস্মিত হ'ল। কিন্তু কোন কৌতূহল প্রকাশ করল না, কি কোন কারণ জিজ্ঞাসা করল না নিঃশব্দে চা করল, খাবারের প্লেট হরগোবিন্দের সামনে ধরে দিল, কিন্তু অন্য দিনের মত কোন কথা বলল না। হরগোবিন্দ ভেবেছিলেন মেয়ে ক্ষমা চাইবে, ভিত্তিহীন কৈফিয়ৎ দেওয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু সে সব কিছুই হ'ল না। মৌনতার মধ্যে সুধার যে বেপরোয়া ভাব ফুটে বেরুল তাতে ভিতরে ভিতরে হরগোবিন্দ জ্বলতে লাগলেন। এক সময় জিজ্ঞাসা করলেন, 'কই, হাবুল ফিরল না?' সুধা বললে, 'খেলতে গেছে, ফিরবে এখনি।'

খানিক বাদেই হাবুল ফিরে এল। বাবাকে দেখে চমকে গেল একটু। কিন্তু হরগোবিন্দ সংক্ষেপে শান্তভাবে বললেন, 'পড়তে বস।'

আর তার একটু পরেই এল ইন্দুভূষণ। হাতে এক ডজন রজনীগন্ধা। দিন কয়েক আগে সুধার খালি ফুলদানি লক্ষ্য করে ইন্দুভূষণ বলেছিল,'কি, ফুলের সখ মিটে গেল নাকি? আজকাল যে আর ফুল দেখি নে।'

সুধা জবাব দিয়েছিল, 'সখ মিটবে কেন ? কিন্তু কদিন ধবে সুখন এ পাড়ায় আসে না, ফুলও বাখতে পাবি নে। বোধ হয অসুখ-বিসুখ হয়েছে ওব।' ইন্দুভূষণ হেসে বলেছিল, 'যদি আপত্তি না থাকে সুখনেব অসুখ না সাবা পর্যন্ত তাব কাজটা আমিও নিতে পাবি।'

সেই ফুল আজ নিয়ে এল ইন্দুভূষণ। কিন্তু ঘবেব ভিতবে হবগোবিন্দকে দেখে কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। তাব আসাব সময সাধাবণত তিনি থাকেন না। প্রাযই ইন্দুভূষণেব বেবোবাব মুখে তিনি ঘবে ঢোকেন। তা ছাড়া সুধাব মুখ আজ বড়ই গম্ভীব, আব বিষণ্ণ। কেউ কোন কথা বলছে না দেখে ইন্দুভূষণ বললে, 'হাবুল, ফুলগুলি তুলে বাখ।'

হবগোবিন্দ উঠে দাঁড়িযে বললেন, 'আমি বাখছি। বাঃ, চমৎকাব মোটা-মোটা ডাঁটাগুলি তো ! এ ফুল বোধ হয ধাবে কাছে পাওযা যায না, কি বলেন মাস্টাবমশাই ?' ইন্দুভূষণ লজ্জিত হয়ে বললে, 'আজ্ঞে না। কলেজ স্ট্রীট মার্কেট থেকে এনেছি।'

হবগোবিন্দ বললেন,' ভাবি চমৎকাব ফুল।'

ইন্দুভূষণ হাবুলকে পড়াতে শুরু কবল। আব সেই ফাঁকে হবগোবিন্দ উঠে একবাব বাড়িব ভিতবে চলে গেলেন। অন্য ভাড়াটেদেব সঙ্গে ফিসফিসস কবে কি যেন আলাপ কবলেন।

ইন্দুভূষণ সুধাব দিকে চেযে বলল, 'কি ব্যাপাব ? আজ যে এমন—

সুধা ভাইকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে ঠোঁটে আঙুল ছোঁযাল। তাব মানে আজ হাবুলও বে-দলী হয়েছে। আবও সাবধান আবও সতর্ক হবাব প্রযোজন হয়েছে সুধা আব ইন্দুভূষণেব।

খানিকক্ষণ বাদে হবগোবিন্দ ফিবে এসে নিজেব জাযগায তেমনি স্থিব হয়ে বসলেন। ইন্দুভূষণ অন্য দিনেব তুলনায আজ কিছুক্ষণ বেশি সময নিয়ে বেশি যত্ন কবে পড়াল ছাত্রকে। তাবপব পবেব দিনেব জন্যে অঙ্ক আব ট্রানস্লেশনেব টাসক দিয়ে বিদায নিয়ে বেবোতে হবগোবিন্দ এলেন পিছনে পিছনে, মাস্টাব, চল, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি। তোমাব সঙ্গে আমাব একটা কথা আছে।'

সুধা এতক্ষণ চুপ কবে ছিল। এবাব দোবেব কাছে এসে দাঁড়িযে তীক্ষ্ণস্ববে বলল, ওঁকে যা বলবাব আমাব সামনে বল বাবা। ওঁকে তুমি কিছুতেই অপমান কবতে পাববে না।'

হবগোবিন্দ বললেন, আপমান কবব কেন ? শুধু দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা কবে নেব। কি মাস্টাব তোমাব কি ভয হচ্ছে ?'

ইন্দুভূষণ একবাব সুধাব দিকে তাকাল, তাবপব হবগোবিন্দেব দিকে চেঁযে বলল 'না, ভয কিসেব চলুন।'

পুকুব ছাড়িযে সেই ছোট্ট মাঠ। মাঠ পেবিয়ে শহবতলিব নির্জন সরু অন্ধকাব গলি। সেই গলিব মুখে হবগোবিন্দ হঠাৎ থেমে দাঁড়ালেন। তাবপব ইন্দুভূষণেব মুখোমুখি দাঁড়িযে বললেন মাস্টাব তোমাব পেশাটা কি সত্যি কবে বল তো ? ছেলে-পড়ানো না মেয়ে-বখানো ?'

ভযে ইন্দুভূষণেব বুক কাঁপছিল, কিন্তু মুখেব বড়াই অত সহজে ছাড়ল না আপনাব ও ধবনেব কথাব জবাব দিতে আমি প্রস্তুত নই।'

'আচ্ছা, আমবা তোমাকে প্রস্তুত কবে নিচ্ছি।'—বলে জনকযেক ছাযামূর্তি মাঠেব ভিতব থেকে এগিয়ে এল। এদেব কাউকে কাউকে চিনতে পাবল ইন্দুভূষণ। এবা সুধাব সেই প্রতিবেশী দাদাব দল। একই বাড়িব ভাড়াটে।

ইন্দুভূষণ ভয পেয়ে বলল, 'কি মতলব আপনাদেব। মাববেন নাকি ?'

একজন বলল 'না না না, আমবা শুধু জবাবটুকু বেব ক'বে নেব।'

আব একজন উপমা দিয়ে বুঝিয়ে বলল, 'টিউব টিপে শুধু পেস্টটুকু বেব কবে নেব দাদা।'

হবগোবিন্দ তাঁদেব সঙ্গে আসছিলেন। একজন বলল, 'মেসোমশাই, আপনাকে আব আসতে হবে না। আমবা আপনাকে ঠিক সমযে খবব দিয়ে আসব।'

খবব পাওযা গেল সপ্তাহ খানেক বাদে। হাসপাতালে জ্ববিকাবে মৃত্যু হয়েছে ইন্দুভূষণেব। প্রথমে দিন কযেক মেসেই পড়ে ছিল। আহত অবস্থায় কাবা যেন মেসবাড়িব দবজায পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল তাকে। প্রথমে মেসেব লোকেবা তেমন গ্রাহ্য করে নি। তারপরে অবস্থা খাবাপ হওয়ায়

কয়েকজনে তাকে হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ডে ভর্তি ক'রে দিয়ে আসে।

সুধা সাত দিন ধরেই ছটফট করছিল। কিন্তু হরগোবিন্দ কড়া পাহারা বসিয়েছিলেন দোরগোড়ায়। কেউ তাকে ঘর থেকে বেরোতে দেয় নি। খবরটা সকলেই চাপতে চেষ্টা করেছিল। তবু চাপা রইল না। বাড়ির ছেলেদের ফিসফিসানির ভিতর দিয়ে সে খবর সুধার কাছে ভেসে এল।

সুধা কাঁদল না, চেঁচামেচি করল না, শুধু দিন দুই বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে রইল। শুকনো কালো একরাশ চুল পিঠের ওপরে ছড়ানো। তার ফাঁকে সুন্দর তনুদেহ থেকে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

হরগোবিন্দ পাশে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, 'সুধা।'

সুধা কোন জবাব দিল না।

হরগোবিন্দ মেয়ের পিঠে আস্তে আস্তে হাতখানা রাখলেন সুধা কোন সাড়া দিল না।

হরগোবিন্দ বললেন, 'সুধা, তুই আমাকে বিশ্বাস কর, এতটা যে হবে আমি ভাবতেই পারি নি। আমরা ওকে শাস্তি দিতেই চেয়েছিলাম সরিয়ে দিতে চাইনি।

সুধা কোন মন্তব্য করল না।

তৃতীয় দিনে সুধা ফের উঠে দাঁড়াল। আবার সংসারের কাজে হাত দিল, ভাইয়ের স্কুল আর বাপের অফিসের রান্না রাঁধতে বসল। ওপর থেকে সবই ঠিক আগের মতই চলতে লাগল। কিন্তু ভিতর থেকে কোন কিছুই আর আগের মত রইল না। একটি মেয়ে রাঁধে বাড়ে, ঘর গুছোয়, বিছানা পাতে সবই করে। হরগোবিন্দ চেয়ে চেয়ে দেখেন। এ যেন তাঁর চির-আদরের সুধা নয়, তারই একখানা অবিকল পাথরের প্রতিমূর্তি। সেই মূর্তির চোখ আছে, তাতে পলক নেই, সে মূর্তির অপরূপ দুটি সুন্দর রক্তাভ ঠোঁট আছে, কিন্তু তাতে স্নেহ মমতা প্রীতি শ্রদ্ধার চিহ্ন মাত্র নেই

এই পাথর আর বরফের দেশে হাবুল বেশিক্ষণ থাকতে পারে না। তার যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে শুধু খাওয়া আর শোওয়ার সময় ছাড়া সারাটা দিন বাইরে বাইরে থাকে। কিন্তু হরগোবিন্দকে তার চেয়ে বেশিক্ষণ থাকতে হয়। মেয়ের ভাবভঙ্গি দেখে এখনও তাঁর গায়ে জ্বালা ধরে মনে রাগ হয় কিন্তু রাগ প্রকাশ করতে কোথায় যেন বাধে। আস্তে আস্তে সব দাহ প্রদাহ সব উত্তেজনা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। এক সীমাহীন শীতল সমুদ্রের মধ্যে তাঁরা দুজনে যেন জনপ্রাণীহীন তৃণশস্যহীন দুই দ্বীপ। শুধু দূর থেকে একজনকে আর একজনের চোখে পড়ে। পারাপার হবার মত মাঝখানে কোন সেতু নেই খেয়া নেই।

একদিন হরগোবিন্দের চোখে পড়ল, সুধা বেশভূষা সব ছেড়ে দিয়েছে। কালোপেড়ে শাড়ি পরে। হাতে দুগাছি চুড়ি ছাড়া আর কোথাও কোন গয়না নেই। সোনার গয়নাও নয় ফুলের গয়নাও নয়। আর একদিন খাওয়ার সময় লক্ষ্য করলেন, সুধা শুধু ডাল তরকারি দিয়ে খেয়ে উঠছে। মাছ মাংস ছুঁয়েও দেখছে না। সব বাপ আর ভাইকে দিয়ে দিচ্ছে।

হরগোবিন্দ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'মাছ খেলি নে কেন সুধা?'

সুধা বললে খেতে ইচ্ছে করে না।'

হরগোবিন্দ বললেন কিন্তু কেন ইচ্ছে করে না শুনি? তুই কি বিধবা? তোদের কি বিয়ে হয়েছিল?

সুধা বলল, 'মন্ত্রপড়া বিয়েটাই কি সব?

হরগোবিন্দ বললেন 'ছি ছি ছি! বাপের সামনে এ কথা বলতে তোর লজ্জা হল না?'

সুধা নির্বিকারভাবে বলল, 'তুমি শুনতে চাইলে তাই বললাম। জিজ্ঞেস করতে তোমারও তো লজ্জা হয় নি বাবা।'

হরগোবিন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'তোর সব কথা মিথ্যে সুধা। কেবল জেদ করে এসব কথা বলছিস। এমনি ক'রে আমার ওপর শোধ নিতে চাচ্ছিস। কিন্তু তুই আমাকে দিনরাত পুড়িয়ে মারছিস কেন? তোর যদি সন্দেহ হয়ে থাকে, তুই এর চেয়ে থানা-পুলিশ কর, আইন আদালত কর, সে অনেক ভাল।'

একটু যেন হাসি ফুটল সুধার মুখে। সুধা বলল, 'সে সব যারা করতে পারত তেমন আত্মীয়স্বজন

তাঁর কেউ নেই। থাকার মধ্যে আছি আমি। কিন্তু আমি যে তোমার মেয়ে। তুমি খুন ক'রে এলে তোমার সেই হাত আমি আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দেব। সে হাতে শিকল পরাব কেন? আমি যে তোমার মেয়ে।'

হরগোবিন্দ আর্তনাদ করে উঠলেন, 'তুই আমার কেউ নস্, কেউ নস্। তুই আমার শত্রু, চিরজন্মের শত্রু।'

কিছুদিন চুপচাপ থাকবার পর হরগোবিন্দই ফের এগিয়ে আসতে চেষ্টা করেন, মৃত সম্পর্ককে আবার যেন উজ্জীবিত করে তুলতে চান। নিজের থেকেই কথা আরম্ভ করেন হরগোবিন্দ। রাত্রে শুয়ে শুয়ে আগের মতই পুরনো দিনের কথা তোলেন। সুধার মায়ের গল্প, মামাবাড়ির গল্প। কিন্তু বাপের স্মৃতিকথায় সুধার আর কোন আগ্রহ নেই। হরগোবিন্দ কথা বলে যান। তক্তপোশ থেকে সুধার কোন সাড়া মেলে না।

হরগোবিন্দ বলেন, 'ও সুধা, ঘুমোলি নাকি?'

সুধা অতি সংক্ষেপে জবাব দেয়, 'হুঁ'।

মাছধরার গল্প, নৌকাডুবির গল্প, বিদেশ বিভুঁইয়ের নানা রকম দুঃসাহসিক রোমাঞ্চকর কাহিনী শুরু করেন হরগোবিন্দ। যে সব কাহিনী সুধা উৎকর্ণ হয়ে রুদ্ধশ্বাসে শুনত আজ আর সে সব গল্পে তার কৌতূহল নেই। হাসির গল্পে সুধা আর হাসে না, ভূতের গল্পে ভয় পায় না, ঘর-সংসারের আলোচনায় কোন উৎসাহ আগ্রহ প্রকাশ করে না। কিছুতেই সেই আগের মত আলাপ জমাতে পারেন না হরগোবিন্দ।

সেদিন অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন তিনি। তিনখানা সিনেমার টিকিট একেবারে কিনে নিয়ে এসেছেন।

হরগোবিন্দ বললেন, 'চল যাই সুধা, কতদিন ছবি দেখি নে। মধুমালতীর মত এমন চমৎকার বই শিগগির আর আসে নি। কথায় কথায় গান। তুই তো গান ভালবাসিস।'

ছেলেকে ইশারা করেন হরগোবিন্দ। হাবুল ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে বলে, 'চল না দিদি।'

সুধা জবাব দেয়, 'আমাকে বিরক্ত করিস নে হাবুল। তোদের ইচ্ছে হয় তোরা যা।'

অনুরোধ উপরোধ ছেড়ে হরগোবিন্দ ফের রাগারাগি শুরু করেন, কিন্তু কোন ফল হয় না। শেষ পর্যন্ত টিকিট তিনখানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেন তিনি।

যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, লেক কি গঙ্গার ধারে বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তাবেও আর কান দেয় না সুধা। বলে, 'তোমরা যাও।'

আর একদিন ভরি তিনেক ওজনের একগাছি হার নিয়ে এলেন হরগোবিন্দ। ধানের ছড়ার ডিজাইন। নতুন উঠেছে। বললেন, 'পরে দেখ্ সুধা, তোকে ভারি চমৎকার মানাবে।'

সুধা বাপের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'কেন মিছিমিছি টাকাগুলি নষ্ট করলে বাবা! আমি তো ওসব ছেড়ে দিয়েছি।'

'ছেড়ে দিয়েছি!' দাঁত কিড়মিড় করতে থাকেন হরগোবিন্দ। কিন্তু কোন ফল হয় না। বাপের স্নেহের যেমন প্রত্যাশা করে না সুধা তেমনি শাসনকেও ভয় করে না আর। নিষ্ফল আক্রোশে হরগোবিন্দ মাঝে মাঝে আগুনের মত জ্বলে ওঠেন, আবার গভীর নৈরাশ্যে বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যান।

একদিন বউবাজার থেকে সুধার মাসী কমলা এল খোঁজ নিতে। সুধাকে নিয়ে যাবার জন্যে অনেক সাধাসাধি করল। কিন্তু সে কিছুতেই যাবে না। বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে কমলা হরগোবিন্দকে তিরস্কার করে বলল, 'জামাইবাবু, আপনিই বা কি ধারার মানুষ। এমন হাত-পা কোলে করে বসে আছেন কেন? জোর করে বিয়ে দিয়ে দিন মেয়েটার। যেমন ক'রে হোক, যার সঙ্গে হোক, বিয়ে দিন।'

হরগোবিন্দ বললেন, 'সেই বরানগরের মুখুয্যেরা তো পিছিয়ে গেল।'

কমলা বলল, 'যাবে না? ভাংচি দেওয়ার লোকের অভাব আছে এখানে? ভাল চান তো এই

বাড়ি ছাড়ুন, পাড়া ছাড়ুন। কলকাতা শহরে কি আর জায়গা নেই ?'

কমলা শুধু রূপবতীই নয়, বুদ্ধিমতীও। ভেবেচিন্তে তার পরামর্শ নেওয়াই ঠিক করলেন হরগোবিন্দ। উত্তর ছেড়ে চলে গেলেন দক্ষিণে। কালীঘাটের সদানন্দ রোডে পঁচাত্তর টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট ভাড়া করলেন। দুখানা শোবার ঘর। রান্নাঘর, বাথরুম সব আলাদা। মেয়ে-জামাই এসে মাঝে মাঝে যদি বাস করে, কোন অসুবিধে হবে না।

বাড়ি বদলানোর ব্যাপারে সুধা কোন আপত্তি করল না, কিন্তু বিয়ের কথায় ফের বেঁকে বসল।

সুধা বলল, 'তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিতে পার, সরিয়ে দিতে পার, কিন্তু জোর করে বিয়ে তুমি আমার কিছুতেই দিতে পারবে না। তা হলে চরম কেলেঙ্কারি হবে।'

মেয়ের মূর্তি দেখে ভয় পেয়ে গেলেন হরগোবিন্দ। ওকে বিশ্বাস নেই, ও এখন সব করতে পারে।

আবার কিছুদিন চুপ রইলেন হরগোবিন্দ। চুপ করে রইল সুধা। দুজনের মাঝখানে শব্দহীন দুঃসহ সেই শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে লাগল।

সুধাকে এখন আর বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে এক ঘরে থাকতে হয় না। সে আলাদা ঘর পেয়েছে। মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে মেয়ের সেই ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখেন হরগোবিন্দ। দেখবার মত কিছু নেই। দামী কোন আসবাবপত্র সে ঘরে রাখতে দেয় নি সুধা। এমন কি, একখানা তক্তপোশ পর্যন্ত না। ঘরের এক কোণে দেওয়ালের ধারে বিছানা গুটানো। ডান দিকে ছোট একটি বইয়ের শেলফ। বইগুলি না খুলেও হরগোবিন্দ বুঝতে পারেন এগুলি তার দেওয়া, যে শত্রু ম'রেও মরে নি। তাকের ওপরে একটি শূন্য ফুলদানি। সেদিন ফিরে এসে হরগোবিন্দ রজনীগন্ধাগুলি বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর ফুলদানিতে আর কোন ফুল রাখে নি সুধা।

আবার একদিন মেয়েকে নিজের কাছে ডেকে নিলেন হরগোবিন্দ বললেন, 'সুধা আমি তোর বাপ।'

সুধা বলল, 'কি বলছ বল।'

হরগোবিন্দ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললেন 'আমাকে কি তুই ক্ষমা করতে পারিস নে ?'

সুধা মুখ নীচু করে বলল, ওসব কথা থাক বাবা।

এর পর হরগোবিন্দ কি বলবেন ভেবে পেলেন না।

আরও কিছুক্ষণ ব'সে থেকে সুধা এক সময় উঠে নিজের ঘরে চলে গেল।

ছোট টেবিলটিতে বসে হাবুল নিজের মনে পড়ছিল। আজকাল ও একা-একাই পড়ে। নিজের মনেই থাকে। বাড়ির এই নিঃসঙ্গ একক জীবনে হাবুলও এতদিনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। বাবা আর দিদির মাঝখানে সে আর যোজক নয়, সেও যেন স্বতন্ত্র তৃতীয় একটি দ্বীপ।

ছেলের দিকে হরগোবিন্দ অপলকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। আরও লম্বা হয়েছে। কিন্তু রোগাটে ভাবটি যায় নি। দেখলে কেমন যেন মায়া হয়। হরগোবিন্দ বললেন, 'হাবুল, শোন।'

হাবুল বলল, 'কি বাবা ?' হরগোবিন্দ বললেন, 'আয়, আমার কাছে আয়।'

হাবুল বিস্মিত হয়ে উঠে এল। বাবা অনেক দিন হল এমন করে ডাকেন না। ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। হরগোবিন্দ হঠাৎ তক্তপোশ ছেড়ে উঠে এসে ছেলেকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন, 'হাবুল, আমার হাবুল—'

হাবুল কিছুক্ষণ আকৃষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর অতিকষ্টে দম ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'বাবা, আমাকে ছেড়ে দাও। বড্ড লাগছে। ব্যথা পাচ্ছি।'

হরগোবিন্দ যেন চমকে উঠলেন, ছেলেকে সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'তুইও ব্যথা পাচ্ছিস ? আচ্ছা যা।'

হাবুল ফের গিয়ে পড়তে বসল। হরগোবিন্দ পা টিপে টিপে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু জানালাটা আর খুললেন না। খুললেই সুধাকে দেখা যাবে। দেয়ালের কাছে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। উৎকর্ণ হয়ে যেন কিছু একটা শুনতে চাইছেন তিনি। কিন্তু কিছুই শোনা গেল

না। শুধু নিজের দীর্ঘশ্বাসের শব্দই কানে ভেসে এল।

পরদিন সকাল সকাল অফিসে বেরুলেন হরগোবিন্দ। একই টেবিলে বসে কাজ করেন সুরেন সমাদ্দার। হরগোবিন্দের সহকর্মী সমবয়সী। খুব সামাজিক আর সদালাপী মানুষ। চারদিকের খোঁজ খবর রাখেন। সাধ্যমত উপকার করেন সহকর্মীদের। অবিবাহিত ছেলের জন্যে মেয়ে খুঁজে দেন, মেয়েব জন্যে ছেলে। মনিবদের জন্যে ঝি আর ঠাকুর-চাকরের খোঁজ আনেন. কর্মপ্রার্থী বেয়ারাদের মনি‌ব জুটিয়ে দেন। এতদিন তাঁর কাছে মুখ খোলেন নি হরগোবিন্দ, আজ মন খুললেন।

ফাইল-পত্র ভাগ ক'রে নিতে নিতে বললেন, 'ভাই সুরেন, আমাব একটা কাজ ক'বে দেবে ?'

সুরেনবাবু বললেন, 'কি কাজ ?'

'একটি ছেলে দেখে দেবে আমাকে ?'

'কি বকম ছেলে ?'

'বামুনের ছেলে হলেই ভাল হয়। অন্য জাত হ'লেও—'

'অন্য জাত হবে কেন ? তুমি বামুন, তোমাকে বামুনের ছেলেই দেব। বামুনেব অভাব আছে নাকি ? তারপর ?'

'ছেলেটি এম· এ· পাস হলেই ভাল হয়, বি· এ· পাস হলেও ক্ষতি নেই।'

সুরেনবাবু বললেন, 'কেন এম· এ· পাস ছেলেব অভাব আছে নাকি ? তাবপর ?'

হরগোবিন্দ বললেন, 'কাজ-কর্ম যা করে করুক। খেযে পবে থাকতে পাবলেই হল।'

সুরেনবাবু হেসে বললেন, 'বিলক্ষণ ! তাবপব ? কার জন্যে হে ? নিজেব মেযের জন্যে নাকি ? আরে ভাই, খুলেই বল না জামাই চাই একটি। আছে আমার হাতে। জামাই কবতে চাও তো বল।'

হরগোবিন্দ বললেন,'না ভাই, জামাই নয়, জামাই নয়।'

সুরেনবাবু বললেন, 'তবে ?'

হরগোবিন্দ বন্ধুর চোখ থেকে চোখ সরিযে নিয়ে বললেন, 'একজন প্রাইভেট টিউটব—ছেলেব জন্যে একজন প্রাইভেট টিউটব।'

শ্রাবণ ১৩৬২

পুরাতনী

সিঁড়ির মুখে দেখা হতেই রিনা বলে উঠল, "ইশ্ একটুর জন্যে তুমি সুযোগটা হারালে।"

বললাম, "কী ব্যাপার ?"

রিনা বলল, "আমার এক বান্ধবী এইমাত্র চলে গেল। পাঁচ মিনিট আগে এলে তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে যেত।"

বললাম, "আমি আমার নিজের বান্ধবী ছাড়া আর কারো বান্ধবী সম্বন্ধে উৎসাহী নই।"

আমার আগে আগে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে রিনা ঘাড় ফিরিয়ে,মুখ টিপে একটু হাসল। "দেখ,

আর যাই কর, আমার কাছে মিছে কথা বল না। বলে সেরে যেতে পারবে না। আমি তোমাকে চিনি।"

প্রশস্ত ছাদের মাঝখানে নিচু গোল টেবিল পাতা। তার চারদিক ঘিরে খান তিনেক বেতের চেয়ার। আমি তার একটি টেনে নিয়ে বসতেই রিনা বলল, "একটু আগে আমার সেই বান্ধবীটি এখানে ছিল। তোমার ওই চেয়ারটাতেই বসেছিল। তোমার নাক যত বড়, ঘ্রাণশক্তি যদি তত তীব্র হত তাহলে এখনো হাওয়ায় তার গায়ের গন্ধ পেতে।"

হেসে বললাম, "পুরোবর্তিনীর পাউডারের সৌরভ নেপথ্যবর্তিনীকে ঢেকে দিয়েছে। আমার নাকেব কোন দোষ নেই।"

রিনা বলল, "দোষটা তোমার নাকের নয়, চোখের। নতুন মুখ দেখলে তোমাব দুটি চোখ সেখান থেকে নডতে চায় না। তুমি নিজের মুখেই স্বীকার করেছ, তোমার দেশভ্রমণের কোন আগ্রহ নেই। একেকটি মেয়েই তোমার কাছে একেকটি দেশ, একেকটি দুনিয়া।"

বললাম, "কথাটা একটু শুধরে নাও। মেয়ে কেটে মানুষ কর। একেকটি মানুষ আমার কাছে একেকটি দুনিয়া এ-কথা ঠিক। সেই দুনিয়া দেখবাব জন্যে আমার দূর দেশে যাওয়ার দরকার হয় না। এমন কি, অন্য গ্রাম অন্য নগরেও নয়। আমি তাদের ঘরে বসেই দেখতে পাই। বড়জোর দু পা বাড়িয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেই হল।"

আমাব কথাব মধ্যে যে কোন যুক্তি নেই, সত্যতাও নেই, তা বলবার জন্যে রিনা একটু হাসল। হাসলে যে ওকে সুন্দর দেখায়, তা ও জানে। নিজের দাঁতগুলির শুভ্রচারুতা সম্বন্ধে ও সচেতন। হাসিতে যদি ক্ষণেকের জন্যে কথা ঢাকা পড়ে, ওর বন্ধুরা তাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। কারণ তারা যখন ওকে দিয়ে কথা বলায়, তা কান পেতে শোনার জন্যে বলায় না, চোখ পেতে ওর বাঙ্ময় রূপ দেখবার জন্যে তর্কের অবতারণা করে। কিন্তু রিনা সে-কথা মনে রাখে না। কথা বলায় ওর আনন্দ। কথা বলতে ও ভালবাসে। কথা বলতে ও জানেও। বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত শ্রোতা উপলক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। আত্মপ্রকাশ হয় লক্ষ্য।

আর এখন কথা ছাড়া ওর কোন কাজ নেই। রিনা ধনী ব্যারিস্টারের মেয়ে। ওব নিজের নামেও হাজার কযেক টাকা জমা আছে। সে-টাকায় ইউরোপ যাওয়া না গেলেও কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত যাওয়া যায়। কলকাতা যখন একঘেয়ে লাগে, মাঝে মাঝে ও গা ঢাকা দেয়। আসলে মুখ ঢাকাই ওর উদ্দেশ্য। ওদের সমাজে পর্দার প্রচলন নেই। তাই অন্তরালের জন্যে ওর মাঝে মাঝে দেশান্তরী হবার দরকাব হয। আমাকে বিনা মাঝে মাঝে কুনো বলে খোঁচা দেয়। কারণ আমি ঘর থেকে বড একটা বেবোই না। মানে এই শহর থেকে। আসলে আমার দুখানি পা থাকা সত্ত্বেও চলচ্ছক্তি কম। তাই বলে যে বেবোবাব সাধ নেই তা নয়। নতুন দেশের স্বাদ ঘরের কোণে বসে মেলে না। সে-কথা আমি মনে মনে মানি। কিন্তু মুখে স্বীকার করিনে। বলি, মনোরথের তুল্য বথ নেই। বলি, সব চেয়ে দূব আর দুর্গম হল বন্ধুজনের অন্তরদেশ। আমার দেশান্তরে যাওয়ার দরকার কী।

রিনা আমার মত নয। মাত্র ছাব্বিশ বছব বযসে ও অনেক জাযগা ঘুরেছে, অনেক মাটি মানুষ আব মনের স্পর্শ পেয়েছে। দু দু বাব বিয়েব বাঁধন ছিঁডেছে। আরও কয়েকবার বাঁধনে ধরা পড়তে পডতে সবে এসেছে। বজ্র আঁটুনি আর ফস্কা গেরো যে কতবার হয়েছে তার তো ঠিক-ঠিকানাই নেই। জীবন সম্বন্ধে ওব অভিজ্ঞতা বিচিত্র, শুধু দেখা নয় শোনা নয়।

ছুটোছুটিব ফাঁকে ফাঁকে জীবন সম্বন্ধে ও বসে বসে ভেবেছেও। ওর অনেক কথাই হয়ত বই পড়ে পড়ে না হয় বন্ধুদের মুখ থেকে শুনে শুনে মুখস্থ করা। কিন্তু তাতে দোষ কী। আমরা কজন আর সংসারে মৌলিক প্রবন্ধ রচনা কবতে আসি। পাঁচজনের মুখের কথাই কুড়িয়ে কুড়িয়ে পঞ্চামৃতেব স্বাদ আনা যায়, যদি তাতে আত্মোপলব্ধির দু-একটি ছিটেফোঁটাও অন্তত থাকে। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে, রিনাব তা আছে। শেখা বুলি আওড়ালেও ও নিজের গলায় আওড়ায়।

আমার সঙ্গে যখন ওব আলাপ, ও তখন বিশ্রাম নিচ্ছে। কর্ম থেকে বিশ্রাম নয়, নর্ম থেকে বিশ্রাম। জীবিকার জন্যে কখনো ওকে কোন পরিশ্রম করতে হয়নি।

জীবনেব অভিজ্ঞতায সেই ওব বড বকমেব ঘাটতি ' বিনা অবশ্য সে-কথা স্বীকাব করে না। বলে, "মাস্টাবি কি কেবানীগিবি না কবলে, হাসপাতালেব নার্স কি অফিসেব স্টেনো না হলে আধুনিক মেযেব জীবন মাটি হযে যায, এ-কথা আমি মানিনে।"

আমি বলি, "বেশ, তাহলে কোন আর্টেব দিকে যাও। নাচ গান, ছবি আঁকা সাহিত্য কি অভিনয, বাজনীতি কি সমাজসংস্কাব—"

বিনা ঘাড ঝাঁকুনি দিযে বলে, "কিছু না কিছু না। আমি কিছু না কবে শুধু বেঁচে থাকব। আমাব অস্তিত্বই এক উচ্চাঙ্গেব সংস্কৃতি। সব বকমেব সংস্কাবেব বিরুদ্ধে তীব্র এক প্রতিবাদ।"

বলি, "অনভ্যাসে বিদ্যা যে হ্রাস পাবে। বুদ্ধিতে মবচে পডবে।"

বিনা হেসে বলে, "সেই বুঝি হযেছে তোমাব মহা ভাবনা। অনেকদিন আগেই বিদ্যেকে গলিযে চোখেব সুর্মাব সঙ্গে মিশিযেছি, আব বুদ্ধিকে লিপস্টিকে। যাতে আমাব বন্ধুদেব নযন মন দুই ই বঞ্চিত হয। দুনিযায এ ছাডা আমাব আব কোন কাজ নেই।'

বিনাব সব কথাই এই ধবনেব শ্লেষ, ব্যঙ্গ আব বিদ্রূপে শাণিত। কিন্তু এত অস্ত্র চালনা যে কাব বিরুদ্ধে তা সব সময বোঝা যায না। অনেক সময মনে হয, ও হাওযাব সঙ্গে লডাই কবছে।

এ গল্প বিনা চৌধুবিকে নিযে নয। তবু যে তাব সম্বন্ধে এত কথা বলছি তাব কাবণ গল্পটা বিনাব মুখ থেকে শোনা। মুখবন্ধেব আকাবে সেই মুখশ্রীব যদি একটু বন্দনা কবি পাঠকবা অপবাধ নেবেন না।

চাকব এসে চাযেব পট বেখে গেল। বিনা একবাব সেদিকে একটু তাকিযে চোখ ফিবিযে নিযে বলল, "কিন্তু চিত্রাকে দেখলে, তাব সঙ্গে আলাপ কবলে তোমাব পক্ষে লাভ হত। ওব জীবনে বেশ বড একটা কাহিনী আছে।"

বললাম, "কাহিনী তোমাব জীবনেই বা এমন কি কম। আব তুমি জীবন দিতে না চাইলেও জীবনীব দু-চাব অধ্যায ত দিযেছ।"

বিনা বলল "দিযেছি। কিন্তু সে দেওযা ধোপাকে কাপড দেওযাব মত বন্ধুকে বই ধাব দেওযাব মত। তুমি আমাব জীবনীব দু-এক অধ্যায অধ্যযন কবতে পাব, কিন্তু তা মুখস্থ লিখতে পাববে না।"

বললাম, 'মুখস্থ আমি কিছু লিখিনে। মেযেদেব মনেব কথাই হক আব মুখেব কথাই হক, আমাব কলমেব মুখে পডলে তা আপনিই সূচিমুখ হযে ওঠে। তাব কপ আগা গোডা পালটে যায।"

বিনা বলল, "যাকগে, চিত্রাব কথা তুমি শুনবে কি শুনবে না এক কথায বলে দাও।

ধমকেব ভঙ্গিটুকু উপভোগ কবে বললাম "আচ্ছা বল।"

বিনা খুশি হযে বলতে শুরু কবল।

"ওব পুবোনাম ছিল চিত্রাঙ্গদা চট্টোপাধ্যায। ওব বাবা যে তোমাব মতই অনুপ্রাসেব ভক্ত ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। চিত্রাব বাবা শ্রীপদ চাটুজ্যেকে আমবা কাকাবাবু বলে ডাকতাম। তিনি ছিলেন আমাব বাবাব বন্ধু তাই হিসেবমত চিত্রাব সঙ্গে আমাব বন্ধুত্ব পুরুষানুক্রমিক কিন্তু আমাদেব দুই পবিবাবেব মধ্যে বিশেষ কোন মিল ছিল না। চিত্রাবা জাতে বামুন, ধর্মে খ্রীস্টান। শ্রীপদবাবু ধর্মেব অনুষ্ঠানেব দিকটা তেমন না মানলেও, নীতিব দিকটা বিশেষ কবেই মানতেন। মদ খেতেন না, পাবতপক্ষে মিথ্যে কথা বলতেন না। লোকেব সঙ্গে অসদ্ব্যবহাবেব কোন সুযোগই তাঁব ছিল না। কাবণ মানুষেব সঙ্গে বেশি মেলামেশা তাঁব স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। মিশনাবি কলেজে পডাতেন। স্বার্থপব খেলোযাডেব মত তিনি ছিলেন স্বার্থপব অধ্যাপক। নিজেব মনে পডিযে যেতেন, ছাত্রদেব সহযোগিতা বেশি চাইতেন না। তবু তাঁব নাম যশ ছিল। সৎ মানুষ হিসাবে আশপাশেব সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা কবত। শ্রদ্ধা কবত কিন্তু গ্রাহ্য কবত না। বীচি বোডে ওঁদেব বাডিব ঠিক উল্টো দিকে তখন আমাদেব বাডি। হওযাটাও যে একটু উল্টো বকমেব ছিল তা আমাকে দেখেই বুঝতে পাবছ। হাইকোর্টে পসাব আব শহবে প্রতিপত্তি, দুই-ই আমাব বাবাব আছে। তাঁব পেশা সুবোধ ছেলে পডানো নয। যে-সব মক্কেল নিযে তাঁব কাববাব, তাঁবা সবাই কিছু যুধিষ্ঠিব ছিলেন না। কিন্তু কোর্টে গিযে দিনকে বাত আব বাতকে দিন বানাবাব মত মাথাব জোব ছিল বাবাব, মুখেব জোব ছিল। সেই

জাদুকরী শক্তি খানিকটা আমি পেয়েছি। অশনে-বসনে পোশাকে-আসবাবে রীতিতে-নীতিতে আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে মিল ছিল না। তবু চিত্রার সঙ্গে আমার ভাব জমে গিয়েছিল। আমরা একই স্কুলে পরে একই কলেজে পড়েছি। এক ক্লাশে এক বেঞ্চে পাশাপাশি বসেছি। তার ফলে কিছুটা বন্ধুত্ব আপনা থেকেই হয়ে গেছে। আমি পড়াশুনো না করে আর দিনরাত আড্ডা ইয়ার্কি দিয়ে বেড়িয়েও চিত্রার চেয়ে চিরকাল বেশি নম্বর পেয়েছি। তার ফলে কাকাবাবুর কাছে আমার খানিকটা বেশি খাতির ছিল। তা ছাড়া চিত্রা যা করতে সাহস পেত না, আমি তা পারতাম। কাকাবাবুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে তর্ক করতাম। ভালটা কেন ভাল, মন্দটা কেন খারাপ তা জানতে চাইতাম। চিত্রার মত বিনা বিচারে সব কথা মেনে নিতাম না। কাকাবাবু যদিও আড়ালে আবডালে অকালপক্ক বলে আমাকে গাল দিতেন, কিন্তু সামনে গেলে অনাদর করতে পারতেন না। পরে শুনেছি আমার অনেক কথা তাঁর মনে চিন্তার উদ্রেক করেছে। সেই চিন্তা থেকে জন্ম নিয়েছে প্রবন্ধ।

তোমার কাছে বিনয় করব না। কারণ বিনয় তোমার ভূষণ হতে পারে আমার নয়। দেখতেই পাচ্ছ হাতে কানে গলায় আমার আলাদা আলাদা গয়না আছে। আর তোমার বিনয় ছাড়া কিছুই নেই। চিত্রা আমার চেয়ে রূপে গুণে নিরেস ছিল, এ কথা বললে শিষ্টাচারের যদি নিয়মভঙ্গ হয় হক। চিত্রার রঙ শ্যামলা, নাক চোখ খুব চোখা নয়। ছিপছিপে একহারা গড়ন। তবু লোকে বলত ওর মুখে মিষ্টত্ব বেশি চেহারায় হাঁটা চলায় ও একেবারে সেন্ট পারসেন্ট মেয়ে। আমি ঈর্ষায় জ্বলতাম। তুলনাটা যে কার সঙ্গে তা কেউ উল্লেখ না করলেও আমার বুঝতে বাকী থাকত না। মনে মনে বলতাম আমি চাইনে ওর মত হতে ও যদি লতা হয়, আমি ধারালো তলোয়ার। আমি বীরের হাতের বিদ্রোহীর হাতের অস্ত্র। ছেলেরা বারবার ওর দিকে তাকাত। কিন্তু কাছে ঘেঁষতে উৎসাহ পেত না। চিত্রা মিষ্টি মেয়ে কিন্তু বড় ঠাণ্ডা, বড় শান্ত বিষণ্ণ আর গম্ভীর। ও যেন ট্র্যাজেডির নায়িকা হওয়ার জন্যেই জন্মেছে।

অবশ্য কিছুটা দুঃখের কারণ ছিল অল্প বয়সে ওর মা মারা যায়। বাপ ত সংসারে থেকেও আধা সন্ন্যাসী ছিলেন বউ মারা যাওয়ার পর বইয়ের মধ্যে আরো বেশি করে ডুবে গেলেন। চিত্রার এক বিধবা বুড়ী পিসীমা এসে ভার নিলেন সংসারের। ভাবী শুচিবাই ছিল চিত্রার পিসীমার। দু-তিন পুরুষ ধরে খ্রিশ্চয়ান হলেও হিন্দুয়ানির অনেক সংস্কারই তিনি ছাড়তে পারেননি। কেবল গীতার বদলে বাংলা বাইবেল পড়া আর রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপের বদলে একমাত্র যীশুখ্রীষ্টের ছবির নীচে মোমবাতি জ্বালানো ছাড়া হিন্দুদের সঙ্গে বিশেষ কোন তফাৎ তাঁর ছিল না। ভূত প্রেত তাবিজ কবচ এমন জিনিস নেই যা তিনি মানতেন না। চিত্রাকে তিনি প্রায়ই বকতেন। বাইরের কোন ছেলের সঙ্গে তাকে মিশতে দিতেন না আর আমার মত মেয়ে ত ছেলেরও বাড়া। তখন আমার বয়স চোদ্দ পনেরর বেশি নয়। কিন্তু সেই বয়সেই চিত্রার পিসী আমাকে নষ্ট আর বজ্জাত বলে গাল দিতে শুরু করেছিলেন। অবশ্য আমি যে নিরীহ আশ্রমমৃগী ছিলাম তা নয়। তখন থেকেই পুরুষের চোখ আর চিত্ত আমাকে দেখে চঞ্চল হত। বিশেষ করে যাঁদের বয়স চল্লিশ কি পঞ্চাশের উপরে তাঁরা আমাকে কিছুতেই কাছছাড়া করতে চাইতেন না। মুশকিল এই যে, আমি তাঁদের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গির মানে বুঝতাম। সুবিধেমত অবশ্য না বুঝবার ভান করতাম। তাতে যদি আবার তাঁদের সুবিধে বাড়ত পরিষ্কার বুঝিয়ে দিতাম যে, আমি সব বুঝেছি। যা হোক, দোষ থাকলে আমি তা কবুল করতে রাজি ছিলাম না। অন্যের মুখে তা শুনতে আমার আরো আপত্তি ছিল। তাই চিত্রার পিসী যেমন আমাকে দু-চোখে দেখতে পারতেন না, তিনিও তেমনি আমার চক্ষুশূল ছিলেন। শুধু আমি একা নই আমার ছোট ভাইবোনদেরও ওই বুড়ীর পিছনে লেলিয়ে দিয়েছিলাম। তারা চিত্রার পিসীকে দেখে ভেংচি কাটত, আর ছড়া কাটত। আর তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন। গালি গালাজ শাপ-শাপান্তের আর অন্ত থাকত না।

চিত্রাও হাসত। কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা হলে গম্ভীর মুখে অনুযোগ দিয়ে বলত, 'আমার পিসীর সঙ্গে অমন করে লাগিস কেন? বুড়োমানুষ কষ্ট হয় না?'

আমি বলতাম, 'কষ্ট না ঘোড়ার ডিম হয়। ওই বুড়ী কেন পাড়া ভরে আমার অমন নিন্দে-মন্দ

করে ? কেন তোর কাছে সুদ্ধু আমাকে ঘেঁষতে দেয় না ? আমি কি পচা আপেল যে কাছে এলেই তোর গায়ে দাগ লাগবে ?'

চিত্রা হেসে বলত, 'আহা বাড়ির বাইরেও ত আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। ভিতরে না হয় নাই হল।'

ওর এই নির্লিপ্ততা দেখে আমার ভারী রাগ হত। মনে মনে ভাবতাম, পিসীকে ত পারব না, কিন্তু এই পিসীসোহাগী ভাইঝিকে আমি একদিন বখাবই বখাব। তার জন্যে যদি আমার সব চেয়ে সেরা ভক্তকে ছেড়ে দিতে হয় তাতেও রাজী আছি।

আমার মাও বারণ করতেন ! বলতেন, 'ওরা যখন চায় না, যাসনে ওদের বাড়িতে। মিশিসনে ওদের সঙ্গে।'

আমি বলতাম, 'বয়ে গেছে ওই বুড়ীর বাড়িতে যেতে।'

বুড়ীর বাড়ি থেকে আস্তে আস্তে ও-বাড়ির নাম হয়ে গেল 'দ্যাট ওল্ড অ্যাণ্ড এনসিয়েন্ট ওয়ার্লড'। নামটা আমাব ছোটভাই অন্তুই মাথা থেকে বার করলে। শুধু আমাদের বাড়ির নয়, পাড়া ভরে বাচ্চা ছেলেমেয়ে আর কুকুরছানার নতুন নতুন নাম রেখে তার যশ বেড়েছে। তার দেওয়া চিত্রাদেব বাড়ির এই নামটা আমরা সবাই লুফে নিলাম। ঠিক উপযুক্ত নাম হয়েছে। ও বাড়িতে শুধু যে একজন শুচিবায়ুগ্রস্ত বুড়ী আছে তাই নয়, ও-বাড়িব সবই পুরনো। দুটো ইউকালিপট্যাস গাছের আড়ালে চুনবালিঝরা চেহারাটা যেমন প্রাচীন, ভিতরের বাসিন্দা কটিও তেমনি, এ-কালের হয়েও পুরনো আমলের মানুষ। এমন কি, চিত্রার গায়েও পুরনো গন্ধ, পুরনো পোশাক, মন ভবা পুরনো দিনেব সংস্কার। ও-বাড়িব উপযুক্ত নাম পুরনো দুনিয়া। নামটা কেন যে আমাদের আগে স্ট্রাইক করেনি, এইটেই আশ্চর্য।

তারপর পুরনো দুনিয়া থেকেও চিত্রার বুড়ী পিসীমা একদিন সবে গেলেন। মারা গেলেন তিন-চাবদিনেব জ্বরে। চিত্রা কেঁদে আকুল হল। তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আমিও যে কেন চোখের জল ফেললাম, তা জানিনে। সারা পাড়াটা যেন কিছুদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। ভারী ফাঁকা আর খালি-খালি লাগতে লাগল। শত্রুপক্ষ যদি এমন নির্মূল হয়ে যায়, লডব কার সঙ্গে।

চিত্রাদের বাড়ির দোব আবাব আমার কাছে নিষ্কণ্টক হল। কাকাবাবুও আমাকে মাঝে-মাঝে ডেকে পাঠাতে লাগলেন। কিন্তু ও-বাড়িতে তখন আমার যাওয়াব সময় কম। এ পাড়ায় ও-পাড়ায় আরো অনেক বাড়ির ড্রয়িংরুম তখন আমাব জন্যে প্রতীক্ষা করে। পার্টি পিকনিকেব ভিড় ঠেলে কুল পাইনে। আমাদের বাড়িব অতিথি অভ্যাগতেব সংখ্যা বেড়েছে। তাঁদেব মধ্যে শুধু এ দেশী নয়, বিদেশী বন্ধুরাও আছেন। তাঁদেব জন্যে আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয। কারণ আমার জন্যেও তাঁরা কেউ কেউ ব্যস্ত থাকতে ভালবাসেন। আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি। কিন্তু কলেজের লেডী প্রিন্সিপ্যালের চাইতেও আমার প্রভাব-প্রতিপত্তি তখন বেশি। তাব আধিপত্য শুধু কলেজের গণ্ডিটুকুর মধ্যে। কিন্তু আমার দুনিযা না মানে মানা, না মানে সীমানা।

এর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটল। চিত্রাব সেই বুড়ী পিসীমা মারা যাওয়ার পব আর কোন মামীমা-মাসীমাকে তাব বাবা বাড়িতে আনলেন না। দিদির চালচলন আর ব্যবহারে তিনিও বোধ হয় বিরক্ত আব বিব্রত হয়েছিলেন। এবার কলেজ থেকে ধরে আনলেন এক বেয়ারাকে। সে একেবারে সব্যসাচী। একাধারে ঠাকুর চাকর মালী দারোয়ান। এর আগে চিত্রার পিসীমাব আমলে কোন ঝি-চাকব এসে দু-চাবদিনেব বেশি টিকতে পারত না। কিন্তু চিত্রাদের এই নতুন চাকরটি বেশ টিঁকে গেল। ওর কাছেই শুনলাম, লোকটির নাম অভয়। বছর পঁচিশ ছাব্বিশ হবে বয়স। গায়ের রঙ পাথরেব মত কালো। কিন্তু নাক চোখ ঠোঁট চিবুক যেন পাথর থেকেই সেকালের কোন শিল্পী কুঁদে বার করেছে। বেশ লম্বা স্বাস্থ্যবান চেহাবা। মুখশ্রীটুকু সুন্দর। হঠাৎ মনে হয় না যে, পেটে কোন বিদ্যেবুদ্ধি নেই। বরং চোখ দুটি দেখলে মনে হয়, বেশ খানিকটা দুষ্টুবুদ্ধি রাখে।

অন্তু ওব নাম দিল বিষ্ণুমূর্তি। কিন্তু নামটা চাকরের পক্ষে বেশি সম্ভ্রান্ত বলে তেমন চালু হল না। অভয় যখন প্রথম এসেছিল, ওর মাথায় ছিল কোঁকড়ানো ঝাঁকড়া চুল, পরনে ডোরাকাটা পাজামা। কিন্তু চিত্রা নাপিত ডেকে ওর চুল ছোট করে ছাঁটিয়ে নিল। পাজামা ছাড়িয়ে ধুতি পরাল।

ভেবছি কলাব জামাটা ছিঁড়ে ফেলে ছিটেব হাফশার্ট, আর বাইবে বেরোবার জন্যে ভদ্রদর্শন সাদা পাঞ্জাবি করিয়ে দিল। একেকটি পোশাক বদলানো হয় আব অভযেব অন্তবাত্মা আর্তনাদ করে ওঠে। পোশাক ত নয়, যেন ওব গাযেব চামডা কেউ ছাডিয়ে নিচ্ছে। আমাব সঙ্গে দেখা হলে প্রায়ই চিত্রাব বিরুদ্ধে নালিশ জানায়. 'দেখুন তো ওঁদেব কাণ্ড। আমাব খুশিমত আমি জামাজুতো পবব, তাও ওদেব সইবে না। কী অত্যাচাব। চাকবি কবতে এসেছি বলে কি মাথা বিকিযে দিযেছি ?' শুনে আমি হেসে বলি, 'কী আব কববে বল। চিত্রা যা বলে ভালব জন্যেই বলে। তোমাকে ভদ্র আব সুন্দব দেখাবে বলেই বলে। জান ত আপরুচি খানা, পবরুচি পবনা! আমবা সবাই তাই কবি। পবেব জন্য পবি।'

কাজকর্মেব ফাঁকে ফাঁকে আমাদেব চাকব দাবোযানেব সঙ্গে অভয় এসে তাস খেলত, আড্ডা দিত। চিত্রাব তাতেও আপত্তি। বলে, 'অত সময় নষ্ট কববে কেন ? বাডিতে কি আর কোন কাজ নেই ?'

এ কথা শুনে আমি একদিন চিত্রাকে ডেকে বললাম, 'ব্যাপাব কি চিত্রা ? তুই ত এ বকম ছিলিনে। নিজেব পডাশুনো নিয়ে চুপচাপ পডে থাকতিস। হঠাৎ এমন সমাজ সংস্কাবক হয়ে পডলি কেন ?'

চিত্রা বিস্মিত হয়ে বলল, 'সমাজ সংস্কাব ?'

আমি বললাম, 'ওই হল, চাকব সংস্কাব।'

চিত্রা গম্ভীব হযে বলল, 'অভযেব চালচলনটা একটু শুধবে দেওযা দবকাব।'

বললাম, 'তা ঠিক। বাডিব কালচাবেব এবাই ত বাহক। জানালাব পর্দা, টেবিলেব ঢাকনি, ঠাকুব-চাকব, কুকুব বেডাল, গৃহস্বামিনীব সংস্কৃতি এদেব ভিতব দিযেই ত ফুটে বেবোয।'

চিত্রা বিবক্ত হযে বলল, 'সব সময ঠাট্টাইযার্কি ভাল লাগে না বিনা'

আমি লক্ষ্য কবলাম চিত্রাব আগেব সেই সহিষ্ণুতা নেই, ওব মেজাজটা কেমন যেন বিগডে বযেছে। আমাব বুঝতে কিছু বাকী বইল না। চিত্রাব বাবাব এক ভক্ত ছাত্র ছিল, নাম অমবেশ মুখুজ্যে। তাব প্রসঙ্গ উঠলে চিত্রাব মুখেব বঙ বদলাত। কিন্তু মেযেটি এত লাজুক, এত চাপা, এত সেকেলে যে কিছুতেই ওব মুখ থেকে মনেব কথা বার কবে নিতে পাবিনি। সেই অমবেশ হঠাৎ একদিন যাওয়া আসা বন্ধ কবে দিল। বিযে কবল এক ধনী ব্রাহ্মণ পবিবাবে। জান ত, পুরুষেব নিন্দায আমি পঞ্চমুখ। আমি যাদেব দেখেছি তাদেব মধ্যে বেশিব ভাগই কাপুরুষ। শুধু রূপেব দিক থেকে নয, গুণেব দিক থেকেও। তবু বেচাবা অমবেশকে বেশি দোষ দিতে পাবিনে। কাবণ চিত্রাব ধবন ধাবণই একটু আলাদা। কোন ছেলেকেই ও উৎসাহ দিতে জানে না। তা সে কৃত্রিমই হোক, আব অকৃত্রিমই হোক। কিছুটা ও যেন ওব বাবাব স্বভাব পেযেছে। তিনি যেমন নিজেব মধ্যে ডুবে থাকতেন, চিত্রাও তাই। দেখতে দেখতে নিজেব মধ্যে তলিযে যেত। কিন্তু সংসাবেব ডুবুবিব সংখ্যা কম, সাঁতাকব সংখ্যা বেশি এমন কোন ডুবুবী আছে যে ওকে সেই সমুদ্রতল থেকে তুলে আনবে ? তাবপব মজুবি যে পোষাবে, এমন গ্যাবান্টি কই ? চিত্রাব দিকে আমাব বাছা বাছা বন্ধুদেব চোখ আকৃষ্ট কবে দেখেছি। তাবা সবাই এক পা এগিযে তিন পা পিছিযে এসেছে চিত্রাব সঙ্গে প্রতিযোগিতাব আমার বডই সাধ ছিল। দেখতাম কে হাবে কে জেতে। লতা না বিদ্যুৎলতা। কিন্তু বড ভীরু মেযে চিত্রা। ও দ্বন্দ্বযুদ্ধে নামলই না। ওব একমাত্র আনন্দ অন্তর্দ্বন্দ্বে।

ইতিমধ্যে আমাব জীবনে অনেক ঘটনা ঘটল। আমি নিজেই ঘটালাম। অঘটন-ঘটনপটিযসীব গৌবব আব কাউকে দিতে চাইনে। এক পাঞ্জাবী শিখকে বিযে কবে ছেডে গেলাম তোমাদেব বাংলা দেশ। ফিবে এলাম দু-বছব বাদে। আমি ছেলে হলে বাবা আমাকে ঘটা কবে ত্যাগ কবতেন। মেযে বলে মনে মনে ছাডলেন। কিন্তু তাই বলে মৌখিক ভদ্রতাব সম্পর্কটুকু দূব হল না। বাডিব সকলেব সঙ্গে একই টেবিলে বসে খাই, গল্প কবি। মন নিযে কেউ মাথা ঘামাইনে, মেজাজ ভাল বাখতে পাবলেই হল।

ফিবে এসে শুনতে পেলাম চিত্রাও এক কাণ্ড কবেছে তাব কৃতিত্ব আমাব চেযে কম নয। বাডিব চাকব অভযকে নিযে সে পলাতকা। পৃথিবীব কিছুই আমাকে বিস্মিত কবতে পাবে না। কিন্তু

চিত্রাব এই খববে আমিও খানিকক্ষণ অবাক হয়ে বইলাম। চিত্রার মত মেয়ে এমন কাণ্ড কবতে পারে, তা যে স্বচক্ষে দেখলেও চোখ বগড়ে ভাবতে হয়, স্বপ্ন দেখছি কি না। আস্তে আস্তে জেনে নিলাম সব বৃত্তান্ত। বোনদেব মুখে, বন্ধুদেব মুখে। চিত্রাব নিন্দায় একেক জনেব পাঁচখানা কবে মুখ বাব হল। মেয়েটা যে মিটমিটে শযতান তা নাকি সবাই আগে থেকে টেব পেয়েছিল। দেখলে মনে হত ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানে না। কিন্তু আসলে তা নয। নিজেদেব সমাজে এত ভাল ভাল ছেলে থাকতে শেষ পর্যন্ত কিনা বাড়িব চাকবটাকে পছন্দ কবল! দেহ ছাড়া আব কি আছে অভযেব! ছি-ছি-ছি। কী রুচি মেয়েটাব, কী প্রবৃত্তি।

আমি কিন্তু খুশি হলাম। বেশ কবেছে, ঠিক কবেছে। এতদিনে ওদের পুবনো দুনিয়া খানখান কবে ভেঙে পড়েছে। মবেছে ওদেব ভূতেব ভয। আহা, এ-সময়ে যদি চিত্রাব সেই বুড়ী পিসীমা বেঁচে থাকতেন, তাহলে কী মজাটাই না হত। তিনি তো নেই-ই, চিত্রাব বাবাও বাড়ি ছেড়ে, পাড়া ছেড়ে, শুনলাম কলকাতা শহব ছেড়েই কোথায চলে গেছেন।

চিত্রাদেব সেই ছোট্ট দোতলা বাড়িটা ছিল ভাড়াটে বাড়ি। তাব মালিক এসে ইঞ্জিনিযাব মিস্ত্রী লাগিযে সেই পুবনো বাড়িটাব নতুন চেহাবা দিলেন। বাড়িব বঙ বদলাল, রূপ বদলাল। নীচে উপবে দুখানা করে ফ্ল্যাট হল। সঙ্গে সঙ্গে ভাড়াটেও এসে গেল। আব তা দেখে দেখে আমাব মনেব এক এক নির্জন কোণ গোপনে হাহাকাব কবে উঠল। ঠিক চিত্রাব বুড়ী পিসীমা মাবা যাওযাব সময যেমন কবেছিল। এত অদল-বদল সত্ত্বেও আমাব মন থেকে সেই পুবনো বাড়িব ছবিটা একেবাবে মুছে গেল না। বাব বাব চিত্রাব মুখখানা মনে পড়তে লাগল। আহা কতদিনেব জানাশোনা ওব সঙ্গে, কতদিনেব বন্ধুত্ব! বাল্যপ্রণযে অভিশাপ আছে। কোন প্রণযেই বা নেই। তবু ছেলেবেলাব ভালবাসাব সঙ্গে আব কিছুব তুলনা চলে না।

বিনা তাব গল্প থামিযে একটুকাল চুপ কবে বইল।

আমি বললাম, "ব্যাপাব কী। চিত্রাদেব সেই পুবনো দুনিযাটা কি শেষ পর্যন্ত তোমাব মনে এসে বাসা বাঁধল?"

বিনা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ কবে উঠল, "না না, আমাব মনে সহজে কোন কিছু বাসা বাঁধে না। আমাব কথা ছেড়ে দাও। যা বলছি তাই শোন। চিত্রাব কথা আমাব মনে পড়তে লাগল। আব সেই সঙ্গে অভযেব কথা। আশ্চর্য, যতই বলিনে কেন, চিত্রাব পাশে অভযকে দাঁড় কবাতে আমাবও যেন কেমন বাধো বাধো লাগতে লাগল। চিত্রাদেব বাড়িব সঙ্গে আমাদেব বাড়িব যে সম্পর্কটুকু ছিল আমি তাব নাম দিয়েছিলাম অমিত্রাক্ষব ছন্দ। অভযেব সঙ্গে চিত্রাব যে মিল, তাতে তাও নেই। একে গদ্য কবিতাও বলা চলে না। তবে ব্যাপাবটা কী। ওদেব সম্পর্কটা কোন জাতেব। নিজেব জীবনেব গিঁট বাঁধা গিঁট খোলাব ফাঁকে ফাঁকে আমি ওদেব কথা ভাবি।

অভযেব কথা মনে পড়ে। আমাব জানালা থেকে কি দোতলাব ব্যালকনি থেকে, যখনই চিত্রাদেব ঘবদোব চোখে পড়ত, অভযকে প্রায সব সময কমবাস্ত দেখতে পেতাম। কখনো বাজাব থেকে ফিবছে, কখনো বা কযলা ভাঙছে, জল তুলছে, বান্না কবছে। আবাব চিত্রা কি তাব বাবা অসুখ-বিসুখে পড়লে তাঁদেব সেবা শুশ্রূষা কবছে। পথ্যেব বাটি নিয়ে চিত্রাকে সাধাসাধি কবছে দেখতে পেতাম। মাঝে মাঝে মন্দ লাগত না দেখতে। মানুষ যখন কাজ কবে, তাব সেই নড়া চড়া থেকে যেন এক আলাদা ছন্দ আলাদা রূপ ফুটে বেবোয। তাই বলে এ-কথা ভেব না যে, চিন্তামগ্ন মানুষেব রূপ নেই। তাও আছে। আমি এক চোখা নই। দু চোখ দিয়ে দেখি। তাই সব মানুষেব মধ্যেই রূপ দেখতে পাই। এমন কি, পাপে মগ্ন মানুষও আমাকে টানে। ডুবন্ত জাহাজেব মত তাদেব মগ্ন সৌন্দয।

দবকাবী কাজ ছাড়া অভযেব খুশিব কাজও ছিল। টবে সে ফুলেব চাবা লাগাত। আমাদেব মালীব কাছ থেকে সে অর্কিড, ডালিয়া, জিনিযা, ক্যানাব চাবা চেযে নিত। চেযে নিত বঙবেবঙেব গোলাপ। চিত্রাব কি তাব বাবাব ফুলেব দিকে কোন ঝোঁক ছিল না। তবে অভযেব পুষ্পবিলাসকে কেউ বাধাও দেযনি। আব ছিল ছেলে মানুষেব মত অভযেব ঘুড়ি ওড়াবাব শখ। যখন তখন ছাদে উঠে মনেব বং ও আকাশে উড়িয়ে দিত। শুধু নিজেই ওড়াত না, পাড়াব ছেলেদেবও অকাতবে

নিজের তৈরি ঘুড়ি বিলাত। তাব ফলে পাড়ায় ওর ভক্তেব সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। আব গভীব বাত্রে মাঝে মাঝে বাঁশি বাজাত অভয়। কাব কাছে যেন সবে শিখতে শুরু কবেছিল। সব সময় যে সুব তাল ঠিক থাকত, তা নয়। তবু শুনতে নেহাত খাবাপ লাগত না। আমি আমাব ভাইবোনদের সঙ্গে মাঝে মাঝে এই নিয়ে হাসাহাসি কবতাম। এই সব সাধ ওব কাব জন্যে। আমাব ছোটবোন বলত, :দিদি নিশ্চযই তোমাব জন্যে। ঠাকুব চাকব ত দূবেব কথা, পৃথিবীর গাছ-পাথব পর্যন্ত তোমাকে চায। তাদেব যদি কথা বলবাব শক্তি থাকত বাঁশি বাজাবাব শক্তি থাকত, চাওযাব সুব এমনি শুনতে পেতে।

আমি হেসে বলতাম তাহলে বাঁশিব সুব এবই মধ্যে শুনতে শুরু কবে দিযেছিস তুই ? বাবাকে বলতে হবে কথাটা।' কিন্তু অভযেব বাধা যে ঘবেব মধ্যেই বাঁধা ছিল এ-কথা আমবা স্বপ্নেও ভাবিনি

ওদেব পালাবাব কিছুদিন আগে বাড়িতে ছোটখাট এক অগ্নিকাণ্ড হয়েছিল সেদিন সন্ধ্যাবেলায কাকাবাবু বাড়ি ছিলেন না। উনুনে আঁচ দিযে অভয যেন কাছেই কোথাই গেছে। তাকে ডাকাডাকি কবে না পেযে চিত্রা নিজেই চাযেব জল গবম কববাব জন্যে কেটলি হাতে বান্নাঘবে ঢুকেছিল। হঠাৎ কী কবে আঁচল পড়ে গেল উনুনেব মধ্যে। আব দাউ দাউ কবে জ্বলে উঠল আগুন। মেযেদেব আঁচলেব লোভ কোন দেবতাই বা সামলাতে পাবেন অগ্নিই বল আব বরুণই বল। চিত্রা যেমন নার্ভাস তেমনি বোকা মেযে। বি এ পাশ কবলে কী হবে, ওব মোটেই বুদ্ধিশুদ্ধি হযনি। আগুনসুদ্ধ আঁচল নিযে ও ঘব আব বাবান্দা দিযে কেবল ছুটোছুটি কবে বেড়াতে লাগল। আব তাব ফলে সে আগুন ওকে একেবাবে চাবদিক থেকে ঘিবে ধবল আগুনেব ধর্মই ওই। ছুটোছুটি কবে তাকে নেবান যায় না। সে ভিতবেবই হক আব বাইবেবই হক

অভয বেশি দবে যাযনি। চিত্রাব চেচামেচি শুনে সে প্রায সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজিব হল। চিত্রাকে ধমক দিযে বলল কবছেন কী দিদিমণি ? আপনাব কি একটুও কাণ্ডজ্ঞান নেই ? খুলে ফেলুন, শিগগিব খুলে ফেলুন।

চিত্রা তবু বুঝতে পাবছে না কী খুলবে।

অভয তখন এগিযে এসে টান দিযে ওব শাড়িটা খুলে ফেলল, টেনে ছিঁড়ে ফেলল সায়া আব ব্লাউজ। চিত্রা এক পলক বিমূঢ় হযে চেযে থেকে দু হাতে চোখ ঢেকে ছুটে ঘবেব মধ্যে গিয়ে দোবে খিল দিল।

কযেক বালতি জল এনে অভয সেই জ্বলন্ত শাড়ি ব্লাউজেব উপব ঢেলে দিল। ততক্ষণে পাড়া পড়শীবা সব এসে পড়েছে। কেউবা দূবে দাঁড়িযে বঙ্গ দেখছে। দু-এক জন বলল, দমকল ডাকব নাকি অভয ?

কিন্তু ব্যাপাবটা আব বেশি দূব গড়াল না। চিত্রাদেব সবই বক্ষা পেযেছে। ঘব-দোব চেযাব টেবিল বই পত্র কিছুই পুড়ল না। পুড়ল শুধু চিত্রাব কপাল। আর অভযেব হাত। সে হাত জেনেশুনেই পুড়িযেছে।

কলকাতায এসে এই অগ্নিকাণ্ডেব তিন বকম ব্যাখ্যা আমি শুনেছি। এক নম্বব হল ব্যাপাবটা দৈব দুর্ঘটনা। দু নম্বব হল চিত্রা সাধ কবে শাড়িতে আগুন ধবিযেছে, অভযেব হাতে ওব বস্ত্রহবণ হবে বলে। তিন নম্ববেব টীকাকাববা বলল, হবণ যা হবাব হযে গিযেছিল। গাযে কেবোসিন ঢেলে চিত্রা গিযেছিল মবতে। শেষ পর্যন্ত ভযেব জন্যে পাবেনি। বিশেষ কবে অভযের জন্যে।

যে ব্যাখ্যা তোমাব পছন্দ হয তাই বিশ্বাস কবো। আমি তো তাই কবি। বিশ্বাস অবিশ্বাস ভালমন্দ, সুনীতি দুর্নীতি সব আমাব পছন্দ অপছন্দেব উপব।

চিত্রা কিছুটা অসুস্থ হযে পড়েছিল। গাযে শুধু আগুনের আঁচ লাগেনি, পুড়েও গিয়েছিল দু এক জাযগা। ওই সঙ্গে জ্ববও হল। খানিকটা বোধ হয আতঙ্কে। চিত্রাব বাবা ডাক্তাব ডেকে চিকিৎসার ব্যবস্থা কবলেন। শুশ্রূষা কবাব ভাব অভয নিজেব হাতে নিল। ওব সেই পোড়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত নিযে আগেব মত, এমনকি আগেব চেযে বেশি, কাজ ও কবতে লাগল। ওব একখানা হাত পুড়ে গিযে যেন চাবখানা হাত বেবিযে এসেছে।

প্রথম প্রথম চিত্রা ওকে কাছে ঘেঁষতে দিত না। অভয় ঘরে গেলে তাকে সেখান থেকে চলে যেতে বলত। পাশ ফিরে শুয়ে থাকত, না হয় চোখ ঢেকে রাখত হাতের তেলোয়। কিন্তু অভয়ের আদর যত্নে অনুনয়-অনুযোগে কখনো বা শাসনে-ধমকে চিত্রা বিমুখ হয়ে থাকতে পারল না। ওষুধ খেল, পথ্য খেল, চোখ মেলল, মুখ তুলল।

এদিকে পাড়াপড়শীরা গা-টেপাটিপি শুরু করেছে। আশেপাশের বাড়িতে ছাদে জানালায় প্রায়ই নানাবয়সী বউ ঝিরা এসে দাঁড়িয়ে থাকে। পুরুষের দলও যে না আসে তা নয়। আগে-এই খ্রীস্টান বাড়িটি সম্বন্ধে পাড়ার কারো কৌতূহল ছিল না। কিন্তু এখন যেন পৃথিবীর যত রস যত রহস্য ওই পুরনো জীর্ণ বাড়িটির মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে।

দিন কয়েক বাদে চিত্রা সুস্থ হয়ে উঠল। ওর বাবা গম্ভীর মুখে বললেন, 'এবার অভয়কে ছাড়িয়ে দিতে হবে।'

চিত্রা বলল, 'কেন?'

ওর বাবা বললেন, 'তোর ভালর জন্যে।'

চিত্রা বলল, 'ভালমন্দ বোঝবার বয়স ত আমার হয়েছে বাবা।'

চিত্রার বাবা বললেন, 'বয়স হলেই যে সবাই তার ভালমন্দ বুঝতে পারে এমন কোন কথা নেই।'

চিত্রা বলল, 'এ-কথা তোমার মুখে নতুন শুনছি বাবা। এতকাল ত তুমি আমাকে সেভাবে মানুষ করনি। তুমি আমাকে নিজের মনে থাকতে দিয়েছ সব বিষয় সম্বন্ধে নিজের মতামত গড়ে তুলতে দিয়েছ। আজ কেন অন্য কথা বলছ, আজ কেন বাধা দিচ্ছ?'

চিত্রার বাবা আবার বললেন দিচ্ছি তোর ভালর জন্যে। তোর পরিণামের কথা ভেবে। একটা চাকরের সঙ্গে—ছি ছি ছি। ভাবতেও আমার গা ঘিনঘিন করছে। আমি তোর মুখের দিকে তাকাতে পারছিনে চিত্রা।'

লজ্জায় চিত্রা নিজেও খানিকক্ষণ মুখ নিচু করে রইল। তারপর মুখ তুলে বাপের চোখের দিকে তাকিয়ে অসীম জেদ আর সাহসের সঙ্গে বলল তুমি যা ভাবছ তা সত্যি নয় বাবা লোকে যা বলছে তা মিথ্যে। আমি এমন কিছু করিনি যাতে তোমার গা ঘিনঘিন করতে পারে কিন্তু চাকর বলে ওকে ঘৃণা করবার অধিকার তোমার নেই।'

চিত্রার বাবা বললেন ঘৃণা ত আমি করছিনে কিন্তু ও যা করে তাতে ওকে সমাদরও করতে পারিনে'

চিত্রা একটু হাসল ও যা করে—। কিন্তু ওকে দিয়ে ত এসব কাজ আমরাই করাচ্ছি বাবা, আমরাই ওকে করতে বাধ্য করছি। শ্রমের মর্যাদা নিয়ে তুমি আর আমি কত আলোচনা করেছি, তুচ্ছ কাজে আজও হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষকে পেটের দায়ে ব্যস্ত থাকতে হয় বলে আমরা দুজনে কত দুঃখ করেছি। মানুষের বুদ্ধি, চিন্তা, কল্পনা, সৃষ্টিশক্তির এমন চরম অব্যবহার আর অপচয়ের জন্যে কত আফশোস করে মরেছি। তুমি লিখেছ, আমি পড়েছি। আর আমাদেরই চোখের সামনে ওই অভয় দিনের পর দিন বাসন মেজেছে আর জল টেনেছে।'

চিত্রার বাবা বললেন, 'চিত্রা, এই জল টানা আর বাসন মাজার কাজ ত তুই শুধু আজ দেখলিনে। অনেককাল ধরেই ত দেখছিস। কিন্তু আজই তোর এই অবিচারটা কেন নতুন করে চোখে পড়ল। এত দরদ তোর মনের মধ্যে কেন উথলে উঠল। তার কারণ ওই লোকটাকে তুই অন্য চোখে দেখেছিস।' দাঁতে দাঁত পিষলেন তিনি। তারপর বললেন, 'কামনার চোখে দেখেছিস, লোভের চোখে দেখেছিস। তাই তোর এই দরদের কোন দাম নেই। তোর এই ওকালতি নিঃস্বার্থ নয়।'

চিত্রা ফের কিছুক্ষণ মুখ নিচু করে চুপ করে রইল। তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'হয়ত তোমার কথাই ঠিক বাবা। হয়ত ভিন্ন চোখেই দেখেছি। আর তা দেখেছি বলেই এমন করে আমার চোখ খুলে গেছে। সামনে থেকে সব আড়াল সরে গেছে। বাবা, যাঁরা মহাপুরুষ মহামানব, তাঁরা এক সঙ্গে অনেককে দেখতে পান। পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মুখ তাঁদের

চোখের সামনে ভাসে। কোটি কোটি মানুষের দুঃখ সুখ তাঁদের হৃদয়কে দিনরাত তোলপাড় করে। কিন্তু আমরা যারা ছোট তারা জীবনে এমনি দুজন একজনকেই শুধু দেখি। দুজন-একজনের ভিতর দিয়েই হঠাৎ একেক সময় আমাদের বিশ্ববোধ জাগে। শিশু কৃষ্ণের মুখে যশোদা যে বিশ্বরূপ দেখেছিলেন, সে-রূপ ছেলের মুখে ছিল না, ছিল মায়ের চোখে।'

হিন্দু পুরাণ, দর্শন, বাপ আর মেয়ে দুজনেরই চর্চার বিষয় ছিল। কিন্তু সেদিন মেয়ের মুখে এ-ধরনের পৌরাণিক উদাহরণ বাপের কাছে নিতান্ত হাস্যকর, অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক আর পরম অসহনীয় হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত আর না থাকতে পেরে তিনি তীব্র জ্বালাভরা স্বরে মুখ বিকৃত করে বললেন, 'কিন্তু তুই কি ভেবেছিস, একটা চাকরকে বিয়ে করে তুই দুনিয়ার চাকরের দুর্দশা ঘোচাতে পারবি ? নাকি ঘরে ঘরে মনিবের মেয়েরা ধরে ধরে চাকরদের বিয়ে করলেই সব শ্রেণীভেদ লোপ পাবে ?'

চিত্রা বললে, 'আমি ত পাগল হইনি বাবা যে ও কথা বলব। আমি শুধু আমার সমস্যার কথাই ভাবছি। শুধু আমার পথই খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছি।'

ওর বাবা বললেন, 'ও চেষ্টা তুই ছেড়ে দে চিত্রা। অভয়ের ওপর তোর যদি অত মায়া হয়ে থাকে, আমি ওকে পাঁচশ কি হাজার টাকা দিচ্ছি। তাই দিয়ে ও হয় লেখাপড়া শিখুক না হয় ব্যবসা-বাণিজ্য করুক। ওকে আগে মানুষ হতে দে। যাক আরো পাঁচ সাত দশ বছর। তারপর তোর যা খুশি তাই করিস।'

চিত্রা এবার কিছুক্ষণ ভেবে দেখল, তারপর বলল-এর আগে তুমিই বলেছ বাবা, শুধু লেখাপড়া শেখাটা মানুষ হবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। আর ব্যবসা-বাণিজ্যে সিদ্ধি ? তাই কি মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড় মাপকাঠি ? বরং উল্টোটাই ত বেশি চোখে পড়ে। ওর সাধ্য নেই একা-একা কিছু করে। বেশি টাকা-পয়সা হাতে পড়লে ও হয়ত তা দুদিনেই নষ্ট করে দেবে। ওকে তোমার কিছুই দিয়ে কাজ নেই বাবা।'

চিত্রার বাবা বললেন, 'বেশ, আমি ওকে কিছু দেব না। কিন্তু তুইও ওকে কিছু দিতে পারবিনে।'

শুধু এ-কথা বলে তিনি নিশ্চিত আর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলেন না। অভয়কে সেই দিনই কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। পাড়ার ছেলেদের ডেকে বলে দিলেন, তাঁর চাকরের স্বভাব ভাল নয়। পয়সা চুরির অভ্যাস আছে। ঘরের জিনিসপত্র দিয়েও তাকে আর বিশ্বাস করা যায় না। তাই সে ফের যদি এমুখো হয় ত যেন উচিত শিক্ষা পেয়ে যায়।

এসব কথা আমি চিত্রার মুখে পরে শুনেছিলাম। তার বাবা যে এসব কাজ করতে পারেন তা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু মেয়ের সুনাম আর পরিণামের চিন্তা আর সমাজে নিজের মান সম্মান খোয়াবার ভয় তাঁকে বোধ হয় অস্থির আর অশান্ত করে তুলেছিল। অভয়কে তিনি বোধ হয় তখন নিজের হাতে খুনও করতে পারতেন। মানুষ যে কত বিচিত্র আর বিপরীত ধাতুতে গড়া তা আমার চেয়ে তোমারই বেশি জানবার কথা। একথা জানবার জন্যে পরের কাছে যাওয়ার দরকার হয় না। নিজের দিকে নিরাসক্তভাবে তাকালেই আমরা সেই দিব্যদৃষ্টি আর দিব্যজ্ঞান পেতে পারি।

অভয় হত না হলেও খুবই আহত হল। একদিন বেশি রাত্রে পাড়ার ছেলেরা ওকে চোরের মার মারল, যদিও জিনিসসুদ্ধ ধরতে পারলে না। পরদিন সে-জিনিস নিজে এসে ধরা দিল। চৌকিদারদের হাতে না, চোরের হাতে। ওরা পাড়া ছেড়ে পালাল। দিন কতক কেউ আর ওদের কোন পাত্তা পেল না।

তুমি ত জান, পৃথিবীর রঙ্গালয়ে আমি শুধু দর্শক কি শ্রোতার সারিতে বসে থাকবার জন্যে আসিনি। নানা রকম ভূমিকায় অভিনয় করেছি। হেসেছি, কেঁদেছি। সান্ত্বনা এই যে, কাঁদাতেও পেরেছি কাউকে কাউকে। আমার এই অতি-ব্যস্ত জীবনে যারা হারিয়ে যায়, তাদের পিছনে পিছনে যাবার আমার অভ্যাসও নেই, উৎসাহও নেই। তবু চিত্রার কথা আমার মাঝে মাঝে মনে পড়ত। সামনের ওই ফ্ল্যাটবাড়িটার ঘরগুলিতে অপরিচিত গৃহস্থ-বউদের নড়াচড়া আসা-যাওয়া দেখতে দেখতে একটি চেনা মুখ আমার চোখের সামনে ফুটে উঠত। আর সেই সঙ্গে ছেলেবেলার অনেক ছায়াছবি। ভাবতাম চিত্রা কেন আসে না এখানে ? ওই বাড়িরই একটা ফ্ল্যাট নিয়ে কেন বাস করে না

নতুন বেশে নতুন ধবনে ? ও ত এখন নতুন জগতের'বাসিন্দা। ওব ভয কী ? জানতে'কৌতূহল হত, সেই লোকটি কি ওব সঙ্গে এখনো আছে, নাকি তাকে দুদিন বাদে তাড়িয়ে দিযেছে চিত্রা ? তাই ত স্বাভাবিক। তাহলে এখন কে ওব সঙ্গী, কেমন ওদেব মধ্যে সম্বন্ধ, জানতে ইচ্ছে হত। কিন্তু সেই ইচ্ছাটা সক্রিয হযে ওঠাব আগেই আমি অন্য ক্রিযা কর্মে জডিযে পডতাম।

সেবাব গোযেন্দা-বিভাগেব একটি চালাক চতুব সুদর্শন ছেলেব সঙ্গে আমাব ঘনিষ্ঠতা হল। কথায কথায তাকে বললাম, 'তুমি আমাব হযে একটা কাজ কবতে পাববে ?' সে বলল, 'তোমাব জন্যে অকাজও কবতে পাবি।' আমি ওকে দিলাম চিত্রাব নাম-ধাম পবিচয, রূপ-গুণেব বর্ণনা। জানালাম সেই প্রণয-কাহিনী,তাবপব বললাম, 'খুঁজে বাব কব এই বনহবিণীকে। আমাব ত মনে হয এই শহবেবই কোন উপবনে সে আছে।

দিন কযেক বাদে সত্যিই সে সন্ধান আনল। ডালহৌসী স্কোযাবেব এক বিদেশী মার্চেন্ট অফিসে চিত্রা স্টেনোগ্রাফাবেব চাকবি কবছে। থাকে ইন্টালিব এক সরু কানা গলিতে। নাম অনবেইট সেকেণ্ড লেন। আমাব বন্ধু বলল, সেখানে আমাকে সে নিযে যেতে পাবে। আমি ধন্যবাদ দিযে বললাম, তাকে সঙ্গে কবে গলিঘুঁজিতে হাঁটবাব আমাব ইচ্ছে নেই। বেডাই ত বড বড সডক দিযেই বেডাব।

আব একটু খোঁজ-খবব নিযে জানতে পাবলাম চিত্রাকে শুধু আমিই দেখিনি। আমাদেব পাড়াব অনেক ছেলেমেযেবই তাকে চোখে পডেছে। যাবা ট্রামে-বাসে দশটা পাঁচটাব ভিড ঠেলে অফিসে যায, তাবা দেখেছে শুকনো শীর্ণ স্বাস্থ্যহীন একটি মেযেকে লেডীজ সীটেব এককোণে চুপ কবে বসে থাকতে। কখনো বা সে বইযেব মধ্যে ডুবে আছে। কখনো বা আপন ভাবনা সমুদ্রে। চিত্রাকে এ-পাডাব অনেকেই চেনে। জিজ্ঞাসা কবলে অনেকেই তাবা আমাকে ওব খোঁজ এনে দিতে পাবত। তাব জন্যে গোযেন্দা লাগাবাব দবকাব ছিল না।

চিত্রাদেব যে পুবনো বাডিটা রূপান্তব আব জন্মান্তব নিযেছে, সেই বাডিব তিন নম্বব ফ্ল্যাটেব অনিলেন্দু সেন ইনকামট্যাক্সেব অফিসাব প্রথমে সে আমাব বাবাব কাছে আসত দবকাবী কাজে তাবপব অদবকাবেও আসত লাগল। আমাদেব ড্রযিং-রুমে বসে গল্প কবত একদিন তাব মুখেও শুনলাম চিত্রাব কথা চিত্রা নাকি আগে ওই অফিসেই কাজ কবত। এমন কি অনিলেন্দবই সেকশনে। অনিলেন্দুব ঠিকানা শুনে সে নাকি বলেছিল,'আমবা আগে ওই বাডিতেই থাকতাম।' আমাব খোঁজ-খববও জিজ্ঞাসা কবেছিল চিত্রা। এমনি কবে একসঙ্গে কাজ কবতে কবতে আলাপ পবিচয এগোয কিন্তু হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল। ছুটিব পব অনিলেন্দু সেদিন অফিস থেকে বেবিযেছে, পাশাপাশি চিত্রা চলছে হেঁটে। এমন সময চোযাডে চেহাবাব অশিক্ষিত অভদ্র দর্শন একটি লোক কোত্থেকে সামনে এসে পথ আগলে দাঁডাল, 'খুব যে জমিযে তুলেছ। আমাব স্ত্রীব সঙ্গে অত খাতিব কিসেব তোমাব ? আমি কেবল দেখছি আব দেখছি। যেদিন ধবব হাড আব মাস আলাদা কবে ছাডব

চিত্রাব মুখ বিবর্ণ অনিলেন্দু অবাক। একটু বাদে সে বলল মিসেস মণ্ডল এই পাগলটি কে ? একে কি আপনি সত্যিই চেনেন ? নাকি পুলিস ডাকব ?

চিত্রা বলল, পুলিস ডেকে দবকাব নেই। ইনি আমাব স্বামী। আসুন আলাপ কবিযে দিই অভযকুমাব মণ্ডল আব—।'

এতক্ষণ বিস্ময ছিল এবাব বিতৃষ্ণায মন ভবে উঠল অনিলেন্দুব। আলাপেব উৎসাহ তাব অনেক আগেই চলে গিযেছিল।

চাব পাশে লোক জমতে শুরু কবেছিল। চিত্রা তাব স্বামীকে নিযে কোনবকমে একটা ট্রামে উঠে পডল। কিন্তু ঝামেলাটা একদিনেই গেল না। অভয প্রাযই এসে উৎপাত কবতে লাগল। অনিলেন্দু খোঁজ-খবব নিযে আবো জানতে পাবল যে, লোকটি আগে চিত্রাদেব চাকব ছিল। এই রুচি বিকৃতিব কথা শুনে গা আবো ঘি ঘি কবে উঠল অনিলেন্দুব। মেযেটিব শিক্ষা-সংস্কৃতিব কোন মূল্যই তাব কাছে আব বইল না। অফিসসুদ্ধ ছি ছি ছি পডে গেল। শেষ পর্যন্ত চিত্রা সেখান থেকে বিজাইন কবতে বাধ্য হয। এই অভিজ্ঞতা নাকি ওব প্রথম নয। তবু যে বাব বাব কেন চাকবি কবতে আসে,

তাই আশ্চর্য।

আমিও অবাক হলাম। অমন একটা ইতরকে চিত্রা আজও কেন সহ্য করছে? পৃথিবীতে সে কি আর দ্বিতীয় পুরুষ খুঁজে পেল না।

তারপর খুঁজে খুঁজে একদিন গেলাম চিত্রার বাসায়। না কোন গাড়ি নিলাম না, সঙ্গী নিলাম না। মনে কর না যে, সব সময় তোমাদের সঙ্গ আমার কাম্য। অচেনা-অজানা পথে একা একা বেড়াবার আমার অভ্যাস আছে। শুধু গাড়িঘোড়ায় নয়, খালি পায়েও হেঁটেছি। তার ফলে পথ হারিয়েছি বহুবার। আবার নিজেই নিজের পথ খুঁজে নিয়েছি।

মার্কেটের সামনে ট্রাম থেকে নেমে হেঁটে হেঁটে অনরেহ্য লেনের সেই বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। তোমার ভাষায় সে এক দেশ আবিষ্কার। এ-গলিতে আমি এর আগে কোনদিন আসিনি। কলকাতায় কত অনাবিষ্কৃত গলিই যে আছে এখনো। শুধু স্ট্রীট ডাইরেক্টরি দেখে তার চেহারা চেনা যায় না, রহস্য বোঝা যায় না, শুধু পা দিলে টের পাওয়া যায় গা কেমন শিরশির করে উঠছে।

পুরনো দরিদ্র পাড়া। দু দিকে ভাঙা জীর্ণ বাড়ি। অন্ধকার অপরিচ্ছন্ন। নম্বর মিলিয়ে কড়া নাড়তেই সাত-আট বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে এসে দোর খুলে দিল।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম খুকু, চিত্রা বলে এখানে কেউ থাকে?'

সে দোরের দুটি পাল্লা খুলে দিয়ে আমাকে সাদরে ভিতরে ডেকে বলল, 'ওই ত মাসী।'

দেখি উঠোনের এককোণে কলতলায় বসে বসে একটি মেয়ে বাসন মাজছে। পরনে লালপেড়ে আটপৌরে শাড়ি। এলো খোপাটি ঘাড়ের কাছে নোয়ানো। চেহারা অনেক রোগা হয়ে গেছে। তবু আমি ওর বসবার ভঙ্গি দেখে পিছন থেকে চিনতে পারলাম, ও চিত্রা ছাড়া আর কেউ নয়।

সাড়া দিতেই ও মুখ ফেরাল উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'তুই!'

আমি জানি চিত্রা আমাকে পুরোপুরি ভালবাসত না, সহ্য করতে পারত না। কারণ ওর পথ আর আমার পথ এক নয়, ওর রুচি আর আমার রুচি আলাদা। তবু সেই মুহূর্তে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার আবছায়ায় আমরা দুজনেই অনুভব করলাম, আমরা দুই বন্ধু। অনেক দিনের অনেক কালের অনেক যুগের দুই পুরনো বন্ধু।

চিত্রা বলল, তুই এখানে আসবি আমি ভাবতেও পারিনি। গরিবের বাড়িতে হাতির পা।'

আমি বললাম হ্যাঁ, হাতি তোকে পিঠে করে নিয়ে যেতে এসেছে। চল আমার সঙ্গে।'

চিত্রা হাত ধুয়ে আমাকে সঙ্গে করে ওর ঘরে নিয়ে গেল। একতলায় তিন ঘর ভাড়াটে। দোতলায় থাকে একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবার বারান্দা থেকে একটি বাঁধা কুকুরের ডাক মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল।

চিত্রার ঘরখানা পূব দক্ষিণ কোণে। গিয়ে দেখলাম আসবাবপত্র সামান্যই। তবু ওরই মধ্যে বইয়ের র‍্যাক আছে। জানালার ধারে পাতা ছোট সস্তা দামের একটি টেবিল। চিত্রা আমার দিকে চেয়ারটা এগিয়ে দিয়ে বলল, বোস

বললাম 'তুই কোথায় বসবি?'

ও বলল, 'আমি ত গৃহস্বামিনী

হেসে বললাম, বটে! তা স্বামীটি কোথায় তাকে যে দেখছিনে?'

চিত্রা বলল কোথায় যেন বেরিয়েছে। একটুবাদেই আসবে হয়ত।'

দু চার মিনিট পরে চিত্রা উঠে দাঁড়াল বলল তুই বোস। আমি চা করে আনি।'

আমি হাত ধরে ওকে টেনে বসিয়ে বললাম, দরকার নেই চায়ের। আমি চা বেশি খাইনে। সেবার চা করতে গিয়ে তুই নাকি যা কাণ্ড ঘটিয়েছিলি। আমি সব শুনেছি।'

চিত্রা একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'আজকাল আর সেসব হয় না। এখন আমি নিজের হাতে সব করি, সব পারি।'

আমি বললাম,'তা ত দেখতেই পেলাম। ইস্তক বাসন মাজা পর্যন্ত। তুই যখন অফিসে চাকরিবাকরি করিস অভয়কে দিয়ে ওসব কাজ করালেই পারিস ওর ত অভ্যাসই আছে।

চিত্রা একটু হেসে বলল থাকলে কী হবে। এখন আর করতে চায় না ভাই। এ-বাড়ির অন্য

কোন পুরুষে ত কবে না।'

আমি বললাম, 'অন্য কোন পুরুষ আব ও কি সমান ?'

চিত্রা সে-কথাব জবাব না দিয়ে আগেব মতই হেসে বলল, 'বলে কি এতদিন ত আমি কবেছি। এখন তুমি দিন কতক কবে দেখ।'

যেন কত বড হাসিব কথা। আমি বাগ কবে বললাম, 'ব্রুট। চিত্রা, তুই ওকে প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে আবো অমানুষ কবে তুলেছিস। আমি অনিলেন্দু সেনেব কাছে সব শুনেছি। এত কাণ্ডেব পবেও তুই ওকে সহ্য কবছিস কী কবে ? ওব মনুষ্যত্ব ত গেছেই। তুইও তা খোযাতে বসেছিস ?'

চিত্রা এ-কথাব কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'অনিলেন্দুবাবুব সঙ্গে তোব তা হলে আলাপ হয়েছে ? তিনি বুঝি সব বলেছেন তোকে ?'

বললাম, হ্যাঁ। নিশ্চযই বানিয়ে বলেননি।'

চিত্রা স্বীকাব কবল। এক বিন্দুও বানায়নি অনিলেন্দু। তাব সব কথা সত্যি। চিত্রাকে নানা জাযগায এমন নিগ্রহ পেতে হয়েছে। যেখানেই ওব সত্য পবিচয লোকে জানতে পেবেছে, সেখানেই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অপমান-লাঞ্ছনা সযে সযে শেষ পর্যন্ত বিদায নিতে হয়েছে ওকে। প্রাসাদেব দিকে কোনদিন ও পা বাডাযনি। কিন্তু কুটিবে কুটিবেও দ্বাব বন্ধ হয়েছে। সে সব কুটিব চিত্রাব মধ্যবিত্ত স্বজন বন্ধুদেব। তাদেব শ্লীলতা শালীনতা, রুচিবোধে চিত্রা আঘাত দিয়েছে। ওব এই রুচি বিকৃতিকে কিছুতেই তাবা মেনে নিতে পাবেনি।

বাইবেব এই প্রতিকল দুনিযাব বিববণ শেষ কবে চিত্রা বলল 'কিন্তু বিনা যুদ্ধ ত শুধু বাইবেব সঙ্গেই নয যুদ্ধ ঘবেব সঙ্গেও আছে। সেই যুদ্ধই সবচেয়ে বড।'

আমি বাগ কবে বললাম,'বড না ছাই। আসলে তুই ওকে ভালবাসিসনি চিত্রা। ওই বকম একটা লোককে ভালবাসা যায না। সামযিক কৌতূহল হযত মেটান যায। তুই ভালবেসেছিস একটা আইডিযাকে। হযত তাও নয তুই ভালবেসেছিস নিজেব জেদকে। তুই ভিতবে ভিতবে আমাবই মত এক জেদী মেয়ে।'

চিত্রা শান্তভাবে হেসে বলল, 'তবু ভাল নিজেব সঙ্গে আমাব একটু মিল খুঁজে পেয়েছিস।'

আমি বললাম 'মিথ্যে কথা তোব সঙ্গে আমাব কোন মিল নেই। আমবা দুই বিপবীত মেরুব বাসিন্দা। আমি আমাব প্রেমিকদেব চাকব কবে বেখেছি, আব তুই তোব চাকবকে প্রেমিক বানিয়েছিস স্বামী বানিয়েছিস।'

চিত্রা তেমনি হেসেই জিজ্ঞাসা কবল, 'কোনটা ভাল বিনা, কোনটা ভাল ?'

আমি থমকে গেলাম। ওব আত্মপ্রত্যয বড বেশি। আমি চট কবে জবাব দিতে পাবলাম না। ও প্রত্যযবাদী আমি সংশযী। আমি কিছুকেই ধ্রুব বলে জানিনে, ধ্রুব বলে মানিনে। আমি নিত্য ভাঙি, নিত্য গডি আব সেই ভাঙাগডাব ভিতব দিয়ে এগিয়ে যাই। তোমাদেব চোখে সেটা হযত থেমে পডা পিছিয়ে পডা। তবু আমাব ভাঙাগডাব বিবাম নেই আমি সব জিনিস যাচাই কবে কবে নেব। কোন আপ্তবাক্য মেনে নেব না।

চিত্রা বলতে লাগল, 'বিনা, কামার্ত পুরুষকে দাস কবে বাখা যত সহজ, সেই দাসকে উঁচুতে তুলে আনা তত সহজ নয। আমি ওকে বেজিস্ট্রি কবেই বিয়ে কবেছি। কিন্তু সত্যিসত্যিই ওকে প্রেমিকেব পর্যাযে স্বামীব পর্যাযে তুলে আনা কি দুচাব বছবেব কাজ ?'

আমি বললাম, 'কে তোকে বলে তুলে আনতে ? তুলতে তুলতে তুই যে একেবাবে পটল তুলবি হতভাগী। রূপযৌবন খুইয়ে তুই যে বুডী হয়ে যাবি।'

চিত্রা হেসে বলল, 'বুডী কি তুইই হবিনে ? ওকথা যাক। আমাদেব সমাজে সমপর্যাযেব সমশিক্ষিত দুজন স্ত্রী-পুরুষ কি একবকম। বিশ্বাসে সংস্কাবে মূল্যবোধে লাভ-লোকসান-সুবিধা-সুযোগেব ভাগ-বাঁটোযাবায তাদেব মধ্যে কত যে তফাত, কত যে হানাহানি, তা ত তুইও দেখেছিস। অভয আব আমাব মধ্যে ব্যবধান ত থাকবেই।'

আমি বললাম, 'থাকবেই। তাহলে বল তোদেব মিলটা গোঁজামিল। তোদেব মিলটা শুধু দেহগত।'

চিত্রা লজ্জিত হয়ে একটু কাল চুপ করে রইল, তারপর ফের মুখ তুলে বলল, 'না শুধু তাও নয়। তুই তোর বন্ধুদের মধ্যে কতকাল থেকে মনের মিল খুঁজে বেড়িয়েছিস। অল্পস্বল্প মিলে তোর তৃপ্তি নেই। যে মিল একান্ত মৌলিক, তাই তোর চাই। কিন্তু আমার কী ধারণা জানিস বিনা? সে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। সে গড়ে নিতে হয়। তুই যে মানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছিস তাকে কোথাও পাবিনে, যদি তাকে নিজে না সৃষ্টি করে নিতে পারিস।'

আমি হেসে উঠলাম, 'সৃষ্টি করা? মানে যা নেই, সেই আকাশকুসুমে বিশ্বাস করা? তা পারব না চিত্রা। আমি বরং ঘাস ফুল তুলে খোঁপায় গুজব, কোন ফুল না পেলে মাঝে মাঝে চোখে সর্ষেফুল দেখব, তবু সজ্ঞানে মাতাল হওয়ার আগে আকাশকুসুমের তত্ত্ব আওড়াব না। তোর সঙ্গে আমার বনল না। যাক ও সব কথা? কাকাবাবুর খবর কী তাই বল। কেমন আছেন তিনি? আছেন ত?'

চিত্রা বলল, 'আছেন। তিনি ছোটনাগপুরের এক মিশনারী কলেজে চাকরি নিয়ে চলে গেছেন বাইরে। চিত্রা অনেক চিঠিপত্র লিখেছিল। ক্ষমা চেয়ে দেখা করতে চেয়েছিল। তিনি সে অনুমতি দেননি। আট দশ বছরের এক অনাথ সাঁওতালী মেয়েকে কুড়িয়ে নিয়ে তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তুলেছেন। আশা সে হয়তো ভবিষ্যতে চিত্রার মত অবাধ্য হবে না। সে পিতৃস্নেহের দাম দেবে। মনে মনে হাসলাম একজনের মানসকন্যা আর একজনের মানস স্বামী। মানসপুত্রটি বোধ হয় আমার জন্যে বাকি রইল।'

বাপের কথা তোলায় চিত্রার চোখ দুটি ভিজে উঠল। কথার ভিতর থেকে ঈর্ষার সূচও ফুটে বার হল। সেই একফোঁটা নাম না জানা সাঁওতালী মেয়েটার উপর হিংসা। চিত্রা বলল, সে বাবার সবখানি জুড়ে বসেছে। আমি এত করে লিখলাম আপনি আমার কাছে এসে থাকুন, না হয় আমি আপনার কাছে যাই। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। অথচ শুনি অসুখবিসুখে কেবলই ভোগেন। ওই মেয়েটা তাঁর কতটুকু সেবা যত্ন করতে পারবে বলত বিনা?'

আমি এ কথার কোন জবাব না দিয়ে যেন অভয়ের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। 'তার ভিতর থেকে কতখানি কী সৃষ্টি করতে পেরেছিস তাই শুনি। গেল কোথায়? নমুনাটা একবার দেখতে পারলে হত। ভাল কথা। সামনাসামনি নাম ধরে ডাকলে কি তার অপমান হবে? মিঃ মণ্ডল বলব না অভয়বাবু? নাকি জামাইবাবু বলে ডাকলে তুই খুশি হবি সত্যি করে বল।'

চিত্রা বলল 'তোর কেবল ঠাট্টা। কেবল খোঁচা দিয়ে কথা বলার স্বভাব। তুই তাকে নাম ধরেই ডাকিস। হুকুম করিস পান সরবত এনে দিতে, আগে যেমন করতিস। তোর কাছে ও আজও চাকর ছাড়া কিছু নয়।

আমি বললাম 'তুইই বা এমন কোন মাথার মণি করে তুলেছিস? আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানিস। তোর ওই কানাকড়িটা কেড়ে ছুড়ে নদমায় ফেলে দিই। নইলে আসল মণির দিকে তোর চোখ পড়বে না।

চিত্রা হেসে বলল 'তা তুই পারিস বিনা। সে শক্তি আছে। কিন্তু আসল মণি হল চোখের মণি। তার চেয়ে বড় মণি কী আছে আমি জানিনে।'

অভয়কে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা চিত্রা গোড়াতে করেছিল। বেশিদূর এগোয়নি। তারপর নানা কাজকর্মে ঢোকাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু অভয়ের মনে এক ধরনের ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স ঢুকে গেছে। বউয়ের চেয়ে ছোট কাজ অল্প মাইনের কাজ সে সহজে করতে চায় না। লোকে তাতে ঠাট্টা করবে। তার চেয়ে বউয়ের রোজগারে পায়ের উপর পা তুলে খাওয়া তার কাছে ঢের সম্মানের। কিন্তু চিত্রার তা মোটেই ইচ্ছা নয়। তার সম্মানবোধ স্বতন্ত্র। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে প্রায়ই ঝগড়াঝাটি হয়। আভাসে ইঙ্গিতে মনে হল, অভয় মারধরও এক আধটু করে। আবার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতেও দেরি করে না। পুরুষের স্বভাব সব জায়গায় একই রকম। চাকর মনিবে ভেদ নেই।

তবু চিত্রা আশা ছাড়েনি। অভয়কে নিয়ে সে একসপেরিমেণ্ট করেই চলেছে। কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষাই যদি চালাবে তাহলে একটা বাঁদরকে ধরে আনলে ত আরো সুবিধে হত। ছেলেমানুষ করা আর স্বামী মানুষ করা ত এক নয়। মেয়েকে বড় করা, আর স্ত্রীকে বাড়িয়ে তোলার কাজও আলাদা। স্বামী স্ত্রী দুজনে দুজনকে গড়বে। কিন্তু অত গোড়া থেকে নয়। তারা যখন শুরু করবে, তখন শুধু

বঙের কাজ বাকি। মূর্তির একমেটের কাজ তার অনেক আগেই শেষ হয়েছে।

তর্ক করলাম চিত্রার সঙ্গে। ওকে সহজে ছেড়ে দিলাম না। কেউ কেউ ভাঙে তবু মচকায় না। আমি আরো শক্ত ধাতুতে গড়া। আমি ভাঙিনে, মচকাইওনে।

ওর কাছ থেকে বিদায় নিতে যাচ্ছি, অভয় এসে হাজির হল। ওর হাতে থলি। বিকেলের বাজার সেরে এসেছে। আমাকে দেখে একটু হকচকিয়ে গেল। বলল, 'আপনি।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তোমাদের ঘরকন্না দেখতে এলাম। তোমাকে তুমি বলছি বলে কিছু মনে কর না। তুমিও আমাকে তুমি বলতে পার। তুমি এখন আমার বন্ধুর স্বামী।'

আমার কথায় কতটুকু ঠাট্টা, কতটুকু আন্তরিকতা তা যাচাই করবার জন্যে অভয় একটু ভ্রূ কোঁচকাল। তারপর শুধু একটু হেসে থলি থেকে জিনিসগুলি বার করতে লাগল। লক্ষ্য করলাম, যা যা চিত্রা খেতে ভালবাসে, তার সবই থলিতে আছে। কইমাছ, শাঁক-আলু, মটরশুঁটি। সেই সঙ্গে এক শিশি মিকশ্চার। আর একটা ফুড।

অভয় বলল, মোটে ওষুধ খেতে চায় না। আপনি একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলে যান দিদিমণি। ওষুধপথ্য না খেলে শরীর ভাল হবে কী করে?

বিস্মিত হয়ে বললাম, 'কী হয়েছে ওর?'

অভয় বলল, 'শোনেননি বুঝি? এই ত তিন মাস আগে একটা নষ্ট হয়ে গেল। সেই থেকে শরীরের আর আছে কী। আপনার কাছে বুঝি সব গোপন রেখেছে। ওই ত রোগ। কারো কাছে কিছু খুলে বলবে না। আচ্ছা, আপনিই বলুন ত, খুলে না বললে মানুষ কি মানুষের মনের মধ্যে সব সময় ঢুকতে পারে।'

মনে মনে ভাবলাম এরা বোধ হয় তাহলে কোন কোন সময় পেরেছে। চিত্রা লজ্জিত হয়ে ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'যাক যাক, তোমাকে আর বকবক করতে হবে না।'

ওরা আমাকে না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়ল না। মোড় পর্যন্ত দুজনে এসে এগিয়ে দিল। রাস্তা থেকে একজন অনিচ্ছুক ট্যাক্সিওয়ালাকে প্রায় ধমকেই ডেকে আনল অভয়।

আমি ট্যাক্সিতে উঠে বসলাম। ভাবতে ভাবতে চললাম ওদের কথা। সেই সঙ্গে নিজের কথাও এল। ছেলেবেলা থেকেই আমার কেমন একটা ঝোঁক ছিল, আমি নতুন কিছু করব। দিনকে রাত আর রাতকে দিন বানাব। হ্যাঁকে না, আর নাকে হ্যাঁ করে তুলব। কোন মেয়ের ছবি দেখলে কলমের ডগা দিয়ে আমি তার ঠোঁটে গোঁফ এঁকে দিতাম। পুরুষের কপালে সিঁদুরের ফোঁটা আর চোখে কাজলের রেখা এঁকে তার মুখে নারীর কমনীয়তা আনতে চেষ্ট করতাম। আমাদের বাড়িতে বাবার তুলনায় মার ব্যক্তিত্বহীনতা দুঃখ লাঞ্ছনা দেখে দেখে আমার ধারণা হয়ে গিয়েছিল, পৃথিবীতে মেয়েরা বড় বেশি মাত্রায় মেয়ে। তাদের আরো শক্ত হওয়া দরকার তাদের মধ্যে আরো শক্তি আনা দরকার। পৃথিবীটাকে যে অবস্থায় পেয়েছি, তাতে আমার সন্তোষ ছিল না। আমি কেবলই ভাবতাম, কী করে এর চেহারা পালটে দেওয়া যায়। কী করে সম্পূর্ণ মৌলিক হওয়া যায়। আমাকে তা হতেই হবে। তার জন্য যদি বিশ্বামিত্রের মত আজব দুনিয়া গড়তে হয়, তাও স্বীকার। চলতি ব্যবস্থাকে পদে পদে অস্বীকার করতে করতে আমি আস্তে আস্তে যে পথ নিলাম দু দিন বাদে চেয়ে দেখি সে-পথও পুরনো। সে পথেও হাজার হাজার মানুষের পায়ের দাগ। সেখানেও পিছলে পড়ে হুমড়ি খাওয়ার ইতিহাস। ভের না আমি অনুশোচনা থেকে এ-কথা বলছি। অনুতাপের অশ্রুও আমার চোখে আসেনি। কিন্তু ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে সব পথই যদি পুরনো, তাহলে নতুন কী। অথচ পৃথিবীটা সত্যি সত্যিই সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মার্কেটের জিনিস, এখানে নতুন কিছু বলবার নেই, করবার নেই, এ-কথা মানতেও মন বিদ্রোহ করে। কারণ আমার পাঁচ ইন্দ্রিয়ের এখনো কিছুই অসাড় হয়নি। আমি এখনো পৃথিবীর নতুন স্বাদ পাচ্ছি, নতুন দৃশ্য দেখছি, নতুন স্পর্শ পাচ্ছি সর্বাঙ্গে। রোজ সে নতুন করে জন্মাচ্ছে, পুরনো বাপ মায়ের ভিতর থেকে নতুন শিশু বেরিয়ে আসছে। না, দুনিয়াটা যে পুরনো আর বাসী এ-কথা মানব না কল্যাণ। বাসী দুনিয়ায় আমি বাস করব না।"

আমি হেসে বললাম, "তোমাদের বাস করতে বলে কে?"

বিনা বলতে লাগল, "চিত্রার কথা ভাবতে ভাবতে এলাম। ওকে পুরনো বলে একেবারে বাতিল

কবে দিতে পাবিনে। কাবণ ও ঠিক আমাব মা মাসীদেব মত নয। আবাব ওকে স্বীকাব কবতেও আমাব মন বাধা পায। কাবণ ওই ত্যাগ, ওই দুঃখববণ, যৌবনবসেব ওই অপচয আমাব জন্যে নয। ও দযা কবতে চায করুক, অনুকম্পা দেখাতে চায দেখাক। কিন্তু স্বামী কি প্রেমিকেব মধ্যে আমি চাই সখাকে, বন্ধুকে। যদি একজনেব মধ্যে তাকে না পাই দশজনেব ভিতব থেকে তাকে খুঁজে নেব। যদি অখণ্ডভাবে তাকে না পাই, তিল তিল কবে গড়ে তুলব সেই তিলোত্তমাকে। যদি সে স্থাযী না হয, আমিও হব ক্ষণিকা।"

একটুক্ষণ চুপ কবে বইল বিনা। তাবপব বলল, "বছব দেড়েক বাদে আজ আবাব দেখা হল চিত্রাব সঙ্গে। এতকাল পবে ও নিজেই সাহস কবে এসেছিল আমাব এখানে। তুমি যে-চেযাবটায বসেছ, ওই চেযাবে বসে সুখ দুঃখেব অনেক কথা সে বলল। শবীবটা আগেব চেযে সেবেছে। চিত্রা সেই মার্চেন্ট অফিসেব চাকবিও ছেড়ে দিযেছে। মার্কেটেব কাছে ছোট একটা ঘব নিযে তাতে খুলেছে এক দোকান। একদিকে দর্জিখানা আব একদিকে লণ্ড্রি। দুজনে একসঙ্গে সেখানে বসেছে। সেলাই ফোঁড়াই আডং ধোলাইযেব ব্যবসা চালাবাব মত বিদ্যা চিত্রা নাকি এব মধ্যে কিছু কিছু শিখে নিযেছে। এতে আপাতত অভযেবও খুব উৎসাহ দেখা যাচ্ছে। চিত্রা অনেক ভেবে দেখেছে অনেক পবীক্ষা নিবীক্ষা কবে দেখেছে, অভযেব সহকর্মী হওযা ছাড়া ওকে কাজে লাগাবাব আব কোন পথ নেই।

যেন সহকর্মী হলেই সহমর্মী হয। যেন স্ত্রী পুরুষ দুনিযায একসঙ্গে এই প্রথম কাজ কবছে। মানে সভ্য শিক্ষিত জগতেব সঙ্গে চিত্রাব যেটুকু সম্পর্ক ছিল তাও গেল।

চিত্রা বসেছে বলে দোকানে কিন্তু বেশ ভিড় হচ্ছে। লোকে আড়ালে আবডালে ঠাট্টা তামাশা কবছে কিন্তু ভিড় কবতেও ছাড়ছে না। অভয দোকানেব নাম দিযেছে নবরূপা। কাব মুখ থেকে কথাটা শুনেছে কে জানে। চিত্রা আপত্তি কবেনি। কোন কিছুতে আপত্তি কবতে কি ও জানে যে কববে ?

কাল নাকি ওদেব সেই নবরূপাব ঘটা কবে উদ্বোধন মানে জানাশোনা কযেকজনকে বলবে। জাঁকজমক কোনকালেই চিত্রা পছন্দ কবত না, আজও কবে না তেমন শক্তিই বা কই।

গোপনে আমাকে আবো একটা কথা বলে গেল চিত্রা কাল ওদেব বিবাহবার্ষিকী। এতকাল কিছু কবেনি। পাঁচ বছব পবে এই প্রথম নাকি সেই দিনটিব কথা চিত্রাব আজ মনে পড়েছে।

সেই থেকে ভাবছি ওদেব কথা। নতুন আব পুবনোব কথা। ওবা যা কবছে তা নতুন নিশ্চযই নয। হযত এব মধ্যেও একদিন জোড়াতালি ধবা পড়বে। নবরূপাব নবত্বও যাবে, রূপও থাকবে না। আমি দুনিযাটাকে অত সবল সহজ বলে ভাবিনে। এক কথায সমাধান টেনে দিতে পাবিনে। আমাব কাছে চিত্রাব দাম এই জন্যে কম যে ওব মধ্যে জটিলতা নেই। ও সব সময কিছু পেতে চায, পেযেছি বলে ভাবতে চায। আব আমাব সন্ধানেব মধ্যেই পাওযা সাধনাব মধ্যেই সিদ্ধি। তবু ওব মধ্যে আজ এক নতুন উৎসাহ দেখলাম কল্যাণ। চোখেমুখে যেন এক নতুন বঙ ফুটে বেবিযেছে। স্বাস্থ্যটা ভাল হযেছে বলেই হযত।

বঙ। এই বঙেই কি পৃথিবীব রূপ বদলায ? সে বাববাব পুবনো থেকে নতুন হযে ওঠে ? আব শিল্পীব তুলিতে যা বঙ, নীতিবিদেব মুখে তাব নামই কি মূল্য ?"

বিনা খানিকক্ষণ চুপ কবে বইল। তাবপব একটু হেসে বলল, "এখন ভেবে দেখ, চিত্রাব সঙ্গে আলাপ কববে কি না।"

ঔদাসীন্যেব ভঙ্গি কবে বললাম, "এমন কিছু তাড়া নেই। পবে কোন একদিন যদি আলাপ কবি তোমাব জন্যেই কবব।"

বিনা ভ্রূ কুঁচকে বললে, 'তাব মানে ?" বললাম, "মানে আজ যেমন তোমাব চোখে তাকে দেখলাম, তেমনি আব একদিন তাব চোখে তোমাকে দেখব, তাব মুখে শুনব তোমাব কথা।"

বিনা হেসে উঠে বলল, "তাহলে কিন্তু তোমাকে হতাশ হতে হবে। সে বেশি কথা বলতে জানে না।"

সোহাগিনী

চণ্ডীপুরেব মাঠে বাযদেব জমিব ধান কাটতে নেমেছিল মতি মিঞা, মবদুল শেখ আর বিহাবী মণ্ডল। মাঠ তো নয় সমুদ্র। এবাব কার্তিকেব শুরুতেই লক্ষ্মীদীঘা ধান পেকেছে। কিন্তু মাঠে জল এখনো তেমনি ঠায দাঁড়িযে। কোমব জলে নেমে তিনজনে ধান কাটছিল। বিঘা তিনেকেব ছোট জমি। কতই বা ধান হবে। তাই বেশি কৃষাণ ওবা নেযনি। অযথা ভাগীদাব বাড়িযে লাভ কি। একেই তো কর্তাদেব অর্ধেক ববাদ্দ বাঁধা আছে। সামনেই লম্বাটে ডিঙি নৌকো। ধান কেটে কেটে তাতেই বাখছিল তিনজনে। আশেপাশে এমন ডিঙি নৌকো অনেক আছে। আবও কযেকখানা জমিব ধানও পেকেছে। কাজী আব শিকদাবদেব জমিতেও ধান কাটা শুরু হযেছে। কাজ কবতে কবতে নিজেদেব মধ্যে গল্প-গুজব কবছিল চাষীবা। বেলা দুপুব গড়িযে গেছে। মাথাব ওপব সূর্য জ্বলছে পেটে ক্ষিদেব আগুন। তবু কাবো হাত কামাই নেই, মুখ কামাই নেই। দু বছব বাদে এবাব ধানেব খন্দ ভালো হযেছে। কেটে ঝেড়ে তুলতে না পাবলে বউ ছেলে খাবে কি। খাওযা-পবায বড কষ্ট। তিনজনেব মধ্যে মতি মিঞাব হাতই বেশি বড ছিল। গোছে গোছে ধান কেটে বাখছিল নৌকায। ধান তো নয, সোনা। কোথায লাগে এব কাছে বাবু ভুঁইযাদেব পবিবাবেব গলাব সোনা, কানেব সোনা। মতি মিঞাব বযস পঞ্চাশ ছাড়িযেছে। মুখেব কালো চাপ দাড়িব বঙ এখন কটা। কিছু কিছু পেকে সাদাও হযেছে। মাথাব কোঁকড়ানো বাবড়ি চুলও অর্ধেকেব বেশি পেকেছে। বেশ লম্বা চওড়া চেহাবা মতি মিঞাব। ছড়ানো পিঠ, চেপ্টা বুক। পিঠও খালি নয, বুকও খালি নয। পিঠভবা দাদ আব বুকভবা লোম। মতি মিঞা বলে, 'মেঞাবা, দাউদে আমাব কোন ঘেন্নাপিত্তি নাই, অসোযাস্তিও নাই। আমি মলম ফলম কিছু লাগাই না। দাউদ আমি পুষি। আমাব বিবিব জন্যে পুষি। ঘবে যদি পছন্দসই, মনেব মতন বিবি থাকে দাউদে ভয কি তোমাব। কিন্তু একটা কথা। তাব পবনে শাড়ি আব প্যাটে দানাপানি পডন চাই। নইলে সে তোমাবে আস্ত বাখবে না। তোমাব মুখেব দাড়ি আব বুকেব লোম সবটাই ছেঁড়বে।'

ভাবি বসিক মতি মিঞা। বযস যত বাড়ছে তত যেন বসেব ফোযাবা ছুটছে। তবু যদি চালে টিন আব গোলায ধান থাকত মতি মিঞাব। তাহলে ফোযাবা আব ফোযাবা থাকত না। সমুদ্দুব হত। আব তাতে গাঁ সুদ্ধ লোক সাঁতাব কাটত। কিন্তু ছেলেপুলে নিযে বড কষ্টে আছে মতি মিঞা। গোড়াব দিকে কতকগুলি মেযে হযেছে, শেষেব দিকে ছেলে। সব মিলিযে গুটি দশেক। বাপকে সাহায্য কববাব বযস তাদেব হযনি। তাকে একাই খেটে খেতে হয।

কিন্তু মাঠে তো ঘবেব বিবি নেই, নিজেব হাতেই এখানে দাদ চুলকিযে নিতে হচ্ছিল মতি মিঞাব। মাঝে মাঝে পাযেব থোড়া থেকে জোঁকও ছাড়াতে হচ্ছিল। তবু তাব কাঁচি যত জোবে চলছিল তেমন আব কাবও নয। মবদুল এদেব মধ্যে বযসে ছোট। তেইশ-চব্বিশ বছবেব বেশি হবে না তাব বযস। লম্বা ফর্সাপানা চেহাবা। থুতনিব ডগায কালো দাড়ি। জোযান বযসেব ছেলে। কিন্তু আজ যেন তাব হাত নড়ছিল না। বড আনমনা দেখাচ্ছিল তাকে। মতি মিঞা তা লক্ষ্য কবে বলল 'কি বে মবদুল, তোব হইছে কি আইজ? কাজে বুঝি মন লাগছে না? নাকি ক্ষিদা লাগছে। তামুক খা তামুক খা।'

তামাক আগুন হুঁকো কলকেব ব্যবস্থা নৌকোতেই আছে। বিহাবী মণ্ডল নৌকোব কাছে গিযে তামাক সাজতে শুরু কবল। তাব চেহাবা বেঁটে খাট, বযস চল্লিশেব কাছে। কলকেয আগুন তুলতে তুলতে সে হেসে বলল, 'মেযাভাই, তামাক খাওযাইযা আইজ আব ওযাবে চাঙ্গা কবতে পাববা না। আইজ ওযাব বিবিব ব্যথা ওঠছে। ঘবেব খুঁটি ধইবা কাতবাইতেছে সে। আইজ কি আব ধান কাটায ওযাব মন লাগে?'

মতি মিঞা উৎসুক চোখে মবদুলেব দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাচাই নাকি ?'
মবদুল লজ্জিত হয়ে বলল, 'হ।'
'এই পেবথম পোয়াতী ?'
'হ।'
মতি মিঞা এবাব একটু উদ্বেগেব স্ববে জিজ্ঞাসা কবল, 'দাইটাইব ব্যবস্থা কইবা আইছিস তো ?'
মবদুল বলল, 'তা কবছি। মা আছে, আমাব বড় বুইনও আইছে। তবু—'
বিহাবী হুঁকোয টান দিয়ে হেসে বলল, 'তবু আমাগো মবদুলেব ভাবনা যায না। ও নিজেই যেন পোয়াতী হইয়া বইছে। ব্যথাডা যেন ওযাবই।'
মতি মিঞা সহানুভূতিব সঙ্গে বলল, 'হাইসো না মণ্ডল, হাইসো না। পেবথম পেবথম ওই বকম হয। যে পোয়াতী সে নিজেব ব্যথা ছাড়া আব কিছু টেব পায না। যে সোযামী তাব দুইজনেব ব্যথা সইতে হয।'
বিহাবী হেসে উঠল, 'ও ভাই মতি মিঞা, তোমাবও কি সেই দশা হয নাকি ?'
মতি মিঞা স্বীকাব কবে বলল, 'হয। কিন্তু এখন আব ততটা না। এ ব্যাপাবে চূড়ান্ত কষ্ট আমি পাইছিলাম ওই মবদুলেব মত বযসে। নিজেব পবিবাবেব জন্যে না, পবেব পবিবাবেব জন্যে।'
বিহাবী মণ্ডল বলল 'তাই নাকি ? বড় মজাব কথা তো। বসেব কথায ক্ষিদেতেষ্টা দূব হয। কও শুনি।'
মতি মিঞা সঙ্গে সঙ্গেই আবম্ভ কবল না। নীববে নিজেব মনে ধান কাটতে লাগল। খানিকটা সময নিল কালেব সাগব পাড়ি দিয়ে বহু দূবে ফেলে-আসা তাব সেই প্রথম যৌবনেব উপকূলে পৌঁছতে। বিহাবী তাড়া দিয়ে বলল, 'কও কও, আবম্ভ কব।'
মতি মিঞা বুঝতে পাবল তাব দুজন সঙ্গীই ধানে কাস্তে চালাতে চালাতে কান আব মন তাকে সমর্পণ কবে বেখেছে। কিষাণবা গল্প বড় ভালোবাসে।
মতি মিঞা আবও এক গোছা ধান নৌকোয তুলে বেখে আস্তে আস্তে আবম্ভ কবল, 'সে বড় সবমেব কথা মণ্ডল ভাই। কইলাম তো তখন ওই মবদুলেব মত* বযস আমাব। মবদুলেব চাইতেও ছোট। গাযে গতবে বক্ত তখন টগবগ কবে। সেই বযসে আমি একজনকে ভালোবাসছিলাম। না আমাগো জাতেব ধর্মেব কেউ না তোমাগো জাতেব তোমাগো ধর্মেব তোমাগো গুষ্টীবই মাইযা। এখন আব নাম কবতে দোষ নাই। বদন চৌকিদাবেব ছোট মাইযা তুফানী। সেই তুফানী আমাব শিবায শিবায বক্তেব তুফান ছুটাইছিল।'
অথচ তুফানীবে প্রায ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছে মতি মিঞা। বযসেও মেয়েটা তাব চেয়ে দশ বাব বছবেব ছোট। আম জাম আব খেজুব কুড়াতে মতি মিঞাদেব বাগা • আসত। বদন চৌকিদাব আব মতি মিঞাব বাপ বজ্জাক সিকদাব প্রতিবেশী ছিল দুজনে। বজ্জাকেব গরু বদনেব বাড়িব কলাগাছে কি লাউ কুমড়োব মাচায এসে মুখ লাগাত, আবাব বদনেব গরু ছাগলও বজ্জাকদেব মুলো আব মবিচেব ক্ষেত মুড়ে খেত। কেউ কাউকে সহজে ছেড়ে দিত না। ঝগড়াঝাটি হত। গালাগাল দিয়ে দু পক্ষই দু পক্ষেব চৌদ্দপুরুষ উদ্ধাব কবত কিন্তু মিলমিশ হতেও বেশি দেবি লাগত না। দুজনেব গলায গলায ভাব ছিল। বজ্জাক আব বদনেব। তাবা প্রায একই ধবনেব চাষী গৃহস্থ। একসঙ্গে মাঠে খাটত বর্ষাব সময এক নৌকোয হাটে যেত। তাদেব চালচলন শোযাবসা সব একবকম ছিল। শুধু পুজো আর্চাব সময বদন পৈতেধাবী পুরুত ডাকত আব বজ্জাক তিন ওক্ত নামাজ পড়ত, বিয়েসাদিব সময মোল্লা মৌলবীকে ডেকে আনত। অন্য কোন ব্যাপাবে তাবা আলাদা ছিল না।
বলতে বলতে সঙ্গীদেব দিকে তাকিয়ে মতি মিঞা দীর্ঘশ্ব ফেলল, সেই দিন কাল আব নাই মণ্ডল ভাই। কালে কালে দেশেব কি হালই হইল। ভাগভেন্ন হইয়া তছনছ হইল দেশ। কাবো কোন লাভ হইল না।'
মতি মিঞাব বাপ আব বদনবা যে আলাদা জাত ধর্মেব তা বুঝতে তাব সময লেগেছিল। বুঝবাব পবেও মানতে চাযনি। ওই তুফানীব জন্যেই যে মন অত অবুঝ হয়ে উঠেছিল, তা তাব টেব পেতে

বাকি ছিল না। এদিকে তুফানীও আস্তে আস্তে ডাগব হযেছে। ছেলেছোকবাদেব দিকে তাকায আব ফিক ফিক কবে হাসে। কিছু ভেবে হাসবাব মত বুদ্ধি ওই ন-দশ বছবেব মেযেব তখনও হযনি। কিন্তু তাব হাসি দেখতে, মুখ দেখতে বড় ভালো লাগে মতি মিঞাব। যেমন টুকটুকে বঙ, তেমনি গডন, তেমনি মুখে শ্রীছাঁদ। টানাটানা নাক চোখ। পাতলা ঠোঁট, সাদা ফুলেব মত দাঁতেব সাবি। মতি মিঞা সেই মুখেব দিকে তাকিযে থাকত। দুজনেব বাডিব মাঝখানে যে বড বাগানটা ছিল, যে বাগান এখন বাযবা কিনে নিযেছে, সেই বাগানে আম জাম কুডোতে তুফানী এলে আগেব মত মতি মিঞা আব তাডা কবত না। ববং হাতেব ইশাবায কাছে ডাকত। কিন্তু তুফানী বড সেযানা মেযে। সে আবও সবে গিযে ভেংচি কাটত। হেসে পালিযে আসত বাডিতে। ঘবে তাব মা ছিল না, ছিল দূব সম্পকেব এক বিধবা পিসী। লোকে বলাবলি কবত রাত্রে সে-ই মা সাজে তুফানীব। কিন্তু তাব নিজেব চবিত্র যাই হোক, বড জাঁদবেল মেযেমানুষ ছিল তুফানীব সেই পিসী। যেমন কাঠখোট্টা চেহাবা তেমনি স্বভাব। সে বড একখানা দা আব মুডো ঝাঁটা উঁচিযেই বাখত। তাব ভযে ও বাডিব ত্রিসীমানায কেউ ঘেঁষতে পাবত না। কিন্তু মতি মিঞাদেব সঙ্গে ছিল আলাদা সম্পর্ক। তাবা বদনেব দবকাবেব সময সাহায্য কবত, ধান ধাব দিত, শস্য বোনা কি কাটাব সময বেগাব দিত, ধান মলনেব সময জোড়া বদল দিযে সাহায্য কবত। চৌকিদাবেব বাডিতে মতি আব তাব বাবাব আলাদা খাতিব ছিল। তা দেখে মতিব স্বজাতেব পডশীবা ঠাট্টা কবত, 'চকিদাব তোবে জামাই কববে মতি।'

মতি চটে উঠে বলত, 'কববেই তো। তোবা শালাবা জ্বইলা পুইডা মব।'

কিন্তু জ্বলে পুডে মবতে হল মতিকেই। দুদিন বাদে তুফানীব বাপ আব পিসী পাশেব গ্রাম পীবপুবেব বনমালী ভক্তেব সঙ্গে মেযেব বিযে দিযে দিল। ভক্তদেব অবস্থা ভালো। চাযেব জাম ছাডা মিস্ত্রীব কাজকম কবে ' ঘব তোলায ওদেব বেশ নামডাক। এই সব দেখেশুনেই বদন মেযেকে ও ঘবে দিল। টাকা পেল, পাঁচ কুডি। কিন্তু নাম যেমন আছে বদনেব জামাইব দুর্নামও তেমনি। বযস বেশি, নেশাভাঙ কবে। গোপনে কোথায বাঁডও বেখেছে। এ সব কথা শুনে মতি মিঞা মনে মনে বড খুশি হল। বেশ হযেছে, আচ্ছা জব্দ হযেছে ওবা। শুধু দুঃখ হত তুফানীব মুখেব দিকে চেযে। সে মুখ কেমন যেন ভাব-ভাব। সে মুখে সেই আগেব মত ফিক ফিক হাসি আব নেই। বিযেব পব তুফানীব পিসী তাকে নিজেব কাছে নিযে এল। বলল 'মাইযা বড হউক, ফলটল দেখুক তখন পাঠাব। এখন দেব না ' তোমাগো ছাওযাল তো এক অসুব ' এখন দিলে কাচাই গিলা খাবে।'

এই নিযে জামাইব সঙ্গে বদন চৌকিদাবেব বেশ মনকষাকষি হল। কিন্তু মেযেকে ওবা ছাডল না।

একদিন পিসী যখন গাঙেব ঘাটে নাইতে গেছে তেমনি এক ফাঁক খুঁজে মতি মিঞা এসে দেখা কবল তুফানীব সঙ্গে।

'কি তুফানী কেমন আছিস?'

'ভালো।'

'সোযামী নাকি তোবে মাইব ধইব কবে?'

'না না। কেডা কইল?'

মতি মিঞা বলল, 'কবে আবাব কেডা। কয আমাব মন। তোব মুখ দেইখা কয।'

তুফানী অস্বীকাব কবে বলে, 'তোমাব চউখ দেখতে জানে না মেঞা।'

ছেলেবেলা থেকেই তুফানীব চোখেমুখে কথা।

মতি মিঞা বলল, 'তয বুঝি সোযামী খুব আদব যত্ন কবে?'

তুফানী বলল, 'তা তো কবেই। কাব সোযামীই বা তা না কবে?'

মতি মিঞা বলল, 'স্নে আদবেব এমনই ঠেলা যে, পবাণ সামলানো দায।'

তুফানী লজ্জিত হযে মুখ নামাল। একটু বাদে বলল, 'তুমি এখান থিকা চইলা যাও মতি মিঞা। ও সকল কথা তুমি কইও না। আমাব শোনা পাপ।'

মতি মিঞাব মনে মনে বড বাগ হল। সে তো তুফানীব কাছে আর কিছু চায না, শুধু শুনতে চায

বিয়েব পব সে সুখী হয়নি। তাব এই সুখী-না হওয়াতেই সুখ মতি মিঞাব। কিন্তু এটুকু সুখও তুফানী তাকে দিতে নাবাজ। সে কেবল বলল, 'তুমি যাও তুমি চইলা যাও।'

যেতে তো চায মতি মিঞা। কিন্তু যেতে পাবে কই। তুফানীব মুখ তাকে টানে। দিনেব মধ্যে দু একবাব ওই মুখখানা দেখতে না পাবলে কাজকমে সুখ নেই, খেয়ে বসে স্বস্তি নেই। মতি মিঞার মনে হয বিয়েব পব তুফানীব মুখ যেন আবও বেশি সুন্দব হয়েছে। কি কবে হল ? সে কি ওব সিঁথিব সিঁদুবে ? গা ভবা রূপাব গহনায ? গলায সোনাব হাবেব চিকচিকানিতে ? নাকি মনেব দুঃখ আব অশান্তিব আগুন ওব দেহকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাঁটি সোনা কবেছে। কিন্তু তুফানী ওকে ভিতব থেকে যতই টানুক, বাইবে থেকে দু হাত দিয়ে কেবলি ঠেলে, বলে আইস না, আইস না। ভালোবাইস না, বাইস না। জাইত মান নিয়া আমাবে শান্তিতে থাকতে দাও।'

তুফানীব আবও বযস বাড়ে, ও পুবো মেয়েমানুষ হয়ে ওঠে। রূপেব গবিমায যেন ফেটে পড়ে। আব তা দেখে হিংসায ঈর্ষায বুক ফাটে মতি মিঞাব।

বাপ বলে মতি তুই সাদি কব।

মতি বলে, বাজান এখন না

মা বলে, 'ক্যান ?'

মতি বলে আমাব মন লয না।'

মা বলে 'ভবানাইশা, পোড়াকপাইলা, তোব মন যে কোথায পইড়া আছে তা কি আব আমাব বোঝন বাকি ? আউ বাবা ছিঃ। পবেব বউব পাছে পাছে অমুন ঘুব ঘুব কবিস না মানুষ তাতে নষ্ট হয গোল্লায যায়। তুই একবাব মুখেব কথা খসা বাজান আমি একটা ক্যান তিনডা মাইযা তোবে আইনা দেই।

মতি বলল ও কথা কইও না মা। আব যা কবা তাই শোনব কিন্তু বিযাসাদিতে আমাব মন নাই।

মতিব মা নিঃশ্বাস ফেলে বলে তোবে যে বোগে ধবেছে কাবো সাধ্য নাই সাবায। এখন আল্লাব দোযা ভবসা।

বনমালী মাঝে মাঝে অনেক দূবে দূবে মিস্ত্রিব কাজ কবতে যায। বড় বড় ঘব তোলে। স্ক্রু বল্টু দিয়ে শক্ত কবে কাবোগেটেব টিন লাগায ঢাল পেটে দুই তিনজন মিস্ত্রী তাব হুকুমে কাজ কবে। ফিবে যখন আসে বউব জন্যে তেল সিঁদুব আলতা আব লাল নীল হলদে বঙেব বাহাবেব শাড়ি আনে। কিন্তু এত কবেও বউব মন পায না বনমালী গাঁজা খায নেশায ওব চোখ দুটো জবাফুলেব মত লাল হয়ে থাকে গলাব স্বব খসখস কবে তুফানীব এ সব পছন্দ হয না। সে বলে তুমি ওই নেশাভাঙ ছাইড়া দাও।'

বনমালী মুখ ভেংচিয়ে ধমক দেয, দূব শালী। গ্রামগঞ্জে কোন শালা গাঁজা না খায শুনি। নেশা না কবলে এত খাটা যায ? এত পযসা কামান যায ? আসলে মন বইছে তোব সেই মোছলাব কাছে। আমাবে তোব পছন্দ হবে ক্যান ? আমি যা কবি তাই খাবাপ। আমি দুনিযা ভইবা ঘব তুইলা বেড়াই আব ওই মোছলা তলে তলে আমাব ঘব ভাঙে। বড় হাতুড়ি দিযা ওব মাথা ভাঙব তবে ছাড়ব। বাটাইল দিযা নাক চউখ তুইলা ফেইলা মুখখানাবে লেপা পোছা কইবা দেব।'

তুফানী স্বামীকে থামায, চুপ কব, চুপ কব। তুমি কি পাগল হইলা।'

স্বামী স্ত্রীব এই ঝগড়া অবশ্য মতি মিঞা কোনদিন আড়ি পেতে শোনেনি কিন্তু পীবপুবেব বনমালীদেব বাড়িব ধাব দিয়ে তো আবও পাঁচ ঘব পাড়াপড়শী আছে তাবাই এ গাঁয়ে এসে গল্প কবে। আব সেই গল্প সাতখানা হয়ে মতি মিঞাব কানে যায নিজেব নিন্দা মন্দ শুনে বাগে অবশ্য টগবগ কবে মতি। কিন্তু যে বনিবনাও হচ্ছে না এই গোপন খববটা ওই সব গাল গল্পেব ভিতব থেকে বেবিয়ে আসে। আব মতি তা শুনে খুশি হয আব ভবিষ্যতেব ভবসায থাকে। স্বামীব অত্যাচাবে অতিষ্ঠ হয়ে তুফানী একদিন তাব কাছে ধবা দেবে, তাব ঘবে এসে উঠবে, তাব বিবি হয়ে থাকবে। ভবিষ্যতেব সেই সুখস্বপ্ন দেখে মতি মিঞা। বাত্রেও দেখে, দিনেও দেখে। ঘুম আব

জাগরণ তার ওই এক স্বপ্নে একাকার হয়ে যায়।

তাই বলে মতি মিঞা যে নিজাম পাগলা হয়ে বাউল-বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়ায় তা নয়। গেরস্থ ঘরের ছেলে সে। সব কাজই তাকে করতে হয়। মাঠের কাজে খাটে। লাঙল চালায়, ধান পাট বোনে, কাটে ধোয়, শস্য ঘরে তোলে। যখন ক্ষেতের কাজ থাকে না বাপ-বেটায় দুজনে মিলে ঘরামির কাজ করে, মাটি কাটে, কাঠ চেলা করে, বড় বড় গাব গাছ ধারালো কুড়ুলের ঘায়ে চিল চিল হয়ে যায়। বাপের চেয়ে অনেক বেশি জোয়ান হয়েছে মতি মিঞা। গায়ে গতরে অনেক ছাড়িয়ে গেছে। ছেলের দিকে তাকিয়ে মতির বাজান সুখের হাসি হাসে। গামছা দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলে, 'হারামজাদা, তুই তোর বাবার বাবা হইছিস। এবার আমার মারে আইনা দে। আমি নাতিপুতির মুখ দেখি।'

মতি বলে, 'সবুর বাজান। আর দুইটা দিন সবুর কর। আর দুইটা পয়সার মুখ দেইখা লও আগে।' বলে আর মনে মনে আর একখানা মুখ ধ্যান করে। কবে সেই চাঁদের মত মুখ নিজের বুকের মধ্যে গুঁজে ধরতে পারবে। বেহেস্তের সুখ পাবে ছেঁড়া কাঁথার তলায়। তাকে ছাড়া চৈত মাসের মাঠের মত মতির এত বড় লম্বা চওড়া বুকখানা যে খাঁ-খাঁ করে। মাঠ ফেটে চৌচির হয় তা সবাই দেখে, কিন্তু বুক ফেটে যে চৌচির হয় তা চোখে পড়ে কজনের। দুই-একজন দোস্ত শুধু মনের ব্যথা বোঝে মতি মিঞার। সেখেদের রহিমুদ্দিন, খাঁদের কাজল সর্দার তাকে প্রায়ই বলে, 'মতিভাই, তুমি একবার হুকুম দাও, ওই গাঁইজাল মাইজমরা মিস্ত্রীর পরিবারকে আউড়া কোলে কইরা নিয়া আসি। আইনা তোমার কোলে ফেলাইয়া দিই।'

লোভে মতির চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করে। কিন্তু পরক্ষণেই মরা মাছের চোখের মত তা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তুফানী যে সত্যিই তা চায় একথা তো সে কোনদিন বলেনি। বরং মতি এসব ইঙ্গিত দেওয়ায় সে উল্টো কথাই বলেছে। 'খবরদার মেঞা, ওদের কথা কইযো না। ও কথা শোনাও পাপ।' কিন্তু মতিকে দেখলে তুফানী যে জোয়ারের গাঙের মত আহ্লাদে উছলে ওঠে, তুফানী যে তার সঙ্গে কথা বলতে ভালোবাসে, সেজেগুজে তার সামনে দাঁড়াতে ভালোবাসে, নানা ছলে মাথার আঁচল ফেলে দিয়ে শজারুর কাঁটা দিয়ে বাঁধা খোঁপাটি তাকে দেখাতে ভালোবাসে, স্বামীর বাড়িতে যাবার সময় কাঁচ পোকার টিপ যেদিন পরে সেদিন লক্ষ্মীর আসনের জন্যে ফুল দুর্বা তোলার ছল করে পথের ধারটিতে এসে দাঁড়ায়, এসব কি কোন পুরুষের চোখেঁ না পড়ে পারে?

মতি মিঞার দোস্তরা বলে, 'মেঞাভাই, মাইয়ামানুষ নিজের মনের কথা নিজেই টের পায় না। তারা কেবল ঢাকে, কেবল ঢাকে। ঘোমটা দিয়া মুখ ঢাকে, ধরম শরম দিয়া মন ঢাকে। যে পুরুষ জোর কইরা সব পর্দা টাইনা সরাইতে পারে, বেপর্দা করতে পারে যে, মাইয়া মানুষ তার। ওরা চায় জুয়ান মরদরে। ওরা ডাকাইতের দিকে কাইত হইয়া শোয় মেঞাভাই, পায়ের তলার মেনি বিড়ালেরে বাও পাও দিয়া লাথি মারে। তুমি তোমার পথ বাইছা লও। হয় ডাকাইত হও, না হয় পোষা কুকুর-বিড়াল হইয়া আইটা কাটা খাইয়া থাক।'

এ তো কেবল দোস্তদের কথা নয়, মতি মিঞারই একটা মন দুই ভাগ হয়ে ঠোকাঠুকি করে। মন স্থির করতে পারে না মতি মিঞা।

মাঝে মাঝে বনমালী শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে আসে। তুফানী যখন থাকে তখনই আসে। মাঠে-ঘাটে, জেলা বোর্ডের রাস্তার ধারে মতি মিঞার সঙ্গে যখনই তার চোখাচোখি হয়, মনে হয় সে যেন কট কট করে তাকায়। চোখ দুটো লাল টক টক করে। হতে পারে গাঁজার জন্যেই অমন হয়। চোখে রাগ থাকলেও বনমালী কিন্তু মুখে হাসে, বলে, 'কি মেঞাসাহেব, দিনকাল কাটতেছে কেমন।'

মতি মিঞা বলে, 'ভালো।'

কিন্তু বনমালীর চাপা হাসি আর গাঁজা খাওয়া গলার তামাশা মস্করা শুনে রাগে তার গা জ্বলে যায়।

বনমালী বলে, 'ভালো হলেই ভালো। এবার আম কাঁঠালের ফলনটা বেশ ভালোই হইছে না? পাকা কাঁঠালের গন্ধে গ্রাম-গঞ্জ ভইরা গেছে। আমার বাড়িতেও কাঁঠাল গাছ আছে মেঞা। একটা গাছে যা কাঁঠাল তা তোমারে কব কি। দেখতে যেমন বড়, ভিতরের কোয়াগুলিও তেমনি

বসখাজা। দেখলে তোমাব জেহ্বা দিযা টস টস কইবা জল পড়বে মেঞা। আমাগো ওদিকে একটা কটা আছে। তাবও জল পড়ে। শালাব কটা রোজ আমার ঘরের চালে আইসা একবার কইবা হানা দেয। কিন্তু কাঠালেব ধাবে কাছে যাইতে পারে না। শক্ত জাল দিযা খুব কইবা ঘিবা বাখছি। শালাব কটা আসে আব ফিবা-ফিবা যায। আইচ্ছা জব্দ। কি বল মেঞাসাব ?'

বনমালী বলে আব মুখ টিপে টিপে হাসে। ওব কথাব মানে যে কী তা বুঝতে বাকি থাকে না মতি মিঞাব। গাযেব বাগে হাত দুটো নিসপিস কবে। ইচ্ছা কবে তড়াক কবে গিযে টিপে ধবে ওব গলা। যা লিকলিকে চেহাবা একখানা। একবাব ধবলেই ভবলীলা সাঙ্গ। কিন্তু কেন যেন হাত ওঠে না মতি মিঞাব, মনে মনে এত গজবানি, কিন্তু মুখ দিযে কথা ফোটে না। বনমালীব বিদ্রূপ তাব বুকে বর্শাব মত বেধে। মতি মিঞা ভাবে আব একটু স্পষ্ট কবে কথা বলুক, আব একটু সুযোগ তাকে দিক বনমালী, আব সেই অজুহাতে মতি তাব ওপব ঝাঁপিযে পড়ে তাকে টুকবো টুকবো কবে ছিঁড়ে ফেলুক। কিন্তু বনমালী বড় সেযানা। সে মতি মিঞাব চোখেব ভাবভঙ্গি দেখে আব কথা বাড়ায না আব এগোয না, এক দু পা কবে পিছোতে থাকে। মতি মিঞা মনে মনে বলে 'যা শালা, বাইচা গেল।

তাবপব ঘটল সেই চূড়ান্ত ঘটনা। সে ঘটনা নিযে অনেকদিন পযন্ত মতি মিঞাদেব পাড়ায, ঘাটে মাঠে লোকে গালগল্প কবেছে, জটলা কবেছে, গুজব ছড়িযেছে পবাণ শীল ছড়া পর্যন্ত বেঁধেছিল। সেই ঘটনাব দিন এল।

ভাদ্র মাসেব সংক্রান্তিব দিন বিশ্বকর্মা পূজা। সে পূজা হিন্দুদেব ছুতাব কামাববাই কবে। কিন্তু সেই উপলক্ষে নদীতে যে নৌকা বাইচ হয, তাতে মুসলমানবাও যোগ দেয। তাদেব নৌকাই ববং বেশি থাকে। যাদেব অবস্থা বড়, শখও বড়, তাবা নিজেবাই নৌকো কেনে। আব যাদেব শখ আছে, কিন্তু টাকাব জোব নেই তাবা পবেব নৌকোয বৈঠা বায। গুণতিতে তাবাই বেশি দলে তাবাই ভাবি। মতি মিঞাও সেই দলে। নৌকো না থাকলে কি হবে বইঠাখানা তাব নিজেব। তাব গাযে যেমন জোব মনে তেমনি কলাকৌশল। বাইচা হিসেবে সবাই নাব নাম কবে, ভিন গাঁ থেকে লোকে তাকে বাযনা কবতে আসে। তাবা বলে 'মেঞা তুমি আমাগো নায আইস। মান নাই মাব কাছে, মান নাই গাঁব কাছে। তোমাবে আমবা টাকা দেব, কাপড় দেব, উর্ডনি দেব।' কিন্তু প্রতিবেশী মেহেব মুন্সাব ছেলে সোনা মন্সাব সঙ্গে তাব লেংটা বযস থেকে দোস্তি। তাদেব আছে নৌকা। সোনা মুন্সা মতি মিঞাকে অত সব দেয না কিন্তু জিতলে পবে ভাই বলে দোস্ত বলে বুকে জড়িযে ধবে। তাকে কি ছেড়ে যাওযা যায মতি মিঞা মুন্সীদেব নৌকোতেই বেশিব ভাগ ওঠে। কোন কোনবাব বন্ধুকে বলে কযে বাইবে যায নাম যশ একটু বাড়িযে নেবাব জন্যে মনে মনে ভাবে, তাব যশ তুফানীব শ্বশুববাড়িতে তাব কানে গিযে পৌঁছুক তাব কানেব সোনা হোক, গলাব হাব হযে থাকুক। যশ চায মতি মিঞা। কিন্তু সোনা মুন্সা সেবাব তাকে ছাড়ল না, হাত ধবে তাব নৌকোয নিযে তুলল। সেবাব নদীতে খুব নৌকা হযেছিল। পঞ্চাশ ষাটখানা তো হবেই। আব সেই বাইচ দেখবাব জন্যে বিশ পচিশখানা গাঁযেব লোক জড় হযেছিল কুমাব নদীব তীবে। তীবে মানে নৌকায। বর্ষাব সময ডাঙা বলে কোন পদার্থ নেই। সব জল আব জল। মাঠ পথঘাট হাট বাজাব সব জলেব নিচে। কিন্তু মানুষ তো আব মাছ নয যে জলেব নিচে থাকতে পাববে, ডাঙা তাব চাই-ই। ডিঙি নৌকো, পানসি নৌকো, দাঁড়েব নৌকো এক নৌকোই কত বকমেব। আবাব ছোটব দিকে যাও, কলাব ভেলা, তালেব ডোঙা তাও আছে। কোন বকমে একটা কিছুকে ধবে একটুখানি জলেব ওপব ভেসে থাকতে পাবলেই হল। তাহলেই বাজা। ডাঙাব বাজা মানুষ। কোন বকমে মাথাটা জাগিযে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পাবলেই তাকে আ পায কে।

তুফানীব কথা ভুলে গিযে মতি মিঞা সঙ্গীদেব কাছে সেদিনেব নৌকো বাইচেব বর্ণনা আবম্ভ কবল। চেযে দেখল সঙ্গীদেব হাতেব কাস্তে সমানে চলছে। তাদেব ডিঙি নৌকোখানা সোনাব ববণ পাকা ধানে বোঝাই হযে এল বলে। মতি মিঞা হেসে বলল, 'আব এক ছিলুম তামুক খাও মণ্ডলভাই। তেমন বাইচ আজকাল আব হয না। হবে কেমনে। মাইনষেব মনেব সেই স্ফূর্তিই নষ্ট

হইয়া গেছে। আর তত মানুষই বা কই। হিন্দুরা চইলা গেল। কতজনে না বুইঝা গেল, বিনা ভয়ে ডরাইল। কানা হইয়া গেল দেশটা। কানা ছাড়া কি। হিন্দু আর মোছলমান একই সুন্দরী মাইয়া মাইনষের সুর্মা পরা দুই চউখ। এক চউখ কানা হইয়া গেলে কি আর এক চউখের শোভা থাকে। সেকালে খুব নৌকা বাইচ হইত। মানুষের মনের আনন্দ আহ্লাদ যেন গাঙের জলে গইলা গইলা পড়ত। সেবারও খুব ফুর্তি হইছিল। সকাল থিকাই মুন্সীগো নাও ধোওয়া পাকলা শুরু করলাম। সে কি নাও একখানা। ষাইট হাত লম্বা। আর তার কি বাহারের গলুই। দুই পাশে বড় বড় বিশ পঁচিশটা কইরা পিতলের চউখ। মাইনষে সোনার চউখে সেই দিকে চাইয়া থাকত। দেখত সোনা। খাজুরের সলতা দিয়া আমরা বাইছারা সেই নাওরে ঘইষা ঘইষা চকচক কইরা ফেললাম। তেল পরাইলাম, সিন্দুর পরাইলাম। নাও তো না, যেন মাইয়া, তরী তো না যেন পরী। আর সে কি রাঙা গলুই মেঞা ভাই। জলে নামাইয়া দুই চাইরখানা বইঠা ছোয়াইলেই সে নৌকোর লম্বা লম্বা সরু গলুই থরথর থরথর কইরা কাপে। যেন ষোল বছরের মাইয়া পোলার উদলা বুকের ডগা। বাইছারা মিলা নাও নিয়া চললাম ঘাটে। আসল বাইচ ভাঙার বন্দরে। গাঙে জল রইলা কিছু নাই, সব নৌকা, বন্দরে বাড়িঘর দোকানপাট রইলা কিছু নাই। সব কালা কালা মাথা। পঞ্চাশ হাটের মানুষ আইসা এক ঘাটে জোটছে। ভিড় হবে না। পুলিসের বোট ঘোরতে লাগল। বিবাদ বিসংবাদ লাগলে তারা থামাবে। মুন্সেফবাবু বড় বড় উঁকিলবাবুদের মাইয়া পোলারা পানসিতে ওঠল বাইচ দেখবার জন্যে। অন্য দিন তাদের দেখলে মানুষ ভুলুক টুলুক দেয়। কিন্তু আইজ নৌকোর দিকেই মাইনষের চউখ। আইজ আর নাওয়ের চাইয়া সেরা মাইয়া কেউ নাই। খুব জোরে বাইচ হইছিল সেবার মণ্ডলভাই। মরদুলের মনে না থাকলেও তোমার একটু একটু মনে থাকবার কথা। সাইট পয়যট্টিখান বাছারি নৌকা নামল ছোটখাট নৌকা আর সেদিন গোণে কেডা। খোদার দোয়ায় আমরাই জেতলাম। পাঁচখানা সেরা বাইছের নৌকার ভিতর থিকা মুন্সীগো নাও তরতর কইরা বাইর হইয়া আসল। মুন্সেফবাবুর বড় কলসটা আমরাই পুরস্কার পাইলাম। সোনা মুন্সী নাচতে নাচতে আমারে আইসা জড়াইয়া ধইরা কইল দোস্ত, এ কলস তোমার। এ নাওয়ের তুমিই বড় বাইছা দুইজনে ঘামে নাইয়া উঠছি। গায়ের সেই ঘাম আর মনের সেই আহ্লাদ যেন আঠার মতো আমাগো দুইজনারে লাগাইয়া রাখল। খুব ফুর্তি কইরা আমরা ফিরা চললাম। বাইছারা সব হৈ হৈ করে দশ টাকার মিঠাই কিনা দিছে সোনা মুন্সী। তাতে তো প্যাট ভরে না। চিড়া গুড়ও খাইতে খাইতে গান গাইতে গাইতে চলছি। কাপুইড়া সদরদির মোল্লাদের ঘাটের কাছাকাছি আইসা ঘটল এক কাণ্ড। পীরপুরের তালুকদারগো নৌকোর গলুই আমাগো নৌকার ওপর উইঠা পড়ল। তারা বলে, 'তোগো দোষ' আমরা বলি, 'তোগো দোষ'। শুরুতে তর্কাতর্কি, গালাগালি। তারপর দুই নৌকার খোলের ভিতর থিকা রামদাও, সড়কি, বর্শা বাইর হইয়া পড়ল আমরা বাইছারা কেউ বইঠা থুইয়া দাও নিলাম, বর্শা নিলাম, কেউ কেউ বইঠারেই অস্তর করলাম হাতের। কাইজা খুব একচোট হইল। খুন কেউ হইল না। তবে জখম খুব হইল। তালুকদাররাও মোছলমান। এ কাইজা হিন্দুমোছলমানের কাইজা না। পীরপুর চণ্ডীপুরের কাইজা। ও নৌকায় হিন্দুও আছে, মোছলমানও আছে। এ নৌকোয়ও তাই। তারপর আন্ধারে ঠিক তাহেত করতে পারলাম না, ও নৌকার এক বর্শা আইসা আমার ঠিক কান্ধের ওপর পড়ল। আর একটু হইলেই গলাডা এফোড় ওফোড় হইয়া যাইত। খুব জোর লাগছিল ভাই। সেই পেরথম কাইজা, সেই পেরথম জখম। পানিতে পইড়া যাইতেছিলাম, সোনা মুন্সী আইসা জড়াইয়া ধরল। এবার আর নাচতে নাচতে না। এবার আর ঘাম না, রক্ত। আমাদের নৌকায় আরো জন দশেক জখম হইল। বাইচে আমরা জেতলাম, কিন্তু কাইজায় আমরা হাইরা গেলাম। সোনা মুন্সী আমারে ধইরা আইনা আমার মায়ের কাছে দিয়া গেল। দশা দেইখা মার সে কি কান্দন। আমার সেই কান্ধের ঘাও শুকাইতে তিন মাস লাগছিল। দাগ ? হ দাগ এখনও আছে। পরে শোনলাম, পীরপুরের সেই নৌকায় বনমালীও ছিল। তার উসকানিতেই নাকি—। সাচা-মিছা জানি না, লোকে তাই কওয়া-কওয়ি করতে লাগল।'

সেই কাজিয়ার পর কাঁধের ঘায়ের জন্যে মতি মিঞা সারা বর্ষাকালটা ভুগেছিল। গোড়ার দিকে

খুব জ্বর হত, যন্ত্রণা হত। প্রায় সারা রাত চীৎকার করত কষ্টে। তারপর আস্তে আস্তে সব কমে আসতে লাগল। মা আগে কাছে নিয়ে বসে থাকত। এখন কাজকর্মে যায়। বাপও কাজে বেরোয়। পাট কাটে, পাট ধোয়। একা একাই করে। মতি মিঞা এই সময়টায় বিছানায় পড়ে থাকায় ভারী লোকসান হল সংসারের। শুয়ে শুয়ে সে তুফানীদের খোঁজখবর করে। চৌকিদারের ঘরেও অসুখ বিসুখ। থানা থেকে সে ছুটি নিয়েছে। সে আর তুফানীর পিসী দুজনেই ম্যালেরিয়া জ্বরে পড়েছে। ওষুধ পথ্য দেওয়ার কেউ নেই। তুফানী পীরপুরে শ্বশুরঘর করছে। তার নাকি ছেলেপুলে হবে। তাকে তারা বেশি পাঠাতে চায় না।

অনেক বলে কয়ে তুফানীর পিসী তাকে কদিনের জন্যে আনিয়েছে। সাধ দেবে মেয়েকে। পাঁচ মাসে দিতে পারেনি, সাত মাসে দিতে পারেনি, এই ন' মাসেও যদি না দেয় কখন দেবে। মেয়েকে নতুন শাড়ি কিনে দেবে, পিঠে পায়েস করে খাওয়াবে। হিন্দুদের যা নিয়ম। একথা শুনে মতির মা এক হাঁড়ি দুধ পাঠিয়ে দিল। ক্ষীরের মত মিষ্টি আর ঘন দুধ দেয় তাদের কালো গাইটা। সেই গায়ের দুধ। সেই দুধের পায়েসে সাধ খেল তুফানী। পাড়ার মেয়েরা উলু দিল। কুলু কুলু কুলু কুলু। মতি শুয়ে শুয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ওকি মা।'

মতির মা হেসে বলল, 'ও বাড়ির তুফানী সাধ খায়। জোকারে জোকারে সেই কথা পাড়া ভইরা জানাইতেছে। বাজান, তুই এবার শাদি কর।

দিন দুই পর সেদিন বিকালবেলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে মতি মিঞা। সেও এই কার্তিক মাস। মাঠের ধান পেকেছে। কেউ কাটছে, যাদের নাবি ফসল তারা এখনো কাটতে শুরু করেনি। বর্ষার জল শুকাতে শুরু করেছে তবে এখনো পুরোপুরি শুকায়নি। সারা পাড়াটা নিস্তব্ধ। হাট বার। পুরুষরা সবাই হাটে গেছে। মেয়েরা যার যার ঘরের কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ মতি মিঞার চোখে পড়ল বাঁশের সাঁকো বেয়ে একটি মেয়ে পা টিপে টিপে গুটি গুটি এগোচ্ছে সাঁকোর নীচে এখন আর অথৈ জল নয়, হাঁটু পর্যন্ত ঘোলা জল। তার ভিতর থেকে ছোট ছোট মাছ চাঁদা-চুচড়ো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। মতি মিঞা দূর থেকেই মেয়েটিকে চিনতে পারল। যাকে সে এতকাল ধরে দেখে আসছে, শুধু রক্তমাংসে নয়, রাত্রের খোয়াবেও যাকে সে দেখেছে, তাকে সে চিনতে পারবে না? সাঁকো পার হয়ে তুফানী মতি মিঞাদের পারে চলে এল। বাড়িতে ঢুকবার পথে এক ঝাড় মোরগবলী গাছ। লাল ফুলে গাছ ভরে গেছে। এই ফুল তুফানী ছেলেবেলায় বড় ভালোবাসত। এ ফুল হিন্দুদের কোন পূজায় লাগে না। শুধু দেখতে বাহার বলে তুফানী সেগুলি নিত। আজও লোভ সামলাতে পারল না। হাত বাড়িয়ে কয়েকটা ফুল তুফানী ছিঁড়ে নিল। তা দেখে মতি মিঞাদের লাল আর কালো মেশানো বড় মোরগটা তুফানীর দিকে কক কক করতে করতে এগিয়ে গেল। হয়ত ভাবল তার ঝুঁটিটাই বুঝি তুফানী ছিঁড়ে নিয়েছে একটু এগিয়েই গোবরলেপা উঠান। একধারে হলদে রঙের পাকা ধানের আঁটি। মলন দেওয়ার জন্য জড়ো করে রেখেছে মতির বাবা। সেই ধানের আঁটির পাশ দিয়ে পাকা ধানের রঙ গায়ে আর মুখে মেখে হিন্দুদের লক্ষ্মী প্রতিমার মত তুফানী মতি মিঞাদের নতুন তোলা টিনের ঘরখানায় এসে ঢুকল। এদিক ওদিক তাকিয়ে ডাকল, 'মতি'

আর তুফানীর মুখে নিজের সেই নাম শুনে মতি মিঞার বুকের মধ্যে তুফান ডেকে উঠল। রক্তের মধ্যে তা দাপাদাপি শুরু করল। এতকাল বাদে ফের তার কাছে কেন এসেছে তুফানী। এবার কি তার ধরা দেওয়ার সাধ হয়েছে? মতির দিকে মন ঝুঁকেছে?

মতি মিঞার বাপ গেছে হাটে, মা গেছে সিকদার বাড়িতে চিঁড়া কোটাতে তক্তপোশের পাতলা কাঁথাখানা গায়ে জড়িয়ে মতি আজ একাই শুয়ে আছে। ছেঁড়া কাঁথার তলায় লাখ টাকার স্বপ্ন কি আজ সত্য হয়ে উঠল?

মতি সাড়া দিয়ে বলল 'এই যে আমি, এইখানে আইস।'

তুফানী হেসে বলল, 'বাব্বা, দিনেও ঘরের মধ্যে তোমার অন্ধকার?'

মতি বলল, 'হ তুফানী। দিনেও আমি বাইরের আন্ধার নিয়া বাস করি। তারপরে এতকাল পরে কি মনে কইরা? বইস।'

নিজে উঠে বসে মতি হাত দিয়ে তক্তপোশের ধারটা তুফানীকে দেখিয়ে দিল। রোগীর বিছানাটা বেশ একটু ময়লা হয়েছে। বিড়ির আগুনে চাদরের খানিকটা জায়গা পুড়ে গেছে। ঘরদোরের হাল দেখে মতির নিজেরই সরম হল। ও তো জানে না, তুফানী আজ আসবে। তাহলে ওর জন্যে ফুলের শয্যা বিছিয়ে রাখত।

অনুরোধ সত্ত্বেও তুফানী বসল না। একটু দূরে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তোমারে দেখতে আইলাম।'

মতি মিঞা বলল, 'কি দেখতে আইলা? বর্শার কোপে মইরা গেছি না আছি, তাই?'

তুফানী বলল, 'কি যে কও? মইষের মত মানুষটা দুই এক কোপ খাইলেই যদি মরে তা হইলে জাইত থাকে না কি? সাইরা ওঠ, আরও কত কাইজ্জা করবা, কোপ খাবা, কোপ দেবা—।'

মতি মিঞা দেখতে লাগল তুফানীকে। ওর মুখে পাকা ধানের রঙ, শাড়িতে কাঁচা ধানের বরণ।

তুফানী একটু হেসে বলল, 'শিগ্‌গির আর আমার আসা হবে না। আটকা পইড়া যাব। ওরা আমারে আইকাইয়া রাখবে। তাই দেখতে আইলাম। শোনলাম অসুখ, শোনলাম জখমে খুব কাবু হইছ। শুইনা এত ভাবনা হইছিল। এখন তো আর জ্বরজারি নাই? কি কও?'

মতি মিঞা বলল, 'আছে কি না আছে? দেখনা গায়ে হাত দিয়া? নাকি ছুইতেও দোষ?'

তুফানী গায়ে হাত দিয়ে দেখল না। শুধু হাতের সেই ফুলগুলি মতি মিঞার বিছানার উপর রেখে দিতে দিতে একটু হেসে বলল, 'তোমার ফুল তোমারেই দিয়া গেলাম।'

মতি মিঞা লক্ষ্য করল সেই রাঙা রাঙা মোরগবলী ফুলের রঙ তুফানীর সিঁথির সিঁদুরে, তার কপালের সুগোল ফোঁটায়, তার পানের রসে আর রঙে রাঙানো তুলতুলে দুটি ঠোঁটে। তুফানী নিজেই যেন এক মোরগবলী।

ধান কাটা বন্ধ রেখে মতি মিঞা তার সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না মণ্ডলভাই, আমি তার হাতখানা সঙ্গে সঙ্গে চাইপা ধরলাম। কইলাম আমার ফুল আমিই নিলাম তুফানী। আমি আর তারে ছাইড়া দেব না।'

সে কইল, 'কি কর মেঞা, কি কর! তোমার কি আক্কেল বুদ্ধি সব গেছে।'

আমি কইলাম, 'আক্কেল বুদ্ধি দিয়া মাইয়া মানুষরে পাওয়া যায় না, আমি জোর কইরা তারে আরও কাছে টাইনা নিলাম। তুফানীর আমারে থামাবার শক্তি ছিল না, চেঁচামেচি করবার শক্তি ছিল না, বোধ হয় সরমে বাইকা বন্ধ হইয়া গেছিল। সে সরমে নিজের চউখ ঢাকল, কিন্তু আমার চউখ ঢাকবে কেডা। তখন যে সাক্ষাৎ শয়তান ঢোকছে আমার শরীলে! সে আমার সব লাজ-লজ্জা হইরা নিছে। এতদিন আমি কেবল দূর থিকাই দেইখা আইছি। ধরি নাই, ছুই নাই, সোয়াদ পাই নাই। আমি যেন পাকা বেলের কাছে কাউয়া হইয়া রইছি। আইজ তা ক্যান থাকব! আইজ ক্যান ছাইড়া দেব? আমি ছাড়লাম না, ধরলাম। তুফানীর মুখে কথা নাই। ও যেন মাটি হইয়া গেছে, পাথর হইয়া গেছে। কিন্তু আমি মাটি না, পাথর না, আগুন, আমি তুফান। হিংসায় আমার বুকটা জ্বইলা পুইড়া ওঠল। বর্শার ফলাটা এবার কান্ধে না, পিঠে না, এক্কেবারে আমার বুকের মইধ্যেখানে আইসা বেন্ধল। পরের পোলা প্যাটে নিয়া ও আমার সঙ্গে আইজ তামাসা করবার জইন্যে আইছে। ওয়ার তামাসা আমি ছুটাইয়া দিব। আমার চউখের ভাব দেইখা ও দুই পাও পাউছাইয়া গেল। আমি চাইর পাও আউগাইলাম, ও ভয়ে কাঁপতে লাগল। কাঁপতে কাঁপতে কইল, 'ছাইড়া দ্যাও মেঞা, ছাইড়া দ্যাও, তোমার পায়ে ধরি। মতি, তুমি কি সব ভুইলা গেলা।'

কব কি মণ্ডলভাই, এই না বইলা দুই চউখের জল ছাইড়া দিল তুফানী। সে আমারে কোন কথা মনে করাইতে চাইল তা ঠিক বোঝতে পারলাম না। কিন্তু তার মুখে আমার নিজের নাম শুইনা আমার বুকের মইধ্যে সমদ্দুরের ঢেউ হুহু কইরা ওঠল। কিসের থিকা যে কি হয়, তা কি কওয়া যায় মণ্ডলভাই। এই আগুনে জ্বইলা পুইড়া মরছিলাম, ফুকমন্তরে দেখি কোথায় আগুন, কোথায় কি, বাইষার পনিতে দুনিয়াদারি ভাইসা গেছে। দেখ মণ্ডলভাই দেখ, সেইদিনের কথায় আমার গায়ের লোম আইজও খাড়া হইয়া উঠছে। তারে ছাইড়া দিয়া আমি সইরা দাঁড়াইলাম। পরনের শাড়িখান ফের গোছগাছ কইরা তুফানী চইলা গেল। আমি যে তারে অত সহজে ছাইড়া দিছিলাম সে কথা

কেউ বিশ্বাস করে না। তাবা ভাবে, আমি আব কিছু কববাব বাকি রাখি নাই। কিন্তু এই ধান হাতে কইবা, আকাশেব তলায় দাঁড়াইয়া সূয্য সাক্ষী কইবা তোমাবে আমি কইতেছি মণ্ডলভাই, আমি তাব আব কোন ক্ষেতি কবি নাই।—তবু তো সে বইল না।'

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মতি মিঞা পুনবায় বলতে লাগল, 'তুফানীব সোয়ামী বনমালী আব তাব বাপ দুইজনেই হাট থেকা একসঙ্গে আসল। বউব জইন্যে বনমালী ময়ূব মার্কা গন্ধ তেল, নতুন নীলাম্ববী শাড়ি নিয়া আইছে। নিয়া আইছে গবম গবম এক সেব জিলাফি। তুফানী জিলাফি বড ভাল খায়। সাধন্তিব সাধ, কত জিনিসই তাব খাইতে ইচ্ছা কবে। বাইছা বাইছা মাছ-তবকাবি, পান-সুপাবি সব নিয়া আইছে। কিন্তু আইসা দেখে বউ নাই ঘবে। অমনিই তাব মুখ অন্ধকাব। পিসী, সে গেল কোথায়? পিসী কাঁথা মুড়ি দিয়া জ্বরে কাঁপে। সে কয়, আছে ধাবে কাছেই। যাবে আব কোথায়। তুমি বইস, জিবাও। হাত মুখ ধোও, পান তামুক খাও। সে আইল বইলা। কিন্তু বনমালী তাবে তালাস কইবা আব কোন জায়গায় পাইল না। তাবপব দেখল, সাঁকোব ওপব দিয়া পা টিপা টিপা আসতেছে। নয় মাইসা পোয়াতী আসতে কি আব পাবে। পায়েব তলায় একটা বাঁশ। আব হাতে ধববাব জন্য সরু একটা তল্লা বাঁশ মাথাব উপব দিয়া বান্ধা। ধইন্য সাহস ছিল তুফানীব। আমি যেমন তাব পাব হইয়া আসা দেখছিলাম, তেমনি পাব হইয়া যাওয়াও দেখছিলাম। তাব পব আব দেখলাম না। কেবল একটা চীৎকাব শোনলাম। সে চীৎকাবে আকাশ ফাটে, পিরথিবী ফাটে, মানুষেব বুক কি তাব চাইয়া শক্ত মণ্ডলভাই, শালাব হাবামী শৃযাবেব বাচ্চা বোনা মিস্ত্রী কবল কি জান? মাইযাডাবে সাঁকোব উপব থিকা নামতে দেওয়াব তব সইল না তাব। নামতে না নামতেই সে আইসা তাব চুলেব মুঠ ধবল। আহা কি চুলেব গোছাই না তাব ছিল যেমন গোছে বড, তেমনি লম্বায় বড, আব কি মিশমিশে বঙ। চুল তো না আষাঢ মাইসা আকাশ ছাওয়া মেঘ। দেইখা চউখ জুডাইয়া যায়। সেই চুল ধইবা বোনা শালা তাবে টানতে টানতে ঘবেব মধ্যে নিয়া গেল। এসব কথা আমি পবে শুনছি ঘবে নিয়া আউলাপাথাবি এই লাথি। লাথিব পাব লাথি লাথিব পব লাথি। চকিদাব আইসা এক হাত ধবল তাব বুইন কাঁথাব তলা থিকা কাঁপতে কাঁপতে উইঠা আইসা আব এক হাত ধবল কব কি জামাই, কব কি। পোয়াতী মাইযাব গায়ে লাথি মাব, এ কি আক্কেল তোমাব' জামাই কইল 'ও মোছলাব ঘবে গেছে। জাইত জম্ম সব খোয়াইয়া আইছে। ওয়াবে আমি শ্যাষ কবব।' চকিদাব তখন আইসা সাধেব জামাইব ঘাড ধবল চউখ বাঙাইয়া কইল, খববদাব আমাব মাইযাব গায় ফেব হাত দিবি তো সেই হাত আমি মোচডাইয়া ভাঙব আমাব মাইযা আমি যাবে খুশি দেব, ডাকাইতবে আব না। আমাব বাড়িব থিকা এক্ষুনি বাইব হইয়া যা।' বনমালী সেই বাতেই চইলা গেল কিন্তু তুফানীব বাথা আব যায় না সাবা বাইত সাবা দিন যাতনায় ছটফট কবতে লাগল মাইয়া। শ্যাষে দাপাইতে লাগল। চকিদাব দাই আনল, ডাক্তাব আনল। ওষুধ দিল ইনজিশান দিল। তাবপব সব শান্তি হইল সন্ধ্যাব সময়। তুফানী আব কাতবাইল না আব কথা কইল না।'

মবদুল আব বিহাবী দেখতে পেল মতি মিঞা ভিজে হাতেব পিঠ দিয়ে দুটো ভিজে চোখ তাব মুছে নিচ্ছে।

চৌকিদাব থানা পুলিস কিছু কবল না। কেলেঙ্কাবীব ভয় তাবও আছে। সেই বাত্রেই মেয়েকে তাবা কালীখোলাব শ্মশানে নিয়ে গেল। তুফানী ফেব মাথায় সিঁদুব পবল, পায়ে আলতা পবল, তাবপব বুড়ো বাপেব কাঁধে উঠে চলল তাব নিজেব দেশে। যে দেশে কেলেঙ্কাবীব ভয় নেই, জাতজন্মেব ভয় নেই। মতি মিঞা ছুটে যাচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু তাব বাপ তাকে যেতে দিল না, বলল, 'ওবা এখন ক্ষ্যাপা কুত্তাব মত হইয়া বইছে। তোবে দেখলে আব থোবে না।' ঝাড়া দিয়ে বাপেব হাত ছাড়িয়ে নিল মতি মিঞা, কিন্তু মায়েব হাত ছাড়াতে পাবল না।

তাবপব শেষ বাত্রে ঘুমন্ত বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে ঘব থেকে বেবিয়ে এল মতি মিঞা। ঘাটেব ছোট ডিঙিখানা খুলে নিল। সাবাটা পাড়া নিঝুম। চৌকিদাব বাড়িও শান্ত। অনেক হৈচৈ আর কান্নাকাটিব পব তুফানীব বাপ আব পিসীও বোধ হয় এতক্ষণে ঘুমিয়েছে। খালেব ভিতব দিয়ে ডিঙি নৌকাখানা নিয়ে চলল মতি মিঞা। হাত যেন অবশ। বৈঠা জলে পড়ে কি না পড়ে। এ তো আব

সেই বাইছের নৌকা নয়। ঘোষেদের জংলা ভিটে ঘেঁষে জোলাদের পোড়ো মসজিদটার ধার দিয়ে ভেসাল পাতা জেলেদের ঘাট পেরিয়ে মতি মিঞা হিন্দুদের কালীখোলার শ্মশানের দিকে এগিয়ে চলল। একবার শেষ দেখা দেখবে। এখন আর দেখবার কিছু নেই। চিতায় জল ঢেলে লোকজন নিশ্চয়ই অনেক আগে চলে এসেছে। তবু মতি মিঞা সেই মাটিটুকু ছুঁয়ে দেখবে, খানিকটা ছাই লুকিয়ে লুকিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসবে। তারপর কাল ভোরে যাবে পীরপুরে। বোনা শুয়োরকে খুন করে তবে ছাড়বে। আর তার ভয় কিসের। জেল ফাঁসিকে সে আর ডরায় না।

মতি মিঞা ডিঙি ভিড়িয়ে রাখল ঘাটের কাছে। গাঙের তীরে শ্মশান। বর্ষার সময় জলে ডুবু ডুবু হয়। কোন কোন বার তলিয়েও যায়। কার্তিক মাসে জল সরে গিয়ে তুফানীর জন্যে অনেক জায়গা করে দিয়েছে। কতকগুলি পোড়া কাঠ আর একটি নতুন মাটির কলসী। আর কিছু নেই। শ্মশানের ওপর উত্তর দিকে ছোট একখানি টিনের ঘর, হিন্দুদের কালীমন্দির। আর তার সামনাসামনি দক্ষিণ দিকে একখানি দোচালা ঘর। শ্মশানযাত্রীদের বিশ্রামের জায়গা। বৃষ্টি বাদল নামলে সেখানে এসে তারা দাঁড়ায় তামাক খায়, বিড়ি টানে।

ঘাটে ডিঙিখানা রেখে মতি মিঞা চিতার দিকে এগিয়ে যেতেই হঠাৎ দেখল ছায়ার মত কি যেন একটা সেখানে নড়াচড়া করছে। সঙ্গে সঙ্গে মতি মিঞার সমস্ত রক্ত যেন জল হয়ে গেল। সমস্ত লোম খাড়া হয়ে উঠল, গা কাঁপতে লাগল থর থর করে।

তখনকার সেই অবস্থাটার কথা সঙ্গীদের কাছে বর্ণনা করে মতি মিঞা বলল, 'শ্মশানে যখন আসছিলাম, তখন গোয়ারের মত ছুইটা আসছিলাম। তখন মনের মইধ্যে ভয়ডর কিছু ছিল না। প্রাণডা কেবল তুফানী তুফানী কইরা অস্থির হইছিল। আমিও তুফানের মত ছুইটা আসছিলাম। কিন্তু আইসা চিতার ওপর সেই কালো ছায়া দেইখা আমার রক্ত একেবারে ঠাণ্ডা হিম হইয়া গেল। এ তো আর কিছু না, শ্মশানের ভূত। হিন্দুগো দেবদেবতা মানা আমাগো নিষেধ। মানলে গুণা হয়। কিন্তু তাই বুইলা কি ভূতপ্রেত আমাগো ছ'ইড়া দেয়? না তাগো না মাইনা পারি? কোন একখানা অস্তর আমার হাতে নাই। ফকিরের এক টুকরো গাছগাছড়া পর্যন্ত সাথে নাই। বোঝ মনের অবস্থাড'। তবু কোন রকমে খোদার নাম নিয়া সাহসে ভর কইরা চকিদারের মতই একটা হাক দিলাম কেডা? ওখানে কেডা? সেও কাপা কাপা গলায় চি চি কইরা ওঠল, কেডা? তুমি কেডা? গলা শুইনা তখন আমি ব্যাপারটা বোঝতে পারলাম। ভূত না প্রেত না, এ তো শালা সেই পীরপুরের বনমালী সেও বোঝল, সেও আমারে চেনল। বোঝতে পারলাম, সেও যে জন্যে আইছে, আমিও সেইজন্য আইছি। বোঝতে পারলাম সেও যা চায়, আমিও তাই চাই। ডাক ছাইড়া কান্দতে চাই মণ্ডলভাই, লাজলজ্জা ছাইড়া চিল্লাইতে চাই। তারপর সেই গাঙের ধারে শেষ রাইতের আন্ধারে সেই নতুন চিতার ওপর আমরা দুইজনে দুইজনের দিকে টাউ হইয়া চাইয়া রইলাম আমাগো পায়ের নীচে তাপ, বুকের মধ্যে তাপ তুফানীর চিতা নেবল কিন্তু আমরা দুইজন জ্বলতে লাগলাম। একজন হিন্দু একজন মোছলমান, একজন সোয়ামী আর একজন জার একজন খুনী আর একজন লুচ্চা বদমাইস, কিন্তু দুইজনেই খাড়াইয়া খাড়াইয়া সমানে পোড়তে লাগলাম। তারপর রাইত ভোর হইলে গাঙে নাইমা একটা কইরা ডুব দিয়া যার যার গ্রামে ঘরে ফিরা আসলাম।

এরপরে অনেকদিন বিরাগী হইয়া এদেশে ওদেশে ঘোরলাম। উত্তর দক্ষিণ কোন দিক বাদ রাখি নাই। পাঁচ বছরের মধ্যে আর বিয়া সাদি কিছু করলাম না। তারপর মার মাথা কোটাকুটির চোটে সবই করতে হইল। ঘর সংসারে থাকতে গেলে সবই করতে হয় মণ্ডলভাই। বনমালীও বিয়া করছে, তারও ছাওয়ালপাল হইছে। তবে বেশি না গণ্ডা খানেক।

আমার বউডা ভাই বছর বিয়ানী। বিয়াইয়া বিয়াইয়া তার আর সাধ মেটে না। বিরক্ত কইরা মারল কিন্তু এখন পোয়াতী হয় আমি তারে খুব আদর যত্ন করি। যা খাইতে চায় আইনা দেই। তারপর আতুড়ঘরে যাইয়া যখন সে গোঙায়, খুটি ধইরা কাতরাইতে থাকে, কোকাইতে থাকে, আমার সেই তুফানীর কথা মনে পড়ে। পরানডা হু হু কইরা উঠে। কি আর করব, উপায় তো কিছু নাই ঘরের দুয়ারে খাড়াইয়া খাড়াইয়া আনমনা থাকবার জন্যে তামুক টানি, মনে মনে আল্লার নাম করি আর আমার বিবির কাতরানির মধ্যে আমার সেই পেরথম পীরিতের গোঙানি শুনি। সে

গোঙানিব শেষ নাই মণ্ডলভাই, দুনিয়াদারিতে গোঙানিব শেষ নাই।'

ধান কাটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। সবাই ভবা নৌকোয উঠল। সূর্য হেলে পড়েছে। মবদুল লগি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নৌকোখানা খালেব ভিতবে নিতে লাগল। কিসেব একটা ভয় আব আশঙ্কায় তাব মনটা যেন কুঁকড়ে বয়েছে। একটু পবে সে মনেব কথাটা খুলেই বলল, একটু হেসে মতি মিঞাব দিকে তাকিয়ে সে বলে ফেলল, 'আপনাব ওই কেচ্ছা আইজ না কইলেই ভালো কবতেন বড়মেঞা।'

মতি মিঞা চমকে উঠে মবদুলেব দিকে তাকাল, 'ক্যান বে?'

মবদুল বলল 'যতসব অপযা, অলুক্ষইণা—'

মতি মিঞা একটু হেসে তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'নাবে না, তোব ভয় নাই মবদুল, আল্লাব দোযায কোন ভয নাই। তুই গিযা ছাওযালেব মুখ দেখবি। সে আমাব অপযা নাবে, তাব পয আছে। সে ভাবি পযমন্তী।'

এবপব আব কেউ কোন কথা বলল না। সরু খালেব ভিতব দিয়ে হলুদ বঙেব ধান বোঝাই নৌকো গাযেব দিকে এগিয়ে চলল।

ভাদ্র ১৩৩৮

দোলা

বিয়ে আমি বেশি বয়সেই কবেছিলাম চল্লিশ পাব কবে দিয়ে। অবশ্য এই বয়সে এসে বিয়ে কববাব আমাব ইচ্ছা ছিল না। কথাটা শুনে আপনি নিশ্চযই মনে মনে হাসছেন। বিশেই হোক আব চল্লিশেই হোক বিয়েব কথায মন কদমফুলেব মত বোমাঞ্চিত হয না কাব। মুখে যতই না না বলুক মনে মনে কে না ভাবে আব একবাব সাধিলেই খাইব।' কিন্তু বাবা মা যতদিন ছিলেন সাধাসাধি কম কবেননি দাদা বউদিও যথেষ্ট সেধেছেন। কিন্তু আমি মত দিই নি। পবিবাবেব চেয়ে তাব বাইবেব জীবনই আমাকে বেশি আকৃষ্ট কবত। কোন বকমে গাড়ি ভাড়াটা জোগাড় কবতে পাবলেই বেবিয়ে পড়তাম। ঘুবে বেড়ানোটা এক সময আমাকে নেশাব মত পেয়ে বসেছিল। তাই বলে শুধু যে ভবঘুবে ছিলাম তাও নয দু একটি জনকল্যাণকব প্রতিষ্ঠানেব সঙ্গেও আমাব যোগাযোগ ছিল। তাদেব নিযমিত সদস্য আমি ছিলাম না। ধর্মানুষ্ঠানেও যোগ দিইনি। তবু চাঁদা তোলাব কাজে, স্বেচ্ছাসেবকদেব নিয়ে দুর্ভিক্ষে বন্যায দুর্গতদেব মধ্যে গিয়ে দাঁড়াতে ভালোবাসতাম। নাম যশেব লোভ যে একেবাবেই ছিল না সে কথা বললে মিথ্যা বলা হবে। তবে সেই লোভই একমাত্র প্রেবণাব বস্তু ছিল না। কিন্তু নিজেব কথা নিজে বড় বেশি বলে ফেলছি।

আমাব জীবনকাহিনীব এই যে খসড়া আপনাকে পাঠাচ্ছি আপনি ইচ্ছা কবলে আপনাব গল্পে তাব এই প্রথম দিকটা ছেঁটে দিতে পাবেন। কাবণ আপনাব গল্পেব সঙ্গে এই অংশেব বিশেষ কোন যোগ থাকবে না। আপনাব গল্প হবে অষ্টম হেনবীব প্রাইভেট লাইফ, তাব পাবলিক লাইফ নয।

আমি যখন একটা দেশী মার্চেন্ট অফিসে চাকবি নিয়েছি তখন থেকেই গল্পটা আবম্ভ কবতে পাবেন। একেবাবে কনিষ্ঠ কেবানী হতে হযনি। সহকাবী ম্যানেজাবেব পদই পেয়েছিলাম। ডিগ্রীটা ছিল। বযসও হয়েছে। তাছাড়া ডিবেক্টব বোর্ড খববেব কাগজে নাম-টামও দেখে থাকবেন। ছবিও

হয়তো দু-একবার বেরিয়েছে। দেখবার মত ছবি নয়। দাঁড়কাকের মত চেহারা। তবু লোকে দেখত।

ওই একটু পরিচয়ের জোরেই কাজটা ভালো পেয়েছিলাম। সেই তুলনায় মাইনে অবশ্য ভালো নয়। তবে নিজের মেসের খরচটা চলে যেত আর বই কেনার বিলাসিতাটাও রাখতে পারতাম।

ঝক্কি নেই, ঝামেলা নেই, বেশ ছিলাম। দাদা বউদি ছেলেপুলে নিয়ে এলাহাবাদের বাসিন্দা হয়েছেন। বাড়িও করেছেন সেখানে। দাদা সরকারী চাকুরে। বউদি মহিলা সমিতির নেত্রী। ভাইপো ভাইঝিরা ওখানেই পড়ে, বড়রা চাকরি বাকরি করে। মাঝে মাঝে আমি ছুটিছাটায় যাই আসি। বউদি তখনও ঠাট্টা করেন 'কি ঠাকুরপো' বিয়েটা একেবারেই করলে না ? জীবনের একটা দিক একেবারে না দেখেই চলে গেলে ?'

তিনিও জানেন, ও প্রশ্নের এখন আর কোন জবাব নেই। কথাটা একেবারেই ঠাট্টা। আমিও তাই জানি।

এর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটল। আমাদের অফিসের একাউণ্টস ডিপার্টমেণ্টের মতিবাবু, মতিলাল দে মারা গেলেন। মাবা যাওয়ার বয়স তাঁর অনেকদিন আগেই হয়েছিল। শতায়ু হও বলে আমরা এখনো আশীর্বাদ করি বটে, কিন্তু সত্তর পর্যন্ত হাত পা চোখ কান নিয়ে টিঁকে থাকতে পারলেই খুশি হই। মতিবাবু প্রায ওই বয়স অবধি বেঁচেছিলেন : কিন্তু ঠিক হাত পা চোখ কান নিয়ে নয়। রোগে দারিদ্র্যে মরবার দশ পনের বছর আগে থেকেই তিনি অর্ধমৃত হয়েছিলেন। শেষের দিকে অফিসে আসতেন লাঠিতে ভর করে। চোখে চশমা দিয়েও কিছু দেখতে পেতেন না। কান দুটো তো আগে থেকেই গিয়েছিল। হাতের কলমটা পর্যন্ত কাঁপত। ফিগারগুলি সমানে পড়ত না। ওপরে উঠত নিচে নামত, এঁকে বেঁকে যেত। কাজ করবার ক্ষমতা তাঁর আর ছিল না। তবু অফিসেই তিনি ছিলেন। তাঁর চেয়ারখানিতে সেদিন পর্যন্ত তিনি বসে গেছেন। প্রমোশন যেমন হয়নি, তেমনি চাকরিও যায়নি।

এই মতিবাবুর কাছে আমি কিছু কৃতজ্ঞ ছিলাম। ছাত্র জীবনে বার দুই ওঁর আশ্রয়ে বাস করেছি। তার পরেও টিউশনি করে আমাকে পড়াশুনো চালাতে হয়েছে। মতিবাবু দু একটা দুর্লভ টিউশনির সন্ধান দিয়েছেন। দাদার অবস্থা ভালো ছিল না। তাঁর কাছে টাকা চাইতে লজ্জা হত। মতিবাবুর অবস্থা আরো খারাপ ছিল। তবু তাঁর কাছে হাত পেতেছি।

তাই মতিবাবু যখন শয্যা নিলেন আমি সপ্তাহে দু-দিন পারি একদিন পারি তাঁর বাদুড়বাগানের বাসায় যেতে লাগলাম। ভারি দরিদ্র পরিবার। পুরনো বাড়ির একতালার দু'খানা ঘরে কোন রকমে মাথা গুঁজে আছেন। আসবাবপত্রের মধ্যে গোটা কয়েক বাক্স-তোরঙ্গ, তক্তপোশ আর দু-তিনখানা হাতলহীন চেয়ার। আমি সে চেয়ারে বসতাম না। রোগীর বিছানার পাশেই বসতাম। কোন কোনদিন ওঁর স্ত্রী আলাদা আসন পেতে দিতেন। বড়মেয়ে চায়ের কাপটি এনে সামনে ধরত। সে যদি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকত আমার পরিচর্যায় এগিয়ে আসত মেজো সেজোরা। পাশে দাঁড়িয়ে তালপাখা নিয়ে বাতাস করত। আমি হেসে বলতাম, 'আমাকে হাওয়া করতে হবে না, তোমার বাবাকে করো।'

ওঁদের মা বলতেন, 'তোমাকে ওরা দেবতার মত দেখে। আমাদের আত্মীয়ও নেই, বন্ধুও নেই। এই বিপদের দিনে তুমিই যা এসে খোঁজখবর নাও।'

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বলতাম, 'অমন কথা বলবেন না। উনি আমাদের জন্যে অনেক করেছেন।'

ওঁর স্ত্রী বলতেন, 'সে কথা আর সংসারে কজন মনে রাখে বল।'

রোগের যন্ত্রণার চেয়েও ভবিষ্যতের চিন্তাটাই মতিবাবুর বেশি। তিনি চোখ বুঁজলে স্ত্রী আর চারিটি মেয়ের কী গতি হবে সেই কথাই বার বার বলতেন। এদের আগে আর পরে ওঁদের আরো ছেলেমেয়ে হয়েছে। 'তারা কেউ নেই, আছে শুধু ওই কটি কুফল।'

আমি বলতাম আপনি ওসব ভেবে মন খারাপ করবেন না।

বলতাম বটে কিন্তু আমি নিজেই বিশেষ ভরসা পেতাম না। যাদের থাকে না তাদের কিছুই থাকে না। মতিবাবুরও কোন কুলে কেউ নেই। দূর সম্পর্কের দু' একজন যারা আছে তারা তো কাছেও

ঘেঁষে না। হাজাব খানেক টাকাব লাইফ ইনসিওরেন্স একবাব করেছিলেন। প্রিমিযাম না দিতে পাবায বহুদিন আগেই তা ল্যাপ্স কবে গেছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে ধার নিয়ে নিয়ে তার আর কিছু অবশিষ্ট নেই।

মৃত্যুব পব আবও একটা তথ্য উদ্ঘাটিত হল, এখানে সেখানে কিছু দেনাও কবেছেন। মুদিব দোকান থেকে শুরু কবে, ডাক্তাবের ওষুধেব দাম, বাড়িওযালাব ভাড়া পর্যন্ত বাকি।

মতিবাবুব স্ত্রী আমাব হাত জড়িযে ধবলেন, 'বাবা, এই অবস্থায তুমি আমাদের ছেড়ে যেযো না। মেয়েগুলিকে নিয়ে আমাকে তাহলে পথে দাঁড়াতে হবে।'

পুরনো বন্ধুব খোঁজ নিতে এসে এত বড় দাযিত্ব যে ঘাড়ে চাপবে ভাবিনি। বললাম, 'ভাববেন না আপনাদেব একটা ব্যবস্থা না হওযা পর্যন্ত আমি যাব না।'

সদ্য বিধবা তাঁব দু চাবখানা গযনা কোন ট্রাঙ্ক কি ঝাঁপিব ভিতব থেকে বেব কবলেন কে জানে। আমাব সামনে এনে ধবে দিযে বললেন, 'এছাড়া আমাব আব কিছু নেই। এ দিযে তুমি ওঁব কাজটুকু কবে দাও।

আমি বললাম 'ওঁব কাজ আটকাবে না। আপনি ওসব তুলে বাখুন।'

বড়মেযেব নাম শান্তি। সে বলল, 'মা উনি তো আমাদেব পব নন। ওঁব কাছে অত সংকোচ কিসেব। উনি এবই মধ্যে আমাদেব জন্যে অনেক কবেছেন। এই গযনা বিক্রিব কটা টাকায তার যে সিকিব সিকিও শোধ হবে না।

শান্তিব বযস তখন কত আব। আঠাবো উনিশ হবে। ও যে দেখতে এত সুন্দব, বোনদেব মধ্যে সবচেযে সুন্দবী এব আগে লক্ষ্য কবিনি। হাতে দুগাছি প্লাস্টিকেব চুড়ি ছাড়া অলঙ্কাবের কণাও কিছু নেই পবনে আটপৌবে একখানা শাড়ি। কিন্তু তাতে ওব রূপেব অসামান্যতা ঢাকা পড়ে। উজ্জ্বল বঙ তীক্ষ্ণ নাক মুখ চোখ—আপনাদেব গল্পেব নাযিকা হবাব জন্য যা যা দবকাব সবই আছে। কিন্তু এতদিন আমি ভালো কবে দেখিনি। হাসবেন না, সত্যিই দেখিনি। কেবল সমস্যাব কথাটাই ভেবেছি। বোঝাব গুরুভাবেব কথা ভেবেই ক্লিষ্ট হযেছি। কিন্তু ওর যে এত রূপ আছে তা দেখিনি। আজ একটি কৃতজ্ঞ তরুণীব মধ্যে নাবীব রূপকে আমি প্রথম দেখলাম। কৃতজ্ঞতা যে এত মধুব তা যেন আমি জীবনে এই প্রথম অনুভব কবলাম। যে ভাবকে অত গুরুতর মনে কবেছিলাম তাব গৌবব বইল, ভাব যেন আব বইল না।

শ্রাদ্ধশান্তি চুকে গেল। মাইনেব টাকাব বেশিব ভাগ আমি মতিবাবুব স্ত্রীব হাতে এনে ধবে দিলাম। তিনি একটু কুণ্ঠিত হযে বললেন 'সব দিলে তোমাব চলবে কি কবে। তোমাবও তে মেস খবচা আছে। আমি বললাম সে একবকম চলে যাবে। সেজন্যে ভাববেন না।'

তিনি বললেন সে কি হয বাবা। তুমি আমাদেব জন্যে ভাববে, আমাদেব জন্যে সব কববে, আব আমবা পোড়া ছাই একটু ভাবতেও পাবব না। তুমি এখান থেকেই দুটো ডাল ভাত খেযে যাবে।'

শান্তি বলল, 'খেযেই দেখুন না অতুলদা। কদিন থেকে আমবা বোনেবাই বান্নাব ভাব নিযেছি। আপনাব মেসেব ঠাকুবেব চেযে খুব খাবাপ হবে না।

আমি বললাম, ঠাকুবেব চেযে ঠাকুবানীবা চিবকালই ভালো রাঁধে।'

এত তবল স্ববে ওব সঙ্গে কোনদিন কথা বলিনি। এই প্রথম বললাম।

শান্তি হেসে বলল, সে কথা স্বীকাব কবেন তাহলে?'

শুধু শান্তি নয, ওদেব চাব বোনেব মুখেই দেখলাম হাসি ফুটেছে। শান্তি, সুধা, তৃপ্তি, দীপ্তি। বযসে দেড বছব থেকে দু-বছবেব ব্যবধান। গড়নে প্রায এক। কারিগবেব একই ছাঁচে ঢালা মূর্তি। বঙটা ওবই মধ্যে কাবো এক পোঁচ বেশি ফর্সা, কাবো বা একটু শামলা।

চাব মুখে সেই চাবটি হাসিব বেখা দেখে আমি মুগ্ধ হযে গেলাম। এতদিন আমি ওদের সান্ত্বনা দিযেছি, প্রবোধ দিযেছি, আশ্বাস দিযেছি, উপদেশ দিযেছি, আজ দেখলাম সবচেযে বড় দান হল আনন্দদান। আমাব কথায যে ওবা হেসেছে এব চেয়ে বড বিস্ময়কব যেন আব কিছু নেই। আমার একটি মাত্র কথায যে চাবটি হাসিব ঝবনা ছুটে বেবোতে পাবে তা দেখে সেদিন সত্যিই বড় অবাক লেগেছিল।

প্রথম মাসে আমি শুধু প্রতি ববিবার আসতাম। ওদেব সঙ্গে বসে খেতাম, গল্প কবতাম, হাসতাম, হাসাতাম। দ্বিতীয় মাসে ওদেব দাবী বাড়ল। তৃতীয় মাসে আমাকে মেস ছেড়ে দিয়ে ওদেব দুখানা ঘবেব একখানাব বাসিন্দা হতে হল। শান্তিব মা বললেন, 'তুমি সব দিচ্ছ, ওদেবও কিছু দিতে দাও। ওবা তোমাকে বেঁধে খাওযাক, সেবা করুক, পবিচর্যা করুক। তাহলে ওদেব ভিখিবীব মত নিতে হবে না। আমিও ভাবতে পাবব—আত্মীযস্বজনেব কাছ থেকেই নিচ্ছি। তুমি আব আমাদেব পব মনে কবো না বাবা।'

এদিকে দুটো এস্টাবলিশমেণ্ট চালাতে গিযে আমি গলদঘর্ম হযে উঠেছি। শুধু মাইনেব টাকায কুলোয না। ব্যাঙ্কে যে সামান্য কিছু সঞ্চয আছে তাতেও হাত পড়ে। আমি তাই শান্তিদেব কথায সম্মতি দিলাম।

মির্জাপুবেব তিনতলায একখানা ঘরে আমি থাকতাম। পুবেব দক্ষিণেব দুদিকেব জানালাই খোলা ছিল। সেই তুলনায বাদুডবাগানেব এই অপবিসব ছোট ঘব মোটেই বাসযোগ্য নয। জানালা একটা আছে,তাও পশ্চিমেব দিকে। দিনেব বেলায ঘবখানা আধা অন্ধকাব হযে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেদিনেব সেই বাদুডবাগান আমাব কাছে পৃথিবীব সেবা ফুলবাগান হযে উঠল। চাব বোনে কোমবে আঁচল জডিযে ঘবখানা ঝেড়েপুছে পবিষ্কাব কবল। তক্তপোশ পাতল, বাইবেব র‍্যাকটি সাজিযে দিল। টিপযে বাখল একটি ফুলদানি।

সন্ধ্যাব সময সুইচ টিপে আলো জ্বালতে গিযে আমি একটু শক খেলাম। বিদ্যুতাঘাত। ছোট তিন বোন তো হেসেই অস্থিব।

শান্তি হাসল না। একটু অপ্রতিভভাবে বলল 'আপনাকে বলা হযনি, সুইচটা খাবাপ আছে।'

আমি পবদিনই মিস্ত্রী ডেকে সব ঠিক কবে নিলাম। শুধু এ ঘবেব নয ওঘবেবও। বাড়িওযালাব ভবসায আব বইলাম না।

তাবপব দু মাস যেতে না যেতেই কথা উঠল, আমি কে, আমাব পবিচয কী। পবিবাবেব বন্ধু কথাটা নির্ভবযোগ্য নয। আমাদেব সমাজ আত্মীযতাব বন্ধন ছাড়া আব কোন বন্ধন মানে না।

শান্তিব মা বললেন 'বাবা, আমাকে সবাই ঠাট্টা করে। দোতলাব ওবা তো দিনবাত ওই নিযেই আছে।

আমি সব বুঝতে পেবে বললাম, তাহলে আমি চলে যাই। মেসেব সেই ঘবটা না পেলেও একটা সীট নিশ্চযই পাব।'

শান্তিব মা বললেন, 'না, তা হয না। তোমাকে আমবা ছাডতে পাবি না।'

আমি বললাম, 'ভাববেন না। দূবে গেলেও আমি আপনাদেব কাছেই থাকব। যেটুকু কবছি সাধ্যমত তা কবতে চেষ্টা কবব।'

তিনি বললেন, তুমি আব কতদিন তা কববে। ভিখাবীব মত আমবাই বা সাবাজীবন তা কী কবে নেব। যাতে অসংকোচে নিতে পাবি, যাতে কেউ আব কোন কথা না বলতে পাবে, তুমি তাব একটা উপায কবে দাও।'

এ উপাযও আমাকে কবে দিতে হবে। আমি চুপ কবে বইলাম। কিন্তু বুকেব ভিতবটা আব চুপ ছিল না। তা তোলপাড কবছিল।

আমি ভেবে দেখলাম শান্তিব সঙ্গে দূবত্বেব ব্যবধান আমাব অনেক কমে গেছে। ও আমাব বিছানার পাশে এসে বসে, হাসে গল্প কবে। র‍্যাকেব বাংলা বইগুলি টেনে টেনে নিযে পড়ে। আমাব র‍্যাকে ওব পডবাব মত বই বেশি ছিল না। ওব ফবমাযেশ মত পাডাব লাইব্রেবী থেকে আমিই আপনাদের লেখা সব আধুনিক গল্প আব উপন্যাস যোগাড কবে এনে দিই। কিছু কিছু কিনেও আনি।

মাঝে মাঝে এমন কথা শান্তি বলে লঘুগুরুব ব্যবধান মানলে যা যা বলা যায না, এমন প্রসঙ্গ তোলে যা এতখানি বযসেব ব্যবধানে উঠবাব কথা নয। এমনভাবে হাসে, এমনভাবে তাকায যে আমাব মনে হয আপনাদেব বর্ণিত পূর্ববাগের লক্ষণগুলিব সঙ্গে একেবাবে হুবহু মিলে যায। অবশ্য

আপনাদেব বর্ণনাব ওপবই শুধু আমি সেদিন নির্ভব কবিনি। আমাদেব নিজেব যে বোধশক্তি আছে সেদিন সেও সেই কথা বলেছিল। সে বোধ ছিল বাসনাবঞ্জিত।

তবু আমি বললাম, 'কিন্তু শান্তিব মত—'

শান্তিব মা একটু হেসে বললেন, 'তাব মত আগেই নিয়েছি। সেজন্য তুমি ভেব না।'

অফিসে বেবোবাব আগে শান্তিব ফেব দেখা পেলাম। অন্য দিনেব মত সেদিনও পানেব খিলিটি হাতে দিতে এসেছে।

আমি তাকে একান্তে পেযে বললাম, 'তোমাব মাব কথা শুনেছ? তোমাব কি মত?'

যদিও জানি মেযেবা এসব কথা স্পষ্ট কবে বলে না, ঠিক ওইবকমই ঘুবিযে বলে, ফিবিযে বলে, হাসিতে বলে, আভাসে বলে, তবু আমি ফেব জিজ্ঞাসা কবলাম, 'তুমি কি সব ভেবে দেখেছ? তোমাব মতটা শুনতে চাই।'

শান্তি তেমনি হেসে বলল, 'আমি আবাব কি ভাবব। এতক্ষণ মাব কাছ থেকে শুনলেন, তাতে বুঝি হল না?'

তাতেই হল। পাঁজিতে শুভদিন দেখে বিযে কবে ফেললাম শান্তিকে। ঘটাপটা কিছুই কবলাম না। ওদেব তো একপযসাও ব্যয কববাব শক্তি নেই। যা কববাব আমাকেই কবতে হবে। ওদেব আত্মীযস্বজন বলতে কেউ ছিল না। তাদেব কাউকেই নিমন্ত্রণ কবতে দিলেন না আমাব শাশুডী। তিনি বললেন, 'বিপদেব দিনেই যখন কাউকে পেলাম না, এখন আমাব কাউকে দবকাব নেই।'

আমিও দু একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছাডা বিশেষ কাউকে বললাম না। তাবা শান্তিকে দেখে আমাকে আডালে ডেকে নিযে বলল, 'সাবাস। তোমাব সবুবে মেওযা ফলেছে।'

তাডাহুডোয আমি প্রথমে নতুন বাডি ঠিক কবতে পাবিনি। বাদুডবাগানেব ওই পুবনো বাসাতেই এক বছব ছিলাম। বাইবেব দিক থেকে শান্তিব বিশেষ কিছুই বদলাল না। যা বাপেব বাডি ছিল তাই হঠাৎ স্বামীব ঘব হযে দাঁডাল। শান্তিব সিঁথিতে সিঁদুব উঠল, হাতে শাঁখা। শাডিটা দামী হল, বঙটা প্রগাঢ। কিছু গযনাগাটিও কবে দিলাম। অবশ্য একেবাবে গা-ভবে দিতে পাবলাম না। ওব যে আবো তিন বোন আছে। তাদেব গা যে একেবাবে খালি। ওদেব দু-খানা এক খানা কবে গডিযে দিলাম। তাতে আমাব শাশুডীবও আপত্তি, শ্যালিকাদেবও। সুধা বলল, 'বাঃ বে আমাদেব কেন দিচ্ছেন। আমাদেব তো আব বিযে কবেন নি।

আমি বললাম 'ভবিষ্যতে কবতেও তো পাবি।' তা শুনে ওবা চাবজনেই খুব একচোট হাসল।

তৃপ্তি বলল যেটিবে বিযে কবেছেন সেটিকে আগে সামলান। তাবপব আমাদেব দিকে চোখ দেবেন।'

আমি ওব বেণী ধবে কাছে টেনে এনে বললাম, তবেবে দু-নম্বব ফাউ।'

ওদেব প্রত্যেকেবই বাডন্ত গডন, ফুটন্ত যৌবন। বিযে ওদেব একজনেবই হযেছে। কিন্তু হাওযা লেগেছে সবাইব গাযে, গাযে হলুদেব বঙ বসে গেছে সবাইব মনে।

আমাদেব মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তা আমি তুলে দিলাম। এব জন্যে বেশি কিছু চেষ্টা কবতে হল না। আমাদেব মধ্যে যে দাতা গ্রহীতাব সম্পর্ক ছিল তা আগেই ঘুচে গেছে। শ্রদ্ধাব, ভযেব কোন দুস্তব ব্যবধানই আব নেই। বযসেব বোঝা নামিযে দিযে আমি ওদেব সমস্তবে নেমে এসেছি। বড সুখেব এই অবতবণ।

মাইনেব টাকাটা শাশুডীব হাতে দিতে গেলে শাশুডীও একটু বসিকতা কবে বললেন, 'এখন তো বাডিব গিন্নী হল শান্তি।'

শান্তি হেসে বলল 'মা, তুমি যদি অমন কথায কথায খোঁচা দাও ভালো হবে না কিন্তু।' বহুদিন পবে যেন সংসাবে সুখেব বান ডেকেছে।

টাকা শান্তি নিজেব কাছে বাখল না, হিসাব নিকাশ, সংসাবেব আব পাঁচটা ব্যবস্থা বন্দোবস্তোব ভাবও আমাব শাশুডীব হাতেই বইল। কিন্তু, শান্তি মনে মনে জানল সে-ই কর্ত্রী, তাব জন্যেই সব। যে ছিল দাতা, শান্তিব জন্যেই সে গ্রহীতা বনে গেছে। তাব এই মনোভাব গোপন বইল না। চাল চলনে ফুটে বেবোতে লাগল। নিজেব যৌবন দিযে সে যে আব চাবটি জীবনকে বক্ষা কবেছে এ গর্ব

তার যাবে কোথায়।

বাইরের দিক থেকে সংসারের আর কোন পরিবর্তন হয়নি। শুধু বৃদ্ধ মতিলালের জায়গায় প্রৌঢ় অতুলচন্দ্র এসে বসেছে। কিন্তু ভিতরের যে পরিবর্তন হয়েছে তাকে প্রায় বৈপ্লবিক বলা চলে।

আমিও বদলাতে লাগলাম। এতদিন সমাজসেবা করেছি তার সঙ্গে অর্থনীতির বিশেষ যোগ ছিল না। টাকাকড়ি যা হাতে আসত তা দীন দুর্গতদের জন্যেই ব্যয় করতাম। ইস্কুল টিস্কুলও দু-একটা করেছি। কিন্তু এখন সব ছাড়িয়ে একটি পরিবারের জন্যে অর্থচিন্তাই আমার প্রবল হয়ে উঠল। এই পরিবারটিকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখা, শ্যালিকাদের পড়াশুনোর ব্যবস্থা করার জন্যে আমার আগেকার অভিজ্ঞতা বিশেষ কোন কাজে লাগল না। অফিসের যে মাইনে পাই তাতে ওইটুকু স্বাচ্ছন্দ্য আনাও সম্ভব নয়। তাতে বাদুড়বাগান থেকে নড়বার কথা ভাবতে পারি না। অথচ নড়তেই হবে। শুধু শান্তির বোনদের জন্যেই নয়, ভবিষ্যতে ছেলেপুলেও তো হবে তার জন্যে তৈরি হওয়া চাই। বিয়ের পর বয়স আমি পাঁচজনের কাছে কিছু কমিয়ে বললেও তা তো আর সত্যি সত্যি কমছে না। আর যৌবনে ধন উপার্জন করতে না পারলে যে হাল হয় তাতো আমি আমার শ্বশুরকে দেখেই বুঝতে পেরেছি।

তাই আমি প্রথম দিকে গোটা দুই পার্টটাইম কাজ নিলাম। তাতে রাত এগারটা বারটা হয়ে যায় বাড়ি ফিরতে। চার বোনের কেউ ঘুমোয় না, কিন্তু সবাই ঝিমোয়। আমি রাগ করে বলি, 'তোমরা খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লেই পার।'

শান্তি বলে, 'বাজে বোকো না। তাই কেউ পারে নাকি ? আচ্ছা, দিন নেই রাত নেই, ভূতের মত এমন খাটছ কেন বলতো ?'

আমি গলা নামিয়ে বলি, 'একটি পরীর জন্যে।'

আমার সেই নিচুগলার কথাও কি করে সুধাদের কানে যায়। সে ফস করে বলে বসে, 'তাই নাকি অতুলদা ? মাত্র একটি পরী ? আপনার সঙ্গে তাহলে আমাদের কথা বন্ধ।'

আমি তাড়াতাড়ি ভুল শুধরে নিয়ে বলি, 'শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু। একটি নয় চারটি। উর্বশী, মেনকা, তিলোত্তমা, রম্ভা। আমার চারটি অপ্সরী।'

আমি ওদের তিনজনকে পাড়ার স্কুলে ভর্তি করে দিলাম।

আমার শাশুড়ী বললেন, 'ইস্কুল টিস্কুল আবার কেন। এখন দেখে শুনে বিয়ে থা দিয়ে দাও। একটি একটি করে পার কর। তোমার ঘাড়ের বোঝা নামুক।'

সুধাকে ডেকে বললাম, 'তোমারও তাই ইচ্ছা নাকি ?'

সুধা হেসে বলল, 'দোষ কি।'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'উঁহু, আজকাল শুধু রূপসী হলে হয় না। বিদুষী না হলে ভালো বর জোটা শক্ত।'

আমার ইচ্ছা সত্যি ওদের তিন বোনকে বেশ একটু দেখে শুনে বিয়ে দিই। ওরা পড়তে থাকুক। আর ইতিমধ্যে আমি তৈরি হই। পণ যৌতুকের টাকা জোগাড় করি।

শান্তি বলে, 'নিজের শরীরের দিকে যে একেবারেই তাকাও না।'

আমি জবাব দিই, 'এতদিনে তাকাবার লোক পেয়েছি। নিজের দিকে তাকানো মানে নিজের আয়নার দিকে তাকানো। সে হল নিজের ছায়া। যখন নিজেকে ছেড়ে আর একজনের দিকে তাকাই তখনই ছায়ার বদলে কায়াকে পাই।'

শান্তি অত তত্ত্বকথা শুনতে চায় না। সে বসে বসে পিঠের ঘামাচি মারে, আর দু একগাছি করে পাকা চুল তোলে।

একদিন বলল, 'আর তোলবার কিছু নেই। তুলতে গেলে কাঁচা ক'গাছিকেই তুলতে হয়। তার চেয়ে কলপ কিনে আন।'

আমার বুকের মধ্যে কিসের একটা খোঁচা লাগে। একটু বাড়িয়ে বলছে শান্তি। আমার চুলগুলি পাকতে শুরু করলেও অত পাকেনি। অত বুড়ো হইনি আমি।

ওর চিত্তচাঞ্চল্যের কারণটা আমার অজানা নেই। দোতলায় বাড়িওয়ালার মেয়ে মল্লিকা ওর

সখি। তার সেদিন বিয়ে হয়ে গেল। বরের বয়স পঁচিশের নিচে। দেখতেও কার্তিকের মত। গানবাজনাও জানে। কিন্তু কার্তিকের বদলে বুড়ো শিবকে তো শান্তি জেনে শুনেই বরণ করেছে।

আমি চুলের জন্যে কলপ কিনলাম না। ভাবলাম পারি যদি কীর্তির কলপ পরব।

তিনটে চাকরি কবে আর পারিনে। তাতে খাটুনিই সার। সংসারের হাল যে কিছু ফিরেছে তা নয়। জীবিকা পাল্টাবার জন্যে আমি কিছুদিন আগে থেকেই চেষ্টা করছিলাম। সেটুকু চেষ্টা এবার কাজে লাগল। আমার কয়েকজন জেলখাটা বন্ধু এখানে ওখানে বেগার খাটছিলেন। তাদের নিয়ে, তাদের সাহায্যে শহরের বাইরে আমি ছোট একটা এগ্রিকালচারাল ফার্ম দাঁড করালাম। পোলট্রি, ডেয়ারি আস্তে আস্তে সবই হল। ঘুরে ঘুরে শেয়ারও কম বিক্রি করলাম না। অফিস করলাম শহরেই। আর দোতলার চারখানা ঘর নিয়ে নিজেদের থাকবার ব্যবস্থা করে নিলাম। ঠিক চার বোনের জন্যে চারখানা ঘর দিতে পারলাম না। তবে ওদের শোবার বসবাব পড়বার জায়গা আর বেড়াবার জন্যে ছাদের ব্যবস্থা ঠিকই হয়ে গেল। ডেয়ারি ফার্ম খুলে বন্ধুবান্ধব এবং তাদের পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র ভাগ্নেদেব দু-চারটে চাকুরির ব্যবস্থাও আমরা করতে পারলাম। যারা একেবারে অনাত্মীয় যোগ্যতা অনুযায়ী তারাও যে কাজকর্ম না পেলেন তা নয়। অনেক বেকার ছেলের বাপমায়ের আশীর্বাদ পেলাম। বহু পরিবার আমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে রইল, যেমন একটি পরিবাব হয়েছিল। কৃতিত্বটা আমাব একার নয় তা আমি জানি। আমাব বন্ধুদেবও যথেষ্ট অংশ এতে আছে তবু তারা বলতে লাগলেন, 'তোমাব জন্যেই এত বড় কাজটা হয়েছে।' নিজেকে কোনদিনই তেমন একটা কাজের লোক মনে করিনি। কিন্তু তাঁবা বললেন, আমি না এগিয়ে এলে কিছুই হত না। আমি জোর কবে আমাব সেই বন্ধুদের টেনে না তুললে তাঁবা আমরণ অবসর শয্যাতেই পড়ে থাকতেন। কিছুদিনেব মধ্যে আমাদেব ডেযাবিব কাজ ভালোই চলতে লাগলো। মুনাফাও মন্দ হল না।

গল্পেব মত শোনাচ্ছে, না? আপনাবা গল্পকাবরাও সত্য ঘটনাকে ভয় করেন। কারণ সত্য হল গল্পেব চেয়েও বিস্ময়কব। কিন্তু সেই বিস্ময়কে আস্তে আস্তে সইয়ে আনাই তো আপনাদেব কাজ। আপনাব কাজ আপনি কববেন। আমাব সে শক্তি নেই, সময়ও নেই।

সবাই বলতে শুরু করল তিন চাব বছরেব মধ্যে আমি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়েছি। তা নাকি প্রায়ই আলাদীনেব আশ্চর্য প্রদীপের মত।

আমি স্ত্রীকে ডেকে বললাম, 'সে প্রদীপ কোথায় জ্বলছে জান?'

শান্তি মুখ ঘুবিয়ে বলল, 'হয়েছে।'

ওর মুখে যে জবাবটি প্রত্যাশা করেছিলাম তা পেলাম না। ওর মুখে প্রদীপের যে আলোটি নতুন শিখায় জ্বলে উঠবে ভেবেছিলাম তা জ্বলতে দেখলাম না।

কিন্তু তা নিয়ে বেশিক্ষণ ভাববার কি হা-হুতাশ করবাব আমাব সময় ছিল না। তার একটু আগে প্রণব দত্ত অফিসের একটা জরুবী কাজ নিয়ে ঘবে ঢুকেছিল। বড একটা কনট্রাক্ট হাতে প্রায় এসে পড়েছে। তাতে হাজার খানেক টাকা আসবে। আমি অফিস আর ফার্মের ব্যাপার নিয়েই তার সঙ্গে আলাপ কবতে লাগলাম। স্ত্রীকে একটু দেখাতে চাই যে তার খুশি হওয়াটাই আমার একমাত্র কাম্যবস্তু নয়। পুরুষেব আবো অনেক কাজ আছে, কীর্তির আলাদা ক্ষেত্র আছে। প্রণব দত্ত অফিসের সেক্রেটারী আব আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী, ইকনমিকসের এম এ। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন ছেলে। বুদ্ধিশুদ্ধি বেশ বাখে। আমি ওকে সুধার জন্যে মনোনীত করে রেখেছি। আমার শাশুড়ীরও তাই পছন্দ। তাই আমার সামান্য ইশারায় শুধু বাড়ির দোরগুলি নয়, জানলাগুলিও ওর জন্যে খুলে গেছে। বাড়ির সব জায়গায় সবাইর কাছেই ও অবারিত। ওব ভূমিকাও অনেক। ও তিন বোনের কলেজের পড়া দেখিয়ে দেয়। চার বোনেরই চিত্তবিনোদন করে। কখনো সিনেমায় নিয়ে যায়, কখনো লেকে, কখনো বোটানিক্যাল গার্ডেনে। শ্যালিকারা আর তাদের দিদি সবাই তার সান্নিধ্যে সুখী। আমি মাঝে মাঝে যে তাতে একটু চমকে না উঠি, খোঁচা না খাই তা নয়। কিন্তু গৃহলক্ষ্মীকে আমি সব সময় চোখে চোখে রাখব তার সময় কই। এতদিনে

বাণিজ্যলক্ষ্মীর সঙ্গেও আমার শুভদৃষ্টি হয়েছে। সে দৃষ্টির মাদকতা তো কম নয়।

সারা দিন রাত আমি ব্যস্ত থাকি। অনেক রাত্রে ফিরে এসে শান্তিকে ঠিক আগের মত আর পাইনে। কখনো শুনি সে সিনেমা থেকে এখনো ফেরেনি। কখনো শুনি বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেছে। তার এত বন্ধু আছে নাকি ? অসম্ভব নয়। অবস্থা ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বন্ধুবান্ধবের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে।

যেদিন বাড়িতে থাকে সেদিনও মিলনটা নিষ্কণ্টক হয় না। কথায় কথায় কেন যে খিটিমিটি লেগে যায় বুঝে উঠতে পারিনে। বুঝতে পারিনে কার দোষ বেশি। নানা কারণে আমার মেজাজও ভাল থাকে না। ব্যবসা চালাবার ঝামেলা অনেক। নানা রকম লোককে নিয়ে কারবার।

তাই মাঝে মাঝে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে যায়, 'তোমার কি। তুমি তো সেজেগুজে পটের বিবিটি হয়ে বেশ ঘুরে বেড়াচ্ছ। একখানা হেলিকপ্টার কিনে দিলে উড়েও বেড়াতে পার।'

শান্তি বলে, 'দেখ, দিতে হয় দাও, না দিতে হয় না দাও। আমি দিনরাত অত খোঁটা আর সইতে পারব না।'

ঝগড়া লাগে। প্রায় প্রতি রাত্রে ঝগড়া লাগে। কারণে অকারণে সামান্য কারণে। খিটিমিটি বাধে। কেন এমন হয় আমি ঠিক বুঝতে পারিনে।

ঝগড়াঝাটির পর ও যখন পাশ ফিরে ঘুমোয় আমি ওকে চেয়ে চেয়ে দেখি। আমার শান্তি, আমার সেই শান্তি। ওর জন্যেই তো সব। ওর জন্যেই তো আমার এত বিভব প্রতিপত্তি, আমার এই নব যৌবন লাভ। যে যৌবনকে আমি শুধু ঘরের কাজে লাগাইনি, যে যৌবন দিয়ে আমি একটি প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলেছি, আরো দশজনের অন্নের সংস্থান করেছি। আমার আসল শক্তি যে কোথায় তা তো আমি জানি, আমার আসল অন্নপূর্ণা যে কে তা তো আমার অজানা নেই। তবু কেন আমি ওকে পাইনে। ওর জন্যে এত পেলাম, কিন্তু ওকে পেলাম না কেন।

একদিন আমি জোর করে ওর ঘুম ভাঙালাম, মান ভাঙালাম। জড়িয়ে ধরলাম বুকের মধ্যে। ও হঠাৎ বলে বসল, 'ছাড়ো ছাড়ো। এ ছাড়া তোমার মুখে কিসের একটা গন্ধ। দাঁতগুলি পরে শুলেই পার।' আমার এক ডেন্টিস্ট বন্ধুর পরামর্শে সব দাঁত ফেলে দিয়ে দুপাটি দাঁতই বাঁধিয়ে নিয়েছিলাম দামী সেট। আমি একটু অপ্রস্তুত হলাম।

বললাম 'আমি নতুন করে নেশাভাঙও করিনে, কিছুই করিনে। যা ছিলাম তাই আছি। যখন খেতে পেতে না তখন কিন্তু আর গন্ধটন্ধ কিছু ছিল না।

শান্তি বলল, 'ফের সেই খোঁটা ?'

আমি বললাম, 'কেনইবা নয় ? তুমি কি ভাব আমি কিছুই টের পাইনে ? আমার গায়ের বাতাসটুকু পর্যন্ত তোমার আর পছন্দ হয় না। এমন অকৃতজ্ঞ নেমকহারাম আমি আর দুটি দেখিনি। একবার ভেবে দেখ তখন যদি না দেখতাম, কোথায় ভেসে যেতে।'

শান্তি বলল, 'সেই ভেসে যাওয়াই ভালো ছিল। এর চেয়ে মরণ ভালো ছিল আমার।'

এমনি চলল রাতের পর রাত।

মাঝে মাঝে থামে। তখন একেবারে কথা বন্ধ।

কিন্তু সেই অসহযোগও তো আমার কাম্য নয়।

কী যে আমি ওর কাছে চাই, আর কী যে পাইনে তা বুঝিয়ে বলা শক্ত। সব সময়েই যে ঝগড়াঝাটি চলে তা নয়। শান্তি কোন কোনদিন আগের মতই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। হাসেও, কথাও বলে। কিন্তু আমার যেন মনে হয় আগে যা ছিল আসল, এখন তার অভিনয় চলে। বাইরের দিক থেকে তার সম্পর্কটা ঠিকই আছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আবার যে পরিবর্তনটা ঘটেছে তার নামও বিপ্লব।

তারপর যা ঘটবার তা ঘটল। শান্তি মৃত্যু কামনা করলেও মরল না। মৃত্যুর ওপর দিয়ে গেল। সঙ্গে নিয়ে গেল প্রণবকে।

এই আশ্চর্য কাণ্ড কী করে ঘটল আমি তার বিস্তৃত বিবরণ দেব না। সেটা আমার পক্ষে রুচিকরও নয়, সুখকরও নয়। ও সব ব্যাপার আপনি নিজেই অনুমান করে নিতে পারবেন। ঘটনার পর ঘটনা

সাজিয়ে ফাঁকে ফাঁকে তিনটি নরনারীর মনোবিশ্লেষণ দিয়ে আপনি শ' দেড়েক দুই পাতা দিব্যি পারবেন ভরে ফেলতে। বউ পালানোর গল্প তো আপনি আর কম লেখেননি। পড়েছেন আরও বেশি। দেশে বিদেশে ও কাহিনীব তো আর অভাব নেই। কিন্তু দেখেছেন কখনো? আমিও পড়েছি, শুনেছি কিন্তু দেখিনি। স্ত্রী কারো সঙ্গে পালিয়ে যাবার পর স্বামীর দশা যে কি রকম হয় কোনদিন তা চাক্ষুষ দেখা ছিল না। এবার হয়ে দেখলাম।

স্বামী পালিয়ে গেলে কি সন্ন্যাসী হয়ে গেলে তাব স্ত্রীর ওপর সহানুভূতি দেখাবার লোক পাওয়া যায়। কিন্তু পলাতকার স্বামীকেও পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়। বন্ধুদেব কাছ থেকে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে নিজের অধস্তন কর্মচাবীদের কাছ থেকেও পালাতে হয়। তার আর মুখ দেখাবাব জো থাকে না। কারো সহানুভূতি পর্যন্ত অসহ্য হয়। কারণ বন্ধুদের সমবেদনার তলায় যে চাপা বিদ্রূপ আর পরিহাস লুকিযে আছে তা কি আর তাব টের পেতে বাকি থাকে? কুলের কালি দেখা যায় না, কিন্তু স্বামীর মুখের কালি সকলেবই চোখে পড়ে।

প্রথমে ভাবলাম সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কোথাও চলে যাই। না দাদা বউদির কাছে নয়, এ মুখ নিয়ে তাঁদের সামনে দাঁড়াতে পারব না। অন্য কোথাও গিয়ে কিছু দিন পালিয়ে থাকতে হবে।

কিন্তু বেরোবার জো রইল না।

আমাব শাশুড়ী এসে আমাব সামনে কেঁদে পডলেন, 'বাবা, তুমি আমাদেব ছেড়ে যেতে পারবে না।' তাঁব সেই কান্নায গলবাব মত মনের অবস্থা আমার নয। তবু বিরক্তি চেপে শান্তভাবেই বললাম, 'আমি তো আর একেবারে চলে যাচ্ছিনে।'

তিনি বললেন, 'না, এখন তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। এই অবস্থায় আমি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারি না। যে মুখপুড়ি গেছে সে তাব কপাল নিয়ে গেছে। তার সব পুড়ুক, সব ছাবখাব হয়ে যাক। তার কুষ্ঠ হোক, মহারোগ হোক তাব। কিন্তু তোমাব মনের যা গতিক তাতে তোমাকে তো ছাডতে পাবি না। তোমার জীবনের যে অনেক দাম।'

তাঁর চোখেব জল আমাব কাছে নির্মল বলে মনে হল। মাতৃস্নেহেব স্বাদ পেলাম তাঁর কথায়, বাবহাবে। সেই মুহূর্তে ওইটুকু আশ্রয়ই বা আমাব আর কোথায় জুটত?

শুধু তিনিই নন, সুধারা তিন বোনেও এসে আমাকে ঘিবে ধবল।

সুধা বলল, 'অতুলদা, আপনি যেতে পাববেন না। একজনের অকৃতজ্ঞতা, একজনের পাপের শাস্তি আপনি আমাদেব সবাইব ওপব চাপিয়ে দেবেন কেন?'

ওরা তিনজনে এখনো কলেজেব ছাত্রী। এখনো কেউই রোজগাব কবে না। ওবা কি আমাকে শুধু সেই ভয়েই ধবে বাখতে চায়? সেই অনাহাবের ভয়ে?

কিন্তু ওদেব দিদির কাছ থেকে অত বড ঘা খেযেও আমি ওদের অতখানি অবিশ্বাস করতে পাবলাম না। আব তা না কবে তৃপ্তিই পেলাম। সত্যিই তো এতদিন ধবে ওদেব কাছ থেকেও তো কম শ্রদ্ধাপ্রীতি পাইনি, কম সেবাশুশ্রূষা নিইনি।

আমি কোথাও গেলাম না। শুধু অফিস আব বাড়ি আলাদা কবে দিলাম। নতুন একটা ফ্ল্যাটে এনে তুললাম ওদের।

অবিশ্বাসিনী স্ত্রীর মা আব বোনেবা আমাব অন্নাশ্রিত হয়েই রইল। আমি থাকতে চাইলাম তাদের হৃদয়েব আশ্রয়ে।

আশ্চর্য, শান্তিব মুখেব আদল ওদেব সব কটিব মুখে। একই রকমের গলা, একই রকমের উচ্চাবণেব ভঙ্গি। হাঁটা চলার ধরনও একই বকম। সেই একজনের প্রতিচ্ছায়া আমি ওদের প্রত্যেকেব মধ্যে দেখতে পেলাম, যে আমাকে সব দিয়েছিল, আবার সব কেড়ে নিয়েছে।

বন্ধুবান্ধব কেউ এসে শান্তির কথা জিজ্ঞাসা করলে তার মা আর বোনেরা সবাই বলে দেয় সে মবে গেছে। হঠাৎ হার্ট ফেল করে মরে গেছে। হৃদযের পরীক্ষায় সে ফেল করেছে না পাস করেছে কে জানে? বোধহয় পাসই করেছে। ফেল কববার দুর্ভাগ্য একা আমার।

ওরা বলে সে মরে গেছে। কিন্তু স্মৃতি কি অত সহজে মরে? জ্বালা কি অত অল্পে জুড়োয়? আমার দগ্ধ ঘায়ে প্রলেপ দেওয়ার জন্যে ওদের কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি নেই।

ইলেকট্রিক ফ্যান আছে, তালপাখার হাওয়ার আর দরকার হয় না। রাঁধুনী আছে, হাত পুড়িয়ে কাউকে আর রাঁধতে হয় না। কিন্তু খাওয়ার কাছে আমার শাশুড়ী এসে রোজ বসেন। শ্যালিকারা আমার ঘর আর টেবিল গুছিয়ে দেয়, ফুলদানি ফুলে ভরে রাখে, সন্ধ্যায় ফিরে এলে কাছে বসে গল্প করে।

সবাই আছে শুধু একজন নেই। সে মরে যায়নি, সরে গেছে।

দিদির নাম ওরা কেউ মুখেও আনে না। সুধার রাগ সবচেয়ে বেশি। কারণ শান্তি তো শুধু আমাকেই ঠকিয়ে যায়নি, ওকেও বঞ্চিত করে গেছে।

বছর ঘুরে এল। আমার শাশুড়ী সেদিন রাত্রে আমার ঘরে এসে বসলেন। আমার স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, কারবারের কথা জানতে চাইলেন। আরও কিছুক্ষণ ভূমিকার পর বললেন, 'ওদের তো একটি একটি করে এবার পার করা দরকার।'

আমি বললাম, 'আমারও তাই ইচ্ছা। সুধা বলে এম এ না পাস করে ও বিয়ে করবে না। চিরকুমারী থেকে দিদির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। সঙ্গে সঙ্গে তৃপ্তি আর দীপ্তিও নাকি সেই পণ করেছে। যত সব ছেলেমানুষি।'

শাশুড়ী বললেন, 'ছেলেমানুষি ছাড়া কি। কিন্তু এরই মধ্যে অনেকে অনেক কথা বলতে শুরু করেছে। এভাবে থাকলে ওদের তিনজনের নামেই বদনাম রটবে। কারোরই বিয়ে হবে না। তার চেয়ে বরং সুধাকে—'

আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'ছিঃ কী বলছেন আপনি।' শাশুড়ী তখনকার মত চুপ করে গেলেন।

শুয়ে শুয়ে অন্ধকারে আমি নিজের মনেই হাসলাম। মৃতা স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করার রেওয়াজ আছে। কিন্তু যে স্ত্রী ঘর ছেড়ে গেছে তার বোনকে নিয়ে ফের ঘর বাঁধবার সাধ থাকলেও সাহস আছে কার? একই দুর্বার রক্তের ধারা তো তারও শিরায়।

পরদিন সুধা কলেজে বেরোচ্ছিল আমি ওকে ডেকে হেসে বললাম, 'আরে, শুনেছ নাকি তোমার মার কথা? তিনি তোমাকে তোমার দিদির আসন পাকাপাকিভাবে দখল করতে বলছেন। তার আর ফিরে আসার লক্ষণ নেই।'

আমি কথাটা হেসেই বলেছিলাম। স্ত্রীর বোনের সঙ্গে এ সব রসিকতা কে না করে। আগেও তো কত করেছি। সুধা কিন্তু হাসল না। সে যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। মুখখানা একেবারে শ্বেতপাথরের মূর্তির মুখ।

সুধা বলল, 'আপনি তাও পাবেন।'

তারপর মুখ ফিরিয়ে জুতোর শব্দ তুলে চলে গেল।

কেন জানি না, আমার হাত দুটি আপনিই মুষ্টিবদ্ধ হল। বাঁধানো দু পাটি দাঁত আক্রমণ করল পরস্পরকে। আমি নিজের মনেই বললাম, পারি বই কি, আমি সব পারি। অবাধ্য একগুঁয়ে মেয়ে, ইচ্ছা করলে আমি না পারি কি? যে ঘা আমি খেয়েছি তার চতুর্গুণ কি আমি ফিরিয়ে দিতে পারি না?

কিন্তু খানিকক্ষণ বাদেই আমার কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এল। ধিক্কার দিলাম নিজেকে, ছি ছি ছি। ছি ছি ছি। গাড়িতে করে ডেযারির কাজ দেখতে চলে গেলাম।

ফিরে এলাম অনেক রাত্রে। দেখি সুধা তখনো জেগে আছে। আমার সঙ্গে গোপন কথা বলবে বলে।

সেই রাত্রে আমার ঘরে একা চলে এল সুধা। গম্ভীর, শান্ত মুখ।

মৃদুস্বরে বলল, 'অতুলদা, আপনি কি রাগ করেছেন?'

আমি বললাম, 'না না, রাগ করব কেন।'

সুধা বলল, 'আমি বড়ই দুর্ব্যবহার করেছি। দিদি যা করে গেছে সে অন্যায় তো কিছুতেই মুছবে না। এর পর আমরাও যদি—। ছি ছি ছি। আমাকে মাপ করুন অতুলদা।'

সুধা আমার পায়ের কাছে বসে পড়ল।

আমি বললাম, 'মাপ কববাব কি আছে। তুমি তো কোন দোষ কবনি, শুধু বুঝতে ভুল কবেছ। আমি তোমাকে ঠাট্টা করছিলাম সুধা। সেটুকু কববাব অধিকাবও কি আমাব নেই?'

বলে আমি ওব হাত ধবে তুলতে গেলাম। আব সঙ্গে সঙ্গে সে তাব হাতখানাকে সবিয়ে নিল। যে সুধাকে আমি বেণী ধবে টেনেছি, হাত ধবে টেনেছি, গাল টিপে দিয়েছি, আজ সে আমাব সামান্য স্নেহস্পর্শটুকু সহ্য কবতে পাবে না, আমি আজ এতই অস্পৃশ্য। এত বড স্পর্ধা এত দুঃসাহস ওব। আমি যদি ওকে এই মুহূর্তে বুকে তুলে নিই, ও কী কবতে পাবে।

কিন্তু আমি কিছুই কবলাম না। শুধু একমুহূর্ত সময নিযে বললাম, 'আমি তোমাব সঙ্গে ঠাট্টা কবছিলাম।'

সুধা বলল, 'কিন্তু মা যা বলেছেন, তাই হযতো ঠিক। আপনি যদি তাই চান, আমাব—আমাব কোন আপত্তি নেই।'

বলে মুখ নিচু কবল সুধা। জানি না হাসল কিনা।

আমি হঠাৎ চেঁচিযে উঠে বললাম 'আমি কাউকে চাই না, তোমাদেব কাউকে চাই না। চলে যাও এ ঘব থেকে।'

সুইচ অফ কবে দিযে আমি শুযে পডলাম। সুধাব ব্যবহাবেব কথা ভেবে নিজেব মনেই হাসলাম। আমাকে কী ভেবেছে ওবা?

আমি কি বকবাক্ষস যে ওবা একটিব পব একটি পালা কবে আত্মদান কববে? একবাব তো এক ভীমেব হাতে হত হযেছি, আর কতবাব নিহত হব?

তাব পবদিন সব স্বাভাবিক হযে গেল আমাদেব চালচলন কথাবার্তা শান্ত সংযত ঠিক আগেব মত।

ইতিমধ্যে আমি আবো কযেকবাব চলে যেতে চেযেছিলাম। বলেছিলাম, তোমবা তো আর নাবালিকা নও। নিজেবাই বেশ থাকতে পাববে। আমি আলাদা জাযগায গিযে থাকি। খবচপত্রেব জন্যে ভেব না। তা যেমন আসছে তেমনি আসবে।

সুধা বলল, অতুলদা আপনি একথা মুখে আনছেন কি কবে? আপনাব চেযে আপনাব টাকাটাই কি বড? আপনি নিশ্চযই সেদিনেব বাগ ভুলতে পাবেননি।

ওব চোখ দুটি ছলছল কবে উঠেছিল।

ও চোখ আমি আগেও দেখেছি। সেই জল। তাবপব প্রচণ্ড জ্বালা।

সুধা এম এ পাস কবেছে। কিন্তু বিযে কবেনি।

তৃপ্তি দীপ্তিও ইউনিভার্সিটিতে ঢুকল। সব খবচ আমিই চালাচ্ছি। তাব বদলে ওদেব সেবাশুশ্রূষা আব কৃতজ্ঞতা পাচ্ছি।

সুধাব মা তাঁব সেই প্রস্তাব তুলে নেননি। সুধাও আবো দু একবাব বলেছে তাব কোন আপত্তি নেই।

আমি যদি চাই তা হলেই পাই।

কিন্তু সে পাওযাব মানে যে কী তা কি আব আমি জানিনে? আমি আব চাইব কোন ভবসায?

মুখেও বলি, নিজেব মনেও বলি, চাইনে চাইনে চাইনে। এই জীবনেব কাছ থেকে আমি আব কিছু চাইনে। আমাব চাইতে নেই।

আমি দিন বাত কাজকমে ডুবে থাকি। বিশেষ কবে শহবেব বাইবেই আমাব বেশি সময কাটে। আমি সেখানেই শান্তি পাই। সেই কাঁচা ঘাস, সাদা দুধ আব সবুজ গাছপালাব বাজ্যে আমি মাঝে মাঝে দু চোখ মেলে দিযে বসে থাকি।

কিন্তু সেই চোখই যদি একমাত্র চোখ হত, তাহলে আব কোন দুঃখ ছিল না।

ওবা তিনজন সুধা তৃপ্তি দীপ্তিবাও কেউ থেমে নেই। তিন সমান্তবাল বেখায তিনটি জীবন ধাবা ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে আমি সেদিকেও তাকাই। একজনেব চলে যাওযাব লজ্জাকে ওবা ভুলেছে, দুঃখকে মনে করে বাখেনি। নিজেদেব কৃতিত্ব দিযে গৌবব আব গর্ব দিযে ওবাও যাব যাব নিজেব স্বতন্ত্র পৃথিবীকে গডে নিচ্ছে। দিনেব পব দিন ওদেব গুণগ্রাহী বন্ধুদেব সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে।

আমি এক একদিন চেয়ে চেয়ে দেখি। তারা আসে যায়, হাসে, ঠাট্টা-তামাসা করে কিন্তু আমি হঠাৎ ওদের মধ্যে গিয়ে পড়লেই ওরা যেন কেমন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সুর কেটে যায়, তাল ভঙ্গ হয়। আমি কি এতই অপয়া ? আমাকে দেখলেই কি ওদের সব কথা মনে পড়ে ? সব ব্যথা নতুন হয় ?

বন্ধুদের ফেলে ওরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে।

সুধা বলে, 'অতুলদা, আপনি কদিন ধরে কাসছেন। একটা ওষুধটষুধ খান।'

আমি বলি, 'ভয় পেয়ো না। সামান্য কাসি। টি বি নয়।' সঙ্গে সঙ্গে সুধাব হাসি মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

আমি নিজেও বড় অপ্রস্তুত হয়ে পড়ি।

তৃপ্তি বলে, 'আপনার খাবারটা এখন এনে দিই অতুলদা।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বলি, 'না না, এখন থাক।'

দীপ্তি বলে, 'অন্তত এক কাপ দুধ খেয়ে যান।'

আমি বলি, 'তোমরা খাও। গোয়ালা কি আর দুধ খায় ?'

ওরা স্তব্ধ হয়ে চুপ কবে দাঁডিযে থাকে। তিনটি তরুণীব মূর্তি। শ্বেতপাথব দিযে গডা। তিনটি চঞ্চল ঝরনা হঠাৎ যেন এক প্রচণ্ড শাপে বরফেব স্তূপ হযে বয়েছে।

আমি তো তা চাইনি।

আমি চাইনে ওরা আমাব চোখের দিকে চেয়ে ভয় পাক, আমি চাইনে আমাব মুখের কথায় ওদেব মুখের হাসি শুকিয়ে যাক।

আমি ওদেব কাছে দুর্ভাগ্য আর দুঃস্বপ্নেব প্রতীক হয়ে থাকতে চাইনে।

তবু ওবা আমার চোখে কী দেখে ওবাই জানে।

ভাদ্র ১৩৬৫

জন্মদিন

দিনেব আলো নিভে যাওযাব সঙ্গে সঙ্গে শীতেব সন্ধ্যা নেমে এল। একটুকাল হয়তো গোধূলিব আলো ছিল। কিন্তু ইন্দুভূষণ তা লক্ষ্য করেন নি। চোখ ছিল বইয়ের পাতায, মন ছিল নিজের জীবন পুঁথিতে। এলোমেলো ভাবে জীবন-ইতিহাসেব পাতাগুলি উল্টে-পাল্টে যাচ্ছিলেন ইন্দুভূষণ। যখন হাতে কোন কাজ থাকে না, পাশে কোন লোক থাকে না, এমন কি প্রিয় গ্রন্থকারও তাঁর পুরনো পাঠককে আব আকর্ষণ কবতে পাবেন না, তখন একা একা পেশেনস খেলাব মতো, স্মৃতি-বিস্মৃতির আলোছায়ায় এমনি করেই লুকোচুরি খেলেন ইন্দুভূষণ।

আজ প্রায় সাবাদিনই অন্যমনস্ক, কখনো বা অতীতমনস্ক ছিলেন তিনি। তাই প্রহরে প্রহরে দিনের রূপ বদলানোর পালা, দৃশ্যে দৃশ্যে পটপরিবর্তন দেখতে পারেন নি। অথচ দেখবার কথা ছিল। অনেকবার দেখেওছেন। এই ঊনত্রিশে পৌষ তাবিখটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কতবার কতভাবেই না দেখেছেন। কখনো ভিতর থেকে কখনো বাইরে থেকে। কখনো ঘরে বসে কখনো বা ছুটোছুটি করে। কখনো বন্ধুজনের সঙ্গে, কখনো নির্জনে। নানাভাবে নিজের জন্মদিনের স্বাদ গ্রহণ করেছেন ইন্দুভূষণ। কম তো নয়, পচাঁত্তব বার এই তারিখটি তাঁর জীবনে ফিরে ফিরে এসেছে। নানা বেশে, নানা ভূষণে।

চাকর অমূল্য এসে সামনে দাঁড়াল। ধমক খাবাব ভয় সত্ত্বেও একটু ইতস্তত করে বলল, 'বাবু।'
ধমক দিলেন না ইন্দুভূষণ, শান্তভাবেই বললেন, 'কী বলছিস।'
'আলো জ্বেলে দেব বাবু? নাকি ঘরে গিয়ে বসবেন? আপনার যে ঠাণ্ডা লেগে যাচ্ছে।'
ইন্দুভূষণ বললেন, 'আচ্ছা, চল ঘরেই যাই।'

সারাদিন আজ তাঁর প্রায় বাইরেই কেটেছে। বাড়িব বাইবে নয়, ঘরের বাইরে। তাঁর দোতলার এই ঘরখানির পূবে পশ্চিমে দু'দিকেই বারান্দা। সকাল থেকে দুপুর পূবমুখী হয়ে রোদ পুহিয়েছেন। তারপর খেয়েদেয়ে চেয়ারে শুয়ে একটুকাল তন্দ্রার আবেশ উপভোগ করে আবার এসে বসেছেন পশ্চিমেব বাবান্দায়।

সূর্যের তাপ আব আলো আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়েছে। শহরেব রাজপথে 'স্বপ্নসম লোকযাত্রা'। কেউ পদাতিক, কেউ রিকশায় চড়ে বসেছেন, কেউ বা ট্যাক্সিতে। এ পথে বাস-ট্রাম নেই। নেই তাই রক্ষা। না হলে কান পাততে পারতেন না ইন্দুভূষণ। আজকাল যে-কোন বকম শব্দই তাঁর কানেব পক্ষে দুঃসহ।

বারান্দাব চেয়ার ছেড়ে ঘরের চেযারে এসে বসলেন ইন্দুভূষণ। এ চেয়াবেও আরাম আছে। হাত-পা ছড়িয়ে শরীবকে একেবাবে এলিযে দেওযা যায়। কিন্তু সেভাবে তিনি ছড়িয়ে দিলেন না। এই বয়সে যতখানি সম্ভব সোজা হয়ে শক্ত হয়ে বসলেন।

অমূল্য সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল। প্রথমে ভ্রূ কুঁচকে চোখের ওপর একটু হাত রাখলেন ইন্দুভূষণ। তাবপব হাতখানা আস্তে আস্তে সবিয়ে নিলেন। আলো খুব জোবালো নয়, শান্ত সহনীয়। সেই আলোয় নিজেব অতি পরিচিত আব ব্যবহৃত আসবাবগুলি ফের ফুটে উঠল। অমূল্য ঝেড়েপুছে জিনিসপত্রগুলিকে পবিচ্ছন্ন করে রেখেছে কিন্তু তাদেব প্রাচীনতা ঢাকবে কী করে। দুটো আলমাবি আইনেব বইয়ে ভর্তি। কিন্তু তালা দুটোয বোধ হয জং পড়ে বয়েছে। অনেক কাল খোলা হয না। যে আলমারিগুলিতে সাহিত্য, দর্শন আব ইতিহাসেব সংগ্রহ আছে সেগুলি ববং মাঝে মাঝে খোলা হযে থাকে। কাঁচেব পাল্লাব ভিতব দিযে এলোমেলো বইযেব বাশ চোখে পড়ছে। অনেক আগে বইয়েব আলমারিগুলি অন্য ঘবে ছিল। সুহাসিনী বই বিশেষ পছন্দ কবত না। শুয়ে শুযে তাঁকে বই পড়তে দেখলে সে বই কেড়ে নিযে তবে ছাড়ত। বলত, 'বই আমাব সতীন, বই আমার দু'চোখেব বিষ।'

সুন্দবী তরুণী স্ত্রীর মুখের সেই 'বিষ' কথাটি ইন্দুভূষণেব কানে অমৃত ঢেলে দিত। তিনি হেসে বই সবিয়ে রেখে স্ত্রীকে বুকেব মধ্যে টেনে নিতেন। তখন ভাবেননি এই প্রেমেব শেষ আছে, ভাবেননি সমস্ত তৃষ্ণার তৃপ্তির জন্যে একটি নারীদেহই যথেষ্ট নয।

--'বাবু।'
ইন্দুভূষণ এবাব সত্যিই বিবক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ, তুই জ্বালালি আমাকে। কী ওটা।'
অমূল্য বলল, 'আপনার কফি। নাকি দুধ খাবেন? দুধ খেলেই কিন্তু ভালো করতেন বাবু।'
ইন্দুভূষণ বললেন, 'না না, দুধ আর নয। তুই আব বউমা মিলে আমাকে একেবাবে দুগ্ধপোষ্য বানিয়ে রেখেছিস। যা এনেছিস তাই দে।'

কফির পেয়ালাটা যেন অমূল্যের হাত থেকে কেড়ে নিলেন ইন্দুভূষণ, তারপর বললেন, 'য', পালা এবাব।'

অমূল্য মাইতি খুব বেশিদিনের চাকর নয়। চার পাঁচ বছব ধরে আছে এখানে। কিন্তু এই কয়েক বছরেই বেশ সেয়ানা আর সাহসী হয়ে গেছে। ধমক দিলে ভয় পায় না, ছুটে পালায না। ধীরে সুস্থে আড়ালে সবে গিয়ে মুখ টিপেটিপে হাসে। ইন্দুভূষণ সব বুঝতে পারেন, সব টের পান। আঠারো উনিশ বছর বযস হয়েছে ছোঁড়ার। ঠোঁটের ওপর কচি কোমল কিশলয়েব মতো গোঁফ। ইন্দুভূষণের ব্লেড চুরি করে শয়তান মাঝে মাঝে দাড়িও কামায়। সে দাড়ি কড়া হতে এখনও ঢের দেরি। রঙ মিশমিশে কালো, কিন্তু মুখের ডৌলটুকু ভারি মিষ্টি, দেহের গড়ন সুঠাম। আরো বয়স হলে ও অনেক মেয়েকে নাচাবে, পবে কাঁদাবে। রূপের ধর্মই তাই। 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে'।

তবু এখনো যার রূপ আছে ইন্দুভূষণের কাছে তার সাত খুন মাপ। ঝি চাকর অবশ্য কেউ তাঁকে

এপর্যন্ত খুন করেনি, শুধু ঘড়ি কলম মনিব্যাগ চুরি করে পালিয়েছে। সুহাস বলত, 'তোমার আর শিক্ষা হয় না!'

তা অবশ্য হয়নি। বার বার ঠকেও শিক্ষা হয়নি ইন্দুভূষণের। পুরনো চাকর-বাকর বেশিদিন সহ্য করতে পারেন নি। তিনি নিত্য নতুনের মধ্যে জীবনের বৈচিত্র্যকে ভোগ করতে চেয়েছেন। নতুন চাকর দারোয়ান, নতুন আসবাবপত্র, নতুন বন্ধু, নতুন বান্ধবী। দিন যখন ছিল, পৃথিবী তাঁর এই নবত্বের দাবি দু'হাতে মিটিয়েছে। আজ সব শেষ। 'যৌবন'। বৃদ্ধ ইন্দুভূষণ চৌধুরী ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে যেন জিভ দিয়ে শব্দটির স্বাদ গ্রহণ করলেন, 'যৌ-ব-ন।' সে যখন মানুষকে রাজা বানিয়ে রাখে তখন দাসত্বেও সুখ। ক্ষুধাব জন্যে দাসত্ব, তৃষ্ণার জন্যে দাসত্ব। সে দাসত্বকে তখন আর বন্ধন বলে মনে হয় না। মনে হয় পরে, অনেক পরে যখন যৌবন ঝরে যায়, যখন জবার হাত থেকে শুধু অভিশাপ ঝরে।

—'বাবু।'

ইন্দুভূষণ চোখ তুলে তাকালেন, 'আবার বাবু' কফি তো খেয়েছি। আবাব কি।'

অমূল্য বলল, 'আর কিছু খাবেন না বাবু? দুটো সন্দেশ খান। ভালো সন্দেশ নিয়ে এসেছি বাবু। নতুন গুড়ের সন্দেশ।'

ইন্দুভূষণ একটু হাসলেন, 'তোরা নতুন মানুষ তোরাই খা। পৃথিবীর সমস্ত গুড় আব মধু তোদের জন্যে। নতুন গুড আর এই পুরনো পেটে সইবে না।'

অমূল্য বলল, 'কিন্তু বাবু আজ যে আপনাকে একটু মিষ্টি খেতে হয়। আজ যে আপনাব জন্মদিন বাবু। বউমা অত করে বলে গেছেন—'

ইন্দুভূষণ ভেংচাবার ভঙ্গিতে বললেন, 'বলে গেছেন! আমার ওপর ভারি তো তাঁর দরদ! আজকের দিনে সকাল থেকে তাঁর দেখাই নেই।'

অমূল্য বলল, 'ছন্দা দিদিমণির যে অসুখ বাবু। তাই তো তিনি সকালের গাড়িতে আসানসোল বওনা হয়ে গেছেন। আপনাকে তো বলেই গেছেন। আপনার মনে নেই?'

ইন্দুভূষণেব এবার সব মনে পড়ল। তাঁর নাতনী ছন্দাব ছেলেপুলে হবে। এই নিয়ে তিনবার। আগেব দু'বাব ছন্দাকে নিজের কাছে এনে বেখেছিলেন ইন্দুভূষণ। একবার দিয়েছিলেন ভবানীপুর নার্সিং হোমে। আব একবাব মেডিকেল কলেজে আলাদা কেবিন ভাড়া কবে রেখেছিলেন। সন্তান কোনবারই বাঁচেনি। তার ফলে ছন্দার শাশুড়ীর ধারণা হয়েছে দোষটা কলকাতা শহরের। কুসংস্কার আব কাকে বলে। ছন্দাকে তারা নাকি এবাব আর জায়গা নাড়া করবেন না। আসানসোলে নিজেদের কাছেই রাখবেন। মেয়েব শরীব নরম হয়েছে খবব পেয়ে অণিমা ছুটেছে সেখানে। বর্ববদেব হাতে পড়ে মেয়েটা এবাব বক্ষা পেলে হয়।

ইন্দুভূষণ একটুকাল নাতনীর কথা ভাবতে থাকেন। আহা, প্রসববেদনায় কচি মেয়েটা কী কষ্টই না পাচ্ছে। কিংবা হয়তো এতক্ষণে একটি ছেলে হয়ে গেছে ছন্দার। ইন্দুভূষণের জন্মদিনে তাঁরই বংশে না হোক, তাঁবই অংশে আর একটি মানব ভূমিষ্ঠ হয়েছে। ভাবতে মন্দ লাগছে না। তাই হোক। এবার ছন্দাব সব কষ্ট সার্থক হোক। ছেলে হয়ে বেঁচে থাকুক।

মেয়েদের মধ্যে প্রবাদ আছে প্রসূতি যখন খুব কষ্ট পায় তাব ছেলে হয়। ছেলে নাকি মাকে খুব যন্ত্রণা দিতে দিতে আসে। কাবণ ছেলে হল সুসন্তান। শ্রেষ্ঠ সন্তান। ঠিক লেখকের শ্রেষ্ঠ লেখার মতো। ইন্দুভূষণ দেখেছেন যে লেখা তাঁকে খুব যন্ত্রণা দিয়েছে, দিনের পর দিন রাতের পর রাত ভাবিয়েছে, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে রেখেছে, যে লেখা আহার-নিদ্রাকে অস্বস্তিতে ভবে দিয়েছে, যাব জন্যে অনেক কাগজ ছিঁড়েছেন, অনেক সময় অপব্যয় করেছেন—সেই লেখাব জন্যেই তাঁব নিজের তৃপ্তি আর লোকেব সুখ্যাতি লাভ ঘটেছে।

'কবিতা বনিতা চৈব সুখদা স্বয়মাগতা' এ কথা সব সময় সত্য নয়। অনেক যন্ত্রণা, অনেক কৃচ্ছ্রতার ভিতর দিয়ে যে আসে স্থায়ী গভীর অনাস্বাদিত সুখ সেই দিতে পারে।

ইন্দুভূষণ স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেছেন, বান্ধবীদের জিজ্ঞাসা করেছেন, শেষ বয়সে নাতনীকেও জিজ্ঞাসা করেছেন, মেয়েদের প্রসবযন্ত্রণার সঙ্গে শিল্পীর সৃষ্টির যন্ত্রণার কোন মিল আছে কিনা। কোন্

যন্ত্রণার তীব্রতা বেশি। তারা কেউ সঠিক জবাব দিতে পারেনি। জবাব ইন্দুভূষণ নিজের মনেই খুঁজে নিয়েছেন। একের সঙ্গে আর একের তুলনা হয় না। প্রথমটা শারীরিক, দ্বিতীয়টা মানসিক। একটা জৈব আর একটা অজৈব। কিন্তু তাই কি সত্যি ? মানুষের শরীর আর মনকে, তার রচনার রূপ আর ভাবকে অমন বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় ? শরীরের যন্ত্রণা কি মনের যন্ত্রণা নয় ? মানসিক কষ্ট কি শরীরের কষ্ট নয় ? তাঁর একমাত্র ছেলে যখন মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে মারা গেল তখন ইন্দুভূষণের শরীর সবচেয়ে সুস্থ ছিল। কিন্তু সেই দৈহিক স্বাস্থ্য কি তখন মুহূর্তের জন্যেও তিনি উপভোগ করতে পেরেছেন ? নিজের যে দেহ আছে আর সেই দেহের এমন অনির্বাণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে তা কি তখন একবারও মনে হয়েছিল ইন্দুভূষণের ? তিনদিন তিনি অন্নজল স্পর্শ করেন নি, তারপর আরো দীর্ঘদিন কোন নারীর সান্নিধ্য-তৃষ্ণা তাঁর মনকে চঞ্চল করেনি। যে তৃষ্ণার অগ্নি প্রায় সারাজীবন তাঁকে জ্বালিয়েছে, শুধু পুত্রশোকের অশ্রু তা কিছুদিনের জন্যে নির্বাপিত করে রেখেছিল। তখন তাঁর দেহ বলে কোন বস্তু ছিল না। শুধু মন। আর সেই মন শুধু একটি অনুভূতির সঙ্গে একাত্মা। সেই দুঃসহ অনুভূতির নাম পুত্রশোক। সময়ের ভেলায় সেই শোকসমুদ্র ইন্দভূষণ অনেক দিন হল পার হয়ে এসেছেন। তবু মাঝে মাঝে সে কথা মনে পড়লে যেন হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে যায়। ইন্দুভূষণ খাণিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। তুমি একটি শিশুকে ভূমিষ্ঠ হতে দেখলে, তোমার স্ত্রীর কোলে হাত পা নেড়ে তার খেলা দেখলে, মুখের আধো-আধো বোল শুনলে, আর একটু পরিচিত হওয়ার পর মায়ের কোল থেকে সে যখন তোমার কোলে মাঝে মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল, তার অপূর্ব স্পর্শসুখ পেলে,—এও কচি কোমল মেদেরই স্পর্শ, সম্পূর্ণই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তবু নারীস্পর্শ থেকে এই স্পর্শের স্বাদ কত আলাদা। রসানয যেমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্বাদবৈচিত্র্য ধরা পড়ে, ত্বকেও তেমনি। তারপর সেই ছেলে তোমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল। প্রতি পলে তোমার চোখের সামনেই সে বেড়েছে তবু যেন তোমার সম্পূর্ণ অগোচরে। তার এই ক্রমবিকাশ আর পরিণতি একেবারেই তোমার চোখের আড়ালে থেকে গেছে। তুমি তাকে খাইয়েছ, পরিয়েছ, লেখাপড়া শিখিয়েছ তবু তুমি তার অনেক কথাই জানোনি। তারপর তুমি একদিন তোমার এই প্রতিরূপের দিকে দ্বিতীয়-তুমির দিকে তাকিয়ে নিজেই বিস্মিত হলে, মুগ্ধও হলে, 'আরে মনুয়া, তুই দেখি মাথায় আমাকেও ছাড়িয়ে গেলি।'

মনুয়ার মা কোপের ভান করে বলল, 'খবরদার তুমি আমার ছেলের দিকে চোখ দিয়ো না। ছাড়াবে না ? ও তোমাকে সর্বদিক থেকে ছাড়াবে।'

তুমি হেসে বলল, 'ছাড়ালেই ভালো।'

তারপর সে আরো বড় হল। তোমাকে ছাড়াতে না পারলেও কখনো কখনো তোমার সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে লাগল। তোমার দাম্পত্য কলহে সে তার মার পক্ষে দাঁড়ায়। তুমি কিছু অন্যায় করলে তার তীব্র প্রতিবাদ করে শাসন করতে চায়। তোমার গৌরবে যেমন তার গর্ব, তোমার অপমানে তেমনি তার লজ্জা। অন্য নারীর প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র আকর্ষণকে সে সহ্য করে না, তোমার অল্পস্বল্প মদ্যপানকে সে তীব্র ঘৃণা করে। তোমার চালচলন আচার আচরণের প্রতিবাদে সে তোমার সঙ্গে কথা বন্ধ রাখে। যে আত্মজকে তুমি তোমার দ্বিতীয় সত্তা বলে ভেবেছিলে তাকে তোমার পর মনে হয়, শত্রু মনে হয়।

সে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের জীবিকা খুঁজে নেয়, নিজের বন্ধুর বোনকে ভালোবেসে বিয়ে করে। তুমি তাতে আরো ক্রুদ্ধ হও, তোমার মনে হয় নিজের ছেলের ওপর তোমার সব অধিকার তুমি হারিয়েছ। একই বাড়িতে একই অন্নে তোমরা থাক তবু সে যেন এক স্বতন্ত্র পরিবারের কর্তা। তার সাধ-আহ্লাদ ভাবনা-বেদনা সব তার সেই ছোট পরিবারটুকুকে ঘিরে। তার দাম্পত্য সুখ, তার পারিবারিক শান্তি দেখে তোমার মাঝে মাঝে হিংসা হয়। তার স্বার্থপরতায় তুমি বিরক্ত হও, ক্রুদ্ধ হও। তুমি ভাব তোমার দেহজ-পুত্রের চেয়ে তোমার মানসপুত্রেরা তোমার বেশি আপন। যাদের তুমি অক্ষরে অক্ষরে গড়ে তুলেছ, শুধু রক্তে নয়, রঙে রসে, নিজের বাসনা-কামনার অংশ দিয়ে যাদের তুমি প্রাণবন্ত করে তুলেছ, যারা তোমার শুধু রক্তবীজ নয়, যারা তোমার ভাবনার বীজ, যারা তোমার আপন সত্তার ভগ্নাংশ হয়েও সম্পূর্ণ, সমগ্র—তারাই তোমার যথার্থ আত্মজ। তোমার নাম

আর কীর্তি তারাই যুগ হতে যুগান্তরে বহন করে নেবে। তোমার দেহজাত যে পুত্র সে আকস্মিক, সে তার মায়ের বাধা, স্ত্রীর বশ, তোমার মনের খবর সে কতটুকু রাখে। কিন্তু যারা তোমার মানসপুত্র তারা তোমার মনঃপূত, তারাই তোমার যথার্থ আত্মজ। তুমি তোমার ছেলের ওপর বিমুখ হলে, উদাসীন হয়ে রইলে। তার ভালোয় মন্দে, হিতাহিতে তুমি নেই। তুমি শুধু রূপ খুঁজে খুঁজে বেড়াও। লতায় রূপ, পাতায় রূপ, পুষ্পে পুষ্পে বিচিত্র বর্ণ-সমারোহ, নারীর নয়নে রূপ, অধরে রূপ, তার ভূষণে রূপ, ভাষণে রূপ, সেই রূপতৃষ্ণাই তোমার রূপসৃষ্টির কাজে প্রধান প্রেরণা। এই তৃষ্ণার নির্বাণ তুমি চাও না, কারণ তুমি জানো তুমি তাহলে নিজেই নির্বাপিত হবে। তুমি নিজের সংসারে আগুন জ্বালাও, অন্যের সংসারে আগুন জ্বালাও, নিজে জ্বলেপুড়ে খাক হও, তোমার ভ্রূক্ষেপ নেই। তুমি মনে মনে জানো এই আগুনের ভিতর থেকে যারা বেরিয়ে আসবে তারা খাঁটি সোনা। তুমি নিজের চেয়ারে শক্ত হয়ে বসে শীতের শেষরাত্রে শক্ত করে কলম ধরে নিজের মনে মনে বল, 'প্রবৃত্তি, আমি তোমার দাস। কিন্তু যখন তোমাকে নিয়ে আমি লিখি তখন তুমি আমার দাসী।

তুমি নিজের মনে হাস আর তোমার সেই মনের হাসি তোমার নতুন উপন্যাসের পরাক্রান্ত নায়কের চোখে মুখে ছড়িয়ে দিতে থাক।

হঠাৎ পাশের ঘরে রোগাতের চীৎকারে তোমার হাসি নিভে যায়। তোমার চলন্ত কলম থেমে পড়ে। তোমার যে স্ত্রী তোমাকে বলেছিল, 'তোমাকে ছুঁতেও আমার ঘেন্না করে' --সেই স্ত্রীই তোমার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ে, 'ওগো, তুমি এখনো ওঠ না?'

তুমি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠ, 'কেন, কী হয়েছে?'

'ওগো, মনুয়া যে আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে।'

তোমার ছেলের অসুখের কথা তুমি শুনেছিলে। জ্বরটা ভালো নয় এ কথা তোমাকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু তোমার নতুন উপন্যাস তোমার বহুকাল আগে লেখা একটি সাধারণ গল্পকে একেবারে ভুলিয়ে দিয়েছে। তোমার অর্থের অভাব নেই। লেখার আয়ের ওপর তোমাকে নির্ভর করতে হয় না। তুমি পয়সাওয়ালা এডভোকেট। তুমি অসুস্থ ছেলের জন্যে বড় ডাক্তার ওষুধপথ্যের ব্যবস্থা করে নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার নায়ক-নায়িকার মন জানাজানির পালায় মনোনিবেশ করেছ। তার পর তুমি সব ভুলে গেছ। পাশের ঘরে অসুস্থ ছেলেকে পর্যন্ত ভুলেছ। নইলে নতুন বাসরঘর তুমি কী করে রচনা করবে।

সব ফেলে তুমি ছুটে গেলে। শুধু একবার মাত্র ডাক শুনলে তার মুখের 'বাবা'।

আর কিছু শুনলে না।

তোমার স্ত্রী, পুত্রবধূ, ঘরভরা আত্মীয়-আত্মীয়াদের কান্নায় বাড়ি ভরে গেল।

শুধু তুমি কাঁদতে পারলে না। তুমি মনে মনে বলতে লাগলে, 'আমার শত মানসপুত্রের বদলে, আমার একটিমাত্র ছেলেকে ফিরিয়ে দাও। আমি যশ চাইনে, অর্থ চাইনে, নারী চাইনে, সৃষ্টিশক্তি চাইনে, আমি শুধু আমার জীবন্ত ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরতে চাই। কার কাছে এই প্রার্থনা তুমি তা জান না, কারণ তুমি তো ঈশ্বর মান না। ঈশ্বর যে তোমারই মানসপুত্র, যে তোমার আত্মজ, তোমার ভাবসত্তায় যার জন্ম সেই ঈশ্বরকে স্বীকার করা তো দূরের কথা, তার নাম উচ্চারণেও তোমার লজ্জা। যেন জারজ সন্তানকে তুমি স্বীকার করে নিচ্ছ, যেন সে শুধু ধর্মপ্রচারকের পাদ্রী পুরোহিতের, মূঢ় অশিক্ষিত জনসাধারণের একটি সংস্কার মাত্র—কবি, দার্শনিক, ভাবুকের সৃষ্টি নয়। তাই তুমি তাকে আজও স্বীকার করতে পারনি। তোমার যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মনের কাছে তাহলে তোমার লজ্জায় যে মাথা কাটা যাবে।

ইন্দুভূষণ কিছুদিন পরে নিজের সেই শোককে একাধিক গল্প-উপন্যাসে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেছিলেন। পারেননি। একবার লিখেছিলেন, 'পাঁজরার হাড় কে যেন একখানা একখানা করে খুলে নিচ্ছে।' লিখেই বুঝেছিলেন, কিছুই হল না। সেই তীব্র যন্ত্রণার বিন্দুমাত্রও উপমার মধ্যে প্রকাশ পেল না। আর একবার লিখেছিলেন, 'একটা অসহায় মানুষ অন্ধকারে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেছে আর তার ওপর দিয়ে পাথরে বোঝাই এক বিরাট চক্রযান যাচ্ছে আর আসছে, যাচ্ছে আর আসছে। আশ্চর্য, লোকটাকে কেউ মরতে দিচ্ছে না। শুধু তার অস্থি আর মজ্জা, তার স্বাদ

আব স্বপ্ন প্রতিমুহূর্তে পিষে পিষে ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে।' লিখে টুকরো টুকবো কবে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ইন্দুভূষণ। সেই যে যন্ত্রণা তা কি শুধু দেহেব যে, বাব বাব তিনি কেবল দৈহিক কষ্টেব সঙ্গে তুলনা দিচ্ছেন? সেই অসাডতা, অসহায়তা, স্বাদগন্ধহীন পৃথিবীব নিবর্থকতা এই উপমায় কতটুকু ফুটে উঠেছে? সে শোককে বর্ণনা কববাব চেষ্ট বৃথা। কিন্তু অবর্ণনীয় শুধু এই কথা বলেই কি ভাষাশিল্পী নিজেব হাত থেকে নিজে বেহাই পান? পুত্রহাবা মায়েব মতো শুধু কাঁদলেই তাঁব নিষ্কৃতি নেই, সেই শোককে অভূতপূর্ব শিল্পরূপ দিতে পাবলে তবে তাঁব ক্ষণিক মুক্তি।

—'বাবু।'

চমকে উঠলেন ইন্দুভূষণ, 'কে?'

চাকব অমূল্য।

ভ্রম ভাঙল। নিজেব মনেই লজ্জিত হলেন ইন্দুভূষণ। মনুয়া তাকে ছেলেবেলায় 'বাবু' বলেই ডাকত।

অমূল্য বলল, 'বাবু, এই দেখুন কত ফুল নিয়ে এসেছি।'

একবাশ লাল আব হলদে ডালিয়া আব দু'তিন ডজন বজনীগন্ধা। স্নিগ্ধ সবুজ মোটা মোটা ডাঁটা। তকণী তন্বী নাবীদেহেব উপমা মনে আসে। ইন্দুভূষণ উল্লাসে উৎসাহে সোজা হয়ে উঠলেন, 'কে এনেছে? কে? মিসেস বায় নিয়ে এলেন বুঝি?'

অমূল্য বলল, 'না বাবু। আমাদেবই ভুবন মালী দিয়ে গেল। টালীগঞ্জেব বাগানেব ফুল।'

ইন্দুভূষণ বাগে জ্বলে উঠলেন, 'দূব কবে দে, দূব কবে দে। হতভাগা মববাব আব জায়গা পেল না।'

অমূল্য বলল, বাবু, আপনাব জন্মদিন—

ইন্দুভূষণ বললেন, 'জন্মদিনে এখানে মবতে এসেছে কেন? সাবাদিন ওব আব সময় হয়ে ওঠেনি। এই সন্ধ্যেবেলায় ফুলেব ডালি নিয়ে এসেছে। ঘাড ধবে বেব কবে দে।' ক্রোধে আক্রোশে উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগলেন ইন্দুভূষণ।

অমূল্য শান্তভাবে বলল, 'সে নিজেই চলে গেছে বাবু। বলছিল সকালবেলায় তাব নাকি খুব দাস্তবমি হয়ে গেছে। তাই আসতে পাবেনি।'

ইন্দুভূষণ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সব মিথ্যুক। জোচ্চোব আব বদমাস। আমি কাবো কথায় বিশ্বাস কবি না। আব তুই হয়েছিস চোবেব সাক্ষী গাঁটকাটা।'

অমূল্য বাগ কবল না। সহানুভূতিব সুবে বলল, 'সত্যি বাবু, মিসেস বায় কেন যে আজ এলেন না বুঝতে পাবছি না। প্রত্যেকবাব আসেন— আমি যাব নিউ আলীপুবে, নাকি আপনি একটা ফোন কবে দেবেন?'

ইন্দুভূষণ ফেব চটে উঠলেন 'বেবিয়ে যা, দূব হয়ে যা। হতভাগা হাবামজাদা শূয়োব। ইয়ার্কি হচ্ছে আমাব সঙ্গে? নাই পেয়ে পেয়ে তুমি কাঁধে উঠতে চাইছ। নেড়া কুকুব?'

অমূল্য এবাব সবে গেল। বেশি বাগলে বাবু একেবাবে পাগল হয়ে যান। তখন ওঁকে বেঁধে বাখতে পাবলে ভালো হয়। কিন্তু কে বাঁধবে? হাত বাঁধো পা বাঁধো, মন বাঁধে কে?

ইন্দুভূষণ ইজিচেয়াবে আবাব ঠেস দিয়ে শুয়ে পডলেন। মুহূর্তেব মধ্যে ফেব শান্ত আব ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন। ভাবি শীত লাগছে। এ বছবে হঠাৎ বেশি শীত পড়ে গেছে, নাকি এ শীত শুধু একা তাঁবই? পঁচাত্তব বছবেব শীত সব এসে এক জায়গায় জমেছে, তাঁব বুড়ো জীর্ণ হাড ক'খানায় ঠকঠক বাজনা শুনতে চায় নাকি? কোটেব ওপবে শালখানা গায়ে জডিয়ে নিলেন ইন্দুভূষণ। এই শাল মিসেস বায়—অনুপমা বায়-ই তাঁকে এক জন্মদিনে উপহাব দিয়েছিলেন। কিন্তু এবাবেব জন্মদিনে সে আব এল না, কোন উপহাবও পাঠালো না। মাত্র দিন পনেবো আগে তাকে কডা কডা কথা বলে অপমান কবেছিলেন ইন্দুভূষণ। কিন্তু আশা কবেছিলেন তা সে মনে বাখবে না, অন্তত তাঁব জন্মদিনটিতে সে কথা সে ভুলে যাবে। আগেও তো তাঁদেব মধ্যে কত ঝগডাঝাঁটি কত ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। কিন্তু জন্মদিনে অনু না ডাকতেই এসেছে। কোন কাবণে না আসতে পাবলে, কি কলকাতাব বাইবে থাকলে সেখান থেকে চিঠি কি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে। কোনবাব কলম, ফুলদানি,

সিগাবেট কেস, ডাযেবি, উপন্যাস লেখাব জন্যে বাঁধানো খাতা, নিজেব হাতে বোনা জাম্পাব,—অনুপমা তাঁকে না দিযেছে এমন বস্তু নেই । অনুপমা নেযনি এমন বস্তুই কি আছে ? তাব জন্যে ইন্দুভূষণ দাম্পত্য-জীবনেব সমস্ত শান্তি নষ্ট কবেছেন, নিজেব ছেলেব কাছে অশ্রদ্ধাভাজন হযেছেন,পুত্রবধূ আব নাতনীব শ্রদ্ধা হাবিযেছেন । ঈর্ষাব বিষে আব যক্ষ্মাবোগে স্ত্রীকে তিলে তিলে মবতে দিযেছেন । অভিনেত্রী অনুপমাব জন্যে ইন্দুভূষণেব ত্যাগও কি কম ?

স্বামীত্যাগিনী এই নাবীটিকে তিনি প্রথমে দেখেছিলেন নিজেবই নাটকেব নাযিকাব ভূমিকায । বঙ্গজগতে তখন অনুপমা স্থাযী আসন কবে নিযেছে । তাব নাম শুনে নাট্যবসিকদের ভীড বাডে, থিযেটাব-সিনেমাব পবিচালকদেব কাছে তাব প্রতিপত্তি সীমাহীন । তবু বিবোধেব ভিতব দিযেই ইন্দুভূষণেব সঙ্গে তাব পবিচয হযেছিল । তাঁব 'অঙ্গনা' নাটকেব মহডা দেখতে গিযে তিনি তাব মুখেব ওপবই বলে দিযেছিলেন, 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমাব নাটকখানা পৌবাণিকও নয, ঐতিহাসিক নয—সামাজিক । নিতান্তই ঘবোযা চিত্র । তাই তাব চবিত্রগুলি ধীবে সুস্থে কথা বলে, স্বাভাবিকভাবে হাঁটে চলে । আমাব বইতে বীবাঙ্গনা লক্ষ্মীবাইদেব কোন স্কোপ নেই ।'

এই কডা সমালোচনায় অনুপমাব মুখ ক্রোধে অপমানে লাল হযে উঠেছিল । কিন্তু সেই ক্রোধকে শুধু মুখেব বর্ণ পবিবর্তন ছাডা ভাষায কি আচবণে ফুটে উঠতে সে কিছুতেই দেযনি । ববং একটু বাদে বঙমাখা ঠোঁটকে মধুব মৃদুহাসিব বঞ্জনে আবও নযনাভিবাম কবে ম্যানেজাবেব দিকে তাকিযে বলেছিল, 'ইন্দুবাবু বুঝি মেযেদেব মধ্যে শুধু গৃহলক্ষ্মীকেই দেখেছেন ? আমাদেব গৃহও নেই আব লক্ষ্মীও নই । আমবা যা, আমবা শুধু তাই-ই । কিন্তু ম্যানেজাববাবু, উনি যেন এসব চিন্তাভাবনা না কবেন । অডিযেনস কী চায আমি জানি । ইন্দুবাবু তাঁব মক্কেলদেব দেখুন । আমাব মক্কেল নিযে তাঁব মাথা ঘামাবাব দবকাব নেই ।'

ইন্দুভূষণ অভিনেত্রীব স্পর্ধায ক্রুদ্ধ হযেছিলেন, বিস্মিত হযেছিলেন, নিজেব কাছে নিজে স্বীকাব না কবলে হবে কি, মুগ্ধও হযেছিলেন । তখন তাঁব বযস পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই কবছে । জোবে বইছে উনপঞ্চাশী হাওযা । অনুপমাও অবশ্য তরুণী নয । সেও তিবিশ পাব হযেছে । বেশভূষায চালচলনে যদিও তাব কোন প্রকাশ নেই । থিযেটাবেব কর্তাবা বাইশ তেইশ কি বডজোব পচিশ—তাব ঊর্ধ্বে তাকে উঠতে দেন না । মঞ্চে নামান অষ্টাদশীব ভূমিকায । তাব তন্বী চেহাবায সবই মানিযে যায ।

বিহার্সেল-রুমে সেই যে বাকযুদ্ধেব মহডা শুরু হযেছিল তাব জেব চলেছিল আবও পাঁচ বছব ধবে । অনুপমা সহজে ধবা দেযনি । ইন্দুভূষণেব নাটকেব নাযক আব উপনাযককে সে অপক্ষপাতে অনুগ্রহ বিলিযেছে কিন্তু লেখকেব সঙ্গে তাব চলেছে শুধু ছলা কলা আব কৌশলেব অস্ত্রপবীক্ষা । কে হাবে কে জেতে । ভাষা-শিল্পী না ভঙ্গি-শিল্পী । শেষ পর্যন্ত ইন্দুভূষণই হাব মেনেছেন । ভঙ্গিব কাছে তাঁব পবাজয তো এই নতুন নয । ঠোঁটেব ভঙ্গি, চোখেব ভঙ্গি, ভ্রূ বাঁকাবাব ভঙ্গি, বেণী দোলাবাব ভঙ্গি—প্রত্যেকটি ভঙ্গিব কাছে তিনি আত্মসমর্পণ কবেছেন । সাহিত্যেও তাই । ভাষা-ভঙ্গিব কাছে তিনি বিষযকে উৎসর্গ কবেছেন । তিনি সাবাজীবন বলে এসেছেন ভেবে এসেছেন—'বিষয । বিষয আবাব কি ? আমি ভাষাব আধাবে যা ধবে দেব তাইতো বিষয । আমাব হাতে ধূলিমুঠি সোনামুঠি হবে । আমি দিনকে রাত কবব, বাতকে দিন । আমি নতুন পৃথিবী গডব । তাব আলাদা নিযম, আলাদা নীতি, আলাদা মূল্যবোধ । আমি কি কেবল চিরাচবিতেব ওপব শুধু দাগা বুলাবাব জন্যে জন্মেছি ?'

ভঙ্গিমাব মহিমাকেই সর্বপ্রধান বলে মেনে নিযেছিলেন ইন্দুভূষণ । একবার এক সাহিত্য-সভায সদম্ভে বলেছিলেন, 'বিষয বিষযী লোকেব জন্যে । সাহিত্যে যাবা পাটেব কাববারী, আলকাতবাব [illegible] বিষয় খোঁজে, সাহিত্যেও বিষয় খোঁজে । কিন্তু সত্যিকারেব শিল্পী বিষযেব সন্ধান কবেন না সত্যিকারের বসিক পাঠক বিষযেব হাত থেকে মুক্তি চান । রূপই শুধু তাঁকে সেই বাঞ্ছিত মুক্তি এনে দেয় । রূপলোক মানেই রসলোক । সেই রূপেব স্পর্শে ধুলো সোনা হযে যায । আব সেই রূপের জাদু না জানা থাকলে সোনা শুধু রূপা নয়, কাঁসা-পিতলেব দলে গিযে জাত হাবায । শিল্পে রূপ মানে শুধু নিষ্প্রাণ জীবের অবয়ব নয়. তাঁর প্রতিটি অক্ষবে প্রতিটি

আঁচড়ে প্রাণ-স্পন্দন, রসের স্রোতস্বতী। শিল্পে রূপ মানে আত্মার রূপ। আমাকে দেহবাদী বলে ভুল করবেন না, আমি দেহাত্মবাদী। দেহই আত্মা নয়, দেহও আত্মা।'

ভঙ্গির কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, সাহিত্যে আর জীবনে, একই ভাবে একই সঙ্গে। আজ সেই তনুশ্রী পুরনো জরাজীর্ণ। কিন্তু তাই বলে রূপচর্চায় সেদিন যে আনন্দ পেয়েছিলেন সে কথা অস্বীকার করলে পরম অকৃতজ্ঞতা হবে। যৌবন ক্ষণস্থায়ী বলে কি তার গৌরব কম ? বসন্ত বারমাস থাকে না বলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লাভ কি ?

চিরকাল রূপের আকর্ষণ তাঁকে টেনেছে। সেই রূপ শুধু শিল্পের রূপ নয়, নারীর রূপ নয়—অর্থের রূপ, যশের রূপ, পৃথিবীর সমস্ত রকমের ভোগসম্ভোগের রূপ।

সহপাঠী বন্ধু সোমেশ্বর সেনকে ওকালতিতে উন্নতি করতে দেখে ইন্দুভূষণও উঠে পড়ে লাগলেন। তিনিও ভালো উকিল হবেন। সোমেশের মতো বাড়ি গাড়ি করবেন। কলমকে যদি লক্ষ্মীর দাসত্বে লাগিয়ে দেন, তা ভোঁতা হতে দেরি হবে না। তার চেয়ে উকিলের মুখ থাকুক লক্ষ্মীর স্তবগানের জন্যে আর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কলমের মুখ সরস্বতীর।

সোমেশ্বর হেসে বলেছিল, 'পারবে কি ভাই ? Law is a jealous mistress.'

ইন্দুভূষণ জবাব দিয়েছিলেন, 'সতীনদের সামলাবার কৌশল আমি জানি।'

যৌবনের সেই আত্মপ্রত্যয়কে এই বুড়োবয়সে নিতান্তই মূঢ় দম্ভ বলে মনে হয়েছে ইন্দুভূষণের। পারা যায় না, তা পারা যায় না। Jealous mistress কি শুধু Law? সব সব। Law, literature, love, life itself with its innumerable ever-increasing cravings. প্রত্যেকেই এক একটি অসীম অসূয়াবতী উপপত্নী। সেই সপত্নীদের কলহ মেটাতে মেটাতে সারা জীবন কাটিয়ে দিলেন ইন্দুভূষণ। আজ সব মিটেছে তবু সাধ মেটে কই।

কিন্তু নিষ্ঠাহীন ইন্দুভূষণই না হয় ব্যর্থ হয়েছেন, সাধনা ছিল না বলে সিদ্ধিও হয়নি, কিন্তু যাঁরা সাধনা করেছেন, যাঁরা শুধু সাহিত্য নিয়েই পড়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই তো পথ থেকে সরে গেছেন। ইন্দুভূষণের মতো তাঁরাও আজ অশ্রুতনামা, বিস্মৃতকীর্তি। কেউ নিষ্ঠার অভাবে যায়, কেউ শক্তির অভাবে যায়। যেতে হয় সবাইকেই। শুধু দু'একজন থাকেন। তাঁরা দশকে দশকে আসেন না। প্রতি শতাব্দীতেও নয়। তাই আয়ুর ক্ষীণতা নিয়ে ক্ষোভ করে লাভ নেই। তবু আশ্চর্য, এই নশ্বর মরজগতে মানুষের অমর হবার সাধের অন্ত নেই। সে নিজের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রের মধ্যে অমর হয়ে বেঁচে থাকতে চায়, সে নিজের মানসসৃষ্টির মধ্যে অমরত্ব খোঁজে। ভুলে যায় অমরত্ব সীমাহীন কালে নয়, অত্যন্ত সসীম সাধনাঘন কয়েকটি মাহেন্দ্রক্ষণের মধ্যে। তোমার সমগ্রজীবনকে যদি সেই একটি ক্ষণে আবদ্ধ করতে পার, একটি সাধনায় নিবদ্ধ রাখতে পার, আর যদি সেই সাধনা তোমাকে অমৃতের স্বাদ এনে দেয় তাহলে তুমি বেঁচে রইলে। তারপর তুমি জীবিত কি মৃত সে তথ্য তোমার কাছে অর্থহীন। কিন্তু তেমন সাধনা তো করতে পারেননি ইন্দুভূষণ। তাঁর ক্ষোভ সিদ্ধি হল না বলে নয়, সাধনা হল না বলে।

—ক্রীং ক্রীং ক্রীং··

পাশের ঘরে টেলিফোনটা বেজে উঠেছে। ইন্দুভূষণ খুশি হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। ফোন তো নয় যেন সেতারের তারে ঝঙ্কার লেগেছে। হেঁটে নয় প্রায় ছুটে গেলেন ইন্দুভূষণ। এতক্ষণে মনে পড়েছে মান ভেঙেছে অভিমানিনীর।

পরম আদরে রিসিভারটা তুলে নিলেন ইন্দুভূষণ, মাউথ-পীস্‌টা মুখের কাছে নিয়ে কোমল স্নিগ্ধস্বরে বললেন, 'অনু, এতক্ষণে মনে পড়ল তোমার ? কাকে চাই ? রামেশ্বর তেওয়ারীকে ? No, no, no, it is wrong number. আমি কে ? তা নিয়ে মাথা ঘামাবার তো দরকার নেই আপনার। I am nobody.'

বিরক্ত হয়ে সশব্দে রিসিভারটা নামিয়ে রাখলেন ইন্দুভূষণ। আশ্চর্য, এই স্বয়ংক্রিয়তার যুগেও দুষ্কৃতির শেষ নেই। সকালের দিকে আরো একটা wrong call এসেছিল। সব ভুল ঠিকানা। তাঁকে আজ আর ডাকবার কেউ নেই, খোঁজবার কেউ নেই। অথচ এমন একদিন ছিল, শুধু জন্মদিন কেন, অন্যদিনও তাঁর টেলিফোনটার ঝঙ্কারের বিরাম ছিল না। পাবলিশারের দোকান থেকে ফোন,

থিয়েটার থেকে ফোন, অগণিত বন্ধু-বান্ধবীর, পাঠক-পাঠিকার কণ্ঠস্বর। সেই কোরাস আজ একেবারে থেমে গেছে। ইন্দুভূষণ এ-যুগের পাঠকদের কাছে মৃত, বিস্মৃত। গত পনেরো বছর ধরে তিনি প্রায় কিছুই লেখেননি। যা লিখেছেন তা একান্তই অকিঞ্চিৎকর, তার চেয়েও বড় কথা তা একেবারেই পাঠকদের মনে ধরেনি। তারও আগে থেকে তাঁর ক্রিটিকরা আর তরুণ লেখকরা, পাঠকরা সমস্বরে বলতে শুরু করেছিলেন তিনি ফুরিয়ে গেছেন। তাঁর আর কিছু দেবার নেই। 'নেই' 'নেই' এই রব একবার তুলে দিতে পারলেই হল। আছে কি না আছে যাচাই করে দেখবার ধৈর্য কার। কাল ইন্দুভূষণের লেখা পড়ে যারা খুশি হয়েছিল, তারা তাকে ভুলে গেছে। অকৃতজ্ঞ, পরম অকৃতজ্ঞ। তুমি আজ যদি কিছু দিতে না পার, কাল যে দিয়েছিলে সে কথা আর মনে রাখবে না। দানের গৌরব তোমাকে প্রতিদিন অর্জন করতে হবে। প্রতিদিন তোমার নিজেকে অতিক্রম যেতে হবে। নিজের সঙ্গেই তোমার প্রতিযোগিতা। তোমার পুরনো তুমির সঙ্গে তোমার নতুন তুমির, কালকের তুমির সঙ্গে আজকের তুমির। ইন্দুভূষণের মনে পড়ল তাঁর সামনে তাঁর সমসাময়িক অন্য কোন লেখকের প্রশংসা করলে তিনি ক্ষুণ্ণ হতেন; শুধু তাই নয়, তাঁর নতুন লেখার তুলনায় পুরনো লেখার প্রশস্তি করলে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। তাঁর পুরনো-লেখা যেন আর-একজন লেখকের লেখা। সে লেখক তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁর পরম শত্রু। আজ নতুন-পুরনো কোন লেখার কথাই কেউ বলে না। পঞ্চাশের ওপরে বই লিখেছেন ইন্দুভূষণ। ছোট বড় মাঝারি গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ—কিছুরই কোন উল্লেখ নেই। একটি ছেলে গেছে আর পঞ্চাশটি মানসপুত্র। কখন যে গেছে ইন্দুভূষণ অনেক সময় টেরই পাননি। যখন পেয়েছেন—জ্বলে উঠেছেন, পুড়ে মরেছেন। আজ আর বাইরে কোন দাহ নেই, সমস্ত অন্তর জুড়ে চিতাশয্যা পাতা। সেই মহাশ্মশানভূমিতে সৃষ্টির অঙ্কুরমাত্র নেই।

মনে আছে ছেলেবেলায় ঠাকুরমাকে প্রণাম করলে তিনি ফোগলা দাঁতে হেসে আশীর্বাদ করতেন, 'আমার মাথায় যত চুল তত বছর পরমায়ু হোক।'

দীর্ঘায়ু হবার যন্ত্রণা যে কত তা কি তিনি নিজেই জেনে যাননি? তবু আশীর্বাদ করতেন। দীর্ঘায়ুতার পথ মৃত্যুতে আকীর্ণ। আত্মীয়ের মৃত্যু, স্বজনের মৃত্যু, পুত্র-পৌত্রের সহস্র শোকাশ্রুতে সে পথ পিচ্ছিল। সবচেয়ে বড় শোক নিজের কীর্তির মৃত্যুতে। সবচেয়ে বড় শাপ নিজের যশের চেয়ে দীর্ঘায়ু হওয়া। তোমার সৃষ্টির চেয়ে তুমি মহৎ হতে চাও হও, কিন্তু দীর্ঘায়ু হয়ো না। নিজের আয়ুর সঙ্গে নিজের সৃষ্টির প্রতিযোগিতায় সৃষ্টিকে তুমি জয়ী হতে দাও। তুমি যে মহৎ সেও তোমার সৃষ্টির মধ্যে। তোমার বাক্যে, তোমার কর্মে। তুমি যদি জীবন-শিল্পী হও—তোমার জীবনই তোমার বাণী, কিন্তু তুমি যদি কথাশিল্পী হও—তোমার বাণীই তোমার জীবন।

মাঝে মাঝে ইন্দুভূষণের মনে হয় এত দীর্ঘজীবী না হয়ে একটি নিটোল সুন্দর ছোটগল্পের মতো শেষ হয়ে যেতে পারলে মন্দ ছিল না। যৌবনের আকস্মিক মৃত্যুতে ছোটগল্পের চমক আছে। সে মৃত্যু একটি ফুলের মতো একটি সুরভিত দীর্ঘশ্বাসের মতো। কিন্তু জরা তোমাকে অত সহজে মরতে দেবে না। সে ক্লান্তিকর বিরক্তিকর অনিপুণ লেখকের সুদীর্ঘ উপন্যাসের মতো। জরা তোমাকে ধীরে ধীরে সরিয়ে আনবে, একটি একটি করে তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অসাড় করবে, তোমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে তোমার সম্বন্ধে উদাসীন নিস্পৃহ করে তুলবে। দীর্ঘকাল তোমাকে জীবন্মৃত করে রাখবে, তারপর মৃত্যুর হাতে তুলে দেবে তোমাকে ছুঁড়ে আস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়ার জন্যে।

ইন্দুভূষণ আজকাল আর আয়নার সামনে দাঁড়ান না। দাঁড়াতে ভয় পান। জরা তাঁর সেই ছ'ফুট দেহকে কুঁকড়ে ভেঙে নিজের বিজয়ধনু করেছে। তাঁর সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণে মনের সাধে দু'হাতে কালি লেপেছে। তাঁর মসৃণ ত্বককে হাতের মুঠিতে নিয়ে কুঁচকেছে, কচলেছে। তাঁর দৃষ্টিকে খর্ব করেছে; শ্রুতিকে ক্ষীণ। দাঁতগুলি অনেক আগেই গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে পাথরের দাঁত পরে নিয়েছেন ইন্দুভূষণ। আর কিছু না পারুন, বিদ্রূপে ব্যঙ্গে যৌবনদর্পিত দুনিয়াকে ভেংচাতে তো পারবেন।

আজকালকার তরুণী মেয়েরা তাঁকে দেখলে ভয় পায়। সেবার অনুপমাও হেসে বলেছিল, 'তুমি

যে এত তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে যাবে তা ভাবিনি। নিজেকে একেবারে হরির লুটের মতো যাকে তাকে বিলিয়েছ। আমার সতীন রাক্ষুসীরা শাঁসটুকু নিয়ে আঁশ আর খোসাটুকু রেখেছে।'

শুনে খুশি হননি ইন্দুভূষণ, দারুণ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। একটু বাদে হেসেই জবাব দিয়েছিলেন, 'এই খোসার মধ্যে এখনো যা আছে অনেক শাঁসেও তা পাবে না।'

অনুপমা তার চেয়ে বছর পনেরোর ছোট। বয়স চুরি করে আরো বেশি ছোট সেজেছিল। ইন্দুভূষণ তাতে আপত্তি করেননি। নিজের বয়স আর পরের মন চুরি করবার জন্যেই তো মেয়েদের জন্ম। বুড়ো বলে খোঁটা দিতে-দিতেও অনুপমা তাঁকে সব দিয়েছে। তাঁর জন্যে ফিরিয়ে দিয়েছে অনেক স্বাস্থ্যবান যুবককে, ফিরিয়ে দিয়েছে তাঁর চেয়ে বহুগুণ ধনীকে মানীকে। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর সে প্রায় স্ত্রীর আসন নিয়েই রয়েছে। কতদিন বলেছে, 'তোমাকে কাছে রেখে যত্ন করতে পারি না। তুমি চলে এসো আমার এই নতুন বাড়িতে।'

ইন্দুভূষণ জবাব দিয়েছেন, 'মানে তোমার রক্ষিত করতে চাও।'

'ছিঃ, রক্ষক করতে চাই, এ কথাও তো বলতে পারতে।'

ইন্দুভূষণ বলেছিলেন, 'তা আর কী করে বলি। তোমার অনেক যশ, অনেক অর্থ। যৌবন যাই-যাই করলেও যুবকেরা যায়নি। এখনো তোমার আনাচে কানাচে তারা ঘুরঘুর করে। ড্রয়িংরুমে একবার এসে বসতে পারলে আর উঠতে চায় না।'

অনুপমা হেসে বলেছিল 'তুমি সেই হিংসাতেই গেলে। এত বয়স হল, তবু তোমার হিংসে গেল না?'

ইন্দুভূষণ জবাব দিয়েছিলেন 'তা কি আর যায়? শুনেছি ঈশ্বর নাকি ষড়ৈশ্বর্যময়। মানুষের ষড়রিপুর ঐশ্বর্য, তা শুধু চিতায় ছাই হয়, তার আগে অনির্বাণ অগ্নি।'

তারপর আস্তে আস্তে অনুপমাও ঈর্ষার যোগ্যতা হারিয়েছে। অতনু তার দিক থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অতনুর বোঝা তার পক্ষে এখন বহন করা কষ্ট। রক্তের চাপে আর মাংসের চাপে তার রক্তমাংসের ক্ষুধা সব গেছে। প্রথম কিছুদিন মা-মাসীর ভূমিকায় নেমেছিল, এখন পরিচালকরা ঠাকুরমা দিদিমা ছাড়া ডাকতে চায় না। অভিমানে অনুপমা একেবারে অবসর নিয়েছে। কি চিত্রে কি মঞ্চে কোথাও আর তার দেখা মেলে না। সে এখন আর পর্দার ওপরে নয়, পর্দার আড়ালে। তার অতিপ্রিয় দর্শকদের চোখের আড়ালে এবং মনের আড়ালে। 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়'। নটীও তাই। যৌবনে সে যত পটীয়সীই হোক বার্ধক্যে তারও সেই দশা। কিন্তু ইন্দুভূষণের তো তা হবার কথা ছিল না। লেখকের যৌবন তো শুধু দেহনির্ভর নয়। সহস্র অক্ষর তাঁর চিরদীপ্তি বহন করে। শুধু যৌবনকে জাগিয়ে রাখতে হয়, সঞ্জীবিত রাখতে হয়। সে বিদ্যা ইন্দুভূষণ ভুললেন কী করে? নারী সংসর্গে? না না। ওদের দোষ দেওয়া বৃথা। ওরা তাঁকে অনেক দিয়েছে। অনেক শ্রদ্ধা, অনেক ভক্তি, অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা, কত সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছে ওরা। তিনি যে ফিরিয়ে দিতে পারেননি সে তাঁরই দোষ। তিনি দিতে পারেননি আজ আয়ুর শেষে এসে মনে হচ্ছে নিতেও পারেননি।

হৃতশ্রী হবার পরেও অনুপমা তাঁকে অনেক দিয়েছে। মনে হয় তখনই সবচেয়ে বেশি দিয়েছে। সুহাসিনী বেঁচে থাকলেও বোধ হয় এমনি করেই দিত। এমনি করেই বলত, 'আমার রূপ নেই, যৌবন নেই, শুধু আমি আছি। তোমার যশ নেই গৌরব নেই, তবু তুমি আছ। এসো আমরা কাছাকাছি থাকি।' জরা সব নিতে পারে, কিন্তু সত্যিকারের শিল্পী তার হাত থেকে নিজের সৃষ্টিশক্তিকে কেড়ে রাখেন। জরা সব নেয় কিন্তু সত্যিকারের প্রেমিক তাঁর ভালোবাসবার শক্তিকে তার হাতে ছেড়ে দেন না।

ইন্দুভূষণ জানেন অনুপমার মনে বড় দুঃখ। স্বামীকে ছেড়ে আসবার জন্যে নয়, ছেলেকে ছেড়ে আসবার জন্যে। তার স্বামী ফের বিয়ে থা করে ছেলেমেয়ের বাপ হয়েছেন। কিন্তু অনুপমার ছেলে বড় হয়ে সব কথা জানতে পেরে বিদেশবাসী হয়েছে। মা আর মাতৃভূমি দুইই ছেড়ে গিয়েছে সে। বিদেশে সে জ্ঞানী হয়েছে, বিজ্ঞানী হয়েছে। তবু মাকে ক্ষমা করতে পারেনি। অনুপমার সম্পদ সে ছোঁয়নি, খ্যাতিকে তুচ্ছ করেছে। এই দুঃখই তার সবচেয়ে বড়। তার কোল জুড়ে আর কোন সন্তান

আসেনি, অনুপমাই আসতে দেয়নি। আজ সেই হাহাকার তার আর যেতে চায় না।

ইন্দুভূষণের মনে পড়ছে কত সন্ধ্যায়, কত গভীর রাত্রির অন্ধকারে দুজনে মুখোমুখি বসে কাটিয়েছেন। কখনো বন্ধ ঘরে, কখনো খোলা ছাদে আকাশের নিচে। মৃতপুত্রের বাপ আর হৃতপুত্রের মা, নষ্টগৌরব লেখক আর বিস্মৃতযশা নটী। মনে হয়েছে এমন করে যেন কোন নারীকেই তিনি আর পাননি। সব হারাবার পর তিনি এমন করে কারো কাছে আর যাননি, সব হারাবার পর এমন করে তাঁর কাছে কেউ আর আসেনি। প্রহরের পর প্রহর কখনো মুখোমুখি, কখনো পাশাপাশি শুধু চুপ করে বসে রয়েছেন। কথা নেই, হাসি নেই, চুম্বন নেই, আলিঙ্গন নেই। দুজনের মিলনের জন্যে ওসবের প্রয়োজনই কি আর আছে?

তবু এই অনুপমাকেই সেদিন বড় কটুভাষায় অপমান করে এসেছেন ইন্দুভূষণ। কিছুদিন হল এক তরুণ চতুর সুদর্শন অভিনেতা ওকে বশ করে ফেলেছে। অনুপমা আজ দিলীপ বলতে অজ্ঞান। এত অনুরাগ যে তিনখানা বাড়ি আর পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সের জন্যে তা অনুপমা কিছুতেই বুঝতে চায় না।

অনুপমা হেসে বলে, 'তা নেয় যদি নিক। তুমি তো আর ওসব চাও না।'

ইন্দুভূষণ তা মোটেই চান না। কিন্তু ওই ছোকরা চালিয়াত ছেলেটা কেন সব নেবে? ও কোন্ যোগ্যতায় সব অধিকার করতে চায়? এই কি ওর ভালোবাসা? এত দিন প্রেমের বেসাতি করেও আসল আর নকলেব ভেদ বুঝতে পাবল না অনুপমা?

এ কথায় সে জবাব দিয়েছিল, 'কী করে বুঝব বল? ও জিনিস তো আমি আর পাইনি। তা ছাড়া আমি সারাজীবন অভিনয় করেছি, জীবনের বাকি ক'টা দিন না হয় আব একজনের অভিনয় দেখতে দেখতে, আর একজনের মা সাজতে সাজতেই মরলাম।'

ইন্দুভূষণ ঈর্ষায় জ্বলে উঠেছিলেন, 'ন্যাকামি কোরো না। তুমি ওর রূপ-যৌবনকে ভালোবেসেছ। তোমার যে কুৎসিত মাংসের স্তূপকে আজ কেউ ছোঁয় না, তোমার সম্পত্তির লোভে—' কথা শেষ করতে পারেননি ইন্দুভূষণ, তার আগেই পায়ের জুতো ছুঁড়ে তাঁর মুখ বন্ধ কবে দিয়েছিল অনুপমা। তাবপর আর ইন্দুভূষণ ওমুখো হননি।

মনে মনে ভেবেছেন, অপরাধ যে ওরই বেশি অনুপমা তা বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে নিজেই যেচে আসবে। কিন্তু অনুপমা আসেনি। এমন ঝগড়াঝাঁটি তো আজ নতুন নয়। দুই শিল্পীর জীবনযাত্রা যে সদাসর্বদাই শিল্প-সম্মত ছিল তা তো আর বলা যায় না। এর আগেও তো কত কাঁচের গ্লাস, তামাকের পাইপ, ছাইদানি আর ছড়ি দুজনের মধ্যে ছোঁড়াছুঁড়ি হয়েছে। তাতে কি সম্পর্ক একেবারে ছিঁড়ে গেছে? জন্মদিনে উপহারের ডালি নিয়ে অনুপমা প্রতিবার এসেছে।

ইন্দুভূষণের জন্মদিন দ'বার খুব ঘটা করে দেশবাসীরা পালন করেছিল। একবার সিনেট হলে, আর একবার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। কত লোকজন, বক্তৃতা, মানপত্র, ফুলের মালা, হাততালি। সেই সমারোহের দিনে অনুপমা যায়নি। হয়তো লজ্জা পেয়েছে। ইন্দুভূষণ নিজেও সঙ্কোচবোধ করেছেন। ডাকতে পারেননি তাকে। তারপবও কতবার এই ভবানীপুরের বাড়িতে ইন্দুভূষণের জন্মদিনে জনসমাগম হয়েছে। অনুরাগী বন্ধুদের নিয়ে পান ভোজন আর শিল্প-সাহিত্যের আলোচনা করেছেন ইন্দুভূষণ। কোনবার কেউ বা তাঁর নতুন গল্প শুনবার দাবি করেছে, কেউ বা উপন্যাসের অংশ। তখনো অনুপমা দূর থেকে নৈবেদ্য পাঠিয়েছে, সামনে এসে দাঁড়ায়নি। তারপর আরো দুর্দিন এসেছে। ইন্দুভূষণ শুনতে পেয়েছেন, যারা সামনে সুখ্যাতি করে তারাই আড়ালের নিন্দুক। তিনিও শোধ নিয়েছেন। সেই অকৃতজ্ঞ অবিশ্বাসী বন্ধুদের মুখের সামনে দোর বন্ধ করে দিয়ে বলেছেন, 'তোমরা আর এসো না। এরপর আমার জন্মদিন আমার মৃত্যুর পরে হবে।' মনে মনে ভেবেছেন, "সেদিন যত বছর পরেই আসুক, অন্তত একজন সত্যিকারের গুণগ্রাহী পাঠক সেদিন আমাকে নতুন করে আবিষ্কার করবে, নিজের ঘরে বসে আমাকে নিয়ে অন্তত আমার একটি রচনাকে 'বেছে নিয়ে আমার জন্মবাসর যাপন করবে সে। সেদিন যে মাসের যে তারিখেই হোক কিছু এসে যায় না। সেই আমার একমাত্র জন্মদিন। আজ যারা আমাকে মৃত বলে জেনেছে তারা আমাকে অজ্ঞাত বলেই জেনে যাক।'

নিজের হাতে সব ব্যবস্থা বন্ধ করেছিলেন ইন্দুভূষণ, সব আয়োজন ভেঙে দিয়েছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে সবাই আসা বন্ধ করে দিয়েছে। তবু যারা দু'একজন আসতে চেষ্টা করত, ইন্দুভূষণ তাদেরও বাধা দিতেন। সহজে যেতে না চাইলে কটুভাষায় তাদের অপমান করতেন। আজকাল তাই কেউ আর আসে না।

শুধু একজন এখনো আসে। সে কোন বাধা মানেনি, কোন নিষেধ শোনেনি। সে ইন্দুভূষণের জীবনেব শেষ অভিসারিকা।

আজ সকাল থেকে মনে মনে সারাদিন তারই প্রতীক্ষা করেছেন ইন্দুভূষণ। চাকরের কাছে ধরা দেননি, তার মনিবের কাছেও কথাটা বার বার অস্বীকার করেছেন। বার বার বলেছেন, 'না না, তাকে চাইনে, চাইনে। তাকে আর ডাকবনা, কক্ষনো ডাকবনা। নিউ আলীপুর থেকে ভবানীপুর যখন তার কাছে সাতসমুদ্রের পার হয়ে পড়েছে তখন তাকে দিয়ে আমারও আর কোন দবকার নাই। সবাইকে বাদ দিয়ে যখন আমি চলতে পারছি, তাকে বাদ দিয়েও পারব।'

সারা বাড়িটা নিস্তব্ধ। কোথাও জনমানব নেই। একতলাব ঘরে চাকর আর ড্রাইভার তার বন্ধুদের জুটিয়ে এনে দোব বন্ধ করে বোধ হয় তাস পিটছে।

দেয়ালে টাঙানো ছোট হাতঘড়িটারদিকে তাকালেন ইন্দুভূষণ। দূর থেকে কাঁটা দেখা যায় না। কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখলেন। রাত আটটা। সারা বাড়িতে বড় ঘড়ি কি টাইমপিস টেবিলঘড়ি রাখতে দেননি ইন্দুভূষণ। ঘড়িব টিকটিক শব্দ তাঁর কাছে অসহ্য। সে যেন প্রতিমুহূর্তে বলে, 'আমি আছি কিন্তু তুমি আর নেই। তুমি আব থাকবে না।'

ঘড়িব শব্দে ঘম ভেঙে যায় ইন্দুভূষণের, ফের আব ঘুম আসে না। ঘড়ি তাঁকেও কালের প্রহরী কবে বাখে।

তাই বড ঘড়ি তিনি দূর কবে দিয়েছেন।

কিন্তু ছোট ঘড়িও ঠিক সময দেয়। রাত আটটা বাজল। এরপব আর কখন সে আসবে?

একখানা চিঠি নয়, একটা ফোন নয়, কাউকে দিয়ে একটি খবর পর্যন্ত পাঠালো না অনুপমা। তবে কি দিলীপ সিকদাব আজও ওকে নিযে কোথাও বেরিয়েছে? না না, তা হতে পাবে না। অত অকৃতজ্ঞ হতে পাবে না অনুপমা। অন্তত আজকের দিনে পাবে না। আজ যে তাঁর জন্মদিন। এইদিন কতবাব নতুন কবে তাঁদেব বন্ধুত্বেব জন্ম হয়েছে। সেসব কি অনুপমা একেবারে ভুলে গেছে?

বেশ, ভুলে গিয়ে থাকলে ইন্দুভূষণ তাকে ফেব মনে করিযে দেবেন। যাকে ভালোবাস তাকে শুধু মনে কবলেই চলে না, বাব বার মনে করিয়েও দিতে হয়। সে দেওয়া আবো কঠিন। সে দেওয়া নিজেব অহংকাবকে অভিমানকে ধবে দেওয়া।

তুমি আসবে না, বেশ আমিই যাব। একটা ফোন করে জানিযে যাওয়া ভালো।

চোরের মতো চুপিচুপি ইন্দুভূষণ পাশের ঘবে গিয়ে আলো জ্বাললেন। ডায়াল ঘুবিয়ে ছ'টা ডিজিটের নির্ভুল নম্বব নিয়ে রিসিভারটা তুলে ধবলেন ইন্দুভূষণ। মধুব নিক্কণে ও-বাড়ির ঘড়িতে আটটা বাজল। 'অনুপমা, তোমার ঘড়িটাকে অত স্লো করে বেখেছ কেন। তোমার সবই কি বিলম্বিত লয়ে? কিন্তু অত বিলম্ব আমার যে সয় না।'

কী ব্যাপার? এত গোলমাল এত হৈ-চৈ কিসের ও-বাড়িতে? 'হ্যালো, অনু, অনুপমা। আমি অনুপমাকে চাই, মিসেস রায়কে চাই। তিনি আর নেই? সেকি! কোথায় গেছেন? মারা গেছেন? হার্ট ফেইল করে? সেকি! কখন? কখন? সাড়ে সাতটায়। আমাকে একটা খবর পর্যন্ত কেউ দিতে পারলেন না? আমি কে? তাই তো আমি আজ কে? তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবেন না। I am now nobody.'

আস্তে আস্তে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন ইন্দুভূষণ। ফিরে গেলেন বড ঘরে, চেয়ারে বসলেন। গা এলিয়ে দিলেন না। শক্ত হয়ে সোজা হয়ে মেরুদণ্ড খাড়া করে বসলেন। আশ্চর্য, আজকের দিনে এ-মৃত্যু তিনি আশঙ্কা করেননি। থ্রম্বসিসের রোগীর কাছ থেকেও নয়। এত মৃত্যু দেখেছেন, এত মৃত্যু সয়েছেন, তবু মৃত্যু অপ্রত্যাশিত, তবু মৃত্যুর কথা মনে রাখতে পারেননি। জন্মদিনে মৃত্যুকে কে

মনে বাখে ? কোনদিনই বাখে কি ?

আশ্চর্য, অনুপমা তাঁকে একটা খবব পর্যন্ত দিল না। সময পাযনি ? না, মন থেকে সায পাযনি ? না কি, যখন সায পেযেছে তখন আব কথা খুঁজে পাযনি। যাই হোক, এখন আব কিছুতেই কিছু এসে যায না। এই মুহূর্তে সবই মিথ্যা। তাব মৃত্যুই একমাত্র সত্য।

শুধু এক মৃত্যু নয, বসে বসে জীবনেব সমস্ত মৃত্যুকে স্মবণ কবতে লাগলেন ইন্দুভূষণ। স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয-স্বজন, খ্যাতি-কীর্তিব মৃত্যু, জীবনভবা ভুলভ্রান্তি ত্রুটি-বিচ্যুতি, ক্ষযক্ষতি —এই জন্মদিনে আজ সব-কিছুব তর্পণ হোক। আশ্চর্য, আজ স্ত্রীব কথা, স্ত্রীব মুখ বাব বাব কবে মনে পডতে লাগল ইন্দুভূষণেব। তাকেও যে তিনি ভালোবেসেছিলেন এ-কথা আজ কাউকে বিশ্বাস কবানো শক্ত। একই হৃদয অনেককে দিযেছেন, তাদেব দুজনকেও।

একটু বাদে নীচেব ঘব থেকে অমূল্য উঠে এল। তাস খেলেনি, বাবুব জন্যে মালা গেঁথে নিযে এসেছে। বজনীগন্ধাব মালা। এমন দিনে বাবু কিছুই পববেন না ? শোকে তাপে বাবুব মাথা খারাপ হযে গেছে। যতই বাগ করুন, অমূল্যকে তিনি ভিতবে ভিতবে খুব ভালোবাসেন।

কিন্তু একি ' বাবু মহাদেবেব মতো অমন ধ্যানাসনে বসে বযেছেন কেন ?

এমন তো কোনদিন বসেন না।

'কী হযেছে বাবু, কী হযেছে ? আজকেব দিনে—ছি ছি—'

ইন্দুভূষণ কোন জবাব দিলেন না।

ফুলেব মালাটা নিযে অমূল্য আব এগোতে পাবল না। তাব আব দবকাবও ছিল না। এবাবকাব জন্মদিনে ইন্দুভূষণ আব একটি নতুন মালা পবে বসে আছেন। দু'গাল বেযে অশ্রুব বিন্দু ফোঁটায ফোঁটায ঝবে পডছে। আব বিদ্যুতেব দীপ্তিতে সেই জলবিন্দুগুলি এক একটি মুক্তাব বিন্দু হযে ফুটে উঠেছে।

ফাল্গুন ১৩৬৫

একটি বিনিদ্র রজনী

মাসখানেক ধবে বাণ্ডিলটা আমাব কাছে পড়ে ছিল। বেলকর্মী বিক্রিযেশন ক্লাবেব সম্পাদক মাঝে মাঝে ফোন কবেন, মাঝে মাঝে পোস্টকার্ডে পত্রাঘাত 'লেখাগুলি কি দেখছেন ? ফাংশনেব দিন ঠিক হযে গেছে। এবাব কম্পিটিশনেব বেজাল্টটা জানতে না পাবলে আমাদেব বড অসুবিধেয পডতে হবে।'

অসুবিধা আমাবও কম নয। ছোট বড খান পঁচিশেক খাতা ভদ্রলোক আমাকে গছিযে দিযে গেছেন। পঁচিশজনেব এই সাহিত্য প্রযাসেব ভিতব থেকে তিনটি বচনা আমাকে বেছে বেব কবতে হবে। স্থিব কবতে হবে কে প্রথম কে দ্বিতীয, কাবই বা তৃতীয স্থান।

শুরুতেই আমি সেক্রেটাবীকে হাত জোড কবে বলেছিলাম, 'আমাকে বেহাই দিন। বাছাই করবার ক্ষমতা যদি থাকবে তাহলে কাগজেব সম্পাদক হতাম, দুরু দুরু বুক নিযে পাঠক আব সমালোচকদেব মুখেব দিকে তাকিযে থাকতাম না।'

কিন্তু সেক্রেটাবী বেহাই দেননি। বলেছেন, 'দিন না একটু কষ্ট কবে দেখে। সবাই খুশি হবে।' তাবপব গলা নামিয়ে বলেছেন, 'সব লেখা আপনাব আগাগোড়া না পড়লেও চলবে। প্রথম দুটি

একটি পাতা, এমন কি দু একটা প্যারাগ্রাফ পড়লেই তো বুঝতে পারবেন—।'

'রাঁধুনীরা যেমন দু একটা ভাত টিপে এক হাঁড়ি ভাতের কথা বলে দেয়। কিন্তু আমি তো তেমন রাঁধুনী নই।' অনুনয় বিনয়ে কোন কাজই হয়নি। মোটা সুতো দিয়ে বাঁধা একরাশ খাতা ভদ্রলোক আমার টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে বিদায় নিয়েছেন।

তারপর ফোন আর চিঠি। শেষ পর্যন্ত বাইশ তেইশ বছরের এক যুবক এসে বলল, 'কাল আমাদের ফাংশন। লেখাগুলি নিতে এসেছি।'

আমি একটু মাথা চুলকে বললাম, 'তাই তো কাজকর্মের এত চাপ—। আমি যে কিছুই করে উঠতে পারিনি।' ভেবেছিলাম রাগ করে ছেলেটি খাতাগুলি নিয়ে যাবে। কিন্তু তা করল না। বললে, 'বেশ তাহলে আজ দেখে রাখুন। কাল সকালে এসে নিয়ে যাব।'

আমি অসহায়ের মত বললাম, 'এত তাড়াতাড়ি কি করে হবে।' ছেলেটি একটু চিন্তা করে বলল, 'আচ্ছা সকালে না হোক ফাংশনের ঘণ্টা দুই আগে পেলেই আমাদের চলবে। না হয় আর একটু সময় আপনি নেবেন। আপনি না যাওয়া পর্যন্ত তো সভা আরম্ভ হবে না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কি, আমি আবার কোথায় যাব।'

ছেলেটি চোখ বড় করে বলল, 'কেন আমাদের ক্লাবে। না না, তা হয় না এখন আর আপনি না করতে পারেন না। আমরা অ্যানাউন্স করে দিয়েছি। না গেলে আমাদের মান মর্যাদা কিছু থাকবে না। আপনি তো অনেকদিন আগেই আমাদের সেক্রেটারীকে কথা দিয়েছিলেন।'

মনে মনে ভাবলাম কথা দিয়েছিলাম, কিন্তু ফিরিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও কম করিনি। ভেবেছিলাম রচনাগুলি তাড়াতাড়ি দেখে দিলে সভায় উপস্থিত থাকবার দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাব। কিন্তু সব ব্যাপারেই বড় দেরি হয়ে গেছে। তাছাড়া যেখানে ক্লাবের মান মর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন—। ছেলেটির উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আর অন্য কথা বলতে সাহস পেলাম না।

তাকে বিদায় দিয়ে ভালো ছেলের মত পেনসিল হাতে প্রতিযোগিতার খাতাগুলি নিয়ে বসলাম।

রচনার বিষয় 'একটি বিনিদ্র রজনী'।

প্রত্যেকেই নিজের জীবনের একটি করে রাত জাগার কাহিনী লিখেছেন। সবই উত্তম পুরুষে। বেশির ভাগই দেখলাম আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুর প্রসঙ্গ। কারো বা বন্ধু। মৃত্যুশয্যায় উদ্বেগ ভয় আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনায় রাত্রিযাপনের কাহিনী। একজন লিখেছেন বাল্যস্মৃতির কথা। সবান্ধবে গ্রামান্তরে গিয়ে যাত্রার আসরে নেমে রাত ভোর করে বাড়িতে ফিরে এসে অভিভাবকের হাতে কানমলা খাওয়ার বিবরণ। কাল সেই লাঞ্ছনার উপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিয়েছে। যাত্রার আসরে দুজন যোদ্ধার দুখানি শাণিত তরবারিই লেখকের মনে বেশি উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে বলে বোধ হল। একজন লিখেছেন জীবিকার দায়ে রাত্রি জাগরণের বিবরণ। এক সহকর্মীর সঙ্গে ইঞ্জিনে কয়লা জোগাতে জোগাতে এক নয় এমন শত শত বিনিদ্র রাতই তাঁর কাটাতে হয়েছে, কাটাতে হবে, কিন্তু সবগুলি রাত্রির বিবরণ তো আর লেখা যায় না।

ভাবলাম তাতো ঠিকই। অত কাগজ কোথায়, তাছাড়া যারা রোজ সারারাত জাগে তারা কি দিনে লিখবে না ঘুমোবে।

বিষয়বস্তুর দিক থেকে লেখাটি নতুন ধরনের। কিন্তু ভাষা কাঁচা, পদে পদে বর্ণাশুদ্ধি এবং ব্যাকারণবিচ্যুতি। আমি দ্বিধায় দুলতে লাগলাম একে প্রধান গৌরবের আসন দেব কি দেব না।

তারপর আরো কয়েকটি রচনা চোখে পড়ল। একজন লিখেছেন তাঁর ফুলশয্যার রাতের কথা। প্রথম রাত্রিতে কিশোরী নববধূর লজ্জা ভাঙাতে পারেননি। একেবারে শেষ রাত্রে ছিল লগ্ন। আলাপের সুযোগই হয়নি। তা ছাড়া চারদিকে আড়ি পেতে ছিলেন কনের দিদি বউদি ঠানদিদের দল। বাসি বিয়েতে দিন আছে কিন্তু রাত নেই। রাত্রে দেখাসাক্ষাত নিষেধ। তৃতীয় দিন ভোর না হতে হতেই লেখকের আসন্ন রাত্রির কথা মনে পড়ছে। কিন্তু ভোরের পরেই তো রাত আসে না। একটি বিরহরজনী কাটাবার পরেও রোদ আস্তে আস্তে ওঠে। বেলা ধীরে ধীরে বাড়ে, যেন কোন গরজ নেই। ফুলশয্যার যে ফুল তারও একটি দীর্ঘ বোঁটা আছে। আষাঢ়ের বেলা যাই যাই করেও যায় না। আকাশের মেঘ মাঝে মাঝে আসন্ন সন্ধ্যার আভাস দেয়, কিন্তু খানিক পরেই সরে গেলে

দেখা যায় রোদ চিকচিক করছে। পরিহাসরসিকা বউদির দু চোখের কৌতুকের মত। তারপর আষাঢ়ের সেই দীর্ঘদিনও শেষ পর্যন্ত কাটল। সন্ধ্যা হল। শুরু হল বউভাতের ঝামেলা। মিষ্টান্নলোভী আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব ছাদের ওপর পাত পাতলেন। গুণতিতে অসংখ্য। লেখকের বাবা আর দাদারা তাঁদের আদর আপ্যায়নে পঞ্চমুখ। কিন্তু লেখকের মুখ ভার। আজও রাত বারোটা পার হল। যৌতুকে পাওয়া নতুন ঘড়িটির দিকে তিনি বারবার তাকান আর ভাবেন ফুলশয্যাতেও এত কাঁটা।

রাত প্রায় একটার সময় শোবার ঘরে ডাক এল। তখনো ঘরে বোন আর বউদিদের ভিড়। আচারে স্ত্রীলোকের শ্রান্তি নেই। শেষ পর্যন্ত ভিড় ভাঙল, দয়া হল ওদের। ঘরে এখন শুধু লেখক আর তাঁর জীবন সঙ্গিনী। কিন্তু শয্যার দিকে এগোতে তাঁর অসীম লজ্জা। লেখকই আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন। বিদ্যুৎবাতি নিবিয়ে দিলেন। সাধাসাধি করে নববধূকে তার নিজের জায়গায় নিয়েও এলেন। কিন্তু তার বেশি এগোতে সাহস পেলেন না। এত শিক্ষা, এত প্রতীক্ষা সবই বৃথা হতে চলল। বিবাহিত অভিজ্ঞ বন্ধুবান্ধবের এত পরামর্শ কিছুই কাজে এল না। একটু এগোতে গিয়ে মনে হয় মেয়েটির সঙ্গে আলাপ নেই পরিচয় নেই যদি সে তাঁকে অভদ্র ভাবে কি অতিমাত্রায় অভিজ্ঞ বলে মনে করে। ছি ছি ছি তাহলে বড় লজ্জার কথা হবে। কিন্তু পিছিয়ে থেকেও স্বস্তি নেই। প্রতি মুহূর্তেই আশঙ্কা মেয়েটি তাঁকে নিতান্ত আনাড়ি মনে করছে। প্রথম রাত্রেই স্ত্রীব কাছে যদি এমন বোকা বনে যান তাহলে জীবনের বাকি রাতগুলির দশা কি হবে। রাত বাড়তে লাগল, শেষ হতে চলল, লেখক আকুল হয়ে উঠলেন। কোন বিদ্যাই কাজে লাগছে না। পরীক্ষা দিতে এসে ছাত্র যেন দেখতে পেয়েছে প্রশ্নগুলি চেনা জায়গা থেকেই এসেছে। কিন্তু বড় ঘুরানো জড়ানো ভাষা। নোট মুখস্থ উত্তরগুলি বসাতে ছাত্র ভরসা পায় না, যদি ঠিক ঠিক না লাগে। আবার দুকলম যে বানিয়ে লিখবে সে সাহসও নেই, যদি গ্রামার ঠিক না হয়।

সেই মূঢ় ছাত্রেব মত লেখক সারারাত জেগে একখানি ব্লাঙ্ক পেপাব সাবমিট কবলেন। খাতার কোথাও একটি কলমের আঁচড় দিতে পারলেন না।

শেষ রাত্রে চাঁদ উঠল। চাঁদের আলো বিছানার ফুলের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। পড়ল আরো একজনের মুখে যে সোনার অলঙ্কারে সেজেছে, ফুলেব অলঙ্কারেও সেজেছে। ফুলশয্যায় বউ এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। লেখক চেষ্টা কবলেন তার ঘুম ভাঙাতে। কিন্তু কিছুতেই পাবলেন না। যে জেগে ঘুমোয় তার ঘুম কি ভাঙানো যায়। তাই একজনেব ছদ্ম নিদ্রা দেখতে দেখতে আর একজনের বিনিদ্র বজনী ভোর হয়ে গেল।

কাহিনী শেষ করে আমি একটু হাসলাম। বিষয় মামুলী, ভাষা আর ভঙ্গি দুইই হাল্কা। তবু লেখার মধ্যে মুন্সীয়ানা আছে। এই প্রতিযোগীকেই বোধ হয় প্রথম আসনে বসাতে হবে।

আরো কয়েকটি কাঁচা বচনা সরিয়ে রাখবার পর আর একটি দাম্পত্য গল্প চোখে পড়ল। ফুলশয্যাব বাত নয়। তাবপব অনেক দিন অনেক রাত্রি চলে গেছে। লেখক লিখেছেন তাঁর মধ্য বয়সের গল্প। মধ্য বয়সের এক দাম্পত্য রজনী। তার আগের কয়েক বাত ধবে স্ত্রী সঙ্গে ঝগড়া। কাবণ দাবিদ্র্য, অনটন। মাসেব শেষ সপ্তাহে বাজাব করবার টাকা নেই, বাড়িওয়ালা বাকি ভাড়ার জন্যে দুদিন বাদে বাদেই এসে অপমান কবে যাচ্ছে, মেজো মেয়েটার টাইফয়েড, এমন সময় স্ত্রী যদি বলে ঘরে চাল বাড়ন্ত তাহলে পুরুষের কি খুন করতে ইচ্ছা হয না ? লেখকেরও সেই সাধ হয়েছিল। চেয়েচিন্তে চালের জোগাড়টা তিনি অবশ্য শেষ পর্যন্ত করলেন, কিন্তু ঝগড়া মিটল না। শুধু চাল পেয়েই স্ত্রী সন্তুষ্ট নন। তাঁর আরো চাই। তেল, নুন, ডাল তরকারি চাই। রোগা মেয়ের জন্যে ওষুধ পথ্য দরকার। কোনটা বাদ দিলেই চলে না। লেখক বলেন, 'তোমার অত খাঁই আমি মেটাতে পারব না।' স্ত্রী তাঁর চোয়ালজাগা মুখখানা বিকৃত করে বললেন, 'আমার খাঁই, না তোমার ছেলেমেয়েদের ? কেন বিয়ে করবার সময় মনে ছিল না ! ছটি সন্তানের বাপ হওয়ার সময় মনে ছিল না যে তাদের খাওয়াতে হবে পরাতে হবে অসুখ বিসুখ হলে চিকিৎসা করতে হবে ?'

স্বামী বললেন, 'সবই মনে ছিল। কিন্তু তোমার মুখ নাড়া খেতে খেতে নিজের বাপের নাম পর্যন্ত ভুলেছি। যা দজ্জাল মেয়ে মানুষ তুমি।'

স্ত্রী বললেন, 'তুমি আবার পুরুষ নাকি। পুরুষ হলে নিজের স্ত্রীকে অমন দুর্ণাম দিতে না।'

দিন নেই রাত নেই রোজ ঝগড়ার ঝড় বয়ে যায়। স্বামী বলেন, 'তোমার মত অলক্ষ্মীকে ঘরে এনেই আমার এই দশা।'

স্ত্রী বলেন, 'তোমার মত অক্ষম পুরুষের হাতে পড়ে আমাব জীবনে কোন সুখও হল না শান্তিও হল না।'

ছেলে মেয়েদের মধ্যে যারা বড় তারা ঝগড়ার সময় বাইরে চলে যায়, যারা ছোট তারা অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। অপেক্ষা করে কখন এই ঝড়ের ঝাপ্টা থামবে।

একদিন অফিস বেরোবার সময় স্বামী ঝগড়ার মুখে চরম অভিসম্পাত দিয়ে গেলেন,'মর মর মর। বিষ খেয়ে হোক, গলায় দড়ি দিয়ে হোক, জলে ডুবে হোক যে ভাবে পার আমায় নিষ্কৃতি দিয়ে যাও।'

'মরব ?'

'হ্যাঁ।'

'মরব ?'

'হ্যাঁ।'

'মরব ?'

স্বামী এবারও বিনা দ্বিধায় বললেন, 'হ্যাঁ।'

স্ত্রী বললেন, 'তিন সত্যি করলে। ফিরে এসে আমার মুখ আর তুমি দেখতে পাবে না।'

অফিসে এসে টিফিনের আগে পর্যন্ত ভালোই কাটল। রাগটা তখনো মেটেনি। স্বামী মনে মনে ভাবলেন যদি মরে শেষ হয়, আমার হাড় জুড়োয়। কিন্তু টিফিনের সময় কৌটোটি খুলে মন বড় খারাপ হয়ে গেল। অন্যদিনের মতই সেই কখানা আলুর কুচি আর দুখানা রুটি দেখে শাঁখা পরা এক জোড়া শীণহাতেব কথা তাঁর মনে পড়ল।

ইচ্ছা হল তখনই চলে আসেন কিন্তু পারলেন না। কাজের চাপ অনেক বেশি। টেবিলে গাদা গাদা এরিয়াব ফাইল পড়ে রয়েছে। শেষ কবতে করতে সন্ধ্যা। সহকর্মীর কাছ থেকে দুটি টাকা ধার কবে তিনি বেবিয়ে এলেন। বৈঠকখানার বাজাব থেকে মাছ কিনলেন, মনোহারী দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ কি মনে হল এক শিশি আলতাও নিলেন সস্তা দেখে। স্ত্রী একদিন বলেছিলেন, 'জলে জলে পা দুটো খেয়ে গেছে। পচে গন্ধ হয়েছে। এক শিশি আলতা এনো তো।'

বাজার নিয়ে স্বামী হাসিমুখে ঘরে এলেন। কিন্তু ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালাবার কেউ নেই না কি ?

ছোট মেয়েটাকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'পুঁটি তোর মা কোথায় রে ?'

আট বছরেব মেয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'বাবা, মা নেই।'

পুঁটির বাবার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল, 'নেই কিরে—হতভাগা মেয়ে। কোথায় গেছে তাই বল।'

পুঁটি কাঁদো কাঁদো ভাবে বলল, 'মা বলল আমি মবতে চললুম।

আমি বললাম, আমরা কার কাছে থাকব। মা বলল, তোদেব বাপের কাছে থাকিস। আমি মরে গেলে সেই তোদের বাপও হবে, মাও হবে। তোদের আলাদা মার আর দরকার নেই।'

ছেলেরা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। কিন্তু কেউ এখনো ফেরেনি। ভদ্রলোক মাছ আর আলতার শিশি নামিয়ে রেখে স্ত্রীকে খুঁজতে বেরোলেন। ঝগড়ার কথা তো বাইরের লোককে বলা যায় না। তবু পাড়াপড়শীর বাড়িতে বাড়িতে গেলেন। কৌশলে পলাতকা স্ত্রীর সন্ধান নিলেন। কিন্তু কারো বাড়িতে তিনি যাননি। গঙ্গার ধারে গেলেন। সেখানেও কোন চিহ্ন নেই। জন দুই লোক বসে বিড়ি খাচ্ছে আর খোসগল্প করছে। তাদের জিজ্ঞেস করলেন কোন স্ত্রীলোককে তারা জলের ধারে যেতে দেখেছেন কিনা। একজন কোন জবাব দিল না আর একজন হেসে বলল, 'আরে দাদা ওই মতলব নিয়ে যদি কেউ এসেই থাকে তাহলে কি সে আর লোক দেখিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়েছে ? যেতে হলে চুপি সারেই চলে গেছে।'

ভদ্রলোক শূন্যবুকে ভরা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে মনে ভাবলেন, 'মা গঙ্গা যদি তাকে নিয়েই থাকেন, কোন চিহ্ন রেখে দেবেন কেন ?'

পা যেন পাথরের মত ভারি, নড়তে আর চায় না। মন যেন পাহাড়ের মত স্থবির, চলতে আর পারেন না। হয় তো মিনিট পাঁচেকের বেশি তিনি সেখানে দাঁড়াননি। কিন্তু মনে হল যেন যুগের পর যুগ চলে গেছে। একজন আর একজনকে ছেড়ে ওপারে চলে গেছেন। যিনি পড়ে রইলেন তাঁর আর স্বেচ্ছায় পার হবার সাধ্য নেই। শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক একটি করে ঢেউ গোনা ছাড়া আর কিছু করবার নেই তাঁর।

এই অবস্থায় থানায় একবার যাওয়া দরকার, আর হাসপাতালে। যদি জলে ঝাঁপ দেওয়ার পর কেউ তাকে তুলে থাকে, কি গাড়ি চাপা পড়বার পর কেউ যদি কুড়িয়ে নেয়। কিন্তু তাঁর কেবলই মনে হতে লাগল কি হবে আর চেষ্টা করে, যে গেছে তাকে আর পাওয়া যাবে না। থানা কি হাসপাতালে একা যেতে ভরসা হল না। ভাবলেন বড় ছেলেকে কি কোন প্রতিবেশী বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বেরোবেন।

এগলি ওগলি ঘুরে পাথরে গড়া পা দুখানি টেনে টেনে তিনি কোন রকমে বাড়িব সদব দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। এখনো কোনো সাড়াশব্দ নেই। সময় বুঝে রাস্তার সব আলো নিভে গেছে। পাড়াসুদ্ধ অন্ধকার।

ভদ্রলোক হাতড়ে হাতড়ে কোন রকমে কড়াটা নাড়লেন। বুঝতে পারলেন না শব্দ হল কিনা। নিজেব বুকের ঢিপ ঢিপ শব্দই বেশি করে কানে আসতে লাগল।

যে কোন শব্দেই হোক দরজাটা খুলে গেল। তিনি দেখলেন এক টুকবো জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে ছায়ার মত একটি নাবী। আঁধারেব মধ্যে এক ক্ষীণ দীপশিখা।

তিনি অপলকে সেই শিখার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কতক্ষণ যে গেল তার আর ঠিক নেই।

অমন করে তাকালে কোন মেয়ে কি চোখ না নামিয়ে নিযে পারে ? তা তার রূপ থাকুক আর না থাকুক, যৌবন যত আগেই বিদায় নিয়ে চলে যাক।

একটু বাদে ফেব চোখ তুলে স্ত্রী বললেন, 'সারারাত দাঁড়িয়েই থাকবে নাকি ? ভিতরে এসো।'

ভদ্রলোক এবাব হেসে বললেন, 'বড় বউ, তবে যে বলেছিলে মরবে।'

তাঁর স্ত্রী বললেন, 'চেষ্টা কি আব করিনি ভেবেছ ? পারলাম না, কাচ্চা বাচ্চার বেড়ি দিয়ে আমাকে যমেব হাত থেকেও কেড়ে রেখেছ। তুমি আমার এত বড শত্তুব।'

সেই রাত্রে তাঁরা ভোর না হওয়া পর্যন্ত জেগে ছিলেন। স্বামীও শ্রান্ত, স্ত্রীও শ্রান্ত কিন্তু আশ্চর্য, তবু কারো চোখে ঘুম আসেনি।

একটু ভেবে এই গল্পটিকেই আমি সবচেয়ে বেশি নম্বব দিলাম। যদিও বর্ণনায় অতিবঞ্জন আছে, ঘটনার বিন্যাসে কিছু কিছু শৈথিল্য, তবু যতগুলি বচনা পেয়েছি তাদেব মধ্যে এই লেখাটিই সবচেয়ে ভালো।

কিন্তু শুধু বিচারপর্বেই কর্তব্য শেষ হল না। পরদিন বিকালে সহকারী সম্পাদকেব সঙ্গে আমাকে তাঁদের অফিসেও যেতে হল। সভাপতিকে নিজেব মুখে ফল ঘোষণা করতে হবে, স্বহস্তে পুরস্কার প্রদান।

হলঘরের অর্ধেক জুড়ে প্রতিযোগীরা বসেছেন। সবাই রেলওয়ের নানা বিভাগে কাজ কবেন। বেশির ভাগই কেরানী। কিন্তু আজ তাঁদের অন্য ভূমিকা। আজ তাঁরা কেউ জীবিকার জন্যে কলম ধরেননি। নিজের জীবনকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। সামনের সারিতে কয়েকটি মহিলা এবং পদস্থ অফিসারকেও দেখা গেল। তাঁরা বিশেষভাবে নিমন্ত্রিত।

ক্লাবের সম্পাদক মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে সংক্ষিপ্ত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করলেন। এর আগে তাঁরা রবীন্দ্র-জয়ন্তী করেছেন, আর একবার তরুণ কবিদের সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছিলেন। ক্লাবেরই একজন সদস্যের লেখা একখানি নাটক অভিনয় করবাব ইচ্ছাও তাঁদের আছে।

এবার আমাকেও কিছু বলতে হল। বললাম, 'প্রতিযোগিতায় যাঁরা যোগ দিয়েছেন তাঁরা আসলে সহযোগী। এই অনুষ্ঠান তাঁদের সকলের চেষ্টায় সার্থক হবে। তাঁদের প্রত্যেকের রচনাই অনন্য।

এক লেখকের সঙ্গে আর এক লেখকের তুলনা সঙ্গত নয়। এমনকি একই লেখকের এক গল্পের সঙ্গে আর এক গল্পের তুলনা চলে না। কারণ একেকটি লেখা তাঁর স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর। যত লেখা তত লেখক।'

আমি মুখবন্ধ শেষ করবার পর ক্ষীণকায় সেক্রেটারী ফাইল হাতে মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'সভাপতির বিচারে প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রবীণ বন্ধু বামাপদ দাশ। তাঁকে ক্লাবের পক্ষ থেকে আমরা একটি রৌপ্যপদক উপহার দিচ্ছি।'

বেঁটে মত এক ভদ্রলোক হাসিমুখে মঞ্চের সামনে এগিয়ে এলেন। বয়স পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। মাথার চুল বেশিব ভাগই পাকা। সামনের সারির গুটি তিনেক দাঁত নেই। তিনি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার সহকর্মীরা আমাকে যে গৌরবে আজ ভূষিত করলেন তা আমি জীবনে আর কোনদিনই পাইনি। কোনদিন স্কুল কলেজের পরীক্ষায় আমি পুরস্কার পাইনি, কোন কাজের জন্যে প্রশংসা শুনিনি, এমন গৌরব আমাব এই প্রথম। এই বুড়ো বয়সে প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। আমি লেখকও নই। জীবনেব একটি সত্য ঘটনাকে কোন রকমে আপনাদের সামনে ধরে দিয়েছি মাত্র। তরুণ সেক্রেটারী আমাকে না জানিয়ে লেখাটিকে প্রতিযোগিতার ফাইলে বেঁধে ফেলেছেন।'

এরপর তিনি তাঁব লেখাটি পডতে শুরু করলেন। কিন্তু দুপাতা এগোতে না এগোতেই আবেগে তাঁর গলা রুদ্ধ হয়ে এল, চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। তিনি বারবার পড়তে চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই লেখাটি শেষ করতে পারলেন না। শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেই বললেন, 'আর কেউ দয়া কবে লেখাটি পড়ে দিন।'

সেক্রেটারির ইঙ্গিতে একজন সুদর্শন যুবক বচনার বাকি অংশ পড়ে শোনালেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ভালো, উচ্চারণ বিশুদ্ধ।

কিন্তু পাঠক গল্পের শেষে এসে পৌঁছতে না পৌঁছতে লেখক ফের কান্নার সুরে বলে উঠলেন, 'আমি তাঁকে বাঁচাতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত সে আমাকে ছেড়ে চলে গেছে।'

আমি একটুকাল অবাক হয়ে থেকে বললাম, 'কি ব্যাপার। তবে কি আপনার স্ত্রী সেই রাত্রেই—'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'না স্যাব, তা নয়। আমি এক বর্ণও মিথ্যে লিখিনি। সেদিন সে সত্যিই ফিরে এসেছিল। কিন্তু গত বছর দুদিনের জ্বরে সে আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। কী যে হল ডাক্তাব মোটে ধরতেই পারল না।'

ভদ্রলোক ফের বসে পড়ে মুখ নিচু কবে রইলেন। চোখে কিছু না দেখা গেলেও সবাই বুঝতে পারল তিনি কাঁদছেন।

নীরব অস্বস্তির মধ্যে সভার কয়েকটি মুহূর্ত কাটল।

একটু বাদে সহকারী সম্পাদক তাঁকে সাহিত্য সভা থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। ফেলে যাওয়া মেডেলর বাক্সটিও তিনি তুলে নিলেন।

সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার মনে হল ভদ্রলোকের আর একটি বিনিদ্র রজনীর ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু তিনি কি আর দ্বিতীয় গল্প লিখতে পাববেন ?

হঠাৎ আমাদের সবাইকে চমকে দিয়ে ক্লাবের সেক্রেটারী মাইকের সামনে মুখ নিয়ে ঘোষণা করলেন, 'এবার গল্প পড়বেন শ্রীবীরেন্দ্রকুমার তালুকদার। তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন। আমরা তাঁকে একটি কলম উপহার দিচ্ছি। তিনি লিখেছেন তাঁর ফুলশয্যার রাতের গোপন কথা।'

সামনের সারিতে যে কযেকটি সাশ্রুনয়না মহিলা বসেছিলেন তাঁদের মুখে এবার হাসি ফুটল।

আষাঢ় ১৩৬৬

ময়ূরী

কুমারীর সিঁথির মত পথের রেখাটি অনেক দূর চলে গিয়েছে। রাস্তাব এ-পার থেকে ও-প্রান্ত দেখা যায় না। অন্ত দেখে দরকারই বা কী! বরং ঝোপের আড়ালে পথটিকে হঠাৎ হারিয়ে যেতে দেখতেই ভাল লাগে। কোলঘেঁষে লম্বা ঝিলটি এই দুপুর-রোদেও শান্ত স্তব্ধভাবে পড়ে আছে। এদিকে কয়েক গজ দূরে অবিরাম বাস-চলাচলের শব্দে ঝিলের জল ক্ষণিকের জন্যও কেঁপে উঠছে কিনা এখান থেকে বোঝবার জো নেই। পশ্চিমের পুরনো প্রায়পরিত্যক্ত রাজবাড়ির ছায়া ঝিলের জলে পড়েছে কিনা তাও এখান থেকে দেখা যায় না। বাঁয়ে নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। ঠিক সারিবদ্ধ নয়। যার যেখানে খুশি আশ্রয় খাড়া করেছে। গড়নের মিল নেই, রঙের মিল নেই। তবু আস্তে আস্তে নতুন একটি বসতি ত হ'ল। শহরের নানা অঞ্চলের মানুষ কিছুদিন পর থেকে এখানে মিলে মিশে বাস করবে। যাদের সঙ্গে কোন পরিচয়ই ছিল না, তাবা পরিচিত হবে, পরস্পরের প্রতিবেশী হবে। কেউ কেউ বন্ধু হবে। বন্ধুত্ব বড় মধুর। রাজেশ্বর ক'বছর আগেও তার বন্ধু পূর্ণেন্দুকে নিয়ে এখানে স্কেচ করতে এসেছে। তখন শুধু খোলা মাঠ ছিল। এ-সব বাড়িঘব তখন ওঠেনি। আর ওই যে সরু সাদা পথটুকু তারও দেখা মেলেনি। ঝিলের পাশে বসে বসে তারা সকাল-সন্ধ্যায় স্কেচ করেছে, হেঁটে বেড়িয়েছে। এখন আর তার জো নেই। এখন ওখানে কাগজ-পেনসিল নিয়ে বসলে চারদিকে ভিড় জমে যাবে।

পূর্ণই প্রথম আবিষ্কাব করেছিল জায়গাটা। রাজেশ্বরের পাড়া। কিন্তু অন্য পাড়া থেকে এসে সেই ঝিল আব মাঠ পূর্ণেরই প্রথম চোখে পড়েছিল। সেই দৃষ্টি এখন অবশ্য সরে গিয়েছে। যাতায়াতের পথে জায়গাটা চোখে পড়লে ও আজকাল বিরক্ত হয়ে বলে, "কী চমৎকার ল্যাণ্ডস্কেপই না ছিল, গেঁযো শহরের গহ্বরে।"

রাজেশ্বর প্রতিবাদ করে না, সাযও দেয় না। ভাবে শুধু কি ফাঁকা মাঠেরই রূপ আছে! নতুন পল্লীব রূপ নেই? রূপ নেই নতুন নতুন মানুষের, শিশু যুবক, বৃদ্ধের? রূপ নেই তাদের ঘর-সংসারেব, সুখ-দুঃখের, হাসিকান্নার?

অথচ পূর্ণ সেই সংসারের কথাই বলছিল এতক্ষণ। স্ত্রীর ফের সন্তান হবে। তাকে হাসপাতালে দেবে, না, নার্সিং হোমে দেবে এখনও ঠিক করতে পারেনি। মেয়ের প্রাইভেট টিউটবটি চলে গিয়েছে। তার জন্যে নতুন টিউটব চাই। আরও নানা পারিবারিক সমস্যা। ছবির আলোচনা আজ খুব কমই হয়েছে। পূর্ণ সংসারের মধ্যে ডুবে আছে বলেই সংসারের রূপ যেন ওর চোখে পড়ে না। ওর চোখ ওর মন কেবল সংসার থেকে পালাই-পালাই করে।

পূর্ণ বলে, "তোমার কী! চল্লিশ পেরিয়ে গেল। বিয়ে-থা করলে না, সংসারের ঝামেলা যে কী বস্তু জানলে না, বুঝলেও না। বেশ আছ, দায়িত্ব নেই, ভাবনা নেই। ছবি ছাড়া তোমার আর দ্বিতীয় চিন্তা নেই।"

রাজেশ্বর হাসে। বন্ধুর কথার জবাব দেয় না। কিন্তু মনে মনে ভাবে, তা যেমন নেই, তেমনই অনেক কথা আজানা রয়ে গিয়েছে। সংসারের অনেক বাসনা-কামনাকে তুলির রঙে আঁকতে আঁকতে রাজেশ্বরের মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ঠিক হচ্ছে ত? নাকি কেউ ফাঁকি ধরে ফেলবে! বলবে, কোন অভিজ্ঞতা নেই, সব আন্দাজের ব্যাপার! কেউ অবশ্য বলেনি। বরং অনেকে ধরে নেয় তার সব অভিজ্ঞতা আছে। তারা জানে না রেখা আর রঙ তার একমাত্র বন্ধন, রেখা আর রঙ তার একমাত্র মুক্তি।

পূর্ণেন্দুকে যে বাসটায় তুলে দিয়েছে রাজেশ্বর, তারপরে আরও দুটো বাস চলে গেল। এবার ফিরতে হয়। ফিরবে? নাকি এই বড় রাস্তা পেরিয়ে ওই সরু সিঁথির বীথিকার দিকে এগোবে?

ঝিলের ধার দিয়ে হেঁটে চলবে ? নাকি একটুখানি থেমে তার শান্ত স্থির জলে নিজের দুটি চোখকে ডুবিয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে ?

"এই বাস, বাঁধকে, বাঁধকে। এই কণ্ডাক্টার। যাঃ, চলে গেল !"

পুবমুখী বাসটা আগেই ছেড়ে দিয়েছিল। তার গতি থামল না। কিন্তু রাজেশ্বর যেতে যেতে থেমে দাঁড়াল। মেয়েটি ততক্ষণে পার হয়ে এপারে এসেছে। প্রায় তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতে দুখানা বই, একটি খাতা। পিঠে দীর্ঘ বেণী। উজ্জ্বল গৌববর্ণেব সঙ্গে ময়ূরকণ্ঠী রঙের শাড়িটি চমৎকার মানিয়েছে। ও-রঙের সঙ্গে নীল মানাত, ফিকে হলুদ মানাত, এমন কি গাঢ় লালও বেমানান হত না। রেড, ব্লু, ইয়োলো। তিনটি প্রধান। আর্টিস্টের তিনরঙা পতাকা। না, তার পতাকা বহুবর্ণের। মেয়েটি ঘাড় ফিরিয়ে পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে আছে। দ্বিতীয় বাসের প্রতীক্ষায়। বোঝা যাচ্ছে ওর কলেজ শহবে নয়, শহরের বাইরে। রাজেশ্বর ওর সান্নিধ্য থেকে আবও দু পা সরে এল। কিন্তু একেবারে চলে যেতে পারল না।

চমৎকার ফর্ম। দীর্ঘাঙ্গী। কত হবে ? সাড়ে পাঁচ। না হলেও পাঁচ পাঁচ। তার কম ত নয়ই। ও যখন রাজেশ্বরের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ওর কাঁধ পর্যন্ত উঠেছিল মেয়েটির মাথা। মসৃণ চিক্কন ঘন কালো চুলের মাঝখানে সুন্দব সাদা একটি রেখার ইশারা। বাঙালী মেয়ের এত দৈর্ঘ বড়-একটা দেখা যায় না। যা দু-একজনকে চোখে পড়ে, গড়ন ভাল পাওয়া যায় না। কিন্তু এই মেয়েটি সব দিক থেকে ব্যতিক্রম। দীর্ঘাঙ্গী হয়েও ক্ষীণমধ্যা আর স্তবকভারে আনতা। রাজেশ্বর একবার যে কুমাবসম্ভব থেকে উমাব ছবি এঁকেছিল, তার সঙ্গে অবিকল মিল আছে। সেই স্তবকভার-নম্রতার সঙ্গে। আশ্চর্য, তার পরিকল্পিত মুখের ডৌলটির সঙ্গেও অপূর্ব সাদৃশ্য। সেই ওভাল শেপেব মুখ, সেই নাক ঠোঁট চিবুক। সেই জন্যেই মুখখানা চেনা-চেনা মনে হয়েছিল রাজেশ্বরেব। মনে পড়েনি এ তারই মনগড়া মূর্তি। পূর্ণ কিন্তু সেই ছবিটা প্রকাশ করতে দেয়নি। বলেছিল নন্দলাল বসুর বড় ছাপ রয়ে গিয়েছে। তা ত থাকবেই। সেই প্রথম আমলের ছবি। অবনীন্দ্রনাথ-নন্দলালের ছবি সামনে রেখে কখনও বা শুধু স্মৃতির দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখে তখন হাত মক্শ করা চলেছে। একলব্যের গুরু ছিলেন একজন, আচার্য দ্রোণ। রাজেশ্বরও একলব্য। আর্টেব কোন স্কুল-কলেজে সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়নি। প্রত্যক্ষ কোন শিল্পগুরুর কাছেও শিক্ষা নেয়নি। শুধু তাঁদের হাতের কাজ দেখেছে। মাসিকপত্রিকা থেকে সস্তা সব প্রিন্ট ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিজের বাক্সে জড়ো করেছে। তারপর গোপনে বসে বসে সেই সব ছবিতে চোখ বুলিয়েছে, মন বুলিয়েছে, তারপর বসেছে রঙ তুলি নিয়ে। একলব্যের গুরু ছিলেন একজন। রাজেশ্বরের অনেক। একালের সেকালের, এদেশের ওদেশেব। প্রথম প্রথম চলেছে শুধু অনুকরণ-অনুসরণের পালা। কিন্তু শুধু কি তাই। রাজেশ্বরেব নিজস্ব বলতে কি কিছুই তার মধ্যে ছিল না ? তিলপ্রমাণ, বিন্দুপ্রমাণ থাকলেও ছিল। নিজেব শ্রমের মধ্যে, স্বেদেব মধ্যে, নতুন পথ কেটে বেরিয়ে যাওয়ার প্রয়াসের মধ্যে রাজেশ্বরের মৌলিকতাব বাসনা মিশে ছিল। সেই প্রস্তুতিপর্ব নিয়ে আজ আর কোন লজ্জা নেই, খেদ নেই। অন্তত এই মুহূর্তে নেই। বরং এক অপূর্ব প্রসন্ন আনন্দে তার মন ভরে উঠেছে। সেই প্রস্তুতিপর্ব আজও শেষ হয়নি। বলতে গেলে সারা জীবনই এক উদ্যোগপর্ব। সে উদ্যোগ, সে উদ্যম শুধু শিল্প সৃষ্টির জন্যে—এই একমাত্র আশ্বাস আর গৌরব রাজেশ্বরের।

আর-একটা বাস এসে পড়েছে। মেয়েটি হাতখানা উঁচু না করলেও বাসটি থামল। এখানেই স্টপ। কিন্তু হাতের ওই ডৌল আর ওই দীর্ঘ আঙুলগুলি দেখতে পেত না রাজেশ্বর। অমন ভঙ্গিতে পেত না। ওই আঙুলগুলি শুধু তুলিতে এঁকে রাখবার মত না—ওই আঙুলে তুলি ধরলেও বেশ মানায়। ডান হাতের মনিবন্ধে সোনার বালা, বাঁ হাতে কালো ফিতেয় বাঁধা ছোট্ট ঘড়ি। ঘড়ির সঙ্গে সোনার বালা কিন্তু মানায়নি। রাজেশ্বরের মতে একটু বিসদৃশ হয়েছে। বাঁ হাতেও যদি আর-একটি বালা পড়ত, তা হলে ঘড়িটি ঢেকে যেত। কিন্তু সিমেট্রি থাকত। আজকাল অনেক মেয়েই অবশ্য হাতে কিছু পরে না। হাতে নয়, কানে নয়, গলায় নয়। যৌবনই তাদের একমাত্র আভরণ। রাজেশ্বর কি এঁকেছে এ যুগের নিরাভরণা যৌবনাভরণাকে ?

বাসটি ছেড়ে চলে গেল। মেয়েটি ঠিক জানলার ধারে বসেছে। বাসে কি ট্রেনে উঠলে জানলার

ধাবটি এখনও বাজেশ্বব নিজেব জন্যে বেছে নেয়। অনেক সময় ছেলেমানুষেব মত সহযোগীদেব সঙ্গে কাড়াকাড়ি পর্যন্ত কবে। বাজেশ্বব হাসল।

"বাবু।"

বাজেশ্বব চমকে পিছনে তাকাল।

পান-বিড়ি-সিগাবেটেব দোকান। দোকানীব পবনে লুঙ্গি, গাযে গেঞ্জি। দাঁতগুলি কালো কালো।

দোকানী হেসে বলল, "বাবু, আজ কিছু নিলেন না?"

বাজেশ্বব বলল, "কী নেব! তোমাব দোকানেব কিছুই ত আমাব চলে না। মাঝে মাঝে বন্ধুদেব জন্যে নিই।"

দোকানী বলল, "আজও আপনাব সেই বন্ধু এসেছিলেন?"

বাজেশ্বব বলল, "হ্যাঁ।"

"তাঁকে বাসে তুলে দিলেন?"

বাজেশ্বব হেসে বলল, "তুমি দেখছি সব খবব বাখ।"

দোকানী বলল, "দেখলাম যে। তিনি অনেকক্ষণ চলে গেছেন না বাবু?"

বাজেশ্ববেব দিকে তাকিযে দোকানী ফেব একটু মুখ মুচকে হাসল। তাবপব মুখ নিচু কবে বিড়ি বাঁধতে লাগল।

তাব সেই হাসি, তাব সেই ভঙ্গি বাজেশ্ববেব সমস্ত মন অস্বস্তিতে ভবে তুলল। ঘৃণায ভযে অপমানে অস্থিব হয়ে উঠল বাজেশ্বব। ছি-ছি ছি, ও ভেবেছে কী! ও কি ভেবেছে ওদেব চোখ আব বাজেশ্ববেব চোখ এক? ও যে চোখে তাকায বাজেশ্ববও সেই চোখে তাকায? ওব ওই হাসি হাসি মুখেব উপব বাজেশ্বব যদি একটা ঘুষি ছুঁড়ে দিত, তা হলে কী হত? সেই শক্তি বাজেশ্বব বাখে। শুধু তুলি ধববাব মত নবম আঙুল কটি নিযেই সে বাস কবে না, বাস কবে না তুলোব মত, মোমেব মত শবীব নিযে। শালগাছেব মত শক্ত সবল আব দীঘ তাব দেহ। তাব তুলিব টানেব যেমন জোব তেমনই জোব কবজিব। বাজেশ্বব একটি ঘুষি দিলে ওই কালো কালো সব কটি দাঁত খসে যেত।

নিজেব দৈহিক শক্তিব চেতনায বাজেশ্বব আত্মপ্রসাদ ফিবে পেল। ফিবে এল মানসিক প্রত্যয মনে মনে হাসল বাজেশ্বব। দুর্বল বিকল দেহে ভীরুতাব বাস। বিকৃতিব বাসা। তাব দেহ ত দুর্বল নয। তাব ভয কিসেব! অমন একটা কেন, পাঁচটা বিড়িওযালাব মাথা সে নিতে পাবে।

খানিকটা এগোতেই ডান দিকে গলি। দু দিকে সাবি সাবি টালিব ঘব বস্তি। নিজেব বাড়ি থেকে বড়বাস্তায পড়বাব এই একটিমাত্রই পথ বাজেশ্ববেব। যখন অন্যমনস্ক থাকে, পথেব দু দিকেব এই শ্রীহীন বাড়িঘবগুলি চোখে পড়ে না। কিন্তু চোখে যখন পড়ে মনটা কেমন কবে ওঠে। তাব যাতাযাতেব পথে যাবা পড়ে আছে, তাদেব মধ্যে শিল্পপ্রীতিব কোন লক্ষণ নেই। একই পাড়ায বাস কবেও বাজেশ্ববকে তাবা চেনে না। মুখ চেনে, নামও জানে, বাজেশ্বব ছবি আঁকে এ-খববও বাখে, কিন্তু তাব বেশি আব-কিছু নয। তাব ছবি এবা দেখে না, দেখবাব কোন আগ্রহই বোধ কবে না। বাজেশ্ববেব ছবি এমন দুরূহ আঙ্গিকেব নয যে, দেখে ওবা বুঝতে পাবে না। দেখবাব রুচি নেই, মন নেই, প্রবণতা নেই। অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অর্ধনগ্ন, অর্ধভুক্ত জনসাধাবণের কাছে বাজেশ্ববেব অস্তিত্বেব কোন মানে নেই, তাব কর্মকীর্তিব কোন অর্থ নেই। যখন সচেতন থাকে এই তথ্য বাজেশ্ববকে বড় বেদনা দেয। অমন সবল সুস্থ সুদৃঢ় দেহেব অধিকাবী হযেও তাব মন এক অসহায নৈবাশ্যে ভবে ওঠে। তাব ছবি এদেব জন্যে নয, এরা তাব জন্যে নয। বাজেশ্ববেব ছবিকে অনেকদিন—আবও অনেকদিন প্রতীক্ষা কবে থাকতে হবে। এদেব প্রশংসা পাবে বলে নয, এবা তাবিফ করবে বলে নয়, এমন কি টাকা দিযে কিনবে বলেও নয, শুধু একবাব চোখ তুলে চেযে দেখবে বলে। এবা—যাবা তাব প্রতিবেশী, এবা—যাদেব সে যাতাযাতেব পথে বোজ দেখতে পায। এবা—যাবা বাজেশ্ববকে বোজ দেখে অথচ কোনদিন তাব ছবি দেখে না। এদেব কাছে ছবি মানে সিনেমা। বিলোল কটাক্ষভবা লাস্যময়ী এক সিনেমা-অভিনেত্রীব ছবি পান-বিড়িব দোকানেব ক্যালেণ্ডাবে শোভা পাচ্ছে দেখে এল বাজেশ্বব। এবাব তাব হাসি পেল। সত্যি, দোকানী তাকে চিনবে কী কবে, তাব দৃষ্টিকে বুঝবে কী কবে! সেই শিক্ষা-দীক্ষা কি ওব আছে? ওব ওপব রাগ কবা

বৃথা। ওকে ঘুষি মারলে অন্যায় হত। ওর কাছে ছবির একটিমাত্র অর্থ। যা বাসনার উদ্রেক করে, সম্ভোগ-পিপাসাকে বাড়িয়ে দেয়, ওর কাছে তাই শিল্প। ওর কাছে নারীর একটিমাত্রই মানে। সে শয্যাসঙ্গিনী। নারী যে ল্যাণ্ডস্কেপেরও অংশ, সে যে লতার মত, ফুলের মত, নদীর মত, ঝরনার মত—সেই সাদৃশ্য দোকানী কোত্থেকে খুঁজে পাবে, যদি খুঁজতে তাকে শেখানো না হয়? রাজেশ্বর ওকে ঘুষি মারবে না, ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। তারপর আস্তে আস্তে ওর দোকান থেকে লাস্যময়ীর ছবিটি সরিয়ে এনে একটি সত্যিকারের ছবি ওখানে টাঙিয়ে দেবে।

"ও কি, ও রাজু, ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস? ও রাজু?"

রাজেশ্বরের চমক ভাঙল। নিজেদের বাড়ি ছাড়িয়ে সে আরও উত্তরে সোজা রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছিল সোনা মা না ডাকলে খেয়ালই হত না।

দু দিকে দুটি করে সবুজ সুপারিগাছ। তার মাঝখানে সাদা-রঙের দোতলা বাড়ি। মন্দাকিনী ডাকতে ডাকতে একেবারে পথে নেমে এসেছেন। পরনে লালপেড়ে গরদের শাড়ি। পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। বেশ একটু মোটা হয়ে গিয়েছেন আজকাল। কিন্তু ওই যা দেখতেই মোটা। দিনরাত খাটুনি, ছুটোছুটির অন্ত নেই। অবশ্য মেয়েদের সব বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ছেলেরা যার যার বউ নিয়ে কর্মস্থলে। কিন্তু জ্যেঠামশাই একাই একশ। তাঁর জন্যে সোনা-মার একমুহূর্ত বিশ্রাম নেই।

রাজেশ্বর বলল, "তোমার এত তাড়াতাড়ি সন্ধ্যাপুজো হয়ে গেল সোনা মা?"

মন্দাকিনী বললেন, "না হবে কিসের! আমার সন্ধ্যাটা সত্যি সত্যি সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকলে তোমার সুবিধে হয় হতভাগা কোথাকার! পূর্ণের সঙ্গে বকবক করতে করতে সেই যে বেরিয়েছিস—আর ফেরার নাম নেই আমি ভাবলাম, তুই বুঝি তার সঙ্গে সেই মনোহরপুকুরেই চলে গেলি। বেলা কাবারটা এর পর কখন নাবি কখন খাবি বল ত।"

এ সব শাসনের কোন জবাব দিতে নেই। রাজেশ্বর স্মিতমুখে বাড়ির ভিতরে ঢুকল। একবার জিজ্ঞাসা করল, "জ্যেঠামশাই খেয়েছেন?"

মন্দাকিনী বললেন, "কখন! তাঁর এক ঘুম হয়ে এল বলে। ঘুম থেকে উঠে চা চাইবেন।"

রাজেশ্বর কোন কথা না বলে নাইতে গেল। বাথরুমে ঢুকে ঝপ ঝপ করে কয়েক মগ জল ঢেলে বাইরে এসে ভিজে কাপড়েই বলল, "কই সোনা মা, ভাত-টাত কি আছে তাড়াতাড়ি দাও। বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।"

মন্দাকিনী বললেন "তোমার আবার ক্ষিদে তেষ্টা আছে নাকি বাপু?"

রাজেশ্বর হাসল। তেষ্টাকে কিছুতেই তৃষ্ণা বলবেন না সোনা মা। অথচ তৃষ্ণা কথাটি কি সুন্দর! ধ্বনিমধুর! তৃষ্ণা তৃষ্ণা, তৃষ্ণা। যারা কবিতা লেখে তারা বোধ হয় এর সঙ্গে মিল দেবে কৃষ্ণা। শুকনো কাপড় পরতে পরতে হাসল রাজেশ্বর। আর হঠাৎ তার চোখের সামনে একখানা মুখ ভেসে উঠল। কৃষ্ণা না গৌরী গৌরাঙ্গী সেই ল্যাণ্ডস্কেপের অবিচ্ছিন্ন অংশ। রাজেশ্বর নিজের হাতখানা চোখের সামনে রেখে কী যেন আড়াল করল।

মন্দাকিনী তা দেখে বললেন "ও আবার কী ভঙ্গি!"

রাজেশ্বর বলল একখানা ইনকমপ্লিট ছবি ঢেকে রাখলাম সোনা মা।"

মন্দাকিনী হেসে বললেন "পাগল হলি নাকি! আকাশে বাতাসে তুই কি সব জায়গায় ছবি দেখিস? মার কাছে গল্প শুনেছি তখনকার দিনে ছেলেদের নাকি পরীতে পেত। তোকে ছবিতে পেয়েছে।"

মেঝেয় আসন পেতে ভাতের থালা এগিয়ে দিলেন মন্দাকিনী। মাছ তরকারির বাটিগুলি চারদিকে সাজিয়ে দিলেন। ছোট একখানা থালা নিয়ে নিজেও বসলেন খেতে। একসঙ্গে না খেলে রাজেশ্বর বড় রাগ করে। খেতে খেতে গল্প করতে খুব ভালবাসে রাজেশ্বর। যত গল্প ওর খাওয়ার সময়। কিন্তু অবাক কাণ্ড! আজ ওর মুখে কথা নেই।

মন্দাকিনী বললেন, "কী রে, আজ বুঝি রান্না-টান্না কিছু ভাল হয়নি!"

রাজেশ্বর বলল "কেন সোনা মা, বেশ হয়েছে।"

মন্দাকিনী বললেন, "অন্যদিন এক তরকারির সাতবার সুখ্যাতি করিস। চেয়ে চেয়ে খাস। আর আজ—"

রাজেশ্বর তাঁর দিকে না তাকিয়ে বলল, "একটা নতুন ছবির আইডিয়া মাথায় এসেছে সোনা-মা। তাই ভাবছি।"

একটু মিথ্যার আশ্রয় নিল রাজেশ্বর। নতুন ছবির ভাবনা এই মুহূর্তে সে ভাবছে না। একটি ভিন্ন রকমের দুশ্চিন্তা হঠাৎ তার মাথায় এসে ভর করেছে। মেয়েটিকে যদি সত্যিই শুধু এক নিসর্গ শোভা বলে ধরা যায়, তা হলে রাজেশ্বর অসত্য বলেনি। কিন্তু নিসর্গ সৌন্দর্য ছাড়াও যদি মেয়েটির মধ্যে অন্য কিছু থাকে, তা হলে, 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' হয়েছে। রাজেশ্বর ভাবতে লাগল, 'লতাপাতা নদী-ঝরনার দিকে তুমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতে পার, কোন বাধা নেই। কিন্তু কোন অপরিচিতা মেয়ের দিকে একপলক তাকানোই কঠিন। অপলক হয়ে থাকলে সভ্য জগৎ থেকে তোমাকে নির্বাসিত হতে হবে। তা ছাড়া লতা আর নদীর সঙ্গে নারীর একটা বড় রকমের প্রভেদ এই যে, তার নিজেরও দুটি চোখ আছে। তার প্রেম পুরুষকে কখনও কখনও অন্ধ করলেও নারী সব সময় চক্ষুষ্মতী। রাজেশ্বর যখন অতক্ষণ ধরে মেয়েটিকে দেখছিল সে রাজেশ্বরের সম্বন্ধে কী ভাবছিল কে জানে! তার চোখ দুটি যে সুন্দর তা রাজেশ্বর দেখেছে, কৃষ্ণকলি না হয়েও সে হরিণাক্ষী। কিন্তু সেই মৃগনয়নার দৃষ্টি ত ভাল করে দেখেনি। রাজেশ্বর তার দিকে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে সে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তাই সেই দৃষ্টিতে অনুরাগ না বিরাগ, সমর্থন না বিতৃষ্ণা কিছুই বোঝা যায়নি। ছি-ছি-ছি, মেয়েটি যদি তাকে বিড়ি-ওয়ালার সগোত্র বলে ভেবে থাকে, তা হলে কী হবে, তা হলে যে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না রাজেশ্বর। ফের যদি ওর সঙ্গে কোনদিন মুখোমুখি চোখাচোখি হয়, সে যে লজ্জায় মরে যাবে।'

জল খেতে গিয়ে বিষম খেল রাজেশ্বর।

মন্দাকিনী ধমকে উঠলেন, "কী যে তোর খাওয়ার ছিরি। সব সময় অন্যমনস্ক।"

ডান দিকের বড় শোয়ার ঘরখানা থেকে সর্বেশ্বরের নাকডাকার শব্দ আসছে।

দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে রাজেশ্বর নিজের মনেই হাসল। বেশ আছেন জ্যেঠামশাই। কাস্টমস অফিস থেকে রিটায়ার করবার পর দুপুরের ঘুমটি বেঁধে নিয়েছেন। একেবারে ছক-মেলানো জীবন। সকালে গীতাপাঠ, সাতটায় সংবাদপত্র, দুপুরে গোয়েন্দা-কাহিনী পড়তে পড়তে দিবানিদ্রা, বিকাল থেকে রাত দশটা কি এগারটা পর্যন্ত পঞ্চাননবাবুর সঙ্গে অশ্ব-গজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ফাঁকে ফাঁকে দু-এক পশলা দাম্পত্যকলহ। জীবনের একটি চমৎকার প্যাটার্ন, একটি নিখুঁত ফর্ম। ওঁকে লতার দিকে তাকাতে হয় না, নদীর দিকে তাকাতে হয় না, নারীর দিকেও তাকাতে হয় না। অমন নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব বার্ধক্য কবে আসবে রাজেশ্বরের, যেদিন লক্ষ শৈবলিনী চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও ভালবাসা ত দূরের কথা, চেয়ে দেখতেও ইচ্ছা করবে না।

মনে মনে হাসল রাজেশ্বর। হাসতে হাসতে নিজের ইজেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। অনেক দিন পরে ফের একটি অয়েলের কাজ শুরু করেছে রাজেশ্বর। ক্যানভাস নিতান্ত ছোট নয়। রাস্তার কলে বস্তির কয়েকটি মেয়ে জল নিতে এসেছে। তাদের কেউ কুমারী, কেউ বা বধূ। উলঙ্গ ছেলে এসেছে পিছনে পিছনে। কাছেই ছোট বাজার। সওদা করতে করতে ক্রেতাদের কেউ কেউ পিছন ফিরে তাকিয়েছে, বিক্রেতাও অন্যমনস্ক। দূরে পপলারের সারির আড়ালে সৌধমালার আভাস দেখা যাচ্ছে। সবে ড্রয়িংটা শেষ হয়েছে, এখনও কিছুই হয়নি। পূর্ণ শাসিয়ে গিয়েছে, 'দেখো যেন প্রচারগন্ধী না হয়। শিল্পীর তুলি জীবনের রহস্যকে প্রকাশ করবে, কোন মতবাদকে আমল দেবে না।' কোন মতবাদের ভক্ত নয় রাজেশ্বর। কিন্তু দারিদ্র্য বঞ্চনা অশিক্ষায় মনুষ্যত্বের এই তিলে তিলে ক্ষয়, এই তাল তাল অপচয় তাকে মাঝে মাঝে বড় পীড়া দেয়। সূর্যাস্তের আভায় আকাশের বর্ণাঢ্যতা যখন আস্তে আস্তে সন্ধ্যার আঁধারে ঢেকে যায়, দোতলার জানলা থেকে আরও একটি অন্ধকার জীবনযাত্রার দিকে রাজেশ্বরের চোখ কোন-কোনদিন নেমে আসে। চোখের সেই বিমূঢ় বিস্ময়ই তুলির ধূসর রঙে তার কোন কোন ছবিতে রূপ নেয়। এর চেয়ে বেশি কোন কথা জানে না রাজেশ্বর। জানবার চেষ্টাও তার নেই।

দুপুর বিকেল সন্ধ্যা রাত বারোটা পর্যন্ত চমৎকার কেটে গেল। এর মধ্যে শুধু বারকয়েক উঠে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে রাজেশ্বর। নিজের তুলি থামিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখেছে গাছের পাতার রঙ-বদলানো। আর সোনা-মার ডাকাডাকিতে নীচে গিয়ে একবার খেয়ে এসেছে। কাজ আর কাজ। নিজের পছন্দমত কাজে থাকার চেয়ে বড় আনন্দ আর নেই। পূর্ণ মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলে, 'শুধু শ্রমের স্বেদের মর্মই জানলে, কিন্তু আরও যে দু-এক রকমের ঘাম আছে তার মর্ম টের পেলে না।'

রাজেশ্বর প্রথমে বুঝতে পারেনি।

পূর্ণ তখন হেসে নিচু গলায় বলেছিল, 'রতিস্বেদ বলে একটা শব্দ আছে শুনেছ? তার অর্থভেদ করা অবশ্য তোমার কাছে শক্ত।' রাজেশ্বর সেকেলে গোঁড়া নয় যে, কানে আঙুল দেবে। হেসেই জবাব দিয়েছে, 'শক্ত কেন হবে? তবে শুনেছি তার সঙ্গে খেদটাও জড়িয়ে থাকে।'

খেদ অবশ্য শ্রমের স্বেদ থেকেও বাদ যায় না। রাশ রাশ ছবি ঘরে পড়ে থাকে। বিক্রি হয় না, তার জন্য দুঃখ আছে, এতদিন ধরে এত কষ্ট করে আঁকা ছবি হয়ত কোন দর্শক এসে এক কথায় নাকচ করে দেন, হয়ত ড্রয়িং-এর তিনি কিছুই বোঝেন না, রঙ সম্বন্ধে তাঁর কোন কাণ্ডজ্ঞানই নেই—এমন সমালোচকের কলমের খোঁচাও সহ্য করতে হয়। কিন্তু তার চেয়েও দুঃসহ নিজের অতৃপ্তি। আজ যে ছবি এঁকে আত্মপ্রসাদের অন্ত নেই, দুদিন বাদে সেই ছবিই নিজের সহস্র দুর্বলতার প্রতিরূপ হয়ে ওঠে। ব্যর্থতায় নৈরাশ্যে মন অবসন্ন হয়ে থাকে। আর্টিস্টের কাছে আত্মধিক্কারের চেয়ে বড় ধিক্কার আর নেই। নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার সঙ্গে গগনস্পর্শী আকাঙ্ক্ষার পদে পদে আপসের মত দ্বিতীয় বিড়ম্বনা আর কী আছে?

খেদ শিল্পীর বৃত্তিতেও রয়েছে। রঙ আর তুলির মধ্যে মিশে আছে সেই বিষাদ। তবু তার স্বাদ অনন্য। তাই নিজের অখণ্ড জীবন তার জন্য উৎসর্গ করে রেখেছে রাজেশ্বর। আর-কাউকে ভাগ দেয়নি—আর কারও দাবি মিটাতে যায়নি। সংসার নয়, পরিবার নয়, ধর্ম নয়, রাজনীতি নয়, ব্যাপক বন্ধুসমাজ নয়, নারীসঙ্গ নয়। নেতি নেতি করে যে ব্রহ্মকে সে জানবার চেষ্টা করে চলেছে, সে তার শিল্প। তাকে সে সুলভ পণ্য করে তোলেনি। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সে অন্যের নয়নসুখকর করেনি। তাতে অর্থের ক্ষতি হয়েছে, যশের ব্যাপ্তি হয়নি। কিন্তু নিজের সঙ্কল্পে অটল রয়েছে রাজেশ্বর। তার দরকার ত বেশি নয়। জ্যেঠামশাইকে তাঁর দুই ছেলে মাসোহারা পাঠায়। তাঁর নিজের পেনশনের টাকাও আছে। রাজেশ্বরের কাছ থেকে টাকা তিনি কিছুতেই নিতে চান না। বলেন, 'ও-টাকা দিয়ে তুই রঙ কিনিস, ও-টাকা আমাকে দিতে হবে না।'

তারপর থেকে জ্যেঠামশাইকে কিছু আর দিতে যায় না রাজেশ্বর। কিন্তু সোনা-মার হাতে কিছু কিছু ধরে দেয়। পোশাকের জন্যেও বেশি ভাবনা নেই রাজেশ্বরের। দুখানা ধুতি, দুটি খদ্দরের পাঞ্জাবি আর দুটি পাজামাতেই পাঁচটি ঋতু কাটে। শীত কলকাতায় সংক্ষিপ্ত। তীব্রতাও কম। পোশাক পরিচ্ছদ মন্দাকিনীই জোগান। বোনদের কাছ থেকেও কিছু কিছু উপহার আসে।

এই কৃচ্ছ্রতার সার্থকতা কী—কোন কোন অন্ধকারঘন রাত্রে মনের কোণে প্রশ্নটা এখনও উঁকি দেয় রাজেশ্বরের। 'এই আমার স্বভাব', এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন সঙ্গত জবাব সে নিজেও দিতে পারে না। চেষ্টাও করে না। যেমন দিতে পারে না 'বিয়ে করলে না কেন' কোন কৌতূহলী বন্ধুর কি অনুরাগীর এই প্রশ্নের জবাব। সে জবাব একদিন হয়ত ছিল। আজ অস্পষ্ট হতে হতে একেবারে হারিয়ে গিয়েছে। আজকাল জ্যেঠামশাই কি সোনা-মাও বিয়ের কথা উল্লেখ করেন না। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন তাগিদ দিয়ে আর কোন লাভ নেই।

পূর্ণ মাঝে মাঝে এখনও ঠাট্টা করে বলে, 'বাংলা দেশে পুরুষের পক্ষে যে কাজটা সবচেয়ে সোজা তুমি তাকেই এমন কঠিন ভেবে বসলে। একমাত্র বিয়েটাই এখানে চোখ বুজে করা যায়।'

রাজেশ্বর হেসে বলে, 'তার পরের ফলটা মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। বিবাহিত বন্ধুদের দেখে দেখে এটুকু বুঝতে পেরেছি।'

পূর্ণ বলে, 'দেখে শেখায় কোন কাজ হয় না। ঠেকে শেখাটাই আসল শেখা। কিন্তু তাও কি বলা যায়? ঠেকতে ঠেকতে শুধু ঠেকাটাই অভ্যাস হয়, শেখা আর হয়ে ওঠে না।'

মেয়েদের সম্বন্ধে পূর্ণ বড় বেশি অভিজ্ঞতার অধিকারী। তার বান্ধবীর সংখ্যা প্রচুর। মাঝে মাঝে জট পাকিয়ে যায়। দাম্পত্যকলহ থামতে চায় না। সালিশী করবার জন্যে ছুটতে হয় রাজেশ্বরকে। বিয়ের এই ত পরিণাম। দুদিন বাদেই স্ত্রীর চেহারা রক্ষাকালীর মত হয়ে ওঠে। রক্ষাকবচের মাহাত্ম্য আব থাকে না।

আলো নিবিয়ে দিয়ে এবার শুয়ে পড়ল রাজেশ্বর। এই স্টুডিওর মধ্যেই দেয়াল ঘেঁষে একখানা ছোট তক্তপোশ পাতা আছে। ছবি আঁকতে আঁকতে ক্লান্তি এলে শুয়ে গড়িয়ে নেয়। তা ছাড়া অনেক সময় শুয়ে শুয়েও ছবি আঁকে বাজেশ্বর। উপুড় হয়ে বুকের তলায় বালিশ চেপে স্কেচ করে। মেঝেয় বসে বসে ছবি আঁকাই বেশি অভ্যাস রাজেশ্বরের। চারদিকে রঙের বাটিগুলি ছড়ানো থাকে, মাঝখানে রঙ্গবাজ।

পাশেব ঘরখানাই আসলে শোবাব ঘর। সিঙ্গল বেডের খাটে ভাল করে বিছানা পেতে মশারি টাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছেন সোনা-মা। ছোট টেবিলটার উপব কাঁচের গ্লাস ঢাকা মাটির জলের কুঁজো আছে সে কুঁজো বাজেশ্বরেব নিজেব হাতে অলঙ্কৃত। শম্ভু রয়েছে, ছোকবা চাকর। তবু সোনা-মা নিজের হাতে এসব করবেন। শুতে যাবাব আগে ওই মোটা শবীর নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে একবাব করে তাগিদ দিয়ে যাবেন, 'রাজু, অনেক বাত হল বাবা, যা এবার ঘুমো গিয়ে।'

আজও এসেছিলেন। বাবা মা ছেলেবেলায় বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছেন। জ্যেঠাইমার মধ্যে নিজেব মাকে পেয়েছে বাজেশ্বব।

কিন্তু পাশের ঘবে ভাল বিছানা থাকা সত্ত্বেও আজ আর তার উঠে যেতে ইচ্ছা করল না। মাথার নীচে পুবানো আর্ট-জার্নালগুলো জড়ো করে বালিশ তৈবি করল। পাশের ঘরটা বড় নিঃসঙ্গ। কিন্তু এ-ঘরে তার সঙ্গী আব সঙ্গিনীব অভাব নেই। এই ঘবের চার দেয়াল তাব স্থায়ী আর্ট গ্যালারি। শুধু নদী প্রান্তর পশু পক্ষী লতা পাতা নয়, তার হাতের আঁকা অনেক নবনাবীও দেয়ালে দেযালে স্থিব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে ছবিগুলি বদলায় বাজেশ্বব। উলটে-পালটে নতুন কবে সাজিয়ে দেয়। কিছুদিন আগে একটি সাঁওতালী মেয়ের ছবি এঁকেছে বাজেশ্বব। পূর্ণ তার খুব প্রশংসা কবেছে। বিশেষ করে দুটি চোখেব। বাজেশ্ববেব হাতে মেয়েদেব চোখ নাকি সবচেয়ে ভাল ফোটে। বাস-স্টপে সেই মেয়েটিব চোখও বড সুন্দর ছিল। কিন্তু তার দৃষ্টিতে কী ছিল কে জানে? ঘুমবাব আগে সংশয়েব খোঁচা লাগল রাজেশ্বরেব মনে। মেয়েটি যদি ভুল বুঝে থাকে, সে ভুল ভাঙবার কি কোনও উপায় নেই?

পরদিন রাজেশ্বরের ঘুম ভাঙল দেবিতে। বাত বেশি জাগলে সে একটু বেলা করেই ওঠে। অনেকদিন ছবি নিয়ে কাজ কবতে করতে বাত শেষ হযে যায়। কিন্তু কাল সেভাবে জাগেনি। এমনিতেই কিসের একটা অস্বস্তিতে ভাল ঘুম হয়নি কাল।

হাত মুখ ধুয়ে চা-টা খেয়ে জ্যেঠামশাইয়ের ঘরে কাগজের হেড-লাইনগুলোতে চোখ বুলিয়ে ফেব এসে বসল ছবি নিয়ে। কিন্তু মন বসল না। দু নম্বর তুলিটা সবিয়ে বাখল বাজেশ্বর। যখন কাজে মন এগোয না, হাতটাও সে পিছিয়ে নেয়। এইটুকু স্বাধীনতা তার আছে। সে কারও দাস নয়। কারও ফবমায়েস সে খাটে না, এমন কি নিজেবও নয়। তার রঙ শুধু অনুরাগেব রঙ। তার আনুগত্য শুধু তার শিল্পের কাছে। আর কাবও কাছে নয়।

বাইরে দেয়ালঘড়িতে ঢঙ করে একটা শব্দ হল। পেরেকে ঝুলানো হাতঘড়ির সঙ্গে মিলিয়ে নিল রাজেশ্বর। সাড়ে দশটা। আর-কিছু বলতে হল না। ঘড়ির কাঁটার মতই ঠিক যান্ত্রিকভাবে কয়েকটা কাজ করে গেল বাজেশ্বর। পাজামা ছেড়ে কাপড় পরল, পাঞ্জাবি পরল, তারপব কিসের তাগিদে বেরিয়ে পড়ল বাড়ি থেকে।

মন্দাকিনী একবার জিজ্ঞাসা করলেন, "ও রাজু, কোথায় যাচ্ছিস? তোর কি দরকার বল না, আমি শম্ভুকে দিয়ে আনিয়ে দিচ্ছি।"

রাজেশ্বর মুখ ফিরিয়ে বলল, "শম্ভুকে দিয়ে সে কাজ হবে না সোনা-মা। আমি আসছি।"

তারপর জোর পায়ে হাঁটতে শুরু করল। তাদের গলি থেকে বড় রাস্তার মোড় মিনিট পাঁচেকের বেশি নয়। রাজেশ্বরের আড়াই মিনিট লাগল।

একটা বাস স্টপ ছেড়ে পুবমুখে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। রাজেশ্বর ভাবল, যাঃ, চলে গেল। এই বাসে যদি গিয়ে থাকে তা হলে আর কোন আশা নেই।

হরিণাক্ষীর বদলে বিড়ির দোকানের মালিকের সঙ্গেই আজ প্রথম চোখাচোখি হল। হাসল দোকানী, তার দাঁতগুলি কালো, চোখ দুটি লালচে, গায়ের গেঞ্জিটি আধ-ময়লা, পরনের লুঙ্গিটি গাঢ় নীল।

দোকানী বলল, "এই যে বাবু, আজ কিছু নেবেন ?"

রাজেশ্বর সঙ্গে সঙ্গে বলল, "হ্যাঁ নেব। এক প্যাকেট সিগারেট দাও ত।"

"কী সিগারেট দেব ?"

"দাও যে কোন একটা। দিলেই হল।"

দোকানী হেসে বলল, "আপনি কি সিগারেট ধরেছেন নাকি বাবু ?"

রাজেশ্বর বলল, "না, আমি ধরিনি। বন্ধুদের জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। আজও দু-একজনের আসবার কথা আছে।"

খুচরো পয়সা কত দিল গুনে দিল না রাজেশ্বর, তার বদলে যে বস্তুটা নিল তার দিকেও তাকিয়ে দেখল না।

রাজেশ্বর ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে বলল, "আচ্ছা, ওই ছবিটা কি তোমার খুব ভাল লাগে ?"

দোকানী যেন লজ্জায় মরে গেল। মাথা কাত করে একটু জিভ কেটে বলল, "পাইকার দিয়েছে বাবু তাই নিলাম।"

রাজেশ্বর বলল, "আচ্ছা, যদি ওই ছবিটার বদলে আর-একটা ছবি তোমার দোকানে এনে টাঙিয়ে রাখি— বেশ ভাল ছবি —।"

দোকানী বলল, "এ-ছবিও বেশ ভাল বাবু। পাইকার আমার বন্ধু। তার হাতের দেওয়া জিনিস কি সবানো ভাল।"

তারপর একটু হেসে বলল, "আপনার যদি পছন্দ হয়ে থাকে বাবু, আর-একটা ক্যালেণ্ডার বরং আপনাকে এনে দেব।"

কিছুকাল ধরে রাজেশ্বরের খেয়াল হয়েছে তাদের ছবিকে জনপ্রিয় না হোক জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত করতে হলে চারদিকে সস্তায় ছড়িয়ে দিতে হবে। শুধু বছরে দুবার একবার আর্ট-এক্‌জিবিশনে সেই পরিচয় গড়ে উঠবে না। সেই এক্‌জিবিশনে কজন লোক যায়, কবার করে যায় ? কজনই বা ছবি দেখবার জন্যে যায় সেখানে ? যাওয়াটা ফ্যাশান বলেই যায় বেশির ভাগ দর্শক। তারা ছবি দেখে না। পনের মিনিটের মধ্যে চার শ ছবির উপর চোখ বুলিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বান্ধবীর সঙ্গে গল্প করে। এই দলের দর্শকই ত বেশি। কিন্তু ছবি দেখা কি অতই সহজ ? এ কি ঘড়ি দেখা যে, নিমেষের মধ্যে সময়টা জেনে নেওয়া গেল ? একখানা ছবি দেখতে হলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দর্শককে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। শিল্পীর যত সময় লেগেছে প্রায় সেই সময় দিতে হয়। নানা সময়ে নানাভাবে দেখতে হয় ছবিকে। তবে ত দর্শন সম্পূর্ণ হয়। ছবি দেখবার সেই চোখের বড় অভাব এদেশে। সেই চোখ তৈরি করতে হবে। সাধারণের মধ্যে শিল্পপ্রীতির উদ্বোধন করা চাই। সেই উদ্বোধন শুধু সাম্বৎসরিক প্রদর্শনীর উদ্বোধনে চলবে না, ন্যাশনাল গ্যালারি প্রতিষ্ঠাতেও সম্ভব হবে না। তাদের ছবিকে ঘরে ঘরে, হোটেলে রেস্টুরেন্টে দোকানে ছড়িয়ে দিতে হবে। যাতে লোকে ভাল ছবি সম্বন্ধে সচেতন হয়। ক্যালেণ্ডারে নয়, সাবান তেলের বিজ্ঞাপনে নয়, বইয়ের মলাটে নয়, সত্যিকারের ছবির প্রচারের জন্য আরও কি ভাল কোন উপায় বার করা যায় না ?

"বাবু, পান নেবেন একটা ?" দোকানী হেসে বলল, "বেশ মিঠে পান বাবু।"

রাজেশ্বর বলল, "না, না, পান আমি খাইনে। আচ্ছা, তোমার দোকান যদি আমি নিজের হাতে সাজিয়ে দিই, তোমার ওই ক্যালেণ্ডার থাকুক, আরও দু-একটা ছোট ছোট ছবি যদি এনে টাঙিয়ে দিই—"

দোকানী হেসে বলল, "কেন অত কষ্ট করবেন বাবু ? আমার দোকান কি সেইরকম দোকান ?

তেমন ভাগ্য কি করে এসেছি ? আপনারা যদি এখানে এসে মাঝে মাঝে পানটা বিড়িটা খান, দু-একজন খদ্দেরকে চিনিয়ে দেন, তা হলে বড় উপকার হয়। ওই যে তিনি এসেছেন।"

শেষ কথাটা অস্ফুট স্বরে বলল দোকানী। কিন্তু রাজেশ্বরের বুকের মধ্যে হাজার গুণ জোরে প্রতিধ্বনিত হল। কার কথা বলছে দোকানী ? অমন করে সামনের দিকে তাকিয়ে ও কী দেখছে ? কী ব্যাপার হতে চলেছে রাজেশ্বর তা জানে। সে তা অনুভব করতে পারছে। তবু কিছুতেই সে মুখ ফিরাবে না, চোখ তুলে তাকাবে না ওদিকে। দোকানীর লালচে চোখ কী করে মুগ্ধতায় সুন্দর হয়ে উঠেছে সে শুধু তাই লক্ষ্য করবে।

এক মিনিট গেল, দু মিনিট গেল। তারপর রাজেশ্বর ঠিক যেন যন্ত্রের মত ওদিকে তাকাল। এমন এক যন্ত্র, যা যন্ত্রীর শাসন মানে না, যা নিজের ইচ্ছায় চলে। ততক্ষণে সে রাস্তা পার হয়ে এপারে এসেছে। পরনে আজ চাঁপারঙের শাড়ি, গায়ে সবুজ রঙের ব্লাউস, হাতে নীলরঙের একটা একসারসাইজ বুক।

রাজেশ্বর চোখ তুলে তাকাতেই তার মনে হল মেয়েটি মৃদু হাসল। সঙ্গে সঙ্গে রাজেশ্বরের বুকের রক্ত যেন জল হয়ে গেল। অপরিচিতার এই হাসির মানে কী ! কত নারীর মুখে তুলির টানে কত হাসি ভরে দিয়েছে রাজেশ্বর, কত ব্যঞ্জনার সঞ্চার করেছে, মোনালিসার হাসির অর্থ নিয়ে গবেষণা করেছে বন্ধুদের সঙ্গে, কিন্তু আজ একটি তরুণীর আকস্মিক মৃদু হাসি তাকে সন্ত্রস্ত করে তুলল। এ হাসি নিশ্চয়ই বলতে চাইছে 'তোমাকে চিনেছি। তুমি কালও নির্লজ্জের মত আমার দিকে তাকিয়েছিলে। আজও না এসে পারনি। বিড়ির দোকানের সামনে যারা এসে দাঁড়ায়, জটলা করে, তুমি তাদেরই একজন।'

না, এই ভুল ওর ভাঙতে হবে। যেমন করেই হোক ওকে বোঝাতে হবে, ও যা ভেবেছে তা ঠিক নয়। রাজেশ্বর দুরন্ত সাহসে নাগরিক বিধি ভঙ্গ করে আরও দু পা এগিয়ে গেল। তারপর কম্পিত গলায় বলল, "দেখুন, কিছু মনে করবেন না। কাল আমি আপনাকে একটি চেনা মেয়ে ভেবে---"

মেয়েটি হেসে বলল, "আমি আপনাকে চিনি।"

"চেনেন ?"

ঝড়ের সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে খেতে হঠাৎ যেন এক শ্যামল সুন্দর কূল পেয়ে গিয়েছে রাজেশ্বর : "আমাকে চেনেন ?"

মেয়েটি স্মিতমুখে বলল, "আপনাকে না চেনে কে ? প্রথম আপনাকে দেখি গতবার একাডেমির একজিবিশনে। আপনার দুখানা ছবি ছিল, আপনিও ছিলেন। ভেবেছিলাম আলাপ করব। কিন্তু আপনি একজন বিদেশী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। বোধ হয় একখানা ছবির ব্যাপার বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর সঙ্গে কথা শেষ করেই আপনি ব্যস্ত হয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন।"

রাজেশ্বর হেসে বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি হ্যাঙ্গিং কমিটির মেম্বার ছিলাম। তারই একটা ব্যাপারে—"

মেয়েটি বলল, "কালও ভাবলাম আপনার সঙ্গে আলাপ করব। কিন্তু আপনি কাল অন্যমনস্ক ছিলেন। সাহস পেলাম না।"

রাজেশ্বর মনে মনে বলল, 'সাহস পেলে না ! আজ কী অভয় তুমি আমাকে দিলে তা তুমি জান না।'

মেয়েটি হঠাৎ পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখছেন ? কোন একটা বাস আসবার নাম নেই। আজও বোধ হয় আমার এগারটায় ক্লাস করা হবে না।"

রাজেশ্বর বলল, "আপনার কি রোজ এগারটায় ক্লাস থাকে ?"

মেয়েটি বলল, "হ্যাঁ। আমাকে আপনি বলবেন না। আপনার মুখে আপনি শুনতে বড় লজ্জা করে। তুমি বলবেন। আমার নাম সুনন্দা। বাড়িতে সবাই নন্দা বলে ডাকে।"

রাজেশ্বর একটু ইতস্তত করে বলল, "আচ্ছা, তাই হবে।"

সুনন্দা বলল, "ওই আমার বাস এসে গেছে।"

বাসে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সুনন্দা। জানলার ধারে বসে বাইরের দিকে তাকাল। রাজেশ্বরের সঙ্গে চোখাচোখি হতে ফের হাসল একটু।

বাসটা চলে গেল।

নিশ্চিন্ত হল রাজেশ্বর। তৃপ্ত হল, মুগ্ধও হল। কাল যে ছিল অপরিচিতা, কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আজ তার সঙ্গে শুধু পরিচয় নয়, প্রায় ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। দুর্বোধ্য হাসির চেয়ে বোধ্য পরিচিত হাসি অনেক ভাল। সে হাসির মধ্যে অনেক আশ্বাস, নির্ভরতা আর অভয় মিশে রয়েছে। দুর্বোধ্য ছবির চেয়ে বোধ্য সহজগ্রাহ্য ছবি অনেক ভাল। সমস্ত জটিলতা শিল্পীর মনের মধ্যে ঘুরপাক খাক, তার রেখা যেন সরল হয়, সবল হয়, তার রঙ যেন পরিচিত ভাষায় কথা বলে। যে চোখের দেখা দেখবে, সেও যেন ছবি থেকে কিছুটা নিয়ে যেতে পারে, আবার যে অন্তরঙ্গ হতে চায়, গভীরে ডুবতে চায়, সেও যেন মাত্র হাঁটুজল দেখে নিরাশ হয়ে ফিরে না আসে। মহৎ শিল্পীর মধ্যে এই দুই লক্ষণই দেখতে পেয়েছে রাজেশ্বর। শিল্পী নিজে পরিশ্রম করবেন, রূপকে প্রকাশের জন্যে প্রাণপণ করবেন, কিন্তু যিনি দর্শক তিনি অনায়াসে তা দেখবেন। মহাকাব্যও তাই। তা বাচ্যার্থে সহজ, ব্যঞ্জনার্থে নিগূঢ়। কিন্তু এখন বাচ্য আর ব্যঞ্জনা এক হয়ে যাচ্ছে। অনধিকারীর পক্ষে সেখানে প্রবেশ নিষেধ। তুমি তাকে বলবে —অনধিকারী, সে তোমাকে বলবে অপটু। পূর্ণ রাগ করে বলে, "তবে কি আমরা সবাই মিলে পটুয়া হব? আমাদের কি বক্তব্য বদলাবে না, প্রতীক বদলাবে না, পদ্ধতি বদলাবে না? সেই দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে যে তাল রেখে না চলতে পারবে সেই গজেন্দ্রগামিনীকে ত আর কাঁধে তুলে নিয়ে দৌড়তে পারব না? সে গরুর গাড়িতে ধীরে সুস্থে আসুক।"

পূর্ণের কথার মধ্যে যুক্তি আছে। তবু রাজেশ্বরের মনে হয় তার কথাই একমাত্র কথা নয়, শেষ কথা ত নয়ই। আসলে যার যার তুলি তার তার হাতে হাতে। দক্ষতা, সিদ্ধির চেয়ে বড় ভাষ্য আর নেই।

রাজেশ্বর চলে আসছিল, দোকানী হঠাৎ ডাকল, "বাবু আর-কিছু নেবেন না?"

"সিগারেট ত নিলাম'

দোকানী হাসল "আমি ভাবলাম আর কিছু যদি আপনার দরকার হয়। আর এক প্যাকেট সিগারেট যদি নেন। একটা পান নিলেও পারতেন বাবু। খুব মিঠে পান।'

কালো কালো দাঁতগুলো আবার বের করল দোকানী। কী দুঃসাহস! রাজেশ্বরের সঙ্গে পরিহাস! তার দৈত্যের মত চেহারা দেখেও একটু ভয় হয় না ওর

কিন্তু পরক্ষণেই রাজেশ্বর হাসল। ওর ওপর রাগ করা বৃথা। হেরে গিয়ে দোকানীর ঈর্ষা বেড়ে গিয়েছে। সান্ত্বনাই ওর প্রাপ্য। রাজেশ্বর মনে মনে বলল, 'কেন, লাস্যময়ীতে মন ভরল না তোমার? তুমি তাকে নিয়ে থাক। আমি আমার লাবণ্যময়ীকে পেয়েছি।

রাজেশ্বর দোকানীর দিকে তাকিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে মৃদু হেসে বলল, "আচ্ছা তোমার পান এসে আর একদিন খাব। আজ যাই।"

সারাদিন বেশ ভাল কাটল রাজেশ্বরের। রঙের বাটিগুলি তুলে নিয়ে উঁচু টুলটার উপর রাখল। নিজের কাজ দেখে নিজেই খুশি হল তুলি চালাতে চালাতে গুন গুন করে সুর ভাঁজতে লাগল রাজেশ্বর, 'মায়াবন বিহারিণী।'

চমৎকার মুড এসেছে।

বিকেল বেলায় মন্দাকিনী এসে দাঁড়ালেন "রাজু খাবার-টাবার কিছু খাবিনে?"

রাজেশ্বর মুখ ফিরিয়ে বলল, "খাব সোনা মা। এখানেই পাঠিয়ে দাও।"

মন্দাকিনী তবু গেলেন না। মুখ টিপে হেসে বললেন, "রাজু, তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি।"

রাজেশ্বর মুখ ফিরিয়ে বলল, "বল না।"

মন্দাকিনী বললেন, "লুকিয়ে লুকিয়ে এই বয়সে ও-সব কী করা হচ্ছে শুনি?"

সোনা-মার মুখে হাসি। কিন্তু রাজেশ্বরের মুখ শুকিয়ে গিয়েছে, বুক দুক-দুক।

"কী সোনা-মা?"

মন্দাকিনী বললেন, "খুচরো পয়সার জন্যে তোর পকেটে হাত দিতে গিয়ে দেখি কী, ওমা, এক প্যাকেট সিগারেট। এসব আবার করে থেকে ধরলি?"

নিশ্চিন্ত রাজেশ্বর হো-হো করে হেসে উঠল, "ও, সেই কথা ? পূর্ণর জন্যে কিনেছিলাম সোনা-মা। কেন, আমি বুঝি ওসব খেতে পারিনে ?"

মন্দাকিনী হেসে বললেন, "না বাপু, তোমার ওসব খেয়ে কাজ নেই। ওসব তোমার সইবে না। তোমার জন্যে দই চিঁড়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

রাজেশ্বর স্মিতমুখে তাঁর দিকে তাকাল। পরনে সোনা-মার সাদা খোলের মিলের শাড়ি। কিন্তু পাড়ের রঙ টুকটুকে লাল। দুপাশের চুলের রঙ এরই মধ্যে সাদা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সিঁথির রঙ টুকটুকে লাল। ষাট পূর্ণ হয়ে গিয়েছে সোনা-মার। কিন্তু দাঁতগুলি আশ্চর্য, আজও অটুট রয়েছে। লোকে ভাবে বুঝি বাঁধানো। তা নয়। এখনও পরিষ্কার ধবধবে সাদা সুগঠিত দাঁত, আর পাতলা ঠোঁট দুটি টুকটুকে লাল। শুধু পানের রসে নয়, ওঁর গায়ের রঙও প্রথম যৌবনে দুধে-আলতায় ছিল। সেই আলতার আমেজ এখনও যায়নি। এত রঙ কি রাজেশ্বর প্রথম ওঁর কাছ থেকেই পেয়েছিল ? ওঁকে দেখেই চিনেছিল ? এই মাতৃমূর্তি রাজেশ্বর যে কতবার কত রকম করে এঁকেছে তার ঠিক নেই। পৌরাণিক আধুনিক কত মুখের সঙ্গে মিশিয়েছে ওই মুখের আদল তার হিসেব সে নিজেই জানে না। কখনও পার্বতীর কোলে গণেশকে দিয়েছে, কখনও যশোদার কোলে কৃষ্ণকে। সব মা-ই সোনা-মা। সব মাতৃরূপই এই রূপময়ীর।

মন্দাকিনী বললেন, "কিছু বলবি রাজু ?"

রাজেশ্বর বলল, "না, ইয়ে, হ্যাঁ। শিবু আর বীরুর চিঠি পেয়েছ ?"

মন্দাকিনী হেসে বললেন, "এই ত সেদিন এল। ওরা ত লেখে না, বউমারাই ওদের হয়ে লিখে দেয়। আজকাল বউরাই হয়েছে ছেলেদের প্রাইভেট সেক্রেটারি।"

মৃদু হাসলেন মন্দাকিনী।

রাজেশ্বরও হাসল। সেই শিবু আর বীরু—শিবেশ্বর রায় আর বীরেশ্বর রায়। দুজনেই কৃতী, নামজাদা। একজন খড়্গপুরে জিয়োলজির প্রফেসর, আর-একজন বোকারোয় ইঞ্জিনিয়ার। ওরা রাজেশ্বরের চেয়ে বয়সে ছোট—অনেক ছোট। কিন্তু দুজনেই পুত্র কলত্র নিয়ে পুরো গৃহস্থ।

রাজেশ্বর বলল, "বত্না আর চন্দাকে এ মাসে আনলে না সোনা-মা ?"

মন্দাকিনী হেসে বললেন, "সব মাসে কি আর আসতে পারে বাপু ? কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সব অস্থির। কোনটার সর্দি, কোনটার কাশি। কেন, তুইও ত গিয়ে ওদের দেখে আসতে পারিস। শিবু-বীরুরাই না হয় দূরে থাকে। ভবানীপুর বালিগঞ্জ ত আর দূরে নয়। কিন্তু তুই কি আর তোর কোটর ছেড়ে নড়বি ?"

আর-একটু দাঁড়িয়ে থেকে মন্দাকিনী চলে গেলেন। সত্যিই জ্যেঠতুতো বোন দুজনকে অনেকদিন দেখতে যাওয়া হয় না।

রাজেশ্বর ক্যানভাসে উলঙ্গ ছেলের কটিতে একটি লাল তাগা পরিয়ে দিল।

'কাচ্চাবাচ্চা।' রাজেশ্বর মনে মনে হাসল, 'কাচ্চাবাচ্চা।' হ্যাঁ, শিশুর ছবিও অনেক এঁকেছে রাজেশ্বর। অনেক। কিন্তু তাদের কণ্ঠে কি কাকলি ভরে দিতে পেরেছে ? নিজে শুনেছে সেই কাকলি ? ছবির শিশুর কাকলি কি কানে শোনা যায় ? না—না—না। হাসিও শোনা যায় না, কান্নাও শোনা যায় না। কূজনও শোনা যায় না, গুঞ্জনও শোনা যায় না। কানের ভিতর দিয়ে নয় তার ছবি দুটি দৃষ্টির মাধ্যমে মরমে প্রবেশ করতে চায়। স্পর্শ করতে চায়, স্পর্শ পেতে চায়।

আজও অনেক রাত অবধি জেগে কাজ করল রাজেশ্বর। পরদিনও সকালে তুলি চলল। কিন্তু সাড়ে দশটায় এসে আবার একটি ঢং করে শব্দ। তুলি থামল। আশ্চর্য, ঘড়ি ত এমন আধঘণ্টা অন্তর অন্তরই বাজে। সব বাজনা কানেও যায় না। কিন্তু সাড়ে দশটার এই একটি মাত্র শব্দ যেন সেতারের সাতটি তারের ঝঙ্কার তুলেছে। আর তার পরই হৃদকম্প। রাজেশ্বর পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়াতে যাচ্ছিল, কিন্তু গেল না। রিস্ট ওয়াচের কাঁটাটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দু ঘণ্টা শ্লো করে দিল। সাদা দেয়ালে নিজের কালো অনাবৃত পিঠটাকে চেপে ধরল শক্ত করে। 'না রাজেশ্বর, আজ তুমি যেতে পারবে না। আজ তোমার যাওয়ার একটি মাত্রই অর্থ হবে। দোকানী তার কালো দাঁতগুলো দেখিয়ে আবার হাসবে। আশেপাশের খদ্দের-বন্ধুরা যারা তোমাকে দু'দিন ধরে লক্ষ্য করছে তারা

চোখ চাওয়া-চাওযি কববে। আব ভাগ্যক্রমে সেই কুন্দদন্তীব দেখা পেয়েও তাব হাসি দেখতে পাবে না, দৃষ্টিব প্রসন্নতা দেখতে পাবে না। এই তৃতীয় দিনেও তোমাকে একই সময একই জাযগায় একই অবস্থায দাঁড়িযে থাকতে দেখলে সে লজ্জিত হবে, বিব্রত হবে, বিস্মিত হবে। কাল তুমি জিতে এসেছ, আজ গেলে হাববে। নিজেব কাছে হাববে, তাব কাছে হাববে। সবচেযে চবম হাবা নিজেব কাছে হাবা। সবচেযে বড ধিক্কাব আত্মধিক্কাব। তা ছাডা গিযে তুমি আব কীই বা পাবে। যা পাবাব তা ত তুমি পেযেছ, যা নেবাব তা ত তুমি নিযেছ। আব তোমাব মডেল দিযে কী দবকাব। এখন মনোভূমিতে মর্মবমূর্তিতে প্রতিষ্ঠা কব, আব কোন মূর্তিব দিকে তাকিযো না।'

কঠিন আত্মশাসনে তৃতীয দিন গেল, চতুর্থ দিন গেল, কিন্তু বাত্রি বুঝি আব কাটে না। এই দুদিন ধবে বাজেশ্বব শুধু শিক্ষক, সংস্কাবক, নীতিবিদ। কিন্তু শিল্পী নয। দুদিন ধবে শুধু শাসন আব অনুশাসন চলছে, কিন্তু তুলি অচল। বঙেব বাটি শুকনো। হঠাৎ বাজেশ্বব খাঁচায-ভবা খোঁচা-খাওযা বাঘেব মত গর্জন কবে উঠল, 'না না না। আমি সমাজ চাই না, শিক্ষা চাই না, নীতি চাই না, আদর্শ চাই না। আমি শুধু আমাব বঙেব স্রোত চিবপ্রবাহিত বাখতে চাই। তাব জন্যে মদেব দবকাব হলে মদ চাই, মাংসেব দবকাব হলে মাংস চাই।'

ঘবেব দবজা বন্ধ, জানলা বন্ধ বাজেশ্ববেব মুখ বন্ধ। বনেব বাঘ শুধু মনেব মধ্যে গর্জন কবতে লাগল। বঙেব সমুদ্রে আজ বক্তেব তবঙ্গ উত্তাল হযে উঠেছে।

পঞ্চম দিনে দশা আবও সঙিন দেখে খাঁচাব বাঘকে বাজেশ্বব ছেড়ে দিল। কিন্তু যাবে যে, সবাই যে তাকে চিনে ফেলবে। আপনাকে না চেনে কে। সে বলেছিল। কথাটায আতিশয্য আছে। তাব সঙ্গে অলঙ্কাব নেই উক্তিতে অলঙ্কাব। কিন্তু তাব ঝঙ্কাবও কি মধুব। সবাই চেনে না, কিন্তু পাডাব অনেকেই ত তাকে চেনে। তাব দেখা যে তাবা দেখে ফেলবে। এমন কোন ছদ্মবেশ কি নেই, যার মধ্যে নিজেকে লুকিযে বাখতে পাবে বাজেশ্বব? যাকে সে দেখবে অথচ তাকে কেউ দেখতে পাবে না, চিনতে পাববে না।

হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়ে গেল। উপুড হযে হামাগুড়ি দিযে তক্তপোশেব তলায খুঁজতে লাগল বস্তুটা। পাওযা গেল একটা মুখোশ। পাডাব ক্লাবেব ছেলেদেব একবাব মুখোশপবা অভিনযেব আইডিযাটা সে ই দিযেছিল। তাদেব জন্যে তৈবি কবে দিযেছিল কযেকটা মুখোশ। চিহ্ন হিসাবে একটা পড়ে আছে বাক্ষসবাজ বাবণেব মুখোশটা। তাবই হাতেব আঁকা বড বড চোখ, নাক আব বিশাল গোঁফ। বাজেশ্বব নিজেব মুখে এটে দিল সেই মুখোশটা। তাবপব আযনাব সামনে দাঁড়িযে নিজেই হাসল। বাঃ চমৎকাব মানিযেছে। আস্তে আস্তে বাজেশ্বব খসিযে নিল মুখোশটা।

হঠাৎ চোখে পডল পেবেকে ঝোলানো তাব বঙিন মনিপুবী থলিটি। যখন বাইবে ছবি আঁকতে যায এই থলিটি ঝুলিযে নেয কাঁধে। ভবে নেয স্থূল সূক্ষ্ম কতকগুলি তুলি, বঙেব প্যাকেট, কাগজ, পেনসিল, স্কেচবুক। আজও তাই নিল। আজও যেন বাজেশ্বব ছবি আঁকতে যাচ্ছে। আজ আপন বেশটাই তাব ছদ্মবেশ।

সেই বাস্তাব মোড। সেই সাডে দশটা। দশটা বেজে চল্লিশ হল। কিন্তু কই, তাব যে দেখা নেই। দোকানীব চোখ এড়াবাব জন্যে আজ বাজেশ্বব খানিকটা পূর্বদিকে সবে দাঁড়িযেছে। এখান থেকেও সব দেখা যায। সেই পথ সেই নবনগব, শুধু নাগবিকাব দেখা নেই। এগাবোটা বাজল, সাড়ে এগাবোটা বাবোটা।

শেষ বৈশাখেব কডা বোদ ক্রমেই চডছে, ক্রমেই চডছে। চাবদিকে আগুনেব হলকা। সাড়ে বাবোটা। ব্যাপাব কী? আজ কি ওব ক্লাস আবও দেবিতে? নাকি আজ একেবাবেই যাবে না?

বাসগুলোব যাতাযাতেব বিবাম নেই। যদিও লোকজন আজ কম। হযত বেলা-দুপুব বলেই চলাচল এমন বিবল হযেছে।

ছাতা মাথায এক ভদ্রলোক পাশ দিযে যাচ্ছিলেন বাজেশ্বব তাঁকে ডেকে বলল, "শুনুন।"

ভদ্রলোক ফিবে তাকালেন, "কী ব্যাপাব?"

বাজেশ্বব বলল, "আজ কি পর্বটর্ব আছে নাকি? আজ কি স্কুল কলেজ সব ছুটি?"

ভদ্রলোক অবাক হযে তাঁব দিকে একটু তাকিযে থেকে বললেন, "আজ বোববাব।"

তারপর হন হন করে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

রাজেশ্বর আর-একবার নিজেকে ধিক্কার দিল। ছি-ছি-ছি! তার কি কোন খেয়ালই নেই। একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছে? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তার? দিন ঠিক নেই, তারিখ ঠিক নেই, হল কী? অবশ্য আগেও এমন অনেকবার হয়েছে। কোন কোন ছবি নিয়ে দিনের পর দিন মাসের পর মাস কেটে গিয়েছে। ক্যালেণ্ডারের তারিখ বদলানো হয়নি। মনেও সেই পরিবর্তনের কোন সাড়া জাগেনি। তার ত অফিস-আদালত নেই। বার-তারিখের হিসাব রাখবার তার দরকারই বা কী! দিন নয়, তারিখ নয়, শুধু আলো আর আঁধারের খেলা। আকাশে মাটিতে লতায় পাতায় ফুলে ফলে বিচিত্র বর্ণ সমারোহ। তার ইতিহাস ত মাস তারিখে চিহ্নিত নয়, নীলে লালে সবুজে পীতে বিভক্ত। তার জীবনপঞ্জীতে পুজো নেই পার্বণ নেই শুধু রঙের উৎসব আছে। যেদিন উৎসব নেই, সেদিন অন্ধকার। কিন্তু অন্তরের রঙের সমুদ্র যখন উদ্বেল হত, এই সসাগরা পৃথিবী তার মধ্যে বিলীন হয়ে যেত, তার চিহ্নমাত্র চোখে পড়ত না। কিন্তু আজ ত আর সে কৈফিয়ত নেই রাজেশ্বরের। আজ সম্পূর্ণ ভিন্ন তারিখের বিভ্রম তাকে দিন তারিখ ভুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেই বিভ্রমও কী মধুর! কী বিচিত্র বর্ণের ইন্দ্রপাশে ঢাকা! সত্যের মুখ হিরন্ময় পাত্রে আবৃত। রাজেশ্বর সেই আবরণেই মুগ্ধ। সেই আবরণ উন্মোচন করবে কি, রাজেশ্বর সেই আবরণে আভরণ সংযোগ করে। তাকে নানা রঙে রাঙায়, লতায় পাতায় ফুলে অলঙ্কৃত করে। সোনা-মা আর রত্না-চন্দাদের ঘট কলসি, ধুনুচি আর বাকী নেই, সব রাজেশ্বরের রঙ আর রেখায় চিত্রিত। তার এই অভ্যাস আছে জেনে পাড়াপড়শী বন্ধুবান্ধব অনেকেই তার কাছে মাটির কি কাঠের পাত্রগুলি দিয়ে যায়। অবসর সময়ে রাজেশ্বর সেগুলি রঙিন করে। পারতপক্ষে সে কাউকে ক্ষুণ্ণ করে না। মনে মনে ভাবে, 'আমার এই ত কাজ, আমি এই জন্যেই ত এসেছি। আদিহীন অন্তহীন অস্তিত্বের মহাসমুদ্রে আমি এক রঙিন বুদ্বুদ।' মাটির ঘটে রঙ লাগাতে লাগাতে রাজেশ্বর ভাবে, 'মৃন্ময়ী, তোমার রঙের শেষ নেই, রসের শেষ নেই, রূপের শেষ নেই। তবু তোমার এই গালে আর ঠোঁটে আমি আমার তুলি বুলিয়ে গেলাম।'

কিন্তু আজ আর নিজের কাছে কোন কৈফিয়ত নেই রাজেশ্বরের। আজ সে হেরে গিয়েছে। কী ভাগ্য তার এই হার আর কেউ দেখতে পায়নি। কিন্তু মনের আর-এক কোণ থেকে গুঞ্জন উঠল, 'যদি একজন দেখতে পেত, সে সৌভাগ্যের সীমা থাকত না।'

রাজেশ্বরকে দেখতে পেয়ে মন্দাকিনী খুব বকলেন, "ছি-ছি-ছি, দিনের পর দিন তুই কী হচ্ছিস বল্ ত। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। তুমি একটা সাংঘাতিক অসুখবিসুখ ঘটাবে আমি বলে দিলাম রাজু।"

বিকাল বেলায় দুটি ছেলে এল দেখা করতে। তপন আর জয়ন্ত। আর্ট কলেজে একটি থার্ড ইয়ারে আর একটি ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। দুজনেরই ফাইন আর্টস। দুজনেই চারুদর্শন। বয়স একুশ-বাইশের বেশি হবে না। জয়ন্ত আবার কচি কচি দাড়ি রেখেছে। রাজেশ্বর হেসে বলল, "এ যুগে কি দাড়ি চলবে?"

আজকালকার ছেলে মুখচোরা নয়। হেসে জবাব দিল, "বলা যায় না। হয়ত এই সেঞ্চুরির লাস্ট ডিকেডে দাড়ি আবার ফিরে আসতে পারে। অনেকে বলেন এই বিংশ শতাব্দী ব্যারেন। অন্তত এই মধ্যভাগ। বোধ হয় একবিংশ ঊনবিংশের পূর্ব গৌরব ফিরে পাবে।"

"দাড়ির জোরে নাকি?" হেসে উঠল রাজেশ্বর।

ওরা ঘুরে ঘুরে তার ছবি দেখল। টেম্পারা, ওয়াশ। ওয়াটার কালার অয়েল। নিজেদের মধ্যে পুরনো ছবির সঙ্গে নতুন ছবির তুলনামূলক সমালোচনা করল।

তপন বলল, "আমাদের প্রফেসর ঘোষ আপনার কথা প্রায়ই বলেন।"

রাজেশ্বর বলল, "তাই নাকি?"

তপন বলল, "হ্যাঁ। তিনি বলেন এমন নিষ্ঠা নাকি আর দেখা যায় না। আর কোন আকর্ষণ নেই, ডাইভারশন নেই—।"

রাজেশ্বর আস্তে আস্তে বলল, "নিষ্ঠা দিয়ে ত বিচার না, সিদ্ধি দিয়ে বিচার। তাই হল একমাত্র

মাপকাঠি।"

তপন বলল, "কিন্তু নিষ্ঠা কি সিদ্ধির উপায় না? নিষ্ঠা ছাড়া কি কিছু হবার জো আছে।"

রাজেশ্বর যেন আত্মগতভাবে বলল, "নিষ্ঠা সিদ্ধির উপায় কিনা জানি না। তবে তাতে আত্মপ্রসাদ আছে। অন্য সব আকর্ষণ থেকে নিজেকে মুক্ত করে এনে শুধু একটিমাত্র ফরমের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখা। অন্য সব চিন্তা চেষ্টা ডিস্ট্রাকসন মাত্র। ছোট ক্যানভাস কিন্তু নিপুণ কাজ চাই।"

দিল্লীর একাডেমিতে রাজেশ্বরের ছবি গিয়েছে, সেখান থেকে গিয়েছে ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে। সে আলোচনা হল। দেশে ছবির বাজার কী করে প্রসারিত করা যায় শিল্পীসঙ্ঘ গড়বার সার্থকতা কী, কেন সেই সঙ্ঘ গড়ে উঠতে উঠতে বার বার ভেঙ্গে যায় তাই নিয়ে আলোচনা চলল। সোনা-মা চা আর খাবার পাঠিয়ে দিলেন।

সন্ধ্যা হয় হয় ওরা দাঁড়াল। বিদায় নেওয়ার আগে দুজনেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

রাজেশ্বর বলল, "আহাহা ওসব আবার কী।"

কিন্তু মন ফের প্রসন্নতায় ভরে উঠল। এই প্রণাম তাকে অনেক উঁচুতে তুলে দিয়েছে ঠিক এ সময় এই প্রণামের যেন বড় দরকার ছিল।

রাজেশ্বর ভাবল আশ্চয, সেও ওদেরই বয়সী। কি ওদের চেয়েও দু এক বছরের ছোট। উনিশের বেশি হবে না তার বয়স। তবু তাকে কেন এত ভয়, কেন তার চোখের দিকে তাকাতে সাহস হয় না, কেন উঁচু আসনে শুধু প্রণম্য হয়ে থাকতে ইচ্ছা হয় না কেন একেবারে সমতলে নেমে আসতে সাধ যায়।'

বস্তি চিত্রে আজ আর মন বসল না। ইজেলটা নীল পর্দায় ঢেকে রেখে নতুন একটি ল্যাণ্ডস্কেপ নিয়ে বসল রাজেশ্বর। ক্ষীণস্রোতা এক গ্রামের নদী। এক পারে দিগন্ত ছোঁয়া সবুজ শস্যের ক্ষেত। আর এক পারে শুধু একটি পথরেখা, সরু আর সাদা

এখন রং নয়, শুধু ড্রয়িং। শুধু পেনসিলের রেখা। কিন্তু পটের আগে মানসপট। সেখানে সবই ফুটে উঠেছে।

আজ একটু তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল রাজেশ্বর। আজও স্টুডিয়োর ঘরেই বিছানা পাতল। নেটের মশারিটা টানিয়ে নিল নিজের হাতে। দু-একটা মশা সেদিন বড় উৎপাত করেছিল। সেইজন্যেই ঘুম হয়নি।

আজও ঘুম এল না। বারোটা, একটা, দুটো, আড়াইটা। ঘড়ির ঘণ্টা শুনতে লাগল রাজেশ্বর আর হঠাৎ মনে হল তার মশারির পাশে কে একজন এসে দাঁড়িয়েছে। ঘরে আলো নেই কিন্তু জানলা দিয়ে বাইরের জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। আর সেই জ্যোৎস্নায় নেটের মশারির ফাঁক দিয়ে তাকে দিব্যি দেখা যাচ্ছে। তার দিব্য রূপ ঘর আলো করেছে। সেই দীর্ঘাঙ্গী তন্বী অসামান্য লাবণ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ পর্যন্ত যত রূপময়ীকে দেখেছে রাজেশ্বর, যত রূপময়ীর ছবি এঁকেছে তাদের সব রূপ ওই এক দেহাধারে এসে পুঞ্জীভূত হয়েছে। এই একই বরতনু ঘিরে তার সব সৃষ্টি সুধাবৃষ্টি করে চলেছে। 'রাজেশ্বর তুমি আমাদের চোখ দিয়েছ মুখ দিয়েছ নয়নে অধরে ক্ষুধা দিয়েছ, তৃষ্ণা দিয়েছ, কিন্তু সেই তৃষ্ণা মিটাবার উপায় ত বলে দাওনি। রাজেশ্বর, প্রাণের বিপুল চাঞ্চল্যকে তুমি রেখা আর রঙের বাঁধনে বেঁধে রেখেছ। আজ আমরা সেই বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছি। একটি শিখা একটি বাসনার আকার নিয়েছি। রাজেশ্বর, আজ আমরা আহুতি চাই।'

রাজেশ্বর মশারি তুলে সাগ্রহে বলল, "এস, এস, এসেছ।"

কিন্তু কে আসবে? ঘরে কেউ নেই। মেঝেয় সেই কাগজপত্র, এক কোণে ইজেলটা, আর-একদিকে সেই রঙের বাটিগুলো ছড়ানো রয়েছে। দেয়ালের ছবিগুলি স্থির অকম্পিত। ফ্রেম আর কাচের আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। রাজেশ্বর সুইচ টিপে আলো জ্বালল। তাতে নতুন কিছু দেখা গেল না।

ছি-ছি-ছি। রাজেশ্বর কি পাগল হয়ে গেল।

সেকি স্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ? তা ত নয়। সে ত সম্পূর্ণ জেগেই ছিল। একটুও ঘুমোয়নি। তবে কি এ দৃশ্য বাস্তব? না, তাও নয়। বাস্তবের চেয়েও যা বড়, বাস্তবের চেয়েও যা বেশি

শক্তিশালী এ সেই কল্পনা। আঁধারের পটে মনের তুলি দিয়ে আঁকা এ সেই নিজেরই মানসী মূর্তি। ছায়ার চেয়েও ছায়া। তবু তাতে কী জীবনস্পন্দন, প্রাণের কী পরিপূর্ণতা!

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। রাজেশ্বর কি ভয় পেল? ভূতের ভয় নয়, পরীর ভয়? বাস্তবেও ভয়, কল্পনাতেও ভয়? কিন্তু শুধুই কি ভয়? সেই ভয়ের সঙ্গে আরও কিছু কি মিশে নেই?

কুঁজোটা এ ঘরে এনে রেখেছিল। ঢকঢক করে খানিকটা জল খেল রাজেশ্বর। তারপর নিজের কাণ্ড দেখে নিজেই হাসল। না, অত ভীত নয় রাজেশ্বর। অনেক বিপদে আপদে সে দেহের শক্তিকে প্রয়োগ করেছে, গুণ্ডার আক্রমণ রোধ করেছে, নিজেকে বাঁচিয়েছে, অন্যকেও। দেহের শক্তি দিয়ে এই দেহকে বেঁধে রাখবে।

পাগলা, মনটাকে তুই বাঁধ। মন নয়, দেহকে বেঁধে রাখো। দেহ নিয়েই ত যত বিপত্তি। মনকে ছেড়ে দাও। তাকে কেউ দেখতে পায় না, ধরতে পায় না, ছুঁতে পায় না। তুমি অদৃশ্য হতে চেয়েছিলে। দেহকে ঘরের মধ্যে ধরে রেখে মনকে যদি অভিসারে পাঠিয়ে দাও তা হলে আর ছদ্মবেশের দরকার হবে না।

ফের শুতে আসবার আগে রঙের বাটিগুলি একটু গুছিয়ে রাখল রাজেশ্বর। রঙ আর রঙ। তারই হাতে তৈরি সবুজে নীলে লালে বিচিত্র বর্ণের সংমিশ্রণ। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল রাজেশ্বর। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'অনঙ্গ এ কী রঙ্গ তোমার। আমি ত তোমাকে চাইনি। আমি ত তোমাকে বারবার এড়িয়ে গেছি। আমি জানি তোমাকে প্রশ্রয় দিলে তুমি আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে। সেখান থেকে আর নাও ফিরতে পারি। কিংবা যদি বা ফিরি এই ধ্যানের আসনে ফের হয়ত বসবার ক্ষমতা আর আমার থাকবে না। আমার অনেক বন্ধুকেই ত জানি। যারা ফিরে এসেছে তারাও অবশ বিকলাঙ্গ। তাদের হাতের তুলি কাঁপে। আঁচড়ে দৃঢ়তা নেই, ঋজুতা নেই। তাই তোমার শত প্রলোভনেও আমি তোমাকে আমল দিইনি। কিন্তু একী রঙ্গ তোমার অনঙ্গ। তুমি আর কোথাও ঠাঁই না পেয়ে আমার রঙের বাটির মধ্যে অঙ্গ ডুবিয়ে বসে আছ।"

মদনকে ভস্ম করল না রাজেশ্বর, তা শুধু মহেশ্বরই করেছিলেন, করে বুদ্ধিমানের কাজ করেননি। রাজেশ্বর শুধু উপহাস করল—মদন আর মহেশ্বর দুজনকেই। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে ফের মশারির মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

পরদিন বেলা দশটা পর্যন্ত কাজ করল। তারপর তার হঠাৎ মনে হল পূর্ণর একবার খোঁজ নেওয়া দরকার। অনেকদিন ওদিকে যাওয়া হয়নি। কেবল পূর্ণই আসে। সে ত বড়-একটা যায় না। একবার যাওয়া উচিত। কী ভেবে থলিটাও কাঁধে নিল রাজেশ্বর। ভরে নিল রঙের বাটিগুলো তুলি আর কাগজ আর স্কেচ বুকটা। পূর্ণ যদি না ছাড়ে তা হলে ওর ওখানেই আজ সারাদিন কাটাবে। বিকেলে ওর ঘরে বসে, কি বাইরে কোথাও এসে ছবি আঁকবে।

মন্দাকিনী রান্না করতে করতে উঠে এলেন "আজ আবার কোথায় চললি, রাজু?"

রাজেশ্বর বলল, "একটু পূর্ণর ওখানে যাচ্ছি সোনা-মা। এবেলা আর ফিরব না।"

"ও মা, আমি যে তোর জন্যে আজ চিতল মাছের পেটি আনালাম।'

রাজেশ্বর বলল, "ও বেলা এসে খাব সোনা মা। মাছের পেটি আমার পেটে ঠিকই যাবে।"

মন্দাকিনী বললেন, "তা যা বাপু, একটু ঘুরে-টুরে আয়। কদিন ধরে এমন মুখ করে আছিস, তাকানোই যায় না। আসবার সময় বন্নার খবর নিয়ে আসিস। ওর ছেলেটার সর্দিকাশি, মেয়েটার আবার কান পেকেছে।"

বারান্দার ইজিচেয়ারখানায় হেলান দিয়ে সর্বেশ্বর তখনও কাগজ পড়ছেন। রাজেশ্বরকে দেখে মুখ তুলে বললেন, "কী, বেরুনো হচ্ছে?"

"হ্যাঁ জ্যেঠামশাই।"

সর্বেশ্বর একটু হাসলেন। ভাইপোর বৃত্তি সম্বন্ধে সস্নেহ উৎসাহ দেখিয়ে বললেন "নতুন ছবি-টবি কি কিছু মাথায় এল?"

রাজেশ্বর একটু মাথা চুলকিয়ে হেসে বলল, "কই আর—।"

সর্বেশ্বর ভরসা দিয়ে বললেন, "আসবে আসবে। বসে বসে একটু ভেবেটেবে নিস, তা হলেই আসবে। প্রতিভার একটা লক্ষণ হল নব নব উন্মেষশালিনী। নতুন চাই, নতুন চাই। আর এ যুগের যা হাওয়া তার চাই নিত্য-নতুন। হ্যাঁ, আর এক কথা। শোন, যেয়ো না। সেদিন এই কাগজেই তোমার সমালোচনা বেরিয়েছিল। তেমন ভাল লেখেনি। দেখে বড় দুঃখ হল। তোমার ওই শান্ত শিষ্ট মিঠে মিঠে ছবিতে আর চলবে না রাজু। যুগের হাওয়া বড গবম। কড়া কড়া জিনিস নিয়ে এস। ঝড ঝঞ্ঝা, বজ্র, বিদ্যুৎ এখন এই সব চাই। বিদ্রোহ বিপ্লব—খুব কড়া কড়া ব্যাপার। বুঝেছ ?"

রাজেশ্বর একটু মাথা চুলকিয়ে হেসে বলল, "তাই হবে জ্যেঠামশাই।"

তারপর রাস্তায় নেমে পড়ল। তাকে এই উপদেশ শুধু জ্যেঠামশাই নন, আবও অনেকেই দিয়ে থাকেন। কিন্তু সে যা সে তাই। তার তুলি ত অন্যেব হুকুমে চলবে না। তা হলে থেমে পডবে। তাব স্বভাবেব বাইরে ত আব যেতে পারে না। যাবা সুখ্যাতি করেন তাঁরাও বলেন, 'মিষ্টি, তোমার ছবি বড মিষ্টি।' শুনে প্রসন্ন হয় না রাজেশ্বর। আজকাল যেমন ভাল মানুষ বললে পুরো মানুষ বোঝায় না, তেমনি লেখা কি ছবিতে শুধু মিষ্টি বললে তার আড়ালে কেমন একটু অনুকম্পা মিশানো থাকে। প্রসাদগুণ আজকাল আব বড গুণ নয়। দর্শকেব চোখ ছবি দেখতে এসে বার বাব খোঁচা খাক, করকব করুক, তাও যেন ভাল। রাজেশ্বর জানে সে অত মিষ্টি নয়। না স্বভাবে, না ছবিতে। তার মনেব মধ্যে যে অকল্যাণেব আর-এক পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে সে তার খবর রাখে। ছবির আলো-ছায়াব মত সেখানেও যে আলো-আঁধাবের খেলা চলেছে সে তা জানে। তবে প্রকাশের বাধা কিসের ? তার নির্দিষ্ট রূপবোধেব ? রুচি আর রীতিব ? তবু মাঝে মাঝে নিজেকে বদলাতে ইচ্ছা করে রাজেশ্বরের, সাধ হয় পুনর্জন্মের। সেই নবজন্ম কি চূডান্ত ডিসিপেশন-এর মধ্যে একবার ডুব দিয়ে না উঠলে আর সম্ভব নয় ?

সেই বড রাস্তাব মোড। তাব ওপারে সেই সরু পথ, ছায়া-শীতল দীর্ঘিকা। এপারে রোদেব তাপ ফের শুরু হয়েছে। হঠাৎ দুই পা যেন আটকে গেল রাজেশ্বরের। কর্ণেব রথ বসে গিয়েছিল, তার পদরথ। নাকি কে যেন দুটি কাঁকন-পরা হাতে তাব পদযুগল জড়িয়ে ধরেছে, 'যেয়ো না, যেয়ো না।'

রাজেশ্বরের বাস চলে গেল, কিন্তু সে যেতে পারল না। সে অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর কাল যার দেখা পায়নি, আজ সে এল। কাল যে রোদে পুড়িয়েছে, আজ সে দূর থেকেই হাসি আর সুধার বৃষ্টি ঝরাতে ঝরাতে পাশে এসে দাঁড়াল।

সুনন্দা হেসে বলল, "আপনাকে যে কদিন দেখিনি।"

রাজেশ্বর বলল, "আমাকে কি তুমি রোজ দেখবে বলে আশা করেছ ?"

সুনন্দা লজ্জিত হয়ে বলল, "না, তা ঠিক নয়, তবে আপনি ত এ পথ দিয়ে যাতায়াত করেন। তাই বলছিলাম। আপনাকে বাসে করে যেতে আমি আরও অনেকদিন দেখেছি।"

রাজেশ্বর বলল, "তাই নাকি ? কই আমি ত দেখিনি।"

সুনন্দা বলল, "বাঃ, আপনারা কেন দেখবেন !"

রাজেশ্বর বলল, "তা ঠিক। আমাদের না দেখাই উচিত।"

সুনন্দা বলল, "আপনি বুঝি খুব উচিত-অনুচিত মানেন ? শুনেছি আর্টিস্টরা নাকি মানেন না ?"

রাজেশ্বর মেয়েটির এই প্রগলভতায় খুশি হল। তার ধারণা হল, ওর বয়স কম হলেও, মন পরিণত, জীবন সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

রাজেশ্বর বলল, "কেউ কেউ মানেন, কেউ কেউ মানেন না। কেউ বা শিল্পে মানেন, জীবনে মানেন না। কেউ বা উল্টো।"

সুনন্দা বলল, "ওই যে আমার বাস এসে পড়েছে। আপনি কোথায় যাবেন ?"

রাজেশ্বর বলল, "দমদমের দিকে।"

সুনন্দা খুশি হয়ে বলল, "তা হলে ত ভালই হল। আমরা একসঙ্গে যেতে পারব।"

রাজেশ্বর বলল, "হ্যাঁ, তা পারব।"

ঈর্ষাকাতর দোকানীর চোখের উপর দিয়ে রাজেশ্বর সুনন্দার সঙ্গে বাসে উঠল। একই সীটে বসল পাশাপাশি। জানলার ধারে সুনন্দা, সুনন্দার ধারে সে। বাস যশোর রোড ধরে এগোতে লাগল।

এই রাস্তা দিয়ে রাজেশ্বর জীবনে কতবার যে যাতায়াত করেছে তার ঠিক নেই। কখনও পূর্ণকে নিয়ে, কখনও অন্য বন্ধুর সঙ্গে, কখনও একা। কখনও বাসে, কখনও ট্যাক্সিতে, কখনও হেঁটে। ছবি আঁকতেও এসেছে, পথের ধারে গাছের তলায় বসে স্কেচ করেছে, অখ্যাত চায়ের দোকানে পিছনের বেঞ্চে বসেছে, এঁকে তুলেছে দোকানের মালিক আর খদ্দেরদের। কোনদিন বা নেমে গিয়েছে মাঠের মধ্যে কি পোড়ো কোন বাগান-বাড়িতে। চায়ের কাপকে করেছে রঙের বাটি, কি চীনামাটির প্লেটের চারদিকে থোকে থোকে রঙ রেখে নিয়ে কাজ করেছে। কিন্তু আজকের যাত্রা অন্য রকম, আজকের যাত্রা উদ্দেশ্যহীন, একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রা। সেই পরিচিত পথ, দোকান পাট, গাছপালা সব যেন আজ রঙ বদলেছে, রূপ বদলেছে। যেন এক অচিন দেশের কন্যাকে নিয়ে এক অচিন দেশে চলেছে রাজেশ্বর। সেখান থেকে যদি না ফেরে রাজেশ্বর, কোন ক্ষতি নেই। সেখানে এক নতুন জীবন, নতুন জন্মের স্বাদ পাবে রাজেশ্বর। সেখানে হয় ত তার আর কোন পরিচয়ই থাকবে না। এই খ্যাতি নয়, কীর্তি নয়, খ্যাতির স্পৃহা নয়, তা হারাবার আশঙ্কা নয়, শোক নয়, এই রাশ রাশ পুঞ্জীকৃত ছবির বোঝা নয়—কিছুই সে নিয়ে যাবে না। সেখানে সে শুধু একজনের সঙ্গী। তার আর কোন দ্বিতীয় পরিচয় নেই, পরিচয়ের প্রয়োজন নেই।

কিন্তু সুনন্দা জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা, আপনি কখন ছবি আঁকেন?"

এক ভিন্ন জগৎ থেকে রাজেশ্বর যেন ফিরে এল। "কী বলছ।"

"কখন ছবি আঁকেন আপনি?"

রাজেশ্বর বলল, "ও। তার কি কিছু ঠিক আছে? যখন ভাল লাগে তখনই আঁকি। সব সময়ই আমার সময়। আবার দিনের পর দিন যায়, যার কোন একটি মুহূর্তও আমার নিজের নয়।"

সুনন্দা বলল, "আপনার বুঝি সেই রকম হয়? কারও কারও আবার শুনেছি বাঁধা সময় থাকে। কেউ বা সকালে, কেউ বা বিকেলে, কেউ বা গভীর রাত্রে। আচ্ছা কী করে অত ছবি আঁকেন বলুন ত? আমি ত একখানাও আঁকতে পারিনে।"

রাজেশ্বর একটু হাসল "তোমার পেরে কী দরকার? তুমি নিজেই ত একখানি ছবি।"

সুনন্দা লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করল।

তার সেই লজ্জা, তার সেই হাসি, তার সেই দুই গালের দুটি টোল মুগ্ধ চোখে উপভোগ করল রাজেশ্বর।

বাস চলতে লাগল। রাজেশ্বর ভাবল, চলুক। ওর যৌবন অনন্ত হোক, এই যাত্রা অনন্ত হোক, রাজেশ্বরের আর কোন কামনা নেই।

একটু বাদে সুনন্দা মুখ তুলে বলল, "আমার পিসীমাও তাই বলেন। তিনি বলেন আমি নাকি পটের বিবি। মোটেই তা নয়। আমি সংসারের অনেক কাজ করে দিয়ে তবে কলেজে বেরোই। তাই ত মাঝে মাঝে দেরি হয়ে যায়।"

রাজেশ্বর বলল, "তুমি বুঝি তোমার পিসীমার কাছে থাক?"

সুনন্দা বলল, "হ্যাঁ। বাবা ত নেই। মা আর আমি—"

রাজেশ্বর তাড়াতাড়ি করুণ কাহিনীর প্রসঙ্গকে এড়িয়ে গেল। করুণ রসের ছবি এঁকেছে। আর নয়।

"তোমার কোন ইয়ার হল এবার?"

সুনন্দা বলল, "থার্ড ইয়ার।"

"আর্টস?"

সুনন্দা বলল, "হ্যাঁ।"

রাজেশ্বর হেসে বলল, "থার্ড ইয়ার হল এ ইয়ার অব রোমান্স। আমাদের প্রফেসর সেন বলতেন।"

সুনন্দা আবার লজ্জিত হয়ে মুখ নিচু করল। তারপর জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

রাজেশ্বর ভাবল, কত অল্পসময়ের মধ্যে ও এত অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে। তার ছবির সঙ্গে ওর পরিচয় আছে বলেই কি এই ঘনিষ্ঠতা হয়েছে ? আলাপের পটভূমি আগেই রচিত হয়ে রয়েছে। এখন শুধু তার ওপর রেখা আর রঙের কাহিনী।

এত অল্প সময়ের মধ্যে কারও সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে রাজেশ্বরও এর আগে পারেনি। আজ কী করে পারল ? না পারবে কেন ? এই কদিন ধরে এত কাছে কাছে রাজেশ্বরের আর কেই বা আছে ? বাস্তবে কল্পনায় স্বপ্নে চিন্তায় দর্শনে অদর্শনে দিব্যদর্শনে এমন কাকে আর পেয়েছে রাজেশ্বর ?

হঠাৎ সুনন্দা বলল, "আমাকে সামনের স্টপটায় নামতে হবে।"

রাজেশ্বর বলল, "সে কী ! তোমার কলেজ ত আর দুটো স্টপ পরে।"

সুনন্দা সংকুচিত হয়ে বলল, "আমাকে এখানেই আগে নামতে হবে। এগারোটায আজ আর আমার ক্লাস নেই।"

রাজেশ্বর উল্লসিত হয়ে বলল, "তা হলে ত ভালই হল। চল, আমিও নেমে পড়ি। কোথাও বসে তোমার একটা স্কেচ করে নেব।"

সুনন্দা একটু ইতস্তত করে বলল, "আপনি নামবেন ? আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি আরও ওদিকে যাবেন !"

মেয়েটি ত বেশ চালাক। রাজেশ্বর বুঝতে পারল সে ওর সঙ্গে যায়, তা সুনন্দার ইচ্ছা নয়।

রাজেশ্বর হেসে বলল, "আমাকে তুমি আরও দূরে পাঠিয়ে দিতে চাইছ ? বেশ।"

হঠাৎ রাজেশ্বরের মনে একটা সংশয় উদগ্র হয়ে উঠল : "তুমি কি এখানে কারও সঙ্গে দেখা করবে ?"

সুনন্দা লজ্জিত হয়ে ফের একটু চুপ করে থেকে বলল, "হ্যাঁ।"

তারপর রাজেশ্বরের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে পরম নির্ভয়ে পরম বিশ্বাসে গোপনতম কথাটি প্রকাশ করে বলল, "হ্যাঁ। আপনি আর্টিস্ট আপনি ত সব বোঝেন। ও আপনার খুব ভক্ত। আপনার নাম ওই আমার কাছে প্রথম করে, আপনার ছবি ওই আমাকে প্রথম চিনিয়ে দেয়। এর আগে ছবিতে আমার কোন ইনটারেস্টই ছিল না। ওর জন্যেই—সব ওর জন্যেই। একদিন আপনার ওখানে নিয়ে যাব।"

রাজেশ্বর অস্ফুটস্বরে বলল, "বেশ ত।"

সুনন্দা বলল, "এই জন্যেই আপনাকে সব বললাম। আপনি আর্টিস্ট, আপনি সব বুঝবেন। আপনি যেন কাউকে আবার--"

রাজেশ্বর মাথা নেড়ে বলল, "না না না।"

সুনন্দা একটু ইতস্তত করে বলল, "আজও অবশ্য আলাপ করিয়ে দেওয়া যায়। আপনার কাছে কোন লজ্জাও নেই, ভয় নেই। প্রথম দিন দেখবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি যেন আপন হয়ে গেছেন। তার আগে এত ছবি দেখেছি আপনার। ওদের বাড়িতেও আছে দু-একখানা। আপনি কি তা হলে নামবেন ?"

রাজেশ্বর ক্ষীণ অস্ফুটস্বরে বলল, "না না না।"

না না না। না না না। এরপর থেকে শুধু না না না। সুনন্দা নেমে গেল।

আরও কয়েকটা স্টপ এগিয়ে রাজেশ্বরও নামল। আজকের রোদ আরও কড়া, মেঘান্তরিত রোদের মত দুঃসহ। সেই তাপের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল রাজেশ্বর। বড় রাস্তা দিয়ে যাত্রিবোঝাই বাসগুলো যাচ্ছে আসছে। কিন্তু কিছুই যেন চিনতে পারছে না রাজেশ্বর। সত্যিই সে এক অচিন দেশে এসে পড়েছে। কিন্তু কেউ আর কাছে নেই। সে এখন নিঃস্ব নিঃসঙ্গ। যে বজ্রবিদ্যুৎ ঝড়ঝঞ্ঝার কথা জ্যেঠামশাই তখন বলেছিলেন তা সব যেন তার বুকের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে। সে বাসা বুঝি এখনই ভেঙে যায়। খড়কুটোর মত উড়ে যায় নিরুদ্দেশ হয়ে।

খানিকক্ষণ বাদে এক পোড়া ইঁটের পাঁজার সামনে রাজেশ্বর নিজেকে আবিষ্কার করল। আশেপাশে ঊষর ধূসর পোড়োজমির বিস্তার। ইঁটখোলার ইঁট পুড়ছে। কতকগুলি ইঁট পুড়ে

একেবাবে ঝামা হযে গিযেছে। অস্নাত অভুক্ত বাজেশ্বব সে দিকে তাকিযে চুপ কবে বসে রইল।

পশ্চিমেব আকাশে সূর্য আস্তে আস্তে দিগন্তেব দিকে নামছে। ও আবাব কালই উঠবে।

কিন্তু বাজেশ্বব কি ফেব উঠতে পাববে ? এই পতন, এই লজ্জা, এই পবম পবাভব থেকে সে কি আব ফেব উঠে দাঁড়াতে পাববে ? বাজেশ্বব নিজেব কাছে কোন জবাব পেল না।

তাবপব আস্তে আস্তে যেন অভ্যাসবশেই থলিটা কাঁধ থেকে নামাল। হাতড়ে হাতড়ে বেব কবল স্কেচবুক আব পেনসিলটা। তাবপব একটা সাদা পাতা খুলে আঁকিবুকি কাটতে লাগল। এও বহুদিনেব অভ্যাস। তা ছাড়া আব-কিছু নয। প্রথমে অর্থহীন বাঁকাচোবা বেখাব জঞ্জাল। তাবপব সূয অস্ত যাওযাব আগেই বাজেশ্বব বিস্মিত হযে দেখতে পেল দুর্বোধ্য বেখাজালেব ভিতব থেকে আস্তে আস্তে একটি মুখ ফুটে বেরুচ্ছে। এখনও শুধু কুঁড়ি। কিন্তু কাল কি পবশুই একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মেব রূপ নেবে। বাজেশ্বব উল্লসিত হযে উঠল। একটি নতুন টেকনিকেব আভাস পাওযা যাচ্ছে। থলিব মধ্যে হাত ডুবিযে দেখল, বঙেব বাটিগুলি ঠিকই আছে। স্পর্শ পাওযা যাচ্ছে তাব নিজেব তুলিগুলিব। কিন্তু এখন নয এখানে নয। এখানে আব আলো নেই। আলোব জন্যে স্টুডিওতেই ফিবে যেতে হবে। সেখানে শতদল আস্তে আস্তে তাব পাপড়িগুলি মেলতে থাকবে। একটি কীট তাব মধ্যে ছিল কি ছিল না তা তুচ্ছ হযে যাবে। এই কটি দিনেব বেদনা গ্লানি আব পবাভব, শ্রান্তি আব অশ্রান্তি, তৃপ্তি আব তৃষ্ণা হযত একদিন তাব নতুন ছবিব উপকবণ হযে উঠবে হযত ফেব তাব বঙেব তবণী নানা আঘাটায ঠোকব খেতে খেতে ঘূর্ণিস্রোতে পাক খেতে খেতে ডুবতে ডুবতে ভাসতে ভাসতে সেই রূপলক্ষ্মীব ঘাটেব দিকে যাত্রা কববে

সন্ধ্যাব আবছাযায বঙিন থলিটা কাঁধে নিযে ফেব উঠে দাঁড়াল বাজেশ্বব।

ছদ্মবেশ এতক্ষণে ফেব তাব আপন বেশ হযেছে তাব একমাত্র ভূষণ

ভাদ্র ১৩৬৬

শ্বেতময়ূর

নীল বঙেব একটি দোতলা বাস পশ্চিম থেকে পুবে ছুটে যেতে না যেতেই নতুন ঘন নীলেব আব একটি বাস পুব থেকে পশ্চিমে ছুটে এল। আব শীলাদেব বাড়িব সামনেব স্টপটাতেই দাঁড়িযে পড়ল পোস্টেব গাযে আঁটা গোল চাকতিতে স্টপ বলে লেখা থাকলেও সব বাস এই স্টপে দাঁড়ায না। যাত্রী থাকলেও নয। 'বাঁধো বাঁধো' কবতে কবতে ড্রাইভাব ভাবী বাসটাকে আবও দবে স্কুলেব সামনে যে স্টপটা সেদিকে এগিযে নিযে যায। তাদেব বাড়িব সামনে বাস না থামলে মাঝে মাঝে শীলাব বাগ হয আবাব কোন কোনদিন সহানুভূতি হয ড্রাইভাবেব ওপব। বাস চালাতে শুরু কবলে তা বোধ হয আব থামাতে ইচ্ছা কবে না। মনে হয কেবলই চালাই কেবলি চালাই। বাসেব দোতলায একবাব উঠে বসলে শীলাব যেমন আব নামতে ইচ্ছা কবে না। মনে হয কেবলি চলি কেবলি চলি।

কিন্তু চলা তো আব সব সময যায না। আজকাল শীলা খুব কমই বাড়ি থেকে বেবোতে পাবে। সংসাবে অনেক কাজ তাছাড়া সে ঢেব বড় হযে গেছে। এখন কি আব যখন তখন বাইবে বেবোলে চলে ? কিন্তু বাড়িব বাইবে না গেলেও সিঁড়ি পর্যন্ত আসতে দোষ কি। বসবাব ঘবেব জানালা দিযে, কি সদব দবজাব আধখানা পাট মেলে, লোকজনেব চলাচল, ট্যাক্সি, কাব, আব বাস চলাচল দেখতে

তো দোষেব কিছু নেই। চলন্ত বাসেব ফাঁক দিয়ে মানুষকে দেখতে বড ভালো লাগে শীলার। এই পাডাব লোককেই মনে হয অচিন দেশেব মানুষ। মা অবশ্য তাব সদবে এসে দাঁডানো বেশি পছন্দ কবেন না। প্রাযই ধমক দেন, কি যখন তখন হাঁ কবে বাস্তাব সামনে এসে দাঁডিযে থাকিস? লজ্জা কবে না? ষোল উৎবে সতেবয পডলি এখনো কি সেই ছোটটি আছিস?' কিন্তু পডলই বা সতেবয। তাই বলে কি আব শীলাব দেখতে ইচ্ছা কবে না? এই গাছপালা লোকজন বোদবৃষ্টি পৃথিবীব সবই যে কত সুন্দব মা তো তা জানে না।

কি শীলাবাণী একেবাবে দোবেব সামনে এসে দাঁডিযে যে! আমাদেব অভ্যর্থনা কবার জন্যে নাকি?' বাস স্টপে নেমে বাস্তা পাব হযে দুজন ভদ্রলোক যে একেবাবে তাঁদেব বাডিব সামনে এসে দাঁডিযেছেন তা শীলা লক্ষ্যই কবেনি। নীল মেঘেব মত চলন্ত বাসটাই তাব দুটি কৌতূহলী চোখকে সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিযে চলেছিল।

একটু জিভ কেটে লজ্জিত ভঙ্গিতে শীলা পিছিযে এল। আগন্তুক হেসে বলল, 'ও কি, পালাচ্ছ কেন।

পালাবাব কিছু নেই। ছোডদিব বব অনিন্দ্যদা। আত্মীয। আপন জন। কিন্তু ওঁব পাশে উনি কে। অনিন্দ্যদাব চেযে মাথায আধ হাতখানেক লম্বা। দুধেব মত ফর্সা চেহাবা। সবুজ বঙেব একটা জামা গাযে আব চোখ দুটিও নীল নীল। কে উনি?

শীলা ফিসফিস কবে জিজ্ঞাসা কবল 'অনিন্দ্যদা কে উনি? উনি কি সাহেব?'

অনিন্দ্য সববে সগৌববে হেসে বলল 'অ্যাংলো ইণ্ডিযান ট্যাংলো ইণ্ডিযান নয, একেবাবে খোদ সাহেব। দ্বীপবাসী ইংবেজ তনয নয, কণ্টিনেণ্টেব জাত জার্মান।'

তাবপব আগন্তুকেব দিকে ফিবে অনিন্দ্য বলল,

Man, she is my sweet sister in law – the youngest the sweetest and the best.'

শীলা মৃদু তিবস্কাবেব সুবে বলল 'অনিন্দ্যদা ওকি হচ্ছে। আমি ছোর্ডদিকে ঠিক বলে দেব।'

কিন্তু ততক্ষণে সাহেব হাত এগিযে দিযেছে উদ্দেশ্য – কবকম্পন। পবমুহূর্তেই তাব কি মনে পডে গেল। জোডহাত কপালে তুলে বলল — নো মস্কাব।'

তাব উচ্চাবণ আব নমস্কাব জানাবাব ভঙ্গি দেখে হাসি চেপে বাখা শীলাব পক্ষে কঠিন হল। উচ্ছ্বসিত হাসি সংববণেব চেষ্টায প্রতিনমস্কাবেব কথা তাব মনে বইল না। অনিন্দ্যেব দিকে ফিবে তাকিযে বলল 'ওকে নিযে ভিতবে আসুন।

নীলাদ্রি মুখ হাত ধুযে চাটা খেযে তক্তপোশখানাব ওপবে সবে সেতাবটিব ঢাকনি খুলছে, শীলা তাব ঘবেব দিকে মুখ বাডিযে বলল, 'ফুলদা দেখ কে এসেছেন।'

নীলাদ্রি স্মিতমুখে বলল, 'কে বে?

অনিন্দ্যদা আবো যেন কে। বেবিযে এসে দেখই না। বাইবেব ঘবে আছেন।

কোন বকমে তাকে খববটা দিযে শীলা পাশেব ঘবে এসে ঢুকল। এ ঘবেও একখানা তক্তপোশে বিছানা গুটানো বযেছে। তাব ওপব উপুড হযে পডে কোমল সুন্দব মুখখানাকে শক্ত কবে চেপে ধবল শীলা। ডুবে শাডিপবা তাব তনুদেহ বিপুল আবেগে ফুলে ফুলে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল।

আলমাবি থেকে বাজাবেব টাকা বেব কবে দেওযাব জন্যে সবোজিনী এসে ঘবে ঢুকলেন কিন্তু আঁচলেব চাবি আলমাবিব তালায লাগাবাব আগে মেযেকে দেখে হঠাৎ থমকে গেলেন।

মৃদু কিন্তু উদ্বিগ্ন স্ববে বললেন, কী ব্যাপাব। কী হ'ল তোব।'

তাবপব নিচু হযে ঝুঁকে পডে মেযেব মুখখানা একটু দেখে নিযে আশ্বস্ত হযে বললেন, 'ও হাসছিস, তাই বল। আমি ভাবলাম কী আবাব হ'লবে বাপু। এই সাত সকালে কে আবাব তোকে বকুনি লাগাল।'

শীলা এবাব মুখ তুলে বলল, 'বাঃ বে, বকুনি আবাব কে দেবে। মা জানো, অনিন্দ্যদা কোত্থেকে এক জার্মান সাহেবকে নিযে এসেছে। কী তাব বাংলা বলবাব কাযদা আব নমস্কাব জানাবাব বহব।

যাও, দেখ গিয়ে। বাইরের ঘরে সব বসে আছে।'

'অনিন্দ্য এসেছে নাকি ! কোথায় !' আলমারি খুলে পাঁচ টাকার একখানি নোট বের করলেন সরোজিনী, তারপর মাথার আঁচলটা একটু টেনে দিয়ে বসবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। হাসির কয়েকটি উচ্ছল তরঙ্গকে বিছানার মধ্যে ঢেলে দিয়ে শীলাও চলল মার পিছনে পিছনে। যখন তখন খিল খিল করে হাসলে ফুলদা বড় বিরক্ত হয়। যার তার সামনে কড়া ধমক লাগায়। কিন্তু হাসি পেলে কেউ না হেসে পারে। তবু তো আগের চেয়ে আজকাল অনেক কম হাসে শীলা। আগে তেমন সাংঘাতিক রকমের হাসি পেলে মেঝেয় লুটোপুটি খেত। গড়িয়ে গড়িয়ে একেবারে তক্তপোশের তলায় চলে যেত। চোখে জল না আসা পর্যন্ত হাসি তাকে ছেড়ে যেত না।

ফুলদা বলে, 'হাসিটা ওর এক রোগ। শীলা একটা আস্ত পাগল।'

'আহা পাগল এ সংসারে কেই বা না। তোমাকেও তো লোকে পাগল বলে। গান-পাগল, সুর-পাগল।'

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাস্তার ধারের বসবার ঘরখানা একেবারে সরগরম হয়ে উঠেছে। ফুলদা গিয়েছে, মা গিয়েছে, দোতলা থেকে খবরের কাগজ হাতে বাবাও নেমে এসেছেন। সাহেব এসেছে খবর পেয়ে বাজারের থলি হাতে কয়েকটি কৌতূহলী ছেলে এসে জানলার কাছে দাঁড়িয়েছে।

শীলা আর ভিতরে ঢুকল না। আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগল। আর দেখতে লাগল। দেখবার মতই রূপ। কী সুন্দর। কী অদ্ভুত সুন্দর। ফর্সা আর লম্বা। লালচে চুল, সিঁদুরে ঠোঁট আর নীল রঙের চোখ। শীলা এ পর্যন্ত যত পুরুষ দেখেছে, জামাই বাবুদের আর দাদার যত বন্ধুদের দেখেছে তাদের কারো সঙ্গেই এর মিল নেই। কী করে থাকবে। উনি তো এ দেশের মানুষ নন। অনেক দূরের ইউরোপের মধ্যে সেই জার্মানী। কোথায় যেন দেশটা। ইউরোপের পুরো ম্যাপটা শীলার ঠিক মনে পড়ল না। উত্তর পশ্চিমে নীল সমুদ্রের মধ্যে লাল রঙের গ্রেট ব্রিটেন আর তার কোলে ছোট আয়ারল্যাণ্ড দ্বীপটিকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু মূল ভূভাগে ফ্রান্স জার্মানীর অবস্থানটা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। থার্ড ক্লাসে ইউরোপ তাদের পাঠ্য ছিল বটে কিন্তু শীলা ভালো করে পড়েনি আর ভূগোল তার মোটেই ভালো লাগত না। ভূগোলের দিদিমণির চোখাচোখা পরিহাস তার মনে জ্বালা ধরিয়ে দিত। কিন্তু কি হবে ইউরোপের ম্যাপ দিয়ে। সবুজ জার্মানী একেবারে তাদের বৈঠকখানার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। টিয়াপাখির মত দুটি লাল ঠোঁটে মিষ্টি মিষ্টি হাসছে। এত কাছে দাঁড়িয়ে রক্তমাংসের কোন সাহেবকে শীলা চোখে দেখেনি। ফুলদার সঙ্গে সিনেমায় দু একখানা বিলিতী বইতে সাহেবদের ছুটোছুটি লাফালাফি দেখেছে কিন্তু জীবন্ত সাহেব এই প্রথম। তাও যে সে সাহেব না, রূপকথার রাজপুত্রের মত পরম সুন্দর সাহেব।

সরোজিনী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে হেসে বললেন, 'আয়। আর ওখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। আমার সঙ্গে সঙ্গে চা আর খাবার টাবার করবি আয়। অনিন্দ্য নাকি এক্ষুনি চলে যাবে।'

শীলা চমকে উঠে বলল, 'এক্ষুনি চলে যাবেন? ওঁকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন নাকি?'

সরোজিনী হেসে বললেন, 'নারে, তা নিতে পারবে না। নীলু ওকে কেড়ে রেখেছে। এ বেলা আমাদের এখানে খাবে। আমার নীলুর তো ও গুণ খুব আছে। অল্প সময়ের মধ্যে অচেনা মানুষের সঙ্গে খুব ভাব করে নিতে পারে। যেন ওর সঙ্গে কত কালের বন্ধুত্ব।'

বাড়ির কর্তা আর চাকরকে বাজারে পাঠিয়ে সরোজিনী মেয়েকে নিয়ে রান্নাঘরের সামনে লুচি বেলতে বসলেন। বাইরের ঘর থেকে কথাবার্তা আর হাসির শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। সরোজিনী মেয়ের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'তোর মন বুঝি ও-ঘরেই পড়ে রয়েছে। আচ্ছা তুই যা। আমি একাই সব করে নিতে পারব।'

শীলা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল,'হুঁ, ও-ঘরে পড়ে রয়েছে তোমাকে বলেছে। আমাকে ছাড়া তোমার কোন কাজটা হয় শুনি?'

সরোজিনী বললেন, 'তা ঠিক। আজকাল তোর হাতের চা ছাড়া বাবুদের অন্য চা পছন্দ হয় না। তুই পান সেজে না দিলে—'

কথা শেষ না হতেই বাইরের ঘর থেকে অনিন্দ্য নতুন জুতোর মচ মচ শব্দে সামনে এসে

দাঁড়াল।

'ম্যাকসকে তো ফুলদা এ বেলার জন্যে রেখে দিল। আমি তাহলে এখন যাই মা। হস্টেলে আমার অনেক কাজ পড়ে রয়েছে।'

সরোজিনী বললেন, 'তাই কি হয় বাবা। চাটা কিছু মুখে না দিয়েই কি যেতে হয়। শীলা, তোর জামাইবাবুকে—অনিন্দ্যদাকে—একটা মোড়া এনে দে তো, বসুকে এখানে। আমরা আমাদের বড় ভগ্নিপতিকে জামাইবাবু বলে ডাকি। আরো আগে ছিল দাদাবাবু। এখন আবার সেই পুরনো চলন ফিরে এসেছে। কিন্তু যাই বলো জামাইবাবুর মত মিষ্টি ডাক আর হয় না।'

অনিন্দ্য শ্যালিকার এনে দেওয়া মোড়াটায় বসে হাসিমুখে চুপ করে রইল। কাল বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কান বদলায, ভাষা বদলায়, মাধুর্যের আধারেরও বদল হয। এই দু বছরের মধ্যে সে এ বাড়ির প্রায় ছেলের মত হয়েছে। জামাতার সেই দূরত্ব আর নেই। সম্বোধনটা আর কি করে থাকবে।

সরোজিনী তাঁর মেয়ে ইলার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আদরের বউ হয়েছে শ্বশুর শাশুড়ীর। কৃষ্ণনগরে তাঁদের কাছেই আছে। এই প্রথম পোয়াতী। আর কয়েকমাস পরেই সরোজিনী তাকে নিজের কাছে নিয়ে আসবেন।

শীলা আর একটি বিশেষ প্রসঙ্গের জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছিল। এসব পুরনো ঘরোয়া আলোচনায় তার মন নেই।

একটু ফাঁক পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শীলা জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা অনিন্দ্যদা, আপনি ওঁকে কোথায় পেলেন ?'

'কাকে ?'

শীলা একটু হেসে বলল, 'আপনার ওই নতুন বন্ধুকে ?'

অনিন্দ্যও হাসল, 'ও ম্যাকসের কথা বলছ ? বন্ধুই বটে। দুদিনেই ও আমার পরম বন্ধু হয়েছে। জার্মান কনস্যুলেট অফিসে আমার একজন জানাশোনা ভদ্রলোক আছেন। তিনিই ওকে আমাদের হস্টেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এ দেশের ছাত্রদের সঙ্গে মিশতে চায়, আলাপ পরিচয় করতে চায়। টুরিস্ট হয়ে এসেছে। ইণ্ডিয়া দেখবে। আপাতত বঙ্গ দর্শন। আমি ওকে বলেছি, দেশকে যদি দেখতে চাও বড় বড় হোটেলে থেকে তার পরিচয় পাবে না। কলেজ-হস্টেলে থেকেও নয়। চল তোমাকে আমি কলকাতা শহরের একটি আইডিয়াল ফ্যামিলিতে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে দিন কয়েক বাস ক'র। একটি পরিবারের ভিতর দিয়ে গোটা দেশের পুরো পরিচয় তুমি পেয়ে যাবে। যে-সে পরিবার নয়। যেমন বনেদী তেমনি—।'

সরোজিনী লুচি ভাজবার জন্যে রান্নাঘরের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছিলেন।

শীলা অনিন্দ্যকে একা পেয়ে হেসে বলল, 'আহা, আমাদের সামনে শ্বশুরবাড়ির খুব সুখ্যাতি করা হচ্ছে। আড়ালে গিয়েই তো নিন্দা করবেন। খোঁটা দেবেন ছোড়দিকে। আমরা সব জানি।'

অনিন্দ্যকে বেশিক্ষণ আটকে রাখা গেল না। ব্যস্ত প্রফেসর। দুটো সিফটে পড়ায়। তারপর আবার হস্টেলের ছেলেদের খবরদারি করে। শ্বশুরবাড়িতে বেশিক্ষণ বাস করবার তার সময় কই। ষোড়শী শ্যালিকার অনুরোধও তাকে ঠেলতে হয়। কাজের এমনি চাপ।

জামাইবাবুদের মধ্যে অনিন্দ্যকেই সবচেয়ে পছন্দ শীলার। ভারি আমুদে আর শৌখিন মানুষ। সেবার কোত্থেকে একটা হরিণ নিয়ে এসে উপস্থিত। আর একবার নিয়ে এসেছিলেন বিচিত্র বর্ণের একজোড়া চীনা মোরগ। তার একটা মোরগ আর একটা মুরগী। কিন্তু এবার যা এনেছেন তার তুলনা হয় না। তাঁর এই সাদা রঙের নীল চোখো প্রাণীটি সবচেয়ে সেরা। আচ্ছা, ম্যাকস কথাটার মানে কী ? কে জানে কী মানে। শীলা লক্ষ্য করে দেখেছে অনেক নামের মানেই অভিধানে মেলে না। সে মানুষের নামই হোক আর জায়গার নামই হোক। নামের মানে তুমি যা ভাববে তাই। নামের মানে তুমি যা মনে করবে তাই। ম্যাকস্ কথাটার কোন মানে আছে কিনা শীলা জানে না। কিন্তু ওকে দেখবার পর থেকেই ফুলদার সেই সাদা ময়ূরের গল্পের কথা মনে পড়ছে শীলার। ফুলদার ছেলেবেলার এক মেয়ে-বন্ধু নাকি ময়ূরভঞ্জের মহারাজার কাছ থেকে চমৎকার এক সাদা ধবধবে

ময়ূর উপহার পেয়েছিল। কী বা তার পাখা আর কী বা তার পেখম। আকাশে কালো মেঘ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে তার পেখম ছড়িয়ে দিত। তাকে নিয়ে দাদার সেই সখীর সোহাগের অন্ত ছিল না। সাদা ময়ূর শীলা চোখে দেখেনি। কিন্তু পর পর দুদিন স্বপ্নে দেখেছে। আর আশ্চর্য, সেই সুখস্বপ্নের পর এক অপরূপ দিবাস্বপ্নের মত ম্যাকস্ এসে উপস্থিত। ময়ূর কি সুখের বাহন?

অন্তত ফুলদার ভাবভঙ্গি দেখে তাই মনে হচ্ছে। সকালে তিন চার ঘণ্টা ঝাড়া রেওয়াজ করে ফুলদা। কিন্তু আজ কোথায় গেল তার রেওয়াজ, কোথায় গেল কী। বসবার ঘর থেকে ম্যাকসকে একেবারে বাড়ির ভিতরে নিয়ে এসেছে ফুলদা। ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছে ফুলের টব। যে টবগুলিতে শীলা রোজ জল দেয়, গাছের শুকনো পাতা বেছে ফেলে। বড় বড় গাঁদা ফুল দেখে ম্যাকসের কী আনন্দ। গাঁদা ফুল তো আর ওদের দেশে নেই। ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছে এঘর ওঘর একতলা দোতলা। ছাদ। দেখিয়েছে ঠাকুরদার আমলের পুরনো লাইব্রেরী। টুং টুং করে সেতারের একটু বাজনাও শুনিয়ে দিয়েছে এক ফাঁকে। ম্যাকস দেখছে শুনছে আর হাসছে। শীলা যখন নানান কাজে এঘর থেকে ওঘরে যাচ্ছে, সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উঠছে নামছে—দুটি নীল চোখ মেলে ম্যাকস তাকাচ্ছে তার দিকে। কিন্তু শীলাকে অত লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবার কীই বা আছে। সে তো আর দিদিদের মত অত সুন্দরী নয়। সে তো মেঘের মতই কালো। তার দিদিরা যদি এখানে কেউ থাকত ও হয়তো তার দিকে ফিরেই তাকাত না। কিন্তু এখনই বা কী দেখছে এত। ও কি সারা বাড়িটাকেই আকাশ ভেবেছে নাকি। আর সেই আকাশভরা মেঘ দেখছে? মেঘ দেখলে কি ময়ূর খুশি হয়? ফুলদা তো তাই বলে।

বেলা প্রায় এগারোটার সময় নীলাদ্রির সময় হল। সে রান্নাঘরের সামনে এসে বলল, 'শীলা, আমাদের আরো দু কাপ চা দে।'

সরোজিনী মাছের কালিয়া রাঁধছিলেন।

শুনতে পেয়ে ছেলেকে ধমকে উঠলেন, 'না, এত বেলায় আর চা নয় বাপু। আমার রান্না হয়ে গেছে। এবার তোমরা চানটা করে খেয়ে নাও।

নীলাদ্রি বলল 'তাই নেব। আজ যখন বাজনা টাজনা কিছু হলই না।'

শীলা সুযোগ পেয়ে বলল, 'কী করে হবে ফুলদা। আজ তো তুমি সেই সকাল থেকে নাচছ। বাজাবে আর কখন।

নীলাদ্রি এগিয়ে এসে বোনের বিনুনী টেনে ধরল, 'কী, কী বললি। কে যে নাচছে তা আমিও দেখতে পাচ্ছি।'

শীলা দাদার হাত থেকে চুল ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়াল।

সরোজিনী বললেন, 'কী এত গল্প করছিসরে ওর সঙ্গে। কোন ভাষায় কথা বলছিলি তোরা?'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'ভাষা নয় মা, ভঙ্গি। বেশির ভাগ ভঙ্গি দিয়েই কাজ সারতে হচ্ছে। যৎসামান্য ইংরেজী জানে। যেটুকুও জানে উচ্চারণ অপূর্ব। অবশ্য আমার উচ্চারণও ওর কানে অভূতপূর্ব শোনাচ্ছে। কাজ চালিয়ে নিচ্ছি। তবু ওর কত কথাই না শুনে নিলাম। জানো কী সাহস। ইংরেজী জানে না, হিন্দী জানে না, উর্দু জানে না, এদিকে সঙ্গী নেই, সাথী নেই, টাকার জোরও তেমন নেই, শুধু মনের জোরে ফার ইস্ট টুর করে এসেছে এই ইণ্ডিয়ায়। ওর ইচ্ছে পৃথিবীর কোন জায়গা বাকি রাখবে না।'

সরোজিনী উনুনের ওপর থেকে কড়াটা নামাতে নামাতে বললেন, 'ভালোই তো। হয়তো তুমিও একদিন যাবে।'

নীলাদ্রি একটু হাসল, 'আমি? ওকে দেখে অবশ্য আমার সেই ঘুমন্ত সাধ জেগে উঠেছে। পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ। কিন্তু চাইলেই কি পাবা যায়?'

শীলা বলল, 'এবার তোমরা নাইতে যাও ফুলদা। আমি বাথরুমে ঢুকলে শেষে যে মিনিটে মিনিটে তাড়া লাগাবে তা চলবে না।'

স্নান তো করবে, কিন্তু সমস্যা হল ম্যাকস পরবে কী। ওর ব্যাগ আর বিছানা সবই তো সেই হস্টেলে ফেলে এসেছে। নীলাদ্রি বলল, 'তাতে কী হয়েছে। ও আমার লুঙ্গি পরে চান করুক। নেয়ে

উঠে আর ট্রাউজার্স নয়, আমার একখানা ধুতিই পরবে। শীলা আমার সেই নকশী চুলপেড়ে ধুতিখানা বের করে রাখতো। আর একটা ফর্সা পাঞ্জাবি—।'

শীলা হেসে বললে, 'দাদা তোমার পাঞ্জাবি কিন্তু ওঁর গায়ে ছোট হবে।'

নীলাদ্রি বলল, 'তা হোক। খানিকটা তো ঢাকবে। ধুতি পাঞ্জাবিতে সাহেব বেশ আরাম পাবে। এখানে এসে ওর খুব গরম লাগছে মনে হচ্ছে।'

ফাল্গুনের মাঝামাঝিতেই এবার বেশ গরম পড়ে গেছে। বাড়ির দু দুটো ফ্যান অচল। ইলেকট্রিক মিস্ত্রীকে খবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার আর দেখা নেই।

শুধু সেতারে নয়, ফুলদার হাত সব ব্যাপারেই খোলে। সত্যিই ম্যাকসকে একেবারে বাঙালীবাবু সাজিয়ে নিয়ে এসেছে। নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে ওকে ধুতি পরা শিখিয়েছে, পাঞ্জাবির বোতামগুলি নিজের হাতে এঁটে দিয়েছে। মেয়েদেরই পুতুল খেলার শখ থাকে। কিন্তু ফুলদাকে যেন হঠাৎ পুতুল খেলার শখে পেয়ে বসেছে। যে মানুষের স্বভাব অত গুরুগম্ভীর, যে মানুষ রাতদিন সেতার নিয়ে পড়ে থাকে, তার মধ্যেও যে এমন একটি ছেলেমানুষ লুকিয়ে আছে তা কে জানত।

বড় ঘরের মেঝেয় আসন পেতে নীলাদ্রি ম্যাকসকে পাশে নিয়ে খেতে বসল।

সরোজিনী বললেন, 'টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা করে দে। ওকি ওভাবে খেতে পারবে? ওর কষ্ট হবে। খাওয়াও হবে না।'

কিন্তু নীলাদ্রি নাছোড়বান্দা। সে বলল, 'খুব পারবে মা। কতক্ষণ বা আছে। এলই যখন, বাঙালী জীবনের সব স্বাদ ওকে পাইয়ে দি। আমাদের কথা ওর চিরদিন মনে থাকবে।'

দেখা গেল ম্যাকসেরও তাতে আপত্তি নেই। এরই মধ্যে সে একেবারে নীলাদ্রির মন্ত্রশিষ্য হয়ে গেছে। সে যা করছে ম্যাকস তারই অনুসরণ করছে। চলাফেরা ওঠাবসা সব লক্ষ্য করে করে দেখছে আর প্রাণপণে তা নকল করবার চেষ্টা করছে।

শীলা ভেবেছিল, এত সব কাণ্ডকারখানা দেখে সে বুঝি হাসতে হাসতে মরেই যাবে। কিন্তু সামলানো যায় না এমন বেয়াড়া হাসি এই মুহূর্তে তাকে জব্দ করতে পারল না। পরিবেশিকার কাজ সে বেশ গম্ভীরভাবেই করে যেতে লাগল। ভাত ডাল মাছ তরকারি সবই সাহেবের জন্য বসে বসে রেঁধেছেন মা। সেই সঙ্গে রুটি মাংসও করে রেখেছেন। কী জানি যদি ওসব কিছু না খেতে পারে। খেতে পারুক আর না পারুক সাহেবের উৎসাহের অভাব নেই। চামচে তুলে তুলে সব একটু একটু চেখে চেখে দেখছে। ভালো না লাগলে মুখ বিকৃত করছে।

বাবা এই সঙ্গে খেতে বসেননি। অফিস থেকে রিটায়ার করলে কি হবে, সেই দশটা পাঁচটার অভ্যাসটি ঠিক আছে। ঠিক আগের সময়ের হিসাবে নেয়ে খেয়ে এখন আর ছুটতে ছুটতে গিয়ে বাস ধরেন না, কাগজ কি বই-টই কিছু একখানা নিয়ে ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়েন। তারপর দু চারপাতা ওলটাতে না ওলটাতেই তাঁর নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়। শীলার মনে আছে, খুব ছেলেবেলায় মাঝরাত্রে কি শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে গেলে বাবার এই নাকের শব্দ কানে গেলে কী ভয়ই না সে পেত। মার কাছে সরে এসে তাঁকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরত।

খেতে খেতে নীলাদ্রি জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা মা, ধুতি-পাঞ্জাবিতে ম্যাকসকে কেমন মানিয়েছে বলো তো?'

সরোজিনী একটু হেসে বললেন, 'বেশ মানিয়েছে।'

নীলাদ্রি গম্ভীরভাবে বলল, 'অনিন্দ্য দত্তের ছোট ভায়রা বলে মনে হচ্ছে না?'

সরোজিনী হেসে বললেন, 'হতভাগা কোথাকার। তোর না আপন বোন? অনিন্দ্যর ভায়রা হলে তোর কী হয়?'

নীলাদ্রি বলল, 'তার চেয়ে তোমার সম্পর্কটাই ভালো। একেবারে জার্মান জামাতা। চমৎকার অনুপ্রাস।'

বলতে বলতে নীলাদ্রি হো হো করে হেসে উঠল।

ম্যাকস নীলাদ্রির দিকে চেয়ে বলল, 'what's the fun?'

নীলাদ্রি বলল, 'Nothing nothing. In our national dress you are looking like a typical জামাইবাবু।'

জামাইবাবু কথাটার মানে বুঝতে না পেরেও ম্যাকস হাসতে লাগল। কিন্তু হাসির বদলে প্রচণ্ড রাগ হল শীলার। ছি ছি ছি একী অসভ্যতা। সে কী সেই ছোট্ট খুকু আছে? কিচ্ছু বোঝে না? ফুলদার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি। জীবনেও শীলা আর তার সঙ্গে কথা বলবে না।

বিকালবেলায় পাড়ার ছেলেমেয়েরা জার্মান সাহেবকে দেখতে এল। এদের মধ্যে কেউ কেউ শীলার বন্ধুও আছে। রীণা, দীপ্তি, বরুণা। স্কুলে এক সঙ্গে পড়ত। বীণা আর দীপ্তি সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। একজন আর্টস নিয়েছে আর একজন সায়াঙ্গ। আর বরুণা পেয়েছে দাম্পত্য জীবন। আর্টস আর সায়েন্সের মিকসড কোর্স।

দীপ্তি বলল, 'ওঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দেবেন না ফুলদা?'

নীলাদ্রি বলল, 'আমি কিছু জানিনে দীপ্তি। ম্যাকস বাওয়ার এখন ষোল আনা শীলার সম্পত্তি।'

শীলার আর সহ্য হল না। তীব্র স্বরে প্রতিবাদ করে উঠল, 'এসবের মানে কী হচ্ছে ফুলদা? তুমি ওঁকে এক মিনিট কাছ ছাড়া করছ না আর বলছ আমার সম্পত্তি?'

নীলাদ্রি বলল, 'আহা আমি তো তোর সামান্য প্রাইভেট সেক্রেটারী মাত্র। কি তোব personal circus-এর ম্যানেজারও বলতে পারিস। জানো বরুণা, প্রোপ্রাইট্রেস শীলা রায়ের কাছে দু রকমের টিকিট আছে। শুধু দেখলে দু আনা আর কথা বলতে গেলে চার আনা।'

টিকিটের কথা শুনে তিন সখী খিল খিল করে হেসে উঠল।

রীণা বলল, 'আমরা কিছু কনসেসন পাব না ফুলদা?'

শীলা মনে মনে আর একবার প্রতিজ্ঞা কবল, জীবনে ফুলদার আব মুখদর্শন কববে না।

দীপ্তিরা ম্যাকসকে আড়াল থেকে দেখে টেখে বিদায় নিল। কিন্তু নতুন বন্ধুকে নীলাদ্রি অত সহজে ছেড়ে দিল না।

সে বলল, 'অনিন্দ্যের হস্টেল থেকে তোমার বাকস বিছানা এক্ষুনি আনিয়ে নিচ্ছি। তুমি এখানেই আরো কটা দিন থেকে যাও। যদি চাও তো আমবা দুজনে তোমাব গাইডের কাজ করে দিতে পারি। পয়সা লাগবে না।'

ম্যাকস আপত্তি তো করলই না, বরং খুশি হয়েই নীলাদ্রিব আতিথ্য নিল। ফুলদার পাশেব ঘরে ওর বিছানা পেতে দিল শীলা। জিনিসপত্র গুছিয়ে ঠিক করে রাখল। সুগন্ধি ধূপকাঠি জ্বেলে দিল। শুকনো শূন্য ফুলদানিটা জলে আর ফুলে ভরে উঠল।

নিজের বিছানা দোতলায় তুলে নিয়ে গেল শীলা। বাবা-মার পাশেব ঘরে সে থাকবে। বড়দা ছোড়দা সপরিবারে একজন দিল্লীতে আব একজন চণ্ডীগড়ে। বাড়িতে এখন আব ঘরের অভাব নেই। কিন্তু একতলার ঘরগুলি খালিও বড় একটা থাকে না। ফুলদার গানবাজনার গুণী বন্ধুদের কেউ না কেউ এসে হাজির হয়, ফুলদা সহজে কাউকে ছাড়তে চায না।

ম্যাকস যদিও গান বাজনা জানে না, কিন্তু দূর দেশের মানুষ তো। আর কত দূর দেশের খবর সে নিয়ে এসেছে। তাই বোধ হয় ফুলদার কাছে ওর এত আদর। গান বাজনা নিয়ে বেশি সময় কাটালেও ফুলদা যে শুধু গান বাজনাই ভালবাসে তা নয়। সে মানুষজন ভালোবাসে, ঘরদোর সাজাতে গুছোতে ভালোবাসে, পাড়ার বউদিদের, বন্ধুর বউদের শাড়ির রঙ আর পাড় পছন্দ করে দিতে ভালবাসে। সেই সঙ্গে ম্যাকসকে ভালোবেসেছে দেখে শীলা খুব খুশি হল।

তাদের এই বাড়ি তাদের এই পাড়া ম্যাকসের নিশ্চয়ই খুব ভালো লেগে গেছে। যে মানুষের সকালে এসে বিকালে চলে যাবার কথা সেই মানুষ পরদিন গেল না, তার পরদিনও গেল না, তার পরদিনও নয়। নীলাদ্রি হেসে বলল, 'ও এখানে থেকে যাবে। যা আদর যত্ন পাচ্ছে ওর বিশ্বপরিক্রমা এখানেই শেষ।' শীলার দিকে চেয়ে নীলাদ্রি হাসতে লাগল।

শীলা রাগ করে বলল, 'ফুলদা, ভালো হবে না কিন্তু। ফের যদি অমন কর তা হলে তোমার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি হয়ে যাবে।'

আব কোন ভাইবোন তো এখন আব বাডিতে থাকে না। ফুলদাই একমাত্র। সে একই সঙ্গে দাদা আব দিদি, সখা আব সখী।

সপ্তাহে দু তিনদিন বাইবে টিউশনি কবে ফুলদা। সেতাবের টিউশনি। দু চাবজন ছাত্রছাত্রী বাডিতে এসেও শেখে। বাকী সময়টা ফুলদা বাজায়। এখন তাব আবো কাজ বেড়েছে। কাজ নয় খেলা। ম্যাকসেব সঙ্গে বসে বসে গল্প কবে। কোনদিন ক্যারাম খেলে। কখনো বা খেলাচ্ছলে তাকে বাজনা শোনায়।

ম্যাকস কি ফুলদাব বাজনা বোঝে ? এইসব বিদেশী সুব তাব ভালো লাগে ? ম্যাকসেব মুখেব হাসি চোখেব উল্লাস দেখে মনে হয় সত্যিই ও খুব উপভোগ কবছে।

মাঝে মাঝে আবাব বাগবাগিণীব নামও জিজ্ঞাসা কবে ম্যাকস। 'What is this tune ?'

ফুলদা জবাব দেয় 'দেশ।'

ম্যাকস তাব বিদেশী জিহ্বা দিয়ে চেখে চেখে উচ্চাবণ কবে 'ডেস।'

'What is this one ?'

সেতাবেব আলাপ শুনে ম্যাকস আব একটি বাগেব নাম জিজ্ঞাসা কবে।

ফুলদা বলে 'খাম্বাজ।

ম্যাকস অদ্ভুতভাবে কথাটা উচ্চাবণ কবে নিজেই হেসে ওঠে।

শীলা একদিন জিজ্ঞাসা কবল, 'আচ্ছা ফুলদা, ওঁকে যে অমন কবে বাগ-বাগিনীব নাম মুখস্থ কবাচ্ছ উনি কি তোমাব বাজনা কিছু বুঝতে পাবেন ?'

নীলাদ্রি জবাব দিল, 'একটু একটু পাবে বইকি। তোব চেয়ে ভালোই পাবে। ম্যাকস কত বড বাক্তিয়ে দেশেব লোক তা জানিস ! কত বড বড কম্পোজাব ওব দেশে জন্মেছেন। বিটোফেনেব নাম শুনেছিস ?'

নামটা যেন শোনা শোনা। শীলা ঘাড কাত কবে। আস্তে আস্তে বলে উনি কি এখনো বাজান নাকি ফুলদা !

নীলাদ্রি হেসে ওঠে 'গ্যেটেব সমসাময়িক ছিলেন তিনি, এখন আব নেই। কিন্তু তাঁব অমব সিম্ফনিগুলি বয়ে গেছে আচ্ছা তোকে বেকর্ড শোনাব। মোৎসার্ট ভাগনাব শুবার্ট শুম্যান সুবে সুবে সাবা ইউবোপকে ছেয়ে দিয়েছেন।'

তাঁদেব সেই সুব যেন এই মুহূর্তেও ফুলদা শুনতে পাচ্ছে। তাব কথাব সুবেলা আবেগ, মুখ চোখেব ভঙ্গিব মুগ্ধতা দেখে শীলাব সেই বকমই মনে হল। তাবপব ওইসব সুবকাবেব কথা নিয়ে ম্যাকসেব সঙ্গে ফুলদা আলোচনা আবম্ভ কবল। শীলা আস্তে আস্তে সেখান থেকে সবে এল। তাব তো অত বিদ্যা নেই যে সব বুঝতে পাববে। ইংবেজী ম্যাকস যে তাব চেয়ে বেশি ভাল জানে তা নয়। অমন দু চাবটে কথা ভাঙা ভাঙা শব্দ শীলাও বলতে পাবে। কিন্তু বলতে এত লজ্জা কবে। একটা কথাও মুখ থেকে বেবোয় না। কী জানি যদি উনি হাসেন। ফুলদা ওব সঙ্গে এত কথা বলে, কিন্তু ওকে বাংলা শিখতে বলে না কেন। বাংলা শেখায় না কেন। উনি যদি বাংলা জানতেন কী চমৎকাবই না হত। শীলা ওঁব সঙ্গে কথা বলতে পাবত গল্প বলতে পাবত।

এব মধ্যে অনিন্দ্য এল আব একদিন খোঁজ নিতে। শীলাকে ডেকে বলল, 'কী ব্যাপাব শীলাবতী। তুমি নাকি ম্যাকস সাহেবকে একেবাবে বন্দী কবে বেখেছ। একজোড়া নীল নেত্রকে কিছুতেই কালো চোখেব আডাল কবতে চাইছ না। নীলাদ্রি ফোনে বলছিল।'

শীলা বাগ কবে বলল, 'কী বাজে বাজে কথা বলছেন অনিন্দ্যদা। ফুলদাই তো ওকে নিয়ে বাতদিন মশগুল হয়ে আছে। বোজ বেডাতে বেবোচ্ছে। ''জ জু কাল মিউজিয়াম, পবশু আর্ট একজিবিশন। আমাকে কি সঙ্গে নেয় ?'

অনিন্দ্য চুকচুক শব্দ কবে বলল, 'ভাবি আফশোসেব কথা। সত্যিই ভাবি অন্যায়। তোমাকে অবশ্যই সঙ্গে নেওয়া উচিত। আব এই জার্মান টুবিস্টটিই বা কী। মনে কি কোন বস কস নেই ? আমি হলে তোমাকে ছাডা বেডাতে বেবতামই না। ওই বাঙাববণ শিমূল ফুলকে বাদ দিয়ে

কৃষ্ণকলিব হাতে হাত বেখে বিশ্ববিজযে বেবিযে পড়তাম।'

শীলা বলল, 'থাক থাক আপনাব ওই মুখেই সব। বেববাব কত সময হয আপনাব।'

অনিন্দ্যদা মৃদু হেসে ফুলদাব ঘবে গিযে ঢুকলেন। ম্যাকসকে সামনে বেখে ওঁদেব মধ্যে ইংবেজীতে তুমুল আলোচনা আবম্ভ হল। দর্শনে বিজ্ঞানে সাহিত্যে সঙ্গীতে জার্মানী পৃথিবীকে অনেক দিযেছে। কান্ট হেগেলেব দেশ জার্মানী, গোটে-শিলাবেব দেশ জার্মানী, মার্কস-এঙ্গেলসের দেশ জার্মানী। আইনস্টাইনেব দেশ জার্মানী। ম্যাকস যেন নিজেব দেশেব প্রতিনিধি। তাকে লক্ষ্য কবে দুজনেব প্রীতি আব প্রশস্তি উচ্ছ্বসিত হযে উঠল। সব কথা শীলা বুঝতে পাবল না। কোন কোন নাম সে এব আগে দু' একবাব শুনেছে। কিন্তু শুধু নামমাত্রই। আব কিছু সে জানে না। শীলা দোবেব কাছে দাঁড়িযে লক্ষ্য কবল সে যেমন বুঝতে পাবছে না, ম্যাকসেবও তেমনি সব কথা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। একখানা ছোট ডিকসনাবী আছে ম্যাকসেব পকেটে। ইংবেজী কথাব জার্মান মানে আব জার্মান কথাব ইংবেজী মানে তাতে আছে। ম্যাকস বাব বাব পকেট থেকে সেই ডিকসনাবীখানা বাব কবছে। পাতা উল্টে উল্টে শব্দগুলি খুঁজে নিচ্ছে। তাবপব তাবিফ কবাব ধবনে বলছে 'Oh, I see!' কখনো বা শব্দেব অর্থে মজাব সন্ধান পেযে হো হো কবে হেসে উঠছে। কিন্তু সে হাসি অনেক বিলম্বিত। অনিন্দ্যদা আব ফুলদা তখন অন্য প্রসঙ্গে চলে গেছেন।

মুখে আঁচল চেপে শীলা সেখান থেকে সবে এল। কিন্তু আজ আব তেমন জোব হাসি তাব পেল না। বেচারা ম্যাকসেব ওপব তাব সহানুভূতিই হল। সে সাতসমুদ্র তেবনদী পাব হযে এসেছে, কিন্তু ভাষাব দেযাল টপকাতে পাবছে না। শীলাব মতই সে অসহায। জানালাব কাছে দাঁড়িযে শীলা ভাবতে লাগল। কিন্তু ইংবেজী ভাষা না জানলেও ম্যাকস অনেক কিছু জানে। কত দেশ দেশান্তব ঘুবে এসেছে। কত বিদ্যা শিখেছে। আব শীলা? সে তো কিছুই জানল না শিখল না। থার্ডক্লাসে দু দুবাব ফেল কবে সে অভিমানে পড়া ছেড়ে দিযে বাড়িতে বসে বইল। ভেবেছিল প্রাইভেট পড়বে। পড়ে পড়ে পবীক্ষা দেবে। কিন্তু তাও আব হযে উঠল না। এদিকে তাব সঙ্গে যাবা পড়ত তাবা কত এগিযে গেল। স্কুলেব গণ্ডী পাব হযে কলেজে গিযে পৌঁছল। কিন্তু শীলাব আব এগোনও হল না, পৌঁছানোও হল না, সে কেবল পিছুতেই লাগল। দু চাবদিন গান নিযে চেষ্টা কবল ছেড়ে দিল। বাজনাও তেমনি। ফুলদা বলল, 'তোব মন নেই।'

শীলা বলল, 'বেশ নেই তো নেই।

সে সবে এল মাযেব কাছে, মাযেব পাশে। চা কবে, পান সাজে, বিছানা পাতে বান্নাবান্নাব জোগান দেয। বেশ ছিল। সব আফশোস আব আক্ষেপ সংসাবেব কাজেব মধ্যে চাপা পড়ে ছিল। আজ সব হঠাৎ দ্বিগুণ বেগে ফেটে বেবোল। শীলাব মনে হতে লাগল ছি ছি ছি এ কী কবেছে সে। নিজেব হাতে নিজেব সব পথ বন্ধ কবেছে। কিছুই জানেনি, কিছু শেখেনি, কোন যোগ্যতা অর্জন কবেনি।

হঠাৎ কেন যেন কান্না পেতে লাগল শীলাব।

সবোজিনী এসে পিছনে দাঁড়ালেন, 'ওকি এখানে দাঁড়িযে দাঁড়িযে কী কবছিস। চুল বাঁধবিনে?

শীলা পিছনে না তাকিযে বলল, 'বাঁধব। তুমি যাও মা।

সবোজিনী বললেন, 'ওবা যে ডাকছে তোকে। আজ নাকি তোকে সঙ্গে নিযে প্রিন্সেপস ঘাটে যাবে। যা না। জাহাজ টাহাজ দেখে আসবি। তাড়াতাড়ি তৈবি হযে নে তাহলে।'

শীলা মাথা নেড়ে বলল, 'না মা, আমি যাব না।'

অনিন্দ্যও এসে খানিকক্ষণ সাধাসাধি কবল।

'ফ্রযেলাইন বায হেব বাওযাব ডাকছে তোমাকে। তাকে নিবাশ ক'ব না, চলো। ফ্রযেলাইন মানে জানো? কুমাবী। আব ফ্রাউ তাব পবেব অবস্থা। আমাদেব এইটুকু জানলেই হল। এখন চল যাই।'

কিন্তু শীলাকে কিছুতেই কেউ নড়াতে পাবল না।

সেই বাত্রে শীলা স্বপ্ন দেখল সত্যিই সে বেড়াতে বেবিযেছে। প্রিন্সেপ ঘাট থেকে প্রকাণ্ড এক জার্মান জাহাজ সমুদ্রেব দিকে যাত্রা কবেছে। সে জাহাজে আব কেউ নেই। শীলা আব প্রকাণ্ড এক

ময়ূর। সাদা ধবধবে তার গায়ের রঙ। কী সুন্দর আর কী সুন্দর। কিন্তু অত মানুষ-প্রমাণ ময়ূর কখনো হয়। শীলা আরো কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখল—ওমা, এতো ময়ূর নয়, এ যে—। না না না, আমি বাড়ি যাব আমি বাড়ি যাব। ছি-ছি ছি, সবাই কী ভাববে। কিন্তু যে যাই ভাবুক জাহাজ আর ফিরল না। ভাসতে ভাসতে একেবারে মাঝ সমুদ্রে গিয়ে পড়ল। সেখান থেকে আরও দূরে, আরও দূরে। আর কী নীল সেই সমুদ্রের জল। এই নীলের আভাস দুটি চোখ আগেই নিয়ে এসেছিল। তারপর সেই নীল সমুদ্র হঠাৎ ফেনিল হয়ে উঠল। আকাশে ঝড়ের আভাস। 'উত্তরে চাই দক্ষিণে চাই ফেনায় ফেনা আর কিছু নাই। তাদের জাহাজ সেই উত্তাল সমুদ্রের বুকে টলতে লাগল, দুলতে লাগল। শীলা তো ভয়েই অস্থির। সবসুদ্ধ ডুবে মরবে নাকি। কিন্তু নীল দুটি চোখ তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসছে। চোখে ভয়ের লেশমাত্র নেই। কেন থাকবে। তার তো ঝড়ের সমুদ্রের ওপর দিয়ে জাহাজে করে যাতায়াতের অভ্যাসই আছে। সে কাছে এগিয়ে এসে শীলার হাত ধরল। তারপর পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'অত ভয় পাচ্ছ কেন, আমি তো আছি। ছি ছি ছি, কী লজ্জা, কী লজ্জা। যদিও দেখবার মত কেউ নেই তবু দুজনকে তো দুজনে দেখতে পাচ্ছে।

মায়ের ডাকাডাকিতে শীলার ঘুম ভেঙে গেল। সরোজিনী বললেন, সেই সন্ধ্যা থেকে কী ঘুমই না ঘুমোচ্ছিস।

শীলা বলল, 'লম্বা একটা সিনেমার গল্প স্বপ্নে দেখছিলাম মা।'

সিনেমার গল্পই তো। ফুলদার সঙ্গে মাস কয়েক আগে যে ইংরেজী ছবিটা দেখতে গিয়েছিল শীলা তাতেও এই রকম জাহাজ ছিল, সমুদ্র ছিল, ঝড় ছিল। সেই ঝড়ের ঝাপটায় নায়িকা নায়কের—। ছি ছি ছি।

সারা সকালের মধ্যে ম্যাকসের মুখের দিকে তাকাতে পারল না শীলা। অন্য দিনের মত সে ওকে চা দিল, খাবার দিল, কিন্তু চোখে চোখে তাকাতে পারল না। ম্যাকস কিন্তু আগের মতই তার দিকে তাকাচ্ছে হাসছে, একথা সেকথা বলছেও। কী সুবিধে একজনের স্বপ্ন আর একজন দেখতে পাবে না একজনের স্বপ্নের কথা আর একজন ভাবতেও পাবে না।

শীলা কিন্তু বেশিক্ষণ ম্যাকসকে এড়িয়ে থাকতে পারল না। ফুলদাই সব মাটি করে দিল। শীলাকে ডেকে বলল 'আজ কিন্তু ম্যাকসের সঙ্গে তোর খেলতে হবে।

শীলা বলল, 'আমি পারব না ফুলদা। কেন তুমি কী করবে।'

নীলাদ্রি বলল, আমার পরশু রেডিও প্রোগ্রাম। দুদিন আমাকে দারুণ রেওয়াজ করতে হবে। কেন, ম্যাকসের সঙ্গে কথা বলতে তোর অত ভয় কিসের রে। ছড়রেছড় ইংরেজী বলবি। ইংরেজী ম্যাকসের কাছেও বিদেশী ভাষা, আমাদের কাছেও তাই। গ্রামার ট্রামারের অত ধার না ধারলেই হল।'

শীলা মৃদু হেসে বলল, 'আমি পারব না ফুলদা। তোমরা পারো। গ্রামার শুদ্ধ করেও বলতে পার, আবার ভুল করেও বলতে পার। আবার সবই আটকে যায়।'

নীলাদ্রি বলল, 'তাহলে বাংলাতেই বলবি। তোর কথা ও শুনতে খুব ভালবাসে।'

শীলা লজ্জিত হয়ে বল, 'যাঃ।

নীলাদ্রি বলল 'সত্যি বলছি। তুই যখন কথা বলিস ও কান পেতে থাকে। অর্থ দিয়ে কী হবে। ধ্বনি ওর ভালো লাগে। সেদিন বলছিল, তোর গলার স্বর নাকি আমার এই ইনস্ট্রুমেন্টের মতই মিষ্টি। একেই বলে ভাগ্য। আমি বারো বছর ওস্তাদের বাড়িতে ধর্ণা দিয়ে, দুবেলা রেওয়াজ করেও যা করতে পারিনি আর তুই অশিক্ষিত পটুতায়—'

শীলা তাকে বাধা দিয়ে প্রতিবাদ করে উঠল, 'কী যে বলো ফুলদা শুধু আমার কথা কেন হবে। তোমার কথা, মার কথা সবাইর কথাই উনি অবাক হয়ে শোনেন। বিদেশী কিনা। বাংলা ভাষাটাই ওঁর কানে মিষ্টি লাগে।'

নীলাদ্রি সঙ্গে সঙ্গে সেতারে একটু বাজিয়ে নিল, 'আ মরি বাংলা ভাষা। মোদের গরব মোদের আশা।'

শীলা একটু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে এল।

নীলাদ্রি সেতাব বাঁধতে শুরু কবেছিল। চোখ না ফিবিযেই বলল, 'কীবে।'

শীলা তাব বাসন্তী বঙেব শাড়িব আঁচল চাঁপাব কলিব বঙেব না হোক সেই গড়নেব আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল, 'ফুলদা একটা কথা বলব, বাখবে ?'

'বল না। বেড়াতে যাবি ? সিনেমায যাবি ?'

শীলা বলল, 'না। ওসব কিছু না। আমাকে ফেব শেখাবে ফুলদা ?'

'কী শেখাব ?'

'তোমাব ওই সেতাব।'

নীলাদ্রি ওব মুখেব দিকে তাকিযে হাসে, 'হঠাৎ যে এই সুমতি ? আচ্ছা আচ্ছা শেখাব।'

শীলা এবাব সামনে থেকে নীলাদ্রিব পিছনে চলে আসে। তাবপব দাদাব পিঠে গাল ঠেকিযে বলে, 'আব একটা কথা। আমি আবাব পড়ব। আমাকে কযেকখানা বই কিনে দেবে ফুলদা ? তিন চাবখানা কিনে দিলেই হবে।'

নীলাদ্রি আঙুলে মেবজাপটা পবতে পবতে বলে, 'আচ্ছা আচ্ছা তুই যদি সত্যিই ফেব পড়তে শুরু কবিস তাহলে তিন চাবখানা বইতো ভালো, গোটা কলেজ স্ট্রীটটাই এখানে তুলে নিযে আসব।'

শীলা বেবিযে এলে নীলাদ্রি দোবে খিল দিযে বাজাতে শুরু কবল।

দুপুবে খাওযা দাওযাব পব নিঃসঙ্গ ম্যাকস এসে আজ নিজেই শীলাকে ডেকে নিল।

'Come, no harm, no shame Play and be happy'

ক্যাবাম বোর্ডেব দিকে আঙুল দেখিযে মুখেব ভঙ্গিতে প্রশ্ন বোধক চিহ্ন টানল ম্যাকস।

প্রথমে সবোজিনী খানিকক্ষণ বসে বসে দেখলেন। ম্যাকস তাঁকেও ইশাবায খেলতে ডাকল।

সবোজিনী হেসে বললেন, 'না বাপু, ওখেলা আমি জানিনে। তাসটাস হলে না হয দেখা যেত। তোমবা খেল, আমি একটু গড়িযে নিই।

সবোজিনী চলে গেলেন

ম্যাকস হাঁ কবে সেই বাংলা কথাগুলি শুনল। হাসল। তাবপব শেষ দুটি শব্দ নিজস্ব ভঙ্গিতে উচ্চাবণ কবল, 'গড়িযে নি।' শেষে হেসে বলল, 'Well Sheela, will you be my interpreter ?'

ইনটাবপ্রেটাব কথাটাব অন্য কোন অর্থ আশঙ্কা কবে শীলা বলে উঠল 'No No No' ম্যাকস তাব ভঙ্গি দেখে হাসতে হাসতে বলল, 'You have learnt only no no no And I have learnt yes yes yes Very good Let us begin'

খেলা চলতে থাকে। বোর্ডেব ওপব টকাটক টকাটক গুটিব শব্দ হয। ওঘবে সেতাবে 'দেশ' বাগেব বেওযাজ চলে। এঘবে শীলা বিদেশীব সঙ্গে ক্যাবম খেলে। এও আব এক ধবনেব বাজনা। সেতাবেব চেযে কম মধুব নয।

খেলায ম্যাকসেবই জিত হয বেশি। আঘাতে আঘাতে গুটিগুলি ঠিক গিযে পকেটে পড়ে। শীলা খেলবে কি, মাঝে মাঝে অবাক হযে ম্যাকসেব দিকে তাকিযে থাকে। এব চেযে বড় বিস্ময বড় বহস্য যেন আব নেই। কোথায কোন দেশেব মানুষ। শীলা সে দেশেব ভাষা জানে না, ইতিহাস জানে না, ভূগোল জানে না, কিছুই জানে না। সেই অচিন দেশেব অপরূপ এক মানুষেব সঙ্গে শীলা নিজেব ঘবে-বসে ক্যাবম খেলছে। দুদিন বাদে একথা কি কেউ বিশ্বাস কববে ? এই মানুষটিবই বা সে কী জানে, কতটুকু জানে। ফুলদাব কাছে শুনেছে, পশ্চিম জার্মানীব কোন এক শহবে থাকে। সে শহবেব নাম ফুলদাই উচ্চাবণ কবতে পাবে না আব তো শীলা। সেখানে বাবা আছে, মা আছে, ভাই আছে। না স্ত্রী নেই। এত অল্প বযসে ওবা বিযে কবে না। বাবাব ছোটখাটো ব্যবসা আছে। ও নাকি একটা টেকনিক্যাল স্কুলে পড়ে। কিন্তু পড়াশুনোয তেমন মন নেই। এদিক থেকে শীলাব সঙ্গে ওব খুব মিল আছে। পৃথিবীটাকে ও নিজেব চোখে দেখতে চায। শীলাব যদি সাধ্য থাকত সেও তাই চাইত। সেও অমনি কবে ঘুবে বেড়াত। ম্যাকস সম্বন্ধে এব চেযে বেশি কিছু শীলা জানে না। কিন্তু এটুকু জানাও যেন বাহুল্য। এটুকু না জানলেও ম্যাকসকে যেন আপন মনে হচ্ছে, তেমনি আপন

মনে হত শীলাব। বন্ধুত্বে কোন বাধা হত না। বন্ধু! কথাটা মনে মনে উচ্চাবণ কবতেও যেন লজ্জা হয়। সে কি ওব বন্ধু হবাব যোগ্য! শীলা যে থার্ড ক্লাসেব ওপবে আব উঠতে পাবেনি! কোন গুণ-যোগ্যতাই যে আযত্ত কবতে পাবেনি সে। কিন্তু ম্যাকসেব তাকাবাব ভঙ্গি শীলাব সঙ্গে তাব মেলামেশাব ইচ্ছা দেখে তো মনে হয না গুণ যোগ্যতা নিয়ে তাব কোন মাথা ব্যথা আছে। শীলাকে দেখেই ও খুশি, তাব কথা শুনেই ওব আনন্দ। শুধু দেখবাব মত হওযা আব শোনবাব মত কথা কওযা। যে বলে 'তোমাকে এব চেয়ে বেশি কিছু আব হতে হবে না' তাব চেয়ে বড় আপন আব কে আছে।

কিন্তু না। আব একজন না চাইলে কি হবে, শীলাব কি যা আছে তাই থাকলেই চলে? তাব কি আবো জানবাব শোনবাব শিখবাব, আবো যোগ্য হতে ইচ্ছা হয না? যেমন ইচ্ছা কবে সাজতে, ভালো শাড়ি পবতে, গযনা পবতে সুন্দব কবে চুল বাঁধতে কাজল পবতে—তেমনি ইচ্ছা কবে আবো যোগ্য হতে। যোগ্যতাব মানে তো পড়াশুনো? সবাই তাই বলে। গুণ মানে তো গাইতে জানা বাজাতে জানা? যদি এমন কোন বব পাওযা যেত, যাতে পৃথিবীব সমস্ত বই একবাত্রেব মধ্যে মুখস্থ হয়ে যায এমন বব যদি পাওযা যেত সমস্ত বাগবাগিণী তাব গলায এসে বাসা বাঁধে, আব ফুলদাব মত তাবও আঙুলেব ছোঁযাব ছোঁযায সেতাবে তাবগুলি ঝঙ্কাব দিয়ে ওঠে! যদি এমন হোত!

শীলাকে খেলায হাবিযে দিযে ম্যাকস হো হো কবে হেসে উঠল You know nothing, you know nothing

হঠাৎ কি যেন মনে হল ম্যাকসেব কী একটা কথা বলতে গিযে শব্দ সমুদ্রে যেন হাবুডুবু খেতে লাগল ম্যাকস। তাবপব লাইফবোটেব মত বেবোল সেই ডিকসনাবী হঠাৎ যেন লাফিয়ে উঠল ম্যাকস Yes, joke, just the word Joke, only joking, don't be sorry Are are you?'

দুঃখিত হবে কি শীলা ম্যাকসেব সেই শব্দ হাতড়ানোব ভঙ্গি দেখে ওব হাসিব সিন্ধু আবাব উথলে উঠেছে।

মেঝেব উপব প্রায় লুটোপুটি খেতে লাগল শীলা খিল খিল খিল। কুল কুল কুল। জলপ্রপাতেব ধাবা গড়িয়ে পড়ছে

ম্যাকসও মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। I see! No sign of sorrow The world is full of happiness'

বেবিয়ে এসে শীলা গুনগুন কবতে লাগল, জার্মানী জার্মানী ম্যাকস ভাবতেব কথা অনেক জানে। কিন্তু শীলা কিছু জানে না। যদি জানত তাহলে শীলা সেসব বিষয নিযে ম্যাকসেব সঙ্গে আলোচনা কবতে পাবত। এখন আব তাব ভয নেই। ওইবকম yes no very good কবে সেও কথা চালিয়ে যেতে পাবে।

একটা দেশকে চোখে দেখেও জানা যায আবাব বই পড়েও জানা যায। এই মুহূর্তে ম্যাকসেব দেশকে তো আব চোখে দেখবাব উপায নেই শীলাব বইয়েবই শবণ নিতে হবে

কোণেব ঘবটায ঠাকুবদাব আমলেব স্তূপাকাব বই জমে আছে। শীলা চুপি চুপি এসে সেগুলি ঘাটতে লাগল। অনেক বইযেব খানিকটা খানিকটা উই আব ইঁদুবেব পেটে গেছে। আবো অনেকগুলি ধূলি ধূসব। আইনেব বই, বোমেব ইতিহাস যোগাবশিষ্ট বামাযণ দামোদব গ্রন্থাবলী সব জাতি বর্ণ মর্যাদাব শ্রেণীভেদ ভুলে একসঙ্গে পাশাপাশি বযেছে। কিন্তু শীলা যা চায, তা কোথায?

মা এসে ধমক দিলেন, 'এই অবেলায তুই আবাব ওগুলো ঘাটতে গেলি কেন? কী চাস বলত।'

শীলা মুখ ফিবিয়ে নিয়ে বলল, 'কিছু না মা।

'তাহলে চলে আয, কিছুতে কামড়ে দেবে। সেদিন একটা বিছে দেখেছিলাম।'

ফিবে এসে শীলা অগত্যা সেই পুবনো স্কুলপাঠ্য আদর্শ ভূপবিচযখানাই খুঁজে খুঁজে বাব কবল! অনাবশ্যক বলে এসব বই তাকেব ওপব তুলে বেখেছিল। ধূলি আব মাকড়সাব জালেব আড়ালে অনাদবে পড়েছিল বছবেব পব বছব। শীলাব কোমল হাতেব স্পর্শে আজ সেই নীবস ভূগোল নতুন

গৌববে নতুন মূল্যে মূল্যবান হয়ে উঠল, সিঞ্চিত হল কাব্যবসেব ধাবায।

ড্রেসিং টেবিলেব সামনে বসে পাতা উল্টে উল্টে ইউবোপেব মানচিত্র বাব করল শীলা। সতৃষ্ণ চোখে তাকাল একটি বিশেষ দেশেব উপবে। তাব উত্তবে নীল সমুদ্রেই কি সেই স্বপ্নেব জাহাজ ভেসেছিল।

সবোজিনী এসে ফেব তাডা দিলেন, 'গা টা ধুবিনে? কী আবাব পডছিস বসে বসে?'

'কিছু না মা।'

শীলা তাডাতাডি ভূগোলখানাকে আঁচলেব তলায লুকিয়ে ফেলল। যেন পবম নিষিদ্ধ নভেল। সমস্ত জার্মানী দেশটাকে সে যেন এমনি কবে বুকেব মধ্যে লুকিয়ে বাখতে পাবলে বাঁচে।

দিন দুই বাদে অনিন্দ্য এল খবব নিতে। 'কি, তোমাদেব সেই জার্মান অতিথি কি পালিযেছে না আছে?'

নীলাদ্রি বলল, পালাবে কে? পালালে জামিনদাব তোমাকে গিয়ে ধবতাম না?'

অনিন্দ্য হাসতে লাগল।

একটু বাদে বলল, 'তুমিতো কলকাতা শহবেব কিছুই আব বাকি বাখনি, ওকে দেখিযেছ। কিন্তু শহবটাই তো আব দেশ নয। একটা গ্রাম ওকে দেখিয়ে নিয়ে এসো। এখনো দেশ বলতে গ্রামকেই বোঝায।'

নীলাদ্রি বলল, কিন্তু গ্রাম নিয়ে কি আমবা আব সত্যিই গর্ব কবতে পাবি? সেই ছাযা সুনীবিড শান্তিব নীডেব অস্তিত্ব কি আব আছে? স্বপ্ন দিয়ে তৈবি সে দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেবা। এখন শুধুই স্মৃতি।'

চা টোস্ট পবিবেশনেব পব শীলা দাঁডিয়ে দাঁডিয়ে ওদেব আলোচনা শুনতে লাগল।

অনিন্দ্য চাযেব কাপে চুমুক দিয়ে বলল 'যাহোক তুমিতো আব কণ্ডাকটেড টুবেব ভাব নাওনি যে, বেছে বেছে শুধু ভালো জিনিসই দেখাব। ওকে সবই দেখতে দাও। তাহলেই এই দেশ সম্পর্কে একটা মোটামুটি ইমপ্রেশন নিয়ে যেতে পাববে।'

গ্রাম দেখবাব প্রস্তাব শুনে ম্যাকস লাফিয়ে উঠল। সে নিশ্চযই যাবে। ইণ্ডিযায এসে গ্রাম না দেখলে সে আব কী দেখল। এখানকাব সভ্যতাইতো গ্রাম সভ্যতা।

গ্রামেব সঙ্গে তিন পুরুষেব মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই নীলাদ্রিদেব। কিন্তু বাবাব এক খুডতুতো বোন আছেন বর্ধমান জেলাব মদনপুবে। সেই পিসিমাব সঙ্গে তো যোগাযোগ বন্ধ হযনি। গেলে সেখানেই যেতে হয।

নীলাদ্রি অনিন্দ্যকে বলল, 'তুমি যখন হুজুগটা তুললে তুমিও চল।'

কিন্তু অনিন্দ্যেব সময নেই। তাব অনেক কাজ। সে যেতে পাববে না।

যাব কাজ নেই যে যেতে পাবে তাকে কেউ বলে না। শেষ পর্যন্ত শীলা নিজেই এসে নীলাদ্রিব কাঁধে গাল ঘষল। যেন এক কৃষ্ণসাব হবিণী দেবদারু গাছকে আদব কবছে।

'আমাকে নিয়ে যাও না ফুলদা।'

নীলাদ্রি বলল, 'তুই যাবি? বড কষ্ট হবে যে। পাববি সহ্য কবতে?'

'তোমবা যা পাববে আমিও তাই পাবব।'

উপেনবাবু দোতলা থেকে নেমে এসে বাধা দিলেন। 'না না, কোথায যাবি। যতসব বাজে হুজুগ।'

তিনি বাডি ছেডে নিজেও বেবোবেন না, ছেলেমেযেবা কেউ বেবোতে চাইলেও তাব পথ আগলে ধববেন। এই পাডাটুকুব বাইবে পৃথিবীব সমস্ত জাযগা তাঁব কাছে অগম্য, বাসেব অযোগ্য। সাপ বাঘ বিপদ আপদে ভবা।

কিন্তু সবোজিনী শীলাব সহায হলেন। স্বামীকে ধমক দিয়ে বললেন, 'অমন করছ কেন? একদিনেব জন্যে যেতে চাইছে, যাক না। সেখানে ছেলেমেয়ে নিয়ে বিনযবাবু আছেন, ঠাকুবঝি আছেন অত ভয কিসেব তোমাব।'

অনুমতি পেয়ে শীলা উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যেন বর্ধমানের এক গ্রামে যাচ্ছে না তারা, বিশ্ব পরিব্রাজকের সঙ্গে সেও পৃথিবী পরিক্রমায় বেরোচ্ছে।

ছোট্ট স্টেশন। লোকজনের ভিড় নেই। প্লাটফর্মের বাইরে এসে নীলাদ্রি দেখল মদনপুরে যাওয়ার বাস আছে, সাইকেল রিক্সা আছে। স্টেশন থেকে পিসিমার বাড়ি মাইল তিনেক দূরে। এগিয়ে যাওয়ার জন্যে পিসতুতো ভাই সুরেশ্বরও এসেছে।

কিন্তু ঝাপটানো বটগাছটার নীচে একটা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। একটু আগে সনের আঁটিগুলি নামিয়ে রেখে গাড়োয়ান বিড়ি টানছে।

ম্যাকস সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে বলল—'What's that ?'

নীলাদ্রি তাকে বুঝিয়ে বলল, 'এ আমাদের দেশীয় যান, আদি আর অকৃত্রিম।

ম্যাকস এগিয়ে এসে সেই গাড়িতে উঠে বসল। যেতেই যদি হয়, এই গাড়িতেই সে যাবে বাসের ব্যবসা তাদের নিজেদেরই আছে। বাস সম্বন্ধে তার আর কোন কৌতূহল নেই। কিন্তু গরুরগাড়ি জীবনে সে এই প্রথম দেখল। তাতে না চড়ে সে ছাড়বে না।

দেরি হবার আশঙ্কা, কষ্টের ভয় দেখিয়েও নীলাদ্রি তাকে নামাতে পারল না। ম্যাকস বলতে লাগল আর কেউ যদি নাও যায় সে একাই যাবে

গাড়োয়ান সবিনয়ে বলল, 'কোন কষ্ট হবে না বাবু আসুন। ওপরে ছাপ্পড় আছে। নীচে আমি মোলায়েম বিছানা পেতে দেব, আপনাদের কোন কষ্ট হবে না।'

ম্যাকসকে তো আর একা ছেড়ে দেওয়া যায় না। বাধ্য হয়ে নীলাদ্রি আর শীলাও তার পাশে উঠে বসল।

কৌতূহলী চাষী কামলারা চারদিকে এসে ভিড় করে দাঁড়াল। তারা যুদ্ধের সময় সাহেব যে দু একজন না দেখেছে তা নয় কিন্তু গরুর গাড়ির ওপর সাহেবকে এই প্রথম দেখল।

সাহেবও তাদের দিকে উল্লাস আর ঔৎসুক্যভরা দুটি নীল চোখ মেলে রাখল।

ধুলোভরা কাঁচা রাস্তায় ক্যাঁচর ক্যাঁচর করে গরুর গাড়ি আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল। রাস্তার দুপাশে দিগন্ত ছোঁয়া মাঠ। মাঠভরা রোদ। নীল আকাশের নীচে মাঝে মাঝে রক্তবর্ণ কৃষ্ণচূড়া।

নীলাদ্রি একবার হাতঘড়িতে চোখ বুলাল। তারপর হেসে বলল, 'ঈস, কী স্পীডেই যাচ্ছি আমরা। আমাদের দেশের অগ্রগতির সিম্বল।

কিন্তু শীলা সে কথা ভাবছিল না। তার সেই স্বপ্নের জাহাজের কথা মনে পড়ছিল। সেই স্বপ্নের জাহাজ এই গরুর গাড়িতে এসে ঠেকেছে, সেই উত্তাল নীল সমুদ্র রূপ নিয়েছে এসে শূন্য শুকনো মাঠে। আশ্চর্য, তবু স্বপ্ন সফল। এমন পুরোপুরিভাবে কোন স্বপ্নই বোধ হয় আর ফলে না।

অনেকদিন আগে পাঠ্য বই থেকে মুখস্ত করা কবিতার একটি অংশ শীলা মৃদু কণ্ঠে আবৃত্তি করতে লাগল,

> 'নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা
> শৈল চূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর বিহঙ্গরা
> নারিকেলের শাখে শাখে
> ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে'

ম্যাকস কান পেতে শুনছিল। হেসে বলল, 'very sweet, don't stop, go on.'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'ওই দুপুর রোদে মাঠের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তোর মনে সমুদ্রের দ্বীপ ভেসে উঠল যে।'

শীলা মুখ নীচু করে বলল, 'এমনিই।'

নীলাদ্রি ম্যাকসের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, 'This is from our Tagore's,' তারপর লাইন কয়েকটির অনুবাদ করে শোনাল।

ফেরার পথে শীলারা আর গরুর গাড়িতে ফিরল না। বাসে করেই স্টেশনে এল। কিন্তু যে গ্রামে

মাত্র একদিন তারা থাকবে ভেবেছিল, সেখানে তিন দিন কাটিয়ে দিয়ে গেল। বাড়ি ঘর আর বিশ্ব ভ্রমণের কথা সব ভুলে গিয়েছিল ম্যাকস। তিন দিন সে গাঁয়ের ছেলেদের সঙ্গে হৈহৈ করে কাটিয়েছে। পুকুরে সাঁতার কেটেছে। পেয়ারা গাছে উঠে ডাল ভেঙে পড়তে পড়তে কোনক্রমে রক্ষা পেয়েছে। পুরনো শিবমন্দিব দেখেছে। দশ মাইল দূরে পাঁচশ বছর আগেব মসজিদ দেখতে ছুটেছে সাইকেলে করে।

মাঝখানে একদিন ছিল হোলি উৎসব। পিসীমাব ছেলেমেয়েরা প্রথমে ভয়ে কাছে এগোয়নি। কিন্তু পবে একটু ইশারা পেয়ে সবাই এসে ম্যাকসকে রঙ দিয়েছে। আবীরে আবীরে প্রবাল গিরিব আকার নিয়েছিল ধবল গিরি। পিসতুতো ভাই-বোনদের সঙ্গে শীলাই ছিল দলনেত্রী। ঘোমটা একটু তুলে সাহেবের এই রঙ খেলা দেখে নিয়েছে গাঁয়ের বউরা। ছেলেরাও বিদেশী অতিথিব অভ্যর্থনার জন্যে সব সম্পদ এনে জড়ো করেছে। একদিন দেখিয়েছে সাঁওতালদেব নাচ, একদিন কীর্তন আর একদিন যাত্রাভিনয়। পালার নাম 'সুভদ্রাহরণ'। আসবার সময় ম্যাকস বলে এসেছে, এমন গ্রাম আব এমন চমৎকার মানুষ সে আর দেখেনি। গ্রামবাসীরা বলেছে সাহেবেব স্বভাবও যে এমন মধুর হয়, তা তাদের জানা ছিল না। ভাষাব মিল নেই, চালচলনের মিল নেই, তবু ম্যাকসেব মিশবার কোন বাধা ছিল না। তার তুলনায় ফুলদাকেই বরং ওদের কাছে দূরেব মানুষ কলকাতাব ফুলবাবু মনে হচ্ছিল শীলার।

আসবাব পথে বাসে আর ট্রেনে ওরা অনর্গল কথা বলতে বলতে এল। মাঝখানে ফুলদা। ডানদিকে ম্যাকস, বাঁদিকে শীলা।

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'ম্যাকস কিছুরই নিন্দা করছে না। বলছে এদেশের সব ভালো।'

শীলা বলল, 'তাহলে একথা ওঁর নিশ্চয়ই মনের কথা নয়। সব দেশেরই সুখ্যাতি কববার জিনিসও থাকে, নিন্দা করবার জিনিসও থাকে। ওঁকে জিজ্ঞেস করোনা ফুলদা, সত্যিই আমাদেব দেশের কোন কোন জিনিস ওঁর খারাপ লেগেছে।'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'তুই জিজ্ঞেস কব না। আচ্ছা, আমি তোর দোভাষীব কাজ করে দিচ্ছি। আমাকে টাকা দিতে হবে কিন্তু।'

শীলা বলল, 'বেশ দেব।'

নীলাদ্রি ম্যাকসের সঙ্গে খানিকক্ষণ ইংরেজীতে আলাপ করে শীলাকে তার বঙ্গানুবাদ শোনাল।

'আমি বললাম, হে বিদেশী, শীলাদেবী তোমাকে জিজ্ঞেস করছে এদেশের কোন দোষত্রুটিই কি তোমার চোখে পড়েনি? এদেশের মেয়েদের গাযের কালো বঙ, কালো চোখ, কালো চুল নতুন বলে তুমি না হয় পছন্দ করতে পাব, কিন্তু এব কালো বাজার, আঁধারের মত কালো কুসংস্কার, দারিদ্র্য অশিক্ষা, স্তরে স্তবে অব্যবস্থা তুমিতো ভালো করে দেখনি। তবে শহরের নোংরা বাস্তা, বস্তীর নোংরা জীবন তো কিছু কিছু দেখেছ। গাঁয়েব খানা ডোবা এঁদো পুকুরের সঙ্গে দীনদরিদ্রের জীবনযাত্রাও কিছু কিছু দেখে গেলে। আমরা চাই তুমি মন খুলেই আমাদেব সামনে চাঁদের উল্টোপিঠেব সমালোচনা করে যাও।'

শীলা বলল, 'উনি কী জবাব দিলেন।'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'বেশি জবাব আর কী দেবে। ইংবেজী ভাষাটা ওকে বেকায়দায় ফেলেছে। ম্যাকস হিটলারেব মত দেশের পর দেশ জয় করতে পাবে, কিন্তু বিদেশিনী ভাষার পাণিগ্রহণ ওর পক্ষে সহজ নয়। তবু আমাদের বিদেশী বন্ধু মোটামুটি একটা জবাব দিয়েছে। ও বলতে চায়, দুদিনের জন্য এসে ওতো আর আমাদের দেশকে তেমন খুঁটে খুঁটে ক্রিটিকের চোখ নিয়ে দেখতে পারেনি। ও রিফর্মারও নয়, পলিটিসিয়ানও নয়। ও সাধারণ টুরিস্ট। ও আমাদের দেশকে দেখেছে পাখির চোখে। আর কিছুটা হয়তো আর্টিস্টের দৃষ্টি নিয়ে। জানিস শীলা, আমার মাঝে মাঝে মনে হয় আমাদের এই টুরিস্ট ম্যাকসও এক ধরনের আর্টিস্ট। সারা পৃথিবীটা ওর সেতার। আর দুটি মুগ্ধ চোখ ওর বাজাবার আঙুল।'

ম্যাকস আরো গল্প করতে করতে চলল। ওর নানা দেশ ভ্রমণের নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী। পূর্ব জার্মানী ছাড়া আশেপাশে সব দেশ ও সাইকেলে ঘুরেছে। পায়ে হেঁটে বেড়িয়েছে। পূর্ব জার্মানী ওর

এক গোপন দুঃখের স্মৃতির সঙ্গে জড়ানো। এদিক থেকে বাংলা দেশের সঙ্গে ওদের দুর্ভাগা দেশের মিল আছে। দুটি দেশই পুবে-পশ্চিমে দ্বিধা বিভক্ত। ম্যাক্স ধনীর ছেলে নয়। আর্থিক অবস্থা মাঝারি ধরনের। তাই এদেশে সে প্লেনে চড়ে আসতে পারেনি। স্টীমারে আর ট্রেনে সব দেশের জল মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসেছে। পথে বিপদ-আপদ কম হয়নি। কিন্তু ওসব ভয় করলে কি আর পথে বেরোন চলে? একবার ফার ইস্টের এক হোটেলওয়ালার মেয়ে তাকে বড় বিপদে ফেলেছিল।

ম্যাকসের মুখে আর এক দেশের মেয়ের নাম শুনে শীলার মনে ঈর্ষার সূঁচ বিঁধল।

'কি রকম বিপদে ফেলেছিল ফুলদা?'

নীলাদ্রি ম্যাকসের কাছ থেকে ঘটনাটা শুনে নিয়ে হেসে বলল, 'টাকা চুরি করেছিল।'

শীলা আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'ছি ছি ছি, মেয়েরা আবার চোর হয়?'

নীলাদ্রি হেসে বলল, 'ম্যাকস বলছে, হয় বইকি।'

ফুলদা বড় অসভ্য। শীলা জানালার দিকে মুখ করে বসে সবুজ গাছপালার মধ্যে চোখ ডুবিয়ে দিল।

বাড়িতে পা দিতে না দিতেই উপেনবাবু খুব একচোট ধমকে নিলেন। এ কি যাচ্ছেতাই কাণ্ড। একদিনের কথা বলে তিন দিন গিয়ে বাইরে কাটিয়ে আসা। তাদের জন্যে কি ভাববার কেউ নেই? দুশ্চিন্তায় কদিন ধরে তাঁর ঘুম হয়নি।

নীলাদ্রি ফিস ফিস করে মাকে জিজ্ঞাসা করল, 'দিনে না রাত্রে?'

কিন্তু আরো খবর আছে। সরোজিনী একখানা এয়ার মেলের চিঠি ম্যাকসের হাতে দিলেন। কনসুলেট অফিস থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে। দু'দিন ধরে পড়ে আছে চিঠিটা।

চিঠি পড়ে ম্যাকসের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। নীলাদ্রি জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার ম্যাকস? খবর কি?'

খবর সুবিধা নয়। ব্যবসায়ে দারুণ লোকসান যাচ্ছে ম্যাকসের বাবা টাকা আর পাঠাতে পারবেন না। সে যেন অবিলম্বে দেশে চলে যায় ম্যাকস শুধু বাপের টাকার ভরসায় আসেনি। তবু বাবার বিপদে তারও বিপদ

ম্যাকস কালই এখান থেকে চলে যাবে। সকালে যদি নাও হয়, কাল সন্ধ্যায় বোম্বে মেল তার ধরা চাইই।

শীলা স্তব্ধ হয়ে গেল। সে কি। এত হঠাৎ? এমনি তাড়াতাড়ি?

এই মুহূর্তে সে ভুলে গেল ম্যাকস এসেছিলও এমনি আকস্মিকভাবে।

কিন্তু ঘটনাচক্রের ওপর দারুণ রাগ হতে লাগল শীলার। অবুঝ অভিমানের সঙ্গে সে মনে মনে বলতে লাগল এমন হবে জানলে কিছুতেই বেড়াতে যেতাম না।

ম্যাকস তার জিনিসপত্র গুছাতে গুছাতে পরদিন সবাইকে বলল, সে গোড়ায় ভেবে এসেছিল তিন দিনে কলকাতা সফর শেষ করে সে বিদায় নেবে। কিন্তু তিন দিনের জায়গায় তিন সপ্তাহেরও বেশি কেটে গেছে, সে যেতে পারেনি। কী করে যে কেটেছে, তা সে টের পায়নি। যদি সময় থাকত আরো তিন মাস সে এই শহরে বাস করে যেত। কিন্তু আরো তিন বছর থাকলেও সাধ মিটত না।

বেলা পড়ে এল। ম্যাকসের গলা আরো করুণ শোনাতে লাগল। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে সে নীলাদ্রি আর সরোজিনীকে বলতে লাগল, তার পথযাত্রীর জীবনে সে এখানে এসে যা পেয়েছে, তা আর কোথাও তার ভাগ্যে জোটেনি। এখানে এসে সে নিজের বাড়িকে ভুলেছিল। এখানে সে নিজের ঘরকেই ফিরে পেয়েছিল। এমন আদর, এমন যত্ন, এমন সেবা, এমন স্নেহ সে আর কোথাও পায়নি।

ম্যাকসের কথাগুলি নীলাদ্রি তার মাকে অনুবাদ করে করে শোনাতে লাগল।

সরোজিনীর চোখদুটি ছল্‌ ছল করে উঠল।

নীলাদ্রি বলল, 'মা তুমি কিছু বল।

সরোজিনী বললেন, 'আমি আর কী বলব বাবা। তুই ওকে বল আমি ওর জন্যে কিছুই করতে

পারিনি। আমার কতটুকুই বা সাধ্যি। ও যে ওর মার কাছে ফিরে যাচ্ছে, সেই আমার আনন্দ। ওকে বল, আমি ওর এখানকার মা হয়ে চোখের জল ফেলছি আর সেখানকার মা হয়ে ওর জন্যে দিন গুনছি।'

একথার উত্তরে ম্যাকস নিচু হয়ে সরোজিনীকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। শ্রদ্ধা জানাবার এই ভারতীয় পদ্ধতি ম্যাকস এর মধ্যে লক্ষ্য করেছিল।

নীলাদ্রির সঙ্গে ঠিকানা বিনিময়ের পর হঠাৎ তার খেয়াল হল শীলা এখানে নেই। কখন উঠে নিজের ঘরে চলে গেছে। ম্যাকস তার কাছে বিদায় নিতে গেল। এদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শীলা জানলার শিক ধরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশের বাড়ির পুরনো প্রকাণ্ড এক দেওয়াল ছাড়া যদিও বাইরে আর কিছুই দেখবার নেই। ম্যাকস তার দোরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দোভাষী নীলাদ্রি আজ আর তার সঙ্গে গেল না।

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে একটু হেসে ম্যাকস মৃদু কোমল সুরে ডাকল Now, Miss No No No '

শীলা চমকে উঠে ফিরে তাকাল। ওর মুখে হাসি নেই। কিন্তু ম্যাকসের মুখে হাসি দেখে তার মনে হল কী নিষ্ঠুর ওরা কী নিষ্ঠুর। জার্মান জাততো এই সেদিনও ফ্যাসিস্ট ছিল। চিরকালের যোদ্ধার জাততো। নিষ্ঠুর তারা হবেই।

ম্যাকস তেমনি হাসিমুখে বলতে লাগল Miss No No No, what will you say today ? Please say something I hope today you will say yes If not thrice, once at least '

শীলা রাগ করে মুখ ফিরিয়ে নিল। আজও সত্যি সে না হয় ইংরেজী নাই বলতে পারে। কিন্তু ঠাটা বোঝবার শক্তি তো তার আছে। কী নিষ্ঠুর। কী নিষ্ঠুর।

ম্যাকস চুপ করে আরো কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

'Sheela'

শীলা ফিরে দাঁড়াল। বিদেশীর কণ্ঠে ভিন্ন ধরনের উচ্চারণে নিজের নাম এই প্রথম শুনতে পেল শীলা। কিন্তু এই আহ্বানে সে কোন সাড়া দিল না। শুধু দুটি সজল কালো চোখ আর দুটি নীল ছল ছল চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু বাদে ম্যাকস আবার বলল Sheela, I—I—I can't express me in foreign language. It has become my foe Please allow me my mother tongue '

তারপর ম্যাকস তার নিজের জার্মান ভাষায় একটানা বলে যেতে লাগল। সে কি গদ্য না ওদের ভাষায় কবিতা—শীলা বুঝতে পারল না। সে কি ওর নিজের কথা না কি কোন মহাকবির আবৃত্তি—শীলা বুঝতে পারল না সে কি সাধারণ সৌজন্য নাকি তীব্রতর অন্তর্ভেদী আগুনের মত বিদ্যুতের মত প্রণয় ভাষণ—শীলা কিছু বুঝতে পারল না।

শীলার মনে হল অনেক দিন বাদে অনেক চেষ্টা যত্নের পর যদি জার্মান ভাষা সে কোনদিন শিখতে পারে, তাহলেও কি একবার মাত্র শোনা এই মধুর শব্দগুলি সে ফের খুঁজে বার করতে পারবে ? পারবে না পারবে না। দুর্বোধ্য ভাষার আড়ালে যে প্রেম সম্ভাষণ আজ রচিত হল, বিস্মৃতির গভীর অতলে তা চিরকালের মত তলিয়ে থাকবে।

একটু বাদে ম্যাকস বেরিয়ে গেল। করকম্পনের আর চেষ্টা করল না। সে ওকে বাক্য দিয়ে ছুঁয়েছে, কাব্য দিয়ে ছুঁয়েছে। অন্তর দিয়ে ছুঁয়েছে। হাত দিয়ে ছোঁয়ার তার আর দরকার নেই।

দোরের সামনে ট্যাক্সি এসে হর্ন দিতে লাগল। শীলাকে ডাকতে এসে সরোজিনী থমকে দাঁড়ালেন। মেয়ে তার বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়েছে। আর সেই প্রথম দিনের মত তার সর্বাঙ্গ দমকে দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে।

এ কম্পন যে কিসের, তা তিনি আর পরখ করবার প্রয়োজন বোধ করলেন না।

ম্যাকসকে হাওডা স্টেশনে গাড়িতে তুলে দিযে নীলাদ্রি তাব নিজেব ঘবে গিযে সেতাব নিযে বসল।

সবোজিনী তাব কাছে এসে দাঁডালেন। একটু চুপ কবে থেকে বললেন, 'মেযেতো উঠলও না, খেলও না। সেই ভাবেই পডে আছে।'

নীলাদ্রি কোন কথা না বলে স্মিতমুখে সেতাবে আঙুল বাখল।

সবোজিনী ভ্রূ কুঁচকে উদ্বেগেব সুবে বলতে লাগলেন, 'তুমি হাসছ। কিন্তু তুমিই বাপু সব নষ্টেব গোডা। তুমিই শুরু থেকে ঠাট্টা কবে কবে এই কাণ্ড বাধিযেছ। এখন এই মেযে নিযে আমি কী কবি।'

নীলাদ্রি মাযেব দিকে তাব প্রশান্ত দুটি চোখ মেলে ধবল। তাবপব মৃদু স্নিগ্ধ মধুব আশ্বাসেব সুবে বলল, 'কিছু ভেব না মা। দুদিনেই সব ঠিক হযে যাবে। জীবনে এব চেযেও কত বড বড কথা তো আমবা ভুলি।'

গোপনে নিঃশ্বাস চেপে মনে মনে বলল, 'জীবনে কত বড বড [illegible] আমাদেব ভুলে থাকতে হয।'

সরোজিনী আব কোন কথা না বলে ঘব থেকে বেবিযে এলেন। দবজাব পাট দুখানি নিঃশব্দে ভেজিযে দিযে এলেন আসাব সময।

একটু বাদে ফেব ধ্বনিব তরঙ্গ উঠল। ও ঘবেব একটি হৃদযযন্ত্রেব তালে তালে একটি তাব যন্ত্র সাবা বাডিব আকাশে বাতাসে গৌডমল্লাবে সুবটমল্লাবে এক অন্তহীন কূলহীন বিষাদসিন্ধুব ঢেউ সাবা বাত ধবে ছডিযে দিতে লাগল।

শ্রাবণ ১৩৬৭

হ্লাদিনী

'এই এলি নাকি খুকু? এত দেবি হল যে?'

'ন্যাশনাল লাইব্রেবীতে গিযেছিলাম বাবা। সেই বেলভেডিযাব থেকে এই লেক গার্ডেন্স। ভাবো একবাব বাস্তাখানা। আব বাস-ট্রামেব যা অবস্থা।'

'একটু সকাল সকাল ফিববি। সবে নতুন বসতি হচ্ছে। এদিককাব পথঘাট এখনো — । আব বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই। আয এখানে, বোস। আজকাল তো আব আসিসই না আমাব কাছে।'

'কী যে বল বাবা। দিনেব মধ্যে কতবাব যে তোমাব সঙ্গে দেখা হয,—কতবাব কথা হয— । দাঁডাও কাল থেকে আমি একটা নোট বাখব।

'হ্যাঁ, এখন তো গুনেগুনেই কথা বলবি। থাক থাক, আব ভক্তিব দবকাব নেই। পাযেব কাছে বসতে হবে না। এসো আমাব সামনে এসে বস।'

অনাদিনাথ বসবাব ঘবেব কোচেব ওপব আধশোযা হযে নিজেকে কোন বকমে গুটিযে বেখেছিলেন। দীর্ঘ চেহাবা এইটুকু কোচে ধববে কেন। একখানা হাত মাথাব নিচে আব এক হাতে একখানি ইংবেজি থ্রিলাব। বেলে বড অফিসাব ছিলেন। তখন থেকেই এ-সব পডাব অভ্যাস বিটাযাব কববাব পবেও এ-সব ছাডতে পাবেননি। মন খাবাপ থাকলে আবো বেশি কবে পডেন।

বীথিকা বাবাব সামনে এসে বসল। একেবাবে কোলেব কাছে। যেন আট-ন' বছবেব মেযে।

কিন্তু অনাদি তালুকদার অত সহজে ভুললেন না। তরুণী মেয়ের সাজসজ্জার ঘটার দিকে তাকালেন। অনেক কিছুই তিনি পছন্দ করেন না। বিশেষ করে ওই লিপস্টিক। ওর ঠোঁট তো অমনিতেই সুন্দর। টিয়ে পাখির ঠোঁটে আবার সিঁদুরের দরকার কি। তাছাড়া এত খুশি-খুশি ভাব কিসের মেয়ের ! আজও কি দেখাসাক্ষাৎ—

নন্দিনীর উল্লাসের কারণ আন্দাজ করবার চেষ্টা করলেন অনাদিনাথ।

কাছে বসে বীথিকা বাবার মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল—'তোমার চুল একেবারেই উঠে গেল বাবা।'

অনাদিবাবু মেয়ের দিকে তাকালেন, 'যদি বলি এর মূলে তুমি।'

বীথিকা মধুর ভঙ্গিতে হাসল, 'ঈস, বললেই আমি শুনব কিনা। টাক তোমাদের বংশগত। তিন পুরুষ ধরে টাক। ঠাকুরদার পঞ্চাশ পেরোতে না পেরোতেই মাথা সাফ হয়েছিল শুনেছি। তুমি তো তবু আরো পঁচিশ বছর কেশকলাপ ধরে রেখেছ।'

অনাদিনাথ হাসলেন। এ মেয়েব ওপব বেশিক্ষণ রাগ করে থাকা যায় না। এমন কথা বলতে শিখেছে ' মেয়ে তো নয়, বুলবুলি। আর কেবল ঠাট্টা-তামাশা। বাপ তো নয়, ও যেন ঠাকুরদার সঙ্গে কথা বলছে। অবশ্য বয়সে ওর ঠাকুরদাও হতে পারতেন—অনাদিনাথ। কিন্তু বাপই হোক আর ঠাকুরদাই হোক, পুরুষ মাত্রেরই ও যেন বান্ধবী। স্বর্গ থেকে প্রপিতামহ নেমে এলেও ও তার সঙ্গে ফ্লার্ট করত। একটু বেশি আদরই দিয়ে ফেলেছেন ওকে অনাদিনাথ। শুধু কি তিনি ? বাড়িসুদ্ধ সবাই ওকে অতিরিক্ত আহ্লাদ দিয়ে দিয়ে—

'জানিস, আমাব মা তোর কী নাম রেখেছিলেন ? তিনি তো তোকে মাস তিনেকের বেশি দেখে যাননি। কিন্তু তাঁকে দেখলেই তুই গদ্‌গদ হয়ে উঠতিস। হাসতিস খলখল করে। তিনি তোর নাম রেখেছিলেন আহ্লাদী।'

'জানি বাবা। কী বিশ্রী নাম মাগো ' তুমি আবার ওটা চালু করতে চেষ্টা করেছিলে। তোমার মায়ের দেওয়া নাম যে মেয়েব ওপর চাপিয়ে দাওনি এই বক্ষে। আমি যদি জোব আপত্তি না করতাম আব দাদারা আমার সঙ্গে না থাকত, ওই নাম আমাকে কলেজে ইউনিভার্সিটিতে বয়ে বেড়াতে হতো। কী মারাত্মক কাণ্ড হতো ভেবে দেখ।'

'আরে আমি কি ওইটাই বাখতাম নাকি ? আমি একটু সংস্কার করে নিতে চেয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম হ্লাদিনী।'

বীথিকা হেসে উঠল, 'ওরে বাবা ! কেউ উচ্চারণ করতেই পারত না। বিশেষ করে সর্দিটর্দি লাগলে—।'

'খুকু, অত চপলতা ভালো নয়। শোন, তোমাব সঙ্গে আমার গুরুতর জরুরী কথা আছে।'

সে যে কী কথা বীথিকা জানে। সে কথা প্রায় রোজই এখন এ বাড়িতে হয়। তবু বীথিকা বাবার মুখেব দিকে তাকাল। সুর্মা পরা ওর আয়ত দুটি চোখ এখন বেশ প্রশান্ত।

'শোন, তোমার যে হ্লাদিনী নাম রেখেছিলাম, বিনা কারণে রাখিনি। তুমি আমাব একমাত্র মেয়ে। সবচেয়ে শেষের, সবচেয়ে আদরের সন্তান। কী আনন্দ যে হয়েছিল তোমাকে পেয়ে, তোমার নিজের যখন ছেলেমেয়ে হবে তখন বুঝবে। সারা বাড়ি ভরে আনন্দের ফোয়ারা ছুটল। কন্যাদায়ই বলি আর যাই বলি, যে ঘরে মেয়ে নেই সে ঘরে কি লক্ষ্মী আছে ! তোমার মা বললেন—যাক, এতদিনে তোমাব একজন সোহাগী জুটল। মেয়ে মেয়ে করে পাগল হয়ে গিয়েছিলে—।'

'তুমি এখনো তো আমাকে নিয়ে সেই পাগলই আছ বাবা। তোমাব কাছ থেকে যা পেয়েছি—'

'থাক থাক। তোর ওই কেতাবি ভাষা বাখ তো। বাপেব কাছ থেকে ছেলেমেয়েরা পাবে না তো কে পাবে ? পেয়েছ তো স্বীকার করলে। কিন্তু দিচ্ছ কী ?'

বীথিকা চুপ করে রইল। জানে, একথা উঠবেই। যখনি বাবার সঙ্গে দেখা হয় একথা ওঠে।

'আমার কথাব জবাব দাও খুকু।'

'কী জবাব দেব বাবা ! তোমাকে আমি কিছু দেব আমার সাধ্য কী। আমাব কী এমন ক্ষমতা আছে !'

'তোমার ক্ষমতা আছে আমি জানি। তুমি এম-এ পাস করেছ। আর একটু পড়াশুনো করলে ফার্স্ট ক্লাসটা পেতে। তা না পেলেও মোটামুটি তোমার রেজাল্টে আমি খুশি। হিস্ট্রি আমারও ফেবারিট সাবজেক্ট ছিল। তুমি তাই নিয়েছ। স্পনসরড্ কলেজে চাকরিও পেয়েছ। মাইনের টাকা তোমার দাদাদের মতই তুমি তোমার মায়ের হাতে ধরে দাও। সে-সব দিক থেকে তোমার বিরুদ্ধে তো কোন নালিশ নেই আমার। তুমি লক্ষ্মী মেয়ে। কিন্তু তুমি আমার কথা শুনে চলছ কই!'

বীথিকা জিজ্ঞেস করল না—কোন্ কথা। কোন কথা না শোনায় তাঁর আপত্তি তা বীথিকা জানে। কিন্তু বাবাও যখন স্পষ্ট কিছু বলছেন না, তারই বা বলে দরকার কি!

'অথচ এইটাই আসল কথা। আর সব তুমি মান আর নাই মান, টাকা-পয়সা কিছু দাও আর না দাও, কিছু এসে যায় না। কিন্তু আমার মূল কথাই তুমি যদি না শোন—।'

একথা যে আসল কথা, মূল কথা—মূল কথা না হোক বিশেষ মূল্যবান কথা, তা বীথিকা মানে। মানে বলেই তো বাবার কথা শুনতে তার দেরি হচ্ছে।

'আমি শেষ কথা বলে দিলাম। যদি আমার কথা না শোন, আমি এক সপ্তাহ দেখব, তারপর সংসার ত্যাগ করে চলে যাব।'

বীথিকা এবার উঠে দাঁড়াল, তারপর হেসে বলল, 'বাবা, সেই ত্যাগটা যেন এক মাস বাদে হয়। তখন থেকে আমার সামারের ছুটি আরম্ভ হবে।'

'তাতে আমার কী?

'বাঃ রে, আমি আর মা-ও তোমার সঙ্গে যেতে পারব। সেবার যেমন হরিদ্বার গিয়েছিলাম।'

অনাদিনাথ নিজে হাসি চেপে বললেন, 'হেস না খুকু। সব কথা অমন করে হেসে উড়িয়ে দিতে চেয় না। তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দেখ গিয়ে ওঘরে তোমার মা'র কী অবস্থা: অসুখে ভুগছে, তবু ওষুধ-বিষুধ কিছু খাবে না। খাবে কি, মনে শান্তি আছে যে খাবে!'

'যাই বাবা, আমি মাকে ওষুধ খাইয়ে আসি গিয়ে।'

পাশেই মা'র ঘর। গৃহস্থালির সব চেয়ে বড় ঘর। ডবল বেডের সেকেলে খাট ঘরের অর্ধেক জুড়েছে। আর এক ধারে বড় একটা গোদরেজের আলমারি। ভিতরটা জিনিসপত্রে ঠাসা। তবু বেচারাকে দুটো বড় বড় বোচকা মাথায় করে দাঁড়াতে হয়েছে। বীথিকা নিজের রুচিমত মায়ের ঘর আর গুছিয়ে রাখতে পারল না। উত্তর দিকে কুলুঙ্গিতে লক্ষ্মীর আসন পাতা। এখনো দীপ জ্বলছে। ঘটের ওপর আমের পল্লব, ফুল-দূর্বার ঘটা দেখে মনে হয় সন্ধ্যায় পূজাপাঠ শেষ হয়েছে। মনে পড়ল আজ বৃহস্পতিবার। ছোট রেকাবিতে একখানি বাতাসা এখনো অবশিষ্ট। বীথিকা এগিয়ে এসে বাতাসাখানা টপ করে মুখে ফেলে দিল। সেই ছেলেবেলার অভ্যাস এখনো ছাড়তে পারেনি। অমনিতে নিরীশ্বরবাদিনী। কিন্তু প্রসাদের ভাগ ছাড়ে না। সন্দেশই হোক বাতাসাই হোক, শশা পেয়ারা কি আখের টুকরোই হোক—সব নেওয়া চাই।

ঘরে সবুজ রঙের কম পাওয়ারের বালব্ জ্বলছে। নীরজা এদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। মেয়েকে দেখে পিছন ফিরলেন। শিয়রের কাছে ওষুধের শিশি, মেজার গ্লাস, আধখানা ভাঙা বেদানা। বোঝা গেল নীরজা কিছুই ছোঁননি। খানিকটা দূরে খাটের ওধারে অয়েল ক্লথের ওপর ননীর পুতুলের মত দুটি শিশু ঘুমোচ্ছে। মায়ের নবতম দুটি নাতি। বীথিকা মনে মনে বলল—ছোড়দার এই ছেলে দুটি ভারি সুন্দর হবে। যেমন শিগগির ছেলেমেয়ে চায়নি, তেমনি বেশ হয়েছে। একসঙ্গে দুটি। একসময় এ খাটের আধখানা ভাগ ছিল বীথিকার। সব ব্যাপারে মায়ের সঙ্গে ছিল রেষারেষি। বাবাকে বলত, তুমি আমাকে 'ওগো' বলো না কেন! মাকে ওগো বলবে না, আমাকে ওগো বলবে।

এখন তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে সে আসর। বাবা পর্যন্ত নাতিদের দৌরাত্ম্যে দূরে হটেছেন।

বীথিকা হাতের ব্যাগটা খাটের ওপর রেখে এগিয়ে এসে মায়ের কপালে হাত রাখল। টেম্পারেচার কমেছে।

'মা!'

'নীরজা মুখ না ফিরিয়েই বললেন, 'আর মা-মা করো না বাপু।'

'বাঃ রে, কোথায় আমি বল্লুব—মা বলে আর ডাকব না মা—আর তুমি উল্টো গীত গাইতে শুরু

কবলে।'

'কেন, তোব না ডাকবাব কী হয়েছে শুনি। আমি অবাধ্য না তুই অবাধ্য?'

'তুমিও অবাধ্য কম নও মা। ওষুধ খাচ্ছ না, পথ্য খাচ্ছ না।'

'কী হবে আব ওষুধ খেযে।'

'ওষুধে চিন্তা-জ্বব ছাড়ে না, কিন্তু ইনফ্লুযেঞ্জা ছাড়ে। আমি সেই সকালে অত কষ্ট কবে জল-কাদা ভেঙে তোমাব ওষুধ নিযে এলাম, আব তুমি খাবে না।'

'গাছেব গোড়া কেটে আগায জল ঢালা কেন বাছা। আমাব অসুখ তো তোমাব জন্যে।'

'বাঃ। বাবা বললেন, 'আমাব জন্যে তাঁব মাথায টাক, আবাব তুমি বলছ, আমাব জন্যে তোমাব ইনফ্লুযেঞ্জা। আমাব যে এত দোষ—'

এবাব অধীব হযে নীবজা মুখ ফিবিযে মেযেব দিকে তাকালেন।

'ঠাট্টা-ইযার্কি সব সময কবিসনে খুকু। মানুষেব ধৈর্যেব একটা সীমা আছে। তাছাড়া তুই যে সব সময আমাব সঙ্গে ফাজলেমি কবিস, আমি কি তোব সমবযসী?'

'সমবযসী মানে? তুমি আমাব এক জেনাবেশন পবে এসেছ। তুমি আমাব কোলেব মেযে। ছোট্ট খুকুমণি। লক্ষ্মী সোনা, এবাব ওষুধটুকু খেযে ফেল তো।'

গ্লাসে ওষুধ ঢেলে মাযেব মুখেব সামনে এগিযে নিযে গেল বীথিকা।

'আমাব কথা না শুনলে আমি ওষুধ খাব না।'

'ওষুধ না খেলে আমি কথা শুনব না।'

'ওষুধ খেলে শুনবি তো?'

'শুনব।'

এবাব নীবজাব মুখে একটু হাসি দেখা দিল। তেতো ওষুধ খেযেও তিনি হাসলেন। আব সেই হাসি দেখে বীথিকাব বড় কষ্ট হল। সত্যি, ভাবি বোগা হযে গেছে মাযেব দেহ। মুখখানি শুকিযে কুঁচকে গেছে। ষাটেব কাছাকাছি এখন বযস। কিন্তু বাবাব চেযেও যেন বেশি বুড়ো দেখায। শুধু দু'দিনেব জ্ববেই ওব এ দশা হযনি। মা অনেকদিন থেকে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন তা বীথিকা জানে। অথচ কী সামান্য ব্যাপাব নিযে—কত সামান্য ব্যাপাব নিযে—। কতকগুলি পযেন্টেব ওপব ওঁবা এত গুরুত্ব দিচ্ছেন বলেই ওঁদেব এত কষ্ট। নইলে এই কষ্ট হতো না, বীথিকা ভাবল। কিন্তু মা'ব ওই হাসি দেখে বড় দুঃখ হচ্ছে বীথিকাব। মা যা বলবেন সত্যিই তো বীথিকা তা শুনতে পাববে না। তবু এই ছলনাটুকু কবতে হল। কী আব কবা যায। মা-ও তো তাকে ছেলেবেলায ভুলিযে-টুলিযে কত ওষুধ খাইযেছেন।

ওষুধেব গ্লাসটা বেখে দিলেন নীবজা। বেদানাব কযেকটি কোযা ভেঙে বীথিকা দুটি একটি কবে মাযেব মুখে তুলে দিল। যেন পাখিকে খাওযাচ্ছে।

'খেলাম। এবাব আমাব কথা শোন।'

'মা, আমি কাপড় ছেড়ে আসি, হাত-মুখ ধুযে আসি। তাবপব এসে শুনব।'

'এই বুঝি! আমাব বেশি সময লাগবে না। শুধু একটা কথা শুনে যা।'

'বল।'

'তোব মেজো মামা আজ আবাব এক সম্বন্ধ এনেছে। ছেলে দিল্লিতে থাকে। ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট না কি ডিপার্টমেন্ট আছে, তাতে ভালো চাকবি কবে। সাত-আট শ' টাকা নাকি মাইনে। আবো উন্নতি হবে।'

'হতে থাকুক। আমি ততক্ষণে গা টা ধুযে আসি মা।'

'অবাধ্য একগুঁযে মেযে! দাঁড়াও বলছি!'

'ওকি মা, চেঁচাচ্ছ কেন। তোমাব শবীব আবো খাবাপ হবে। জ্বব বেড়ে যাবে। আচ্ছা আমি বসছি তোমাব কাছে। বলো কী বলবে বল।'

'বলব আমাব মাথা।'

নীবজা একটু হাঁপাতে লাগলেন। বাগ আব দুঃখ দমন কববাব জন্য সময নিলেন একটু।

তারপর মেয়ের পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'ছেলেটি কিন্তু সবদিক থেকেই ভালো। বেশ স্বাস্থ্যবান, আর লম্বা-টম্বা। লম্বা না হলে কি আর পুরুষের চেহারা খোলে ? আমার মা বলতেন, পুরুষ হবে তালগাছের মত। মেয়েরা তার দিকে তাকাবে আর তাদেব মাথার আঁচল খসে পড়বে।'

'আজকাল তো মেয়েরা মাথায় আঁচল দেয় না মা।'

'দেয় না ভারি বুদ্ধির কাজ করে ! কুমারী অবস্থায় আঁচল কেউ দেয না, আমরাও দিতাম না। কিন্তু বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সিঁদুর টিঁদুব পরলে, মাথায় আঁচল দিলে ভালোই দেখায়। মুখখানা ঘেরা থাকে। যতদিন চুল থাকে আঁচল না দিলেও চলে। কিন্তু চুল তো আর বেশি দিন থাকে না তোমাদের আজকালকার মেয়েদের। আঁচল দিলে সব ঢেকে যায়। তা তো দেবে না। ন্যাড ন্যাডা বিশ্রী দেখায় সব। তবে আজকাল নাকি সব নকল চুলও বেরিয়েছে। কালে কালে কতই শুনব।'

একালেব রূপসজ্জা নিয়ে মায়ের সঙ্গে আজ আর তর্ক তুলল না বীথিকা। এর চেয়েও গুরুতর বিষয় নিযে বহু তর্ক আছে।

'গোপনে গোপনে তোব ফটো পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। তাদের দেখে তো খুব পছন্দ। তোকে যে দেখবে সেই পছন্দ করবে। ভগবান এই সুখটুকু আমাকে দিয়েছেন।'

নীরজা প্রসন্ন পরিতৃপ্ত চোখে মেয়েব দিকে তাকালেন। বঙে, নাক-চোখে, দেহেব গড়নে তার মেয়ে সুন্দব। একেবারে অপূর্বসুন্দরী নয়, ডাকসাইটে সুন্দরী নয়, তবু দেখতে বেশ। লেখাপড়াও যতদূর শিখবার শিখেছে। তবে আরো ক'টা বছর আগে বিয়ে দিতে পারলে ভালো হতো। তাহলে আব কোন সমস্যা থাকত না। কর্তার গাফিলতি। বিয়ে দিলেই মেয়ে পর হয়ে যাবে। মেয়ে তো পব হবার জন্যেই হয়। কিন্তু আর দেরি করবেন না নীবজা। তাহলে এই চেহারা আর থাকবে না। বয়স পার করে বুড়ি করে বিয়ে দিয়ে কী হবে।

মেযেব দিকে তাকালেন নীবজা। কিন্তু ওর যা গড়ন, ওর বোধ হয় অনেকদিন—অনেকদিন—এই বাঁধ থাকবে। নীবজাব নিজের দেহ অল্পবয়সেই ভেঙে গিয়েছিল। কত আগে বিয়ে হয়ে গেল। পর পর ছেলেমেয়ে হতে লাগল। তারপর বোগ শোক—। দেহের আব থাকে কি ! কিন্তু ওর থাকবে। আহা, ভগবান করুন যেন থাকে, আজকালকার মেয়েরা এই সুবিধাটুকু পায়। বাপেব ঘরে পছন্দ মত লেখাপড়া শিখতে পারে, অল্প বয়সে ছেলেমেযে ধরতে হয় না, শরীর রাখতে পারে।

'কী দেখছ মা।'

'তোকে দেখছি।'

'আমাকে ?'

'হ্যাঁ রে খুকু। দেখছিলাম আর ভাবছিলাম। ছেলেমেয়ে কাছে থাকলে মানুষ যেন বুড়ো হযেও বুড়ো হয় না।'

'কি রকম !'

'কি বকম আবার ! তোকে দেখলে আমার সেই প্রথম বয়সের কথা মনে পড়ে যায। অবশ্য তোর সঙ্গে আমার অনেক তফাৎ। আকাশ-পাতাল। তোর এই বযসে আমি তিন ছেলের মা। পুরোদস্তুর গিন্নি। এই যে তুই রাত-দিন চলছিস-ফিরছিস, ছুটোছুটি করছিস, আমাদের কালে কি এসব হতো ? ওরে বাপরে, ঘোমটা একটু খাটো করলে কী নিন্দে, কী নিন্দে ! কোন মিল নেই। কিন্তু একেক সময় মনে হয়, বেশ মিল আছে। আমি যা হতে পারিনি তুই তাই হয়েছিস। তোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখি আর ভাবি, যেন সেই বয়সেব আমিই তোর ভিতর দিযে চলছি-ফিরছি, ঘুরছি বেড়াচ্ছি। তুই আমার সব সাধ সব স্বপ্ন মিটিয়েছিস ! তুই আমাকে কোন দুঃখ দিসনে মা।'

মা আর মেয়ে দু'জনের চোখেই ছলছল করে উঠল।

বীথিকা আরো এগিয়ে এসে মায়ের কাছ ঘেঁষে বসল। তাঁর কাঁচা-পাকা চুলে সিঁথিতে মোটা করে সিঁদুর পরা মাথাটি আরো কাছে টেনে নিল। তারপর জীর্ণ গালে ঠোঁটে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। সেই মুহূর্তে বীথিকার মনে হল, সত্যি এই যে স্নেহের বন্ধন, নাড়ীর বন্ধন, এর চেয়ে বড় কিছু আর পৃথিবীতে নেই। এর জন্যে সব দেওয়া যায়। পুরো একটা জীবনও এর কাছে তুচ্ছ। বীথিকা কি ত দিতে পারে না ?

মেয়ের আদরে নীরজার একটু তন্দ্রার মত এল। বীথিকা পা টিপে টিপে এবার বেরোল মা'র ঘর থেকে।

করিডর দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল। পাশেই বড়দার ঘর। এ ঘর একই সঙ্গে তাঁর শোবার আর লিখবার ও পড়বার। ঘরের দরজা আধখানা ভেজানো। সেই ফাঁকে আলো এসে পড়ছে। ঢাকনির নিচে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে বড়দা কাজ করছেন। মক্কেলের নথিপত্রের মার্জিনে নোট লিখছেন না আইনের বই পড়ছেন, কে জানে!

বীথিকা পায়ের শব্দ মৃদুতর করে চলে যাচ্ছিল, পিছন থেকে গুরুগম্ভীর স্বরে ডাক এল 'খুকু'!

আশ্চর্য, নিজের কাজে অত মনোযোগী বড়দা মক্কেলের ফাইলে নিমগ্ন, তবু কী করে টের পেলেন তাঁর ঘরের কাছ দিয়ে খুকুই যাচ্ছে, আর কেউ যাচ্ছে না!

বীথিকা এগিয়ে এসে তাঁর ঘরের সামনে দাঁড়াল।

রিভলভিং চেয়ারখানা একটু ঘুরিয়ে নিলেন অবনীনাথ।

বললেন, 'এই এলি নাকি?'

'না দাদা, অনেকক্ষণ এসেছি। বাবার কাছে ছিলাম, মা'র কাছে ছিলাম।'

বীথিকা যেন ধরা-পড়া আসামী। বড়দা যেন উকিল নন, হাইকোর্টেব জজ। এই মুহূর্তে রায় দিয়ে দেবেন। পাঁচ বছর, দশ বছর, হতে পারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। বড়দার ইচ্ছা যে তাই, তাতে কোন সন্দেহ নেই বীথিকার। তিনি যাবজ্জীবনেব দণ্ডই তাকে দিতে চান। তিনি অবশ্য পুরস্কাব বলেই দেবেন। কিন্তু বীথিকা যদি তাঁর দানকে পুরস্কাব বলে নিতে পারত!

চশমার পুরু কাঁচের ভিতর দিয়ে অবনীনাথ বীথিকার দিকে তাকালেন।

কিসের একটা ভয় আর অস্বস্তি বোধ করল বীথিকা। দীর্ঘ, উন্নত, সবল, সুন্দর, প্রৌঢ় এক পুরুষ-মূর্তি চেয়ারে অনড় হয়ে বসে আছেন। বসে বসে দেখছেন। কী দেখতে চাইছেন তিনি? বাবার দৃষ্টি নয়, মায়ের দৃষ্টি নয়, অনুরাগী বন্ধুদের দৃষ্টি নয়—এ ভিন্ন এক জোড়া চোখ। কী জানতে চাইছেন তিনি? তাঁর কি জানবার কিছু বাকি আছে! তা নেই। তিনি এখন সেই জানাকে না-জানার সামিল করতে চান। তিনি হাঁ-কে না করে দিতে চান, না-কে হাঁ কবতে চান। তাঁব দুটি চোখ সেই প্রবল ইচ্ছার প্রতিফলক। তাঁর দুটি চোখ এখন কঠিন নির্মম এক শাসকের চোখ।

'আচ্ছা তুই যা।'

চেয়ার ঘুরিয়ে নিলেন অবনীনাথ। ফের নিজের কাজে মন দিলেন। বীথিকাব একবার ইচ্ছা হলো আরো একটুকাল দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে বড়দার পিঠ দেখে। রোমশ প্রশস্ত পৃষ্ঠদেশ। বেশ দেখবার মত। বড়দার চোখের মত তাঁর এই পিঠ ভয়ঙ্কর নয়। ও পিঠে ছেলেবেলায় কতদিন কত প্রশ্রয় পেয়েছে বীথিকা! শুধু কি পিঠে? বুকে কাঁধে কোথায় না তুলেছেন তাকে বড়দা? সবাই আহ্লাদ আহ্লাদ কবে, বড়দা কি তাকে কম আহ্লাদ দিয়েছেন এক সময়! নিজের পিঠকে বড়দা বলতেন আফ্রিকা মহাদেশ। 'চল খুকু, তোকে আফ্রিকা মহাদেশে নিয়ে যাই।' বড়দা বলতেন, দুটি কাঁধ পামীর মালভূমি। মাথা হিমালয়ের চূড়া। ভূগোল শেখাতেন তাকে বড়দা।

সিঁড়ি ভেঙে তিন তলায় উঠে এল বীথিকা। নিজের ঘরে ঢুকল। আলো জ্বালল। ছোট্ট সুন্দর পরিপাটি করে গুছানো তার এই ঘর। জানলার ধারে খাট। খাটে ফেননিভ বিছানা। র‍্যাকে একটি বইও এলোমেলো নেই। টিপয়ের ওপর ফুলদানিতে রজনীগন্ধা। ভারী মমতা এই ঘরের ওপরে বীথিকার। তবু আজকাল মাঝে মাঝে মনে হয় খাঁচা। সোনার খাঁচা। দোর ভেজিয়ে দিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ি বদলাল বীথিকা, জামার বোতাম খুলতে লাগল।

অমন যে রাশভারী স্বভাবের বড়দা, তাঁর আদরও কম পায়নি বীথিকা। কিন্তু সেই বড়দা আর নেই। তিনি বদলে গেছেন। একদিনে নয়, দিনে দিনে বদলেছেন। তিনি বীথিকার পোশাকআশাক পছন্দ করেননি, চালচলন পছন্দ করেননি, তার বন্ধুদের দেখে মহা বিরক্ত হয়েছেন। তবু বীথিকা নিজের ধরনে নিজের ধারণায় চলেছে। বড়দাকে পাশ কাটিয়ে বন্ধুমণ্ডলী নিয়ে আর-এক ভূমণ্ডল গড়ে তুলেছে।

কিন্তু মাঝে মাঝে বড়দাকে এমন করে হারাবার জন্যে দুঃখ হয় বীথিকার। বড়দার মনের মত

হয়ে তাঁকে ফের জয় করে নেওয়ার জন্যে লোভ হয়। গোপনে গোপনে বীথিকা এখনো বড়দার ওপর প্রবল আকর্ষণ বোধ করে। বীথিকা এখনো বলে, এখনো স্বীকার করে, হ্যাঁ, পুরুষের ওই রকমই হওয়া উচিত। পুরুষেব মূর্তি বীথিকা বড়দাব মধ্যেই প্রথম দেখেছিল। ঠিক ওই রকম দৈর্ঘ, দৃঢ়তা, একটু বা দম্ভ, কর্মক্ষেত্রে সাফল্য, নিজের শক্তিব ওপর বিশ্বাস, আর সেই সঙ্গে বৃহৎ পরিবারের আত্মীয় পরিজন ও বাইরের বন্ধুজনের জন্য ত্যাগ—এত গুণ কাকে না লুব্ধ করে? বড়দা নিঃসন্দেহে আদর্শ পুরুষ। স্বামীকে নিয়ে বড় বউদির মনে মনে যে গর্ব তা অকারণ নয়। বীথিকাও এক সময় ভাবত, তার স্বামী বড়দার মতই হবেন। পৌরুষের এই বিশেষ প্রকাশটি বীথিকার মনকে অনেক—অনেকদিন ধরে—আর বোধ হয় এই সেদিন পর্যন্তও আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এখনো তা একেবারে কেটে যায়নি।

'ভারী কনভেনশনাল পৌরুষ সম্বন্ধে তোমার এই ধারণা।' বীথিকার কোন কোন ছেলে-বন্ধু বলেছে। আকারে-প্রকারে যারা অন্য ধরনের পুরুষ তাদেরই লেগেছে বেশি।

বীথিকা তাদের সঙ্গে তর্ক করেছে, 'তা যদি বল—রূপ, গুণ আমাদের ফাণ্ডামেণ্টাল ভ্যালুজ কি কনভেনশনাল নয়?' বীথিকা কি জানত সে নিজেই একদিন নিজেব প্রতিবাদ করবে? প্রতিবাদ কবতে হবে তাকে?

তারপব অবশ্য পৌরুষের নানা প্রকাশ সে নানা জনের মধ্যে দেখেছে। এমন অনেক প্রফেসরকে দেখেছে, যাঁদের চেহাবা নেই, বাকশক্তি দুর্বল কিন্তু পাণ্ডিত্য আছে। সেই পাণ্ডিত্যেব মধ্যেই তাঁদেব পৌরুষ। এমন অনেক গুণীকে দেখেছে, শিল্পীকে দেখেছে, যাঁদের গুণ অনেক মাবাত্মক দোষের সঙ্গে বিজড়িত। তাঁদেব গুণ যেন খনিব ভিতরের অবিশুদ্ধ ধাতু। তবু বীথিকা মনে মনে স্বীকার কবেছে ওই গুণেব মধ্যেই তাঁদেব পৌরুষ। ভুলো দোষ গুণ ধরো—এই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা।

পুরুষ চব্বিশ বছব বয়সে বীথিকা কম দেখেনি! দেখতে ভালো লেগেছে। পুরুষের সঙ্গ যে তার ভালো লাগে একথা সে অস্বীকাব কবে না। পুরুষ তাকে দেখে আনন্দ পায় তা সে দেখেছে। তার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পায়, তাব সান্নিধ্যে আনন্দ পায়—লক্ষ কবেছে, অনুভব কবেছে বীথিকা। আব তাদেব সেই পাওয়াব মধ্যে নিজের এক বিশেষ ধবনেব স্বীকৃতি পেয়েছে এ কথা অস্বীকার করে কী হবে।

তবু এত পুরুষের মধ্যে বড়দা যে একজন পুরুষের মত পুরুষ, বীথিকা তা আজও মানে। কিন্তু একমাত্র পুরুষ নয়, এ কথাও ঠিক।

শাড়ি পালটে ঘড়ি খুলে পাশেব বাথরুমে ঢুকল বীথিকা। ফ্লাট সিসটেমে বাড়ি। প্রত্যেক ফ্লোরেই বাথরুম আছে। দোতলা তিনতলাব দুটো ফ্লাটই তাদের ভাড়া নিতে হয়েছে। পাশেই জায়গা কেনা আছে। সেখানে নিজেদের বাড়ি উঠছে। কাছাকাছি থাকলে দাদাদের দেখাশুনো কবতে সুবিধা হয়। তাই এত দূরে আসা।

বাথরুমে এসে সাবান মেখে মুখ-হাত ধুতে লাগল বীথিকা। পুরুষ অনেককে দেখেছে। দাদাদের বন্ধুদের অনেকেই শেষ পর্যন্ত বীথিকাব বন্ধু হয়েছেন। বড়দারও কোন কোন বন্ধু বাদ যাননি। বীথিকা হাসল। তাঁদের কাউকে কাউকে দুষ্টুমি করে বীথিকা বেশ কাবু করে ফেলেছিল। কিন্তু অল্প বয়সের সেই দুষ্টুবুদ্ধি এখন আর বীথিকার নেই। সেই বীথিও বদলেছে। এখনকাব বীথিকা যেন আব-এক বীথিকা। মা যেমন তাব মধ্যে নিজের যৌবন-স্মৃতিকে দেখেন, বীথিকাও তেমনি একটু সবে দাঁড়িয়ে যেন আর-এক বীথিকাকে দেখতে পায়—যে বীথিকা ঠিক আগেকাব মত তরল নয়, চপল নয়, চাপল্য যার মুখোশ মাত্র, যে বীথিকা নিজের সমস্যায় জর্জর, যে বীথিকা একটি দ্বিধার দোলায় এখনো দোলে।

অনেককে দেখেছে বীথিকা। কিন্তু কখনো কি ভেবেছি..., যে পুরুষ অনেকের চোখেই প্রায় নির্বিশেষ, তাকে সে বিশেষ চোখে দেখবে!

বাথরুম থেকে বেরিয়ে ফেব দোতলায় নামল বীথিকা। ঢুকল খাবার ঘরে। ছোট-বউদি মন্দিরার আর তর সয় না, এরই মধ্যে ডাকাডাকি শুরু করে দিয়েছে।

লম্বা টেবিলের দু'পাশে সারি সারি আটখানা চেয়ার পাতা। ভাইপো ভাইঝিদেব দল খেয়ে উঠে

গেল। সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করা হল টেবিল। সবাই তো একসঙ্গে হয় না। তা ছাড়া এক-অন্নে থাকলে কি হবে—রুচি ভিন্ন, সময়ও ভিন্ন।

সেজদা, ন'দা চাকরি নিয়ে সপরিবারে বাইরে। একজন ডিব্রুগড়ে আর একজন জব্বলপুরে। একজন রেলে আর একজন অর্ডন্যান্সে।

বাড়ি এখন প্রায় খালি। শুধু মেজদা একাই এত বড় খাবার ঘরটা জমিয়ে বসে আছে। বীথিকা তার সামনের চেয়ারে গিয়ে বসল।

অরিন্দমের বেশ বড়সড় চেহারা। এখনো শরীর-চর্চা করে। মাংসপেশীগুলি সেই শক্তির স্বাক্ষর ধরে রেখেছে।

একটু দূরে বসে খাচ্ছে ছোড়দা অলোকেশ। ছোট বউদি মন্দিরাকে জোর করে তার পাশে বসিয়ে দিলেন বড় বউদি। তারপর নিজেই পরিবেশন করতে শুরু করলেন।

বীথিকা বলল, 'ওকি বউদি, তুমি কেন? আমাদের মালতী কোথায় গেল?'

অণিমা পুষ্টাঙ্গী। বাড়ির বড় বউ। স্বামী শুধু বয়সে নয়, সব ব্যাপারেই যে বড় সে সম্বন্ধে অণিমা সচেতন। কিন্তু সেই অহঙ্কারকে কীভাবে সংযত করতে হয়, তা তিনি জানেন। বেশবাস সাদাসিধে। আচার-আচরণেও তাই। তবু ব্যক্তিত্ব চোখে পড়ে। সেই সঙ্গে মুখের প্রসন্ন মাধুর্যটুকুও দৃষ্টি এড়ায় না।

অণিমা বললেন, 'মালতী কি আর আছে? ওর স্বামীর নাকি অসুখ। তাকে দেখতে চলে গেছে। খোঁজখবর তো কিছু রাখবিনে?'

অরিন্দম বলল, 'কোথায় থাকিস বল তো খুকু? কলেজ থেকে সোজা বাড়ি চলে আসবি তা নয়, কোথায় টো-টো করিস সারাদিন?'

মেজদা বলবান হলে কী হবে, বীথিকা তাকে বড়দার মত অত ভয় করে না। মেজদার ধমকের মধ্যেও কোথায় যেন একটু সস্নেহ প্রশ্রয় আছে।

বীথিকা বলল, 'বাঃ রে, আমার বুঝি কোন কাজ থাকতে পারে না। আমি বুঝি শুধু মিছিমিছিই ঘুরে বেড়াই? রিসার্চের কাজে আমাকে মাঝে মাঝে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে যেতে হয়। তুমি বিশ্বাস না করলে কী করব?'

অরিন্দম অনেকখানি রুটি-তরকারি একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে বলল, 'কী রকম রিসার্চ শুনি? কী সার্চ করে করে বেড়াচ্ছিস!'

বীথিকার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল অরিন্দম।

অণিমা থালায় করে মাছ নিয়ে এলেন। হাতায় করে প্রত্যেকের পাতে দিতে দিতে বললেন, 'কথাটা মিথ্যে বলোনি ঠাকুরপো। রিসার্চের নামে খুকু এখন নিজেই নিজের ঘরবাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

বীথিকা বলল, 'বউদি!'

অরিন্দম বলল, 'ও আবার কী খুঁজবে! ও যদি খুঁজবে আমরা আছি কী জন্যে? —খুকু, তুই মোটেও ভাবিসনে যে, তুই তোর পছন্দমত একটা যা-তা কিছু এ বাড়িতে করতে পারবি। আর বাড়ির বাইরে তো যেতেই পারবিনে, যেখানেই যাবি সেখান থেকে ধরে নিয়ে আসব। আমাদের পছন্দ-করা ছেলের সঙ্গে আমি দাঁড়িয়ে থেকে তোর বিয়ে দেব। আমি একাই যথেষ্ট। বর আসবে। একজন পুরুতকে ডেকে আনব। বলব—মন্ত্র পড়ে যান। শব্দরূপ ধাতুরূপ গ্রাহ্য করবেন না। শুধু অনুস্বর বিসর্গগুলি মাঝে মাঝে থাকলেই হল।'

অরিন্দম একটু থেমে আবার বলতে থাকল, 'পুরুত মন্ত্র পড়তে থাকবেন। আর তোকে আমি পাঁজাকোলে করে নিয়ে এসে আলপনা আঁকা পিঁড়িতে বসিয়ে দেব। তুই বিয়ে করবি না তোর ঘাড় করবে।'

বীথিকা এক টুকরো মাছ ভেঙে মুখে দিয়ে হেসে বলল, 'সে কি মেজদা, এই বুঝি তোমার অভিসন্ধি? বাদ্য নেই, বাজনা নেই, অমন নিখরচায় আমার বিয়েটা সারবে আর আমার বিয়ের জন্যে যে টাকাটা বরাদ্দ আছে তাই দিয়ে বুঝি তোমার নতুন বিজনেসের নতুন এক্সপেরিমেন্ট শুরু

হবে ?'

অরিন্দম বলল, 'আমাদের কথামত যদি চল, তোমার বিয়েতে আমরা রাজসূয় যজ্ঞ করব। আর যদি ঝামেলা কর, তাহলে ওই ব্যবস্থা। হাতকড়ি লাগিয়ে বিয়ে। —বউদি, তোমরা তো বোধ হয় ডজনখানেক ছেলের সঙ্গে এখন কথাবার্তা চালাচ্ছ। কেউ এস ডি ও, কেউ ম্যাজিস্ট্রেট, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বিলাত-ফেরত ডাক্তার ; আরো কে কে আছে ? একজন উপমন্ত্রী টুপমন্ত্রীও আছে বোধ হয়। আর আমাদের খুকুর কাছে যে-সব আবেদন-নিবেদন আছে, যে লম্বা ওয়েটিং লিস্ট আছে ওর কাছে, তাতেও কি মেরেকেটে ডজন দুই ক্যাণ্ডিডেট দাঁড়াবে না ? সব মিলিয়ে এক স্বয়ংবর-সভা ডাকলে হয়।'

'মেজদা, ভালো হবে না কিন্তু।'

কয়েক থাবায় অরিন্দম খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল। তারপর ফের হাসতে হাসতে বলল, 'স্বয়ংবর-সভার আইডিয়াটা কিন্তু বেশ। যাই বলিস। তবে পণটা ঠিক করে নিতে হবে। ধনুর্ভঙ্গ না লক্ষ্যভেদ, নাকি আধুনিক কালের তর্কযুদ্ধ— ।'

এক লাফে বেরিয়ে গেল অরিন্দম। কিন্তু যাওয়ার আগে একটু কুকীর্তি করে গেল। এঁটো হাতটা ঘষে দিয়ে গেল বীথিকার ডান গালে।

বীথিকা বলে উঠল, 'দেখ দেখ, কাণ্ড দেখ।' বাঁ হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে গালটা মুছে নিল বীথিকা।

আসলে বীথিকা যে খুকুই, তার জীবন, তার জীবনের নানা জটিল সমস্যা, তার দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সবই যে তুচ্ছ হাস্যকর ব্যাপার, এই কথাটাই যেন এক বিরাট অট্টহাসি দিয়ে মেজদা তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল।

বীথিকা মনে মনে বলল, 'কিন্তু যতই হাস মেজদা, তুমিও এক বিরাট শিশু। চল্লিশ বছরেও তোমার বয়স বাড়েনি। ওই বিপুল দেহের মধ্যে তুমি এক শিশুর, বড়জোর একটি বালকের মন নিয়ে বাস করছ।'

তবু এক হিসেবে মেজদা বেশ আছে। বীথিকা ভাবল, বেশ আছে মেজদা। বিয়ে-থা করল না, বোধ হয় করবেও না কোনদিন। কোন মেয়েকে কাছে ঘেঁষতে দিল না, ঘেঁষলও না কোনদিন। সারা জীবনটা এক ব্যবসা থেকে আর এক ব্যবসায় গিয়ে আর কম লোকসান থেকে বেশি লোকসানের বাহাদুরি দেখিয়ে দেখিয়ে কাটিয়ে দিল। প্রেম শব্দটি শুনলেই মেজদার হাসি পায়। পায়ের তলায় কি কোমরের সুড়সুড়ি দিলে মানুষ যেমন হাসে, মেজদা তেমনি করে হাসে। মেজদা কি সিনিক হয়ে গেছে ? কে জানে ! মেজদা কি গোপনে গোপনে কাউকে ভালোবেসেছিল—তাকে পায়নি, সেইজন্যে এই অবস্থা ? কে জানে !

বীথিকা অনেক জানবার চেষ্টা করেও পারেনি। বাইরে থেকে মেজদার জীবন খুবই সহজ সরল অনাড়ম্বর। কিন্তু ভিতরের সব দরজা বন্ধ। অবসর সময়ে ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ে, কি দাবা খেলে মেজদা। কিন্তু ইচ্ছা করেই হোক কি চেষ্টা করেই হোক আর নিজের স্বভাব থেকেই হোক, মেজদা ভালো না বাসতে পারার শক্তি আয়ত্ত করেছে।

বীথিকা নিজের মনে বলল, 'ঠিক মেজদা, ভালো না বাসতে পারাও একটা ক্ষমতা। সেই ক্ষমতা কী করে পাওয়া যায়, আমাকে বলে দাও। ভালো না বাসতে পারার মন্ত্রটা শিখিয়ে দাও আমাকে।'

'খুকু, তোকে আর একখানা মাছ দিই ? তোর ভাত যে পড়ে রইল।'

বড় বউদি আবার ঘুরে এসে ওর পাতের কাছে দাঁড়ালেন।

'না বউদি, আর খেতে ইচ্ছে করছে না।'

'কেন যে ইচ্ছে করছে না তা তো জানি ভাই। কিন্তু না খেয়ে খেয়ে শরীর শুকলে কি চলবে ? খেতেও হবে, পরতেও হবে, আবার আমাদের কথা শুনতেও হবে। আমরা যা বলছি তা তোমার ভালোর জন্যেই বলছি। বাড়িসুদ্ধ লোক এককথা বলছি আর তুমি আর এক কথা বললেই তো হবে না। এখানে সবাই তোমার চেয়ে বয়সে বড়, অভিজ্ঞতায় বড়। তাদের কথা শুনলে তোমার ভালো বই মন্দ হবে না।'

'তা তো হবে না, কিন্তু তাই বলে তুমি মাছখানা দিয়েই ফেললে বউদি ? কাব ভাগেব মাছ দিলে ? তোমাব ?'

'না মন্দিবাব। ও তো এখনো মাছ খেতে শিখল না। ভালোই বাসে না মাছ। ওকে একটু বাবডি আনিযে দিযেছি।'

বীথিকা চোখ তুলে ছোট বউদিব দিকে তাকাল। মন্দিবাও মৃদু হাসল।

'এখনো মাছটা ধবতে পাবলে না ?'

মন্দিবা হেসে মাথা নাডল।

গুজবাটী মেযে। যদিও বাংলা দেশে অনেকদিন আছে, শান্তিনিকেতনে পডেছে, কিন্তু মাছটা এখনো ওব প্রিয় খাদ্য হযে ওঠেনি। একেবাবে যে খায না তা নয, কচিৎ কখনো কালেভদ্রে খায। আব সব ভালোই শিখেছে। বাংলা চমৎকাব বলতে পাবে, ববীন্দ্রসঙ্গীত চমৎকাব গায। আগে নাচতও। সেই নাচ দেখেই তো ছোড়দাব মনেব ময়ূব নেচে উঠেছিল। একেবাবে আমেদাবাদ পর্যন্ত ছুটে গিযেছিল ছোডদা। তবে ছুটোছুটি সার্থক। ভাবী সুন্দব বউ হযেছে। ভাবী মিষ্টি চেহাবা। প্রথম প্রথম বাডিতে অবশ্য একটু গোলমাল হযেছিল। মা বেঁকে বসেছিলেন। কিন্তু বউযেব মুখ দেখে ভুলে গেলেন। স্বভাবেও। মানিযেছে বেশ। দুটিতে পাশাপাশি বসে আছে যেন কিন্নব-কিন্নবী। ছোডদা অবশ্য নাচতে পাবে না। কিন্তু তাই বলে ওব উঠোন বাঁকা নয। ইনকাম ট্যাক্সেব পদস্থ অফিসাব। মোটা মাইনে পায। এবাবও প্রমোশন নিযে বোম্বেতে বদলি হলো। মন্দিবাকে সঙ্গে নিযে যাবে। নামটা ছোডদাব বেশ পছন্দ হযেছে। বীথিকাবই দেওযা নাম। আগে ওব নাম ছিল সবস্বতী সবাভাই।

'মাছটা কেন ফেব দিলে বউদি ! খেতে ইচ্ছে কবছে না।'

বড বউদি ধমক দিলেন 'আঃ আবাব ! খা বলছি। নইলে জোব কবে মুখেব মধ্যে গুঁজে দেব। খাও। আব চিন্তা-ভাবনা না কবে আমাদেব কথা শোন কাল কিন্তু তোমাব বেবোন চলবে না কাল তোমাকে দিযে আমাদেব দবকাব আছে।'

বীথিকা বুঝতে পাবল, আব একদল আসবে তাব রূপ গুণ যাচাই কবতে।

'কিন্তু আমাব তো কোন দবকাব নেই।'

'আমাদেব দবকাবেই তোমাব দবকাব। আচ্ছা খুকু, তোব কি ধাবণা, বাপ মা দাদা বউদিবা দেখেশুনে বিযে দিলে সে বিযে সুখেব হয না ? আমবা তো বলি তাতেই বেশি সুখ। শেষ পযন্ত সেই সুখই টেকে। একজনেব দেখা ভুল হতে পাবে, কিন্তু দশজনেব একসঙ্গে ভুল হবে—তা হয না।'

বীথিকা বেশ বুঝতে পাবছে, এসব বডদাব কথা—বউদিব মুখ থেকে বেবিযে আসছে। বডদা বাডিতে বেশি কথা বলেন না। কোন তর্ক কবেন না, যুক্তি দেখান না। বীথিকাব সঙ্গে তো নযই। তাঁব সব সওযাল-জবাব কোর্টে, কিন্তু বাডিতে তিনি সুপ্রীম কোর্টেব চীফ জাস্টিস। বাডিতে তিনি শুধু বায দেন। বউদিই শুধু তাঁব মনেব কথা মাঝে মাঝে জানাতে পাবেন এবং ব্রডকাস্ট কবেন।

'তোব কি ধাবণা শুধু নিজেবা দেখেশুনে বিযে কবলেই মানুষ সুখে শান্তিতে থাকে, অন্যবকম হলে থাকে না ? এবাডিতে আমাদেব অলোকেশই না হয এক কাণ্ড কবেছে। কিন্তু আমবা কযেক জা—আমাদেব তো সেই পুবনো ধাবাতে এক জীবন চলে এল। আমবা কি খুব অশান্তিতে আছি ?'

'আমবা মানে তুমি আব বডদা ?'

'আচ্ছা তাই না হয ধব।'

ওবে বাব্বা মাঝে মাঝে খবচপত্তব নিযে তোমাদেব দু'জনেব যা ঝগডা লাগে তাতে তো আমাব একেক সময ভয হয, এই বুঝি তোমাদেব চিবতবে বিবাহ বিচ্ছেদ হযে গেল।'

টেবিলেব ওপাশে অলোক আব মন্দিবা দু'জনেই হেসে উঠল।

অণিমাও হাসলেন, 'তা হলেই বুঝি তুমি বাঁচো। এই বুঝি তোমাব মতলব। আমাকে তাডিযে টুকটুকে একটি নতুন বড বউদি নিযে আসবে ?'

'না বউদি। সে লোভ আমাদেব নেই। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খুঁজলেও এমন আব একজন বড বউদি

আমরা পাব না, তা কি জানিনে ?'

'থাক,থাক, আর অত তোষামোদে দরকার নেই আমার। বিবাহবিচ্ছেদ হবে না। সে পথ বন্ধ। যত ঝগড়াঝাটি লাঠালাঠি ফাটাফাটিই করি, আমরা এক ঘরেই থাকব। বড়জোর দু'দিন কথা বন্ধ করে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারি। কিন্তু আজকাল তোমাদের মধ্যে যা হচ্ছে — । আজকাল কি হচ্ছে না হচ্ছে তুমি নিজে ভালো করেই জানো। সেইজন্যেই তো ভয়। সেইজন্যেই তো আমাদের এত অমত। সেইজন্যেই পইপই করে তোমাকে বারণ করি। যার একবার অমন হলো তার যে বার বার—'

'থাক বউদি, ওসব আলোচনা এখন থাক। দোহাই তোমার, রেখে দাও ওসব। তোমাদের যা বলবার তা তো এতদিন ধরেই বলছ। রোজই শুনছি। নতুন কী আর শুনব ?

বেশ শুনো না।

অণিমা মুখ ঘুরিয়ে চলে গেলেন।

বীথিকা উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু অলক এসে এঁটো হাতে ওর সামনের চেয়ারে বসল।

'যাসনে খুকু আমারও একটা কথা আছে।'

মন্দিরাও উঠে পড়েছিল। যাওয়ার সময় বাঁ হাতে বীথিকার কাঁধ একটু নেড়ে দিয়ে বলল, 'তোমরা ভাইবোনে কথা বল। আমি যাচ্ছি ঠাকুরঝি।

বীথিকা ছদ্ম কোপে ধমক দিয়ে উঠল 'ফের ঠাকুরঝি ' তোমাকে বলিনি, ওসব ডাক একালে অচল হয়ে গেছে ? তুমি বুঝি পুরনো বাংলা উপন্যাস পড়ে পড়ে ওইসব অচল শব্দের স্টক বাড়াচ্ছ ?

মন্দিরা হেসে বলল, 'বড় মিষ্টি লাগে যাই বল।'

ও চলে গেলে বীথিকা বলল 'তোমার আবার কী কথা ছোড়দা ? হাতের এঁটো শুকিয়ে আঠা হয়ে গেল। চল উঠি এবার। হাতটাত ধুয়ে তোমার কথা শুনব।'

না বোস একটু। আমি লক্ষ করছি তুই ক'দিন ধরে এসব কথা এড়িয়ে যাচ্ছিস। কিন্তু আমারও তো যাওয়ার সময় হয়ে এল। দু'দিন বাদে আমাকে বোম্বে গিয়ে জয়েন করতে হবে। যদিও প্লেনেই যাব, কিন্তু বাঁধাছাঁদা তো কিছু হয়নি। সবই বাকি। এরপর আমার আর সময় হয়ে উঠবে না। এখনি কথাটা সেরে নিই। এবার একটা ডিসিসনে আসা দরকার।'

বীথিকা একটু হাসল, তোমার ডিসিসন তো তুমি দু' বছর না আড়াই বছর আগে নিয়েছ। আমার ডিসিসনও আমি প্রায় ওই সময়েই নিয়ে রেখেছি।'

'না খুকু সে ডিসিসন ফাইনাল হতে পারে না।'

'তবে কি সেমি ফাইনাল ?

'হেস না হাসবার কথা নয়। তোমার ডিসিসন বদলাতে হতে পারে খুকু।'

'গায়ের জোরে ? তুমিও কি মেজদা হলে নাকি ছোড়দা ?'

খোঁচা খেয়ে অলোক একটু চুপ করল। এ বিষয়ে সে অব্যাপারী নয়। প্রেমকে মেজদার মত সে ঠাট্টা করে না। তার মধুর কোমল অপরূপ অভিজ্ঞতা আছে। সে প্রেমের বেদনাও জানে, আনন্দও জানে। মিলনের পথে শত বাধাবিঘ্নের সঙ্গেও তার পরিচয় আছে। অনেক যত্নে, অনেক আয়াসে একটি একটি করে সেইসব বাধাকে দূর করতে হয়েছে। কিন্তু সব দুঃখ তো আজও বিদূরিত নয়। সেই গুজরাটী পরিবারের সঙ্গে পূর্ণ আত্মীয়তা আজও সম্ভব হয়নি। একটি রমণীয় উদ্যান থেকে এক অতি মনোরম ফুলকে সে শুধু তুলে এনেছে। তাঁরা বলেবেন, ছিঁড়ে এনেছ। মন্দিরা অবশ্য সবই মানিয়ে নিয়েছে। শুধু দু' একটি আচার-বিচার আর খাবার টেবিলের দু' একটি আইটেম ছাড়া সে প্রায় সবই গ্রহণ করেছে। তবু তার আর একদিক এখনো একেবারে বন্ধ। চিঠি নেই পত্র নেই, কোন যোগাযোগ নেই। মাঝে মাঝে বিমনা হয়ে জানালায় গিয়ে দাঁড়ায় মন্দিরা। কি দেখে কে জানে। নালার জল দেখতে দেখতে সে সবরমতীর কূল দেখে কিনা কে জানে। অলোকের মনে হয়, নদীর মত নারীরও দুটি কূল। সেই দুই কূলের ভিতর দিয়েই সে স্বাভাবিক স্রোতে বয়ে চলে। একটি কূল ভেঙে হয়ত দেওয়া যায়, বন্ধ করা যায়, কিন্তু বড় কষ্ট। তাদের খুকু কি সেই কষ্ট কল্পনা করতে

পাবে ? সেই কষ্ট সহ্য কবতে পাবে ? পাবলেও কি পাবতে দেওযা যায় তাকে ?

'তোমাব কথা শেষ তো ছোড়দা ? উঠি এবাব।'

'শেষ কি বে। আবম্ভই তো হল না।'

'তাহলে বলে ফেল যা বলবাব। বড ক্লান্তি লাগছে। আমি এবাব শুযে পডব।'

'তোমাব ডিসিসন বদলাতে হবে, খুকু।'

'ওবে বাব্বা। এ যে একেবাবে আদেশ! কেন প্রভু।'

'ঠাট্টা নয খুকু, শোন। আচ্ছা, রুচি বলেও তো একটা বস্তু আছে।'

'আছে বইকি। তুমি রূপেব কথা বলছ তো ? একজনেব রুচিব সঙ্গে দশজনেব রুচি যখন মেলে তখন সোনায সোহাগা। যখন মেলে না তখন শুধু সোনা।'

'অত সিওব হযো না খুকু। গিল্টি না হোক, ফোবটিন ক্যাবেটও হতে পাবে।'

'হোক না! তাই তো এখন বাজাবে চালু।'

তাবপব, এ? কাছাকাছি, প্রায আত্মীযেব মধ্যে—। যাই বলিস—আমি তো এব মধ্যে বোমাণ্টিক কিছু দেখিনে।

'তা আব কী কবা যাবে বল। সবাই তো আব তোমাব মত অত বোম্বে আমেদাবাদ ছুটতে পাবে না। চান্স পায না, হযত দবকাবও বোধ কবে না। কেউ কেউ হযতো নিজেব ঘবেব কোণেই আমেদাবাদকে পেযে যায, ছোড়দা।'

'পেতে পাবে। কিন্তু তাব রুচিব প্রশংসা কবতে পাবিনে। তাব কল্পনাশক্তি বলে কিছু নেই।'

'আবাব রুচি! আবাব কল্পনা! কল্পনা কি শুধু দূবেব জনকে কাছে আনে, কাছেব জনকেও দূবে নিযে দেখতে জানে না ?'

'ওসব কাব্য বাখ খুকু। শুধু কাব্য নিযে জীবন চলে না। কাব্যেব নিযম আলাদা, জীবনেব নিযম আলাদা। কাব্যেব আগুনে কাবো একগাছা চুলও পোড়ে না, কিন্তু একটা জ্বলন্ত দেশলাইব কাঠিতে একটা গোটা বাড়ি, এমনকি একটা গোটা শহব পুড়ে মবতে পাবে।'

'দাঁড়াও ছোড়দা। আমি দমকলেব ওপব কিছু ভবসা বাখি। কাব্যেব মূল্য যে এত কম তা তোমাব কাছে এই প্রথম শুনলাম।'

'মূল্য কম তো বলিনি, আমি বলেছি, নিযম আলাদা। উপভোগেব ধবন আলাদা।'

একটু চুপ কবে থেকে অলোক ফেব বলল, 'সে তো শুনেছি একেবাবেই একা। তাব আব কেউ নেই।'

'ঠিকই শুনেছ! কিন্তু আব একজন যখন যাবে তখন তাবা দু'জন হবে। তোমবা গেলে জনসংখ্যা আবো বাড়তে পাবে। সাধাবণ আত্মীযকে তোমবা ইচ্ছে কবলেই পবমাত্মীয় কবতে পাব।'

'সে আশা তুমি মোটেই কবো না খুকু। আমাদেব বাদ দিযেই তোমাব চলতে হবে।'

'তা জানি। যেমন আমেদাবাদকে বাদ দিযে আব একজনেব চলছে। চলছে কি আব ? চালিযে নিতে হচ্ছে। উপায কি, বল। মাঝে মাঝে জীবন দু'পাযে চলে না, এক পাযে খুঁড়িযে খুঁড়িযে চলে।'

'আবাব কাব্য ? উপমা আব রূপক ছেড়ে দিযে কথা বল খুকু। জীবন বড স্থূল, বড নিষ্ঠুব। জীবন ওসব রূপকেব ধাব ধাবে না।'

'শুধু বুঝি রূপেব ধাব ধাবে ?'

'আব একটা ব্যাপাব আছে। সেখানেও রুচিব প্রশ্ন। দেখ, ডিভোর্স এদেশে এখন চলছে, চলবেও। কিন্তু মেযেই হোক, ছেলেই হোক, ডিভোর্সীব সম্মান যেমন অন্য দেশে কম, এদেশেও তেমনি বাতাবাতি বাড়বে বলে মনে হয না।'

'যেখানে প্রাণ নিযে টানাটানি সেখানে সম্মানেব কথা পবে। সেইটাই জৈব নিযম।'

'কিন্তু খুকু, তোব ভয করে না ? যাব একজনেব সঙ্গে বনিবনাও হল না, তার যে আব একজনেব সঙ্গে—'

'হবেই যে একথা যেমন বলা যায় না, হবেই না একথাও তেমনি জোব কবে বলা ঠিক নয।

আমবা চাই বা না চাই, অনেক আনসার্টেনটি জীবনে মেনে নিতে হয। তাদেব মধ্যে মিলন-শতদল বোধহয সবচেযে অনিশ্চিত ছোডদা। কিন্তু তুমি শুধু তাব দোষগুলিব কথাই তুললে। একটি গুণও কি তাব দেখলে না?'

'দেখব না কেন? সে একজন আর্কিযোর্লজিস্ট। ইণ্ডিযা গভর্ণমেণ্টে চাকবি কবে। বযেস হিসেবে চাকবি ভালো। মাইনে ভালো। খোঁডাখুডিব কাজে তাব যা উৎসাহ তাতে মৌর্য আমলেবই হোক কি গুপ্ত আমলেবই হোক, নিদেনপক্ষে এখনকাব কংগ্রেসী আমলেব একটা গড টড আবিষ্কাব কবে যদি বসে তো অবাক হব না।'

'আব কিছু নেই?'

'আব তো গুণেব মধ্যে দেখি মন টানা গুণ। সে তোকে এমনভাবে টেনেছে—'

এতক্ষণে বীথিকাব মুখে হাসি ফুটল। হেসে চিবন্তন সেই মেযেলী ইণ্টাবজেকসনটি ব্যবহাব কবে বলল 'আহা।'

ঘব থেকে বেবিযে দু'জনে বেসিনেব কাছে এল।

অলোক কল খুলে নিজেই হাত ধুতে যাচ্ছিল।

বীথিকা খপ কবে তাব হাতখানা ধবে ফেলে বলল এসো আমি ধুইযে দিচ্ছি। জলে ভিজিযে বাখো একটু। এত শুকনো এঁটো কি সহজে ছাডে? আহা, অত টানাটানি কবছ কেন। সবাইব সামনে মন্দিবা এসে তোমাব হাতে ধুযে দিতে পাববে না। এই বাঁদীকেই দিতে হবে।'

বোনেব উল্লাস আব উচ্ছলতা দেখে অলোক আপত্তি কবল না।

বীথিকা দাদাব হাত ধুযে দিতে দিতে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। আব ক'দিনই বা সে দাদাকে এমন ববে আ . ক. পাববে। দু'একদিনেব বেশি নয। হযতো এই তাব শেষ হাত ধবা শেষ হাত ধোযানো।

ঘাম

অধীব হযে হাতঘডিব দিকে তাকাল বিজন। পাঁচটা পঁযত্রিশ।—এই আসছি বলে, আধ ঘণ্টাবও বেশি হযে গেল সুনন্দা ওপাশেব অমূল্যবাবুদেব ফ্ল্যাটে গেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওব দেখা নেই। এব পবে কি আব কাবো বাডিতে চা খেতে যাওযা যায? তা ছাডা যেতেও তো সময লাগবে। এই দীনেন্দ্র স্ট্রীট থেকে টালিগঞ্জেব চারু এভিনিয়্ কি সোজা বাস্তা? তাবপব মাথা খুঁডলেও এখন এই ববিবাবেব বিকালে একখানা ট্যাকসি মিলবে না। বাসেব ভিড ঠেলে উঠে দুহাতে মাথাব ওপবেব বড ধবে একে বেঁকে সার্কাসেব নানা বকম কসবৎ কবতে কবতে তবে গিযে পৌছুতে হবে।

কিন্তু যত কষ্টই হোক না গেলে চলবে না। এত কবে বলে দিযেছে যখন অনিমেষ—বিশেষ কবে ওব স্ত্রী শুভ্রা যখন অনুবোধ কবেছে বিজনবা যদি না যায - বই খাবাপ দেখাবে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলায চাযেব নিমন্ত্রণে বাত দুপুবে গিযে হাজিব হলেই কি খুব ভালো দেখায? সুনন্দাব যদি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকে।

বিজন আবো পাঁচ মিনিট দেখল। পাঁচ মিনিট পাঁচটি ঘণ্টাব মত মনে হতে লাগল। আব একটি সেকেণ্ডেব কাঁটা ঘুবে আস্তেতে না আসতে বিজন চেঁচিযে উঠল, ও বাঙাব মা।

বুড়ি ঝি উপুড় হয়ে বসে ভিজে ন্যাতা দিয়ে ঘরের মেঝে পুঁছে নিচ্ছিল, চোখ তুলে তাকাল—কী বলছ দাদাবাবু ?

বিজন ধমকের সুরে বলল,—তোমাকে এই অবেলায় ঘর পুঁছতে কে বলেছে ?

—বউদি বলে গেছে দাদাবাবু। রোজই এই সময় ঘর পুঁছি।

বিজন বলল,—না পুছতে হবে না। যাও এই তিন নম্বর ফ্ল্যাট থেকে তোমার বউদিকে ডেকে নিয়ে এসো তো। যাও এখুনি ডেকে নিয়ে এসো।

ন্যাতা আব জলেব বালতি রেখে রাঙার মা দোর খুলে বেরোল। নির্বিকার ভাবে পান চিবুচ্ছে তো চিবুচ্ছেই। বয়স ষাটের কাছাকাছি রাঙার মার। বছর তিনেক ধরে বিজনদের কাছেই আছে। বকুনি দুজনের কাছেই খায়। কিন্তু তেমন কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ধৈর্য আছে। বোধহয় অভিজ্ঞতাও আছে। রাঙাব মা বোধ হয় ভাবে সংসারে যারা বকবাব বকবে আর যাবা কাজ কববার তারা কাজ করে যাবে। বাগেব সময় এই কুরূপা বৃদ্ধা ন্যুব্জা নাবীদেহের ভগ্নাবশেষ বিজনের মনে অস্বস্তির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। সুনন্দাও ওর সঙ্গে কম বকাবকি কবেনা। ওর অপরিচ্ছন্নতা নিযে অবাধ্যতা নিয়ে মাঝে মাঝে চেঁচামেচি করে হুলস্থূল বাধিয়ে দেয। কাজ ছেড়ে চলে যেতেও বলে। কিন্তু রাঙার মা কাজও ছাড়ে না চলেও যায় না। জানে যে তাকে ছাড়া বিজনদের চলবে না। রাগ পড়ে গেলে দুজনেই ওরা রাঙার মাকে সাধাসাধি শুরু করবে।

একটু বাদে সুনন্দা ঘবের মধ্যে এসে দাঁড়াল। একা নয়, কোলে একটি বাচ্চা। বছর ছয়েকের একটি ছেলে। যেমন কালো তেমনি রোগা। পাশেব ফ্ল্যাটের অমূল্য নিয়োগীর কনিষ্ঠ সন্তান।

—অত চেঁচামেচি শুরু করেছ যে ! বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছে ?

সুনন্দা পাশেব ঘর থেকে খোলা দরজা দিয়ে স্বামীর সামনে এসে দাঁড়াল।

বিজন লক্ষ্য কবল স্ত্রীব মুখে ডাকাত পডবার মত কোন উদ্বেগ কি আশঙ্কা নেই। ওর মুখে হাসি। হাসলে সবাইকেই ভালো দেখায়। সুনন্দার দাঁতেব গডন সুন্দর বলে আরো যেন বেশি সুন্দব দেখায ওকে। বয়স বছব চল্লিশেক হতে চলল সুনন্দাব। কিন্তু দেখে মনে হয যেন তিরিশও পার হয়নি। দীর্ঘ দোহাবা চেহারা। মাথায় প্রায় বিজনের সমান সমান। বিজন সাড়ে পাঁচ। সুনন্দা পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। পাশাপাশি হাঁটলে সুনন্দাকে এক ইঞ্চি ছোট দেখায় না বরং বড়ই দেখায়। কিন্তু দৈর্ঘ সত্ত্বেও ওব দেহেব গডন ভালো বলে স্ত্রীকে বিজনেব বেমানান লাগে না। গায়েব রঙে নাক চোখের গড়নে সুনন্দা বেশ সুশ্রী। প্রথম প্রথম বন্ধুবা বিজনকে বলত তুমি তো রীতিমত সুন্দরীভার্য।

তাদের গলায় ঈর্ষার আমেজ থাকত।

বন্ধুদের চোখ থেকে সেই মোহ আব লুব্ধতা এখনো একেবারে মিলিয়ে যায়নি।

কিন্তু সুনন্দা যাকে কোলে নিয়ে এই মুহূর্তে গণেশ জননী সেজেছে তাকে কিন্তু ওর কোলে একেবারেই মানায়নি। বাচ্চাটি বেশ কদাকার। অমূল্যবাবুর সবগুলি ছেলেমেয়েই তাই। কিন্তু সবচেয়ে শেষেরটি কুরূপতায় যেন সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু এইটিব ওপরই সুনন্দার যেন সবচেয়ে বেশি পক্ষপাত। আসলে একটি মাংসপিণ্ডকে বুকে চেপে ধরে সুনন্দা আদর করতে চায়। তার আকার প্রকার যেমনই হোক না তাতে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই।

বিজনের মনে হল সুনন্দার এখনকার হাসি দেখলে তাব কোন বন্ধু অপলক হয়ে থাকত না। কারণ এই মুহূর্তে বিজনের স্ত্রীর হাসি কোন স্ত্রীর হাসি নয়, মায়েব হাসি। বাৎসল্যরসে বিগলিত।

সুনন্দা বলল,—হল কী তোমার ? একেবারে শিবনেত্র হয়ে বইলে যে।

বিজন বলল,—শিব্‌ হয়ে গণেশজননীকে দেখছি।

সুনন্দা লজ্জিত হয়ে বলল,—আহা ! তাবপব সেই মানবকটির মুখের কাছে মুখ নিয়ে সুনন্দা বলতে লাগল,—শুনছ বিণ্টু লোকে কী বলে শুনছ ? তুমি নাকি গণেশ ? কেন তুমি গণেশ হবে শুনি ? তোমার কি হাতির মত মাথা ? তোমার কি শুঁড় আছে ? দেখ কি রকম হাসছে দেখ। থাক থাক আর হাসতে হবে না তোমাকে। একেবারে দেখন হাসি হয়ে উঠেছ না ?

বিজন দেখল সুনন্দার সুডৌল সুগৌর মুখখানা ওই কদাকার মাংস্‌ পিণ্ডটির ওপর নেমে এল।

নাক ঘষতে লাগল কপালে। ঠোঁটে ঠোঁট ঘষল। মনে হল দাঁত ঘষাব শব্দও যেন শুনতে পেল বিজন। তীব্র যৌন আবেগে ক্রোধে আব গভীব বাৎসল্যে প্রায় একই বকম দাঁত ঘষাব শব্দ শোনা যায় সুনন্দাব. বিজন লক্ষ্য কবেছে।

আবো একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য কবছিল। মাত্র গুটি কত দাঁতে পান চিবুতে চিবুতে উপভোগ কবছিল এই অপৰূপ বাৎসল্যেব দৃশ্য।

বাঙাব মা সুনন্দাব আবো কাছে এসে গা ঘেষে দাঁড়াল। হেসে বলল,—এত সখ তোমাব ছেলেব। আহা একটি বাচ্চা যদি তোমাব কোলে আসত কী ভালোই হত বউদি। তোমাকে অত কবে বললাম চল যাই আমাব সঙ্গে কাঁকুড়গাছিব বুড়ো শিবেব ওখানে। বাবাব কাছে যে যা মানৎ কবে তাই ফলে। একটি ফল দিয়ে এসে মনেব মত ফল পাবে বউদি।

সুনন্দা লজ্জিত হয়ে বলল,–থাক থাক হয়েছে। তোমাব আব ফল ফল কবতে হবে না।

বাঙাব মা বলল, তাতো হবে না বুঝলুম। কিন্তু এ তোমাব হল কী বউদি। ঘামে যে একেবাবে নেয়ে উঠেছ। এই কার্তিক মাসেব দিনে এত ঘাম

স্ত্রীব ঘর্মাক্ত শবীব বিজনও লক্ষ্য কবল। লক্ষ্য কবে একটু গম্ভীব হয়ে গেল।

সুনন্দা লজ্জিতভাবে হাসল। স্বামীব দিক থেকে মুখ ফিবিয়ে নিয়ে ঝিকে বলল,—আচ্ছা এক আপদ হয়েছে। বাচ্চা টাচ্চা কাউকে কোলে নিলেই আমাব এমনি কবে ছোটে।

নিজেব দেহেব দিকে তাকাল একবাব সুনন্দা কোলেব বাচ্চাটিব দিকে তাকাল তাবপব ফেব একটু অপ্রতিভ ভঙ্গিতে হেসে বলল,– এ এক বোগ যাই ওকে ওব মাব কাছে বেখে আসি।

কিন্তু এই অস্বাভাবিক ঘামকে যে সত্যিই আপদ কি বোগ ব্যাধি বলে মনে কবে সুনন্দা তা ওব কথাব ভঙ্গিতে [illegible] না। দুর্ভোগ নয় যন্ত্রণা নয় এই বোগেব উপভোগ্যতাই ওব চোখেব ভঙ্গিতে, মুখেব হাসিতে শবীবেব প্রতিটি বোমকূপে অতি মাত্রায় পবিস্ফুট হয়ে উঠেছে

সুনন্দা স্বামীব দিকে চেয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল,– তুমি আব একটু বোসো লক্ষ্মীটি। আমি ওকে বেখে এক্ষুনি আসছি।

বিজন হঠাৎ তিক্ত তীব্র কঠিন স্ববে বলে উঠল, আব আসতে হবে না

সুনন্দা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। ভ্রূ কুঁচকে বলল, -তাব মানে?

বিজন বলল,—মানে আবাব কি। অমূল্যবাবুদেব ঘবে যাও। গিয়ে ফেব বিন্টু পিন্টু মিন্টু বিন্টুদেব আদব সোহাগ কবতে বসে যাও ছটা বাজে। কাবো বাড়িতে চায়েব নিমন্ত্রণ বাখতে যাওযাব সময আব নেই। এখনো কাপড় বদলাবাব সময পেলে না তুমি আদব সোহাগ নিয়েই আছ। এব পব কখন বা তৈবি হবে। কখন বা যাবে। যেতেও তো ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে।

সুনন্দা বলল, সে আমি বুঝব। তৈবি হতে আমাব পাঁচ মিনিটেব বেশি লাগবে না। আমি কি তোমাব মত? এক দাড়ি কামাতেই দেড় ঘণ্টা?

বিন্টুকে বেখে আসতে গেল সুনন্দা। গিয়ে আব দেবি কবল না দুতিন মিনিটেব মধ্যেই ফিবে এল।

বাইবে বেবোবাব জন্যে তৈবি হয়ে বিজন এতক্ষণ খাড়া চেযাবটায বসে কথা বলছিল. কিন্তু স্ত্রী ঘব থেকে বেবোবাব সঙ্গে সঙ্গে সে গবদেব পাঞ্জাবিটা খুলে চেযাবেব পিঠে বেখে দিল, তাবপব নেমে এসে নিচু ইজি চেযাবটায গা এলিয়ে দিয়ে চুরুট ধবাল।

সুনন্দা এসে বলল,—একি তুমি জামাটামা সব ছেড়ে ফেললে যে।

বিজন বলল, কী হবে আব গিয়ে? বাত দুপুবে চায়েব নিমন্ত্রণে গিয়ে লাভ কী।

সুনন্দা বলল,- সবে তো সন্ধ্যা এখনই তোমাব বাত দুপুব হয়ে গেল? তোমাব বাগেব কাবণ আমি জানি।

— জানো। কী বলতো দেখি।

বলে আব লাভ কী।

সুনন্দা পাশেব ঘবে শাড়ি বদলাতে যাচ্ছিল. বিজন বাধা দিয়ে বলল,—সুনন্দা শুনে যাও। আমাব কথাব জবাব দিয়ে যাও।

সুনন্দা বলল,—আসছি ! আমি তো পালিয়ে কোথাও যাচ্ছিনে । আচ্ছা, মাঝে মাঝে তোমাব কী হয বলতো দেখি । কাবো ছেলে মেয়েকে কোলে কবতে দেখলে তুমি যেন একেবাবে উন্মাদ হয়ে যাও । তোমাব দুটো চোখ হিংসেয যেন জ্বল জ্বল কবতে থাকে । আমাদেব ঘবে কেউ আসেনি । তাই বলে পৃথিবীতে আব কাবো ছেলে মেয়ে কি থাকবে না ? কি তাদেব কাউকে আমি একটু আদব যত্ন কবতে পাবব না ? এ কি হিংসুটে স্বভাব তোমাব ।

ভিজে ন্যাতা বুলিয়ে বুলিয়ে বাঙাব মা তখনও মেঝে পবিষ্কাব কবছিল—হঠাৎ সে মুখ তুলে বলে উঠল,—ঠিক বলেছ বউদি, ভগবান মন বুঝেই ধন দেনতো ।

বিজন সোজা হয়ে উঠে বসল তাবপব তাবস্ববে চীৎকাব কবে উঠল,—চুপ ! তোমাব আব ঘব পুঁছতে হবে না । যাও এঘব থেকে । বেবিয়ে যাও ।

জলেব বালতি হাতে বাঙাব মা দাঁড়াল । বিড বিড কবে বলতে লাগল— এ কী কাণ্ড বে বাবা । এমন তো কোথাও দেখিনি । কথায কথায মাবতে ওঠে এ কোন ধাবাব ভদ্দব লোক ।

বাঙাব মা সামনে থেকে সবে গেলে সুনন্দা তাব জাযগায এসে দাঁড়াল । এক মুহূর্ত চুপ কবে স্বামীব দিকে তাকিয়ে থেকে বলল —তোমাব কী হয়েছে বলত ।

বিজন বলল,—আমাব কিছুই হযনি । হঠাৎ তোমাব মনেই একটু বেশি মাত্রায বাৎসল্যেব উদয হয়েছে ।

সুনন্দা সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিল না । একটু বাদে আস্তে আস্তে বলল, যদি হয়ে থাকে সেটা কি খুব দোষেব ? আমাদেব যা বয়েস -

বিজন বলল,— থাক থাক আব বয়েস বয়েস কবো না । বয়েসেব কথা কি তোমাব সব সময মনে থাকে ? বিশেষ কবে বেশবাশ সাজ সজ্জাব সময ।

—তাব মানে ?

নিজেব কথাব টীকা টিপ্পনীব ঝুঁকি নিল না বিজন । ববং আগেব প্রসঙ্গে ফিবে যাওয়া নিবাপদ মনে কবে বলল,- আমাদেব যা বয়েস তাতে বাৎসল্য আসাটা দোষেব নয কিন্তু তাবও তো একটা স্থান কাল আছে । অমল্যবাবুব ছেলেমেয়েবা তো আব কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না ঘবে এসে তাদেব আদব সোহাগ কবতেও পাবতে

এবাব সুনন্দা ধৈয হাবিয়ে চেঁচিয়ে উঠল,— কেবল অমল্যবাবুব ছেলে অব অমল্যবাবুব ছেলে । ওবা হয়েছে তোমাব দুচোখেব বিষ । তোমাব ভয়ে কোন একটা বাচ্চা ছেলেমেয়ে এঘবে ঢুকতে পাবে না । তুমি যতক্ষণ বাড়িতে থাকো আমি কাউকে ডাকিও না আনিও না । কিন্তু পা সুদ্ধ লোক তোমাকে চেনে । তোমাব এই কুচুটে স্বভাব নিয়ে বলাবলি কবে । আমি লজ্জায মবে যাই । আমাদেব হযনি হযনি । তাই বলে বিশ্বসুদ্ধ লোক তোমাব মত নিঃসন্তান হবে তুমি কি তাই চাও ”

বিজন এবাব চেযাব ছেড়ে তীববেগে উঠে দাঁড়াল । ঘবেব দুদিকেব দবজা বন্ধ কবে দিয়ে এসে স্ত্রীব মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল,—না তা চাইনে । আমি নিঃসন্তান হলেও তুমি যদি কোন প্রকাবে সন্তানবতী হতে পাব হও না । আমাব তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই । এ কথা তো আমি অনেকদিন বলেছি ।

সুনন্দা একটুকাল স্তব্ধ হয়ে বইল । তাবপব অস্ফুটস্ববে বলল, —এসব কী বলছ তুমি ? হিংসেয হিংসেয তোমাব সত্যিই কি মাথা খাবাপ হয়েছে ? মাঝে মাঝে তোমাব মাথাব মধ্যে কতকগুলি পোকা ঢুকে কিলবিল শুরু কবে দেয তাই না ? সত্যি কবে বল তাই দেয কিনা ?

হিংস্র জিঘাংসায বিজনেব মুখ বিকৃত দেখাল । সে বলে উঠল, —তা যদি বল, সে পোকা তোমাব মাথাব মধ্যেও ঢোকে । মুহূর্মুহু কামড়ায আব বলে তুমি যেমন কবে পাব মা হও, যাব সাহায্যে পাব—

সুনন্দা প্রচণ্ড ক্রোধে মুখ ফিবিয়ে নিয়ে বলল,— যাও আমাব সামনে থেকে সবে যাও । তোমাব মুখ দেখতেও আমাব ঘৃণা হয । তুমি এত ছোট, এত মীন মাইণ্ডেব, এত পাবভাবসন তোমাব মধ্যে । কোন সুস্থ মেয়েব পক্ষে একঘবে তোমাব সঙ্গে বাস কবা অসম্ভব ।

বিজন বলল,— তুমি তো তাই চাও । এক ঘবে আব বাস কবতে চাওনা । বেশতো, ঘব বদলে,

মানুষ বদলে এক্সপেবিমেন্ট কবে দেখতে পাব এখনো। সে বয়েস তোমাব আছে। এখনো অন্তত একটি ডিকেড হাতে আছে তোমাব।

সুনন্দা বলল,—এক্সপেবিমেন্ট যদি কবতে হয তোমাব পবামর্শ নিযে কবব না। আমি আমাব সুবিধেমত পথ বেছে নিতে পাবব। তোমাকে সে জন্যে ভাবতে হবে না।

বিজন বলল —তা জানি। তোমাকে পবামর্শ দেওযাব লোকেব এখন আব অভাব নেই। কিন্তু একটা কথা তোমাকে বলে বাখি শোন, কথায কথায যে তুমি নিঃসন্তান তুমি নিঃসন্তান বলে খোঁচা দাও, তুমি কি জানোনা ডাক্তাব আমাব মধ্যে কোন দোষ খুঁজে পাযনি?

সুনন্দা ফেব একটুকাল চুপ কবে বইল। তাবপব আস্তে আস্তে বলল,—ডাক্তাব কি আমাব মধ্যেই কোন দোয পেযেছেন? ডাক্তাব যা যা কবতে বলেছেন সবইতো আমাকে দিযে কবিযেছ? দু দু বাব অপাবেশন হয়ে গেছে, আব কী কবতে বলো আমাকে?

সুনন্দাব দুটি চোখ এবাব জলে ভবে উঠল। মুখ ফিবিয়ে পাশেব ঘবে ঢুকে এবাব দোবে খিল দিল সুনন্দা।

আব স্ত্রীব চোখে জল দেখে বিজনেব সম্বিৎ ফিবে এল ছি ছি ছি, কথাটা ওকে বলা ঠিক হযনি। যদি নিজেব দোষেই বন্ধ্যা হয়ে থাকে সুনন্দা সে জন্যেও কোন দুর্ভাগিনী নাবীব মুখেব ওপব বলা পবম নিমমতা। এবাব গ্লানি আব অনুশোচনায মন ভবে উঠল বিজনেব। জামাটা ফেব গাযে দিল স্ত্রীকে নিয়ে এবাব নিমন্ত্রণ বাখতে বেবোবে। ট্যাক্সি পেলে ট্যাক্সিই নেবে। পাওযাটা হযত একেবাবে কঠিন হবে না শ্যামবাজাবেব মোড থেকে একটা ট্যাক্সি মিলে যেতেও পাবে।

বিজন এগিয়ে গিয়ে বন্ধদ্বাবে— ঠিক কবাঘাত নয সস্নেহে টোকা দিতে লাগল। —নন্দা, তৈবি হয়ে নাও চল একবাব অনিমেষদেব ওখান থেকে ঘুবে আসি

প্রথমে খানিকক্ষণ কোন সাডাই মিলল না। তাবপব সুনন্দাব বিবক্তিভবা গলা শোনা গেল, তুমি যাও আমি যাব না।

বিজন মধুব স্ববে বলল, - সেকি হয নন্দা? অনিমেষ কী মনে কববে বলতো? ওবা যে দুজনকেই বলেছে। আব বিনা উপলক্ষে তো বলেনি। তুমি তো জানো ওদেব আজ ম্যাবেজ অ্যানিভাবসাবি। ওবা সে কথা না বললেও তাবিখটা তো আমাদেব মনে আছে ওবা বেজিস্ট্রেশনেব তাবিখটাই ধবে তিনজন সাক্ষীব মধ্যে দুজন তো আমবাই ছিলাম মনে নেই তোমাব?

কিন্তু সুনন্দা এসব অবাস্তব কোন কথা কানেই তুলল না। একই কথা সে বাববাব বলতে লাগল তোমাব যেতে ইচ্ছে হয যাও আমি যাব না কাবো কোন শুভ কাজে যাওযাব অধিকাব আমাব নেই। কাউকে মুখ দেখাবাব মত মুখ আমাব নেই তুমি যাও।

আবো মিনিট পনেব স্ত্রীকে সাধাসাধি কবে বিজন ক্ষান্ত হল। এই এক দোষ সুনন্দাব। একবাব যা 'না' কববে মাথা খুঁডে মবলেও বিজন তাকে 'হ্যাঁ' কবাতে পাববে না। বড জেদ সুনন্দাব। আব ক্রমে বেডেই চলেছে। কেউ কেউ ভয দেখিযে বলে আবো বাডবে। বযসেব সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ্যা নাবীব আবো কত বিকৃতি আসবে তাব ঠিক কি। এই যে ঘবে দোব দিয়েছে সুনন্দা ঝাডা দু ঘণ্টাব মধ্যে সে দোবও আব খুলবে না। পৃথিবীতে যদি ইতিমধ্যে প্রলযকাণ্ডও ঘটে যায তবু দবজাব খিল এঁটে ও দাঁডিযে দাঁডিয়ে মববে। সুতবাং বিজন এবাব দু' ঘণ্টাব মত নিশ্চিন্ত হয়ে বেবিয়ে পডতে পাবে। চলে যেতে পাবে যে দিকে দুচোখ যায়, যে পথে মন তাকে টেনে নিযে যায সে পথে পা বাডাতে বিজনেব এখন আব কোন বাধা নেই। তাবপব দু ঘণ্টা আডাই ঘণ্টা বাদে, তাব ভাগ্য যদি ভালো হয বিজন এসে দেখবে সুনন্দাব ঘবেব দবজা আপনিই খুলে গেছে। তবে গৃহিণী ফেব ঘব সংসাবেব কাজে হাত লাগিযেছে। আব নসিব মন্দ হলে সাবাবাত এমনকি পবদিন সকালেও এব জেব চলবে।

বাঙাব মাকে ডেকে সদব বন্ধ কবতে বলে বিজন বাস্তায নেমে পডল।

অনিমেষ চৌধুবীদেব ওখানে যাবে কি? কিন্তু একা একা যেতে এখন আব ইচ্ছা কবছে না। ঝগডাঝাটিব ছাপ মনেব ওপব তো বযেছে, মুখেও কি খানিকটা খানিকটা লেগে নেই বিজনেব? এই মন নিযে এই মুখ নিয়ে লোকসমাজে তাবও যাওযা এখন অনুচিত। বিশেষ কবে কোন উৎসব অনুষ্ঠানেব বাডিতে।

—এই যে স্যার, কোথায় যাচ্ছেন এদিকে ?

ছেলেটি পথের মধ্যে একেবারে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। বিজন একেবারে আত্মমগ্ন ছিল। বহির্জগৎ যেন থেকেও নেই। বিজন একটু চমকিত, একটুবা অপ্রস্তুত। এত ভক্তি আজকাল দেখা যায় না। ছেলেটি বোধহয় সদ্য গ্রাম থেকে এসেছে। কি কোন মফস্বল শহর থেকে।

—স্যাব আমাকে চিনতে পারছেন তো ?

বিজন বলল,—বাঃ চিনতে পারব না কেন ? তুমি তো আমাদের কলেজেরই— । মুখ তো খুবই চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ স্যার। আমার নাম প্রদীপ। প্রদীপ মজুমদার। আমাকে হিস্ট্রি অনার্স ক্লাসে দেখেছেন। আমরা এ পাড়াতেই উঠে এসেছি। আমাকে আরো কটি ছেলে বলছিল প্রফেসর দাশগুপ্ত এই পাড়ায় থাকেন। আচ্ছা স্যাব আপনি কি এই হলদে বঙের ফ্ল্যাট বাড়িটায়—

—হ্যাঁ। তিনতলায়। চার নম্বর ফ্ল্যাট। যেযো একদিন।

প্রদীপ খুশি হয়ে বলল,—নিশ্চয়ই যাব স্যাব। কোন অসুবিধে হবে নাতো বাড়িতে গেলে ?

বিজন ছাত্রের পিঠে হাত রেখেহেসে বলল,—বাঃ, অসুবিধে কিসের। যেয়ো, অবশ্যই যেয়ো।

প্রদীপ হেসে বলল,—আপনাকেও একদিন আমাদের বাড়িতে যেতে হবে স্যার। বাবা খুব খুশি হবেন, আমরা কাছেই—ওই মোহনলাল মিত্র স্ট্রীটে— ।

— বেশতো বেশতো। বিজন ফের ওর পিঠে হাত বুলালো আর পিঠে হাত রেখেই দু' পা এক পা করে উত্তব মুখে এগোতে লাগল।

একটুবাদে বিদায় নিল ছেলেটি। বেশ লাগল ওকে। ওকে আর ওর পৃষ্ঠপোষক শুভানুধ্যায়ী আর ছাত্রবৎসল হিসাবে নিজেকে। সুনন্দা মাঝে মাঝে রাগ কবে যাই বলুক বিজন সন্তানহীন বলে হীনমনা নয়, ক্ষুদ্রচেতা নয়, ছাত্রদের মধ্যে সে পুত্রকে দেখতে জানে। আগে আগে প্রথম বযসে ছাত্রদের মনে হত ছোটভাইযের মত, এখন আস্তে আস্তে তাবা ছেলেব স্থান নিচ্ছে। মুখে অবশ্য বাবা বাছা বলে ডাকে না বিজন, ডাকতে পারে না। মুখে কেমন বাধো বাধো লাগে। কিন্তু যে স্নেহটুকু অনুভব করে তা নিখাদ বাৎসল্য। বাৎসল্য ছাড়া কিছু নয়। ক্লাসেও সে জনপ্রিয়। কলেজে ছাত্রদের কোন অনুষ্ঠান হলে প্রিন্সিপ্যাল বিজনের ওপর তার ভার দেন। ছোটোখাটো ছাত্র বিক্ষোভ মিটাবাব দায়ও বিজন দাশুগুপ্তের। ক্লাসে রোলকল করার সময় মাঝে মাঝে এক নিমেষের জন্য থেমে সে ক্লাস ভরতি ছাত্রদের দিকে তাকায়। অধ্যাপনা তার অতীতকাল নিয়ে। কিন্তু যাবা অধ্যযন করে তারা তো উত্তর কালের। এক পলকের জন্যে যেন সেই ভাবীকালের দিকে বিজন অপলক হয়ে থাকে। কাল সমুদ্রে তবঙ্গের পরে তরঙ্গ। সব সময় এদেব সে বুঝতে পাবে না। কখনো কখনো মনে হয এবা যেন বেশি উদ্ধত অহঙ্কৃত আর সেই সঙ্গে অবোধ। কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হয় যৌবনেব এই হযত ধর্ম। প্রৌঢ়ের প্ল্যাটফর্ম থেকে যৌবনকে হয়ত এইরকমই দেখায়। তাদের প্রতিটি কথার মধ্যে অহংকারের ঝংকার লাগে। এই উত্তরকালের পক্ষ নিয়ে সমবয়সী কি নিজেব চেয়েও বেশি বয়সী সহকর্মীদের সঙ্গে তর্ক করে বিজন। তাঁরা হয়ত ভাবেন যেহেতু বয়সে প্রৌঢ় বলেও তাকে প্রৌঢ় বলে মনে হয় না তাই সে যুবকদের পক্ষ নিয়ে যৌবরাজ্যে স্থায়ী আসন নিতে চায়। যেহেতু সে জৈবিক দিক থেকে আর একটি জেনাবেশনের সৃষ্টি করেনি তাই সে যেন এক জেনারেশন পিছনে সরে যেতে চায় না। আসলে তা নয়। পুরাকালের সঙ্গে এ কালকে আর উত্তরকালকে সে মিলিযে দেখতে চায়। এই তিনকালের রাজনীতি, রীতিনীতি, সভ্যতা সংস্কৃতি একই সম্পর্কমূলে যুক্ত, এই তার বলবার কথা।

সহকর্মী বন্ধু অনিমেষ চৌধুরীর সঙ্গেও কি এই নিয়ে কম তর্ক হয় নাকি তার। অনিমেষ বিজনের চেয়ে অন্তত পাঁচ বছরের ছোট। আধুনিক জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক। কিন্তু ভাবনায় ধারণায় ওকে অনেকখানি অনাধুনিক বলে মনে হয় বিজনের। আর বিজ্ঞান ? বিজ্ঞান শুধু ওর ক্লাসরুমে আর লেবরেটরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞান ওর দৃষ্টিতে নেই, যুক্তিতে নেই, দৈনন্দিন আচার আচরণে জীবনযাত্রায় নেই। তবু অনিমেষ আর অঞ্জলি দুজনই বিজনদের বন্ধু। আর বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে দুটি ছেলেমেয়ের বাপ মা হয়ে ওরা বিজনদের ওপর কিঞ্চিৎ সহানুভূতিশীল। সহানুভূতি কি

অনুকম্পা অবশ্য বিজন চায় না। কিন্তু বন্ধুত্ব চায়। আর এটুকু জানে এই প্রাগাঢ় প্রৌঢ় বয়সেও সেই বন্ধুত্ব ছোটখাটো মতবিরোধ রুচিবিরোধ এমনকি আদর্শের বিরোধও ছাপিয়ে চলে যায়। বন্ধুত্ব নিজেই এক শিল্প—এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। যদিও তার মত উত্তর-চল্লিশ অধিকাংশ পুরুষের কাছেই আপদ বিশেষ, অনাসৃষ্টির মত।

অনিমেষের ওখানে যেতে পারলে বড় ভালো হত। বিজনদের না দেখে ওরা ক্ষুণ্ণ হয়ে দুঃখ পাবে। ওরা তো জানে না অকারণে দাম্পত্যকলহ তাদের যাওয়াটাকে এমন করে ঠেকিয়ে রাখল। কিন্তু কয়েকবার মহড়া দিয়েও নিজেকে দক্ষিণগামী কোন একটা জনবহুল বাসে ঠেলে তুলতে পারল না বিজন। বড্ড ভিড়। আর একা একা যাওয়ার পক্ষে বড় দীর্ঘ পথ। পনের বছর ধরে একাকিত্ব আর এককত্ব গেছে বিজনের। এখন যেন ভাবাই যায় না জীবনের সাতাশ আঠাশ বছর বয়স পর্যন্ত সে একক ছিল। মনে হয় যেন জন্মাবধি দাম্পত্য জীবন চলেছে। স্ত্রী এক অভ্যাস। সন্তান দ্বিতীয় অভ্যাস। অভ্যাস ছাড়া আর কি।

কিন্তু না গেলেও একটা ফোন করে দেওয়া দরকার। অন্তত সেইটুকু সৌজন্য অনিমেষ দাবি করতে পারে। ফোন অনিমেষের আছে বিজনের নেই। কিন্তু সারা পাড়াতেও কোথাও একটি টেলিফোন খুঁজে পাবে না এমন কৈফিয়ৎ বিজন বন্ধুকে কী করে দেবে।

শেষ পর্যন্ত বসাক ফার্মেসিরই শরণ নিল বিজন। ডাক্তার এখনো আসেননি। কাউন্টারের পিছনে উঁচু টুলের ওপর রোগাটে কম্পাউণ্ডার বসে আছেন।

বিজনকে দেখে ভদ্রলোক হাসি দিয়ে আপ্যায়ন করলেন,—এই যে স্যার আসুন স্যার। বাড়ির সব ভালো তো?

বয়স বেশি নয় রাখালবাবুর। কিন্তু এরই মধ্যে সামনের কটি দাঁত গেছে। হয়তো সেই জন্যেই হাসিটি দেঁতো হাসি নয়।

—হ্যাঁ ভালো। একটা ফোন করব।

রাখালবাবু বললেন,—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

ফোনে সরাসরি অনিমেষকেই পাওয়া গেল।

—হ্যালো। অনিমেষ, যেতে পারছিনে ভাই।

অন্যপারে এক নিমেষের নিস্তব্ধতা, নৈরাশ্য।

—কেন কী হল তোমার?

—কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই। ধরো না ছোটখাটো গোছের একটা অঘটন।

—যাক। তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে তেমন কিছু নয়। হয়ত বৌদির পান থেকে চুন খসেছে।

—যা বলেছ। বয়েস হোক তোমাদেরও মাঝে মাঝে খসবে।

—আজকের দিনে ও অভিশাপ আর দিয়ো না বিজন, এমনিতে ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাত নিয়ে আছি।

বিজন হেসে বলল,—তাই নাকি? দাম্পত্যজীবনের রীতিই তাই। প্রভাতে মেঘডম্বুর।

—শুধু প্রভাতে কেন ভাই। প্রভাতে মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে নিশীথে কখনইবা না? আচ্ছা, –শিগগিরই কিন্তু এসো আর একদিন। আজ ফাঁকি দিলে, আর একদিন কিন্তু আসা চাই, নইলে দারুণ ঝগড়া হয়ে যাবে। তোমার বন্ধুপত্নী এখন হেঁসেলে আছেন। আসতে পারছেন না। ছেড়ে দিচ্ছি: আরে, ধরো ধরো। আমার ছোট ছেলে তোমার সঙ্গে কথা বলবে।

—তোমার ছেলে?

—তাইতো শুনি। ছেলের মাতো সেই কথাই বলে।

তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে কথা বল।

বিজন বলল,—কাকা না জ্যাঠা?

—আরে দূর। জ্যাঠা আজকাল ছেলেরা হয়। ছেলের বাপ জ্যাঠারা ওসব শুনলে কানে আঙুল দেয়। জ্যাঠার চেয়ে কাকাই ভালো। 'আঙ্কেল টম।'

খানিকক্ষণ বন্ধুর শিশুপুত্রের কলকাকলি শুনল বিজন। বন্ধুর প্রম্পটিংও অবশ্য ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছিল।

—কাকাবাবু এসো। কাকিমাকে নিয়ে আসবে।

—নিশ্চয়ই যাব। প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজন ফোন ছেড়ে দিল। মনে মনে ভাবল, অনিমেষ আত্মজের মধ্যে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেছে। দেখা হলেই ছেলের কথা বলে।

কম্পাউণ্ডারকে ফোনের চার্জটা দিয়ে আর একটু কুশল প্রশ্ন,—বাড়ির সব ভালোতো রাখালবাবু ?

রাখালবাবুর মুখে ফের সেই বৈদান্তিক হাসি,—ভালো আর কই স্যার। ভালো থাকবার কি জো আছে ? একপাল কাচ্চা-বাচ্চা। বাড়ি থেকে অসুখ বিসুখ আর যেতে চায় না। আপনার ওসব ঝামেলা নেই স্যার। বেশ আছেন আপনি।

নিঃশব্দে বিনা মন্তব্যে বিদায় নিল বিজন। তা ঠিক, কোন ঝামেলা নেই বিজনের। ছেলে-মেয়ের সুখও নেই, ছেলে-মেয়ের অসুখও নেই।

হাঁটতে হাঁটতে পার্কের একটি বেঞ্চে এসে বসল বিজন। না, আসনের কোন ভাগীদার নেই আপাতত এইটুকুই সুখ। ধোঁয়ায় আর কুয়াশায় এত বড় পার্কটা যেন এক বিষণ্ণতার চাদর মুড়ি দিয়ে রয়েছে। নাকি নিজের মনের কালিই বিজন সারা পার্কে ছিটিয়ে দিয়ে বসে আছে। কারণে অকারণে বিজনের মন যেন কেন হঠাৎ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। ছোট-খাটো ত্রুটির জন্য গ্লানির পাহাড় বুকের ওপর থেকে কিছুতেই যেন আর নামতে চায় না। সুনন্দাকে ওকথাটা না বলাই ভালো ছিল। স্ত্রী ছাড়া বিজনের আর কে আছে ? স্বামী ছাড়া সুনন্দারও কেউ নেই। বোধহয় কেউ আর আসবেও না। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তারা দুজনে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। এ সর্তের কোন নড়চড় হবে না। কিন্তু এক এক মুহূর্তে মনে হয় গিঁট ছেড়ার জন্যে দুজনেরই পণ যেন প্রাণ পর্যন্ত।

যুগ পালটেছে। বংশরক্ষার জন্য আগেকার মত মানুষ আর পাগল হয় না। রক্ষা না হলে মঠে মন্দিরে গিয়ে মাথা কোটাকুটি করে না। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ধারা বদল হয়েছে। শিক্ষিত মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্য নেয়। যদি না পায় মেনে নেয়। বিজনও মেনে নিয়েছে। মেয়ে বলে সুনন্দার পক্ষে অত সহজে এই সন্তানহীনতাকে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়, বিজন তা জানে। গোড়ার দিকে এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে হাসি পরিহাস ও করেছে বিজন। কৃত্রিম উপায়ে প্রজননের কথা তুলেছে। এ দেশে যদি সে ব্যবস্থা থাকত পরীক্ষা করে দেখা যেত। বলা যায় না এই অপত্যহীনতা কার দোষে। সুনন্দা যদি রাজী থাকে সেই প্রাচীন নিয়োগ প্রথাও প্রয়োগ করে দেখা যায়। বিজনের তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই।

সুনন্দা বলেছে,—তোমার আপত্তি না থাকাটাই সব কিনা ? আমার বুঝি আর রুচি প্রবৃত্তি বলে কিছু নেই ? দরকার হয় ওসব পরীক্ষা নিরীক্ষা তুমি বাইরে থেকে চালিয়ে এসো। আমার ওসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

তারপর স্বামীকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রেখে সুনন্দা বলেছে,—আমরা দুজন মিলে যা চাই দুজন মিলেই তা গড়তে চাই। একজনের হলে তাতে কি দুজনের মন ভরবে ? তুমি বরং আর একজনকে বিয়ে কর। আমি কিছু মনে করব না। যদি ছেলেপুলে হয়—

বিজন হেসে বলেছে,—তিনজনে তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করব, কী বল ?

তারপর সকৌতুকে পোষ্যপুত্র নেওয়ার প্রস্তাব, অনাথ আশ্রম থেকে কোন পরিত্যক্ত মানব শিশুকে কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দান, কৌতুক রসের ভিয়েনে সম্ভব অসম্ভব নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করেছে দুজনে। একজন আর একজনের কাছে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে ব্যাপারটা মোটেই গুরুতর কিছু নয়। এ নিয়ে কারোরই কোন মাথাব্যথা নেই।

কিন্তু ব্যথাটাতো মাথায় নয়, ব্যথাটা বুকে। তা মাঝে মাঝে নানা ভাবেই জানান দিয়ে যায়।

বি এ পাশ স্ত্রীকে বিজন বসিয়ে রাখেনি। নিজে গরজ করে সরকারী অফিসে কাজ জুটিয়ে দিয়েছে। কিছু একটা নিয়ে থাকুক। অফিসে সুনন্দার সুখ্যাতি হয়েছে। সহকর্মীদের মধ্যে সুহৃদও নিতান্ত কম হয়নি। বিজন সব খবর রাখে। মাঝে মাঝে ঈর্ষার খোঁচা যে না খায় তা নয়, কিছু না

কিছু প্রতিক্রিয়া তাব চালচলনে আভাসে ভাষণে ধবা না পড়ে তা নয। তবু স্ত্রীকে সে মোটামুটি স্বাধীনতাই দিয়েছে। বন্ধুবান্ধব অনেকেব তুলনায বিজন সহনশীল উদাবস্বভাব। এটুকু বললে অহংকাব কবা হয না সত্যিকথাই বলা হয।

ঘবেও আমোদ-প্রমোদেব সাধ্যমত ব্যবস্থা কবে দিয়েছে বিজন। বেডিও আছে। গ্রামোফোন আছে, বাংলা গল্প উপন্যাসেব লাইব্রেবী আছে। স্যাকবাব দোকানে যাতাযাতও সুনন্দাব নিতান্ত কম নেই। তবু ভবিল না চিত্ত। তবু অমূল্যবাবুব ফ্ল্যাটেব দিকেই টান যেন বেশি সুনন্দাব। সময পেলেই সেখানে তাব ছুটে যাওযা চাই। যতক্ষণ পাবে একটি না একটি মানব শিশুব উত্তাপ তাব ভোগ কবা চাই। এ সুখ সুনন্দাব একাব। এব অংশ বিজনেব পাবাব জো নেই। সেই জন্যেই কি তাব মনে এত ঈর্ষা। এত দ্বেষ বিদ্বেষ। নিজেকে ক্ষমা কবে না বিজন, বেহাই দেয না। মনকে খুঁটে খুঁটে চিবে চিবে দেখে। শেষ পর্যন্ত নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত কবে শাস্তি দেয।

উচিত হযনি বিজনেব। শত হলেও সুনন্দা যে মেযে। মাতৃত্বেব সংস্কাব যে ওব বক্তেব মধ্যে সে কথা ভুলে যাওযা উচিত হযনি।

খানিকবাদে পার্ক থেকে উঠে ঘবে ফিবে গেল বিজন। দেখে খুশি হল আজ দু' ঘণ্টাব আগেই বান্নাঘবেব দোব খুলেছে সুনন্দা। বান্নাবান্নায হাত দিয়েছে।

মান ভাঙাবাব আগেই সুনন্দা আজ কথা বলল। যদিও দুটি চোখ ফোলা ফোলা। গলাব স্বব ভাবি।

—গেলে না অনিমেষবাবুদেব ওখানে?

—না। একা একা যাই কী কবে? একটা ফোন কবে দিয়ে এলাম।

—বেশ কবেছ।

ছোট টেবিলেব দুধাবে বসে নৈশভোজন প্রায নিঃশব্দে সাবল দুজনে।

তাবপব শোযাব ঘবে এসে দুজনে দুখানা বই হাতে নিযে বসল। পডাটা অছিলা। মুখ বন্ধ কবে বাখাব উপায।

আবো কিছুক্ষণ গেল। সুনন্দাব চোখ যখন ঢুলুঢুলু হযে এল, বইযেব ওপব বাব কযেক ঢুলেও পড়ল বিজন আব তখন দেবি কবল না, উঠে গিযে শবীবেব সমস্ত শক্তি দিয়ে স্ত্রীকে আডকোলে তুলে নিযে বিছানায শুইযে দিল। প্রথম যৌবনেব সেই গাঢ অনুবাগ আবাব যেন ফিবে এসেছে।

সুনন্দা আপত্তি কবতে লাগল,—না না না। ছেডে দাও আমাকে ছেডে দাও।

কিন্তু বিজন স্ত্রীব এই অনুনয কানে তুলল না।

শেষ পর্যন্ত আগেও যেমন হযেছে আজও তেমনি হল। স্বামীব বুকে মুখ গুঁজে অবুঝ বালিকাব মতই খানিকক্ষণ ফুঁপিযে ফুঁপিযে কাঁদল সুনন্দা।

বিজন বাধা দিল না, কিন্তু সান্ত্বনা দিল। নিজেব ত্রুটি স্বীকাব কবে স্ত্রীব কাছে ক্ষমা চাইল। তাব গালে মুখে হাত বুলাতে বুলাতে বলল,—যে দুঃখ আমাদেব আছে আমবা তা একসঙ্গে সইব। কেউ আমবা কাউকে ব্যথা দেব না, আঘাত দেব না।

সুনন্দা বলল,— আমি আব যাব না অমূল্যবাবুদেব ওখানে। তুমি যখন কষ্ট পাও—

বিজন বলল,—কষ্ট? ছি ছি ছি। তুমি নিশ্চযই যাবে। যত খুশি ওদেব তুমি ডাকবে, আদব কববে, কোলে নেবে। আমাব ঘব ওদেব জন্যে খোলা বইল।

ঘুম এল অনেক বাত্রে। সেই ঘুম যে আবো কত বাত্রে ভাঙল তা অবশ্য টেব পেল না বিজন। শুধু অনুভব কবল স্ত্রীব নিবিড আলিঙ্গনে সে আবদ্ধ হযে আছে। কিন্তু সুনন্দাব সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে উঠেছে। এত ঘাম কেন সুনন্দাব? আজতো এমন কিছু গবম নেই। তাছাডা মাথাব ওপব কম পযেণ্টে পাখাও চলছে। বিজনেব ববং একটু একটু শীত শীতই লাগছে। কিন্তু সুনন্দা এত ঘামছে কেন?

বিজনেব হঠাৎ আজকেব বিকালেব কথা মনে পড়ল। তখনো সুনন্দা ঘামছিল। অস্বাভাবিকভাবে ঘামছিল। সে ঘাম সুনন্দাব গাযে বিজন আবও কযেকবাব দেখেছে। বুক থেকে স্তন্য তো বেবোতে পাবে না তাব বদলে অতি বাৎসল্যে সর্বাঙ্গ থেকে ঘামেব ধাবা ছোটে। ঘুমেব মধ্যে

কী স্বপ্ন দেখছে সুনন্দা ? সে কি এখনো একটি শিশুকেই আঁকড়ে রয়েছে ! হঠাৎ কিসের যেন একটা যন্ত্রণা বোধ করল বিজন। এক অদ্ভুত অস্বস্তিতে তার মন ভরে উঠল। এর পর থেকে রোজই কি এমনি হবে ? যেহেতু স্ত্রীর কোলে সে একটি শিশু এনে দিতে পারেনি, স্ত্রীর কোলে অন্যের শিশু দেখলে শিশুর মত ঈর্ষায় জর্জর হয়েছে তাই কোন দিনই কি সে আর স্ত্রীর কাছে পুরুষের সম্মান, পুরুষের মর্যাদা পাবে না ! বিজন কল্পনা করতে লাগল সুনন্দার আলিঙ্গনের মধ্যে সে যেন আকারে অবয়বে আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাচ্ছে। আর কোন দায় নেই, দায়িত্ব নেই, আশঙ্কা নেই, লজ্জা নেই, অনুতাপ নেই, গ্লানি নেই। রাত্রির অন্ধকারে গোপন সুড়ঙ্গ পথে বিজন আবার যেন সেই মধুর শৈশবে ফিরে গেছে। মধুর মূঢ়তার মুখে তার একটিমাত্র বুলি।

বিজন সুনন্দার কানের কাছে মুখ এগিয়ে নিল। তারপর অর্ধ কৌতুকে অর্ধ বিদ্রূপে, অর্ধ যন্ত্রণায়, অর্ধ বেদনায় একটি অস্পষ্ট অস্ফুট ধ্বনিকে ঈষৎ স্ফুটতর করে তুলল,—মা, মা, মা।

ঘুমের মধ্যে মৃদু হেসে সুনন্দা গাঢ় আলিঙ্গনে তাকে আরো বুকের কাছে টেনে নিল। নিজের কাণ্ড দেখে বিজন নিজেই এবার ঘামতে শুরু করেছে।

একটি নাগরিক প্রেমের উপাখ্যান

বিকেল পাঁচটার পরে ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। ছুটোছুটি বৃথা। সুরজিৎ দু'একখানা খালি ট্যাক্সি দেখে কয়েকবার এগিয়ে গেল। কিন্তু গিয়ে পৌঁছবার আগেই দেখল, তাতে অন্য লোক উঠে বসেছে।

বিপাশা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। সুরজিতের এই ছুটোছুটি সে আজ আট বছর দেখছে। মোটেই স্মার্ট নয় সুরজিৎ। কর্মপটু নয়। শুধু পড়াশুনোয় ভাল। আগে ভাল পড়ুয়া ছিল, এখন ভাল পড়ায়।

একটু বাদে বিপাশা বলল, 'ট্যাক্সি ধরা যাবে না। চল এই পথটুকু হেঁটেই যাই। এখান থেকে গঙ্গার ঘাট কতটুকুই বা দূর !'

দূর নয়, বরং কাছেই। এসপ্ল্যানেড থেকে গঙ্গার ধার পর্যন্ত সুরজিৎ অনেকদিন বিপাশাকে নিয়ে হেঁটে গেছে। কথা বলতে বলতে হেঁটেছে, নিঃশব্দে হেঁটেছে। যানবাহনের স্রোত মাঝে মাঝে তাদের গতি রুদ্ধ করেছে। দু'জনে থেমে দাঁড়িয়েছে। কখনো বা একজন আর একজনকে থামিয়েছে। বেশির ভাগ দিন বিপাশাই তার হাত ধরে আটকে রেখেছে। —'এই আর একটু হলেই চাপা পড়ছিলে।'

সুরজিৎ হেসে বলেছে, 'পড়তামই বা। হাসপাতাল পর্যন্ত তুমি সঙ্গে সঙ্গে যেতে। সমস্ত লজ্জা ভয় ত্যাগ করে পাশে বসে থাকতে। চোখ মেলেই তোমার ব্যাকুল চোখ দুটি দেখতে পেতাম।'

বিপাশা বলেছে, 'থাক আর কবিত্বে কাজ নেই। বয়ে গেছে তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাসপাতালে যেতে। রাত আটটার মধ্যে আমাকে বাড়ি ফিরতে হয় না ? বাবা মা দাদাদের ধমকের ভয় নেই বুঝি ?'

'সেই ভয়ে তুমি আমাকে একা একা হাসপাতালে যেতে দিতে ?' সুরজিৎ হেসেছে।

'দিতামই তো।' বিপাশা শক্ত করে সুরজিতের হাতখানা নিজের মুঠিতে চেপে ধরেছে। কেউ

দেখে ফেলবে সে ভয় করেনি। এই জনারণ্যে কে কাকে চেনে? জনতাই যেন নির্জনতা।
ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। কিন্তু হেঁটে যেতেও রাজী হল না সুবজিৎ। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটি ফিটনের সামনে দাঁড়াল। বিপাশার দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল আজ ঘোড়ার গাড়িতে করেই যাই। ঘোড়ায় চড়বার তো আর জো নেই। ঘোড়ার গাড়িতেই চড়া যাক। Last ride together নয়, Last drive together'
বিপাশা কোন কথা বলল না। সুবজিৎ ভেবেছিল, অন্তত একটু প্রতিবাদ করবে বিপাশা। মন থেকে না হোক, মুখের আশ্বাসেও বলবে, শেষ কেন হবে? আমরা শেষ হতে দেব না।
কিন্তু বিপাশা চুপ করে রইল।
সুবজিৎ অগত্যা কোচম্যানের সঙ্গে দর কষাকষি শুরু করল, 'কত নেবে, প্রিন্সেপস ঘাট?'
'দু' টাকা বাবুজী।'
'দু টাকা! বল কি? তুমি কি ডাকাতি করতে চাও না কি?'
কোচম্যান হাসল, 'ডাকাতি কী বলছেন বাবুজী! ঘোড়াকে খাওয়াব কি? ছোলা কিনি ব্ল্যাকে।'
বিপাশা অধীর হয়ে বলল, 'চল হেঁটেই যাই, গাড়িতে দরকার নেই।'
তবু অদ্ভুত স্বভাব সুবজিতের। হাঁটবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দর কষাকষি করবে। সর্বস্ব যেতে বসেছে! তবু আট আনা কি চার আনা বাঁচাবার জন্যে তার প্রাণপণ চেষ্টা। যেন কারো কাছে ঠকবে না সুবজিৎ, এই তার জেদ। অথচ ঠকছে, প্রতিনিয়তই হেরে যাচ্ছে তা সে জানে।
দেড় টাকা, পৌনে দু' টাকা--কিন্তু কোচম্যান এক পয়সাও ছাড়বে না। কেবল হাসে। যেন অসম্ভব প্রস্তাব করছে সুবজিৎ! সেই সঙ্গে অনুনয় বিনয়, আর মিষ্টি মিষ্টি কথা, 'পারব না বাবুজী, মরে যাব। আপনারা দু জনে হাওয়া খেতে যাবেন, চারগণ্ডা পয়সা বেশি দিলে আপনার লোকসান নেই। কিন্তু আমাকে কম দিলে আমি যাব! ঘোড়াকে কি খাওয়াব আর নিজেই বা খাব কী।'
শেষ পর্যন্ত সুবজিৎ কিন্তু দু' টাকাতেই রাজী হল। বিপাশাকে নিয়ে উঠল গাড়িতে। পাশাপাশি বসল। কোচম্যান ঢাকনিটা নামিয়ে দিল। ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা যেতে লাগল। শব্দ সুবজিতের মনকে এখনো যেন কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কখনো দূর অতীতে, কখনো সুদূর ভবিষ্যতে। কিন্তু একথাও জানে, পাশে যে বসে আছে সে ভাসবার মেয়ে নয়। সে শক্ত হাতে খুঁটি আঁকড়ে ধরতে চায়। মেয়ে মাত্রেই বস্তুবাদিনী। বিশেষ করে এ যুগের মেয়ে। এই যান্ত্রিক যুগ যেন শুধু বস্তুতন্ত্রকেই জানে। তার আর কোন তন্ত্রমন্ত্র নেই। কিন্তু সুবজিতের মাঝে মাঝে মনে হয়, সে অন্য যুগের মানুষ! ভুল করে এ যুগে এসে পড়েছে। এসে বলছে, 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে।' কিন্তু অন্য কোনখানে যাওয়ারও আর জো নেই। তার হাত পা বাঁধা এই যুগ তাকেও আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। স্বপ্ন দেখবার জো ছিল না সুবজিতের। অল্প-বয়স থেকেই কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে। বাবাকে দেখেছে শৈশবে। তাঁর কথা তার ভালো করে মনে পড়ে না। মাকে দেখেছে, দিদিদের দেখেছে। কেউ মাস্টারি নিয়েছে, কেউ নার্সিং, কেউ টেলিফোনের চাকরি। কোনরকমে টিকে থাকতে পারলেই যেন বর্তে যায়। সেই টিকে থাকার সংগ্রামে সুবজিতকেও ছেলেবেলা থেকেই অংশ নিতে হয়েছে। সরু গলির মধ্যে একতলার ভাড়াটে বাড়ি। আরো তিন ঘর ভাড়াটের সঙ্গে জল-কল উঠোন আর ছাদের ভাগ নিয়ে কাড়াকাড়ি ঝগড়াঝাটি। ঘরে ঘরে ঝগড়া, আবার নিজেদের ঘরের মধ্যেও ঝগড়া। মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া, বড়দি আর মেজদির মধ্যে ঝগড়া, মেজদি আর ছোড়দির মধ্যে কখনো ভাব কখনো আড়ি। শাড়ি সেমিজ নিয়ে কাড়াকাড়ি। পাড়ার দু-একটি ছেলেও কি মাঝে মাঝে মনোমালিন্যের কারণ হয়নি? আগে বুঝত না, পরে বড় হয়ে বুঝেছে সুবজিৎ। কিন্তু নিজেরা যতই মারামারি করুক, ছোট ভাইকে আদরেই রেখেছে দিদিরা। বিশেষ যত্নে সাবধানে একটি মাত্র আশার দীপকে যেন আঁচলের আড়ালে তারা ঢেকে নিয়ে চলেছে। সুবজিৎ যেন খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশে খারাপ হয়ে না যায় সেই ছিল তাদের ভয়। ফলে সুবজিৎ সামাজিক হয়নি, সাংসারিক ব্যাপারে দক্ষ হয়নি। প্রাণপণে শুধু ভালো ছেলে হয়েছে। আর কীই বা সে হতে পারত! বহুদিন পর্যন্ত বই আর ঘরের কোণ ছাড়া কোন সঙ্গী ছিল না সুবজিতের। মা বলতেন, 'এতগুলি মেয়েমানুষের তুমি একমাত্র আশা ভরসা বাবা। তুমি মানুষ হলে তবে আমাদের

সব দুঃখ ঘুচবে তা মনে রেখ।'

একবার একটা ফাউন্টেনপেনের জন্যে কী ধমকই না খেয়েছিল সুবজিৎ। মা বলেছিলেন, 'গরীবের ঘোড়া রোগ কেন বাবা। যে মেয়ে বেশি রোজগার করত তার তো বিয়ে হয়ে গেল। সে তো এখন আর এক পয়সাও দিতে পারবে না। দু'বেলা খাওয়া পরা কী করে চলবে তাই ভেবে ভেবে রাত্রে আমার ঘুম নেই। কেন, ফাউন্টেনপেন ছাড়া কি আর লেখা হয় না? আমরা পাখের কলমে লিখেছি, খাগের কলমে লিখেছি— ।'

মেজদি অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ টাকা দিয়ে একটি কলম সুবজিতকে কিনে দিয়েছিল। কিন্তু সে কলম সে অনেকদিন ব্যবহার করেনি। ভিতরে ভিতরে রাগ জেদ অভিমান তারও কি কম ছিল? সেই অল্পবয়স থেকেই সুবজিতের মনে এই ধরণা এসে গিয়েছিল তার বিলাস ব্যসন চলবে না। সে দরিদ্রের ছেলে। তার বাপ নেই, মা আর দিদিদের শ্রমে সে পালিত। আজ সুবজিৎ স্বাবলম্বী। কয়েকজনের অবলম্বনও। বড়দি বিধবা হয়েছে। তাকে আর তার দুটি ছেলেমেয়েকে কিছু কিছু করে পাঠাতে হয়। বাধ্য হয়ে মিতব্যয়ী সুবজিৎ। তবু মিতব্যয়িতাকে সে ধর্মের মত অনুশীলন করে। বন্ধুদের কেউ কেউ তাকে কৃপণ বলে ভাবে। কে জানে, বড়লোকের মেয়ে বিপাশারও সেই ধারণা থাকা অসম্ভব নয়।

অবিরাম গাড়ির স্রোত চলেছে , এত ভিড় আর এত বিচিত্র শব্দ এই শহরে। কোথাও যেন সঙ্গতি নেই। সবুজ ঘাসে ঢাকা ফোর্টের ঢিবিটাকে কি কিম্ভুতকিমাকারই না দেখায়।

এক সময় বিপাশা বলল, 'চুপ করে রয়েছ যে?

সুবজিৎ বলল 'কী বলব। কথা তো তোমারই বলবার কথা। তুমিই তো শেষ কথা বলবে বলে এসেছে।'

বিপাশা কোন জবাব দিল না। সেই শেষ কথা কি দু'জনেরই নয়? তবু সুবজিৎ তাকে দিয়েই কথাটা বলাতে চায়। বলা অবশ্য অনেক আগেই হয়ে গেছে। মুখের কথায় এখন আর তা স্পষ্ট করে না বললেও চলে। তবু কথা দিয়েই আজ শেষ টেনে দিতে হবে। কিন্তু তাদের সম্পর্কের শেষ যে এমন করে হবে তা কে ভেবেছিল। বিপাশা অন্তত ভাবেনি।

বি এ ক্লাস থেকে সুবজিৎ তার সহপাঠী বন্ধু। সেই বন্ধুত্ব ইউনিভার্সিটির দু বছরে আরো ঘনতর হয়েছে। ছেলে-বন্ধু অবশ্য বিপাশার আরো ছিল। তারা শুধু পরীক্ষায় পাস করা ভালো ছেলেই নয়। কবি গায়ক চিত্রশিল্পীও তাদের মধ্যে ছিল কেউ কেউ। সবাই সচ্ছল অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। তবু বিপাশা কবিতা গান আর চিত্র উপহারের বদলে তাদের শুধু মাঝে মাঝে সঙ্গ দিয়েছে, দূরে গেলে চিঠি দিয়েছে, ফোনে কথা বলেছে, হেসেছে, গল্প করেছে। কাউকে হাতে হাত মেলাতে দিয়েছে, কাউকে আরো কিছু বেশি। যারা আরো অগ্রসর হতে চেয়েছিল তারা নিরাশ হয়েছে। হেসে বলেছে, 'বন্ধু শুধু বন্ধুই থাক, অন্য কিছু হতে চেয় না দোহাই তোমাদের। আস্তে আস্তে সবাই সরে পড়েছে। শুধু সুবজিৎ রয়ে গেছে। সবাই ভেবেছিল শেষ পর্যন্ত ওরই জিত হবে। বিপাশা তাই ভেবেছিল। অথচ কী আছে সুবজিতের? একটি ফার্স্টক্লাস ডিগ্রী। শুধু তারই জোরে মানুষ বৈষয়িক সিদ্ধির এক স্তর থেকে আর এক স্তরে ওঠে না। তবু খানিকটা উঠেছে সুবজিৎ। চাকরি পেয়ে ক্রিস্টোফার রোডে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। চারতলার ওপরে ঘর। ভাড়া তাই কিছু কম। কিন্তু সুবজিৎ যে চারতলায় উঠতে পেরেছে তাতেই ওর আনন্দ। ওর ঘর থেকে যে আকাশ দেখা যায়, জানলা দিয়ে যে দূরের গাছপালা দেখা যায় তাতেই ও খুশি। সেই কানা গলির একতলার গহ্বর থেকে তো কিছুই দেখা যেত না। ফ্ল্যাটে দু'খানি মাত্র ঘর। সামনে এক চিলতে বারান্দা। রেলিং ধরে দাঁড়ান যায়। সুবজিৎ বলেছিল, 'তুমি এলে ফুলের টব রাখব এখানে।' এখন টবে তুলসী গাছ আছে। সুবজিতের মা আছেন। আরো দুই দিদি আছেন। তাঁদের বিয়ে হয়নি, হবেও না। রূপ নেই, যৌবন গেছে। ঘরদোর দেখাতে দেখাতে সুবজিৎ হেসে বলেছিল, 'আমাদের ভাগে আপাতত একখানা ঘরই পড়বে। তাতেই ধরে যাবে, কী বল? তাছাড়া ঘর কতক্ষণের জন্যেই বা। মানুষের কাজের জায়গা তো বাইরেই। কি বল, ধরবে না?

মনে যাই থাক, বিপাশা মুখে বলেছিল, 'নিশ্চয়ই ধরবে।'

মনে মনে ভাবছিল, সুবজিতেব মোটেই উচ্চ আশা নেই। শুধু চাবতলাব ফ্ল্যাটে উঠতে পেবেই ও খুশি। সাদার্ন এভিনিয়ুর নিজেদেব তিনতলা বাড়িতে বিপাশা ছেলেবেলা থেকে মানুষ হয়েছে। একটু বড হবাব পব পুবো দু'খানা ঘব ভাগে পড়েছে তাব। একখানা শোবাব, আব একখানা পড়বাব ও বন্ধুদেব নিয়ে বসে গল্প কববাব। কিন্তু বিপাশা বলেছে,—ওসব বাবাব, ওসব তাব নয়। বিপাশা ভেবেছে, তাব প্রেম আর্থিক বৈষম্যকে আমল দেবে না। কলেজে পড়বাব সময় যে বাজনৈতিক দলেব বিপাশা পবম সমর্থক ছিল, যে ছাত্রসঙ্ঘেব সুবজিৎ ছিল ঘনিষ্ঠ সহযোগী, সেখানে বৈষম্যকে তাবা প্রশ্রয় দেয়নি, বৈষম্য-বিনাশেব স্বপ্ন দেখেছে, সঙ্কল্প কবেছে, সংগ্রাম কবেছে। সুবজিৎ সেই একই পথেব একই আদর্শেব বন্ধু। বিপাশা দেখেছে, সুবজিৎ লিখতে জানে না, গাইতে জানে না, ছবি আঁকতে জানে না। কিন্তু স্বপ্ন দেখতে জানে। আদর্শেব স্বপ্ন সামাজিক বৈষম্য বিলোপেব স্বপ্ন, নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষেব উত্থানে সহায়তাব সঙ্কল্প। বিপাশা দেখেছে, সুবজিৎ শিল্পী নয়, কিন্তু বিদ্রোহী। সেই বিদ্রোহ দাউ দাউ কবে জ্বলে না, দীপশিখাব মত জ্বলে। দাবিদ্র্যেব সঙ্গে সংগ্রাম কবতে কবতে বড হয়েছে সুবজিৎ। দাবিদ্র্যেব অভিশাপেব কথা সে জানে। তাব অবসান সে চায়। বিপাশা দেখেছে, সুবজিৎ শিল্পী নয় কিন্তু সৎ। তাব সততাই এক শিল্প। তাব চবিত্রই শিল্পগুণে ভূষিত। সেই চবিত্র একই সঙ্গে অনমনীয় আব মধুব সুবজিৎ চঞ্চল নয়, প্রগলভ নয়, সংযত মিতভাষী দায়িত্ববান যুবক।

বাবা, মা দাদা, বউদি, অন্য সব আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবা সবাই যখন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা কবেছেন, তুই ওব মধ্যে কী পেলি?' বিপাশা ওব বিদ্যাবত্তা সততা আব চবিত্রমাধুর্যেব দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়েছে বলেছে, চেহাবাই কি সব? অর্থই কি সব? গাড়ি-বাড়িব সুখই কি একমাত্র সুখ?'

কেউ মত দেননি। কেউ বলেননি বিপাশা দত্তেব মত সুন্দবী আব ধনীব ঘবেব মেয়েব পক্ষে প্রায় নিঃস্ব অকিঞ্চন সুবজিৎ চক্রবর্তী সুযোগ্য পাত্র সবাইব ভিন্ন মতেব বিরুদ্ধে বিপাশা একা লড়েছে। কখনো তর্ক কবেছে কখনো মৌন অসহযোগিতায় দূবে সবে বয়েছে। সেই শীতল স্নায়ু-যুদ্ধেব যেন শেষ ছিল না। তাঁবা একেব পব এক সম্বন্ধ এনেছেন। কেউ ইঞ্জিনিয়াব, কেউ ডাক্তাব, কেউ ব্যাবিস্টাব কেউ উচ্চপদেব সবকাবী চাকুবে। কিন্তু বিশাপা সবাইকে ফিবিয়ে দিয়েছে, 'না না না।' সে কাউকে বিয়ে কববে না। যাকে কববে তাকে ঠিক কবেই বেখেছে। তা কি বাবা-মা জানেন না? তা কি দাদা বউদিব অজানা আছে?

সেই সংগ্রাম চলেছে দিনেব পব দিন মাসেব পব মাস, বছবেব পব বছব শ্রেণী সংগ্রামেব মত স্বজন সংগ্রামও ব্যক্তিগত জীবনে তীব্র আব মর্মঘাতী

শেষপর্যন্ত তাঁবা নিবস্ত হয়েছেন। সম্মতি দেননি তবে সামনে থেকে সবে দাঁড়িয়েছেন। '—কব তোব যা ইচ্ছে যাতে তুই সুখী হোস তাই কব।

কিন্তু সমস্ত বাধা অপসাবিত না হলেও যখন শিথিল হয়ে গেল, সবাই আশা কবতে লাগল বিপাশা আব সুবজিৎ এবাবে ম্যাবেজ বেজিস্টাবেব অফিসে শুভযাত্রা কববে।, বিপাশা দেখল, সব বাধা তখনো ঘোচেনি। বেশিব ভাগ বাধাই অন্তবেব বাধা। বিপাশা আজ অনুভব কবছে যে উদ্দাম নিয়ে সে বাবা মা দাদা বউদিদেব সঙ্গে যুদ্ধ কবেছে, যুদ্ধ শেষেব পব জয়েব ফল ভোগ কববাব দিকে তাব আব সেই উৎসাহ নেই। ক্লান্ত, বিপাশা ভাবি ক্লান্ত। বিবাহ তো একটা উৎসব। মিলন উৎসব। ক্লান্ত মন নিয়ে কি সেই উৎসব পালন কবা যায়? শবীব একটু খাবাপ থাকলে, কিংবা কোন অনির্দেশ্য কাবণে মন বিমর্ষ বিষণ্ণ হয়ে থাকলে বিপাশা পবম বন্ধুব নিমন্ত্রণও বাখে না। সে নিমন্ত্রণ বিয়েবই হোক জন্মদিনেবই হোক পিকনিকেবই হোক, আব টি পার্টিবই হোক। বিপাশা যায় না। বন্ধুবা জানে বিপাশা খুব মুডি। মন অনুকূল না থাকলে পবেব উৎসবে যায় না বিপাশা, আব নিজেব উৎসবে যাবে? এ উৎসব তো দু'দিন একদিনেব নয় জীবনব্যাপী যে মহোৎসব—তাবই সূচনা। সে উৎসব অবশ্য যে কোন মুহূর্তে বন্ধ কবে দেওয়া যায়। বিবাহ-বিধিতে বিচ্ছেদেব ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বিপাশা বাব বাব বলেছে, আমি তা চাইনে সুবজিৎ। আজ চুক্তি কবব, কাল চুক্তি ভাঙব, আমাব সে ইচ্ছে নয়। তাব চেয়ে যতদিন না আমি মন থেকে সম্পূর্ণ সাড়া পাই—'

গাড়ি এসে থামল। সুবজিৎ বলল, 'এখানেই বাখো। বাস্তাব ওপাবে আব যেতে হবে না।'

সুবজিৎ নেমে পড়ল। বিপাশাকেও নামতে হল। কিন্তু নামবাব যেন ইচ্ছা ছিল না। গাড়িটা না থামালেও পাবত সুবজিৎ। অনন্তকাল না হোক, আবো কিছুক্ষণ না হয এ গাড়িটা চলতে থাকত। আব এই চাবদিকে ঢাকা অন্ধকাবেব মধ্যে, যাকে ভালোবাসে তাব পাশে বসে ভাবতে ভাবতে চলত বিপাশা। শুধু হাতেব মধ্যে হাতখানি ধবে নিযেই খুশি হত। পাণিপীডনেব জন্যে পীড়াপীড়ি কবত না।

সুবজিৎ কোচম্যানকে ভাড়া চুকিযে দিল। দু'টাকা তো দিলই, তাবপব আবো চাব আনা বকশিশ দিল। কোচম্যান খুব খুশি হযে সেলাম জানাল।

'আমি কি থাকব, বাবুজী? ফিববাব সময গাড়ি লাগবে না আপনাদেব?'

বিপাশা বলল, 'না না, তুমি চলে যাও।' কোচম্যান একটু হেসে গাড়িটা সবিযে নিযে গেল।

বিপাশা বলল, আবো চাব আনা কেন তুমি ওকে দিলে। এমনিতেই তো বেশি নিচ্ছিল। তখন অত দব কষাকষি কবলে তুমি—

সুবজিৎ বলল, 'তাব প্রাযশ্চিত্ত হিসেবেই ওই চাব আনা দিলাম। তুমি খুব বিবক্ত হচ্ছ বুঝতে পাবছিলাম।'

বিপাশা একটু হাসল, 'ও সেই জন্যে! তুমি চাব আনা না দিলেও তোমাব জেনাবাসিটি আমি স্বীকাব কবতাম।'

সুবজিৎ বলল, 'কবতে নাকি? ষোল আনা দিযেছি। তবু তো স্বীকাব কবছ না।'

বিপাশা এ কথাব জবাব দেবাব সুযোগ পেল না। সুবজিৎ বাস্তা পাব হবাব জন্যে পা বাড়িযেছে।

সবগুলি বেঞ্চ ভবতি। জোড়ায জোড়ায সব বেড়াতে এসেছে হাসছে গল্প কবছে। একটি মাবোযাড়ী দম্পতিব সঙ্গে ছেলেমেযেও আছে।

গাছেব নীচে কোণেব বেঞ্চখানি এখনো খালি আছে। সুবজিৎ তাড়াতাড়ি গিযে বেঞ্চখানা দখল কবল। যেন ট্যাক্সিব মত হাতছাড়া হযে যাবে।

বিপাশা ওব পাশে এসে বসল। তাবপব একটু হেসে বলল 'অমন ছেলেমানুষেব মত ছুটোছুটি কবছিলে কেন? মাঝে মাঝে এমন হাসি পায তোমাব কাণ্ড দেখে।'

সুবজিৎ বলল, 'হাসি যদি পায তাহলে একটু হেসে নাও। সেই শুরু থেকেই তো গোমড়ামুখী হযে বযেছ।'

গোমড়ামুখী শব্দটা বিপাশাব কানে খুব খাবাপ লাগল। মাঝে মাঝে এমনি এক একটা গেঁযো শব্দ ব্যবহাব কবে সুবজিৎ, আব বিপাশাব সমস্ত মন-মেজাজ খাবাপ হযে যায। ও যে যজমানী বামুনেব ছেলে, সেই স্মৃতি, সে সাধাবণ সংস্কৃতি কিছুতেই যেন সুবজিৎ ভুলতে পাবে না, কি ভুলতে চায না। ওব আর্থিক দীনতা, রুচিব দীনতা বাব বাব ধবা পড়ে। নিজেকে মার্জিত কববাব ইচ্ছা ওব নেই। ববং ভিতবে ভিতবে ওব জেদ খুব প্রবল। দাবিদ্র্যেব অহঙ্কাব ষোল আনা। সেইজন্যেই দাবিদ্র্য ঘোচে না। আজকাল যত ওকে দেখে ততই অবস্থাব অমিল, প্রকৃতিব অমিল চোখে পড়ে বিপাশাব। ভাবনা হয, এই পর্বতপ্রমাণ অমিল কি শুধু বিযেব চুক্তিনামায সই কবলেই ঘুচে যাবে? সংশয ঘোচে না বিপাশাব। যে আদর্শেব মিল তাদেব মধ্যে ছিল সেই মিল এখন তিল-প্রমাণ। তাবা কেউ আব এখন সক্রিয সশস্ত্র যোদ্ধা নয। এখন যুদ্ধ নিজেদেব মধ্যে, যুদ্ধ শুধু নিজেব সঙ্গে নিজেব। আবো পাঁচজন নিবীহ মাস্টাবেব মত সুবজিৎও কলেজে মাস্টাবী কবে। নিজেব আদলে ভালো ছেলে তৈবি কববাব চেষ্টা কবে। সেই বিদ্রোহেব বীব আজ কোথায? কোথায সেই সৈনিক যোদ্ধা? যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখে বিপাশা একদিন মুগ্ধ হযেছিল কে জানত তা স্ফুলিঙ্গমাত্রই, তা কখনো আগ্নেযগিবি হযে উঠবে না, প্রলযকাণ্ড ঘটাবে না। ছাত্র বযসে সুবজিতের দাবিদ্র্যের মধ্যে যে তেজ দেখেছিল বিপাশা, এখন তা নির্বাপিত। এখন সুবজিৎও ক্যাবিযাবিস্ট। শুধু চাকবি বজায বেখে চলা, পার্ট-টাইম কাজ নিযে উপার্জন বাড়ানো। এখন সুবজিতের বিশ্ব-বিপ্লব শুধু পবিজন-পালনেব মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিপাশাব বাবাব সঙ্গে, আবো পাঁচজন ভদ্রলোকেব সঙ্গে তাব কোন তফাত নেই।

সুবজিৎ বলল, 'কই, কোন কথা বলছ না তো?'

বিপাশা বলল, 'কি বলব তাই ভাবছি।'

সুরজিৎ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ভেবেও কি বলবার কথা আজ কিছু বের করতে পারবে? যখন কথা বেরোত আপনিই বেরোত। এখন হাজার খুঁজলেও কি বলবার মত কোন একটি কথা ফিরে পাবে বিপাশা?'

'বেশ, তাহলে তুমিই বল।'

কিন্তু সুরজিতেরও কি বলবার কথা বেশি কিছু আছে? এক সময় ছিল যখন ভাবতে হত না, খুঁজতে হত না, বিপাশাকে পাশে নিয়ে বসবার সঙ্গে সঙ্গে তার মনের কথাও আপনি বেরিয়ে আসত। সুরজিতের মাঝে মাঝে মনে হত এই ভালবাসা যেন কথা বলারই আনন্দের মধ্যেই সবখানি ধরা রয়েছে। তার বাইরে আর কিছু নেই, থাকবার দরকার নেই। কথা বলা আর কথা শোনা। সামনে ভরা নদী, পাশে নদীর মত মেয়ে, নদীর নামের মেয়ে। সেও কলস্বনা কী মিষ্টি গলা বিপাশার। সেই কণ্ঠে সাহিত্য রাজনীতি থেকে যে কোন তুচ্ছ কথাও অপরূপ তাৎপর্যে ভরে ওঠে—তখন মনে হত সুরজিতের। মনে হত সংসারে আর কিছুর প্রয়োজন নেই। শুধু একজন আর একজনের কাছে হৃদয়কে উন্মোচিত করে দিতে পারলেই হল। সেই উন্মোচনের একটি মাধ্যম হল ভাষা। চব্বিশ ঘণ্টার কাজ চালাবার ভাষা শুধু প্রেম আর কাব্যই সেই ভাষাকে সংকীর্ণ বন্ধন থেকে মুক্তি দেয়। সুরজিতের মনে হয়েছে যা সে বলেছে আর যা সে শুনেছে সবই স্বতোৎসারিত, অচিন্ত্যপূর্ব এমনকি অলৌকিক। আজকের মত তখনো কয়েকটা বড় বড় জাহাজ নোঙর ফেলে থাকত। তাদের ঘরে ঘরে আলো জ্বলত চূড়ায় চূড়ায় আলো জ্বলত। দীপালির উৎসব যেন অনন্ত রাত্রির। সেই আলোয় মনের সব অন্ধকার ঘুচে যেত সুরজিতের। কখনো এরই একটি জাহাজে উঠে নিরুদ্দেশ যাত্রার কথা বলতে তাদের লজ্জা হত না। ওরা বলত, তারা কোন বন্দরেই ভিড়বে না, তারা পৃথিবীর সব বন্দরই ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাবে। এই বস্তুতন্ত্রের যুগে সেই অবাস্তব কল্পনায় তাদের কোনরকম সংকোচ হত না। আবার পাশাপাশি বসে, অঙ্গে অঙ্গে সংলগ্ন হয়ে হাতের মধ্যে হাত রেখে নদাবক্ষের অন্ধকারও দেখেছে সুরজিৎ। সেই অন্ধকার আজকের মত নৈরাশ্যের অন্ধকার নয়। সেই আপন অজ্ঞাত অপরিচিত রোমাঞ্চকর জীবন রহস্যের আধার। সেই তমিস্রা নদীর মতই রহস্যময়ী। সমস্ত ভাবনা বেদনা সাধনা আরাধনা আবৃত করে রাখে। সেই আবিষ্টতা দিনের পর দিন অনুভব করেছে সুরজিৎ রাতের পর রাত কেটেছে আচ্ছন্নতায়।

বন্ধুর সংখ্যা বেশি নয় সুরজিতের। মাত্র দু'তিনজন। বান্ধবী মাত্র একটিই। আর কোন মেয়েকে ভালোবাসা দূরের কথা অন্য কোন মেয়ের কাছেই যেতে পারেনি সুরজিৎ, যাওয়ার কোন আগ্রহই বোধ করেনি যে একের মধ্যেই অনন্ত সুখ পেয়েছে তার একাধিকে কি দরকার। কিন্তু বিপাশা তা নয়। বিপাশা বন্ধুমণ্ডলী নিয়ে পরিবৃতা হয়ে থাকতে ভালোবেসেছে। ওর আত্মীয়স্বজন অনেক, বন্ধুবান্ধবও বহু। ও যেন সকলের স্নেহপ্রীতি অনুরাগের স্তব আর স্তুতি দিয়ে গড়া। কেউ ওর তনুদেহের সুখ্যাতি করবে, কেউ ওর উজ্জ্বল গৌর বর্ণের, কেউ রূপের কেউ রূপসজ্জার, কেউ বিদ্যার, কেউ বুদ্ধির, কেউ উচ্চ ভাষণের, কেউ গুনগুনানির। বিপাশার সবাইকে যে চাই। ও যেন প্রত্যেকের তিল তিল আকাঙ্ক্ষার তিলোত্তমা মূর্তি ওর ভালোবাসাও জনে জনে তিলে তিলে বিন্দুতে বিন্দুতে বিতরিত।

বন্ধুরা মাঝে মাঝে ঠাট্টা করেছে, কখনো বা হিতৈষীর মত সাবধান করে দিয়েছে সুরজিৎকে, 'ভাই, সামাল দিতে পারবে তো? বিপাশা দত্তের নাগপাশ বড় কঠিন পাশ। ধরবার সময় অক্টোপাশের মত ধরে। আবার ছাড়বার সময় লেজের ঝাপটায় সহস্র যোজন দূরে ফেলে দেয়। ক্ষুরের লেজে অনেকেই মাথা মুড়িয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেই ক্ষুর গলার ক্ষুর হয়েছে তাদের।

সুরজিৎ তা জানে। বিপাশা যে অনেক বন্ধুকে ফিরিয়ে দিয়েছে তা সে নিজেই বলেছে। কিন্তু গর্ব করে বলেনি। উল্লাসের সঙ্গে বলেনি। ম্লান মুখে ধরা গলায় বলেছে। যারা ভুল করেছে, বন্ধুত্বকে প্রেম বলে ধরে নিয়ে পরিণামে দুঃখ পেয়েছে তাদের ভুলের জন্যে বিপাশার দুঃখের যেন শেষ নেই। সেই সব ভাঙা হৃদয়ের কাহিনী শুনতে শুনতে, আশ্চর্য, কখনো সুরজিতের মনে ঈর্ষা হয়নি। বরং সহানুভূতিতে হৃদয় ভরে উঠেছে। আর সেই সঙ্গে এক অনুচ্চারিত গোপন আশ্বাসে মন কানায়

কানায় কি পূর্ণ হয়েও ওঠেনি ? কেউ যা পায়নি সুরজিৎ তাই পেয়েছে। তাকে ছাড়া কাকে কতটুকু খুদ কুঁড়ো ভিক্ষা দিয়েছে বিপাশা, কী হবে সে কথা জেনে ? সুরজিৎ যা পেয়েছে, তাতেই সে পরিপূর্ণ। কিন্তু কে জানত তার পাত্রও ভিক্ষাপাত্র, পূর্ণ পাত্র নয়। অর্পণের ছল মাত্র, সমর্পণ নয়।

যদি তাই হয়ে থাকে, এই আট বছর ধরে সেই ছলনার খেলাও কী মাধুর্য নিয়েই না এসেছিল ! অস্বীকাব কববে না সুবজিৎ. লজ্জা অপমান আর বিদ্রূপের ভয়ে কারো কাছেই সে অস্বীকার করবে না, সে ভালোবেসেছিল। সে সম্পূর্ণভাবে একটি মেয়ের কাছে নিজেকে সমপর্ণ করে দিয়েছিল। কী মধুব মত্ততা সেই সমর্পণের মধ্যে। সমবয়সী সহপাঠিনী হলেও সুবজিৎ যাকে বিদ্যায় ছোট বলে জানে. গভীব বুদ্ধি আর ব্যাপক অভিজ্ঞতাব ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র বলে জানে, তাবই রূপ আর লাবণ্যের কাছে, তাব দেহাধারের অলৌকিক বহস্যের কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে যেমন দুঃসহ যন্ত্রণা তেমনি অপার্থিব অবিশ্বাস্য আনন্দ। সেই বিষামৃত আট বছর ধরে আপন অস্তিত্বেব পাত্রে পান কবেছে সুরজিৎ। আজ সেই পাত্র শূন্য হয়েছে বলে নিজেকে যদি একান্ত প্রতারিত প্রবঞ্চিত মনে কবে—তাহলে কী আব বাকি থাকবে ?

আটটা বছর তাবা একসঙ্গে ঘুবেছে, বেড়িয়েছে, কথা বলেছে, তর্ক করেছে আবৃত্তি করেছে, গুনগুন করেছে, হাজাব বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও ঘর বাঁধবাব স্বপ্ন দেখেছে। আজ সেই স্বপ্নেব সৌধ গগনেব সৌধ হয়ে রইল। তাব কাবণ যে কী সুরজিতের বুঝতে বাকি নেই। বিপাশার স্বপ্নভঙ্গের হেতু একান্ত বস্তুগত। এই পৃথিবীর ধুলোমাটির মধ্যে প্রোথিত। বিপাশা যতই অস্বীকাব করুক, উচ্চ রুচি ও উচ্চ সমাজের মেয়ে এই ধনীব দুলালী সুরজিতেব মত গরীব বামুনের ঘরে আসতে ভয় পাচ্ছে। তাব অশিক্ষিতা মাকে ভয় পাচ্ছে বিপাশা, সুবজিতেব আধা-শিক্ষিতা দিদিদের সংশয়েব চোখে দেখছে। কাবণ বিপাশা জানে যে, সুবজিৎ নিজেকে তাব পায়ে যত বিলিয়েই দিক মা আর দিদিদের ছেড়ে আলাদা কোথাও বাস কবতে পাববে না। অথচ সুরজিতেব ঘবে বিপাশাকে সব ছেড়ে আসতে হবে—বাপ মা দাদা বউদি, ছোট ছোট ভাইবোন, অসংখ্য বন্ধুবান্ধব, উচ্চ শিক্ষিত অভিজাত সমাজ। অতখানি ত্যাগ স্বীকারে বিপাশার আজ বোধ হয় দ্বিধা এসেছে। বিপাশা বোধ হয় ভাবছে, প্রেমের ক্ষেত্রে নাবী ও পুরুষের বেলায় কেন এই বৈষম্য হবে ? কেন বিপাশাই সব ছেড়ে আসবে, সুবজিতকে কানাকড়িও ছাড়তে হবে না ? এই নিয়ে একদিন কথাও হয়েছিল। ব্যক্তিগত নয়, তত্ত্বগত কথা।

সুবজিৎ বলেছিল, 'এই তো নিয়ম।'

বিপাশা বলেছিল, 'আমি যদি বলি নিয়ম নয়, ঘোবতব অনিয়ম। তোমাদেব পুরুষতান্ত্রিক সমাজেব জবরদস্তি ?'

সুরজিৎ আব কোন কথা বলেনি।

ভিন্ন জাতের ভিন্ন সমাজের মেয়েকে সুরজিৎ বিয়ে কবছে শুনে তাব মা আব দিদিবাও বেঁকে বসেছিলেন। কিন্তু সুরজিৎ আব কাউকে বিয়ে কববে না শুনে শেষ পর্যন্ত তাঁবা নিমরাজী হয়েছেন। তাঁদের এইটুকু ত্যাগ যে কম নয় তা সুরজিৎ জানে। আবার সংঘর্ষেব এখানেই যে শেষ নয় তাও বিপাশা বোঝে। সেই নিত্য নিঃশব্দ কলহকে বোধহয় ভয় পাচ্ছে বিপাশা।

কিন্তু সব ভয়ই ভেসে যেত, যদি বিপাশাব মনে আগেব মত প্রেমের বন্যা কূলপ্লাবিনী হত। সুরজিৎ জানে, সেই প্লাবন নেই। তটিনী এখন ক্ষীণস্রোতা। যে কোন প্লাবনই প্রতিদিনেব নয়, মাত্র কয়েকদিনেব।

কোন কোন বন্ধু সুরজিৎকে দোষ দেয়। বলে, 'তুমি কেন এতদিন অপেক্ষা করলে, অপেক্ষা করতে দিলে ? কেন জোব কবলে না ? তুমি কি জানো না মেয়েরা মুখে যাই বলুক, সমস্ত দেহে জববদস্তিব আশা করে ?'

জববদস্তি ! না, সেই জবরদস্তি সুবজিতের ধাতে নেই। সে গান্ধর্ব বিয়েব জন্যে উন্মুখ হয়েছিল, আসুরিক বিয়েতে তাব পবম অরুচি।

নীল বঙেব বাতি জ্বেলে ছোট একটি লঞ্চ দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে গেল। বাঁশি বাজল, একটু ঢেউ জাগল জলে।

বিপাশা বলল, 'অনেকক্ষণ ধবে তুমি চুপ কবে বসে আছ, বোধ হয ঘণ্টাখানেক হবে।'

অন্ধকাবে ঘড়ি দেখবাব বৃথা চেষ্টা কবল। তাবপব একটু হেসে সুবজিৎ বলল, না। অতক্ষণ হবে না। কোন কোন সময পনেব বিশ মিনিটকেও এক ঘণ্টা বলে মনে হয।'

এতক্ষণে আশপাশেব গুঞ্জনমুখব বেঞ্চগুলি ক্রমশ খালি হতে শুরু কবেছে।

বাস্তাব চীনাবাদামওযালা আব চা-ওযালা দু-দু'বাব এই যুগলেব কাছে এসে ফিবে গেছে। তৃতীযবাব এসে বিপাশাব তাড়া খেল। অথচ এমন দিনও গেছে, ওই অভিজাত রুচিব ধনীনন্দিনী জবিব আঁচলে গবম মাটিব ভাঁড় চেপে চা খেযেছে খোসা ছাড়িযে বাদাম তুলে দিযেছে সুবজিতেব মুখে, নিজে উন্মুখ হযে বযেছে তাব হাতেব একটি বাদামেব জন্যে।

অনেকদিন চাঁদেব দিকে পিছন ফিবে বসেছে সুবজিৎ। ঘাড় ফিবিযে গাছেব ডালেব ফাঁকে ফাঁকে পূর্ণ চাঁদকে দেখেছে আব দেখেছে জ্যোৎস্নামাখা আব একখানি মুখকে। সে মুখ চাঁদেব চেযেও সুন্দব। আজ আব চাঁদ পিছনে নয সামনে পশ্চিমেব আকাশে। প্রতিপদ কি দ্বিতীযাব চাঁদ। পাণ্ডুব ঠোঁটে বিবর্ণ এক চিলতে হাসি যেন শুকিযে যেতে যেতেও শুকোচ্ছে না

বিপাশা বলল, চল এবাব ওঠা যাক

সুবজিৎ বলল কিন্তু কথা তো শেষ হল না। তুমি আজ শেষ কথা বলতে এসেছিলে।'

বিপাশা একটু হাসল শেষ কথা কি কথাব অপেক্ষা বাখে?

সুবজিৎ আব কিছু জিজ্ঞাসা কবল না।

দু জনে উঠে পড়ল। একটু এগোতেই চোখে পড়ল একটি ঘোড়াব গাড়ি বাস্তাব এপাবেই এসে দাঁড়িযেছে। সুবজিৎ চিনতে পাবল সেই গাড়ি আব সেই কোচম্যান।

সুবজিৎ বলল তুমি এখনো আছ?

কোচম্যান হেসে বলল হাঁ বাবুজী আপনাদেব দু জনকে নিযে যাব হাওযা খাওযা হল বাবুজী

এ কি লোভ না সেই চাব আনা বকশিশেব কৃতজ্ঞতা? সুবজিৎ এবাব আব দব কষাকষি কবল না

দু জনে উঠল গাড়িতে পাশাপাশি বসল কোচম্যান ঢাকনাটা নামিযে দিল

দু জনে কান পেতে মাঝে মাঝে কোচম্যানেব গলাব স্বব আব তাড়া খাওযা ঘোড়াব খুবেব শব্দ শুনতে লাগল।

হঠাৎ সুবজিৎ বলল একটা সত্যি কথা বলবে বিপাশা?

বল।

'তুমি আব কাউকে ভালোবেসেছ? কথা দিযেছ?

বিপাশা ধবা গলায বলল, না। বিশ্বাস কব দিইনি '

সুবজিৎ বলল, 'আমি কোনদিন কবিতা লিখিনি। আমাদেব অমন প্রবল ভালোবাসাব মধ্যেও আমাব এক লাইন লেখা বেবোযনি। আজ দুটি লাইন তোমাব জন্যে অনুবাদ কবে নিযে এসেছি। শুনবে?'

'বল।'

সুবজিৎ বলল—

> 'Take back the hope you gave—I claim
> Only a memory of the same

এবাব শোনো একটি দুর্বল মিনতি—

> যা কিছু দিযেছিলে ফিবিযে নাও তুমি
> শুধু সে স্মৃতিটুকু নিও না নিও না।'

বিপাশা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হযে বইল। তাবপব হঠাৎ সুবজিতেব কাঁধে মুখ চেপে ভিজে চোখে ধবা গলায ক্ষীণ অস্ফুট স্ববে বলল, 'আমাকে ভুল বুঝো না, আমাকে অবিশ্বাস ক'ব না।'

নিরুদ্দেশ

বিবাট হলঘবেব এ দেযাল থেকে ও দেযাল পর্যন্ত অনেকগুলি মাথা চোখে পড়ে। কাঁচা মাথা পাকা মাথা, কাঁচা পাকা চুলে মেশানো মাথা,—মাথাই কতবকম। এই তো গেল চুলেব দিক। চুল ছাড়া টেকো মাথাও দেখা যায। কা'বা বা আধ মাথা জুড়ে টাক, কাবো বা গোটা মাথা জুড়ে ইন্দ্রলুপ্ত। মানুষেব কতবকমেব মুখেব গড়ন, নাক চোখেব গড়ন। মুখেব স্টাডিও মন্দ নয। একটু কান পাতলে প্রণবেশ একঘব সহকর্মীদেব গুঞ্জবণ শব্দও শুনতে পান। সবাই মুখ বুজে কাজ কবে না। কাজেব ফাঁকে ফাঁকে কেউ কেউ উঠে গিযে অন্য টেবিলে গিযে গল্প কবে। তা ছাড়া জীবন বীমা কোম্পানীব অফিসে বাইবেব লোকজন তো হবদম আসে। তাদেবও কথাবার্তা শোনা যায। দৃশ্য আছে, শব্দ আছে, গন্ধও আছে। প্রণবেশেব সামনেব টেবিলেব তপনবাবু ভাবি শৌখিন। তিনি গন্ধ তেল ব্যবহাব কবেন। মিষ্টি মশলা দেওযা পান খান। স্পর্শ থেকেও বঞ্চিত নন প্রণবেশ চক্রবর্তী। পলিসি ডিপার্টমেন্টেব গোকুল বায মাঝে মাঝে তাঁব পাশে এসে বসেন। সিনেমা সাহিত্য বাজনীতি নানা বিষযে তাঁব উৎসাহ হযত বা দখলও আছে। তিনি এসে মাঝে মাঝে প্রণবেশেব খোঁজখবব নিযে যান। নিযে যান বলা ভুল, দিযে যানই বেশি। জগতেব যাবতীয খবব তিনি প্রণবেশকে সবববাহ কবতে থাকেন। শ্রোতাকে অনামনস্ক দেখে মাঝে মাঝে তাঁব বাহুতে খোঁচা দিযে বলেন, 'শুনেছেন নাকি মশাই ?'

প্রণবেশ শোনেন, কিন্তু কিছু বুঝতে পাবেন না। ফ্যাল ফ্যাল কবে বক্তাব মুখেব দিকে তাকিযে থাকেন।

গোকুলবাবু হাতেব পাতা উল্টে নৈবাশ্যেব ভঙ্গি কবে বলেন কিচ্ছু শোনেননি। আপনাব হযে গেছে মশাই। এত অন্যমনস্কতা নিযে কী কবে আপনি কাজ কববেন ? চলাফেবা কববেন ? এতদিন ধবে আপনাকে বলছি ডাক্তাব দেখান, ডাক্তাব দেখান। ছুটি নিন। ছুটি তো আপনাব যথেষ্ট পাওনা আছে। ছুটি নিযে চেঞ্জে যান। শবীব মন সাবিযে আসুন

শুভাকাঙ্ক্ষী সহকর্মী উপদেশ দিযে চলে যান।

এই হলঘবটিকে ছোটখাটো একটি জগৎ বলা যায। এ জগতেব দৃশ্য গন্ধ স্পর্শ কোন কিছু থেকে বঞ্চিত নন প্রণবেশ। তবু যেন মাঝে মাঝে সব কিছু অবাস্তব বলে মনে হয়। মানুষগুলি যেন মানুষ নয, ছাযামূর্তি। তিনি নিজেও যেন তাই। অবাস্তব, অশবীবী শুধু কতকগুলি বাসনা কামনাব আধাব। আসলে এইটাই বোগ। এই বস্তুকে অস্বীকাব কবাব ব্যাধি সংসারকে স্বীকাব কবাব ভয। বিশেষ কবে কর্ম ভয। এই ভয থেকেই আসে অনিচ্ছা অক্ষমতা। প্রণবেশ জানেন এই হল বোগ। কিন্তু এ বোগ কি ডাক্তাব দেখালেই সাববে ? শুধু দামি দামি নার্ভটনিক খেলে কি নীবোগ হবেন প্রণবেশ ? এই অস্ব'ভাবিক ভীরুতা তাঁব কোথেকে এল কে জানে ? তিনি জানেন এই কর্মময সংসাবে পবস্পবেব সঙ্গে যোগসূত্র একমাত্র কর্মসূত্র। ছেলেবেলায যাত্রাব আসবে বিবেকেব গান শুনেছিলেন, 'সুতে দুখান ঘুড়ি, ভক্তি আব জ্ঞান বেড়ায উড়ি।' অধ্যযন ধ্যান মননেব যে

contemplative life তাও কর্মের সঙ্গে বাঁধা। তাও আসলে active life. কিন্তু প্রণবেশ যেন সমস্ত কর্ম থেকে মুক্তি পেতে চান। সেই নৈষ্কর্ম মানে মৃত্যু, জীবমুক্তি নয়, বিলুপ্তি। সেই বিলুপ্তি কি চান প্রণবেশ? না তাও নয়। জড়বাদীর বিলুপ্তি অন্য কোন লোকে পৌঁছে দেয় না অন্য জন্ম জন্মান্তরের কল্পনায় উদ্বুদ্ধ করে না। সেই বিলুপ্তি মানে নাস্তিত্ব শূন্যতা। না, একেবারে শূন্য হয়ে যেতে চান না প্রণবেশ। নিজের অস্তিত্বকে অনুভব করতে চান। শুধু অনুভূতি। কর্ম, কৃত্য, কৃতিত্বের দায় থেকে মুক্ত শুধু অনুভূতি। তিনি কি শুধু অশরীরী এক অনুভূতি মাত্র হয়ে থাকতে চান? নিজের মনেই হাসেন প্রণবেশ

না অশরীরী হওয়ার কল্পনা তাঁকে সব সময় আনন্দ দেয় না। অশরীরী হয়ে থাকাও তো না থাকার সামিল। শরীর নেই অথচ মন আছে, আর সেই মনের চিন্তা কল্পনা অনুভব শক্তি আছে একথাও তাঁর পক্ষে ধারণা করা কঠিন। দেহই তো তাঁর আইডেনটিটি কার্ড। এই পরিচয়পত্র ছাড়া তিনি অন্যের কাছে স্বীকৃতি পাবেন কী করে? এই দেহের পাত্রেই তো তিনি রূপ রস গন্ধ স্পর্শ গ্রহণ করেন। তাই নিরবয়ব হয়ে থাকাও তাঁর মনঃপূত নয়।

এই উল্টোপাল্টা চিন্তাধারায় আর পরস্পর বিরোধী আকাঙ্ক্ষার আকর্ষণ বিকর্ষণে প্রণবেশ অস্থির হয়ে ওঠেন। অস্বস্তি বোধ করেন।

এর চেয়ে নিজের কাজে মন দিতে পারলে ভালো হত কিন্তু অফিসের কর্তৃপক্ষ তাঁর হাত থেকে গুরুদায়িত্ব সরিয়ে নিয়েছেন। ওদের বোধহয় ধারণা হয়েছে তিনি পুরোপুরি সুস্থ নন। সেই অসুস্থতা শরীরের নয়, মনের অন্যমনস্ক ব্যক্তির হাতে কোন গুরুদায়িত্ব ছেড়ে দিতে ওরা রাজি হননি। ব্রাঞ্চ ম্যানেজারও তাকে একদিন ডেকে বলেছিলেন, প্রণববাবু ছুটি নিন আপনি। কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে refreshed হয়ে আসুন।

কিন্তু ছুটি নেওয়ার কথায় প্রসন্ন হন না প্রণবেশ। এই অফিসের কতজন ছুটি ছুটি করে পাগল। কারণে অকারণে তারা কামাই করে। কিন্তু ছুটি নেওয়ার অনুরোধ সত্ত্বেও প্রণবেশ ছুটি নেন না। ছুটি নিলে যেন অসুস্থতাকে স্বীকার করে নেওয়া হয় শারীরিক অসুস্থতা নয়, মানসিক অসুস্থতা। যদিও শরীর আর মন অবিভাজ্য, মনও অন্তঃশরীর ছাড়া আর কিছু নয়, তবু বলবার সুবিধার জন্যে মানুষ ওই ভাবেই রোগকে চিহ্নিত করে। ডাক্তাররাও ওইভাবেই বিভক্ত হয়ে যান দেহের রোগের আর মনের রোগের ডাক্তার। আরও বিভাগ উপবিভাগ আছে আজকাল বিশেষজ্ঞতার যুগ। এক এক প্রত্যঙ্গের জন্যে এক এক ডাক্তার। কিন্তু তাঁর কোন অঙ্গই বিকল অকেজো হয়ে গেছে বলে স্বীকার করতে রাজি নন প্রণবেশ কিন্তু তিনি স্বীকার না করলে কি হবে, তাঁর আশেপাশের সবাই যে তাঁকে অস্বীকার করে তা তিনি বুঝতে পারেন।

অফিসের কর্তৃপক্ষ যৎসামান্য কাজ দিয়ে তাঁকে একটি মাঝারি ধরনের আসনে বসিয়ে রেখেছেন প্রিমিয়াম ডিপার্টমেন্টের মেজবাবুর আসন।

যাঁরা ডিফলটার হয়েছেন তাঁরা মাঝে মাঝে আসেন প্রণবেশ তাঁদের প্রিমিয়াম নোটিশের ওপর একটা সই করে দেন, তাদের সামান্য জরিমানাটা মকুব হয়ে যায়। বিলম্বের পরিমাণ যদি বেশি হয়, তিনি সাক্ষাৎকারীকে বড়বাবুর ঘরে পাঠিয়ে দেন। কেউ কোন খোঁজখবর নিতে এলে বলেন। সারাদিনের কাজ তাঁর এমনি দু চারবার নাম স্বাক্ষরেই শেষ হয় বড়জোর দু চারজন সাক্ষাৎকারীর সঙ্গে কথাবার্তা। তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর টেবিল খালি পড়ে থাকে। জরুরী কাজের গুরুতর কোন ফাইল তাঁর টেবিলে কেউ পাঠায় না তাঁর সামনের চেয়ারে অফিসের কোন পদস্থ ব্যক্তি এসে বসেন না। এমন কি অধঃস্তন কর্মচারীরাও কেউ বড় একটা আসে না। আসবার দরকার হয় না। কারণ কারো সঙ্গে প্রণবেশ কর্মসূত্রে আবদ্ধ নন।

অসুস্থ মস্তিষ্কের মানুষকে যেমন সবাই এড়িয়ে যায় ছোট বড় সব সহকর্মীই তেমনি তাঁকে এড়িয়ে চলেন। ওদের ধরন ধারণ দেখে মনে মনে হাসেন প্রণবেশ। ওরা হয়তো প্রণবেশকে পাগল বলেই ধরে রেখেছেন। ওদের হয়তো আশঙ্কা প্রণবেশ যে কোন মুহূর্তে ভায়োলেন্ট হয়ে উঠতে পারেন।

আবার কেউ কেউ ভাবেন প্রণবেশ সেয়ানা পাগল। কাজ এড়াবার জন্যে ইচ্ছা করে হাত গুটিয়ে বসে আছেন। ঘৃণা অবজ্ঞা বিদ্বেষে তাঁরা প্রণবেশের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। নেতিবাচক উপহাস

পরিহাস নিয়ে বহু দূরে তাঁদের অবস্থান। প্রণবেশও তাঁদের কাছে যান না, তাঁরাও তাঁর কাছে আসেন না।

নিঃসঙ্গ কর্মহীন প্রণবেশ আজও তাঁর চেয়ারে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু নিজের মনকে নিয়ে কাটাচ্ছিলেন। সেই মন পুরোপুরি সুস্থ কি অসুস্থ তিনি জানেন না তাঁর প্রতি অন্যের আচরণ দেখে ধরে নিতে হয় অসুস্থ না হলেও তিনি ঠিক স্বাভাবিক নন। অন্যের বিচারে তিনি সম্পূর্ণ অনির্ভরযোগ্য, কাজকর্মের একেবারেই অনুপযোগী হয়ে পড়েছেন

তাই কি আজ সারাদিনের মধ্যে একটি ফাইলও তাঁর টেবিলে আসেনি? প্রিমিয়ামের নোটিশ নিয়ে একজন পলিসি হোল্ডারও তাঁর সাহায্য প্রার্থনার দরকার বোধ করেননি?

প্রণবেশের মনে হয় আর কেন, এবার এই চেয়ার ছেড়ে উঠে চলে গেলেই হয়। উঠে কোথায় যাবেন? বাড়িতে গেলে স্ত্রীপুত্রকন্যারা তাঁকে ঘিরে ধরবে। ওঁরা তাঁর ওপর নির্ভরশীল। কেউ আংশিক, কেউ বা পুরোপুরি। তাঁরা হাত ধরে ফের তাঁকে এই চেয়ারে এনে বসিয়ে দেবে

স্ত্রী একদিক থেকে নির্মম। আর একদিক থেকে পরম মমত্বময়ী। ছেলেমেয়ে ঘরসংসার মানমর্যাদা সব আগলে রাখতে চান।

তিনি বলেন, 'তোমার কী হয়েছে? কিচ্ছু হয়নি মন দিয়ে কাজ করলেই তুমি করতে পারবে। ওসব বাতিকটাতিক ছাড় তো। এখনো তোমার সামনে কত দায়িত্ব ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে হবে।' মাথা গুজবার একটা জায়গা আজও আমাদের হল না। অফিস থেকে পালাবার জায়গা নিজের পারিবারিক আশ্রয় নয়, অন্য কোন কর্মস্থলও নয়। বনস্থল, নিবিড় অরণ্য নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া।

নিরুদ্দেশ! মনে মনে হাসেন প্রণবেশ। তিনি যে চেয়ারে বসে আছেন এই চেয়ার থেকেই বিশ বছর আগে প্রায় তাঁরই বয়সী এক ভদ্রলোক নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরও স্ত্রীপুত্র ছিল অফিসে মানমর্যাদা ছিল। তবু হঠাৎ একদিন কেন যে তিনি চলে গেছেন তা কেউ জানে না।

প্রণবেশ তখন এ অফিসে আসেননি। সেই নিরুদ্দিষ্ট ভদ্রলোককে কখনো দেখেননি। তাঁর সহকর্মীরাও তাঁর সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখেন না। যাঁরা তাঁকে চিনতেন তাঁরা অনেকেই রিটায়ার করেছেন কেউ কেউ বা সংসার থেকেই বিদায় নিয়েছেন। এত বড় অফিসে নিশ্চয়ই আরো কেউ কেউ আছেন যাঁরা সেই সত্যজীবন রায়কে চিনতেন। কিন্তু তাঁদের কাউকে খুঁজে বের করতে পারেননি প্রণবেশ। খুব একটা উৎসাহও বোধ করেননি। সহকর্মীদের মধ্যে দ একজনকে জিজ্ঞাসা করে দেখেছেন তাঁরা কেউ জানেন না। একজন বৃদ্ধ পলিসিহোল্ডার বছর দুই হল প্রণবেশকে এই খবরটি দিয়েছিলেন। তাঁর সামনের চেয়ারে বসে বলেছিলেন, 'মিঃ চক্রবর্তী আপনার ওই চেয়ারের একটা গুণ আছে। ওই চেয়ার থেকে সত্যবাবু বলে এক ভদ্রলোক নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। আপনার যা রকমসকম, যেমন উদ্‌ভ্রান্ত উন্মনা-উন্মনাভাব তাতে আপনিও করে আমাদের ছেড়ে যান।'

বৃদ্ধ সস্নেহে তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসেছিলেন। তাঁর সেই হাসির মধ্যে ব্যঙ্গ ছিল না, কৌতুক ছিল না। অনাবিল স্নেহের মাধুর্যধারায় প্রণবেশকে তিনি সেদিন অভিষিক্ত করেছিলেন। তারপর আর তাঁকে দেখেননি প্রণবেশ। তিনি মারা গেছেন। দশ হাজার টাকার পলিসি ছিল তাঁর। পুরো প্রিমিয়ামটা দিতে হয়নি। বছর পাঁচেক আগেই বিদায় নিয়েছেন।

তারপর থেকে সেই সত্যজীবন প্রণবেশকে প্রায়ই হণ্ট করছেন। যখন অন্য সবাই প্রণবেশের সঙ্গ ত্যাগ করেছে, তিনি তাঁর প্রায় নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছেন। শুধু অফিসে নয়, বাসে ট্রামে, বাড়িতে, পার্কে বেড়াবার সময় তাঁর কথা মনে পড়ে যায় প্রণবেশের। তাঁর অস্তিত্ব যেন অনুভব করেন। অবশ্য এ যে তাঁর একটা ফ্যানটাসি, তাও তিনি বোঝেন। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয় সত্যজীবনের থাকাটা আর চলে যাওয়াটা দুই ই কাল্পনিক ব্যাপার। কিংবদন্তীর মত অর্ধসত্য, অনিশ্চিত সত্য। কিন্তু এই সত্য তাঁকে পেয়ে বসেছে।

কোন কোন দিন প্রণবেশ ভেবেছেন এই সত্যজীবনের বাড়িঘরের ঠিকানা, তাঁর সংসার ত্যাগের কারণ তিনি খুঁজে বের করবেন। সেই বৃদ্ধ তাঁকে বলেছিলেন, কলকাতা শহরেই তাঁর বাড়ি ছিল।

বউবাজার অঞ্চলে থাকতেন এ কথাও বলেছিলেন। অফিসের পুরনো ফাইলপত্র ঘেঁটে তাঁর ঠিকানা বের করা অসম্ভব নয়। ঠিকানা খুঁজে খুঁজে সত্যজীবনকে এখন আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু তাঁর স্ত্রীপুত্রের সন্ধান হয়তো মিলতে পারে। তাঁদের কাছ থেকে সত্যজীবনের চলে যাওয়ার যথার্থ কারণ বের করতে পারেন প্রণবেশ। কিন্তু সত্যি সত্যি খুঁজতে গিয়ে প্রণবেশ তেমন যেন উৎসাহ বোধ করেন না। খুঁজে কী হবে। প্রণব চক্রবর্তী গোয়েন্দাও নন, ঐতিহাসিক, প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকও নন। তা ছাড়া নিরুদ্দিষ্ট সেই ভদ্রলোকের সংসারত্যাগকে কোন একটি নির্দিষ্ট কারণ দিয়ে বেঁধে ফেলতেও যেন প্রণবেশের মন চায় না। নিশ্চিত সত্যের চেয়ে অনিশ্চিত সত্য রহস্যময়। রোমান্টিক। অপার্থিবতায় ঘেরা। সেই অলৌকিকতার আবরণ থেকে তিনি যেন তাঁর সত্যজীবনকে মুক্ত করতে চান না।

বৃদ্ধ বলেছিলেন, সত্যবাবুর স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরাও কেউ জানতেন না সেই কারণ। সত্যবাবু কাউকে কিছু লিখে যাননি, কাউকে কিছু বলেও যাননি। তাঁর আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব কেউ জানেন না যে ব্যাপারটা কী। অফিসের কাজ সেরে এক জামা এক কাপড়ে তিনি চলে গিয়েছিলেন। থানা পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছিল তারা কোন উদ্দেশ দিতে পারেনি। হাসপাতালগুলিতে খোঁজ নেওয়া হয়েছিল,মৃত কি আহত সত্যজীবনকে কেউ এনে ভর্তি করেনি। তখনকার কাগজে হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশের স্তম্ভে ছবি দিয়ে তুমি ফিরে এস বলে একবার তাঁর স্ত্রীর, আর একবার তাঁর ছেলেমেয়েদের অনুনয় বেরিয়েছিল কেউ ধরা দেয়নি, কেউ সাড়া দেয়নি। বৃদ্ধ বলেছিলেন, সত্যজীবনের স্ত্রী তাঁকে মৃত বলে মেনে নেননি। তাঁর অশনবসন সধবার মতই। কোন আশ্রম টাশ্রমেও সত্যজীবনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি দাড়ি গোঁফওয়ালা সাধু সন্ন্যাসী দেখে এগিয়ে গেছেন সত্যবাবুর স্ত্রী, কি ছেলেমেয়েরা। কিন্তু কেউ তাঁকে বের করতে পারেননি।

বৃদ্ধের বিবরণ শুনে ছেলেমানুষের মতই খুশি হয়ে উঠেছিলেন প্রণবেশ। এরই নাম তো সত্যি সত্যি হারিয়ে যাওয়া দেহ রেখে মরে যাওয়া নয় দেহ নিয়ে সরে যাওয়া। সূক্ষ্ম শরীরে বিচরণ না, এই স্থূল শরীর নিয়েই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কোন স্পেস ক্রাফটের সাহায্য নিয়ে নয়, বিনা যন্ত্রপাতির সাহায্যেই গ্রহে গ্রহে তারায় তারায় ঘুরে বেড়ান প্রণবেশ ভাবেন 'আমরা যেটুকু পারি, যেটুকু করি, যেটুকু জানি তা সসীম সসীম তো বটেই, অতি ক্ষুদ্রসীম। কিন্তু আমাদের না পারা না করা না জানার গণ্ডী অনেক অনেক বেশি বিস্তৃত। আমাদের বাস্তব জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা তার ভিত্তিভূমি হলেও তার সহস্রশীর্ষ আকাশ ছোঁওয়া। তার প্রত্যেকটি চূড়া কল্পনার সোনায় মাখানো। অর্ধেক মানবী তুমি অর্ধেক কল্পনা। শুধু মানবী কেন মানবও তাই। নারী মহাকবির কলম যদি হত তা দিয়েও ওই কথা বেরত হে আনন্দসুন্দর পুরুষ তুমিও বাস্তবে কল্পনায় মেশানো। তার ভাগ আধাআধি নয়, তার অনুপাত সিকি আর তিন চতুর্থে। কারো কারো মধ্যে বা আরো বেশি।

তবু একদিন প্রণবেশ কী করে যেন সত্যবাবুর বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। বউবাজারের গলির মধ্যে দোতলা একটি পুরনো বাড়ি। সামনে দুদিকে রোয়াক। কয়েকটি ছেলেমেয়ে খেলায় মত্ত তাদের একজনকে ডেকে প্রণবেশ জিজ্ঞাসা করলেন সত্যজীবন রায় কি এ বাড়িতে থাকতেন?

'কে সত্যজীবন রায়?'

সাত আট বছরের সুদর্শন দুটি ছেলেমেয়ে একে অন্যের মুখের দিকে তাকায়।

তারপর হঠাৎ মেয়েটি বলে ওঠে 'ওরে, দাদুর কথা বলছেন উনি দাদুর নামই তো—'

প্রণবেশ হেসে বলেন, 'হ্যাঁ তিনি তোমাদের দাদুই হবেন। 'তিনি তো নেই এখন—'

মেয়েটি চোখ বড় বড় করে বলে, 'তিনি কবে চলে গেছেন।'

'আচ্ছা, তোমাদের বাবা আছেন? বাবাকে ডেকে দাও না '

ছেলেটি গম্ভীরভাবে বলে, 'বাবা এখনো অফিস থেকে ফেরেননি। কে আপনি?'

'আমি? আমাকে তুমি চিনবে না। তোমার দাদু যে অফিসে কাজ করতেন, আমি সেখানে কাজ করি। তিনি যে চেয়ারে বসতেন, আমিও সেই চেয়ারে বসি।

'আপনি কী চান। বাবা তো বাড়িতে নেই।

'তা তো শুনলাম। তোমাব ঠাকুবমাব সঙ্গে কি আমি একবাব দেখা কবতে পাবি ?'
'ঠাকুবমা তো অচেনা অজানা মানুষের সামনে বেবোন না। আচ্ছা তাঁকে বলে দেখি।'
তিনি বাজি হয়েছেন। সেই দুটি ছেলেমেযেব সঙ্গে প্রণবেশ বাড়িটিব ভিতবে ঢুকলেন।
পুবনো বাড়ি। ভিতবে উঠোন। দক্ষিণ দিকে চৌবাচ্চা। দেযালেব ওপাশ থেকে একটি নিম গাছ তাব ওপব ঝুঁকে পড়েছে। একটি দুটি পাতা পড়েছে সেই খোলা চৌবাচ্চাব জলে। অনেক পাতা আব ফুল বাইবে পড়ে আছে।
নীচেব ঘবগুলি অন্ধকাব। ডানদিক দিযে সিঁড়ি উঠেছে দোতলায। ওই দিকেই ঢাকা বাথরুম। সব মিলিযে কেমন যেন একটা ছাযা ছাযা বহস্যভবা ভাব।
ছেলেটি প্রণবেশকে পশ্চিম দিকেব ঘবখানিতে নিযে গেল।
জোড়া তক্তপোশে মাদুব বিছানো। আব একদিকে খান দুই চেযাব। দেযাল ঘেঁষে একটি আলমাবি। একদিকেব কাঁচ ভেঙে গেছে।
তাঁকে চেযাবে বসতে বলে ছেলেটি চলে গেল।
প্রণবেশেব মনে হচ্ছিল, 'আবে এ বাড়িতে আমি তো আগেও এসেছি। এই ঘবে যেন বাস কবে গেছি আমি। ঠিক মনে কবতে পাবছিনে কোন সময।'
একটু বাদে সেই দুটি ছেলেমেযেব সঙ্গে স্থূলাঙ্গী একজন ভদ্রমহিলা নেমে এলেন। তাঁব পবনে লাল পেড়ে সাদা খোলেব শাড়ি। মাথায খাটো আঁচল, তাব ফাঁকে সামনেব দিকেব কিছু পাকা চুল চোখে পড়ল। সিঁথিতে সিঁদুব, কপালে সিঁদূবেব ফোঁটা।
তিনি ঘুবে গিযে তক্তপোশেব ওপব বসলেন।
প্রণবেশেব মনে হচ্ছিল এ মুখ যেন তাঁব চেনা। অথচ কোথায দেখেছেন ঠিক কবতে পাবছেন না
ভদ্রমহিলা যে পর্দানশীন নন তা দেখে খুশি হলেন প্রণবেশ।
নমস্কাব বিনিমযেব পব তিনি জিজ্ঞাসা কবলেন, 'আপনি কী চান ?'
নাতিনাতনীকে বললেন, 'যাও, তোমবা উঠানে খেলা কব গিযে।'
তাবপব আবাব জিজ্ঞাসা কবলেন, 'আপনি কী জানতে চান।'
প্রণবেশ বললেন, 'আমাব পবিচয তো আপনি শুনেছেন ?'
'তা শুনেছি।'
'আপনাব স্বামীব সম্বন্ধে আমি কিছু জানতে চাই। ভয নেই আপনাব, আমি গোযেন্দা বিভাগ থেকে আসিনি। আমি আমাব নিজেব গবজে এসেছি।'
'বলুন কী শুনতে চান।'
'আপনাব স্বামী কেন চলে গেলেন ?'
'তিনি তো কিছু বলে যাননি।'
'তবু আপনাব কী অনুমান। আপনার কী মনে হয ?'
'মনেব কথা বাইবে বলে কী হবে ? তা শুধু অন্তর্যামী জানেন। তিনি জানুন।'
'সত্যবাবু চলে যাওযায আপনাব নিশ্চযই খুব কষ্ট হযেছিল।'
মহিলাটি একটু চুপ কবে থেকে বললেন, 'তাতো বুঝতেই পাবেন।'
'এই কী কবছিস তোবা ? এই অবেলায চৌবাচ্চাব মধ্যে নামিসনে। খববদাব খববদাব।'
জানলা দিযে নাতিনাতনীকে শাসন কবলেন মহিলা।
প্রণবেশ বললেন, 'কিন্তু সেই দুঃখেব তীব্রতা আব নেই এ কথাও তো ঠিক।'
মহিলাটি মুখ নিচু কবে বললেন, 'আমি আব কী বলব বলুন। আপনি সবই বুঝতে পাবেন।'
প্রণবেশ তাবপব উঠে দাঁড়িযেছিলেন। নমস্কাব জানিযে বলেছিলেন, 'আপনাকে বিবক্ত কবে গেলাম কিছু মনে কববেন না।'
আশ্চর্য, তাবপব প্রণবেশেব বহুদিন সংশয হযেছে ঘটনাটি কি সত্য ? নাকি স্বপ্ন দেখেছেন ? কিংবা দিবাস্বপ্ন ?

কিছুদিন অফিস ছুটিব পব তিনি বউবাজাবেব গলিব ভিতব দিয়ে হেঁটে গেছেন। মাঝে মাঝে দু একটি বাড়িব দিকে লুব্ধভাবে তাকিয়ে বয়েছেন। পাছে কেউ দেখে ফেলে তাই ভয়ে ভয়ে সবেও গেছেন।

পবে তাঁব আবও মনে হয়েছে, যে বাড়িটিব ভিতবে তিনি ঢুকেছিলেন, অন্তত ঢুকেছিলেন বলে তাঁব মনে হয়েছিল তাব সঙ্গে কলেজে পড়বাব সময় বেসিডেনশিয়াল টিউটব হিসেবে তিনি যে বাড়িতে ছিলেন তাব অদ্ভুত মিল আছে। আব যে অতি প্রৌঢ়া মহিলাব সঙ্গে তাঁব সেদিন আলাপ হয়েছিল তাঁব মুখাবয়বেব সঙ্গে প্রণবেশেব স্ত্রীব মুখেব বেশ খানিকটা সাদৃশ্য আছে।

আসলে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবাব দীর্ঘকাল পবে প্রণবেশ নিজেই যেন স্ত্রীব ইন্টাবভিউ নিতে এসেছিলেন। এসে দেখলেন, স্ত্রীব মনে শোক দুঃখেব চিহ্ন মাত্র নেই। তাঁব আসনে কিছুদিন বসেছিল ছেলে, তাবপব বসছে নাতি।

এই তো হবে। মহাপ্রস্থান কবলেও যা হবে, খণ্ড প্রস্থান কবলেও তাই।

তিনি চলে গেলেও কিছুই অচল হয়ে থাকবে না। এ কথা জেনেও চলে যেতে পাবেন কই?

তা ছাড়া কেন যাবেন কোথায় যাবেন এ দুটি প্রশ্নেব সদুত্তবও কি তিনি খুঁজে পেয়েছেন?

নিজেব নিয়মকানুন শৃঙ্খলায় তিনি নিজেই এক ইনস্টিটিউসন।

বেয়াবা এসে বলল, 'ম্যানেজাববাবু আপনাকে ডাকছেন'

প্রণবেশ সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত। কী ব্যাপাব কোন ভুল ভ্রান্তি হল নাকি যেন যাওয়াব ইচ্ছা নেই। যেন পালিয়ে থাকতে পাবলেই বাঁচেন প্রণবেশ। তবু যেতে হল

বিবাট একখানা টেবিল সামনে নিয়ে ম্যানেজাব বসে আছেন। প্রসন্ন মুখ পবিতুষ্ট সুস্থ সুপ্রতিষ্ঠ ভদ্রলোক। প্রণবেশেব প্রায় সমবয়সী কিন্তু সবদিক থেকেই অসম।

প্রণবেশ ভাবলেন কী করে মানুষ এমন নির্ভীক অসংশয়ী হয়? আমি ওব প্রতিষ্ঠা পদগৌবব চাইনে কিন্তু মাঝে মাঝে আমি আমাব identity বদল কবতে চাই। আমি একজন সবল সফল দৃঢ়চিত্ত পুরুষেব সঙ্গে খানিকক্ষণেব জন্যেও আমাব সত্তাব বিনিময় চাই কিন্তু এ কথাও ঠিক বস্তু অনন্যনির্ভব প্রতিষ্ঠা আব আত্মপ্রত্যয়।

ম্যানেজাব একটু হেসে বললেন, 'কী ব্যাপাব? সদাই অন্যমনস্ক [illegible] ভদ্রমহিলাকে চিনতে পাবেন?'

ম্যানেজাবেব সামনে বসে একটি সুদর্শনা মহিলা কথা বলছিলেন। বয়স তিবিশেব নীচেই হবে। ম্যানেজাব বললেন বসুন প্রণববাবু। মিসেস সোম আপনাব সঙ্গে দেখা কবতে চাইছিলেন। তাই এই কষ্টটুকু দিলাম। আপনাব আত্মীয়া শুনলাম। আমাদেবও অনাত্মীয় নন। আমাদেব এই ইউনিটেব সঙ্গেই আছেন। লেডী ডাক্তাব

মিসেস সোম প্রণবেশেব দিকে চেয়ে স্মিত মুখে বললেন 'চিনতে পাবছেন?'

চেনা চেনা লাগছিল। কিন্তু সত্যিই ঠিক চিনে উঠতে পাবছিলেন না প্রণবেশ। তাঁব পাশে বসে লজ্জিতভাবে হেসে বললেন ঠিক যেন—

মহিলাটি মধুব ভঙ্গিতে হাসলেন চিনলেন না তো? তা চিনবেন কেন কত বড়লোক হয়েছেন। দাঁড়ান। অঞ্জনাদিব কাছে আমি নালিশ কবব গিয়ে।'

কে এই বহস্যময়ী মধুবা। প্রণবেশ অনুমান কবলেন তাঁব স্ত্রীব কোন বান্ধবী কি আত্মীয়া হবেন। কিংবা কুটুম্বিনী। অঞ্জনাব সহোদব সহোদববা তো আছেই। তাছাড়া মামাত পিসতুতো ভাইবোনবাও বহুসংখ্যক। তাবা আবাব নানা শাখাপ্রশাখায় জটিল। কিন্তু কাবো সঠিক পবিচয় জানবাব জন্যে প্রণবেশ এই মুহূর্তে তেমন ব্যগ্র নন। একটু হেসে বললেন, 'বেশ তো কববেন নালিশ।'

মিসেস সোম বললেন, 'মিঃ ভদ্রেব কাছে শুনলুম আপনি এখানেই আছেন। আপনাব শবীব নাকি তেমন ভালো যাচ্ছে না।

সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে উঠলেন প্রণবেশ, 'না না, আমি তো ভালই আছি।'

মিসেস সোম হেসে বললেন, 'আহা অমন আঁৎকে উঠলেন কেন? আমি আপনাব চিকিৎসা

কবতে আসিনি। নাড়ি টিপে ধবব না, জিভ দেখতে চাইব না।'

মহিলাটি তো বেশ সুবসিকা। প্রণবেশ ভাবলেন শ্যালিকা কি শালাজ স্থানীয় কেউ হবেন হযতো।

মিঃ ভদ্র বললেন, 'আপনাব ট্রিটমেণ্টে থাকলে উনি বেশ তাডাতাডি সুস্থ হবেন মিসেস সোম।'

তাবপব ম্যানেজাব প্রণবেশকে বিদায় দিলেন। মিসেস সোমেব সঙ্গে এবাব তিনি কাজেব কথা বলবেন।

আজকাল তো সত্যি সত্যিই অবণ্যবাসী হযে ফলফুল খেযে প্রাণ ধাবণ কবা যায না। কিছু না কিছু তাঁকে কবতেই হবে। কিছু যদি কবতেই হয লোকালযে বসে কবাই ভালো। কর্মে প্রণবেশেব ভয। আবাব কর্মভীরুতাব অপবাদেও ভয। আচ্ছা এক যন্ত্রণা হযেছে। নিজেব মনেই হাসেন প্রণবেশ। কোন আশ্রমে-টাশ্রমে যাওযাব কল্পনা তিনি কবতে পাবেন না। ওবে বাবা। ওই রুটিন লাইফ তাঁব সহ্য হবে না। অফিসেব রুটিনই মানতে পাবেন না তো আশ্রমেব রুটিন। তাছাডা আশ্রম বিশ্বাসীকেই আশ্রয দেয। তিনি কি কোন আনুষ্ঠানিক ধর্ম মানেন? তিনি সহিষ্ণু। প্রায সব কিছুই সহ্য কবেন। কিন্তু গ্রহণ কবেন কি? বাজনৈতিক আখডা, ধর্মীয আশ্রম কোনটাই তাঁব জন্যে নয। অথচ নিজে কিছু একটা গডে তুলে তাব মধ্যে যে তিনি বাস কববেন সে সাধ্যও তাঁব নেই। তাব জন্যেও কর্মক্ষম হতে হয। শুধু বিলাসী হলে চলে না। কল্পনাকে সুনির্দিষ্ট রূপ দেওযা শ্রমসাধ্য ব্যাপাব। তাবও কঠোব নিযম শৃঙ্খলা অভ্যাস অনুশীলন আছে। এইজন্যে যিনি কল্পনাকে রূপ দেন সেই আর্টিস্টও কর্মবীব।

বাজ্যভবে কে বটিযে দিযেছে প্রণবেশ অসুস্থ। এ তো মহাজ্বালা হল। দশচক্রে ভগবান ভূত আব প্রণবেশ কি বোগী হবেন নাকি?

নিজেব চেযাবে এসে বসলেন প্রণবেশ। কিন্তু আগে থেকেই কে এক ভদ্রলোক তাঁব সামনেব চেযাবে বসে তাঁব জন্যে অপেক্ষা কবছেন।

'কী ব্যাপাব? কী চান?' প্রণবেশ জিজ্ঞাসা কবলেন।

ভদ্রলোক তবু কথা বলেন না। স্মিতমুখে চুপ কবে বসেই আছেন। প্রণবেশ নিজেই বললেন, প্রিমিযামেব নোটিশ এনেছেন? কিন্তু আজ তো ক্যাশ বন্ধ হযে গেছে।'

ভদ্রলোক তবুও প্রণবেশেব দিকে চেযে মিটিমিটি হাসছেন। হাসিটিব মধ্যে কেমন একটু বহস্যেব ভাব। কিন্তু বেশ মিষ্টি। ইনিও সুশ্রী সুপুরুষ। ঈষৎ লম্বাটে গডন মুখেব। সুডোল। টিকোলো নাক, পাতলা ঠোঁট। ছিপছিপে চেহাবা। মাথাব চুলগুলি কিন্তু সব পাকা। 'কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?'

নিজেব কিছু কিছু পাকা চুল নিযে এখনো মাঝে মাঝে দুঃখ হয প্রণবেশেব। কিন্তু এই সুদর্শন ভদ্রলোক এক মাথা পাকা চুল নিযে বেশ প্রসন্ন মনেই বসে আছেন। পবনে গেরুযা বঙেব পাঞ্জাবি, মিহি ধুতি। দাডি গোঁফ কামানো। শৌখীন সুপবিচ্ছন্ন ভদ্রলোক। বযস? বযস ঠিক আন্দাজ কবা শক্ত। এক চুল ছাডা দেহেব কোথাও কোন বযসেব ছাপ পডেনি। দিব্যজীবন আছে কিনা প্রণবেশ তা জানেন না, কিন্তু এ ভদ্রলোক যেন এক দিব্য যৌবনেব অধিকাবী।

তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'চিনতে পাবছেন?'

চেনা চেনা লাগছে। নিজেব দুর্বল স্মৃতিশক্তিব জন্যে একটু বিব্রত লজ্জিত হযে প্রণবেশ বললেন, 'ঠিক যেন—ঠিক যেন place কবতে পাবছিনে। কিছু মনে কববেন না।'

ভদ্রলোক বললেন, না না, মনে কবব কেন। আপনি আমাকে ঠিক দেখেননি। কিন্তু দেখতে চেযেছেন।'

'তাব মানে?'

'দু বছব ধবে আপনি আমাকে যত্রতত্র খুঁজেছেন। হোটেলে বেস্টুবেণ্টে, পার্কে, গঙ্গাব ধাবে। আপনি যেখানে যেখানে চেঞ্জে গিযেছিলেন, দেবাদুনে হবিদ্বাবে। আমাব স্ত্রী পুত্রও বোধ হয সে সময আমাকে এমন ব্যাকুলভাবে খোঁজেনি।'

আশ্চর্য, এত ভীরু প্রণবেশ। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি আব ভয পেলেন না। তিনিও যে সপ্রতিভ হতে পারেন, সরস হতে জানেন, তাব প্রমাণ দেওয়াব জন্যে উৎসুক হযে উঠলেন। 'কী কবে

জানলেন আপনাকেই আমি খুঁজেছি। আমি থটরিডিং টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করিনে। আমি ঘোরতর বস্তুবাদী।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'তাই নাকি ! দেখুন আপনি যে কী, আর কী নন, তা অত জোর গলায় বলবেন না। দেখি আপনার হাতখানা। না না আমি পামিস্ট নই। পাঞ্জাবির আস্তিনটা গুটিয়ে নিন। আপনার গায়ে একটু আঁচড় দিয়ে দেখব কি ? দেখছেন তো আমাব বড বড নখ নেই। আমার আঁচড়ে আপনার রক্ত বেরোবে না। কিন্তু আর যে কী কী বেরোবে তা আপনিও বলতে পারেন না, আমিও পাবিনে।'

প্রণবেশ হাসলেন, 'বলতে যে পারেন না তা জানি। আপনার কোন অপ্রাকৃত ক্ষমতায় আমি বিশ্বাস করিনে। আমার চিত্ত দৌর্বল্যের শেষ নেই। আমার বন্ধুরা সবাই সে কথা জানে। তারা সবাই আমার চেয়ে দৃঢ়চিত্ত, দৃঢ়চরিত্রের পুরুষ। কিন্তু তবু আমি তুক তাক মানিনে, মাদুলি কবচ ধারণ করিনে, জ্যোতিষীর কাছে হাত বাড়াইনে। আপনার কোন অলৌকিক শক্তি আছে আমি মানতে পাবব না। বলুন না, আপনি আমার কথা কী করে জানলেন ?'

'আবে মশাই, আপনি তো আচ্ছা লোক। আপনি বুঝি ধরে নিয়েছেন আপনাবই শুধু অনুমান শক্তি আছে, কল্পনাব জোর আছে, সারা বিশ্বে আর কাবো নেই ? আপনার কি ধারণা আমি সংসার ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় অনুমান শক্তিকে আমার স্ত্রীর আঁচলে বেঁধে রেখে গেছি ? আপনি আমাকে যেভাবে জেনেছেন আপনাকেও আমি ঠিক সেই পথেই চিনেছি। এবার বলুন তো আমাকে অত খুঁজেছিলেন কেন ?'

'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস কবব বলে।'

'করুন।'

'আপনি লোকালয় ছেড়ে চলে গেলেন কেন ?'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আপনিই বলুন না। আপনার অত যখন কল্পনার জোব ?'

'বলব ? কিছু মনে করবেন না তো ?'

প্রণবেশ যেন বহুদিন বাদে পবম বন্ধুর সঙ্গে বসালাপে মগ্ন হয়েছেন।

'যদি বলি আপনি লাখখানেক টাকা চুরি করে পালিয়েছিলেন।'

ঠোঁট টিপে টিপে হাসলেন প্রণবেশ।

ভদ্রলোকও হাসলেন, 'এই বুঝি আপনার বুদ্ধির দৌড় ? আরে মশাই চুরিই যদি করতে পারতাম তাহলে পালাব কোন দুঃখে ? যাকে যা বখরা দেবার দিয়ে এই শহরেই বাড়ি করতাম, গাড়ি করতাম। চাই কি একটি তরুণী নারী জুটে যাওয়াও অসম্ভব ছিল না।'

'ওরে বাবা ! এখনো তরুণী নারীর কথায় আপনার জিভ সজল হয় ? তবে নাকি আপনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ? তাহলে নিশ্চয়ই আপনি খুন করে পালিয়েছেন। আপনার যা চেহারা আর যা রসে টইটম্বুর ভাব তাতে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই প্রণয ঘটিত ব্যাপার ছিল পিছনে। কাকে খুন করেছিলেন বলুন তো ? বিশ্বাসহন্ত্রী দয়িতাকে না প্রতিদ্বন্দ্বীকে ?'

ভদ্রলোক হাসলেন, 'এই বুঝি আপনার কল্পনার জোর ? আজকালকার লেখাপড়া জানা, প্রণয়ীরা অত রক্তারক্তির মধ্যে যায় নাকি ? তারা রসের ব্যাপারী, রক্তের ব্যাপারী নয়। আজকাল সবাই জানে জীবন যদি পদ্মপত্রে নীর প্রেমের অশ্রু কচুর পাতায় টলমল।'

প্রণবেশ বললেন, 'তাহলে আপনি মশাই শ্রীমুখে নিজেই বলুন কেন সংসার ছাড়লেন।'

'বলব প্রণববাবু বলব। এসেছি যখন, নিশ্চয়ই বলব। তাব আগে আপনাকে দুটি একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।'

'করুন না।'

'সত্যি জবাব দেবেন। আপনি নিরুদ্দেশ হতে চাইছেন কেন ?'

প্রণবেশ হতাশার ভঙ্গি করে বলেন, 'কেন চাইছি তাই যদি জানতাম !'

সত্যজীবন হাসলেন, 'তাহলে আমি আপনাকে সাহায্য করি।'

'করুন।'

'আপনি মশাই প্রেমে পড়েছেন। কোন তরুণী মেযেব প্রেমে। তাবপব হতাশ হযে—'

প্রণবেশ হেসে বললেন, 'আপনি, দেখছি আমাবই অস্ত্রে আমাকে ঘাযেল কবাব চেষ্টা কবছেন। আপনাব মৌলিকতাব অভাব। কোন তরুণীব প্রেমে আমি পড়িনি। তবে তারুণ্য আমাকে আকর্ষণ কবে, যৌবন আমাকে মুগ্ধ কবে। সে যৌবন স্ত্রীপুরুষ নিবপেক্ষ।'

সত্যজীবন মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন, 'সে তো আবো মাবাত্মক। বিশ্বময দিযেছ তাবে ছড়াযে। তাব চেযে বিশেষ একজনকে জড়িযে ধবা ঢেব ভালো। শুনুন মশাই, এবাব আমি বলব আপনি বাঁ হাতেব আস্তিন গুটান। আমি আবাব একটু আঁচড় দিযে দেখি। আমি যদি বলি যৌবন শুধু আকষণ কবে তাই নয, আপনিও কল্পিত যৌবন নিযেই যৌবনকে আকর্ষণ কবতে চান। নিজেও যযাতিব মত পুনর্যৌবন চান।'

প্রণবেশ একটু ক্লিষ্ট স্ববে বললেন, 'অমন কবে গাল দেবেন না। আমাব ছেলেমেযেবা বড়ো হযেছে। আমি কি তাদেব মধ্যে নিজেব নবযৌবন দেখতে পাইনে?'

ভদ্রলোক হেসলেন, 'কখনো পান, কখনো পান না। যখন পান না, তখনই মনে হয হাবালাম হাবালাম, গেল গেল, পালাই পালাই। তখনই বলেন, মন বনে চল। এদিকে মন ফিবে ফিবে উপবনেব দিকে তাকায।'

এক বাদে ভদ্রলোকেব গলা একটু গম্ভীব গম্ভীব শোনাল, 'তাছাড়া যৌবন তো শুধু নাবী সম্ভোগেব ক্ষমতাই নয, যৌবন আবো অনেক ক্ষমতাব প্রতীক। যৌবন সৌন্দর্য শৌর্য বীর্য হযতো বা ঔদার্যেব সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী। যৌবন বঙ্গমঞ্চেব কেন্দ্রস্থলে। আব সব কোণঠাসা। উইংসেব আড়ালে আপনি যৌবনকে নিজেব সত্তাব সঙ্গে অভিন্ন কবে দেখতে চান। যৌবন গেলে সর্বস্ব গেল বলে মনে কবেন, ভাবেন নিজেব পবিচযপত্রটি চিবদিনেব মত হাবিযে গেল। তাবও পবে নিজেও হাবিযে যেতে চান

প্রণবেশ নিজেব মনে একটু কী যেন ভেবে দেখলেন, তাবপব আস্তে আস্তে বললেন, 'সত্যবাবু আপনাব কথা আংশিক সত্য, পুবো সত্য নয। যৌবন হাবাবাব দুঃখই কি একমাত্র দুঃখ?'

সত্যজীবন বললেন, 'একমাত্র কেন হবে? আবো আছে খ্যাতি আছে, প্রতিপত্তি আছে। কিন্তু তা নিযত চঞ্চল। কাবো দশশালা বন্দোবস্ত, কাবে বা পাঁচশালা। কচিৎ কেউ ভোগ দখলেব জীবন স্বত্ব নিযে আসেন, বেশিব ভাগই যৌবন স্বত্ব। সেই স্বত্ব ক্ষীযমাণ দেখে বুক ভেঙে যায। মনে হয সব গেল। যেটুকু আছে, তাও যদি যায তাহলে বাঁচব কী নিযে। হাবাধন হওযাব চেযে নিজে ববং জন্মেব তবে হাবিযে যাই সেই ভালো। কিন্তু ভালো কবে ভেবে দেখুন তো, দশজনেব কাছে আপনাব যে পবিচিতি, তাই কি আপনাব একমাত্র আইডেনটিটি কার্ড?'

প্রণবেশ বললেন, 'আপনাকে তো আমি বলেছি, সত্যবাবু, আমি বস্তুবাদী। আপনাব কল্পনা আমাব ভাব সবই বস্তুজাত। আমাব সামান্য দু চাবখানা যা আসবাবপত্র আছে তা যে আমাব কিছুই নয, তা আমি কী কবে বলব, সব মিলিযে সব নিযে আমি সমগ্র।'

সত্যজীবন হেসে মাথা নাড়তে লাগলেন, 'ওই তো মুসকিল। ওইখানেই তো আপনাব গোঁযার্তুমি। সব ছেড়েও আপনি আপনিই। একথা যেদিন বুঝতে পাববেন সেদিন আব এমন পালাই পালাই কববেন না। ন যযৌ ন তস্থৌ হযে থাকবেন না। নিজেব মধ্যে নিজে স্থিব হযে থাকবেন।'

প্রণবেশ বললেন, 'সত্যি কবে বলুন তো সত্যবাবু, এই জ্ঞান লাভেব জন্যে কাবো কি নিরুদ্দেশ হওযাব দবকাব হয? এতো আমবা ঘবে বসেই পাই।'

সত্যজীবন হেসে বললেন, 'সবাই কি এক জাযগায বসে সব পায? নাকি যা পায তাব সবটুকু ধবে বাখতে পাবে।'

তাবপব একটু বাদে বললেন, 'যাক গে মশাই। ঢেব তত্ত্ব কথা হল। এবাব আপনাব কথা বলুন। আপনাব জীবনেব কথা শুনি। আপনি চলে যেতে চাইছেন কেন? আব চাইছেনই যদি যেতে পাবছেন নাই বা কেন। আপনাব আটকাচ্ছে কোথায?'

ভদ্রলোকের গলায় কৌতুকেব সুব দেখে প্রণবেশ ফের অন্তবঙ্গ হয়ে উঠলেন। তিনিও এবার

বেশ হাল্কা সুরে বললেন, 'আটকাচ্ছে কোথায় শুনবেন ? আটকাচ্ছে ভয়ে। যেতে চাইছি সেও ভয় থেকে, আবার যেতে যে পারছিনে সেও ভয় থেকে।'

সত্যজীবন বললেন, 'ভারি মজার কথা তো। বলুন বলুন। আপনার ভয়ের চেহারাটা দেখি।'

'কী আর বলব। শুনলে আপনি হাসবেন। পালাবার ইচ্ছে কি মশাই শুধু আজ ? তিরিশ বছর আগেও আমি একবার পালাতে চেয়েছিলাম।'

'বলেন কি ? আমার চেয়েও আগে ? এতক্ষণ বৃথাই সময় নষ্ট হল। শুরুতেই আপনার গল্পটা শুনে নিলে হত। বলুন এবার।'

প্রণবেশ বলতে লাগলেন, 'এই সৃষ্টিছাড়া ভয় আমার মধ্যে কোত্থেকে যে এল তা আমি বলতে পারব না। আত্মচরিতের উৎস সন্ধানে পিছু হটতে হটতে আমাকে চলে যেতে হয় কৈশোরে বাল্যে শৈশবে এমন কি মাতৃগর্ভে। কিন্তু সেই অন্ধকারে ফিরে গিয়েও কি সব হদিশ পাব ? অতদূরে গিয়ে কাজ নেই। প্রথম যৌবনের দু একটি ঘটনার কথা বরং শুনুন।'

'হ্যাঁ মশাই যৌবনের গল্পই ভালো। যুবতী-টুবতী আনছেন তো ?'

'না মশাই কোথায় যুবতী, তখন দিনরাত পরীক্ষার পড়া নিয়ে ব্যস্ত। বি-এ পরীক্ষা। পরের বাড়িতে ছেলে পড়িয়ে পড়াশুনো করি। বাবা থাকেন দূর মফঃস্বলের গাঁয়ে, আমি শহরে। দুজনেরই আশা পাশ করে যাব। এর আগের দুটি পরীক্ষায় ভালোভাবেই তো পাশ করেছি। যেসব ক্লাসমেটের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব তারা যতটা তৈরি হয়েছিল আমি তার চেয়ে কম তৈরি হইনি। কিন্তু হলে কী হবে। শুনুন কাণ্ড। দ্বারভাঙা বিল্ডিং-এর চূড়ায় সীট পড়ল। আশেপাশে সবই চেনা মুখ। আমাদের কলেজেরই সব ছেলে। পেলাম প্রশ্নপত্র। সবাই লিখে চলেছে। কিন্তু এ কি ব্যাপার। আমার কলম সরে না, আমার লেখা পড়ে না। আমি নিজেই অবাক। জানা সব প্রশ্ন। কিন্তু কিসের যেন একটা মানা ভিতর থেকে আমাকে অনড় করে রেখেছে। ভিতরে অনড়, কিন্তু বাইরে নড়তে লাগলাম, কাঁপতে লাগলাম। খানিকটা লিখে কেটে দিলাম। আবার শুরু করলাম, আবার কাটলাম। বুঝতে পারলাম আমার দ্বারা আর হবে না। তবু সে দিন দুটো বেলাই কাটিয়ে দিলাম। কিন্তু দ্বিতীয় দিনের একটি বেলাও আর কাটল না। শ্বেতপত্র গার্ডের হাতে সঁপে দিয়ে চুপি চুপি চোরের মত বেরিয়ে এলাম। আরো কয়েকটি ছেলেও বেরিয়েছিল। কিন্তু তারা বেরোল ডাকাতের মত। যেন কিছুই হয়নি। বেপরোয়া। বাইরে এসে সিগারেট ফুঁকতে লাগল। আমি যে কীভাবে এসপ্ল্যানেডে এসে পৌঁছলাম, ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু অচেতনভাবে আসিনি। আমার উদ্দেশ্য হাওড়া স্টেশন থেকে যে কোন ট্রেন ধরব। তারপর চিরদিনের জন্যে নিরুদ্দেশ হয়ে যাব। কিন্তু কিছুতেই এসপ্ল্যানেড ছাড়িয়ে অন্য কোথাও যেতে পারলাম না। যেন গোলকধাঁধায় ঘুরছি। বেরোবার পথ পাচ্ছিনে। সে যে কী অবর্ণনীয় যন্ত্রণা, গভীর লজ্জা ভয়, অনুশোচনার সে যে কী ঘূর্ণি ঝড়, তা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না। তারপর সন্ধ্যার পর কোনরকমে বাসায় ফিরে আসতে পেরেছিলাম। আমার ছাত্রছাত্রীরা ঘিরে ধরল 'মাস্টার মশাই কেমন পরীক্ষা দিলেন ?' বললাম, 'দিয়েছি একরকম। কিন্তু আমার মুখ দেখে তদের কিছু বুঝতে বাকি রইল না। পরদিন বাবাকে চিঠি লিখে দুর্ঘটনার কথাটা জানিয়ে দিলাম।'

প্রণবেশ থামলেন।

সত্যবাবু বললেন, 'তারপর ? তারপর বুঝি আর ওমুখো হননি ?'

'হয়েছিলাম। তারপর কোন একবার কোনরকমে পাশ করে বেরিয়েওছিলাম। কিন্তু আমি বেরোলে কী হবে, সেই যে অনির্দেশ্য অবর্ণনীয় এক ভয় আমার ভিতরে ঢুকে রইল তা আর কিছুতেই বেরোলে না। সেই ভয় জীবনভর আমাকে জ্বালাচ্ছে। তারও যেন একটা আলাদা জীবন আছে। সে আমারই পাশাপাশি বেড়ে উঠেছে। যেন আমারই দ্বিতীয় সত্তা। সে আমার চিরসঙ্গী। পায়ে পায়ে হাঁটে। সুযোগ পেলেই সামনে এসে দাঁড়ায়। সব অন্ধকার করে দেয়। আর সেই আঁধিতে আমি হারিয়ে যাই। এই ভয় আমাকে প্রতিবার কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে এনেছে, প্রতিক্ষেত্রে অযোগ্য অপুট প্রতিপন্ন করেছে। আমি যা কিছু করতে গেছি, যা কিছু সবল মুঠিতে আঁকড়ে ধরতে গেছি, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত আমার হাত কেঁপেছে। অথচ জানেন

সত্যবাবু, তার কোনটাই খারাপ কাজ নয়, কোনটাই বিবেকবিরুদ্ধ অকল্যাণ কর্ম নয়।'

সত্যজীবন মিটিমিটি হাসছিলেন। বললেন, 'তেমন দু একটা কাজে হাত দিলে পারতেন। হয়তো হাত পাকত, নার্ভ শক্ত হত।'

কিন্তু প্রণবেশ বন্ধুর পরিহাসটুকু গায়ে মাখলেন না। তেমনি আবেগার্দ্র স্বরে বলে যেতে লাগলেন, 'এই ভয় আমাকে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে পলাতক করে তুলল, প্রতি পরীক্ষায় ব্লাঙ্ক পেপার সাবমিট করতে বাধ্য করল। প্রতি কাজে অসফলতার লেবেল এঁটে দিল। কিসের ভয়? সাপের ভয়, বাঘের ভয় নয়, চোরের ভয়, ডাকাতের ভয় নয়। নতুন কিছু শেখার ভয় জানার ভয়, নতুন কোন কাজে হাত দেওয়ার ভয়। তারপর এই ভয় আকারে প্রকারে ক্রমেই বাড়তে লাগল। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদেও ভয়। কিন্তু সেই সঙ্গে টুঁ শব্দটি করতে না পারার জন্যে আত্মগ্লানি। লজ্জায় অপমানে মুখ লুকোবার ইচ্ছা, নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার বাসনা। কিন্তু যাব কোথায়? এই ভয়ার্ত সত্তাকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে তো। আসলে আমি পালাতে চাই নিজের কাছ থেকে, মুক্ত হতে চাই নিজের হাত থেকে। কিন্তু লোকালয় থেকে দূরে যেতে চাইলে কি হবে, আমি নিজেই যে এক বৃহৎ লোকালয়কে বয়ে নিয়ে চলেছি। যে আলয় লোকভয়ে আচ্ছন্ন।'

সত্যজীবন হেসে বললেন, 'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটাই প্যাথলজির এক্তিয়ারে। আপনি গোড়াতেই ভালো কোন সাইকো-অ্যানালিস্টের কাছে গেলে পারতেন। সময় মত চিকিৎসা হলে আপনার আধিই বলুন, ব্যাধিই বলুন সেরে যেত।'

প্রণবেশ বললেন, 'সেইখানেই তো আমার গোঁড়ামি। আমার একমাত্র সম্বল অহমিকাই বলুন আর আত্মপ্রেমই বলুন। আমি ভাবলাম, কেন আমি অন্যের কাছে যাব? আমি নিজেকে কি কিছু কম বুঝি না কি কম চিনি? প্রাপ্তবয়সে আমি কোন গুরুপুরোহিতের কাছে যাইনি, ফকির-দরবেশের দরগায় মাথা ঠুকিনি। যদিও জানি আমার হাতের মুঠোয় সামান্য আমলকিটিও নেই, আর হাতের বাইরে বিশাল জগৎ, তার প্রতিকূলতা ভয়ঙ্কর, সে আমাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে পারে, চূর্ণ বিচূর্ণ করে পিষে মারতে পারে তবু আমি অবৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপকে প্রশ্রয় দিইনি, জ্যোতিষীকে হাত দেখাইনি, শান্তিস্বস্ত্যয়নের ধার ধারিনি। আমি যেমন আর কারো কাছে যাইনি তেমনি নিজের মনের চিকিৎসার জন্যে কোন ডাক্তার কবরেজেরও শরণ নিইনি। আমি এমন করে আর কারো কাছে নিজেকে উদঘাটন করিনি। শুধু আপনার কাছে করলাম। কেন করলাম জানেন? আপনি আমার দ্বিতীয় সত্তা।'

সত্যজীবন হাসলেন, 'দ্বিতীয় সত্তা? এই না আপনি বললেন দ্বিতীয় সত্তা আপনার ভয়? আপনার ভয়কম্পিত হৃদয়? যার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা নিরাপত্তা নিরাপত্তা নিরাপত্তা। আমাকে বরং আপনি তৃতীয় স্থান দিন। নইলে আসন নিয়ে কাড়াকাড়ি হবে। তাছাড়া, আমি কারো সঙ্গে ব্র্যাকেটে থাকতে চাইনে।'

প্রণবেশ হেসে বললেন, 'আধ্যাত্মিকতায় আপনি এমন বসের ময়ান লাগালেন কী করে? কিন্তু দ্বিতীয়ই হোক, তৃতীয়ই হোক আপনি আমার অন্যতম সত্তা তাতে কোন সন্দেহ করবেন না। আপনি যা পেরেছেন তা হয়তো আমি কোনদিনই পাবব না। রিটায়ার করার দিনটি পর্যন্ত এই নড়বড়ে চেয়ারটি আঁকড়ে পড়ে থাকব। আপনি যে নিঃসংশয় স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন আমি হয়তো কোনদিনই তা ছুঁতে পারব না। আমি হয়তো জীবনভর এক পা এগোব আর দু পা পিছোব, দ্বিখণ্ডিত সত্তার দণ্ডভোগ করব, কিন্তু আপনি যে আমার এক অসম্পূর্ণ অভীপ্সা সে কথা ভুলে যাবেন না। ক্ষণিকের জন্যে হলেও আমি যে কখনো কখনো আপনার সঙ্গে একাত্মা হতে পারি সে কথা মনে রাখবেন।'

দিব্যমূর্তি হেসে বললেন, 'রাখব। ফের দেখা হবে। পুনর্দর্শনায়।' বিদায় নমস্কার নয়, হাত বাড়ালেন করকম্পনের জন্যে।

কিন্তু তিনি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কিসের একটা গোলমাল শুনে প্রণবেশ চকিত হয়ে উঠলেন।

কয়েকজন সহকর্মী তাঁকে ঘিরে ধরেছেন, 'প্রণববাবু চলুন চলুন। আপনাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

প্রণবেশ আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। কোথায় কি ভুল করলেন ফের কে জানে। ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কেন, হয়েছে কী ?'

গোকুলবাবু ধমকের সুরে বললেন, 'আর মশাই হয়েছে কী। হবার কি বাকি আছে শুনি ? আপনি প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে বিড়বিড় করছিলেন, হাসছিলেন। আপনার সামনের ওই খালি চেয়ারটার দিকে চেয়ে চেয়ে কথা বলছিলেন, হাত তুলে কি যেন দেখাচ্ছিলেন। আপনি কী দেখছিলেন, কাকে দেখছিলেন বলুন তো ?'

প্রণবেশ ভয়ে ভয়ে বললেন, 'কেন তাঁকে কি আপনারা কেউ দেখেননি ? গোকুলবাবু বললেন, 'আপনি অফিসসুদ্ধ লোককে ভয় পাইয়ে দিয়েছেন। এখনো যদি ডাক্তার টাক্তার না দেখান, অ্যাসাইলামে শেষ পর্যন্ত আপনার স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা হবে। জানেন তা ?'

তারপর গোকুলবাবু বেশ অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কাকে দেখছিলেন বলুন তো ?'

প্রণবেশ চুপ করে রইলেন। তাহলে তিনি কি সত্যিই hallucination দেখতে শুরু করেছেন ? কিন্তু পুরোপুরি অচেতন তো তিনি ছিলেন না। না কি, এও খানিকটা তাঁর ইচ্ছা করে দেখা। দেখতে চেয়েছেন বলে দেখা।

নিজেকে আর সহকর্মীদের তাই বলেই অভয় দিলেন প্রণবেশ। একটু হেসে বললেন, 'ঘাবড়াবেন না। এ বোধ হয় এক ধরনের self-projection।'

গোকুলবাবু ধমকের ভঙ্গিতে বললেন, 'রেখে দিন মশাই self-projection সব কিছুর একটা সীমা আছে আপনি যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন।

প্রণবেশ বললেন, তাই নাকি ?

মনে মনে একটু হাসলেন এতদিন আমিই সবাইকে ভয় করতাম। এখন আমাকে দেখেও কেউ কেউ ভয় পেতে শুরু করেছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে তাঁর কাঁধে হাত রাখলেন গোকুলবাবু। দুজনে লিফটের দিকে এগোতে লাগলেন।

আরো অনেকে লিফটে উঠবার জন্যে সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। বড্ড বেশি লোকের ভিড়। আর প্রণবেশ সব সময় ভিড় এড়িয়ে থাকতে চান। যেখানে ঠেলাঠেলি মারামারি তিনি তার থেকে অনেক দূরে সরে থাকতে চান কিন্তু সেখানেও কি শান্তিতে থাকবার জো আছে ? অজ্ঞাত অবজ্ঞাত থাকবার ভয় সেখানেও কি তাঁকে স্থির থাকতে দেয় ?

তীব্র ঊর্ধ্বমুখী সাঙ্কেতিক লিফট উঠে আসছে। লাল আলো জ্বলছে। আলোটাকে এক অনৈসর্গিক জন্তুর রক্তচক্ষু বলে মনে হচ্ছে কেন ?

প্রণবেশ মনে মনে বললেন, 'কী যা তা ভাবছি। আমি কি সত্যিই উন্মত্ততার দিকে এগিয়ে চলেছি ? উন্মাদের জগৎ, ও তো এক উদ্দেশ্যহীনতার জগৎ। চিরদিনের মত লুকিয়ে থাকবার আশ্রয়। কিন্তু আমি তো সে আশ্রয় চাইনে।

বাস না করলে যা হয় আর কি। বাড়িটা একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে। সামনে দুটি রোয়াক আছে। বাঁ দিকেরটার অর্ধেক নেই। ভিতবেও ভাঙাচোরা কম হয়নি। একটা সিঁড়ির খানিকটা খসে গেছে। ইঁদারার ধারের চাতালটা ফেটে রয়েছে। ভিতরে বান্নাঘরের বারান্দাটার সংস্কার করতে হবে। বাড়ির ভিতরে ঢুকে মৃগাঙ্কমোহন এক নজরে সব দেখে নিলেন, তারপর বুড়ো মালীকে ধমকাতে লাগলেন, 'এসব যদি তোবা না-ই দেখবি তাহলে আছিস কী জন্যে? মাসে মাসে এতগুলি কবে যে টাকা দিই, কেন?'

বনমালী পাকা মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, 'বাবু আমাব তো কসুর নেই। আমি তো সবই দেখছি।'

মৃগাঙ্কবাবু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'ছাই দেখছিস। দেখলে কি এই দশা হত?'

স্বামীব কাণ্ডকাবখানা ঘরের ভিতব থেকে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখছিলেন নীলিমা। তিনি এবার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। তাবপরে স্বামীকে মৃদু তিরস্কাবেব সুবে বললেন, 'এসব কী হচ্ছে বলতো। এই তো সবে গাড়ি থেকে নামলে। এখনো বাক্স বিছানা পর্যন্ত ভালো কবে খোলা হযনি। তুমি বাড়ি বাড়ি করেই অস্থির।'

মৃগাঙ্কমোহন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে একটু চুপ কবে বইলেন। তাবপব মনেব বিক্ষোভ আব উত্তেজনা চেপে হেসে বললেন, 'মাথার ঘাম পাযে ফেলে যদি তোমাকে টাকা বোজগাব কবতে হত আব সেই বোজগারেব টাকায বাড়ি তৈবি হত তাহলে তুমিও অস্থিব হতে। তাহলে তোমাবও মনে হত বাড়িব এক একখানি ইট বুকের এক একখানি পাঁজব।'

নীলিমা বললেন, 'ওরে বাবা, তোমাব কলকাতায় একটা তিনতলা বাড়ি, এখানে একটা বাড়ি, দুটো বাড়ির সবগুলি ইটকে বুকেব পাঁজব বলে ভাবতে হলে আমি তো গেছি। অত পাঁজব মানুষের বুকে থাকে না কি?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তুমি হাসো আর যাই করো আমাব বিষয়সম্পত্তি জিনিসপত্রের ওপব তোমাব মমতা কম। বাড়িটাব নাম বৃথাই 'নীলিমা' নিলয়' রেখেছি। তোমাব মন এ বাড়ির ধারে কাছেও নেই।'

নীলিমা বললেন, 'তাতো ঠিকই। তুমি এক কাজ করো। এবাব বাজমিস্ত্রীকে বলে আমার নামটা তোমার বাড়ির গা থেকে মুছে ফেলো।'

মৃগাঙ্কবাবু সেখান থেকে সরে এলেন। নীলিমার ওই এক কথা। রাগ হলেই কেবল 'মুছে ফেলো। মুছে ফেলো।' যেন মুছে ফেলা অতই সহজ।

মালীকে ডেকে মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'রাজমিস্ত্রীকে খবর দাও। কী লাগবে না লাগবে হিসাব দিয়ে যাক। আমি কাল থেকেই কাজ আরম্ভ করতে চাই।'

তারপর তিনি এসে ঘরে ঢুকলেন। নীলিমা ততক্ষণে বিছানাপত্র খুলে ফেলেছেন। বাক্স স্যুটকেস সব একদিকে সরিয়ে রেখেছেন। ঝেড়েপুছে গোছগাছ করে স্নান সেরে এবার রান্নার আয়োজন করছেন। সদ্যস্নাতা স্ত্রীকে দেখে একটু তৃপ্ত হলেন মৃগাঙ্কবাবু। ক্বচিৎ কখনো আজকাল স্ত্রীর দিকে চোখ পড়ে। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে দেখে আসছেন। দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে। তবে সন্তান হয়নি বলে পঞ্চাশ পেরিয়েও নীলিমার শরীরের গড়ন বেশ আঁটসাট আছে। মেয়েদের তুলনায় একটু যেন বেশি শক্ত। কেমন যেন একটা পুরুষালি ধাঁচ এসে যাচ্ছে দেহে। সন্তান হয়নি বলেই কি? না কি একটা বয়সের পরে নারী আর পুরুষ সব সমান হয়ে যায়। তাদের সাদৃশ্য বাড়ে। সাদৃশ বাড়ে, কিন্তু মমতা বোধ বাড়ে কি? সখ্যতা বাড়ে কি? মৃগাঙ্কবাবুর অভিজ্ঞতা অন্তত সেই সাক্ষ্য

দেয় না। যত দিন যাচ্ছে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিভেদ-বৈষম্যও বেড়ে চলেছে। সন্তানহীনতাই কি এই খিটিমিটির কারণ ? সে কথা বলা যায় না। বহু সন্তানের জনকজননীর মধ্যেও এই বিরোধ দেখেছেন মৃগাঙ্কবাবু। বহু বন্ধুবান্ধবের দাম্পত্যজীবনের কথাই তাঁর জানা। তাঁদের মধ্যে শুধু জৈব তাগিদে যৌন মিলন আছে। আর কোন মিল নেই। উকিল মানুষ। নিজের হাতে বহু অসুখী দম্পতির আইনসম্মতত বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন মৃগাঙ্কবাবু। কিন্তু প্রচণ্ড রকমের ঝগড়া ঝাঁটি সত্ত্বেও নিজেদের মিলটা এখনো টিঁকে আছে। কতটুকু মিল কতখানি গোঁজামিল কে জানে ?

মৃগাঙ্কবাবু স্ত্রীর দিকে একটু এগিয়ে গেলেন, 'সাহায্য করব ? তরকারি কুটে দেব না কি বাটনা বাটতে বসব ? কোথায় তোমার শিল নোড়া ?'

নীলিমা মুখ না ফিরিয়েই বললেন 'থাক। আর অত সোহাগে দরকার নেই।'

মৃগাঙ্কবাবু বুঝতে পারেন নীলিমা রুষ্ট হয়েছেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল রাঁধুনি পদ্মলতাকে সঙ্গে করে আনেন। কিন্তু মৃগাঙ্কবাবু রাজি হননি। দুটি প্রাণীর তো মাত্র অস্থায়ী সংসার। নিজেরাই রেঁধে বেড়ে নেওয়া যায়। তাতে রান্নার স্বাদও ভালো হয়। পদ্মকে আনলে মিছামিছি ওর যাতায়াতের ভাড়া গুণতে হত। ওই মাঝ বয়সী স্ত্রীলোকটি এমনিতেই বেশ মোটাসোটা। তারপর এই যশিডির জল হাওয়ায় ফুলে ঢোল হয়ে যেত। তার চেয়ে দুজনে এসেছেন, কোন ঝামেলা ঝক্কি নেই। মৃগাঙ্কবাবু স্ত্রীকে বলেছেন 'ভেবো না রান্নাটা যদি তোমার বোরিং লাগে আমাকে বলো আমিও মাঝে মাঝে রাঁধব। ওখানে গিয়ে আমারও তো কোন কাজকর্ম থাকবে না। আদালতও থাকবে না মক্কেলও থাকবে না।'

নীলিমা বলেছিলেন, 'বড় আফশোস। ছুটির মধ্যে কলকাতার কোর্টগুলি যদি ওখানে তুলে নিয়ে যেতে পারতে বেশ হত।'

কথাটা মিথ্যা নয়। ছুটিব দিনগুলিতে সবচেয়ে অস্বস্তি বোধ করেন মৃগাঙ্কমোহন। কী করে যে সময় কাটাবেন ভেবে পান না। তাস পাশার নেশা নেই। তাঁর মত বয়সেও কতজন মদ আর মেয়েমানুষে বিভোর হয়ে আছে। কিন্তু মৃগাঙ্কমোহন পান সিগারেটটি পর্যন্ত খান না। নিজেব স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোককে ছুঁয়েও দেখেননি। ওসব দিকে তাঁর স্বাভাবিক বীতস্পৃহা আছে।

সমবয়সী সমব্যবসায়ী নৃপেন হালদার সেদিন বার লাইব্রেরীতে তাঁকে বলেছিলেন 'ভাই মৃগাঙ্ক, তোমাব কার্পণ্য তোমাকে Other Vices থেকে বাঁচিয়েছে।'

মৃগাঙ্কবাবু হেসে বলেছিলেন, 'কী রকম ?'

নৃপেনবাবু জবাব দিয়েছিলেন,'নিজেব স্বভাব বদলাবাব জন্যে আমি কত যে মাদুলী পরেছি, দশ আঙ্গুলে কত যে অষ্ট ধাতুর আংটি ধারণ করেছি তাব ঠিক নেই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সংসারে সবচেয়ে বড রক্ষা কবচ দেখছি কৃপণতা। তুমি সেই কবচ কুণ্ডল নিয়ে মায়েব পেট থেকে পড়েছ তোমাব মার নেই।'

হালদার যত ঠাট্টাই করুক ওর সংসারের যে কী হাল তা মৃগাঙ্কবাবুর জানতে বাকি নেই। একপাল ছেলেমেয়ে। কোনটাই মানুষ হয়নি। নিজে এখনো মদ আর মেয়েমানুষ নিয়েই আছে। যা পায় দু হাতে খরচ করে আর মাসের শেষে যাব তাব কাছে ধাব করে।

ওরা তাঁকে কৃপণ বলে বলুক, মৃগাঙ্কবাবু নিজেকে মিতব্যয়ী বলে জানেন। স্বাস্থ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি বিত্ত-প্রতিপত্তি অমিতাচারে কীই বা থাকে। দু দিনেই সব ছারখার হয়ে যায়। যে যাই বলুক এই পৃথিবীকে সংযত সঞ্চয়ী পুরুষরাই দীর্ঘকাল ধবে ভোগ করতে পারে।

নৃপেন হালদারের অভিজ্ঞতা অবশ্য আলাদা। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'আচ্ছা বলতো মৃগাঙ্ক, মেয়েরা সবচেয়ে কোন পুরুষকে পছন্দ করে ?'

মৃগাঙ্কবাবু বলেছিলেন, 'কী করে বলব বল। আমি তো অপর মেয়ের মন নিয়ে কারবার করিনে।'

হালদার হেসে বলেছিলেন, 'তা ঠিক। তুমি সংসাবে একটিমাত্র 'মকে চিনে রেখেছ। মক্কেল। কিন্তু ভাই আমিও মন নিয়ে কারবার করিনে। মন বলে যে কিছু আছে তা বিশ্বাস করিনে। আগাগোড়া ভিতর বাহির সব দেহ। আমি দেহাত্মবাদী। হাঁ যা বলছিলাম। পুরুষের কোন বস্তুকে মেয়েরা সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে বল তো ?'

'তুমিই বল।'

নৃপেন হালদাব বলেছিলেন 'রূপ স্বাস্থ্য বিদ্যা বুদ্ধি ? উঁহু ? বিত্ত খ্যাতি প্রতিপত্তি ? উঁহু। ওবা ভালোবাসে generosity, ঔদার্য। ওই স্বভাবকৃপণা সঙ্কীর্ণমনা নাবীজাত পুরুষেব উদারতাকে যত ভালোবাসে তত আব কিচ্ছু ভালোবাসে না।'

অন্য স্ত্রীলোক সম্বন্ধে মৃগাঙ্কবাবুব কোন অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু নিজেব স্ত্রীব বেলায দেখেছেন হালদাবেব কথাটা খানিকটা খাটে। নীলিমাবও অভিযোগ,'তুমি টাকা ছাড়া কিছু চেন না। তুমি কেবল নিজেকে ভালোবাসো, নিজেব টাকাকে।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'টাকা যদি ভালোবাসি সেও তোমাবই জন্যে। তুমি আমাব চেযে জুনিযব। আমাব চেযে কযেক বছব বেশি এই পৃথিবীতে থাকবে। তখন তোমাব টাকাব দবকাব হবে। তোমাকে যদি ধনবতী কবে বেখে যেতে পাবি তুমি হযতো জনবতীও হতে পাববে। অনেক যুবক তোমাব দাস হযে থাকবে।'

নীলিমা বলেছিলেন, 'বাম বাম। ওকথা বলতে তোমাব মুখে আটকালো না ? আমি যক্ষিণী হযে তোমাব টাকাব কাঁড়ি পাহাবা দেব তাই ভেবেছ বুঝি ? জানো টাকাব জন্যে মানুষ খুন হয ? টাকাব টানে আব কেউ আসুক না আসুক চোব ডাকাতবা এসে ঘাড মটকায ?'

মৃগাঙ্কবাবু জানেন তাঁব ঘাড খুব শক্ত। তা সহজে কেউ মটকাতে পাববে না। কোন কোম্পানীব কত শেযাব কিনেছেন কোন ব্যবসাযে কত টাকা খাটছে তা শুধু তিনিই জানেন। নীলিমাকে ওসব জানতে দেননি মৃগাঙ্কমোহন। মেযেদেব পেটে বাচ্চা তবু দশ মাস থাকে, কথা দশ মিনিটও থাকে না।

বিকেলেব দিকে এক কাণ্ড ঘটল। ঘুবে ঘুবে বাড়িব আশেপাশেব ফলন্ত আতা আব পেযাবা গাছগুলি দেখছিলেন মৃগাঙ্কবাবু। বড জংলা হযে আছে বাড়িটা। পবিষ্কাব কবতে হবে। ঢুকবাব পথে ডাইনে বাঁযে হলদে আব গোলাপী বঙেব মৌসুমী ফুল লাগিযেছে বনমালী। ওগুলিবও ডালপালা একটু ছেঁটে দেওযা দবকাব। গাছগুলি পথেব ওপব ট্রেসপাস কবছে

একটি অপবিচিত যুবক এসে বাড়িব সামনে দাঁড়াল।

মৃগাঙ্কবাবু এগিযে গিযে বললেন, 'কী চাই ?

যুবকটি বলল, 'বাড়ি ভাডা আছে ?

মৃগাঙ্কবাবু খুশি হযে বললেন, আছে। কখানা ঘবেব দবকাব ?'

যুবকটি বলল 'একখানা হলেই হবে। আমবা দুজন আব কোলে বাচ্চা আছে একটি। বেশি ঘবেব দবকাব নেই।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন 'তা অবশ্য ঠিক। তবে চেঞ্জে এসেছেন, একটু ছড়িযে ছিটিযে থাকতে পাবলেই তো ভালো। আমাব যে দুখানা ঘব খালি আছে তা জোড়া ঘব। একখানা নিলে আবো একখানা নিতে হয। দুখানা ঘবে দুটি ফ্যামিলিকে বাখবাব জো নেই। তাতে প্রাইভেসি থাকে না।'

যুবকটি বলল, 'বেশ। দুখানাই নেব। কত ভাডা ?'

মৃগাঙ্কবাবু হেসে বললেন, 'আগে দেখে পছন্দ করুন। তাবপবে তো ভাডা। আপনি দেখলেই হবে ? না মিসেসেবও দেখা দবকাব ?'

যুবকটি বলল, 'আমি দেখলেই হবে। ওকে ডাঃ বাগচীব ডিসপেনসাবিতে বসিযে বেখে এসেছি। তাঁব সঙ্গে আগে একটু জানাশোনা ছিল। তিনিই আপনাব বাড়িব খোঁজ দিলেন।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'হ্যাঁ, উনি আমাব বন্ধুলোক। চলুন, ঘবগুলি দেখবেন চলুন।'

ঘব দেখে যুবকটিব পছন্দ হল। পছন্দ না হবাব কিছু নেই। পুব-দক্ষিণে বড বড জানালা। পবিষ্কাব পবিচ্ছন্ন ঘব।

কিন্তু ভাডাব কথা শুনে সে একটু ভ্রূ কুঁচকালো।

'দুখানা ঘব ষাট টাকা ?'

মৃগাঙ্কবাবু সবিনযে বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমি ভেবেছিলাম একটু কম টম হবে।'

'আজ্ঞে না। আমি কমিয়েই বলেছি। এই চেঞ্জের সময় বাড়ি এখানে দুর্ঘট। অনেক চেঞ্জার এসেছে এবার। কয়েকমাস আগে থেকে যারা বুক করে রাখে তাদের কথা আলাদা। হঠাৎ এলে জায়গা পাওয়া শক্ত। আপনি নিজে বোধ হয় তা দেখেও এসেছেন।'

'না আমি তেমন একটা খুঁজিনি। দিন পনেরো থাকব। ভাড়াটা কি তার জন্যে কিছু—'

মৃগাঙ্কবাবু হেসে বললেন, 'আজ্ঞে না। আপনি দু সপ্তাহই থাকুন আর এক সপ্তাহই থাকুন ভাড়া ওই এক মাসেরই দিতে হবে। এখানে এই নিয়ম।'

যুবকটি বলল, 'বেশ। কিন্তু ঘরে তো দেখছি কোন ফার্নিচার টার্নিচার নেই।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'সে জন্যে ভাববেন না আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। আপনি নিয়ে আসুন ওঁদের। লাগেজ, টাগেজ বেশি আছে নাকি? লোক দেব সঙ্গে?'

যুবকটি বলল, 'না। লোকের দরকার নেই।'

সে বেরিয়ে গেলে নীলিমা স্বামীকে কাছে ডেকে বললেন, 'আবার কি হাঙ্গামা বাঁধাচ্ছ বলতো?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'হাঙ্গামা আবার কোথায় দেখলে?'

নীলিমা বললেন, 'এইসব ভাড়াটে টাড়াটে আবার কেন আনছ? এদের নিয়ে কলকাতার বাড়িতে তো সারা বছর উপসর্গ লেগেই আছে। এখানে কটা দিনের জন্যে জুড়োতে এসেছি। এখানেও তুমি. ভাড়াটে ভাড়াটে করে অস্থির।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'ঘরগুলি মিছিমিছি ফেলে রেখে কী হবে বল? এখানে এই বাড়িঘর সারাতেও তো খরচ আছে। তার এগেনসটে কটা টাকা যদি আসেই লাভ ছাড়া লোকসান তো নেই।'

একটু চুপ করে থেকে মৃগাঙ্কবাবু হাসলেন, 'তাছাড়া একা একা মুখ বুঁজে থাকবে। ওরা এলে তোমার কথা বলার লোক হবে।'

নীলিমা বললেন, 'কথা বলার জন্যে তো তুমিই আছ।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আমি? আমি তো এখন শুধু তোমার ঝগড়ার সাথী। আমরা এখন সবসময়েই দুজনে দু পক্ষের উকিল। আমি যদি আসামী পক্ষের তুমি ফরিয়াদী পক্ষের আর আমি যদি ফরিয়াদী পক্ষের তুমি আসামীর দলে।'

নীলিমা বললেন, 'দলাদলি না করলেই তো পার।'

মৃগাঙ্কবাবু ভাবেন তিনি কি আর সাধ করে দলাদলি করেন? ঝগড়াঝাটি বিরোধ বিসংবাদ তাঁরই কি ভালো লাগে? ছেলে নেই মেয়ে নেই পরস্পর পরস্পরের অবলম্বন। মৃগাঙ্কবাবুরও ইচ্ছা হয় স্ত্রীর সঙ্গে এক মতের এক পথের পথিক হতে। কিন্তু নীলিমা যেন তাঁর কিছুই ভালো দেখতে পান না। স্বামীর চরিত্রের কোন গুণই যেন তাঁর চোখে পড়ে না। মৃগাঙ্কবাবুর মনে হয় প্রেমের একটা বড় শর্ত পরস্পরের গুণ গ্রহণ এমন কি গুণকীর্তন। কিন্তু স্ত্রীর কণ্ঠে সেই প্রশংসার বাণী শুনতে পান না মৃগাঙ্কবাবু। স্ত্রীর চোখে মুগ্ধতার দৃষ্টি দেখতে পান না। দশজনে যা বলে নীলিমাও যেন কখনো সরবে কখনো নীরবে সেই কথারই প্রতিধ্বনি করেন, 'তুমি হার্ডকিপটে, তুমি স্বার্থপর। তুমি শুধু নিজেকেই ভালোবাসো।'

মৃগাঙ্কবাবুর বলতে ইচ্ছা, 'আর কাউকে না হোক, আমি অন্তত তোমাকে ভালোবাসি। তোমাকে আমি শাড়িগয়না প্রচুর দিয়েছি, এই বাড়িঘর বিষয় সম্পত্তি সব তোমার জন্যে। অভাব শুধু সন্তানের। সে কি আমিই দিতে পারিনি, না তুমিই নিতে পারনি তার শেষ বিচার এখনো হয়নি। ডাক্তাররা বলেছেন এ ব্যাপারে তুমিও নির্দোষ আমিও নির্দোষ। তোমার হয়তো মনে মনে সন্দেহ, যেহেতু ভিজিটের টাকাটা তারা আমার কাছ থেকে নিয়েছে, তারা আমার পক্ষ টেনেই কথা বলে। কিন্তু ব্যাপারটা তো তা নয়। বিজ্ঞান নিরপেক্ষ।'

খানিকবাদে ওরা এসে হাজির। স্বাস্থ্যবান যুবক। এক হাতে হ্যাজাক লণ্ঠন আর এক হাতে স্যুটকেস। পাশে পাশে ছিপছিপে সুশ্রী তরুণী স্ত্রী। কোলে শিশু পুত্র। পিছে বাক্স বিছানা মাথায় কুলী।

মৃগাঙ্কবাবু নিজেই এগিয়ে এলেন। কুলীর মাথা থেকে মাল নামাতে সাহায্য করলেন।

যুবকটি বলল, 'আহা, আপনি কেন অত কষ্ট করছেন ?'

মালপত্র নামানো হলে কুলীকে যুবকটি বিদায় করে দিতে যাচ্ছিল, মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'ওকে ছেড়ে দেবেন না। ফার্নিচার টানিচারগুলি আনতে হবে তো ?'

যুবকটি বলল, 'সেগুলি কোথায় ?'

'আমার স্টোর রুমে আছে।'

ভিতরের দিকের একখানা ঘরে খানকয়েক তক্তপোশ একটির পর একটি তোলা রয়েছে।

যুবকটি বলল, 'এই আপনার ফার্নিচার ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এর চেয়ে বেশি কী দরকার। ওইরকম তক্তপোশে শুয়ে আমি জীবনের পঁচিশ বছর কাটিয়ে দিয়েছি।'

দুখানা তক্তপোশ ধরাধরি করে এ ঘর থেকে ওঘরে নেওয়া হল। মালী খানিকটা সাহায্য করল। কুলীকে বিদায় করে দিলে যুবক। বাড়তি কাজের জন্য সে আরো চার আনা বেশি চায়। মৃগাঙ্কবাবু তাকে কড়া ধমক দিলেন। তারপর যুবকটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দশটা নয়া পয়সা দিয়ে দিন।'

একটু বাদে নিজের ঘরে গিয়ে রেভেনিয়ু স্ট্যাম্প লাগানো একখানা সাদা কাগজ নিয়ে এসে একটু হেসে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না। ট্রানজাকসনটা এখনই হয়ে যাওয়া ভালো। আমি তাই করে থাকি।'

যুবকটি ব্যাগ থেকে ষাটটি টাকা বের করে তাঁর হাতে দিল।

মৃগাঙ্কবাবু একটু হেসে বললেন, 'ইয়ে, আপনার নামটা যেন কী ?'

'সলিল দত্ত।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আপনার যে আরো ছটি টাকা লাগবে সলিলবাবু।'

'আরো ছ টাকা ? কেন বলুন তো ?'

মৃগাঙ্কবাবু হাসি মুখেই বললেন, 'ওই তক্তপোশের জন্যে। প্রতি তক্তপোশ তিন টাকা করে ধরেছি।'

সলিল বিশালাক্ষ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর হেসে বলল 'আপনি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছেন।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'এর মধ্যে ঠাট্টার তো কিছু নেই। ইচ্ছা করলে তক্তপোশ দুখানা অমনিতেই আপনাকে আমি ব্যবহার করতে দিতে পারি। কিন্তু আপনিই বা অনর্থক আমার ফেভার নিতে যাবেন কেন ? আমিই বা আপনাকে কেন অবলিগেশনে বেঁধে রাখব ? এখানে কাঠ পাওয়া যায় না বহু দূর থেকে কাঠ আনাতে হয়েছে। মিস্ত্রীর মজুরী দারুণ চড়া। কোন জিনিসটা সংসারে বিনা পয়সায় হয় মশাই ?'

সলিল বলল, 'তাতো বটেই।' তারপর ভিতরের দিকে মুখ বাড়িয়ে ডাকল, 'বীণা! বীণা! আমার কাছে খুচরো টাকা নেই। তুমি ছ'টা টাকা বের করে দাও তো ?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'এখন না থাকে থাক না। পরেই দেবেন না হয়।'

সলিল বলল 'না না। এখনই নিয়ে যান।'

বীণা এসে টাকাটা সলিলের হাতে দিল। সলিল দিল মৃগাঙ্কবাবুর হাতে। তিনি দশ টাকার নোটগুলি যেমন গুণে নিয়েছিলেন এক টাকার নোট কখানাও তেমনি গুণে নিলেন। তারপর দীর্ঘাঙ্গী তরুণী বধূটির দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'ঘর পছন্দ হয়েছে তো ?'

বীণা হেসে বলল, 'হ্যাঁ।'

দীর্ঘাঙ্গী ফর্সা মেয়েটিকে দেখলেই বোঝা যায় অল্প দিন বিয়ে হয়েছে। এরই মধ্যে ছেলের মাও হয়েছে। আজকালকার ছেলেমেয়েরা এত তাড়াতাড়ি বাপ মা হতে চায় না। ভাবলেন মৃগাঙ্কবাবু। সেদিক থেকে এরা একটু সেকেলে।

ঘরে ঢুকতেই স্ত্রীর সামনে পড়ে গেলেন মৃগাঙ্কমোহন।

নীলিমা বললেন, 'আচ্ছা তুমি কী ?'

মৃগাঙ্কবাবু বিস্মিত হযে বললেন, 'কেন, কী হযেছে ?'

'তুমি আবাব ওদেব কাছ থেকে তক্তপোশেব ভাডাটাও নিলে ?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তাতে কী হযেছে বলতো ? তক্তপোশেব ভাডা কি ভাডাটেদেব কাছ থেকে আমি এই প্রথম নিচ্ছি ? প্রতি বছবই তো নিযে থাকি।'

নীলিমা বললেন, 'এবাব না নিলেই পাবতে। ওই বাচ্চা বাচ্চা দুটি ছেলেমেযে—'

মৃগাঙ্কবাবু হাসলেন, 'বাৎসল্যে একেবাবে টইটুম্বুব। এখন আবাব ওবা বাচ্চা কিসেব ? ওদেব নিজেদেবই তো বাচ্চা হযে গেছে।'

নীলিমা বললেন, 'হলেই বা। আমাদেব ছেলেমেযে হলে ওই বযসীই তো হত। ওই কটা টাকা তুমি ছেডে দিলেই পাবতে।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তা পাবতাম না। পাবলেই বা তা বলব কেন ? দযা কবব অন্ধ-আতুবকে। শক্ত সমর্থ জোযান পুরুষেব সঙ্গে পুরুষেব মত ব্যবহাব কবলেই তাকে সবচেযে বড সম্মান দেখান হয তা জানো ?'

নীলিমা আব কোন কথা বললেন না। কিন্তু তাঁব তাকাবাব ভঙ্গি দেখে মনে হল তিনি স্বামীব যুক্তি মেনে নেননি।

পবদিন থেকে বাডি মেবামতেব কাজে লেগে গেলেন মৃগাঙ্কবাবু। লোকজন মিস্ত্রী খাটানোয তাঁব ভাবি আনন্দ। তিনি তাদেব সামনে বসে থেকে কাজ দেখেন। পাশে পাশে ঘুবে ঘুবে তাদেব দিযে কাজ কবান। দবকাব হলে নিজে হাত লাগিযে তাদেব উৎসাহ দেন চুবি কবাটা সাধাবণ মানুষেব স্বভাব। কাবো লোভ টাকাপযসাব দিকে। কেউ চুবি কবে কাজ, কেউ চুবি কবে সময। সবই অর্থেব নামান্তব কি রূপান্তব। এই অর্থেব লোভ কাব না আছে ? মৃগাঙ্কবাবু ভাবেন, লোভী কি শুধু তিনিই ? কেউ দু' হাতে জমিযে সুখ পায, কেউ অপবিণামদর্শীব মত দু' হাতে খবচ কবে সুখ পায। আসলে যে যা কবে নিজেব জন্যেই কবে। শুধু নিজেব পঞ্চেন্দ্রিযেব তৃপ্তিব জন্যে। নিজেব গণ্ডীব বাইবে কেই বা যেতে পেবেছে ? স্বার্থপব সবাই। তবু মানুষ কাথাটাকে গালাগাল হিসাবে ব্যবহাব কবে। আব একজনেব মুখ থেকে কথাটা শুনলে কান জ্বালা কবে। মনে বাগ হয দুঃখ হয। সবচেযে ভালো অবিচল থাকা। যে তোমাকে স্বার্থপব বলছে তাব জন্যে কথা খবচ না কবে শুধু মৃদু হাস্যে বুঝিযে দেওযা 'তুমিও তাই।

ভোববেলায বেডিযে এসে বাবান্দায চেযাবখানা পেতে চা খাচ্ছিলেন মৃগাঙ্কবাবু, হঠাৎ তাঁব চোখে পডল ইঁদাবা থেকে সলিল জল তুলছে। তুলছে তুলুক। জল না তুললে খাবে কি ? মুখ ধোবে কী দিযে ?

কিন্তু মৃগাঙ্কবাবুব বালতিতে কেন ? একটা বালতিও কি ওব জোটেনি ?

চাযেব কাপ শেষ কবে উঠোনে নেমে ইঁদাবাব কাছে এগিযে গেলেন।

'এই যে সলিলবাবু ? জল তুলছেন বুঝি ?'

'হ্যাঁ মৃগাঙ্কবাবু। আপনাব ইঁদাবাটা খুব ভালো। বেশ জল আছে।'

মৃগাঙ্কবাবু মনে মনে হাসলেন। ছোকবা ভেবেছে এতেই তিনি জল হযে যাবেন।

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'খুব খবচপত্র কবে কবিযেছিলাম। আশেপাশে আব কাবো বাডিতে এত গভীব ইঁদাবা আব পাবেন না। কিন্তু একটা কথা। আপনাব নিজেব দডি বালতি কি নেই ?'

সলিল বলল 'বালতি আছে। কিন্তু দডি নেই।

মৃগাঙ্কবাবু হেসে বললেন 'দডিব জন্যে ভাববেন না। আমি সে ব্যবস্থা কবে দেব। বাজাবে আমাব চেনা দোকান আছে। আপনি সেখান থেকে দডি কিনে নিযে আসবেন। আমাব নাম কবলে একটু সস্তাতেই পাবেন। যদি নিজেব যেতে ইচ্ছা না হয আমাব লোক আছে। দডি আপনাকে এনে দেবে।'

সলিল বলল, 'বেশ তো। দডি-বালতিব ব্যবস্থা কবা যাবে। আমি ভেবেছিলাম ক'টা দিনই তো আছি। তাব জন্যে আবাব আলাদা হাঙ্গামা কবব ! তাব চেযে দডি-বালতিব জন্যে আপনাকে কিছু চার্জ ধবে দিলেই হবে।'

মৃগাঙ্কবাবু হঠাৎ কোন কথা বলতে পারলেন না। ক্রুদ্ধ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। সেই দৃষ্টি সহ্য করবার ক্ষমতা কি ওই ছোঁড়ার আছে ? সে চোরের মত জলের বালতি হাতে তাঁর চোখের সামনে থেকে সরে গেল।

তবু মৃগাঙ্কবাবুর আক্রোশ সঙ্গে সঙ্গে গেল না। তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, 'জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে লড়াই ? মৃগাঙ্ক মল্লিককে তুমি চেন না। আজকালকার ভাড়াটেরা ঘাড় বাঁকিয়ে বুক ফুলিয়ে চলে। তাদের উচ্ছেদ করা শক্ত। তবু আমার কলকাতার বাড়ির পাঁচ ঘর ভাড়াটে আমার ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে। আমি কারো বে-আদবি মাফ করিনে। আমাকে চটিয়ে কেউ আমার বাড়িতে বাস করতে পারে না। আদালতের রায় যার পক্ষেই যাক শেষ পর্যন্ত বেযাড়া ভাড়াটে উঠে যেতে বাধ্য হয়। কত রুই-কাতলা দেখলাম তুমি তো চুনোপুঁটি।'

দুপুরের আগেই অবশ্য সলিল আলাদা দড়ি-বালতি নিয়ে এল। দেখে মৃগাঙ্কবাবু খুশি হলেন। মুখে যত ফটফট করুক আসলে তাঁকে ভয় করে। তার কথা অমান্য করবার সাহস ছোঁড়ার নেই।

কিন্তু মানুষের সব দিন তো সমান যায়ই না একদিনেরই বিভিন্ন প্রহর বিভিন্নভাবে কাটে।

দুপুরবেলায় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মৃগাঙ্কবাবু। কোর্ট খোলা থাকলে ঘুমের কোন কথাই ওঠে না। কিন্তু ছুটির দিনে খাওয়া দাওয়ার পরে কেমন যেন ঝিমুনি আসে। খানিকক্ষণ গড়িয়েও নেন।

আজ ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনের আতাগাছগুলির দিকে তাকাতেই তাঁর বুকের ভিতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। বড় বড় আতাগুলির একটিও নেই। সবগুলি গাছ কে যেন নির্মূল করে নিয়ে গেছে। মূল অবশ্য ঠিকই আছে, কিন্তু ডালপালাগুলি ক্ষতবিক্ষত। আর ফলের মধ্যে যেগুলি নিতান্তই কচি শুধু সেইগুলিই রক্ষা পেয়েছে। পাকাগুলি তো গেছেই ডাসাগুলি পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন।

মালী আছে লোকজন আছে তা সত্ত্বেও কীভাবে চোর যে এই সর্বনাশ করে গেল মৃগাঙ্কবাবু তা বুঝতে পারলেন না।

চোখের সামনে মালীকে দেখতে পেলেন না। ঘরে গিয়ে স্ত্রীর সামনে দাঁড়ালেন। তিনি বই পড়ছিলেন। হয়তো ধর্মগ্রন্থ হয়তো ভ্রমণকাহিনী, হয়তো নাটক-নভেল। স্ত্রীর পড়াশুনো সম্বন্ধে মৃগাঙ্কবাবুর বিশেষ কোন কৌতূহল নেই। বরং এক ধরনের বিরাগ বিরক্তি আছে। মৃগাঙ্কবাবুর মনে হয় ধর্ম আর সাহিত্য নীলিমাকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। নীলিমা আজকাল আর বাপের বাড়ি যান না, কিন্তু যখন তখন পূজোর ঘরে গিয়ে পালিয়ে থাকেন, যে কোন বই খুলে তার মধ্যে মুখ গুজে পড়ে থাকেন।

মৃগাঙ্কবাবুর মনে হয় বেশ এক মজার পালাবার জায়গা নিজের জন্যে খুজে নিয়েছেন নীলিমা। যখন তখন সেখানে গিয়ে আশ্রয় নেন। একই ছাদের নীচে থেকেও তিনি যেন আলাদা জগতে বাস করেন। অথচ এই স্ত্রীই তাঁকে মাঝে মাঝে খোঁটা দেন, তুমি আছো তোমার শামুকের খোলের মধ্যে।'

মৃগাঙ্কবাবুর মনে হয়, 'আমি যদি শামুকের খোলের মধ্যে থাকি তুমিও তো তাই। আমরা সবাই এক একটি শামুক। একই পুকুরের মধ্যে থাকি। কিন্তু কারো ছোঁয়া কারো গায়ে লাগে না। সব শক্ত চাড়ায় ঢেকে যায়।'

উঁচু গলায় স্ত্রীর ধ্যানভঙ্গ করলেন মৃগাঙ্কবাবু, 'খুব তো বই পড়ছ ? এদিকে কী হয়ে গেছে জানো ?'

নীলিমা বই থেকে চোখ তুললেন। তাঁর পরনে লালপেড়ে সাদা খোলের শাড়ি। মাথায় আঁচল নেই। পিঠ ভরে কালো চুলের রাশ ছড়ানো। যেন জগদ্ধাত্রী হয়ে বসে আছেন।

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আতা গাছে একটিও আতা নেই।'

নীলিমা হেসে বললেন, 'আছে গো আছে। সে জন্যে তোমার পৃথিবী আঁধার দেখতে হবে না। ওই দেখ।'

খাটের তলাটা দেখিয়ে দিলেন নীলিমা। মৃগাঙ্কবাবু উপুড় হয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখলেন সত্যি খাটের তলায় কতকগুলি আতা আছে। কিন্তু বড়গুলি কোথায় ? পাকাগুলি কোথায় ?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'এই কি সব ?'

নীলিমা বললেন, 'সব কেন হবে ? কতকগুলি সলিল নিয়ে গেছে। ওই তো পেড়েছিল।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'তা বুঝেছি।'

নীলিমা বললেন, 'আর ওর এক বন্ধুও এসেছিল। সেও কিছু খেয়ে গেছে।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'বেশ করেছ, আর কাউকে ডেকে আনতে পারল না ? নিজে পায় না শঙ্করাকে ডাকে। পরের ধনে পোদ্দারী।'

নীলিমা একটুকাল স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর হেসে বললেন, 'শোন। তোমাকে একটা কথা বলি ? বসো এখানে।'

মৃগাঙ্কবাবু পরম অনুগতের মত স্ত্রীর পাশে বসে পড়লেন। বললেন, 'হুকুম হয়েছে ? কানে মন্ত্র দেবে ?'

নীলিমা বললেন, 'তা আর দিতে পারলাম কই ? শোন, এই যে জিনিস-জিনিস কর, জিনিস কি সঙ্গে যাবে ?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'এই যে মানুষ মানুষ কর মানুষই কি তোমার সঙ্গে যাবে ? কিছুই সঙ্গে যায় না, বস্তুও না মানুষও না। তার ঈর্ষা দ্বেষ, ঘৃণা ভালোবাসা কিছু না। তবু এই সংসারে যে যতদিন থাকে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু নিয়ে জড়িয়ে থাকে। কেউ মানুষ ভালোবাসে কেউ জিনিসপত্র ভালোবাসে। কেউ বা মদ তাস রেসেই জীবন কাটিয়ে দেয়। তাও দেখেছি।'

একটু চুপ করে রইলেন মৃগাঙ্কবাবু। তারপর হঠাৎ বললেন, 'কিন্তু মানুষের চেয়ে জিনিসপত্তর ভালোবাসা অনেক ভালো। তা জানো ?'

'কেন বলতো ?'

'এই আমার এই টেবিল চেয়ার খাট আলমারি আমি যতদিন থাকব ওরাও ততদিন থাকবে। ওরা কেউ ঘর ছেড়ে চলে যাবে না। কি ঘরের মধ্যে থেকেও ভিতরে ভিতরে বদলে যাবে না। ওই যে আমাদের নৃপেন হালদার, ও কি জীবনে কম মেয়েমানুষ ভালোবেসেছে ? কিন্তু একজনকেও কি রাখতে পারল ?'

নীলিমা বললেন, 'সেই কথা ? জিজ্ঞেস করে দেখ, তিনিও তাদের মানুষজ্ঞানে ভালোবেসেছেন কি না।'

মৃগাঙ্কবাবু উঠে পড়লেন। মনে মনে ভাবলেন, যত নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই হোক, থাকে না, কিছুই থাকে না। একমাত্র বস্তুই থাকে। যে সব বস্তু বেশিদিন থাকে না তারাও যতদিন থাকে পরম আপন হয়ে থাকে। গায়ের জামাটা গায়ের সঙ্গে লেপটে থাকে। হাতের ঘড়িটা হাতের সঙ্গে বাঁধা। যে কোন বিবাহবন্ধনের চেয়ে এ বন্ধন দৃঢ়তর। যে কোন বন্ধুত্বের বন্ধনের চেয়ে টেকসই।

ভালোবাসায় বিশ্বাস করেন না মৃগাঙ্কবাবু। মানুষের ভালোবাসায় কোন আসক্তি বোধ করেন না। কত ভালোবাসার কাঙালকেই না তিনি এই জীবনে দেখলেন। নৃপেন হালদার তো স্পষ্ট স্বীকারোক্তি দেয়, ভাই তুমি বেশ আছো। আমি একদিন যদি কোন মেয়ের মুখমদের ছিটা না পাই মনে হয় প্রাণ ওষ্ঠাগত হল। জল তেষ্টায় মরুভূমির মধ্যে শুকিয়ে মারা গেলাম।

আবার অন্যরকমের আসক্তিও দেখেছেন মৃগাঙ্কবাবু। সমবয়সীদের মধ্যে কতজনে যে সঙ্গ সঙ্গ করে পাগল তার আর ঠিক নেই। তাদের নারীপুরুষ ভেদ নেই ছেলেবুড়ো জ্ঞান নেই একজন কাউকে চাই ই চাই। এরই নাম সঙ্গের নেশা। মধুর অভাবে গুড়, সিগারেটের অভাবে বিড়ি, মদের অভাবে তাড়ি। সমবয়সীদের মধ্যে অনেককেই দেখেছেন মৃগাঙ্কবাবু, সঙ্গের অভাবে কষ্ট পায়। তারা পরিবারের মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ, ইয়ার বন্ধুদের মধ্যে থেকেও নির্বান্ধব। তাদের তিনি পরামর্শ দেন, 'তোমরা আর একটু বিষয়ী হও। সবাই যে বাড়িগাড়ি করবে তার কোন কথা নেই। সবাই তা পারেও না। যার যেটুকু সাধ্য সেটুকু কর। নিজের কাজকে ভালোবাসো। পেশাকে ভালোবাসো। সেই ভালোবাসা যেন পোশাকী ভালোবাসা না হয়। সংসারে যে যত নিষ্কর্মা সে তত নিঃসঙ্গ।'

মানুষের ভালবাসায় বিশ্বাস করেন না মৃগাঙ্কবাবু কিন্তু চোখের সামনে একটি ভালোবাসার মূর্তিকে ক'দিন ধরে রোজই দেখতে পান। হ্যাঁ লোকে একে ভালোবাসাই বলে। স্বামী প্রেম, সন্তানবাৎসল্য, বন্ধুপ্রীতি। বউটি এক সঙ্গে সবই চালিয়ে যাচ্ছে। প্রায় রোজই ওরা ঘুরতে বেরোয়। আজ দেওঘর

কাল শিমুলতলা, পরশু মধুপুর। যেদিন কোথাও যায় না, মৃগাঙ্কবাবুর এই বাড়ির মধ্যেই ওরা ঘুর ঘুর করে। যেন এই বাড়িটাকেই ওরা মধুপুর করে তুলেছে। শুধু কি বাড়ি ? পুরো দুনিয়াটাই যেন ওদের কাছে তাই। মধুপুর। মাঝে মাঝে একটু বিস্মিত হন মৃগাঙ্কবাবু। কখনো কখনো একটু ঈর্ষার উদ্রেকও হয়। পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ওরা কোন এমন মধু খুঁজে পেয়েছে ওরাই জানে। নিজে কি এই মধুর স্বাদ কখনো জীবনে পাননি ? পিছনের দিকে তাকান মৃগাঙ্কবাবু। বেশি দূর দেখতে পান না। সমস্ত যৌবনস্মৃতি যেন এরই মধ্যে ঝাপসা হয়ে গেছে। পেসকার নন্দ বাঁড়ুয্যে বলে ভালো। মৃগাঙ্কবাবুরই সমবয়সী। এক সময় সহপাঠীও ছিল। নন্দ বলে, 'মল্লিক করে যে গরম ভাতে ঘি খেয়েছিলাম তার গন্ধ কি আর আঙুলে লেগে আছে ? বাকি জীবনটা পান্তাপরশুতি খেয়েই কাটল।'

যৌবন কি সেই গরম ভাতে ঘি ? বড় ক্ষণস্থায়ী বড় ক্ষীণায়ু। সেইজন্যেই কি ওই সলিল আর বীণা আকুলভাবে সমুদ্র পান করতে চায় ?

বীণা মৃগাঙ্কবাবুরই বারান্দা দিয়ে হাঁটে আর কোলের ছেলেকে পিঠ চাপড়ে ঘুমপাড়ায় আর গুনগুন করে মৃগাঙ্কবাবু মিস্ত্রী খাটাতে খাটাতে কি বাগানের ঘাস পরিষ্কার করতে করতে সেই গান শোনেন। তখন কে বলবে ওই বীণা গোপাল-জননী যশোদা ছাড়া আর কেউ ?

কিন্তু খানিকবাদেই ওর বেশ বদলে যায়। স্বামীর সঙ্গে কী ফষ্টিনষ্টিই না করে মেয়েটা। ঘরের মধ্যেও করে। ঘরের বাইরেও করে। মৃগাঙ্কবাবুর মত ষাট বছরের একজন বয়স্ক লোক এই বাড়িতেই আছেন তা যেন ওরা গ্রাহ্যও করে না। দু'খানা মাত্র ঘর ওরা ভাড়া নিয়েছে। কিন্তু ওদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় মৃগাঙ্কবাবুর পুরো বাড়িটাই ওদের বাগানবাড়ি, প্রমোদকুঞ্জ। যুবকটি উৎসাহে আহ্লাদে যেন একেবারে খোকা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে মৃগাঙ্কবাবুর পেয়ারাগাছে ওঠে। ডালপালা ভেঙে একশেষ করে। মৃগাঙ্কবাবু মনে মনে কামনা করেন ওর হাত পাও ভাঙুক। অন্তত ছ' মাস যেন শয্যাশায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু তেমন কোন দুর্ঘটনা ঘটতে দেখা যায় না। আর বউটা যেন এক বনহরিণী। পিঠে বেণী দুলিয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে কখনো স্বামীর পিছনে ছুটছে, কখনো স্বামীকে পিছনে পিছনে ছোটাচ্ছে। আতা নিয়ে পেয়ারা নিয়ে কাড়াকাড়ি। একদিন তো চোখে পড়ল একজনের মুখের ফল আর একজন কামড়ে কেড়ে নিচ্ছে।

ওদের একজন বন্ধুও আছে। তাকেও মাঝে মাঝে দেখেন মৃগাঙ্কবাবু। রোগা পিছছিপে চেহারা ভারি ধূর্ত। তার সঙ্গেও বউটির খুব ভাব। পঙ্কজ না কী যেন একটা নাম। ছেনালিপনাটা তাঁর সঙ্গে যেন আরো বেশি। ছুটোছুটি লুটোপুটি হাসাহাসি সবই চলে। আইনসঙ্গত ওদের ওই প্রেম যদি বা সওয়া যায়, বেআইনী পীরিত দুঃসহ লাগে মৃগাঙ্কবাবুর।

একদিন ওই পঙ্কজের সঙ্গেই এক চোট হয়ে গেল তাঁর। ইদারা থেকে জল তুলছে তো তুলছেই। কয়েক বালতি জল বন্ধু পত্নীর গায়ে ঢেলে দিয়েছে। সেই জলকেলির পরও কেলি শেষ হয়নি। ছোকরা আরো জল তুলছে।

মৃগাঙ্কবাবু গিয়ে সামনে দাঁড়ালেন, 'অত জল দিয়ে কী হবে ?'

পঙ্কজ গম্ভীরভাবে বলল, চান করব।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'চান করতে কত জল লাগে ?'

পঙ্কজ বলল, 'সবাইর সমান লাগে না। কারো কারো এক বালতিতেই হয়।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'আর কারো কারো বুঝি একশ বালতির দরকার ? এখানে ওসব চলবে না।'

পঙ্কজ আরো দু এক বালতি জল তুলে স্নান সেরে চলে গেল।

মৃগাঙ্কবাবু গেলেন পিছনে পিছনে। ভাবলেন সলিলকে বলে দেবেন কথাটা। সে যেন তার বন্ধুকে সামলায়। কিন্তু খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখলেন দুই বন্ধুর মধ্যে হাসাহাসি হচ্ছে।

পঙ্কজ বলল, 'যাই বলো লোকটিকে দেখে ফেলো ফীলিং হয় না, হয় বাফেলো ফীলিং।'

সলিল ইশারায় মৃগাঙ্কবাবুকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'চুপ চুপ।'

বাফেলো ? দাঁতে দাঁত ঘষলেন মৃগাঙ্কবাবু। এই মুহূর্তে সত্যিই তাঁর বুনো মোষ হয়ে যেতে ইচ্ছা করছে। বেরোক দুটো ধারালো শিং তাঁর মাথা ফুঁড়ে। সেই শিং দিয়ে ওই দুই বন্ধুর পেট চিরে

ওদেব নাডিভুঁডি তিনি বেব কবে আনবেন।

মৃগাঙ্কবাবুব সঙ্গে তাঁব পনেব দিনেব ভাডাটেব এই সম্পর্ক, কিন্তু তাঁব স্ত্রীর সঙ্গে আত্মীযতাব অন্ত নেই। বীণা মাংস বেঁধে মাসীমাকে দেয, মাসীমা মাছ বেঁধে বীণাকে সবান্ধবে খাওযান। মাঝে মাঝে ওদেব তবকাবি মৃগাঙ্কবাবুব পাতেও পডে।

মৃগাঙ্কবাবু বলেন, 'এ আবাব কী?'

'মুডিঘণ্ট। খেযে দেখ। বীণা বেঁধেছে।'

'উঁহু। ওসব আমাকে দিযো না।'

'আহা খাও না। মেযেটা বাঁধে ভালো।'

সেদিন নীলিমা সলিলেব ছেলেকে কোলে নিযে এসে দাঁডালেন।

'কী সুন্দব ছেলে হযেছে দেখেছ?'

তুমিই দেখ সব শিশুই আমাব কাছে সমান মাংসপিণ্ড।'

নীলিমা বলেন 'ও মা ও কী কথা। বযসকালে ছেলেমেযে হলে এই বযসী নাতিনাতনী হত আমাদেব। কিন্তু ভগবান মন বুঝেই ধন দেন। তুমি ছেলেপুলে ভালোবাসো না, মানুষজন ভালোবাসো না। কেবল টাকা টাকা টাকা এত টাকা তোমাব খাবে কে?'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন কেন আমি খাব?

'তুমি একাই বুঝি একশ?

মৃগাঙ্কবাবু বললেন একশ কি বলছ? আমি একা এক অক্ষৌহিনী

এবাব যাওযাব পালা। সলিলবা নাকি চলে যাবে মৃগাঙ্কবাবু বোজই শোনেন ওবা আজ যাবে কাল যাবে কিন্তু কেবল যাই যাই কবে। যায আব না মৃগাঙ্কবাবু বুঝতে পেবেছেন ওবা পুবো একটি ক্যালেণ্ডাব মাস্ত এখানে থেকে তবে যাবে ভাডা উশুল কবে তবে নডবে। তাব আগে এক পাও বাডাবে না

এব মধ্যে আবো একটি কাণ্ড ঘটল মৃগাঙ্কবাবু দেখতে পেলেন তাঁব ফুলগাছগুলিব অনেক ফুলই নেই। মাঝে মাঝে বীণা শখ কবে একটি দুটি ফুল খোঁপায পবে, কি বিনুনিতে দেয। কিন্তু বাগান সুদ্ধ উজাড কববাব অধিকাব ওদেব কে দিল?

মৃগাঙ্কবাবু ওদেব ঘবেব সামনে গিযে দাঁডালেন। যা ভেবেছেন তাই। ওদেব ফুলদানিতে ফুল, বিছানায ফুল, বীণাব খোঁপায বড একটি গোলাপ জ্বলজ্বল কবছে।

সেই বক্তগোলাপ দেখে বক্তচক্ষু হলেন মৃগাঙ্কবাবু। কিন্তু কথা বললেন হেসে। 'আজ কি তোমাদেব ফুলশয্যাব অ্যানিভাবসাবি নাকি বীণা?

বীণা একবাব মৃগাঙ্কবাবুব দিকে চোখ তুলে তাকাল। তাবপব চোখ নামিযে নিযে বলল 'না।

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, বাগান উজাড কবে ঘবে নিযে এসেছ? কুঁডিগুলিও কি ছিঁডতে হয?'

বীণা বলল, 'কুঁডি ওব মধ্যে একটিও নেই মেসোমশাই। সবই ফোটা

মৃগাঙ্কবাবু বেডাতে চলে গেলেন। ভাবলেন কার্তিক মাসে তো বিযে টিযে হয না। নিশ্চয বিবাহ-বার্ষিকীব তাবিখও পডতে পাবে না তবু আজ ওদেব এমন ফুল উৎসব কিসেব? কে জানে আজ হযতো ওদেব প্রথম সাক্ষাৎ বার্ষিকী, নীলিমাব কাছে শুনেছেন ওবা নাকি ভালোবেসে বিযে কবেছে।

অবশ্য ওই ভালোবাসায বিশ্বাস নেই মৃগাঙ্কবাবুব। প্রেমজ বিবাহ সত্ত্বেও কত বিবাহ-বিচ্ছেদেব মামলা তাঁব হাতে এসেছে। যাবা মামলা কবে না তাদেবও কতজনেব খবব জানেন মৃগাঙ্কবাবু। সবাই তো আব এই নিযে আইন আদালত কবে না। একই ঘবেব মধ্যে বিচ্ছিন্ন হযে বাস কবে।

ভালোবাসা। কথাটা প্রায উচ্চাবিত হতে শোনেন বটে মৃগাঙ্কবাবু। নিজেব চেযেও মানুষ নাকি অন্যকে বেশি ভালোবাসতে পাবে। অসম্ভব, অসম্ভব। যতক্ষণ মানুষেব স্বতন্ত্র দেহ আছে, ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ আছে ততক্ষণ অন্য কাউকে ভালোবাসা অন্য কাবো জন্যে ত্যাগ কবা তাঁব পক্ষে অসম্ভব। সেই ত্যাগ ধোপে টেঁকে না। সেই ভালোবাসা দু একবাব ধোপা বাডি থেকে এলেই ফেঁসে যায। এ এক আশ্চর্য স্ববিরোধ। তোমাব দাঁতে ব্যথা হচ্ছে তুমিই কষ্টে ছটফট কববে, তোমাব চোখে

কুটো পড়লে তুমিই জগৎ সংসাব অন্ধকাব দেখবে। তোমাব শবীবেবই হোক মনেবই হোক যে কোন কষ্ট শুধু তোমাবই কষ্ট, কিন্তু এই দেহগত সুখ তুমি যদি একা ভোগ কবতে যাও লোকে তোমাকে বলবে স্বার্থপব। একমাত্র দেহত্যাগেব পবই স্বার্থত্যাগ সম্ভব। একমাত্র বায়ুভূত হতে পাবলেই মহাকাশেব সঙ্গে আব মহামানবেব সঙ্গে মিলিত হওয়া যায়।

ঘুবে ঘুবে সন্ধ্যাব পব নিজেব ঘবে এসে ঢোকেন মৃগাঙ্কবাবু। নীলিমা যথাবীতি সন্ধ্যাপূজায় বসেছেন। এই এক ঈশ্বব। সর্বগ্রাসী ঈশ্বব নীলিমাকে পেয়ে বসেছে। মৃগাঙ্কবাবুব যদি সাধ্য থাকত অ্যাডালট্রিব মামলা আনতেন ওই ব্যভিচাবীব বিরুদ্ধে।

ছোট টেবিলখানাব ওপব হ্যাবিকেন লণ্ঠনটি জ্বলছে। এই শহবেব কোন কোন বাড়িতে ইলেকট্রিক লাইট এসেছে। মৃগাঙ্কবাবু ইচ্ছা কবেই অত খবচেব মধ্যে যাননি। নিজে তো এখানে এসে বছবে একমাসেব বেশি থাকেন না। কী দবকাব ওই অপচয়ে।

সাবা বাড়িতে একখানা মাত্রই চেয়াব বেখেছেন। নিজে বসেন। যাবা দেখা সাক্ষাৎ কবতে আসে তাদেব সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বলেন মৃগাঙ্কবাবু। বসতে বললেই শুতে চাইবে। অন্তত এক কাপ চা না খেয়ে উঠতে চাইবে না।

টেবিলেব দিকে এগিয়ে যেতেই থমকে গেলেন মৃগাঙ্কবাবু। তাঁব ছোট্ট টেবিলখানি ফুলে আব ফলে ভবতি। এ সব কে দিল? মামলা জিতিয়ে দিয়ে শাঁসালো মক্কেলেব কাছ থেকে কোন কোন সময় দামী উপহাব নিয়েছেন মৃগাঙ্কবাবু। এসব ফুলফল শাকসব্জীব মত পেবিশেবল গুডসে তাঁব কোন লোভ নেই।'

'এসব কে দিল?'

স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কবেলন মৃগাঙ্কবাবু।

নীলিমা বললেন, 'কেন বিবক্ত কবছ? এসব তোমাব গাছেব ফুল তোমাব বাগানেব ফল। বীণাবা সব ফেবত দিয়ে গেছে।

মৃগাঙ্কবাবু একটুকাল স্তব্ধ হয়ে বইলেন তাবপব স্ত্রীব দিকে তাকিয়ে বললেন খুবতো সাফাই গাইছ। চোবাই মাল ফেবত দিলেই বুঝি আইন ক্ষমা কবে? তাব চোখে নির্দোষ হওয়া যায়?'

নীলিমা একথাব কোন জবাব দিলেন না।

মৃগাঙ্কবাবু ঘব থেকে বেবিয়ে এলেন। পাশে বীণাদেব ঘবে গান বাজনা হচ্ছে। নিতাই বসে ওদেব গানেব আসব প্রতিপত্রবতীব সঙ্গে বন্ধুটিও থাকে।

তোমাব ঘবে বাতি তোমাব ঘবে সাথী', কোথায় যেন শুনেছিলেন গানটা তিনি ঠিক মনে কবতে পাবেন না।

মৃগাঙ্কবাবু পাশ কাটিয়ে বাইবে এসে বসলেন। বাড়িব বাইবেব বোয়াকে। দিনেব বেলায় এই বোয়াকে বসেই তিনি দু'একজন প্রতিবেশীব সঙ্গে গল্প কবেন। তাঁবাও চেঙ্গাব। বেশিব ভাগই আধবয়সী কি বুড়ো বয়সী। ছেলেছোকবাবা বড় বেশি তাঁব কাছে ঘেঁষে না। আব মেয়েদেব সঙ্গে কথা বলতে তিনি নিজেই অস্বস্তি বোধ কবেন। কোর্টে মুখে তুবড়ি ছোটে মৃগাঙ্কবাবুব। জেবায় সওয়াল জবাবে তাঁব জুড়ি খুব কমই আছে। কিন্তু মেয়েদেব সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দুটি সেনটেনসেব পব থার্ড সেনটেনস আব খুঁজে পান না মৃগাঙ্কবাবু। কী কবে যে নৃপেন ঘণ্টাব পব ঘণ্টা ওদেব সঙ্গে গালগল্প কবে সেই জানে।

এই মুহূর্তে দুটি বোয়াকই শূন্য। শুধু তাই নয়, ধাবে কাছেও কেউ নেই। লোকজন নেই, জীবজন্তু নেই। বস্তুপুঞ্জ? এই অন্ধকাবে তাও কিছু চোখে পড়ে না। পুঞ্জ পুঞ্জ শুধু আঁধাব আব আঁধাব। এই আঁধাবই কি একমাত্র সত্য?

একটু দূবে স্টেশন। সেখানে কিছু আলো আছে। কিছু লোকজনেব আনাগোনা। একটি ট্রেন এসে মিনিটখানেক দাঁড়াল। তাবপব আবাব অন্ধকাবে মিলিয়ে গেল। ওবও যেন নিঃসঙ্গ যাত্রা। আব এই মিনিটখানেকেব ছোঁয়া। ট্যানজেন্ট স্পর্শক। মৃগাঙ্কবাবু ভাবলেন, আমবা শুধু পবস্পবকে ক্বচিৎ কখনো এক নিমেষেব জন্যে ছুঁই। তাবপব যোজন যোজন দূবে নিক্ষিপ্ত হই। স্ত্রীব সঙ্গেই হোক, পুত্রেব সঙ্গেই হোক, বন্ধুব সঙ্গেই হোক, আমাদেব মিল শুধু ওই তিল প্রমাণ। মাঝখানে

অমিলেব ব্যবধান সমুদ্র পর্বতেব।'

আকাশেব দিকে তাকালেন মৃগাঙ্কবাবু। অসংখ্য তাবা জ্বলজ্বল কবছে। এক অ্যাসট্রোনমাব মক্কেল তাঁকে নক্ষত্রবিশাবদ কবতে চেযেছিলেন। পাবেননি। দুটি একটি তাবা ছাডা সব তাবাই মৃগাঙ্কবাবুব কাছে বেনামা, অজ্ঞাতকুলশীল। তবু আশ্চর্য, মাঝে মাঝে ওই অজ্ঞাত বহস্যালোক তাঁকে হাতছানি দেয। ওই সীমাহীন অফুবন্ত আকাশ তাঁকে একটিমাত্র প্রশ্ন কবে কেন? কেন? কেন? এই গণ্ডীবদ্ধতা কেন? কেন এই দেহজাত সংস্কাব আব মনোগত বাসনাব বন্ধন? কেন এই ঐকান্তিক আত্মবতি আব অন্তহীন অনাত্মীযতা?

কিন্তু এ প্রশ্নও এখানকাব ট্রেনগুলিব মত। এক মিনিট দেড মিনিটেব বেশি স্টেশনে দাঁডায না।

কেবল ত্যাগ ত্যাগ ত্যাগ। কেউ কাবো জন্যে ত্যাগ কবতে বাজী নয, অথচ মুখে সবাই ত্যাগীবাজ। মুখে সবাবই ত্যাগেব মহিমা। তুমি যদি গ্রহণ কবতে চাও, গৃহীত হতে চাও তাহলে ত্যাগ কবতে হবে। ত্যাগ যদি কবতে না জানো তুমি পবিত্যক্ত হবে। সে বড অসহ যন্ত্রণা। এই পবিত্যক্ত হওযাব অনুভূতি,ত্যাগেব চেযেও তা যেন দুঃসহ। কিন্তু কী ত্যাগ কবব? কেমন কবে ত্যাগ কবব? ভাবতে থাকেন মৃগাঙ্কবাবু। ওকালতিব প্র্যাকটিস জমতে জমতে চুল দাডি সব পেকে গেল। ত্যাগ কি আব এক ধবনেব প্র্যাকটিস? এই বযসে কি নতুন কবে জুনিযবগিবি সম্ভব?

খাওযাব ডাক পডল। খানিক বাদে উঠে গিযে খেতে বসলেন মৃগাঙ্কবাবু।

স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কবলেন, 'কোথায ছিলে এতক্ষণ?'

নীলিমা বললেন, ওদেব একটু গুছিযে টুছিযে দিযে এলাম। ওবা কাল সকালেই চলে যাবে

'কোন ট্রেনে? বেনাবস এক্সপ্রেসে?'

তাইতো শুনেছি।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, চল আমবাও কাল চলে যাই।

নীলিমা বললেন, 'না বাপু। অত সাত তাডাতাডি আমি যেতে পাবব না। কিছুই এখনো গুছোনো হযনি।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'না হয মোগলসবাইতে চল। বিকেলেব গাডিতে।'

নীলিমা বললেন সে দেখা যাবে।'

খাওযা শেষ হলে টর্চ হাতে আবাব বাইবে বেবোলেন মৃগাঙ্কবাবু। ঘুবে ঘুবে যে কটি বড বড আতা দেখলেন পেযাবা দেখলেন হাত বাডিযে পাডলেন। যেন নিজেব গাছেব ফল নিজেই চুবি কবছেন। পদ্মফুলেব মত যেসব মৌসুমি ফুল গাছে গাছে ফুটেছিল সযত্নে একটি একটি কবে তুললেন। মনেব মত কবে একটি তোডা বাঁধলেন। এতদিন টাকাব তোডাই বেঁধেছেন। ফুলেব তোডা এই প্রথম।

ঘবে এসে নতুন কেনা সুদৃশ্য সবুজ বঙেব বেতেব ঝুডিতে সব সাজিযে বাখলেন নীলিমা ঘবে নেই। ফেব বোধ হয ওদেব জিনিসপত্র গুছিযে দিতে গেছেন।

মৃগাঙ্কবাবু এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন। শিশুব কোন খেলনাই ঘবে নেই। টেবিলে কিছু আইনেব বই আছে। আব কিছু ফাইলপত্র। একটি বঙীন কাঁচেব কাগজ চাপা আছে। সেটি তুলে দিলেন ঝুডিতে। আব আছে নিজেব চশমাব খাপ। বীণাব ছেলে সেটি নিযে একদিন টানাটানি কবেছিল বলে বিবক্ত হযেছিলেন মৃগাঙ্কবাবু। বহুদিনেব ব্যবহৃত প্রায অঙ্গপ্রত্যঙ্গেব মত ওই চশমাব খাপটিও মৃগাঙ্কবাবু ঝুডিতে ভবে বাখলেন।

তাবপব ঘুমোতে গেলেন। ঘুম ভাঙ্গল ঠিক ভোবেই। যেমন নিত্য ভাঙ্গে। নীলিমা তাবও আগে উঠে পডেছেন। স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'চল আমবা ওদেব সী অফ কবে দিযে আসি। বেনাবস এক্সপ্রেস বাইট টাইমে আসছে কিনা জেনে আসতে হবে। কাল তো দু ঘণ্টা লেট ছিল।'

নীলিমা বললেন, 'কাদেব সী অফ কববে?'

'কেন? তোমাব ওই বোনপো বউমাদেব?'

নীলিমা বললেন, 'ওমা, ওবা তো বাত থাকতে থাকতেই চলে গেছে।'

মৃগাঙ্কবাবু বললেন, 'সে কি। শেষবাতে তো কোন ট্রেন ছিল না।'

নীলিমা বললেন, 'আব বল না। ওদেব ওই যে বন্ধু পঙ্কজ। ভাবি হুজুগে ছেলে। সে বাতদুপুবে

কোত্থেকে এক জীপ জুটিয়ে আনল। সেই জীপে করে ওরা গেল মধুপুর। তারপর আরো কোথায় কোথায় ঘুরবে। তারপর কলকাতা।'

মৃগাঙ্কবাবু আর কোন কথা বললেন না। চুপ করে বেতের ঝুড়িটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। এটিকে শেষ পর্যন্ত তাঁদের মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারেই তুলে নিতে হবে।

অভিসার

প্রথম প্রথম হাতটা একটু কাঁপত নন্দিতার। খানিকক্ষণের জন্যেও সিঁথির সিঁদুর তুলে ফেলতে বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করত। কে জানে বাবা। এই সিঁদুর আবার সিঁথিতে উঠবে তো। কিন্তু আজকাল সে এই সংস্কার কাটিয়ে উঠেছে। সংস্কার ছাড়া কি। সিঁদুরের সঙ্গে স্বামীর আয়ুর কী সম্পর্ক। যে সমাজের সধবারা সিঁদুর পরে না তাদের স্বামীদের কি অকালমৃত্যু হয়? নন্দিতার এক বন্ধু আছে সুমিত্রা। সে এই হিন্দু সমাজেরই মেয়ে। সুমিত্রা ইচ্ছা করেই সিঁদুর পরে না। এই নিয়ে তাকে অনেক সমালোচনা সহ্য করতে হয়েছে। কিন্তু সুমিত্রা অটল। নন্দিতার আর এক বন্ধু কেতকী। মাতৃসদনে নার্সের কাজ করে। সেও যতক্ষণ হাসপাতালে থাকে সিঁদুর পরে না। সিঁদুরও তো আসলে ভূষণ ছাড়া কিছু নয়। এও এক ধরনের প্রসাধন মাত্র। এর সঙ্গে মঙ্গল অমঙ্গলের কী এমন যোগ আছে? মনকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছে নন্দিতা। তবু যেন কেমন কেমন লাগে।

বরানগরে শ্বশুরবাড়ি। সেখান থেকে সিঁদুর তুলে আসা যায় না। শ্বশুর নেই। কিন্তু বিধবা শাশুড়ী জলজ্যান্ত রয়েছেন। বউয়ের এই অলক্ষুণে কাণ্ড দেখলে তিনি নন্দিতাকে আস্ত রাখতেন না কি?

বরানগর থেকে যাদবপুর পর্যন্ত দীর্ঘ পথের দু ধারে আত্মীয়স্বজন যে দু চার ঘর না আছে তা নয়। কিন্তু নন্দিতা তাদের কারো বাড়িতেই যায় না। সোজা চলে আসে ঢাকুরিয়ায় তপতীদের বাড়িতে। তপতী তার বহুদিনের পুরনো বন্ধু। আর খুব বিশ্বাসী।

দুখানি ঘরের একটি ফ্ল্যাটে ছোট্ট সংসার। স্বামী আর বাচ্চা ছেলে নিয়ে বেশ আছে তপতী। কোন ঝামেলা নেই।

তপতীর শোবার ঘরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নন্দিতা তার সজ্জা পরিবর্তন করে। সিঁথির সিঁদুর তুলে দিয়ে বধূ থেকে ফের কুমারী হয়। শাশুড়ীর জোর জবরদস্তিতে শাঁখা মাঝে মাঝে পরতে হয়। তপতীর বাড়িতে এসে সেই শাঁখা দুগাছিও সন্তর্পণে খুলে রাখে। আজ অবশ্য শাঁখা ছিল না। শুধু সিঁদুরটুকু তুললেই দিব্যি ফের কুমারী হতে পারে নন্দিতা। কিন্তু তপতীর আয়না বসানো গোদরেজের আলমা'রির সামনে দাঁড়িয়ে নন্দিতা আজ যেন কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। বাইরে পড়ন্ত রোদ। রাস্তার ওপারে কয়েকটি নারকেল গাছ নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে। পিছনে খাটের ওপর বসে ছেলেকে সাজাচ্ছিল তপতী। আর নন্দিতার কাণ্ড দেখে মুখ টিপে টিপে হাসছিল। একটু বাদে তপতী বলল, 'কি রে তোর অভিসার সজ্জা আর কত বাকি।'

নন্দিতা মুখ ফিরিয়ে তাকাল, 'সজ্জা আবার কিসের। বরং সাজসজ্জা সব খুলে রেখেই তো যাচ্ছি।'

তপতী বলল, 'আহা যেটুকু ধুয়ে মুছে যাচ্ছিস তাতে তার চোখে ভালোই লাগবে। তাতো তার

চোখে আরো বেশি রূপসী হয়ে উঠবার জন্যেই। শাড়িটাও বদলে যাবি না কি ? আমার বেগুনি রঙের শাড়িটা কি দেব ?'

নন্দিতা বলল, 'না রে না। এই শাড়িতেই হবে। এই সাদা খোলের শাড়িই ওর পছন্দ।'

তপতী একটু হাসল, 'যতদূর জানি পছন্দটা তুইই করিয়েছিলি। বিয়ের আগে তুই সাদা-খোলের শাড়ি পরতে ভালো বাসতিস। গয়নাগাঁটি পরতেই চাইতিসনে। সুবীর বাধ্য হয়ে তোর সেই নিরাভরণ রূপ পছন্দ করেছিল। কতবার অনুরোধ করেছিল রঙীন শাড়ি পরতে। পরিসনি, এখন তো দিব্যি পরছিস। আবহাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে রঙ বেরঙের শাড়ি।'

নন্দিতা তপতীর দিকে তাকিয়ে হাসল, 'আহাহা, যত বয়েস বাড়ছে তত যেন কাব্য উছলে উঠছে। রঙীন শাড়ি পবব না কী করব। না পরলে শাশুড়ী যে রাগ করে।'

তপতী বলল, 'আর জ্বালাসনে। শুধু শাশুড়ীর দোহাই দেওয়া হচ্ছে। তাঁর পুত্রটির মন জোগাতে হয় না ? নয়ন জুড়াতে হয় না ?'

মুখ টিপে হাসল নন্দিতা। তাবপর ফের আয়নার দিকে তাকিয়ে সিঁদুর তোলায় মন দিল।

তপতী বলল, 'তাড়াতাড়ি কর। হাসপাতালের ভিজিটিং আওয়ার্সের অর্ধেক সময় তো কেটে গেল। পাঁচটা বাজে বাজে।'

নন্দিতা বলল, 'বাজুক গিয়ে। তপতী বড্ড ক্লান্তি লাগে।'

তপতীর ছেলে পিণ্টু তাগিদ দিচ্ছে, 'আমার তো খাওয়া হয়ে গেছে মা। কখন বেরোবে ?'

তপতী জবাব দিল, 'এই তোমাব মাসীমণিব সাজসজ্জা শেষ হলেই বেবোব বাবা। অস্থির হয়ো না। একটু ঠিক হয়ে দাঁড়াও। বোতামগুলি লাগিয়ে দিই।'

তারপর সে ফের নন্দিতার দিকে তাকাল, 'ক্লান্তি লাগে তো আসিস কেন ?'

নন্দিতা এ কথাব কোন জবাব দিল না। আসে যে কেন সে কি নিজেই তা জানে ? শুধু আসাই তো নয়, ছলনা কবতে কবতে আসা, আবার এসেও ছলনা করা। এর মধ্যে যেটুকু ঝুঁকিই থাক আছে। ধবা পড়লে স্বামীর কাছেই কি কম কথা শুনতে হবে ? সবই জানে নন্দিতা। তবু নিজেকে নিবৃত্ত করতে পাবে না। সে যেন নিজে আসে না। বাইরের অন্য কোন অদৃশ্য শক্তি তাকে টেনে নিয়ে আসে। তাকে দিযে যেটুকু যা করবার করিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেয়। মাঝে মাঝে এমন মনে হয় নন্দিতাব।

জানলা-টানলা বন্ধ কবে ছেলেকে নিয়ে তপতীও নন্দিতাব সঙ্গে বেরোল।

বেরোবার আগে রাঁধুনী সুরলক্ষ্মীকে যথারীতি নির্দেশ উপদেশ দিয়ে গেল।

ওর স্বামী প্রদোষ কলেজের অধ্যাপক।

কলেজ ছাড়াও তপতীকে বাড়িতে গিয়ে পড়াত। তারপর দিনক্ষণ দেখে ছাত্রীকে গৃহিণী করে নিয়েছে। তাব আগে অনেকদিন ধরে চলছিল মন জানাজানির পালা। সেই পর্বে নন্দিতা ওদের নানাভাবে সাহায্য করেছে।

দুপুরের ক্লাসগুলি সেরে নাইট সিফটেও পড়ায প্রদোষ। তাই ওব রাত হয়। নন্দিতার সুবিধে প্রদোষের চোখের সামনে বেশ পরিবর্তন করতে হয় না।

অবশ্য প্রদোষ বেশ ভদ্র।

যদি কখনো নন্দিতা তার সামনে পড়ে যায় সে অশোভন কৌতূহল দেখায় না, অসঙ্গত কোন প্রশ্ন তোলে না। সাধারণ কুশল প্রশ্নে সৌজন্যটুকু সেরে সামনে থেকে সরে যায়।

ভদ্র এবং এ-সব ব্যাপারে খানিকটা নির্লিপ্ত নন্দিতার স্বামী মণিময় সেনও। পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যাণ্ট। অফিসের কাজ নিয়েই আছে। প্রায়ই বাইরে বেরোয় বড় বড় ক্লায়েণ্টের ফার্ম অডিট করতে। আজ বোম্বে, কাল পুণা, পরশু নাগপুর জব্বলপুর লেগেই আছে। কাজ পাগল এই লোকটি স্ত্রীর চালচলন নিয়ে মাথা ঘামায় না। বিয়ে করা দরকার। মা পীড়াপীড়ি করছিলেন। তাঁকে বউ এনে দিয়েছে। ব্যস।

কর্মব্যস্ত স্বামীর এই ঈষৎ ঔদাসীন্য ভালোই লাগে নন্দিতার।

নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের নিগড যে কি তা তো তার আর জানতে বাকি নেই।

বড রাস্তাব মোডে ফলেব দোকান। নন্দিতা কযেকটি আপেল ন্যাসপাতি কিনে বঙীন থলিতে ভবে নিল।

তপতী বাস স্টপ পর্যন্ত ওব সঙ্গে এল। তাবপব বলল,'তুই ভাই তাহেল যা। শুধু ফল নিলি? ফুল নিলিনে? সে তো ফলেব চেযে ফুলই বেশি ভালবাসে শুনেছি। তুই যা। গিযে দেখে আয, আমি ছেলেটাকে একটু ঘুবিযে টুবিযে নিযে সন্ধ্যাব আগেই বাডি ফিবব। তুই তো আমাব ওখানেই হযে যাবি। সিঁদুব টিঁদুব ফেব পবে যেতে হবে তো আজ কিন্তু আমাদেব সঙ্গে খেযে যাবি নন্দিতা। এক সঙ্গে খাব। গল্প কবব।'

নন্দিতা অসম্মতি জানিযে বলল, 'না ভাই। সে আব একদিন হবে। আজ তো বলে আসিনি।'

তপতীবা চলে গেল। নন্দিতা বাস স্টপে এসে দাঁডাল।

ভিড দেখে একটা দুটো বাস ছেডে দিল নন্দিতা। তাবপব উঠব কি উঠব না ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত একটি বাসে উঠেও পডল। বসবাব জাযগাও মিলে গেল একটা।

এই অভিনযে আজ যেন নন্দিতাব বড্ড বেশি ক্লান্তি লাগছে। রুগ্ন বন্ধুকে আব কতদিন এভাবে ছলনা কববে নন্দিতা? ছলনা কি সে শুধু একজনকেই কবছে?

কতদিন আব সুবীবেব কাছে ব্যাপাবটা সে লুকিযে বাখবে? একদিন না একদিন সে তো সবই জানতে পাববে,জেনে আঘাতও পাবে,সেই আকস্মিক আঘাতেব চেযে ওকে নিজেব মুখে অকপটে সত্যি কথা জানানোই তো ভালো। এত সঙ্কোচ কিসেব নন্দিতাব? সুবীবেব জন্যে সে তো কম দিন অপেক্ষা কবেনি। ও অসুস্থ হবাব পবও সাত বছব ধবে নন্দিতা ওব সুস্থতাব জন্যে দিন গুনেছে। মাঝে মাঝে সুস্থ হযে উঠেওছে সুবীব। নন্দিতা আশা কবেছে এবাব বোধ হয ও হাসপাতাল থেকে ছাডা পাবে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ওকে ছাডেননি। শবীব একটু ভালো থাকলে সুবীব তো আব ঘবে বসে থাকত না। নানা অজুহাতে বেবিযে পডত। শবীবেব ওপব অত্যাচাব সে কি কম কবেছে? কিন্তু নন্দিতা কি তাব নিজেব দাযিত্ব অস্বীকাব কবতে পাবে? সুবীবেব এই বোহেমিযান ভাব সে কি নিজেই জাগিযে তোলেনি? মুখে সাবধান থাকতে বলেও নন্দিতা ওকে নিযে বোদে বোদে ঘুবেছে, বৃষ্টিতে ভিজেছে, বেস্টুবেণ্টে খেযেছে, না কবেছে কি।

তাবপব আবাব অসুস্থ হযে পডেছে সুবীব। হাসপাতাল থেকে তাব আব বেবোন হযনি। আবাব চলেছে দীর্ঘস্থাযী চিকিৎসাব পালা।

নন্দিতা তখন কলকাতাব দক্ষিণ দিকেই থাকত। প্রায বোজ আসত ওকে দেখতে। হাতে ফলেব ঠোঙা কি কোন দিন বাডিব তৈবি খাবাব নিযে আসত ক্যাবিযাবে কবে। আনত নতুন নতুন গল্পেব বই কি মাসিক সাপ্তাহিক পত্রিকা। সুবীবেব বিছানাব পাশে দু ঘণ্টা তো থাকতই আবো বিশ পচিশ মিনিট বেশিই কাটিযে যেত। যতক্ষণ না হাসপাতালেব লোক এসে বলত, 'সময হযে গেছে' ততক্ষণ উঠত না।

তাবপব ধীবে ধীবে আসা যাওযাব ব্যবধান বাডতে লাগল। বোজ আব আসা হয না। সপ্তাহে দুদিন কবে আসে।

তাতেও সুবীবেব কী বাগ, কী অভিমান। 'আগেব মত তুমি আমাকে আব ভালোবাস না।'

এই অবুঝ চিবরুগ্ন মানুষটিকে কী কবে বোঝানো যায ভালোবাসা প্রতি মুহূর্তে এক বকম থাকে না। বোজ এক বকম থাকে না। সেই স্রোতেবও জোযাব ভাঁটা আছে।

তবু নন্দিতা যুক্তি দিযে ওকে বোঝাবাব চেষ্টা কবত, 'সুবীব ভালো আমি তোমাকে ঠিকই বাসি। কিন্তু আমি যে আত্মীযবাডিতে থাকি তাঁদেব তো সংসাবেব কিছু কাজকর্ম আছে। দাযদাযিত্ব আছে। সংসাবে আবো যে কত দবকাবী কাজ থাকতে পাবে তুমি এই হাসপাতালেব বিছানায শুযে কিছুতেই তা বুঝতে পাববে না।'

সুবীব বলে, 'খুব পাবি নন্দিতা। বুঝতে খুবই পাবি। আমি তো মাযেব পেট থেকেই বোগী হযে জন্মাইনি। পঁচিশ বছব সুস্থ শবীবে এই পৃথিবীকে ভোগ কবেছি।' একটু চুপ কবে থেকে সুবীব একটু হেসেছিল, 'অবশ্য আত্মীযস্বজনহীন বেকাব নিঃসম্বল মানুষ যতটুকু ভোগ সম্ভোগ কবতে পাবে ততটুকুই কবেছি। কিন্তু তুমি তো সব জেনেই আমাব কাছে এসেছিলে। আমি তো চাল দিইনি।

আমাব যা নেই তা আছে বলে বড়াই করিনি। তারপর আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি। সেই অসুখ আর আমাকে ছাড়ছে না। শুধু সেই অপরাধে তুমি কি আমাকে ছেড়ে যাবে? এই কি তোমার মানবীয়তা?'

নন্দিতা হেসে বলেছিল, 'ও সব দোহাই দিয়ো না সুবীব। আমরা কেই বা পুরো মানব? কেই বা পুরো মানবী।'

দু'জনেব প্রথম পবিচয়, প্রথম বন্ধুত্ব, প্রথম প্রেমের কথা আজও মাঝে মাঝে ভাবে নন্দিতা। সুবীব তখন থেকেই হীন স্বাস্থ্য, নির্বিত্ত আত্মীয়স্বজনহীন। তবু নন্দিতা আকৃষ্ট হয়েছিল তার বিদ্যাবত্তায়। অত কৃচ্ছ্রতার মধ্যেও সুবীব ভালো অনার্স নিয়ে পাশ করেছিল। নন্দিতাকে আকর্ষণ করেছিল তার নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা। সে যেন অমিত শক্তিধর। সব রকম অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে সে যেন একাই দাঁড়াবার সামর্থ্য রাখে। সুবীব রাজনৈতিক অরাজনৈতিক সব রকম বক্তৃতাই ভালো কবতে পাবত। যখন যা লিখত তাও তীক্ষ্ণ হত, সরস হত। কিন্তু পুরো একখানা বই লেখার সুযোগ কি সামর্থ্য ওব আর হয়ে উঠল না। রোগ ওকে একেবারে ধরাশায়ী করে দিলে। টি বি আজকাল আব দুশ্চিকিৎস নয়। কতজনের হয় আবার সারে। দিব্যি সুস্থ হয়ে তারা বিয়ে থা করে। ছেলেপুলে হয়। নন্দিতাও তাই ভেবেছিল। সেরে যাবে। কিন্তু সারল না। হয়তো চিকিৎসা বিভ্রাট, হয়তো ওব নিজের অনিয়ম অত্যাচার, হয়তো বা ওর দুর্বল শরীরের প্রতিরোধ শক্তির অভাব। হয়তো এব সব কিছুই আছে। হযতো বা সেই সঙ্গে আরো কিছু।

সুবীব মাঝে মাঝে বলত, চিঠিতেও লিখত, 'নন্দিতা, তুমি যদি আমাকে আরো বেশি ভালোবাসতে, আ[illegible] ভালোবাসতে তাহলে আমি ঠিক সুস্থ হয়ে উঠতাম। আমি তাহলে ফের সব পাবতাম নন্দিতা। হযতো অসাধারণ কিছু হতাম না। আরো পাঁচজন সাধারণ মানুষের মত ঘর বাঁধতাম; স্ত্রীকে ভালোবাসতাম, সন্তানকে ভালোবাসতাম। নাম যশের কাঙালপনা করতাম না। এই পৃথিবীতে সাধাবণ মানুষের সাধারণ সুখদুঃখ ভোগ কবতাম আব তোমাকে তার ভাগ দিতাম। শুধু যদি তুমি আমাকে আব একটু ভালোবাসতে।'

সুবীর নাম যশের কাঙাল নয়, শুধু ভালোবাসার কাঙাল। ও কি জানে না কাঙালকে বেশি দিন ভালোবাসা যায় না। শুধু অনুকম্পা কবা যায়, করুণা কবা যায়।

সেই স্নেহ প্রীতি করুণাও যে বেশি দিন স্থায়ী হয় না তাও তো নন্দিতা দেখেছে। সুবীরের আত্মীযস্বজন নেই। কিন্তু বহু বন্ধু ছিল। বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন বয়সের। প্রথম কয়েক বছর তাঁরা সুবীরেব রোগশয্যার পাশে এসে দাঁড়াতেন। বসে বসে কত গল্প করতেন। কত হাসি-কৌতুক। নন্দিতা নিজের চোখে সুবীবেব এই বন্ধুভাগ্য দেখেছে। কেউ কেউ বই পা[illegible]তেন। কেউ বা মনিঅর্ডারে টাকা। জন্মদিনে কি পুজোব সময় জামাকাপড় পাঠিয়ে কেউ কেউ স্মরণ করতেন সুবীরকে। তারপর ধীরে ধীরে সব ক্ষীণ হতে লাগল।

সুবীব নন্দিতার হাতখানা নিজেব মুঠিব মধ্যে নিয়ে বলেছিল, 'যেতে দাও গেল যাবা। তোমাকে যেতে দেব না।'

নন্দিতা ওর কপালে হাত বুলাতে বুলাতে হেসে বলেছিল, 'আমি গেলে তো তুমি যেতে দেবে? আমি আছি তোমার কাছে। চিরজীবনেব জন্যে আছি।'

সেই প্রতিশ্রুতি অবশ্য রাখতে পারেনি নন্দিতা। কিন্তু ওর সেদিনের সেই কথার মধ্যে কোন অসত্য ছিল না। একদিন যা সত্য ছিল তা যে চিরদিন সত্য থাকবে না তা কে জানত। তাই বলে সেই আগের দিনগুলি কি মিথ্যা?

সুবীর গভীর আশ্বাসে বলেছিল, 'আমি জানি নন্দিতা। তুমি আমার কাছেই থাকবে। আজ আর আমার কেউ নেই, তুমি ছাড়া আব কিচ্ছু নেই। তুমি আমার সর্বস্ব।'

নার্স এসে সাবধান কবে দিয়েছিল, 'ওঁকে বেশি কথা বলতে দেবেন না। ওঁর জ্বর আছে। হেমারেজ হয়েছে।'

একজন পুরুষেব সর্বস্ব হতে পারার মত সুখ আর কিছুতেই নেই। সেদিন মনে হয়েছিল নন্দিতার। কিন্তু সেই সুখ যে পরম দুঃখের কারণও হতে পারে তা কি তখন আর ভেবে দেখেছিল?

কলকাতায় চাকরি বাকরির সুবিধে হল না। নন্দিতাকে যেতে হল চন্দননগরে স্কুলে মাস্টারি নিয়ে। প্রথম কিছুদিন কলকাতা থেকেই যাতায়াত করত। কিন্তু এ ব্যবস্থা বেশি দিন টিকিয়ে রাখতে পারল না। বড় কষ্ট হয়। নন্দিতা মেয়েদের হস্টেলে জায়গা করে নিল।

সুবীর বলল, 'তুমি ইচ্ছা করেই আমার কাছ থেকে দূরে সরে গেলে। কলকাতায় কি কোন একটা চাকরি-টাকরি জুটত না ?

নন্দিতা বলল, 'কই আর জুটল ? জুটলে কি আর দূরে গিয়ে থাকি ?'

দূরে গিয়ে কিন্তু ভালোই লাগতে লাগল নন্দিতার। স্কুলের মেয়েরা তাকে ভালোবাসে। টিচারদের মধ্যে অনেকেই ওর যোগ্যতা স্বীকার করেন। সেক্রেটারী বলেন, 'আপনার সুখ্যাতি দেখি ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে।'

নন্দিতার মনে হয় কী মধুর এই প্রশস্তি,ছাত্রীদের আনুগত্য, সহযোগিনীদের প্রীতি-সৌখ্য বন্ধুত্বের মূল্য যে এত বেশি এখানে না এলে বুঝতে পারত না নন্দিতা।

আগের মত সুবীরের চিঠির আর জবাব দেওয়া হয় না। ঘন ঘন দেখতে যাওয়া আর হয়ে ওঠে না। সুবীরের দীর্ঘ চিঠির জবাবে ছোট করে উত্তর লেখে নন্দিতা, সপ্তাহে সপ্তাহে পরীক্ষার খাতা দেখি, আরো কত রকমের কত কাজ, নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই।

চিঠির ধরন দেখে বোঝা যায় নন্দিতা অন্য সুখের স্বাদ পেয়েছে। বন্ধুত্ব আর ভালোবাসা তো আছেই। কাজকর্ম, কর্মস্থলে যশ জীবনে কম রসের জোগান দেয় না। সেই রস যেন প্রেমেরই পরিপূরক।

কোনোদিন ছাত্রীদের ব্যাণ্ডেলের চার্চ দেখাতে নিয়ে যায়, সাপ্তাহান্তিক ছুটিতে দীঘার সমুদ্র তীর থেকে বেরিয়ে আসে, কোন দিন বা দলবল নিয়ে কলকাতা টহল দিয়ে যায়। সুবীরকে আর দেখতে যাওয়া হয়ে ওঠে না।

চিঠির পর চিঠিতে সুবীরের অভিমান ঈর্ষা আক্ষেপ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। নন্দিতার মনে একটু একটু অনুশোচনা যে না হয় তা নয়। একজন রুগ্ন বন্ধুকে,তার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল বন্ধুকে দূরে সরিয়ে রাখছে। যেতে আর ইচ্ছা করে না। হাসপাতালের সেই বিষণ্ণ পরিবেশ—ওষুধের গন্ধ, ডাক্তার নার্সদের চলাফেরা, অনেকটা কয়েদীদের মত ইউনিফর্ম পরা রোগীদের জটলা, এই পরিবেশের মধ্যেও নন্দিতা সুবীরের সঙ্গে এক সময় কী প্রণয়মধুর মুহূর্তগুলিই না কাটিয়েছে। কিন্তু জীবনের স্রোত তাকে আজ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে ফেলেছে। সে জগৎ সুস্থ সজীব কর্মশীল মানুষের। হাসপাতালে যখন ঘন ঘন আসত নন্দিতা তার কাজ ছিল একটি রুগ্ন বন্ধুকে সেবা সোহাগ আর সান্ত্বনা দান। তাকে আশা ভরসায় উদ্দীপ্ত করে তোলা। আর স্কুলে এসে অন্য কর্তব্যভার পড়েছে নন্দিতার ওপর। মেয়েদের শেখানো দেখানো, গল্প বলা, তাদের নালিশ শোনা তার প্রতিকার করা। শহরের ছোট বড় প্রতিষ্ঠান নন্দিতাকে টানাটানি করে। সবাইকে কি ফেরানো যায় ?

শান্তিপুরে থাকেন নন্দিতার বাবা মা ভাইবোন। কলকাতার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, তারপর সুবীর সান্যাল তাকে সেই পিতৃপরিবার থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করে এনেছিল। আবার চন্দননগরের এই কর্মজীবন তাকে সুবীর আর তার হাসপাতাল থেকে দূরে সরিয়ে এনেছে। এই দূরত্ব শুধু ভৌগোলিক দূরত্ব নয়। মনের দিক থেকেও বেশ খানিকটা দূরে সরে এসেছে নন্দিতা। মাঝে মাঝে অবশ্য মনে হয়। এ তার নির্মমতা। ক্ষমাহীন নিষ্ঠুরতা। কিন্তু মনকে যত গালাগালই দিক সে তার নিজের কাজ করে যায়। তাকে ফেরানো বড় শক্ত।

এর মধ্যে একদিন সুবীর এক দুঃসাহসিক কাজ করে বসল। সে হঠাৎ গিয়ে চন্দননগরে হাজির। ছাত্রীদের নিয়ে বেড়িয়ে ফিরছিল নন্দিতা। স্টেশনেই তার সঙ্গে দেখা। নন্দিতা বলল, 'এ কি তুমি যে এখানে।' সুবীর বলল, 'তুমি তো আর যাও না। আমিই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলাম।' নন্দিতা বলল, 'তুমি এই অসুস্থ শরীর নিয়ে—'

সুবীর বলল, 'অসুস্থ শরীর নিয়ে আমি কোথায় বা না যাই। কোথায় তোমাকে নিয়ে আমি না ঘুরেছি। ভয় নেই আমার স্পুটম এখন নেগেটিভ।'

ছাত্রীদের একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে নির্দেশ দিয়ে নন্দিতা সুবীরকে বলল, 'তুমি অত্যন্ত অন্যায়

করেছ। তোমার স্পুটম পজিটিভই থাক আর নেগেটিভই থাক তাতে কিছু এসে যায় না। আমি চাইনি তুমি আমার স্কুল পর্যন্ত এসে ধাওয়া করবে।',

সুবীর বলেছিল, 'কেন আমাকে দশজনের সামনে স্বীকার করে নিতে তোমার এত লজ্জা কিসের ? আমি কোন দিক থেকে অযোগ্য ? আচ্ছা চল তোমার হস্টেলে। সেখানে কথা হবে ?'

'না। সেখানে আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারব না।'

'তাহলে চল কোন চায়ের দোকানে গিয়ে বসি। সেখানে কথা হবে।'

নন্দিতা বলেছিল, 'এমন কী কথা আছে যা আজ বলা চাই ? আমি গিয়ে শুনব।'

'কবে যাবে ?'

'আমার যখন সময় হবে সুবিধে মত যাব একদিন।'

সেদিন পরের ট্রেনেই সুবীর চলে এসেছিল। নন্দিতা তাকে একটুও বিশ্রাম করতে বলেনি, এককাপ চা খাওয়ার জন্যে আমন্ত্রণ জানায়নি। ওই রুগ্ন দুর্বল মানুষটিকে আরও প্রচণ্ড আঘাত করতে পারলে সে যেন খুশি হত। মাঝে মাঝে আপন স্বভাবের মধ্যে কী যে এক দুর্বোধ্য নিষ্ঠুরতা জেগে ওঠে নন্দিতা নিজেই বুঝতে পারে না। ঝড়ের মত, ভূমিকম্পের মত সে যেন এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। সব মায়ামমতার বন্ধন ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে যেতে চায়।

অবশ্য মত বিরোধ গোড়া থেকেই। সুবীর বলত, 'আমি গোপনীয়তা চাইনে। আমি চাই তোমার আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাইর কাছে তুমি আমাকে স্বীকার করো।' কিন্তু নন্দিতার মনে দ্বিধা। সে বলত সময় আসুক তখন তোমাকে বার করব। তার আগে তুমি সিন্দুকে থাকো গোপন রত্নের মত।'

দুজনের সম্পর্কের মধ্যে অনেকদিন আগেই চিড় ধরেছিল। এবার সেই ফাটল ক্রমেই বড় হতে লাগল।

অনেকদিন বাদে নন্দিতা ফের গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ করল, কিন্তু সে যেন নিতান্তই কর্তব্যবোধ। তাতে কোন রস নেই, আনন্দ নেই।

সুবীর কিছুদিন অভিমান করে ছিল। কিন্তু ফের তার সেই আবেগ উচ্ছ্বাস অভিযোগ অভিমান প্রবল এবং অবিরল হয়ে উঠল। চিঠির পর চিঠিতে সে নন্দিতাকে অতিষ্ঠ করে তুলল। সুবীর লিখতে লাগল, 'তুমি এত নিষ্ঠুর এত হৃদয়হীন ?' কিন্তু এই গঞ্জনা শুনে নন্দিতার যে সহৃদয়তা বাড়ল তা নয়। সে ভাবতে লাগল এ কোন ধরনের পুরুষ বিন্দুমাত্র যার আত্মসম্মান নেই। সব শেষ হয়ে গেছে শুনেও যে ছেড়ে দিতে চায় না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে তাকে বেঁধে রাখতে চায় তাকে সহ্য করা কি সহজ ?

কী করে এই কারাগার থেকে রক্ষা পাবে নন্দিতা ভেবে পায় না।

একজন যেন অবাঞ্ছিত বাসনার দুই বাহু মেলে তাকে জড়িয়ে ধরবার জন্যে পিছনে পিছনে ছুটে আসছে। আর নন্দিতা প্রাণপণে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে ছুটে পালাচ্ছে। পথের আর শেষ নেই।

শেষ পর্যন্ত আশ্রয় মিলল। বাবা, মা অনেকদিন ধরেই বিয়ের জন্যে চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু নন্দিতা তাতে কান দেয়নি। দাদারা বিরক্ত হয়ে এ প্রসঙ্গ ছেড়েই দিয়েছেন। যে যার কর্মস্থলে আছেন বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে। পারিবারিক বন্ধন শিথিল। দু' একদিনের অতিথি হিসেবে তাঁদের কাছে যায় নন্দিতা। কিন্তু যাওয়ার পর সেই দুদিন কাটানোও কষ্টকর হয়ে ওঠে।

এই সময় বাবা মা আবার পীড়াপীড়ি শুরু করলেন।

বাবা বললেন, 'খুকি, আমার কথা শোন। আমার দশা তো দেখছিস। দেহের যা অবস্থা নড়তে চড়তে পারিনে। কবে চলে যাব তার ঠিক নেই। অনেকদিন বাদে আবার একটি সম্বন্ধ এসেছে। ছেলেটি ভালো। বাড়ির অবস্থা ভালো। আয় রোজগার ভালো। শুধু বয়স একটু বেশি।'

মা বললেন, 'আজকালকার ছেলেদের চল্লিশ বছর আবার একটা বয়স নাকি। তোমার মেয়েই বা এমন কোন কচি খুকি।' নন্দিতা বলল, 'কর তোমাদের যা খুশি। আমি আর ভাবতে পারিনে।'

বাবা বললেন, 'আমি মাথার ওপর আছি। তোর দাদারা মাথার ওপর আছে। তুই কেন ভাবতে যাবি বলতো। এতদিন নিজের ভাবনা নিজে ভেবেছিলি বলেই তো এই হাল।'

ওরা যা বললেন তাতেই রাজি হয়ে গেল নন্দিতা। শুধু একটি শর্ত। কোন রকম জাঁকজমক আড়ম্বর আয়োজন যেন না হয়।

তেমন আড়ম্বর অনুষ্ঠানের সাধ্যও বাবার ছিল না। নানা কারণে দাদারা তেমন সাহায্য করতে পারলেন না। কারো বউয়ের অসুখ। কারো বাড়ি করতে গিয়ে ধার দেনা হয়েছে। নগদ টাকা কই হাতে।

সুবীরকে ইচ্ছা করেই নন্দিতা জানায়নি। সে এ খবর সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু নন্দিতা ভাবতে পারেনি বিয়ের পিঁড়িতে বসে এই শুভ উৎসবটা তার নিজের কাছেও এতখানি অসহ্য লাগবে। মনে পড়ে যাবে কয়দিনের পুরনো একটি প্রতিশ্রুতি, টি বি হাসপাতালের একটি বেড, একটি রোগজীর্ণ দেহ, আর দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুটি চোখের সেই উজ্জ্বল ঔৎসুক্য। কিন্তু তখন তো আর ফিরবার উপায় নেই। আর ফিরবেই বা কোথায়। শুধু সহানুভূতিকে সম্বল করে সারাজীবন কাটিয়ে দেওয়ার মত সঙ্কল্পের জোর কি তখন আর নন্দিতার আছে?

মণিময়ের স্বভাব সুবীরের ঠিক বিপরীত। মানুষটি নীরস নয় তার অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস উচ্ছলতার ও ধার ধারে না। সুবীরের মত একটি নারীকে সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসার কথা মণিময় ভাবতেও পারে না। তবে স্ত্রীর যেটুকু প্রাপ্য তা নিশ্চয়ই দেয়। আদর সোহাগও করে। মদটদ খায়। তবে তা নিয়ে বড়াই কি বাড়াবাড়ি করে না। নিজের কাজকর্মের চাপ যখন পড়ে তখন কারো কথাই তার মনে থাকে না। অফিসের কাজে মাঝে মাঝে ট্যুরে বেরোয়। নন্দিতাকে রেখে যায় মার জিম্মায়। স্কুলের কাজ নন্দিতাকে বিয়ের পর ছেড়ে দিতে হয়েছে।

মণিময় বলেছে 'আমি যখন অক্ষম হয়ে পড়ব তখন চাকরি কোরো। যতক্ষণ শক্ত সমর্থ আছি ওসব দিয়ে দরকার নেই।'

শাশুড়ী মাঝে মাঝে বলেন, এত জায়গায় যাস বউকে দু একবার নিয়ে গেলেই পারিস

মণিময় বলে 'বেড়াবার জন্যে তো যাইনে মা, যাই কাজে। যখন বিলাস ভ্রমণে যাব তোমার বউমাকে সঙ্গে নেব। তখন আবার তুমিই বলবে এমন বউপাগলা ছেলে আর দেখিনি।'

শশুড়ী হেসে বলেন, 'না বাপু তা আমি কোনদিন বলব না। তোমার যত খুশি বেড়াও না বউ নিয়ে—

স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার কিছু নেই। এমন একজন বস্তুবাদী কর্মব্যস্ত পুরুষকেই তো চেয়েছিল নন্দিতা। তবু কেন যেন মনে হয় কিসের একটা অভাব আছে। এখানে এসে যেটুকু প্রয়োজন তা নন্দিতার মিটেছে। কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেটুকু তা নাগালের বাইরেই রয়ে গেল। আর একজন ছিল অন্যরকম। প্রয়োজনের যে দাবি তার সিকির সিকিও তার কাছে মিটত না। সে দিত প্রয়োজনাতীতের সুধা। যা হাওয়ায় ভাসে হাওয়ায় মিলায়।

নন্দিতার কেন যেন মাঝে মাঝে মনে হয় এক নিগড় থেকে পালিয়ে এসে সে আর এক নিগড়ে এসে পড়েছে। সারা পৃথিবীই যেন নানা ধরনের কারাগারে ভরা। শুধু তাদের নাম আলাদা নিয়মকানুন আলাদা। কিন্তু রুদ্ধদ্বারের আড়ালে আবদ্ধ করে রাখবার কায়দা কানুন এক।

তারপর ঠিকানা বদলে দেওয়া একখানা খামের চিঠি এসে পৌঁছল নন্দিতার হাতে। হাতের লেখাটা সুপরিচিত।

চিঠি খুলে পড়ল নন্দিতা। সংক্ষিপ্ত চিঠি। 'অসুখ আবার বেড়েছে। ফের উঠতে হবে অপারেশনের টেবিলে। নেমে আসতে পারব কিনা জানিনে। তোমার সঙ্গে একবার দেখা হলে ভালো হত।

স্বামী সফরে বেরিয়েছে। শাশুড়ীর কাছ থেকে ছুটি নিল নন্দিতা।

হাসপাতালে এক আত্মীয় আছে নন্দিতার। সম্পর্কে ভাই হয়। তার অসুখের বড় বাড়াবাড়ি।

নন্দিতা অনুমতি চাইল, 'একটু দেখে আসব মা?' শাশুড়ী মানুষ ভালো। সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি দিলেন, 'যাও না বউ মা। কিন্তু অতদূর কি একা একা যেতে পারবে?'

'পারব মা। একা একা চলাফেরার অভ্যাস আমার আছে।'

পথে যেতে যেতে নন্দিতার হঠাৎ মনে হয়েছিল এই বেশে তো যাওয়া যাবে না সুবীরের কাছে।

সে বড নিষ্ঠুবতা হবে। ও যদি নন্দিতাব বিয়েব খবব না পেয়ে থাকে তা হলে হয়তো অবাক হবে। মুগ্ধ বিস্ময়ে বাক্যহাবা হবে না, দুঃসহ বেদনায় স্তব্ধ হয়ে থাকবে। কী দবকাব ওই মৃত্যুপথ যাত্রীকে পথেব প্রান্তে অমন কবে ঠেলে দেবাব। তাব চেয়ে একটু মধুব মিথ্যায তাকে শান্তি দিতে ক্ষতি কি।

ঢাকুবিযাব বাবুবাগান লেনে থাকে তপতীবা। সেখানে গিয়ে বন্ধুকে সব কথা খুলে বলেছিল নন্দিতা। সৎ উদ্দেশ্য এবং কিঞ্চিৎ অসৎ উপাযেব কথা সে গোপন বাখেনি।

তপতী সায দিয়ে বলেছিল, 'ঠিক বলেছিস। মডাব ওপব খাঁডাব ঘা দিয়ে আব লাভ কি।'

বহুদিন পবে নন্দিতা সুবীবেব বোগ শয্যাব পাশে টুলটিব ওপবে বসেছিল। সুবীবেব চেহাবা অনেক খাবাপ হয়ে গেছে। দেহ শয্যালীন। ঘন ঘন কাশছে। তবু সুবীব তাকে দেখে উৎসাহে উঠে বসতে চেষ্টা কবেছিল।

নন্দিতা মৃদু ধমকেব সুবে বলেছিল 'আহা উঠছ কেন আবাব

সুবীব বলেছিল, 'আমি জানতাম নন্দিতা তুমি আসবে। আমাব ওই চিঠি পেলে তুমি না এসে পাববে না।

বাববাব কাশি এসে কথাবার্তায় ব্যাঘাত কবেছিল

নন্দিতা বলেছিল, আঃ কেন অত কথা বলছ ?'

'বাঃ বে। কতকাল পবে দেখা। কত কথা জমে বযেছে কথা না বললে তুমি বুঝবে কী কবে '

নন্দিতা মধুব প্রতিবাদ কবেছিল তুমি কী ভেবেছ বলতো ? কথা বললেই তবে বুঝব ? না বললে বুঝব না ?

সস্নেহে ধমকে ওব সব কথা বন্ধ কবে দিয়েছিল নন্দিতা

খানিকক্ষণ চুপ কবে থেকে সুবীব ফেব বলেছিল আমি অনেক চিঠি লিখেছি তোমাকে কই পাইনি তো ?

পোস্ট কবিনি। পাবে কি কবে। জমিয়ে বেখেছি আজ তোমাকে সব দিয়ে দেব ডাযেবি লেখেছি দিনেব পব দিন সেও তোমাবই কথায় ভবা, নিয়ে যেয়ো। আমাব এই মূল্যবান সম্পত্তিব তুমিই একমাত্র স্বত্বাধিকাবিণী আজই তুমি সব নিয়ে যাও কাল যদি না থাকি।

নন্দিতা বলেছিল কী যে বল। না থাকবাব কী হয়েছে তোমাব অসুখেব ধাবাইতো এই। কখনো বাডে কখনো কমে

সেদিন সুবীবেব ডাযেবি আব চিঠিগুলি নন্দিতা বেখেই এসেছিল। বলেছিল আব একদিন নেব

মনে মনে বলেছিল নেব যে নিয়ে বাখব কোথায়।

কী সব কাবণে অপাবেশন স্থগিত আছে। বিনা অপাবেশনেই একটু একটু ক'বে সুস্থ হয়ে উঠছে সুবীব।

সঙ্কটটা এবাবেব মত বোধ হয় কাটল।

এখন হঠাৎ আবাব নন্দিতাব আসা যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

অতদূব থেকে এত ঘন ঘন দেখতে আসা ভালো দেখায় না

মণিময ট্যুব থেকে ফিবে এসেছে। এখন আছে কলকাতায়।

সেদিন হেসে বলেছিল 'কিগো তোমাব ভাইযেব অসুখটসুক সাবল ?'

নন্দিতা বলেছিল 'সম্পূর্ণ সাবেনি।'

মণিময বলেছিল 'খানিকটা সাবলেই হল। কি বকম ভাই যেন তোমাব ? মাসতুতো ভাই নযতো ?'

আসা যাওযায নন্দিতাব আবাব ক্লান্তি বোধ শুরু হয়েছে। ছোটখাটো অসুবিধাগুলি বড হয়ে উঠছে। কে জানে এব মধ্যে কতখানি বা মনেব ক্লান্তি কতখানি বা শবীবেব।

তাছাড়া এক একসময নন্দিতাব সন্দেহ হয সুবীব সব জানে। বিয়েব কথাও জানে আবাব ওব কুমাবী সেজে অভিনয কবাব কথাও জানে। এ ঘটনা কেউ কি আব ওব কানে না তুলে দিয়েছে ? কত জানা শোনা বন্ধু দুজনেব। তাবা কি আব বন্ধুকৃত্য কবেনি ?

সুবীর হয়তো সবই জানে। জেনে ও চুপ করে থাকে। হয়তো নন্দিতার নিখুঁত অভিনয়টুকু উপভোগ করে। হয়তো ভাবে, যেটুকু পাচ্ছি তাই বা মন্দ কি। একদিন যা বাস্তব ছিল আজ তার ছায়াটুকু নিয়ে ছলটুকু নিয়ে দুজনের সময় কাটে।

সুবীর বলে, 'আমি আর এখন বেশি কিছু চাইনে নন্দিতা। আমার সাধনা এখন সবচেয়ে কম চাওয়ার প্রায় না চাওয়ার সাধনা। আমার পরীক্ষা এখন সব চেয়ে কম পেয়ে এমন কি কিছু না পেয়েও কী করে বেঁচে থাকতে পারি তাই নিয়ে।'

এসব কথার মানে কী? হয়তো ধরা পড়ে গেছি এই সংশয় নিয়ে লুকোচুরিতে কি কোন মজা থাকে?

নির্দিষ্ট স্টপ ছাড়িয়ে নন্দিতা চলে এসেছিল। বাস থেকে নেমে সেই পথটুকু সে ফের হেঁটে এগিয়ে এল।

বহুদিনের পরিচিত সেই হাসপাতালের গেট। রোগীদের আত্মীয়স্বজনরা কেউ ঢুকছেন কেউ বেরোচ্ছেন।

মজা থাকুক আর না থাকুক নন্দিতা আর বেশিদিন এভাবে এখানে আসতে পারবে না। তাকেও এবার দীর্ঘদিনের জন্যে ছুটি নিতে হবে। আড়ালে চলে যেতে হবে। তারপর হঠাৎ একদিন ঢুকে পড়তে হবে কোন হাসপাতাল টাসপাতালে

সে হাসপাতাল অবশ্য কোন অসুখের হাসপাতাল নয়।

শাশুড়ী নাতির মুখ দেখার জন্যে দিন গুণছেন।

মাধবী মঞ্জরী

নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস শিয়ালদা স্টেশনের প্লাটফর্মে এসে ঢুকল। তখনো টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে মলয় ভ্রূ কুঁচকে বলল মিলি তুই একটা অপয়া,আমি যখন বাড়ি থেকে কলকাতায় আসি সারাটা পথ রোদ খটখট করে। আর তুই যেমন ছিঁচকাঁদুনে ওয়েদারটাও তেমনি। সারাটা পথ নাকে কাঁদতে কাঁদতে আর চোখের জল ফেলতে ফেলতে এল।'

শ্যামবর্ণা দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি বাইরের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টিপাত দেখছিল। দাদার অভিযোগ শুনে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকাল। তারপর হেসে বলল, 'আর ঝগড়া করো না ছোড়দা। সারাটা পথ তো ঝগড়া করতে করতেই এলে। আমাকে অপয়া বলো না। আমার জন্যেই তো এবার তুমি একটা বাড়তি টি এ পেয়ে গেলে। কথা নেই, বার্তা নেই, দিব্যি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে।'

মলয় বলল, ভারি তো বেড়ানো। তোর জন্যেই তো দুদিনের ছুটি নিয়ে এত কষ্ট করে যাওয়া আর আসা। বাবার আদেশ তাঁর এই স্নেহের ছেঁড়া নেকড়ার বোঁচকাটিকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে হবে। করে যে তুই সাবালিকা হবি, স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে শিখবি মিলি—'

মিলি বলল, 'সাবালিকা আমি হয়েছি ছোড়দা। আর একা একা চলাফেরার কথা বলছ তো? তাও আমি পারি। বাবা ছাড়েন না তাই।'

মলয় বলল, 'থাম। বাজে বকিস নে। সাবালিকা হয়েছেন। বার কর তো তোর সার্টিফিকেট অব

এজ।'

কিন্তু স্যুটকেস খোলার সময় নেই। ভাই বোনের কপট কলহও এখন স্থগিত রাখতে হবে। ট্রেন প্লাটফর্মের ভিতরে ঢুকেছে। কুলীরা খোলা দরজা দিয়ে কম্পার্টমেণ্টের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। সহযাত্রীরা নামবার জন্যে উদগ্রীব। দোরের কাছে ঠেলাঠেলি। যদিও ট্রেন তাব গন্তব্যে এসে পৌঁছেছে। সে এখন আর কোথাও নড়াচডা করছে না।

দুজনে তাডাতাড়ি জিনিসপত্র গুছিয়ে ফেলল। মালপত্র আব কি। একটা হোল্ডঅল আব একটা বড় স্যুটকেস।

কুলীব মাথায় মাল দুটো চাপিযে দিয়ে ওরা দ্বিতীয় শ্রেণীর সেই কামরা থেকে নেমে এল। নামেই দ্বিতীয় শ্রেণী। ভিড়ের দিক থেকে আরো এক ধাপ নিচে।

কয়েক পা এগোতেই মিলি একটি মহিলাকে স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর দিকে তাডাতাডি এগিয়ে এল। তাঁর কাছে এসে হেসে বলল, 'দিদি, তুমি নিজে এসেছ। এই বৃষ্টির মধ্যে তোমাব আসাব কি দরকাব ছিল? ছোডদাই তো আছে সঙ্গে।'

পূর্ণিমা হেসে বললেন, 'একটু বাজার-টাজার করতে বেরিয়েছিলাম। ভাবলাম তোদের তো এই ট্রেনে আসবার কথা। দেখে যাই।'

মলয ততক্ষণে ওদেব পাশে এসে দাঁড়িযেছে। হেসে বলল, 'দিদি, কোথায় তোমার সেই বি·টি· রোডের হাউসিং এস্টেট আর কোথায় এই শিযালদা স্টেশন: বাজাব করতে করতে তুমি এতদূর পর্যন্ত এলে। কই তোমার বাজারের ব্যাগটাগ কই।'

পূর্ণিমা হেসে বললেন, 'একি মাছ পান তবকারির বাজার যে থলি আনব বস্তা আনব।'

মলয় বলল, 'বুঝতে পেরেছি। এই সুযোগে তুমি একটু বেডিয়ে নিলে। জামাইবাবু ঠিকই বলেন। কেউ কেউ থাকে উড়ুন চণ্ডী, আর তুমি হলে ঘুরুন চণ্ডী।'

মিলি বলল, 'এই ছোডদা, ওকি হচ্ছে। দিদি আমাকে রিসিভ করতে এসেছেন তাই বুঝি তোমার হিংসা?'

পূর্ণিমা বললেন, 'সত্যিই তো মিলিকে একটা দারুণ রিসেপসন দেওয়া উচিত। কী চমৎকার রেজাল্ট করেছে ও।'

মলয় বলল, 'যা বলেছ দিদি। কিন্তু তুমি এমন একা খালি হাতে এলে কেন? ফুলের মালা বাদ্যি বাজনা এসব কোথায রেখে এলে? ভালো রেজাল্ট যেন আমরা কখনো করিনি।'

মিলি বলল, 'কী হিংসুটে দেখেছ?'

পূর্ণিমা স্মিতমুখে দুটি ভাইবোনের মধ্যবর্তিনী হযে গেটের দিকে এগোতে লাগলেন।

আবো একটু এগিয়ে কুলী মালপত্র নামিযে বাখল।

মলয বলল, 'তোমরা দাঁডাও এখানে। আমি যাই ট্যাকসিব জন্যে লাইন দিই গিযে। সেসব তো আর মিলিকে দিয়ে হবে না।'

পূর্ণিমা সস্নেহে মিলির কাঁধে হাত রাখলেন, 'বাব্বা, এরই মধ্যে কত বড হয়েছিস। মাথায় আমার প্রায সমান সমান।'

মিলি বলল, 'এই তো দেখ দিদি, তুমি তো বললে বড় হযেছিস কিন্তু বাবা মা দাদাবা সে কথা মোটেই মানতেই চায় না। তাবা ভাবে আমি সেই ছোটটিই আছি।'

পূর্ণিমা হেসে বললেন, 'তোর বুঝি বড হবার খুব সখ।'

মিলিও হাসল, 'খু-ব।'

হাসলে ওর দুই গালে দুটি টোপ পড়ে। সেই টোপ দুটি সস্নেহে টিপে দিযে পূর্ণিমা বললেন, 'বড় হবার বড় জ্বালা রে বোন। যখন হবি তখন বুঝবি। এই বেশ আছিস।'

বেশ আছে বই কি মিলি। ভাইবোনেদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। একমাত্র মেয়ে। খুব আদরে সোহাগে আছে। তাই বলে কি চিরকাল কেউ খুকি হয়ে থাকতে চায়? নাকি চাইলেই তা থাকতে পারে?

পূর্ণিমা ওর দিকে স্মিতমুখে তাকিয়ে ছিলেন। আপন বোন নয় তাঁর। খুড়তুতো বোন। মেয়ের

বযসী। নিজেব মেযে নেই। কন্যাসমা এই বোনটিকে ভাবি স্নেহ কবেন তিনি।

দিদিব সেই স্নেহদৃষ্টিতে মিলি একটু লজ্জিত হল। হেসে বলল, 'দিদি ওবা সবাই আমাকে ক্ষ্যাপায। তুমি আমাকে বড্ড বেশি ভালোবাসো।'

পূর্ণিমা বললেন, 'বাসব না? তোব যে অনেক গুণ।

মিলি বলল, 'গুণ না আবো কিছু। ধবো এটুকুও যদি আমাব না থাকত। তুমি কি আমাকে ভালোবাসতে না?'

বড শক্ত প্রশ্ন একমুহূর্ত মিলিব দিকে তাকিযে বইলেন পূর্ণিমা তাবপব বললেন, গুণ যদি না থাকত? তাহলে ভালোবাসা তো ভালো—দূব কবে দিতাম।

এবাব হেসে এগিযে এসে বোনকে কাছে টেনে নিলেন পূর্ণিমা।

মলয ততক্ষণে ট্যাক্সি নিযে এসে হাজিব হযেছে। দিদি আব বোন দুজনকে তাগিদ দিযে বলল 'ওঠো শিগগিব তোমবা তো দিব্যি শেডেব নিচে দাঁডিযে দাঁডিযে গল্প কবছ। আমি এদিকে ভিজে—

ক্যাবিযাবে মাল দুটো তুলে দিযে ওদেব দুজনকে পিছনেব সাটে বসিযে মলয ড্রাইভাবেব পাশে গিযে বসল।

পূর্ণিমা বললেন 'ওকি বাইবে গিযে বসলি কেন ভিতবেই তো জাযগা ছিল।

মিলি বলল, 'দিদি, ওব কথা আব বলো না ড্রাইভাবেব পাশে বসাটাকে ও মস্ত বড একটা সিভালবি মনে কবে

পূর্ণিমা হেসে বললেন 'কববেই তো। ওতো আব তোব মত মেযে নয আমাব কাছে বসলে আমি তোব মাথাটা মুছে দিতে পাবতাম মলয

মলয পিছনেব দিকে না তাকিযে বলল তোমাব আঁচলটাকে এটি পেপাব বানিযে আব লাভ কি দিদি '

একটু বাদে বোনেব দিকে তাকিযে বলল জানিস মিলি এটা আপাব সাকুলাব বোড এখন নাম হযেছে আচায প্রফুল্লচন্দ্র বোড।'

মিলি বলল থাক ছোডদা। তোমাব তাব আমাকে শহব চিনাতে হবে না আমি কি নতুন এসেছি নাকি কলকাতায?

মিলি এব আগেও তিন চাব বাব এসেছে কলকাতায কিন্তু এবাবকাব আসাব সঙ্গে সেইসব আসাব তফাৎ আছে। এবাবকাব আসা বেডাতে আসা নয, মিউজিযাম চিডিযাখানা লেক কি পুবনো আমলেব ইডেনগার্ডেন দেখে আব দু একটা সিনেমা টিনেমা দেখে ফিবে যাওযা নয কি আত্মীয স্বজনেব বিযেতে নিমন্ত্রণ খেতে আসাও নয, এবাব সে এসেছে এই শহবেব কলেজে পডতে, হস্টেলে থাকতে, এই বড শহবেব স্থাযী সিটিজেন হতে বডদাও কলকাতায পডাশুনো কবেছে চাকবি নিযে গেছে দিল্লিতে। সেখান থেকে ইউবোপ কি আমেবিকায পাডি দেবে এই হল দাদাব স্বপ্ন। মিলিব সাধও তাই। সেও বিদেশে যাবে কলকাতা হল সেই বিদেশ যাত্রাব প্রথম পদক্ষেপ তবু বাবা মাব কথা ভাবলে মিলিব মন খাবাপ হয যায

বাবা একবাব বলেছিলেন, 'এখানকাব কলেজেই পড না এখানে পডাও তো ভালো [illegible] কবা যায।'

মিলি আবদাবেব সুবে বলেছিল, না বাবা, আমি কলকাতাব কোন কলেজেই পডব। আমি আমাব ক্লাসেব মেযেদেব বলেছি আবো কতজনকে বলেছি '

বাবা হেসেছিলেন, এখন কথা না বাখতে পাবলে তাদেব মুখ দেখাতে পাববিনে--এই তো মানমর্যাদা সব যাবে?'

মিলি বলেছিল 'তা নয। কিন্তু তুমিই তো বাবা এতদিন বলে আসছ বড জাযগায বাস না কবলে মানুষেব আউটলুক বড হয না। মানুষেব আকাঙ্ক্ষাও বাডে না, ক্ষমতাও বাডে না।'

মা বলেছিলেন, 'দেখলে তো? তোমাব শেখানো বুলি দিযেই মেযে তোমাকে জব্দ কবছে। আসলে তোবা বড নিষ্ঠুব। আজকালকাব ছেলেবা মেযেবা সব সমান। একবাব উডতে শিখলে আব

তাদেব ধবে বাখা যায না। একবাব পাখা গজালেই হল।'

মিলি হেসে বলেছিল, 'তখন আছে মহানভ-অঙ্গন। তাই না মা?'

পাড়াব ক্লাবে দুঃসময কবিতাটি আবৃত্তি করে প্রতিযোগিতায় প্রথম পুবস্কাব পেযেছিল মিলি। প্রতিযোগিতাব কবিতা সে ভুলে যায না। যথাযোগ্য স্থানে সেইসব কবিতা থেকে উদ্ধৃতি বসিযে দিতে পাবে।

কলকাতায আসবাব এত উৎসাহ-উদ্দীপনা তবু দুদিন আগে থেকেই মন খাবাপ হযে গিযেছিল মিলিব। বাবা-মাব আগেই তাব চোখে প্রথমে জল এসে পড়েছিল।

মাযেব গলা জড়িযে ধবে বলেছিল, 'আমি না হয না গেলাম। বাবাকে বলে দাও—'

মা হেসে বলেছিলেন, 'কেন বে—'

মিলি বলেছিল, 'তোমাদেব কষ্ট হবে। দাদাবাও তো এখানে থাকে না। আমিও যদি চলে যাই একা একা ভাবি কষ্ট হবে তোমাদেব।'

মা হেসে বলেছিলেন 'দূরে তো তোকে পাঠাতেই হবে। আজ পড়তে যাচ্ছিস, দুদিন বাদে যাবি স্বামীব ঘব, শ্বশুবঘব কবতে তখনো তো আমাদেব একা থাকতেই হবে। আগে থেকেই অভ্যাস কবা ভালো।'

মিলি বলেছিল, 'আমি ওসব কোনদিন কববো না মা। তুমি ভেবো না।'

মা হেসে জবাব দিযেছিলেন 'যদি না কবিস তবেই তো বেশি ভাববাব কথা হবে।

শেষপর্যন্ত অবশ্য মনস্থিব করে সুটকেস আব বিছানাপত্র নিযে ছোড়দাব সঙ্গে কলকাতায বওনা হযে এসেছে মিলি।

স্টেশনে আবাব সেই বিদায দৃশ্য। বাবা মা দুজনেই স্টেশনে এসেছেন। মাযেব চোখ ছলছল। বাবা কিন্তু শান্ত স্থিব। গাম্ভীর্যেব মধ্যেও এক ধবনেব প্রসন্নতা ছড়ানো বযেছে মুখে এসেছে ক্লাসেব মেযেবন্ধুবা পাড়াব ক্লাবেব গুণগ্রাহী ছেলেবা।

মলয হেসে বলেছিল, 'মিলি তুই কি কলকাতায যাচ্ছিস নাকি লণ্ডন ফণ্ডন কোথাও যাচ্ছিস। শহবেব সব লোক তোব পাযে পাযে ছুটে এসেছে। এখন দেখছি মেযে হযে জন্মানোই ভালো ছিল।

মিলি বলেছিল 'আহা শুধু মেযে হযে জন্মালেই বুঝি হয?'

ট্রেনে আসতে আসতে মিলিব মনে হযেছিল তাব একটা অংশ যেন সে বাড়িতে বাবা মাব কাছে ফেলে এসেছে। আহা, তাই যদি হতো নিজেব খানিকটা অংশ দিযে আব একটি মিলি তৈবি করে সে যদি বাবা মাব কাছে বেখে আসতে পাবত। তাহলে ওঁবা সেই মিলিকে নিযে থাকতেন। আব এই মিলি নিশ্চিন্ত মনে কলকাতায পড়াশুনো কবত, শহবেব আনন্দ আহ্লাদেব মধ্যে মেতে থাকত, বাবা মাব জন্যে মন খাবাপ কবতে হতো না।

কিন্তু স্বর্ণসীতাব মত নিজেব কোন স্বর্ণপ্রতিমা তো বেখে আসা সম্ভব নয, মিলি মাব কাছে বেখে এসেছে তাব ছেলেবেলা থেকে এই সতেব বছব বযস পর্যন্ত বিভিন্ন সমযে তোলা ফটোগুলিব অ্যালবাম, তাব পুবস্কাব পাওয়া বইগুলি, মেডেলগুলি। এসব দেখে মিলিব কথা বাবা-মাব মনে পড়বে। এইগুলিব ভিতব দিযে সে বাবা মাব কাছে থাকবে। এইসব মিলিযে তাঁবা মনে মনে আব একটি মিলিকে তৈবি করে নিতে পাববেন।

ট্যাক্সি শ্যামবাজাব পাঁচমাথাব মোড় পেবোল, টালা ব্রীজ পেবোল, বি টি বোডে পড়ে খানিকটা এগিযে ঢুকল হাউসিং এস্টেটে।

সাবি সাবি ব্লক বাড়ি। বাড়িগুলিব কোন নাম নেই। শুধু ইংবেজী বর্ণমালা দিযে বাড়িগুলিব আলাদা পবিচয চিহ্নিত কবা হযেছে।

পূর্ণিমা বললেন, 'ট্যাক্সি আব এগোবে না। সর্দাবজী বোখকে।'

ট্যাক্সি ভাড়া পূর্ণিমা দিতে চাইছিলেন, মলয বলল, 'না দিদি তুমি কেন দেবে। আমাব কাছে টাকা আছে। সব মিলিব অ্যাকাউন্টে খবচ হচ্ছে। আমি নোট করে বাখছি। বাবাকে প্রতি নযা পযসাব হিসাব পাঠিযে দেব।'

চারতলায় ফ্ল্যাট। মালপত্র টেনে নিয়ে সেখানে যেতে হবে।

পূর্ণিমা বললেন, 'তুই একা পারবিনে মলয়। লোকজন কাউকে ডাক। রাস্তার মোড় থেকে কুলিটুলি একজন কাউকে নিয়ে আয়। ছেলেবা সব বাইরে। তোর জামাইবাবু সেই সকালবেলায় অফিসে রওনা হয়ে গেছেন। বাড়িতে ব্যাটাছেলে কেউ নেই। ও একটি ব্যাটাছেলে অবশ্য আছে।' পূর্ণিমা একটু হাসলেন। 'আমাদের টুকুর ছেলে হয়েছে তার বয়স আজ সতের দিন।'

মলয় বলল, 'তাহলে তাকে ডেকে নিয়ে এসো দিদি। তার সাহায্য নিতে আমার কোন আপত্তি নেই। তোমবা দুইজনেই তো অবলা।'

মিলি বলল, 'দিদি, ছোড়দা একটু খেলাধূলা করে কিনা তাই স্পোর্টসম্যান বলে অহঙ্কারের সীমা নেই। চল আমবা ওপরে চলে যাই। ও একা একা যা পাবে করুক।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবল আর অবলবা মিলে বাক্স বিছানা ওপরে নিয়ে এল। কলিংবেল টিপতে মাঝবয়সী একটি বিধবা স্ত্রীলোক এসে দোর খুলে দিল।

মিলি তাকে চেনে। দিদিদের বাড়ির পুরনো রাঁধুনী পদ্মা। কয়েক বছব ধরে আছে।

মিলি হেসে বলল, 'এই যে, ভালো আছ পদ্মদি?'

পদ্মা বলল, 'তুমি ভালো আছ তো?'

আরো একটি মেয়ে তাকে অভ্যর্থনার জন্যে এগিয়ে এল। ফর্সা ফুটফুটে ছোটখাট সুন্দর চেহাবা। হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়াল।

মিলি ওকেও চেনে। দিদির ভাগ্নী টুকু। দু'বছর আগে যখন এসেছিল মিলিব ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। তখন ছিল কুমারী। এখন জননী। অথচ তার চেয়ে দু-তিন বছবের মাত্র বড় হবে।

টুকু আগেব বন্ধুত্বকে স্বীকৃতি জানিয়ে বলল, 'কিবে তুই নাকি খুব ভালো পাশ কবেছিস মিলি?'

ঘবের ভিতব ঢুকে মিলি ওব কানেব কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বলল, 'তোব মত অত ভালো না। তুই তো একেবারে ডবল প্রমোশন পেয়েছিস।'

টুকু লজ্জিত হয়ে বলল, 'আহা।'

মিলি বলল, 'কই তোর ছেলে কই, দেখব।'

টুকু বলল, 'ওই তো।'

দেয়াল ঘেঁষে তক্তপোশ পাতা। তাব নিচে ছোট একটি বিছানায় একটি ক্ষুদ্র শিশু ঘুমোচ্ছে। সর্বাঙ্গ নীল চাদরে ঢাকা। মুখটুকু শুধু বাইরে আছে।

মিলি বলল, 'বা! ভাবি সুন্দর হয়েছে তো। ঠিক একেবারে পুতুলেব মত। টুকু তুই শেষপর্যন্ত পুতুলের মা হলি? সত্যিকারের মা বলে কিন্তু বিশ্বাস হয না।'

টুকু হেসে বলল, 'একেবারে বুড়ি থুড়থুড়ি। কী পাকা পাকা কথা।'

মিলি বলল, 'তুই পুতুলের মা। আর আমি পুতুলের দিদিমা। সম্পর্কে তোর এককাঠি ওপরে। কথায় পাকা হবে না তো কি হবে। ভালো করে চেয়ে দেখ পদ্মাদিব মত আমার চুলগুলিও বোধহয় সামনেব দিক থেকে পেকে গেছে।'

'এই কথার তুবড়ী, এদিকে আয। তুই এই ক'দিন এঘরে থাকবি। এই সুধেন্দু স্মিতাদেব ঘবে। এখনকাব মত সব এভাবে থাক। পরে খুলিস। এখন তাড়াতাড়ি চান করে দুটি খেয়ে নে। মুখ তো শুকিয়ে আমসি হয়েছে।'

মলয় জিনিসপত্রগুলি টানাটানি করে এঘরে এনে রাখছিল। পূর্ণিমাকে বলল, 'দিদি, আমার মুখের দিকেও একবার তাকিয়ো। পেটে আগুন জ্বলছে। মিলি চান করে করুক। আমার ধাবাস্নান হয়ে গেছে। আর সবুব সইছে না।'

পূর্ণিমা হেসে বললেন, 'চল, তোকে আগেই খাইয়ে দিই।'

মলয় বলল, 'হস্টেলে গিয়ে এখন আর কিছু পাব না। নইলে খাই খাই করে তোমাকে জ্বালাতাম না দিদি।'

পূর্ণিমা বললেন, 'তুই আবার এত ভদ্রতা শিখলি কবে থেকে। চল, তোকে খেতে দিই গিয়ে। জামা প্যান্ট বদলে নে তাড়াতাড়ি। মিলি তুইও তৈরি হয়ে নে বোন।'

মিলি বলল, 'যাই দিদি।'

কিন্তু ঘর থেকে বেরোবার আগে মিলি একবার ঘরখানার দিকে তাকাল। এঘরে সুধন্দুের খাট, আলমারি, বইয়ের র‍্যাক আছে। আছে দেয়ালে টানানো ওদের যুগল ফটো। দিদির বড়ছেলে আর তার বউ। গত বছর বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর ভিলাইতে চাকরি নিয়ে চলে গেছে।

মিলি ভাবল, সবাইকেই এমনি করে বাপ-মাকে ছেড়ে দূরে চলে যেতে হয়। কেউ পড়বার জন্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, কেউ বা চাকরির জন্যে দূরে চলে যায়। একসঙ্গে কাছাকাছি থাকবার আর জো নেই। কাছাকাছি থাকতে পারে, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে থাকতে পারে টুকু আর টুকুর ছেলে। মিলি এইভাবে বাপ-মাকে জড়িয়ে ধরে থেকেছিল, এখন আর তার মনে পড়ে না। তবে ইদানীং মা যে তার বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন সেকথা থেকে থেকে মনে পড়ছে। একসঙ্গে বসে কত গল্প, কত খুঁটিনাটি কথা। মা যেন মা নয়, তারই ক্লাসের আর একটি মেয়ে। সমবয়সী সখী। সেই বন্ধুত্ব জমে উঠতে না উঠতেই তাকে বেরিয়ে পড়তে হল আর এক আকাঙ্ক্ষার টানে। মা বলেন, 'তোর উচ্চাকাঙ্ক্ষা বড় বেশি।' উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকলে কি চলে? জীবনের কোন মানে আছে অ্যামবিশন ছাড়া। মিলি ভাবতে লাগে, সিঁড়ি বেয়ে সে কেবলি উঠছে, কেবলি উঠছে। সে ওঠার যেন আর শেষ নেই। আশেপাশে যাদের দেখে মিলি তাদের সবাই তো উচ্চাভিলাষী। দাদা, সুধেন্দুদা। সম্পর্কে বোনপো হলেও মিলি তাকে সুধেন্দুদা, কখনো বা সুধুদা বলে ডাকে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা সবারই আছে। বাবাও ত [illegible]। তিনিও কি চান না তাঁর মক্কেলের সংখ্যা আরো বাড়ুক, ওকালতিতে আরও নাম যশ হোক, টাকা আসুক। তিনিও কি চান না?

পূর্ণিমা তাড়া দিলেন, 'কই মিলি? গেলিনে নাইতে?'

মিলি বলল, 'যাই দিদি।'

॥ ২ ॥

খেয়েদেয়ে মলয় আর দেরি করল না। যাদবপুর ছুটল। সেখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। থাকে হস্টেলে।

পূর্ণিমা বললেন, 'সেকি, তুই এক্ষুণি চললি?'

মলয় বলল, 'মিলিকে লোকাল গার্জিয়ানের হাতে পৌঁছে দিয়ে গেলাম। বাবা মার অস্থাবর সম্পত্তি।'

পূর্ণিমা হেসে বললেন, 'আর তুই বুঝি স্থাবর সম্পত্তি? পাজি ছেলে।'

মিলি বলল, 'ছোড়দা, আজকের দিনটা থেকে গেলে পারতে না? কাল সকালে গিয়েই তো কলেজ করতে পারতে।'

মলয় বলল, 'তা পারতাম। কিন্তু কী আর হবে মিছিমিছি থেকে। ওখানে তো আবার গোছগাছ আছে। অমনিতেই কদিন কলেজ কামাই হল। তাছাড়া তোর ভাবনা কি। যা দরকার হয় দিদিকে বলবি। দিদি একাই তো দুশো। জামাইবাবুর একশ হর্সপাওয়ার ধরে বলছি।'

মলয় চলে গেল। মিলি ওকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল। ভাবল, ছোড়দা কেমন যেন একটু নিষ্ঠুর, খানিকটা যেন সেলফ্-সেন্টারড্ হয়ে পড়েছে। বাবা-মার কাছে নিয়মিত চিঠিপত্র দেয় না। তাঁরা অযথা উদ্বিগ্ন হন। কেমন যেন ছাড়া-ছাড়া ভাব ছোড়[illegible]। নিজের বন্ধুবান্ধব নিয়েই আছে। আর নিজের পড়াশুনো। মূল পরিবারের দূরে থাকলে এই রকমই কি হয়? মিলিও কি একদিন এমনি খানিকটা নির্লিপ্ত আর উদাসীন হয়ে যাবে? বাড়ির জন্যে আর এত টান এত মমত্ব এত বেদনাবোধ থাকবে না?

সন্ধ্যার পর তপন এল আসানসোল থেকে। মিলিকে দেখে বলল, 'এই যে তুই এসে গেছিস?'

মিলি বলল, 'আমি তো অনেকক্ষণ এসেছি। তুমি কোন রাজ্য জয় করে এলে তপনদা?'

সম্পর্কে বোনপো। কিন্তু প্রায় সমবয়সী বলে সম্বোধন আর ব্যবহার ভাইবোনের মত। তপন বি এসসি থার্ড ইয়ারে পড়ে। কলেজ আর বাড়ির চেয়ে পাড়ার ক্লাব আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেই ওর বেশি অন্তরঙ্গতা। দিদি পুত্রচরিত্র বর্ণনা করছিলেন, মিলির মনে পড়ল। এধরনের ছেলে জলপাইগুড়িতেও দেখেছে। তারা যেন ঘরের না, বাইরের। পথের সঙ্গেই তাদের সম্পর্ক বেশি। নিজেদের বাড়িঘর আর বাবা-মার কথা ছাড়া মিলি তো অন্য কিছু ভাবতেই পারে না।

'দিদি, জামাইবাবু কখন আসবেন?' মিলি এবার গৃহকর্তার সন্ধান নিল।

পূর্ণিমা বললেন, 'তোর জামাইবাবুর কথা আর বলিসনে। তিনি সকাল আটটায় বেরোন আর রাত বারোটায় ফেরেন।'

'বল কি দিদি, অতক্ষণ অফিসে কাজ করেন? ষোল ঘণ্টা? তুমি যেমন ষোলকলার পূর্ণিমা তিনি তেমনি ষোল ঘণ্টার চাকরে?'

রান্নাঘরের সামনে বঁটি পেতে বসে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছিলেন পূর্ণিমা। মিলির কথার জবাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি হাসলেন, খুব কথা শিখেছিস। এত কথা কোথায় পাস বল তো।'

মিলি বলল, 'কী জানি দিদি, কোত্থেকে যে পাই কী করে বলব। পরীক্ষার খাতায় সব তো মুখস্থ বিদ্যা ঢেলে দিয়ে আসি। ডায়াসে উঠে যা আবৃত্তি করি তাও তো পরের কবিতা। রবীন্দ্রনাথ কি নজরুল কি সুকান্তের। ভাবি, আমার অরিজিন্যালিটি বলে কিছু নেই। কিন্তু তোমাদের সঙ্গে যখন কথা বলি দিদি সে কথা কোত্থেকে যে বানিয়ে বানিয়ে ওঠে—আমি নিজেই বুঝতে পারিনে।'

পূর্ণিমা ঠোঁট টিপে হেসে বললেন, 'আমি জানি, কে বানায়। বলব?

'বল না।'

পূর্ণিমা তেমনি হাসলেন, 'কথা বানিয়ে বানিয়ে দেয় তোর বয়েস।

মিলি লজ্জিত হয়ে বলল, 'আহা।'

ওঁর মুখের দিকে চেয়ে মিলির মনে হয় তার এই মায়ের বয়সী দিদিটি যেন এই মুহূর্তে নিজের বয়সের কথা ভুলে গেছেন। এই মুহূর্তে তিনিও যেন পূর্ণযৌবনা, নবযৌবনা তিনি যেন মিলির সঙ্গে অভিন্নদেহিনী।

মিলি ভাবল তার এই বয়েসের কথা কই তার নিজের তো তেমন মনে থাকে না। কিন্তু অন্য সবাই, বিশেষ করে যাদের বয়স হয়েছে, কি মেয়ে কি পুরুষ তারা সেই বয়স্থা বয়স্করাই যেন যৌবনমনস্ক বেশি।

মাঝে মাঝে মাও বাবাকে বলেন, 'মেয়ের বয়েস হচ্ছে। এখন থেকে তৈরি হও

মিলি আড়াল থেকে শোনে। বয়স হচ্ছে একথা যেন কাউকে বলে দিতে হয় মনে করিয়ে দিতে হয়। নিজের প্র্যাকটিস নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও বাবা সংসার সম্বন্ধে উদাসীন নন। ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে বেশ সচেতন।

হঠাৎ জামাইবাবুর অফিসের কথা মনে পড়ল মিলির।

'ওর অফিস তো বেশ দূরে।'

পূর্ণিমা বললেন, 'দূরে বই কি। যাতায়াতে শুনেছি ঘণ্টা চারেক করে লাগে।

জিজ্ঞাসা করল, 'ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করেন?'

'তাই তো করতে হয়। ইলেকট্রিক ট্রেন। তাতেও কত সময় লাগে। স্টেশনে নেমে সেখান থেকে আবার হাঁটতে হয়। সাইকেল রিকশা-টিকশাও আছে শুনেছি।' মিলি বলল, ভারি মজার তো। তুমি গেছ সেখানে?'

পূর্ণিমা হেসে বললেন, 'রাম বলো। বিশ পঁচিশ মাইল পথ ঠেঙিয়ে অজ পাড়াগাঁয়ে উনি যান পেটের দায়ে। আমি সেখানে গিয়ে কী করব?'

মিলি বলল, 'যাই বল দিদি, ভারি মজার চাকরি। আমরা থাকি উকিল পাড়ায়। সেখান থেকে বাবার কোর্ট কত কাছে। মিনিট কয়েকের পথ। কিন্তু এই যে রোজ ট্রেনে করে যাওয়া আবার দুদিকের গাছপালা বাড়িঘর দেখতে দেখতে ট্রেনে করে ফিরে আসা কী মজার। শুনতেই তো রোমান্টিক লাগছে।'

পূর্ণিমা হেসে বললেন, 'তুই তো রোমান্টিক বলছিস। কিন্তু যে রোজ যায় তার তো প্রাণ যায়। এই বয়সে অত ছুটোছুটি করতে ভারি কষ্ট হয় তোর জামাইবাবর। রোজ সমানে নাওয়া-খাওয়া হয় না।'

'কেন, খেয়ে যান না বাড়ি থেকে ?'

'অত সকালে খাওয়ার অভ্যাস নেই। দুপুর বেলায় গুদামেই খান। একজন লোক আছে সে রান্না করে দিয়ে যায়। সে আবার মাঝে মাঝে কামাই করে।'

মিলি বলল, 'দিদি, আমার যখন লম্বা ভেকেশন থাকবে আমি যাব জামাইবাবুর সঙ্গে।'

পূর্ণিমা বললেন, 'ওমা, তুই সেখানে গিয়ে কী করবি।'

মিলি বলল, 'জামাইবাবুকে রেঁধে খাওযাব।'

পূর্ণিমা হেসে বললেন, 'ওরে বাবা। কী সোহাগ। একথা শুনলেই তোর জামাইবাবু ভবা পেটে ঢেঁকুর তুলতে শুরু করবেন দেখে নিস। তুই রাঁধতে জানিস যে রেঁধে খাওয়াবি ? কেবল তো পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করেছিস।'

মিলি বলল, 'ঈস ! তুমি একবার পরীক্ষা করে দেখ না। তোমার রান্নাঘরের ভার দিয়ে দেখ একদিন আমার হাতে।'

পূর্ণিমা হেসে বললেন, 'দেব। তুই যা মাযাবিনী সব ভার কেড়ে না নিস।'

তরকারি কোটা শেষ করে পূর্ণিমা অন্য কাজে হাত দিলেন। মিলি লক্ষ্য করল তিনি কখনো চুপচাপ বসে থাকেন না। কাজেব লোক আছে তবু পূর্ণিমার নিজের হাত কামাই নেই। কখনো ঘর ঝাঁট দিচ্ছেন, কখনো বিছানা পাতছেন, কখনো টুকুর ছেলেকে কোলে নিয়ে সোহাগ করছেন।

মিলি বলল, 'দিদি, তুমি একটি আস্ত ক্রিয়াপদ। তোমার হাত দুখানা বোধহয় সব সময় কিছু না কিছু ধরতে চায। দেখে মনে হয় যেন দশভূজা।'

পূর্ণিমা হেসে বললেন, 'তোবও ঘরসংসার হোক, দেখবি তোবও আব আটখানা হাত বেরিয়েছে।'

পূর্ণিমা বলছিলেন মুকুন্দবাবুব ফিবতে রাত এগাবো বারোটাও হয। অফিস থেকে সোজা বাড়ি আসেন না। যান তাসেব আড্ডায। বন্ধুদেব সঙ্গে তাস-টাস খেলে তবে বাড়ি ফেবেন।

প্রথম প্রথম পূর্ণিমা বাগ করতেন।

'এ কী আচবণ তোমাব ? সেই সকালে যাও আব বাত দুপুবে ফের। বাড়িব আর মানুষগুলি রইল কি মবল তা নিযে কোন চিন্তাও নেই ভাবনাও নেই।'

মুকুন্দবাবু স্ত্রীর অভিযোগে বাগ কবেন না, মুখ টিপে হাসেন, বলেন, 'চিন্তা-ভাবনা কি না থেকে পাবে ?'

পূর্ণিমা বলেন, 'ছাই আছে। তোমাব চালচলন দেখে মনে হয় না তোমাব ঘবসংসাব বলে কিছু আছে। দিনভর অফিস আব বাতভব আড্ডা।'

মিলি বলল, 'তাতে জামাইবাবু কী বলেন ?'

পূর্ণিমা বললেন, 'তোব জামাইবাবুব কথা আব বলিসনে। তিনি বলেন, নিজেকে এমন আডাল কবে বেখেছি বলে তবু খোঁজটোজ কব, নইলে সেটুকুও কবতে না। শোন কথা।'

মিলির ভাগ্য ভালো। জামাইবাবু আজ আব অত দেরি কবলেন না। কী কাবণে যেন তাঁদের তাসেব আড্ডা আজ সকাল সকাল ভেঙে গেছে।

কলিং-বেলেব শব্দে এগিয়ে গিযে পূর্ণিমা নিজেই দোর খুলে দিলেন।

স্বামীকে দেখে হেসে বললেন, 'ব্যাপার কি, আজ যে এত সকাল সকাল। আজ কোন্‌দিকে সূর্য উঠেছিল ?'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'পূর্বদিকে ওঠেনি দেখাই যাচ্ছে।'

'ধন্যবাদটা আমার প্রাপ্য বউদি ! আমিই আজ ঠেলেঠুলে মুকুন্দকে তুলে এনেছি। পাছে আর কোন আড্ডায় গিয়ে বসে তাই একেবারে হাতে হাতে সঁপে দিযে গেলাম।'

আর এক ভদ্রলোক যে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িযেছিলেন মিলি তা লক্ষ্য করেনি, বোধহয় পূর্ণিমাও

লক্ষ্য করেননি। একটু লজ্জিত হয়ে তিনি মাথার আঁচল তুলে দিলেন। তারপর তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'ও, আপনিও এসেছেন নীলধ্বজবাবু! আমি ঠিক দেখতে পাইনি।'

নীলধ্বজ বললেন, 'আমার চেহারাটাও যেমন, ভাগ্যটাও তেমনি। আমি চট করে কারো নজরে পড়িনে। পাছে মনে করেন আড়ি পেতে আপনাদের দাম্পত্যালাপ শুনছি, তাই তাড়াতাড়ি নিজেকে জানান দিলাম।'

পূর্ণিমা বললেন, 'বুড়ো বয়সে আবার দাম্পত্য আলাপ। আসুন, ভিতরে আসুন।'

বাইরের ঘরখানি একই সঙ্গে বেডরুম আর ড্রয়িংরুম। একদিকে একখানি ডিভান আর একদিকে খান দুই সোফা, দুখানা কুশন-আঁটা নিচু চেযার। তার একটিতে তাঁকে বসতে বললেন পূর্ণিমা।

তারপর হেসে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—আমার বোন মিলি। খুব গুণী মেয়ে। এবার হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় বেশ ভালো রেজাল্ট করেছে। কত পেয়েছিস যেন মিলি? সাতশ বিশ? তাই না? নাচতে পারে, গাইতে পারে, আবৃত্তি প্রতিযোগিতায ফার্স্ট হয়—'

মিলি বাধা দিয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'দিদি কি হচ্ছে এসব?'

পূর্ণিমা হেসে বললেন, 'আর বলব না। ওর আরো গুণ আছে। সেগুলি আপনি নিজেই টের পাবেন। আর ইনি আমাদের বন্ধু নীলধ্বজ চক্রবর্তী, ম্যাজিশিযান।'

মিলি কৌতূহলী হয়ে বলল, 'ম্যাজিশিয়ান! উনি ম্যাজিক দেখান নাকি?' মিলি বিস্মিতভাবে ধুতি পাঞ্জাবি পরা সাধারণ দর্শন এই ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। ওঁর হাতে কোন যাদুদণ্ড নেই। চোখের দৃষ্টি তেমন তীব্র উজ্জ্বল বলে মনে হল না। যাদুকরের চোখে নাকি হিপনটাইজ করার মতো শক্তি থাকে। কিন্তু ওর দৃষ্টিতে কি সেই শক্তি আছে? বরং তাতে একটু অসুস্থতার ছোপ লেগেছে বলে মিলির মনে হল। সে চোখ ফিরিয়ে নিল। দিদি বললেন, 'প্রণাম কর মিলি।'

জামাইবাবুর এই সমবযসী বন্ধুকে হাত জোড় করে নমস্কার করবে কিনা মিলি ভাবছিল। পূর্ণিমার নির্দেশে ব্যাপারটা সহজ হল। সে সঙ্গে সঙ্গে প্রণাম করল। একজনকে নয়, তিন গুরুজনকেই।

পূর্ণিমা বললেন, 'আহা আবার আমাকে কেন।'

নীলধ্বজ বললেন, 'আপনাকেই তো করবে।'

পূর্ণিমা বললেন, 'কেন, আমি ছাড়া কি আর এখানে কেউ ওর প্রণম্য নেই?'

নীলধ্বজ বললেন, 'সে তর্কের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় আমের পল্লবে ঢাকা সিঁদুরের পুত্তলী আঁকা ওই পুণ্যঘটটিতে প্রণাম করলেই তা সবাইর কাছে গিয়ে পৌঁছত।'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'নীলধ্বজ তোমার স্তব-স্তুতিতে রাত ভোর হযে যাবে দেখছি। বিয়েটিয়ে তো করনি। কিন্তু মেয়েরা যে স্তুতিতে বশ তা কী করে জানলে?'

নীলধ্বজ হাসলেন, 'এই সামান্য কথাটুকু জানবার জন্যে বিয়ে করবার দরকার হয না। বরযাত্রী গেলেই চলে। তুমি না হয় স্থায়ী কল্পতরু পেয়ে গেছ। না চাইতেই তিনি সব দেন। কিন্তু আমাদের এক কাপ চা এক খিলি পানের জন্যে পৃথিবীর সমস্ত কাব্য আর সংগীত—'

পূর্ণিমা হেসে বললেন, 'মতলব নিজেই ফাঁস করে দিলেন। আপনাকে আর কিচ্ছু দিচ্ছিনে। একখিলি পানতো ভালো এককুচি সুপরিও যদি পান তো কী বলেছি। মিলি দু'কাপ চায়ের জল বসাতো বোন তাড়াতাড়ি।'

মিলি চলে যাচ্ছিল, মুকুন্দবাবু বললেন, 'আবার দু'কাপ কেন। আমার জন্যে করতে হবে না। আমি চায়ের ভক্ত নই।'

পূর্ণিমা বললেন, 'তুমি ছাড়া বুঝি আর কেউ নেই এখানে? ওঁকে জলপানি না দিলে চলে? উনি একা একা করেই বা চা খান?'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'আশ্চর্য ব্যাপার। জীবনে একা একা পথ চলবে বলে যে বিয়ে থা করল না সে এক কাপ চা পর্যন্ত কারো সঙ্গে ছাড়া খেতে পারে না।'

পূর্ণিমা বললেন, 'আর তুমি ঠিক উল্টো। বিয়ে থা করেছ, ছেলেপুলে হয়েছে অথচ সকাল থেকে রাত্তি বারটা পর্যন্ত সেকথা তোমার মনে থাকে না। দিব্যি একা একা—'

জামাইবাবুর উদ্দেশ্যে দিদির এই মধুর গঞ্জনাটুকু শুনতে শুনতে মিলি চা করতে চলে গেল।

সে যেন হঠাৎ বয়স্কদের রাজ্যে প্রবেশের অধিকার পেয়ে গেছে। ওঁদের কথাবার্তা হাসি-কৌতুকের স্বাদ যেন আলাদা। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল এসব তার শোনা সঙ্গত নয়। এখানে দাঁড়িয়ে থাকা তার পক্ষে অশোভন। বাবা-মা যখন নিজেদের মধ্যে কি ওঁদের বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব হাসিঠাট্টা করেন মিলিদের সেখানে থাকতে দেন না। কিন্তু এখানে এসে মনে হচ্ছে দিদি-জামাইবাবু তাকে সমান অধিকার দিয়েছেন। তাঁরা যদি মিলিকে না যেতে বলেন সে কী করে যায় ? এ যেন ছেলেবেলায় নভেল পড়ার মত। ক্লাস সিক্স্ সেভেন থেকেই মিলি লুকিয়ে লুকিয়ে নভেল পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র তার ওই বয়সেই শেষ। মা একদিন ধরে ফেললেন। খুব বকুনি লাগালেন। তারপব অবাক কাণ্ড। মিলিকে অনুমতি দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা পড়। কিন্তু ওই বঙ্কিম, রবীন্দ্র, শরৎচন্দ্র পর্যন্ত। তারপরে আব হাত বাড়িয়ো না। যখন সময় হবে আমি নিজেই তোকে আধুনিকদের লেখা পড়তে দেব।'

বছব দুয়েকের মধ্যে বাবা-মা সববকম নিষেধাজ্ঞাই প্রায় তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু মিলির মনে হয় নভেল-নাটক লুকিয়ে পড়ায় যেমন মজা বেশি, পারমিশন নিয়ে পড়ায় তেমন নেই। তেমনি গুরুজনদের রহস্যালাপ আড়াল থেকে অল্পস্বল্প শুনতেই বেশি ভালো লাগে। একেবারে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে শুনলে যেন অস্বস্তি বোধ হয়। মনে হয় গুরুজনরা যেন তার অস্তিত্ব গ্রাহ্য কবছেন না কিংবা আচমকা তাকে নিজেদেব সঙ্গে টেনে নিচ্ছেন।

মিলি অবশ্য চা ভালোই করে। তবু তার একটু আশঙ্কা ছিল চা খেয়ে সদ্যপরিচিত ভদ্রলোক না যেন কী বলেন।

পূর্ণিমা বললেন, 'কেমন হযেছে মিলির চা ?'

নীলধ্বজ বললেন, 'মিলি তার দিদিব মান রেখেছে।'

পূর্ণিমা বললেন, 'থাক আপনাকে আর মন রাখা কথা বলতে হবে না। মিলি আমাব চেয়েও বেশ ভালো চা কবে।'

নীলধ্বজ বললেন, 'কথাটা আমি আগে বলতে ভবসা পাচ্ছিলাম না।'

পূর্ণিমা একটু ভ্রূকুঞ্চন করলেন, তাবপর হেসে বললেন. 'যেখানে সেখানে ভয় পাওয়াটা আপনার একটা বাতিক। নিশ্চযই ভযঙ্কব ভয়ঙ্কর কাণ্ড অনেক করেছেন তাই এই আতঙ্ক। যাকগে। আপনার আতঙ্ক নিযে আপনি থাকুন। মিলিব কবা চা খেলেন ওকে দু-এক নম্বব ম্যাজিক দেখিয়ে দিন দেখি।'

নীলধ্বজ হেসে উঠে দাঁড়ালেন, 'এত বাত্রে যদি ম্যাজিক দেখাতে যাই আমার বন্ধু মুগুর নিয়ে তাড়া কববে। আমাব যাদুদণ্ড গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙ্গে পডবে; সেই বিস্ক নিতে চাইনে বউদি।'

পূর্ণিমা হাসি মুখে চুপ করে রইলেন।

নীলধ্বজ বললেন, 'তাছাড়া আপনি ঠিক জানেন কিনা জানিনে বউদি, ম্যাজিক আমি দেখি বেশি, দেখাই কম। সেইজন্যেই বোধ হয আমাব কোন দিক থেকে কিছু হল না।'

কথাটা হাসতে হাসতেই বললেন নীলধ্বজ কিন্তু কোথায় যেন একটু বেদনার সুর বাজল।

মিলি ঠিক বুঝে উঠতে পাবল না এসব কথার মানে কি। হয়তো দিদি-জামাইবাবুরাই তা জানেন। কনটেক্সটা না জানা থাকলে কি কোনকিছুর ব্যাখ্যা করা যায় নাকি ? মিলি নিজের মনেই একটু হাসল।

এবার বিদায় নেওয়াব জন্যে নীলধ্বজ পা বাড়ালেন। মিলির দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'চলি মিলি। তোমার চা সত্যিই খুব ভালো হয়েছে। আর একদিন এসে তোমার নাচ দেখব, আবৃত্তি শুনব।'

মিলি বলল, 'আব আপনাব ম্যাজিক ? তা কবে দেখাবেন ?'

নীলধ্বজ হেসে বলল, 'বেশ তো, দেখো একদিন।'

যেতে যেতে আবার ফিরে এলেন নীলধ্বজবাবু, মিলির আরো কাছে ঘেঁষে এসে বললেন, 'না, কলমটা নিয়েই যাই। আমার কলমটা দিয়ে দাও না মিলি।'

মিলি বিস্মিত হয়ে বলল, 'আপনাব কলম নিয়ে আমি কি করব ?'

'হ্যাঁ. সামান্য একটা ডট পেন, ওটা দিয়ে তুমি আর কি করবে ? তোমাকে আমি একটা ভালো কলম প্রেজেন্ট করব। ডট পেনটা দিয়ে দাও লক্ষ্মীটি।'

মিলি হতভম্ব। একটু বাদে বলল, 'ওমা আমি আপনার ডট পেন আবার কখন নিলাম।' নীলধ্বজ বললেন, 'সেকালে মোক্তার মুহুরীদেব মত ওইতো কানে গুঁজে রেখেছ।'

মিলি সঙ্গে সঙ্গে তার ডান কানে হাত দিয়ে ডট পেনটি পেয়ে গেল। তারপর হেসে বলল, 'এতো আপনিই কখন যেন গুঁজে রেখেছেন। এই আপনার ম্যাজিক ? এতো সাধারণ হাত সাফাই।'

নীলধ্বজ মৃদু হাসলেন, 'যা বলেছ। ওইরকম একটু হাতসাফাই-টাফাই-ই জানি। তার চেয়ে বেশি কিছু পারি নে।'

মিলি বলল, 'এই ডট পেনটিকে সোনার কলম যদি করে দিতে পাবেন তাহলে বুঝি।'

নীলধ্বজ একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'সেই স্পর্শমণি আমাব মধ্যে নেই মিলি, তোমার মধ্যে আছে। তুমিই পার এই ডট পেনটিকে সোনার কলম কবে তুলতে।'

মিলির মনে হল তার সারা গা যেন কাঁটা দিয়ে উঠেছে, ভয়ে নয়, অন্য কোন অনুভূতিতে। ছেলেদের স্তুতিবাক্য সে একেবারে না শুনেছে তা নয় কিন্তু নীলধ্বজ যা বললেন তাকে ঠিক যেন স্তুতি বলা যায় না, তা যেন স্তব। কোন দেবী প্রতিমাকে মিলির মধ্যে দেখতে পেলেন. কে জানে। এর নামই কি যাদুমন্ত্র ?

পূর্ণিমা হেসে বললেন, 'আমাদের মিলি যে এত বড় যাদুকরী তা তো জানতাম না। ওকে আপনি যে আকাশে তুলে দিলেন সেখান থেকে ওকে এখন নামাব কী কবে। ওতো আর মাটি দিয়ে হাঁটতেই চাইবে না।'

মিলি লজ্জিতভাবে চুপ কবে বইল। নীলধ্বজ কোন জবাব না দিয়ে স্মিতমুখে একটু তাকিয়ে চলে যাচ্ছিলেন ; মিলি বলল, 'আপনার কলমটা— ।'

নীলধ্বজ বললেন, 'ওটা তোমার।'

পূর্ণিমা বললেন, 'বাঃ রে। এই না আপনি বললেন আপনি মিলিকে একটা দামি কলম উপহাব দেবেন। এখন ওই ডট পেন দিয়ে ভোলাতে চাইছেন ?'

নীলধ্বজ পূর্ণিমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন, 'যা বলেছেন। দামি জিনিস আব কোথায় পাব। আমি তুচ্ছ জিনিস দিয়েই ভোলাই, পরকে নয়, নিজেকে।'

পূর্ণিমা বললেন, 'যাঁরা ম্যাজিক জানেন তাঁদের আবার জিনিসের অভাব হয নাকি ?' নীলধ্বজ বললেন, 'সেই ভোজবাজির জিনিস কি আব সংসারের ভোগে লাগে বউদি ?'

পূর্ণিমা বললেন, 'বিয়ে থা কবলেন না। ঘরসংসার কিছু হল না। আপনার তো কোন খবচই নেই। এত টাকা দিয়ে করেন কি বলুন তো!'

নীলধ্বজ মৃদু হেসে বললেন, 'সব যে ম্যাজিকেব টাকা বউদি। সে টাকা খেলা ভাঙবাব সঙ্গে সঙ্গেই উড়ে যায়।'

ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি এবার সিঁড়ির দিকে এগোতে লাগলেন।

দিদি-জামাইবাবুর সঙ্গে মিলিও সিঁড়ি পর্যন্ত গেল।

মুকুন্দবাবু বললেন, 'আমি আর নিচ পর্যন্ত গেলাম না নীলু।'

নীলধ্বজ বললেন, 'না না, তোমার আর নামবার দরকার কি।'

মুকুন্দবাবু স্ত্রীব দিকে চেয়ে বললেন, 'জানো, নীলধ্বজ আজ আমাদের ক্লাবে এসেছিল খেলা দেখতে। ওর খেলা আলাদা, আমাদের খেলা আলাদা। গাড়িতে করে আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল। আমি বললাম, তোমার পুবনো অস্টিনটা এবার বেচে দাও নীলু। দিয়ে নতুন মডেলের গাড়ি কেন। আর এতকাল বাদে কী যে একখানা ভাঙাচোরা ক্লাইভের আমলের বাড়ি কিনলে। ওটা বিক্রি করে দাও। দিয়ে নতুন বাড়ি করো। লেকটাউনে ভালো জায়গা আছে।'

নীলধ্বজ হাসলেন, 'এরপর বোধহয় বলবে মুকুন্দ এই পুরনো দেহখানা কাউকে দিয়ে দাও। নতুন তাজা এক দেহের মধ্যে ঢুকে পড়। ম্যাজিশিয়ান যখন তখন তো অসাধ্য কিছু নেই।'

সিঁড়িতে তাঁব পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলে মিলিরা ফিরে এল।

মিলি ভাবল, ম্যাজিশিয়ানরা খুব স্ফূর্তিবাজ হন শুনেছি। কিন্তু এ ভদ্রলোক এত দীনদুঃখীর মত কথা বলছেন কেন? ওঁর কিসের দুঃখ?

তপন এঘরের দরজায় একবার মুখ বাড়িয়ে পাশের ঘরে চলে গিয়েছিল। টুকুর সঙ্গে বসে গল্প করছিল সেখানে।

খাওয়ার টেবিলে আবার সবাই জড় হচ্ছেন। মুকুন্দবাবু তপনকে বললেন, 'কীরে, তুই একবার এঘরে এলিই না।'

তপন বলল, 'ওসব ম্যাজিক-ট্যাজিক আমার ভালো লাগে না বাবা। এই বিজ্ঞানের যুগে যত সব ছেলেমানুষি। বিজ্ঞান অন্য ম্যাজিক দেখাচ্ছে।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে খাওয়া শেষ করে তপন উঠে পড়ল

কিন্তু ম্যাজিক আর ম্যাজিশিয়ান সম্বন্ধে মিলির কৌতূহল যেন শেষ হতে চায় না।

শেষ হল না। সে মুকুন্দবাবুর কাছে তাঁর এই ম্যাজিশিয়ান বন্ধুর গল্প শুনতে লাগল।

'ওই নীলধ্বজ নামটা কি ওঁর আসল নাম, জামাইবাবু।' মুকুন্দবাবু বললেন, 'না না ওটা ট্রেড নেম। কলেজে যখন পড়তে আমরা ওর আরো একটা নাম দিয়েছিলাম ডন কুইকসট।'

মিলি বলল, 'কেন জামাইবাবু?'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'ওর ওই উদ্ভট চালচলনের জন্যে। জানিস তো ডন কুইকসটের গল্প? উইণ্ড মিলকে দৈত্য মনে করে তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, টাট্টু ঘোড়াকে বানিয়েছিলেন উচ্চৈঃশ্রবা। পড়িস্নি সেই নাইটের গল্প?'

মিলি বলল, 'ছোট বই একখানা পড়েছি। বাংলা অনুবাদে।'

মুকুন্দবাবু বললেন, বড় বইখানা ওই নীলধ্বজের কাছেই আছে। চেয়ে এনে দেব পড়িস। ওই অদ্ভুত স্বভাব ওর এখনো আছে। কিন্তু ও যে শেষ পর্যন্ত ম্যাজিক দেখানো ওর প্রফেসন করে ফেলবে আমরা ভাবতেই পারিনি তার আগে অনেক কিছু করেছে। কেরানীগিরি, কলেজের মাষ্টারি, বিজ্ঞাপনের কপি লেখা। কোন কিছুতেই টিকে থাকা ওর স্বভাবে নেই। ম্যাজিকটাও শুনেছি ছেড়ে দিয়েছে দল ভেঙ্গে গেছে। এখন বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকে। বুঁদ হয়ে বসে বই পড়ে। কত পুরনো বই যে জড় করেছে তার ঠিক নেই। বাড়িতো নয়, এক বইয়ের দোকান।'

'সব বুঝি ম্যাজিকের বই?

'শুধু ম্যাজিকের বই কেন হবে? সব রকম বই ই আছে। নভেল নাটক, কাব্য দর্শন।'

মিলি বলল, 'পড়তে দেন বই?'

মুকুন্দবাবু হেসে বললেন 'তোকে নিশ্চয়ই দেবে।

মিলি বলল 'আহা। নিয়ে যাবেন একদিন আমাকে ওর বাড়িতে?'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'তোর তো ভারি সাহস। ওই যাদুকরের বাড়িতে যাবি শেষে যদি হিপনটাইজ টিপনটাইজ করে বসে?'

মিলি বলল, 'ঈস করলেই হল। আমি বুঝি আর হিপনটাইজ করতে জানিনে?'

মুকুন্দবাবু হেসে উঠে স্ত্রীকে বললেন 'ওগো শুনছ মিলিও নাকি হিপনটাইজ করতে জানে? যাদুকরকে যাদু করা। নীলধ্বজকে পরে হিপনটাইজ করিস মিলি। আগে আমার ওপর দিয়ে পরীক্ষাটা চালা। চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম।'

মিলি ভারি লজ্জিত হল। জামাইবাবু যে তার কথাটার এমন অর্থ করবেন কে জানত। দিদি এসে তাকে রক্ষা করলেন। স্বামীকে বললেন, 'বুড়ো বয়সে সখ দেখে আর বাঁচিনে। চার বিবির বশ হয়ে আছ তাতে বুঝি আর কুলোয় না?' মুকুন্দবাবু বললেন, 'চার বিবি আবার কোথায় পেলে? আমি তো একজন ছাড়া দ্বিতীয় জনকে জানিনে।'

পূর্ণিমা বললেন, 'থাক, বাজে কথা বলে আর মন ভোলাতে হবে না। আমি তো এখন বুড়ী। কিন্তু তোমার ওই তাসের ছুঁড়ীদের কোনদিন যৌবন যায় না।'

মুকুন্দবাবু হেসে উঠলেন, 'ও সেই কথা। তুমি তো আমাকে রীতিমত ঘাবড়ে দিয়েছিলে।'

মিলি বলল, 'তুমি ভেব না দিদি। কাল থেকে জামাইবাবুর তাস খেলা ব্যান করে দিচ্ছি।'

তারপর মুকুন্দবাবুর দিকে চেয়ে তর্জনী তুলে লীলায়িত ভঙ্গিতে বলল, 'কাল থেকে যদি সন্ধ্যার পর অফিস থেকে সোজা বাড়িতে চলে না আসেন কঠোর শাস্তি—'

হাত মুখ ধোয়া হলে পূর্ণিমা বললেন, 'যা, আর রাত জাগতে হবে না। তুই গিয়ে সুধেন্দুদের ঘরে শুয়ে পড়। বিছানা পেতে রেখে এসেছি।'

'তুমি কোথায় শোবে দিদি?'

পূর্ণিমা বললেন, 'আমি তোর পাশেই শোব। টুকুও থাকবে ওই ঘরে ওর ছেলে নিয়ে। ওকে তো আর একা একঘরে রাখতে পারিনে। মাঝখানেব ঘরে তপন থাকে আজকাল।'

মিলি বলল, 'আর জামাইবাবু?'

পূর্ণিমা বললেন, 'খুব যে জামাইবাবুর খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে। জামাইবাবুর কোন ব্যবস্থা হয়নি। তুই ব্যবস্থা করবি তবে হবে।' তারপর একটু হেসে বললেন, 'উনি বাইরের ঘবে ডিভানে শোবেন।'

মিলি বলল, 'কেন দিদি, আমি বরং বাইরের ঘরে থাকি। আমার একা একা শোয়ার অভ্যাস আছে। তোমরা ভিতরের ঘরে—'

পূর্ণিমা হেসে বললেন, 'থাক তোমাব আর ম্যানেজারি করতে হবে না। কী বিচার বিবেচনা। আমার বোন তো নয় যেন দিদিশাশুড়ী।'

শাড়ি-টাডি বদলে মিলি এসে শুয়ে পড়ল। শোয়ার আগে ড্রেসিং টেবিলের ওপর খুলে বাখল হাতঘড়ি, চুলেব কাঁটা, আব জামায় গুঁজে রাখা সেই ডটপেনটি।

পূর্ণিমা বলেছেন, 'উনি যখন দিয়েছেন যত্ন করে বেখে দিস কলমটা।'

তারপর হেসে বলেছেন, 'বলা যায় না ম্যাজিশিয়ানের কলম। কোন দিব্যগুণ থাকতেও পাবে।'

মিলি বলেছিল, 'আহা, এতই যদি গুণাগুণে বিশ্বাস তোমার তুমি নিজেই রেখে দাও না কলমটা।'

পূর্ণিমা বলেছেন, 'ঈস, তোকে আদর করে দিয়েছেন আমি কেন নেব?'

পূর্ণিমা ডটপেনটা খুলে একটু নেড়েচেড়ে দেখল। সত্যিই কোন কলাকৌশল আছে কিনা কে জানে। যাদুকব তাকে একটা সাধারণ ডটপেন দিযে গেছেন বিশ্বাস কবতে ইচ্ছা কবে না। হয়তো একটু বাদে দেখবে পেনটা আস্তে আস্তে নডছে। নিজেই তার দিকে এগিয়ে আসছে। হযতো দেখবে ডটপেনটা একটা সুন্দর পুতুল হয়ে গেছে কি ছোট্ট একটি ট্রানজিসটার রেডিও।

আচ্ছা মহাভাবত ঘেঁটে ঘেঁটে হঠাৎ এই নীলধ্বজ নামটা কেন নিলেন ভদ্রলোক। আব কি কোন নাম পেলেন না। নীলধ্বজের স্ত্রীব নাম জনা। নীলধ্বজ বীর নন কিন্তু জনা বীবাঙ্গনা। ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন অর্জুনের সঙ্গে লডতে। মাইকেলেব বীবাঙ্গনা কাব্য থেকে বাবা একদিন পড়ে শুনিয়েছিলেন। বাবা খুব ভালোবাসেন মাইকেলেব লেখা। জনা নামও আজকাল আব কেউ রাখে না। শুনতে কিন্তু মন্দ নয়। টুকু ছেলেকে কোলের কাছে শুইযে অঘোবে ঘুমুচ্ছে। ছেলেব কী নাম বাখা হয়েছে মিলি এখনো জানে না। এব পব যদি ওব মেয়ে হয মিলি বলবে 'ওর নাম বেখে দে জনা।'

মিলি এবার শুয়ে পড়ল। দেয়ালে সেই ফোটোখানা দেখা যাচ্ছে নবদম্পতীর। নতুনই তো। পুবো এক বছরও হয়নি সুধেন্দু দীপ্তির বিয়ে হয়েছে। দিদি বলছিলেন আব কয়েক দিনের মধ্যেই ওদেব ফার্স্ট ম্যারেজ অ্যানিভারসারি। কিন্তু ওবা আসতে পারবে না। সুধেন্দুব ছুটি নেই। দিদি টেলিগ্রামে আশীর্বাদ জানাবেন। উপহারের জিনিস আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন। ভাবতে ভারি অদ্ভুত লাগে। ওরা কেউ নেই অথচ ওদেরই ঘরে রাত্রে ঘুমুতে এসেছে মিলি। ওদের সব জিনিসপত্র ব্যবহার করছে। ওদের খাট আলমারি ড্রেসিং টেবিল। এই ঘরের গায়ে এখনো বিয়েব গন্ধ জড়ানো। ঝালর দেওয়া সাদা মুকুটটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। উঁচু তাকের ওপর তুলে রেখেছে দিদি। দেখতে কিন্তু বেশ সুন্দব।

দেখতে দেখতে কখন যে দুচোখ ভেঙ্গে ঘুম এসে পড়ল মিলি তা জানতে পারল না, কখন যে পূর্ণিমা তার পাশে এসে শুয়ে পড়লেন মিলি তা টের পেল না। হঠাৎ মিলি দেখতে পেল সে এক বিরাট হলঘরের মধ্যে বসে আছে। একেবারে সামনের সারিতে তার সীট। একঘর অপরিচিত

লোকের মধ্যে সে বসে আছে। কিন্তু তাই বলে তার কোন ভয়-ভাবনা নেই সঙ্কোচও নেই। সামনের ডায়াসটা থিয়েটারের স্টেজের মত। এত সুন্দর স্টেজ সে জীবনে দেখেনি আর এত রঙ-বেরঙের আলো। সেখানে এক বিদেশী যাদুকব স্টেজের ওপর তাঁর সরু লম্বা যাদুদণ্ডটি নেড়েনেড়ে কী যেন বক্তৃতা করছেন। সে ভাষা বাংলা নয়, ইংরেজী নয়, হিন্দী নয়। তাহলে কিছু কিছু বুঝত মিলি। হয়তো ফরাসী, হয়তো জার্মান, হয়তো অন্য কোন ভাষা। সেই বিদেশী ভাষার বক্তৃতা কে জানে কতটা কে বুঝল। কিন্তু সবাই হাততালি দিল। সঙ্গে সঙ্গে মিলিও হাততালি দিল। বক্তৃতা না বুঝতে পারলেও মিলির দুই কান যেন পরিতৃপ্ত হয়ে গেল। সেই ভাষার ধ্বনি বড় মধুর। বক্তার কণ্ঠস্বব বড মিষ্টি। যাদুকরেব মাথায সাদা পাগড়ি। অল্প বয়স। রাজপুত্রের মত রূপবান।

তারপর সেই ভিনদেশী যাদুকর তাঁর অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা দেখাতে লাগলেন। সেসব খেলা মিলি কখনো দেখেনি। কলকাতায় এর আগে ম্যাজিকই সে কখনো দেখেনি। একবার তাদের স্কুলের হেডমিস্ট্রেস এক ম্যাজিসিয়ানকে নিয়ে এসেছিলেন। তাদেব ক্লাস-রুমেই ম্যাজিক দেখবার ব্যবস্থা হয়েছিল। তিনি রুমালে বাঁধা চোখ দিয়ে ব্ল্যাক-বোর্ডের লেখা পড়েছিলেন, একটা টাকা ছিঁড়ে ছিঁড়ে অনেকগুলি টাকা বের করেছিলেন, জ্বলন্ত মোমবাতি মুখের মধ্যে দিয়েছিলেন। আরো যেন কী কী করেছিলেন ঠিক মনে নেই। মিলি তখন অনেক ছোট। ক্লাস ফাইভে পড়ে। বড় হয়ে ম্যাজিক খেলা দেখা এই তার জীবনে প্রথম। কিন্তু কী রকমের খেলা। ভালো কবে বুঝতে না বুঝতেই মিলিয়ে যাচ্ছে। একটা খেলার সঙ্গে আব একটা মিশে যাচ্ছে যেন। তারপর এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। যাদুকর হঠাৎ মিলির দিকে তাকিয়ে স্টেজের ওপর উঠে আসবাব জন্যে ইসারা কবলেন। মিলি সঙ্গে সঙ্গে উঠে তাঁব পাশে গিয়ে দাঁড়াল। কোন দেশেব মানুষ জানে না মিলি, কোন ভাষায় তিনি কথা বলেন তাও জানে না তবু মিলির কোন ভয় নেই, সঙ্কোচ নেই যেন কত দিনের আলাপ তাঁর সঙ্গে।

তারপব তিনি তাঁর যাদুদণ্ড নেড়ে দর্শকেব দিকে চেয়ে বললেন, 'এই মেয়েটিকে আমি যা খুশি তাই বানাতে পারি। বলুন আপনারা কী চান। ময়না কি টিয়াব মত সুন্দর একটি সবুজ রঙের পাখি বানাব নাকি বনের হরিণ, নাকি ফুলে ফুলে ভরা একটি লতা, নাকি একটিমাত্র গোলাপ ফুল?'

একথা শুনে মিলির বুক ভয়ে দুরু দুরু। সত্যিই কি যাদুকরেব এইসব ক্ষমতা আছে? সত্যিই কি তিনি মন্ত্রবলে তাঁকে অন্য কিছু করে দেবেন?

নিরুত্তর দর্শকদেব দিকে তাকিয়ে যাদুকর ফের হেসে বললেন, 'আপনারা নিশ্চযই ভাবছেন ওসব দিয়ে কী হবে। বনে পাখি অনেক আছে, হরিণ অনেক আছে, গাছে গাছে ফুলেব অভাব নেই। তার চেয়ে এই মেয়েটিকে যদি আরও সুন্দবী, পরমা সুন্দবী পবীতে পরিণত করি আপনারা কি খুশি হবেন না?'

দর্শকদের মধ্যে অনেকেই বললেন, 'তাই করুন। পরীকে চাই আমরা!'

হাজাব কণ্ঠে প্রতিধ্বনি শোনা গেল, 'পরী চাই।'

যাদুকর হেসে বললেন, 'কিন্তু পরী যে চান আপনাবা তার যে পাখা আছে। সে যে উড়ে যাবে। তার চেয়ে মানবীই ভালো। তাব অঙ্গে রূপ, মনে অগাধ ভালোবাসা অথচ পাখা নেই, উড়তে পারবে না। সে আপনাদের ঘর জুড়ে থাকবে, হৃদয় জুড়ে থাকবে।'

যাদুকর তাঁর সোনার যাদুদণ্ড ছোঁয়ালেন মিলির গায়ে। সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারা বদলে গেল। হাজার দর্শকের চোখ আয়নার মতো চক চক করতে লাগল।

হাজার দর্শকের মুগ্ধ গুঞ্জন শোনা গেল, 'বাঃ! এমন রূপ আর দেখিনি।'

মিলি বলল, 'আমিও একটু দেখব। কেমন হয়েছি দেখতে চাই।'

'বেশ তো দেখ।'

যাদুকর সোনা বাঁধানো বড় একখানা আয়না তার সামনে তুলে ধরলেন।

মিলি আয়নার মধ্যে অপূর্ব এক রূপবতীকে দেখতে পেল। তার গা-ভরা মণিমুক্তার গয়না ঝলমল করছে।

অবাক কাণ্ড। যেসব অচেনা লোকেব মধ্যে সে বসে ছিল তাদেব মধ্যে বাবা আছেন, মা আছেন, দাদাবা আছে, পাড়াব ছেলেবা আছে। মিলি একসঙ্গে সবাইকে পেযে আনন্দে অধীব।

সে বাবাব কাছে এগিযে এসে বলল, 'চল বাবা। এবাব বাড়ি যাই।'

কিন্তু বাবা অবাক হযে তাকিযে আছেন। মা দাদাদেব আব পাড়াব ক্লাবেব সবাব চোখগুলি যেন পুতুলেব চোখ, সে চোখে দৃষ্টি নেই। মুখগুলি সুন্দব সুন্দর পুতুলেব মুখ। কিন্তু কোন ভাষা নেই। মিলি বুঝতে পাবল, কেউ তাকে চিনতে পাবছে না।

মিলি কতবাব যে বলল, 'আমি মিলি আমি মিলি।'

কিন্তু কেউ সেকথা বিশ্বাস কবছে না।

মিলিব তখন ভয হল সে হাবিযে গেছে। অপকপ অপবিচিত কপলাবণ্যেব মধ্যে সে মিলিযে গেছে।

কেউ যদি তাকে চিনতেই না পাবে তবে এত কপ এত লাবণ্য নিযে কী হবে।

সে ফিবে তাকিযে যাদুকবেব উদ্দেশ্যে বলল, 'আমাকে আগেব চেহাবা ফিবিযে দিন। আমি চাইনে, আমি যা আছি তাব চেযে বেশি সুন্দবী হতে চাইনে।'

কিন্তু স্টেজ অন্ধকাব। যাদুকব তাব বাক্স-ডেক্স নিযে কোথায যে পালিযেছেন তাব ঠিক নেই। দর্শকদেব চেযাবগুলি খালি। তবে হলঘবটা অন্ধকাব নয। তাবই কপেব আলোয জ্বলজ্বল কবছে।

দিদিব ডাকে মিলিব ঘুম ভাঙল, 'এই মিলি অমন কবছিস কেন, এই মিলি?'

মিলি জেগে উঠে কিছুক্ষণ চুপ কবে বইল। ঘবেব মধ্যে তখনো কমপাওযাবেব একটা সবুজ আলো জ্বলছে।

মিলি বলল, 'আমি হাবিযে গিযেছিলাম দিদি।'

পূর্ণিমা বললেন 'দূব পাগলী কোথায হাবিযেছিলি।'

মিলি বলল, 'স্বপ্নেব মধ্যে।'

তাবপব দিদিকে জডিযে ধবে সে শুযে বইল।

পূর্ণিমা সস্নেহে মিলিব পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'নিশ্চযই ভয পেযেছিস এই তোব বীবত্ব? এই তোব একা একা শোযাব বড়াই?'

॥ ৩ ॥

পবদিন সকালবেলায চাযেব টেবিলে মিলি আবাব বীবাঙ্গনা।

মুকুন্দবাবু বললেন, 'হ্যাঁবে মিলি, সাবাদিনতো তোব মুখে খই ফোটে। কাল নাকি বাত্রে তোকে বোবায ধবেছিল?'

মিলি বলল 'আপনাব বিশ্বাস হয জামাইবাবু? বোবা কানা খোঁড়া—এবা আমাকে কেন ধবতে যাবে?'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'ওবে বাবা। তোব জন্য কোন দিব্যকান্ত অপূর্ব পুরুষপ্রবব অপেক্ষা কবছে আমি দেখব। কে অপেক্ষা কবছে বলতো?'

মিলি বলল 'কে বা কাবা কী কবে বলব? আমি তো আব নিজেব ভাগ্য গুণতে জানিনে, হাত দেখতেও জানিনে। আপনি জানেন জামাইবাবু?'

'কী?'

'হাত দেখতে?'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'না। ওসব দেখাদেখিতে আমাব বিশ্বাস নেই। হাত দেখতেও জানিনে, হাতেব মধ্যে হাত নিযে ঘণ্টাব পব ঘণ্টা বসে থাকতেও জানিনে। হাতেব মধ্যে হাত পেলে পাঞ্জা কষবাব জন্যে আমাব হাত উসখুস কবে।

মিলি কেটলি থেকে মুকুন্দবাবুকে আবো এক কাপ চা ঢেলে দিল। তাবপব তাঁব দিকে চেযে মুখ টিপে হাসতে লাগল।

মুকুন্দবাবু বললেন, 'হাসছিস যে?'

মিলি বলল, 'জামাইবাবু, আপনি এখনো বেশ সুপুরুষ। কিন্তু আপনি যে কোনদিন বীরপুরুষ ছিলেন একথা মরলেও আমি বিশ্বাস করব না।'

মুকুন্দবাবু একটু যেন আহত হলেন। বললেন, 'বীরপুরুষ মানে যদি পালোয়ান ধরে নিস তা আমি কোনদিনই হইনি হতেও চাইনি। ওই ধরনের আনকুথ চেহারা আমার কোনকালেই পছন্দ ছিল না। তবে ডুয়ার্সের চা-বাগানে যখন চাকরি করতাম তখন প্রায়ই শিকার টিকারে যেতাম। সেসব তোর জন্মের আগে—'

মিলি হেসে বলল, জামাইবাবু, মনে হচ্ছে সেসব যেন আপনারও জন্মের আগে। সবই পূর্বজন্মের ব্যাপার।'

পূর্ণিমা এসে তাড়া দিলেন, 'কী বসে বসে যে খুব গল্প করছ। আজ তোমার অফিসের বেলা হয় না? এর পরে উঠলে আটটা দশের ট্রেন আর কখন ধরবে।'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'ঠিক ধরতে পারব তুমি ভেব না। আমার সময় ঠিক আছে '

পূর্ণিমা বললেন, 'সময় যে কত ঠিক থাকে তা আমি জানি শেষে তো কাকের মত নাবে বকের মত খাবে। তাড়াহুড়োর আর শেষ থাকবে না।

মুকুন্দবাবু আর বসে থাকতে সাহস পেলেন না উঠে দাঁড়ালেন।

স্ত্রীর দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'শুনছ, আমি যে শিকার টিকার করতাম তা মিলি কিছুতেই বিশ্বাস করছে না।'

পূর্ণিমা ধমকের ভঙ্গিতে বললেন, 'ওকে বিশ্বাস করাতেই হবে তোমার এমন ঠেকাটা কী। এখন যেমন তাস তাস করে জ্বালাও তখন শিকার শিকার করে জ্বালাতে একবার একশ দুই ডিগ্রী জ্বর গায়ে নিয়ে রাত দুপুরে তোমার মেরে আনা বেলেহাঁস আমাকে রেঁধে দিতে হয়েছিল তুমি আর তোমার বন্ধুরা বসিয়ে বসিয়ে খেয়েছিলে। তাতে অত পৌরুষের কী আছে?'

মুকুন্দবাবু বাথরুমের দিকে যেতে যেতে ফিরে তাকিয়ে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বললেন, হায় নারী। তুমি কেবল সেই বেলেহাঁস মারার কথাটা মনে রেখেছ।'

পূর্ণিমা হাসি চেপে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন ঢঙ।'

স্নান সেরে এসে মাঝখানের ঘরের দেয়ালে যে দু'টো হরিণের শিং আঁটা আছে সেটা মিলিকে আঙুল দিয়ে দেখালেন মুকুন্দবাবু বললেন ওই দেখ। শিকারী যে ছিলাম তার সাক্ষী। আরো ছিল। বাড়ি বদলাতে বদলাতে কোথায় যে কী গেছে

মিলি বলল 'আপনার শিকার নাকি? আমি তো ভেবেছিলাম সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মার্কেট থেকে কেনা—'

মুকুন্দবাবু হেসে বললেন, 'চূড়ান্ত ফাজিল হয়েছিস সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মার্কেট থেকে তোর বর এবার একটি কিনে নিয়ে আসব। তখন বুঝবি মজা।

মুকুন্দবাবু আজ বাড়ি থেকে খেয়ে গেলেন। পূর্ণিমা মিলিকে দিয়ে সব পরিবেশন করালেন

মিলি বলল, 'জামাইবাবু পেট ভরে খাবেন কিন্তু। নইলে সব দোষ আমার ঘাড়ে পড়বে।'

খাওয়া দাওয়ার পর মিলি মুকুন্দবাবুর হাতে একটি পান তুলে দিল।

মুকুন্দবাবু বললেন, 'পান তো আমি খাইনে।'

মিলি বলল, আমি সেজেছি। খেয়ে দেখুন একটা।

মুকুন্দবাবু বললেন, 'চুন খয়ের ঠিকমত দিয়েছিস তো? নাকি মুখ পুড়বে?'

'পুড়ুক। এর পর দই দেখে ভয় পাবেন। আমি আর দিদি সব দই খেয়ে নেব।'

একতলার গেট পর্যন্ত জামাইবাবুকে এগিয়ে দিতে এল মিলি। ফিরে আসার সময় বলল, একদিন আপনার অফিসে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবেন?'

'ওরে বাবা। সে তো অনেক দূর।'

মিলি বলল, 'দূর বলেই তো বেড়াবার পক্ষে সুবিধে।'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'কিন্তু সেখানে তো দেখবার কিছু নেই। সেই অজ পাড়াগাঁয়ে চাল আর

গমেব গুদাম দেখে তুই কী কববি।'

মিলি বলল, 'আপনি সেখানে বসে বসে সাবাদিন কী কবেন তাই দেখব। ভাবতেই এত বোমান্টিক লাগছে—'

মুকুন্দবাবু হেসে বললেন, 'আচ্ছা যাস। একদিন জিপে কবে নিযে যাব।'

হাতেব ঘডিটিব দিকে একবাব তাকালেন মুকুন্দবাবু। তাবপব মিলিব দিকে চেযে বললেন, একঘন্টা লেট কবিযে দিলি।'

মিলি বলল, 'দিলামই-বা। আপনিই তো ইনচার্জ। কাবো কাছে তো আব কৈফিযৎ দিতে হবে না।'

মুকুন্দবাবু চলে গেলে মিলি এসে পূর্ণিমাব কাছে দাঁডাল। সব সময়েই কিছু-না-কিছু কাজ নিয়ে আছেন দিদি। তাঁব হাত কখনো কামাই নেই।

মিলি বলল, 'দিদি, আমাকে কিছু কাজ দাও।'

পূর্ণিমা হেসে বলল, 'তুই কি কাজ কববি নাকি কাজ পণ্ড কববি? যে মানুষ কোনদিন লেট কবে না সে আজ তোব জন্যে—'

মিলি লজ্জিত হযে বলল, 'আহা-হা।'

খানিকক্ষণ জানালাব গবাদ ধবে দাঁডিযে বইল মিলি। সাবিসাবি চাবতলা ব্লক বাডি। সব ব্লক মিলিযে যেন ছোট একটি উপনগব। বাডিগুলি পবস্পব থেকে বিচ্ছিন্ন। মানুষগুলিও যেন তাই। যে যাব সুখ-দুঃখ ব্যক্তিগত জীবনেব নানাবকম সমস্যা আব সেগুলিব সমাধানেব চেষ্টায ব্যস্ত। ছোটদেব মাসিক পত্রিকায যেমন কতকগুলি ধাঁধা থাকত আব সেগুলি উত্তব দেওযাব জন্য গ্রাহক-গ্রাহিকাদেব মধ্যে সাডা পডে যেত এও কি তেমনি? ধাঁধাব উত্তব দিতে পেবেছিল বলে মিলিব নাম মাসিক পত্রিকায ছাপা হয়েছিল। দাদাবা বলেছিল তুই নিজে পাবিসনি, বাবা তোকে বলে দিযেছেন। কিন্তু বাবা তাকে ভালোবাসেন ঠিকই তাই বলে তাঁকে পডাশোনা কাজকর্মেব ব্যাপাবে পবমুখাপেক্ষী হযে থাকতে শেখাননি। ববং স্বাবলম্বিতায উৎসাহ দিযেছেন। সবসময বলেছেন 'Selfhelp is the best help. নিজে কব, নিজে শেখ, নিজে চেষ্টা কবে শেখ, নিজে কষ্ট কবে শেখ। তবেই তা মনে হবে যথার্থ শেখা হযেছে।'

বাবা সবসময মিলিব উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে জাগিযে দিযেছেন, 'তোমাকে ভালো বেজাল্ট কবতে হবে, শুধু পবীক্ষায ভালো নম্বব পাওযা নয, বিষযটা জানতে হবে, শিখতে হবে।' বাবা বলেন, 'আমি চাই আমাব মেযে যথার্থ শিক্ষিতা হোক। শুধু পবীক্ষা পাশেব জন্যে বিদ্যা নয, বিদ্যা চিত্তেব উৎকর্ষ সাধনেব জন্যে। তুমি যতদূব পডতে চাও পডবে, বিদেশে যেতে চাও যাবে। ছেলে আব মেযে আমাব কাছে সমান। তোমাকে আমি সববকমেব স্বাধীনতা দেব। কিন্তু তুমি এমন কিছু কববে না যাতে আত্মসম্মান নষ্ট হয। তোমাব সম্মানে আমাদের সম্মান। একথা মনে বেখ।' বাবাব বন্ধুবা বলেন ক্ষিতীশ বড মবালিস্ট, বড বেশি আইডিযালিস্ট। ক্ষিতীশ যেন এ যুগেব মানুষ নয।

মিলিব মনে হয বাবা অন্য রকমেব মানুষ হলে তাঁকে মানাত না। তিনি অন্য বকম হলে মিলি তাঁক শ্রদ্ধা কবতে, ভালোবাসতে পাবত না।

একটু আগে দিদি বললেন, 'মিলি তুই কাজ কবতে এসেছিস না কাজ পণ্ড কবছিস?' 'দিদি, তুমি কি জান না আমি কাজ কবব বলেই এসেছি, পডাশুনা কবব বলেই এসেছি। বাবা যে আমাকে টাকা খবচ কবে কলকাতায বাখবেন আমি তাব সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার কবব। একটি পযসাবও অপচয হতে দেব না। কিন্তু আজকালকাব ভালো ছেলেবা যেমন গোবেচাবা হয না, ভালো মেযেবাও তেমনি ঘাড গুঁজে, মুখ বুজে পডে থাকে না। তাবাও মাথা তুলে চারদিকে তাকায়, সমবযসীদেব সঙ্গে আড্ডা-ইযার্কি দেয, আব যেসব অসমবযসী সাধ কবে সমবযসী সাজতে চান তাঁদেব অল্পস্বল্প প্রশ্রয দেয়, তাতে তাদেব জাত যায় না। ভালোমন্দেব ধাবণাব কিছু বদল হযেছে দিদি। আমি মফঃস্বল শহবে থেকেও তা জানি। মোটামুটি বক্ষণশীল পবিবাবেব মেযে হযেও তা টেব পাই। বাবা বলেন তিনি যখন ক্লাসিকস্ পডেন তিনি হয সেকালে চলে যান, আব না হয় সেইসব লেখকদেব নিজেব কালে টেনে নিয়ে আসেন। বাবা আমার সঙ্গে আড্ডা ইয়ার্কি দেন না। কিন্তু তিনি যখন শিল্প সাহিত্য

নিয়ে আলোচনা করেন আমাকে বুঝতে দেন না তিনি আমার অসমবয়সী। তুমি তো জানো না দিদি, বাবা আমার প্রথম বন্ধু।'

সামনের বাড়ির চারতলার ব্যালকনিতে দুটি ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে। মিলিকে ওরা হয়তো দেখতে পেয়েছে। নিজেদের মধ্যে হেসে হেসে কী যেন বলাবলি করছে ওরা। কিন্তু মিলিকে ওরা কতটুকুই বা দেখেছে, কতটুকুই বা জানে। কোনদিনই জানতে পারবে না। কারণ সপ্তাহখানেক পরেই মিলি হস্টেলে চলে যাবে। তার কলেজও ঠিক হয়ে আছে হস্টেলও ঠিক হয়ে আছে। বাবা নিজে আসেননি কিন্তু চিঠিপত্র লিখে সব ঠিক করে রেখেছেন। তাঁর ব্যবস্থাতেই সব হয়। কলেজে একটা ফর্মাল ইন্টারভিউ দিতে হবে এই পর্যন্ত। মিলি অবশ্য নিজের রেজাল্টের জোরেই ভর্তি হতে পাববে। বাবার চেনাজানার জোরে নয়। তবু মিলিকে ঘিরে তাঁর যেটুকু আশা-আকাঙ্ক্ষা সাধ-আহ্লাদ আছে সেটুকু মিটুক। তুমি আমার জন্যে কিছু ছাড়বে, আমি তোমার জন্যে কিছু ছাড়ব না হলে কি আত্মীয়তা বজায় থাকে?

ঘুবে ঘুরে মিলি টুকুর কাছে এসে দাঁড়াল। ছেলেকে দুধ খাওযাচ্ছিল টুকু। ঝিনুক বাটির দুধ নয়, বুকের দুধ। মিলিকে দেখে লজ্জিত হয়ে একটু ঘুরে বসল। খাওয়ানো শেষ করে ওকে যত্ন করে শুইয়ে দিল। বাচ্চাছেলে খেতে খেতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

মিলি এবার এসে টুকুব গা ঘেঁষে বসল।

টুকু হেসে বলল, 'কীবে! এতক্ষণে বুঝি আমার কথা তোর মনে পড়ল। সময় হল আমার খোঁজখবর নেওয়ার।'

মিলি বলল, 'আহা, আমি যখনই তোব ঘরে এসে উঁকি দিয়ে গেছি দেখেছি তুই ছেলেকে নিয়ে আছিস। ওকে নাওয়াচ্ছিস, খাওয়াচ্ছিস, ঘুম পাড়াচ্ছিস, আদব করছিস। বাবাবে বাবা। ছেলে যেন আর কারো হয় না। তুই কি মা হয়েই মায়েব পেট থেকে পড়েছিলি?'

টুকু বলল, 'ফাজিল কোথাকার। বাচ্চাব যত্ন আব আমার যত্ন সবইতো মামীমা করছেন। আমি শুধু ওদেব কথা মত চলছি।'

মিলি টুকুর থুতনি নেড়ে দিয়ে বলল, 'আহা-হা, কী অনুগত মেয়েই একখানা। শুধু মামা-মামীর কথা শুনেই চলছ, নিজের ইচ্ছেয় কিচ্ছু কবছ না। মামা-মামী বুঝি বলে দিয়েছিলেন বিয়ের পর একবছব যেতে না যেতেই—'

টুকু লজ্জিত হয়ে অন্যদিকে মুখ ফেবাল। ভাবি সুন্দব রঙ ওব। লজ্জা পেলে ওর সিঁথির সিঁদুর যেন সারা মুখে ছড়িয়ে যায়। মুখেব ডৌল ভারি মিষ্টি। ছোটখাটো চেহাবা। টুকু যেন এখনো এতটুকু। পুতুলের মত নরম তুলতুলে। কিন্তু দেখ, এত অল্প বয়সেই কেমন মা হয়ে গেছে। পুতুল হযেছে পুতুলের মা।

একটু বাদেই টুকু মুখ তুলে সোজা মিলির দিকে তাকাল। তারপর সস্নেহ শাসনেব ভঙ্গিতে বলল, 'তুইতো ভারি ফাজিল হয়েছিস মিলি। বিয়ের আগেই এই, বিয়ে হলে না যেন কী করবি।'

মিলি মৃদুস্বরে বলল, 'কী আর করব। বছব বছব মা হব।'

টুকু হেসে বলল, 'যেন অতই সোজা।'

মিলি বলল, 'পরীক্ষায় সেভেনটি টু পার্সেন্ট পাওয়ার চেয়ে সামান্য একটু কঠিন, তাই না?'

টুকু বলল, 'কী অহংকাব। না হয় একটু ভালো পাশই করেছিস। তাই বলে নিজের ঢাক নিজে পেটাবি নাকি অমন করে?'

মিলি বলল, 'কী কবি বল। আমার তো আব তোর মত অমন একজন কেউ আসেনি যে ঢাক পিটিয়ে দেবে।'

টুকু বলল, 'আহা-হা, কী আফশোস। তাহলে মামীকে বলি তোকে হস্টেল টস্টেলে পাঠানো বন্ধ রেখে সম্বন্ধ দেখুক।'

মিলি বলল, 'ঈস। তার জন্যে মামীমাকে বলা কী দরকার? তোর জন্যে কাকে বলতে হয়েছিল শুনি? নিজেদের ব্যবস্থা তো নিজেরাই কবে নিয়েছিস।'

টুকু লজ্জিত হয়ে বলল, 'তুই তাও শুনছিস? কার কাছে শুনেছিস বল তো?'

মিলি বলল, 'সোর্স আমি বলব না। আমি বলি আব তুই তাব গর্দান নে। It is an open secret. বিশ্ববাসী জানে।'

টুকু বলল, 'হ্যাঁ, বিশ্ববাসীব তো খেয়ে না খেয়ে কাজ নেই। কাব কাছে শুনেছিস বল না।'

মিলি বলল, 'উঁহু, অত কাঁচা মেয়ে পাওনি। তুই যদি in details বলিস, আমিও তাহলে in details বলব। তাব আগে না। খুন, আগুন আব ভালোবাসা কেউ চেপে বাখতে পাবে না। তুই চাপবি কী কবে?'

টুকু বলল, 'তুই এত কথা জানলি কী কবে বল তো?'

মিলি বলল, 'সব মুখস্থ বিদ্যা। বই পডলে সবই জানা যায়। Read and you will know. তুই আমাব পবীক্ষা নিয়ে দেখ। এ সাবজেক্টেও আমি যদি at least seventy-five percent না পাই—'

পূর্ণিমা এলেন তাগিদ দিতে, 'কী বসে বসে কেবল গল্পই হচ্ছে। নাওযা-খাওযা নেই বুঝি?'

মিলি বলল, 'দিদি, আমিও সেই কথা ভাবছিলাম। বাঁধতে বাঁধতে তুমি বুঝি নাওযা খাওযাব কথা ভুলেই গেলে। পঞ্চান্নব্যঞ্জন যদি নিজেই বাঁধবে বাঁধুনী বেখে আব দবকাব কি?

খাওযাদাওযাব পব মিলি আবাব এল টুকুব সঙ্গে গল্প কবতে। দবজা ভেজিযে জানলাগুলিতে পর্দা টেনে দিল মিলি।

টুকু বলল, 'ও কিবে ঘবখানাকে একেবারে ডার্করুম কবে তুললি যে।'

মিলি বলল, 'কী কবব বল। চোখে আলো লাগলে ঘুম আসে না। তুই তো আলো জ্বেলেও ঘুমোতে পাবিস।'

টুকু বলল, 'আগে পাবতাম না। এখন পাবি। বিযেব পবে কত অভ্যাস বদলে যায।'

মিলি এসে টুকুব পাশে শুযে পডল। একদিকে ওব ছেলে ঘুমোচ্ছে।

টুকু হেসে বলল, 'এত খাতিব যে?'

মিলি বলল, 'তোব গল্প শুনব বলে।'

'আমাব গল্প আব কী শুনবি।'

'বাঃ বে গল্প তোব জীবনেই ঘটল। তোবা ঘটালি। অঘটন ঘটন পটীযসী। কী যেন একটা কথা আছে। নিজেবাই নিজেদেব ভাগ্যবিধাতা।

টুকু বলল, 'কেন? তোব জীবনে কিছু ঘটেনি?

মিলি হেসে বলল, 'আমাব? একেবাবে সাদামাঠা। বছবেব পব বছব স্কুলে গেলাম, পডলাম, পবীক্ষা দিলাম। পাশও কবলাম। দুদিন বাদে কলেজে ভর্তি হব। হস্টেলে একগাদা অচেনা মেয়েব সঙ্গে ভাব কবে আব কলেজ কবে কাটাব। এই তো শ্রীমতী মিলি চৌধুবীব পূর্ণাঙ্গ জীবন চবিত। এব মধ্যে গল্প কই?'

টুকু বলল, 'আমাব জীবনেই বা এমন কী ঘটেছে—'

মিলি বলল, 'বাজে বকিসনে। তোব জীবনে যে অনেক কিছু ঘটেছে তাব সাক্ষীটি তো কোলেব কাছে দিব্যি আবাম কবে ঘুমোচ্ছে। জাগাব ওকে? ওকে জিজ্ঞেস কবব সব কথা।'

টুকু বলল, 'না ভাই লক্ষ্মীটি জাগাসনে। কাল সাবাবাত জ্বালিযেছে।'

'তাহলে বল।'

টুকু একটু হাসল, 'কী আব বলব বল। সেই তো পুবনো কথা। কত গল্প উপন্যাস তো পডেছিস। তাতে সাধ মেটেনি?'

মিলি বলল, 'দূব দূব? টাটকা জীবনেব কাছে বই? বই হল বাসি শুকনো ফুল। Very poor substitute—আমের বদলে আমসি।'

টুকু হাসল, 'এই না তখন বললি বই পড়ে সব জানা যায।'

'জানা যায বলেছি। বাঁচা যায তো বলিনি।'

'ওবে বাবা। বাঁচা-মবা কত কী শিখেছিস। এসব তো শুধু মুখস্থ বিদ্যা বলে মনে হয না?'

'বাঃ বে, দু-একটা লাইন বানিয়েও লিখতে পাবব না এতই কি খাবাপ স্টুডেন্ট? যাক গে। কথায

কথায় তুই আসল কথা চাপা দিচ্ছিস। কিন্তু ভবী ভুলবার নয়। বল না রে সব। খুঁটিনাটিসুদ্ধু বল। নইলে ইন্টারেস্টিং হয় না। এখন আর অত লজ্জা কিসের? বিয়ে হয়ে গেছে, ছেলে হয়ে গেছে—'

টুকু তবু চুপ করে রইল। একটু বাদে বলল, 'কী আর শুনবি বল? সেই তো মামুলি পুরনো কথা। আজকাল সবাইর জীবনেই প্রায় ঘটে। বিয়ের আগে নিজেদের মধ্যে দেখা-শোনা, আলাপ পরিচয়—আমার বাবা-মার বেলায়ও তো এমন হয়েছিল।'

মিলি হেসে বলল, 'রক্ষে কর বাবা। তোর বাবা মা সম্বন্ধে আমার কোন ইনটারেস্ট নেই।'

টুকু বলল, 'কিন্তু আমি যে তাঁদের কথা ভুলতে পারিনে মিলি। মা নেই। তিনি তিন বছর হল মারা গেছেন। বাবা বহুকাল আগে থেকেই থেকেও নেই। তিনি এখন কিংবদন্তী। কোথায় আছেন জানিনে তবু তাঁদের কথা প্রায়ই আমার মনে পড়ে।'

মিলি চুপ করে রইল। টুকুর গলার স্বর বদলে গেছে। মিলি ওকে আস্তে আস্তে আরো কাছে টেনে নিল

টুকু বলতে লাগল, 'প্রায়ই মনে পড়ে। বিশেষ করে মার কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনে। আমার সেই দুখিনী মার কথা। তিনিও ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর তাঁদের সেই ভালোবাসা টিকল না

'কেন রে?'

টুকু বলতে লাগল, 'কেন যে আমি ঠিক ভালো করে বুঝতে পারিনি। মাও পরিষ্কার করে বলেননি। জন্মের পর থেকে দেখছি আমি আর মা মামাবাড়িতে আছি। আমাদের নিজেদের কোন বাড়ি নেই ঘর নেই। মা কর্পোরেশনের স্কুলে মাস্টারি করেন। যা পান মামার হাতে এনে ধরে দেন। কেন যে এমন হল। অথচ মা বেশ সুন্দরী ছিলেন। বুদ্ধি বিবেচনাও তাঁর ছিল। তবু কেন যে এমন হল।'

দোষটা তাহলে পুরোপুরিই তোর বাবার।'

টুকু বলল অমন করে বলিসনে মিলি। সবাই অবশ্য তাই বলে। বলে, বাবা নির্বোধ, অকর্মণ্য, দায়িত্বহীন। কেউ কেউ বলে বাবা চতুর নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। মা ছিলেন খুব চাপা। তাঁর কাছ থেকে বিশেষ কিছু বের করা যেত না। কিছু জিজ্ঞেসা করলে বলতেন, ওসব জেনে তোমার কী হবে। তুমি নিজের কাজ কর। পড়াশুনো কর'

'তারপর?

'কিন্তু বাবার সম্বন্ধে আমি যেসব কথা শুনতাম সেগুলি নিজের মনে মেনে নিতে পারতাম না। বাবা খারাপ একথা শুনলে শুধু দুঃখ নয় আমার কেমন একটা অপমান বোধ হত। বাবা ভালো লোক নয়—এতে আমারও অপমান, আমার মারও অপমান। আমি স্কুলের দিদিমণিদের কাছে, ক্লাসের মেয়েদের কাছে বাবার একটা ভিন্ন ধরনের ছবি তুলে ধরতাম। বাবা মহৎ উদার ভাগ্যবান। বাবা বিদেশে বড় চাকরি করেন সেইজন্যেই এখানে আসতে পারেন না। বানিয়ে বানিয়ে আমি বাবাকে নিজের মনের মত আদর্শ বাবা করে তুলতাম।'

টুকু থামল।

মিলি কোন কথা বলল না। কথা বলতে পারল না। কথা বলার ইচ্ছাও করল না

শুধু সদ্য পাওয়া বন্ধুকে আরো অন্তরঙ্গভাবে কাছে টেনে নিল। যেন এই নৈকট্য দিয়েই সে তার সমস্ত সান্ত্বনা, সমস্ত আশ্বাস, অন্তরের সমস্ত সমবেদনা প্রকাশ করতে চায়।

একটু সময় নিয়ে টুকু ফের বলতে লাগল, 'কিন্তু আমি ধরা পড়ে গেলাম। একজনের কাছে যে গল্প বলি আর একজনের কাছে বলা গল্পে তার মিল থাকে না বানাবার একটা নেশা আছে। খুব অল্প বয়সে পুতুলকে যেমন নিত্যনতুন পোশাক পরিয়েছি, আমার বাবাকেও তেমনি নিত্যনতুন রূপগুণের পোশাক পরাতাম। বাবা আমাকে হাতে করে গড়েননি। কিন্তু আমি আমার বাবাকে মনে-মনে গড়েছি। শিবানী পড়ত আমার চেয়ে তিন ক্লাস ওপরে। ভারি চালাক চতুর। সে একদিন বলল, 'তোর কটা বাবা রে। আমার কাছে বলেছিস তোর বাবা দিল্লীতে কাজ করেন, আবার সীমার

কাছে বলেছিস বোম্বেতে ব্যবসা করেন। সেবা দিদিমণির কাছে তোর বাবাকে প্রফেসর বানিয়েছিস। এত মিথ্যাও বলতে পারিস।'

মাও আমাকে একদিন দারুণ বকুনি লাগালেন। বললেন, 'কী দরকার তোর ওসব বাজে কথা বলে? খবরদার। কারো কাছে যদি ফের কিছু বলবি, তোর মুখ আমি সূঁচসুতো দিয়ে চিরদিনের মত সেলাই করে দেব।'

আমি আর মুখ খুললাম না। কিন্তু বাবার একটি মূর্তি আমার মনের মধ্যে রয়েই গেল। সে মূর্তি সৎ, সক্ষম, সবল এক পুরুষের মূর্তি।

কিন্তু বাবাকে সত্যি সত্যি একদিন দেখলাম। চেহারা যে তেমন ভালো তা নয়। জামা-কাপড় দেখে মনে হয় না ভালো অবস্থায় আছেন। মামা পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি ওঁকে প্রণাম করলাম। তিনি আমাব পিঠে হাত রাখলেন। বললেন, 'ভালো করে পড়াশুনো করো।'

আশীর্বাদ কবলেন, 'সুখী হও।' তাবপব তিনি মামার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সেখানে মাও গেলেন। তাবপর তাঁদেব মধ্যে কী সব কথাবার্তা হল। বাবা মুখ কালো করে চলে গেলেন। শুনলাম তিনি টাকা চাইতে এসেছিলেন। বাবার ওপর আমার রাগও হল, দুঃখও হল। তিনি আমার কল্পনার মূর্তিকে ভেঙে চুরমাব করে দিয়েছেন। কিন্তু তাঁকে কখনোই আমার খারাপ কি বদলোক বলে মনে হয়নি।'

মিলি শুরুতে বলেছিল টুকুর বাবা মার পুরনো গল্পে তাব কোন কৌতূহল নেই। কিন্তু কাহিনী যখন একবার আরম্ভ হয়ে গেছে মিলি তার সবটুকু না শুনে ছাড়তে চায় না।

টুকুর মামা-মামী অবশ্য ওকে খুবই আদর করেন। আপন মেয়ের মত দেখেন। টুকু তাঁদের মেয়ের অভাব পূর্ণ কবেছে। ওঁদের সংসাবে টুকুর মাবও কোন অযত্ন হয়নি।

কিন্তু বাবার অভাব কি আর কেউ মেটাতে পারে? প্রত্যেকটি সম্পর্কেব স্বাদ আলাদা। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির আধারে যে স্নেহ-ভালোবাসা, তার স্বাদও ভিন্ন ভিন্ন ধবনেব।

অবশ্য আরো একটু বড় হবাব পর বাবার কথাটা টুকুব আর তেমন মনে পড়ত না। তাব স্কুল আছে, পডাশুনো আছে, বন্ধুরা আছে, গল্পের বই, সিনেমা-থিয়েটার, এত প্রাচুর্যেব মধ্যে বাবাব অভাব সে প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। শুধু মার মুখের দিকে তাকিয়ে টুকুব সেকথা মনে পড়ত। যিনি শাঁখা-সিঁদুব পরেন, স্বামীর পদবী ধারণ কবেন অথচ স্বামীব সঙ্গে বাস কবেন না, সেই দুর্ভাগিনী নারীর বিড়ম্বিত জীবনের কথাটুকু অনুভব কবত।

কোন কোন গভীব বাত্রে মার পাশে শুয়ে তাঁকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধবে টুকু জিজ্ঞাসা কবত, 'বল না মা কী হয়েছিল তোমাদের। কেন তোমাদেব বনিবনাও হল না? বাবা কি পাজী গুণ্ডা বদমাস ছিলেন?'

'না না। তা কেন হবে? তা হলেও তো বুঝতাম একটা কিছু হয়েছে।'

'তবে?'

'সে কিছুই কবতে পাবেনি। কিছুই হতে পারেনি।'

'তবে? তাঁকে তুমি কী দেখে ভালোবেসেছিলে?'

'তুই মেয়ে। তোকে আব কী বলব? সেই বয়সে কিছু না দেখেও ভালোবাসা যায়। সে ভালো চিঠি লিখতে পাবত, ভালো কথা বলতে পারত, সে আমার জন্যে গুচ্ছ গুচ্ছ ফুল নিয়ে আসত। আমি সেই ফুলের গন্ধকে ভালোবেসেছিলাম।'

'তারপর?'

'তারপর দেখলাম যে শুধু ওইটুকুই। তাব চেয়ে বেশি কিছু নয়। ওইটুকু নিয়ে বিয়েব আগে পর্যন্ত চলে। বিয়ের পরে আর চলে না। আমবা বুঝতে পাবলাম আমাদের বিয়ে করা ভুল হয়েছে।'

'কেন তোমরা সেই ভুল শুধরে নিলে না? কেন আদালতের সাহায্য নিলে না?'

'অতদূর যেতে সাহস হল না। সেও তো এক হাঙ্গামা। তাছাড়া ভুল শোধবাবার ধরন তো একবকম নয়। ভুল আমরা যার যার নিজের মত শুধরেও নিয়েছি।'

'তোমার কি মনে হযনি মা, শোধরাতে গিয়ে আবও ভুল করেছ?'

টুকুর মা অস্ফুটস্বরে বললেন, 'কী জানি।'

তারপর আরো কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

মা বললেন, 'ঘুমিয়েছিস ?'

মেয়ে বলল, 'না মা। ঘুম আসছে না।'

'এবার ঘুমো। ওসব ভেবে লাভ নেই। ঘুমো।'

সেদিন দুজনের মধ্যে আগে কে ঘুমিয়েছিল কে জানে।

টুকুর সেদিন ঘুম হয়নি শুধু বাবার কথা ভেবে নয়, আরো একজনের কথা তার মনে হচ্ছিল। সে এক জিওলজিস্ট যুবক। মামার স্নেহভাজন। এ বাড়িতে তার যাতায়াত আছে। সে চিঠি লিখতে পটু নয়, গল্প করায় তার বেশি দক্ষতা'নেই। ফুলটুলের বেশি ধার ধারে না। সে কর্মঠ, পরিশ্রমী, ভালো ছেলে। তাকে মামার পছন্দ, মারও পছন্দ। টুকুরও পছন্দ। সেও তার পছন্দের কথা জানিয়েছে।

মা একদিন বললেন, 'তোরা আর দেরি করছিস কেন ?'

টুকু বলল, 'আমি বিয়ে করব না মা।'

'কেন রে ?'

'তোমাকে দেখে আমার আর বিয়ে করতে ইচ্ছে হয় না। ভয় হয়।'

'দূর পাগলী। শুধু আমাকে কেন দেখবি। আরো পাঁচজনের দিকে তাকিয়ে দেখ। কত সুখের ঘর আছে সংসারে।'

'কে জানে মা, কে কতখানি সুখী। বাইরে থেকে দেখে কতটুকুই বা বোঝা যায়।'

মা বললেন, 'কিন্তু আমি সৌরকে চিনেছি। উপযুক্ত ছেলে। ও তোকে সুখী করবে।'

টুকু বলল, 'তা হোক, ওটা যেন একজনের কাজ। সুখী হতে পারারও তো ক্ষমতা চাই মা।'

'তোর সে ক্ষমতা আছে।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে টুকু বলেছিল, 'কিন্তু আমি চলে গেলে তোমার কি দশা হবে মা ?'

মা বলেছিলেন, 'তখন আমার সব দুর্দশা যাবে। আমি তোদের কাছে যাব মাঝে মাঝে। তোদের মধ্যে গিয়ে থাকব। আমি যা পাইনি তোদের মধ্যে তাই পাব।'

কিন্তু টুকুর মার সেই ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। তার আগেই তিনি সংসার থেকে বিদায় নিয়েছেন। ম্যালিগন্যান্ট'ম্যালেরিয়া হয়েছিল। মামা চিকিৎসার কোন ত্রুটি করেননি। তবু তাঁকে বাঁচানো গেল না।

ছেলে হওয়ার পর ফের মার কথা মনে হয়েছে টুকুর। নিজের কথাও মনে হয়েছে।

মনে মনে প্রার্থনা করেছে, 'আমি যা পাইনি আমার ছেলে যেন তা পায়। ওর বাবা যেন যথার্থ বাবা হতে পারে। বাপ-মা থাকতেও ও যেন অনাথ না হয়।'

কাহিনী শেষ করে টুকু থামল। মিলিও কিছুক্ষণের মধ্যে কোন কথা বলল না।

খানিকক্ষণ বাদে মিলি বলল, 'তুই তোর বাবাকে কি খুব ঘৃণা করিস টুকু ?'

টুকু বলল, 'ঘৃণা ? ছিঃ ঘৃণা কেন করব ? যদিও রাগ হয়েছে, দুঃখ হয়েছে। বাবার জন্যে সামাজিক কোন মর্যাদা পাইনি। কিন্তু যেমন করেই হোক সেসব দিন তো কেটে গেছে। সেই দুঃখ আর নেই, সেই বয়সও আর নেই। জানিস সেদিন বাবার কতকগুলি চিঠি আমার হাতে পড়েছিল।'

'কোথায় পেলি ?'

'মার ট্রাঙ্কের মধ্যে। কিছু শাড়ি, সামান্য কিছু গয়না, খান কয়েক বই আর লাল নীল ফিতেয় বাঁধা কয়েক তাড়া চিঠি। এই তো মায়ের সম্পত্তি। আমি সেগুলির অধিকারিণী হলাম। তারপর হঠাৎ আমার কেমন যেন ইচ্ছে হল দু-একখানা চিঠি পড়ে দেখতে।'

'সে কিরে। তোর বাবার love letters তুই পড়লি ?'

'কিছু কিছু পড়েছি। ভাবলাম, মা কী দেখে ভুলেছিল একবার পড়ে দেখি। দুজনের কেউ তো আর নেই। একজন নিরুদ্দেশ, আর একজনের উদ্দেশ আমি কোনদিনই পাব না।'

'তারপর ?'

'তারপর তোকে বলব কি মিলি, অমন চিঠি জীবনে আমি কখনো পড়িনি।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মিলি আর কী বলতে যাচ্ছিল, টুকু বলল, 'আর কিছু জিজ্ঞেস করিসনে মিলি। আর কিছু জানতে চাসনে।'

ছেলে কেঁদে উঠেছিল। টুকু তাকে শান্ত করতে লাগল।

॥ ৪ ॥

সুধেন্দু-দীপ্তির আজ প্রথম বিবাহবার্ষিকী। দুদিন আগে থেকেই পূর্ণিমা মহাব্যস্ত। ছেলে আর বউ কাছে নেই। ভিলাইতে তারা নিজেদের মত করে অ্যানিভারসারি করবে। কলকাতার কোন কোন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছে। অতদূরে কে আর যাবে। কে যেন রসিকতা করে লিখেছে—যাতায়াতের ভাড়াটা টি এম ও· করে পাঠাও। বাবা-মাকেও যেতে লিখেছিল সুধেন্দু। কিন্তু মুকুন্দবাবুর কি আর জীবনেও কোনদিন ছুটি আছে?

মিলি বলল, 'দিদি, আমাকে আগে বললে না কেন? তুমি আর আমি দুজনে মিলে চলে যেতাম। ওদের বিয়েটা তো আব দেখিনি। বিয়ের অ্যানিভারসারিটা দেখতাম।'

পূর্ণিমা বললেন, 'সেটা তুই এখানে বসেই দেখতে পারবি। কিন্তু খাটতে হবে আমার সঙ্গে সঙ্গে। শুধু জামাইবাবুর সঙ্গে আড্ডা দিলে চলবে না।'

মিলি হেসে বলল, 'শুনছেন জামাইবাবু, দিদির খোঁটা? হস্টেলে যাওযার আগে আমি আর আপনার সঙ্গে কথা বলব না।'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'তাহলে দম বন্ধ হয়ে তুইও মারা যাবি আমিও মাবা যাব। বিয়ের পব মিষ্টি কথা যেটুকু তা ওই শালীতেই বলে। শালীর দিদির কাছে তো মুখঝামটা।'

পূর্ণিমা একবার স্বামীর দিকে তাকালেন। কোন কথা বললেন না। বাজাবেব ফর্দ তৈরি কবতে ব্যস্ত ছিলেন তিনি।

বউযেব শাড়ি তিনি আগেই পার্শেল পোস্ট-এ পাঠিয়ে দিযেছেন। ছেলেকে দিযেছেন একটি জাম্পাব, নিজের হাতে তৈরি। টেলিগ্রামে আশীর্বাদ পাঠিযেছেন।

দুপুরে কয়েকজন আত্মীয়-বন্ধুকে খাওয়াবেন পূর্ণিমা। দুপুবে যাঁরা আসতে পারবেন না, তাঁদের জন্যে রাত্রে বন্দোবস্ত।

তপন বলল, 'মা, কী যে পাগলামি কবছ। দাদাব বিয়েতে কত খবচ করেছ আবার বিবাহবার্ষিকীতেও এত জাঁকজমক। এই খরচে আমার বিয়েটা হয়ে যেত।'

পূর্ণিমা হেসে বললেন, 'ছেলের সখ দেখ। এখনো তো কলেজেব গণ্ডি ছাড়াতে পারিসনি। কবে চাকরি পাবি ভগবানই জানেন। বউ এনে খাওয়াবি কি?'

তপন বলল, 'সেজন্যে ভেব না। আমি যাকে বিয়ে কবব সে বউদির মত হাইহিল পরা মেয়ে নয়। তোমার ছোট বউমা শ্বশুর-শাশুড়ীব পাতেব প্রসাদ খেয়েই দিব্যি কয়েক বছর কাটিয়ে দিতে পাববে।'

পূর্ণিমা হেসে বললেন, 'তাহলে বলি তোর বাবাকে। নতুন বধূবরণের ব্যবস্থা করুন।'

তপন বলল, 'ওবে বাবা! দরকার নেই। তোমাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না। আজই তো আর বউটউ কেউ আসছে না। তার বদলে আমার একজন বন্ধু কিন্তু রাত্রে খাবে।'

মিলি বলল, 'মাত্র একজন? এক ডজন নয়? তোমার সঙ্গে তো জনা পাঁচ-ছয় ছেলেকে প্রায় সব সময় ঘোরাফেরা করতে দেখি তপনদা।'

তপন বলল, 'আমার বন্ধুদের দিকে কেন তুই তাকাতে যাস মিলি? তাকাবার তো কথা নয়। তোর জন্যে তো আমার বাবাব বন্ধুরাই আছেন।'

মিলি বলল, 'দাঁড়াও, বলে দিচ্ছি গিয়ে জামাইবাবুকে।'

আজ আর সময় পাবেন না বলে রাত্রেই সুধেন্দুদের ঘর জুড়ে আলপনা দিয়েছেন পূর্ণিমা। এক কোণে ছোট একটি টেবিলের ওপর একই সাইজের পুত্র-পুত্রবধূর দুখানি ফটো।

পূর্ণিমা একটি যুঁই ফুলের মালা মিলির হাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'দুখানি ফটোতে ভালো করে জড়িয়ে দে।'

মিলি বলল, 'তুমি দাও না দিদি।'

পূর্ণিমা বললেন, 'না না তুই দে। তোকে ওরা খুব ভালোবাসে।'

মিলি মালাটি জড়িয়ে দিয়ে বলল, 'দিদি, তুমি একজন রিয়েল আর্টিস্ট।'

পূর্ণিমা হেসে বললেন, 'সত্যি নাকি ?'

মিলি বলল, 'আচ্ছা দিদি, তোমরা নিজেরা ম্যারেজ অ্যানিভারসারি করো তো ?'

পূর্ণিমা বললেন, 'দূর। তোর জামাইবাবুর ওসব সখ-টখ নেই। আমাদের বাড়িতে এই প্রথম ম্যারেজ অ্যানিভারসারি।'

একটু চুপ করে থেকে পূর্ণিমা বললেন, 'মিলি, আজ সন্ধ্যাবেলায় ওই কবিতাটি আবৃত্তি করিস।'

'কোন্ কবিতাটি দিদি ?'

পূর্ণিমা বললেন—

'আমরা দুজনা ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদি কালের হৃদয়-উৎস হতে।'

মিলি তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলল—

'আমরা দুজনা করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে
বিরহ বঁধুর নয়ন সলিলে
মিলন মধুর লাজে।'

পূর্ণিমা বললেন, 'আজ সন্ধ্যার সময় তুই একটু নাচবিও—বুঝলি ?'

মিলি বলল, 'ওরে বাবা! আমি বুঝি সবই করব ? আজ আমি তোমার গেস্টদের ভাত-ডাল-মাছ-তরকারি পরিবেশন করব। নৃত্য-গীতটা সেকেণ্ড ম্যারেজ অ্যানিভারসারির জন্যে তোলা থাক।'

মুকুন্দবাবু আজও অফিসে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মিলি তাঁকে গোপনে এসে পরামর্শ দিয়ে গেছে, 'খবরদার, অমন কাজও করবেন না জামাইবাবু। দিদি তাহলে রেগে-মেগে ডিভোর্স করে বসবে। এই শুভদিনে কাজটা ভালো হবে না।'

দুপুরে নিমন্ত্রিতদের সংখ্যা খুব বেশি হল না। কেউ কেউ আসবেন না বলে আগেই জানিয়েছিলেন। দু'একজন বিনা নোটিশে অনুপস্থিত হলেন।

পূর্ণিমা বললেন, 'এই তো তোমার বন্ধুদের কাণ্ড।'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'ওদের দোষ দিতে পারিনে। আর এস· ভি· পি· দিয়ে নিমন্ত্রণের চিঠি তো আর পাঠাইনি।'

মিলি নিজেই পরিবেশনের ভার নিল। পদ্মাও রইল তার সঙ্গে। পূর্ণিমা এসে দেখাশোনা করতে লাগলেন।

এক টেবিলে খেতে বসলেন সুধেন্দুর জ্যাঠশ্বশুর কৃষ্ণপ্রসাদ, মুকুন্দবাবুর ক্লাসমেট কালীকিঙ্কর, আর তার সহকর্মী যুবক রজতকান্তি আর মুকুন্দবাবু নিজে।

মুকুন্দবাবু বললেন, 'কৃষ্ণবাবু কেমন রান্না-বান্না হয়েছে ?'

কৃষ্ণপ্রসাদ বললেন, 'চমৎকার। মাছ-মাংস পোলাও কালিয়া ভুরি ভোজের ব্যবস্থা। এবার নিজেদের বিবাহ-বার্ষিকীটাও আরম্ভ করে দিন। আমাদের একটা উপলক্ষ বাড়ুক।'

পূর্ণিমা বললেন, 'রান্নার প্রশংসা তো করলেন। এবার বাড়াটা কেমন হয়েছে বলুন। আমার বোনের পরিবেশনটা—'

কৃষ্ণপ্রসাদ মিলির দিকে একটু তাকালেন, তারপর হেসে বললেন, 'অতি চমৎকার। বলতে গেলে পরিবেশনের গুণেই রান্নার এই স্বাদ হয়েছে।'

পূর্ণিমা হেসে বললেন, 'শুনলি তো ? সবাই এখন শতমুখে তোবই প্রশংসা কবে।'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'কববেই। তুমি এখন ওব কাছে অমাবস্যা।'

পূর্ণিমা বললেন, 'অতটা একচোখোমিও আবাব ভালো নয। তোমাব শ্যালিকাব গায়েব বং আমাব চেযে—'

তাঁব ক্লাসমেটকে সাক্ষী মানলেন মুকুন্দবাবু, 'আচ্ছা কালী, তুই-ই বল। বংই কি রূপেব একমাত্র ক্রাইটেবিযা ?'

কালীকিঙ্কব হেসে বললেন, 'ভাই কালো বংযেব পক্ষে ওকালতি কবা কি আমাদেব সাজে ? বাবা-মা এমনই নামটা একেবাবে বঙেব সঙ্গে মিলিযে বেখেছিলেন। লোকে তো ভালোবেসে কানা ছেলেব নামও পদ্মলোচন বাখে।'

সবাই হেসে উঠলেন।

মুকুন্দবাবু তাঁব সহকর্মীকে বললেন, 'বজত, মিলি বিশ্বাসই কবে না আমি এক সময শিকাব-টিকাব কবতাম। আমি এখন নিধিবাম সর্দাব হযে আছি। ঢাল তলোযাব কিচ্ছু নেই। কিন্তু তোমাব তো একটা বন্দুক আছে।

'আছে স্যাব।'

'তুমি একদিনেব জন্য সেটা আমাকে ধাব দেবে।'

'নিশ্চযই স্যাব, নিশ্চযই।'

'আমি মিলিকে নিযে যাব তোমাদেব ওই অঞ্চলে —হাতটা ঠিক আছে কিনা পবখ কবে দেখা যাবে। পুবো একটা দিনেব প্রোগ্রাম কেমন হবে বলতো ?'

'চমৎকাব হবে স্যাব।'

বজতেব উৎসাহেব আধিক্যে তিন প্রবীণ হাসলেন।

মিলি যতবাব বজতকে পবিবেশন কবতে গেল মুকুন্দবাবু বললেন, 'ওখানে একটু দেখে শুনে দাও।'

গোপনে জামাইবাবুব জামায একটু ঝোল লাগিযে দিযে মিলি এব প্রতিশোধ নিল।

এক ফাঁকে টুকুব ঘবে একটু উঁকি দিযে দেখল মিলি। টুকু চিঠি পডছে। মধ্যপ্রদেশেব চিবিখিবি থেকে ওব স্বামী সৌবেশেব চিঠি এসেছে খানিক আগে। বেশ পুরু চিঠি। পডতে সময লাগে বইকি।

মিলি বলল, 'কি বে ক'বাব পডা হল ?'

টুকু বলল, 'ক'বাব আবাব ? ফাজিল কোথাকাব।'

মিলি বলল, 'চিঠিখানা কিন্তু আমাব হাতেই পডেছিল। আমি গাপ করে দিতে পাবতাম।'

টুকু বলল, 'কবলেই হল ?'

মিলি বলল, 'তোব নাম যে স্বপ্না বায আমার খেযালই ছিল না। আমি মিনিট খানেকেব জন্য পাজেলড হযে গিযেছিলাম। তাবপব বুঝতে পাবলাম ব্যাপাবটা। আমাদেব জামাতা বাবাজীবন তোকে কী বলে ডাকে বে। আটপৌবে নামে, নাকি পোশাকি নামে।'

টুকু বলল, 'তাকেই জিগ্যেস কবিস।'

খাওযাদাওয়াব পব মুকুন্দবাবু কুটুম্ব-বন্ধুদেব নিযে পাশেব ঘবে তাসেব আসব পাতলেন। 'খানিকটা সময় যখন হাতে এসেছে তিনি তাকে তাস-ছাড়া কবতে চান না।

মিলি চা দিতে এসে এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা কবল, 'জামাইবাবু, আপনাব সেই ম্যাজিশিযান বন্ধুর কি হল। তাঁর যে আসবার কথা ছিল।'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'সে রাত্রে আসবে। ম্যাজিশিয়ানবা তো নিশাচবই হয়।'

'ম্যাজিক-ট্যাজিক দেখাবেন তো ?'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'তা তো তোবই জানবাব কথা। এখন তো তুই-ই তার ইমপ্রেসাবিও।'

' মিলি বলল, 'আহা।'

সন্ধ্যার আগে আগে এল মলয়।

মিলি তাকে পাকড়াও করল, 'তুমি সেই যে ডুব দিয়েছ ছোড়দা, আর তোমাব দেখা নেই।'

পূর্ণিমা বললেন, 'দুপুরে এলিনে কেন?'

মলয় বলল, 'দুপুরে হস্টেলে আই· ডি—মানে ইমপ্রুভড ডায়েট ছিল দিদি।'

পূর্ণিমা তার দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হেসে বললেন, 'আমার ভোজমানব মহারাজ। এখানে আরো ইমপ্রুভড ডায়েট পেতি।'

মলয় বলল, 'রাত্রে খাব।'

তারপর পকেট থেকে কলেজের আর হস্টেলের ফর্ম বের করে দিয়ে বলল, 'একেবারে বিনা কাজে বসে থাকিনি। তোর জন্যে কি রকম ছুটোছুটি করছি তাই দেখ। ইন্টারভিউর আর দরকার হবে না। ফর্ম ফিল আপ করে দিলেই হবে। তারপর ওরা যেদিন ডাকবে একেবারে তল্পিতল্পা নিয়ে হস্টেলে চলে যাবি।'

মিলি যে ছাত্রী হঠাৎ যেন তার খেয়াল হল। এতদিন সে ওসব কথা ভুলেই ছিল। সে যেন দিদি জামাইবাবুদের একজন। পড়াশুনো সে ভালোবাসে, পরীক্ষায় তার কোন ভয় নেই। তবু চেঞ্জে যাওয়ার মত এই হাওয়া বদল তারও বেশ ভালো লাগছিল। সে এমন এক পুরো বয়স্কদের রাজ্যে এসে পড়েছে যাঁদের পড়াশুনোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। যাঁরা বহুকাল ওই সংস্রব ছেড়ে এসেছেন, যাঁদের কথাবার্তা চাল-চলন, দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাট সমস্যা আর তার সমাধান সম্পূর্ণ আলাদা। কিছুদিনের জন্যে তাঁদের একজন হয়ে যেতে বেশ লাগছিল মিলির।

সন্ধ্যার পর তপন এল তার সেই বন্ধুকে নিয়ে। সুদর্শন দীর্ঘাঙ্গ যুবক। তপনের চেয়ে বয়সে দু'তিন বছরের বড়ই হবে হয়ত। তপন সগর্বে পরিচয় করিয়ে দিল, 'আমার বন্ধু দীপঙ্কর সেন। জানিস ও ফ্লাইয়িং ক্লাবের মেম্বার। পাইলটিং শিখছে।'

ড্রয়িংরুমে এসে বসল সবাই। ফ্লাইয়িং ক্লাব, পাইলটিং—এই দুটি কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মিলির মন উঁচু আকাশে ডানা মেলে উড়তে শুরু করল। ভারি চমৎকার ভারি মজার তো। এ পর্যন্ত কোন পাইলটকে মিলি দেখেনি। দীপঙ্কর অবশ্য পাইলট এখনো হয়নি। কিন্তু হবে তো একদিন। ওর চেহারায়, ওর দৃপ্ত ভঙ্গিতে সেই উচ্চ প্রত্যাশা আছে। ও যেন এক মূর্তিমান অ্যাম্বিশন। মিলির মনে হল যে যাদুকরকে সে স্বপ্নে দেখেছিল নীলধ্বজের সঙ্গে তার কোন মিল নেই বরং মিল আছে এই দীপঙ্করের সঙ্গে। সে যাদুবিদ্যা শেখে না, বিমান চালনার বিদ্যার্থী। কিন্তু তার মধ্যেও কি কম যাদু।

তপন মিলিরও গুণপণার পরিচয় দিল। 'ভালো ছাত্রী, নানা বিষয়ে ইনটারেস্ট আছে। আজকে ওর নাচও দেখতে পাবে দীপুদা।'

দীপঙ্কর একটু হাসল, 'তাহলে তো বেশ ভালো দিনেই এসে পড়েছি।'

মিলি বলল, 'হ্যাঁ। আজ এখানে ভালো খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আছে।'

দীপঙ্কর বলল, 'আমাকে কি আপনার পেটুক বলে মনে হয়? আমি দেখাশোনার জন্যেই এসেছি।'

তপন বলল, 'তুমি ওকে আপনি আপনি করছ কেন দীপুদা, ও আমার অনেক ছোট। ওর মুখ থেকে এখনো দুধের গন্ধ যায়নি। গায়ে এখনো স্কুলের গন্ধ লেগে রয়েছে।'

দীপঙ্কর আশান্বিত হয়ে মিলির দিকে একটু চেয়ে হেসে বলল, 'তাহলে তুমি বলতে পারি?'

মিলি ভ্রূ কুঁচকে একবার তপনের দিকে তাকাল। বুঝিয়ে দিল সে অনধিকার চর্চা করছে। তারপর তাকাল দীপঙ্করের দিকে। হেসে বলল, 'না। তুই আর তুমি শুনে শুনে আমার কান ঝালাপালা হয়ে গেছে। কেউ যদি আমাকে আপনি বলে আমার খুব ভালো লাগে।'

চট করে কোন জবাব দীপঙ্করের মুখে জোগাল না

পাশের ঘর থেকে ডাক শোনা গেল, 'মিলি!'

'দিদি ডাকছেন, শুনে আসছি।'

যেতে যেতে মিলি শুনতে পেল, দীপঙ্কর বলছে, 'এ যে দেখছি ঝিলিমিলি!'

তপন আর তপনের বন্ধু যাই বলুক অত সহজে ওকে ইনটিমেট হতে দেবে না মিলি। বৃদ্ধ কি

প্রৌঢ়কে এ তো সানুগ্রহ্-প্রশ্রয় নয়, এ যুদ্ধ সমানে সমানে।

পূর্ণিমা বললেন, 'এ বেলা খাওয়া-দাওয়ার ঝামেলা কম। ওসবের দিকে তোর যাওয়ার দরকার নেই। গেস্টদের তুই একটু এনটারটেইন করবি। দু'একটা আবৃত্তি একটু নাচ। আমি সবাইকে বলে রেখেছি।'

মিলি বলল, 'আবৃত্তি হতে পারে। কিন্তু নাচ কী করে হবে দিদি? জায়গা কোথায়?'

পূর্ণিমা বললেন, 'বড় ঘরখানা পরিষ্কার করে রেখেছি। ঘরোয়া ব্যাপারই তো। ভেবেছিলাম ছাতেই ব্যবস্থা করব। কিন্তু ভরসা হয় না। বিষ্টি-টিষ্টি এসে পড়তে পারে। আকাশের অবস্থা ভালো নয়।'

মিলি বলল, 'জায়গা না হয় ওতেই হয়ে যাবে। কিন্তু আরো তো ব্যবস্থা চাই। ঘুঙুর-টুঙুর আমি তো কিছুই সঙ্গে নিয়ে আসিনি।'

পূর্ণিমা বললেন, 'আমি সব ব্যবস্থা করেছি। ফুলের মালা আনিয়েছি। ভালো করে সেজে নে। ঘুঙুর বাঁয়া-তবলা হারমোনিয়ম সব কিছুর ব্যবস্থা করেছি।'

মিলি বলল, 'কিন্তু আমার যে অনেকদিন ধরে প্র্যাকটিস নেই দিদি। এতই যখন করেছ, আজ নাচটাও তুমি নেচে দাও।'

পূর্ণিমা সস্নেহে মিলির দু'গাল টিপে ধরে বললেন, 'তোর গলা টিপে মেরে ফেলব।'

তপনই খবর নিয়ে এল, 'মিলি নীলধ্বজবাবু এসেছেন।'

মিলি বলল, 'জামাইবাবুকে ডেকে দাও।'

তপন বলল, 'বাবা তাস খেলছেন। তাছাড়া উনি তো এসেই তোর খোঁজ করছেন।

তপন একটু হাসল।

মিলি বলল 'করবেনই তো। যাচ্ছি।'

একটু বাদে মিলি এসে নীলধ্বজের পাশে বসল। দীপঙ্কর যে অন্য সোফা থেকে লক্ষ্য করছে তা আড়চোখে দেখে নিল।

আজ নীলধ্বজের পরনে সাদা পাজামা পাঞ্জাবি। সেদিন পরনে ধুতি ছিল, গেরুয়া রঙের জামা ছিল গায়ে।

নীলধ্বজ বললেন, 'কী দেখছ?'

মিলি একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'আজ আপনি সব সাদা পরে এসেছেন।'

নীলধ্বজ হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, নামটা এবার বদলে নিলেও পারি। নীলধ্বজের বদলে শ্বেতকেতু। অনেকদিন ধরেই পরাজয়ের পতাকা কাঁধে নিয়ে বেড়াচ্ছি।'

মিলি বলল, 'ওকথা শুনতে কিন্তু আমার ভালো লাগে না। মানুষ হার মানবে কেন? আমি তো কিছুতেই হার মানিনে। আর যে হার মানে তার ধার দিয়েও হাঁটি নে।'

নীলধ্বজ বললেন, 'তাই নাকি? তবে তো তোমাকে আর বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারব না।'

মিলি একটু লজ্জিত হল। কী যে বলবে ভেবে পেল না।

একটু বাদে বলল, 'আপনি আজ ম্যাজিক দেখাবেন তো?'

নীলধ্বজ বললেন, 'না।'

মিলি বলল, 'ও মা। আমি তো ভেবেছি আপনি যখন এসেছেন নিশ্চয়ই আজ ম্যাজিক দেখাবেন।'

নীলধ্বজ বললেন, 'কোন নতুন খেলা আমার জানা নেই।'

মিলি বলল, 'আমি তো আপনার কোন খেলা দেখিনি। আমার কাছে সবই নতুন।'

নীলধ্বজ আস্তে আস্তে বললেন, 'তা ঠিক। তোমার কাছে সবই নতুন। আর আমার কাছে সবই পুরনো। খেলা আজ আমি তোমাকে দেখাব না। আমি যদি আজ খেলা দেখাতে যাই তোমার লীলা দেখবে কে?'

মিলি একটু হতাশ হল বুঝতে পেরে নীলধ্বজ বললেন, 'আর একদিন দেখাব। আবার একটা শোয়ের ব্যবস্থা করছি। কে জানে এইটাই হয়তো লাস্ট শো। বোধহয় নিউ-এম্পায়ারে হবে।

তোমাকে কার্ড পাঠাব। যেযো তুমি।'

মিলি এই প্রতিশ্রুতিটুকু পেযে খুশি হল। যে ম্যাজিকেব স্বপ্ন সে দেখেছে তেমন একটু কিছু ঘটবে নাকি? ঘটলে কিন্তু মন্দ হয না। স্বপ্নেব মধ্যে মিলি যেমন ভয পেযেছিল সত্যি হলে কিন্তু তেমন ভয পাবে না।

ঘব থেকে যাওযাব আগে মিলি এবাব দীপঙ্কবদেব সামনে গিযে দাঁড়াল। বেশ বুঝতে পাবল সে একটু ক্ষুণ্ণ হযেছে।

তপন বলল, 'কী ব্যাপাব? তুই যে আবাব ঘুবে এলি।'

মিলি তপনেব দিকে তাকিযে দীপঙ্কবেব উদ্দেশ্যে বলল, 'ওঁব কাছে আমাব একটা জবাব পাওনা আছে।'

দীপঙ্কব বলল, 'জবাব? কই, আপনি কিছু জিজ্ঞেস কবেছিলেন বলে তো আমাব মনে পড়ে না।'

মিলি হেসে বলল, 'ইনস্ট্রাকশন। আপনি বোধহয বাগ কবেছেন। চলুন ওঘবে।'

দীপঙ্কব বলল, 'কেন, ওঘবে কি। সেই ভালো খাওযা-দাওযাব লোভ দেখাচ্ছেন তো?'

মিলি বলল, 'আসুন না, এলেই দেখতে পাবেন।'

সবাইব আগে মিলি নিজেই চলে এল। দিদি নাচেব আসবেব ব্যবস্থা প্রায সম্পূর্ণ কবে ফেলেছেন। টুকুও তাঁকে সাহায্য কবছে।

পূর্ণিমা বললেন, 'তাড়াতাড়ি তৈবি হযে নে। এব পব তো ওঁদেব আবাব বসিযে টসিযে দিতে হবে। বেশি বাত কবা চলবে না। কোনটা নাচবি বলতো।'

মিলি একটু ভেবে বলল, 'অভিসাব।'

পূর্ণিমা বললেন, 'কোন অভিসাব? রুম ঝুম রুম ঝুম ঝুম নূপুব বাজে। প্রেম বাধা সঙ্গে অভিসাব সাজে সেই বাধাব অভিসাব?'

মিলি বলল, 'না না। ববীন্দ্রনাথেব অভিসাব। বাসবদত্তা। স্কুল থেকে সেবাব হল। ওইটাতেই তো মেডেল পেযেছিলাম আমাদেব মধুবিমা হযেছিল উপগুপ্ত।'

'কিন্তু এখানে উপগুপ্ত কে হবে?'

মিলি টুকুব দিকে তাকিযে বলল, 'টুকু তুই হবি আমাব উপগুপ্ত? কিচ্ছু কবতে হবে না। শুধু সেজেগুজে বসে থাকলেই হবে।'

টুকু বলল, 'না বাবা, আমি ছেলে সাজতে পাবব না।'

মিলি বলল, 'ছেলেব মা হলে বুঝি নিজে সাজা যায না।' তাবপব পূর্ণিমাব দিকে চেযে বলল, 'দিদি, তাড়াতাড়ি একটি মেযে খোঁজ, আমাব উপগুপ্ত হবে।'

পূর্ণিমা বললেন, 'মেযে কোথায পাব? তুই ডাকলে অনেক ছেলে চলে আসবে।'

মিলি বলল, 'ধ্যেৎ। তাহলে উপগুপ্ত গুপ্তই থাক, আমি একাই পাবব। তুমি কিন্তু কবিতাটা পিছন থেকে পড়ে দেবে।'

শেষ পর্যন্ত উপগুপ্ত হতে একটি মেযেকে বাজি কবান গেল। কিন্তু আব এক বিভ্রাট। তবলিযা আসেনি।

নীলধ্বজ এগিযে এলেন, 'আমি ঠেকা দিতে পাবি। আশা কবি তাল ভঙ্গ হবে না।'

মিলি একটু অবাক হযে বলল, 'আপনি পাবেন নাকি ওসব?'

নীলধ্বজ বললেন, 'তোমাব ভাব দেখে মনে হচ্ছে এ-ও এক ম্যাজিক দেখছ?'

পূর্ণিমা বললেন, 'তুই জানিসনে মিলি উনি এক বহুরূপী।'

নীলধ্বজ বললেন, 'সব বাণিজ্যেব জ্যাক। শ্রেষ্ঠী কি সওদাগব নই।'

নীলধ্বজ মিলিব রূপসজ্জাবও একটু পবিবর্তন ঘটালেন। বাসবদত্তাব মাথাটাথাগুলি একটু ঠিক কবে দিলেন।

মিলি বলল, 'আপনি এসব পাবেন?'

নীলধ্বজ বললেন, 'সব পাবিনে। কিছু কিছু। স্টেজ নিযে তো আমাবও কিছু কাববাব আছে।'

নৃত্য শুরু হতে মুকুন্দবাবুরা তাসের আসর ছেড়ে এঘরে এসে বসলেন। যতক্ষণ অনুষ্ঠান হল উঠলেন না।

পূর্ণিমা পড়তে রাজি হলেন না। তাঁর জায়গায় তপন দীপঙ্করকে বসিয়ে দিল। চমৎকার পড়ে।

দর্শকদের সুখ্যাতিতে মিলি খুব খুশি।

দীপঙ্কর বলল, 'আপনার নাচ চমৎকার হয়েছে।'

মিলি বলল, 'আপনি এত ভালো পড়তে পারেন তাতো জানতাম না।'

দীপঙ্কর বলল, 'আপনি আমার কী জানতেন?'

মিলি বলল, 'আপনি পাইলট একথা শুনেছি।'

দীপঙ্কর বলল, 'পাইলট এখনো আমি হইনি, তবে হব।'

মিলি বলল, 'ড্যানসারও আমি এখনো পর্যন্ত হইনি তবে হব। জানেন, আমি পড়ার দিকে যাব নাকি নাচের দিকে যাব সেদিন পর্যন্ত আমি সব স্থির করতে পারিনি। আমাকে দুটোই টানে।'

দীপঙ্কর বলল, 'মাত্র দুটো? একদিন আমাদের ফ্লাইং ক্লাবে আসবেন তপুর সঙ্গে। তখন আপনার পাইলটিং শিখতে ইচ্ছা হবে।'

'শেখবার ব্যবস্থা করে দেবেন তো?'

নিশ্চয়ই দেব।'

'কী মজা! আপনি আসবেন আমাদের হস্টেলে। ভিজিটর্স লিস্টে আপনার নাম দিয়ে দেব।'

দীপঙ্কর বলল, 'আমার সৌভাগ্য। এত তাড়াতাড়ি এনলিস্টেড হব ভাবতেই পারিনি।'

আহারাদির পর অতিথিরা বিদায় নিলেন।

নীলধ্বজ যাওয়ার আগে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করে গেলেন মিলি আর তার দিদি-জামাইবাবুকে।

মিলি বলল, 'কবে?'

নীলধ্বজ বললেন, 'তোমাদের যে দিন সুবিধে। সম্ভব হয়তো কালই। বিকেলে।'

মিলি বলল, 'কালই কি আর হবে। জামাইবাবু এইতো একদিন কামাই করলেন আর বোধহয় একমাসের মধ্যে উনি আর ছুটি নেবেন না।'

পূর্ণিমা বললেন, 'একমাস কি বলছিস, এক বছর বল।'

মিলি বলল, 'তবেই দেখুন। দু-চারদিনের মধ্যেই আমি হস্টেলে ঢুকে পড়ব।'

নীলধ্বজ বললেন, 'তুমি ঢুকে পড়বে আর আমি কলকাতার বাইরে বেরিয়ে পড়ব। তার আগেই এক কাপ চা যদি খেয়ে আস খুশি হব।'

মিলি বলল, 'তাহলে জামাইবাবুকে বলুন।'

নীলধ্বজ মুকুন্দবাবুর দিকে এগিয়ে গেলেন, 'মুকুন্দ, তুমি কবে যেতে পারছ বল।'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'আমাকে আর কেন। যারা আসল তাদের নিয়ে যাও। আমার সময় করা কঠিন।'

নীলধ্বজ বললেন, 'জীবনে অনেক কঠিন কাজ তুমি করেছ। করে সফলও হয়েছে। আমি তার কিছুই পারিনি। আমার খাতিরে আর সামান্য একটু শক্ত কাজ না হয় করলে।'

পূর্ণিমা বললেন, 'অত করে বলছেন ভদ্রলোক। যাও না। অফিস তো তোমার তিনশ পঁয়ষট্টি দিনই আছে।'

শেষ পর্যন্ত রবিবার বিকালে দিন ঠিক হল। অফিসে না গিয়ে মুকুন্দবাবু পারবেন না। তবে যত তাড়াতাড়ি পারেন চলে আসবেন। তবে বিকেল গড়িয়ে যদি সন্ধ্যা হয় নীলধ্বজ যেন অধীর না হন, কি বাড়িঘরে তালাচাবি দিয়ে বেরিয়ে না পড়েন।

নীলধ্বজ বললেন, 'ঠিক আছে। আমি তোমার জন্যে সন্ধ্যা তো ভালো শেষ রাত অবধি বসে থাকব।'

মুকুন্দবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'আমার জন্যে?'

॥ ৫ ॥

এই অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা শুনে তপন বলল, 'মিলি, তুই একটা আস্ত বোকা।'

'কেন ? বোকামির কী হল ?'

তপন বলল, 'ওই বুড়ো ম্যাজিশিয়ানের ভূতুড়ে বাড়িতে গিয়ে কি কোন লাভ আছে ? তার চেয়ে দীপুদাব সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলে অনেক কাজ হত। ওরা নতুন মডেলের একটা অ্যামবাসাডর কিনেছে। গাড়িটা দীপুদাই বেশির ভাগ চালায়। একদিন সারা কলকাতা টহল দেওয়া যেত।'

'সত্যি ?'

'একদিন তো তোকে ফ্লায়িং ক্লাবে যাওয়ার জন্যে নিমন্ত্রণও করে গেছে। যেতে পারতি সেখানে। দেখতে পারতি কী করে প্লেন চালান হয়।'

মিলি বলল, 'যাব একদিন।'

তপন বলল, 'জু-তে যাওয়া যেত, বোটানিকস-এ যাওয়া যেত। ঘুরে বেড়াবার, দেখবার, শোনবার আরো কত আনন্দ করবার কত জায়গা ছিল। অন্তত একটা সিনেমা দেখলেও কাজ হত। ফেরার সময় রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়েটেয়ে আসতাম। কিন্তু তুই পণ করেছিস ওই বুড়োদের সঙ্গ ছাড়বিনে।'

এসব যেন মিলির নিজেরই মনের কথা, তপনের মুখ থেকে বেরোচ্ছে। মিলি ভাবল এত তাড়াতাড়ি নীলধ্বজের বাড়িতে যেতে রাজি না হলেই হত। অন্তত যাওয়াটা পিছিয়ে দিলেই পারত।

তপন শেষে ভয় দেখিয়ে তার কাজ শেষ করল, 'ওই ওল্ড উইজার্ড মরা জন্তুজানোয়ারের মন্ত্রপড়া হাড় ছুঁইয়ে তোকে বুড়ী বানিয়ে না রাখে তো কী বলেছি।'

এবাব মিলি হেসে উঠল, 'তাতে তোমার অত দুঃখ কিসের তপনদা ?'

কিন্তু মিলি মনে মনে যাই ভাবুক বলি বলি করেও দিদি কি জামাইবাবুকে বলতে পারল না যে নীলধ্বজবাবুর বাড়িতে যাবে না। এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাকোচ করে দিয়ে সে যদি তপন আর তার বন্ধুর সঙ্গে বেরোয় ওঁরা কী ভাববেন।

মুকুন্দবাবু তাঁব কথা রাখলেন। সেদিন চারটের আগেই অফিস থেকে চলে এলেন। মিলিকে বললেন, 'কই তৈরি হয়ে নে। তোর তো সাজতে গুজতেই ঘণ্টা দেড়েক লাগবে।'

মিলি ভাবল, 'ছাই সাজ। যাব তো এক বুড়ো মানুষের সঙ্গে বুড়ো মানুষের কাছে। আমি এই আটপৌরে শাড়ি পরেই যাব।'

এদিকে আর এক বিপত্তি। পূর্ণিমা যেতে পাববেন না। টুকুর ছেলের জ্বর-জ্বর হয়েছে। ওদের একা রেখে কী করে যাবেন ?

মিলি বলল, 'দিদি, তাহলে আমিও না গেলাম।'

পূর্ণিমা বললেন, 'দূর তাই কি হয় ?' ভদ্রলোক অত করে বলে গেছেন, যাবি বলে তাকে কথাও দিয়েছিস। এখন না গেলে ভারি খারাপ দেখাবে। বেশি দেবি কর্ববিনে। এক কাপ চা খাবি, দুটো কথা বলবি, তারপর চলে আসবি।'

তারপর মুকুন্দবাবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, 'তোর জামাইবাবু কতদূর থেকে কত আশা করে এসেছেন তোকে নিয়ে একটু বেরোবেন বলে। ভদ্রলোককে নিরাশ করা কি ঠিক হবে ? দেখছিস নে এই অবেলায় দাড়ি-কামাবার কি ঘটা !'

মিলি হেসে বলল, 'সত্যি জামাইবাবু, সকালেই তো একবার দাড়ি কামিয়ে গেছেন আবার কেন ?'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'এ রহস্য তোরা বুঝবিনে। তোরা তো আর মুকুন্দ হয়ে জন্মাসনি মাকুন্দ হয়ে জন্মেছিস।'

পূর্ণিমা বললেন, 'জানি গো জানি। ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাকা দাড়ি বেরোয় চেঁছে আর কী করবে।

কিন্তু নীলধ্বজবাবুতো বিয়ে-টিয়ে করেননি শুনেছি। চাকরবাকর নিয়ে একা একাই থাকেন। তোমার এত সাজ-সজ্জা কার জন্যে?'

মুকুন্দবাবু দাড়ি কামাতে কামাতে কৃত্রিম আক্ষেপের সুরে বললেন, 'তাইতো কার জন্যে।'

মিলিও বিনা সজ্জায় যেতে পারল না। দিদির অনুরোধে সাজ-সজ্জা করতে হল। নীলরঙের শাড়ি বেছে দিলেন পূর্ণিমা। বললেন, 'নীলধ্বজের ধ্বজা।'

বি টি রোডের মোড থেকে ট্যাকসি নিলেন মুকুন্দবাবু।

মিলি বলল, 'আবার ট্যাকসি কেন জামাইবাবু।'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'যা ভিড। বাসে উঠতেই পারবিনে। তাছাড়া ঠেলাঠেলি ঠাসাঠাসি কোথায় কার দাড়িতে ঘষা লাগবে তোর লিপস্টিক টিপস্টিক সব উঠে যাবে।'

মিলি সজোরে জামাইবাবুর পিঠে এক কিল বসিয়ে দিয়ে বলল, 'যাঃ।'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'ঈস জান তো গেলই ইস্ত্রিকরা জামাটাও গেল।'

মুকুন্দবাবু ড্রাইভারকে গ্রে স্ট্রীটে যেতে বললেন।

মিলি বলল, 'গ্রে স্ট্রীটে থাকেন বুঝি উনি?'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। সবাই গ্রে। তুই শুধু গ্রীন।'

টালা ব্রীজ পার হতে হতে পশ্চিমের সোনালি আকাশের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল মিলি। একটু বাদে বলল, 'জামাইবাবু নীলধ্বজবাবুর সঙ্গে তো আপনার স্বভাবের কোন মিল নেই তবু ওঁর সঙ্গে আপনার এমন বন্ধুত্ব হল কী করে?'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'অনেকেই বলে একথা। একসঙ্গে পড়তাম। কলেজের থার্ড ইয়ার থেকে বন্ধুত্ব। তোরা এখন যেটাকে ফার্স্ট ইয়ার বলিস। গোড়া থেকেই নীলধ্বজ একটু উদ্ভট ধরনের ছিল। ওর চালচলন, অসম্ভব অসম্ভব ধরনের কথাবার্তায় আমরা সবাই হাসতাম। ও কিন্তু গম্ভীর হয়ে থাকত। ও জানত না ওর সিরিয়সনেস সবাইকে হাসির খোরাক জোগাচ্ছে। ওর জামা ফরসা থাকতো, কাপড় ময়লা, কাপড়টা আস্ত থাকত তো ধোপা-বাড়ি থেকে ছিঁড়ে আসা জামাটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ত। কেউ কেউ ভাবত এসব ওর ইচ্ছাকৃত। আমি জানতাম তা নয়। এটা ওর খেয়ালের অভাব। আমরা কয়েকজনে মিলে ওর নাম দিয়েছিলাম ডন কুইকসট। তখন সার্ভান্টিস সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ আমাদের পাঠ্য ছিল।'

মিলি কৌতূহলী হয়ে বলল, 'তারপর?'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'কিন্তু ও পাঠ্যবইয়ের ধার ধারত না। অপাঠ্য অকেজো বই সব পড়ত। সস্তা মেসে থাকত। মোটেই গুছিয়ে টুছিয়ে থাকতে পারত না। আমি ওর কাছে মাঝে মাঝে যেতাম। গল্পের বইয়ের লোভেই যেতাম। তখন বইটই আমিও ঘাঁটতাম। বুঝলি? এখন সব ধানচালের মধ্যে গেছে।'

'তারপর?'

'তারপর পাঠ্যদশা শেষ করে আমরা দুজনে আরো বড় দুর্দশায় পড়লাম। পেটের ধান্দায় কে যে কোনদিকে ছিটকে পড়লাম তার কিছু ঠিক রইল না। 'উত্তরে উত্তরে চলে এসো নববর' সেই ডাকে সাড়া দিয়ে আমি চলে গেলাম নর্থ বেঙ্গলে। ডুয়ার্সের বনবাদাড়ে ঘুরলাম, জ্বরে ভুগলাম, কালাজ্বরে ভুগলাম। আরো দু-এক রকমের জ্বর থেকেও রেহাই পেলাম না। আর নীলধ্বজ কলকাতার রাস্তা পায়ে হেঁটে দুরমুজ করে বেড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে এক এক অফিসে ঢোকে, কিছুদিন থাকে আর বেরিয়ে আসে। কখনো তারা ছাড়ায়, কখনো ও ছেড়ে দেয়। ওর কর্মজীবনের ইতিহাস এক ব্যর্থতার মহাভারত। সেই আঠার পর্ব তোর শুনে কী হবে। আমি সব জানিও না।'

মিলি বলল, 'দরকার নেই জামাইবাবু, বড নীরস লাগছে। যদি রোমান্টিক ঘটনা-টটনা কিছু থাকে তাই বলুন।'

মুকুন্দবাবু হেসে বললেন, 'বটে! রোমান্টিক দুর্ঘটনা কিছু কিছু ঘটেছে ওর জীবনে। সত্য মিথ্যা জড়িয়ে অনেক রটনাই হয়েছে ওর নামে। মন্দ লাগে না—এমন একটা লিজেণ্ডারি ফিগার হয়ে থাকতে। তবে একটা ভুল ও করেনি। জিতেশের মত বিয়ে করেনি।'

'জিতেশ কে ?'

'টুকুব বাবা। নীলধ্বজ বুদ্ধিমানেব মত বিবাহবন্ধনেব বাইবেই থেকে গেছে। কিন্তু থাকলে হবে কি। বজ্র আঁটুনি ফসকা গেবোয ও অনেকবাব আটকা পডেছে। হযতো জীবনভোবই আটকে আছে।'

'ওব তেমন কেউ আছেন নাকি ?' মিলি মুখ টিপে একটু হাসল।

মুকুন্দবাবু বললেন, 'আমি অন্তত কাউকে দেখিনি। ও নিজেও কাউকে দেখেছে বলে মনে হয না। মনে হয সবাই ওব ধবাছোঁযাব বাইবে। বোধহয সেই জন্যেই স্পর্শ লোভেব অন্ত নেই। নানা হাট ঘুবে নানা ঘাটেব জল খেযে ও যখন ম্যাজিককে পেশা হিসেবে নিল আমি অবাক হযে গিযেছিলাম।'

মিলি বলল, 'কেন ?'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'ও নিজেই ভুলে আছে ও আবাব লোককে ভোলাবে কী কবে ? যাই হোক এক বিখ্যাত যাদুকবেব সঙ্গে সঙ্গে থেকে ও কযেক বছব তাঁব সাকবেদী কবল শোনা যায এ ব্যাপাবেও এক যাদুকবীব হাতছানি ছিল।'

'তাবপব ?'

'তাবপব কিছুদিন বেশ চলল। ও নিজেই এক দল গডল। দলবল নিযে ও বেশ কযেক বছব সাবা ভাবত না হোক পূবভাবত ঘোবাঘুবি কবে বেডাল কখনো আসামে কখনো বিহাবে কখনো উডিষ্যায। দক্ষিণ পশ্চিমে কখনো কখনো গিযেছে।'

মিলি বলল, 'ভাবি মজাব তো।

মুকুন্দবাবু বললেন, 'মজাব বই কি। কিন্তু এই মজাটা বেশি দিন বইল না একবাব শুনলাম ও একেবাবে দেউলে হযে গেছে।'

কেন ?

শুনলাম ওব ইমপ্রেসাবিও নাকি ম্যানেজাব ওকে ডুবিযেছে। বিশ পঁচিশ হাজাব টাকা মেবে দিযে উধাও। সেই ধাক্কা সামলাতে ওব বহুদিন লেগেছে। ধাব দেনা সব মিটেছে কিনা জানিনে। কিন্তু ওব ভাঙা দল আব জোডা লাগেনি '

আব ভাঙা হৃদয ?'

মুকুন্দবাবু হেসে বললেন, 'সে তো একেবাবে চূর্ণবিচূর্ণ এমন ফ্যাসিনেশনও দেখিনি। এমন ফ্রাস্ট্রেশনও দেখিনি। দুটোব বেকর্ডিং ডেসিমেল

বন্ধুচবিত শেষ কবতে না কবতেই মুকুন্দবাবু বন্ধুব বাডি দেখতে পেলেন ট্যাক্সি থামিযে ড্রাইভাবকে ভাডা চুকিযে দিযে গলিব মধ্যে গিযে ছোট একটি দোতলা বাডিব সামনে গিযে কডা নাডলেন।

সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক এসে দোব খুলে দিল

মুকুন্দবাবু বললেন, কিবে ভোলা ভালো আছিস ? বাবু আছেন ওপবে ?'

ভোলা বলল, 'আছেন। শুযে আছেন।'

'শুযে আছেন কিবে, অসুখ নাকি ?

ভোলা বলল, না অসুখবিসুখ নয। ওঁব দলেব লোকেব কেউ কেউ এসেছিলেন। তাঁদেব সঙ্গে কি নিযে যেন চটাচটি হল। তাঁবা চলে গেলেন। উনি মনটা খাবাপ কবে—'

মিলি বলল, 'জামাইবাবু, চলুন আমবা তাহলে ফিবে যাই।

মুকুন্দবাবু বললেন, 'দূব, তাই কি হয ? আমবা যে এসেছি তা ওকে একবাব জানিযে যাওযা ভালো। তুই ভাবিসনে।'

পুবদিকে অন্য একটি বাডিব উঠান। বড বড থামওযালা পুবনো নাটমন্দিব। সেই নাটমন্দিব এখন জনশূন্য। পিছনে ঠাকুবঘব। ডাইনে বাঁযেব দুটি ঘব তালাবন্ধ। মাঝখানেব ঘবখানি খোলা। ভিতবে বৃদ্ধ পুবোহিত বোধহয আবতিব আযোজন কবছেন। ওপবে বিদ্যুতেব আলো নিচে পিতলেব পিলসুজেব ওপব সন্ধ্যাপ্রদীপ। ভিতবেব ছোট ছোট মূর্তি এতদূব থেকে ভালো কবে দেখা

যায় না। বোধহয় রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিই হবে।

ঘুরে ঘুরে দক্ষিণ দিকে গিয়ে দাঁড়াল মিলি। এদিকে তো ফুল আর পাতাবাহারের টব। খানিকটা দূরে উঁচু পাঁচিল। পাঁচিলের এধারে এই বাড়ির কম্পাউণ্ডের মধ্যেই একটি বড় নিমগাছ ডালপালা বিস্তার করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

যেন কলকোলাহলের কলকাতা শহর নয়, শহরের বাইরে দূর এক অচিনপুরীতে এসে পড়েছে মিলি। জনশূন্য মৃতপুরী। যেখানে বাদ্য নেই, গীত নেই, গুঞ্জনধ্বনিটুকু পর্যন্ত নেই। প্রাণস্পন্দন থেমে গেছে।

মিলির হঠাৎ মনে হল, এর চেয়ে তপন আর দীপঙ্করের সঙ্গে প্রোগ্রাম করলে কী ভালোই না হত। হৈ হৈ করে সারা কলকাতা টহল দিয়ে বেড়ান যেত। হৈ হুল্লোড় উল্লাস উচ্ছ্বাসের কোন অন্ত থাকত না। আর দীপঙ্করের সেই ফ্লাইং ক্লাব। সেই ক্লাবে মিলি যাবে একদিন। প্রথম দিন গেস্ট হয়ে যাবে তারপর সেও রেগুলার মেম্বার হবে। সেও শিখবে পাইলটিং। মিলি দীপঙ্করের প্লেনের এয়ার হস্টেস হবে না, কো-পাইলটও হবে না। মিলি আলাদা প্লেন চালাবে। কম্পিটিশন হবে দীপঙ্করের সঙ্গে কে কত উঁচুতে উঠতে পারে। কার কত বেশি স্পীড। উর্ধ্বাকাশে দুখানি বিমানকে পাশাপাশি দেখতে পেল মিলি। একখানিতে দীপঙ্কর আর একখানিতে মিলি চৌধুরী। দক্ষতায় কেউ কারো চেয়ে কম নয়। না দীপঙ্করকে হারিয়ে দিতে মন সরল না মিলির।

ও পাশে পাশেই থাক।

'মিলি।'

সেই উঁচু নীলাকাশ থেকে নীলধ্বজ তাকে নামিয়ে আনলেন।

মিলি একটু চমকে উঠল। মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে চেয়ে লজ্জিতভাবে বলল, 'বলুন।'

নীলধ্বজ খুব কাছে আসেননি। একটু দূরে দাঁড়িয়েই তাকে ডাকছেন। তাঁর কণ্ঠস্বরে অপূর্ব মোহমন্ত্র। কে বলে গীত নেই, গুঞ্জন নেই, প্রাণস্পন্দন নেই এই পুরীতে। মিলির সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। কিন্তু মিলি দেখে আশ্বস্ত হল নীলধ্বজ একা নন, জামাইবাবুও পিছনে রয়েছেন।

নীলধ্বজ একটু হেসে বললেন 'কী দেখছিলে?'

মিলি বলল, 'এই নিমগাছটা—'

নীলধ্বজ বললেন, 'ওই গাছটা আমাকেও মাঝে মাঝে সঙ্গ দেয়। নাকি আমিই ওর সঙ্গী হই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবছিলে বল তো?' মিলি মৃদু লজ্জিত স্বরে বলল, 'কী আবার ভাবব?'

নীলধ্বজ হেসে বললেন, 'আমি কিন্তু থট রিডিং জানি। বলব?'

মিলি চ্যালেঞ্জ করতে ভরসা পেল না। কী জানি যদি সত্যিই বলে ফেলেন।

নীলধ্বজ তেমনি হেসে বললেন, 'ভয় নেই বলব না, বলব না। তুমি কতক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে আছ বল তো? ভারি মনোরম একটি স্ট্যাচুর মত দেখাচ্ছিল। আমি যদি ভাস্কর হতাম তোমার এই ভঙ্গিটি মর্মরে বাঁধিয়ে রাখতাম।'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'তুমি তো ওকে স্ট্যাচু করেও রাখতে পার। পার না নীলধ্বজ?' মিলি বুঝতে পারল জামাইবাবু তাকে ভয় দেখাচ্ছেন।

নীলধ্বজ বললেন, 'না মুকুন্দ, তা পারিনে বরং আমার যদি ক্ষমতা থাকত আমি মূর্তিগুলিকে তাদের মর্মরবন্ধন থেকে মুক্তি দিতাম। তাদের প্রাণ দিতাম—'

মুকুন্দবাবু হেসে বললেন, 'তোমার সে ক্ষমতা না থেকে ভালোই হয়েছে। এই ওভার পপুলেশনের দেশে পাথরের মূর্তিগুলিও যদি প্রাণ পেয়ে খাই খাই করত আমরা কিছুতেই তাদের রেশন দিতে পারতাম না।'

বসবার ঘরের পাশে ছোট আর একখানা ঘর। সেখানে ছোট ডাইনিং টেবিল পাতা। নীলধ্বজ অতিথিদের নিয়ে সেখানে বসলেন। তিনি একদিকে আর একদিকে মিলি আর মুকুন্দবাবু। নীলধ্বজ মিলির ঠিক সামনের আসনটি বেছে নিলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, 'ভোলানাথ নিজের হাতের কিছু না কিছু তোমাদের না খাইয়ে ছাড়বে না। আনো দেখি ভোলানাথ কী করেছ।'

ভোলানাথ বলল, 'আমি সবই করতে পারি। বাবু করতে না দিলে কী করব বলুন—'

লুচি, তরকারি, ডিমের কারি প্লেটে প্লেটে সাজিয়ে দিল ভোলানাথ।
মুকুন্দবাবু বললেন, 'এ যে সত্যিই ভোজবাজি করে ফেলেছ দেখছি। এত অল্পসময়ের মধ্যে—'
মিষ্টিগুলি অবশ্য বাজার থেকেই এসেছে। রসগোল্লা সন্দেশগুলি সাজিয়ে দিল ভোলানাথ।
মিলি বলল, 'এত কে খাবে।'
মুকুন্দবাবু বললেন, 'খা না। তুই তো মিষ্টি ভালোইবাসিস।'
নীলধ্বজ হেসে বললেন, 'শুধু মিষ্টি? ঝাল টক—'
মিলি বলল, 'তা ও ভালোবাসি।'
নীলধ্বজ হঠাৎ একটি রসগোল্লা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'ঈস্, কেমন যেন আমের গন্ধ বেরোচ্ছে। ভোলা কোন দোকান থেকে আনলি এই মিষ্টিগুলি। দেখতো মিলি।'
মিলি একটি রসগোল্লা মুখে দিয়ে বলল, 'সত্যিই তো জামাইবাবু।'
নীলধ্বজ বললেন, 'মুকুন্দ, তুমি দেখতো খেয়ে। আনারসের গন্ধ পাচ্ছ কিনা দেখতো। মিলি আমও চেনে না আনারসও চেনে না।'
মুকুন্দবাবু খেয়ে বললেন, 'হ্যাঁ আনারসের গন্ধই তো।'
মিলিও দ্বিতীয়বার খেয়ে আনারসের গন্ধ পেল
মুকুন্দবাবু বললেন, 'কলা কাঁঠাল বাকি থাকে কেন সেগুলিও আমদানি কর।'
এঁটো প্লেটগুলি সরিয়ে নিয়ে গেল ভোলানাথ। চায়ের কেটলিটা টেবিলের ওপর রাখল। কাপ-প্লেটগুলি সাজিয়ে দিল সামনে।
মুকুন্দবাবু বললেন, 'চায়ের কাপে যেন অন্য কোন গন্ধ আমদানি করো না নীলধ্বজ। চায়ের গন্ধই আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগে।
নীলধ্বজ বললেন, 'না আর কিছু করব না, মিলি দেখতো চা-টা ঠিক করেছে কিনা ঢাকনিটা খুলে দেখ।'
মিলি খুলে দেখল কেটলি ভর্তি চা আছে
নীলধ্বজ বললেন, 'দেখ কাণ্ড, আমাকে একটা ফাটা কাপ দিয়েছে ভোলানাথ। কপাল তো ফাটল না, কেবল ঘটি-বাটিই ফাটে।
মিলি বলল, 'আপনি আমার কাপ নিন।' নীলধ্বজ বললেন 'সেকি হয়। তুমি আর একটা কাপ দাও আমাকে।'
মিলি কাপবোর্ড থেকে আর একটা কাপ এনে নীলধ্বজের সামনে দিল
মুকুন্দবাবু ফ্যানের হাওয়া বাঁচিয়ে মুখ নিচু করে সিগারেট ধরিয়ে নিলেন।
নীলধ্বজ বললেন, দাও, এবার চা দাও মিলি।
মিলি প্রথমে নীলধ্বজের কাপেই চা ঢালতে গেল। ও মা এক ফোঁটা চা ও নেই।
নীলধ্বজ হেসে বললেন, 'কী হল? একেবারেই শূন্যপাত্র। তাই না? আমার জন্যে বারিবিন্দুও নেই? নেই আমি তা জানি। তবু নিজের মনেই একটা ইলিউসন সৃষ্টি করি। ভাবি আছে বুঝি। ভাবি এখনো বুঝি ভাণ্ডার অফুরন্ত। বলি দাও দাও। দাও মিলি।'
মিলি বলল, 'কী করে দেব। আপনি আসল কেটলিটা সরিয়ে নিয়েছেন।'
নীলধ্বজ বললেন, 'কখন সরালাম। তোমার জামাইবাবু তো জলজ্যান্ত বসে আছেন।'
তারপর চা-ভরা কেটলিটা যথাস্থানে রেখে দিলেন নীলধ্বজ।
চা-খাওয়ার পর ভোলা কাপডিসগুলি সরিয়ে নিয়ে গেল।
নীলধ্বজ তবু টেবিল ছেড়ে উঠলেন না। চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলেন।
তারপর হঠাৎ হাত বাড়িয়ে মিলির ডান হাতখানা তুলে নিলেন নীলধ্বজ। মিলির গা শিরশির করে উঠল। ভদ্রলোক কি করে বসবেন কে জানে। তবে জামাইবাবু পাশে রয়েছেন এই যা ভরসা।
নীলধ্বজ বললেন, 'বাঃ তোমার আঙুলগুলি তো ভারি সুন্দর। আর্টিস্টের আঙুল। চম্পকাঙ্গুলি।'
মুকুন্দবাবু হেসে বললেন, 'ওর আঙুলে তুমি যদি চাঁপার রঙ দেখ নীলধ্বজ তাহলে বুঝব তুমি

চশমায হলদে বঙের কাঁচ বসিয়েছ।'

নীলধ্বজ বললেন, 'বঙীন কাঁচ আমবা সবাই বসাই মুকুন্দ। কেউ সর্ষে ফুল দেখি কেউ চাঁপা ফুল দেখি।'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'তোমাব ক্লাসিফিকেশনটা ঠিক হল না। আমবা একই মানুষ একই চশমায কখনো সর্ষে ফুল দেখি কখনো চাঁপা ফুল দেখি।'

নীলধ্বজ একটু ভেবে বললেন, 'বোধহয তোমাব কথাই ঠিক। একই মানুষ নাকি একই আধাবে ভিন্ন ভিন্ন মানুষ। ভিন্ন ভিন্ন বাসনায ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব। এক বাসনায সার্কাসেব ক্লাউন আব এক ক্ষমতায মাস্টাব আর্টিস্ট। যদিও আব এক গোপন অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা আছে অখণ্ডতাব, সমগ্রতাব, সমন্বযেব। সে আকাঙ্ক্ষা কি কোনদিনই পূর্ণ হবাব?'

স্বপ্নেব মধ্যে যাদুকবেব মুখে মিলি যে বিদেশী ভাষাব ভাষণ শুনেছিল এ যেন সেই ভাষণ। শব্দগুলি চেনা। কিন্তু অর্থ যেন হৃদযঙ্গম হয না। কববাব ইচ্ছাও হয না মিলিব।

নীলধ্বজ আবাব মিলিব আঙুলগুলিব দিকে চোখ বাখলেন, তোমাব আঙুলগুলি কিন্তু সত্যিই সুন্দব। বঙে না হোক, গডনে চম্পক। তুমি হাতে আংটি পবেছ দেখছি। লাল বঙেব পাথব আমাব ভাল লাগে। যদিও নিজে কখনো পবিনি। একবাব নীলা পবেছিলাম। সইল না। ছুটে গেল। তুমি নেল পালিশ পব না মিলি?

মিলি বলল 'না ওসব আমাব ভালো লাগে না।' নীলধ্বজ বললেন, আমাবও ভালো লাগে না। তবে দর্শকদেব কাউকে কাউকে আমি পবাই যাবা নিজেব নখে নিজেব মনকে ক্ষণেকেব জন্যে দেখে নিতে চায।'

মিলি এবাব উল্লসিত হযে উঠল, নখদর্পণ? আপনি জানেন নখদর্পণ?'

নীলধ্বজ হেসে বললেন, 'একটু আধটু।

তাবপব পকেট থেকে ছোট একটা কৌটো বেব কবলেন। তাব ভিতবে কালো বঙেব কী একটা পেইন্ট ছিল। সযত্নে তাব একটু নীলধ্বজ মিলিব বুডো আঙুলেব নখে মাখিযে দিলেন।

একমুহূর্ত মিলিব চোখেব দিকে চেযে বইলেন, তাবপব হেসে বললেন, যাকে তুমি দেখতে চাও তাব কথা একটু ভাব। তাবপব তাকাও নখেব দিকে। তুমি দেখতে পাবে নিশ্চযই দেখতে পাবে।'

কী আশ্চয, নিজেব সেই বঙমাখা নখে দীপঙ্কবেব দীপ্ত মুখচ্ছবি দেখতে পেল মিলি।

নীলধ্বজ বললেন, 'দেখেছ? নাও, এবাব এই কমাল দিযে কালিটুকু মুছে ফেল।

একখানা নীলাভ রুমাল বার কবলেন নীলধ্বজ। মিলি লজ্জিতভাবে বলল, আপনাব রুমাল নষ্ট হবে।'

নীলধ্বজ বললেন, 'নষ্ট হবে কেন। তোমাব নখেব বঙটুকু থাকবে।'

মিলি বলল, 'ওতো আপনাবই বঙ।

নীলধ্বজ বললেন সেই সঙ্গে তোমাব বঙটুকুও দেখে নিযেছি, তাও আমাব এই কালো বঙেব মধ্যে মিশে বইল।

কিছুক্ষণ সবাই চুপ কবে বইলেন

তাবপব মুকুন্দবাবু বললেন, 'বেশ তো আছ নীলধ্বজ। নিজেব খেলা নিযে বেশ মেতে আছ। তবু কেন অত হাহুতাশ—'

নীলধ্বজ হঠাৎ গভীব আক্ষেপেব সঙ্গে বললেন, 'তোমাব ভুল ধাবণা মুকুন্দ। I am a social entertainer, but I get no entertainment আনন্দ কাকে বলে আমি জানি নে। তাব কাছে আমিও অপবিচিত। সে আমাব ঘবে অনধিকাব প্রবেশ কবতে চায না।'

মুকুন্দবাবু সহানুভূতিব সঙ্গে বললেন, 'কেন বলতো? কিসেব এত দুঃখ তোমাব? কেন এই বিষাদ?'

নীলধ্বজ বললেন, 'আমি নিজেই তাব কোন কাবণ খুঁজে পাইনে। যখন দেখি ব্যক্তিগত ব্যর্থতাই এর মূলে, নিজেকে আবো ছোট মনে হয। মহৎ সুখ যদি না-ও পাই, আমি মহৎ দুঃখেব অংশীদাব

হতে চাই মুকুন্দ। সে দুঃখ যেন ধনজনমানেব না হয়, সে দুঃখ যেন প্রেম আব যশেব অপবিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে তুচ্ছতায় ডুবিয়ে দিতে পাবে। মাঝে মাঝে মনে হয় মুকুন্দ, কী ছাই জীবনভব ম্যাজিক দেখলাম যদি যা ইলিউসন তাকে ইলিউসন বলে চিনতে না পাবি, যদি ব্যক্তিগত সাফল্য অসাফল্য সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যেব ঊর্ধ্বে নিজেকে দাঁড কবাতে না পাবি—সেই তো মানুষেব যথার্থ নাটমঞ্চ মুকুন্দ।'

আবেগে নীলধ্বজের গলা কাঁপছিল। মুকুন্দবাবু চুপ কবে বইলেন।

মিলিও কোন কথা বলল না। ছোট দুঃখ বড দুঃখ কোন দুঃখই সে পেতে চায় না। সে শুধু সুখ চায় আনন্দ চায়। কিন্তু যাদুকব কিসেব একটা দুর্বোধ বিষাদে তাব মন আচ্ছন্ন কবে দিলেন। যে দুঃখ তাব নয়, যে দুঃখেব কোন প্রতিকাব নেই তাবও কয়েকটি তবঙ্গ তাব সবুজ বেলাভূমিতে এসে আছডে পডল।

একটু বাদে মুকুন্দবাবু বললেন, 'এবাব উঠি নীলধ্বজ।'

নীলধ্বজ একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাব ক্লাবেব বন্ধুবা তোমাব জন্যে অপেক্ষা কবছেন।'

মুকুন্দবাবু বললেন, না আজ আব ক্লাব ট্লাব নয়। সোজা বাডি চলে যাব।

অতিথিদেব নিয়ে নিচে নেমে এলেন নীলধ্বজ। পাশাপাশি খানতিনেক ঘব। মিলি লক্ষ্য কবল সবগুলি তালাবন্ধ নয় ভেজানো বয়েছে। একটি ঘবেব দবজা ফাঁক হয়ে আছে। মিলি কৌতূহলী হয়ে সেদিকে একটু উকি দিচ্ছিল নীলধ্বজ তা লক্ষ্য কবে বললেন, 'দেখবে? এসো, চল না ভিতবে '

এঘাবে গোটা পাঁচ ছয় বইয়েব আলমাবি। আবো কতকগুলি বই ব্যাকে উপচে পডছে। ছোট একটি টেবিল আছে জানলাব ধাবে। দুপাশে দুখানি চেয়াব। নীলধ্বজ কি এঘবে কাবো সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথা বলেছেন? গল্প কবেছেন? কে জানে?

আব একখানি ঘব আবো আগোছালো। ছোট বড নানা আকাবেব পাথবেব মূর্তি। সব পাথবেব নয়, কাঠেব প্লাস্টিকেব, নাবীমূর্তিই বেশি কাঁচেব দু তিনটি আলমাবি ভবা ছোট ছোট মূর্তি খেলনা, ধূপদানি, দাপদানি, ফুলদানি নানা ধাতুব নানা আকাবেব। একদিকে কতগুলি বাঁধানো ফটো দেয়ালে ঠেস দিয়ে উল্টো কবে বাখা।

মুকুন্দবাবু বললেন, 'ওই বুঝি তোমাব পুবনো সব ফটো আব মানপত্র? ওগুলি ওভাবে বেখেছ কেন?' নীলধ্বজ একটু হেসে বললেন 'ওবা আব মুখ দেখাত চায় না। কী দেখছ মিলি? এ ঘব এখন যাদুকবেব যাদুঘব। সে এখন নিজেই নিজেব শবাধাব।'

আব এক ঘবে অনেকগুলি বাক্সডেস্ক, ছোটবড নানা আকাবেব ল্যাম্পস্ট্যাণ্ড আব গোটা কয়েক ম্যাজিক ওয়াণ্ড মাথা উঁচিয়ে আছে। ভেঙ্গে যাওয়া দলেব সম্পত্তি যেন প্রাগৈতিহাসিক পুবীব লুপ্ত অবশেষ।

বিদায়েব সময় নীলধ্বজ মিলিব কাঁধে এক বর্ণাঢ্য মণিপুবী ব্যাগ ঝুলিয়ে দিলেন।

মিলি বলল, একি, কী আছে এব মধ্যে? নীলধ্বজ মৃদু হেসে বললেন, 'ভাবি কিছু নয়। বইতেও পাববে, সইতেও পাববে হাবালে কোন দুঃখ লাগবে না দু-চাবটি ছোট ছোট মূর্তি আছে। একটি কলমদানি। তোমাব টেবিল সাজাবাব কাজে লাগতেও পাবে।

আব দিলেন দুজনেব হাতে দুটি গোলাপেব তোডা। পাতাবাহাবেব পাতা দিয়ে গাঁথা।

নীলধ্বজ বললেন, 'মুকুন্দ এখান থেকে ট্যাক্সি পেতে তোমাদেব দেবি হবে। আমাব ভাঙা গাডিটায় ভোলানাথ তোমাদেব পৌঁছে দিয়ে আসুক।'

মুকুন্দবাবু বললেন, 'ভোলানাথ। তোমাব শাঙ্কো পাঞ্জা কি ড্রাইভিংও জানে?'

নীলধ্বজ একটু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'শাঙ্কো পাঞ্জা!' তাবপব হেসে উঠলেন, 'ও তুমি তোমাব ডন কুইকসটকে এখনো মনে বেখেছ।'

বন্ধুকে সাদবে একটু কাছে টেনে নিলেন নীলধ্বজ।

গাডিতে উঠে মিলি মুকুন্দবাবুব কাছে ঘেঁষে বসল।

'জামাইবাবু?'

'কি রে ?'
'এখানে আমাকে কেন নিয়ে এলেন ?'
'ভালো লাগছে না ?'
'না।'
মুকুন্দবাবু বললেন, 'বুঝতে পেরেছি। তুই আমার কাঁধে মাথা রেখে একটু রেস্ট নিয়ে নে। কিচ্ছু ভাবিসনে। এখানে এসে যা দেখলি যা শুনলি একটা রাত ভালো করে ঘুমিয়ে নিতে পারলে সব ভুলে যাবি। এই ম্যাজিক ওয়ার্ডের কথা কিচ্ছু তোর মনে থাকবে না।'
তিনি সস্নেহে মিলির মাথাটা নিজের কাঁধে এনে ঠেকালেন।
মিলি কোন কথা বলল না। জামাইবাবু ঠিক বোঝেননি। তাঁকে সব কথা বোঝানও যাবে না। মিলি তো শুধু শরীর খারাপ লাগার কথাই বলেনি।
তবু চোখ বুজে জামাইবাবুর সস্নেহ পরিচর্যাটুকু সে গ্রহণ করল।

॥ ৬ ॥

দিনতিনেক বাদে মিলির হস্টেলে যাওয়ার দিন এসে গেল।
তপন ওকে তাড়া দিয়ে বলল, 'নে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে। দীপুদাকে বলে রেখেছি। সে গাড়ি নিয়ে এল বলে।'
মিলি ভ্রূ-কুঁচকে বলল, 'আবার দীপুদার গাড়ি কেন ? আমি কারো গাড়িটাড়িতে যাব না। কেন ট্যাকসির কি অভাব আছে না-কি শহরে ?'
তপন বলল, 'কেন, দীপুদার গাড়ি কি দোষ করল ?'
মিলি বলল, 'ভারি তো পাইলট। মাটি দিয়ে গড়গড়িয়ে কেবল গাড়ি চালান। একটা হেলিকোপটার নিয়ে এলে তবে বুঝতাম।'
তপন বলল, 'হেলিকোপটার কেন, এয়ারফোর্সের প্লেন আসছে তোর জন্যে।'
বেশি কিছু নেবার নেই। সামান্য বিছানাপত্র একটা বাক্স স্যুটকেস। মশারি ছিল না। পূর্ণিমা একটি মশারি দিয়ে দিলেন। বললেন, 'যদি মশাটশা লাগে কোথায় পাবি।'
তপন বলল, 'তুমিও চল মা। মশারি খাটিয়ে দিয়ে আসবে। তোমার ওই বই মুখস্থ করা বোনটি কি নিজের মশারি নিজে টানিয়ে নিতে পারবে ?'
পূর্ণিমা বললেন, 'বোনপোটি যাচ্ছে কী জন্যে ?'
বইপত্র এখনো কিছুই কেনা হয়নি। পরে কিনে নিতে হবে।
জামাইবাবু আগেই অফিসে বেরিয়ে গেছেন। মিলি দিদিকে প্রণাম করল।
পূর্ণিমা বললেন, 'কী মন খারাপ লাগছে ?'
মা-ও একথা বলেছিলেন, মা-ও ছল-ছল চোখে বিদায় দিয়েছিলেন। অথচ এযাত্রা শুভযাত্রা, আনন্দের যাত্রা।
টুকুব কাছ থেকেও বিদায় নিল মিলি। ওর ছেলেকে কোলে নিয়ে একটু আদর করল। হেসে বলল, 'দে আমাব কাছে। ভয় নেই ফেলে দেব না।'
সবাই গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এল।
নিজের গাড়ির সারথি হয়ে দীপঙ্কর বসে আছে। পরনে ধূসর রঙের প্যান্ট। গায়ে সাদা সার্ট। গৌরবর্ণ দীপঙ্করকে আজ আরো উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।
পিছনের সীটে বসল তপন আর মিলি।
দীপঙ্কর একটু ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'আজ কী। আপনি না তুমি ?'
মিলি বলল, 'আপনি।'
দীপঙ্কর বলল, 'দূরেই রাখতে চান। ঠিক আছে। ভিজিটার্স লিস্টে আমার নাম দিয়েছেন তো ?'
মিলি বলল, 'ভেবে দেখছি। আবেদন-টাবেদন করুন—'

দীপঙ্কর বলল, 'ওইসব আবেদন নিবেদনের পাত্র আমি নই। জানেন এখন পর্যন্ত চাকরির জন্যে অ্যাপ্লিকেশন করিনি।'

মিলি বলল, 'জানেন সে সব অ্যাপলিকেশন রিজেক্টেড হবে। তাই করেননি।'

তপন বলল, 'তুমি চাকবি করতে যাবে কোন দুঃখে। তোমার বাবার অত বড় হোসিয়ারি—'

দীপঙ্কর বলল, 'দূর—বাবার হোসিয়ারি তাতে আমার কি। আমি বাবার পুরনো জুতোয় পা গলাতে যাব নাকি? আমি নিজে কিছু করব।

তপন বলল, 'তুমি তো বাইরে যাওয়ার কথাও ভাবছ। ইচ্ছা করলেই তো যেতে পার। তোমাদের তো অনেক সুযোগ-সুবিধে রয়েছে।'

দীপঙ্কর কোন জবাব দিল না। মৃদু হেসে গাড়ি চালাবার দিকে মন দিল।

মিলি বলল, 'বিদেশে আমিও যাব জানো তপনদা। জব ভাউচার নিয়ে গেলেও যাব।'

তপন বলল, কটা দিন পরে যাস্। আগে দেখ হস্টেলে গিয়ে মন-টন টেঁকে কি না।'

হস্টেল কথাটার সঙ্গে কিবকম একটা রোমান্টিক অনুভূতি জড়িয়ে রয়েছে মিলির মনে। সে নিজেই আবদার করেছে হস্টেলে থাকবার জন্যে। নতুন পরিবেশ, নতুন আবহাওয়া, নতুন নতুন সব মুখ। নতুন জীবনের স্বাদ আছে এখানে। দিদি বলেছিলেন তাঁর বাড়িতে থেকে পড়তে। মায়ের স্নেহ সে তাঁর কাছে পেত। কিন্তু সে যা এতদিন ধরে পেয়েছে শুধু তাতেই এখন আর মন ওঠে না। সে নতুন কিছু পেতে চায় যা অনাস্বাদিতপূর্ব। মা আব মাতৃভূমি ছাড়িয়ে বহুদূবে—বহুদূরে যেতে পারলে যেন ভালো হয়। এই হস্টেল কি তাকে সেই অচিন দেশের রহস্যের কোন আভাস দেবে? এ যেন ছাত্রী-নিবাস না, বহু দূর দেশের কোন দূতাবাস।

হস্টেলের সামনে দীপঙ্কব তাদের নামিযে দিল। মালপত্র নিয়ে তপন তার সঙ্গে ভিতরে গেল। দীপঙ্কর রইল বাইবে।

তপন বলল, 'তুমি চলে যাও দীপুদা। তোমার তো কাজ আছে। আমি ওকে গুছিয়ে-টুছিয়ে দিযে বাসেই চলে যাব।'

দীপঙ্কব মিলির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল, 'তাহলে চলি। ফের যদি দরকার-টরকাব হয় ড্রাইভাবকে ডেকে পাঠাবেন।'

মিলি বলল, 'ড্রাইভারকে আর ডাকব না, পাইলটকে ডাকব।'

দীপঙ্কব হেসে সিগাবেট ধরালো। গাড়িতে উঠে বসে স্টার্ট দিল পরমুহূর্তে।

তপনও বেশি দেরি করল না। বিকালের এনগেজমেন্টগুলি ও মাটি করতে চায় না।

তপন বলল, 'বাব্বা! এই ক্ষুদে প্রমীলাবাজ্যে মানুষ পাঁচ মিনিটের বেশি থাকতে পারে?'

মিলি বলল, 'তোমাকে থাকতে দেয় কে?'

কাল ফের খোঁজ নিতে আসব এই আশ্বাস দিয়ে তপন মিলির কাছ থেকে বিদায় নিল।

এব পর মিলিব অভ্যর্থনা-পর্ব শুরু হল। যাবা আগে এসেছে, এখানকার যাবা পুরনো পুরবাসিনী তারা মঙ্গলাচরণ শুরু করল। কিন্তু এ কী আচরণ! তারা মিলিকে জোব কবে হলেব মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিযে বলল, 'তোমাকে নাচতে হবে।'

একটি মেয়ে সুব করে বলল, 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে, হে নটবাজ জটার বাঁধন পড়ল খুলে।'

তার বেণীটাকেই জটা বানিয়ে টানাটানি করতে লাগল। সেই বেণী একবার খুলল একবার বাঁধল।

চায়ের কাপে চিনির বদলে নুন দিল মিশিয়ে।

ভাতের মধ্যে কাঁকর তো আছেই, তরকারির খোসা-টোসাগুলিও পেল। মাছ-তরকারির বাটির মধ্যে ঝোলের বদলে ঘটির জল ঢেলে দিল কে যেন।

তারপর শয়ন-পর্ব। সেখানেও স্নেহের অত্যাচার কম নয়। মিলি দেখল তার বিছানার চাদর কালি মাখা। বালিশের ঢাকনি তো গেছেই—ওয়াড়গুলিও নেই। মশারির দড়িগুলি কাটা।

মিলি লেডী সুপারিনটেনডেন্টের কাছে ভয়ে ভয়ে অভিযোগ জানাল, 'দিদি, এসব কি?'

তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'এর নাম র‍্যাগিং, মেয়েরা তোমাকে নিয়ে একটু আমোদ-আহ্লাদ করছে। এ-ধরনের আহ্লাদ অবশ্য আমাদের পছন্দ নয়। কিন্তু কী করব বলো। যে কালের যে হাওয়া।'

তারপর তিনি ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই, তোমরা বেশি বাড়াবাড়ি করো না। বেচারা ভয় পাচ্ছে।'

তারপর মিলিকে তিনি ফের একটু অভয় দিয়ে হেসে বললেন, 'এই প্রথম দিনই মিলি। তারপর এমন আর করবে না। বেশ মিলে মিশে থাকবে। ওরা সবাই তোমার বন্ধু হয়ে যাবে।'

মিলি ভাবল হলেই ভালো।

হাসপাতালের মত এক ঘরে অনেকগুলি বেড। বোর্ডারদের জন্য নাকি এই ব্যবস্থা। পুরনো হয়ে গেলে আলাদা ঘর পাবে মিলি। তখন অংশীদারিণী একজন কি দু'জনের বেশি থাকবে না।

দু'একটি মেয়ের সঙ্গে ইতিমধ্যে আলাপ করে নিয়েছে মিলি। এখানে আইন কানুন সব কড়া। বাড়ির মত স্বাধীনতা এখানে পাওয়া যাবে না, দিদির বাড়ির মত তো নয়ই। গেটে দু'তিনজন দারোয়ান আছে। ভিতরেও দু'একটি দৌবারিকের আনাগোনা দেখেছে। যখন তখন বেরোন যায় না, যার তার সাথে দেখা করা যায় না। চিঠিপত্রগুলি আগে সব খুলে দেখে ছাড়া হয়। তাতে কোন আপত্তি নেই মিলির। এমন চিঠি তার আসবে না যাতে কেউ কোন দোষ ধরতে পাবে। কিন্তু একটু প্রাইভেসিও থাকবে না এই বা কেমন? আরো কত বিধিনিষেধ আছে কে জানে।

দীপঙ্করকে বলেনি, ভিজিটরদের তালিকা বাবার কাছে আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে মিলি। ছয় জনের পর্যন্ত নাম দেওয়া যায়। তার বেশি না। কিন্তু মিলির যে অনেক বন্ধু, অনেক আত্মীয়-স্বজন। কাকে রেখে কাকে বাদ দেবে। ছোড়দা তো আছেই, দিদির বাড়ির দু'জনকে রেখেছে, মামাবাড়িব একজনকে, একজন মাসী, একজন পিসীকেও রাখতে হয়েছে। নইলে তাঁরা দুঃখ পাবেন। সবাই কলকাতায় থাকেন। সবাইরই তো দেখতে ইচ্ছা করবে মিলিকে। বাকি থাকে একটি নাম। এই নামটি লিখতে গিয়ে মিলি একটু ভেবেছিল। ম্যাজিশিয়ান কি? একমুহূর্ত তাঁর কথা ভেবেছিল মিলি। না বাবা দরকার নেই। তিনি কখন কোন ভৌতিক কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবেন কে জানে। শেষ পর্যন্ত নামটা তাঁর দেয়নি মিলি। যদিও বাদ দিতে একটু কষ্ট হয়েছিল। আর একটি নাম লিখতে গিয়েও দ্বিধান্বিতা হয়েছিল মিলি। তার সঙ্গে তো আলাপ বেশিদিনের নয়, চেনা-জানা কম। কিন্তু তপনের তো সে বন্ধু। নিশ্চয়ই ভয়ের কিছু নেই। এ-ও আব এক ম্যাজিশিয়ান। ওব দৃষ্টিতে যাদু, হাসিতে যাদু, চলনে-বলনে যাদু। সর্বাঙ্গে যাদু জড়ানো। শেষ পর্যন্ত দীপঙ্করের নামটি মিলি তালিকার শেষে না বসিয়ে থাকতে পারেনি। কিন্তু এখন মিলির মনে হল ও নামটাও না দিলেই ঠিক হত। বাবা ওকে একেবারেই চেনেন না, শোনেননি ওর নাম। তিনি অ্যাপ্রুভ না-ও করতে পারেন। যদি তিনি অ্যাপ্রুভ না করেন তাহলে মিলির মান থাকবে কোথায়? সে কারো কাছে অসম্মানিতা হতে চায় না, এমন কি বাবা-মার কাছেও না।

সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা গুমি আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়েছে মিলি। কোথায় সেই দূরদেশের রহস্যময় দূতাবাস, কড়া কড়া বিধিনিষেধেব খাঁড়া ঝোলানো এ যে বন্দীনিবাসেরও বাড়া।

হঠাৎ মা-র কথা মনে পড়ে গেল মিলিব। 'মা, মাগো, তোমাকে কতদিন দেখিনে।'

কে যেন এসে পিঠে হাত রেখেছেন। চমকে উঠে তাঁর দিকে তাকাল মিলি।

না, মা নয়, তবে মা-র বয়সী আর একজন মহিলা। লেডী সুপারিনটেনডেন্ট মিস তালুকদার। তাঁর সঙ্গে আরো কয়েকটি মেয়ে এসে জড় হয়েছে। ওরা র‍্যাগিং-এর পাণ্ডা ছিল।

সুপারিনটেনডেন্ট বললেন, 'মিলি, তুমি কাঁদছ?'

মিলি সজোরে প্রতিবাদ করল, 'না তো, কাঁদব কেন?'

মিস তালুকদার বিছানার পাশে বসে তার পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দিলেন, সস্নেহে বললেন, 'মন খারাপ লাগছে বাড়ির জন্যে, বাবা-মার জন্যে?'

মিলি কোন জবাব দিল না।

মিস তালুকদার বললেন, 'প্রথম প্রথম সবারই হয়। মন একটু একটু খারাপ লাগে। তারপর সব

ঠিক হয়ে যায়। ভালো লাগতে শুরু করে। ভালো লাগবার অনেক জিনিস আছে এখানে! কলেজের পড়াশুনোর মধ্যে কত আনন্দ। তুমি ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে পড়তে এসেছ। আমাব সাবজেক্ট। দেখবে বইয়ের পাতায় পাতায় জ্ঞান আর পাতায় পাতায় আনন্দ—**that clear delight.**'

মিলি নীরবে তাঁর দিকে তাকাল।

মিস তালুকদাব বললেন, 'তাছাড়া এখানে অনেক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। দুদিন বাদে ফ্রেসারস ওয়েলকাম। সেই উপলক্ষে গান, আবৃত্তি, নৃত্যাভিনয় কত কি। সব তোমার ভালো লাগবে মিলি। আমি বলছি তুমি সব ভালোবাসবে।'

মিলি স্মিত মুখে চুপ করে বইল। সে-ও তো তাই চায়। সে-ও তো ভালোবাসবার জন্যেই এসেছে।

আকাঙ্ক্ষা

'যেতে হলে তাড়াতাড়ি কর ছায়া। সকাল থেকে গা ছেড়ে দিয়ে বসে আছিস তো আছিসই।'

মাসী এর আগেও কয়েকবাব তাগিদ দিয়েছে। তার এবাবের তাগিদটা আরো জোরালো। গলার স্ববে কিছু বিবক্তিও ফুটে উঠেছে।

মাসীর বিরক্তি দেখে ছায়া একটু হাসল,'তুমি আজকাল আর আমাকে দেখতে পার না। কথায় কথায় কেবল দূব দূর কব আব বক। আমি কি সত্যিই হাত পা ছেড়ে দিয়ে বসে আছি? সংসারের কত কাজ করলাম না সকাল থেকে? একরাশ এঁটো বাসন মাজলাম। চা করলাম, তবকারি কুটে দিলাম মামীমাব—'

সুলতা বলল, 'থাক থাক তোকে আব কাজের ফিরিস্তি দিতে হবে না। মামা-মামীর সংসারে আছিস খাটতে হবে না? না খাটলে এ সংসারে কে কাকে খেতে দেয়। এত করে বলি বউদি, মেয়েটাকে অত করে খাটিয়ো না। একেই তো ওই বকম রোগা পটকা চেহারা। কেবল লম্বা ধিঙ্গীই হয়েছে। গায়ে পায়ে আর পুষ্ট হতে পারল না। কে বলবে বাইশ তেইশ বছরের সোমত্ত মেয়ে। খেটে খেটে আরো যদি হাড্ডিসার হয়, বান্নাঘবে আগুনের তাপে থেকে থেকে গায়ের রঙ পুড়ে আরো নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কি ওকে দেখে কেউ পছন্দ করবে?'

ছায়া মনে মনে হাসল। এবার আক্রমণের লক্ষ্য পালটে গেছে মাসীর! অভিযোগ এখন আর ছায়ার বিরুদ্ধে নয়, মামীর বিরুদ্ধে। ছাযা জানে এ অভিযোগও মাসীর খুব সঙ্গত নয়। মামা-মামী তাকে খুব বেশি খাটায় না। গরীবের সংসারে পাঁচখানা কাজ সবাইকেই করতে হয়। ছায়াও তার চেয়ে বেশি করে না। শরীর যে তেমন মোটাসোটা হয় না তাব জন্যে কাকে আর দোষ দেবে ছায়া। শরীবের গড়নই তার ওইরকম। অসুখ বিসুখ তো নেই। সেও কি কম ভাগ্য নাকি? কিন্তু মাসীর ধারণা আরো বেশি করে ঘি দুধ মাছ মাংস ছায়াকে খাওয়াতে পাবলে সে আরো স্বাস্থ্যবতী হত, রূপলাবণ্য আরো খুলে যেত। দেখতে তো সে আর খারাপ নয়, তেমন আদর যত্নে থাকে না বলেই ছায়ার এই দশা। কিন্তু ছায়া জানে তা ঠিক নয়, শত আদর যত্নে থাকলেও কি আর দেহের গড়ন বদলাতো? শ্যামলা রঙ দুধে আলতায় গোলাপী বর্ণ হয়ে যেত? নাকি বাঁশির মত নাক হত,

পটলচেরা চোখ হত ? ওসব কিছুই হত না। তবে ভগবান ছায়ার ওপর একটু করুণা করলেও পারতেন। ছায়াকে দু'চার ফোঁটা রূপ বেশি দিলে তাঁর অনন্ত ভাণ্ডার ফুরিয়ে যেত না। কিন্তু মন মেজাজ যখন ভালো থাকে তখন ছোট আয়নাখানার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখে খুশিই হয়ে ওঠে ছায়া। তার যা আছে তাই বা কম কিসে ? চোখ দুটো যদি আরো বড় হত, নাকটা খড়্গের মত খাড়া হয়ে থাকত, রঙ আর একপোঁচ ফর্সা হত তাহলে সেই ছায়া আর এই ছায়া থাকত না। অন্য মেয়ে হয়ে যেত। তার চেয়ে যা সে নিজের বলে জেনেছে তাই যথেষ্ট। তার দাঁতের গড়ন সুন্দর। হাসলে তাকে আরো বেশি সুন্দর দেখায়। ছায়াব চুলেরও অনেকে প্রশংসা করে। তাব চুল যেমন লম্বায় বড়, গোছেও তেমনি মোটা। এমন মেঘবরণ চুল ধারেকাছে কোন মেয়ের নেই।

দাঁত আব চুল রূপের মধ্যে ওই দুটি সম্পদ আছে বলে মাসীব মনে অফুরন্ত আশা একটু চেষ্টা চরিত্র করলেই ছায়াকে ভালো ঘবে, বিদ্বান বুদ্ধিমান আর মোটা মাইনের চাকরে বরের হাতে দিতে পারবে। শুধু মাসীব কেন ওইরকম গোপন আকাঙ্ক্ষা কি তার বোনঝির মনেও নেই। দু বছর আগে ছায়া বি-এ পাশ করেছে। বেললাইনেব এপারে এই নতুন পাড়ায় ছেলেদের মধ্যেই বি-এ পাশেব সংখ্যা কম, মেয়েদের মধ্যে তা নেই বললেই চলে। মাসীবও তাই গর্ব। 'আমাদের তিনকুলের মধ্যে তুই-ই প্রথম বি-এ পাশ করলি ছায়া।'

মনে মনে যে আত্মপ্রসাদ না রয়েছে তা নয়, তবু সেটুকু গোপন করে ছায়া বলে, 'হ্যাঁ, বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা। তোমার তিনকুলেই হোক আর আমাব তিনকুলেই হোক, কেউ পড়াশোনার দিকে যায়নি তাই পাশটাসও করেনি। আজকাল কত বি-এ পাশ এম-এ পাশ ছেলেমেয়ে পথে গড়াগড়ি খায় মাসী, তা তো জানো না।'

যেতে যেতে সেই দুপুব। খেয়েদেয়ে তবে তো বেরোবে ছায়াবা। কিন্তু মাসী সকাল থেকেই তাড়া দিচ্ছে, তৈরি হয়ে নে, তৈরি হয়ে নে।

মাসীব ধারণা, দু ঘণ্টা আগে যদি কলকাতায় যেতে পাবে আরো দুটো জায়গায় বেশি যেতে পারবে। পয়সা খবচ করে শুধু বেড়াবার জন্যে তো আব যাচ্ছে না মাসী, সিনেমা থিয়েটার দেখবার জন্যেও যাচ্ছে না। যাচ্ছে চাকবি-বাকরিব খোঁজে। এখন মাসীও বেকার, ছায়াও বেকাব। যা দিনকাল, জিনিসপত্রের যা দর তাতে দাদা-বউদির ঘাড়ে বসে একমাসের বেশি দু' মাস খেতে মাসীর খুব লজ্জা করে। আর ছায়ার তো লজ্জার বালাই-ই নেই। ছেলেবেলা থেকে মামা-মামীর দয়ায় সে বড় হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে। কিন্তু পাশটাস করার পরেও যে খাওয়া পরাব জন্যে অন্যেব ওপর নির্ভর করে থাকতে হচ্ছে তার জন্যে মনে বড় লাগে। তবে লাগলেই তো আর খালি হাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায় না। যেখানে খুশি সেখানে গিয়ে থাকাও যায় না। মেয়ে হয়ে জন্মেছে যে। ছেলে হয়ে জন্মালে কি আর এমন পরাধীন হয়ে থাকত ছায়া ?

মামার ঘাড়ে বসে বসে খাচ্ছে এ কথা ভাবলেই নিজেব বাপ-মা না থাকাব কথাটা মনে পড়ে ছায়ার। দুজনেই তার খুব অল্প বয়সে মারা গেছেন। কি বাবা কি মা কারোরই মুখ মনে পড়ে না, তাঁদের আদব যত্নেব কোন স্মৃতিও নেই। তাই, শোকের কোন কথা ওঠে না। কিন্তু খাওয়া পবার জন্যে অন্যের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে মনে পড়লেই বাপ-মায়ের অভাব খানিকটা অনুভব করে ছায়া। তাঁরা বেঁচে থাকলে তাঁদেব ওপর নির্ভর করতে ছায়ার লজ্জাও হত না, সংকোচও হত না। কন্যাদায়ের ভারও সহজেই তাঁদের কাঁধে তুলে দেওয়া যেত। সবাই নিজেদের ছেলেমেয়েকে খাওয়ায় পরায় লেখাপড়া শেখায়, বয়স হলে টাকা পয়সা খবচ করে মেয়ের বিয়েও দেয়। কোন্ মেয়ে তার জন্যে লজ্জা পায় ? কিন্তু ভাগ্নীর বেলায় সে কথা খাটে না। তাছাড়া ছায়ার মামা তো আর ঝাড়া হাত পা নয়। তারও চারটি ছেলেমেয়ে। ধার দেনা করে বড় মেয়ের বিয়ে দিতে হয়েছে। খুকুদির দুটি বাচ্চা হয়ে গেছে। তবু নাকি মামার সেই মেয়ের বিয়ের দেনা এখনো শোধ হয়নি। মামা তো আর ভালো চাকরি করে না, বড় রকমেব কোন ব্যবসা-বাণিজ্যও করে না। স্টেশনের গায়ে ছোট একখানি মনোহারি দোকান আছে। এত বড় সংসারে ওই দোকানটুকুই সম্বল। তাই তাদের দু'জনকে খেতে পরতে দিতে হয় বলে মামা-মামী যদি মাঝে মাঝে মুখঝামটা

দেয়, কখনো কখনো ঠেস দিয়ে বাঁকা বাঁকা কথা বলে, তাদের খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না।

সুলতা আবার তাড়া লাগাল 'ফের গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়ালি। কী আছে ওখানে। যা অমলার কাছে থেকে ট্রেনের মান্থলিখানা নিয়ে আয়। ছুটির দিন। কোথায় কখন বেরিয়ে যাবে পাত্তাও পাবি নে।'

জানালার নিচের পুকুরটা বর্ষায় বেশ ভরে উঠেছে। ছোট একটি নারকেল আর সুপারির বাগান। পুকুরের ওপারে তার আড়ালে সারি সারি কয়েকটি বাড়ি। পশ্চিম প্রান্তে একেবারে শেষ বাড়িটায় থাকেন অমলাদিরা। রাইটার্স বিল্ডিং-এ কাজ করেন। রোজ কলকাতায় যাতায়াত করেন অমলাদি। তাঁব স্বামীর চাকরি আগরপাড়ার একটি হাই স্কুলে। দু'জনে এক সঙ্গে বেরোন। যাতায়াতের মান্থলি দু'জনেরই আছে। ছুটিব দিনে অমলাদির কাছ থেকে মাসী মাঝে মাঝে মান্থলিটা ধার নেয়। যাতায়াতের চারটে টাকা বাঁচে।

এখন একটি টাকাও হিসেব করে ব্যয় কবতে হয়। কারোরই তো চাকরি-বাকবি নেই। লাইনের ওপারে ছায়ার একটা টিউশনি মাত্র সম্বল। মাসে পনের টাকা। তাও নিয়মিত আদায় হয় না। কী আর হয় তাতে। তবু অন্যেব কাছে যখন তখন হাত পাততে ইচ্ছা করে না ছায়াব। টাকা পয়সাও নয়, বড রকমের কোন অনুগ্রহ প্রার্থনাও নয়, তবু মান্থলিখানা ধাব নেওয়াও তো নেওয়া। কিন্তু সময বিশেষে নিতে হয। একটা টাকা তো ভালো. একটা সিকির হিসেব না কবলে চলে না।

পুকুরেব ধার দিয়ে গিয়ে বাগানটুকু পার হয়ে অমলাদিব ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল ছায়া। 'এত বেলায় কী রাঁধছেন অমলাদি।' অমলাদি মুখ ভার কবে বললেন, 'এসো। আজ তো আর অফিস-টফিস নেই। ধীরে সুস্থে কাজকর্ম করছি। অন্যদিন তো নাকে মুখে শুঁজে দৌডতে হয়, আজ শখ করে বাজার থেকে মাংস এনেছে তোমাব বিজয়দা।'

ছায়া বলল,'বিজয়দা খুব ভালো বাজার করেন আমি জানি। উনি যেমন বাজারে ওস্তাদ, আপনি তেমনি বান্নায়।'

আবো দুটি একটি মন ভোলানো কথা বলে ছায়া আসল কথাটি পাড়ল, 'মাসী আপনার মান্থলিখানাব জন্যে পাঠিযে দিল।'

অমলাদির লম্বাটে মুখখানা আরো লম্বা দেখাল। তিনি বিবস কণ্ঠে বললেন, 'তা আমি আগেই বুঝেছি। তোমাদের জন্যে ছুটির দিনে নিজেরা যে একটু বেড়াতে-টেবাতে বেবোব তাব জো নেই।'

ছায়া চুপ কবে বইল। এইটুকু কথা শুনতেই হবে। যতক্ষণ না একেবাবে না বলে দেবেন ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ছায়া।

শেষ পর্যন্ত মান্থলিখানা বার করে দিলেন অমলা। বললেন, 'তোমার ম'সীকে বলো বড্ড অসুবিধে হয। সামনের ববিবার কিন্তু দিতে পারব না।'

ছায়া হেসে বলল, 'সামনের রবিবার কে যাচ্ছে অমলাদি। আমাদের কি আব অত ঘনঘন কলকাতা যাওয়া হয? আমি তো একেবারেই ন' মাসে ছ' মাসে একদিন করে যাই।'

অমলাদি ততক্ষণে রান্নায় ফের ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

ছায়া বাড়িতে পৌঁছতেই সুলতা রাগ করে উঠল, 'গেছিস তো গেছিসই। এক জায়গায় গেলেই কি লেগে থাকতে হবে?'

এক তো অমলাদির অমন অনিচ্ছাকৃত অনুগ্রহ, তারপর মাসীর এই বকুনি। ছায়ার আর ইচ্ছা করে না ট্রেনে গিয়ে ওঠে। কিন্তু মাসী নাকি কাকে বলে রেখে এসেছে। যে বাড়িতে মাসী কাজ করত তার কর্তা নাকি ছায়াকে দেখতে চেয়েছেন। মাসী তাঁব সঙ্গে ছায়ার আলাপ করিয়ে দিতে যাচ্ছে। ভদ্রলোকের নাকি সরকারী বে-সরকারী বহু অফিস আর কলকারখানার সঙ্গে জানাশোনা। বলা তো যায় না, কার কখন মন গলবে, কার সাহায্য কাজে লাগবে। ঘরের মধ্যে হাত পা কোলে করে বসে থাকলে কি কোন সুযোগ আসে?

খেয়েদেয়ে তৈরি হয়ে নিল ছায়া। মাসীর তৈরি হতে বেশি সময় লাগে না। কিন্তু ছায়ার লাগে। একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হয়ে গেলে কি চলে? বাইরে পরে বেরোবার মত শাড়ি তেমন নেই। যা আছে তাও পুরনো। ওরই ভিতর থেকে হালকা বেগুনি রঙের শাড়ি বের করল ছায়া। জুতো

জোড়াও পুবনো হযে গেছে। আজ যতখানি হাঁটাহাঁটি হবে তাব ধকল সইবে কিনা কে জানে।

স্টেশনে যেতে হলে মিনিট দশেক হাঁটতে হয। কাঁচা মাটিব বাস্তা। বর্ষাকাল। জল কাদা হযেছে। বৃষ্টি যা হবাব আগেই হযে গেছে। আজ বোদ খুব কডা। শাডি বাঁচিয়ে আব জুতো বাঁচিযে মাসীব পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগল ছাযা। সাইকেল বিকশাও আছে। তাদেব গ্রামেবই দুটি ছেলে দু'খানা বিকশা চালায। বললে ছাযাকে তাবা কম ভাড়ায নিযে যায। চল্লিশ পযসাব জাযগায পঁচিশ পযসা দিলেও চলে। কিন্তু ওই কযেকটা পযসাও এখন হিসেব কবে চলতে হয।

স্টেশনে ঢুকে মামাব দোকানেব সামনে দিযেই টিকিট ঘবেব দিকে যেতে হয। দেখতে পেযে মামা জিজ্ঞাসা কবলেন, 'কিবে,' টিকিটেব টাকা আছে তো।'

সুলতা জবাব দিল, 'আছে দাদা। তোমায ভাবতে হবে না।'

মামা বললেন, খোঁজখবব কিছু পেযে যাচ্ছিস তো? নাকি মিছিমিছি পযসা নষ্ট আব হযবানি।'

মাসী জবাব দিল, 'খোঁজখবব কবাব জন্যেই যাচ্ছি দাদা। বাডিতে বসে থাকলে কেউ তো আব হাতেব মধ্যে কাজ গুঁজে দিযে যাবে না।'

'নিজে যাচ্ছিস যা। ওকে আবাব টেনে নিচ্ছিস কেন।

মাসী বলল, একখানা মান্থলি পেযেছি। ওব ভাড়াটা লাগবে না। তাছাড়া বাডিতে বসে বসে একেবাবে পচে গেল। মাঝে মাঝে একটু আধটু বেবোন ভালো। চোখমুখ ফোটে। একজন ভদ্রলোকেব সঙ্গে দুটো কথা বলতে শেখে।'

মামা আব কিছু বললেন না। দোকানেব মালপত্র গুছিযে বাখাব দিকে মন দিলেন।

ট্রেনে ভিড থাকলেও বসবাব জাযগা পেযে গেল ছাযা। এ কামবায তাদেব নিজেদেব গ্রামেব লোক কেউ নেই দেখে ভালো লাগল। চেনা কেউ থাকলে নিশ্চযই জিজ্ঞাসা কবত, কোথায যাচ্ছ, কেন যাচ্ছ। কৈফিযৎ দিতে দিতে প্রাণ অস্ত।

মাসীব আবাব পান খাওযাব অভ্যাস বসবাব জাযগা পেযেই থলিব ভিতব থেকে পানেব ডিবাটি বেব কবে খুলে বসেছে।

চেনা পথ, চেনা গাছপালা স্টেশনগুলিব নাম সব মুখস্থ ছাযাব। তবু চলন্ত ট্রেনেব জানালা দিযে তাকিযে থাকতে তাব মনে হল যেন নতুন এক দুনিযা দেখতে পাচ্ছে।

কিন্তু দেখবাব কি জো আছে? মাসী বক বক কবতে শুরু কবেছে। তাব জীবন কথা আব ফুবোয না। সবই পুবনো কথা। শুনতে শুনতে ছাযাব মুখস্থ হযে গেছে। তবু ছাযাকে সেসব শোনানো চাই। বিধবা হওযাব পব দাদাব ঘাডে বসে খুব কমদিনই খেযেছে মাসী। কলকাতায গিযে বাঁধুনীগিবি কবেছে, হাসপাতালে দাইযেব কাজ কবেছে, ভদ্রলোকেব বাডিতে বাচ্চা ছেলেমেযে বেখেছে। কোন কোন মাসে দুশো তিনশো টাকা বোজগাব কবেও তাব দাদাকে দিযেছে মাসী। দাদা যে বাডি কবেছে তাতে তাবও দান আছে। সেই চক্ষুলজ্জাতেই তো একখানা ঘব বোন আব ভাগ্নীকে ছেডে দিযেছে দাদা। নইলে ওই ঘব দাদা কাউকে ভাড়া দিযে টাকা আয কবত। সংসাবে ছাযা ছাডা আব তো কোন বন্ধন নেই মাসীব। ছাযাব জন্যেই সংসাবে সে আটকে আছে। ছাযা যখন চলে যাবে—।

মাসীব কথায বাধা দিযে ছাযা হেসে বলল, 'হ্যাঁ, মাসী আমিও যাচ্ছি আব তুমিও মুক্ত হচ্ছ।'

মাসী বলল, যাবি নে তুই কি চিবদিন আমাব ঘাডে পডে থাকবি নাকি? তোবও সংসাব হবে স্বামী হবে, ছেলেমেযে হবে—।'

খুবই সাধাবণ অথচ পবম মধুব একটি সুখেব চিত্র মাসী ছাযাব সামনে তুলে ধবে। সেই ভবিষ্যৎ কখনো মনে হয খুবই কাছেব। কখনো মনে হয দূব দূবান্তবেব। তাকে কোনদিন ছাযা হাত দিযে ছুঁতে পাববে কিনা কে জানে।

'তেমন দিন যদি আসেই মাসী তুমি থাকবে আমাব কাছে। তোমাব নাতি-নাতনীকে মানুষ করবে। পরের ছেলেমেযে পালবাব পুষবাব আর দবকাব হবে না।'

মাসী বলল, 'দূব। জামাইয়েব বাডিতে লাগাবাঁধা থাকলে কি মান থাকে। আমি মাঝে মাঝে গিযে তোদেব দেখে আসব। কোন কোনদিন ভাবি কি জানিস? হাসপাতালে কত লোক ছেলেমেযে

বেখে যায়। কেউ কেউ ইচ্ছে কবে বাচ্চা ছেড়ে দিতেও চায়। তাব একটিকে তুলে নিই। নিয়ে গোড়া থেকে পেলে পুষে বড কবে তুলি।'

নিজেব পেটে কোন ছেলেমেয়ে হযনি বলে মাসীব মা হবাব সাধ যেন আব যেতে চায না।

ছায়া কৌতুক কবে বলে, 'নাও না মাসী। আব একটি বাচ্চা মেয়েকে তুমি নিয়ে নাও। এবাব কিন্তু সুন্দব ফুটফুটে মেয়ে বেছে নেবে। আমাব মত কালো কুচ্ছিত যেন আব নিয়ো না। সুন্দব হলে আব বিয়েব ভাবনা ভাবতে হবে না।'

মাসী বলল 'ঈস। কে বলে তুই কালো। কে বলে কুচ্ছিত? আমাব মেয়েব মত মেয়ে কটি আছে সংসাবে। এমন শান্ত সুন্দব স্বভাব কজনেব আছে? তোকে যে পাবে তাব বহু ভাগ্য।'

ছায়া নিজেব মনেই হাসল, 'কেবল সেই ভাগ্যবান মানুষটিকে কেউ হযতো কোনদিন চোখেব সামনে দেখতে পাবে না।'

দমদম স্টেশনে নামল দু'জনে। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেবিয়ে এসে ছায়া বলল 'মাসী, এই দমদম বোডেব কাছে আমাব এক বন্ধু আছে। আমবা একসঙ্গে কলেজে পডতাম। ওব বিয়েতে যেতে পাবিনি। ঠিকানা দিয়ে আমাকে চিঠি লিখেছে। বাববাব কবে বলে দিয়েছে কলকাতায় এলে যেন অবশ্যই ওদেব বাড়িতে যাই, বীথিকাদেব বাড়িটা আগে হয়ে যাব?' মাসী বলল 'না বাছা। আগে যে দবকাবী কাজে এসেছি সেটা সেবে নিই। তাবপব যত পাব তুমি বন্ধুবান্ধবেব সঙ্গে দেখা কবো। ববিবাবেব বাজাব ভদ্রলোক যদি কোথাও বেড়াতে টেবাতে বেবিয়ে যান তাঁব সঙ্গে দেখা হবে না। এত কষ্ট কবে আসাটা মাটি হয়ে যাবে'

ভদ্রলোক থাকেন বেলগাছিযাব ইন্দ্র বিশ্বাস বোডে দমদম থেকে অনেকটা দব।

মাসী বলল, 'কী কববি। হেঁটে যেতে পাবাব? না বিকশা কবব?

'বিকশা যে কববে পযসা লাগবে না?'

'তাতো লাগবেই। বাবো আনাব কমে কেউ বাজি হবে না।

ছায়া বলল, 'ওবে বাবা। তাব চেয়ে চল হেঁটেই যাই।'

'পাববি তো হাঁটতে?'

'তুমি যদি পাব আমিও পাবব।

ছায়া কিছুতেই মাসীকে বিকশা কবতে দিল না। হেঁটে হেঁটে এল ইন্দ্র বিশ্বাস বোডে।

এখানকাব সুবেন দত্তেব কথা মাসীব কাছে আগেও শুনেছে ছায়া। কিছুদিন আগেও ওঁদেব বাড়িতে মাসী দুমাস কাটিয়ে গেছে। ওঁব নাতি হয়েছে। সেই বাচ্চাকে বাখত। বাচ্চা আব তাব মা কেউ সুস্থ ছিল না। মাসী দিনবাত তাদেব সেবা কবত। মাইনেব বেলায সুবেনবাবু কৃপণতা কবেননি। তাছাড়া তাঁব বাড়িব সবাই তাব সঙ্গে বাড়িব লোকেব মত ব্যবহাব কবেছেন। আসাব সময মাসীকে কাপড দিয়েছেন বকশিস দিয়েছেন। কোন দবকাব টবকাব পডলে আসতে বলেছেন। এমন কজনে বলে? কলকাতায এলেই ওদেব সঙ্গে একবাব দেখা কবে যায মাসী। ওঁদেব কাছে ছায়াব কথাও সে বলে বেখেছে। সুবিধা সুযোগ হলে হতেও পাবে।

বেলা দেডটা নাগাদ ছায়াবা গিয়ে পৌঁছল কড়া বোদ। পাড়াটা নিঝুম। দোতলা তিনতলা বাড়িগুলি দাঁড়িযে দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছে। ভিতবে লোক আছে কিনা বোঝা যায না।

মেজেন্টা বঙেব নতুন দোতলা বাড়ি। নেমপ্লেট আছে। কলিং বেল টিপতে মাঝবযসী এক ভদ্রলোক এসে দোব খুলে দিলেন। তাঁব মুখে বিবক্তিব চিহ্ন, ভ্রূ কোঁচকানো। কিন্তু মাসীকে দেখে তিনি হাসলেন, 'আবে সুলতা তুমি। এসো এসো। এই ভবদুপুবে এই বোদেব মধ্যে।'

মাসী বলল, 'আপনাব সঙ্গে দেখা হবে বলে এলাম। অনেকক্ষণ ধবে আমাব দাদুকে কোলে নিতে পাবব বলে দুপুবেই চলে এলাম দাদা। আমাব যে বোনঝিব কথা বলেছিলাম এই সেই বোনঝি। ছায়া, ইনি তোব মামা হন, প্রণাম কব।'

ছায়া প্রণাম কবল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটুকুও লক্ষ্য কবল মাসীব এই আত্মীয সম্বোধনে ভদ্রলোক খুশি হলেন না। ছায়াব মনে হল কী দবকাব ছিল অতখানি গায়ে পড়ে অন্তবঙ্গতা কববাব।

মাসী বলল, 'দাদা কি ঘুমিয়ে পডেছিলেন। অসময়ে এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম।'

সুবেনবাবু বললেন, 'না না, কাগজপত্র দেখছিলাম। তুমি যাও, ভিতরে যাও সুলতা। মেয়েবা খাচ্ছে—'

মাসী তবু গেল না। বোনঝিব আবো একটু পবিচয দেওয়াব জন্যে সে ব্যস্ত।

'ছায়া বি-এ পাশ কবেছে জানেন দাদা?'

সুবেনবাবু বললেন, 'ও তাই নাকি? বেশ বেশ।'

ছাযাব মনে হল ওঁব দাইয়ের বোনঝি বি-এ পাশ কবেছে শুনে উনি যেন একটু অবাক হলেন।

মাসী হেসে বলল, 'এখন চাকবি খুঁজে বেড়াচ্ছে দাদা।'

সুবেনবাবু নৈর্ব্যক্তিক সুবে বললেন, 'বহু ছেলেমেয়েবাই তো তাই খুঁজছে সুলতা। কিন্তু কাজ কোথায়?'

সুলতা বলল, 'আপনি ইচ্ছা কবলে পাবেন দাদা। আপনাদেব অফিসে—তাছাড়া আবো কত অফিস আছে আপনাব জানাশোনা—'

সুবেনবাবু এমনভাবে হাসলেন যেন সুলতা এক অসম্ভব প্রস্তাব কবছে। তাবপব ছায়াকে জিজ্ঞাসা কবলেন, 'তুমি এমপ্লয়মেন্ট একসচেঞ্জে কার্ড কবিয়েছ?'

ছাযা বলল, 'হ্যাঁ। তিন বছব আগে কবিযে বেখেছি।'

সুবেনবাবু বললেন, 'ওইভাবেই চেষ্টা কবে যেতে হবে।'

মাসী মধুব লজ্জিত ভঙ্গিতে হেসে বলল, 'ওব জন্যে আবো একটি জিনিস খুঁজছি দাদা।'

একটু বিস্মিত হযে সুবেনবাবু বললেন, 'কী ব্যাপাব।'

সুলতা আবদাবেব ভঙ্গিতে বলল, 'একটি ছেলে আমাকে জোগাড কবে দিতে হবে। বেশি কিছু চাইনে। মেযেতো আমাব বি-এ পাশ কবেছে। ছেলেটি এম-এ পাশ হলে তবে মানায। আব মোটামুটি খেযে পবে থাকতে পাবে তাহলেই হল।'

সুবেনবাবু হাসছিলেন। মাসীব তো লজ্জা নেই, কিন্তু সেই হাসি দেখে লজ্জা পাচ্ছিল ছাযা। সুবেনবাবুব মত লোক ছাযাব পাত্র খুঁজে দেবেন এমন অসম্ভব অবিশ্বাস্য ব্যাপাব ঘটে নাকি পৃথিবীতে? মাসীব যদি কোন কাণ্ডজ্ঞান থাকে।

তাবপব মাসী ছাযাকে ওঁদেব খাওযাব ঘবে নিযে গেল। সেখানে ডাইনিং টেবিলে শাশুড়ী আব বউ খেতে খেতে গল্প কবছিলেন। আব একটি লম্বা বড সড স্ত্রীলোক তাঁদেব পবিবেশন কবছে।

ঘবে ঢুকে মাসী অন্তবঙ্গ সুবে বলল, 'এই যে বউদি। এত বেলাতেও আপনাদেব খাওযা হযনি। কী কবছিলেন এতক্ষণ?'

মাসীব বউদি দেখতে ছোটখাটো মহিলা। বযস কত হযেছে আন্দাজ কবা শক্ত। চুল পাকেনি, দাঁত পড়েনি।

খেতে খেতে তিনি মাসীকে অভ্যর্থনা জানালেন, 'আবে এসো এসো। পিছনে ওটি কে?'

মাসী বলল, 'আমাব সেই বোনঝি বউদি। ছাযা প্রণাম কব বউদিকে। আব উনি হলেন তোব বউদি, কেমন সুন্দব দেখছিস। এম-এ পাশ। রূপে লক্ষ্মী গুণে সবস্বতী।'

ছাযা মাসীব বউদিকে প্রণাম কবতে যাচ্ছিল। তিনি বাধা দিলেন, 'ওকি ওকি। খেতে খেতে তোমাব প্রণাম নিতে পাবব না। নিলে বাঁ হাতে আশীর্বাদ কবতে হবে।'

সকৌতুকে হেসে উঠলেন ভদ্রমহিলা।

মাসী বলল, 'বউদি, আপনাব বাঁ হাতেব আশীর্বাদেব দামই লাখ টাকা। হাত ঝাড়লেই তো পর্বত।'

ভদ্রমহিলা প্রণাম নিলেন না। কিন্তু টেবিলের তলা থেকে মাথা বেব করে আনতে গিয়ে খামোকা একটা গুঁতো খেল ছাযা।

মহিলাটি বললেন, 'আহা লাগল নাকি?'

তাঁর বউমা ছায়ার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, 'বোসো এখানে।'

পাশের চেয়ারটি দেখিয়ে দিলেন তিনি।

এদিকে ওদিকে সারি সারি অনেকগুলি চেয়ার। ছায়া তাঁর ঠিক পাশে বসল না। দুখানা চেয়ার

বাদ দিয়ে বসল। বউটি বেশ সুন্দরী। ফর্সা টুকটুকে রঙ।

মহিলাটি বললেন, 'সুলতা তুমিও বোসো। লজ্জা কিসের তোমার। বোসো না।'

মাসী বলল, 'না বউদি আমি বসব না। আমার ছায়াকে যে আপনারা আদর করেছেন তাই আমার ভাগ্য। লেখাপড়ায় খুব ভালো ছিল। কোনদিন পরীক্ষায় ফেল করেনি। এখনো বইয়ের পোকা। গল্পের বই পেলে রাত দিন ভুলে যায়।'

ওঁদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। উঠে বেসিনে ওঁরা হাত মুখ ধুয়ে এলেন। তারপর মাসী আর ছায়াকে খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'কী খাবে সুলতা?'

'আমরা খাওয়াদাওয়া করে বেরিয়েছি বউদি। আমাদের জন্যে ভাববেন না।'

'তাই কি হয়? এই দুপুরবেলায় গৃহস্থের বাড়িতে এসে তোমরা না খেয়ে থাকবে।'

মহিলাটি পরিবেশনকারিণীকে বললেন, 'প্রভা, ওদের আম কেটে দাও। ফ্রীজ থেকে সন্দেশ বার কর।'

মাসীও শেষ পর্যন্ত খেতে বসল। সন্দেশগুলি দেওয়ার সময় মহিলাটি বললেন, 'শুক্লার—আমার বউমার হাতের তৈরি। খেয়ে দেখতো সুলতা কেমন হয়েছে।'

মাসী বলল, 'চমৎকার। কিন্তু দাদুভাইকে দেখার জন্যে আমার প্রাণ ছটফট করছে।'

মহিলাটি হেসে বললেন 'ওপরে বাপের কাছে শুয়ে দিবানিদ্রা দিচ্ছে। চল দেখবে চল।'

দোতলায়ও সারি সারি খান চারেক ঘর। একটি ঘরের ভিতর মাসী নিজেই ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে ওঁরাও ঢুকলেন। খাটের ওপর একটি সুদর্শন যুবক কাত হয়ে ঘুমুচ্ছেন দেখে ছায়া আর ভিতরে ঢুকল না। একটি ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে তাঁর পাশে চিৎ হয়ে শুয়ে হাত পা নাড়ছে।

মাসী খাটের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল 'দাদুভাই তো ঘুমুচ্ছে না বউদি, দিব্যি খেলা করছে. 'আর দেখুন, কেমন পিটপিট করে তাকাচ্ছে। আমাকে ঠিক চিনতে পেরেছে।'

মহিলাটি বললেন 'তা চিনবে না? তোমাকে তো জন্মাবধি দেখছে।'

মাসী বলল 'কেমন হাসছে দেখুন নেব কোলে?'

'নেবে বই কি?'

মাসী বলল 'দুমাস আমি ওকে কোলে কোলে রেখেছি। রাত্রে একটুও ঘুমুতে দিত না। কোল থেকে নামালেই কান্না। এখন বোধহয় মানিক আমার লক্ষ্মী ছেলে হয়েছে, তাই না? এখন বোধহয় আর কাঁদে টাদে না।'

শুক্লা দুধের বোতল হাতে নিয়ে ঘরে এসেছিল। সেই বোতল প্রায় কেড়ে নিয়ে মাসী বাচ্চাকে খাওয়াতে লাগল। আর কোলে করে সোনা আমার, মানিক আমার বলে আদর করতে লাগল।

তারপর পাশের বড় ঘরখানায় মহিলা মজলিস বসল। মাসী তার বউদিকে পান সেজে খাওয়ালো নিজেও পান খেল। একথা সেকথার পর তাঁর কাছে যথারীতি তিনটি আবেদন পেশ করল। একটি তার নিজের চাকরির জন্য। বাচ্চা ছেলে মেয়ে দেখাশোনার কাজ, রোগীদের সেবাশুশ্রূষার কাজ, এমন কি অল্প লোকজন হলে রান্নার কাজ হলেও সে নিতে রাজি আছে। কতদিন আর বসে বসে খাবে? খাওয়াবে কে? দ্বিতীয় আরজি হল ছায়ার জন্যেও একটি কাজ দেখে দেওয়া। মাস্টারি হোক, কেরানীগিরি হোক একটা কিছু হলেই হল।

'আচ্ছা আপনার বাড়িতেই একটা কাজ দিন না।'

ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে বললেন, 'আমার বাড়িতে ও কী কাজ করবে?'

মাসী বলল, 'শুনেছি বড় বড় লোক সেক্রেটারি রাখে, টেলিফোন ধরবার জন্যে লোক রাখেন, আরো কত খুঁটিনাটি কাজের জন্যে তাঁদের লোকের দরকার হয়। ছায়া তো সেসব কাজ করে দিতে পারে বউদি।'

মহিলাটি হেসে বললেন, 'আমার তো ওই ধরনের কোন কাজ নেই। তোমার দাদার যদি দরকার থাকে তাঁকে দেখ না বলে।'

মাসী বলল, 'আপনাদের বাড়িতে না হোক, আপনাদের তো কত বন্ধুবান্ধব আছে। তাঁদের যদি

এই ধরনের লোকের দরকার থাকে—'

'দেখব সুলতা। তুমি তো বলেই রেখেছ। আমি দেখব পাঁচ জায়গায় খোঁজখবর করে।'।

মাসী বাচ্চাটিকে আরও একটু আদর করল, আরও বুকের কাছে টেনে নিল, তারপর বলল, 'সব সমস্যার সমাধান হয় বউদি যদি একটি ছেলে যোগাড় করে দেন আমাকে।'

ছায়া এতক্ষণ মুখ নিচু করেছিল হঠাৎ মাথা তুলে বিরক্তভাবে বলল, 'মাসী চল যাই। যেতেও তো সময় লাগবে। এবার ওঠো।'

মাসী বোনঝির সেই রূঢ়তাটুকু স্নিগ্ধ হাসি দিয়ে মুছে দিল, 'মেয়ের আমার লজ্জা হচ্ছে। যা না তুই ওই বারান্দায় গিয়ে খানিকক্ষণ বোস। চেয়ার পাতা আছে। সামনে কি সুন্দর একটা পার্ক দেখ গিয়ে বসে বসে। আমি ততক্ষণ বউদির সঙ্গে আরো দুটো কথা বলি। অত দূর থেকে ঘন ঘন তো আর আসতে পারিনে। কিন্তু বাচ্চাটার জন্যে আমার মন ছটফট করে।'

ছায়ার আর সহ্য হচ্ছিল না। সে এবার বেরিয়ে এসে ব্যালকনির চেয়ারখানিতে এসে বসল। জোড়া চেয়ার পাতা। বোধহয় কর্তা গিন্নি বসে বসে গল্প করেন এখানে। এখন একটি চেয়ার খালি পড়ে আছে। ছায়ার যেন মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয় ও আসনটি কোনদিন আর পূর্ণ হবে না। এমন আরো দু'চার জন আইবুড়ো মেয়েকে দেখেছে ছায়া। তারা বুড়ো হয়ে যায়, কিন্তু বিয়ে আর হয় না। স্কুলের দিদিমণিদের মধ্যেই কয়েকজন এমন ছিলেন। কোন ছেলে যদি আইবুড়ো থাকে লোকে বলে, 'ও বিয়ে করল না।' কিন্তু কোন মেয়ে যদি ইচ্ছা করেও সারাজীবন কুমারী থাকে, লোকে বলবে, 'ওর বিয়ে হল না।' এই বিয়ে না হওয়ার মধ্যে লজ্জা আর অপমানের যেন শেষ নেই। তুমি কোন পুরুষের চোখে পড়নি, কোন পুরুষের মন ভোলেনি তোমাকে দেখে। তুমি রিজেকটেড জিনিস।

ঘণ্টা দুই বাদে মাসীর ওঠার মতি হল। এতক্ষণ কী যে গল্প করল মাসী সেই জানে। মহিলাটি নিশ্চয়ই মনে মনে বিরক্ত হয়েছেন।

মাসী বাইরে এসে বলল, 'চল ছায়া, এবার বেরোই।'

'ছায়া বলল, 'তোমার হাতে ওটা কিসের প্যাকেট মাসী।'

মাসী হেসে বলল, 'বই। তোর জন্যে বউদির কাছ থেকে গল্পের বই চেয়ে নিয়ে গেলাম পড়তে পারবি।'

নিচের ঘরে সুরেনবাবু কি একটা লেখা টাইপ করছিলেন। দূর থেকে টাইপরাইটারের খটখট শব্দ শোনা যাচ্ছিল। ছায়ার মনে পড়ল তারও টাইপটা শিখে রাখবার ইচ্ছা ছিল। চাকরি বাকরিতে সুবিধা হয়। কিন্তু টাকা কোথায়? পাঁচটা টাকাই বা আসে কোত্থেকে?

সুরেনবাবু তাঁদের দেখে উঠে দাঁড়ালেন। হেসে বললেন, 'যাচ্ছ বুঝি? এসো আবার।'

মাসী বলল, 'আমার কথা মনে রাখবেন দাদা।'

সুরেনবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই। তোমরা কোথায় যাবে?'

'একেবারে দমদমে গিয়ে গাড়িতে উঠব।'

'কিসে যাবে?'

'হেঁটেই চলে যাব দাদা।'

'না না, হেঁটে যেয়ো না। এখনো বেশ রোদের তাপ।' দেরাজ থেকে একটা টাকা বের করে তিনি মাসীর হাতে দিয়ে বললেন, 'ওকে নিয়ে রিকশা করে যেয়ো।'

পথে নেমে মাসী বলল, 'এই অঞ্চলে আমার আরো দু'তিনটে পার্টি আছে। তারা আরো বড় লোক। বিজনেস করে। গাড়ি টাড়ি আছে। যাবি নাকি তাদের বাড়ি? গেলে তারাও আদর যত্ন করে।'

ছায়ার ক্লান্তি লাগছিল। একটু হেসে বলল, 'না মাসী, আর তোমার পার্টি দিয়ে আমার দরকার নেই। চল এবার ফিরে যাই। যাওয়ার সময় যদি পারি বীথিকে একবার দেখে যাব।'

একটু এগোতেই রিকশা মিলল। ছায়া আপত্তি করছিল 'আবার রিকশা কেন? হেঁটে যাই। টাকাটা বাঁচুক।'

কিন্তু মাসী সেকথা শুনল না। বলল, 'অত বেশি হাঁটাহাঁটি কবলে তোব শবীব খাবাপ হবে। এমনিই যা ছিবি হচ্ছে দিনেব পব দিন।'

বিকশায উঠে ছাযা বলল, 'মাসী, একটা কথা। যাচ্ছি আমাব বন্ধুব বাডিতে। সেখানে কিন্তু তুমি চাকবি বাকবিব কথা তুলতে পাববে না, আমাব সম্বন্ধ দেখাব কথাও বলতে পাববে না। আমি তাহলে যাব না।'

মাসী হেসে বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা। বলব না। মুখফুটে না চাইলে কেউ কি কিছু দেযবে? না কাঁদলে মাযেও দুধ দেয না। বলা তো যায না কাব দ্বাবা কি হয। কাব হাত দিযে কোন সুযোগ কখন এসে পডে। চেষ্টা কবে যেতে হয। বুঝলি? চেষ্টায ক্ষান্ত হতে নেই।'

ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টেব কতকগুলি ফ্ল্যাটবাডি। শহবেব মধ্যে যেন ছোট আব একটি শহব। মাঝখানে ফাঁকা জাযগা আছে। ছোট ছেলেমেযেদেব খেলবাব ব্যবস্থা বয়েছে। ব্লক আব নম্বব মিলিযে, মাসীকে নিযে চাবতলাব ফ্ল্যাটে উঠে গেল ছাযা। দোবেব কাছে দাঁডিযে কডা নাডল।

দোব খুলে দিযে বীথি এসে সামনে দাঁডাল, আবে ছাযা, তুই।'

'তুইতো আমাকে চিনতে পাবলি। তোকে তো আমি চিনতেই পাবছি না বীথি। কী সুন্দবই যে তোকে দেখাচ্ছে।'

বীথি লজ্জিত হযে বলল 'সুন্দব না ঘোডাব ডিম। চল ঘবে চল'

ছাযাব মনে হল সতি৷ এত সুন্দব কিন্তু বীথি ছিল না। তাব চেযে সামান্য একটু ফর্সা, মুখ চোখেব শ্রী ছাঁদ হযতো আব একটু ভালো কিন্তু শাডি গযনায শাঁখায সিঁদুবে কী অপূর্বই না ওকে দেখাচ্ছে।

মাসীব সঙ্গে সহপাঠিনীব পবিচয কবিযে দিতে বীথি তাকে প্রণাম কবল ও বাডিতে মাসী কেবল মাথা নুইযে নুইযে পাযেব ধুলো নিযেছে। এখন একটি জাযগায সে প্রণামও পেল

বিধবা শাশুডী আছেন বীথিব। তাঁব সঙ্গে মাসীব আলাপ কবিযে দিল বীথি। তিনি বললেন, আসুন আমবা ও ঘবে গিযে বসি। ওবা গল্প টল্প করুক।' তিনি মাসীকে পাশেব ঘবে নিযে গেলেন।

একা পেযে বীথি ছাযাকে জডিযে ধবল, সত্যি তুই যে আসবি ভাবতেই পাবিনি তুই আমাব কলেজেব প্রথম বন্ধু। মনে আছে, সেই প্রথম দিনেব আলাপেব কথা?'

ছাযা বলল, 'আমাব সবই মনে আছে। তোবই এখন ভোলবাব দিন বীথি।

খাট আলমাবি ড্রেসিং টেবিলে সাজানো ঘব। কাচেব আলমাবিতে বই। দেযালে বীথি আব ওব স্বামীব ফোটো। প্রসন্ন পবিতৃপ্ত স্বাস্থ্যবান এক যুবক।

ছাযা বলল, কেবল ফোটোই দেখছি। জলজ্যান্ত মানুষটি কইবে। তাকে কোথায লুকিযে বাখলি।'

বীথি হেসে বলল, 'তোব ভযে সিন্দুকে ভবে বেখেছি। জানা ছিল না তুই আসবি। উনি গেছেন চেতলায একজন বন্ধুব সঙ্গে দেখা কবতে ফিবতে ফিবতে বাত হবে। তাতে কি। তুই আজ থাকবি আমাদেব এখানে।

ছাযা একটু হেসে বলল, 'হুঁ। তোব নতুন পদবী যেন কী হল? সবকাব তাই না? ঌ‍টচাথ থেকে সবকাব। জাতেব দিক থেকে একধাপ নামলি।

বীথি হেসে বলল 'ওসব ওঠানামায আমবা বিশ্বাস কবিনে।'

ছাযা বলল, 'শুনেছি এক বছব আগে বেজেস্ট্রি কবেছিলি।

বীথি হেসে বলল, 'কাব কাছে শুনেছিস?'

'যাব কাছেই শুনে থাকি তুই তো আব বলিস নি? এইতো বন্ধুত্ব।'

বীথি বলল, 'ওঁব বাবণ ছিল যে।'

'কী কবেন তোব স্বামী?'

'এ জি বেঙ্গলে কাজ কবেন।'

'অফিসাব?'

'না বে? ইউ ডি ক্লার্ক। খুব স্ট্রাগল কবে মানুষ হযেছেন। গোডাব ইতিহাসটা আমাদেব মতই।'

বীথিদেব ইতিহাস ছাযা জানে। নৈহাটিব সরু গলিব সেই পুরনো একতলা ভাড়া বাড়িতে কলেজ ফেবত কতদিন গিযে আড্ডা দিযেছে ছাযা। ঘব তো নয ছোট ছোট দুটি খুপবি। তাব চেয়ে ছাযাব মামাব বাড়িব অবস্থা ভালো। বীথিব বাবা কোন এক দোকানে কাজ কবেন আবার যজমানিও কবেন। বীথি টিউশনি কবত। যখন যা পেত তাই কবত। অনেকগুলি ভাইবোন। কী কবে যে চলত ভগবানই জানেন। খুবই ভালো মেযে ছিল বীথি। সেই ভালো মেযে কী কবে যে গোপনে গোপনে আব একটি ছেলেকে ভালোবাসল, ভালোবাসাব প্রতিদান পেল সে এক বহস্য।

ছাযা বলল, 'এই সব জিনিসপত্র তোব বাবা—মানে মেসোমশাই দিযেছেন নাকি ?'

'ক্ষেপেছিস ? বাবা অত টাকা কোথায় পাবেন ? তাঁব কাছ থেকে আমি কিচ্ছু নিইনি। বলেছি তুমি শুধু আশীর্বাদ কব'। তাই যথেষ্ট। এসব যা দেখছিস কিছু উনি নিজে কবেছেন। বাকি সব আমাব ভাসুবেব। পবেব ধনে পোদ্দাবি, বুঝলি ?'

এ পোদ্দাবিব মধ্যেও যে সুখ আছে তা ওব হাসি দেখে বুঝতে পাবল ছাযা।

'কিন্তু কী কবে আলাপ হল ? কীভাবে কাছে গেলি, কাছে আসতে দিলি সব গোড়া থেকে বল।'

বীথি মৃদু হেসে বলল, 'আব একদিন বলব। সব কি আব বলা যায ? যখন হবাব হয়ে যায।'

ছাযা মনে মনে বলল, 'তা ঠিক। যখন হবাব হয়ে যায, আবাব যাব হবাব হয তাব হয়ে যায। যাব হয না তাব কোনদিনই হয না।'

বীথি নিজেব হাতে হালুযা তৈবি কবল, চা কবল। কিছুতেই না খাইযে ছাড়ল না।

সন্ধ্যাব কিছু আগে বন্ধুব হাত থেকে ছাড়া পেল ছাযা।

সকালেব খববেব কাগজটা মেঝেয লুটাচ্ছিল, ছাযাই সেটা তুলে নিযে বলল, 'ভাই, তোব কাগজটা দিবি ? আজ সকালে কাগজ আব বাখা হযনি, পড়াও হযনি।'

বীথি বলল, ও মা, নিযে যা। একটা খববেব কাগজ নিবি তাব আবাব চাইতে হয নাকি ?'

টিকিট কাটাব আগে ছোট ভাইপো ভাইঝিদেব জন্যে একটাকাব সববতী লেবু কিনে নিল মাসী। সামনে এসে হাত পেতে দাঁড়ালে কিছু দিতে তো হবে। তাবা তো আব বুঝবে না তাদেব পিসী এখন বেকাব।

গাড়িতে উঠে বসবাব জাযগা কবে নিযে মাসী বলল, 'মেযেটি তো বেশ। আব ওব ভাগ্যও খুব ভালো।'

ছাযা জানে, বীথিব শুধু ভাগ্য নয, পুরুষকাবও আছে। ও নিজেই নিজেব ভাগ্যকে গড়ে তুলেছে।

বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে বাত আটটা। ইন্দ্রপুরী থেকে আবাব সেই দবিদ্রদেব পাড়া। ছোট বড় টালিব ঘব, বাঁশেব বেড়া, কাঁচা মাটিব ভিত। মাঝে মাঝে দুটি একটি একতলা পাকা বাড়িও আছে। কিন্তু সে বাড়িগুলি প্রায অসম্পূর্ণ। যাবা ধাবদেনা করে আবম্ভ করেছে তাবা শেষ কবতে পাবেনি। আলো নেই, বাস্তা নেই, প্ল্যান-টল্যান কিচ্ছু নেই, যে যেখানে পাবে মাথা গুঁজবাব ঠাঁই কবে নিযেছে।

নিজেদেব ঘবে ঢুকে হ্যাবিকেনটি জ্বেলে নিল ছাযা। পোশাকী শাড়িখানা ছেড়ে আটপৌবে আধময়লা শাড়িখানা পবল। মামা আব মামীব কথোপকথন কানে গেল। 'কি বে কিছু হল ?' 'সঙ্গে সঙ্গেই কি হয দাদা ? খোঁজখবব নিযে এলাম, বলে টলে এলাম।' মামা বললেন, 'মিছিমিছি কেবল পয়সা নষ্ট। দুদিনেব বাজাব হযে যেত ঐ টাকায।'

ছায়া মামীকে জানিযে দিল আজ বাত্রে সে আব কিছু খাবে না। খেয়ে এসেছে বন্ধুব বাড়ি থেকে। মনে মনে ভাবল মামাব একবেলাব অন্ন বাঁচিযে দিলাম।

সত্যি, বীথি বেশ একটি বব জুটিযে নিযেছে। ভালো বেসেছে বলে যাকে তাকে ভালোবাসেনি, যোগ্য পাত্রকেই ভালোবেসেছে। আব ছাযা ? এতকালেব মধ্যে সেও কাউকে দেখতে পেল না, কাবো চোখেও সে পড়ল না। বাস্তাঘাটে চলাব সময, বুড়োবা শুধু ড্যাবড্যাব করে তাকিযে থাকে, আর দুটো একটা অশিক্ষিত অপদার্থ ছোকবা গ্রাম্য ভাষায় ইয়ারকি মারতে আসে। এই পর্যন্ত।

ছাযাব মনে পড়ল তার বিয়ে নিযে মামা কি মাসীর যত দুশ্চিন্তা সব মনে মনে, আব মুখের

কথায়। কেউ ভরসা করে একটা সম্বন্ধ আনতে পারেনি। টাকা জোগাবে কে। মামা বাড়ি করে সর্বস্বান্ত। মাসীর কাজ কখনো থাকে, কখনো থাকে না। দু'চার টাকা যদি বা পায় যখন কাজ থাকে না বসে বসে খেয়ে তা ফুরিয়ে ফেলে।

দূর ছাই কী হবে ওসব কথা ভেবে। যে ভাবনার কোন কূলকিনারা নেই সেই অকূল সমুদ্রে কী হবে সাঁতার কেটে।

বীথির কাছ থেকে চেয়ে আনা কাগজখানা খুলে বসল ছায়া। রাজনৈতিক খবব কিছু পড়ল না। প্রথম দেখল চাকরির বিজ্ঞাপনের পাতাটা। রোজই দেখে। বেছে বেছে দু একখানা করে অ্যাপলিকেশনও করে। টিউশনির টাকার বেশির ভাগ অ্যাপলিকেশন টাইপ করাতে আর ডাকটিকিট কিনতে খরচ হয়ে যায়। এ পর্যন্ত একখানা চিঠিরও জবাব আসেনি। কৌন ইন্টারভিউর কল-টল কিচ্ছু না। তবু দরখাস্ত করে যেতে হয়।

ছায়া লক্ষ্য কবে দেখল, আজ কাগজে চাকরির বিজ্ঞাপন অল্প। একটিও দরখাস্ত করার মত নয়। কিন্তু পাতার পর পাতা পাত্রপাত্রীব বিজ্ঞাপন। পাত্রেব চাহিদাই বেশি, পাত্রীব চাহিদা কম। একটিব পর একটি পড়ে যেতে লাগল ছায়া। কোন কোনটা দুবাব করেও পড়ল। বেশ সময় কাটে। গল্প উপন্যাসের চেয়ে কম ইন্টারেস্টিং নয়।

হঠাৎ কি খেয়াল হল ছাযার। তারপর তাকের ওপর থেকে কাগজ আর সস্তা ফাউন্টেন পেনটা, নিয়ে এল পেড়ে। নতুন এক আবেদনপত্র বচনা করতে বসল।

মাসী বিছানা পেতে শুযে পড়ল। একবাব তাড়া দিল ছায়াকে: 'কী লিখছিস বসে বসে? কাল লিখলেও হবে। আয় শুবি আয়।'

ছায়া বলল, 'তুমি ঘুমোও মাসী। আমি একটু বাদে যাচ্ছি।'

কোন্ বিজ্ঞাপনের জবাব দেওযা যায়। আজেবাজে জাযগায চিঠি লিখে লাভ কি। মাবি তো হাতী, লুঠি তো ভাণ্ডার।

দেড হাজার টাকার মাইনের একজন ইঞ্জিনিয়ার একটি সুন্দবী শিক্ষিতা পাত্রী চেয়েছেন। তিনি স্বপ্রতিষ্ঠ। কলকাতায় বাড়ি আছে, গাড়ি আছে। মেয়ে পছন্দ হলে কোন দাবিদাওয়া নেই।

জাতে মিলে যাচ্ছে। বাকিটুকু ছাযা কলমেব মুখে মিলিয়ে দিতে লাগল। 'মেয়ে অতি রূপবতী, উচ্চশিক্ষিতা, গৃহকর্মে নিপুণা। তার দাঁত আর চুলেব তুলনা নেই।'

রূপযৌবনসম্পন্ন স্বাস্থ্যবান একটি যুবকের ছবি চোখের সামনে রেখে ছাযা বিজ্ঞাপনদাতাকে চিঠি লিখতে লাগল।

জীবনে এই তার প্রথম প্রেমপত্র।

বীতশোক

দুঃসংবাদটা প্রথমে একটি মেয়ের কাছ থেকে পেলেন অনিমেষ। শীতাংশু মারা গিয়েছে। কলেজে এক সময় অনিমেষের সহপাঠী ছিল শীতাংশু। সব সহপাঠীর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় না। শীতাংশুর সঙ্গে হয়েছিল। টেলিফোনে খবরটি জানাল সুমিতা নন্দী। অনিমেষের প্রাক্তন ছাত্রী। শীতাংশুদের পাড়ার মেয়ে।

শীতাংশু অনিমেষের মতই পঞ্চাশ পার হয়েছিল। আজকালকার দিনে মরবার বয়স একে বলে না। মানুষের আয়ু দীর্ঘতর হয়েছে। সম্ভোগের স্পৃহা, হয়তো বা ক্ষমতাও বেড়েছে। আজকাল কেউ আর পঞ্চাশে বনে যায় না। বনে যাওয়ার পরামর্শও কেউ কাউকে দেয় না। বরং স্বচ্ছন্দে উপবনে বিহার করে। কিন্তু শীতাংশু ছিল স্বাস্থ্যহীন। স্ত্রীর সিঁথিতে সিঁদুর আর তাকে আমিষ ভোজনের সুবিধাটুকু দেওয়া ছাড়া শীতাংশুর বেঁচে থাকবার আর কোন সার্থকতা ছিল না।

দুঃখ শীতাংশুর জন্যে নয়, তার স্ত্রী সুনন্দার জন্যেও নয়। দুঃখ শীতাংশুর আশি বছরের বুড়ো বাপের জন্যে। তিনি এখনো বেঁচে আছেন। আর বেঁচে থেকে এই দুঃসহ শোক তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়া অনিমেষের সামাজিক কর্তব্য।

কিন্তু সব কর্তব্যই কি মানুষ অনায়াসে অবলীলায় করতে পারে? আত্মীয় হক অনাত্মীয় হক কারো রোগে অনিমেষ সেবা করতে জানেন না। শোকে তিনি সান্ত্বনা দিতে অক্ষম। শোকের পরিবেশে নিজেকে কেমন যেন বিমূঢ় মনে হয় অনিমেষের। কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এসব ক্ষেত্রে গতানুগতিক কথাই তো লোকে বলে। কিন্তু সেই বাঁধাধরা কথাগুলিও অনিমেষের মুখ থেকে বেরোতে চায় না। নিজেরই কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। তাই তিনি যথাসম্ভব এই সব আনুষ্ঠানিকতা এড়িয়ে চলেন। কেউ কেউ হয়তো অন্যরকম মনে করে। তাদের দোষ নেই।

শুধু স্বভাবের ভীরুতাই নয়, অনিমেষের হাতেও প্রচুর কাজ জমেছে। দুটি কলেজে ছাত্র পড়ানো আছে। একটি কলেজে তিনি উপাধ্যক্ষ। অধ্যক্ষ অসুস্থ। তাই সব রকম প্রশাসনিক দায়িত্ব তাঁর ঘাড়ে এসে পড়েছে। তারপর আছে হায়ার সেকেণ্ডারির পরীক্ষার খাতা। সেই খাতায় তাঁর বসবার ঘর ভর্তি। তিনি প্রধান পরীক্ষক। অপ্রধান যাঁরা আছেন তাঁদের বৈঠক নিয়মিতভাবে অনিমেষের ঘরেই বসে। এখন অতিথি সমাগম, বন্ধু সমাগম প্রায় বন্ধ হবার জো হয়েছে। তার বদলে আসেন পরীক্ষকরা। অণিমাকে তাঁদের অভ্যর্থনা করতে হয়।

সহধর্মিণীই কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলেন অনিমেষকে, 'কই গেলে না শীতাংশুবাবুদের বাড়ি?'

অনিমেষ বললেন, 'হ্যাঁ যাব।'

'যাব যাব করছ তো সেই কবে থেকে। যাও একবার, আমি তো কোথাও নড়তে পারব না। তোমার ঘর পাহারার জন্যেই আছি।'

অনিমেষ হেসে বললেন, 'থাকবেই তো। তুমি ঘরণী যে।'

এমন কিছু বেশি দূর নয়। গোয়াবাগান থেকে এন্টালীর আনন্দ পালিত রোড। তবু সময় করে যেতে যেতে অনিমেষের সপ্তাহখানেক কেটে গেল।

তারপর মরিয়া হয়ে একদিন শৈলেশবাবুর ডিসপেনসারিতে গিয়ে পৌঁছলেন। তখন বেলা এগারোটা। বোশেখ মাসের খর রোদে সারা শহর ঝলসাচ্ছে।

ডিসপেনসারিতে শৈলেশ্বর একাই বসেছিলেন। টেবিলের ওপর দুখানি পা তোলা। মাথাটি চেয়ারে হেলানো। চোখ দুটি বোজা। মনে হচ্ছে যেন ঘুমোচ্ছেন। মাথার বেশিরভাগ জুড়েই টাক। চুল যা আছে সব সাদা। শীর্ণ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। আশি বছর বয়সে শরীরের কীই বা থাকে। তবু এই দীর্ঘাঙ্গ পুরুষটি যে এক সময় বেশ স্বাস্থ্যবান ও পরম সুপুরুষ ছিলেন তা তো অনিমেষ নিজের চোখেই দেখেছে। জীর্ণ দেহাধার এখনো সেই রূপের সাক্ষ্য বহন করে। একটি সুরম্য প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ অতীতের ঐশ্বর্যের স্মৃতি আঁকড়ে ধরে রয়েছে।

ঘর আজ জনবিরল। আগেকার দিনে রোগীর ভিড়ে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ থাকত না। এখন আর সেই অসুবিধা নেই।

এর আগে শৈলেশ্বরের সম্পদের দিনগুলি দেখেছেন অনিমেষ। তাঁর খ্যাতি বিত্ত প্রতিপত্তি, গাড়িবাড়ি বাগানবাড়ি আজ জীর্ণ দেহের মত সামান্যই অবশিষ্ট আছে। ক'জনের দীর্ঘ জীবন সব বৈভব সঙ্গে নিয়ে চলতে পারে?

'কেমন আছেন?'

কুশল প্রশ্নটুকু অনিমেষের নিজের আগমনবার্তা ঘোষণার জন্যে।

শৈলেশ্বর চোখ তুলে তাকালেন। টেবিল থেকে পা নামিয়ে চেয়ারের ওপর সোজা হয়ে

বসলেন। একটু হেসে বললেন, 'এসো এসো।'

অনিমেষ লক্ষ্য করলেন, শৈলেশ্বর আজ দাঁত পরেননি। দাঁত ছাড়া তাঁকে বড় একটা দেখা যেত না। বাড়ির বাইরে তো নয়ই। ডাক্তারবাবুর মুখে দুপাটি দাঁতই সেট করে গিয়েছিল। কৃত্রিম বলে মনে হত না। এখন দাঁত ছাড়া ভারি খাবাপ দেখাচ্ছে ওঁকে। মুখ নেই শুধু মুখগহ্বর। মৃত্যু শোকে সান্ত্বনা দিতে এসেছেন অনিমেষ। তাঁর মনে হল জরার জন্যেও সান্ত্বনা দরকার। জরা মৃত্যুরও বাড়া।

শৈলেশ্বর বললেন, 'তুমি এবার অনেক দিন বাদে এলে।'

অনিমেষ কৈফিয়তের সুরে বললেন, 'আসব আসব অনেক দিন ধরে ভাবছি। কিন্তু কাজকর্ম, নানা ঝামেলা—'

শৈলেশ্বর বললেন, 'কাজ তো করতেই হবে। তোমার কর্মশক্তি আরো বহুদিন থাকবে। আমার মত নিষ্কর্মা হবার দিন তোমার এখনো অনেক দূরে।'

অনিমেষ ভাবলেন কী করে কথাটা তোলা যায়। শীতাংশু যে নেই সেই কথাটা। অমন অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ কি সমীচীন হবে? বৃদ্ধ যদি আপাতত সেই শোক ভুলে গিয়ে থাকেন তা হলে অনিমেষ কি নিজে থেকে তুলবেন? সেটা কী সমীচীন হবে? ত' কি ফের মনে করিয়ে দেবেন অনিমেষ?

শৈলেশ্বর বললেন, 'আরতি কেমন আছে। তোমার স্ত্রী?'

অনিমেষ একটু হেসে বললেন, 'আরতি নয় অণিমা।'

শৈলেশ্বর নিজেকে শুধরে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, অণিমা। আজকাল নাম বড় ভুল হয়ে যায়। অনেকদিন আসে না। আগে কত আসা-যাওয়া ছিল।'

শৈলেশ্বর একটু হেসে বললেন ব্যস্ত তো থাকবেই আমি ব্যস্ত নই বলে যে রাজ্যসুদ্ধ লোকের কাজ থাকবে না তা তো হয় না।

শীতাংশুর প্রসঙ্গটা এবার তুলতে হয়। কিন্তু ডাক্তারবাবু নিজে তা তুলছেন না। এটা কি ইচ্ছাকৃত? ইচ্ছা করেই কি উনি সেই চরম দুঃখকে ভুলে থাকতে চাইছেন? না কি অনিমেষের স্ত্রীর নামের মত নিজের ছেলের নামও তিনি এই মুহূর্তে বিস্মৃত হয়েছেন? ছেলের বন্ধুকে দেখে ছেলের কথা সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়াই তো তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

ওষুধের আলমারিগুলি প্রায় খালি। একটি আলমারিতে পুরনো কিছু ডাক্তারী বই, মেডিকেল জার্নাল। আর কিছু নতুন সংযোজন। গীতা উপনিষদের কয়েকটি খণ্ড, রামকৃষ্ণ কথামৃত।

অনিমেষের মনে পড়ল আগে ডাক্তারবাবুর অবসর বিনোদনের জন্যে আলমারির ওই তাকটা ভরা থাকত দেশী বিদেশী উপন্যাস আর গল্প সংগ্রহে।

'অতুল কোথায়?' আর কোন কথা খুজে না পেয়ে ডাক্তারবাবুর একমাত্র কম্পাউণ্ডারের খোঁজ করলেন অনিমেষ।

শৈলেশ্বর বললেন, 'আমার ভাগীদার জুটেছে। সে এখন আর এক জায়গায় পার্ট টাইম করে। তাকে তো এখন আর পুরো কাজ আর পুরো মাইনে দিতে পারিনে। তারও তো কাচ্চাবাচ্চা আছে।'

বেলা বেড়ে যাচ্ছে এবার জোর করেই অনিমেষ প্রসঙ্গটা টেনে আনলেন, 'আপনাদের বাড়ির সব কেমন আছে?

'বাড়ির সব?'

এবার যেন শৈলেশ্বরের সব মনে পড়ল।

'তুমি শোননি বুঝি? মাস দেড়েক আগে আমার একটি ভাই মারা গেছে সে অবশ্য আলাদা বাড়িতে থাকত। তবু তো ভাই। তারপর সেদিন গেলেন আমার একজন বন্ধু, অন্তরঙ্গ বন্ধু। তারও আগে গেছে ছেলে। শীতু তো তোমার বন্ধু ছিল অনিমেষ। সে আর নেই।'

অনিমেষ লক্ষ্য করে দেখলেন বৃদ্ধের চোখে জল নেই। বিন্দুমাত্র অশ্রুও চোখে পড়ল না। গলা একটু আর্দ্র হয়ে উঠল? তাও কল্পনা মাত্র।

অনিমেষ একটু যেন অনুযোগের সুরে বললেন, 'আমি কিছুই জানতে পারিনি—'

শৈলেশ্বব একটু উদাসভাবে বললেন, 'কে কাকে জানায় ? আব জানিযে কী-ই বা হত। তা ছাড়া তোমাব সঙ্গে তো ইদানীং আব দেখা সাক্ষাতও হত না। দু'মাস হযে গেল।'
অনিমেষ নিজেব মনেই যেন বললেন, 'দু-মাস।'
পুত্রশোক দু-মাসেব বলেই কি বৃদ্ধ নিজেকে এমন সংহত বাখতে পেবেছেন ? না কি আলমাবিব গীতা উপনিষদ তাঁব অশ্রু মুছিযে দিযেছে ? না কি দু-মাসেব মধ্যে তিনটি মৃত্যুশোক তাঁকে এমন শিলীভূত কবে ফেলেছে ?
অনিমেষ জিজ্ঞাসা কবলেন, 'কী হযেছিল ?'
শৈলেশ্বব বললেন, 'এমন কিছু নয। ভুগছিল তো অনেকদিন ধবে। শেষ দিকটায নিউমোনিযা—'
এই সময আব একজন মাঝবযসী ভদ্রলোক এসে ঘবে ঢুকলেন। বললেন, 'ডাক্তাববাবু, আপনাব তো এখন যাওযাব কথা।'
শৈলেশ্বব উৎসাহিত হযে বললেন, 'নিশ্চযই যাব। আমি তো আপনাব জন্যেই অপেক্ষা কবছি। গাড়ি এনেছেন ?'
ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যাঁ, ট্যাক্সি নিযে এসেছি।'
শৈলেশ্বব অনিমেষেব দিকে চেযে বললেন, 'আমাকে তো এবাব কলে বেবোতে হচ্ছে। তুমি আব একদিন এসো। আব এলেই যখন সুনন্দাব সঙ্গে একটু দেখা কবে যাও।'
অনিমেষ বলল, 'নিশ্চযই যাব।'
ডাক্তাববাবু না বললেও শীতাংশুব স্ত্রী সুনন্দাব সঙ্গে তিনি দেখা কবে যেতেন। এদিকে তো বড একটা আসা হয না আজকাল। কবে আবাব আসতে পাববেন তাব ঠিক কি। সামাজিক কৃত্যটুকু সেবে যাওযাই ভালো।
মিনিট পাঁচ সাত হাঁটতে হয। পাশাপাশি দুটি গলি। ভুল কবে অন্য গলিতে ঢুকে পডলেন অনিমেষ। ফলে ঘোবাঘুবিটা বাড়ল। নিজেব মনেই হাসলেন অনিমেষ। 'পথ ভুল কবতে আমি ওস্তাদ। কতবাব এসেছি তবু ভুল হয।'
শেষ পর্যন্ত গন্তব্য গৃহটিব সামনে এসে দাঁড়ালেন অনিমেষ। দোতলা বাড়ি। বেশি দিনেব পুবনো নয। বছব দশ বাবো আগে ডাক্তাববাবু তৈবি কবিযেছেন। বাড়িব উল্টোদিকে একটি কৃষ্ণচূড়াব গাছ ফুলে ভবতি।
কড়া নাডতে একটি যুবক এসে দোব খুলে দিল। দিব্যকান্তি প্রসন্ন মুখ। ন্যাড়া মাথায সবে একটু একটু চুল গজিযেছে। খালি পা, গলায পৈতে। মুহূর্তেব মধ্যে অনিমেষ তাকে চিনতে পাবলেন। শীতাংশুব ছেলে উৎপল।
অনিমেষ কিছু বলবাব আগেই বাইশ তেইশ বছবেব যুবকটি হেসে তাঁব দিকে এগিযে এল, 'আসুন, আসুন। আপনি দাদুব ওখানে এসেছিলেন বোধ হয। চলুন, মা ওপবে আছেন।'
উৎপলেব সঙ্গে সিঁড়ি বেযে একটু ধীবে ধীবে দোতলায উঠলেন অনিমেষ।
যুবকেব মুখে আগমনবার্তা আব একবাব সানন্দে ঘোষিত হল, 'মা, দেখ এসে কে এসেছেন।'
সুনন্দা ঘবেব ভিতবে ছিলেন। এগিযে এসে অনিমেষেব সামনে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আসুন।'
অনিমেষ দেখলেন তাকালে এখনো যেন নিমেষ ফেলতে ইচ্ছা কবে না। উজ্জ্বল গৌববর্ণা এই রূপবতী শুধু আগেব চেযে কিছু পুষ্টাঙ্গী হযেছেন। যৌবন যাই যাই কবেও যেন এই অপরূপ রূপাধাবেব মাযা কাটাতে পাবছে না।
পবনে সবুজ পাড়েব সাদা খোলেব শাড়ি। একেবারে নিবাভবণা হননি। হাতে একগাছি কবে চুড়ি, গলায সরু হাব।
সুনন্দা মৃদু স্ববে বললেন, 'আসুন ভিতবে।'
অনিমেষ একবাব হাতঘড়িব দিকে তাকালেন। বললেন, 'বেলা হয়ে গেছে।'
সুনন্দা এবার একটু হেসে বললেন, 'বেলা হযে গেছে বলে ভিতবে যাবেন না ? বুড়ি ছোঁযা কবতে এলেন না কি ?'

কণ্ঠমাধুর্যের সঙ্গে এবার তরল প্রগলভতা মিশেছে।

অনিমেষের মুখে এসে পড়েছিল, 'বুড়ি কোথায় ?' কিন্তু কথাটা স্থানোচিত সময়োচিত হবে না বলে চেপে গেলেন। ঢুকবার আগে সুনন্দা ছেলেকে কী যেন ইশারায় বললেন। তারপর ভাষায় নির্দেশ দিলেন, 'তোমার যেতে হবে না। সুবলকে ডেকে বলে দাও, তাহলেই হবে।'

অনিমেষ অনুমান করলেন অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা হচ্ছে। একটু বাধা দিয়ে বললেন, 'আবার কোথায় কাকে পাঠাচ্ছেন ?'

সুনন্দা অনিমেষকে ঈষৎ ধমকের সুরে বললেন, 'সে খোঁজে আপনার কী দরকার ? আপনার জন্যে পাঠাচ্ছি নাকি ? গেরস্তের নিজের কোন কাজ নেই নাকি ?'

উৎপল ঘরে ঢুকল না। সুনন্দা অনিমেষকে নিয়ে ঘরে এলেন। কারো গৃহসজ্জার দিকে তাকাবার অভ্যাস অনিমেষের নেই। তিনি গৃহী কিংবা গৃহিণীর সঙ্গে আলাপে তন্ময় হয়ে থাকেন। আর কোনদিকে তাকাবার কথা তাঁর মনে থাকে না।

ঘরে একটা ড্রেসিং টেবিল আছে কিন্তু কোন চেয়ার নেই। তার বদলে চামড়ার দুটি সুদৃশ্য মোড়া রয়েছে। আর আছে একখানা মাঝারি ধরনের সিঙ্গল বেডের খাট। বিছানাটি নীল রঙের আচ্ছাদনে ঢাকা।

অনিমেষ একটি মোড়ায় বসতে যাচ্ছিলেন সুনন্দা বাধা দিয়ে বললেন, 'ওখানে কেন ? খাটে উঠে বসুন। আহা হা জুতো খুলে পা তুলেই বসুন না। আপনার পায়ে তো কাদা নেই। বিছানার চাদরে না হয় একটু পায়ের ধুলোই দেবেন।

অনিমেষ দেখলেন তাঁর পুরনো বন্ধুপত্নী আগেও যেমন ছিলেন এখনও তেমনি রয়েছেন। তাঁর প্রগলভতা একটুও কমেনি। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে অনিমেষ ভুলে গেলেন কী উপলক্ষে তিনি এসেছেন। কে জানে সুনন্দা নিজেও সে কথা ভুলে থাকতে চান কিনা, ভুলিয়ে রাখতে চান কিনা

কিন্তু অনিমেষ তাড়াতাড়ি কর্তব্য সারতে ব্যস্ত। তাঁর ফেরবার তাড়া আছে। কাজের তাড়া আছে। এই রোদের মধ্যে অনেক দূর তাঁকে ফিরে যেতে হবে। চাইলেই ট্যাকসি মেলে না বাসে ওঠা দুরূহ।

তিনি এবার প্রায় জোর করেই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করলেন, 'শীতাংশু তা হলে চলে গেল।'

গলায় একটু আর্দ্রতা আনবার চেষ্টা করেছিলেন অনিমেষ। কিন্তু নিজেই বুঝতে পারলেন তা আসেনি। কৃত্রিমতাটুকু যদি সুনন্দার কাছে ধরা পড়ে থাকে তিনি নিশ্চয়ই হেসে উঠবেন, অনিমেষের এরকম সেই আশঙ্কা হল।

সুনন্দা উচ্চহাস্য করলেন না। মৃদু হেসে বললেন 'তিনি কি আজ গেলেন নাকি ?'

অনিমেষ অপরাধীর ভঙ্গিতে বললেন, 'না। দু মাস আগের ঘটনা। কিন্তু আমি শুনেছি সেদিন মাত্র।'

সুনন্দা মোড়ার ওপরে বসেননি, খাটের ওপরেও নয়। একটু দূরে দাঁড়িয়ে তিনি অনিমেষের সঙ্গে কথা বলছিলেন। একবার খোলা দরজার দিকে তাকালেন তিনি, তারপর অনিমেষের দিকে চেয়ে বললেন 'দু মাসও নয়, তারও অনেক আগে থেকেই বলতে গেলে তিনি ছিলেন না। যেভাবে ছিলেন তাকে থাকা বলে না। তিনি বেঁচে গেছেন।'

অনিমেষের গলায় যদি বা একটু কৃত্রিমতা এসে থাকে, সুনন্দার গলায় তার আভাসমাত্র নেই। সহজ সরল সুস্পষ্ট ঘটনার বিবৃতি তিনি দিয়ে যাচ্ছেন। তার চেয়ে বেশি কিছু নয়।

অনিমেষ কথাটা ভালো করেই জানেন। গত দশ-বারো বছর ধরে কি তারও বেশি শীতাংশু মানসিক দিক থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তারপর শারীরিক অসুস্থতাও আসে। দেহমন তো অবিচ্ছিন্ন। একটি খারাপ হলে আর একটি খারাপ হবেই। চিকিৎসাদি সাধ্যমত শৈলেশ্বর করিয়েছিলেন। হয়তো সাধ্যের অতিরিক্তও করিয়ে থাকবেন। কিন্তু রোগ সারেনি। ডাক্তাররা বলেছিলেন, কোনদিন সারবে না।

শীতাংশু কোনদিন ভায়লেণ্ট হয়নি। যদি বা ক্বচিৎ কখনো হয়ে থাকে অনিমেষ তা জানেন না। শীতাংশু অনিমেষকে দেখলে শুধু হাসত। হয়তো সবাইকে দেখলেই হাসত। অনিমেষ সেই হাসির

কোন অর্থ ভেদ করতে পারতেন না। কিন্তু সেই অপার্থিব হাসি দেখলে অনিমেষের গা শিরশির করত। অনিমেষ বালকের মত মাতালকে ভয় করেন, পাগলকে ভয় করেন। যদিও তিনি জানেন মদ না খেলেও লোকে মাতাল হয়। উন্মাদ বলে চিহ্নিত না হলেও লোকের উন্মত্ততার সীমা থাকে না। ব্যর্থ বাসনায়, ক্রোধের প্রাবল্য, ঈর্ষায় দ্বেষে মুহূর্তে মুহূর্তে মানুষ সুস্থতার সীমা ডিঙিয়ে যায়। তবু প্রমত্ত আর উন্মত্তকে তাঁর ভারি ভয়।

এরই মধ্যে সুবল প্লেট ভরতি মিষ্টি নিয়ে এসেছে। বেঁটে খাটো স্বাস্থ্যবান চেহারা। দেখলেই বোঝা যায় কাজের ছেলে।

সুবল বলল, 'মা কোথায় রাখব ?'

সুনন্দা বললেন, 'আমার কপালে।'

তারপর তার হাত থেকে মিষ্টির প্লেট আর জলের গ্লাসটি নিয়ে অনিমেষের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'নিন।

অনিমেষ হাত বাড়ালেন না। শুধু হেসে বললেন, কী সর্বনাশ ? এ সব কে খাবে ?'

'কেন আপনি ?'

অনিমেষ বললেন, 'আমার মিষ্টি খাওয়া বারণ।

'কে বারণ করেছে ?'

'ডাক্তার।'

'কোন রোগের ডাক্তার ?'

'হৃদরোগের।'

সুনন্দা হেসে বললেন, 'ও রোগ কি আপনার এই নতুন হল নাকি ?'

অনিমেষ এ-কথার কোন জবাব দিলেন না।

সুনন্দা বললেন, 'খান খান। সব না পারেন একটি দুটি নিন। একটি মিষ্টি খেলে আর মারা যাবেন না। আর যদি যানই, যাবেন।'

একটি নিষিদ্ধ সন্দেশ শেষ পর্যন্ত তুলে নিলেন অনিমেষ।

এক হাতে প্লেট আর এক হাতে জলের গ্লাস ধরে রয়েছেন সুনন্দা। একটু হেসে বললেন 'আমাকে একটি টিপয় ভেবে আপনি দেখি একেবারে ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে রইলেন। এমন টিপয় দেখেছেন কখনো ?'

অনিমেষ স্বীকার করে বললেন, 'না দেখিনি।'

'তা হলে দেখুন। এবার দয়া করে জলের গ্লাসটি নিন।

তারপর দোরের দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে ডাকলেন, 'বাবা সুবল, এবার তোয়ালেখানা নিয়ে এসো।'

জল খাওয়া হয়ে গেলে গ্লাসটি আর প্লেটখানা সুবলের হাতে ফেরত দিয়ে সুনন্দা বললেন, 'আপনাকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছিলাম কেন জানেন ?'

অনেক সময় সংক্ষিপ্ত জবাবই নিরাপদ। অনিমেষ মাথা নেড়ে বললেন, 'না।'

সুনন্দা বললেন, 'এখানে আসবার আগে আপনি নিশ্চয়ই আমার শ্বশুরের ওখানে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে অনেক অশুভ সংবাদ শুনেছেন। কোন শুভ সংবাদ তিনি শুনিয়েছেন কি ? তাঁর যা ভুলো মন।'

অনিমেষ বললেন, 'না, তেমন কিছু তো শুনিনি।'

সুনন্দা বললেন, 'তা হলে শুনুন, আপনাকে একটা সুখ-সংবাদ দিচ্ছি। কমলবাবু বিয়ে করেছেন।'

'কোন কমলবাবু ?'

'আপনি তো আসা যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, তাই সব ভুলে গেছেন। না কি আমার শ্বশুরের হাওয়া লেগেছে গায়ে ? পনের বিশ বছর ধরে তাঁর সঙ্গেই তো আপনার বন্ধুত্ব জমে উঠেছে। কমল। তাকে আপনি ভালো করেই চেনেন। আমার দেওর হয় সম্পর্কে। যখন আসা-যাওয়া ছিল

আপনি তার সঙ্গে তাসটাস খেলেছেন। অনেকবার হেরেও গেছেন। সেই কমলের এবার বিয়ে দিলাম। শ্রীমানের বয়স এখন পঁয়তাল্লিশ।'

অনিমেষ বললেন, 'আর শ্রীমতীর ?'

'তারও গোটা পঁয়ত্রিশেক হবে। কমলের একটু কম-বয়সীর দিকে ঝোঁক ছিল। আমি তাকে নিষেধ করেছি, অমন কাজও করো না, বিপদে পড়বে। অফিস আদালত সব বাদ পড়বে, বউ আগলে বসে থাকতে হবে রাতদিন।

'কেমন বউ হয়েছে ?'

'সুন্দর বউ।'

'আপনার চেয়েও সুন্দর ?'

সুনন্দা বললেন, 'তা কেন হতে যাবে ? আমি কি সব ব্যাপারেই হারব নাকি ? আমার চেয়ে সুন্দর নয়, তবে আমার চেয়ে ঢের ঢের বিদুষী।'

অনিমেষ বললেন, 'বিদ্যায় আপনিই কি কিছু কম যান নাকি ?'

সুনন্দা বললেন, 'নিশ্চয়ই চুরিবিদ্যার কথা বলছেন।'

এবার অনিমেষ উঠে দাঁড়ালেন। আর দেরি করা চলে না। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা।

সুনন্দা বললেন, 'যাবেনই তো। এত বেলায় একেবারে স্নানাহার সেরে গেলেই তো পারতেন। ভয় নেই, আমার রান্নায় মিষ্টি বেশি থাকে না।'

অনিমেষ বললেন, 'আজ থাক। আর একদিন হবে ও-সব।'

নিচে নেমে সদর দরজা পর্যন্ত অনিমেষকে এগিয়ে দিলেন সুনন্দা। ছেলেকে ডেকে বললেন, 'সঙ্গে যা। একটা ট্যাক্সি ডেকে দে। ট্যাক্সি যদি না পাস, একটা রিকশা নিশ্চয়ই করে দিবি। বাস স্টপ পর্যন্ত নিয়ে যাবে।'

তারপর অনিমেষের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'খবরদার পয়সা বাঁচাবার জন্যে এই রোদের মধ্যে হেঁটে যাবেন না কিন্তু।'

উৎপল রাস্তায় নেমে অনিমেষের পাশে পাশে হাঁটতে লাগল। তারপর এক সময় একটু হেসে বলল, 'আপনার সঙ্গে কোন কথাই বলতে পারলাম না। আর একদিন যখন আসবেন তখন বলব।'

অনিমেষ পরম স্নেহে ছেলেটির পিঠে হাত রাখলেন। স্মিতমুখে বললেন, 'নিশ্চয়ই। আমি আসব। তুমিও তো যেতে পার। আমার ঠিকানা জানা আছে তো ?'

উৎপল বলল, 'দাদুর কাছে চাইলেই তো পাব।'

'তা পাবে।'

কয়েক হাত দূরে একটি রিকশাওয়ালা খালি একখানা রিকশা নিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছিল—উৎপল দ্রুত পায়ে গিয়ে তাকে ধরল। তারপর অনিমেষের দিকে চেয়ে বলল, 'এখানে ট্যাক্সি পাবেন না। রিকশাই নিন আপনি। বাস স্টপ পর্যন্ত যাবে। তিরিশ পয়সা নেবে।

অনিমেষ বললেন, 'বেশ তো।'

রিকশায় উঠবার আগে আর একবার তাকালেন উৎপলের দিকে। পুরোপুরি নয়, খানিকটা আদল আসে শীতাংশুর মুখের।

রিকশায় বসে এতক্ষণে মৃত বন্ধুর কথা মনে পড়ল অনিমেষের। তার জন্যে শোক প্রকাশ করতে এসেছিলেন। সেই অবকাশ আর হয়নি। শোকেরও তো একটা অনুষঙ্গ চাই।

সুনন্দার দোষ দেওয়া চলে না। শীতাংশু যেমন তিলে তিলে মরেছে, সুনন্দাও হয়তো তেমনি তিলে তিলে শোক করেছেন। সেই শোক লোকচক্ষুর অন্তরালে। জীবনের একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে সেই শোকশয্যা পাতা।

কিন্তু অনিমেষের তো তা নয়। তিনি পীড়িত বন্ধুর জন্যে আপসোস করেছেন। কিন্তু গভীরভাবে শোকার্ত কি হয়েছেন ? মনে পড়ে না। আজ অনিমেষের ইচ্ছা হল তার মৃত্যু-সংবাদ শেষবারের মত তাঁর হৃদয়ে বিপুল শোকাবেগ এনে দিক। এক নিমেষের জন্যে একটি নীরব নিভৃত শোকসভার অনুষ্ঠান হোক। শীতাংশুর জন্যে সেইটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু আবেগ ? অত সহজলভ্য নয়।

শীতাংশুর সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক বহু দিন অপরিশীলিত ছিল। প্রীতির ঝরনা কবে শুকিয়ে গিয়েছে তা তিনি নিজেই জানেন না।

ওর সঙ্গে প্রথম জীবনের দিনগুলির কথা মনে আনবার চেষ্টা করলেন অনিমেষ। সেই একই সঙ্গে পড়াশোনা করা, কলেজে যাওয়া, সাহিত্য রাজনীতি নিয়ে আলোচনা, আচার আচরণের লক্ষণ দেখে রমণী হৃদয়রহস্যের অর্থ ভেদের যৌথ প্রয়াস। স্মৃতি আছে, কিন্তু আর কিছু নেই।

অনিমেষের মনে হল তিনিও অংশত মৃত। সত্তার যে অংশ শীতাংশুর জন্যে ধরা ছিল তা আর নেই।

অনিমেষ ভাবলেন শুধু শীতাংশু কেন আরো অনেকের ক্ষেত্রেই তিনি মৃত, তারাও জীবিত নয়। তিনিও শোকরহিত, তারাও শোকরহিত।

উৎপল কোত্থেকে এক বুড়ো রিকশাওয়ালাকে জুটিয়ে দিয়েছে তাই দেখ। এই রোদে গরমের মধ্যে অনিমেষের মত ভারি ওজনের একটি শক্ত সমর্থ মানুষকে বয়ে নিতে লোকটির নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে।

কিন্তু বুড়ো তো জানে না সে একটি জীবন্ত মানুষকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে না। একটি লাস টেনে নিয়ে চলেছে। সেই অসনাক্ত শবদেহের জন্যে পৃথিবীতে শোক করবার কেউ নেই। কেউ নেই।

অভিন্নহৃদয়

ভোর হতে না হতেই দোলা স্বামীকে ঠেলে তুলল, 'ওঠো ওঠো, আজ যে তুমি বাজার করবে বলেছিলে।'

অসিত পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, 'কেন আজ কি।'

'বাঃ রে। তুমি নিমন্ত্রণ করে এসেছ, তুমিই ভুলে গেলে। আজ না ওরা খাবে।'

এবার অসিতের মনে পড়েছে। তবু স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'কারা খাবে যেন?'

দোলা বলল, 'যাও আমি জানি না।'

দীর্ঘাঙ্গী তন্বী সুন্দরী স্ত্রীর মুখের ওই আরক্ত আভাস দেখে আর মধুর ভঙ্গির 'আমি জানি না'—যার বাচ্য আর ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণ আলদা—সেই ধ্বনিটুকু শুনে অসিতের মনে হল, 'তবে কি আমি ভুল করেছি? তবে কি প্রণবকে আমার এখানে আসতে খেতে না বললেই ভালো হত?'

নেটের বড় মশারি এখনো তোলা হয়নি। সিঙ্গল-বেডের দুখানা খাট জুড়ে বড় করে বিছানা পাতা। দুজনের জন্যে নয়, তিনজনের জন্যে। দুজনের মাঝখানে তিন বছর আগে আরো একজন এসেছে, বিন্নি। সেই মধ্যবর্তিনী শিশুকন্যাকে ওরা আলাদা বেবিকটে রাখে না। প্রাচীন ধারা অনুযায়ী সে বাপ মার কাছেই শোয়। ঘরের মধ্যে মশারি টাঙালে যেমন আলাদা ঘর হয়ে ওঠে, তেমনি মেয়ের জন্যে নিজেদের বিছানার ওপরই অয়েলক্লথ বিছিয়ে আলাদা বিছানা পাতে দোলা। রাত গভীর হলে মধ্যবর্তিনীকে পার্শ্ববর্তিনী করে রাখে। কতটুকু সময়ের জন্যেই বা। সেই বক্ষের মণি একবার মায়ের বুকে ঘুমোয় আবার বাপের বুকে। বিছানায় সে কতটুকু সময়ই বা থাকে।

বিন্নি বাপের মতই লেট-রাইজার, কিন্তু মায়ের মতই দেখতে সুন্দর। ঘুমন্ত মেয়ের মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে অসিত স্ত্রীর দিকে আবার তাকাল। তারপর হেসে বলল, 'আমি কিন্তু জানি।

তোমার ফর্মার লাভার আর আমার ফর্মার ফ্রেণ্ড। সে আজ খাবে আমাদের বাড়িতে। সে নয় তারা। সপরিবারে।'

দোলা স্বামীকে ধমক দিয়ে বলল, 'ছিঃ। কী যা তা বলছ?' তারপর মেয়ের দিকে ইসারা করে বলল, 'জান না ? ও আজকাল সব বুঝতে পাবে, সব বলতে পারে। তোতা পাখির মত যা শোনে অই বলে।'

অসিত বলল, 'কিন্তু ও তো ঘুমুচ্ছে। নিশ্চয়ই আমার মত কপট নিদ্রা এখনো শেখেনি।'

দোলা হাসল, 'তোমার কপট নিদ্রাও আছে নাকি ? নিজের মুখেই স্বীকাব করছ ?'

অসিত বলল, 'করব না কেন ? আমি আমার সব অপবাধই অকপটে স্বীকার করি।'

দোলা স্বামীর দিকে তাকাল। দুজনেই একমুহূর্ত চুপ করে রইল। দোলা জানে, অপরাধ যদি হয়ে থাকে তা শুধু অসিতের একারই নয়। তাতে তারও অংশ আছে।

স্ত্রীর ভাবান্তর দেখে কষ্ট হল অসিতের। গুরুভার উড়িয়ে দেওযার জন্য হেসে বলল, 'আমি সব অপরাধই স্বীকার করি। ঘুম ভাঙলেও মাঝে মাঝে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকি, কেউ মুখের কাছে মুখ নিয়ে ডেকে দেবে বলে। আশায় আশায় থাকি তার মুখখানা যদি আরো একটু এগিয়ে আসে।'

দোলা কোন জবাব না দিয়ে মশাবিব দড়ি খুলতে লাগল। তারপর একসময় বলল, 'এবার দয়া করে উঠে পড়ো। আজ তো রবিবাব। তাডাতাডি বাজারে না গেলে কিছু পাবে না।'

বাজার করায় অসিতের তেমন উৎসাহ নেই। পারেও না, তেমন পছন্দও করে না। দোলাই সব কবে। বাড়িব কাছেই বাজার। তেমন কোন অসুবিধা হয় না। বাজারে অনেক মেয়েই আসে আজকাল। তাতে অগৌরবেব কিছু নেই।

অসিত বলে, যুগটা যখন নারীপ্রগতির, এসব বাজাব-টাজাবেব ভারও তোমাদেবই নেওয়া উচিত। তাছাড়া, যে বান্না কববে সেই যদি বাজাব কবে তাতে সুবিধাও আছে। নিজেব পছন্দমত বাজার করে নিয়ে আসতে পাবে। বাজাবে গিয়ে রান্নাঘবটাকে সে চোখের সামনে দেখতে পায়। আমি বাজাবে গেলে তো আব তা হয় না। কেবল দোকানদাবেব সঙ্গে ঝগড়া হয়। মেজাজ ঠিক থাকে না।

নিজেব কুঁডেমিব সমর্থনে যুক্তির অভাব হয় না অসিতের। দোলা প্রতিবাদ কবে না। নিজের হাতে ঘবেব বাইরেব সব কাজই কবে। অবশ্য ওকে সাহায্য করবাব জন্যে কেউ না কেউ থাকে। কখনো বা কোন বাচ্চা ছেলে পাওয়া যায়, কখনো বা কোন বুড়িকে, কখনো বা মাঝবযসী কোন অনাথা মহিলা। তাকে দিযে সব কাজ করাতে সংকোচ হয় দোলাব। কেউ স্থির হয়ে থাকে না। কিছুদিন ধবে রাত দিনের লোক নেই। ঠিকে ঝি আছে একটি। গঙ্গাকে দিয়েই দোলা রেশন তোলায়, মিল্ক সেণ্টাব থেকে দুধ আনিয়ে নেয়। তবু সব কাজ তাকে দিয়ে চলে না।

স্ত্রীর ভাবসাব দেখে অসিত বুঝতে পাবল আজ আব বাজাবে সে যাবে না। বাজারটা তাকেই করতে হবে।

বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে এল অসিত। চা খেতে বসল স্ত্রীর সঙ্গে। দুখানা রুমের ফ্ল্যাটে আলাদা ডাইনিংরুম নেই। বান্নাঘরের সামনে ডাইনিং প্লেস আছে। সেখানেই টেবিল চেয়ার পেতে সুন্দর একটি খাবাব ঘব করে নিয়েছে দোলা। টেবিলখানা নিতান্ত ছোট নয। অন্তত দুজন লোক একসঙ্গে বসে খেতে পারে।

অসিতের এখন যা আর্থিক সঙ্গতি তাতে তার চেয়ে ভালো জায়গায় বেশি ভাড়ার ফ্ল্যাটে সে থাকতে পারে। কিন্তু দোলার তা ইচ্ছা নয। বাড়ির জন্যে মিছিমিছি বাড়তি কতকগুলো টাকা খরচ করে লাভ কি!

সেদিন এক বন্ধু এসেছিল বেড়াতে। সে অসিতের এই ফ্ল্যাটেব খুব সুখ্যাতি করেছিল, 'কেন জায়গাটা খারাপ কিসের। তোমার এই ইন্দ্র বিশ্বাসই তো ইন্দ্রপ্রস্থ। সামনে কত বড় রাস্তা পেয়েছ, পার্ক পেয়েছ। আমার হরতুকি বাগানের গলি যদি দেখতে।'

বাড়ি না বদলাবার আরো একটা কাবণ আছে, অসিতের ব্যাংকেব চাকরি। অল ইণ্ডিয়া সার্ভিস। যখন যেখানে ইচ্ছা বদলি করে দিতে পারে।

নিরিবিলিতে দুজনে মুখোমুখি বসে চা খাওয়ার কি আব জো আছে! মেয়ে উঠে বসেছে টেবিলের ওপর, 'আমি চা বিস্কুট খাব।'

দোলা ওকে চা খেতে দেয় না, বিস্কুট দেয়। সেই বিস্কুট বিন্নি একবার বাবার চায়ের কাপে ডুবিয়ে নেয়, আব একবার মায়ের কাপে। কোন পক্ষপাত নেই।

চা খেতে খেতে অসিত বলল, 'বাজার থেকে কী কী আনব বলতো। তরকারি-টরকারি যা আসে তাই না হয় আনব। ও একরকম মুখস্থ হয়ে গেছে। কিন্তু মাছ?'

দোলা ফের একটুকাল চুপ করে রইল, 'আনবে।'

অসিত বলল, 'প্রণব কোন্ মাছ খেতে ভালোবাসে?'

দোলা একটুকাল চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'আমি কী করে বলব? তোমার বন্ধু।'

অসিত একটু হাসল, 'তোমারও তো বন্ধু—ছিল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তোমরাই ভালো জানো। একসময় তোমার বাপেব বাড়িতে নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন তো কম খায়নি। বিনা নেমন্তন্নেও খেয়েছে।'

দোলা বলল, 'সে তো তুমিও খেয়েছ। মাছ-টাছ পছন্দ করে যদি আনতে পার এনো। না হলে এনো না। সামনের দোকানে মাংস পাওয়া যায়। আমি এখান থেকে মাংস আনিয়ে নেব।'

গলার স্বরটা একটু যেন রুক্ষ শোনাল দোলার।

অসিত লক্ষ্য করল যতবার সে প্রণবের নাম করে ততবারই দোলা আড়ষ্ট হয়, না হয় লজ্জিত হয়, না হয় অস্বস্তি বোধ করে। কেন এমন হবে। সাত আট বছর হয়ে গেল তাদেব বিয়ে হয়েছে, তারপর সন্তান হয়েছে, এখনো কেন ব্যাপারটাকে সহজ স্বাভাবিক ভাবে নিতে পারবে না দোলা। এখন প্রণবও বিবাহিত। তার ঘরেও বউ এসেছে। বউয়ের কোলে দুটি বাচ্চা। যমজ শিশু হয়েছে মমতাব। একই সঙ্গে পুত্রকন্যার সাধ মিটেছে।

অসিত চায় ব্যাপারটা এবাব সহজ হয়ে যাক। তাদের দুই বন্ধুর মধ্যে আগেব মতই মেলামেশা হোক, পারিবারিক লেভেলে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় অন্তরঙ্গতা বেড়ে উঠুক। প্রণব এমনিতে সজ্জন সহৃদয় মানুষ। অসিতও এমন কিছু খারাপ মানুষ নয়। অফিসে, অফিসের বাইবে পবিচিত আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কেউ সে কথা বলে না। শুধু প্রণবের মনে একটা কাটা দাগ আছে। কিন্তু সে তো একটা দাগ মাত্র। সাত বছব আগের সেই ক্ষতচিহ্ন কি আজও শুকায়নি? তা প্রণবই জানে। আর আশেপাশের আরো কিছু লোকজন যারা ব্যাপারটাব কথা জানত অসিতের সম্বন্ধে তাদের ধারণা হয়তো একটু অন্যরকম হয়ে রয়েছে। তাতে অসিতের কিছুই এসে যায় না। তাদের ক'জনের সঙ্গেই বা অসিতের আজকাল দেখা সাক্ষাৎ হয়? ক'জনের সঙ্গেই বা তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল? তারা হয়তো মুখে মুখে আড়ালে আবডালে অসিতের কিছু অখ্যাতি ছড়িয়ে থাকবে। তাতে কিছুই এসে যায় না। অসিত চায প্রণবেব সঙ্গে তাব সম্পর্কটা আগের মতই সহজ স্বাভাবিক হয়ে উঠুক। অন্তরঙ্গতা হয়তো ইচ্ছা করলেই জমিয়ে তোলা যায় না। কিন্তু একটা সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে বাধা কিসের?

চা খাওয়া শেষ করে মেয়েকে একটু আদর করল অসিত। তারপর স্ত্রীর দিকে চেয়ে কোমল স্বরে বলল, 'তা হলে দাও থলিটা। নিজের বুদ্ধিমতই নিয়ে আসি মাছ-টাছ।'

স্বামীর অসহায় অবস্থা দেখে দোলা একটু হাসল, 'কেন, নিজের বুদ্ধির ওপর বুঝি তোমার আস্থা নেই?'

অসিত বলল, 'আস্থা থাকবে না কেন? বুদ্ধিটুকু কি আর বাড়িতে নিয়ে আসি ভেবেছ? ব্যাংকের সেফ ডিপোজিট ভল্টে রেখে আসি। যেখানে তোমার গয়নাগুলি থাকে। তুমি তো আমার হাতে পাঁচটা টাকা বেশি দাও না। পাছে বাজে খরচ করে ফেলি। বুদ্ধির বুঝি সে ভয় নেই?'

এ কথার পর দোলা একটু সদয় হয়। সত্যি, মানুষটির সাংসারিক বুদ্ধি একেবারেই নেই। হেসে বলে, 'শোন, এখন তো ইলিশ মাছের সময়। ইলিশ যদি পাওয়া যায় ইলিশই এনো। না হলে পোনা তো আছেই। আর বড় বড় চিংড়ি পেলে নিয়ে এসো। মালাইকারি করব। বেলগাছিয়ার বাজারে বোধহয় ভালো মাছ-টাছ আর পাবে না। একেবারে শ্যামবাজারে চলে যেয়ো।'

'যদি পচা মাছ-টাছ এনে বসি ?'

দোলা বলল, 'তোমার বন্ধু পচামাছই খাবে। আমি আর কী করব ?'

অসিত বলল, 'আমার সে ভয় নেই। তোমার হাতের গুণে মরামাছও জ্যান্ত মাছেব মত লাগবে। মরা সম্পর্ক আবার তাজা হয়ে উঠবে।'

বাজার সেরে খুশি মনেই ফিরে এল অসিত। ইলিশ আর চিংড়ি দুইই মিলেছে। মাছ দেখে দোলাও খুব খুশি। না পচাটচা নয়। বরফ দেওয়া হলেও ভালো মাছই চিনে এনেছে অসিত। তবে পরনের পাজামাটা অক্ষত অবস্থায় নিয়ে আসতে পারেনি। কোত্থেকে যেন কালি লাগিয়ে এনেছে। দোলা বকুনি দিল, 'ও কালি কী আর উঠবে ? নিশ্চযই গাড়ির চাকার কালি। কোথায় গিয়েছিলে বলতো ?'

এবার পুরো ব্রেকফাস্ট, চা টোস্ট আর ডিম সিদ্ধ।

খেতে খেতে অসিত বলল, 'এ তো নিত্যবরাদ্দ। ভালো বাজার করে এনেছি বলে অতিরিক্ত কিছু দেবে না ?'

দোলা বলল, 'আমার জন্যে এনেছ নাকি ?'

অতিবিক্ত চাওয়াটা শুধু কথার কথা। সত্যিই কি আর অত আদর সোহাগ আজকাল চায় অসিত ? স্ত্রীকে যখন তখন তেমন করে আদর করবাব জন্যে মন কি আব আগের মত উৎসুক হয়ে ওঠে ? সেই প্রাক-বিবাহযুগে যেমন হত ? উত্তর বিবাহ পর্বেও প্রথম দুতিন বছর যেমন হত ? তেমন কি আর হয ! অস্বীকার করে লাভ নেই, হয় না। দোলারও যেন তেমন দাবি আর নেই। তার বদলে দু'জনের যৌথ সৃষ্টি বিন্নির মুখে ওরা অবিরাম মধুবৃষ্টি করে। একজন এগালে চুমো খায় আর একজন ওগালে। দোলা গৃহকর্ম শুরু করে দিয়েছে। বঁটি পেতে মাছ কুটতে বসেছে নিজের হাতে। সংসারের সব কাজ জানে, সব কাজ পারে। তাই হয়তো ঘোড়া দেখে দেখে খোঁড়া হয়েছে অসিত।

না, প্রণবের স্ত্রী মমতা অত সুন্দরী নয়। সৌন্দর্য কি চাইলেই পাওয়া যায় ? কে জানে প্রণব হয়তো সৌন্দর্যকে তেমন কবে খোঁজেওনি। হয়তো রূপের ওপব ওর আর তেমন আস্থা নেই, এমনও হতে পারে।

প্রণবের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ বড় একটা হয় না। যদি বা বিশেষ কোন কথা থাকে, প্রথম প্রথম তো চোখ ফিরিয়ে নিত। আজকাল তবু এক-আধটা কথা বলে। হঠাৎ অসিতের কি খেয়াল হল। ওর ঠিকানা সংগ্রহ করে মাণিকতলা সি আই টি রোডে একদিন প্রণবের বাড়িতে হাজির হল।

প্রণবও থাকে অসিতেব মতই একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে। তবে ফ্ল্যাটটি আরো ভালো। বাড়িটিও নতুন। রাস্তাটি আরো চওড়া আর বড়।

অসিতকে দেখে প্রণব একটু চমকে উঠেছিল বইকি ! প্রণব হয়তো ভাবতে পারেনি বন্ধু আর শত্রুর দ্বৈত ভূমিকা নিয়ে অসিত সত্যিই তার বাড়িতে এসে হাজির হবে।

'আয়' বলে ঘরে ডেকে নেওয়ার আগেই অসিত ওর ঘরে ঢুকে পড়েছিল। বসতে বলার জন্যে অপেক্ষা করেনি। নিজেই বসে পড়েছিল ওর সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমের সোফাটায়। তারপর হতভম্ব প্রণবকে হাত ধরে টেনে পাশে বসিয়ে বলেছিল, 'খুব অবাক হয়ে গেছিস, তাই না ?'

প্রণব আস্তে আস্তে বলেছিল, 'তোর কোন আচরণেই কেউ কি অবাক হয ?'

এর মধ্যে যে অন্তর্নিহিত তিরস্কারটুকু আছে তার তীক্ষ্ণতা অসিতকে বিদ্ধ করতে ছাড়েনি। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোবার আগেই অসিত অসীম সহনশীলতার বর্ম পবে বেরিয়েছে। আজ তার যে আচরণকে নিতান্তই নাটকীয় বলে মনে হচ্ছে প্রণবের, ও তো জানে না কয়েকদিনের সযত্ন মহড়ায় অসিত তা আয়ত্ত করেছে।

প্রণবের কথার জবাবে অসিত হেসে বলেছিল, 'তা ঠিক। আমার চালচলনে কেউ আর অবাক হয় না। কিন্তু তোর কাণ্ডকারখানায় রাজ্যশুদ্ধু লোক কিন্তু অবাক হয়ে গেছে। ধরা যাক যে মেয়েটিকে তুই ভালোবেসেছিলি—'

দুই ঠোঁটে আঙুল রেখে এবং আড়চোখে পাশের ঘরখানা দেখিয়ে দিয়ে তাকে থামিয়ে দিয়েছিল

প্রণব। তারপর বলেছিল, 'আয়, তোকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

একটু উঁচুগলায় ডেকেছিল, 'মমতা, এ ঘরে এসো। আমার একজন পুবনো বন্ধু এসেছে। ছেলেবেলার বন্ধু।' পাশের ঘর থেকে একটি মেয়ে এসে ঢুকল। বয়স হয়তো খুব বেশি নয়। তিরিশের নিচেই হবে। কিন্তু একটু বেঁটে ধরনের, একটু বা মোটাও। গায়ের রঙ শ্যামলা। সুন্দরী নয়, তবু সব মিলিয়ে কোথায় যেন একটু লাবণ্য লেগে রয়েছে।

প্রণব পবিচয় করিয়ে দিল।

নমস্কার প্রতিনমস্কারেব পর অসিত বলল, 'আপনি বোধহয় আমার নাম ওব মুখে একবারও শোনেননি।'

মমতা কথাটা স্বীকার করে নিয়ে হেসে বলল, 'আপনার বন্ধু কথা তো প্রায় বলেনই না। নিজের কাজকর্ম নিয়েই থাকেন।'

'কী কাজ ?'

অসিত প্রণবের স্ত্রীর মুখ থেকেই তার ইদানীংকাব জীবনবৃত্তান্ত শুনতে চেয়েছিল।

মমতা বলেছিল, 'কলেজেব চাকরি আছে দুবেলা। বাড়িতেও ছাত্রছাত্রীরা আসে। বাকি সময়টুকু লেখালেখি আছে। বইপত্র নিয়ে থাকতেই ভালোবাসেন।'

অসিত কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনার সময় কাটে কী করে ?'

প্রণব জবাব দিয়েছিল, 'মমতাও বেকাব নয়। ওবও স্কুল আছে, ঘরসংসারের কাজ আছে, ছেলেমেয়ে নিয়ে ঝামেলা আছে। আমি কম কথা বলি বলে নালিশ করছিল তোর কাছে। মমতাই বা কটি কথা বলে ?'

অসিত হেসে উঠেছিল, 'তা হলে তোদেব একেবারে নীরব প্রেম আব বোবার সংসার ?' তারপব মমতার দিকে চেয়ে বলেছিল, 'কই বাচ্চাদের নিয়ে আসুন দেখি।'

মমতা একটু লজ্জিত হয়ে বলেছিল, 'ওরা আপনাকে ব্যতিবাস্ত করে তুলবে। আমবা কথা না বললে কি হয় ওরা খুব কথা বলে। দিনরাত ঝগড়া মাবামাবি লেগেই আছে। আপনি বলছিলেন বোবার সংসার। কিছুক্ষণ যদি বসে যান দেখবেন ঠিক উল্টো। আপনাব কান একেবাবে ঝালাপালা হয়ে যাবে।'

অসিতের অনুরোধে বাচ্চা দুটিকে নিয়ে এসেছিল মমতা। যমজ সন্তান তো যখন তখন চোখে পড়ে না, তাই একটু কৌতূহলী হয়ে ছেলেমেয়ে দুটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছিল। জিজ্ঞাসা করে জেনেছিল ওদের বয়সও তিনের কাছাকাছি। প্রণব বিয়ে করেছে পরে, কিন্তু ছেলেমেয়ে দুটি তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে। কিংবা হতে দিয়েছে। এ ব্যাপারে মনস্থির করতে অসিতেব কিছু দেরি লেগেছিল।

প্রথমে জলখাবারের আযোজন। তারপব মধ্যাহ্ন ভোজ। অসিত খেতে চায়নি। বাড়িতে কাজ আছে বলে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রণব আব মমতা কিছুতেই ছাড়ল না।

মমতা বললে, 'এই ভর দুপুরে কেউ কি কারো বাড়ি থেকে না খেয়ে যায় ? এই বলছেন পুবনো বন্ধু। এ কি বন্ধুর মত ব্যবহার ? আজ না হয় স্ত্রীর হাতের ভালো রান্না নাই বা খেলেন।'

অসিত বলল, 'কথা তা নয়। ফিরতে দেরি হলে বউ চিন্তায় থাকবে। ভাত নিয়ে বসে থাকবে।'

মমতা বলেছিল, 'বেশ তো, একটা খবর দিয়ে দিন। টেলিফোন নেই ?'

অসিত বলেছিল, 'টেলিফোনের জন্যে অ্যাপলাই করেছি। কবে পাব ঠিক নেই। তবে পাশের ফ্ল্যাটে আছে। আমরা বড় একটা ইউজ্ করিনে। তবে খবরটবর থাকলে জানিয়ে দেয়।'

প্রণব বলল, 'তাই দিলেই হল। আমাদেরও একতলায় একটা ওষুধের দোকান আছে। দরকার হলে ওখান থেকে ফোন-টোন করি। চার্জ অবশ্য বেশি নেয়।'

মমতা বলল, 'তা নিক।' তারপর স্বামীর দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি ফোনটা তাড়াতাড়ি করে এসো।'

প্রণবের দ্বিধাটুকু সকৌতুকে উপভোগ করল অসিত। একটু বাদে প্রণব বলল, 'আচ্ছা, তুইও আয়।'

অসিত গেল সঙ্গে সঙ্গে। ফার্মেসীতে তখনো বেশ ভিড়। কাউন্টারের এক পাশে টেলিফোনটা রাখা। কে একটি মেয়ে হেসে হেসে কথা বলছে।

সে টেলিফোনটা ছেড়ে দিলে অসিত বলল, 'প্রণব টেলিফোনটা কর তাহলে। বললেই ওরা দোলাকে ডেকে দেবে।'

কিন্তু আশ্চর্য ওর সংকোচ আর লজ্জা, নাকি অন্য কিছু কে জানে? প্রণব কিছুতেই গেল না টেলিফোনের কাছে। অসিতই শেষ পর্যন্ত ফোন করে দোলাকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিল। চার্জটা অসিত নিজের পকেট থেকে দিতে যাচ্ছিল কিন্তু প্রণব হাত বাড়িয়ে ওর হাতখানা ধরে ফেলল, 'তুই কেন দিবি। আমি দিচ্ছি।'

অসিতের মনে হল কতকাল পরে বন্ধু তার হাতখানা ধরল, যে বন্ধুকে সে পরম শত্রু ভেবে ফেলেছিল—সেই বহুদিনের হারানো বন্ধু।

ফার্মেসী থেকে বেরিয়ে এসে অসিত ওর দিকে নিজের সিগারেট কেসটা বাড়িয়ে ধরল। প্রণব সিগারেট নিতে আপত্তি করল না। অসিতের মনে পড়ল, প্রণব আগে সিগারেট খেত না। কলেজে পড়ার সময় অসিতই ওকে প্রথম সিগারেট ধরায়। তারপর প্রণব অসিতর চেয়েও বেশি সিগারেট খেতে শিখেছে। এক সময় চেইনস্মোকার হয়ে উঠেছিল।

এদিকে গাছগাছালি বেশ আছে। একটি কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে অসিত প্রণবকে বলেছিল 'কী ভেবেছিলি তুই বলতো। দোলাকে না পেয়ে তুই নাকি জীবনটাকে নষ্ট করতে বসেছিলি। লেখাপড়া, চাকরি-বাকরি সব ছেড়ে দিয়ে একেবারে বিবাগী বাউণ্ডুলে হয়ে গিয়েছিসি তুই। বছর তিনেক তোর কোন পাত্তাই ছিল না। আজকাল কি কেউ এমন করে? এসব তো সেই সেকেলে নভেল নাটকে পড়তাম আমরা।'

প্রণব কোন জবাব দেয়নি। মৃদু হেসে নিজের মনে সিগারেট টেনে গিয়েছিল।

অসিত বলেছিল তোর কাণ্ডকারখানা দেখে আমি একসময় ভেবেছিলাম তোর সঙ্গে দেখা হলে আমি বলব ডিভোর্স করে দোলাকে আবার তোর কাছে ফিরিয়ে দেব একটা মেয়ের চেয়ে তোর জীবন, তোর সাকসেস তোর সুখশান্তি আমার কাছে অনেক বড় তুই বিশ্বাস করবি কিনা জানি না, বাচ্চাটাচ্চা আনতে আমি সেই জন্যেই দেরি করেছি। তারপর যখন শুনলাম তুই বিয়েও করেছিস ঘরসংসার পেতেছিস তখন—'

প্রণব অসিতের কথা বিশ্বাস করেছিল কিনা বোঝা যায়নি শুধু একটু হেসে বলেছিল, অসিত তুই মেয়েদের যত হাতের পুতুল মনে করিস আমি তা করিনে। আমি ওদের পুতুল করে রাখতেও চাইনে।'

মমতা উপস্থিত মত অসিতকে সেদিন খুব খাইয়ে দিয়েছিল। ডাল তরকারি মাংস 'ডম চাটনি দই কিছুই বাকি ছিল না। সে প্রায় ভুরিভোজ। খেতে খেতে বেলা দুটো বেজে গিয়েছিল।

এর আগে দুই বন্ধু কত রেস্টুরেন্টে খেয়েছে, কখনো কখনো বারে গিয়েও বসেছে, কিন্তু এমন পারিবারিক পরিবেশে এমন তৃপ্তি করে খাওয়া এর আগে যেন আর হয়নি।

বিদায় নেওয়ার সময় অসিত বলেছিল, 'আমাকে জোর করে খাইয়ে দিলি। এবার কিন্তু তোর একদিন রিটার্ন ভিজিট দিতে হবে। সবাইকে নিয়ে যাবি। বাচ্চাটাচ্চা সবসুদ্ধ। করে যাবি বল?'

প্রণব বলেছিল, 'গেলেই হয় একদিন।'

অসিত মমতার দিকে চেয়ে বলেছিল, 'আপনার ওপর ভার রইল। দিনক্ষণ স্থির হয়ে যাক।'

কিন্তু অত তাড়াতাড়ি দিনক্ষণ স্থির হয়নি। প্রণবও ব্যস্ত, মমতাও ব্যস্ত। প্রণব লিখছে টেক্সট বুকের নোট আর মমতা দেখছে স্কুলের টার্মিনাল পরীক্ষার খাতা। মাসখানেকের মধ্যে ওরা সময় করে উঠতে পারবে না।

এই মাসখানেক চুপ করে ছিল না অসিত। ওদের সঙ্গে ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিল। 'করে তোদের সময় হবে। করে?'

অসিত বন্ধুর বাড়িতে একদিন খেয়ে এসেছে। বন্ধুকে সপরিবারে একদিন খাওয়াতে পারলে তবে বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। অসিতের একটু জিতও থাকে। তাছাড়া এই অন্নগ্রহণের ভিতর দিয়ে প্রণব যেন

তার আর দোলার সব দোষত্রুটি মার্জনা করে তাদের দুজনকে নতুন করে গ্রহণ করবে। খাওয়া আর খাওয়ানোটা উপলক্ষ। আসল কথা মিলন, পুনর্মিলন। বন্ধুত্বের স্বীকৃতি। পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

শেষ পর্যন্ত আজ এই রবিবার দুপুরে আসবে বলে কথা দিয়েছে। টেলিফোন করে নিজেই ঠিক করে দিয়েছে তারিখ আর সময়। সবাইকে নিয়ে আসবে। সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি বাদল হচ্ছে আজকাল। বাচ্চাদের নিয়ে আসা, দুপুরই প্রশস্ত।

কিন্তু ওরা আসছে না তো ? হঠাৎ এক সময় খেয়াল হল অসিতের। বেলা বাড়তে বাড়তে সাড়ে বারটা বেজে গেল। ওরা এখনো এসে পৌঁছল না। ব্যাপারটা কি।

স্ত্রীকে ফিরে ফিরে দুতিনবার জিজ্ঞাসা করল অসিত, 'তোমার রান্নাবান্না সব রেডি তো ?'

দোলা বলল, 'কখন হয়ে গেছে।'

আমিষ নিরামিষ দিয়ে ষোড়শোপচার না হোক সাত আট রকমের পদ রেঁধেছে দোলা। রান্না যেমন করে ভালো তেমনি তাড়াতাড়িও করতে জানে, গ্যাসের ব্যবস্থা আছে রান্নাঘরে। কোন অসুবিধা হয় না।

খাইয়ে দাইয়ে বিন্নিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়বার আগে সে বার বার জিজ্ঞাসা করেছে 'মা ওরা এল না ?'

'কারা ?'

'আমার বন্ধুরা ?'

'আসবে। তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। তারপর আসবে।'

কিন্তু একটা বাজল, দেড়টা বাজল, প্রণবরা এল না।

অসিত অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। ব্যাপারটা কি। কেন আসছে না ?

পাশের ফ্ল্যাটে ফোন করতে গিয়ে সুবিধা হল না। ভদ্রলোক বিরস মুখে বললেন, 'ফোনের কথা আর বলবেন না মশাই। তিন দিন ধরে আউট অফ অর্ডার।'

অসিত বার বার গিয়ে দোলাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন আসছে না বলতো ?'

দোলা বলল, 'কী করে বলব ?'

অসিত বলল, 'ভুলতে পারেনি, কিছুতেই ভুলতে পারেনি। বিয়ে থা করেছে, ছেলে-মেয়ে হয়েছে এখন আর ওর কিসের দুঃখ ? তবু মনের মধ্যে দুঃখকে ইচ্ছা করেই জীইয়ে রেখেছে।' দোলা কোন জবাব দিল না।

অসিতের ছটফটানির শেষ নেই। একবার ছুটে গিয়ে রাস্তার মোড়ে বাস স্টপ পর্যন্ত যায়। সেই বাস স্টপে বহু যাত্রীই নামে। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রণবরা নেই। প্যাসেঞ্জার ভর্তি ট্যাক্সি দেখলে তার দিকে তাকায়, কিন্তু কোন ট্যাক্সিই অসিতের প্রত্যাশিত ব্যক্তিটিকে নিয়ে আসে না।

শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরে এল অসিত। বার বার ক্ষোভের সঙ্গে বলতে লাগল, 'মিছিমিছি আমার কতকগুলি টাকা নষ্ট হল। কত কষ্ট করে বাজার করলাম। আজকালকার দিনে জিনিসপত্রের দাম কি কম ? আসবেই না যখন কথা না দিলেই হত।'

দোলা এসব নালিশের কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'চল তোমাকে খেতে দিই।'

অসিত বলল, 'তুমি খাবে না ?'

'খাব বইকি।'

'তাহলে বলা উচিত ছিল, এসো আমরা দুজনে একসঙ্গে বসে খাই।'

দোলা একটু হেসে বলল, 'না বললেও তাই খাব।'

বেলা আড়াইটার সময় ওরা দুজনে বসল মুখোমুখি। এত যত্ন করে এত সুস্বাদু সব রান্না করেছে। কিন্তু জ্বরের রোগীর মত অসিতের মুখে আজ অরুচি।

ফিরে ফিরে মনে পড়তে লাগল কয়েক বছর আগেকার কথা। প্রফেসর বি· কে· দত্তের বাড়িতে যেত দুই বন্ধুতে একসঙ্গে। অধ্যাপক তাদের দুজনকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁর স্ত্রী আদর যত্ন করে খাওয়াতেন। কিন্তু আকর্ষণ যে কোথায় তা কারো কাছেই গোপন ছিল না। দোলা তখন বি· এ· পড়ত, চমৎকার রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইত। বাবার দুই ছাত্রকে সঙ্গ দিতে তার নৈপুণ্য ছিল সব চেয়ে

বেশি। অনেকদিন পর্যন্ত ওর মন জানা যায়নি। ওজনে প্রণব আর অসিত প্রায় একই রকম। বিদ্যায় বুদ্ধিতে চেহারায় বংশ-মর্যাদায় তফাৎ খুবই সামান্য। উনিশ আর বিশ। কারো মধ্যে এটা একটু বেশি কারো মধ্যে ওটা। মনে হত, দোলা যেন দুজনকেই ভালোবাসে। দুজনের সমষ্টি আর সংমিশ্রণে যে কল্পিত তৃতীয় ব্যক্তি তাকে যেন ভালোবাসে সবচেয়ে বেশি।

তবু একজনকে যখন বেছে নেওয়ার দিন এল দোলা প্রণবের দিকেই পক্ষপাত দেখাল। ওর কাছ থেকে আশ্বাস পেয়ে প্রণব চলে গেল ডুয়ার্সের একটা কলেজে চাকরি নিয়ে। অসিত রইল কলকাতায। কিন্তু অধ্যাপকের বাড়িতে তাব আসা যাওয়া বন্ধ হল না। আলাপ আলোচনাব প্রথম আর প্রধান প্রসঙ্গ থাকত প্রণব। অনুপস্থিত থেকেও সে সকলেব আলাপ আলোচনার মধ্যে প্রচণ্ডভাবে উপস্থিত থাকত। তখন অসিতের বড় ভূমিকা ছিল বিরহকাতরা বান্ধবীকে সঙ্গ দান। তারপর আস্তে আস্তে প্রসঙ্গ বদলাতে লাগল। দোলার মনোভাব বদলাতে লাগল। হয়তো কিছুটা প্ররোচনা অসিতের দিক থেকেই আগে এসে থাকবে। কিন্তু অসিত তো লুকোচুরি করে কিছু করেনি, দোলাকে চুরি ডাকাতি কবেও নেয়নি। দোলার মত নিযে তার বাবাই তাকে সম্প্রদান করেছেন।

সেই কাঁটাটুকু কি আজও প্রণব তার মন থেকে তুলে ফেলতে পারেনি ? আশ্চর্য !

কিন্তু আরও আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। এক সপ্তাহ বাদে একটু বেলার দিকে প্রণব এসে হাজির হল অসিতের ফ্ল্যাটে।

বন্ধুকে দেখে অবশ্যই খুশি হল অসিত। হেসে বলল, 'কী ব্যাপাব ? সেদিন এলি না যে ? তারিখ ভুল হযেছিল ?'

প্রণব বলল, 'নারে ভাই জ্বরে পড়েছিলাম। খারাপ টাইপের ইনফ্লুয়েঞ্জা। বাচ্চা দুটো এখনো ভুগছে। ফোনে খবব দিতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কানেকশনই পেলাম না।'

অসিত বলল, 'সত্যিই বলছিস ? মেডিকাল সার্টিফিকেট নিয়ে এসেছিস ?'

প্রণব নিজেব শুকনো দুটো গাল দেখিয়ে বলল, 'এই হল সার্টিফিকেট। খুব দুর্বল করে ফেলেছে।'

কাবো অসুখ হযেছিল শুনে এত সুখী অসিত বোধ হয় আর কখনো হয়নি।

প্রণব তখনই চা খেযে বিদায নিতে চায। কিন্তু অসিতবা তাকে কিছুতেই ছাড়ল না। দোলা নতুন কবে রান্না চাপাল। স্নান কবার জন্যে গবম জল করে দিল। তারপর অসিতকে যেমন উপস্থিত মত খাইযেছিল মমতা, প্রণবকেও দোলা তেমনি খাইযে দিল। খাওযাটা নিতান্ত খাবাপ হল না।

দোলা বলল, 'এ আসা কিন্তু তোমাব আসা হল না। ওদের সবাইকে নিয়ে আসতে হবে।'

প্রণব প্রতিশ্রুতি দিল, 'তাই আসব।'

বাচ্চাদেব অসুখ বলে আজ আব সে বেশি দেবি করল না। এ অবস্থায় অসিতর[illegible] বা পীড়াপীড়ি করবে কেন ?

অসিত ওকে এগিয়ে দেওযার জন্যে সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল।

হঠাৎ একটা বাসস্টপের কাছে এসে প্রণব থেমে দাঁড়াল।

অসিত বলল, 'কী হল রে ?'

সারি সাবি কয়েকটি ফ্ল্যাট বাড়ি। একটি বাড়িব দোতলাব একটি ফ্ল্যাটের দিকে আঙুল বাড়িয়ে প্রণব বলল, 'ওই ফ্ল্যাটটায় প্রফেসর দত্ত থাকতেন, তাই না ?'

অসিতও দাঁড়িয়ে পড়ল। হেসে বলল, 'তাই তো। তোর তো খুব লক্ষ্য আছে। ওঁরা এ ফ্ল্যাট অনেকদিন ছেড়ে দিয়েছেন। সাউথে চলে গেছেন। আমি এই পথ দিয়ে বোজ যাতায়াত করি। একবার চোখেও পড়ে না।'

প্রণব বন্ধুকে সিগারেট দিল, নিজেও ধরাল। তারপর ল্যাম্পপোস্টের মত সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। বোঝা গেল, ওকে পূর্বস্মৃতি তাড়া করে নিয়ে চলেছে।

স্মৃতি কি অসিতেরও নেই ? ফ্ল্যাটের ওই তিনখানি ঘর জুড়ে এক সময় কত আনন্দ উৎসব স্নেহ প্রীতির ধারা বয়ে গেছে, বিশ্বাস স্থাপন বিশ্বাস ভঙ্গ আর তার জন্যে অনুশোচনার পীড়ন সে অনুভব করেছে। এখন সেইসব অনুভূতির কোন চিহ্ন মাত্র নেই। এই ফ্ল্যাটে এখন যেমন একটি অপরিচিত

পরিবার বাস করেন, তখনকার মধুর আর তিক্ত মৃদু আর তীব্র অনুভূতিগুলিও যেন তেমনি এক অপরিচয়ের আবরণে আচ্ছন্ন। যে দোলা আজ তার গৃহিণী হয়ে ঘর সংসার করছে, সন্তান পালন করছে, সে কি সেই দোলা? নাকি আজকের সেই অসিতই সেই অসিত?

'তুই নিশ্চয়ই তখনকার দিনগুলির কথা ভাবছিস।' অসিত সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল।

প্রণব বলল, 'হয়তো।'

অসিত বলল, 'তখন বোধহয় তুই আমাকে খুন করে ফেলতে পারতিস।'

প্রণব অন্যমনস্কের মত বলল, 'তা পারতাম।'

অসিত বলল, 'আর এখন?'

প্রণব বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল। তারপর হেসে বলল, 'এখন পিনের খোঁচা দিতেও আলস্য লাগে।'

অসিত বলল, 'ঠিক বলেছিস। আলস্য, ঔদাস্য আর জড়তা সব ঢেকে দিচ্ছে। সেই প্যাশন আর কোন কিচ্ছুর মধ্যে নেই। না প্রেমে না বন্ধুত্বে না হিংস্র শত্রুতায়। তোর কি মনে হয় না মাত্র এই পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়সে এসেই আমরা বুড়িয়ে যাচ্ছি? বড্ড তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছি?'

প্রণব কোন জবাব দিল না।

অসিত বলল, 'কী ভাবছিস বলতো।'

প্রণব একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তোর ভাবনার চেয়ে আমার ভাবনা খুব একটা আলাদা নয়।'

তারপর বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনে নিঃশব্দে সিগারেট টানতে লাগল।

কোন দেবতাকে

কড়াটা নড়ছে তো নড়ছেই।

এই দুপুরবেলায় কে আবার এল জ্বালাতে। পাড়ার কোন ছেলে টেলে হবে। ওদের তো সময় অসময় বলে কিছু নেই।

মা রান্নাঘরের কাজে ব্যস্ত। বড়দি বাথরুমে। একবার ঢুকলে সহজে বেরোতে চায় না। ছোড়দি বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে বসে আছে। সামনে এম এ পরীক্ষা। পুরো একটা সপ্তাহও আর নেই মাঝখানে। ছোড়দি পরীক্ষার ব্যাপারে ভারি নার্ভাস।

অগত্যা সঞ্চিতাকেই এসে দোর খুলে দিতে হল।

সামনে এক ভদ্রলোক স্মিতমুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। পরনে ফর্সা ধুতি পাঞ্জাবি। মাথার চুল সব পাকা। তবু অপূর্ব সুন্দর দেখতে। টিকোল নাক, টানা চোখ। গায়ের রংও ফর্সার দিকে। সুপুরুষ কিন্তু বয়স্ক পুরুষ। ভদ্রলোককে চেনা চেনা লাগছে অথচ ঠিক পুরোপুরি চিনে উঠতে পারছে না সঞ্চিতা। এই অবস্থায় ভারি অস্বস্তি লাগে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'কি গো চিনতেই পারছ না। নলিনীর ছোট মেয়ে না তুমি?'

সঞ্চিতা অস্ফুটস্বরে বলল, 'হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক বললেন, 'নলিনী কোথায়?'

সঞ্চিতা বলল, 'মা রাঁধছেন।

'এখনো ওর রান্নাবান্না শেষ হয়নি ? চিরকালের অভ্যাস—'

সঞ্চিতা দোরের সামনে থেকে একটু সরে দাঁড়িয়ে বলল,—'আপনি ভিতরে আসুন।'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'যাক এতক্ষণে তুমি বোধহয় কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছ। লোকটি চোর নয় ডাকাত নয় ছেলেধরা কি মেয়েধরা ধরনের কিছু নয়। তাকে আসতে দেওয়া যায়, বসতে বলা যায়।'

সঞ্চিতা লক্ষ্য করল ভদ্রলোক একটু বেশি কথা বলেন। বয়স বেশি হলে কেউ কেউ তাই বলে। কিন্তু ওঁর বলবার ধরনটি বেশ সুন্দর। উচ্চারণ স্পষ্ট আর গলাটি ভারি মিষ্টি। এমন গলায় কেউ বক বক করলেও বিরক্তি আসে না।

ঘরের মধ্যে একখানা লম্বা সোফা পাতা। ভদ্রলোক তার একধারে বসে পড়লেন। হাতের ব্যাগটাকে রাখলেন পাশে। তারপর সঞ্চিতার দিকে চেয়ে হেসে বললেন, 'কই তোমার বাবা মা কই, দিদিরা কই। ডাকো ওদের। এলামই যখন সবাইকে একবার দেখে যাই।'

সঞ্চিতা বলল, 'কী বলব মাকে ?'

'বলবে তোমার টোকো মামা এসেছেন। ভাগ্যে টাক পড়েনি তাহলে সবাই বলত টেকো মামা। কিন্তু দেখেছ তো মাথার চুল ? পাক ধরলে কি হবে এখনো বেশ ঘন আর শক্ত। টেনে দেখ একগাছিও তুলতে পারবে না। অবশ্য তোমার কাছে আমার চুলের গর্ব সাজে না। তুমিও তো অরণ্যকুন্তলা। সেকালের নভেলিস্ট হলে বর্ণনা দিতে বসতেন আগুলফলম্বিত কেশদাম। আহাহা।'

সঞ্চিতা একটু আড়চোখে তাকাল। শুধু মুখেই নয় ভদ্রলোকের দুটি চোখেও যেন মুগ্ধতার বিস্তার। এমন দৃষ্টি ওর বয়সী কোন ভদ্রলোকের কাছে অপ্রত্যাশিত।

ঘরের সামনে রেলিং দেওয়া একফালি বারান্দা। সেই বারান্দায় নেমে ডানদিকে ঘুরে গেলে একেবারে শেষপ্রান্তে যে ছোট্ট ঘরটুকু আছে সেটাকেই মা রান্নাঘর বানিয়েছেন।

মায়ের কড়াতে তখনো চচ্চড়ি। এই রান্নাঘরখানাই যেন মায়ের সবচেয়ে প্রিয় ঘর। এই ঘরই তাঁর বিশ্বজগৎ। রান্নার মধ্যেই যেন তিনি তাঁর সমস্ত শিল্প নৈপুণ্যকে ঢেলে দিয়েছেন। তাঁর দ্বিতীয় কোন প্যাশন নেই।

'ও মা, দেখ এসে এক ভদ্রলোক এসেছেন। ডাকছেন তোমাকে।'

নলিনী মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'কে ?'

'বলছেন তো তোমার টোকো মামা। আসলে একটি বক্তিয়ার খিলিজি। এত বকবক করতে পারেন।'

সঞ্চিতা যতটা অভিযোগের সুরে কথাটা বলতে চাইছিল ততটা রুক্ষতা কিন্তু ওর গলায় ফুটে উঠল না। বরং কোথায় যেন একটু প্রশ্রয়ের আমেজ লাগল। সেই প্রসন্নতাটুকু সঞ্চিতার নিজের কাছেও গোপন রইল না।

নলিনী উঠে দাঁড়ালেন। পরনে লাল-পেড়ে সাদাখোলের শাড়ি। আধময়লা হয়ে উঠেছে। তিনি আঁচলে হাতখানা মুছে নিলেন।

সঞ্চিতা বলল, 'মা শাড়িটা বদলে নিলে না ?'

নলিনী বললেন, 'টোকো মামার কাছে যাব। এতেই হবে।'

অমনিতেও মা বেশভূষা সম্বন্ধে খুব উদাসীন। সাজসজ্জা করতেই চান না। মেয়েরা শাড়ি ধরবার পর নিজে রঙীন শাড়ি পরা ছেড়েই দিয়েছেন। এই নিয়ে বাবা একসময় খুব বকাবকি করতেন। এখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

মায়ের সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চিতা আবার বাইরের ঘরে চলে এল। এবার আর সে সামনে এল না, মায়ের পিছনে দাঁড়িয়ে রইল।

নলিনী বললেন, 'টোকোমামা কতদিন পরে এলে বল তো। পথ ভুল করে নিশ্চয়ই। ভবানীপুরে সেই যে সেজদির মেয়ে মিলুর বিয়ের সময় দেখা হয়েছিল তারপর আর দেখাসাক্ষাৎ নেই। আসোই না আজকাল।'

টোকো মামা বললেন, 'আসা কি সোজা রে। তোরা তো কিছুতেই আর সাউথে গেলিনে। কি সুখে যে এইখানে পড়ে আছিস তোরাই জানিস। এ যেন দুটো শহর। একটা হাল আমলের আর একটা অষ্টাদশ শতাব্দীর। মাঝখানের পথটা আজকাল এত লম্বা মনে হয় যেন সুমেরু কুমেরুর ব্যবধান। তাতো হল। কিন্তু এ কি চেহারা করেছিস। একেবারে শুষ্কং কাষ্ঠং। আমি তো তোর চেয়ে অন্তত বছর পাঁচেকের বড। কিন্তু দেখলে মনে হয় তুই যেন আমার বড় মাসী।'

নলিনী হাসিমুখে বললেন, 'তুমি ঠিক আগের মতই আছ টোকো মামা। তোমার ধরন ধারণ কথাবার্তা কিছু বদলায়নি। বিয়ে-থা তো করলে না—'

টোকো মামা বললেন, 'ভালো কথা। ভুলেই যাচ্ছিলাম। তোদের তো বিয়ের নিমন্ত্রণ করতেই এসেছি।'

ব্যাগটা খুলে ফেললেন ভদ্রলোক। তার ভিতর থেকে লম্বা একখানা খাম টেনে বের করলেন। লাল কালিতে এক কোণে কোণাকুনিভাবে ছাপা শুভ বিবাহ।

নলিনী বললেন, 'কার বিয়ে টোকো মামা? তোমার নিজের নাকি?'

টোকো মামা হেসে উঠলেন, 'তাহলে তো একটা দারুণ স্টাণ্ট দিতেই পারতাম। কিন্তু সেটা ওস্তাদের শেষ মার বলে এখনো থামিয়ে রেখেছি। ছোড়দার মেয়ে টুলু, তার বিয়ে। এইটি চার নম্বর। এর পরেও দুটি আছে। জানিস বোধহয় ওরা থাকে চক্রধরপুরে। কিন্তু বিয়ে হচ্ছে কলকাতায়। গড়িয়াহাটায় বাড়ি-ভাড়া করেছেন। অল্প দিনের মধ্যে সব ঠিকঠাক হয়েছে। আমি তো আর কিছু পারি না। শুধু চিঠি লিখতে পারি আর চিঠি বিলি করতে পারি। সেই ভার পড়েছে আমার ওপর। এই নে।'

চিঠিখানা নলিনীর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে তিনি বললেন, 'গৃহকর্তাটি কোথায়? আমাদের জামাতা বাবাজীবন শ্রীমান তপেশচন্দ্র?'

নলিনী বললেন, 'তিনি গেছেন উড়িষ্যায়, ময়ূরভঞ্জে।'

'ময়ূরভঞ্জে! সেখানে আবার কেন পাঠিয়েছিস!'

নলিনী বললেন, 'আমি পাঠাব কেন। পাঠিয়েছে অফিস। তাকে তো অফিসের কাজে বছরে ছ' মাস প্রায় বাইরে কাটাতে হয়।'

টোকো মামা বললেন, 'ঔ—সে তো আবার জিওলজিস্ট, ভূতাত্ত্বিক। আর আমি ভূত হয়েই রইলাম।'

নলিনী বললেন, 'তুমি ভূত হবে কেন? তোমার মত জ্যান্ত মানুষ ক'জন আছে? চিন্তা নেই ভাবনা নেই কন্যাদায় নেই, বেশ আছ।'

টোকো মামা হাসিমুখে চুপ করে রইলেন। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলি এবার। যাস কিন্তু সবাইকে নিয়ে। না গেলে ছোড়দা দুঃখ পাবেন।'

নলিনী বললেন, 'এখনই উঠবে কোথায়? এই ভরদুপুরে? বোসো, চা-টা খাও। তারপর চানটান করে দুটি ডালভাত খেয়ে যাবে।'

টোকো মামা বললেন, 'ওরে বাবা। আমার যে অনেক কাজ আছে। আমার যে আরো অনেক জায়গায় যেতে হবে। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে এলাম। ড্রাইভার আর থাকতে চাইছিল না।'

নলিনী সঞ্চিতার দিকে চেয়ে বললেন, 'সঞ্চু, যা তো মামার জন্যে এক কাপ চা করে নিয়ে আয়। চা খাবে না কফি, টোকোমামা?'

'তোর যা খুশি। আমি সবই খাই। কিছুতেই অরুচি নেই। কিন্তু তোর ওই সঞ্চারিনী পল্লবিনীকে কোথাও পাঠাসনে। ও বসুক এখানে। একটু আলাপ টালাপ করি। এতক্ষণ তো তোর আড়ালে মুখ লুকিয়েই রইল।'

নলিনী সস্নেহে মেয়ের দিকে তাকালেন, 'ওরা ভারি লাজুক। ঘরকুনো, কারো সঙ্গে মেশে টেশে না। মোটেই আজকালকার মেয়েদের মত নয়।'

তিনি বললেন, 'এ তো বড় চিন্তার কথা। একালের মেয়ে হয়েও ওরা একালিনী হচ্ছে না। আর আমি তিনকাল খুইয়েও প্রাণপণে চেষ্টা করছি একালে ঢুকে পড়তে।'

নলিনী হেসে বললেন, 'চেষ্টার কি আছে। তুমি তো ঢুকেই বসে আছ। সঞ্চু তুই বোস ওঁর কাছে। ভালো কথা, তোমাকে কী বলে ডাকবে ওরা ? দাদু না দাদা ?'

তিনি যেন আঁতকে উঠলেন, 'দাদু নয় দাদু নয়। ওই ডাকটা ট্রাম বাসের কণ্ডাকটাবদের মুখে শুনে শুনে কান পচে গেছে। রীতিমত ভালগার লাগে।'

'তাহলে দাদা বলেই ডাকবে।'

'যা খুশি। ওর চেয়েও মধুর যদি কিছু থাকে তাহলেও আপত্তি নেই।'

নলিনী হেসে বললেন, 'তোমার যা কথা। তুমি তো এত জায়গায় ঘোবাফেরা কব। এত জানাশোনা তোমার। দাও না আমাব মেয়েদের জন্যে সম্বন্ধ দেখে।'

সঞ্চিতা প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলল, 'মা, ওছাড়া কি তোমার মুখে কোন কথা নেই ?'

নলিনী মৃদু হেসে ভিতরের ঘবে চলে গেলেন।

সঞ্চিতাকে ওঁর পাশে গিয়ে বসতে হল। তিনি ওকে আরো কাছে ডেকে নিলেন।

তিনি বললেন, 'তোমার মা সঞ্চু সঞ্চু বলে ডাকছিল তোমাকে। তোমার নাম কি সঞ্চারিনী ?'

সঞ্চিতা একটু হেসে বলল, 'অতবড় লম্বা নাম হয় নাকি কারো ?'

'কেন হবে না ? লম্বা হলে অনেকক্ষণ ধরে উচ্চারণ করা যায়। লজেন্সের মত মুখের মধ্যে অনেকক্ষণ থাকে।'

এই সময় সঞ্চিতার দিদিরা এসে পড়ল। মাও এলেন। নিজেই কফি করে এনেছেন।

দিদিদের সঙ্গে তাঁর টোকো মামার পরিচয় করিয়ে দিলেন মা।

মা বললেন, 'অর্পিতা, বঞ্চিতা, সঞ্চিতা। নামের বাহার আছে। জানো তো তোমার জামাইকে। এক সময় সাহিত্য-টাহিত্য ভালোবাসত। যত কাব্য নিজের মেয়েদের নামেব ওপর ঢেলে দিয়েছে। প্রথম প্রথম দু-তিন মাস অন্তর মেয়েদের নাম বদলে রাখত। কিছুতেই আব মনস্থির কবতে পারে না। শেষে যখন স্কুলে ভর্তি করে দিতে হল তখন তো আর নাম ঠিক না করলে চলে না।'

টোকো মামা বললেন, 'কেবল মেয়েদেরই নতুন নতুন নাম দিয়েছে, তোকে বুঝি দেয়নি ? গুণে দেখ, একশ আটটা তো হবেই। বেশিও হতে পাবে।'

মা লজ্জিত হয়ে বললেন, 'কী যে বলো তুমি—'

ভদ্রলোক কফি খেয়েই বিদায় নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু মা ওঁকে ছাড়লেন না। বললেন, 'তাই কি হয়। কতদিন বাদে এসেছ। এই দুপুববেলায় কেউ কি কিছু না খেয়ে যায় ? ছেলেবেলায় আমরা কত মেলামেশা করেছি, দল বেঁধে কত হৈ-হুল্লোড়—মনে আছে ? ছেলেবেলায় আমাদের রাজবল্লভপাড়াব বাড়িতেই তো ছিল সব আড্ডা—'

মা তাঁর বাল্যস্মৃতিতে ফিরে যান।

ভদ্রলোক রয়ে গেলেন। চান করলেন, খেলেন। ডাল মাছ তরকারি, মায়েব হাতের প্রত্যেকটি রান্নার খুব সুখ্যাতি করলেন। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ওঁর খাওয়া। পাতে কিছুই পড়ে বইল না। একেই বলে ভোজনশিল্পী।

শ্যামবাজারে বড়দির এক বন্ধু থাকে, নাম উর্মি। তার সঙ্গে কি দরকার আছে বলে বড়দি বেরিয়ে গেল। ছোড়দি রইল তার পরীক্ষার পড়া নিয়ে। খাওয়া দাওয়ার পর মার একটু বিশ্রাম না করে নিলে চলে না। খবরেব কাগজটা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েন। দিনরাত খাটেন। দুপুরের পর এই নিদ্রাটুকুই ওঁর বিশ্রাম। ওঁকে ছুটি দিতে হল।

অতিথিকে সঙ্গ দেওয়ার দায়িত্ব পড়ল সঞ্চিতার ওপর। ওঁর ঘুমোবার অভ্যাস নেই। ওঁব বিলাস শুধু গল্প করার, কথা বলার।

কত গল্পই না করলেন। উনি থাকেন বালিগঞ্জের একটি তেতলা বাড়ির একখানা ঘর নিয়ে। সেই ঘরে আর কেউ নেই। একাই থাকেন। বাড়িটার দোতলা একতলা জুড়ে বিয়েবাড়ি। নিত্য উৎসব লেগে থাকে। নিজে তো বিয়ে থা করেননি। কিন্তু বিয়ে দেখার সুযোগটা প্রায়ই ঘটে। মাঝেমাঝে নিমন্ত্রণও জোটে। কোন কোন বিয়ে খুব সহজভাবেই হয়। আবার কোন কোন বিয়ের পিছনে কত জটিলতা। কত গোপন কান্না, কত বুকফাটা দীর্ঘশ্বাসের ইতিহাস। কোন লেখক যদি

এসব দেখতেন কি শুনতেন কত গল্প লিখে ফেলতে পাবতেন।

সঞ্চিতা জিজ্ঞাসা কবল, 'আপনি লেখেন না কেন ?'

তিনি বললেন 'আমি শুধু চিঠি লিখতে পাবি, চিঠি লিখতে ভালোবাসি।'

'বোজ লেখেন ?'

'তা লিখি।'

'বোজ আপনাব নামে চিঠি আসে তাহলে ?'

'তা আসে।'

সঞ্চিতা বলল, 'ভাবি মজাব ব্যাপাব তো।'

তিনি বললেন, 'তুমিও এই মজায যোগ দাও না।'

সঞ্চিতা আমন্ত্রণটা এডিযে গিযে বলল, 'আমাব ওসব অভ্যাস নেই।'

নতুন অভ্যাস কবে নিলেই হয। আমি বোজ ভোবে উঠে ভাবি আজ কোন না কোন বন্ধুব চিঠি পাব কিছু না কিছু নতুন কথা তাতে থাকবে। কিছু না কিছু বিস্ময আমাব জন্যে অপেক্ষা কবে আছে।

সঞ্চিতা বলল 'বোজই কি তেমন কিছু ঘটে ?'

ভদ্রলোক বললেন 'ঘটে না। কিন্তু আশা কবতে ক্ষতি কি ? আমি কখনো হতাশ হই না। আমি আশাব মধ্যে বাস কবি। সেই আশাব বাসা আমাব নিজেব হাতে বোনা। বাবুই পাখিব বাসাব মত তাতে কত যে শিল্পকলা তুমি যদি আমাব ঘবে যাও দেখতে পাবে।'

সঞ্চিতাব বুকেব মধ্যে ঢিপ ঢিপ কবতে থাকে। সে যেন মাযেব টোকো মামাব সঙ্গে কথা বলছে না। এ যেন এক অলৌকিক ক্ষমতাশালী জাদুকব। তাঁব জাদুদণ্ডে সম্মোহন শক্তি। মাযামন্ত্রে তিনি যে তাকে কোন অচেনা জগতে নিযে যাবেন তাব ঠিক নেই। তাঁব মাথাব রুপালি চুলেব গুচ্ছ যেন রুপাব মুকুট। তাঁব বযসেব তুলনায শবীবেব অন্য সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গেব তুলনায চুলগুলি যেন হঠাৎ পেকে গেছে। বড্ড বেমানান বলে প্রথম মনে হযেছিল সঞ্চিতাব। এখন আব তা মনে হচ্ছে না।

ইচ্ছা কবেই ওঁব চোখেব দিকে তাকাচ্ছিল না সঞ্চিতা। সে মাযেব কাছে শুনেছে কোন কোন লোক আছে যাদেব চোখেই সব শক্তি। সেই শক্তিবলে তাবা অন্তত কিছু সমযেব জন্যে মানুষকে দিযে যা খুশি তাই কবাতে পাবে।

এদিকে আকাশে মেঘেব পব মেঘ জমতে শুরু কবেছে। আষাঢ মাস। মেঘ-বৃষ্টিবই দিন। বোজই প্রায বিকালে বৃষ্টি হচ্ছে।

'বাঃ কি সুন্দব মেঘ কবেছে দেখবে এসো।'

ভদ্রলোক বেলিংঘেবা বাবান্দায গিযে দাঁডালেন।

'এসো এসো দেখবে এসো।'

কী দেখবাব আছে ওখানে উনিই জানেন। সঞ্চিতাবা বোজই ওখানে গিযে দাঁডায। জামাকাপড শুকোতে দিতে যায। এমন কিছু তো দেখতে পায না। একটি বাস্তা। খানিক দূবে এখনো মেবামতের কাজ চলছে। বছবেব পব বছব চলে যাচ্ছে। কাজ আব শেষ হয না। বাস্তাব দক্ষিণে নতুন একটা পার্ক হযেছে। সকালে বুডোব দল মর্নিংওযাক কবেন। বিকালে ছোট ছেলেমেযেদেব ছুটোছুটি দেখা যায। আব কী দেখবাব আছে ওখানে ?

তবু যখন ভদ্রলোক অমন কবে ডাকছেন যেতেই হল। সঞ্চিতা গিয়ে ওঁব পাশে দাঁডাল।

ভদ্রলোক আঙুল তুলে দেখালেন, 'কী সুন্দব লেটাব বক্স দেখেছ ? কী সুন্দব টুকটুকে বঙ মেখে সবুজ ঘাসেব ওপব দাঁডিয়ে আছে। খুব সুন্দব না দেখতে ?'

সঞ্চিতা মোহাবিষ্টেব মত বলল, 'হ্যাঁ।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ও প্রতীক্ষায় আছে কবে একটি তন্বী সুন্দবী মেযে সন্তর্পণে বাস্তাটি পাব হযে ওব কাছে গিযে দাঁডাবে। তাবপব সঙ্গোপনে বঙীন খামেব চিঠিখানি টুপ কবে ওব মধ্যে ফেলে দেবে।'

সঞ্চিতা হেসে বলল, 'তা বুঝি কেউ আব দেয় না ? পাডাব কত মেযেই তো ওই লেটাব বক্সে

গিয়ে চিঠি পোস্ট করে।'

'শত মেয়ে করুক। ও কিন্তু একজনের প্রতীক্ষা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এবপব থেকে দুটি লেটার বক্স তোমার চিঠির জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকবে। একটি এই সবুজ গালিচার ওপর পাতা। গণেশের মত লাল টুকটুকে রঙের এই বড় লেটার বক্সটি। আর একটি বালিগঞ্জের একটি সাদা বাড়ির তিনতলার ঘরের গায়ে লাগানো একটি কাঠের বাক্স। আমি ভেবেছি সেটিকেও এমনি টুকটুকে সিঁদুরে রঙে রাঙিয়ে নেব। চিঠির বাক্সের বঙ লাল না হলে মানায় না।'

সঞ্চিতা কোন জবাব দিল না।

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকার পর ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'ঈস, অনেক দেরি হয়ে গেল। কত কাজ পড়ে আছে এখনো। যাই এবার। তুমি কি একটু এগিয়ে দেবে?'

সঞ্চিতা হেসে বলল, 'কতদূর?'

'যতদূর চোখ যায়।'

টোকো মামা চলে যাচ্ছেন শুনে নলিনীও উঠে এলেন।

তিনি বললেন, 'এক কাপ চা খেয়ে গেলেই পারতে।'

'না না, অনেক দেবি হয়ে গেছে।'

নলিনী বললেন, 'আমার মেয়েদেব সম্বন্ধেব কথা মনে রেখো। একটি একটি করে তো এবার—বড়টি বি· এ· পাস করেছে। মেজোটি এম· এ· দেবে। ছোটটি এম· এ· পড়ছে।'

টোকো মামা হেসে বললেন, 'বিয়ের জন্যে বাড়ি যদি চাস সস্তায় করে দেব। বাড়িওয়ালাব সঙ্গে আমাব খুব খাতির আছে।'

নলিনী বললেন, 'আগে পাত্র ঠিক হোক তারপব তো বাড়িব ব্যবস্থা। তুমি কিন্তু এসো আবার টোকো মামা। তুমি এলে খুব আনন্দে কাটে।'

টোকো মামা সঞ্চিতাব দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওই তো আমাব কাজ। আমিও এক ধবনেব সোশ্যাল এনটাবটেইনাব। যদি জিজ্ঞেস করো আপনার মিডিয়াম কি, আমি বলব আমার কোন মিডিয়াম নেই। আমিই আমার মিডিয়াম।'

এতক্ষণে এই স্ফূর্তিবাজ মানুষটিব গলায় যেন একটু বিষাদেব ছোঁয়া লাগল।

দোতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন তিনি। পিছনে পিছনে সঞ্চিতা।

টোকো মামা বললেন, 'খুব পুরনো বাড়ি তো দেখছি। লর্ড ক্লাইভের আমলের নাকি?'

সঞ্চিতা হেসে বলল, 'অত পুরনো নয়।'

'অনেক ভাড়াটে থাকে বুঝি? এ যে একটা মালটিপারপাস স্টোর দেখছি।'

সঞ্চিতা বলল, 'তা বলতে পারেন।'

ওঁকে সদর দবজা পর্যন্ত এগিযে দিয়ে এল সঞ্চিতা। রাস্তার ওপারে বাসস্ট্যাণ্ড। গোটা দুয়েক বাস দাঁড়িযে আছে। তিনি রাস্তা পার হযে গিযে স্টার্টাবেব সঙ্গে কি একটু কথা বলে সামনের দোতলা বাসটায় উঠে পড়লেন। একেবাবে দোতলায় চলে গেলেন। সামনেব দিকে জানলার ধাবে একটি সীটে বসে জানলা দিযে মুখ বাড়িযে হাত নাড়তে লাগলেন।

সঞ্চিতা কিন্তু হাত নাড়ল না। কে জানে কে কোত্থেকে দেখে ফেলবে।

ফিরে এসে সঞ্চিতা সবাইর জন্যে চা কবল। বাড়িতে থাকলে বৈকালিক চায়ের পাটটা সে নিজের হাতেই নেয়। চায়ের গন্ধ পেয়ে পড়া-টড়া ছেড়ে রঞ্জিতাও এসে বসল। এতক্ষণ ওর মুখে কথা ফোটেনি। এখন ফোড়ন কেটে বলল, 'মা তোমাব টোকো মামা তো আমাদেব সঞ্চুর সঙ্গে খুব ভাব করে গেলেন। সাবা দুপুর ফিস ফিস। আব একটু হলে ওকে টোকো মামী বানিযে ফেলেছিলেন আর কি?'

মা হাসি চেপে ধমক দিয়ে বললেন, 'যাঃ ফাজিল কোথাকাব।'

সঞ্চিতা বলল, 'আমার করা চা খাচ্ছিস আবার আমাকেই খুঁড়ছিস। অকৃতজ্ঞ। সামনেই পরীক্ষা। যদি কিছু একটা—'

রঞ্জিতা বলল, 'এই পরীক্ষা নিয়ে কোন কথা বলবিনে।'

সঞ্চিতা জানে পবীক্ষাব ব্যাপাবে ওব দাকণ ভয। নানাবকম কুসংস্কাবেব জালে বাঁধা। অনেক কিছু মানে।

মা তাঁব টোকো মামা সম্বন্ধে আবো একটু স্মৃতিচাবণ কবলেন। আপন মামা নন, মায়েব পিসতুতো ভাই। একসময খুব যাতাযাত মেলামেশা ছিল। সম্পর্কে মামা হলে কি হবে আসলে মামাত ভাইযেব মত, প্রায সমবযসী। অনেক গুণ ছিল। কিন্তু বড অস্থিবমতি, নিষ্ঠা নেই। কত জাযগায কত কাজ কবেছে তাব ঠিক নেই। ধবে আব ছাডে। এখন নাকি একটা গ্রামোফোন কোম্পানীব সঙ্গে আছে। বিযে টিযে কবল না। কেন কে জানে। লোকে নানাকথা বলে। নানাবকম বটনাও আছে। টোকোমামা নিজেও কি নিজেব সম্বন্ধে কম বটায নাকি? অদ্ভুত মানুষ।

মা উঠে পডলেন। কাজ সাবতে হবে। বঞ্জিতা আবাব তাব বই নিযে বসল।

সঞ্চিতা চুপ কবে বসে বইল। মনেব মধ্যে কী যে এলোমেলো ভাবনা কল্পনাব হাওযা বযে যেতে লাগল তাব কোনো মাথামুণ্ডু নেই।

তাবপব অনেক বাত্রে কাগজ কলম নিযে কিছু লিখতে বসল সঞ্চিতা।

কিন্তু কী লিখবে? গল্প কবিতা সেই স্কুলে থাকতে একসময লিখত। কবে ছেড়ে দিযেছে। এখন কি আব তা ফেব লেখা যায? সেই ছেলেবেলাব মন তো আব নেই। এখনকাব মন যা লিখতে চায তাব উপযোগী ভাষা কোথায, ফর্ম কোথায?

এক সময ডাযেবিও লিখত সঞ্চিতা। লুকিযে লুকিযে নিজেব গোপন মনেব কথা লিখে যেত। কিন্তু সেই ডাযেবি একদিন দিদিদেব হাতে পডল। তাবা সববে সঞ্চিতাব গোপন কথাগুলি সবাইকে পড়ে শোনাতে লাগল। কী লজ্জা। কী লজ্জা! ছোট হবাব বড জ্বালা। বাগে দুঃখে সেই যে ডাযেবি লেখা ছেড়ে দিল সঞ্চিতা, আব লেখা হল না। বাবা এখনো তাকে বছবেব শুকতে একখানি কবে সুন্দব ডাযেবি উপহাব দেন। সেই ডাযেবিব মলাটেব বঙ কোন বছব লাল কোন বছব নীল কোন বছব সবুজ। দেখেই মনেব মধ্যে উল্লাস জেগে ওঠে। মনে হয সাবা পৃথিবীতে বঙ ছাডা যেন আব কিছু নেই। বর্ণে বর্ণে অবর্ণনীয ধবণী। সঞ্চিতাব ইচ্ছা হয একই দিনে সেই ডাযেবিব তিনশ পঁযষট্টিটি পাতা লিখে ফেলে। কিন্তু এক পাতাও লেখা হয না। মনেব কথাব খাতা আবও গভীবে মনেব মধ্যে লুকিযে বযেছে। দিদিদেব সাধ্য নেই তা টেনে বেব কববাব। শেষ পর্যন্ত সেই ডাযেবিতে কলেজেব নোট লেখে সঞ্চিতা। আবো পুবনো হলে মাকে দিযে দেয। বাকি পাতাগুলি মায়ের হাতে পড়ে হয ধোপাব হিসেবেব খাতা।

চিঠি? চিঠি লেখাব অভ্যাসও বড একটা নেই সঞ্চিতাব বাবা বাইবে থাকলে তাঁকে দু একখানা পোস্টকার্ড ক্বচিৎ কখনো লেখে। মল্লিকা পডত তাব সঙ্গে। ওব বাবাব বেলেব চাকবি। তিনি খড়্গপুবে বদলি হবাব পব মল্লিব সঙ্গে অল্পস্বল্প চিঠিপত্র লেখালেখি হত। তাবপব বদলী হল মল্লিকা নিজে। বাপেব বাডি থেকে শ্বশুরবাডিতে। তাবপব থেকে সব যোগাযোগ বন্ধ।

কিন্তু আজ একখানা চিঠি লিখতে ভাবি ইচ্ছা কবছে সঞ্চিতাব। কাকে লিখবে সেই হযেছে কথা। না, মাযেব ওই বুডো টোকো মামাকে নয। শুধু বুডো হলেও কথা ছিল না। ওঁব যে অনেক আছে। সঞ্চিতা অনুমান কবতে পেবেছে ওঁব অনেক আছে পত্রপ্রণয়িনী। কিন্তু সঞ্চিতা তাব প্রথম চিঠি এমন কাউকে লিখতে চায না যিনি বহুবল্লভ। সে তাব প্রথম প্রেম এমন কাউকে নিবেদন কবতে চায না যিনি শততম প্রেমেব স্বাদ পেযেছেন। সঞ্চিতা একজনেব কাছে একতমা হযে থাকতে চায। কিন্তু কে সেই একেশ্বব? অ-দৃষ্ট অদৃশ্য অনাগত হৃদযেশ্বর?

সাবা পৃথিবী সন্ধান কবে দেখল সঞ্চিতা। কোন বন্ধু নেই তাব, কোন পত্রবন্ধু নেই। সঞ্চিতাব সঙ্গে পড়ে এমন কোন কোন মেয়েব চিঠিব বন্ধু আছে, ফোনেব বন্ধু আছে। স্বদেশী বন্ধু বিদেশী বন্ধু, প্রতিবেশী বন্ধু প্রবাসী বন্ধু। বন্ধুময বসুন্ধবা। কেউ কেউ আবার পেন-ফ্রেণ্ডকে বিযেও কবে।

মাযেব টোকো মামা কথায কথায় বলেছিলেন, 'বল কি, তোমাব কোন বন্ধু নেই? এই তো বন্ধুত্বেব বয়স। এখন হাত বাডালেই বন্ধু, পা বাড়ালেই পথ, চোখ তুলে তাকালেই শুভদৃষ্টি।'

সঞ্চিতা হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কতজনের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হয়েছে আপনাব? কতজনেব সঙ্গে মালাবদল কবেছেন?'

তিনি বলেছিলেন, 'অগুনতি অগুনতি। তবু মনে হয় এই প্রথম, এই প্রথম।'

মনে হওয়াটাই কি সব ? মনে তো হয় না। কে জানে ?

বাইরে গোলমাল শোনা যাচ্ছে। বাইরের নয়, এই বাড়ির ভিতরেরই গোলমাল। একতলার ঘরের হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক মদ খেয়ে এসে বউকে পেটাচ্ছে। নতুন কিছু নয়। মাঝে মাঝে প্রায়ই এইরকম ঘটনা ঘটে। অন্য ভাড়াটেরা কেউ কেউ এসে শাসায় 'তুলে দেব আপনাকে। আর পাঁচজনের শান্তিভঙ্গ করছেন আপনি। এখান থেকে তুলে দেব।'

কিন্তু মদ্যপ লোকটি ভালোই জানে তুলে দেবার মালিক ওরা নয়। আসল যে মালিক তাঁর সঙ্গে ওর কোন অবনিবনাও নেই। মাসের প্রথমে ভাড়াটি দিব্যি গুণে দেয়। যে নিয়ম এ বাড়ির অনেকেই মানে না। তাছাড়া স্ত্রীকে মারধোর করলে কি হবে, মত্ত অবস্থা কেটে গেলে আবার আদর আহ্লাদও করে। গয়নাগাটি এনে দেয়। সঙ্গে করে নিয়ে যায় সিনেমা থিয়েটার দেখতে। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে হয়েছে। ওরা ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর পাঠ নেয়নি।

কিন্তু আজকের চেঁচামেচিটা যেন খুব বেশি। সঞ্চিতার মনে হল আজ এসব না হলেই যেন ভালো হত। আজ একটি সুন্দর মনোরম বর্ণগন্ধময় জগতে বাস করতে চায় সঞ্চিতা। সে জগৎ কি শুধু কল্পনার জগৎ, স্বপ্নের জগৎ, বাস্তবে তার কি কোন অস্তিত্ব নেই ? সে জগৎ কি শুধু নিজের মনেই নিজেকে নিয়ে গড়ে তুলতে হয় ? কারো সাহায্য ছাড়া তা কি সম্ভব ?

মা বার বার তাগিদ দিচ্ছেন, 'ও সঞ্চু এবার সুইচটা অফ করে দে মা। ঘরের মধ্যে আলো জ্বালা থাকলে কেউ কি ঘুমুতে পারে। কী লিখছিস মাথামুণ্ড। আজ রেখে দে, কাল আবার লিখিস। লেখার সময় [illegible] পালিয়ে যাচ্ছে না।'

ও ঘর থেকে দুই দিদি ফোড়ন কাটতে লাগল। অর্পিতা বলল, 'তোমার ছোট মেয়ে মস্ত বড় বই লিখছে মা। মহাকাব্য লিখছে।'

রঞ্জিতা বলল, 'মহাকাব্য নাকি চম্পূকাব্য ? পত্রকাব্য ? রাত জেগে কার কাছে চিঠি লিখছিস সঞ্চু ?'

সঞ্চিতা কারো কথারই জবাব দিল না। হঠাৎ তার মনে হল অস্পষ্ট ছায়ার মত কে যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই ছায়ামূর্তি পক্ককেশ প্রৌঢ় নন, অনিন্দ্যকান্তি নব যুবক। তার রূপের তুলনা নেই, তার যৌবনদীপ্তি অতুলনীয়। সঞ্চিতা তার মুখের দিকে তাকাতে সাহস পেল না। পাছে কোন চেনা মুখের সঙ্গে তার সাদৃশ্য দেখতে পায়।

আলো নিবিয়ে দিয়ে আলগোছে দক্ষিণের দোর খুলে সেই সরু রেলিংঘেরা বারান্দায় এসে দাঁড়ালো সঞ্চিতা। বাইরে নিথর স্তব্ধতা। দূরের নারকেল গাছগুলির মাথা যেন কালি দিয়ে আঁকা। কিন্তু আকাশে সেই ঘন মেঘের পুঞ্জ আর নেই। বিকালে সন্ধ্যায় অশ্রান্ত বর্ষণে নিজেকে সে নিঃশেষ করে দিয়েছে। আকাশে এখন চাঁদ। পূর্ণচাঁদ নয়, খণ্ড চাঁদ। আকাশে এখন তারা। সঞ্চিতার নক্ষত্র পরিচয় হয়নি। দুটি একটি বাদে সব তারাই তার কাছে নাম পরিচয় হারা। তবু কোন কোন সময় কত চেনা, কত আপন বলেই না মনে হয় ওদের।

কী আশ্চর্য, ওই ম্লান চাঁদের আলো আর তারার মালার নিচে দাঁড়িয়ে আছে সেই লেটার বক্সটি। বৃষ্টিতে ভিজে জ্যোৎস্নায় ভিজে যেন অপার্থিব লাবণ্যে ভরে উঠেছে ওই চিঠি ফেলার দীর্ঘাকার আধারটি। কিসের জন্যে অপেক্ষা করছে ওই রূপাধার ? একখানি চিঠির জন্যে ?

চিঠিখানি হাতে নিয়েই এসেছে সঞ্চিতা। কোন মায়ামন্ত্র বলে চিঠিখানা যেন স্বয়ং লিখিত হয়েছে। একখানি সাদা খামের মধ্যে নিজেকে আবৃত করেছে সেও যেন কোন জাদুকাঠির স্পর্শে। সবই যেন লোকাতীত বোধাতীত ঘটনার জাল। ইন্দ্রজালের মত সঞ্চিতাকে আজ সাদরে জড়িয়ে রেখেছে।

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সংবিৎ ফিরে এল সঞ্চিতার। না, এ চিঠি কাউকে পাঠানো যায় না। আজ মেঘাচ্ছন্ন বর্ষণমুখর রাত্রে যা সে লিখেছে কাল দিনের আলোয় তা যদি পড়ে সঞ্চিতা নিজেই লজ্জায় মরে যাবে। এ চিঠি কাউকে পাঠানো যায় না।

টুকরো টুকরো করে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল সঞ্চিতা। ছুঁড়ে দিল লেটার বক্সটার দিকে। নির্মমভাবে

ছিঁড়তে পাবল না, পবম মমতাব সঙ্গেই ছিঁড়ল। নিজেব লেখা, নিজেব সৃষ্টি। যেন নিজের হৃদপিণ্ড টুকবো টুকবো কবে ছিঁড়ে ফেলছে।

কিন্তু এত ভয় কববাব কোন কাবণ ছিল না সঞ্চিতাব। খামের ওপব নামও লেখা ছিল না, ঠিকানাও লেখা ছিল না। ও চিঠি কোথাও গিযে পৌঁছত না।

শ্রাবণ ১৩৮২